প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ— ...

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্ত্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ (১৯৬৮)

—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৯

ভিন্ন স্রোত (গল্প)—সন্তোষকুমার ঘোষ ... ২৭

সাহিত্যস্রষ্টা বিদ্যাসাগর—সন্তোষকুমার অধিকারী ... ৩৬

তিনকন্যে (উপন্যাস)—সীতা দেবী ... ৪০

চতুষ্পাদ ব্রহ্ম—মনিকণা গুপ্তভায়া ... ৫০

জব্বলপুরে তিনদিন—বামপদ মুখোপাধ্যায় ... ৫২

দলিল—জুলফিকার ... ৬০

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৬৯

সমাপ্তি (কবিতা)—শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী ... ৭৮

ভগিনী নিবেদিতাকে : দু'টি প্রশ্নের নৈবেদ্য (কবিতা)—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৯

জাগতিক (কবিতা)—শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ... ৮০

সার্থকতা (কবিতা)—শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

মুখ (কবিতা)—শ্রীসুধীর নন্দী ... ৮১

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ—ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার ... ৮২

মুক্তমালা (গল্প)—চিত্ররথ ... ৮৩

মূলে ভুল—(উপন্যাস) পুষ্প দেবী ... ৮৯

ককেশিয়াস চক সারকল—অশোক সেন ... ৯৭

মৃত্যুদণ্ড—বিমলাংশুপ্রকাশ রায় ... ১০৮

অন্তর্বর্তী নির্ব্বাচন—বিধুভূষণ জানা ... ১১০

গ্রন্থ পরিচয়— ... ১১৯

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	...	১২১
বেদের দেবতা—অশ্বিদ্বয়—মুক্তাকণা সেনচৌধুরী	...	১২৯
তিনকন্যে (উপন্যাস)—সীতা দেবী	...	১৩৫
বিদ্যাসাগরের উইল—সন্তোষকুমার অধিকারী	..	১৪৬
ককেশিয়ান চক সারকল—অশোক সেন	.	১৫১
বিপ্লবের উৎস—কালীচরণ ঘোষ	...	১৫৬
স্মৃতিচারণ : রামপদ মুখোপাধ্যায়—যোগেশচন্দ্র বাগল	...	১৬৪
বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	১৭১
মূলে ভুল (উপন্যাস) পুষ্প দেবী	...	১৭৯
নিবেদিতার অবদান শ্রীননী দাস	...	১৮৯
সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—ভাগবতদাস বরাট		১৯৩
সার্থক স্মরণ (কবিতা) -শান্তশীল দাশ	...	১৯৮
"প্রবাসী" (কবিতা)—জ্যোতির্ময়ী দেবী	...	১৯৯
যশোর গান (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত	..	১০০
অনেক বর্ষার পর (কবিতা) করুণাময় বসু	...	২০০
খুঁজে ফেরে (কবিতা)—রেবা ভবানী	...	২০১
কবি তানসেন—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	২০১
গান্ধীজি : গঠন কর্ম : অস্পৃশ্যতা বর্জন—কানাইলাল দত্ত		২১৪
স্মৃতির টুকরো—সাতকড়িপতি রায়	...	২১৯
নাম মাহাত্ম্য—বিমলাংশুপ্রকাশ রায়	...	২২৯
হাওড়া জেলার মাটির ঘর—তারা সাঁতরা	...	২৩৩
গ্রন্থ পরিচয়—	...	২৩৭

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী
১৩৭৫
পৌষ

প্রবাসী—পৌষ ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	...	২৪১
সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি—অসীম বর্দ্ধন	...	১৪৯
আরণ্যক—ডাঃ নন্দলাল পাল	...	২৫৪
ছন্দের রাজা সুকুমার রায়—বিনায়ক সেনগুপ্ত	...	২৬৩
ককেশিয়ান চক সারকল—অশোক সেন	...	১৬৮
চিত্তরঞ্জনের কবি কর্ম—সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	...	২৭৬
সাহিত্যে শ্লীলতা—বিনায়ক সান্যাল	...	২৮৩
সম্বিত্তি ও সত্য—কালীচরণ ঘোষ	...	২৮৮
গান্ধীজির বইপড়া—কানাইলাল দত্ত	...	২৯৪
তিনকন্যে (উপন্যাস)—সীতা দেবী	...	৩০৩
বাঙলা ও বাঙালীর কথা—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৩১৪
প্রেম (গল্প)—সমর বসু	...	৩২৩
শুভরাত্রি (কবিতা)—করুণাময় বসু	...	৩২৮
লণ্ডন (কবিতা)—ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	...	৩২৯
কবি ও বিজ্ঞানী (কবিতা)—দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	...	৩৩০
সূর্য্যমন্দির (কবিতা)—অলক গোস্বামী	...	৩৩১
এবং (কবিতা)—জ্যোতির্ময়ী দেবী	...	৩৩২
কল্পিত-অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা—রবীন্দ্রনারায়ণ দে	...	৩৩৩
মূলে ভুল—(উপন্যাস) পুষ্প দেবী	...	৩৩৮
সাগর তীর্থ—মাধব পাল	...	৩৫১
বীর অভিমন্যু (গল্প)—স্নেহেন্দু মাইতি	...	৩৫৭

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
প্রবাসী
মাঘ
১৩৭৫

প্রবাসী—মাঘ ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	৩৬২
পঞ্চধারা—পরিমল গোস্বামী	৩৬৯
দশমী—সুবোধ বসু	৩৭৯
কান্তকবি রজনীকান্ত সেন—রণজিৎকুমার সেন	৩৮৮
তিনকন্যে (উপন্যাস)—সীতা দেবী	৩৯৩
সমিতির উদ্ভব ও প্রসার—কালীচরণ ঘোষ	৪০৩
মা ও বাপু—কানাইলাল দত্ত	৪১১
স্মৃতির টুকরো—সাতকড়িপতি রায়	৪১৭
অগ্নিযুগের চন্দননগর—শ্রীদ্রষ্টা	৪১৮
বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৪২৫
অব্যক্ত (গল্প)—আরতি বসু	৪৪১
সম্মোহন (কবিতা)—শঙ্কর চক্রবর্ত্তী	৪৪৬
মন (কবিতা)—শ্রীবাণীকুমার দেব	৪৪৭
আহ্বান (কবিতা)—শ্রীজিৎ ভট্টাচার্য্য	৪৪৮
আলো-ছায়া (কবিতা)—রেবা ভবানী	৪৪৯
পঞ্চশস্য—	৪৫০
ককেশিয়ান চক সারকল—অশোক সেন	৪৬১
মূলে ভুল—(উপন্যাস) পুষ্প দেবী	৪০১
পুস্তক পরিচয়—	৪৮০

প্রবাসী—ফাল্গুন, ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ—	...	৪৮১
পত্রধারা—পরিমল গোস্বামী	...	৪৮৯
নেমন্তন্ন (গল্প)—সুনীল মুখোপাধ্যায়	...	৪৯৮
কালিদাস সাহিত্যে দার্শনিক ও বৈয়াকরণ উপমা—রঘুনাথ মল্লিক	...	৫০১
তিনকন্যে (উপন্যাস)—সীতা দেবী	...	৫০৪
বাপুকে যেমন দেখেছি—অরুণা দাশগুপ্তা	...	৫১৫
প্রমথ চৌধুরীর 'ছোটগল্প'—সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী	...	৫১৮
গান্ধীজির সত্যাগ্রহ—কানাইলাল দত্ত	...	৫২৪
মূলে ভুল—(উপন্যাস) পুষ্প দেবী	...	৫৩১
মস্কো আকাডেমিক আর্ট থিয়েটারের সত্তর বছর পূর্তি উৎসব—অশোক সেন	...	৫৫০
বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	...	৫৫৩
রাত্রির বাগানে (কবিতা)—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য	...	৫৬০
স্বপ্ন (কবিতা)—বিভা সরকার	...	৫৬১
বাগানিয়া (কবিতা)—নীরদবরণ	...	৫৬২
নিপীড়নের নাগপাশ—কালীচরণ ঘোষ	...	৫৬৬
স্মৃতিচারণ : আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি—ভাগবতদাস বরাট	...	৫৭৩
পঞ্চশস্য—	...	৫৭৭
সাময়িকী	...	৫৯০

"আপনি কি সুখী হতে চান"?

পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে ছোট পরিবার গড়ে, আপনি প্রকৃত সুখী হতে পারেন। এই পরিকল্পনার সাহায্যে আপনার আয় অনুযায়ী, কত বৎসর অন্তর আপনার সন্তান হলে ভাল হয়, তা আপনি নিজেই স্থির করতে পারবেন, ফলে আপনার সংসারের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকবে।

বহু সন্তান জন্মানোর ফলে মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে গৃহের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, পরিকল্পিত ছোট পরিবারে এসব ঘটতে পারে না।

আপনার সীমিত সংখ্যক সন্তানের শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও তাদের ভালভাবে মানুষ করার দিকে প্রয়োজনীয় দৃষ্টি দিতে পারেন।

বিবাহিত জীবন কোনরূপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারেন।

এ বিষয়ে স্থানীয় হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ আপনাকে পছন্দমত পদ্ধতি বেছে নিতে সাহায্য করবে।

যাতায়াত, খাদ্য ও মজুরীহানী ইত্যাদির জন্য আপনাকে অর্থ সাহায্যও করা হবে।

যে কোন হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে সব রকম সাহায্য পাবেন,......যোগাযোগ করুন।

প্রবাসী—চৈত্র, ১৩৭৫

সূচীপত্র

বিবিধ প্রসঙ্গ— ... ৬০১
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—ঋষভচাঁদ ... ৬০৯
প্রতিবন্ধ (গল্প)—সন্তোষ কুমার ঘোষ ... ৬১৬
অহিংসা—কানাইলাল দত্ত ... ৬২৪
তিনকন্যে (উপন্যাস)—সীতা দেবী ... ৬৩১
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিদ্যাসাগর—সন্তোষকুমার অধিকারী ... ৬৪২
সেদিনের বৈজুদা—শশাঙ্ক শেখর সান্যাল ... ৬৪৫
সংখ্যাগণনার এক নূতন পদ্ধতি ও তার আলোচনা—সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত ... ৬৪৭
পত্রধারা—পরিমল গোস্বামী ... ৬৫৪
আবোল তাবোল ও সুকুমার রায়—বিনায়ক সেনগুপ্ত ... ৬৬৩
ভগবানকে কি জানা যায়—ভোলানাথ সাহা ... ৬৬৯
রাধাকৃষ্ণলীলায় হোলীখেলা—স্নেহেন্দু মাইতি ... ৬৭৪
বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৬৭৬
রিক্‌শওয়ালা (কবিতা)—শ্রীমমতা ঘোষ ... ৬৮১
মাতৃ-স্নেহ (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ... ৬৮৩
পৃথিবীও কথা কয় (কবিতা)—ডাঃ নন্দলাল পাল ... ৬৮৩
মূলে ভুল—(উপন্যাস) পুষ্প দেবী ... ৬৮৪
তাম্রলিপ্ত—বিধুভূষণ জানা ... ৬৯৭
গান্ধীবাদ ও গান্ধীবাদী—জ্যোতির্ময়ী দেবী ... ৭০৫
পঞ্চশস্য— ... ৭১১
সাময়িকী ... ৭১৬

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড | কার্ত্তিক, ১৩৭৫ | ১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

হরতাল করিবার অধিকার

মজুরী বা বেতন বৃদ্ধির দাবী পেশ করিবার অধিকার বর্ত্তমান কালে সকল দেশেই গ্রাহ্য হইয়াছে। এইভাবে কার্য্যের মূল্য হিসাবে কর্ম্মীকে যে অর্থ দেওয়া হয় তাহার পরিমাণের ন্যায্যতা বিচার পৃথিবীতে বহু উপায়ে সিদ্ধ করা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দাবিদাওয়া ব্যক্তিগতভাবে করার নিয়মও আছে অথবা একজাতীয় কার্য্যে নিযুক্ত বহুব্যক্তির দাবী সমবেতভাবে কর্ম্মীসংঘ বা ট্রেডইউনিয়নের মারফতেও করা হইয়া থাকে। চাওয়া হইলেই তাহা দেওয়া হইবে এমন কথা কেহ বলিতে পারে না, সুতরাং মজুরী বা বেতনবৃদ্ধির কথা লইয়া নিয়োগকর্ত্তা ও নিযুক্তব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে বহু তর্ক, বিচার, দরাদরি প্রভৃতি হইয়া থাকে এবং বিশদ আলোচনা হইয়া যাইলে পরেই বর্দ্ধিত হারে অর্থ পাইবার কথা স্থির হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে বহু আইন কানুন দেশে দেশে প্রচলিত আছে যাহার নির্দ্দেশ অনুসারেই এই সকল ব্যাপারের আলোচনা ও নিষ্পত্তি করা হইয়া থাকে। আইন অনুসারে চলিলে কর্ম্মীদিগের পক্ষে প্রাপ্য টাকা না পাইয়া কাজ বন্ধ করিবার কথা উঠিতে পারে না; কারণ আইনে নির্দ্দেশ আছে যে সকল দাবির কথাই শেষ পর্য্যন্ত সরকারী ব্যবস্থায় আদালতে বিচার হইয়া কোথায় কি বাড়িবে, না বাড়িবে সেই সম্বন্ধে নির্দ্দেশ শ্রমিক আদালতের রায় হিসাবে প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কোন কোন সময় আইন অনুসারে সালিস মানাও হইয়া থাকে।

কার্য্য বন্ধ করা সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন রকম আদর্শ ও নিয়ম গঠিত হইতে পারে। বর্দ্ধিত হারে অর্থ পাওয়া বা না পাওয়ার গুরুত্ব বিচার করিয়া যদি দেখা যায় যে না পাইলে কর্ম্মীদিগের যতটা অসুবিধা বা ক্ষতি হইবে তাহার তুলনায় কাজ বন্ধ করিলে জনসাধারণের ক্ষতি বা অসুবিধা অনেক অধিক হইবে, এমন কি সমাজের বহু বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য অচল হইয়া যাইবে; তাহা হইলে দাবি না পাইয়া কাজ বন্ধ করার অধিকার কোন কোন জাতীয় কর্ম্মীদিগের জন্য আইনত গ্রাহ্য

করা হয় না। নিজের প্রয়োজন বা ইচ্ছা অনুসারে সকল দাবি যদি জোর করিয়া লওয়াটাই রীতি হয় এবং না পাইলে যদি কাজ বা মাল সরবরাহ বন্ধ করিয়া নিয়োগকর্ত্তা ও কার্য্যফল উপভোগী সাধারণের উপর চাপ দিবার প্রথা, সামাজিক লাভ লোকসান নির্ব্বিচারে কর্ম্মীর অধিকার বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কোন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের কর্ম্মীদিগের উপর সাধারণের জীবন মরণের ভার সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দিয়া অসহায়ভাবে, শুধু কর্ম্মীদিগের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ টাকা না পাইলে খাদ্যবস্তু সরবরাহ বন্ধ করা হইবে, ঔষধ দেওয়া হইবে না, চিকিৎসা করা হইবে না। যাতায়াত ও আলোকের ব্যবস্থা রদ করা হইবে, পুলিশ পাহারা আর থাকিবে না; অথবা দেশরক্ষার কার্য্যও আর কেহ করিবে না; এইরূপ হইলে বিষয়টা প্রায় ব্ল্যাক মার্কেটের শোষণ পদ্ধতিরই মত হয়। এবং কালোবাজারে অতিরিক্ত লাভ করিবার চেষ্টা যদি আইনসঙ্গত না হয় তাহা হইলে অতিরিক্ত হারে মজুরী বা বেতন পাইবার চেষ্টাও অন্যায় বলিয়া ধরাই সঙ্গত মনে হয়। সমবেতভাবে কিছু দাবী করিলেই তাহা ন্যায্য দাবি একথা কেহ মানিতে পারে না। অন্যায় বা ন্যায় দাবী করিলেই বা না করিলেই স্থির হইয়া যায় না। সমাজসংস্কারক্ষেত্রে বহু কার্য্যই করা হইয়াছে যেখানে সামাজিক উন্নতি অবনতির বিচার বিনা দাবিতেই আরম্ভ করা হইয়াছিল। জনহিতকর বহু ব্যবস্থাই বিনা দাবিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রুগীরা সমবেতভাবে দাবি করিয়া হাসপাতাল গঠন করায় নাই এবং ছোট ছেলেমেয়েরা বা তাহাদিগের পিতামাতারাও স্কুল পাঠশালা স্থাপনের কোন দাবী করিবার পূর্ব্বেই সমাজসংস্কারক বা শাসনকর্ত্তারা শিক্ষার ব্যবস্থা করা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বরং পিতামাতাকে জোর করিয়া ও আইনের ভয় দেখাইয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুলে বাধ্য করা হইয়াছে। অর্থাৎ সামাজিকভাবে যাহা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য তাহাও মানুষকে যেমন অনেক সময় জোর করিয়া করাইতে হয়, সেইরূপ যাহা করিলে সমাজের ক্ষতি হয় তাহা করা হইতে নিরস্ত করিবার জন্যও শক্তি ব্যবহার ন্যায়ত ধর্ম্মসঙ্গত ও বলিয়া ধরা যাইবে।

যাহাদিগের মজুরী বা বেতন মাসিক ১০০৲ টাকা তাহাদিগকে যদি আরও দশটাকা অধিক হারে মাসহারা না দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাদিগের যে অভাব সহ্য করিতে হয় তাহার তুলনায় যদি যাতায়াতের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া বহু গরীবের কার্য্যক্ষেত্রে যাওয়া অসম্ভব করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই সকল লোকের শতকরা একশত টাকাই লোকসান হইতে আরম্ভ করে। অপর বহু ব্যক্তি যদি বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ বন্ধ হইলে কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হয় অথবা অন্ধকারে থাকার ফলে রাত্রে কাজ করিতে না পারে; কিম্বা যদি হাসপাতালে অন্ধকারে অস্ত্রচিকিৎসা না হইতে পারে বা ঠাণ্ডায় ঔষধ বা অপর বস্তু সংরক্ষণ না করিতে পারায় ঐ সকল দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন যাহাদিগের কার্য্যের উপর নির্ভর করে তাহাদিগকে কার্য্য বন্ধ করিতে দিলে তুলনামূলক বিচারে সমাজের ক্ষতি অধিক হইতেছে দেখা যাইতে পারে। এই কারণে ঐ জাতীয় অতি আবশ্যক কার্য্য বন্ধ করা আইনত নিবারণ করা প্রয়োজন হইতে পারে।

মালিকদিগের লাভের অংশ অতিরিক্ত করিয়া বাড়াইয়া মজুরদিগের প্রাপ্য কমাইয়া দেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। এইজন্য লাভের ব্যবসায়ে মালিকের সহিত দাবিপেশ করিবার কথা সততই উপস্থিত হয় এবং ট্রেডইউনিয়নও ঐ জাতীয়ক্ষেত্রে গঠিত হয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে নিয়োগকর্ত্তার ব্যক্তিগত লাভের কথা নাই বা যে কার্য্য করা হয় তাহা সমাজের মঙ্গলের জন্যই করার ব্যবস্থা হয় কাহারও লাভের জন্য নহে; সে ক্ষেত্রে অন্য কারণে দাবি পেশ করিতে হইলেও নিয়োগকর্ত্তার অতিরিক্ত লাভের কথা উঠে না। সরকারী বহু কার্য্যেই ব্যক্তিগত লাভের কোন কথা

উঠে না। যদি কোন লাভ হয়ও সে লাভ রাজস্বের ভিতর ধরা হয় ও তাহা জনসাধারণের কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং সরকারী ব্যবসায়ে মজুরী বা বেতন বৃদ্ধির কথা বিচার করিতে হইলে শুধু দেখিতে হইবে তুলনীয় ব্যক্তিগত লাভের ব্যবসায়ে মজুরী বা বেতনবৃদ্ধির হার কি প্রকার প্রচলিত আছে এবং সেই তুলনায় সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিক বা কর্ম্মীগণ অল্প অর্থ পাইতেছেন কি না। আর দেখিতে হইতে পারে যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা দেওয়া হইতেছে তাহা যথেষ্ট কিনা। এই বিচার করা খুবই কঠিন; কারণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কোন সর্ব্বজন সমর্থিত মান বা মাপকাঠি নাই। একভাবে দেখিলে যাহা যথেষ্ট মনে হয় অন্যভাবে দেখিলে তাহাই আবার অল্প হইয়া দেখা দেয়। সরকারী-চাকুরেদের রোজগারও অনেক সময় "উপরি" পাওয়ার ফলে ঠিক কতটা তাহা জানা যায় না।

যাহাই হউক সরকারী কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ কর্ম্মী-দিগের কার্য্য বন্ধ করা অন্যায়, যেহেতু তাহাতে সামাজিক অকল্যাণ হয়; তেমনি কার্য্য বন্ধ করিবার জন্য সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বরখাস্ত করিলেও সমাজের মঙ্গল খর্ব্ব হয়। সুতরাং সামাজিকভাবে কোনটাই করিতে দেওয়া চলিতে পারে না। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে আইন করিয়া কোন কার্য্যের ন্যায্য ব্যবস্থা বা মতবিরোধ ও অপর সমস্যার সমাধান আর সম্ভব হইতেছে না। ইহার মূল কারণ ইহাই হইতে পারে যে হয় আইন প্রণয়ন ঠিক হয় নাই, নয়ত আদালত বা রাজকর্ম্মচারিগণ উপযুক্তভাবে নিজ কর্ত্তব্য করিতে সক্ষম নহেন। অর্থাৎ আইন এবং দফতর-আদালত প্রভৃতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। উপযুক্ত আইন, ব্যবস্থা ও কার্য্যভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থাকিলে এত গোলযোগ কখনও হইতে পারে না।

সংবাদপত্রে ক্রমাগতই দেখা যাইতেছে যে সামাজিক ভাবে অবশ্য প্রয়োজনীয় কার্য্য বন্ধ করা আইনবিরুদ্ধ ও দণ্ডনীয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কার্য্য বন্ধ করা হইতেছে। দাবি কি এবং তাহা কেন দেওয়া হইতেছে না। তাহা ন্যায়সঙ্গত কি না। এই সকল কথার কোন বিশদ আলোচনা হইলেও তাহার কোন বর্ণনা বড় অক্ষরে ছাপা হইতেছে না। সরকারী আইন করা হইল যে এই এই কার্য্যে হরতাল করিলে সাজা হইবে। কিন্তু হরতালের কারণ কি তাহার পূর্ণ আলোচনা কে কখন করিল, কেইবা স্থির করিল যে কর্ম্মীদিগের দাবী ন্যায্য নহে। হরতাল করিবার পরে জনসাধারণ বহু কষ্ট ও লোকসান সহ্য করিলেন এবং সাজা দিয়া ২০০০০ লোক কাজ হইতে বিতাড়িত হইল; অর্থাৎ সমাজের ক্ষতি ও অমঙ্গল বেশ পূরা মাত্রায় দুই দিক দিয়াই হইল। কিন্তু দাবির বিচার কি ভাবে কখন করা হইল? যে সকল আইন আছে সেগুলি কোথায় কোথায় কখন ব্যবহার করা হইল? অর্থাৎ দাবিগুলি যদি কিছু কিছু দূর অবধি ন্যায্য বিবেচিত হয় তাহা হইলে দাবির কিছুটা দেওয়া হইবে কি না এবং সেকথার বিচার করা হইয়াছে কিনা। শুধু আইন জারি করা ও সমাজের ক্ষতিকরভাবে সহস্র সহস্র লোকের সাজার ব্যবস্থা করিলেই বিষয়টার নিষ্পত্তি হইয়া যায় না। ন্যায্য দাবি মিটান, কাজ চালাইয়া রাখা ও যথাসম্ভব অল্প লোকের উপর জোর জুলুম করাই আদর্শপন্থা। ন্যায্য দাবি না মিটাইয়া শুধু আইন দেখাইয়া বহু লোককে কাজ হইতে বরখাস্ত করা সমাজ মঙ্গলকর পন্থা হইতে পারে না। সমাজের ক্ষতি করা কর্ম্মীর পক্ষে যেমন অন্যায়, কর্ম্মীর অভিযোগ না শুনিয়া তাহাদিগকে হরতাল করার অপরাধে কর্ম্মচ্যুত করিয়া কার্য্য সমাধান করাও ততটাই অন্যায়। ন্যায় ও সুবিচার হইল আসল কথা। তাহা করা হইতেছে কি?

চেকোস্লোভাকিয়াতে রুশের দমননীতি

স্বাধীন মানুষ যেমন ধনবাদ ও ব্যক্তিগত অধিকার-বাদ ত্যাগ করিয়া সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তির দ্বারা ব্যক্তির শোষণ নিবারণনীতি অবলম্বন করিতে পারে; তেমনি আবার সমষ্টিবাদ মানুষের মানবতাকে খর্ব্ব করিতেছে দেখিলে সাধারণ মানুষ সমষ্টিবাদকে পরিবর্ত্তিত রূপ

দিতেও ইচ্ছুক হইতে পারে। এবং সেইরূপ ইচ্ছা হইলে যদি কোন জাতির অধিকাংশ লোক সেই সকল পরিবর্তন করিতে মনস্থ করে তাহা হইলে অপর দেশের লোক আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের সংস্কার চেষ্টা বন্ধ করিতে পারে না—অন্তত স্বাধীনতার আদর্শ রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে। চেকোস্লোভাকিয়ার নেতাগণ নিজ দেশবাসীর মত অনুসারে যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার চেষ্টা করিতে চাহিয়াছিলেন, রুশিয়া ও তাহার প্রধান প্রধান অনুবর্ত্তী জাতিগুলি; যাহাদের মিলিত নাম ওয়ারশ প্যাক্ট জাতি সংঘ; সেই সকল সংস্কার সাধিত হইলে নিজেদের দেশের লোকেরাও ব্যক্তি-স্বাধীনতাবৃদ্ধি চেষ্টা করিবে এই ভয় পাইয়া সমবেতভাবে চেকোস্লোভাকিয়াতে সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়া সেই দেশ দখল করিয়া বসিয়াছে। উদ্দেশ্য বলপ্রয়োগ করিয়া ঐ দেশের নেতাদিগকে সংস্কার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করা। মুখে বলা হইয়াছে যে চেকোস্লোভাকিয়ার জনমত অনুসারেই সবকিছু ঠিক করা হইবে। কিন্তু জনমত রুশিয়ার ইচ্ছামত গড়িয়া উঠিতেছে না। ঐ দেশের কোন নেতারাই রুশিয়ার কথামত ওঠা বসা করিতে অগ্রসর হয় নাই। বলপ্রয়োগের ওজুহাত সৃষ্টি করার জন্য কোন চেকোস্লোভাকের সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং রুশিয়ার মতলব হাসিল হইতেছে না।

চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি স্ববোদা ও প্রধান মন্ত্রী দুবচেক কয়েকবার মস্কো যাইয়া রুশিয়ার শাসকদিগের সহিত কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। শুনা যায় তাঁহাদিগের উপর কিছু কিছু জোর জুলুমও করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া রুশিয়ার ভয়ে মত বদলাইয়া রুশিয়ার কথায় চলিতে রাজী হয়েন নাই। রুশিয়া চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণের মধ্যে স্ববোদা ও দুবচেকের বিরুদ্ধদল সৃষ্টি করিতেও সক্ষম হয় নাই। ইহার কারণ চেকোস্লোভাকিয়া কম্যুনিজমের কঠোরনীতি পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করিলেও মূলনীতিতে হস্তক্ষেপ করে নাই। ব্যক্তি-গত মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের খবরাখবর রাষ্ট্রীয় মুরুব্বিদিগের অনুমতি লইয়া তৎপরে ছাপিবার ব্যবস্থা, নির্ব্বাচনের সময় ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিতে না দেওয়া প্রভৃতি যে সকল সমাজ স্বাধীনতা দমনকারক নিয়ম কম্যুনিজমের নামে চালান হইয়া থাকে ও যে সকল নিয়মের প্রকৃত উদ্দেশ্য অল্পসংখ্যক সভ্য দিয়া গঠিত গণ্ডির দলপতিদিগের শাসনে দেশের কোটি কোটি ব্যক্তিকে অসহায়ভাবে সেই স্বৈরাচার মানিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য করা; সেই সকল মানবাত্মার পূর্ণবিকাশবিরুদ্ধ নিয়মাদির পরিবর্তন চেষ্টাকে কম্যুনিজম বিরুদ্ধতা বলা যায় না। কিন্তু কঠোরনীতির পূজারীদিগের ভয় ছিল যে মুক্তির হাওয়া বহিতে দিলে তাহাদের একচ্ছত্ররাজত্বের অবসান ঘটিবে এবং সেই কারণেই তাহারা স্ববোদা ও দুবচেকের কার্য্যকলাপ পছন্দ করে নাই। ওয়ারশ প্যাক্টের জাতিগুলি অর্থাৎ রুশিয়া, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, পূর্ব্ব জার্ম্মানী, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশের নেতাগণ চেকোস্লোভাকিয়াতে দমননীতি প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়া সেই দেশ দখল করিয়াছে। তাহাদের আশা ছিল যে সৈন্য পাঠাইলেই স্ববোদা ও দুবচেকের বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তিরা সামনে আসিয়া কঠোরনীতিবাদ আশ্রয়ে নূতন দল গঠন করিতে সাহায্য করিবে, কিন্তু অদ্যাবধি কোন লোকই রুশিয়দলের সাহায্যার্থে সামনে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। সুতরাং সৈন্যদল চেকোস্লোভাকিয়া দখল করিয়া বসিয়া আছে এবং স্ববোদা-দুবচেক রাজত্বের পূর্ব্বরূপ কোনভাবে পরিবর্ত্তিত করা যায় নাই। রাজশক্তি অচল ও সামরিক শক্তি আইনত প্রতিষ্ঠিত নহে। চেকোস্লোভাকিয়ার রাষ্ট্র ঠিক কি ভাবে চলিতেছে বা চলিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। শুনা যায় যে রুশিয় জবরদস্তি ক্রমশঃ ঢিলা হইয়া আসিতেছে।

রুশিয়া মোটামুটি মানিয়া লইয়াছে যে সৈন্য বসাইয়া জনস্বাধীনতা নষ্ট করিবার কোন অধিকার বা কারণ দেখাইতে তাহারা অক্ষম। কম্যুনিজমের মূল রীতিনীতি যেখানে কেহ ভাঙিয়া দিতেছে না; এবং শুধু সাধারণের

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি ব্যতীত অপর কোন সংস্কারও করা হইতেছে না; সেক্ষেত্রে শত শত ট্যাঙ্ক পাঠাইয়া জনসাধারণের উপর জুলুম করিলে বিশ্বের দরবারে কম্যুনিষ্ট জাতিগুলির আর কোথাও মুখ দেখান চলিবেনা। যাহা করা হইয়াছে তাহাতেই অপরাপর দেশের কম্যুনিষ্ট দলগুলির ইজ্জত বহু অংশে খর্ব্ব হইয়াছে এবং বিশ্ব-কম্যুনিজমের প্রসার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। এই সকল কারণে এবং পশ্চিম ইয়োরোপীয় জাতিগুলির সমর-আয়োজন বৃদ্ধি দেখিয়া রুশিয়ার চেকোস্লো-ভাকিয়ায় কঠিন ও কঠোর নীতি চালাইবার আগ্রহ ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। সৈন্য ও ট্যাঙ্ক পাঠান যে একটা মহা ভুল হইয়াছে তাহা মস্কোতে সকলে এখন বুঝিতে পারিতেছে। চেকোস্লোভাকিয়ায় গায়ের জোরে কোন কিছু করাও অসম্ভব তাহা স্বীকৃত হইতেছে। কম্যুনিজমের যে অল্পলোকের কথায় সকল দেশবাসীর ওঠাবসার ব্যবস্থা, তাহা আর চলিবেনা বলিয়া মনে হয়। নীতিগতভাবে কম্যুনিজম সাধারণতন্ত্র; অর্থাৎ সকল লোকেরই শাসন ক্ষমতায় অংশ গ্রহণের অধিকার আছে ইহা কম্যুনিজমে স্বীকৃত। কিন্তু কার্য্যত রুশিয়া প্রভৃতি দেশে সাধারণ লোকের প্রায় কোনই রাষ্ট্রীয় অধিকার নাই। তাহারা শাসকগণ্ডির মতলবের দাস। ইহার পরিবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু করিবার সাহস কাহারও নাই। চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপার ঐ চেষ্টারই অভিব্যক্তি। এবং তাহাতে বাধা দিবার আয়োজন কম্যুনিজমের সত্যরূপ জগতের নিকট পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দেয়। যাহারা কম্যুনিজমে বিশ্বাসী তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই নেতাদিগের স্বৈরাচার অধিকারে বিশ্বাসী নহেন। এখন সেই সকল ব্যক্তি হয় কম্যুনিজম ত্যাগ করিবেন নয়ত তাঁহারা কম্যুনিষ্ট নেতাদিগকে অন্যায় অধিকার ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন। অবস্থা ঠিক কি হইবে তাহা এখনও পূর্ণ প্রকাশিত নহে।

স্রাব, অভাব ও স্বভাব

সকল শিল্পকলা, অর্থাৎ সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি মানবসভ্যতা ও কৃষ্টির নিদর্শন জ্ঞাপক যাহা কিছু, তাহার মূলে রহিয়াছে মানুষের মনের ভাব ও রস অনুভূতি। মানুষের মনের ভিতর তাহার চিন্তা, কল্পনা ও ভাবাবেশকে অবলম্বন করিয়া যে সকল রূপ শব্দে সুরে রেখায়, আকারে বর্ণে, তালে, ভাষায়, ছন্দে গন্ধে বা স্পর্শ অনুভূতির অবাস্তব রচনায় মূর্ত্ত হইয়া উঠে সেই সকল মানসিক সৃষ্টির বাহ্যিক ও বাস্তব অভিব্যক্তি ও প্রকাশেই মনুষ্য সমাজে রূপরস অনুভূতিজাত উদ্ভাবনার আরম্ভ হইয়াছে। মানুষ যাহা রচনা বা নির্ম্মাণ করে তাহার জন্ম প্রথমে মানুষের অন্তরে। বাহিরে তাহাকে গড়িয়া তুলিয়া অপর লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে হইলে তাহার প্রকাশিত রূপ ভাষায়, শব্দে, সুরে, তালে, ছন্দে, বর্ণে, রেখায়—কোন একটা বাস্তব কিছুর মাধ্যমে ব্যক্ত করিতে হয়। মনের ভাবে যাহা জন্মায় তাহার প্রাণ আসে মানুষের অনুভূতি ও রসবোধের পথ বাহিয়া। সেই জন্য যেখানে সত্য অনুভূতি বা অন্তরের রসবোধ নাই সেখানে সৃষ্টিও নাই। বাস্তবে কিছু রচনা বা গঠিত হইলেই তাহাতে সৃজন উদ্ভাবনা হইয়াছে বলা যায় না। কারণ ভাব বা অনুভূতি বর্জ্জিতভাবেও রচনা বা নির্ম্মাণ কার্য্য করা অসম্ভব নহে। ফ্রান্সে কোন একটা যন্ত্রের ছাঁচে চাপ দিয়া প্রস্তুত এক হাজার টুকরা "নরমুণ্ডের" সহিত ইতালিতে তৈয়ারী দুই হাজার হস্ত ও বৃটেনে ঢালাই করা দুই হাজার পা ও এক হাজার দেহ আমেরিকায় লইয়া গিয়া এক হাজার মূর্ত্তি জোড়া তাড়া দিয়া গঠিত হইলে তাহার মধ্যে কোন রস অনুভূতি বা ভাবের অভিব্যক্তি না থাকাই সম্ভব। গভীর রাত্রে যখন কোন সংবাদপত্র দফতরে কোন খবর লেখক তারে বা বেতারে প্রাপ্ত সংবাদকে সাজাইয়া লিখিয়া দেন তখন তিনি একটা সংবাদ লেখকের লেখন-পদ্ধতির নিয়ম অনুসারেই লেখার কার্য্য শেষ করেন। রস অনুভূতির কোন উদ্ভব সেখানে দেখা যায় না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আজকাল সাহিত্যে, শিল্পে, স্থাপত্যে ও অপরাপর কলায় মানুষের প্রাণের কোন সাড়া প্রায় পাওয়া যায় না। প্রেরণা নাই, রস অনুভূতি নাই, গঠন আছে কিন্তু সৃজন নাই। দফতরের কার্য্য যেরূপ

আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে বহুক্ষেত্রে করা হইয়া থাকে, শিল্পকলা, সাহিত্য, সঙ্গীত বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি কম্পিউটার যন্ত্রে কাজ সারিবার ব্যবস্থা করা অদূর ভবিষ্যতে আর অসম্ভব না হইতে পারে। এই উপায়ে শেক্‌সপিয়ার, ভিক্টর হিউগো, বেতোফন, প্র্যাকসিটেলিস, মিকাল আঞ্জেলো প্রভৃতির আবির্ভাব যদিও সম্ভব হইবে না, কিন্তু বাজারের অবিবেচক ও রুচিবর্জ্জিত ক্রেতাদিগের জন্য সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার মাল সরবরাহ চলিতে থাকিবে। যদি দেখা যায় যে বাজারের ক্রেতা চিন্তাশক্তি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা হইলে ব্যবসাদারদিগের প্রচারযন্ত্র পূর্ণ বেগে চালাইয়া শীঘ্রই অধিকাংশ লোকের কাছে প্রমাণ হইয়া যাইবে যে মানবসভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে যে সকল মহামানব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগের সহিত তুলনায় আধুনিক যান্ত্রিকভাবে চালিত লেখক, রূপকার, সঙ্গীতস্রষ্টাগণ কোন অংশে কমে যান না। ইহাতে বাজারে ছাপা বই বিক্রয় চলিতে থাকিবে, রং বেরং-এর চিত্র ও ক্যালেণ্ডার ফ্রেমে আঁটা হইয়া ও বিনা ফ্রেমে দেয়ালে উঠিবে এবং গ্রামোফোন ও রেডিওতে সুর তানলয়ের হত্যাকাণ্ড লাভের সহিত অনুষ্ঠিত হইতে থাকিবে। মানবসভ্যতা ও কৃষ্টি গড়াইয়া বহু নিম্নে যাইবে কিন্তু একটা লাভের কারবার গড়িয়া উঠিয়া বহু নির্গুণ ব্যক্তির দিন গুজরান সুবিধার হইবে।

ভাবের অভিব্যক্তি না হইয়া যদি ভাবের অভাবই উচ্চ মূল্যে প্রকাশিত হইতে পারে ও এই ডিমক্রাসি ও কম্যুনিজমের যুগে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রের আভিজাত্য যদি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া পণ্ডিত-মূর্খ, সুর-বেসুর, পাঠ্য-অপাঠ্য সুন্দর-কুৎসিত, আদরণীয়-ঘৃণ্য প্রভৃতি পূর্ব্বকালের ভেদাভেদ যদি আর না থাকে তাহাতে মানবসভ্যতা এক নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিবে। ক্রমে ক্রমে এই সকল ক্ষেত্রে প্রতিভাবান মানুষের পরিবর্ত্তে যে কোন নির্ব্বোধকে দিয়াই কাজ করান চলিবে এবং পরে আর মানুষ প্রয়োজনই হইবে না। কম্পিউটার লিখিত ও রচিত গল্প বা সঙ্গীত অনায়াসে বাজারে বিক্রয় হইবে। অর্থ ও অর্থহীনতা, রসমাধুর্য্য ও নীরস কাঠিন্য ইত্যাদির ক্রমশঃ আর কোন পার্থক্য থাকিবে না। যশ বা কর্ম গৌরব বলিয়া কোন আকাঙ্ক্ষার কিছু আর থাকিবে না। মানবসভ্যতা এমন একটা অপরূপ স্তরে গিয়া পৌছাইবে যেখানে আলোক ও অন্ধকার, সত্য ও মিথ্যা, মৃত্যু ও অমরত্বের পার্থক্যও কেহ আর বুঝিবে না বুঝিলেও স্বীকার করিতে সাহস পাইবে না।

মানুষের স্বভাব হইতেই তাহার প্রাণে ভাবের উদয় হয় অথবা হয় না। অর্থাৎ মানুষের স্বভাব যদি বিকৃত হইয়া এমন একটা চরম অবস্থায় পৌছায় যেখানে সে সকল অভাবকেই কূট তর্কের দ্বারা পূর্ণতায় সুসজ্জিত করিয়া দেখাইতে পারে তাহা হইলে সেই অবস্থায় মানুষের আর অবনতির কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই অবস্থা ঠিক জাতির মানসিক প্রলয়ের আগমনের পূর্ব্বাবস্থা। মানসিক প্রলয়ের পরে আবার নূতন করিয়া মানুষের বুদ্ধি ও বোধশক্তি জন্মলাভ করে কি না আমরা তাহা নিশ্চয় জানি না। তবে সকল অবস্থারই একটা শেষ সীমা থাকে ও সেই সীমা অতিক্রম করিলে একটা বৈপরীত্যের আবির্ভাব হওয়াই স্বাভাবিক। আশার কথা ঐটুকুই। কারণ আমরা জাতীয় প্রতিভার ও সত্য ভাব ও রসবোধের অভিব্যক্তি শেষ করিয়া বর্ত্তমানে ভাবের অভাব মাত্র ব্যক্ত করিয়া কৃষ্টির কর্ত্তব্য শেষ করিতেছি। অতঃপর যে নূতন স্বভাব আমাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া আলোকের পরপারের সূর্য্যহীন লোকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহা শীঘ্রই একটা চরম অবস্থায় আসিয়া পড়িবে। তখন যে নূতন জন্ম বা জাগরণ আসিবে তাহাতে কোন পথে বা কোন আদর্শ অনুসারে এই জাতি চলিবে তাহা কে বলিতে পারে? আমাদের শুধু আশা যে নূতন পথ খুঁজিয়া বেড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির মূল সূত্রগুলি ধরিয়া লইবার আগ্রহই যেন আমরা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে দেখিতে পাই। তাহা হইলেই জাতির জীবন জাতির মানুষ ফিরিয়া পাইতে সক্ষম হইবে।

সেকাল ও একাল

সেকাল বলিতেই একটা উপকথা বা কল্পিত পরিবেশের কথা মনে জাগিয়া উঠে। আর একাল বা আধুনিক সময় বলিলেই একটা প্রকট অতিবাস্তবতা এবং বিজ্ঞান ও যন্ত্রবহুল অবস্থা সবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু মানুষের উন্নতি ও তাহার সভ্যতার বিস্তার যদি এই দুই কালের পার্থক্যের মাপকাটি হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে বর্তমানের দাবি সত্যের উপর স্থাপিত নহে। অর্থাৎ বর্তমানকালে যে আনবিক আবহাওয়া বহিতেছে তাহা বস্তুত মানুষকে কোন নবকলেবর বা নূতন প্রাণমন দান করে নাই। চক্র আবিষ্কার অথবা অগ্নি জ্বালাইবার নিভাইবার পদ্ধতি গঠন মানব সভ্যতার বিস্তারে নিশ্চয়ই আনবিক বিজ্ঞান অপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগে সক্ষম হইয়াছিল। রুশ বা আমেরিকান দূরাকাশবিহারী বৈমানিকদিগের চন্দ্রপথে ভ্রমণ অপেক্ষা হয়ত কলম্বাসের আমেরিকা গমন অথবা তৎপূর্ব্বের আর্য্যজাতির দেশ-দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন কিম্বা জলের নীচে বিচরণক্ষম সাবমেরিন ও আকাশপথে দ্রুত গমন উপযোগী বিমান আবিষ্কার মানবইতিহাসকে অধিক প্রবল ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। সামাজিক রীতিনীতি সংস্কারে মানুষের সহিত মানুষের অথবা আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে সততা ও পবিত্রতা আনয়ন করিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের চেষ্টা সবিশেষভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল; কিন্তু বর্তমান কালের উচ্চস্তরের মতবাদ হইতে ব্যক্তি বা সমাজের মঙ্গল হইতে বড় একটা দেখা যায় না। পূর্ব্বকালের মানুষ কষ্ট করিয়া মানবপ্রগতির সহিত যোগ রক্ষা করিতে সক্ষম হইত; কিন্তু যোগ একবার সৃষ্টি হইলে তজ্জাত শ্রদ্ধা, ভক্তি, রসঅনুভূতি ও আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়া মানুষের প্রাণ সতেজ করিয়া রাখিত। একালের প্রতিভা বিজ্ঞাপনের চটকে ক্ষণিকের জন্য মানুষকে চমৎকৃত করিয়া পরমুহূর্ত্তে বিস্মৃতির অতলে মিলাইয়া যায়। আজ যাহা কৃত্রিম উপায়ে মানুষের মনে উত্তেজনা জাগ্রত করে কাল তাহার কোন মূল্য বা আদর থাকে না। দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য, নাটক, সঙ্গীত, নৃত্য ও অপরাপর সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্ভূত ধনসম্ভার, কৃত্রিম উপায়ে জাগ্রত চাহিদার তাড়নায় মহামূল্যবান বিবেচিত হইয়া অতি শীঘ্রই আবার ক্রেতার অভাবে পরিত্যক্তের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। ভারতের ঋষিগণ অথবা প্রাচীন গ্রীসের পণ্ডিতগণ একটা কথা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বে বহুবর্ষের চিন্তা ও সাধনার পরীক্ষায় সে কথার সত্যতা বিচার করিয়া লইতেন। তাঁহাদিগের উচ্চারিত বাণী সেই কারণে সময়ের বক্ষে ক্ষোদিত হইয়া রহিয়াছে। আজ যেসকল কথা সহজ আবেগে বলা হয় সেই সকল কথা শীঘ্রই লোকে ভুলিয়া যায়। ইহার কারণ কথাগুলি কেতাদুরস্তভাবে সময়োপযোগী করিয়া বলা হয় এবং কেতা ও সময় বদলাইলেই কথাগুলিরও পরমায়ু শেষ হইয়া যায়। সাহিত্য, কাব্য ও অপরাপর কলায় ঐ একই কেতা ও সময়ের প্রভাব। আজকার কেতা বা ফ্যাশন কাল অন্যরূপ ধারণ করে। সময়ের গতি নূতন নূতন তন্ত্রকে জন্মদান করে। যেখানে কিছু ছিলনা, নয়ত পুরাতন কোন ভাব বা আদর্শ কষ্টে স্থানচ্যুত না হইয়া মাটি কামড়াইয়া পড়িয়াছিল সেখানে হঠাৎ জীবনের দ্রুত পরিবর্তনশীল গতির তোড়ে, "বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাতে" ফেনায়মান অবাস্তবের বস্তুরূপ প্রাপ্তির মতই তন্ত্রহীনতা বায়ুপূর্ণ বুদ্বুদের মতই বিরাট তন্ত্রাকাররূপ ধারণ করিয়া দেখা দেয়। সে তন্ত্র যেমন অকারণ বিশ্বাসের আধার তেমনি তাহা অকারণ অবিশ্বাসের ফুৎকারে উড়িয়া যায়। কালিদাস, চণ্ডীদাস, রবীন্দ্রনাথের কাব্য হঠাৎ আর কোন কোন হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারে না। সেই সকল হৃদয় নূতন আদর্শে "একঘটি জলের" পরিবর্ত্তে "আধখানা বেল" পাইয়াই তৃষ্ণা ভুলিয়া নূতন কায়দায় নৃত্যরত হইয়া ডন বৈঠক দিতে আরম্ভ করে। রাজমিস্ত্রী ভাবে পোঁচড়া লাগাইতে আমি কাহা অপেক্ষা কমে যাই সুতরাং চিত্রঅঙ্কনে আমিই কেন না শীর্ষস্থান অধিকার করিব।

তাহার তুলির আকার অনুপাতে তাহার চিত্রের মর্য্যাদার পরিমাণ স্থির করিয়া শ্রেণীহীন সমাজের উচ্চ আদর্শ রক্ষার্থে তাহাকে চিত্রকর শ্রেষ্ঠ বিচার করিলে, পরের দিন প্রে-পেণ্টার হয়ত বা বিরাট পিচকারি হস্তে বিক্ষোভ জানাইতে আসিবে। অর্থাৎ কাহারও গুণ দীর্ঘকাল গ্রাহ্য থাকিবে না। এবং সকলকেই খুসী করিতে হইবে। খুসী রাখা একালে ততটা কঠিনও হইতেছে না। কারণ যেখানে বহুমানব একই সম্মান আকাঙ্খা করে এবং কেহই সম্মানার্হ নহে, সেখানে সকলকেই একদিনের মত রাজা করিলে কেহই রাজা হয় না এবং সকলেই হয়। সকল ধনের অধিকারী যেমন সকলেই হইলে কোন ধন কাহারও হয় না, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও ধনের অধিকার লইয়া ঝগড়ার সৃষ্টিও হয় না; মান যশের বিচারসভাতেও তেমনি যদি সকলকেই অল্পক্ষণের জন্য প্রথমস্থানে বসান হয় এবং সকলেই যদি সমান অর্থহীন কবিতা লিখিয়া একই প্রকার রেখা ও বর্ণের কলহসংকুল চিত্র আঁকিয়া, একাধারে বিকট সুরতানলয়হীনতার চূড়ান্ত করিয়া মহাকবি শিল্পী বা সঙ্গীতকারের নাম ধারণ করিয়া ফেলেন ও তৎপরে অতিশীঘ্র সে আসন ত্যাগ করিয়া অপরকে উচ্চাসনে বসাইয়া নিজ নিজ গুণহীনতার অভিব্যক্তির সুযোগ দিতে থাকেন তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্থ ও আঘাতপ্রাপ্ত হয় শুধু কৃষ্টির আদর্শ ও মানব মনের সরসতার পরিণতরূপ এবং অক্ষত ও অপ্রকাশিত থাকিয়া যায় মানুষের অহমিকা, অজ্ঞানতা ও প্রতিভার ক্রমবিলোপন।

যে সময়ে দেখা যায় যে রূপরসের সকল প্রকাশই হৃত গৌরব একটা উপহাসের মতই হইয়া দাঁড়াইয়াছে কোন আদর্শই সুরক্ষিত নাই এবং মানুষ দল বাঁধিয়া নিজ কৃষ্টির ঐতিহ্যকে অশ্রদ্ধার পঙ্কে ডুবাইয়া কলুষিত প্রবৃত্তির প্রভাবে যত্রতত্র অধঃপতনকে বলপূর্ব্বক প্রগতি বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছে; সে সময়ে জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকল ব্যক্তির কর্ত্তব্য হইবে ঐ বিমূঢ় সত্যপথভ্রষ্ট কৃষ্টি বিরুদ্ধতার দমনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা। যে সকল আদর্শ চিরপ্রতিষ্ঠিত ও যাহার বিরুদ্ধবাদ নীতি ও রস অনুভূতি সংরক্ষিত রাখিয়া সম্ভব হইতে পারেনা, সেই আদর্শগুলির প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তখন অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। ঘৃণ্য, কুৎসিত, পাপপঙ্কিল যাহা কিছু মতবাদের মুখোশ পরাইয়া নূতন ধরণের মানসিক অগ্রগমনের খোরাক বলিয়া সভ্যতার বাজারে উপস্থিত করা হয় সেই সকল আবর্জ্জনা যথাস্থানে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা জাতীয় শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য করা আবশ্যক। জনগণের রুচি বিকারের জন্য যাহারা দায়ী তাহারা সর্ব্বদাই নিকৃষ্ট পণ্য সরেস বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত। এই কার্য্যে তাহাদিগের প্রধান অস্ত্র মানুষের নীচপ্রবৃত্তির খোরাক জোগান। এবং সেই কার্য্যকে উচ্চ আখ্যায় ভূষিত করিয়া সভ্যসমাজে চালান। অশ্লীলতা ও শ্লীলতার প্রভেদ লইয়া কুতর্কের সৃষ্টি; পাপ পুণ্যের পার্থক্য অস্বীকার করা; সুনীতিকে প্রাচীনতার নিদর্শন ও সেই কারণে বর্জ্জনীয় বলিয়া দেখান। দোষ, গুণ; উত্তম, অধম; ন্যায়, অন্যায়, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম; ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিচারেই সংশয় বিভ্রমের উদ্ভব চেষ্টা এই সকল কৃষ্টির বাজারের নিকৃষ্ট পণ্য বিক্রেতাদিগের চির অভ্যস্ত বিক্রয় পন্থার রীতি।

কৃষ্টি মনের আশ্রয় ও অবলম্বন। কৃষ্টিবর্জ্জিত জীবন জান্তবভাবে বাঁচিয়া থাকা মাত্র। সেই জন্য শিল্পকলা, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি লইয়া মানুষ সূক্ষ্ম অনুভূতি ও জ্ঞানের পথে চলিতে চাহে। স্থূলবুদ্ধি স্থূল অনুভূতি ও বিকৃত রুচি স্বভাবতই কোন কোন মানুষের মধ্যে লক্ষিত হয়; কিন্তু সেই স্থূলতা ও বিকারকে ভাব ও চিন্তার অন্নজল বলিয়া প্রচার করিতে দেওয়া চলে না। কারণ মানুষ তাহাতে উচ্চাকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া নীচ প্রবৃত্তির দাস হইয়া দাঁড়ায় ও তাহার মনুষ্যত্ব ক্রমশঃ অধোগতির সহজ গমনের আকর্ষণে খর্ব্ব হইতে হইতে পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। সমাজের প্রত্যেক মানুষ যদি নিজ নিজ প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খাকে

(শেষাংশ ১১৭ পৃষ্ঠা)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্ত্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ (১৯৬৮)

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

যিনি সুদীর্ঘ ষাট বৎসরেরও অধিক, প্রথমতঃ ছাত্র পরে শিক্ষক এবং অবশেষে এমারিটাস্ অধ্যাপকরূপে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যুক্ত, তাঁহার পক্ষে আপন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্ত্তনে ভাষণদানে আহূত হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়রূপিণী জননীর নিকট হইতে তাঁহার স্নেহধন্য কোন ছাত্রের প্রতি প্রকৃতই শ্রেষ্ঠতম সম্মান। এই সম্মান আমি লাভ করিলাম, আমার কর্ম্মজীবনের শেষ প্রান্তে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়রূপিণী জননীর নিকট হইতে, যে বিশ্ববিদ্যালয়-মাতার নিকট আমি আমার জীবনে, আমার নৈতিক, মানসিক, সংস্কৃতিগত ও আত্মিক সত্তায় কত না ঋণী। ইহার জন্য আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য এবং কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

* * * *

বস্তুজগতের সীমানা ছাড়াইয়া যে জগৎ, সেই জগৎ সম্পর্কে আমি মননশীলতার দিক হইতে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) কিন্তু ভাবাবেগে মরমী (mystic)। কোন দৃঢ় অথবা সুনিশ্চিত ধর্ম্মবিশ্বাস বা উপলব্ধিতে আমি এখনও উপনীত হইতে পারি নাই, এ কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। তথাপি যাহাকে বলা হয় একম্ সৎ, এক অখণ্ড সত্তা অথবা পূর্ণতা এবং যাহা সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই রহিয়াছে অথচ সব কিছুর মধ্যে হইতে উপ-চীয়মান, সেইরূপ কোন পরম বাস্তবতা বা অ-দৃষ্ট সত্য / সম্পর্কে আমার ভিতরে রহিয়াছে এক গভীর আকুলতা। এই এক এবং অখণ্ড সত্তার প্রতি অস্পষ্ট অথবা অবিরাম আকর্ষণ (yearning) আমাদের সকলের অন্তরেই আছে। কোটি কোটি আলোক-বর্ষ ছাড়াইয়া যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং উহারই প্রতিচ্ছবি মনুষ্য-জীবনের শারীরিক ও আধি-শারীরিক যে ক্ষুদ্র অণু, সে সম্পর্কে গম্ভীরভাবে ও গুরুত্বের সহিত চিন্তা করিলে আমরা এক বিস্ময়কর ও হতবুদ্ধিজনক পরিস্থিতির গোলকধাঁধায় হারাইয়া যাই, যাহা ব্যাখ্যার অতীত এক আকুল আকাঙ্খার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। ইহার বুদ্ধিসত্তা ও সামঞ্জস্যের প্রকাশে আমরা এমন একপ্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করি বলিয়া মনে হয়, এ্যালবার্ট আইন্‌ষ্টাইন যাহাকে বলিয়াছেন "বিশ্বজাগতিক (cosmic) ধর্ম্মীয় অনুভূতি" বা "আনন্দঘন বিস্ময়"। আমাদের সসীম এবং ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়ানুভূতিতেও এই বুদ্ধিসত্তা এবং সামঞ্জস্য যথেষ্টরূপে প্রকাশিত।

এই এক অখণ্ড সত্তা যাহাকে বলা হয় সৎ, যাহা সমস্ত অস্তিত্ব জুড়িয়া রহিয়াছে, তাহাকে ভারতীয় চিন্তা-বিদেরা চিৎ অথবা প্রজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দ ও রস অর্থাৎ পরম সুখ (Supreme Bliss) এবং পরম আকর্ষণ এবং মহান আনন্দ (Supreme charm and Rapture বলিয়াও অভিহিত করিয়াছেন। 'জ্ঞান' বা বুদ্ধিবৃত্তির চর্য্যার মাধ্যমে আমরা ইহার সান্নিধ্যে উপনীত হইবার প্রয়াস পাই। 'ভক্তি' বা পরম প্রত্যয়ের (Absolute faith) সাহচর্য্যে আমরা চাহি ইহাতে আমাদের সত্তাকে সমর্পণ (abandon) করিতে। আর, 'কর্ম্ম' বা নিরন্তর কর্ম্মপ্রবাহের মধ্য দিয়া এই আকাঙ্খা-পূরণে আমরা আমাদের প্রস্তুতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। চেতনা বা জড়, যাহাই হই না কেন, আমরা একমএর সহিত একাত্ম, যদিও শারীরিক অভিব্যক্ত

দিক দিয়া আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তিসত্তা আমাদের সীমিত।

গাম্ভীর্য্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত উপলক্ষ্যে যে স্বর্গীয়তা (Divinity) আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করে সেই চূড়ান্ত বাস্তব সত্য বা এই একাত্মতার কথা প্রথমেই স্মরণ করা নিশ্চয়ই যথার্থ। কারণ ইহাতে আমাদের চিন্তা সঠিকপথে চালিত হইবে, সকলের মঙ্গল-কামনায় আমাদের সংকল্প গঠিত হইবে।

তৎ সবিতুর বরেনইয়ম ভার্গো দেবস্ত ধীমহি:
ধিও ইয়ো না প্রচোদয়াৎ

"আমরা সুদীপ্ত স্রষ্টার পরম শ্রদ্ধার্হমহা গৌরবের
পূজারী:
তিনি যেন আমাদের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করেন"

এবং

তন্ মে মনস শিব-সংকল্পম্ অস্তু
"আমার মন যেন সাধু সংকল্পে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে"।

* * * *

আধুনিককালের পৃথিবীতে, অন্যান্য সভ্যদেশগুলির মতো ভারতবর্ষেও, স্কুল-কলেজের শাখাপ্রশাখার মাধ্যমে এবং সর্ব্বোচ্চ শিক্ষার কেন্দ্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ই হইল আমাদের চিন্তা ও সংকল্প, কর্ম এবং উদ্যোগ যথাযথরূপে পরিচালনার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ই ইয়োরোপের কলা এবং বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি আমাদের নিকট বহন করিয়া আনিয়াছিল এবং এই সূত্রে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পদে ভারত এক, দুই কিংবা তিন হাজার বৎসর পূর্বে মহান্ ছিল—যখন সে সেকালের সমস্ত সুসভ্য জাতির সহিত সমান তালে চলিত। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীতে ভারতের মননশীলতায় দেখা দিল এক স্থিতাবস্থা, যাহার ফলে ভারত পশ্চাতে পড়িয়া গেল এবং অন্যত্র, বিশেষ করিয়া ইয়োরোপে যে উন্নতি প্রকাশমান হইতেছিল উহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। আরব, পারসীক এবং অন্যান্য জাতিসহ পর্তুগীজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী প্রভৃতির ন্যায় অন্যান্য ইউরোপীয়গণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ইংরেজরাও বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভের জন্য ভারতে আসিল, সপ্তদশ শতাব্দীর মোড় ফিরিবার সময়। এই সকল ধনসংগ্রহকারী বিদেশী যাহারা ভাগ্যান্বেষণ করিতে গিয়া কল্পতরুকে ফাঁকি দিবার আগ্রহে মত্ত হইয়া উঠিলেন তাঁহাদের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল ভারতবর্ষ। জ্ঞানের অভাব, উদ্দেশ্যহীনতা এবং জনকল্যাণের আদর্শে দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনে অক্ষমতা এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিল, যাহাতে জাতি হিসাবে ভারতীয়দের নীতিবোধ ও ধী-ক্ষমতা নিঃশেষিত হইয়া পড়িল এবং প্রকৃতিগত জাতীয় বৈশিষ্ট্য এবং মানসিক ক্ষমতার উচ্চ আদর্শ হইতেও ভারত বিচ্যুত হইয়া পড়িল। অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী সংগ্রাম এবং সংঘাতের পর, পর্তুগীজ (যাহারা ভারতে ইতিমধ্যেই পশ্চাতে সরিয়া আসিতেছিল) এবং ফরাসীদের ন্যায় ইংরেজগণও এখানে প্রভু হইয়া দাঁড়াইল এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই (মারাঠা এবং শিখ ব্যতীত) অধিকাংশ রাজন্যবর্গকেই দমিত অথবা অপসারিত করিতে সমর্থ হইল। "বণিক এবং বাণিজ্য-পোতের মালিকের মানদণ্ড এবং তুলাদণ্ডে পরিণত হইল শাসক এবং রাজ্যজয়ীর তরবারি এবং রাজদণ্ডে।" ভারতবর্ষ হইল ইংলণ্ডের শাসন এবং শোষণ করিবার জন্য অনুগত ভৃত্য এবং প্রজা। ভারতের অবনয়ন পূর্ণাঙ্গ হইল বিশেষ করিয়া তখনই যখন সে পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাহার অতীত মহিমা বুঝিবার সামর্থ্য হারাইয়া ফেলিল। ভারতীয়েরা সকলেই (যাঁহারা তাঁহাদের মানসিক তৎপরতা হারাইয়া ফেলেন নাই এইরূপ কয়েকজন বিরল, মহাপ্রাণ ব্যক্তি ব্যতীত) মানসিক ও আত্মিক দিক হইতে বিশুদ্ধ মধ্যযুগীয় মনোভাব ও অন্ধ কুসংস্কারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রহিল। এই মধ্যযুগীয় মনোভাব ও অন্ধ কুসংস্কার ভারতবর্ষকে এতখানি নীচে টানিয়া রাখিয়াছিল যে তখন মনে হইয়াছিল পুনরায় উত্থানের সম্ভাবনা তাঁহার নাই।

মধ্যযুগীয় মনোভাব; কুসংস্কার এবং তমসার এই শক্তিগুলির এখনও শেষ হয় নাই। এই শক্তিগুলি আবার কুৎসিতভাবে তাহাদের মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে—আধুনিকতা ও উদ্ভাসিত সংরক্ষণতা (enlightened conservatism) উভয়ের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় ভারতে যে মানসিক ও আত্মিক মুক্তির পরিবেশ আনিয়াছে তাহার সেই দুই শতাব্দীব্যাপী দানকে ধ্বংস করিবার জন্য। বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কশূন্য এই শক্তিগুলি ব্যক্তিগত স্বার্থের সহিত জড়িত এক মিথ্যা দেশভক্তির সহিত মিলিত হইয়া ক্রমেই দুর্বার এবং হিংস্র হইয়া উঠিতেছে এবং জাতীয় জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা, জাতীয় অখণ্ডতা এবং নিয়মশৃঙ্খলা, জাতীয় নৈতিকতা ও জাতীয় প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যময় ভাবের পরিপোষক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এক বিষম সমস্যার পরিস্থিতির সম্মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। নানা প্রকার দলীয় রাজনীতির শক্তিশালী উদ্গাতাদের কতিপয় ব্যক্তির অজ্ঞতা, নীতিবিক্রম, অবিচার এবং নির্মমতার প্রতি বেদনাবোধশূন্য মনোভাব এই সব দুষ্টশক্তির পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ধ্বংস এবং বিচ্ছিন্নতাপ্রবণতার কাজে।

* * * *

আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর, কয়েক বৎসর আগে, উচ্চপদে অভিষিক্ত কোন ভারতীয় শাসনকর্ত্তা, যিনি পাঞ্জাবে একজন গোঁড়া কংগ্রেসী ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, "ভারতে ইংরেজ শাসনের কৃষ্ণমেঘের অন্তরালে একটিমাত্র রূপালি রেখাই ছিল, তাহা হইল ইংরেজী ভাষা।" শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে ভারতীয়গণ কর্ত্তৃক স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সমগ্র উপ-মহাদেশে তাহাদের রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজী ভাষা গ্রহণের ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল।

ইংরেজী ভাষা প্রথমতঃ বৃটিশেরা আমাদের উপর আরোপিত করে নাই। ১৭৮৪ সাল হইতে ১৮২৪ সালের মধ্যে ভারতীয়দের জন্য কলিকাতা এবং বারাণসীতে প্রথম যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বৃটিশেরা স্থাপন করিয়াছিল তাহাতে সংস্কৃত এবং পার্শি ভাষা (এবং উহার সহিত আরবীও) শিক্ষাদান করা হইত। ১৮১৭ সালে ভারতীয় বালকগণকে আধুনিক শিক্ষা এবং ইংরেজীভাষায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় যে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার উদ্যোক্তা ছিলেন কতিপয় ভারতীয় ভদ্রসন্তান। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রেরণা ছিল ভারতে ইংরেজী ভাষা তথা ইয়োরোপীয় জ্ঞান আনয়নের বাসনা এবং বহির্বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা, যাহার প্রবেশপথ বৃটিশেরা উন্মুক্ত করিয়া দিলেও প্রধানতঃ নিজেদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। ইংরেজের সহিত সংযোগ ভারতীয় বুদ্ধিজীবিমহলের নিকট লইয়া আসিল বিস্তৃততর এক পৃথিবীর সংবাদ। অধিকন্তু, বুদ্ধিজীবি ভারতীয়দের মধ্যে ইহাতে ইতিমধ্যেই এক বিরাট মানসিক ক্ষুধার সঞ্চার হইয়াছিল, যাহার সমতুল্য ক্ষুধা তাহারা পূর্বে কখনও অনুভব করে নাই। বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও ইংরেজী স্কুল খোলা হইল। সারা দেশে যে নূতন আলোর বিস্তার হইতেছিল সেই আলোর বিচ্ছুরণকেন্দ্র হইল কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের এই স্কুলগুলি। এই সকল ইংরেজী স্কুল চিন্তার ক্ষেত্রে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিল এবং ভারতীয়দের মধ্যে এক অভূতপূর্ব ভাবাদর্শের নবজন্মের (renaissance) যুগ আবাহন করিয়া লইয়া আসিল। পরবর্ত্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতে একচ্ছত্র শাসক ও নিয়ামকশক্তিতে পরিণত হইয়া জনসাধারণের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সুরু করিল তখন ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে তাহারা যে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে তাহার বীজকেন্দ্র হইল এই ইংরেজী স্কুলগুলি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত অগ্রগমনে এক নূতন দিগন্তের প্রকাশ করিল। ইহার ফলে ভারতীয়রা উন্নতিশীল মানবতার সদস্যরূপে অন্যান্য জাতিগুলির সহিত একাসনে বসিতে পারিল,—তাহাদের

মন হইল আধুনিক এবং প্রগতিসম্পন্ন। ভারতের তথা মানবজাতির কল্যাণে কলা-বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার বিকাশে বুদ্ধিমত্তার সহিত অংশ গ্রহণে তাহারা তখন সমর্থ হইল।

* * * *

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতে, যাহাকে বলা হইয়াছে সংযোজন বা যোগ অর্থাৎ পূর্বে যাহা কখনও আমাদের ছিল না সেই সকল নূতন জিনিষের মূল্যবোধের প্রবর্ত্তনা করিল—কলা-বিজ্ঞান ও কারিগরীবৃত্তিতে, রাজনৈতিক ও গণতন্ত্রী ধ্যান-ধারণায়। আমাদের স্কুল এবং কলেজীয় পাঠক্রমে সংস্কৃত, পারসীক, গ্রীক, ল্যাটিন এবং আরবীর ন্যায় ক্ল্যাসিক্যাল ভাষাগুলিকে অবশ্যপাঠ্যরূপে অন্তর্ভুক্ত করিয়া, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে 'ক্ষেম' বা মূল্যবান বস্তুর সংরক্ষণেও সাহায্য করিল। এই সংস্কৃতির মূল্য শুধুমাত্র আমাদের নিকটই সার্থক নহে, সমগ্র মানবজাতির জন্যও অর্থপূর্ণ। ঐ সকল অবশ্যপাঠ্য বিষয়গুলি (সারা ভারতে শতশত বৎসর ধরিয়া প্রচলিত পুরানো 'এনট্রান্স' অথবা 'ম্যাট্রিকুলেশন' এবং প্রাথমিক কলা (Fine Arts) বা অন্তর্বর্তীকালীন (Intermediate) শিক্ষাক্রমে) ন্যূনপক্ষে ছয় বৎসরকাল সকল ছাত্রকে অধ্যয়ন করিতে হইত। যোগ এবং ক্ষেমার মধ্যে বিজ্ঞতার সহিত ভারসাম্য রক্ষা করায় ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষব্যাপী শিক্ষাক্রম আমাদের দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। এই ব্যাপারে ইহা হইতে উৎকৃষ্টতর কোন কিছুর কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি না। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা, অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিলাম বটে, কিন্তু আমাদের আত্মাকে হারাইলাম না। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা এবং উচ্চমাধ্যমিক ও কলেজীয় স্তরে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে, আমাদের শিক্ষা প্রণালী যাহাতে অতি প্রয়োজনীয় সংস্কৃত শিক্ষার স্থান ছিল, তাহা এক দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পরে আমরা আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করিলাম আমাদের আধুনিক ভাষাগুলির প্রতি। একমাত্র ইংরেজী এবং সংস্কৃতভাষার পক্ষে ভর করিয়াই এই আধুনিক ভাষাগুলি উন্নতির আকাশে বিচরণ করিতে পারিত। ইংরেজীর সংস্পর্শে এবং প্রধানতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাহায্যে ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালীর মাধ্যমেই রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী, রঙ্গলাল ব্যানার্জী, বালগঙ্গাধর জাম্বেকার, বিষ্ণুশাস্ত্রী, কৃষ্ণ চিপলুন্কার, গোবর্ধনদাস ত্রিপাঠি. মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, এস্, কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, কস্তুরি রঙ্গ আয়েঙ্গার, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কজুকুরী বীরেশলিঙ্গম্ পন্তালু, পিচ্চুগু ভি, রামমূর্ত্তি পন্তলু, হরিশচন্দ্র মুখার্জী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র বসু, অনুন্দোরম বড়ুয়া, কৃষ্ণদাস পাল, রাজনারায়ণ বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, স্যার সৈয়দ আমেদ, সৈয়দ আমীর আলি, বদরুদ্দীন তায়েবজী, দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, স্বামী রামতীর্থ, এন্, জি, চন্দভারকর, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে, লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামানন্দ চ্যাটার্জী, প্রমথ চৌধুরী, লক্ষ্মীনাথ বেজ্‌বড়ুয়া, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু, রাধানাথ রায়, ফকিরমোহন সেনাপতি, মধুসূদন রাও, ভাই পুরণ সিং, এস, রামানুজন্, কে, এস্, কৃষ্ণণ, বীরবল সাহ্‌নি, মেঘনাদ সাহা এবং জীবিতদের মধ্যে চক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন্, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, জাকির হোসেন প্রভৃতি বহু সংখ্যক পুরুষ (বাহুল্যের জন্য যাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়)—যাঁহারা জীবনের সমস্যা, রাজনীতি, কলা এবং বিজ্ঞানে ভারতীয় চিন্তা এবং শিক্ষা-ব্যাপারে নায়ক

ছিলেন সেই সব গুণী ও উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিদিগের সমাবেশ সম্ভব হইয়াছিল। উপরোক্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই ছিলেন ইয়োরোপীয় শিক্ষাধারায় পণ্ডিত এবং কেহ কেহ বিজ্ঞানেও। ইঁহারাই আবার ভারতীয় স্বাজাত্যবোধ ও দেশভক্তি, ভারতীয় আশা-আকাঙ্খা এবং ভারতীয় সাংস্কৃতির নায়ক এবং ব্যাখ্যাতাও ছিলেন। ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব জিনিষ আরো শক্তিশালী হইয়া উঠিল। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্ম আমাদের যে আগ্রহ তাহার অবলম্বনও ছিল ইংরেজী।

আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির এক শত বৎসর পূর্বে যে ভারতীয় জীবনধারা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই এক মহান্ উত্তরাধিকারী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি। তখনকার পরিস্থিতিতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দক্ষতার সহিত ভারতের জনসাধারণের মহতী সেবা করিয়াছিল। অবশ্য চিন্তা করিতে অক্ষম এমন কোন কোন সমালোচকও রহিয়াছেন যাঁহারা জানেন না কী তাঁহারা চাহেন। ভারতে বৃটিশ সরকারের কোন কোন কট্টর রাজনীতিবিদ্ 'ভারতীয়দের স্ব-স্থানে রাখার' সরকারী নীতির বংশবদ করিবার জন্য খোলাখুলিভাবে এবং গোপনেও চাপ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সফলকাম হইতে পারেন নাই। আমাদের জাতীয় সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মৌলিকতা রক্ষা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার অগ্রগতিতে প্রকৃত সাহায্য করিয়াছিল। আমরা সকলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য গর্ববোধ করিতে পারি: আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়রূপিনী জননী (Alma Mater) তাঁহার সন্তানদের ভালভাবেই লালন-পালন করিয়াছেন।

* * * *

জ্ঞান বৃক্ষ আরো শত সহস্র শাখায় সম্প্রসারিত হোক ("Let Knowledge grow from more to more"): এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনা কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা-উত্তরকালে পূর্ণ হইতেছে না। স্বাধীন ভারতে আমাদের শিক্ষা এবং মননশীলতার অগ্রগতি সমস্ত দিকে এবং বিরাট পদক্ষেপে হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে যাহা লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহা উহার বিপরীত। ভারতের অগ্রগমন এবং উহার ভাবী নাগরিক তথা ছাত্রদের কল্যাণ সাধনের চিন্তায় মগ্ন প্রতিটি দায়িত্বশীল এবং সৎ ভারত প্রেমী ইহার জন্য পরিতাপ করেন।

ইহা সত্য যে, ভৌতিক বিজ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা এবং মৌলিক গবেষণায় এবং কলা-বিষয়ের উচ্চতর পর্য্যায়ে আমাদের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা এখনও তাঁহাদের স্থানচ্যুত হন নাই। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির মানে এবং অধ্যয়নের গুরুত্বদানে দুঃখজনক পতন হইয়াছে, যাহার ফলে শঙ্কিত এবং আতঙ্কিত হইবার বিরাট কারণ রহিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার আমাদেরই ছাত্রদের মানের তুলনায় বর্তমানে প্রচলিত মান অনেক নিম্নে। পাশ্চাত্যের অগ্রগামী দেশগুলির তুলনায়ও বহু নিম্নে। এই বিশাদময় কাহিনী বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই: কিন্তু যখন আমি, আমাদের ভারতীয় কলেজ-ছাত্রদের শতকরা এক বিপুল অংশ বর্তমানে অর্ধ-শিক্ষিত মাত্র, বহু বিষয়ে অশিক্ষিত এবং এক প্রকারের আদিম মানসিকতা আক্রান্ত—এই সকল কথা ঘৃণার সুরে উচ্চারিত হইতে শুনি, তখন অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া অধ্যাপনারত একজন শিক্ষাবিদ্ হিসাবে আমাদের কলেজীয় ছাত্রদের এক বিরাট অংশ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা হইতেই লজ্জায় আমি মাথা নিচু না করিয়া পারি না।

আমি ইহার জন্য আমাদের তরুণ সম্প্রদায়কেই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী করিব না। ইহা তাহাদের ত্রুটী নহে, আজ তাহারা যে অবস্থায় পতিত হইয়াছে সেই অসহায় অবস্থার দিকে তাহাদের ঠেকিয়া দিয়াছে। উহার জন্য দায়ী নানা ঘটনা। "প্রগতিশীল" সৌখীন ভাবধারার অনুরক্তব্যক্তিদের বে-পরোয়া এবং উদ্দাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাত্রদের উপরে চাপাইয়া দিবার ফলে যথার্থ শিক্ষা বলিয়া কোন বস্তু নাই। দলীয় নোংরা স্বার্থে দুর্ভাগ্যাক্রান্ত এবং হতাশাপূর্ণ ছাত্রদের চমকপ্রদ ধ্বনি (slogan) এবং অর্দ্ধ সত্য দিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বিপথে চালনা করিয়া রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্রদের নির্দয়ভাবে এবং অপরাধীর মনো অবলম্বনেশোষণ করিতেছে। কোন রাজনৈতিক দলই ইহা

হইতে মুক্ত নয়। অধিকন্তু, আরেক প্রকার বি-জাতীয় দলীয় রাজনীতি যাহার দৃষ্টি কেবল জনসাধারণের কোন বিশেষ অংশের আর্থিক এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার প্রতি নিবদ্ধ, শিক্ষাক্ষেত্রে এমন সকল জটিলতার সৃষ্টি করিতেছে যাহা দৃঢ়ভিত্তিক এবং যুক্তিসম্মত শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

* * *

বর্তমানের বিষম পরিস্থিতি যাহাতে সুস্থ এবং স্বাভাবিক হয় সেই উদ্দেশ্যে চিন্তাশীল এবং সাধু ব্যক্তিগণ সর্বত্র বিভিন্ন প্রস্তাব দিতেছেন। বর্তমানের শিক্ষাগত কাঠামো, যাহাকে বর্তমান ছত্রভঙ্গ অবস্থার জন্য দায়ী করা হয় এবং যে কাঠামো মনে হয় কাহারই অভিপ্রেত নহে, তাহার আপাদ-মস্তক পরিবর্তন সাধনের জন্য উপদেশ বর্ষণ করিতে সম্মেলন, কমিশন এবং কমিটির অভাব নাই। "ছাত্র-অসন্তোষ" দূর করিবার জন্য প্রচুর সাধু উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এই সব উপদেশে ছাত্রদের যেমন দোষী সাব্যস্ত করা হয় তেমনই আবার তাহাদের দোষস্খালনও করা হইয়া থাকে, কিন্তু সর্বোপরি নিন্দা করা হইয়া থাকে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে।

শিক্ষকরূপে, গবেষকরূপে এবং গবেষণার পথপ্রদর্শকরূপে আমি অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিককাল হইতে এই শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত যুক্ত। প্রায় বিশ বৎসরকাল আমি ভারতের শিক্ষা এবং রাজনীতির দৃশ্যপটের দিকে নিবিড় ভাবে দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমার মনে হয় আমরা সকলেই মৌলিক সমস্যাগুলিকে এড়াইয়া গিয়াছি—আমরা শুধু সমস্যার কিনারায় হাত ঠেকাইয়াছি। ইহার দোষযুক্ত মূলই স্ফীত হইয়াছে এবং উন্নতির সকল প্রয়াসই ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই সকল মৌলিক সমস্যার সহিত জড়িত রহিয়াছে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বহু বিষম এবং সামাজিক অবিচার, প্রাদেশিক ঈর্ষ্যা এবং শোষণ, যাহা তলায় তলায় উহাদের অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করিয়া চলিয়াছে।

আমাদের বালক-বালিকাগণ এবং তরুণ-তরুণীরা স্কুলে এবং কলেজে যাহাতে সহজেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ সুবিধাগুলি লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে জাতির পরিচালনাভার যাঁহাদের হাতে ন্যস্ত, তাঁহাদের বিবেচনার জন্য বিনয়ের সঙ্গে আমি কিছু বক্তব্য উপস্থিত করিতেছি। আমার বয়স এখন অশীতিবর্ষের সন্নিকট, অকপটেই আমি আমার মনের দুয়ার খুলিয়া দিতেছি।

আমাদের শিক্ষা এখন চিন্তা এবং কর্মের অবাধ বিকাশের জন্য এবং সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যান্য পুরোগামী দেশের ন্যায়, যেখানে আমাদের মতো বহু ভাষাভাষী, বহু জাতি এবং বহু ধর্ম রহিয়াছে, আমাদেরও প্রয়োজন শিক্ষাগতভাবে ভ্রমপূর্ণ কোন নির্দিষ্ট নীতি আরোপের পরিবর্তে একটি যুক্তিসম্মত এবং বাস্তব শিক্ষাপ্রণালীর।

বর্তমান অবস্থার জন্য মূলতঃ দায়ী হইল দুইটি জিনিষ। এই দুইটি হইল—

(১) আমাদের শিক্ষাজগতে পুরাতন প্রণালীকে সম্পূর্ণ টানিয়া নামাইয়া নূতন ভাবাদর্শে একেবারে নূতন রূপ দানের জন্য "তত্ত্ববিদ্‌গণ" (এবং কিছু কিছু কর্ম-ব্যস্ত "সংস্কারকগণ") কর্তৃক অ-দায়িত্বশীল এবং অবাধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই সকল ভাবাদর্শের আশু এবং অধৈর্য্য প্রয়োগে আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, যখন ইহাতে জটিলতা এবং অসুবিধা দেখা দেয় তখন আবার নূতন করিয়া "সংস্কারের" ব্যর্থ প্রয়াস হয় যাহার ফলে অবস্থা আরো বেশি খারাপ হইয়া পড়িয়াছে।

আশার লক্ষণ এই যে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কেহ কেহ পুনরায় শিক্ষাপ্রণালীর মতো কোন কিছুতে প্রত্যাবর্তনের কথা চিন্তা করিতেছেন।

(২) শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির অনধিকার প্রবেশ, যাহার ফলে স্কুল এবং কলেজে তারিখ এবং বয়ঃসীমা, পাঠ্যবিষয় এবং পাঠ্যক্রমে নির্ব্বিচার পরিবর্তনের ফলে ছত্রভঙ্গ অবস্থা পূর্ণাঙ্গ বিপর্য্যয়ে পরিণত হইয়াছে। কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলিতে উৎসাহী কিন্তু চিন্তাহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক

এবং তরুণেরা যুক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই সকল রাজনীতিবিদ্‌গণ পদ্ধতিতে নীতিজ্ঞানশূন্য, নিজেদের বিশেষ স্বার্থের তল্পীবহন এবং ধ্বজাধারণ করিয়া ইঁহারা নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করিতেছেন। এই সকল রাজনীতিজ্ঞগণ অধিকাংশ নির্বাচনী অভিযানে ছাত্রদের ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাহাদের সমর্থন লাভের জন্য সকল প্রকার অশালীন ব্যবহারকে ক্ষমা করিয়া যান।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক রাজনীতির নোংরা খেলায় ছাত্রদের টানিয়া আনা ছাড়াও ছাত্রদের মানের ক্রমাবনয়ন হইতেছে, পাঠ্যবিষয় এবং পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে বিশেষতঃ ভাষার ব্যাপারে, সরকারী বাহনগুলির চাপে। বহুসংখ্যক বিষয়ের অত্যধিক ভার, যাহাতে রহিয়াছে বিশাল সংখ্যক অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক যাহা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠ করিতে হইবেই।

ইহা আমাদের শিক্ষাকে কোমল বয়স্ক বালক-বালিকাদের উপর এক ভয়ঙ্কর চাপে পরিণত করিয়াছে। এই দুইটি বিষয়েরই সংশোধন হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমি আমার বক্তব্য আমার প্রস্তাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখিব উহার মূল্য যাহাই হোক।

* * * *

"পুরাতন শৃঙ্খলার অবসান হইলে, নূতন আসিয়া স্থান করিয়া লয়।" কিন্তু পুরাতন যখন অকেজো হয় তখনই উচিত পরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করা। প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ের শিক্ষার পুরাতন পাঠক্রম এবং কর্মসূচী যাহা শতবর্ষেরও অধিককাল ধরিয়া প্রচলিত ছিল এবং যাহা সমগ্র ভারতে নূতন এবং পুরাতন সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে মোটামুটি একই প্রকার ছিল, তাহা পরীক্ষিত এবং কার্য্যক্ষেত্রে উত্তম বলিয়াই প্রমাণিত। অধিকাংশ সভ্যদেশে প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালী হইতে উহা নিকৃষ্ট ছিল না। স্বাধীনতার পর এই প্রণালীর উপর আমাদের গড়ার কাজ ছিল, ইহার পরিবর্ত্তনে আমাদের তাড়াহুড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এই প্রণালীকে চলিতে দিয়া প্রাথমিক শিক্ষার সাহায্যে সাক্ষরতাঅর্জ্জন এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সাহায্যে উহার পরিপুষ্টি সাধনে—আমাদের উচিত ছিল এই ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগী হওয়া। কিন্তু যখন আমরা দিল্লীতে বসিয়া নূতন কিছু করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলাম, তখন আমার মতে, সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনে, এই শিক্ষাপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে চাওয়া হইল। কতকগুলি প্রদেশের আনুষ্ঠানিক সমর্থন অবশ্য ইহার পিছনে ছিল। ইহার ফল হইল তুমুল বিশৃঙ্খলা, আধা-খ্যাচড়া এবং অদক্ষ শিক্ষাদান এবং বিগত দশকগুলি ধরিয়া ছাত্র ও শিক্ষকদের অবর্ণনীয় কষ্ট।

সমগ্র দেশের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে একটি মাত্র অখণ্ড প্রণালী চাপাইয়া দেওয়া যায় কিনা—অর্থাৎ, শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত এবং দিল্লী হইতেই পরিচালিত হইবে কিনা—এ বিষয়ে বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া শুনিতে পাই। সারাদেশে এই প্রস্তাব শিক্ষার পক্ষে ভাল হইবে কিনা এ বিষয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত। প্রত্যেকটি প্রদেশ অথবা ভাষাভাষী অঞ্চলে এমন বিশেষ বিশেষ সমস্যা আছে যাহা কেন্দ্র হইতে তত্ত্ব বিদ্‌গণের পক্ষে যথাযথরূপে অনুধাবন করা অথবা উহার সমাধান করার চেষ্টা করা অসম্ভব। সাধারণ রূপ-রেখার দিক হইতে শিক্ষাকে হইতে হইবে বিশাল ভারতীয় (pan-Indian) ধরণের। কিন্তু ইহার খুঁটি-নাটি, যেমন, পাঠ্যক্রম এবং পঠন-তালিকা, প্রদেশের শিক্ষা দপ্তরের হাতে সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমাদের জাতীয় আদর্শ হইল বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন। একই পোষাক সকল আত্মাকে পরান কখন সম্ভব হয় না এবং একটি মাত্র ভোঁতা ক্ষুরে দেশের সকলের মাথা কামানো চলে না। এই সারগর্ভ উক্তি দুইটির একটি একজন দার্শনিকের আর অপরটি, জনশ্রুতি। ইতিমধ্যেই বাংলা দেশে এবং অন্যত্র প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় "কেন্দ্রিকতা ও "ঐক্যরূপের" নামে আরেকটি পশ্চাদ্‌গামী ব্যবস্থা কখনই উচিত নহে।

* * * *

আমি এই প্রস্তাব করিব: ছাত্রদের ক্ষতি করিয়া আর কোন নূতন পথে চলিবার নিষ্ফল প্রয়াস করিবেন না। আসুন, আমরা আমাদের মিথ্যা অহংকার এবং লজ্জা ত্যাগ করিয়া সাহসে ভর দিই এবং পুরাতন শিক্ষাপ্রণালী অথবা উহারই অনুরূপ কোন কিছু পুনঃস্থাপন করি। পুরাতন অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের কথা বেশ কিছুসংখ্যক দায়িত্বশীল শিক্ষাবিদ্‌ও গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন। নিম্নোক্ত রেখানুযায়ী আমি একটি সংগঠনের প্রস্তাব করিতেছি :

(১) চার অথবা পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা—বয়স পাঁচ হইতে আট অথবা নয়।

(২) আট অথবা সাত বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা—বয়স নয় অথবা দশ হইতে ষোল।

(৩) কলেজে চার বৎসর—প্রারম্ভিক অথবা অন্তবর্ত্তীস্তরে দুই এবং গ্রাজুয়েট অথবা ডিগ্রী স্তরে আরো দুই

(৪) আরো দুই বৎসর কিংবা এক বৎসর এম্-এ ডিগ্রীর জন্য।

(৫) এম্-এ অথবা এম্-এস্‌সি'র পর সুবিধানুযায়ী গবেষণামূলক অধ্যয়ন

পূর্ব্বেকার মতোই ইহা এক সরল এবং পরিষ্কার কর্ম্মসূচী যাহার মধ্যে ব্যর্থতা নাই। শিক্ষক এবং ছাত্র—কাহারও কোন দুশ্চিন্তা কিংবা অসুবিধা থাকিবে না। রাজনৈতিক কোন পুরোহিত-তন্ত্রের নির্দ্দেশে নয়, প্রত্যেক স্তরের জন্য পাঠ্যতালিকা, পাঠ্যবিষয়, পাঠ্য-পুস্তক এবং পরীক্ষা নির্ধারিত হইবে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষাগত প্রয়োজন এবং দক্ষতার বিচার করিয়া।

ভাষার প্রশ্ন বর্ত্তমানে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে ইতিমধ্যেই ভারত বিভাজনের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রত্যেকেই শিক্ষাক্ষেত্রে যত উচ্চস্তরে সম্ভব মাতৃভাষার ব্যবহারের পক্ষে। কিন্তু মাতৃভাষার অর্থ এই নয় যে ইংরেজীকে বর্জ্জন করিতে হইবে। ইংরেজী এবং সংস্কৃতের কথা আমরা উচ্চকণ্ঠে বলি, কিন্তু আমরা এমন পাঠ্যতালিকা ছাপাইয়া দিতেছি যাহাতে সংস্কৃত প্রকৃতপক্ষে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ইংরেজীরও অবহেলা করা হইতেছে যাহাতে যথাশীঘ্র সম্ভব ইংরেজী হটানো সম্ভব হয়। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে ইংরেজীকে অবশ্য-পাঠ্য ভাষা রূপে রাখিতেই হইবে। আমরা যদি বর্ত্তমানে কী ঘটিতেছে তাহার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং বাগ্‌বহুল বিতর্কের অবতারণা না করি, তবে আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে ইংরেজী কেবল আমাদের, বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত সাংস্কৃতিক জীবন এমন কি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনেই উহার চিরায়ত আসন বিস্তার করে নাই, পরন্তু উহার প্রভাব প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। স্বাধীন জাতি হিসাবে পৃথিবীর সকল জাতিপুঞ্জের সম্মুখে আমাদের প্রখ্যাত স্থান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ইংরেজীর প্রয়োজন পূর্ব্বের চেয়েও বেশী। আমাদের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্ত্তৃপক্ষের উচিত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের মারফৎই শুধু নয়, অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেও, কখনও খোলাখুলিভাবে কখনও বা চরম কপটাচারণের মধ্য দিয়া, জোর করিয়া হিন্দী চাপাইয়া দিবার বিষয় পুনর্বিবেচনা করা। হিন্দী-ভাষী জনসাধারণের কথা এবং তাহাদের দাবী সম্বন্ধেই শুধু নয়, অহিন্দী-ভাষী জনসাধারণের অনুভূতি এবং ভাবপ্রবণতা, সুযোগ-সুবিধা, ভাল-মন্দ ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত। এ ব্যাপারে তাঁহাদের অন্ধ হইলে চলিবে না। তাঁহারা এই মহান্ সত্যকে উপেক্ষা করিতে পারেন না যে, অ-হিন্দী অঞ্চলে আবশ্যিক হিন্দী আমাদের শিক্ষা ও রাজনৈতিক জীবনে বিরাট বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং বিচ্ছিন্নকামিতা লইয়া আসিয়াছে।

১৯৫৬ সালে, সরকারী ভাষা কমিশনের সদস্যরূপে কমিশনের রিপোর্টে আমি আমার ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহাতে আমি যে আশংকা ব্যক্ত করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ ১২ বৎসর পরে তাহা বড় বেশী সঠিক প্রমাণিত হইতেছে। আমি জোরের সহিত বলিতে পারি যে, ইংরেজীকে রক্ষা করা এবং অ-হিন্দী-ভাষীদের জন্য আবশ্যিক হিন্দীর বিরুদ্ধে আমার যুক্তির

বিরুদ্ধে কোন সদুত্তর মেলে নাই,—বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরেজীর বিরুদ্ধে এক প্রকার আদিম ঘৃণা অথবা জীবনের সকলক্ষেত্রে অধিকতর ইংরেজী ব্যবহার এবং "রাষ্ট্রভাষা" সম্পর্কে নীরস ভাবালুতার পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু দেখি নাই।

আমার ভিন্নমতের মন্তব্যের পরিশেষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মতামত এবং সংক্ষিপ্ততম সময়ে ভারতীয় পট হইতে ইংরেজী অপসারিত করিয়া হিন্দীকে সেই স্থানে বসাইবার আগ্রহ সম্বন্ধে তাঁহার বিরাক্তর কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম।

ইংরেজী এখনও উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের প্রচলিত ও কার্য্যকর সাধারণ ভাষা। এই উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতিকে পরিচালিত করেন। যাহারা হিন্দী বলেন বা ব্যবহার করেন এবং আধুনিক শতাব্দীগুলিতে ভারতের বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সমষ্টিতে যাহাদের দান অতি-মাত্রায় ক্ষুদ্র সেই ক্ষুদ্র জনসমষ্টির সম্ভাব্য স্বার্থে এবং নিছকই ভাবালুতার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনের কোন ভাল, উপযোগী এবং মূল্যবান জিনিষকে ধ্বংস করিতে সাহায্য না করার জন্য আমি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে বিনীত অনুরোধ জানাই।

১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁহার সমাবর্ত্তনী ভাষণ বাংলা ভাষায় দিয়াছিলেন। ভারতে এই-ই সর্ব্বপ্রথম কোন ভারতীয় ভাষা যে ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সমস্ত ছাত্রের মাতৃভাষা, সেই ভাষার সম্মাননা হইয়াছিল। ইংরেজীর মতো, শিক্ষাদান এবং পরীক্ষা গ্রহণের ভাষারূপে যে সময়ে মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এমন কি সেই সময়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উজ্জীবনে ইংরেজী ভাষার ভূমিকা সম্পর্কে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন এই উপলক্ষ্যে উহা পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে :

এ প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করা চাই যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষার সম্মানের আসন বিচলিত হ'তে পারবে না। তার কারণ এ নয় যে, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের জীবনযাত্রায় তার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। আজকের দিনে য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্ত মানবলোকের শ্রদ্ধা অধিকার ক'রেছে; স্বাজাত্যের অভিমানে এ কথা অস্বীকার ক'রলে অকল্যাণ। আর্থিক ও রাষ্ট্রীক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার পক্ষে এই শিক্ষার যেমন প্রয়োজন তেমনি মনকে ও ব্যবহারকে মূঢ়তা-মুক্ত করবার জন্য তার প্রভাব মূল্যবান। যে চিত্ত এই প্রভাবকে প্রতিরোধ করে, এ'কে অঙ্গীকার ক'রে নিতে অক্ষম হয়, সে আপন সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ নিরালোক জীবনযাত্রায় ক্ষীণজীবি হ'য়ে থাকে। যে জ্ঞানের জ্যোতি চিরন্তন তা যে-কোনো দিগন্ত থেকেই বিকীর্ণ হ'ক, অপরিচিত ব'লে তাকে বাধা দেয় বর্ব্বরতার অস্বচ্ছ মন। সত্যের প্রকাশ-মাত্রই জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার-গম্য; এই অধিকার মনুষ্যত্বের সহ-জাত অধিকারেরই অঙ্গ। রাষ্ট্রগত বা ব্যক্তিগত বিষয়-সম্পদে মানুষের পার্থক্য অনিবার্য্য, কিন্তু চিত্ত-সম্পদের দানসত্রে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানুষ এক। সেখানে দান করবার দাক্ষিণ্যেই দাতার ধন্য, ও গ্রহণ করবার শক্তি-দ্বারাই গ্রহীতার আত্মসম্মান। সকল দেশেই অর্থ-ভাণ্ডারের দ্বারে কড়া পাহারা, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান-ভাণ্ডারে সর্ব্বমানবের ঐক্যের দ্বার অর্গল-বহীন। লক্ষ্মী কৃপণ, কারণ লক্ষ্মীর সঞ্চয় সংখ্যা-গণিতের সীমায় আবদ্ধ, ব্যয়ের দ্বারা তার ক্ষয় হ'তে থাকে; সরস্বতী অকৃপণ, কেননা সংখ্যার পরিমাপে তাঁর ঐশ্বর্য্যের পরিমাপ নয়, দানের দ্বারা তার বৃদ্ধিই ঘটে। বোধ করি, বিশেষ-ভাবে বাংলাদেশের এই গৌরব করবার কারণ আছে যে, য়ুরোপীয় সংস্কৃতির কাছ থেকে সে আপন প্রাপ্য গ্রহণ ক'রতে বিলম্ব করেনি। এই সংস্কৃতির বাধাহীন সংস্পর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে তার সাহিত্য প্রচুর শক্তি ও সম্পদ লাভ ক'রছে, এ কথা সকলের স্বীকৃত। এই প্রভাবের প্রধান সার্থকতা এই যেখানে যে জড়-

করণের দুর্ব্বল প্রবৃত্তিকে কাটিয়ে' ওঠবার উৎসাহ সে প্রথম থেকে দিয়েছে।······

···বস্তুতঃ, নবযুগ-প্রবর্তক প্রতিভাবানের সাধনায় ভারতবর্ষে সর্বপ্রথমে বাংলাদেশেই য়ুরোপীয় সংস্কৃতির ফসল ভাবী কালের প্রত্যাশা নিয়ে দেখা দিয়েছিল, বিদেশ থেকে আনীত পণ্য-আকারে নয়, স্বদেশের ভূমিতে উৎপন্ন শস্য-সম্পদের মতো। সেই শস্যের বীজ যদি-বা বিদেশ থেকে উড়ে এসে আমাদের ক্ষেত্রে প'ড়ে থাকে, তবু তার অঙ্কুরিত প্রাণ এখানকার মাটিরই। মাটি যাকে গ্রহণ ক'রতে পারে সে ফসল বিদেশী হ'লেও আর বিদেশী থাকে না। আমাদের দেশের বহু ফলেফুলে তার পরিচয় আছে।

ইংরেজী শিক্ষার সার্থকতা আমাদের সাহিত্যে বঙ্গীয় দেহ নিয়ে বিচরণ ক'রছে বাংলার ঘরে ঘরে, এই প্রদেশের শিক্ষা-নিকেতনেও সে তেমনি আমাদের অন্তরঙ্গ হ'য়ে দেখা দেবে, এ জন্য অনেক দিন আমাদের মাতৃভূমি অপেক্ষা ক'রছে।

রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন—

···বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গা-যমুনার মতো মিলিয়া যায়, তবে বাঙালি শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে।···

('শিক্ষার বাহন', রবীন্দ্ররচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার, খণ্ড ১১, পৃঃ ৬৪৩)

হিন্দী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। হিন্দী-ভাষার মহান্ মরমী কবি কবিরকে তিনি ইংরেজী অনুবাদের মাধ্যমে সভ্যজগতের সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য ভারতীয় জাতীয় ভাষা যাহার অনেকগুলিতেই মহান্ সাহিত্য রচিত হইয়াছে এবং যেসব ভাষা কোনক্রমেই হিন্দীর তুলনায় অপকৃষ্ট নহে—সেই সকল ভাষার উর্দ্ধে হিন্দীকে কৃত্রিম উপায়ে (জনসাধারণের অর্থ প্রচুর পরিমাণে ও অন্যায়ভাবে ব্যয় করিয়া) গুরুত্ব ও স্থান দেওয়ার অশালীন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তা-বিরোধী মনোবৃত্তির নিন্দা করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন :

যান্ত্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই কি, কিন্তু তার চেয়ে বড় কাজ—দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারী প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারি তেল জোগাবার খাতিরে, ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

এই প্রসঙ্গে য়ুরোপের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। সেখানে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, অথচ এক সংস্কৃতির ঐক্য সমস্ত মহাদেশে। সেখানে বৈষয়িক অনৈক্যে যারা হানাহানি করে, এক সংস্কৃতির ঐক্যে তারা মনের সম্পদ্ নিয়তই অদল-বদল ক'রছে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ধারায় ব'সে নিয়ে আসা পণ্যে সমৃদ্ধিশালী য়ুরোপীয় চিত্ত জয়ী হয়েছে সমস্ত পৃথিবীতে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ-সাধনে দ্বিধা ক'রলে চ'লবে না। মধ্যযুগে য়ুরোপে সংস্কৃতির এক ভাষা ছিল লাটিন। সেই ঐক্যের বেড়া ভেদ ক'রেই য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা যেদিন আপন আপন শক্তি নিয়ে প্রকাশ পেলে, সেইদিন য়ুরোপের বড় দিন। আমাদের দেশেও সেই বড় দিনের অপেক্ষা ক'রবো—সব ভাষা একাকার করার দ্বারা নয়, সব ভাষার আপন আপন বিশেষ পরিণতির দ্বারা।

('বাংলাভাষা-পরিচয়', অধ্যায় ৮)

কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিদের আমি পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিব সমগ্রভাবে প্রশ্নটিকে এক প্রশস্ত, নিস্পৃহ, ন্যায়সঙ্গত এবং সাম্য সঙ্গতরূপে বিচার করার জন্য—যাহাতে একটি মহান্ দেশ বিভাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। অতীতে সংস্কৃতের সাহায্যেই ভারত একটি জাতিতে সংহত হইয়াছিল—যে জাতির এক সাধারণ ইতিহাস ছিল এবং মানবধর্ম্মী আদর্শও ছিল। পারসীক ভাষার সাহায্যেও কিছু পরিমাণে এই সংহতি সাধিত হয়। অবশেষে এই সংহতি বলশালী হয় এবং বিপুলাকার ধারণ করে ইংরেজীর সাহায্যে। এইরূপই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলিয়াছিলেন যে : ইতিহাসের ঘটনার তাড়নায় সর্ব্বজনগ্রাহ্য

বিশাল ভারতীয় ভাষারূপে আমাদের কোন আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, অতএব, ইংরেজী যেহেতু বর্তমানে আছে- আমাদের নিজস্ব স্বার্থেই এই ভাষার সুযোগ্যতম ব্যবহারই আমাদের পক্ষে সম্ভব।

বর্তমানে স্কুলের ভাষাসমূহ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া সারা ভারতে স্কুল এবং কলেজে আমাদের তরুণদের মানসিক গঠন এবং শিক্ষার স্বার্থে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত ভাষার ব্যবস্থাই প্রস্তাব করিব, ইহা অবশ্য কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠির, যাহাদের এক বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে, খেয়াল-খুসী চরিতার্থ করিবার জন্য নয়।

তিনটি ভাষা আবশ্যিকভাবে আমরা রাখিতে পারি

(১) মাতৃভাষা

(২) ইংরেজী, এবং

(৩) একটি তৃতীয় ভাষা—নিম্নোক্ত তিনটি গ্রুপ হইতে যে কোন একটি : হয় (ক) একটি ক্লাসিকাল ভাষা—এইগুলির মধ্যে যে কোনটি ; সংস্কৃত, পালি প্রাকৃত, আবেস্তান এবং পহ্লবী, পারসীক, আরবী, হিব্রু, সিরীয়, গ্রীক, ল্যাটিন, পুরাতন আর্মেনীয় এবং পুরাতন তিব্বতীয় এবং পুরাতন বা সঙ্গম তামিল (শেষোক্ত ভাষাটি ছাড়া এই সকল ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা সবগুলিই আমাদের কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইতিমধ্যেই গৃহীত হইয়াছে ; এবং এই তালিকায় পুরাতন তামিলের অন্তর্ভুক্তিও নিঃসন্দেহে যথাযথ হইবে কেননা তামিলকমের ছাত্ররা পুরাতন তামিল ভাষা লইতে পছন্দ করিবার সুবিধা পাইবে) ; অথবা (খ) ইংরেজী ব্যতীত অপর কোন আধুনিক ইয়োরোপীয় ভাষা—যেমন, ফরাসী, জার্মান, পর্তুগীজ, স্প্যানিস, ইটালীয়, রাশিয়ান ; (অথবা জাপানী, চীনা, থাই, ইন্দোনেশীয়, বর্মী, আধুনিক আরবীর মতো কোন আধুনিক এশীয় ভাষা ; কিংবা (গ) মাতৃভাষা ব্যতীত কোন একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা (১)—বর্তমানে নেপালী, তুলু এবং মণিপুরী সাহিত্য সহ একাডেমী কর্তৃক স্বীকৃত যে কোন একটি ভাষা।

অহিন্দীভাষী ছাত্রদের উপর হইতে আবশ্যিক হিন্দীর বোঝা তুলিয়া লইয়া ভারতের ঐক্য, ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থার বিপদ এবং বিভেদমূলক সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটানো আমাদের উচিত। আবশ্যিক হিন্দী সময়, শক্তি, অর্থ এবং মানসিক প্রশান্তির অপচয় ছাড়া কিছু নয়। "রাষ্ট্র-ভাষা" রূপে হিন্দীর উপরে যে ভাবাবেগপ্রসূত মূল্য আরোপ করা হয় (এবং ইহাও প্রশ্নাতীত নহে)। তাহা ব্যতীত সংস্কৃত অথবা ইংরেজীর তুলনায় তামিল, বাংলা, গুজরাটী অথবা মারাঠা-ভাষীদের বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত উন্নতির জন্য হিন্দীর কোন প্রয়োজন নাই।

অ-হিন্দীভাষী ছাত্রদের উপর এই শাস্তি চাপানো কেন? জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং সারা ভারত জুড়িয়া কোন কোন হিন্দী-উৎসাহী তাঁহাদের মাতৃভাষা অথবা কথনের ভাষা হিন্দীকে ইংরেজীর স্থানে বসাই-বার স্বপ্ন দেখেন বলিয়াই কি?

এই তো গেল স্কুল এবং কলেজে ভাষার কথা। উচ্চতর পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার জন্য অবশ্যই আমাদের দ্বি-ভাষী হইতে হইবে—মাতৃভাষা এবং ইংরেজী। ইংরেজী ভাষার অপসারণের জন্য এক বৎসর অথবা কোন নির্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত করার সাহস আমি দেখাইব না—কেননা আপতদৃষ্টিতেই বুঝা যায় উহা অর্থহীন এবং নিষ্ফল হইবে। ইংরেজী এবং মাতৃভাষা—বিশাল ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে, যে অবস্থায় আমরা আছি, তাহাতে আমাদের উচ্চতম শিক্ষার ক্ষেত্রে, ইহাই হইবে একমাত্র যুক্তিসংগত পথ। শিক্ষাক্ষেত্রে আমার কয়েকজন প্রখ্যাত সহকর্মী সাধারণভাবে (এবং অস্পষ্টভাবেই) বলেন যে আমাদের উচ্চতম শিক্ষা-ব্যবস্থা হইতে ইংরেজীর অপসারণ এখনই কর্তব্য—অবশ্য তাঁহারা উদারতার সঙ্গে স্বীকার করেন যে ইংরেজী নিশ্চয়ই 'কারিগরীর ভাষা' ('Tool Language') বা "গ্রন্থাগারের ভাষা" (Library Language) ইহার অর্থ জানি না কী রূপে পঠিত হইবে

আমি এই সকল ব্যক্তির মতামতের সশ্রদ্ধ অথচ প্রবল বিরোধী। দুইটি মহা সত্য আমাদের ভুলিলে চলিবে না; (১) আমাদের জাতীয় অহংকারে ইহা আঘাত করিতে পারে (যদিও তা উচিত নয়), তথাপি প্রকৃত সত্য এই যে, উচ্চতম বিজ্ঞানের পঠন ও গবেষণা, যে পঠন ও গবেষণা আমাদের ছাত্রদের উন্নততম অংশেই সীমাবদ্ধ থাকবে, তাহার জন্য কার্য্যকরীভাবে আমাদের আধুনিক কোন ভারতীয় ভাষার ব্যবহার করিতে হইলে বহু বৎসরের সময় লাগিবে। ইংরেজী ইতিমধ্যেই প্রায় এক আন্তর্জাতিক ভাষাতে পরিণত হইয়াছে, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অধিকাংশ ইয়োরোপীয়, ল্যাটিন আমেরিকান এবং এমন কি এশীয় এবং আফ্রিকান দেশগুলির সহায়তায় ইংরেজী আজ সমস্ত উন্নত জাতি এবং বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার ভাষা। (২) ভারত একটি বহু ভাষাভাষী জাতি—যাহার সংহতি-শক্তি হিন্দী নহে, ইংরেজীই। বিজ্ঞান এবং কলার উচ্চতর শিক্ষার মধ্য দিয়া ভারতের জাতীয় সংহতি ইংরেজীর মাধ্যমেই হইতে পারে। ইংরেজী এমন এক আন্তর্জাতিক মান প্রতিষ্ঠিত যাহাতে বর্তমানে আমাদের আধুনিক কোন ভারতীয় ভাষা এখন পৌঁছায় নাই। ভারতের সংস্কৃতিগত এবং রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষার জন্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে উচ্চ আন্তর্জাতিক মান ও তাহার বুদ্ধিবৃত্তি-সংক্রান্ত খ্যাতি অটুট রাখিতে হইলে ভারতীয় ভাষাগুলিকে বিভিন্ন অঞ্চলে সাহায্যকারী ভাষা হিসাবে রাখিয়া উচ্চতর বিশ্ববিদ্যালয় মানের শিক্ষায় ইংরেজীকে বিশাল ভারতীয় ভাষারূপে রাখিতেই হইবে। এবং উহাই হইবে ভারতীয় ভাষাগুলির স্বার্থরক্ষা এবং ভারতীয় ভাষাভাষীদেরও বিশ্বের দরবারে স্বার্থরক্ষা।

অতএব, শাসনকার্য্যে সমরূপতা এবং দক্ষতা—উভয়ই রক্ষা করিতে হইলে এবং ভারতের মতো একটি বহু ভাষাভাষী দেশে বিশৃঙ্খলা দমন করিতে হইলে ইংরেজীর মতো শ্রেষ্ঠতম সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যবিশিষ্ট একটি ভাষাকেই সংযোগ রক্ষাকারী নিরপেক্ষ ভাষারূপে বরণ করিতে পারি, ১৪টি অথবা তাহা হইতেও বেশী "জাতীয় ভাষা" নহে। এতগুলি ভাষাকে বরণ করিলে উহার অবস্থা হইবে বেবেলের মিনারের মতোই।

ইংরেজীর পাশাপাশি কিংবা ইংরেজীর পরিবর্তে হিন্দীর স্থান দিলে একটি মাত্র ভাষাভাষী সম্প্রদায়কে অবশিষ্ট জনসাধারণের উপরে চিরকালের জন্য অসঙ্গত এবং বিশেষ কতগুলি অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হইবে। বিগত কয়েকটি দশকের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহার অর্থ হিন্দী এলাকার ছাত্রদের দুইটি ভাষা—হিন্দী এবং কিছুটা ইংরেজী (এমন কি ঐটুকু ইংরেজীও বাদ দিয়া দেওয়া হইয়াছে), আর, বাংলাভাষী অঞ্চলে চারটি (বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত এবং হিন্দী)। এই অবস্থায় কি আমাদের ছাত্ররা সুখী এবং তৃপ্ত হইতে পারে? আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ইহা কি পিছুটান নহে?

এই অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণকে, মৌন থাকিয়া সর্বদাই এড়াইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু এই যুক্তিসংগত কারণেই ইংরেজী, একমাত্র ইংরেজীই, আমাদের সর্ব-ভারতীয় নিয়োগের পরীক্ষাগুলিতে ব্যবহৃত হওয়ার নিয়ম চালু থাকা উচিত। (অবশিষ্ট ভারতে হিন্দী জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার সুদূর-প্রসারী কুফল) "অ-হিন্দী অঞ্চলে হিন্দীর প্রসার" এবং "হিন্দীর বিকাশের" জন্য অবশিষ্ট ভারত হইতে গৃহীত কোটি টাকার সংশয়পূর্ণ অপচয় সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে চাহি না। আমি শুধু কেন্দ্রে যাঁহারা হিন্দী মূলক নীতি গঠনের জন্য দায়ী তাঁহাদের এই নীতির চরম নিষ্ফলতা এবং অবিচারের বিষয় ভাবিয়া দেখিতে বলি। যে সংহতি এখনও আছে এবং ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী ভারতের পক্ষে যাহা আমাদের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, সেই সংহতিকেই সংহতির নামে সর্ব-ভারতীয় সরকারী অর্থের এই নিষ্ফল অপব্যয়ে নষ্ট করিতে দেখিয়া উত্তর ভারতের একদল ব্যক্তি (অন্যান্য অংশের কতিপয় ব্যক্তিসহ) ছাড়া সমগ্রভাবে ভারতীয় জনসাধারণ এখন ক্ষুব্ধ এবং চঞ্চল। শিক্ষা-জগতে যখন এতসব

জরুরী এবং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার আছে, তখন এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর দাবীকে তুষ্ট করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা এবং শুধুমাত্র হিন্দীভাষী একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সম্ভাব্য চাকুরিতে নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির জাতীয় অপ্রয়োজনীয়তার সম্পর্কে কি গভীর চিন্তা দেখা দিবে না? নিজেদের মাতৃভাষা, ইংরেজী এবং সংস্কৃতের তুলনায় যে ভাষার কোন বুদ্ধিবৃত্তিসংক্রান্ত বা সংস্কৃতিগত কোন মূল্য নাই, কোন মূল্য কখনই থাকিবে না (যদিবা নিজেদের পছন্দ অনুসারে হিন্দী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ হইতে তাহারা না চাহে সেই ভাষা বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ করায় কত কাল সরকারী অর্থের অপচয় করিয়া কত বৎসর বাংলা এবং অন্যান্য প্রদেশের স্কুলের ছাত্ররা বৎসরের পর বৎসর সময় নষ্ট করিতে বাধ্য হইবে?

ইহা ছাড়া, আমি দুশ্চিন্তার সহিত লক্ষ্য করিয়াছি (আমি এই উদ্বিগ্নতার কথা প্রকাশ্যে ব্যক্তও করিয়াছি) যে কোমল-বয়স্ক শিশুদের বাংলা এবং হিন্দীর মতো দুইটি নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত ভাষা একই সময়ে শিক্ষাদান ভাল নয়—উহাতে ঐ সব শিশুর মনে বাংলা হিন্দীর সহিত এবং হিন্দী বাংলার সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে। বাংলা এবং ইংরেজীর মতো মূলতঃ বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে দুইটি ভাষার ভাষাগত সংমিশ্রণ ঘটে না। অধিকন্তু প্রত্যক্ষরূপে এবং পরোক্ষে বা গোপনে গোপনে হিন্দী চাপানোর ফলে বাংলার বিশুদ্ধতা এবং সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বাংলা পত্রপত্রিকায় শংকার সহিত ইহা লক্ষ্য করা গিয়াছে। তাই দেখা যায় বাংলাতে যে সব সংস্কৃত শব্দের নিজস্ব অর্থ রহিয়াছে, সেই সব শব্দের যে অর্থ বর্তমানের হিন্দীর মুখপাত্ররা করিতেছেন তাহাতে স্কুল পাঠরত বাঙালী ছাত্রদের মনে বিভ্রমের সৃষ্টি হইতেছে।

অত্যন্ত মূল্যহীন একটা রাজনৈতিক মতবাদের সপক্ষে এই বিমাতৃসুলভ আচরণ, যাহার ফলে এক মানসিক বিকলতা ও হতাশার ভাব আসিয়া পড়িতেছে, তাহা আর কতকাল চলিতে পারে?

অপ্রয়োজনীয় এবং অনাহূত আগন্তুক হিন্দীকে বাদ দিয়া ইংরেজীর সহায়তায় মাতৃভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষার পূর্ণতম উন্নতি হইতে পারে, সেই শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত করিতে দেওয়াই বা কেন হইবে? হিন্দীর যে ন্যায্য অধিকার তাহার আমি বিরোধী হইতে পারি না। কারণ পঁচিশ বৎসরেরও অধিক কাল রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি ও অন্যান্য সংগঠনের মধ্য দিয়া স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত একটি বিষয়রূপে বাঙালী এবং অন্যান্য অহিন্দীভাষী ছাত্রদের মধ্যে হিন্দী পঠনের প্রসারে আমি সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত। ইহার ফল খুবই ভাল হইয়াছে। একথা সকলে জানেন। কিন্তু আমাদের স্কুল এবং কলেজগুলিতে পাঠরত অহিন্দীভাষী বালক বালিকাদের জন্য আবশ্যিক হিন্দীর আমি তীব্র বিরোধী।

* *

আমি শিক্ষা সম্বন্ধে বলিতেছি। শিক্ষার অর্থ হইল মানুষের সুপ্ত মানসিক বৃত্তিগুলিকে জাগরিত করা। প্রতিরক্ষা অথবা অর্থ-ব্যবস্থার মতোই শিক্ষা সাধারণ শাসন পরিচালনা, পূর্ত্ত ও যানবাহন বিভাগ, খাদ্য অথবা স্বাস্থ্য, এমন কি আইন অথবা পররাষ্ট্র বিভাগ হইতেও অধিকতর বিশিষ্ট ভাবে প্রয়োজনীয়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের সম্মানভাজন শিক্ষাবিদ্ ও চিন্তানায়কদের উপদেশের প্রতি আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত। প্রত্যেকটি কার্য্য অথবা নীতির অগ্রে থাকিবে চিন্তা এবং সেই চিন্তার ভিতরে থাকিবে বাস্তবতা-বোধ। এ বিষয়ে দূরদৃষ্টি না থাকিলে চলিবে না।

জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, এই বিষয়ে উপদেশদানে উপযুক্ত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক উপাচার্য্য যথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুনাথ সরকার, প্রমথ চৌধুরী, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, সি, ভি, রামন, এম্, সি, চাগলা, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, পি, বি গজেন্দ্রগাদ্কর, পি, কোদাণ্ডরাও, কে, এম্ মুন্সী, পি, সুব্বারায়ন, বিধানচন্দ্র রায়, সি, ডি দেশমুখ এবং আরো

বহু সংখ্যক ব্যক্তি—যাঁহারা সকলেই নেতৃস্থানীয় এবং আলোকপ্রদর্শনকারী এবং দেশের মঙ্গল কামনায় বিশ্বস্ততার সহিত আন্তরিক এবং উচ্চতম অভিজ্ঞতার আকর। ইঁহাদিগের দেখান পথ অনুসরণ করাই বিধেয়।

শুধু বাঙ্গালীদেরই নহেন, সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে ভারতীয় আত্মা যে সকল ভাষায় প্রকাশমান সেই সকল ভাষায় আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য প্রেমিকদেরও, এখানে শিক্ষা এবং জীবনে ভাষার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের যে তৃতীয় উদ্ধৃতি দিতেছি তাহা অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত অনুধাবন করা উচিত।

অতএব, বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দী-ভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়ো রকমের মিল হইবে, সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁচে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃকপাতও করিবে না। আমার বেশ মনে আছে, অনেকদিন পূর্বে একজন বিশেষ বুদ্ধিমান্ শিক্ষিত ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, "বাংলা সাহিত্য যতই উন্নতি লাভ করিতেছে ততই তাহা আমাদের জাতীয় মিলনের পক্ষে অন্তরায় হইয়া উঠিতেছে। কারণ এ সাহিত্য যদি শ্রেষ্ঠতা লাভ করে তবে ইহা মরিতে চাহিবে না—এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় ভারতবর্ষে ভাষার ঐক্য-সাধনের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বাধা দিবে বাংলা ভাষা, অতএব বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।" সকল প্রকার ভেদকে ঢেঁকিতে কুঁদিয়া একটা পিণ্ডাকার পদার্থ গড়িয়া তোলাই জাতীয় উন্নতির চরম পরিণাম, তখনকার দিনে ইহাই সকল লোকের মনে জাগিতেছিল। কিন্তু আসল কথা—বিশেষত্ব বিসর্জন করিয়া যে সুবিধা তাহা দু-দিনের ফাঁকি—বিশেষত্বকেই মহত্ত্বে লইয়া গিয়া যে সুবিধা তাহাই সত্য।

("হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়", ১৩১৮, রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, খণ্ড ১৩, পৃঃ ১৮১-৮২)

এই জাতীয় অভিমত আমি নাগরী অক্ষরে হিন্দীর মাধ্যমে ভারতীয় ঐক্যের জন্য যাঁহারা উদ্বিগ্ন সেই সকল ব্যক্তি, যাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দীভাষী, তাঁহাদের স্পষ্ট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বলিতে শুনিয়াছি। সমস্ত ভারতীয় ভাষা, যেমন, আর্য্য, দ্রাবিড়ীয়, তিব্বত-বর্মী এবং কোল অথবা মুণ্ডাভাষীদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য (প্রশ্ন জাগিতে পারে; কোন প্রয়োজন?) এক বিমিশ্র হিন্দীর মতো উদ্ভট বস্তুর কথা বলিবার চপলতাও কাহারো কাহারো মধ্যে দেখা যায়। হিন্দীর গর্ভে নিমজ্জিত করার পথ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ বাংলা এবং ভারতের অন্যান্য ভাষাগুলির 'হিন্দীঅয়ন' করিতে চাহেন। অভিপ্রেত না হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে ভাষা-নীতির রূপায়ন ঐ পথেই যাইতেছে।

কিন্তু সংস্কৃতের পশ্চাদ্‌ভূমি অথবা সংস্কৃতের সাধারণ মঞ্চকে শক্তিশালী করিয়া এবং স্কুলে তিনটি আবশ্যিক বিষয়ের মতো একটি ঐচ্ছিক অথবা নির্বাচনযোগ্য ভাষা-রূপে শিক্ষাদানের মধ্য দিয়াই আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি পরস্পর পরস্পরের কাছাকাছি আসিবে। এই অবস্থায় আমাদের অধিকাংশ ছাত্রই আধুনিক একটি ভারতীয় ভাষা স্বচ্ছন্দে শিক্ষা করিবে।

সাধারণভাবে তাহারা হিন্দীর মতো সংস্কৃতকে নিষ্প্রয়োজনীয় এবং বিরক্তিকর বোধ করিবে না। যে ভাবধারা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নয়, সেই ভাবধারাকে আমরা ঝাড়িয়া ফেলিব কবে? কখন আমাদের দৃষ্টি স্বচ্ছ এবং প্রকৃতিস্থ হইবে এবং সিন্দবাদের সেই বৃদ্ধটি যে শ্বাসরোধ করিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে তাহার কবল হইতে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা কবে মুক্ত হইবে?

সমগ্র ভারতে সাহিত্যক্ষেত্রের অন্যতম নায়ক, প্রমথ

চৌধুরীর এই সুচিন্তিত অভিমত, আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশে সংস্কৃত এবং ইংরেজী উভয়েরই মূল্যায়ন বাংলা ভাষার একজন মহান্ লেখকের সাক্ষ্যরূপে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না :

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, মৃত-ভাষা ও পর-ভাষার প্রভুত্ব থেকে মাতৃভাষাকে আমি মুক্ত ক'রতে চাই ব'লে এ ভুল যেন কেউ না করেন যে, আমি সংস্কৃত ও ইংরেজির পঠন-পাঠন বন্ধ ক'রে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, তা ক'রলে বঙ্গসাহিত্যে ইভলিউশন হওয়া দূরে থাক্, একটা বিষম ও সম্ভবতঃ ভীষণ রিভার্‌শন এসে পড়বে। সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা থেকেই আমরা সেই মনের বল ও হাতের কৌশল লাভ ক'রবো যা আমাদের সাহিত্যের মুক্তির কারণ হবে।···

···সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের সম্যক্ চর্চা আমাদের চিরদিনই ক'রতে হবে। বলা বাহুল্য, পৃথিবীর অসংখ্য মৃত-ভাষার মধ্যে গ্রীক, লাটিন, ও সংস্কৃত, এই তিনটি আর্য্যভাষাই ক্লাসিক. অপর কোনোটিই নয়।··· এই তিনটি ক্লাসিকের মহা গুণ এই যে, তার প্রত্যেকটিই পুরুষালি সাহিত্য, মেয়েলি নয়; সে সাহিত্যে আধআধ ভাষ কিংবা গদগদ ভাবের স্থান নেই; সে সাহিত্য যেখানে কোমল সেখানে দুর্ব্বল নয়, যেখানে সানুরাগ সেখানে সানুনাসিক নয়। এ কারণেও সংস্কৃতের চর্চা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং অবশ্য-কর্ত্তব্য, কেননা বাংলার বাণীর কান্তা-সম্মিত হ'য়ে পড়বার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক এবং রোখ আছে।

···আজকের দিনে ইংরেজির চর্চা ত্যাগ ক'রলে বিশ্বমানবের বিদ্যালয়ে প্রবেশদ্বার স্বহস্তে বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে। বাংলা আমাদের শিক্ষার প্রধান ভাষা হ'লে ইংরেজি বাণী আর প্রভু-সম্মিত থাকবে না, সুহৃৎ-সম্মিত হ'য়ে উঠবে; প্রভু তখন যথার্থ সখা হ'য়ে উঠবে।···

("বাংলার ভবিষ্যৎ", অগ্রহায়ণ ১৩২৪, মির্জ্জাপুর ফিনিক্স ইউনিয়ন লাইব্রেরিতে পঠিত; দ্রষ্টব্য—প্রবন্ধসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৯৫৯ সালের পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ৯৯, ১০০, ১০১)

আমাদের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃতির প্রতি যথেষ্ট ব্যাকুলতা দেখান। ভারত এবং পৃথিবীর নিকট সংস্কৃতের মূল্য আমরা সকলেই জানি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সংস্কৃত সম্বন্ধে যে উচ্চ আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা আমাদের স্মরণে আছে। আমাদের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের অধীনে পূর্ণাঙ্গ এক সংস্কৃত-দপ্তর রহিয়াছে। সংস্কৃত পঠন-পাঠনের জন্য তাঁহারা কিছু অর্থও ব্যয় করিয়া থাকেন। অথচ, জাতীয় সাংস্কৃতিক সংহতির একটি হাতিয়ার হিসাবে সংস্কৃতকে সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্রের নিকট উপস্থিত করার উদ্দেশ্যে (আবশ্যিক বিষয় হিসাবে তাহাদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার জন্য নহে), যে পাঠক্রম নির্দিষ্ট করা হইয়াছে (সরকারী তিন ভাষা ফর্মুলারূপে) তাহাতে সংস্কৃতকে (অথবা সমতুল্য ক্লাসিক্যাল ভাষাকে) নিষিদ্ধই করা হইতেছে। এই ব্যাপারে, হিন্দী সংস্কৃতের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে, যদিও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় সংস্কৃতের যে গঠন করিবার শক্তি আছে, চরিত্র সৃষ্টি করা অথবা জ্ঞান-দান বা মন গড়িয়া তোলার ক্ষমতা আছে, হিন্দীতে তাহার কিছুই নাই। আমরা স্কুলে যে সামান্য কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক এবং সাধারণ উদ্ধৃতি শিক্ষালাভ করিয়া থাকি সেগুলি চিন্তা-সম্পদ এবং প্রসাদগুণে আমাদের চিরকালের সম্পদ হইয়া দাঁড়ায়। সারা জীবন উহা হইতে পাঠ লইয়া আমরা শক্তি অর্জন করি এবং উহা আমাদের চিত্তকেও সৌন্দর্য্য এবং সুঘ্রাণে আপ্লুত করিয়া রাখে।

সেই "অপরিবর্ত্তনীয়" (কোন কোন ভগবৎ প্রেরিত এবং পূতধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের মতো) ও পবিত্র "তিন ভাষা ফরমুলা"র অযৌক্তিক অন্ধনীতি এই পথে প্রবল বাধা। সংস্কৃতের আন্তর্জাতিক মূল্য এবং ভারতীয় মন এবং আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে সংস্কৃতের দান নির্দেশ করিতে গিয়া চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী

সূত্রের আকারে যথার্থই বলিয়াছেন যে, "পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে আমাদের প্রাচীনত্বের প্রতীক হইল সংস্কৃত।" সংস্কৃতের দুইজন রুশ পণ্ডিত পৃথিবীর নিকট ভারতের পক্ষে সংস্কৃতের মূল্য ঘোষণা করিয়াছেন এইভাবে : "সংস্কৃত গ্রন্থন শক্তির অসামান্য কাজ করিতেছে। সংস্কৃতকে বাদ দিয়া ভারত সম্বন্ধে চিন্তাই করা যায় না। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের ঐক্যের বনিয়াদ গড়িয়া তুলিয়াছে এবং উহার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে সংস্কৃত।" (সোভিয়েট একাডেমী অব্ সায়েন্সেস্, ইন্‌স্টিটিউট অব্ দি পিপল্‌স্ অব্ এশিয়া, নাউকা পাবলিশার্স, মস্কো, ইউ, এস্, এস, আর, ১৯৬৮ : ভি, ভি, আইভানভ্ এবং ভি, এন্, টপোরভ্ লিখিত "সংস্কৃত", পৃঃ ২৬, ২৭)

ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠির খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য আমরা যেন আমাদের মহান উত্তরাধিকার বলি না দিই। কেননা উহার ফলে আমাদের স্কুল এবং কলেজের তরুণেরা তাহাদের জাতীয় ঐশ্বর্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবে এবং "ভারতীয় জাতি" হিসাবে আমাদের সত্তা এবং আত্মার বিনাশ ঘটিবে।

* * *

অসংখ্য বিষয় এবং অসংখ্য পাঠ্যপুস্তকের ভারে স্কুলে পাঠরত আমাদের শিশুরা দৈহিক এবং সামাজিক উভয় দিক হইতেই ভারাক্রান্ত। এই বোঝার হাত হইতে তাহাদের মুক্তি দিতে হইবে। শিক্ষার কর্মসূচীর কোন কোন নির্দেশনামায় স্কুলে যাওয়ার বয়সে বিজ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয়ে অতিরিক্তি বিশেষায়ন সম্বন্ধে কোন কোন মহলে সচেতন বা অচেতনভাবে একটা উদ্বিগ্নতা আছে বলিয়া মনে হয়।

আমরা প্রায়ই পাতার আড়ালে গাছটিকে লক্ষ্য করি না। কিংবা বৃক্ষটিকেই দেখি, অরণ্যের কথা ভুলিয়া যাই। মূলগত বিষয়গুলিতে বড় বড় এবং সাধারণ রূপরেখায় দৃঢ়ভিত্তিক শিক্ষাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। যেমন, পাটিগণিত, বীজগণিত এবং জ্যামিতি ত্রি-শাখায় গণিতশাস্ত্র; ভূগোল এবং ইতিহাস (স্বদেশ এবং বিশ্ব ইতিহাসের মূল স্রোতগুলি); প্রাথমিক বিজ্ঞান (কোন নির্দিষ্ট বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান নহে, সামাজিক মানুষ হিসাবে জীবনের অধিকাংশ নির্বাহ করিতে পারে এইরূপ যথেষ্ট সাধারণ জ্ঞান, তৎসহ অর্থনীতি ও শাসন-ব্যবস্থার মৌলিক ধারণাগুলি); এবং দুইটি ভাষাও, প্রথমতঃ মাতৃভাষা এবং ইংরেজী (বিশেষ করিয়া যাহারা কলেজীয় শিক্ষার স্তরে এবং তদূর্দ্ধ যাইতে চাহে তাহাদের জন্য) তৎসহ নির্ব্বাচনযোগ্য তৃতীয় একটি ভাষা (উন্নত কোন দেশে তৃতীয় ভাষা কখনও বোঝাস্বরূপ বলিয়া দেখা যায় নাই), যাহা হইবে একটি ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা কিংবা কোন এক আধুনিক ভাষা।

* * *

আমি এত কথা বলিলাম কারণ আমি মনে করি পৃথিবী হইতে বিদায় লইবার আগে আমার সব কথার পুনর্ঘোষণা করা উচিত। শিক্ষা এবং রাজনীতিতে ভাষার প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে তখন হইতেই আমি খোলাখুলি ভাবে এবং প্রকাশ্যে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া আসিতেছি। এই ভাষার প্রশ্ন আজ একটি অসমঞ্জসরূপে বৃহৎ প্রশ্ন তথা জাতীয় সমস্যায় পরিণত হইয়াছে, যদিও এই প্রশ্ন উত্থাপনের কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমি যাহা বলিতেছি তাহা আমাদের ছাত্র এবং তরুণদের সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ হইতে বলিতেছি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয় হইতেই বলিতেছি। অর্দ্ধ শতাব্দী কালেরও অধিক ধরিয়া যাঁহার বৃত্তি শিক্ষা, যিনি তাঁহার বৃত্তি ও আদর্শের জন্য গৌরব অনুভব করেন, আমিও তাঁহারই মত শিক্ষার সকল স্তরে, শিক্ষকমণ্ডলীর সহিত, সাফল্যে এবং ব্যর্থতায়, সেবাকর্মের সহকর্মী এবং সহকর্মী। এখনও উচ্চ আদর্শপরায়ণ শিক্ষকের অভাব নাই, যাঁহাদের নীরব লাঞ্ছনাভোগ গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতির সহিত আমি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি। বুভুক্ষার প্রান্তে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের প্রতি যে ঘৃণা এবং অবহেলা করিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়াও, তাঁহারা তাঁহাদের শির উচ্চে রাখিতে চাহেন, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার উচ্চমান ক্ষুণ্ণ হইতে দেন না। তাঁহারা নিঃসন্দেহে সম্মানার্হ। তাঁহাদেরই

প্রাচীনতমের অন্যতম হিসাবে আমি আমার আশীর্ব্বাদ, মঙ্গলকামনা এবং সশ্রদ্ধ প্রণাম তাঁহাদের জ্ঞাপন করিতেছি।

কিন্তু অধুনা তাঁহাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক অবজ্ঞাপূর্ণভাবে শিক্ষক-বৃত্তি গ্রহণ করিতেছেন দেখিয়া আমি গভীর বেদনা বোধ করি। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন প্রথমতঃ তিনি রাজনৈতিক দলের সদস্য, পরে একজন শিক্ষক। তাঁহাদের মধ্যে অন্যান্য বহু সংখ্যক মনে করেন শিক্ষক হইলেই বুঝি আর ছাত্র থাকা চলিবে না। কিন্তু শিক্ষক তখনই ভালো শিক্ষক হইতে পারেন, যখন তিনি সারা জীবন ছাত্রও থাকেন এবং তাঁহার পবিত্র কর্ত্তব্যকে গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করেন। যিনি নিছক পরীক্ষা গ্রহণের কেন্দ্র (শিক্ষাদানও হইত, তবে পরোক্ষভাবে "অনুমোদিত" স্কুল এবং কলেজের মাধ্যমে) হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে, শিক্ষাদানের এবং গবেষণার একটি কেন্দ্রে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন, যিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাঁহার মাতৃভাষা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির যথাযথ স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন—সেই প্রখ্যাত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমি যখন আজ হইতে ৫৪ বৎসর পূর্বে আমার শিক্ষকতা জীবনের সুরু করি তখন যে সাধু উপদেশ আমাকে দিয়াছিলেন উহার জন্য আমি সেই মহাপুরুষের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। ১৯১৩ সালে ইংরেজীতে আমি এম্-এ পাশ করি। ১৯১৪ সালে স্যার আশুতোষ আমাকে ডাকাইয়া ইংরেজী বিষয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট অধ্যাপনার জন্য যে নূতন বিভাগটি খোলা হইয়াছিল উহাতে এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হইতে বলেন।

আমি বেশ কিছুটা কম্পন অনুভব করিলাম এবং কিছুটা ইতঃস্ততভাবও। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রীতিবহির্ভূত এবং স্নেহশীলভঙ্গীতে আমার পৃষ্ঠে চাপড় মারিয়া বলিলেন: "ভয় করিও না। তোমাদের ইংরেজ শিক্ষকেরা তাঁহাদের আপন ভাষা তোমাদের শিক্ষাদানের জন্য কতটুকু বিদ্যা লইয়া এদেশে আসেন? পরই প্রকৃত শিক্ষালাভের সুরু হয়?" আমি এই বিজ্ঞ পরামর্শ অনুসরণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং এই জন্য আমি স্যার আশুতোষের নিকট চির কৃতজ্ঞ। আমার ছাত্রদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ, কেননা তাঁহারা আমাকে সকল সময়ে আরো জ্ঞান অর্জন করিবার অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছেন। স্কুলে, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনায় আমার সহকর্মীবৃন্দকেও আমি এই উপদেশই দিব—সর্বদাই অধ্যয়ন করিবেন, আরো অধ্যয়ন, আরো বেশ অধ্যয়ন করিবেন। যাহা অধ্যয়ন করিবেন তাহা যেন পরিপাক করিতে পারেন এবং প্রত্যেক জিনিষই বুদ্ধির পরীক্ষায় যাচাই করিয়া লইবেন। আপনার অধীনে যাঁহারা রহিয়াছেন তাঁহাদের অসুবিধাগুলি অনুধাবন করিতে সচেষ্ট থাকিবেন; সর্বদাই নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করিবেন। কিন্তু উহা পূরণ করিবার কথা ভুলিবেন না এবং ক্লাসেই হোক বা প্রশ্নপত্রেই হোক, নিজে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়া আপনাদের ছাত্রদের কোন কিছু বুঝাইতে যাইবেন না। প্রশ্নও করিবেন না।

দলীয় রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী বিষয় ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়কেই তাঁহাদের প্রকৃত বৃত্তি এবং কর্ম হইতে বিকর্ষিত করে। জাতীয় সমস্যা এবং মানব-কল্যাণ বিষয়ক বড় বড় সমস্যা না দেখিয়া কেবলমাত্র দলীয় দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ না করাতে, আমার মনে হয় আমাদের শিক্ষকদের এক সচল বিশ্বাস হওয়া উচিত, কারণ এই ধরণের রাজনীতি আদর্শের অবনয়ন করে, কোন ভালই করে না। আপনি আচরি' ধর্ম আন কে শিখায়—ক্ষমতা সীমবদ্ধ হইলেও আদর্শ যেন নক্ষত্রের মতো আকাশসংলগ্ন হয়। ইহা সামান্য শিক্ষকের মহান্ আদর্শ হইতে পারে। ছাত্রদের নিকট সবচেয়ে সুন্দর পথপ্রদর্শক হওয়া উচিত শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন। এই বোধ শিক্ষককে তাঁহার আচরণ এবং ব্যবহারে আরো বেশি দায়িত্বশীল করিয়া তুলিবে।

সর্বোপরি মনে রাখা দরকার, ভালবাসা পাওয়া যায় ভালবাসিতে পারিলেই।

যদি সত্যই অনুরক্ত হ'ন, তবে অনায়াসে আপনারা বিস্ময়কর কাজ করিতে পারিবেন, এবং অন্তরে কৃতজ্ঞ থাকিবেন। ইহাই জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

* * *

আমাদের ছাত্রদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি কি ভাবি সেই কথা বলিয়া আমি আমার এই ভাষণ শেষ করিব। অবশ্য কোন কোন শিক্ষক এবং অধ্যাপকের পেশাই হইয়া দাঁড়ায় উপদেশ বর্ষণ এবং আত্মমত প্রচার। কিন্তু বর্ত্তমান সমাবর্ত্তনী ভাষণদানের জন্য এক বিশেষ অধিকার আমার আছে। আশা করি আপনারা এই কারণে আমাকে ক্ষমা করিবেন।

আমি সর্ব্বদাই আমাদের ছাত্রদের, বিশেষতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই কথাই হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাহি যে, শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলিয়া গর্ব্ব যখন তাহাদের আছে, তখন সকল কিছুর উর্দ্ধে সেই সম্মানবোধ ছাত্রদের রাখিতে হইবে, সর্ব্বদাই তাহারা যেন কতকগুলি জিনিষকে পবিত্র বলিয়া স্বীকৃতি দেন। আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অবশ্য প্রায়ই ইহা দেখা যায় না, যদিও তাঁহারাও ভদ্রলোক। প্রথমতঃ সত্যকে যেন তাঁহারা সকল সময়ে, যে কোন মূল্যে, আঁকড়াইয়া থাকেন। নিজেদের জীবনেও এই "খেলার নিয়ম" মানিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদের সমধর্ম্মী মানুষ এবং নিজেদের প্রতি তাহাদের সৎ থাকিতে হইবে। কথায় এবং আচরণে তাঁহারা যেন ভুলিয়া না যান যে, তাহারা এক মহান্ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এবং বাহক। ইহার পরে আসে বুদ্ধিজীবি হিসাবে তাহাদের দায়িত্ব। নিজেদের নিকট নিজ অনুচরদের নিকট, সমাজের নিকট এবং জনসাধারণের প্রতি তাহাদের এক মহান্ আত্মিক কর্ত্তব্য রহিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাদের করিতে হইবে, বিভিন্ন বিষয়ে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিসঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই। আবেগ এবং ভাবালুতা বড় এবং ভালো জিনিষ হইলেও আমাদের উচ্চতর জীবনে উহা কার্য্যকরী এবং ফলপ্রসূ করিতে হইলে বুদ্ধিবৃত্তির সহিত উহাদের মিলন ঘটাইতে হইবে। সর্ব্বোপরি, ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপ যেন পরহিতব্রত, মানুষের সেবার মনোভাব—"নিজের আগে অন্যের সেবা", রোটারিয়ানদিগের যাহা আদর্শ—সেই আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ নয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে যাহারা আছে তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসিয়া এই আদর্শ রূপায়নের বহু উপায় আছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষায় তাহারা যেন যত্নবান হন। ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা রক্ষা এবং যথাযথ আচরণ যেন তাহাদের মূলগত চিন্তার বিষয় হয়।

পরিশেষে, প্রাচীন ভারতের এই মহান্ আদর্শ, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যাহা সংস্কৃতিবান গ্রীকদূত, হেলিওডোরসকে মুগ্ধ করিয়াছিল, সেই আদর্শের কথা বলিব। সেই আদর্শ হইল দম বা আত্ম-সংযম ; ত্যাগ অর্থাৎ প্রথমতঃ সমাজের কল্যাণে, আদর্শের জন্য যাহা চিরস্থায়ী নহে তাহাকে বর্জ্জন করা, অপ্রমাদ অর্থাৎ মন এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বচ্ছ, সতর্ক এবং চির ভাস্বর করিয়া রাখা যাহাতে যুক্তি এবং বুদ্ধির দ্বারা অপরীক্ষিত এবং বহিঃশক্তির দ্বারা আরোপিত ভাবপ্রবণতা, অনুভূতি এবং আদর্শের দ্বারা উহা মেঘাচ্ছন্ন না হয়।

আমি শুধু আপনাদের জন্য সৎকর্ম এবং সেবাময় জীবনই প্রার্থনা করিতে পারি, সেই জীবনে ভাগ্য যেন আপনাদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন এবং আপনারা সকলকাম হন। এক মহান্ দেশের নাগরিক হিসাবে মানবজাতির মহা মূল্যবান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী রূপে, আপনাদের আপন জন, আপন জাতি এবং মানবজাতির প্রতি আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আপনারা যেন সুখী হন এবং ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ সন্তোষ লাভ করেন।

তেজস্‌ভি নাভ অধিতম্ অস্তু
মা বিদ্বিষবহাই :

"শিক্ষক এবং ছাত্র আমাদের উভয়েরই জ্ঞানানুশীলন যেন তেজস্বী হয় এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে যেন কোন ভুল বুঝাবুঝি বা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ না জন্মায়।"

ভিন্ন স্রোত

(গল্প)

সন্তোষকুমার ঘোষ

আবার একটা চিঠি দিয়েছে চণ্ডী। দিন দশেকের মধ্যে দু'খানা চিঠি। কাঁচা হাতের টেরাবাঁকা হরফের লেখা। কাকে দিয়ে লিখিয়েছে কে জানে। হরিশ পণ্ডিত বহুকষ্টে পাঠ উদ্ধার করলে। দুটো চিঠির বয়ানই ধরতে গেলে একই ধরণের।—চিঠি পেয়েই আমারে নিতে এসো বাবা। একটা দিনের তরেও দেরি ক'রো নি—লক্ষ্মীটি। গেল বছরে বড় পুজোর সময়ে এ চুলোয় ছেনু। তার আগের বছরেও তাই। এবারও এরা যেতে দিবে নি বাবা। না—কইছে। পালিয়ে যাব বলেছি বলে—কী মার মারতে লেগেছে। দু'চার দিনের ভিতরে এসে পড়ো ভালই—নইলে আমি একাই সোনামুখীতে চলে যাব।

বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে কালীচরণ। সন্ধ্যার আগে দাওয়ায় বসে হুঁকো টানতে টানতে অনেক কিছু ভাবছে তাই।—কাল সকালেই মেয়ের বাড়ী রওনা হবে—না পঞ্চুর কথামত সকাল সকাল দু'টি খেয়ে নিয়ে ওদের সঙ্গে ইষ্টিশনে গিয়ে কোলকাতা যাবার গাড়ীতেই চড়ে বসবে। ভেবে ঠিক করতে পারছে না কালীচরণ। মহালয়া হয়ে গেছে। পরশু ষষ্ঠী। রায়বাবুদের বাড়ীর পুজোর পাট উঠে গেছে গত বছর থেকেই। এবার তাই ওরা কোলকাতার বাজাতে যাবে ঠিক করেছে। পঞ্চুর ভায়রাভাই ভরসা দিয়েছে। শহরে বারোয়ারী পুজোয় বাজালে নাকি মোটা টাকা মেলে। এদিকে মেয়ের ওই চিঠি! চণ্ডীর ধাত-মেজাজ তো আর কালীচরণের অজানা নয়। হুট্ বলতেই—পালান স্বভাব। নিতান্ত ছোটটি আর নেই। সময়ে ছেলেপুলে হলে কবে মা হয়ে যেত। এবার পালিয়ে এলে—বলবার কইবার আর মুখ থাকবে না। শাশুড়ী তো ক্ষেপেই আছে—জামাই সুবলও বেগড়াবে নিশ্চয়ই। হয়ত ঘরেই নেবে না আর! মহাজ্বালা হয়েছে কালীচরণের। একরত্তি বয়েস থেকে আজ পর্যন্ত একই ধরণের আছে চণ্ডী। একটুও পাল্টায় নি। ওর মনের গড়ন যেন কেমনতর। মেয়েমানুষের স্বভাবধর্মের সঙ্গে কোথাও যেন মিল নেই। ছোট বেলা থেকেই ঘরেদোরে মন বসে না চণ্ডীর। সারাক্ষণই বাইরে বাইরে ঘোরা স্বভাব ছিল ওর। হাঁক পেড়ে পেড়ে গলা ফেড়ে গেলেও মেয়ের সাড়া মিলতো না। হয়—দূরে কোথাও সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে ডাং-গুলি খেলতো তখন—নয়ত বনে-বাদাড়ে ফলসা-নোনা বৈঁচি আঁশফল যা হ'ক কিছু খুঁজে খুঁজে বেড়াতো। দুপুর গড়িয়ে গেছে হয়ত। মেয়ের পেটে ভাত পড়ে নি। ঘরে ফেরার নামও নেই। খোঁজ খোঁজ! শেষে হয়ত জানা গেল—মেয়ে জেলে দুলেদের সঙ্গে জুটে মাঠপারে বিল ছেঁচতে গেছে। কেমন যেন পাগলী একধরণের! তেমনি পাগল হয়ে উঠতো মেয়ে ঢোলকাঁসির বোল শুনলে। বাজাতে পেলে তো কথাই ছিল না। একেবারে ত্রিভুবন ভুলে যেতো। বাজনদারের মেয়ে। জন্ম থেকেই ঢাক-কাঁসির বোল শুনতো তো? বাপের সঙ্গে বাজিয়ে বাজিয়ে হাতও বেশ পাকিয়ে ছিল। শুধু রায়বাবুদের বাড়িতে নয়—বুড় শিবতলাতেও কতদিন ও বাপের ঢাকের সঙ্গে দিব্যি তাল দিয়ে দিয়ে কাঁসি বাজিয়েছে। অতটুকু মেয়ের তালজ্ঞান দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত। আজও বাজনার নামে—পুজোপার্বণের নামে মেতে ওঠে মেয়ে। আপসোস করে কালীচরণ। এর চেয়ে ভগবান ওকে পুরোপুরি পুরুষ করে গড়লেই পারতেন। পাড়ার সব গিন্নী মায়েদের মত কালীচরণও কিন্তু ভেবেছিল—সিঁথের সিঁদুর ছোঁয়ালেই আর মুখের উপর ঘোমটার ঘের পড়লেই

—মেয়ের মতিগতি আপনা থেকেই পাল্টে যাবে। কিন্তু তা আর হল কই? বিয়ের পর সাত আট বছর তো কেটে গেল। স্বভাবের স্রোত সেই আগের মতই একটানা উজানে বইছে। এই ক'বছরের মধ্যে যতবারই সুবল নিয়ে গেছে চণ্ডীকে—ততবারই ও সুবলদের ওখান থেকে পালিয়ে এসেছে। সোয়ামী আর শাশুড়ীর কাছে মাসখানেকও ওর মন বসে কিনা সন্দেহ! এবারই যা—কি ভাগ্যিস একনাগাড়ে মাসচারেক হ'ল রয়েছে। না হ'লে—সকাল নেই—দুপুর নেই—রাতবিরেত নেই—দিনক্ষণেরও বালাই নেই কোন রকম। হুট ক'রে একা এক কাপড়েই হঠাৎ এসে হাজির হয় চণ্ডী। পাখীপড়ানোর মত করে কত বুঝিয়েছে কালীচরণ। রাগের মাথায় ঠাস্ ঠাস্ করে চড়িয়ে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ী থেকে সদ্য পালিয়ে-আসা মেয়েকে ঘরে-দাওয়ায় উঠতে দেয় নি কালীচরণ। —খেতেও দেয় নি এক আধ দিন। মা মরা মেয়ে ব'লে কোন রকম মায়া দয়া করে নি। কিছুতেই কিছু নয়। চণ্ডীর স্বভাবের সেই বিপরীতমুখী স্রোতকে কিছুতেই ফেরাতে পারে নি কালীচরণ।

আবার পালিয়ে আসবে বলে লিখেছে চণ্ডী। কি মেয়েরে বাবা! ভরাভর্তি আঠার বছর বয়েস হ'ল—আর কবে যে মতিগতি ফিরবে ওর—তা ভেবে পেলে না কালীচরণ। আর এই পালানোর পালা কি আজ শুরু হয়েছে। বিয়ের পর সেই প্রথম যেবার সুবলদের ওখানে ঘর করতে যায়—সেই থেকেই পালান শুরু হয়েছে। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কালীচরণের চোখের সামনে বছর সাতেক আগের একটি দৃশ্যপট ফুটে উঠল।—

তাড়াতাড়ি ঘরে তালাচাবি লাগিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে কালীচরণ। একা নয় ঠিক। পিঠে ওর জীবিকার যোগানদার জয়ঢাকটিও আছে। রায়বাবুদের বাড়ী শ্যামাপুজো। বাজাতে চলেছে তাই। জোড়া ঢাকই যায় ফি বছর। ওদের পাড়ার পঞ্চুই আর একটা ঢাক বাজায় ওর সঙ্গে। কাঁসি বাজায় পঞ্চুর ভাগে হারু। তারা খানিক আগে হাঁক দিয়ে এগিয়ে চলে গেছে। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি চলছে। সূর্য পাটে নামে-নামে। দেখতে দেখতে তালগাছের মাথার রোদটুকু মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসবে। পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে জোর কদমে তাই এগিয়ে চলেছে কালীচরণ। বাঁ পাশে শ্মশান। শ্মশানের ধার দিয়ে সরু একটা পথ আছে। এদিক দিয়ে হাঁটে না কেউ বড় একটা। তাড়াতাড়ি পৌঁছবে বলে এ পথই ধরেছে কালীচরণ। চলতে চলতে অল্পদূরে অশথ তলাটার কাছে ও যেন হটাৎ ভুত দেখতে পেলে। তিন কুড়ির উপর বয়েস হল। দূরের দিকে আর তেমন নজর ছোটে না ওর। কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা দেখে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কালীচরণ। খড়কে-ডুরে শাড়ী-পরা কে একটা মেয়ে হন্‌হন্ করে এগিয়ে আসছে না! চলার ধরণটা যেন বড় চেনা-চেনা। মেয়েটা খানিকটা কাছাকাছি হতেই সচকিতকণ্ঠে কালীচরণ চেঁচিয়ে উঠল—কে রে!

বাপের গলার আওয়াজ পেয়েই একগাল হেসে চণ্ডী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে—আমি গো বাবা।

শুধু অপ্রত্যাশিত নয়। অভাবনীয়ও বটে। শ্মশানের কাছে এমন অসময়ে মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে কালীচরণ স্তম্ভিত হয়ে গেল। অভাবনীয় ব্যাপার বই কি! চণ্ডী স্বামীর ঘর করতে গেছে পুরো একমাসও হয়নি তখনো। দুর্গাপুজোয় শহরে নাকি ভারি জাঁক। সুবল নিতে এসেছিল তাই চণ্ডীকে। কিছুতেই যাবে না চণ্ডী। গোঁ ধরে বেঁকে বসেছিল মেয়ে। ষষ্ঠীর আগের দিন রায়বাবুদের বাড়িতে বাজাতে যাবার আগে কত সাধ্য-সাধনা করে—কত ক'রে বুঝিয়ে—ভুলিয়েভালিয়ে তবে চণ্ডীকে সুবলের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেই মেয়েকে হঠাৎ শ্মশানের কাছে সামনাসামনি দেখে কালীচরণ শুধু স্তম্ভিতই হল না—একেবারে হতবাক হয়ে গেল। সুবলদের ওখান থেকে চণ্ডী পালিয়েই এসেছে তা হ'লে! কিন্তু একা এল কি ক'রে তা ভেবে পেলে না কালীচরণ। শ্বশুরবাড়ী ওর নিতান্ত কাছেপিঠে নয়। ধরতে গেলে একবেলার পথ। রেলগাড়ী চড়তে তো হয়ই। তাছাড়া কথায় বলে একানদী বিশ ক্রোশ—সেই নদীও পার হতে হয়। নদী পেরিয়ে হাঁটা-পথটুকুও বড় কম নয়। এগার পেরিয়ে সবে বার বছরে পা দিয়েছে চণ্ডী। বলিহারি বুকের পাটা মেয়ের!

তুমি তো বাজাবার লেগে বাবুদের বাড়ী চলছো বাবা —দাঁড়ালে ক্যানে? চলো—আমিও যাব তোমার সাথে।'—সঙ্কোচহীন অতি স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর মেয়ের। অভাবনীয় কিছুই ঘটে নি যেন।

কেমন করে যে মেয়ে এখানে এসে হাজির হল—সে ভাবনাকে ছাপিয়ে কালীচরণের মনের উপর মুহূর্তের মধ্যে আর এক গুরুভাবনা ভর করল। স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি ভাবতে লাগল কালীচরণ।—হ'ক ছেলে মানুষ। বিয়ে হয়েছে। একজনদের ঘরের বউ এখন তো বটে। তাদের সংসারকেই এখন আপনার বলে ভাবতে হবে বই কি? একা পালিয়ে এসেছে এখানে। জামাই আর ওর শাশুড়ী খোঁজাখুঁজি করবে নিশ্চয়ই। কি ভাববে তারা—কে জানে!

'আঃ, দাঁড়িয়ে রইলে ক্যানে?—এখানেই রোদ পড়ে গেল। দেখো দিকি গাছপিনে চেয়ে। সন্ধ্যের আগে পৌছবে কি করে?' বলতে বলতে মেয়ে এগিয়ে এসে বাপের হাত ধ'রে আগ্রহভরে বার দুই টান দিলে।

মেয়ের আগ্রহব্যাকুল কণ্ঠস্বর শুনে কালীচরণের যেন সংবিৎ ফিরে এল। ভাবলে—যা হবার, তা তো হয়েছেই। চারা নেই আর তার। শ্যামাপুজোর দুটো দিন তো কাটুক কোন রকমে। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে চণ্ডীকে সুবলদের ওখানে রেখে এলেই হবে। বেয়ানের কাছে হাত জোড় করে অনুরোধ করবে। জামাই ছেলে-মানুষ হ'ক। তাকেও বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলতে হবে বই কি? মা-মরা মেয়ে। তার বয়েস তো ওই। বুদ্ধিশুদ্ধি নিতান্তই কাঁচা এখন। না হ'লে--মেয়েছেলে হয়ে সোয়ামীর ঘর ছেড়ে কেউ কি কখনো পালায়? যেমন করেই হ'ক—বোঝাতে হবে ওদের। উপায় কি আছে আর। ভাবতে ভাবতে একটা যেন কিনারা পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হল কালীচরণ।

বাবুদের ওখিনে এক কাপড়ে ক্যামুন ক'রে যাবি বল দিকি মা? ঘরকে চল।—দেখি প্যাটরার ভিতরে যদি তোর একখানা ছেঁড়াখোঁড়া কাপড় থাকে।'—কথাটা বলেই কালীচরণ আবার বাড়ীর দিকেই পা বাড়াতে যাচ্ছিল।

বাপের হাত ধরে চণ্ডী আবার টান দিলে। ভ্রূভঙ্গী করে বললে—না না, তাহলে যেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে বাবা। ওখিনে বড় মা-ঠানের কাছে মাগলেই—যা হ'ক একখানা পরতে দেবে। আর কাপড়খানা অমনি পাওনা হয়ে যাবে বেশ।—বলতে বলতে চণ্ডীর মুখচোখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল।

তা কথাটা মন্দ বলেনি মেয়ে। সেই ভাল। বাপ-বেটীতে হাঁটতে শুরু করল।

পথের দুধারে প্রথম-হেমন্তের ধানক্ষেত। স্বর্ণ সম্ভাবনায় ভরা। ঐশ্বর্য্যের ভারে ধানগাছের মাথাগুলো নুইয়ে নুইয়ে পড়ছে। বাপের আগে আগে মেয়ে হাঁটছে। হাঁটছে না ঠিক। পথের উপর দিয়ে যেন প্রাণোচ্ছল দেহের অপরূপ ছন্দ রচনা করতে করতে এগিয়ে চলেছে। আশ্চর্য মেয়ে! ক্লান্তি নেই—অবসাদ নেই একটুও। কে বলবে—এই মেয়ে পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরের শ্বশুরবাড়ী থেকে সদ্য পালিয়ে এসেছে। চলছে আর মাঝে মাঝে ধানের শীষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে কী এক ধরণের অনির্বচনীয়তার স্বাদ নিচ্ছে যেন। ডাঙার দুর্ভোগ এড়িয়ে জলের মাছ যেন সদ্য জলে এসে পড়েছে। নতুন করে প্রাণ পেয়েছে যেন।

দুর্গাপুজোর ক'দিন বাপের মনটাও বড় খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরিবার গত হওয়া অবধি দুর্গাপুজোর কদিন মেয়েও ওর সঙ্গে রায়বাবুদের বাড়ীতেই থাকে। এবারই যা ছিল না। ক'দিন হ'ল বাপের মনটা যেন জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্নের আকাশের মত খাঁ খাঁ করছিল। মেয়ে যেন শ্যাম-সজল ছায়া সঙ্গে নিয়ে এসেছে। চলতে চলতে কালীচরণ ফস্ করে জিজ্ঞাসা করলে—শহরে তো পুজোআচ্চার ভারি জাঁক হয়—কয়রে শুনি। তা ঠাকুর ক্যামন দেখলি মা? পিরতিমে ক্যামুনতর বল দিকি?

বাপের দিকে মুখ ফিরিয়ে অবজ্ঞামিশ্রিত কণ্ঠে মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললে—জাঁক না ছাই! ঠাকুরতলায় দিনে-রেতে শুধু গণ্ডাগণ্ডা আলো জলতে থাকে—আর ঘ্যাঙোড় ঘ্যাঙোড় ক'রে সারাক্ষণ কলে গান বাজতে লাগে। ওরে জাঁক কয় বুঝি? পাঁচ গাঁয়ের লোক পাত পাড়বে—পেট

পুরে খাবে—কাঙালী বিদেয় হবে—তবে না পুজো গমগম্ করবে। তা নয়—।

কথা কয় না তো—মেয়ে যেন একেবারে কথকতা শুরু করে দেয়। বড় ভাল লাগে কালীচরণের। শ্রুতি উৎকর্ণ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আগ্রহ ভরে বললে—তাই নাকি রে?

মেয়েও উৎসাহভরে সঙ্গে সঙ্গে বললে—হিঁ গো বাবা। কী বিচ্ছিরি মেড়ো গান।—হ্যাগো! আমাদের এখানকার শ্যাল-কুকুরের ডাক তার থিকে ঢের মিঠে লাগে বাবা।

ক'দিন কাছে ছিল না মেয়ে। কথকতা শুনতে সত্যিই আজ বড় ভাল লাগছে কালীচরণের। চণ্ডী হাতমুখ নেড়ে-নেড়ে ভঙ্গিমাভরে বলতে লাগল—ঠাকুরদালান কই? মা দুগ্গারে যেমন তেমন জায়গায় বসাতে আছে নাকি? পথের ধারে হোগলা দে—চট দে ঘর বানিয়ে মায়ের লেগে ঠাঁই করে দিয়েছে। তাও কাত্তিক গণেশ—লক্ষ্মী সরস্বতী সব মার কাছ থিকে কত কত তফাতে রে বাবা! হেথায় একজন তো উই হোথায় একজন। কলা বউতো গণেশ ঠাকুরের ঠিক পাশেই থাকবার কথা বাবা—নয় কি কও? ওখিনে কলা বউটারে একটেরে সরিয়ে রেখেছে। ও আবার জাঁক!—ও আবার পুজো!

কথা বলতে বলতে চণ্ডীর মনটা সম্ভবত: চকিতের জন্যে রায়বাবুদের ঠাকুরদালানটাই ঘুরে এল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞের মত বললে- এক কাঠামোয় মা দুগ্গার দুপাশে কাছে কাছেই তো ছা-পো সব থাকবার কথা।—নয় বাবা? আর মাথায় উপর চালচিত্তির না থাকলে বুঝি মায়েরে মানায়? বাবুদের ঠাকুর কী সোন্দরপানা দেখায়—কও কি না বাবা?

মিথ্যে নয়। রায়বাবুদের ঠাকুরদালানে পুজোর ক'দিন মাটির প্রতিমা যেন প্রাণ পায়। হাসে কাঁদে—বরাভয় মূর্তি ধরে। মেয়ের কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিলে কালীচরণ। বাপের সায় পেয়ে চণ্ডী উৎসাহ ভরে সঙ্গে সঙ্গে বললে—অষ্টমীর দিনকে রেতের বেলায় ক'জায়গায় ঠাকুর দেখবার লেগে নে গেলজো তো? মুখপোড়া কী কইলো যেন বাবা? কইলো—দেখ দিকি—তোদের গাঁয়ে এমন ঘটা ক'রে পুজো হয় কোথাও? বাপের জন্মে কখনো এমনি সব ঠাকুর দেখিছিল?

ছোট লোক ঢাকীর ঘরের মেয়ে হলেও নিজের স্বামীর উদ্দেশ্যে ও-ভাবে 'মুখপোড়া' বিশেষণ প্রয়োগ করাটা যে নিতান্ত দূষণীয়—সে কথাটাই মেয়েকে বোঝাতে যাচ্ছিল কালীচরণ। কিন্তু তার আগেই চট্ করে চণ্ডী আবার বাত্ময়ী হয়ে উঠল। চোখেমুখে বিজয়িনীর গর্বভাব ফুটিয়ে বললে—বাপ তুলিয়ে কথা কয়। আমিও ছেড়ে কথা কইনি বাবা। পোড়ারমুখোরে বলনু—তোদের শহরের মুখে আগুন। পুজোয় ঘটা দেখতে চাস তো আমাদের ওখিনে রায়বাবুদের বাড়ী গে দেখিস ক্যানে। বাপের জন্মেও ভুলতে পারবি নে তুই।

জাতে ছোট হলেও ভদ্রলোকদের নিয়েই কালীচরণের কারবার। আচার-আচারণে তাই বেশ ভদ্রও। নীতি-জ্ঞানও আছে বেশ। তাড়াতাড়ি বললে—স্বামীর সাথে ওভাবে তুই-তোকারি করিস্—এ কিন্তু ঠিক নয় মা। সুবল তোর চাইতে বয়েসে বড়—গুরুজন।

চণ্ডী সঙ্গে সঙ্গে তাচ্ছিল্যভরে বললে—ছাই বড়ো! ও আবার গুরুজন! তালগাছের মত ঢ্যাঙাপানা আড়টাই যা দেখায়। নইলে—ক্ষ্যামতায়? লড়ুক দিকি ও আমার সাথে? দুলেদের পটলারেই বলে কতবার মেরে কুঁৎকে দিয়েছি। ও মুখপোড়া তো তালপাতার সেপাই।

কথাটা মিথ্যে নয় অবশ্য। দস্তিপনাতেও চণ্ডীর জুড়ি নেই এ গাঁয়ে। তা বলে মেয়ের অমন স্বভাব—বিশেষ করে কথার অমন বে-আদব ধরণ সমর্থনযোগ্য নয় মোটেই। কথা শুনে তাই চমকে উঠল কালীচরণ। তাড়াতাড়ি বললে—ছি:, মে-ওলা মেয়েদের মুখ দে অমুন সব কথা কাড়তে নাই মা—জিব্ খসে যায়।

খসে যায় না ছাই! আমারে কথার কামড় দেবে—গায়ে হাত তুলবে—আর আমি ছেড়ে কথা কইব বুঝি?—বারে!

পরক্ষণেই যেন কৌতুকোদ্দীপ্ত হয়ে উঠে বিচিত্র ভঙ্গিমা সহকারে চণ্ডী বললে—সে দিনকে তেমনি টেরটি পেয়েছে বাছাধন।

কী টের পেল রে?—প্রশ্নটা কালীচরণের ঠোঁটের প্রান্ত থেকে খসে পড়বার আগেই চণ্ডী উৎসাহ ভরে বলে উঠল—সে দিনকে আমার গালে ঠাস্ করে কী জোর চাপড় ধরিয়ে দিলে মুখপোড়া। আমিও ছেড়ে কথা কইনি বাবা। দিইচি'ডান হাতটার কোষে কামড় বসিয়ে। টের পেয়েছে বাছাধন। দাঁত বসে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেসলো। ঘা সারে নি এখনো। বেশ হয়েছে যেমন কম্ম তেমনি ফল।

সবে বার বছরে পা দিয়েছে চণ্ডী। আর সুবলের বয়েস বোধ করি আঠার উনিশই হবে। তা ও বয়েসে একটু-আধটু খুনসুড়ি ঠোকাঠুকি হবে বই কি মাঝে মাঝে! তা হ'লে অস্বাভাবিক কিছু করে বসবে মেয়ে—সেই বা কেমন কথা!

বিস্মিত দৃষ্টি তুলে বাপ মেয়েকে বললে—নিশ্চয়ই কিছু দোষ বাধিয়েছিলিস, তুই—নইলে এমনিতে কেউ গায়ে হাত তুলবে ক্যানে?

অভিমান ভরে মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললে—'বারে! কখন দোষ করনু শুনি? শাউড়ী মাগী সাথে করে নদীতে চান করতে নে গ্যাল্লো ক্যানে তা হলে?'—বলতে বলতে চকিতের মধ্যে ওর কথার ধরণটাই পাল্টে গেল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল—নদীর জল কী সোন্দরপানা দেখতে লাগে গো বাবা! জলে পড়লে ইচ্ছে লাগে না আর উঠি। এক ডুবে—একেবারে হোই হোথায় গিয়ে উঠেছি তো? ভেসে যাচ্ছি দেখে শাউড়ী মাগী কেঁদেই খুন। আমি যেন পাথর কি শিলে—টুপ করে তলাপিনে চলে যাব। এখিনে দিনে কতবার দীঘি পেরুই। কও তো বাবা? জানে না কিছু্ছু—কেবল হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে মরে।

ক্ষণিকের জন্যে থামল চণ্ডী। পরক্ষণেই আবার বললে—'ওদিনকেই যেই কারখানা থেকে ফিরেছে—ছেলেকে অমনি সাতখানা ক'রে নাগালে মাগী। মুখপোড়া অমনি ছুটে এসে ঠাস্ ঠাস্ করে গালে চাপড় বসিয়ে দিলে। দাঁত যে কত রক্ত বেরিয়ে ছ্যালো—জানো?'

চণ্ডী হঠাৎ পিছিয়ে এসে বাপের হাত ধরে অভিমান-বিজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল—আমারে আর ও-চুলোয় যেতে করো নি বাবা।

থাকতে পারে নাকি কেউ? ক্ষেত-খামার নেই—কলা-বাগান আমবাগান নেই—চান করব—সাঁতরাব যে—পোড়া জায়গায় পুকুর-ডোবাও নেই একটাও। ওখিনে আবার মানুষে থাকে!

মানুষ থাকতে পারে নাই বটে। কারখানার পাশে বস্তির মধ্যে দুখানা ঘর নিয়ে সুবলরা থাকে। গায়ে গায়ে ঘিঞ্জি ঘিঞ্জি খাপরা দিয়ে ছাওয়া ঘর। ঘর নয় ঠিক। পায়রার খোপ যেন সব। একটি করে দরজা—আর জানালা। দরজায় সামনেই একফালি করে সরু দাওয়া। মজুরদের স্বর্গ মর্ত্য আর পাতাল যাই বলো সব কিছুই ওখানে—ওরই মধ্যে। ওখানে মেয়ে দিতে প্রথমটায় মন সরেনি কালীচরণের। সুবলের বাপ হুট করে মরে গেল তাই। না হলে কারখানার নামকরা মিস্ত্রী ছিল লোকটা। সুবলও মিস্ত্রির কাজ শিখেছে। ছেলেটার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবেই শুধু কালীচরণ মত করেছিল। তাছাড়া যার যেখানে হাঁড়িতে চাল দেওয়া আছে। সেখানে গিয়ে পড়তেই হবে তো তাকে? সে আর কে খণ্ডাবে?

মেয়ের দুঃখ। একে মা-মরা মেয়ে। তার একমাত্র সন্তান। বাপের মন তো গলবেই। চণ্ডী অভিমানভরে আবার বললে—হাওয়া বাতাস আছে নাকি চুলোর জায়গায়? আমাদের এখিনে মাঠ ফুরোয় তো আকাশ ফুরোয় না—কও কি না? একই আকাশ তো বাবা? কিন্তু কতরত্তি বলতো ওখিনে? ওখিনে সাত ভাই তারারা ওঠে না—সাঁঝ তারাও না।

মেয়ে নিতান্ত মিথ্যে বলেনি। ওই ঘিঞ্জি বস্তির মধ্যে আকাশ আর কতটুকু। বোধ করি হাত দিয়ে মাপা যায়।

মেয়ে একই ধুয়ো ধরেছে তখন। আবদারের সুরে আবার বললে—আমারে ওখিনে আর পাঠিও নি বাবা। ও মুখপোড়া নিতে এলেও আর যাচ্ছি নে আমি।

সাত আট বছর আগেকার কথা। কিন্তু মেয়ের সেই মিনতিভরা করুণ কণ্ঠস্বর বোধ করি কোনদিনই ভুলতে পারবে না কালীচরণ। তারপরও কম করে দশ পনের বার

নি। মাস চারেক আগেকার কথা। ছেলের আবার অন্য জায়গায় বিয়ে দেবে বলে উঠে পড়ে লেগেছিল চণ্ডীর শাশুড়ী। পাত্রীও ঠিক করে ফেলেছিল। হরিনারায়ণপুরের নটবর ঢাকীর মেয়ে। কানাঘুষো কথাটা শুনেই কালীচরণ তাড়াতাড়ি মেয়েকে নিয়ে সুবলদের ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল। ঘরেদোরে কিছুতেই উঠতে দেবে না ওর শাশুড়ী। কম কথা শোনায় নি। এখনো যেন কানে বাজছে কথাগুলো।—আমরা নেহাত মেয়ের গড়ন আর রঙ দেখে ভুলেছিলুম। নইলে ঘর করবার মেয়ে নয় ও। যে ক'দিন থাকে দিনরাত মুখেমুখে চোপা করে। ছেদ্দা করে না একটুও কাকেও। তাছাড়া সোমত্ত মেয়ে—রাতবিরেত নেই একা একা পালানো স্বভাব। কেন—ছেলে আমার ফেলনা নাকি? আমি এ মাসেই সুবলের আবার বে দোবো। এতে যা হয় হোক।

কিন্তু গুরু রক্ষে করেছেন বলতে হবে। কেন কে জানে—সুবল নাকি একটু বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। না হলে চণ্ডীর জীবনে মাস চারেক আগেই মহাদুর্বিপাক ঘনিয়ে আসতো। কত সাধ্য সাধনা ক'রে' মেয়েকে দিয়ে বেয়ানের পায়ে ধরিয়ে শপথ করাতেও হয়েছিল। নিজেও হাত জোড় করেছিল। তবে না ওর শাশুড়ী একটু ঠাণ্ডা হয়! সেই রেখে এসেছে চণ্ডীকে। কি ভাগ্যিস মন বসিয়ে ঘর করছিল ক'মাস। কিন্তু আবার ভূত ঘাড়ে চেপেছে। পালিয়ে আসবে বলে লিখেছে। অতবড় মেয়ে। এখনো মতিগতি বদলাল না। আক্কেলও হল না কোন রকম। আশ্চর্য! এখনো সেই পালিয়ে আসবার মতলব। অদৃষ্ট—সবই অদৃষ্ট কালীচরণের। না হ'লে এমনটি হবে কেন?

একটানা চিন্তাস্রোতে হঠাৎ বাধা পড়ল। পাঁদাড়ের কাছে ক'টা শিয়াল ডেকে উঠেছে। সন্ধ্যা উৎরে গেছে কখন। উঠোনের কোণে নাজনে তলাটায় অন্ধকার বেশ ঘন হয়েছে ইতিমধ্যে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল কালীচরণ। ভেবেই বা করবে কি। পুজোর ক'টা দিন বইতো নয়। কোলকাতা থেকে বাজিয়ে ফিরে মেয়ের ওখানে যাওয়াই স্থির করলে সে। পয়সা-কড়ির টান চলেছে। মেয়েকে আনতে গেলে—যাওয়া-আসার রাহা খরচ আছে। এখানে দুদিন রাখতে গেলেও খরচ-খরচা আছে। পয়সাকড়ির দিকটাই ভাবতে হবে আগে।

এক রকম স্থির নিশ্চিন্ত হয়েই জলপান কেনবার জন্যে বেরিয়ে পড়ল কালীচরণ। সংসারে এখন আর দ্বিতীয় জন নেই। একা ও। কোন কোনদিন জলপান খেয়েই রাত কাটিয়ে দেয় আজকাল। গল্পগুজব সেরে মুড়ি জলপান নিয়ে হরি মুদীর দোকান থেকে কালীচরণ যখন ফিরল রাতের প্রথম প্রহর তখন গড়িয়ে পড়েছে। উঠোনে পা দিয়েই চমকে উঠল কালীচরণ। দাওয়ায় ওঠবার পৈঠের উপর পা রেখে চণ্ডীর মতই কে বসে রয়েছে না!

সচকিত কণ্ঠে কালীচরণ বললে—বসে কে রে?

'আমি বাবা'। চণ্ডীর কণ্ঠস্বরই বটে। বুকটা যেন ধক্ করে উঠল কালীচরণের। কখুন এলিরে?—কার সাথে এলি?—একাই পালিয়ে এলি নাকি আবার?—প্রশ্ন যেন এক সঙ্গেই কালীচরণের মুখ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

হাঁ-না—কোন রকম উত্তরই দিলে না চণ্ডী। কেন কে জানে—সত্যি কথাটা বলতে এই প্রথম চণ্ডীর মনের মধ্যে যেন কি এক ধরণের সংকোচ জাগল।

তলে তলে উত্তেজিত হলেও মুখে শুধু দুঃখ প্রকাশ করে কালীচরণ বললে—বয়েস বাড়তেছ দিন দিন। আবার একা পালিয়ে এসে ভাল কাজ করলিনে মা। পুজোর কটাদিন বইতো নয়! কোলকাতা থেকে বাজিয়ে ফিরে আমি তো তোদের ওখিনে যেতুমই। অতকাণ্ড করে এই সেদিন রেখে এলুম তোকে। আবার পালিয়ে এসে কি ফ্যাসাদ বাধালি বল দিকি?

দাওয়ায় উঠে হারিকেনটা জ্বাললে কালীচরণ। কথা নেই আর কারও মুখে। কিছুক্ষণের জন্যে একটানা নিস্তব্ধতা। দাওয়ায় উঠে এল চণ্ডী। মৃদু কণ্ঠে বললে—এবার রায়বাবুদের ওখিনে বাজাতে যাবে নি বাবা?

চণ্ডী যেন অন্য এক দিগন্ত থেকে কথা কইলে। আগের মত সেই উচ্ছ্বাস আর আবেগের লেশ নেই। কেমন যেন ক্লান্ত উদাস কণ্ঠস্বর।

না-না, পুজোআজা হবে না মা আর। পুজোআজার

পাট উঠে গেল চেরকালের মত। বাবুদের বাড়ী গেলবারেই মা শেষ পুজো নিয়েছে।

বাপের কথা শুনে চণ্ডী চমকে উঠল। পরক্ষণেই কালীচরণ বিড় বিড় করে বলতে লাগল—বাবুদের জমিদারী গেল—' কর্তারাও সব মরে-হেজে গেলেন একে একে। ছেলেরা নাতিরা সব কোলকাতার বাড়ীতেই থাকে বরাবর। দেশের ভিটে, দালান-কোঠার উপর টান নেই মায়া নেই কারও। বড় কর্তার চোখ বুজতে তর সইলো নি। বেচে-বুচে সব ভূত করে দিলে ছেলেরা। শুনচি বাবুদের বাড়ীর ওদিক পিনে নাকি কারখানা হবে!—হাওয়া-গাড়ীর কারখানা।

'কারখানা হবে—সে কি কও বাবা!' নির্মম আঘাত বুকে বাজলে যেমন হয়, চণ্ডীর কণ্ঠস্বরে তেমনি ব্যথার ভাব ফুটে উঠল। মেয়ের ব্যথা বাপের মনের মধ্যেও যেন সঞ্চারিত হল সঙ্গে সঙ্গে। চুপ করে রইল কালীচরণ। কিছুক্ষণের জন্যে আবার একটানা নিস্তব্ধতা। খানিক পরে কি ভেবে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে কালীচরণ ফস্ করে বললে—হ্যাঁরে, চিঠিতে করেছিলি সুবল নাকি বড় মারধোর করতে লেগেছে? তা কথাটা সত্যি—না, বড় পুজোর সময়টায় এধিনে আসবার লেগে মনটা আঁকপাঁক করতে ছ্যালো? তাই বোধ করি অমুন করে লিখিয়ে-ছ্যালিস।

মিথ্যে—মিথ্যে সব। হ্যারিকেনের দিক থেকে তাড়া-তাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলে চণ্ডী। চোখে ওর জল এসে গেল। বাপ ওর ঠিকই বলেছে। পুজো আসছে—বড় পুজো। উপরি উপরি তিন বছর পুজো দেখতে পায় নি ওখানে। গত বছর আর তার আগের বছরেও দুর্গাপুজোর সময়টাতেই সুবল এসে জোর করে নিয়ে গিয়েছিল ওকে। এবারে তাই পুজোর সময়টায় এখানে আসবার জন্যে প্রাণটা ওর আকুল হয়ে উঠেছিল। কী দুর্বার আকুলতা! সে আকুলতার কথা কেমন করে কাকে বোঝাবে চণ্ডী? সুবল মারধোর করে না ছাই। মিথ্যে—হ্যাঁ, ডাহা মিথ্যে কথাই লিখিয়েছিল চণ্ডী। একটু বেচাল দেখলে শাশুড়ী বলে শাসায়। না হ'লে সুবল এখন ধরতে গেলে ওর কথাতেই ওঠে-বসে। শাশুড়ীর সঙ্গে কথাকাটি হলে—ওর হেয়ে টেনেই কথা কয়। এবারে গিয়ে অবধি সুবলকে তাই ওর বেশ ভালই লেগেছে। সুবলেরও মন পড়েছে ওর উপর। আদর করে প্রায়ই এখন বলে—'তোর পয়েই কারখানায় আবার মাইনে বেড়েছে—খাতিরও বেড়েছে। মাইরি বলছি।' গত মাসে কানের একজোড়া ফুল গড়িয়ে দিয়েছে। পুজোয় এবার সতের টাকা দামের একখানা শাড়ীও দিয়েছে। এ বছরে আর হ'ল না। আসছে বছরে পুজোর সময় দু'ভরির বালাও গড়িয়ে দেবে—বলছিল সেদিন। সুবলের জন্যে এখুন সর্বক্ষণই ওর মন পড়ে থাকে। সুবলের কিছু হলে—ওর মনটার এখন কেমন এক ধরণের ভাবনা হয়। গত মাসে একদিন রাতে হঠাৎ ভেদবমি হয়েছিল সুবলের। কী ভয়ই করেছিল ওর সে রাতটায়। মনে মনে কত ঠাকুর দেবতাকে ডেকেছিল।—মানতও করেছিল ও। অবশ্য খুঁটিনাটি নিয়ে এক আধ-দিন দুজনে রাগারাগি হয় না যে তা নয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে আবার দুজনে কাছাকাছি হলেই সে রাগ মিলিয়ে যেতে বেশী দেরি লাগে না। দিন পনের আগে ক'দিন ধরে রাতে কথাকাটাকাটি চলছিল। কারণ ওই এক। দুর্গাপুজোর আগেই যেমন করে হক চণ্ডী সোনা-মুখীতে বাপের কাছে আসবেই। দুর্নিবার জিদ। ওদিকে সুবলও গোঁ ধরে বসেছিল। দুর্গাপুজোয় নয়—কালী পুজোর সময় নিজে সঙ্গে করে চণ্ডীকে দুদিনের জন্যে সোনামুখী থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। কারখানার পাশেই অত ঘটা করে পুজো হচ্ছে। দু'দিন যাত্রা হবে—একদিন থিয়েটার। থিয়েটারে সুবল পাট নিয়েছে। অভিনয় দেখিয়ে অবাক করে দেবে চণ্ডীকে—মতলবটা এই। চণ্ডীর মনটা কিন্তু তখন সোনামুখী মুখো হয়েছে। সুবলের সাধ্য কি তার মনের মোড় ফেরায়। কথাকাটাকাটি হতে হতে হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল চণ্ডী। ক্ষেপলে কিন্তু চণ্ডী আর কারও আপনার নয়। সুবলকে সেদিন স্পষ্ট বলেছিল—আমারে আটকাতে পারবে নি তুমি। পুজোয় আমি পালিয়ে যাব এচুলো থিকে। পালানোর নাম শুনে

সঙ্গে বলেছিল—এবার পালালে—আর ঘরে নেবো না তোকে। ছাড়ান দিয়ে দেবো জন্মের মত। নটবর ঢাকীর মেয়েকেই ঘরে আনব ঠিক—দেখিস তখন। এখনো বে হয় নি সে মেয়ের।

চণ্ডীর মাথাতেও আগুন ধরে গিয়েছিল। শাউড়ী মাগী কথায় কথায় ছেলের বে দেবে বলে শাসায়। ছেলের মুখেও—ওই বুলি—'আবার বে করবো।' বেশ—তাই করুক ওরা। ও চেরকালের মত সোনামুখীতেই পড়ে থাকবে। ওদের সংসারের ওপর কোন টান নেই ওর।—কোন টান নেই। থাকতে না পেরে কুঞ্জ মিস্ত্রির মেয়েকে দিয়ে তাই অমন ক'রে দু' দুখানা চিঠি লিখিয়েছিল।

অবশ্য মার খায় নি যে তা নয়। মার খেয়েছে আজ দুপুরের দিকে। ভাত খেতে বসেছিল সুবল। খাবার সময়ে আবার হঠাৎ ওই বাপের বাড়ী যাবার কথা ওঠে। দুজনে কথা কাটাকাটিও শুরু হয়। রাগের মাথায় মানুষ কি না করে। রাগ আগুন। রাগ শয়তান। শুধু রাগের বশেই সুবল এঁটো হাতেই সজোরে ওর গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিল। চণ্ডীর মাথাতেও সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গিয়েছিল। 'এ জন্মে আর তোদের ঘর করবো নি।'—বলে অনমনীয় মেজাজ দেখিয়ে চলে এসেছে ও। কারও সঙ্গে নয়। একাই চলে এসেছে—এক কাপড়ে। সুবলের দেওয়া কানের ফুল দুটোকে খুলে তার চোখের সামনেই মেঝের উপর ছিটকে ফেলে দিয়ে এসেছে। সুবল রাস্তায় ছুটে এসে—দুবার হাত ধরে টেনেও ছিল। দুবারই ঝটকা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল ও। হাজার হ'ক বেটা ছেলে। রাগের মাথাতেই বোধ হয় আর পিছু পিছু আসে নি। ও নিজেও পিছু দিকে আর চেয়েও দেখে নি। গোঁ ভরে চলে এসেছে।

'ওয়াক-ওয়াক'। দুদিন আগের মত চণ্ডীর শরীরের ভিতরটা কেমন যেন ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে উঠল। কালীচরণও সচকিত হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। বললে—অমন করিস ক্যানেরে! সারাদিনকে পেটে কিছু দিস নে—গা গুলোতে লেগেছে বোধ করি তাই। নে—হাতে পায়ে জল দিয়ে নিয়ে জলপান ক'টা মুখে দে দিকি। আমি উনুন ধরিয়ে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিই।

'না না—শরীলটার আমার ক'দিন ধরে ভাল লাগচে নি বাবা। আমি খাব নি কিছু।'—কথাগুলো বলে দাওয়াতেই মাদুর বিছিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল চণ্ডী।

সারা অঙ্গজুড়ে ক্লান্তি নেমেছে। পথশ্রমের ক্লান্তি। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। বাপের ডাকে রাতে একবার সাড়া দিলে শুধু। খেলেও না কিছু—উঠলও না আর।

পরদিন সকালেও পুকুরে মুখ ধুতে গিয়ে চণ্ডীর গাটা আবার তেমনি করে ঘুলিয়ে উঠল। বমি-বমি ভাব। ঘাটের খেজুরের গুঁড়ির ধাপের উপর থেবড়ে বসে পড়ল চণ্ডী। শরীরটা যেন কি এক ধরণের অবসন্নতায় এলিয়ে পড়তে চাইছে। পথ হাঁটার ক্লান্তিতেই সম্ভবত মুখ-চোখ কেমন যেন বসে গেছে। বাগ্‌দীবুড়ি বাসন মাজছিল ঘাটে। প্রায় কাঁদোকাঁদো হয়ে চণ্ডী বললে—আমার কেমন যেন গা গুলোতে লেগেছে ঠান্‌দি। কাল রেতেও এমনি হয়ে ছ্যালো। ক'দিন হয় খাবার জিনিষ দেখলেই ওয়াক ওঠে।

'কখন এলি গা তুই?'—ব'লে বুড়ী চণ্ডীর মুখের উপর চোখ পেতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে। মুচকি হেসে বললে—ও ভয়ের কিছু না লো। বেটা-বেটি যা হ'ক একটা পেটে এসেছে তোর। নাতজামাইকে সন্দেশ খাওয়াতে বলিস।—ক'দিন হয়—আমাদের পুঁটীরও তো অমনি হচ্ছে। কুটোটি কাটে না দাঁতে। দুনিয়ার জিনিষে অরুচি।

বুড়ীর কথা শুনে চমকে উঠল চণ্ডী। শাশুড়ীও ওই কথা বলেছিল সেদিন। সামান্য একটা কথা। কিন্তু কি অসামান্য এর শক্তি। শুধু কথা শুনে চণ্ডী জীবনে কখনো এমন বিচলিত হয়নি।—এমন অভিভূতও হয় নি। বুড়ীর কথাগুলো যেন চণ্ডীর শরীরের সমস্ত রক্ত-স্রোতকেই ঝাঁকানি দিয়ে নতুন একধরণের চেতনাকে জাগিয়ে তুলল। সেই সঙ্গে ওর সারা মনজুড়ে অনেক রকমের ভয়-ভাবনা এসেও ভর করলো।

মুখধুয়ে তাড়াতাড়ি ঘাট থেকে বাড়ীতে এল চণ্ডী। চালের বাতা থেকে ঢাক পেড়ে কালীচরণ তখন ঠিকঠাক করছে সেটাকে। চকিতের মধ্যে চণ্ডী বুঝে নিলে—পঞ্চমি আজ—বাপ তার কোথাও বাজাতে যাবে নিশ্চয়ই।

কোলকাতায় যাবার কথাটাই মেয়েকে বলতে যাচ্ছিল কালীচরণ। তার আগেই চণ্ডী কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বললে—কোথায় বাজাতে যাবে গো? আজ কিন্তু তোমার যাওয়া হবে নি বাবা।

'ক্যানে রে?' বলেই কালীচরণ বিস্মিত দৃষ্টি তুললে মেয়ের দিকে।

মেয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি নামিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে—আমারে তোমার জামাইয়ের ওখিনে আজই রেখে আসতে হবে বাবা।

'আজই! ক্যানে রে!'—কালিচরণের কণ্ঠস্বর আরও বিস্ময়বিহ্বল।

'হ্যাঁ, আজই দুপুরের দিকেই চলে যাব বাবা।'—অবিচলিত কণ্ঠস্বর চণ্ডীর!

এসেছিস যে কেলে—পুজোর ক'টাদিন থাক্ এখিনে। আমি কোলকেতা থেকে বাজিয়ে ফিরে তোকে রেখে আসবো। মুণ্ডলির মায়েরে কয়ে যাব—ওদের ওখিনেই এক'দিন খাবিদাবি—থাকবি।

'না-না।'—আপত্তিব্যঞ্জক ধ্বনি সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল চণ্ডীর মুখ থেকে।

আজ দুপুরেই আমারে নিয়ে যেতে হবে বাবা। আমার মনটার ভিতরে কেমন যেন ভাল লাগচে নি বাবা। দুপুরের আগেই নিয়ে চলো আমারে—লক্ষ্মিটি!

চণ্ডীর চোখের কিনারায় জল এসে গেল নিমিষের মধ্যে। বিস্মিত কালীচরণ সকালের আলোয় মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে কয়েকবার। কিন্তু মেয়ের মনের খাতে যে হঠাৎ ভিন্ন ধরণের স্রোত বইতে শুরু হয়েছে—তা একটুও আন্দাজ করতে পারলে না কালীচরণ। ভাবলে—বয়েস বাড়লে কি হবে—মেয়ে তার তেমনি খেয়ালিই আছে। বদলায় নি একটুও।
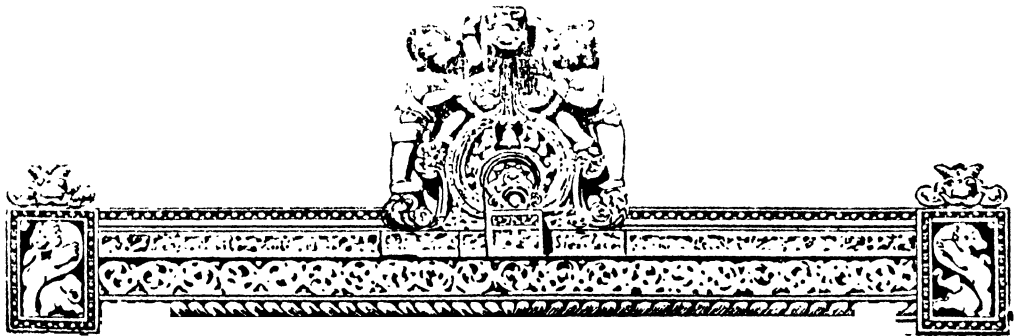
সাহিত্যস্রষ্টা বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—"বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজগতি ও কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।"

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাংলাগদ্যরচনার জন্য যাঁদের নাম করা হ'য়ে থাকে, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হ'লেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। মৃত্যুঞ্জয়ই সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তীদের মধ্যে একমাত্র লেখক—যিনি বাংলাগদ্যরচনার রীতি কিছুটা ধরতে পেরেছিলেন। ভাষাকে তিনি বিষয়োচিত করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তবু ভাষার আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে ভাষা সেই কলানৈপুণ্য লাভ করেনি, যা বিদ্যাসাগরের হাতে সম্ভব হ'য়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের পরে স্মরণযোগ্য নাম রামমোহনের। কিন্তু রামমোহনের ভাষা বিতর্কের ভাষা; ঋজু ও দৃঢ় কিন্তু কমনীয়বর্জ্জিত। ভাষার গঠনপদ্ধতি দুর্ব্বল এবং শব্দনির্ব্বাচন কষ্টকল্পিত। রেভারেণ্ড্ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকখানি বই লিখেছিলেন—উপদেশ কথা, বিদ্যাকল্পদ্রুম, ষড়্‌দর্শন সংবাদ—যেগুলির ভাষা রামমোহনের মত কষ্টপ্রসূত নয়, বরং সহজ ও সরল। কিন্তু সে ভাষাও সাহিত্যের ভাষা হ'তে পারেনি। তার মধ্যে শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে শিল্পবোধের সমন্বয় ঘটেনি; যুক্তির সঙ্গে হৃদয়বেদনার মিলন ঘটেনি। তাই বিদ্যাসাগরের পূর্ব্ববর্ত্তীকালের বাংলাগদ্যের ভাষাকে জনতার মত বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত, উদ্দেশ্যহীন ও আড়ষ্ট বলে বর্ণনা করে' রবীন্দ্রনাথ মোটেই অত্যুক্তি করেন নি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ভাষার বিবর্ত্তনের এই ইতিহাস প্রত্যক্ষ হ'বে।

প্রথম মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন' থেকে—(রচনাকাল ১৮০২)

"একদিবস রাজা অবন্তীপুরীতে সভামধ্যে দিব্যসিংহাসনে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে এক দরিদ্রপুরুষ আসিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল কথা কিছু কহিল না। তাহাকে দেখিয়া রাজা মনের মধ্যে বিচার করিলেন যে লোক যাচ্ঞা করিতে উপস্থিত হয় তাহার মরণকালে যেমন শরীরের কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয়না ইহারও সেইমত দেখিতেছি। অতএব বুঝিলাম ইনি যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছেন কহিতে পারেন না।

রামমোহন রায়ের পথ্যপ্রদান—(রচনাকাল ১৮২৩) থেকে—

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী নামগ্রহণ পূর্ব্বক যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সমুদায়ে দুইশত অষ্টাত্রিংশত পৃষ্ঠাসংখ্যক হয় তাহাতে দশপৃষ্ঠাপরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন। এ দশপৃষ্ঠা গণনা করা গেল যে ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ হয়।"

বিদ্যাসাগরের প্রথম গদ্যরচনা 'বাসুদেবচরিত' (১৮৪৪-৪৫ ?) এবং প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতির (১৮৪৭) পূর্ব্বে যেসব বাংলা গ্রন্থ রচিত হ'য়েছিল—তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গদ্যসাহিত্য বলে'

কোন একটি গ্রন্থেরও নাম করা যায়না। কৃষ্ণমোহনের রচনা লালিত্যবর্জিত; তার রচনার কোন নিজস্বরীতি ছিলনা। "বিদ্যাকল্পদ্রুম থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

"এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাসপুস্তকে অনেক অনেক নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্ররূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয় পুরাকালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল এবং পুরাণ-লেখকেরা কবিতার ছন্দ লালিত্যাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দ-বিন্যাস করতঃ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন পুরঃসর বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।"

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে বিদ্যাসাগর ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যগ্রন্থের রচনায় মন দিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যানভাগ থেকে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রকে গ্রহণ ক'রে তিনি লিখলেন 'বাসুদেবচরিত'। দুর্ভাগ্যের বিষয় ইংরাজশাসকবৃন্দ বাসুদেবচরিতে পৌত্তলিকতার গন্ধ আবিষ্কার করায় বইটি ছাপা হয় নি। এই প্রথম রচনা বিদ্যাসাগরের তেইশচব্বিশ বছর বয়সের রচনা। পরিণত শিল্পরীতির পরিচয় এই গ্রন্থে ছিল না, কিন্তু তবু 'বাসুদেবচরিতে'ই "বাংলাভাষার প্রথম যথার্থশিল্পীর আত্মপ্রকাশ। নিচের উদ্ধৃতি থেকে সমকালীন গদ্যসাহিত্যের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরের রচনারীতির বৈশিষ্ট বোঝা সহজ হ'বে।

"অনন্তর অষ্টমমাস পূর্ণ হইলে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্র সময়ে ভগবান ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গলবাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে নির্মল জল ও সরোবরে কমল প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকরগীতে ও কোকিল কলকলে আমোদিত হইল; এবং শীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল। সাধুগণের আশয় ও জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল।"

এ' গদ্য স্নিগ্ধ প্রাণবাণ ও সাবলীল। এ'গদ্যে শিল্পীর করস্পর্শ পড়েছে; ফুটে উঠেছে নিবিড় অথচ গতিময় কাব্যসুষমা। ভাষা "সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সু-পরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত" হয়েছে।

সংস্কৃতসাহিত্যের শব্দভাণ্ডার লুট করে এনেছিলেন বিদ্যাসাগর। এমন কি রচনার ভাবশরীরও সংস্কৃত-সাহিত্যাশ্রয়ী। তবু শকুন্তলা বা সীতার বনবাস সংস্কৃতর নয়, বাংলাগদ্যের মৌলিক রূপ। গদ্যের এই সাহিত্যরূপ এতদিন অনাবিষ্কৃত ছিল। বিদ্যাসাগরের হৃদয়ে যে রসানুভূতি ছিল তারই প্রকাশ ঘটলো এতদিনে। গদ্যের ভাষা তার সাধারণ অর্থকে অতিক্রম ক'রে আর এক অনির্বচনীয় অর্থে বিমূর্ত্ত হ'লো।

"...সমুদ্রে দৃষ্টিপাতমাত্র দেখিতে পাইলেন, প্রবাহ-মধ্য হইতে এক অদ্ভুত স্বর্ণময় মহীরুহ বহির্গত হইল। ঐ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া এক পরমাসুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী হস্তে বীণা লইয়া মধুর কোমল তানলয় বিশুদ্ধ স্বরে সঙ্গীত করিতেছে।"

"এই সেই জনস্থানমধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর-মণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত।"

এ' ভাষাই আদর্শগদ্যের ভাষা। ছন্দমধুর ও ব্যঞ্জনা-ময়। "তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এইরূপ সুমধুর বাংলাগদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" [বঙ্কিমচন্দ্র]

কিন্তু শুধু গদ্যের ভাষাই নয়, তার ভাবদেহে তিনি প্রাণসঞ্চার করেছিলেন। 'শকুন্তলা' ও সীতা তাঁর হাতে পৌরাণিক বেশ ত্যাগ করে বাঙ্গালীর বেশে এসে দাঁড়িয়েছিল। স্নেহে ব্যথায় ব্যর্থতায় ও আবেগে মণ্ডিত, সহানুভূতিতে নিবিড় ঘরোয়া বাঙালী জীবন। মূলরচনা না হ'য়েও তাঁর গ্রন্থগুলি অনন্য সাহিত্যসৃষ্টি। পরবর্ত্তীকালের সকল শ্রেষ্ঠ লেখকের কাছেই প্রেরণা-স্বরূপ। "বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলাগদ্যের ছন্দভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই উপরে বঙ্কিম ও পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের কারুরীতির অশেষ নিদর্শন নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" [মোহিতলাল মজুমদার, সাহিত্য-বিতান]

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িককালে যাঁরা গদ্যরচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন তাঁদের নামও প্রসঙ্গক্রমে উঠ্‌তে পারে। কৃষ্ণমোহনের কথা পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে। অক্ষয়কুমার দত্ত নিঃসন্দেহে সেকালের শক্তিমান লেখক। তাঁর মন যুক্তিনিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত ছিল। কিন্তু তাঁর গদ্যের ভাষা আড়ষ্ট; পাঠককে তাঁর বাচনভঙ্গিমায় কেবলই বাধা পেতে হয়। সেদিন অক্ষয়কুমারই 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য প্রবন্ধগুলির এমন কি সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত'র প্রবন্ধগুলিরও ভাষার সংশোধন ক'রে দিতেন। এ'র দ্বারা বোঝা যায়, সেযুগেও অক্ষয়কুমারের ওপর তাঁর সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠা স্বীকৃত হ'য়েছিল। আর এ'যুগের সমালোচক মোহিতলাল বলেন—"তিনি যে কেবল বাংলাগদ্যের আবিষ্কর্ত্তা নহেন, পরন্তু তাঁহার রচনা যে বাংলাগদ্য-সাহিত্যের সর্ব্বগুণান্বিত ক্লাসিক, বেতালপঞ্চবিংশতি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার 'আত্মজীবনচরিত' পর্য্যন্ত পাঠ করিলে প্রতিপত্রে ও প্রতিছত্রে তাহার প্রমাণ মিলিবে।"

'সীতার বনবাস'এর ভাষায় যেমন অপূর্ব্ব শিল্প-নৈপুণ্য ও কাব্যসুষমার সমন্বয় ঘটেছে, তেমনই প্রাবন্ধিক-ভাষা গড়ে উঠেছে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি বই-গুলিতে। এগুলির ভাষা তীক্ষ্ণ, দৃঢ়, যুক্তিনিষ্ঠ অথচ প্রাঞ্জল। কখনও বিদ্রূপে শাণিত, কখনও বা আবেগে করুণ। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য এ ভাষার সৃষ্টি। অথচ মানবিক বেদনাবোধ, সততা ও নিষ্ঠা প্রতি ছত্রে ছত্রে। সবার ওপরে লক্ষণীয় লেখকের গভীর সংযম ও শুচিতাবোধ। কোন অবস্থাতেই শালীনতাবোধকে বিসর্জ্জন দেননি বিদ্যাসাগর। তাই তাঁর বিতর্কের ভাষাও আদর্শ ভাষা;—ব্যঙ্গাত্মক তবু পরিচ্ছন্ন।

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি, তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচারগুণে, পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে সর্ব্বশরীরে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।"

[বিধবা-বিবাহ

"তর্কবাচস্পতি মহাশয়, দয়া করিয়া আমায় যে এই উপদেশ দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। আমি তাঁহার মত সর্ব্বজ্ঞ নহি; সুতরাং পুস্তকবিরহিত অথবা উপদেশনিরপেক্ষ হইয়া, বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারি, আমার এরূপ সাহস বা এরূপ অভিমান নাই।...তর্কবাচস্পতি মহাশয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এজন্য পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমি সংস্কৃত পাঠশালা হইতে একগাড়ী পুস্তক আহরণ করিয়াছি। কিন্তু দেখ, তিনি কেমন সরল, কেমন পরহিতৈষী; একগাড়ী পুস্তক পর্য্যাপ্ত হইবেকনা, যেমন বুঝিতে পারিয়াছেন, অমনি দুইগাড়ী পুস্তক আহরণে উপদেশ দিয়াছেন।"

[বহুবিবাহ

এ কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বাংলাভাষাকে যিনি সুবিন্যস্ত ক'রে গড়লেন, এবং বাংলাগদ্যের সাধুরূপ যিনি সৃষ্টি করলেন, তিনি কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির সাধনায় কোনদিন বসেননি। বসেননি কথাটা হয়ত ঠিক নয়, ব্যক্তিজীবনে অবসর তাঁর এতই কম ছিল যে, নিজের আত্মচরিতটিও সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেন নি। আত্ম-চরিতের কয়েকটি পৃষ্ঠা ছাড়া আর একটিমাত্র লেখা পাওয়া যায় যা অপ্রয়োজনের লেখা। সেটির নাম 'প্রভাবতী সম্ভাষণ'। যিনি বাংলাগদ্যের জনক, তাঁর মৌলিক সাহিত্যকর্ম নেই কেন, একথা জিজ্ঞাস্য হ'তে পারে বইকি। বস্তুতঃ সাহিত্যের সাধনায় তিনি কেন বসেন নি, এ'কথা না ভাবলে বিদ্যাসাগরকে বুঝতে অসুবিধেই হ'বে।

এই কথাটিই শ্রীভূদেব চৌধুরী তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিকথায় ব্যক্ত করেছেন অন্যভাবে—"বিদ্যাসাগর নিজব্যক্তিত্বের গভীরে এক ব্যাপক নিরাসক্তি ও উদার মূল্যবোধ রচনা করেছিলেন।"

বিদ্যাসাগরের জীবনে আসলে আত্মচিন্তার কোন

অবকাশ ছিল না। যে মানুষ সমাজের সমস্ত গ্লানি-মোচনের দায়িত্ব নিয়ে সংগ্রামী সৈনিকের মত শুধু লড়াই করে গিয়েছেন, সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি করুণায় উৎসারিত হ'য়ে যিনি আচার ও কুসংস্কারের পলি সরিয়ে সমাজকে স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বতিতে পরিণত করতে কৃতসংকল্প; তাঁর জীবনে আত্মচিন্তার স্থান কোথায়। নিজের জীবন দিয়েই তিনি এক অমর সাহিত্য রচনা করেছেন। দারিদ্রের ঝড় জল ঠেলে, জীবনের কৃচ্ছ্রতাকে অবজ্ঞা করে' যিনি মানবকল্যাণের দীপবর্তিকা জ্বালাতে এগিয়ে যান, তাঁর জীবনের পরিমাপ করবে কে ?

সাহিত্যরচনা করে কালক্ষেপ করার মত সময় তাঁর হাতে ছিল না। একমাত্র লক্ষ্য মানুষের দুঃখমোচন। কল্যাণবোধের প্রেরণা থেকেই তাঁর কর্ম্ম। জীবনে তাই জ্ঞান, কর্ম্ম ও সত্যবোধের সঙ্গে বৈরাগ্যের মিলন ঘটেছে। চিরঅপরাজিত যোদ্ধা পুঞ্জিভূত অন্যায়, অসত্য অন্ধতা ও অজ্ঞতার সঙ্গে সংগ্রাম করে ক্লান্ত। চকিতের অবসরে তিনি চেয়ে দেখেছেন, বনবাসিনী সীতার মধ্যে নির্য্যাতীত নারীজাতির কান্না জমাট হয়ে লুকিয়ে আছে। তিনবছরের মেয়ে প্রভাবতীর বিয়োগে তাঁর পুরুষহৃদয় হাহাকারে ভ'রে উঠেছে। কিম্বা সেই শিশুমেয়েটিকে লক্ষ্য ক'রেই তিনি বুকের জমা বিক্ষোভকে প্রকাশ করেছেন—"একমাত্র তোমায় অবলম্বন করিয়া এই বিষময় সংসারে অমৃতময় বোধ করিতেছিলাম…" অর্থাৎ সংসার অকৃতজ্ঞতায় বিষময় হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু সে অনুভূতিকে প্রকাশ করার অবসরই বা কোথায় ? তাঁকে ছুটতে হ'য়েছে তারানাথ, দ্বারকানাথদের বিতর্ক-দ্বন্দ্বের আসরে।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসৃষ্টির সূচনাই হয়েছে প্রয়োজনবোধের তাগিদ্ থেকে। ফোর্টউইলিয়ামে তাঁকে পড়াতে হ'তো হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষপরীক্ষা' ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'। বই দুটির ভাষা এতই অশালীন ছিল যে শিক্ষক বিদ্যাসাগর বিব্রত-বোধ করতেন। তাই ফোর্টউইলিয়ম কলেজের ছাত্র-দের জন্য লিখলেন "বেতাল-পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) যিনি 'সীতার বনবাস' লিখলেন, তিনিই শিশুদের জন্য রচনা করতে ব'সলেন বর্ণপরিচয়। প্রয়োজনের তাগিদেই লিখলেন বোধোদয় (১৮৫১) ঋজুপাঠ (১৮৫১) কথামালা (১৮৫৬) ও আখ্যানমঞ্জরী (.৮৬৩) ইংরাজী সাহিত্য ছেঁকে তিনি অনুবাদ করলেন—কিন্তু সে অনুবাদ স্রষ্টার হাতের যাদুস্পর্শে মূল রচনাশৈলীর মাধুর্য্যে প্রকাশিত। শুধু শিশুশিক্ষার বইও নয়, সমাজের কলুষনাশের জন্য লেখনী ধারণ করে লিখলেন বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি গ্রন্থ। সে যুগে সংস্কৃতশিক্ষার্থী ব্যক্তিদের মুগ্ধবোধ ব্যকরণ মুখস্থ করার নিদারুণ প্রয়াস দেখে ব্যথিত হ'য়ে সৃষ্টি করলেন সরল ও সহজ উপক্রমণিকার। অর্থাৎ যেখানে যা প্রয়োজন, তারই জন্য বিদ্যাসাগর সজাগ। যিনি সকল মানুষের অভাবকে জেনেছেন, ব্যক্তিগতজীবন তাঁর কাছে তুচ্ছ হ'য়ে গেছে।

তাই খণ্ডিত শিল্পীসত্তা, ও দার্শনিকসত্বাকে অতিক্রম করে', সাহিত্যিক বিদ্যাসাগরকে ছাড়িয়ে, যে সমগ্র বিদ্যাসাগরের রূপ আমাদের চোখে প্রতিভাত, সে বিদ্যাসাগর মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ, বিপ্লবীনায়ক বিদ্যাসাগর। সকল তুচ্ছতার গণ্ডি পার হ'য়ে, তিনি সর্ব্বকালের সকল মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত।

তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

(১৩)

দক্ষিণ কলকাতার একটা নূতন বাড়ী। বছর চার পাঁচ আগে হয়ে থাকবে। অতি ছোট হলেও সামনে একটুখানি বাগান আছে। বাড়ীটা খুব বড় নয়, আবার নিতান্ত ছোটও নয়। প্রতি তলায় ছোট বড় মাঝারি মিলিয়ে খান পাঁচ :করে ঘর আছে। একতলাটা বাড়ী তৈরী হতে না হতে ভাড়া হয়ে যায়, দোতলায় গৃহস্বামী যিনি তিনি নিজেই থাকেন। তিনতলাটা শেষ হতে কি একটা কারণে বেশ খানিকটা দেরি হয়েছিল। সবে শেষ হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটেও এসে জুটেছে।

মহা হৈ চৈ করে উপরের তলায় আসবাবপত্র তোলা হচ্ছে। গোলমালে বিরক্ত হয়ে একটি গোলগাল বউ বারান্দায় বেরিয়ে এসে বলল "বাবা, চেঁচিয়ে হাট বসিয়ে দিয়েছে একেবারে। কি কলকাতার সব ফার্নিচার এখানে এনে তুলছে নাকি? এক ঘণ্টা হয়ে গেল, এদের চেঁচানি আর থামেনা।"

বউ ঠাকরুণের তীব্র কণ্ঠস্বর শুনে একজন আধবুড়ো মত চাকর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। এখন মাথা জুড়ে টাক পড়েছে বটে, তবে আমাদের পুরান বন্ধু ভগীরথকে চিনতে দেরি হয়না। এসে বলল "বৌদিমণি, মানুষ কি কম এসেছে যে আসবাবপত্র কম আসবে? জন বারো ত হবেই কমপক্ষে। এই ত বাজার নিয়ে ফিরবার সময়ই দেখলাম, গোটা পাঁচ ছেলে-মেয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে আর মারামারি করছে।"

বউ অপরূপা গালে হাত দিয়ে বলল "এই সেরেছে। বাবা যে কেন ভাল করে খোঁজ খবর না নিয়ে এই এক পাল লোক এনে ঢোকালেন, তা কে জানে বাপু। এখন সারাক্ষণ সিঁড়ির দরজা আগলাতে হবে, না হলেই ঐ অসভ্য ছেলেপিলেগুলো ভিতরে এসে ঢুকবে, আর ঊষা, উমাকে যতরকম বাঁদরামি শেখাবে।"

"সিঁড়ির দরজা একেবারে বন্ধ করে রেখ" বলে ভগীরথ আবার রান্নাঘরে ফিরে গেল। অনেক মোটা হয়েছে, মাথার চুলও প্রায় সব উঠে গেছে। বাড়ীতে নূতন গিন্নী এসে তার অবস্থার কোনো অবনতি হয়নি। বরং উন্নতিই হয়েছে এক-একদিকে। রামপদর হাতে যখন সংসার চালানর ভার ছিল তখন ভগীরথকে একটু ভয়ে ভয়ে থাকতে হত, কারণ, ইচ্ছে করে না ঠকলে, তাঁকে ঠকান সহজ, ছিলনা। দুজন মানুষের অতি সাদাসিধে সংসার ছিল খরচের জন্য ভগীরথ যা সামান্য টাকা পয়সা পেত, তার থেকে খুব বেশী সরান সম্ভব ছিলনা। এখন বৌদিমণি আসার পর সংসার অনেক বড় হয়েছে। বাবু, দাদাবাবু, বৌদিমনি ছাড়াও দুটি বাচ্চা দিদিমণি এসে গেছে এরই মধ্যে। তাদের একটি আয়াও জুটেছে। আর রকমারি খাওয়াদাওয়ার ঘটা ঢের বেড়েছে। বাচ্চাদের জন্যে সব কিছুই আলাদা করতে হয়, এমন কি তাদের ভাতও আলাদা। তারপর দুধ আছে, পুডিং আছে ডিমের পোচ আছে, আরো সাতসতেরো। বউদিমণি খেতে খুব ভালবাসেন, প্রামদেশের মেয়ে রান্নাবান্নাও খানিক খানিক জানেন। নূতন নূতন তরকারির ফরমাশ করেন, নূতন রকম জলখাবারের জন্য ভগীরথকে তাড়া লাগান। তা পেটে খেলে পিঠে সয়। এত রকম কেনা

কাটার কাজে অনেক টাকাই ভগীরথের হাতে এসে পড়ে, তার খানিকটা কি আর তার হাতে লেপ্‌টে আটকে যায় না?

তবে ভগীরথ যে খুব সুখে আছে এ কথা বলা যায়না। আগে রান্নাঘরে ছিল তার একচ্ছত্র রাজত্ব। ঠিকে ঝি যোগমায়া কোনো কিছু নিয়েই কথা বলতনা। কিন্তু এখন খুকুদের আয়া আহ্লাদী সারাক্ষণ এসে হুট্ হুট্ করে রান্নাঘরে ঢুকছে। খাবারের ভাগ সে ঠিকমত পাচ্ছেনা, এরকম সন্দেহ হবা মাত্রই সে হেঁড়ে গলায় চেঁচাতে আরম্ভ করে। সে যেমন তেমন চেঁচান নয়, সাতপাড়া এক হয়ে যায় একবারে। রামপদ একদিন সেই ভীম নিনাদ শুনেই আদেশ দিয়ে ছিলেন যে এসব এখানে চলবেনা। আর একবার ঐ রকম চীৎকার শুনলে তিনি আহ্লাদী ও ভগীরথ দুজনকেই একসঙ্গে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন।

এতে অবশ্য অপুর ভয়ানক আপত্তি ছিল। জন্মাবধি অতি দরিদ্র সংসারে সে মানুষ। খেতে পায়নি পেট ভরে কোনও দিন এবং পরিশ্রম করতে হয়েছে উদয়াস্ত। কাজেই খেতে না পাওয়া এবং বেশী খাটা এ দুটো ব্যাপারের উপরেই সে খড়্গহস্ত। আহ্লাদী চলে গেলে ঐ দুর্দান্ত দস্যি মেয়ে দুটো পড়বে সম্পূর্ণ তার ঘাড়ে, সে তাহলে মরেই যাবে। আর ভগীরথ না থাকলে এই এত লোকের রান্না করবে কে? বাড়ীর কর্তা রামপদ হয়ত বলবেন আলুভাতে ভাত সিদ্ধ করে খাও, কিন্তু সেটাও অপুর একেবারে মনঃপূত নয়। ভাল খাওয়ার স্বাদ একবার যে পেয়েছে সে কি আর ঐ সেদ্ধ পোড়া খেতে পারে? যেদিন খাওয়াটা ভাল হয়না, সেদিন অপুর মন ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়, জীবনটাই বিফল মনে হয়। তাই সে প্রাণপণ চেষ্টায় আহ্লাদীকে সামলে রাখে যতক্ষণ রামপদ বাড়ীতে থাকেন। মাঝে মাঝে তাকে বখশিস্‌ও দেয় দরাজ হাতে, দই কিনে খেতে, তেলে ভাজা কিনে খেতে। উষা আর উষাও যে এসব সুখাদ্যের ভাগ মাঝে মাঝে পায়না, তা জোর করে বলা যায়না। আসলে ওগুলি যে বাচ্চাদের পক্ষে অতি অনিষ্টকর একথা সত্যিই অপু বিশ্বাস করেনা। বাচ্চা-বেলায় তারা নিজেরা ক্ষিদের জ্বালায় কি না খেয়েছে? কই, মরেনি ত? কিন্তু বিশ্বাস করুক বা না করুক তাকে খুব সাবধান হয়ে চলতে হয়, যাতে এ সব অনাচারের খবর অভয়পদ বা রামপদ না পান। অভয়পদ এমনিতে কোনো সাহেবীয়ানা করেনা, কিন্তু উষা উমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সে ভয়ানক সাহেব। ভগীরথ, আহ্লাদী, অপরূপা সবাইকেই সে কঠোর হাতে শাসন করে বেড়ায়। রামপদ বাড়ীর বাইরেই থাকেন বেশীক্ষণ, তবু যদি কখনও কোনো ফাঁকে কোনো অনাচার চোখে পড়ে, তিনি তখনি দোষীদের শাস্তি বিধান করতে দাঁড়িয়ে যান। যে বৌমাকে কোনোদিনই কোনো ব্যাপারে কিছু বলেন না, তাকেও এক্ষেত্রে ছেড়ে কথা কন্‌না।

কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে গজ্‌গজ্‌ করে অপু যখে শোবার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় দুই বাচ্চাকে পেরাম্বুলেটারে বসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে আহ্লাদী এসে সদর দরজায় দেখা দিল। মেয়ে দুটিকে একসঙ্গে কোলে তুলে নিয়ে হাঁক দিল "ভগীরথদা, গাড়ী তুলে দাও।"

ভগীরথ নীচে নেমে গেল। উষা আর উমা মিনিট দুই তিনের মধ্যেই উপরে এসে ছোটখাট ঘূর্ণিবায়ুর মত মায়ের গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মা দুহাতে তাদের আক্রমণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতে করতে বলতে লাগল "থাম দস্যি থাম, ফেলে দিবি নাকি?"

আহ্লাদী আয়া পিছন থেকে বলল "বৌদিমনির যে কথা! ঐ কচি দুটো তোমায় ফেলতে পারে নাকি?"

অপু মুখ ভার করে বলল "না, তা কি আর পারে? যা গুণ তোমার কচি দুটোর। দেখছ শাড়ীতে কি রকম জুতোর কাদা লাগিয়ে দিল? আজ সবে পাট ভেঙে পরেছি।" শাড়ী জামাগুলির উপর অপুর বড় মমতা। একমাত্র তাদের সম্বন্ধেই সে সর্ব্বদা সজাগ থাকে।

বাচ্চা দুটিকে মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করতে করতে আহ্লাদী বলল "ছেলেপিলের মায়ের কাপড়ে ওরকম লেগেই থাকে।" বড় খুকী উষাকে সে

কোনোরকমে ছাড়িয়ে নিল, ছোট উমা কিল তুলে বলল "মাথা ভেঙে দেব।"

উষার বয়স বছর চার হবে। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বেশ হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, চোখ দুটি বেশ বড় বড়। রামপদ বলতেন তাকে দেখলেই তাঁর বালিকা হেমলতার কথা মনে হয়। অপুর এ মন্তব্যটা ভাল লাগত না। হেমলতা এত সমালোচনা করেন ও এত উপদেশ দেন যে তার ছোট পিশশাশুড়ীকে মোটেই ভাল লাগেনা। অবশ্য এ অপছন্দটা সে কারো কাছে ভুলেও প্রকাশ করত না। একদিন অভয়পদর কাছে কি একটু বলতে গিয়েছিল, তাতে সে ধমক দিয়ে উঠল "ওঁরা সব গুরুজন, ওঁদের সমালোচনা কোরোনা। যা বলেন তোমার ভালর জন্যেই বলেন, শুনলে তোমার উপকার বই অপকার হবেনা।" অপু তখন থেকে বুঝে নিয়েছে যে এবাড়ীতে শ্বশুরবাড়ীর কারো নিন্দা বা সমালোচনা চলবেনা, কারণ সে গরীব-ঘরের মেয়ে, এরা সব বড়লোক। তা ছাড়া সে লেখাপড়া জানেনা, এরা মেয়েপুরুষ সবাই পণ্ডিত।

বড় মেয়েকে জাহ্নবী সরিয়ে নেওয়াতে এইবার অপু ছোট উমাকে কোলে নিয়ে বলল "কোথায় বেড়িয়ে এলে খুকু?"

উমা ছোট হাতখানা বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল "এখানে, ওখানে, সেইখানে।"

উষা বিজ্ঞের মত বলল "কিচ্ছু জানেনা উমাটা। আমরা লেকের ধারে বেড়িয়েছি, পাতা ছিঁড়েছি।"

উমা বলল, "আমিও পাতা ছিঁড়েছি।"

উমার রং খুব ফরসা, তবে শরীরটা বড়ই ছোটখাট ও রোগা। সে হবারবার অপুর শরীর তেমন ভাল ছিলনা, কাজেই বাচ্চা তেমন বড় সড় হয়নি। শরীরটা তেমন শক্তও নয়, কোনোরকম অনিয়ম হলেই তার অসুখ করে। মেজাজও বড় বোনের চেয়ে অনেক বেশী খিট্‌-খিটে। ছোট মুঠি তুলে বিশ্বসংসারের সবাইকে দুচার ঘা দিতে সে সদাই প্রস্তুত। উষাও তাকে রীতিমত ভয় করে চলে, যদিও ছোটবোনের উপর স্নেহও তার প্রচুর। এরই মধ্যে তাকে সামলায়, জামা জুতো পরাবার চেষ্টা করে, চুল আঁচড়াতেও যায়। তবে উমা সব তাতেই বাধা দেয়, জাহ্নবী ছাড়া আর কেউ তার সাজসজ্জা করে দেবে এ তার পছন্দ নয়, মাকেও সে ঠেলে সরিয়ে দেয়।

ভগীরথ গাড়ী তুলে নিয়ে এল। বলল "সিঁড়িটা যেন বড় রাস্তা পেয়েছে সব। উঠবার নাববার জো নেই। বলবেন ত দাদাবাবুকে বৌদিমণি।"

অপু বলল "আমি বললে ত সব হবে। তোমাদের বাবুকে বলো যদি তিনি কিছু ব্যবস্থা করেন।"

"ঐ ত বাবু আসছেন, নিজের চোখে দেখতেই পাবেন" বলে ভগীরথ রান্নাঘরে চলে গেল।

রামপদ সিঁড়িতে অনাবশ্যক রকম জনসমাগম দেখে একটু অবাক্ হলেন। উপরে উঠে এসে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন "এতগুলো মানুষ এল কোথা থেকে? বাড়ীতে যেন মিটিং বসে গেছে মনে হচ্ছে।"

ভগীরথ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বলল "এনারাই ত সব এসে উঠলেন তিনতলায়।"

রামপদ বললেন "কই এত লোক আসবার ত কোনো কথা ছিল না? আমাকে বলেছিল যে স্বামী স্ত্রী আর দুটি ছেলেমেয়ে।"

জাহ্নবী বলল "দুটি না ত আর কিছু। আমি উঠবার সময় অন্ততঃ তিন জোড়া দেখলাম।"

রামপদ বললেন "এ সব মানুষের সাধারণ সভ্যতাটুকুও নেই। কথা বলে দেখতে হচ্ছে।" বলে তিনি নিজের শোবার ঘরে ঢুকে গেলেন।

বিকেলে অভয়পদ ফিরবার পর বেশ ঘটা করে চা খাওয়া হয়। রামপদ তার আগে ফেরেন, এবং আগেই চা খান। চায়ের সঙ্গে কোনোদিন গোটা চারপাঁচ বিস্কুট, নয় গোটা দুই টোষ্ট্। বাড়ীতে ভোজনরসিকা বউ আসাতেও তাঁর খাওয়াদাওয়ার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি।

ভগীরথ তাঁর চা আর খাবার এনে খাওয়ার ঘরের টেবিলে রাখল। অপুর শ্বশুর সম্বন্ধে বেশ কিছু ভীতি ছিল, সে পারতপক্ষে তাঁর কাছে ঘেঁষত না। তবে হেমলতার শিক্ষায় বিকেলে শ্বশুরের চা টা ঢেলে দিত, জলযোগের উপকরণ এগিয়ে দিত।

আজও সে যথাকর্ত্তব্য করতে এগিয়ে এল। রামপদ তাকে দেখে বললেন "খুকুরা ফিরেছে বেড়িয়ে?

অপু বলল "হ্যাঁ, অনেকক্ষণ হল ফিরেছে।"

রামপদ চা খেতে খেতে বললেন "তোমার একখানা চিঠি আছে," বলে পকেট থেকে একখানা পোষ্টকার্ড বার করে অপুর হাতে দিলেন।

পড়া বা লেখাটা অপুর বিশেষ অভ্যাস ছিলনা। হাতের লেখা পড়তে তার সময় লাগত। আস্তে আস্তে চিঠির পাঠোদ্ধার করে সে পোষ্টকার্ডখানা টেবিলের উপর রেখে দিল। রামপদ জিজ্ঞাসা করলেন, "কে চিঠি দিয়েছেন?"

অপু বলল "বাবা লিখেছেন।"

রামপদ বললেন "তাঁরা সব বেশ ভাল আছেন ত?"

অপু বলল "বিশেষ ভাল কিছু নেই, নানা অসুখে ভুগছেন। পাড়াগাঁয়ে কোনো চিকিৎসা হয়না ত?"

রামপদ বললেন "কিছুকাল কলকাতায় থেকে চিকিৎসা করালে পারেন। রোগ বেশী বাড়তে দেওয়া ভাল নয়। তাঁদের বল না কিছুদিনের জন্যে এখানে চলে আসতে।"

অপু ত হাতে স্বর্গ পেল। কিন্তু সেটা সোজাসুজি শ্বশুরমশায়কে জানতে দেওয়া যায় নাত? হ্যাংলা ভাববেন যে? তাই মুখখানা একটু কাতর করে বলল, "বাবা যে বড় অসুস্থ, একলা আসতে ত পারবেন না? আর মার ঘাড়ে সমস্ত সংসার, ফেলে ত নড়তে পারেন না?"

রামপদ বললেন "সেটা একটা অসুবিধা বটে। তাঁকে দেখবে কে? তোমার পক্ষে ছোট দুটি মেয়ে সামলে তাঁর দেখাশোনা করা সম্ভব নয়। তোমার পরের বোনটির বয়স কত?"

অপুর পরের বোন অনুপমার বয়স উনিশ ছোঁবার উপক্রম করেছে। কিন্তু অত বয়স বলা যায়না, বিয়ে হয়নি এখনও। কাজেই বাড়ীর শিক্ষামত বলল "এই ষোলো হল এবার।"

রামপদ বললেন "তাহলে ত বাবার দেখাশুনো করবার বয়স হয়েছে। তুমিও ত সঙ্গে থাকবে। চাকরবাকরও ইতিমধ্যে আছে। অতএব একবার জিজ্ঞাসা করে যাও, তারপর অনুপমাকে নিয়ে চলে আসতে লেখ তোমার বাবাকে। নিয়ে আসার লোকের যদি অভাব হয় ত তোমার জ্যাঠাইমাকে জানালে তিনি তোমার দাদাদের একজনকে সঙ্গে দিয়ে দেবেন।"

এর মধ্যে উষা আর উমার আবির্ভাব। দাদার চায়ের সঙ্গে টেবিলে যে বিস্কুটগুলো সাজান থাকে তেমন মিষ্টি বিস্কুট আর কোথাও পাওয়া যায়না। আদুরী যে বিস্কুট-গুলো কেনে তা একদম বিচ্ছিরি। এসেই ছোট ছোট হাত প্রসারিত করে হুঙ্কার "বিক্কু, বিক্কু।"

রামপদ প্রায় ছ'সাতখানা বিস্কুট নাতনীদের করকমলে তুলে দিয়ে বললেন "এস বড়রাণী, ছোটরাণী কি খবর বল ত।"

দু-জনের মুখভর্ত্তি, কোনোমতে উত্তর দিল "ভায়ো।" এরপর যে কোনো ঠাকুরদাদার ইচ্ছা করত নাতনীদের কোলে নিতে। কিন্তু রামপদ এদিকে বিশেষ আগ্রহ দেখান না। ঠিক এক মুহূর্ত্তেই দুটিকে কোলে তুলে এক জায়গায় বসাতে হবে তা না হলেই মহাপ্রলয়! বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে ছুটতে হবে, এবং দু-চারটে বাসনও ভাঙবে। তাই আলগোছে আদর করেই রামপদ নিবৃত্ত হন।

এরপর অভয়পদর আগমনের সময়। ছেলে বৌয়ের চায়ের আসরে রামপদ বড় একটা বসেন না, তাতে তাদের স্বাভাবিকতা বড়ই ব্যাহত হয়, এবং শ্বশুরকে না দিয়ে অতরকম জলখাবার খেতেও অপুর লজ্জা করে।

তিনি উঠে পড়তে যাচ্ছেন এমন সময় অভয়পদর সঙ্গে সঙ্গে হেমলতাও এসে ঘরে ঢুকলেন। রামপদ বললেন "আরে হেম যে? অনেকদিন দেখিনি, বোস্, বোস্। বৌমা হেমকেও চা দাও।"

হেমলতা বললেন "শুধু চাই দিও বাপু' আর কিছু না, এত বেলায় খেয়েছি, যে এখনও আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে আছে। দেখবে আর কি করে, এ ক'দিন বড় ব্যস্ত ছিলাম। রান্নার লোকটা বাড়ী গেছে। আজ দিদির একখানা চিঠি পেলাম, তাই খোকার সঙ্গ ধরলাম।

রামপদ জিজ্ঞাসা করলেন "কনকরা সব ভাল ত?"

হেমলতা বললেন "ভালই আছে। শান্তিকে পাঠিয়ে দিতে লিখেছে। তারা নাকি শান্তির জন্যে খুব একটা ভাল সম্বন্ধ পেয়েছে। ওরা গ্রামেই মেয়ে দেখবে, বরের মা বাবা আমাদের পাশের গ্রামেই থাকে। ছেলে এখানে বেশ ভাল চাকরি করে। বিয়ে হলে শান্তি গ্রামে থাকবে না, কলকাতাতেই থাকবে। এখন কার সঙ্গে যে পাঠাই তাই ভাবছি।"

রামপদ বললেন "এই এখনি কথা হচ্ছিল বৌমার সঙ্গে যে তাঁর বাবাকে কিছুদিন কলকাতায় রেখে চিকিৎসা করালে হয়। ভদ্রলোক বড়ই ভুগছেন ওখানে। আমি বলছিলাম যে প্রবীর যদি তাকে নিয়ে আসে ত সেই শান্তিকে নিয়ে যেতে পারে।"

হেমলতার ভুরু দুটো একটু কুঁচকে উঠেছিল অপুর বাবার আসার কথা শুনে। বললেন "কবে আসছেন তিনি ?"

অভয়পদও একটু জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল, কারণ কাজে যাবার আগে সে এ বিষয়ে কিছু শুনে যায়নি।

অপু তাড়াতাড়ি তার বাবার লেখা পোষ্টকার্ডখানা অভয়পদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল "এই ত এটা বিকেলে ডাকে এল। তাই শ্বশুরমশায় বলছিলেন যে তাঁকে লিখে দিতে কলকাতায় এসে চিকিৎসা করতে।"

হেমলতার কুঞ্চিত ভ্রূ আবার সমান হল। অভয়পদ মুখটাকে একেবারে ভাবলেশহীন করে বসে রইল। শ্বশুরের কন্যা সম্বন্ধে তার মনোভাব যাই হোক, শ্বশুরবাড়ীর অন্য লোকজনগুলিকে সে একটু দূরে দূরেই রাখতে চায়।

হেমলতা বললেন "তা কাল চিঠি দিলেও ত সে অজ পাড়াগাঁয়ে পৌঁছতে তিনচার দিন লাগবে। তারপর তারা গোছগাছ করে আসবে। শান্তির দেরি হয়ে যাবেনা ?"

রামপদ বললেন "পাত্রপক্ষ কি একেবারে দিনক্ষণ ঠিক করে লিখেছে নাকি ?"

হেমলতা বললেন, "তা অবশ্য নয়। দিদি লিখেছে যত শীগ্গির সম্ভব।"

রামপদ বললেন "তুই চা টা খেয়ে নিয়ে আমার ঘরে আয়। পোষ্টকার্ড দিচ্ছি, একটা চিঠি লিখে দে কনককে সব খবর দিয়ে। একবার প্রবীর এলে যখন কাজ হয় তখন শুধু শুধু দুটো লোকের রেলভাড়া গোণা কেন ?"

"আচ্ছা চল," বলে হেমলতা উঠে পড়লেন।

তিনি আর রামপদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবা মাত্র, অভয়পদ অপুর দিকে তাকিয়ে বলল "এটা কি খুব একটা ভাল পরামর্শ হল ?"

অপু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল "তোমার বাবাই ত প্রথম কথা তুললেন। আর আমারও ত ইচ্ছে করে মা বাবার জন্যে কিছু করতে, তাঁদের দেখতে ? কতদিন তাঁদের দেখিনি বলত ?"

অভয়পদ বলল "তা ত বুঝলাম, কিন্তু তাঁর দেখাশোনা করবে কে। নিজে ত দুই মেয়ে নিয়ে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ, আর একটিও আসার নোটিস্ দিচ্ছেন, পারবে তুমি ?"

অপু বলল "বাবা অনুকে নিয়ে আসবেন, সে আমার চেয়ে কাজের।"

অভয়পদ বলল, "তা দেখ চালাতে পার কিনা। বাবা যখন বলছেন তখন আমি অমত করব কেন ? দাও চিঠি লিখে। তবে অসুবিধে হলে আমি জানিনা। বুঝে সুজে চোলো। পাড়াগাঁ আর শহরে তফাৎ আছে ত ?"

অপু এবারে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল "তা পাড়াগাঁয়ের লোক কি মানুষ নয় ? সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিও তাদের নেই ? কোথায় কেমনভাবে চলতে হয়, তাও জানেনা ?"

অভয়পদ বলল "তাই কি আর জানে সব সময় ? সে যা হোক তোমার শাড়ী আমার stock এর উপর এবার টান পড়বে, তার জন্যে প্রস্তুত থেকো।"

অপু বলল, "আহা তাতে যেন আমি মরে যাব।"

অভয়পদ বলল, "মরা ত উচিত নয়। পাছে আচমকা আঁতকে ওঠ, তাই বলে রাখলাম। যাক ছোট গিন্নীরা

একটা ভাল খবর দিলেন, শান্তির বিয়ের প্রস্তাব। ওর একটা ভাল বিয়ে হয়ে গেলে বড় পিসীমা হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে ওঁর বড় চিন্তা। একটি মেয়ের ভাল বিয়ে হয়ে যায়, আর বড় ছেলেটার একটা চলনসই চাকরি হয়ে গেলে তিনি তিনি অনেকটাই হাল্কা হয়ে যাবেন।"

অপু বলল, "ছোট পিসীমা যখন হাতে নিয়েছেন, তখন ঘটিয়ে ছাড়বেন। উনি কি কম জোগাড়ে মানুষ? দেখো শান্তি, স্বর্ণ দুজনেরই উনি ভাল বিয়ে দিয়ে দেবেন।"

অভয়পদ বলল "তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তাই যেন হয়।"

(১৪)

সকালের ট্রেনে অপুর বাবা, বোন অনুপমা আর কনকলতার বড় ছেলে প্রবীর এসে হাজির হল ক'দিন পরেই। ট্রেনের সময়ের আগে থেকেই অপু উদ্বিগ্ন মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। অতিথিদের থাকার জন্যে লাইব্রেরী-ঘরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, তাতে নেয়ারের খাট পেতে ঠিক করে রাখা হয়েছে। এ সব রামপদই করিয়েছেন, অপু নামে গিন্নী হলেও সত্যিকারের কাজের বেলা বড় একটা এগোয় না। সংসার চলে ভগীরথ, যোগমায়া ও আদুরীর হাতে। তা মস্ত এক গোছা চাবি অপু সর্ব্বদা আঁচলে বেঁধে রাখে। সম্পত্তির তার অভাব নেই। শাড়ী জামা ভর্ত্তি আলমারীই ত দুটো। গহনা বেশীর ভাগ থাকে ব্যাঙ্কে, তবু ঘরেও কিছু থাকে। সংসার খরচের টাকা রামপদ অপুর হাতেই দেয় যদি মেয়েটার এতে কিছু হিসাবজ্ঞান হয়। অপু রোজ গম্ভীর ভাবে খরচের টাকা বার করে দেয় এবং সেটা খাতায় লেখে। তার দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। অভয়পদ মাঝে মাঝে খাতাখানা টেনে নিয়ে দেখে আর হাসাহাসি করে।

আজ যদিও ঘরদোরের ব্যবস্থা রামপদ করিয়েছেন, এবং বাজারের টাকা অভয়পদ বার করে দিয়েছে, কি কি জিনিষ কতখানি আনতে হবে তাও সেই ভগীরথকে বুঝিয়েছে, উৎকণ্ঠা আর আগ্রহ অপুরই বেশী। আগ্রহটা বাবাকে দেখবার জন্যে, বোনকে দেখবার জন্যে। কতদিন সে তাদের দেখেনি। চিঠিপত্রও কমই আসে। বাবা রুগ্ন, চিঠি লেখালিখি করতে তাঁর ভাল লাগে না। মা ত লিখতে জানেনই না বললেই হয়, এবং সময়ও পান না। ভাই-বোনেরা কালেভদ্রে লেখে, অপু নিজেও খুব ভাল পত্র-লেখিকা নয়।

উৎকণ্ঠাটাও তাঁদেরই জন্যে। যতই বড়াই করুক স্বামীর কাছে, অপু জানে চালচলনে, কথাবার্ত্তায় এঁদের অনেক ত্রুটি হবে। অপু ঠেকে শিখেছে। রামপদ হয়ত সবই উপেক্ষা করে যাবেন, তিনি ও সব ত্রুটি ধরেনই না। নিজেও ত ছেলেবেলাটা পাড়াগাঁয়েই কাটিয়েছেন। কিন্তু অভয়পদ আড়ালে বিদ্রূপ করবে, কথা শোনাবে। ক্ষমা গুণটা তার মধ্যে অত্যন্তই কম। সবচেয়ে ভয় করে অপু হেমলতাকে। তিনি অপুর বাপের বাড়ীর কারো বেফাঁস কথা শুনলে বা কোনো অপকর্ম্ম দেখলে জোড়া ভুরু কুঁচড়ে এমনভাবে তাকান যে তার পিঁপড়ের গর্ত্তে ঢুকে যেতে ইচ্ছা করে। নিজেকে ভয়ানক ছোট মনে হয়। এইজন্যে ছোট পিসীমাকে সে দেখতে পারে না। কিন্তু সে কথা ত ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করবার জো নেই এ বাড়িতে। হেমলতা শ্বশুরমশায়ের অত্যন্তই প্রিয়, অভয়পদও ছোট পিসীমা বলতে অজ্ঞান। এঁর চেয়ে বরং জ্যাঠাইমা ভাল। তাঁর অত জাঁক নেই নিজেকে অত বড় ভাবেন না। চিরকাল পাড়াগাঁয়েই কাটিয়েছেন বলে তাদের তবু মানুষের মধ্যে গণ্য করেন। তবু তিনিও অপু বা তার মা বাবাকে কিছুমাত্র দেখতে পারেন না। যা হোক, তাঁর কল্যাণেই অপুর বড় লোকের ঘরে বিয়ে হয়েছে। অনুটাত বুড়ী হয়ে গেল, এখন অবধি একটা সম্বন্ধও এল না।

ছাদের উপর বাক্স বিছানা চাপিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ী এসে বাড়ীর সামনে দাঁড়াল। অপু আনন্দ উজ্জ্বল মুখে ঝুঁকে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল "এসে গিয়েছে, এসে গিয়েছে।"

অভয়পদ ধীরেসুস্থে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে আরম্ভ করল। রামপদ বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল।

ইঃ বাবা কি রোগাই হয়ে গিয়েছেন। শেষ যখন অপু তাঁকে দেখে তখনও চেহারা এতটা খারাপ ছিল না। আর অনুর চেহারা হয়েছে দেখ। যেমন কালো তেমন ঢ্যাঙা। সাতজন্মে খেতে পায় না যেন। শাড়ীটা যদি বা চলনসই, অপুই ওটা দিয়েছিল বছর দুই আগে, ও তার সঙ্গে একটা বেঢপ বেমানান জামা পরে এসেছে। সাধে কি এদের দেখলে তার শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা নাক সিঁটকয়। অপুর চোখে প্রায় জল এসে গেল।

ইতিমধ্যে আগন্তুকরাও প্রায় দোতলায় উঠে এসেছে। প্রথমেই অভয়পদ অপুর বাবাকে ধরে আস্তে আস্তে উঠছে। তারপর অনু হাতে একখানা তালপাখা আর একটা পুঁটলি। তার পিছনে প্রবীর কি সব জিনিষপত্র হাতে করে। সর্ব্বশেষে ভগীরথ, কাঁধে ট্রাঙ্ক আর বিছানা।

রামপদ এগিয়ে গিয়ে বেয়াইয়ের হাত ধরে বললেন, "বড় কাহিল হয়ে গিয়েছেন দেখছি, ঘর আপনার ঠিকই আছে, চলুন বিশ্রাম করবেন।"

অপু এসে প্রণাম করল। তার বাবা বললেন, "বেঁচে থাক মা। এই বুঝি তোমার খুকীরা?

উষা আর উমা খানিক দূরে দাঁড়িয়ে ব্যাপার দেখছিল। দুজনেরই দৃষ্টি সন্দেহাকুল। তাদের দাদামশায় তাদের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করামাত্র তারা এক ঝটকায় বেশ খানিকটা দূরে সরে গিয়ে আদুরীর পিছনে আশ্রয় নিল। তাদের মাতামহ একটু অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে বললেন, বাবাঃ, একেবারে মেমসাহেব যে।"

অপু বলল "মেম সাহেব না হাতী! দুটোই বুনো, নূতন মানুষ দেখলেই অমনি করে!"

অভয়পদ একটু কটমট করে অপুর দিকে তাকাল। রামপদ বললেন "শিশুদের পক্ষে এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। ওরা পরখ করে নিয়ে তবে বিশ্বাস করে।"

কথা বলতে বলতে তাঁরা লাইব্রেরী-ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলেন। রামপদ বললেন "এই ঘরটা আপনার জন্যে ঠিক করে রাখা হয়েছে। খোলামেলা আছে, নিরিবিলিও আছে। অনুপমাও এই ঘরে থাকবে। জিনিষপত্রগুলি এই ঘরে নিয়ে এস ভগীরথ।"

জিনিষপত্র সব ঐ ঘরে নিয়ে এসে গুছিয়ে রাখা হল। অপুর বাবা ধপ করে খাটে পাতা বিছানায় বসে পড়ে বললেন "আঃ বাঁচলাম। সকাল থেকে কি কষ্ট! সেই কোন ভোরবেলায় উঠেছি, এক মুঠো মুড়ি ছাড়া কিছু পেটে পড়েনি।

রামপদ ব্যস্ত হয়ে বললেন "খোকা দেখত এঁদের কি ব্যবস্থা হয়েছে চায়ের। ভগীরথকে সব গুছিয়ে নিয়ে আসতে বল। বৌমা, যাও ত টেবল্‌টা ঠিক কর।

অভয়পদ আর অপু দু'জনেই তাঁর আদেশ পালন করতে ছুটল। অনুপমাও চলল্ তার দিদির পিছন পিছন। খাবারঘরে এসে বলল "দিদি যা হোক মুটিয়েছিস ভাই। বড় মানুষের বউ, খুব বুঝি খাচ্ছিস চারবেলা?"

অপু চটে বলল "নূতন করে আবার কোথায় মোটালাম? এমনিই ত আছি বিয়ের পর থেকে। তোমার মত খ্যাংরা-কাঠি মার্কা চেহারাই কি ভাল? চারবেলা এরা সকলেই খায় কাজেই আমিও খাই।"

দিদি চটছে দেখে অনু একটু সামলে গেল, বলল "সে ত অবিশ্যি, অন্যরা খেলে তুমি কি আর না খেয়ে থাকবে? আর আমি খ্যাংরাকাঠি হব না ত কি হব বলত ভাই? ভাত আর মুড়ি ছাড়া কোনোদিন কিছু খেতে পেয়েছি? তাও সবদিন পেট ভরে নয়। যেমন খাওয়ার ছিরি, তেমন পরার ছিরি! আমি আবার একটা মানুষ! আসতেই ত চাইছিলাম না, নিতান্ত তা না হলে বাবার আসা হয় না তাই এলাম। কলকাতার লোকে একেই গাঁয়ের মানুষকে ঘেন্না করে, তার উপর আমার ছিরি-ছাঁদ দেখলে ত আরো ঘেন্না করবে।"

অপু বলল "কেন, ঘেন্না করবে কেন? এখানকার মানুষ সবাই কি রাজপুত্র রাজকন্যার মত দেখতে? রোগা লোক একটাও নেই? তুই চা খেয়ে নে, তারপর তোর না থাকে আমার শাড়ী জামা বের করে দিচ্ছি, তাই পরে নে। তখন কে বুঝবে তুই কোথাকার মানুষ।"

ভগীরথ চায়ের সরঞ্জাম বয়ে আনল। সঙ্গে খাবারও অনেক রকম। প্রবীর হাত মুখ ধুয়ে এল। অনুপমাও

একটু পরিষ্কার হয়ে এল। অপুর বাবাও এসে চেয়ারে বসলেন। অভয়পদ আর অপু পরিবেশন করতে লাগল।

প্রবীর খেতে খেতে বলল "চাটা খেয়ে একবার মাসিমার বাড়ী ঘুরে আসি।"

রামপদ বললেন "এখুনি কি দরকার? স্নান করে খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও, ওবেলা যেও এখন। একেবারে হেমকে আর শান্তিকে নিয়ে আসবে, এঁদের সঙ্গে দেখাটাও হয়ে যাবে।"

প্রবীর বলল "শান্তি আমার সঙ্গে কাল ফিরতে পারবে ত? আমার কিন্তু পরশুর মধ্যে ফিরে যেতেই হবে।"

অভয়পদ বলল "কেন কি ব্যাপ্যার?"

প্রবীর বলল "একটা interview আছে। হয়ত একটা কাজ পেয়ে যেতে পারি বর্দ্ধমানে।

রামপদ বললেন "তাহলে ত খুব ভালই হয়। তোমার একটা চাকরি হলে আর শান্তির একটা ভাল বিয়ে হয়ে গেলে কনক অনেকটাই নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। আমরাও ত বুড়ো হয়ে পড়ছি, ছেলেপিলের দল এক এক করে settled হয়ে যাচ্ছে দেখে যেতে ইচ্ছা করে।"

অপুর বাবা একমনে খেয়ে যেতে লাগলেন। কনকলতার কথা উঠলেই এঁরা নির্ব্বাক ও গম্ভীর হয়ে যান।

অভয়পদ জিজ্ঞাসা করল "শান্তির কোথা থেকে সম্বন্ধ এসেছে জান নাকি? ছেলেটিকে কেউ দেখেছে?"

প্রবীর বলল "আমি দেখেছি দু একবার। দেখতে শুনতে ভাল, বেশ ভাল চাকরিতেও ঢুকেছে এখানে। ঘর ত ভালই। এখন তাদের মেয়ে পছন্দ হলেই হয়।

রামপদ বললেন "অপছন্দ করার মত মেয়ে শান্তি নয়। তবে তাঁদের যদি খুব টাকার দাবি থাকে তা হলে আলাদা কথা।"

অপু মনে মনে বলল "সে জন্তে ত আপনিই আছেন। সেখানেই বা জ্যাঠাইমার অভাব কি?"

প্রবীর বলল "সে রকম ত কিছু মনে হয় না। তাদের নিজেদের অবস্থা বেশ ভাল, ছেলের বিয়ে দিয়ে টাকা আদায় করার প্রয়োজন কিছু তাদের নেই। আমাদের বাড়ী প্রস্তাব পাঠিয়েছে যখন তখন টাকার প্রত্যাশা খুব করে না বোধ হয়। টাকা আমাদের নেই তা ত তারা জানেই।"

চা খাওয়া চুকে গেল। অপুর বাবা আবার গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। রামপদ কাজে বেরবার জন্যে প্রস্তুত হতে গেলেন। অভয়পদও কাজে যাবে, তবে একটু দেরিতে। সম্প্রতি সে প্রবীরকে নিয়ে গল্প করতে বসল। অপু অনুকে নিয়ে নিজের শোবার ঘরে ঢুকল। অনু জিজ্ঞাসা করল, "দুপুরে তোরা কখন খাস ভাই?

অপু বলল "তা আমার একটু দেরিই হয়। শ্বশুরমশায় আর তোর জামাইবাবু ত খেয়ে দশটার মধ্যে বেরিয়ে যান। তারপর বাচ্চাদের নাওয়ান খাওয়ান। দুটোই এত দজ্জাল, যে আমি আর আয়া হিম্‌সিম্ খেয়ে যাই। তারপর ত নিজের নাওয়া খাওয়া, বারোটা বেজেই যায়।"

ইতিমধ্যে ঊষা উমার আবির্ভাব। এতক্ষণ তারা আয়ার সঙ্গে কোথায় ঘুরছিল কে জানে। মায়ের খাটের উপর অপরিচিত মানুষ দেখে আবার তাদের মুখ ভার হতে আরম্ভ হল। তবে মানুষটা কিনা মেয়ে, আর কোথায় যেন একটু মায়ের মত দেখতে তাই রাগটা বেশীক্ষণ রইলনা। কথাও বলে বেশ মজা করে। কাজেই একটা আপোষ হয়ে গেল। কোলে নিলেও তাকে মারতে ইচ্ছা করলনা। চানের সময়ও সে মায়ের সঙ্গে বাথরুমে দাঁড়িয়ে রইল। মানুষটার নাম শোনা গেল "মাসী।" খাবার সময়ও সে এসে চেয়ারে বসল। ঊষা আর উমা এতে আপত্তি না করে খেয়ে নিল।

এরপর অপু অনুর স্নানের পালা, খাওয়ার পালা। রামপদর স্নানের ঘরে ওদিকে প্রবীর ও অপুর বাবা স্নান সেরে নিলেন। ভগীরথ তারপর ঘরটা একবার ভাল করে ধুয়ে দিল। বাবুর একটু পিটপিটানি আছে তা সে জানে। আর এসব পাড়াগেঁয়ে বুড়োদের কাণ্ডজ্ঞান কিছু কমই থাকে তাও সে জানে।

রামপদ আগেই খেয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, এইবার বাকি ক'জন খেতে বসল। টেবিলে খাওয়া অভ্যাস নেই অনু আর তার বাবার, তবু একরকম করে সারা হল।

অনেকরকম রান্না হয়েছিল, সকলেই তৃপ্তি করে খেল। ঊষা আর উমা বাবার চেয়ারের দু পাশে দাঁড়িয়ে আলু খেতে লাগল। এগুলি তাদের নিত্য বরাদ্দ, একদিন যদি অভয়পদর ভুল হয়ে যায়, এগুলি সমানভাবে বণ্টন করে দিতে তাহলে পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি হয়। একেবারে কান্নাকাটি পড়ে যায়। বাবার পাতের একটা আলুর অভাব একসের আলু রান্না করে দিলেও হয়না।

খাওয়ার পর এক একজন গেল এক এক দিকে। অভয়পদ কাজে বেরল, প্রবীর চলল তার মাসীমার বাড়ী। অপুর বাবা সজোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমতে লাগলেন। অপু আর অনু অপুর শোবার ঘরে বসে গল্প আরম্ভ করল। কত কথা জানবার আছে কত কথা জানাবার আছে। ঊষা আর উমাকে ঘুম পাড়িয়ে আদুরী সবে ঘর থেকে বেরিয়েছে, কাজেই গল্প খুব নীচু গলায় করতে হল।

অনু বলল "এই দুটো আলমারীই তোর জামা কাপড়ে ভর্ত্তি নাকি রে দিদি?"

অপু বলল "বাঁ দিকেরটার দু একটা তাকে তোর জামাইবাবুর কাপড় থাকে।"

অনু বলল "সে আর কত? বাকি সবই ত তোর? সুখে আছিস্ ভাই।"

অপু বল্‌ল "সুখ কি আর শুধু কাপড় জামা গহনা থাকলেই হয়? খাওয়া পরা থাকা কিছুর অভাব নেই বটে, কিন্তু মনে হয় সব যেন ভিক্ষে পাচ্ছি, আমার নিজের কিছু নয়। সবই যে তাদের দেওয়া এটা সারাক্ষণ মনে করিয়ে দেবার লোকের ত অভাব নেই?"

অনু বলল "তোর শ্বশুর বলে নাকি কিছু?"

অপু জিভ কেটে বল্‌ল "না, না, ওঁর সে স্বভাব নয়। যদিও ওঁর দৌলতেই সব, তবু ওসব কথা কোনোদিন তোলেন না। তাঁর ছেলের মনটা কিন্তু তাঁর মত হয়নি। চোরা চিমটি কাটছে সারাক্ষণই। সবার উপর আছেন পিসীমা, নাক ত তাঁর সিটকেই আছে।"

অনু বলল "তাই নাকি রে? আমি বলি খুব বুঝি আদরে যত্নে আছিস।"

অপু বলল "আদর যত্ন একেবারে নেই তা বলছিনা। খাওয়া পরা থাকার সুখ আছেই, তবে তার দাম ত দিতে হচ্ছে সকলের কাছে হাত জোড় করে? ঝি-চাকরগুলো শুদ্ধ আমার উপর সর্দ্দারি করে। আমি গরীবের মেয়ে সবাই জানে ত? ঊষা উমাও বড় হয়ে আমাকে মানবেনা দেখো।"

অনু বলল "ভাল জ্বালা, এর চেয়ে গরীবের ঘরে বিয়ে হওয়াও যে দেখি ভাল।"

অপু প্রায় আঁৎকে উঠে বলল "তা বলিস নে ভাই। সব অবস্থারই সুবিধা অসুবিধা ত আছে? এটাতে তবু সুবিধাগুলোই বেশী, অসুবিধাই কম। নিজে খাচ্ছি পরছি থাকছি ভাল, তোদেরও কিছু কিছু সাহায্য করতে পারছি। গরীবের ঘরে পড়লে নিজেও খেতে পেতামনা, কাউকে কিছু দিতেও পারতামনা।"

অনু বলল "তুই যে আমাদের এটা সেটা দিস সারাক্ষণ এতে জামাইবাবু কিছু বলেনা?"

"পূজোর সময় কাপড় জামা দিলে কিছু বলেনা, শীতের সময় গরম কাপড় দিলেও কিছু বলেনা, তবে টাকা পাঠাতে দেখলে রেগে যায়। সব সময় ত লুকিয়ে রাখা যায় না? ধরা পড়া যেতে হয়।"

অনু জিজ্ঞাসা করল, "সংসারখরচের টাকা তোর কাছে থাকে না?"

"তা থাকলে কি হবে? হিসাবের খাতায় সব হিসেব লিখতে হয় ত? সে ত লুকোবার জো নেই, তোর জামাই বাবুর হাতে পড়বেই।"

অপুর কাপড়ের আলমারী খুলে সব কিছু দেখানোও হল, অনেকক্ষণ ধরে। একটা ভাল রেশমের জামা আর একখানা রঙীন শাড়ী বার করে অপু বলল "বিকেলে গা ধুয়ে এই দুটো পরিস। না হলেই ছোট পিসী ঠাকরুণ নাক সিঁটকবেন। শান্তি আসবে সেও নিশ্চয়ই খুব সেজেগুজে আসবে।

আগ্রহের সঙ্গে শাড়ী আর জামা নিয়ে অনু বলল "তোর কাপড় বলে সবাই চিনে ফেলবে না ত?"

অপু বলল "আমার শাড়ী জামার অত কেউ খবর

রাখেনা ভাই। মেয়েমানুষ আর ত কেউ ঘরে নেই? সে থাকলে বরং ভয় ছিল। তোর জামাইবাবু গহনাগুলোর খুব হিসেব রাখেন, ভয় পাছে আমি বাপের বাড়ীতে কিছু দিয়ে দিই। এই গায়ে যা আছে তা ছাড়া সবই প্রায় ব্যাঙ্কে,' বাড়ীতে বেশী জিনিষ রাখতে দেয়না।"

অনু বলল "বাবাঃ কড়া পাহারা দেখছি। সব তোর হয়েও তোর নয়। মা এদিকে আশা করে বসে আছে যে, কাঁচের চুড়ি পরে বেড়াই দেখলে তুই হাতের গহনা কিছু একটা দিয়ে দিবি।"

অপু বলল "সে ভাই হবেনা। যদি বিয়ের ঠিকঠাক হয়, তাহলে যদি দিতে দেয়। মাকে বেশী আশা করতে বারণ করিস্। গরীবের মেয়ে বড়লোকের ঘরে বিয়ে হলেও তার শুধু ভোগের অধিকার, দেবার থোবার অধিকার নেই। দিতে হলেই কর্ত্তাদের অনুমতি নিতে হবে। তা তোর জামাইবাবু যা স্বার্থপর, ও কখনও অনুমতি দেবেনা। বরং শ্বশুরমশায়কে বললে তিনি মত দিতে পারেন, কিন্তু ও কখনও মত দেবেনা।"

গল্প করতে করতে কখন যে বেলা পড়ে গেছে তা দু বোনের খেয়াল নেই। উষা উমা এবার নড়ে উঠে বসবার লক্ষণ দেখাল। আদুরীও দিবানিদ্রা ত্যাগ করে উঠে এল। অপু বলল "এগুলোকে এবার দুধ জলখাবার খাইয়ে তবে আমি চুল বাঁধব, সেই সময় তোরও চুল বেঁধে দেব। অনেকরকম খোঁপা বাঁধতে শিখে গেছি এখন। বাবাকেও একটু ফরশা জামা কাপড় পরিয়ে রাখ, তাঁকে দেখতে ত আজ ডাক্তার আসবে।"

অপুকে এবার কাপড়ের আলমারী বন্ধ করে খুকীদের তত্ত্বাবধানে লাগতে হল। ঘুম ভাঙতেই তাদের প্রথম একবার মারামারি লেগে যায়। তারপর দুধ খাওয়া মিষ্টি খাওয়া, চুল আঁচড়ান, জুতো মোজা পরা, ফরশা ফ্রক পরা, সব একটার পর একটা চলতে থাকে। সবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তারা বেড়াতে বেরিয়ে গেলে তখন অপু আর অনু চুল বাঁধতে বসল। চুল বাঁধা গা ধোওয়া শেষ করে সবে তারা কাপড় জামা বদ্‌লাচ্ছে, এমন সময় রামপদ ফিরে এলেন। ভগীরথ তাড়াতাড়ি করে তাঁর চায়ের জোগাড় করতে লাগল। অপু বলল "আজ দেখি ইনি বেশ আগে আগে ফিরেছেন।

তাড়াতাড়ি শাড়ী পাল্টে নিয়ে সে বলল "আমি যাই ভাই, ওঁর চাটা ঢেলে দিয়ে আসি।"

অনু বলল "উনি তোমাদের সঙ্গে খান না কেন ভাই?'

অপু বলল "ওঁর সবই ত আগে আগে, তারপরই সব ছেলেরা আসে ওঁর কাছে পড়তে। আমাদের সঙ্গে খেতে গেলে ওঁর দেরি হয়ে যায়।"

অপুকে দেখে রামপদ বললেন "তোমার বাবা বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছেন ত? আমাদের ডাক্তারবাবু একটু পরেই আসবেন ওঁকে দেখতে।"

অপু বলল "অনুকে পাঠাচ্ছি দেখতে। সে ওঁকে তৈরি করে রাখবে।"

রামপদ বললেন "ডাক্তারবাবু যেমন যেমন উপদেশ দেবেন, সেগুলি যেন ঠিকমত পালন করা হয়, নইলে এখানে এসে লাভ হবেনা কিছু। অনু একলা না পারলে তুমিও সঙ্গে সঙ্গে দেখবে।"

রামপদর চা খাওয়া হয়ে যেতেই তিনি নিজের ঘরে চলে গেলেন। অপু ঘরে গিয়ে অনুকে বলল "চল এবার বাবাকে ঠিকঠাক করে রাখি। ফরশা জামা কাপড় আছে ত?"

অনু বলল "আছে।"

ক্রমশঃ

চতুষ্পাদ ব্রহ্ম

মণিকণা গুপ্তভায়া

জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে শ্রীঋষভচাঁদ চতুষ্পাদ ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মাণ্ডুক্য উপনিষৎ হইতে তিনি চতুষ্পাদ ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন। মাণ্ডুক্যে বলা হইয়াছে চতুষ্পাদ ব্রহ্মের প্রথমপাদ জাগরিত স্থান; দ্বিতীয়পাদ স্বপ্নস্থান, তৃতীয়পাদ সুষুপ্তস্থান, এবং চতুর্থপাদ প্রপঞ্চের উপশম বা বিরাম স্থান। তিনিই আত্মা এবং তিনিই বিজ্ঞেয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও চতুষ্পাদ ব্রহ্মের কথা উপদেশ করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে চতুষ্পাদ ব্রহ্মের প্রথম পাদের নাম প্রকাশবান্, দ্বিতীয় পাদের নাম অনন্তবান্, তৃতীয় পাদের নাম জ্যোতিষ্মান্ এবং চতুর্থপাদের নাম আয়তনবান্। শ্রীঋষভচাঁদজীর প্রবন্ধের অনুবৃত্তি বা পরিশিষ্টরূপে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ব্রাহ্মণ' শীর্ষক কবিতায় ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত জাবালা-নন্দন সত্যকামের আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। গুরু গৌতম সত্যকামের সত্যনিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—

—অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত!
তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলজাত।

গৌতম অতঃপর সত্যকামের উপনয়ন সংস্কার করিয়া „কৃশানামবলানাং চতুঃশতা গা নিরাকৃত্য উবাচ" ("নিজের গোশালা হইতে চারিশত কৃশ ও দুর্ব্বল গাভী বাহির করিয়া সত্যকামকে দিয়া বলিলেন) "ইমা সোম্যানু সংব্রজেতি" (হে সৌম্য ইহাদের লইয়া যাও এবং সেবা কর)

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সত্যকাম ঐ সকল ধেনু লইয়া বহির্গমনকালে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন 'এক সহস্র হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ গোধন না লইয়া ফিরিবনা।' তরুণ ব্রহ্মচারী. দুর্গম অরণ্যমধ্যে একটি 'তৃণোদক বহুলং' (প্রচুর তৃণ ও জলপূর্ণ) স্থানে প্রবেশ করিয়া সেই চারিশত ধেনুর অক্লান্ত সেবায় ও কঠোর তপস্যায় বহুবৎসর অতিবাহিত হইবার পর ধেনুর সংখ্যা এক সহস্রে পরিণত হইল। কিন্তু সত্যকাম তাহা লক্ষ্য করেন নাই। দেবগণ তাহার কঠোর তপস্যা এবং ধেনুগণের অক্লান্ত সেবায় পরিতুষ্ট হইলেন।

একদিন বায়ু দেবতা ঐ ধেনুর পালের মধ্যে বৃহত্তম বৃষটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "আমরা সহস্র সংখ্যক হইয়াছি, সুতরাং আমাদের আচার্য্যগৃহে লইয়া চল।" তারপর পুনরায় বলিলেন "ব্রহ্মণশ্চ তে পাদং ব্রবানীতি"—সত্যকাম! তোমাকে ব্রহ্মের পাদ সম্বন্ধে বলিব। সত্যকাম বলিলেন "ব্রবীতু মে ভগবানিতি" ভগবন্ উপদেশ করুন।

'তস্মৈ হোবাচ প্রাচী দিক্কলা প্রতীচি দিক্কলা দক্ষিণা দিক্কলোদীচী দিক্ কৈষ বৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ প্রকাশবান্নাম।'—বৃষভ রূপী বায়ুদেব তাঁহাকে বলিলেন হে সৌম্য! এই পূর্ব্বদিক ব্রহ্মের একপাদের এককলা (চতুর্থাংশ); এই পশ্চিম দিক্ এককলা, দক্ষিণ দিক্ এককলা এবং উত্তর দিক্ এককলা। এই চারিকলার সমষ্টিতে ব্রহ্মের প্রকাশবান্ নামক প্রথম পাদ। "য এতমেবং বিদ্বাং-চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণঃ প্রকাশ বানিত্যুপাস্তে, প্রকাশবানস্মিল্লোকে ভবতি, প্রকাশবতো হ লোকান্ জয়তি।' যিনি ব্রহ্মের চতুষ্কল প্রকাশবান্ পাদ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি

ইহলোকেই প্রকাশবান্ (অর্থাৎ প্রখ্যাত) হ'ন এবং দেহান্তে প্রকাশবান্ (অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়) দেবাদিলোক সকল জয় করেন। পরিশেষে বায়ুদেব বলিলেন 'অগ্নিষ্টে পাদং বক্তেতি।' অর্থাৎ অগ্নি তোমাকে ব্রহ্মের আর এক পাদের কথা বলিবেন।

পরদিবস সত্যকাম সহস্র ধেনু লইয়া গুরু গৌতমের আশ্রমাভিমুখে রওনা হইলেন। পথিমধ্যে সন্ধ্যাকালে ধেনুসকল একস্থানে রক্ষা করিয়া হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া হোম ও বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া প্রশান্তভাবে উপবিষ্ট হইলেন। কিয়ৎকাল পরে অগ্নি তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মণঃ সোম্য! তে পাদং ব্রবানীতি", আমি তোমাকে ব্রহ্মের একপাদের কথা বলিব। সত্যকাম উত্তর করিলেন "ব্রবীতুমে ভগবানিতি" ভগবন্ উপদেশ করুন। অগ্নিদেব বলিলেন "পৃথিবীকলা, অন্তরিক্ষং কলা দ্যোঃ কলা, সমুদ্রঃ কলা, এষ বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণঃ অনন্তবান্নাম"—এই পৃথিবী এককলা, অন্তরিক্ষ এককলা, দ্যুলোক এককলা এবং সমুদ্র এককলা। এই কলা চতুষ্টয়ের সমষ্টিতে ব্রহ্মের দ্বিতীয় পাদ। এই পাদের নাম অনন্তবান্। "স য এতমেবং বিদ্বাং শ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণোঽনন্তবানিতু পাস্তে, অনন্তবানস্মিংল্লোকে ভবতি, অনন্তবতো হ লোকান্ জয়তি।" ব্রহ্মের এই কলাচতুষ্টয় বিশিষ্ট দ্বিতীয় পাদকে যিনি অনন্তবান্ রূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে অনন্তবান্ হ'ন। অর্থাৎ অক্ষয় মহিমালাভ করেন এবং দেহান্তে অনন্ত (অক্ষয়), লোক সকল জয় করেন। পরিশেষে বলিলেন "হংসস্তে, পাদং বক্তেতি।" হংস তোমাকে অপর এক পাদের কথা বলিবেন।

পর দিবস সহস্র ধেনু লইয়া পথ অতিবাহন করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ধেনুগণের যথাযোগ্য বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া সত্যকাম হোম বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া প্রশান্তভাবে উপবেশন করিলেন। কিয়ৎকাল পরে আদিত্যদেব একটি উজ্জ্বল হংসরূপ ধারণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া সত্যকামকে বলিলেন "ব্রহ্মণঃ সোম্য! তে পাদং ব্রবানীতি" সত্যকাম বলিলেন "ব্রবীতু ভগবানিতি," হংস বলিলেন "অগ্নিকলা, সূর্য্যঃকলা, চন্দ্রঃকলা বিদ্যুৎকলা এস বৈ সোম্য! চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মান্নাম"—এই অগ্নি এককলা, সূর্য্য এককলা, চন্দ্র এককলা এবং বিদ্যুৎ এককলা। এই চারিকলার সমষ্টিতে ব্রহ্মের তৃতীয়পাদ, এই পাদের নাম জ্যোতিষ্মান্। "স য এতমেবং বিদ্বাং-শ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণো জ্যোতিষ্মতো হ লোকান্ জয়তি।" যিনি ব্রহ্মের এই জ্যোতিষ্মান্ পাদ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে জ্যোতিষ্মান্ (দীপ্তিমান্) হ'ন এবং দেহান্তে জ্যোতিষ্মান্ লোক সকল জয় করেন। পরিশেষে বলিলেন—"মদ্গুষ্টে পাদং বক্তেতি"—মদগু (অর্থাৎ পানকৌড়ি 'নামক জলচর পক্ষী) তোমাকে চতুর্থপাদের কথা বলিবেন।

পথ অতিবাহনের চতুর্থ দিবসে যথারীতি সান্ধ্য হোমাদির পর প্রশান্তভাবে প্রতীক্ষমান সত্যকামের নিকট সাক্ষাৎ প্রাণশক্তি মদগুরূপ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন—তোমাকে ব্রহ্মের চতুর্থপাদের কথা বলিব। সত্যকাম বলিলেন—ভগবন উপদেশ করুন। মদগু বলিলেন "প্রাণঃ কলা চক্ষুঃ কলা, শোত্রং কলা, মনঃ কলা। এষবৈ সোম্য চতুষ্কলঃ পাদো ব্রহ্মণ আয়তনবান্নাম।" অর্থাৎ প্রাণ এককলা, চক্ষু এককলা, শোত্র (কর্ণ) এককলা, এবং মন এককলা। এই কলা-চতুষ্টয়ের সমষ্টিরূপে ব্রহ্মের চতুর্থ পাদের নাম আয়তন-বান্। (টীকাদিতে বলা হইয়াছে এইখানে আয়তন শব্দে মনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে কারণ সর্ব্ব ই'ন্দ্রিয়পথে যে সকল ভোগ্য পদার্থ আহরিত হয়, মনই সেই সকল ভোগ্যের আয়তন বা অধিষ্ঠান।

"স য এতমেবং বিদ্বাংশ্চতুষ্কলং পাদং ব্রহ্মণ আয়তন—বানিত্যুপাস্তে আয়তনবানস্মিংল্লোকে ভবতি। আয়তন-বতো হ লোকান্ জয়তি।" যে ব্যক্তি ব্রহ্মের এই আয়তনবান্ পাদ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি ইহলোকে আয়তনবান্ হ'ন (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট আশ্রয়প্রাপ্ত হন) এবং দেহান্তে উৎকৃষ্ট আশ্রয়-স্থলরূপ লোকসমূহ জয় করেন।

জব্বলপুরে তিনদিন

রামপদ মুখোপাধ্যায়

ঔরঙ্গাবাদ থেকে আসছিলাম জব্বলপুর। কিলো-মিটারের হিসাবে পথ খুব দীর্ঘ নয়—কিন্তু ট্রেনে করে পৌঁছতে সময় লাগে চব্বিশ ঘন্টারও বেশী। এর কারণ ব্র্যাঞ্চ লাইনের সঙ্গে মেন লাইনের ট্রেনের যোগাযোগটা অস্বস্তিকর। মনমদ জংশনে গাড়ী বদল করে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করতে হয় বোম্বাই থেকে আসা ট্রেনের জন্য। আমরা মনমদে পৌঁছেছিলাম বেলা সাড়ে তিনটেয়—আর কলকাতাগামী বোম্বাই মেল (ভায়া এলাহাবাদ) ধরেছিলাম রাত সাড়ে বারোটায়। কি দুঃসহ দীর্ঘক্ষণের প্রতীক্ষা। অথচ আর আধ ঘন্টা আগে যদি মিটার গেজের গাড়ীটা আসত মনমদে কিংবা সংযোগরক্ষাকারী সেই আগের ট্রেনটা বোম্বাই থেকে ছাড়তো মিনিট চল্লিশেক পরে তাহলে যাত্রীদের এমন দুর্ভোগ ভুগতে হতো না। রেলের সময় তালিকায় এই সংশোধন-যোগ্য সংযোগসাধন কি একেবারেই দুঃসাধ্য।

এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবকাশে মনমদের চেহারাটা দেখে নিলাম। স্টেশন যত জমকালো, শহর তেমন নয়। কয়েকটি মাত্র ভাল পাকা রাস্তা। দোকানপাট বাড়ী ঘর ইস্কুল ডাকঘর বাজার মায় সিনেমা পর্য্যন্ত যা কিছু জাঁকজমক ঐ স্টেশন ঘেঁষেই। জায়গাটা নেহাতই যাত্রী-নির্ভর বলে বোধ হল। বাসিন্দাদের দেখে এটা যে স্বাস্থ্যকর স্থান তাও বুঝা গেল। শহরটা ক্রমশঃই বাড়ছে। নতুন নতুন ইমারৎ পথঘাট তৈরী হচ্ছে—জনতার চাপ বাড়ছে—ব্যবসা-বাণিজ্যও জমজমাট হচ্ছে।

শহরে খানিটা ঘুরে স্টেশনে এসে বসলাম। যত রাত বাড়ছে,—ট্রেনের আসা যাওয়া কমে আসছে। স্টেশন প্লাটফর্ম্ম আর জনকোলাহলে কর্ম্মচঞ্চল নয়। বেশির ভাগ তেওয়ার শহরে চলে গেছে। যারা আছে—তারা চায়ের অথবা বই বা খাবারের স্টলের সামনে নিজ নিজ বিক্রেয় জিনিষগুলি গুছিয়ে রেখে গল্পের আসর বসিয়েছে। আমাদের প্রতীক্ষালয়ের সামনে অমনি একটি আসর বসল। স্টেশনের সীমানায় সেইটিই সব চেয়ে জমজমাট আসর মনে হল!

এখানে প্রথমে এসে বসল নীলকুর্ত্তাধারী কয়েকটি জমাদার। এরা একটু আগে ঝাড়ু হাতে ষ্টেশনের চার পাঁচটি প্ল্যাটফরম পরিষ্কার করে বেড়াচ্ছিল। ট্রেনের গতায়াত বিরল হওয়াতে যাত্রীসমাগমও রইল না—অবসর পেয়ে এরাও একটু হাত পা ছড়িয়ে বাঁচল। কেউ পা ছড়িয়ে বসল—কেউ বা সটান শুয়ে পড়ল প্ল্যাটফরমে। হাতের তালুতে খৈনী দলতে দলতে গল্প জুড়ে দিল কোন কোন জন। ঝাড়ুদার ছাড়া কয়েকজন মজুরও এখানে এসে জমল। এরাও দিনের প্রসঙ্গ তুলে হাসি গল্পে মাতল,—এককলি গানের ধুয়ায় কৃষ্ণ বিরহের বেদনাকে মূর্ত্ত করে তুলল। এইসব কিন্তু এতক্ষণ ছাড়া ছাড়া ভাবে চলছিল—আসর জমজমাট হয়ে উঠল এক বিশালকায় জমাদারের আগমনে। সে এসে ঝাড়ু গাছা মেঝের রেখে—মাথার পাগড়ীটা খুলে—প্ল্যাটফরমের ধুলো ঝেড়ে বসতেই ওরা সবাই চঞ্চল হয়ে উঠল। ওদিক থেকে—জমাদারের দল, এ দিক থেকে মজুরের দল সরে এসে ওকে ঘিরে বসল।

জমাদার গম্ভীর গলায় বলল, রাম রাম ভাইয়া—কেয়া খবর?

খবর তো আপ কো পাস—রামজী কা কহানী—তো শুনাইয়ে ভেইয়া। রামজী তো অযোধ্যা সে রাজপাট

ছোড়কর লছমন আওর সীতা মাঈকী সাথ চিত্রকূট আ গ্যয়ি—

জমাদার হেসে বলল, বহোৎ আচ্ছা—পহেলে চায় তো পিলাও।

মুখের কথা খসতে না খসতে দু-তিন জন উঠে গেল চা আনতে। একেবারে দু' পিয়লা চা এসে গেল।

চা পান করে গল্প বলতে বসল জমাদার।

চমৎকার ওর গল্প বলার ভঙ্গি।। ভরাট দানাদার গল্প কাহিনীর দুঃখ আনন্দে আরোহ অবরোহ ছন্দে সুর-তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলেছে অনায়াস গতিতে। যেন কথক-ঠাকুর বেদীর উপরে বসে রামায়ণ কাহিনী ব্যাখ্যা করছেন।

আসর জমে উঠল। প্রতীক্ষালয়ের বাইরে এসে আমি দাঁড়ালাম আসরের একধারে—আরও কয়েকজনকে দেখলাম চায়ের ষ্টল থেকে—খাবারের ষ্টল থেকে—কয়েকজন প্রতীক্ষ-মান যাত্রীও আরামশয্যা ছেড়ে সেই আসরকে এসে পরি-পুষ্ট করল।

বহুবার শোনা কাহিনী। তবু কি অদ্ভুত কৌতুহল, কি অকপট শ্রদ্ধা ভক্তির প্রকাশ। এরা নিশ্চয় শিক্ষার স্বাদ তেমন পায়নি। সমাজের যে স্তরে এদের বাস—সাংস্কৃতিক দ্যুতিতে সে স্তর আলোকিত নয়—তবু কাব্য-কথায় অমৃতরস পানের স্বভাবগত এই তৃষ্ণা এদের কোথা থেকে এলো। কাল্পনিক কাহিনী জীবনসত্তাকে এমন করে আচ্ছন্ন ও আলোড়িত করে কোন্ যাদু মন্ত্রে—যে জীবন আধ্যাত্ম-চিন্তা স্বাদে তিল মাত্র উন্মুখ নয়।

সেই মুহূর্ত্তে মনে হল—এ হলো ভারতবর্ষের আদি-কালের রূপ। তথাকথিত শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে এর মূল্য যাচাই করা নিরর্থক। আমাদের দেশেও তো দেখেছি পুঁথিপত্র পড়ে যে বড় বড় তত্ত্বগুলো পণ্ডিতজনেরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না—অক্ষরজ্ঞানহীন সরল চাষীরা তা অনায়াসে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে থাকে। শিক্ষা-লয়ের চেয়ে রামায়ণ মহাভারতের আসরগুলিই তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানে সচেতন করে তোলে। তারা মুখেই শুধু বড় বড় কথা বলে না, কাহিনীগত উপদেশের তাৎপর্য্য জেনে নিয়ে দুঃখ শোক বিপদে আশ্চর্য্য ধৈর্য্য দেখায়। এই শিক্ষা তাদের জীবনকে অদ্ভুতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। জন্ম-মৃত্যুর আলো অন্ধকার তাদের সুখ দুঃখে বিচলিত করে সামান্তক্ষণের জন্য। চলমান সংসারের জীবন ছন্দে নিজেদের জীবনকে স্বচ্ছন্দে তারা মিলিয়ে নিতে পারে।

আসর চলল—প্রায় ঘণ্টা খানিক ধরে। তারপর গাড়ী আসার সঙ্কেতধ্বনি হতেই ওরা—'জয় রাজা রামচন্দ্র কি জয়' ধ্বনি দিয়ে আসরের অবসান ঘোষণা করল।

তন্দ্রাচ্ছন্ন ষ্টেশন আবার সজাগ হয়ে উঠল—দেখতে দেখতে গাড়ী এসে গেল।

জব্বলপুরে পৌঁছালাম পরের দিন বেলা একটায়।

ষ্টেশন থেকে মাত্র দু ফার্লং দূরে ছিল আমাদের গন্তব্য স্থান। রাজা গোকুল দাসের ধর্ম্মশালা। কিন্তু ভিন্ দেশী মানুষ দেখলে সর্ব্বত্র যা দস্তুর—এখানকার গাড়োয়ান তার অন্যথা করল না। ভাড়াটা আদায় করল দ্বিগুণেরও বেশী।

ধর্ম্মশালায় জায়গা ছিল প্রচুর, ম্যানেজার ছিলেন না। আমরা অপরাহ্নকাল পর্য্যন্ত তাঁর আশায় বসে রইলাম। তিনি আর একটি সরকারী দফতরে কাজ করেন—এখান-কার পদটি অবৈতনিক।

চমৎকার একটি উদ্যানের মধ্যে ধর্ম্মশালাটি—দু'ভাগে ভাগ করা। এক ভাগে প্রাসাদোপম দ্বিতল অট্টালিকা—অন্য অংশে প্রতীক্ষালয়ের মত টাইলের ছাউনি বড় বড় হল ঘর। আর সুবিস্তৃত উঠোনের একধারে রেলওয়ে কোয়ার্টারের মত এক কুঠরি ওয়ালা বাসগৃহ কয়েকখানি। সেগুলিতে স্থায়ী বাসিন্দারা থাকেন মনে হয়! হল-ঘরে অনাহূত রবাহুতরা অনবরত আসা যাওয়া করছে। আহ্বান নাই বিসর্জ্জন নাই—কারও অনুমতির অপেক্ষাও কেউ করছে না। মোটঘাট কাঁধে ফেলে গেট পেরিয়ে সোজা চলে যাচ্ছে ছাউনির মধ্যে। গাঁটরি খুলে লোটা কম্বল চাল আটা তৈজসপত্র বার করছে। মুখ হাত ধুয়ে কিংবা না ধুয়েও উঠোনে একটা চুল্লী জ্বালিয়ে বেশ দশাসই খান-কয়েক চাপাটি বানিয়ে নিয়ে ভোজনপর্ব্ব সেরে কেউ বা সেই কম্বলে চিৎ হয়ে শুয়ে খানিক জিরিয়ে নিচ্ছে—কেউ বা লোটা কম্বল গুছিয়ে নিয়ে গেট পার হয়ে চলে যাচ্ছে!

পিঠে গাঁটরি, হাতে চৌদ্দ পোয়া লাঠি, মুখে ভজন গানের কলি অথবা জয় সীতারাম ধ্বনি। দিব্য স্বচ্ছন্দে স্রোতের শ্যাওলা ভেসে চলেছে নদী ধারা বেয়ে। আমাদের মত ঘাটে ঘাটে নোঙর ফেলে আরাম কুড়োতে গিয়ে সময়কে ভারী করছে না। যতবারই একরাশ মোট-ঘাট নিয়ে আশ্রয়-সন্ধানে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অধীর হয়েছি—ততবারই মনে হয়েছে—এরাই সুখী। এদেরই অধিকার আছে যথার্থ অর্থে দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ পদযাত্রাই তো বৃদ্ধি করে আনন্দের সঞ্চয়।

ঘরে আশ্রয় পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। আমাদের আনন্দ শর্ত্তাধীন।

কিন্তু জব্বলপুরে পৌঁছালাম মানেই যে মর্ম্মর শৈলের কাছটিতে এসে পড়লাম তা নয়। এখান থেকে নর্ম্মদার দূরত্ব অনেকখানি। ষ্টেশন থেকে শহর এক মাইলেরও কিছু বেশী—আর বাস ষ্ট্যাণ্ড পাকা দু'মাইল। বাস-ষ্ট্যাণ্ড থেকে নর্ম্মদা আরও তেরো মাইল। নর্ম্মদার সবচেয়ে নামকরা ঘাট হল ভেরাঘাট যেখান থেকে নৌকা ছাড়ে মার্বেল রক-দর্শনার্থীদের নিয়ে।

আজ আমাদের পূর্ণ বিশ্রাম। পরের দিনও তাই। আগে শহরের চেহারাটা ভাল করে দেখে নিই—তারপরে তেরো মাইল দূরে ভেরাঘাটে ভেড়া যাবে। হাঁ—ওই অর্থই ঘাটের। যেখানে ভেড়ে মানুষ—মানে মিলন হয় পরস্পরের। কিসের মিলন। সেটাও দেখলাম কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলায় কল্যাণে। কি বিপুল জনস্রোত চলেছে সেই পথে! সে আর একটি অবিচ্ছিন্ন গতি নদীধারা।

আগের দিন পরিচয় হল শহরের সঙ্গে। বেশ ছোট খাটো শহর—দূরে রজত রেখা নিকটে তরঙ্গ মাত্র। সেই আদি যুগের পুরাতন পথ ঘাট—বাড়ী ঘর মহল্লা চক ইত্যাদি। নূতনের সংযোজনও হচ্ছে। তার বাহার খুলেছে ষ্টেশনে আসার দুধারের মাঠগুলিতে। চওড়া পথ—আধুনিক ডিজাইনের ভবন—পার্ক…দু'টি কালের নমুনা পাশাপাশি সাজানো। পুরাতন পথগুলি এখানে নূতন নাম নিচ্ছে কিনা জানি না—কিন্তু নূতন পথ এই কালের ইতিহাসকে স্মরণ করাতে চাইছে। ষ্টেশন থেকে শহরে আসার সোজা পথটির নাম শরৎ বসু রোড। প্রায় মাইলখানিক এসে তার হাত ধরেছে সুভাষ বসু। দু-ভাইকে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে হাত ধরে দাঁড়াতে আর কোথাও দেখিনি। আবার আমরা যে পথটায় রয়েছি এটার নাম বিনোবাভাবে রোড। এতে স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের সম্মান দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতিটি নামকরা সহর একই নামাঙ্কিত নামাবলী গায়ে চাপিয়ে কি বৈচিত্র হারাচ্ছে না? সেই সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে না ঐতিহ্য ইতিহাস লোকরঞ্জক কোন কাহিনীর সূত্র? আমরা তো কলকাতায় প্রতি বছর এই দৃশ্য দেখছি। তার প্রাচীনত্বকে ইতিহাস ঐতিহ্যকে মুছে দেওয়ার এই অশোভন ব্যগ্রতা লক্ষ্য করছি! পুরাতন কালের চিৎপুরের যে বাস্তব অকপট ছবি রয়েছে হুতোমের নক্সায়—আজ নবীন কালের পাঠ করা বই পড়ে নামের সূত্র ধরে কখনো কি সেই ছবিটির সন্ধান পাবেন! চির-স্থায়ী বন্দোবস্তের কথা রাস্তা দেখলেই মনে পড়বে এটুকু চিহ্ন তো আর কলকাতায় নেই। না কি ওটার প্রয়োজন নেই আদৌ—যেহেতু জমিদারি প্রথাটা আজ সমূলে উৎ-পাটিত হয়েছে। এখন রাস্তা দেখে ইতিহাসের স্মৃতি মনে জাগবে না—ইতিহাস পড়ে রাস্তাটা কোনখানে ছিল অনু-মান করে নিতে হবে। পরিবর্ত্তন যে আদৌ উচিত নয়—এমন কথা কেউ বলবে না। যেসব রাস্তা নেহাৎই অনামী অথবা প্রসিদ্ধ কোন নাম বা ঘটনার সঙ্গে নিঃসম্পৃক্ত—তাদের অঙ্গে নামী পুরুষের নামের অলঙ্কার গৌরব বর্দ্ধক প্রশংসার কথা। দৃষ্টান্তস্বরূপ সেন্ট্রাল অ্যাভিনু রসা রোড প্রভৃতির কথা বলা যায়! কিন্তু বহুখ্যাত নামকে মুছে নূতন নামকরণ যেন মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির প্রকাশ—এক ধর্ম্ম মন্দিরকে অন্য ধর্ম্ম মন্দিরে রূপান্তরিতকরণ। শ্রদ্ধা-নিবেদনের এই সুলভ পন্থা গ্রহণের রীতি সর্ব্বত্র সুষ্ঠু কিনা ভেবে দেখা উচিত।

বাস-ষ্ট্যাণ্ডএ খবর নিয়ে জানা গেল—ভেরাঘাটের বাস ছাড়ে তিন বার—সকাল আটটায়, এগারোটায় আর অপরাহ্নে। ভেরাঘাট থেকে ফিরে আসার শেষ বাস পাঁচটায়।

বাস-ষ্ট্যাণ্ডে খবর নিয়ে জানা গেল, আগামীকাল এই নিয়ম থাকবে না। আগামীকাল থেকে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলা বসবে নর্ম্মদা তীরে, দূর দূরান্তর পল্লী থেকে আসবে অসংখ্য যাত্রী—বাস চলবে সারাদিন ধরে। তেমন তেমন ভিড় হলে দশ পনেরো মিনিট অন্তর বাস ছাড়বে। ভরসার কথা। আবার আশঙ্কার কথাও। সেই প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে আসা-যাওয়ার কষ্টও তো বড় কম নয়।

কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অসুবিধা কিছু ঘটল না। একখানা বাস ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় খানিতে ভালভাবে বসতে পারলাম। রাস্তাটা ভালই। ভরসা হল—এক ঘন্টার মধ্যেই যথাস্থানে পৌঁছে যাব। কার্য্যত তা হলো না। বাস যতই এগিয়ে চলে—ততই তার গতিবেগ কমে আসে। পথ চওড়া হলে কি হবে—সারা পথ জুড়ে চলেছে সাইকেল সাইকেল-রিক্‌শা, টাঙ্গা, একা আর অতিকায় গোযান। গোযানের সংখ্যাই বেশি। একে তো মন্থরগতি যান—তার উপরে তিন চারটি পরিবারের এত রকমের মানুষ, গৃহ-পালিত পশু। রন্ধন শয়নের যাবতীয় সাজসরঞ্জামের বস্তাতে আকণ্ঠ বোঝাই। এক মাসের শিশু থেকে অশীতি-পর বৃদ্ধ বৃদ্ধারা, খাঁচাশুদ্ধ শুকপাখী, মার্জ্জার, সারমেয়, ছাগল সবাই পুণ্য স্নানার্থী। এমন দশ বারোটি গোযান মিলিয়ে গোটা একখানা গ্রামই চলেছে নর্ম্মদার পুণ্য সৈকতে। এই গ্রামের সংখ্যাও বড় কম নয়।

যানবাহনকে পাশ কাটাতে কাটাতে বাসের গতি হল মন্থর। দেড় ঘন্টারও বেশি লাগল বারো মাইল পথ অতি-ক্রম করতে। বাকি এক মাইল পেরুলে ভেরাঘাট। কিন্তু যান-নিয়ন্ত্রণের আইনে সেই পথটুকুন দুস্তর হয়ে রইল। অগত্যা পদযানের শরণাপন্ন হতে হল।

এখন পথের দু'ধারে বসেছে দোকান। খাবারের, খেলনার, ফল ফুলারির নিত্য ব্যবহার্য্য ঘরগৃহস্থালী দ্রব্যের অসংখ্য অস্থায়ী দোকান। এর মধ্যে পনেরী অর্থাৎ আখের পাহাড় আর পাথরের শিল নোড়া জাঁতার স্তূপই বেশি করে চোখে পড়লো। ডিসেম্বরের প্রথম, সূর্য্য তবু চোখ পাকিয়ে আকাশে উঠেছেন। দৃষ্টির স্পর্শ মোটেই সুখকর নয়। ঢালু পথ দিয়ে হুড় হুড় করে নামছে মানুষের স্রোত। পথ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই—স্রোতে না ঢেলে দিলেই হল। নর্ম্মদার উচ্চাবচ চরভূমিতে আর একটি সমুদ্র এসে মিশছে—তার কল্লোলধ্বনি শ্রুতিস্পর্শ করল। নদীকে দেখলাম বাঁকা একখানা তলোয়ারের মত পড়ে আছে। বিস্তীর্ণ নয়, বেগবতী নয়, ভারি শান্ত শিষ্ট নিরীহ চেহারার নদী।

একটা সাঁকো পেরিয়ে অপর পারে এলাম। পথের মানুষকে মাঝে মাঝে শুধোতে লাগলাম মার্বেল-রক আর কতদূর? কেউ বলল, জানি না— কোন কোন জন ফ্যাল-ফ্যাল্ করে চেয়ে রইল, নামটা যেন এই প্রথম শুনছে; কেউ বলল, থোড়া দূর। অস্থায়ী স্বেচ্ছাসেবকদের শুধোলাম—তাদের জবানও একরূপ। থোড়া দূর। বাংলার পল্লীতে মাঠ ময়দান অতিক্রম কালে এমনি আশ্বাসকার একটি কথা প্রায়ই শোনা যায়—কোশখানেক পথ। ডালভাঙা ক্রোশ। অর্থাৎ পথ চলতে চলতে পথিক একটা গাছের ডাল ভেঙে নেয় হাতে—যতক্ষণ না হাত ভেঙে আসবে সেটা হাতে থাকবে। ভার-অসহ্য লাগলে সেটা যে জায়গায় ফেলবে—সেই দূরত্বই এক ক্রোশের নিশানা। আমরাও তেমনি থোড়া দূর শুনতে শুনতে ভেরাঘাট পেরিয়ে এলাম। নদী থেকে পাড়টা চার পাঁচ তলা সমান উঁচু, আর দুধারে বাড়ী-ঘর আর মানুষজনের ভিড় থাকায় ঘাটের নিশানা ঠিক করা যায় নি। সামনে মানুষ—পিছনে আর পাশেও মানুষ সব মানুষই চলছে একটি নদীস্রোতের মত—সেই স্রোতে মার্বেল-রকের নিশানা হারিয়ে গেল। তবু মাঝে মাঝে মার্বেল রকের কথা জিজ্ঞাসা করছি।

একজন প্রবীণ বলল, প্রপাত? থোড়া দূর।

নতুন কথা শুনলাম—প্রপাত। ভাবলাম—সেইখানেই বুঝি মার্বেল-রক। নামটা আগেও শুনেছিলাম স্মরণ ছিল না। এখন শব্দটা কানে যেতেই মনে হল—তাইত মার্বেল রকের মত এই নর্ম্মদা প্রপাতটিও তো কম আকর্ষণীয় নয়।

চললাম এবার প্রপাত লক্ষ্য করে।

খানিক এগিয়ে ছোট মত একটা পাহাড়ের কোলে এলাম। সেই পাহাড়ের উপরে দেখা গেল একটি মন্দিরের নিশানা। সরকারী বিজ্ঞপ্তি পড়ে জানা গেল—এটিরও

ইতিহাস আছে—আটশো বছরের পুরানো ইতিহাস। স্থির করলাম—ফিরবার কালে এটি দেখে যাব—এখন অতগুলি সিঁড়ি ভেঙে দেহকে ক্লান্ত করব না।

ইতিমধ্যে বেলা বাড়ছে—রোদ চড়া হচ্ছে—সর্ব্বাঙ্গ স্বেদসিক্ত। তবু সোৎসাহে এগিয়ে চলেছি প্রপাত দেখব বলে। এমনি করে দু'মাইলেরও কিছু বেশি পথ অতিক্রম করে আমরা প্রপাতের ধারে পৌঁছলাম। কিন্তু মার্ব্বেল-রক এখনও অদৃশ্য। তা হোক—প্রপাতের সামনে বসে তার গর্জ্জন উল্লম্ফন ও গতি তৎপরতা দেখে এতক্ষণের জমা-করা শ্রান্তি ক্লান্তি নিমেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। এখানেও যাত্রীর ভিড় ঠেলাঠেলি। সবচেয়ে অসুবিধা চারিদিকে ছোট বড় অসংখ্য পাথর বিছানো—এতটুকু সমতল ভূমি নেই যেখানে সহজভাবে পা ফেলতে পারি। কোনরকমে একখানা পাথরে বসতে পারলাম। বসলাম একেবারে গর্জ্জনোন্মত্ত জলধারার সামনে। সেখানে শীকর-কুয়াশার জালে সূর্য্যালোক ঢাকা পড়েছে। চোখ মুখ সর্ব্বাঙ্গ জলরেণুতে ভরে গেল—ভারি আরাম বোধ হল।

চেয়ে দেখলাম—বহুদূরব্যাপী একটি প্রশস্ত প্রান্তর বেয়ে দুর্দ্দান্ত বেগে ছুটে আসছে জলস্রোত। ঠিক প্রান্তর নয়—পাথর বিছানো সেই উপত্যকা বেয়ে ছুটে এসে নর্ম্মদা ঝাঁপ খেয়ে পড়ছে চার পাঁচ তলা সমান নীচু একটা গিরিবর্ত্মে। গর্জ্জনে, ফেনায়, আবর্ত্তে, শীকর-ধূমজালে সেখানে একটা প্রলয়কাণ্ড বেধে গেছে। উন্মাদিনী দিশেহারা নর্ম্মদার শব্দ-তরঙ্গে—আর সব শব্দ ডুবে গেছে। খুব নিকটে বসা মানুষটির কথাও শুনতে পাচ্ছি না।

বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখা যাবে, এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটি বন্দিনী হয়েছে দু'ধারের গিরিসঙ্কটের মাঝখানে। অথবা কল্পনা করা যায়—শৈলবাহুর আশ্রয় পেয়ে শ্রান্তক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দিয়েছে পরম তৃপ্তিভরে। সত্যই মাইল খানিক দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখানে ভিন্ন মূর্ত্তির নর্ম্মদা—অতিশয় শান্তশিষ্ট নিরীহ নির্ব্বিকার নদী। জলে তরঙ্গ নাই—অস্ফুট কাকলি নাই—প্রশান্ত একটি স্রোতধারা নিঃশব্দে পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে চলেছে।

হিন্দুর সমস্ত পুণ্যকর্ম্মে স্মরণীয় সাতটি প্রবাহিনীর মধ্যে নর্ম্মদা অন্যতমা। আর নর্ম্মদার আর একটি নাম রেবা। অমর কণ্টক পর্ব্বত থেকে বা'র হয়ে প্রায় ৪০০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করে এই নদী কাম্বে উপসাগরে পড়ছে। পুরাণ মহাভারতে এই নদীর উল্লেখ আছে—দেবলোকের সঙ্গে এর সম্পর্কটি সুনিবিড়। গঙ্গার সঙ্গে শিবের মধুর সম্পর্কের কথা হিন্দুমাত্রেই জানেন—নর্ম্মদাকে শঙ্করের সঙ্গে মিলিয়ে তেমনি একটি মধুর স্মৃতি অন্তরকে উদ্বেল করে তোলে। এখানে বহু যাত্রীকে দেখলাম—সহর্ষ জয়ধ্বনি দিয়ে ফলপুষ্পের অঞ্জলি ছুড়ে দিচ্ছেন তরঙ্গআবর্ত্তে। কোন কোন দুঃসাহসী পুণ্যকামী পাথরের দেওয়াল বেয়ে নীচের নেমে সেই বেগোন্মত্ত ঘূর্ণীজল স্পর্শ করে আসছেন—কেউ বা স্নান তর্পণ করছেন। উপরেও স্নানের ধুম পড়ে গেছে।

পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নর্ম্মদার বহু ধারা শাখা নদীর সৃষ্টি করেছে—সেই জলে বড় জোর কোমর পর্য্যন্ত ডোবে স্নানের হুড়াহুড়ি লেগে আছে সেইখানেই। অনেকের দেখাদেখি আমারও দুই পাথরের মাঝখানে একটি স্রোতধারায় ডুবিয়ে আর একখানা পাথর সাপটে ধরে স্নানের কাজটা সেরে নিলাম। সেই বেগও কম প্রচণ্ড নয়—মনে হচ্ছিল পাথরশুদ্ধ দেহটাকে উপড়ে নিয়ে এই বুঝি প্রপাত-আবর্ত্তে নিক্ষেপ করে।

স্নান সারা হল—কিছু জলযোগও সেরে নেওয়া গেল। আবার যথারীতি জুতো হাতে নিয়ে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে ভিড়ের ধাক্কা খেয়ে যে ভাবে প্রপাতের কাছে পৌঁছেছিলাম তেমনি করেই ফিরে এলাম প্রধান রাজপথে। এখন রাজপথে আরও ভিড়—দুধারের দোকানপসারে জম-জমাট হয়ে উঠেছে জায়গাটা। সাদা ও কালো পাথরের নানান জিনিস বিক্রী হচ্ছে। আমরা কয়েকটি মার্ব্বেল-পাথরের হাতী ও ধূপদান নিলাম। মকরবাহিনী গঙ্গা, মাছ, সাপ, শিবলিঙ্গ, পৌরাণিক বহু দেবদেবীর মূর্ত্তি, পাথরের বাটী, গ্লাস ইত্যাদি জিনিস থরে থরে সাজানো রয়েছে। সংসারীর পক্ষে এইসবের আকর্ষণ ছেড়ে আসা কম ত্যাগ স্বীকার নয়।

পাথরের খেলনা-বিক্রেতাকে শুধোলাম—মার্ব্বেল-রক কোথায়?

সে বললে, সোজা চলে যাও ভেড়াঘাটে—সেখানে নৌকা পাবে। সেই নৌকায় চেপে খানিকটা দূর গেলেই দেখবে মার্বেল-রক। হাঁ—ইঁহাসে এক মীল।

ফিরে চললাম। সামনে পড়ল বনবেষ্টিত সেই পাহাড়টা—যার উপরে আটশো বছরের পুরাতন মন্দির রয়েছে। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির। এটা অবশ্য মন্দিরের পিছন দিক—সামনের সিঁড়ি-বাঁধানো পথ দিয়ে গেলে পাহাড়টা বেষ্টন করতে হবে আর বেশ খানিকটা ঘুরও পড়বে বলে—আমরা অন্যান্য যাত্রীদের অনুসরণ করে বন-পথটাই ধরলাম। পথ সংক্ষেপ হল—মাথার উপরে অকরুণ মধ্যাহ্ন সূর্য্যের তাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলাম। বনের ছায়ায় দেহ ঢেকে সঙ্কীর্ণ পাওটি অর্থাৎ পায়ে-চলা পথ ধরে আমরা এগুতে লাগলাম। সেই পথ এঁকে বেঁকে পাহাড়ে উঠে মন্দিরের খিড়কি দুয়োরে শেষ হয়েছে। সেই নির্জ্জন পথের ধারেও ফুল বেলপাতার পশরা সাজিয়ে বসেছে স্থানীয় লোকেরা। অন্য দিন এরা নিশ্চয় বসে না—আজ যাত্রীর জোয়ার এসেছে বলে এরাও ভাবতরঙ্গে ভেলা ভাসাবার আয়োজন করেছে। বড় গরীব এরা—এই রকম পাল-পার্ব্বণ না এলে ভগবানের মহিমাকে উপলব্ধি করতে পারে না। এরাও যাত্রীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ধ্বনি তুলছে—জয় শিব শঙ্কর পার্ব্বতী মায়ী কি জয়।

পাহাড়ের মাথায় দেব-দেউল ঘিরে গোলাকার পাঁচীল। সেই পাঁচীলের কোণে কোণে ছাউনি—অলিন্দেরই আকার, মূল মন্দির থেকে পৃথক। মূল মন্দির মাঝখানে। সেই অলিন্দের নীচের সারি সারি যোগিনী মূর্ত্তি—সংখ্যায় চৌষট্টি। কারুকার্য্যে অনুপম—দেহভঙ্গী বসন অলঙ্কার বাহন পরিচারকবৃন্দ সবই নিপুণ ছন্দে গাঁথা এক-একখানি পাথরের ছবি। ১১৫৫ খৃঃ অব্দে কালচুরির রাণী আহলাদা দেবী তাঁর পুত্র নরসিংহ দেবের রাজত্বকালে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১১৮০ সালে নৃপতি বিজয় সিংহের রাজত্বকালে তাঁর মা আর একবার সংস্কার করিয়েছিলেন মন্দির। পরে-মূর্ত্তি-বেষকরা মন্দির-সমেত মূর্ত্তিগুলিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল। তার সাক্ষ্য ভগ্ন হস্ত পদ ও তুণ্ডহীন যোগিনী মূর্ত্তিগুলিতে সুপ্রকট।

মূল মন্দির-দুয়ারে দেবদর্শনার্থীরা রীতিমত মল্লযুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিল। সেই যুদ্ধে যোগদান করার ক্ষমতা না থাকায় একপাশে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি দেখছিলাম, ইতিমধ্যে জনাকয়েক স্থানীয় লোক আগম নির্গমের ভিড়টা নিয়ন্ত্রিত করায় দেবদর্শনের সুবিধা হল। ভিতরে শিবের লিঙ্গমূর্ত্তি নয়—পার্ব্বতীকে কোলে নিয়ে শঙ্কর বসে রয়েছেন। এই যুগল মূর্ত্তিতেও সেই অপরূপ শিল্প-নৈপুণ্যের প্রকাশ যা ইলোরার কৈলাস গুহায় অথবা খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে দেখা যায়। ভঙ্গিটা মিথুন মূর্ত্তির।

দেবদর্শন সেরে দেউলের প্রাচীর-বেষ্টনীর বাইরে একটি বিল্ববৃক্ষের ছায়ায় এসে বসলাম। সারা প্রাঙ্গনে ছায়ায় ছায়াময়! ঝির ঝির করে হাওয়া চলছিল। অদূরে বসে একজন সন্ন্যাসী ভোজন করছিলেন, এক ভক্তিমান্ ভোজন করাচ্ছিলেন। যোগক্ষেম বহনের মহিমা কি না যোগীশ্বর শিবই জানেন—সাধুর দেখলাম আত্মপ্রত্যয়ের অভাব নাই। কবি হেমচন্দ্রের সেই কবিতাংশ মনে পড়ল—এক শ্রেণীর বাঙালী মেয়েকে দেখে বহুদিন আগে যা লিখে-ছিলেন—'খেয়ে যায়—নিয়ে যায় আর যায় চেয়ে—'। সাধু পেট ভরে আহার করলেন—যা উদ্বৃত্ত রইল করঙ্ক ভরে গুছিয়ে নিলেন—এবং দক্ষিণা নিলেন অঞ্জলি ভরে। ভক্তি-মান্ ব্যক্তিটি টাকা পয়সা রেজকি যা উঠল অঞ্জলিতে—সাধুর করপুটে ঢেলে দিলেন। পরমাণু যুগের মধ্যাহ্নকালে ভারত-বর্ষের এক পুরাতন মন্দির-অঙ্গনে কৌপীনবন্তের মহিমাকে প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হলাম।

এরপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমরা আসল পথটা ধরলাম এবং অনতিবিলম্বে পৌছে গেলাম ভেড়াঘাটে।

ভেড়াঘাটের দুটি অংশ। একটি উপরে—অন্যটি নীচে। দুটি জায়গায় নর্ম্মদা-দর্শনার্থীদের জন্য দুটি সরকারী বিশ্রামা-লয় আছে। এখানে রাত্রিবাসের ইচ্ছা থাকলে আগে থেকে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন।

তবে একথা ঠিক—পুরোপুরি একটি দিন আর রাত্রি-বাস না করলে নর্ম্মদা ও মর্ম্মর-শৈলের মহিমা ঠিক মত উপলব্ধি করা যায় না। এই সঙ্গে একটি পূর্ণিমা রাত্রির

সংযোগ ঘটলে তো সোনায় সোহাগা। কথাটা বেশি করে মনে হল নৌ-বিহারের সময়। বারো আনার টিকিট কেটে সেই দুপুরের সূর্য্যকে মাথায় নিয়ে যখন নৌকায় চাপলাম, চারিদিকের পাষাণ-প্রাচীরে বন্দিনী নর্ম্মদার আঁকাবাঁকা ধারাপথ বেয়ে নৌকা যখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল, পাহাড়ের প্রলম্বিত ছায়ায় সুস্থির কাকচক্ষু-স্বচ্ছ জল দু পাশে টলটল করে উঠল আর দু পাশে নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র রঙে-রেখায় অপরূপ দেখাতে লাগল গিরি দেওয়ালগুলি—তখন বারবারই মনে হতে লাগল এখনই যদি এমন সৌন্দর্য্য-মায়া মনোহরণ করতে পারে, না-জানি সকাল সন্ধ্যার কোমল আলোয় এর প্রকাশ কত অপরূপই না হবে। আর যে রাত্রি আজ আসছে? শারদ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নিশীথ রাত্রিতে দেখেছি মর্ম্মর-হর্ম্ম্য তাজের উজ্জ্বলন্ত রূপ—মিনারে মিনারে গম্বুজের জ্যোৎস্না-পিছল পৃষ্ঠদেশে গলিত রজতধারার দীপ্তি দেখে বিহ্বল হয়েছি। হাজার হাজার মানুষ তাজের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সেই চোখ-ঝলসানো ঐশ্বর্য্য দেখে পাগলের মত গান গেয়েছে, কবিতা আউড়েছে, হেসেছে, নৃত্য করেছে—কলকল শব্দে বৃহৎ জনন উতরোল উচ্ছল হয়ে উঠেছে। আর এখানেও সেই চন্দ্রিকা-স্নিগ্ধ রাত্রিকে নামিয়ে অনায়াসে কল্পনা করতে পারি ভুবন-ভুলানো চাঁদের আলোয় আঁকাবাঁকা শৈলরন্ধ্র-পথে আগুনে গলানো চকচকে একটা রূপোর স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে আমাদের নৌকা—দু ধারে দুগ্ধধবল পাহাড়ের গা পিছলে পড়ছে সেই আগুনের স্রোত। সে আগুন দাহ করে না—জ্বালা ধরায় না; মণি-মাণিক্যের গা-চোঁয়ানো ভেজা ভেজা আলো—আমরা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে পান করছি আর হয়তো বা মনে মনে বলছি—'এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল—সে মরণ স্বরগ সমান।' পূর্ণিমার রাতে এই পথ অলকাপুরীরই পথ। একটি রাত্রি এখানে না কাটালে অলকাপুরীর কল্পনা করব কোন্ বস্তু মিলিয়ে।

আসলে এটা ভাবেরই উচ্ছ্বাস। অলকাপুরীকে কোন বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করা যায় না বলেই অধরা অচেনা সেই পুরী কল্পনারই ধন। এই রাজ্যকে কোন কোন সময়ে তৈরী করে বিশ্বকর্ম্মা-মন। চাঁদের আলো সকলের জন্য নয়, মনের স্বর্গও সব মানুষের জন্য তৈরী করে না বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্ব-ভুবনের অধিকর্ত্তা হলেও—সব মানুষের সামনে সৌন্দর্য্যময় ভুবনের দুয়ার খুলে রাখেন না।

ধূমল পাহাড়—নীল পাহাড় ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে গেল নৌকা—প্রপাতের অভিমুখে। এইবার দুধারে বাহু বিস্তার করে শাদা পাহাড়গুলো এগিয়ে এলো। শঙ্করের আলিঙ্গনে ধরা পড়লেন পার্ব্বতী। এ মেয়ে তো সেই দুরন্ত বন্য-মেয়ে নয়—যে একটু আগে পাহাড়ের মাথা থেকে ঝাঁপ খেয়ে দু'পাশের বন প্রান্তর তটভূমি কাঁপিয়ে ঝাঁপাই ঝুরতে ঝুরতে আসছিল উন্মাদিনীর মত। আরও নীচের নেমে দয়িতের বাহু-উপাধান পেয়ে আর লোভ সামলাতে পারেনি মেয়ে। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটি এলিয়ে দিয়েছে অমনি। এখন সে স্থির—শান্ত সুপ্তিভারে অলস-মন্থর-গতি।

মাঝি বলল, নদী এখানে পাঁচ শো ফুট গভীর।

তবু এটা বর্ষাকাল নয়—পাঁচতলা সমান মার্বেল পাহাড়-গুলো তখন নাকি জলের তলায় তলিয়ে যায়।

মাঝি হাতী পাহাড় দেখাল—ঘোড়া পাহাড় দেখাল। এগুলো খেয়ালী প্রকৃতির হাতে তৈরী মূর্ত্তি। হাত তুলে দেখাল দুরারোহ গিরি-দেওয়ালের মাথায় একটি গুহা যার অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ধরে বাস করছেন এক মহাত্মা।

শাদা পাহাড়গুলোর রঙ কি মোলায়েম। কি আশ্চর্য্য-ভাবে স্তবকে স্তবকে সাজানো রয়েছে—আর সূর্য্যের আলো পড়ে কি অদ্ভুত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে!

দেখতে দেখতে পৌনে এক ঘণ্টা সময় কোথা দিয়ে চলে গেল—আমরা ফিরে এলাম ভেড়াঘাটে।

নৌকা থেকে নেমে আবার হাঁটতে সুরু করলাম। কৌতূহল-শেষে এবার ক্লান্তির বোঝাটা রীতিমত ভারি হয়েছে। যাত্রীর ভিড় আরও বেড়েছে। নর্ম্মদার তীরভূমি লোকে লোকারণ্য। বেশির ভাগ যাত্রীই দুখানা গোরুর গাড়ির ছইয়ের মাথায় চাদর কাপড় ইত্যাদি বেঁধে দিব্য একটি চাঁদোয়া তৈরী করেছে। আহার-অন্তে সেই ছায়া ছায়া জায়গাটিতে সারি সারি শুয়ে পড়েছে। অনেকগুলি

ঢোলক আর মন্দিরাও তো দেখছি গাড়ীতে। ভজনানন্দে রাত্রি জাগরণের প্রস্তুতি পর্ব্ব না কি ?

চলতে চলতে ভাবনা হল—বাসে জায়গা পাব তো? এখনও প্রবল জলস্রোতের মত মানুষ আসছে। তবে ভরসার কথা এইটুকু—ঘরে ফেরার তাগিদ দেখা যাচ্ছে না। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাতটুকু এরা নর্ম্মদাপুলিনেই কাটাবে মনে হয়।

মাঠের মাঝে সারি সারি বাস দাঁড়িয়ে—জানি না ওগুলি কখন ফিরবে। একখানা ঝরঝরে পুরাতন বাসে কিছু যাত্রী বসে রয়েছে দেখলাম। কণ্ডাকটার আর ড্রাইভার মিলে সোরগোল তুলে সেই বাসে—যাত্রী ওঠাচ্ছে। আমরাও উঠলাম। ওরা বললে—এইখানাই সব আগে ছাড়বে। ছাড়বে কিন্তু পৌঁছবে তো সময়মত! ওর জরা-জীর্ণ দশা দেখে এমন সন্দেহ জাগল। হায়—কে তখন জানত ধূমাৎ বহ্নি! আধা-আধিরও বেশী পথ এসে সন্দেহ সত্য হল। এগুলি হল ভাড়া নেওয়া বাস। মেলার মওকা বুঝে—যে যেখান থেকে পেয়েছে যাত্রী-বহনের জন্য সবরকম যান সংগ্রহ করেছে। এমন একটা মরশুমে দু' পয়সা পিটে নেওয়ার সুযোগ ছাড়বে কেন!

বাসখানার এই দুর্দ্দশা ঘটতো না—যদি পাকা সড়ক ছেড়ে কাঁচা সড়কে না ঢুকতো। কেন ওরা কাঁচা পথ ধরেছিল—সেটা দু'একজনের কথা শুনে স্পষ্ট হল। সোজা পথে নাকি টোল-ট্যাক্সের কড়াকড়ি--সেই ঘাঁটি এড়াবার জন্য মাঠের আধ-কাঁচা পথ ধরেছিল। এতে লাভের অঙ্কটা পরিপুষ্ট হবে। কিন্তু লাভের গুড় যে সময়ে সময়ে পিঁপড়ে খেয়ে যায়—এই প্রবাদ বাক্যটি হয়তো এদেশে প্রচলি[ত] নয়। অর্দ্ধেক রাস্তা এসে বন্দুকে গুলি ছোটার মত একটা শব্দ হল। চমকে উঠে ড্রাইভার কণ্ডাকটার নেমে পড়ল শুকনো মুখে যন্ত্রপাতি এটা-ওটা নাড়াচাড়া করল। কি[ন্তু] রোগ তখন চিকিৎসার বাইরে। টায়ার ফেটে গেছে।

আমরা তো প্রমাদ গুনলাম। এই ঘোরা পথে কো[ন] যানবাহন চলছিল না—মানুষের আনাগোনাও কম। একটা বিকল্প ব্যবস্থা যে হবে সে ভরসাও রইল না। এখন উপায় ?

উপায় একটা ছিল—খানিকটা দৈব ও দেবী-মহিমার উপর নির্ভর করে আমরা উৎকণ্ঠিত রইলাম। পিছনের জোড়া টায়ার একখানা ফেটেছিল—অক্ষত ছিল দ্বিতীয়টি। দুটো চাকা একসঙ্গে ফাটলেই অকূলপাথারে পড়তাম।

কিন্তু এ চাকাখানার উপরেও ভরসা রাখা চলে না। ওটা জখমী চাকা—যেটা প্রতি মুহূর্ত্তে ফাটবে বলে ওরা আশঙ্কা করছিল। অথচ ফাটল কিনা মজবুত চাকাখানাই।

কণ্ডাকটার ড্রাইভারকে বললে, ধীরে চালাও ভাই—ঘণ্টায় পাচ মাইল হোক—সে ভি আচ্ছা—চাকা যেন না ফাটে।

দৈব ও দেবী-মহিমার গুণে চাকাটা অক্ষত রইল। দশ মিনিটের পথ এক ঘন্টায় পাড়ি দিয়ে ঠিক সন্ধ্যাবেলায় আমরা ফিরে এলাম বাসষ্ট্যাণ্ডে।

দলিল

জুলফিকার

ছটা সওয়া ছটায় খেলা বসে, ভাঙতে ভাঙতে রাত দশটা। দু' একদিন রাত্তির এগারোটাও বেজে যায়।

রেলের এঞ্জিনীয়ার রহমান সাহেব খুবই মজলিশী লোক। তাঁরই বাংলোর পুবদিকের কুঠুরীটাতে ব্রিজ-খেলার আসর বসে। খেলা বা আড্ডা যতক্ষণ খুশি চলুক,—আপত্তি করার কেউ নেই। রহমান মৃতদার। একমাত্র ছেলে বিলেতে পড়ছে। একাই থাকেন ভদ্র-লোক। তাসখেলার ভীষণ নেশা।

সাব রেজিষ্ট্রার জগদীশ গুহের আপিসের সংলগ্ন কোয়ার্টার্স। কিন্তু সে সেখানে থাকে না। পুরানো বাড়ী, আশেপাশে জঙ্গল—বড্ড সাপের উপদ্রব। তাই ওর কলেজের সহপাঠী শিক্ষানবিশ মুনসেফ পূর্ণেন্দু, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক সুধাকর ও ইন্স্যুরেন্স কর্মী অমরেশ,—সবার সাথে একত্র মেস করে আছে। সকলেই প্রায় সমবয়সী।

রহমান সাহেবের কোয়ার্টার্সের কাছেই ওদের মেস। মেসের ওরা ছাড়া আরও দু'একজন খেলতে আসেন,—রেলের ডাক্তার দত্ত, কনট্রাক্টর বোসবাবু প্রভৃতি। তবে ওঁরা রেগুলার নন।

বিভুতোষ সেন এই শহরে সানরাইজ ব্যাঙ্কের যে নতুন ব্র্যাঞ্চ খোলা হয়েছে, তারই ভার নিয়ে এসেছে, আজ বছর দুই হল। জগদীশের দেশে বাড়ী, ওর পুরোনো বন্ধু।

খেলার সখ বিভুরই সব চেয়ে বেশী, খেলেও সবার চাইতে ভাল।

প্রায় মাইলখানেক দূরে ওর বাসা। রোজ অনেক-খানি রাস্তা হেঁটে আসে।

গত মহাযুদ্ধের কিছু পূর্ব্বের কথা।

এম. এস. সি পাশ করে, চাকরীর খোঁজ করতে করতে যখন সরকারী কাজের বয়স অতিক্রান্ত, তখন অতিকষ্টে বিভুর জন্যে জুটেছে পৌনে দুশো টাকার এই চাকরীটা (অবিশ্যি, এর আগে বছরখানেক ট্রেনিং নিতে হয়েছে হেড অপিসে—৭৫৲ ভাতায়)।

ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টার বিভুতোষের পিশে-কাম-খুড়শ্বশুর রায়বাহাদুরের বিশেষ বন্ধু লোক। তাঁরই অনুগ্রহে মিলেছে এই চাকরী।

পিশেমশায়ের দাদার মেয়ে মায়ার সঙ্গে বিভুর বিয়ে হয়েছে,—ওর চেয়ে যে বয়সে কম দশবছরের ছোট আর বিদ্যে যার ম্যাট্রিকের গণ্ডীও পেরোয় নি! গ্রাম্য অর্ধশিক্ষিতা, অল্পবয়সী মেয়ে।...এই বিয়েতে বিভুর ছিল প্রবল আপত্তি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা টিকল না। বিয়ে হল, পিঠ পিঠ চাকরীও।

স্বাস্থ্যবতী মেয়ে মায়া।

রং ফর্সাই, ঠোঁট ও চিবুকের গড়নটা সত্যিই সুন্দর। স্বভাব নম্র। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, মেয়েটা সলজ্জ ভীরু। কিন্তু অন্তরে আছে ওর তেজ, আছে প্রখর মর্যাদাবোধ।

ধৈর্য ও সহনশীলতাও যথেষ্ট।

প্রায় চারবছর ওদের বিয়ে হয়েছে। কিছুদিন হল একটি মেয়েও হয়েছে।

কিন্তু সংসারের ওপর এখনও মন বসেনি বিভুতোষের।

রহমান সাহেবের বাড়ীর বৈঠক বিভুবাবু ছাড়া জমেই না। ওর মত ওস্তাদ খেলোয়াড় সারা শহর

খুঁজলে ছুটি মিলবে না। গোটা পূর্ব্ববঙ্গেও হয়ত ওর সমকক্ষ ব্রিজপ্লেয়ার হু'চার জনের বেশী নেই। কালবার্ট্‌সন গুলে খেয়েছে।

বিভূতোষ ছিল বলেই না গেল বছর চিটাগং এ. বি. রেলওয়ে ইনষ্টিট্যুটে টুর্ণামেণ্ট খেলে ওদের দল মস্ত এক ট্রফি জিতে এনেছে।

রাতে ফিরতে বিভূর প্রায়ই দেরী হয়। নভেম্বরের মাঝামাঝি। দশটা রাত্তির নেহাৎ কম নয়। প্রখ্যাত ব্রিজ-চ্যাম্পিয়ন বিভূতোষ সেন, এম. এস. সি. কখন গৃহে ফিরে আহারে বসবেন, তারই প্রতীক্ষায় থাকতে হয় মায়াকে। গরম গরম খাবার টেবিলে হাজির করা চাই। টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরে, ষ্টীম-বাথে বসিয়ে রাখতে হয়, ওর জন্যে।

বিভূদের ব্যাঙ্কে কাজ করেন নিত্যানন্দবাবু। তাঁরই মাসশাশুড়ীর বাড়ীর নীচতলাটা ভাড়া নিয়ে আছে ওরা।

গৃহস্বামিনী থাকেন দোতলায়, বিধবা মেয়ে আর কলেজে-পড়া ছেলেটাকে নিয়ে।

মায়াকে ভদ্রমহিলা ও তাঁর কন্যা দুজনেই খুব স্নেহ করেন। মাঝে মাঝে উনি বিভূতোষকে মৃদু ভর্ৎসনা জানান,—এত রাত্তির ছেলেমানুষ বউ না খেয়ে একা-একা জেগে থাকে। একটু সকাল সকাল ফিরলেই ত হয়।

কিন্তু কে শোনে কার কথা!

রবিবার কি ছুটীর দিনেও যে ওর সাথে দুটো কথা বলবে,—নিতান্ত দরকারী সংসারের কথা, সে সুযোগও মেলে না মায়ার।

প্রায় ছুটীর দিনেই সকালে এসে জোটে জগদীশদের দল। চা জলখাবারের পর্ব্ব শেষ করেই খেলতে বসে। খেলা যখন ভাঙে সূর্য্য তখন মধ্যগগনে। তারপর খেয়ে-দেয়ে ঘুম। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে সন্ধ্যে। তারপর চলল আড্ডায়।

বিভূতোষ সকাল নটা সাড়ে নটা পর্য্যন্ত বাইরের ঘরে অপিসের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। বাড়ীটা ব্যাঙ্কের কাছেই। রোজ কাগজ-পত্রের স্তূপ নিয়ে পিওন-সহ আসেন অ্যাকাউণ্টেণ্ট, সই করাতে। দিনের-দিন হিসাব দেখে, ডিপজিট, উইথড্রয়াল মিল করে সই করতে গেলে, ছুটীর পর আরও অন্ততঃ ঘণ্টা দেড়েক থাকতে হয়,—এমনি কাজের চাপ।

যুদ্ধের বাজারে ব্যাঙ্কগুলোয় লেন-দেন অসম্ভব বেড়েছে।

একা পেরে উঠছে না বিভূতোষ। একজন এ্যাসি-ষ্ট্যাণ্টের জন্য লিখেছে হেড অফিসে। লোক কবে দেবে কে জানে?

পাঁচটার পর অফিসে থাকতে বিভূ রাজী নয়। পাঁচটা বাজতে না বাজতেই উঠে পড়ে চেয়ার ছেড়ে।

বাসায় ফিরে কাপড়-চোপড় আর চা-খাবার খেতে যতটুকু সময়; তারপরই সোজা ছোটে তাসের আড্ডায়।

দিনের পর দিন একঘেয়ে খেলায় ওরা কী এমন আনন্দ পায়,—মায়া ভেবেই পায় না।

দুই

বিয়ের পর খুব ভয়ে ভয়েই দিন কেটেছে মায়ার। চশমা চোখে ভারিক্কী চেহারার লোকটা না জানি কত-বড় বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্! মায়া গাঁয়ের মেয়ে, দেশের থেকে মাইনর পাশ করে, শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে বছর তিনেক পড়েছিল। আর বিভূতোষ পাশ করে বেরিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায়।

প্রথম প্রথম মায়া আপনি, আজ্ঞে করেই কথা বলেছে।

'মনে জাগে এই ভয়—
তোমার চরণে অবোধ জনের
অপরাধ পাছে হয়'—এই গোছের একটা ভীরু সঙ্কোচ ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু যত দিন যায়, ততই দেখতে পায় এই পুঁথিপড়া পাণ্ডিত্যের পেছনে রয়েছে কী প্রভূত অজ্ঞতা! এমন ছোটখাট

অনেক বিষয়—যা সাধারণ লোকের চোখে ধরা পড়ে, সেগুলো ওর দৃষ্টি কি করে এড়িয়ে যায়, মায়া ভেবেই পায় না। ওর আত্মভোলা ভাবের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন অহমিকা ও স্বার্থপরতাকেও সে দেখতে পেয়েছে।

বিভুতোষ যে ত্রুটিহীন দেবপদ-বাচ্য একজন মহা-মানুষ নয়,—এটা আবিষ্কারের পর মায়ার মনটি সত্যিই বেশ হাল্কা লাগে। আরও দশজনার মত ও যে দোষে-গুণে রক্তমাংসে গড়া সাধারণ একটা মানুষ, এটা ওর কাছে মস্ত একটা সুসমাচার। সম্ভ্রমবোধের আড়ষ্টতার কঠিন বন্ধন থেকে সে মুক্তি পায়। মনের স্বাভাবিক সমভূমিতে সে এখন বিভুর মুখোমুখি দাঁড়াতে পেরেছে।

মায়ার শরীরটা খুব খারাপ চলছে।

ছোকরা চাকরটা চলে গেছে ছুটি নিয়ে, এখনও ফেরে নি।

ঠিকে ঝি সন্ধ্যের আগেই চলে যায়। একা মায়াই সব কাজ করে, মেয়ের তাল সামলায়, অসুস্থ শরীর নিয়ে।

সেদিন বিভু বাসায় ফিরল যখন, তখন রাত প্রায় বারটা। শহর সুষুপ্ত, শীতে, কুহেলিকায় চারধার আচ্ছন্ন। দোকানপাট, লোকচলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, কেবল দু' একটা ভাড়াটে গাড়ী মাঝ-রাতের প্যাসেঞ্জার নিয়ে রেল-ষ্টেশনের দিকে চলেছে। তাদেরই চাকার ঘর্ঘর ও ঘোড়ার গলার ঘণ্টার টুংটাং শব্দ শোনা যায়।

কিছুক্ষণ দরজা ধাক্কা দেবার পরও সেটা খুলল না। শেষটায় বিভু রেগে কড়া নাড়ল, বেশ একটু জোরেই। ঠাণ্ডায় বাইরে দাঁড়িয়ে তার মেজাজটা বিগড়ে যায়।

ডিসেম্বরের শীতে, রাত বারটা পর্যন্ত খাবার আগলে জেগে থাকাটাও যে কম কষ্টকর নয়, এটা কিন্তু তার মনে আসে না। হঠাৎ হাতের ঠেলায় দরজাটা খুলে যায়।

ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে বিভুতোষ আলো জ্বালালে, বেশ জোরালো বাল্বের আলো।

দেখে, সামনের ক্যালেণ্ডারটা ওল্টানো, আর তারই সাদা পিঠে গোটা গোটা, বড় বড় লাল হরপে লেখা ঝুলছে:

যারা এত রাতে বাড়ী ফেরে
তারা হয় মাতাল, নয় গাড়োয়ান—

বিভুতোষের মনে হল, যেন পিছন থেকে হঠাৎ ওর মাথায় জোরে আঘাত করল। প্রায় ঘুরে পড়বার মত অবস্থা ওর।...যে মেয়ে দাঁত চড়ে কথা কয়না, এই রুক্ষ প্রতিবাদ তার কাছ থেকে এল কি করে? কত-দূর নির্যাতনে এই উদ্ধত বিদ্রোহের ভাব মনে অঙ্কুরিত হয়, ক্যালকুলাস কষা বুদ্ধি দিয়ে তা ঠাওর করে উঠতে না পারলেও, মায়ার মানসিক বিপর্যয় এই প্রথম ওর কাছে প্রকট হয়ে উঠল।

শোবার ঘরে খাটের কাছে এসে দেখে, কম্বল ঢাকা দিয়ে কুঁচকে শুয়ে আছে মায়া, দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

চোখ দুটো তার অসম্ভব লাল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

গায়ে হাত দিয়ে দেখল, আগুনের মত গরম।

এই অবস্থায় কখন উঠে গিয়ে, পাশের ঘরের সদর দরজাটা নিঃশব্দে খুলে, আবার এসে শুয়েছে ও, বিভুতোষ টেরও পায়নি।

বাইশ দিন বাদে জ্বর ছাড়ল।

কিভাবে যে এই কয়েকটা দিন কেটেছে, ভগবান্‌ই জানেন। ওপর তলার মাসীমা আর তাঁর মেয়ে শৈলদি ছিলেন, তাই রক্ষে। বিভুতোষের খাওয়াদাওয়ার অবিশ্যি কিছু ত্রুটি হয় নি।

জ্বরে পড়ে থেকেও মায়া স্বামীর সেবাযত্ন ঠিক ঠিক চালিয়েছে, শৈলদির মারফত।...বিভুতোষ এ কয়দিন আড্ডায় যায় নি।

খেলার বন্ধুরা খোঁজ নিতে এসে দেখে গেছে বৌয়ের খুব অসুখ।

মেয়েটা মাস ছয়েকের। তাকে দুধ খাওয়ানো, তেল মাখানো, ঘুম পাড়ানো, কাঁথা পাল্টানো—সব কিছুরই ভার শৈলদি নিয়েছেন। বিভুর চা জলখাবার, ভাত সবই এসেছে ওঁদের ওখান থেকে।

শৈলদি টিপ্পনী কাটতে ছাড়েন না।

—'ধন্যি মানুষ বাপু তোর স্বামী! এত বড় অসুখটা গেল, একবারও যদি একটানা ঘণ্টাখানেক বসল কাছে। নেহাৎ চক্ষুলজ্জায় বাধে, তাই আড্ডায় যেতে পারছে না। অথচ সেখানে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে। দেখছিসনে অফিস থেকে ফিরে, একবার এঘর একবার ওঘর-খালি পাইচারী করে বেড়াচ্ছে।'

—'না দিদি, মনটা ওর ভালই, তবে নিজের খেয়াল নিয়ে মেতে থাকেন কিনা, তাই অন্য কিছুর দিকে নজর নেই। আর বিপদ্ এলে সত্যিই দিশেহারা হয়ে পড়েন।'

—'তুই থাম্। এই যে জ্বর গায়ে তুই ওর খাবার তদারক চালাচ্ছিস, কালীর মাকে দিয়ে ওর ময়লা গেঞ্জী, আণ্ডারওয়ার কাচিয়ে তুলছিস, সেবা-যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটী হতে দিচ্ছিস নে—এ কি ওর চোখে পড়ে না?...লেখাপড়া জানিস নে, এই না তোর অপরাধ! আরে বি. এ. এম. এ পাশ মেয়েও ঢের দেখেছি। তাদের বিয়ে করে ঘরে এনে, এমন কি বেশী সুখ পাচ্ছে লোকে? আমিও বলে রাখছে, তোকে তাচ্ছিল্য করবার জন্যে একদিন ওকে পস্তাতে হবে।

কী রত্ন যে ভগবান্ ওকে দিয়েছেন, তার মূল্য ও একদিন না একদিন বুঝবেই। অনুতাপে জ্বলতে হবে ওকে।

—'ছিঃ দিদি! অমন কথা বলবেন না। আমি ভুগছি, ভুগছি, ওঁকে যেন দুঃখ সহ্য করতে না হয়।'

—'রাখ্ তোর গাজ্বালানী সতীপনা! তোদের কাছে আস্কারা পেয়েই না ওদের এত বাড়।'

পাশের ঘর থেকে সব কথাই কানে আসে বিভুতোষের।

শৈলদি বিভুর চাইতে বছর দুয়েকের বড়।

যেমন দুর্গাপ্রতিমার মত রূপ, তেমনি অশেষ গুণবতী।

ওর প্রতি বিভুর শ্রদ্ধার অন্ত নেই।

আজ তাঁরই মুখে নিজের কঠোর সমালোচনা শুনে, ওদের দাম্পত্য জীবনযাত্রার আসল রূপটা চকিতে ওর চোখের সামনে ফুটে ওঠে। একটা আকস্মিক আত্ম-সমীক্ষা নিজের অজ্ঞাতপূর্ব্ব নীচতা ও স্বার্থপরতাকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়! আত্মগ্লানিতে মন ভরে ওঠে।

তিন

মায়াকে সত্যিই যেন নতুন লাগে।

ওর মুখের কোমল সহাস্য পাণ্ডুরতা বিভুতোষকে স্নেহসিক্ত করে তোলে।

ভারী সহিষ্ণুশীলা, শান্ত মেয়ে।

মায়ার কাছে এসে তার দু'খানি হাত ধরে বলে:

—'আমায় তুমি ক্ষমা করো মায়া, অনেক কষ্ট দিয়েছি তোমাকে।'

তারপর পকেট থেকে একখানা নীলরঙের কাগজ বার করে ওর সামনে মেলে ধরে। এটা ওর অঙ্গীকার পত্র। ভবিষ্যতে কি কি কাজ থেকে বিরত থাকতে মনস্থ করেছে, তারই ফিরিস্তি। বিভু কাগজটা পড়ে শোনাতে চায় মায়াকে।

ওর ছেলে-মানষেমী দেখে মায়ার খুব মজা লাগে। বলে:

—'কি হবে ও দিয়ে?'

—'এই দলিলখানার দু প্রস্থ নকল হবে, অবিশ্যি কাট-ছাঁট করার পর। একখানা থাকবে তোমার কাছে, অন্যখানা আমার কাছে। আমার সইয়ের নীচে থাকবে তোমার সই, আর একপাশে খুকুর আঙুলের টিপ,—লক্ষ্মীর তেল সিন্দুর মাখিয়ে। ও হবে এই দলিলের সাক্ষী। ওর টিপের একটা বিশেষ মূল্য আছে,—ময়্যাল ভ্যালু।'

ওর কথা শুনে মায়া খিলখিল করে হেসে ওঠে।

'—দলিল! কি হবে দলিলে! যা মনে ভেবেছ, সেই অনুযায়ী চলতে পারলেই হল। আমি ত আর আদালতে নালিশ করতে যাচ্ছি নে।'

—'আমি জানি সংকল্পে আমি দৃঢ় হতে পারি নে,

তাই ভাবছি কাগজখানা বাঁধিয়ে টাঙিয়ে রাখব। সব সময়ে চোখের সামনে ঝুলবে, যাতে ভুল না হয়।'

মায়া রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে উঠে।

'—ক্ষেপেছ। কত লোক আসে বেড়াতে, পাড়ার কত মেয়ে। দেখে গিয়ে হাসাহাসি করুক আর কি।'

—'তাও বটে।'

মাথা চুলকে বিভূতোষ বলে।

—'আমি চাই দলিলটা আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পাদিত হোক। আচ্ছা খসড়া পড়ে শোনাচ্ছি তোমাকে। মন দিয়ে শোনো। কোথাও কোন আপত্তি থাকলে বোলো। দরকার মত সংশোধন করে নেব '

ওর কথায় মায়া শুধু একটু হাসে।

বিভূতোষ পড়তে সুরু করে :

'আজ ৪ঠা পৌষ, ১৩৪৭ সাল, ইংরাজী ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ। আমি আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, জ্ঞানতঃ আমার কোন কার্যে বা ব্যবহারে বা বাক্যে আমার পত্নী শ্রীমতী মায়ারাণী সেনের মনে কোনরূপ বেদনা বা বিরক্তি উৎপাদন করিব না এবং যাহাতে আমার অবহেলা বা অসতর্কতায় তিনি কোনরূপ দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ না পান, সে দিকে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিব।...'

—'জেনেশুনে কেউ কি কারো মনে ব্যথা দেয়, নেহাৎ শত্রু না হলে, কিংবা প্রতিহিংসা নেবার ইচ্ছে না থাকলে?'

—'অজ্ঞাতসারে আমরা যে পাপ করে থাকি, তার জন্যে আমাদের আইনতঃ দায়ী করা যায় না। মনে অপরাধ-বোধ না জাগলে অপরাধ হয় না। পেনাল কোড বা দণ্ডবিধি আইনে তাই পাগল কিম্বা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যে অপরাধ করা যায়, তার জন্য শাস্তির বিধান নেই।'

(বিভূ দু বছর ল পড়েছিল।)

—'অনেক নিষ্ঠুর দুরাচারী লোকেরও অপরাধজ্ঞান খুব কম। ওদের অনেকেই পাপবোধ হারিয়ে ফেলে। পাপ করবার সময়, ওরা যে পাপ বা অন্যায় কিছু করছে সে কথা ওদের মনেই হয় না। কিন্তু তাই বলে কি তারা সাজা থেকে ছাড়া পাবার যোগ্য?'

বিভূ মায়ার কথায় বিস্ময়বোধ করে। মেয়েটা বাস্তবিকই বুদ্ধিমতী ও চিন্তাশীলা।

—'আচ্ছা, শোনো তারপর। নিশ্চিন্তপুরের তাসের আড্ডায় আর খেলিতে যাইব না।...'

—'নিশ্চিন্তপুরের আড্ডায় না গিয়ে, বকুলতলার-রসময় উকিলের বাড়ীতে গেলেই হল। সন্ধ্যের পর তার বৈঠকখানায়ও জোর খেলা হয়। শ্যামসুন্দরবাবুর স্ত্রীর কাছে শুনেছি। ওঁর কর্ত্তাও সেখানে খেলতে যান, মাঝে মাঝে।'

—'আচ্ছা, তা হলে 'নিশ্চিন্তপুর' শব্দটা কেটে দিচ্ছি, কি বল?'

—'কিন্তু একদম খেলতে না পেলে, দম আটকে মারা যাবে না ত? অতটা কি একবারে সহ্য হবে?......'

(মায়া ইদানীং কথাবার্ত্তায় অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে কথায় একটু শ্লেষও থাকে তার।)

—'খেলতে যাও বেশ, কিন্তু সকাল সকাল ফিরে এলেই হয়। বাড়ী ঘর, মেয়ে, বউ আছে—খেলতে বসে সে কথাটা না ভুললেই হল। আর ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, রোজই হাজরে দিতে হবে আড্ডায়—এরই বা মানে কি?'

মায়া যে ওকে খেলতে দিতে একদম নারাজ নয়,—এটা জেনে বিভূতোষ একটু উৎফুল্লই হল।

—'আচ্ছ', তা হলে ও জায়গাটা বদ্‌লে লিখছি, তাসখেলা যতদূর সম্ভব কম করিব। যদিও কোথায় খেলতে বসি, সাড়ে সাতটার আগেই বাড়ী ফিরিব।'

—'যে সময় সাধারণতঃ অন্য সব ভদ্রলোক ক্লাব থেকে বাড়ী ফেরেন, তখন ফিরলেই হল। এই ধর সাড়ে আটটা, নটার মধ্যে।'

মায়ার উদারতায় বিভূতোষের মনটা অনেক হাল্কা হয়ে যায়। সে বলল :

—'আচ্ছা, তা হলে লিখছি,—গ্রীষ্মকালে রাত্রি ন'টায় এবং শীতকালে আটটায় বাড়ী ফিরিব।'

—'কিন্তু, গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের মেয়াদ কতটুকু সেটা জানা দরকার। বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত—ছয় ঋতুর বাকী চারটে কোনটা কার ভাগে পড়বে, সেটাও ত জানতে হবে।'

বিভুতোষ মায়ার মন্তব্যে বেশ একটু লজ্জাই পায়। বিদ্যার গৌরবে হঠাৎ ঘা লাগে।

নিজের ক্রুটী ঢাকবার জন্তে বলে :

—'ইংরেজদের দেশে দুটোই ঋতু—সামার, গ্রীষ্ম আর উইণ্টার, শীত। মোটামুটি মার্চ থেকে আগষ্ট পর্যন্ত সামার, আর সেপ্টেম্বার টু ফেব্রুয়ারীকে উইণ্টার বলে ধরে।'

—'আচ্ছা তা হলে অটাম আর স্প্রীং কখন? ইস্কুলের ইংরেজী বইয়ে অটাম সম্বন্ধে একটা কবিতা পড়েছিলুম!'

—'ওগুলো কবিতাতেই চলে।...আচ্ছা, তাহলে মার্চ থেকে আগষ্ট পর্যন্ত ছ মাস রাত ন'টার মধ্যে, আর সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাত্রির আটটায় বাড়ী ফিরব।'

—'আপত্তি নেই, কিন্তু দলিলটা এক তরফা হল না কি? আমার দিক্ থেকেও একটা সর্ত ঢোকানোর আছে। রাত নটার পর বাড়ী ফিরলে খাবার মিলবে না। কেমন, রাজী আছ?'

—'ও, নিশ্চয়ই।'

নীল মোটা ব্যাঙ্ক পেপারে দু প্রস্থ দলিল লেখা হল। লেখা শেষ হলে তার নীচে বিভুতোষ সই করল। ওর পীড়াপীড়িতে মায়াও দস্তখত করে দিল কাগজটায়। ঘুমন্ত খুকুমনির বাম অঙ্গুষ্ঠের তেল-সিঁদুর ছাপে চিহ্নিত হয়ে, দলিল সম্পাদনার কাজ যথারীতি সম্পন্ন হল।

চার

মায়ার শরীর এখন অনেক ভাল।

গণ্ডের রক্তিমাভা ফিরে এসেছে। ওকে সাথে নিয়ে বিভুতোষ রোজ বিকালে নদী ধারে বেড়াতে যায়। সন্ধ্যেবেলার ঝিরঝিরে হাওয়া সত্যিই চমৎকার।

এর মধ্যে একদিন হৈ হৈ করে জগদীশের দল এসে হাজির।

—'এই ত দিব্যি সেরে উঠেছেন, বৌদি। ভগবান করুন আগের চাইতে আরো স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠুন।' বলল পূর্ণেন্দু।

অমরেশ বলল :

—'কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবনের অবস্থা আমাদের। গত দু'মাসের মধ্যে খেলা একদিনও ঠিক জমল না। চলুন আজকে বিভুদা। বৌদি ত এখন সেরে উঠেছেন।'

বিভুতোষের মুখে অসহায়তার ছাপ।

—'হার ম্যাজেষ্টীর পারমিশান চাই। ওটা না হয় আমিই নিচ্ছি।' জোড়হস্তে মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, সুধাকর :

—'দাদাকে আমাদের সাথে যেতে আজ্ঞা দিন, বৌদি, প্রসন্ন অন্তরে।'

মায়ার ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হল। শুভ্র, পরিচ্ছন্ন দাঁতের ঝলকে খেলে যায় এক দুর্বোধ্য হাসি।

এইবার বিভু একটু মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে ওঠে :

—'তোমাদের ত আর ঘর সংসার নেই। তোমাদের কি? তোমাদের মত তাসের আড্ডায় দিন কাটালে, আমাদের মত সংসারী লোকেদের চলে না।'

জগদীশ বলল :—'ডেভিল ক্যোটিং স্ক্রীপচার্স! এতদিন চলছিল কি করে?'

—'ঠিক আর চলছিল কোথায়। সংসার-শকটের চাকায় বেজায় ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ শব্দ উঠছিল।'

—'একথা কিন্তু আমরা আদৌ বিশ্বাস করি না বিভুদা, যে বৌদির মত শান্ত লক্ষ্মী মেয়ে আপনার সাথে খ্যাচ্ খ্যাচ্ করেন,' বলল পূর্ণ।

—'মুখে খ্যাচ্ খ্যাচ্ করবার লোক উনি নন। প্রতিবাদ জানাবার ভঙ্গিতে ওঁর মৌলিকতা আছে।'

মায়া প্রমাদ গণল।

সেদিনকার ক্যালেণ্ডারের লেখার কথাটা আবার বলে না বসে। যদিও ক্রীড়ামোদী এই দায়িত্বহীন যুবকদের ওপর তার বিরূপ ভাবটা উত্তরোত্তর বেড়েই চলছিল, তবুও কথাটা এড়ানোর জন্যে মায়া মুখে একটু হাসি টেনে বলল :

—'ওরা যখন ডাকতে এসেছেন, যাওনা কেন, ঘুরেই এসো!'

অমরেশ জয়ধ্বনি করে ওঠে :

—থ্রী চিয়ার্স ফর আওয়ার 'বিনাইন বৌদি, হিপ হিপ হুরে।'

অনেকদিন পর বিভুতোষ চলল ওদের সাথে, রহমান সাহেবের বাংলোয় তাস খেলতে।

এরপর বিভুতোষ ফের তাসের আড্ডায় যেতে শুরু করল।

নিয়মিত নয়, মাঝে মাঝে। সপ্তাহে তিন চার দিন।

বাড়ী কিন্তু সময়মতই ফিরত।

আটটার পর তাকে আর কিছুতেই ধরে রাখা যেত না।

বন্ধুদের ঠাট্টা, অনুরোধ সবই সে উপেক্ষা করে চলত।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে খেলার নেশা আবার তাকে পেয়ে বসল। আড্ডায় হাজিরা দেওয়া বেড়েই চলল। ফেরার নির্দিষ্ট সময়সীমাও লঙ্ঘন হতে লাগল।···

ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ট্যুরে এসেছিলেন চট্টগ্রামে।

তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য বিভুতোষকে যেতে হয়েছিল সেখানে। সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেন্টে ঘড়ি আর চশমা খুলে রেখে বাথরুমে ঢুকেছিল। ফিরে এসে দেখে ঘড়িটা উধাও। সহযাত্রী স্যুট-পরা ছেলেটাও। গাড়ীটা একটা ফ্ল্যাগ ষ্টেশনে থেমেছিল আধ মিনিটের জন্য। ভাগ্যিস স্যুটকেশটা নিয়ে পালায় নি।

দামী ঘড়ি, বিয়েতে পেয়েছিল।

যুদ্ধের বাজারে ঘড়ির দাম খুব চড়ে গেছে। বাইরের মাল আসছে না। মায়ার অসুখে অনেকগুলো টাকা বেরিয়ে গেছে। নতুন ঘড়ি কেনা শীগগির সম্ভব হবে না।

আড্ডায় গিয়ে ঘড়ির অভাবে, বিভুতোষ সময়টা ঠিকমত ঠাওর করে উঠতে পারে না। পাশের হল-ঘরে একটা বড় ওয়াল-ক্লক আছে বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ সময় ঘরটা অন্ধকারই থাকে। রোজ রোজ আলো জালিয়ে ঘড়ি দেখতে গেলে পাছে ওদের নজরে পড়ে যায়, সেই সংকোচটা কাটিয়ে উঠতে পারে না। জগদীশ ও পূর্ণেন্দুর ঘড়ি আছে, তবে সবদিন তারা ঘড়ি আনে না। ওদের ত বাড়ী ফেরার তাড়া নেই। বারবার সময়ের কথা জিগগেস করলে ওরা চটেও যায়। অনেকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে বিভু বাড়ী ফেরে। কিন্তু দু একদিন বেশ দেরী হয়ে যায়। মায়া কিন্তু উচ্চবাচ্য কিছুই করে না। গম্ভীর মুখে খাবার এগিয়ে দেয়।···

বাড়ীতে রেডিয়াম ডায়ালের একটা জার্মান টাইম-পীস আছে। খুব ভাল সময় দেয়। যেদিন ফিরতে দেরী হয়, সেদিন বিভুতোষ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কৈফিয়তের সুরে বলে ওঠে :

—'বাঃ, রাত নটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে, টেরই পাইনে। আই য়্যাম রিয়ালী সো সরি। একটা ঘড়ি না কিনলে আর চলছে না।'

পাঁচ

খেলাটা সেদিন দিব্যি জমে উঠেছে।

রেলের অডিট ডিপার্টমেণ্টের এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক এসেছেন।—নরসিংহম্, দারুণ খেলোয়াড়। জগদীশ আর বিভুতোষ জুটী হয়ে, রহমান ও নরসিংহমের বিপক্ষে খেলছে। রহমান সাহেবেরা মোটেই সুবিধা করে উঠতে পারছেন না। বিভুতোষ সেন ইজ ইন্ হিজ বেষ্ট ফর্ম টুডে।

ভুলচুক এমনিতেই খুব কম হয় তার ; আজ একদম ত্রুটীহীন দুর্দান্ত খেলা খেলছে। হাতও পাচ্ছে খাসা।

এর মাঝে কখন উঠে এসে সুধাকর, টুলের ওপর দাঁড়িয়ে হলঘরের ক্লকটার কাঁটা ঘুরিয়ে, ঘণ্টা দুয়েক স্লো করে রেখে গেছে। জগদীশের পরামর্শেই হয়েছে এটা। বিভুতোষ সময়ের এই পরিবর্ত্তনটা জানতে পারে না।

রহমান সাহেবের পশ্চিমা কুলী-গ্যাংয়ের সর্দার মুকুটলাল বাদাম বেটে গোলাপী আতর সংযোগে পিতলের বড় এক গামলা ভর্ত্তি সিদ্ধির সরবত তৈরী করেছে।

মাঝে মাঝে আড্ডায় সিদ্ধি চলে। তবে বিভু ক্বচিৎ কখনও সামান্য একটু চেখে দেখে মাত্র। বন্ধুদের অনুযোগ এড়িয়েই চলে। আজ ওরা কাড়াকাড়ি করে সরবত খেয়েছে। সাথে বাদামের বরফি।... খেয়ালের মাথায় বিভুতোষও পুরো একগ্লাস সরবত খেয়ে ফেলেছে।

খেলায় জিতে ও সিদ্ধির প্রভাবে, মনটা ওর ফুর্ত্তিতে ভরপুর।

মাদ্রাজী ভদ্রলোকটী সুবিধা করতে না পেরে, শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দেন। বিভুরও বাড়ী ফেরার কথা মনে পড়ে যায়।

—'তাই ত! রাত্তির কত হল এখন?'

রহমান সাহেব একটু মুচকে হেসে বলে ওঠেন :

—'কত আর হবে, নটা বড় জোর।'

—'ইমপসিবল! নটার নিশ্চয়ই বেশী, বলল বিভু।'

রহমান সাহেব জিগেগস করেন জগদীশকে :

—'সাবরেজিষ্ট্রার, তোমার ঘড়িতে কত?'

জগদীশ হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা ওর দিকে উঁচু করে ধরে বলল :

—'এই দেখুন না, নটা বেজে দশ।'

(সেও ঘড়ির কাঁটা দু ঘণ্টা স্লো করে রেখেছে।)

বিভুতোষের তবুও যেন বিশ্বাস হয় না।

পাশের ঘরে এসে আলো জেলে দেখে বড় ঘড়িটাতে নটা সাত।

—'না, খুব বেশী রাত হয় নি, কিন্তু মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে খেলছি।'

ডাঃ দত্ত মন্তব্য করলেন :

—'সিদ্ধি খেলে অমন হয়। টাইম ও স্পেস সেন্স অনেকখানি ব্লার্ড হয়ে পড়ে।'

ওদের নিতান্ত পীড়াপীড়িতে আরও দু-চার ডিল খেলল বিভু। খেলা ছেড়ে উঠল যখন রাত তখন সাড়ে এগারোটা। ঘড়িতে নটা বাইশ।

দারুণ ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

সেই বিকেলে খানচারেক কচুরী খেয়ে বেরিয়েছে, আর সরবতের সঙ্গে খেয়েছে দুখানা বরফি। এতক্ষণ কখন সেগুলো হজম হয়ে গেছে।

মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় উঠল বিভু।

রাস্তা জনহীন।

এপাড়ের চায়ের দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করবার উদ্যোগ করছে।

বিভুতোষের কোন দিকে লক্ষ্য নেই।

মানে হাল্কা খুশির আমেজে।

চোখ বুজে, গুন গুন করে গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে :

—'সময় কখন হবে তোমার
আমি ত আছি জেগে—'

একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

আর একটু হলেই ওর গায়ে পা দিচ্ছিল আর কি!...

বাড়ীর গেট পেরিয়ে, বারান্দায় উঠে বিভু দরজা ধাক্কা দিল। হাতের ঠেলা লাগতেই দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে খিল লাগাতে লাগাতে বিভুতোষ ভাবল :

'তাই ত! মায়া দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে। যদি চোর বদমাইস কেউ ঢুকত।'

ভিতরের বারান্দায় রাখা বালতি থেকে জল নিয়ে

হাত পা ধুলো। শোবার ঘরে এসে দেখে, মায়া চাদর ঢাকা দিয়ে ঘুমুচ্ছে। ভাবল, ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক না! এখন লাভ কি জাগিয়ে। আগে খেয়েই নেওয়া যাক। যা খিদে পেয়েছে!

আজকাল বেশী রাত্তির হলে, খাবার ঢাকা থাকে টেবিলে। এখন ফাল্গুন মাসের শেষ। খাবার গরম করবার দরকার পড়ে না।

আজ রাতে ডাক রোষ্ট হয়েছে।

ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্টেণ্টের ভাই শিকার করতে গিয়ে তিনটে মস্ত মস্ত বিলে হাঁস মেরে এনেছিল, তারই একটা দিয়ে গেছে, আপিসে বেরোনোর আগে।

মায়াকে রোষ্ট বানাতে বলেছিল, রাতের জন্যে। কোল্ড ডাকরোষ্ট অরেঞ্জ সস দিয়ে খেতে ভারী মুখরোচক।

কমলার মরশুমে মায়া বড় বড় দুই বোতল অরেঞ্জ সস তৈরী করে রেখেছে। খাবার ঘরের তাকের ওপর সাজানো বৈয়াম ও বোতলে হরেকরকম জিনিষ,—আমসত্ত্ব, আচার, বড়ি, কাসুন্দী, জেলী, মোরব্বা, সস।

মায়া সত্যিই সুগৃহিণী। সবই ওর নিজের হাতে তৈরী।

অরেঞ্জ সসের বোতলটা খুঁজে বার করে বিভুতোষ খাবার-টেবিলে এসে বসল।

মস্ত একটা জালের ঢাকনী দিয়ে ঢাকা রয়েছে খাবার। বেশ জুৎ করে চেয়ারে বসে ঢাকনাটা উঠাল।

কিন্তু এ কী!···

আচমকা হতাশা ও বিস্ময়ে, ক্রোধে ও লজ্জায় বিভুতোষ বিমূঢ় হয়ে যায়।

দেখে, একটা বড় প্লেটের ওপর রেডিয়াম ডায়েলের টাইমপীসটা উর্ধ্বমুখে তার দিকে তাকিয়ে, যেন ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। কাঁটা দুটো বারটার ঘরে—জড়াজড়ি করে আছে।······

আর ঘড়ির নীচে চাপা খুকুর আঙুলের সিঁদুর টিপ-ছাপ দেওয়া, নীল কাগজের সেই দলিলখানা —— মাঝ থেকে লম্বালম্বি ভাবে ছেঁড়া।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা
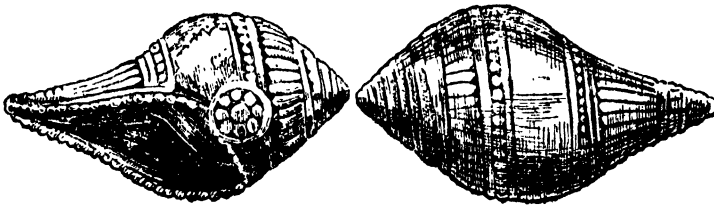
শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বেকার সমস্যা

প্রায় মাস দুই পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের তীব্র বেকার সমস্যার এক ভয়াবহ চিত্র প্রকাশিত হয়। কোন একটি ব্যাঙ্কে মাত্র ৪০।৫০টি অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়! এই বিজ্ঞাপনের চাহিদা মত ২৮,২২৪টি দরখাস্ত পড়ে। দরখাস্তকারীদের মধ্যে আছেন: ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমাধারী এন্‌জিনিয়ার, বহু এম-এ বি-এল এবং বি-এ বি-এল, এম এস সি, বি-এস-সি, বিটি (শিক্ষক), কমার্স-ডিগ্রীধারী, এম-এ, বি-এর ত কথাই নাই, ইহা ছাড়াও সাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন কয়েক হাজার প্রার্থীও আছেন; ডাক্তার আবেদনকারী কেহ আছেন কি না প্রকাশ পায় নাই, থাকিলে অবাক্ হইবার কান হেতু নাই।

বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে বাড়ীর একটি ছেলেটি উচ্চ শিক্ষাদান করিয়া মানুষ করিতে সীমিত আর গৃহস্থকে ঘটিবাটি বিক্রয় করিয়া পড়ার খরচ যোগাইতে হয়। বাড়ীতে তিন-চারিটি সন্তান থাকিলে বহুক্ষেত্রে একটির পঠন-পাঠন ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেই গৃহস্থের প্রাণান্ত হয়, ফলে অন্য সন্তানগুলি হয় অবহেলিত এবং কোন ক্রমে স্কুলের শেষ শ্রেণী পর্য্যন্ত উঠিয়া লেখাপড়া এবং ভবিষ্যতের উন্নতির আশা, ইচ্ছা সবই বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হয়! আজ বাঙলা দেশে সাধারণ গৃহস্থের আর্থিক অবস্থা এমনই হইয়াছে যে সন্তানদের উচ্চ শিক্ষাদানের চিন্তা করাও তাহাদের পক্ষে—বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার আকাঙ্খার মত। শতকরা ৯৫টি গৃহস্থ পরিবারই বাড়ীর ছেলেদের কোন ক্রমে স্কুলের পড়াশুনা শেষ করাইয়া চাকরীর বাজারে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এ-পোড়া রাজ্যে সায়ান্স, এন্‌জিনিয়ারিং, কমার্স, বি-এল, বিটি প্রভৃতি ডিগ্রী লাভ করিয়াও যদি বাঙ্গালী যুবকদের সামান্য ব্যাঙ্ক অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পদের জন্য হুমড়ি দিয়া ভীড় জমাইতে হয় পেটের এবং সাংসারের দায় মিটাইতে, তাহা হইলে তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষার মূল্য কি এবং কোন্ মহা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই খাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইতেছে?

দেশের এবং জাতির অধুনা কর্ত্তা তথা অভিভাবকের দল প্রায় সকলেই জাতীয় শিক্ষানীতি লইয়া জল ঘোলা করিতেছেন, সকলেই বলিতেছেন, দেশের শিক্ষানীতি এবং ব্যবস্থা এমন হইবে যাহাতে যুব তথা ছাত্র-সমাজ অচিরে দেশ এবং জাতিকে উন্নতির গৌরীশৃঙ্গে ঠেলিয়া তুলিতে সক্ষম হয়। (এবং ইহা সম্ভব সমগ্র দেশের বিভিন্ন অহিন্দী ভাষীদের উপর জোর করিয়া হিন্দীর জোয়াল চাপাইয়া!) বহু ব্যয়ে বহু কষ্টে এবং বহু বৎসরের আপ্রাণ-অক্লান্ত চেষ্টায় শিক্ষা সম্পাদন করিয়া শিক্ষিত যুবকদের যদি ভিখারীর মত দরজায় দরজায় ধর্ণা দিতে হয় তাহা হইলে ইহার শেষ পরিণাম কি? দেশের যুব-সমাজকে কথায় কথায় উচ্চমার্গস্থিত নেতারা দেশের এবং জাতির কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিতে "আহ্বান" জানাইতেছেন, খুবই উত্তম "আহ্বান", কিন্তু যুব-সমাজের, শিক্ষিত বেকারদের কিছু পাথেয়র ব্যবস্থার কথা কেহ বলেন না কেন? যে-ভাবেই হউক আজ যাঁহারা দেশকে উপদেশ দিবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দয়া করিয়া একবার মাটিতে অবতরণ করিয়া পায়েহাঁটা মানুষের পথ-

নার বাধা-বিপত্তির একটা সমীক্ষা লইতে রাজী আছেন কি? একথা জানি, আমাদের অম্বরচারী গগন-বিহারী *সরকারী এবং অন্যান্য কর্তাদের এরোপ্লেন এবং হেলিকপ্টার* ছাড়িয়া পৃথিবীর মাটিতে পদার্পণ করা এখন অতীব কষ্টকর হইবে, কিন্তু কপালের কথা যায় না বলা—"দুদিন পরে যখন তাঁহাদের আবার আমাদের সঙ্গে 'গা-এ গা-ঠেকাইয়া' (ঘৃণার সহিত) মাটির পৃথিবীর কর্দমাক্ত এবং কন্টকাকীর্ণ পথে চলিতেই হইবে, সেই কথা ভাবিয়াই না হয় তাঁহারা করুণা করিয়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বেকারদের করুণ অবস্থাটা একবার (স্ব) চক্ষে দেখুন না?

রাজ্য কর্ম্মসংস্থান (State Employment Exchange)—কেন্দ্র

১৯৬৭ সালে রাজ্য কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে ৪০০,০০০-এরও বেশী কর্ম্মপ্রার্থীর নাম রেজিষ্টারী করা হয়। কিন্তু এই সংখ্যার উপর অনায়াসে আরো ১০।১৫ লক্ষ প্রার্থীর নাম যোগ করা যায়, যাহারা ক্রমাগত বিফল মনোরথ হইয়া আর রাজ্য কর্ম্মসংস্থান ভবনের দরজার দিকে যান না। রাজ্য কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের প্রকাশিত একটা হিসাবে অবস্থার গুরুত্ব একটু উপলব্ধি করা যাইবে। গত তিন বছরে কর্ম্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল কম বেশী ১৩,৯২,৬৬৪। কেন্দ্র কর্ম্মসংস্থান করিয়া দেয় মাত্র ১,৩১,৯৯১ জন প্রার্থীর। কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রকে দোষ দিব না, কারণ এমন কোন বাঁধাধরা আইন নাই যে, সরকারী এবং বেসরকারী কল-কারখানা, আপিস, ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্থাকে, লোক নিয়োগ করিতে হইলে তাহা রাজ্য কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের মাধ্যমেই করিতে হইবে। নিয়ম আছে: চাকরী খালি হইলে এবং নূতন পদের জন্য কর্ম্মী দরকার হইলে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রকে জানাইতে হইবে। কেন্দ্র যথা প্রার্থিত কর্ম্মপ্রার্থীর তালিকাও কলকারখানা, আপিস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্থায় পাঠাইবেন। কিন্তু এমন কোন নিয়ম কিংবা বাধ্যবাধকতা নাই যাহাতে কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র কোন সংস্থাকে তাঁহাদের প্রেরিত তালিকা হইতেই নূতন লোক নিয়োগ কিংবা শূন্য পদ পূর্ণ করিতে বাধ্য করিতে পারেন। নিয়োগ সম্পর্কে সংস্থার আছে পূর্ণ স্বাধীনতা এবং এই স্বাধীনতার *পূর্ণ সুযোগ পশ্চিমবঙ্গে অবাঙ্গালী কলকারখানা এবং বাণিজ্য সংস্থার মালিকগণ গ্রহণ করেন।* অবাঙ্গালী মালিক নিজ রাজ্য হইতে প্রয়োজনমত লোক আমদানী করিয়া, স্বজন স্বগোত্র পালন-পোষণ বেপরোয়া ভাবে চালাইতেছেন। অবশ্য একথা স্বীকার করিব যে বাঙ্গালীর ভাগ্যে ছিটে-ফোঁটা পড়ে। অবাঙ্গালী মালিক একেবারে নির্দ্দয় নহেন।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও স্বীকার্য্য যে আত্মীয়-স্বজন-স্বগোত্র পোষণ এবং পালন মানুষ মাত্রেই করিয়া থাকে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক নেতারা এই দোষ বর্জ্জিত। তাঁহারা অপর রাজ্য আগত শ্রমিকদের স্বার্থ সর্ব্বাংশে রক্ষা করিবার সর্ব্বপ্রয়াস করেন, এমন কি বাঙ্গালী শ্রমিকদের স্বার্থহানি করিয়াও। বাঙ্গালী শ্রমিক-নেতারা ইহা করেন নিজেদের স্বার্থেই, তাঁহারা জানেন যে দলে ভারী হইলে বলেও ভারী হয়, কাজেই সংখ্যালঘু বাঙ্গালী শ্রমিকদের প্রতি আন্তরিক দরদ থাকিলেও বাঙ্গালী শ্রমিক-নেতারা, দলে ভারী সংখ্যাগুরু অবাঙ্গালী শ্রমিকদের দাবী আদায়ে এবং স্বার্থরক্ষায় যে প্রকার তৎপরতা দেখান, হতভাগ্য বাঙ্গালী শ্রমিকদের বেলায় ততখানি নহে। তবে, অবাঙ্গালী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা এবং দাবী আদায় করার ফলে সামান্যসংখ্যক বাঙ্গালী শ্রমিক একেবারে বঞ্চিত হয় না।

অবস্থা যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী শ্রমিক-সমাজকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে। আপাতত 'সর্ব্ব-ভারতীয়' শ্রমিক নেতৃত্বের কবল মুক্ত হইয়া, সাময়িক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিককে রাজ্য-সংস্থা গঠন করিয়া নিজেদের স্বার্থ নিজেদেরই রক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন পথ নাই।

কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রকে প্রকৃত ক্ষমতা দিতে হইবে

কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিকে কেবলমাত্র 'কর্ম্মখালি' এবং 'কর্ম্মী-চাই' রেজিষ্টারি আপিস মাত্র না করিয়া, রাজ্যের সকল সরকারী, বেসরকারী সংস্থা, কলকারখানা, ব্যবসা-

বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান যাহাতে সরকারী কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র প্রেরিত *লোক লইতে বাধ্য হয়, সেই আইনগত ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র—কার্য্যত 'বেকার' থাকিবে,* বর্ত্তমানে যা আছে। এমন বহু ঘটনার কথা জানি যেখানে বিধিমত কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রে 'কর্ম্মখালি' কিংবা 'কর্ম্মী-চাই' সংবাদ পাঠাইয়া (এমন কি পাঠাইবার পূর্ব্বেই) শূন্য পদ পূরণ এবং নূতন কর্ম্মী নিয়োগ করা হইয়া থাকে। কর্ম্ম-সংস্থান কেন্দ্র হইতে কোন প্রতিষ্ঠানে 'রিকিউজিশন্' কিংবা ডিমাণ্ড মত কর্ম্মী তালিকা যখন পৌঁছায়, তাহার পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের মনোনীত এবং মনোমত প্রার্থী (কর্ম্মী) শূন্য কিংবা নূতন পদে বহাল করিয়া থাকেন। এই অবস্থা এবং ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে এবং দিলে, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ধাপ্পা অথবা পরিহাসে পর্য্যবসিত হইবে। কাজে প্রায় তাই হইয়াছে।

কর্ম্মসংস্থান হইতে প্রেরিত প্রার্থী নিয়োগ করিতে সকল সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাকে আইন-গতভাবে বাধ্য না করিলে এই কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিকে তুলিয়া দেওয়াই অতি উত্তম কার্য্য হইবে। ইহাতে কিছু সরকারী টাকাও বাঁচিবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য-গুলিতেও কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্রে রাজ্যবাসী অর্থাৎ স্থানীয় (সন্স অব্ দি সয়েল) প্রার্থীদের সর্ব্বক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়া থাকে, বিশেষ করিয়া কল-কার'-খানায় শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে। প্রতিবেশী রাজ্য-গুলিতে এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী শ্রমিকদের কোন দাবী নাই, শ্রমিক পদপ্রার্থী দু-একজন বাঙ্গালী থাকিলেও তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য হয় এবং ইহার প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই, স্থানীয় শ্রমিক-নেতারা ত নিজ নিজ রাজ্যের শ্রমিকদের দাবী-দাওয়া আদায় করিতে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের স্বার্থরক্ষার বিষয়ে সদা তৎপর এবং অতি জাগ্রত থাকেন। খাস পশ্চিমবঙ্গেও বাঙ্গালী শ্রমিকদের অবস্থা প্রায় একই রকম। এ-রাজ্যে কয়েকটি বিশেষ শিল্পে বাঙ্গালী প্রার্থীর সংখ্যা যথেষ্ট থাকিলেও, বাঙ্গালী চাকরী পায় কম, পায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সরকারী কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রের বিধি অনুযায়ী, মাসিক ৬০৲ *টাকা এবং তদূর্দ্ধ বেতনভোগী পদ খালি কিংবা নূতন লোকের প্রয়োজন হইলে,* কেন্দ্রে লোকের জন্য লিখিতে, ফর্মে জানাইতে হইবে। কয়টি রাজ্যের, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কয়টি সংস্থা এ-বিধি পালন করে জানিতে ইচ্ছা হয়। এ-রাজ্যের অবাঙ্গালী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কল-কারখানাগুলিতে মালিকের নিজ রাজ্যের লোক পূর্ব্ব হইতেই হাজির থাকে এবং শূন্য পদ পূরণের কিংবা নূতন লোক নিয়োগের সূচনাতেই পদ পূরণ এবং নূতন নিয়োগ চটপট হইয়া যায়—ইহা যে কেহ লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন। বাঙ্গালী শ্রমিক নিয়োজিত হয় না, এ-কথা বলিব না, কিন্তু প্রয়োজন এবং প্রার্থীর সংখ্যার তুলনায় তাহার হার কত? শতকরা ১০-এর বেশী হইবে কি? এ অবস্থার প্রতিকার এবং বাঙ্গালী প্রার্থীর প্রতি অন্যায় অবিচারের প্রতিরোধ প্রতিকার করিতে হইলে, পশ্চিম-বঙ্গের সরকারী কর্ম্মসংস্থান কেন্দ্রগুলি হইতে প্রেরিত যোগ্য প্রার্থী নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ নাই।

কম্যু নেতার দৃপ্ত ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গের একজন অতিখ্যাত তীব্রলাল কম্যু-নেতা ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহাদের দল, অর্থাৎ ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট (উফ্রী) জয়লাভ করিয়া যদি আবার সরকার গঠন করিতে পারেন তবে সেই সরকার সর্ব্বতোভাবে হইবে শ্রমিক-কল্যাণ সরকার, সোজা কথায় যাহাকে বলা যায়, আগামী 'উফ্রী' সরকার, এ-রাজ্যে শ্রমিক স্বার্থ এবং শ্রমিক-কল্যাণ ছাড়া আর কাহারো কল্যাণ এবং ন্যায্য স্বার্থরক্ষার প্রতি কোন দৃষ্টি দিবে না। অর্থাৎ আমাদের বুঝিতে হইবে, রাজ্যে শ্রমিক ব্যতিরেকে অন্য শ্রেণীর প্রজা বা নাগরিকের কোন অধিকার থাকিবে না! এইখানে শ্রমিক বলিতে শ্রমিক-চালক ইউনিয়ন নেতাদেরই বুঝিতে হইবে, কারণ সাধারণ অজ্ঞ এবং অল্প-শিক্ষিত শ্রমিক নিজেদের সামান্য স্বার্থরক্ষা অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির বেশী আর বিশেষ কিছু লইয়া মাথা ঘামায় না। সরল-বুদ্ধি শ্রমিককে নেতারা যেমন বুঝান, তাহারা তেমনি বুঝে, এবং প্রায়

ক্ষেত্রেই দেখা যায়, নেতাদের প্রচার-প্ররোচনা এবং উস্কানিতেই শতকরা প্রায় একশতটি শ্রমিকবিক্ষোভ ঘটিয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই বিক্ষোভের দুঃখ কষ্ট এবং উত্তাপ সবই যায় শ্রমিকদের উপর দিয়া, নেতারা তাঁহাদের প্রস্তুতি কার্য্য শেষ করিয়া, বারুদে আগুন লাগাইতে অন্য লোককে নির্দেশ দিয়া নিজেরা নিরাপদ্ অন্তরালে সরিয়া যান, বহু নেতা আত্মগোপন করিতেও অতি তৎপর, দেখা যায়! শ্রমিক-বিক্ষোভেরে ফলে ষ্ট্রাইক, লক-আউট প্রভৃতির কারণে অভাব দুঃখ এবং অনাহারের (সপরিবারে) জ্বালা-যন্ত্রণা সবটাই ভোগ করিতে হয় নিরীহ শ্রমিক-সাধারণকে। এই সময় শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের দুঃখ-কষ্টের অংশ লইতে বিশেষ কোন শ্রমিক-নেতাকে দেখি নাই আজ পর্য্যন্ত। গত বৎসর উফি সরকারের একদেশদর্শী শ্রমনীতির ফলে কলিকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র যে-সকল কলকারখানা ষ্ট্রাইক, লক-আউটের ফলে মাসের পর মাস বন্ধ হইয়া থাকে সেই সময় অনাহারজর্জরিত স্ত্রীপুত্র-পরিবার লইয়া, শ্রমিকদের অবস্থা কি শোচনীয় পর্য্যায়ে নামিয়া আসে তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। গত বৎসরের আঘাতজনিত যা এখনও শুকায় নাই, তাহা সত্ত্বেও বামপন্থী তথাকথিত সংযুক্ত দলীয় নেতাদের মুখে 'হইতে পারে জয়' এই আশাতেই পশ্চিমবঙ্গে আবার একটা গণ্ডগোল বাধাইবার হুমকি বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বলা শক্ত এবার এ-রাজ্যে—

শ্রম-অপদেবতারা শ্রম-দেবতাকে বধ করিতে পারিবেন কি না

এ-সংবাদ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে যে বহু শিল্প-সংস্থা এবং কলকারখানার কর্ত্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ হইতে তাঁহাদের কলকারখানা অপসারিত করিতেছেন। যাঁহারা সংস্থা অপসারিত করিতেছেন না, তাঁহারা বর্ত্তমান কল-কারখানা সম্প্রসারিত করিবার যে সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা বর্জ্জন কিংবা স্থগিত রাখিয়া মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ,মহিশূর, বিহার প্রভৃতি রাজ্যে কলকারখানা প্রসারিত করিতেছেন। মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী কোন শিল্পপতি আর নূতন কারবার স্থাপন, এমন কি পুরাণ কারবারও চালাইতে একেবারেই উৎসাহী নহেন, এবং ইহার কারণ অতি স্পষ্ট।

একটি সংবাদে জানা গেল যে একটি বিখ্যাত স-ভারতীয় শিল্প সংস্থা এসিয়ান্-মার্কেটের চাহিদা মিটাইবার জন্য তাঁহাদের ইউরোপীয় কারখানার একটি সুবৃহৎ শাখা কারখানা কলিকাতার নিকট দমদমে স্থাপন করিবার পাকা ব্যবস্থা করেন এবং এই কারখানার জন্য যন্ত্রপাতিও আমদানি করা হইয়া যায়। এই ইলেক্ট্রনিক কারখানাটি দমদমে স্থাপিত হইলে কমপক্ষে ৪।৫ হাজার বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবক এবং হাজার দশেক বাঙ্গালী শ্রমিকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হইত। কিন্তু তাহা হইল না—। প্রস্তাবিত এই সুবৃহৎ কারখানাটি মহারাষ্ট্র রাজ্যে, বোম্বাই শহরের নিকট স্থাপিত হইতেছে। এই কারখানার জন্য যে-সকল যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়, ইতিমধ্যে তাহা সবই বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে। এই বিদেশী কারখানার মালিক-গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-সমস্যা এবং কথায় কথায় শ্রমিক-দের ধর্ম্মঘটের প্রাবল্য দেখিয়া সময় থাকিতেই নিরাপদ্ স্থানে সরিয়া পড়িলেন!

জি-ই-সি, বিড়লা, ফিলিপ্স্, জয় এনজিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ এবং আরো বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গেই গড়িয়া উঠে, কিন্তু এই সকল শিল্পসংস্থার মালিকগোষ্ঠী ব্যবসা সম্প্রসারণে পশ্চিমবঙ্গের উপর আর ভরসা করেন না। ইহার প্রধানতম কারণ শ্রমিকসমস্যা এবং ট্রেড ইউ-নিয়ন নেতাদের শিল্পঘাতী রীতিনীতি।

কোন শিল্পসংস্থাই সাধ করিয়া লক্-আউট ঘোষণা করে না, কিন্তু যখন দেখে যে বিক্ষুব্ধ শ্রমিক কলকারখানার যন্ত্রপাতি ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর, তেমন অবস্থায় কার-খানাতে লক্-আউট ঘোষণা না করিয়া উপায় কি? মাস দুই পূর্ব্বে দুর্গাপুরের কারখানার ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। ষ্ট্রাইক করার অর্থ বুঝা যায়, কিন্তু যে-কারখানাতেই আবার হাজার হাজার শ্রমিককে কাজ করিয়া অন্নসংস্থান করিতে হইবে, সেই কারখানার মূলে আঘাত করার অর্থই

হইল আত্ম-হত্যার সামিল। সাত আট হাজার শ্রমিক দুর্গাপুরে সাময়িকভাবে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। কারখানা চালু হইলে তাহাদের অনেকে হয়ত আবার কাজ পাইত, কিন্তু আপাতত হয়ত মাসকয়েক তাহাদের বেকার থাকিতেই হইবে। দুর্গাপুরে যে সকল যন্ত্রপাতি একদল শ্রমিক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বেকার করিয়াছে, তাহা মেরামত করিতে প্রায় ৮০।৯০ লক্ষ টাকা এবং ৬।৭ মাস সময় লাগিবে। এই বিষম ক্ষতির দায় কে বহন করিবে? কল-কব্জা সম্পর্কে জ্ঞানহীন শ্রমিক-নেতারা—শ্রমিকদের ভাল করিতে গিয়া এই ভাবেই তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

আগামী নির্ব্বাচনে কি হইবে কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু ভাগ্যক্রমে যদি আর একবার ইউ-এফ সরকার গঠিত হয়, তাহা হইলে শ্রম-অপদেবতার দল এবার যে খেল দেখাইবেন, তাহাতে হয়ত এ-ভাগ্যহত রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যে যতটুকু উন্নতি এবং স্থায়িত্ব দেখা যাইতেছে—তাহা শ্রমিক-বিক্ষোভের প্লাবনে ভাসিয়া যাইবে। ক্ষমতা হাতে পাইবার পূর্ব্বেই যে সরকারের দ্বিতীয় নেতা শ্রমিকদের পক্ষে এক তরফা ডিক্রি জারী করিতে পারেন, তাঁহার আদালতে মামলা উঠিবার পূর্ব্বেই খারিজ হইয়া যাইবে এবং বাদীর পক্ষে (মামলা না শুনিয়াই) হাকিম রায় দান করিবেন। আমাদের এ-আশঙ্কা সত্য না হইলে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালী হয়ত আরো কিছুকাল টিকিয়া থাকিবে।

কলিকাতায় বেকারীর জয়যাত্রা!

১৭ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ কলিকাতার একটি প্রখ্যাত ব্রিটিশ এন্‌জিনিয়ারিং কোম্পানি ১৬-৯-৬৮ হইতে তাহাদের তিনটি সংস্থার দরজা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। কোম্পানির বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, তাহাদের তিনটি সংস্থার কর্ম্মী এবং শ্রমিক এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে—যাহাতে কোম্পানির কাজকর্ম্ম চালানো আর সম্ভব নহে—অতএব বাধ্য হইয়াই তাহাদের দরজা বন্ধ করিতে হইল! আমরা যতদূর জানি এই কোম্পানিতে বাঙ্গালী কর্ম্মী এবং শ্রমিকের সংখ্যা অন্তত ৮।১০ হাজার। আলোচ্য কোম্পানির কর্ম্মীদের দাবী-দাওয়া কি এবং কোম্পানি কি ভাবে তাহার কতখানি মিটাইতে চাহে, ঠিক জানা নাই। আমরা কোন পক্ষের হইয়া কথা বলিতে বা ওকালতি করিতেও বসি নাই—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এ-কথা বলা যায় যে, কোন ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সাধ করিয়া লাভের কারবার হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেয় না; দিতে চাহে না। কর্ম্মী এবং শ্রমিকদের দাবী অবশ্যই থাকিতে পারে, বিশেষ করিয়া অন্ধকার এই ক্রমাগত মূল্যস্ফীতির দিনে, কিন্তু কোন ক্রমেই এমন অবস্থার উদ্ভব হওয়া, কিংবা সৃষ্টি করা উচিত নহে যেখানে দুইপক্ষের আলোচনার দ্বারা একটা মীমাংসার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কর্ম্মী এবং শ্রমিকদের দাবী এমন হওয়া উচিত যাহা কোম্পানী মিটাইতে সক্ষম হয়, এবং ইহা মালিক ও কর্ম্মীদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরাই ভাল করিয়া করিতে পারেন। এক্ষেত্রে তথাকথিত স্বনির্ব্বাচিত এবং স্বার্থপর শ্রমিক-নেতারা কখনও দুইদিকে সমান দৃষ্টি রাখিয়া সুবিচার করিতে পারেন না, করেন না। শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায়, সাধারণ শ্রমিককেই এই কলহ-বিবাদের সবটা ঝকি পোহাইতে হয়, মাননীয় শ্রমিক-নেতাদের দেহে আগুনের কোন আঁচ লাগে না। (১৯-৯-৬৮)

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কি?

ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে, রাষ্ট্রপতি-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর কিছুটা উন্নতি দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে শিল্পপরিচালক অর্থাৎ "ঘৃণিত শোষক" বলিয়া কথিত মালিকগোষ্ঠীও খানিকটা নিরাপত্তা বোধ করেন। ব্যবসায়জগতে আবার একটা সজীবতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু—আগামী নির্ব্বাচনের দিন যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তাহাদের তাঁবে শ্রমিক-ইউনিয়নগুলিতে নূতন করিয়া কারণ অকারণ বিক্ষোভ সৃষ্টির নবপ্রয়াস শুরু করিয়াছে। রাজ্যের বর্ত্তমান শিল্প-জগতে এই পরম সঙ্কটজনক অবস্থায় শ্রমিক এবং শ্রমিক-নেতাদের সাধারণভাবে সকল দিক্ চিন্তা করিয়া কাজ করা একান্ত প্রয়োজন হইলেও, শ্রমিক-নেতারা দেশের পক্ষে কোন প্রকার প্রকৃত কল্যাণজনক চিন্তা করিতে সক্ষম

এবং আগ্রহী নহেন। তাঁহাদের প্রধান এবং একমাত্র চিন্তা, কি করিয়া নেতৃত্ব বজায় রাখা যায়, অর্থাৎ কি ভাবে তাঁহারা ক্রীড়া হিসাবে, নিজেদের স্বার্থে এবং নেতৃত্বের আসন পাকা করিতে শ্রমিকসাধারণকে ক্রীড়নক হিসাবে কাজে লাগাইতে পারেন। শতকরা ৯৫জন শ্রমিক- তথা ইউনিয়ন-লিডার সাধারণ শ্রমিকের সুখদুঃখ কি এবং তাহাদের প্রকৃত সমস্যার সমাধান কিসে, কিভাবে হইতে পারে, সে-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সাক্ষাৎজ্ঞান রাখেন কি না এবং রাখিলেও নিজেদের দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তাহার প্রকৃত সমাধানের পথে যাইতে একেবারেই যে প্রস্তুত নহেন, ব্যাপার দেখিয়া ইহাই মনে হয়। রাজনৈতিক দলীয় প্রভাবমুক্ত না হইলে শ্রমিক-ইউনিয়নগুলি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াই থাকিবে। অ-শ্রমিক বাহির হইতে আসিয়া শ্রমিক-নেতা হইতে পারে, কিন্তু শ্রমিকের সমস্যা, তাহার দুঃখ, বেদনা, প্রকৃত অভাব অভিযোগ প্রভৃতি প্রকৃত-শ্রমিক ছাড়া আর কেহই বুঝিবে না, বুঝিতে পারে না। শ্রমিক-সমাজের নেতৃত্ব ভাড়াটিয়া ইউনিয়ন-লিডার দিয়া চালাইলে, কাজ অপেক্ষা হইবে অকাজই বেশী। শ্রমিকদের অমঙ্গলের মাত্রাও ইহাতে বাড়িবে। গত কয়েক মাসে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ মিলিয়াছে।

অবস্থার গতিক যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই আশঙ্কা অমূলক নহে যে—শিল্পসংস্থাদিতে শ্রমিক বিক্ষোভ যদি প্রশমিত না হয় এবং শ্রমিক নেতা মহাশয়গণ যদি শ্রমিকমহলকে তাঁহাদের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করার নীতি পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে অচিরে পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রায় সকল অবাঙ্গালী শিল্পসংস্থার কল-কারখানা ত বটেই, বহু বাঙ্গালী মালিকগোষ্ঠীও তাঁহাদের সংস্থা ওড়িষা, বিহার এবং অন্যান্য রাজ্যে সরাইয়া লইতে বাধ্য হইবেন। গত কিছুকাল হইতেই ইহা বাস্তবেও দেখা যাইতেছে। পশ্চিম বাঙ্গলা হইতে কল-কারখানা এবং অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্যসংস্থা অন্যত্র চলিয়া গেলে, বাঙ্গালী শ্রমিকদের অবস্থা কি হইবে, তাহা পূর্ব্বে কয়েকবার আমরা আলোচনা করিয়াছি, অবস্থা এই প্রকার হইলে বাঙ্গালী শ্রমিক-নেতার দল কি লইয়া কাল কাটাইবেন, কোন্ সূত্র হইতে তাঁহাদের রাজকীয় 'খোরাকীর' আমদানী হইবে? শ্রমিক ক্ষেত্র যদি 'খরা'তে আক্রান্ত হয়, 'শ্রমিক-জোতদারেরা' নূতন কি পেশা গ্রহণ করিবেন জানি না। পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করাটা অতি উত্তম কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু পরের মাথা এবং কাঁঠাল, দুই-ই যদি বিরল হয়, কাঁঠাল ভাঙ্গার ব্যাপারীরা কোন্ হাটে আর কার মাথায় কি ভাঙ্গিয়া কি ভক্ষণ করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিবেন?

কাজেই ইউনিয়ন-নেতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কর্ত্তব্য, নিজেদের বৃহত্তর স্বার্থ, স্থায়িত্ব এবং রুজি-রোজগারের সড়ক উন্মুক্ত এবং তৈলাক্ত রাখিবার জন্ম পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসংস্থার কলকারখানাগুলি যাহাতে অন্য-রাজ্যে চলিয়া না যায় সে-বিষয়ে সবিশেষ অবহিত থাকা। ইহা মালিকের স্বার্থের জন্ম নহে, শ্রমিক এবং শ্রমিক-নেতাদের আত্মরক্ষা এবং সত্তা বজায় রাখিবার কারণেই করিতে হইবে। (২০-৯ ৬৮)

মন্ত্রী'-ফ্যামিলী প্ল্যানিং'?

কেন্দ্রীয় প্রশাসন সংস্কার কমিশন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে প্রকৃত কর্ম্মতৎপর (অ্যাক্টিভ) করিবার জন্ম বিশেষ কয়েকটি সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের মতে:

১। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 'চারপোয়া' মন্ত্রীর সংখ্যা ১৬ এবং তিন ও দুই-পোয়া মন্ত্রীসংখ্যা ২৪এর বেশী হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।

২। অবস্থা বিশেষে এবং অতি প্রয়োজনে মন্ত্রী-সংখ্যা ৫জন বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

৩। কমিশন আরো সুপারিশ করিয়াছেন—প্রধান মন্ত্রীর হাতে বিশেষ কোন দপ্তর থাকা উচিত নহে, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বিশেষ কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হইবেন না। তিনি হইবেন সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীর উপরে, "অভিভাবক মন্ত্রী"। তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইবে বিভিন্ন বিভাগ এবং দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সর্ব্বাঙ্গিক উন্নয়নের প্রতি সদা সজাগ এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা।

মন্ত্রীমণ্ডলী সীমিত করা, অর্থাৎ 'মন্ত্রী-পরিবারে'—একটা ফ্যামিলী প্ল্যানিং (অর্থাৎ কিনা: মন্ত্রী-পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা,—প্রস্তাবটি অতি সময়োচিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার পরিণাম কি হইবে, ভবিষ্যৎই তাহা বলিবে! মন্ত্রী নির্ব্বাচন বা নিয়োগ অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রশ্নের সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকে। এই প্রশ্ন সম্মুখে রাখিয়া, বিভিন্ন দপ্তরের ভার লইবার মত উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া গেলে, বলিবার কিছুই নাই, জটিল সমস্যার, অর্থাৎ সীমিত সংখ্যায় মন্ত্রী নিয়োগ, সহজ মীমাংসা হয়ত হইয়া যাইবে।

কদাচিৎ রাজনৈতিক পার্টিতে উপযুক্ত সংখ্যক প্রার্থী না পাওয়া গেলে—দলীয় ঐক্য এবং স্বার্থের খাতিরে, যোগ্যতার মাপকাঠি প্রধানমন্ত্রীকে হয়ত বাধ্য হইয়াই এড়াইয়া যাইতে হইবে। এমন অবস্থার উদ্ভব হইলে মন্ত্রী সংখ্যা সীমিত রাখা অসম্ভব হইতে পারে। "অযোগ্যতার" দাবী মিটাইতে এবং উপদলগুলিকে শান্ত ও সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য—একজন অযোগ্য মন্ত্রীর স্থলে আরো জনকয়েক অযোগ্যকে মন্ত্রীসভায় বাধ্য হইয়াই আশ্রয় দিতে হইবে। এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে।

কমিশন 'উপ-প্রধান মন্ত্রীর'—পদটি বাতিল করিতে কোন সুপারিশ কেন করিলেন না, বুঝা গেল না। আমাদের সংবিধানে উপ-প্রধানমন্ত্রীর কোন পদ নাই, এ-বিষয়ে কোন উল্লেখও নাই। স্বর্গত জবাহরলাল নেহরুর কালে সর্দার প্যাটেল উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল করেন, তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তির পর দীর্ঘকাল এই পদে বসিবার কেহ ছিলেন না, না-বসাতে কাজের, অর্থাৎ প্রশাসনিক দিক্ হইতে কোন ক্ষতিও কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। বহুকাল পরে নেহরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে মোরারজী দেশাই হইলেন উপ-প্রধান মন্ত্রী। যতদূর জানা যায়—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সানন্দ-সম্মতি ইহাতে ছিল না। কংগ্রেসের দলীয় কোন্দল এবং ঘরোয়া বিবাদ সাময়িক-ভাবে চাপা দিবার জন্যই মোরারজী দেশাই (একপ্রকার জোর করিয়াই) উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করিলেন।

প্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশগুলি সময়োচিত এবং যথাযোগ্য হইলেও প্রধানমন্ত্রী ইহা বাস্তবে প্রয়োগ করিতে পারিবেন কি না গভীর সন্দেহের বিষয়। জবাহরলাল নেহরু হয়ত ইহা তাঁহার আমলে কার্য্যকর করিতে পারিতেন, কারণ, সত্য-হউক, মিথ্যা হউক, নেহরুর মেজাজকে অন্যান্য সকল মন্ত্রী ভয় করিয়া চলিতেন এবং অপমানিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার নির্দ্দেশ-আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করার সাহস কোন অতি সাহসী মন্ত্রীরও ছিল না, এ-কথা কংগ্রেসমহলে সুবিদিত ছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দপ্তরে বিষম ব্যয়-বাহুল্য

প্রশাসন সংস্কার কমিশন একটি অতি প্রয়োজনীয় দিকে দৃষ্টিদান করেন নাই—তাহা প্রত্যেকটি কেন্দ্রীয় দপ্তরে অনাবশ্যক ব্যয়বাহুল্য। এক-একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর 'ব্যক্তিগত' কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমপক্ষে দশ—দুএকটি ক্ষেত্রে বেশীও আছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের মোট ৫১৪ জন 'ব্যক্তি-গত' কর্ম্মচারীর বেতন বাবদ মাসিক খরচা হয় ১,৭৫,০০০ টাকা মাত্র! মন্ত্রী সংখ্যা কমিলে হয়ত এই 'ব্যক্তিগত' কর্ম্মচারীদের সংখ্যাও কিছু কমিবে এবং তাহাতে গরীব প্রজাদের করের টাকাও কিছু বাঁচিতে পারে।

মন্ত্রীদের 'ব্যক্তিগত' কর্ম্মচারী বলিতে ঠিক কি বুঝায় তাহা জানি না। কিন্তু কোন কর্ম্মচারী যদি কোন মন্ত্রীর একান্তভাবে 'ব্যক্তিগত' হয়, তবে সেই কর্ম্মচারীর বেতন ভাতা প্রভৃতির দায় মন্ত্রী মহাশয়ের 'ব্যক্তিগত' আয় হইতেই মিটান কর্ত্তব্য। এ-বিষয়ে আরো বলিবার কথা এই যে—আমাদের মন্ত্রীদের (দু-চারজন বাদে) বিদ্যাবুদ্ধি এবং কর্ম্মক্ষমতার যে-পরিচয় সাধারণ মানুষ প্রত্যহ পাইতেছে (পূর্ব্বেও পাইয়াছে) তাহাতে মন্ত্রী মহোদয়গণের প্রধান কর্ম্মই হইল সচিবের প্রদত্ত রিপোর্ট এবং অন্যবিধ অফিসিয়াল্ কাগজপত্রে নির্দ্দিষ্টস্থানে, অর্থাৎ 'ডটেড' লাইনে তাঁহার মূল্যবান্ সহীদান করা মাত্র। সচিব কি রিপোর্ট দিলেন, তাহা পড়িবার, কিংবা পড়িলেও বুঝিবার মত শিক্ষা ও বুদ্ধি কয়জন মন্ত্রীর থাকে বলা শক্ত না হইলেও, বলাটা বিপদের কারণ হইতে পারে। আমাদের মতে এক-একজন মন্ত্রীর দুইজন পাকা সচিব এবং জন পাঁচেক ঘুঘু কেরানী থাকিলেই যে কোন মন্ত্রী মহাশয়ের

খাস দপ্তরের কাজ খাসা চলিতে পারে। আমাদের এই অপ্রশাসনিক সুপারিশ বিবেচিত হইবে কি? (২-৯-৬৮)

এম পি-দের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি

সংসদ সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা (আর্থিক) বৃদ্ধি সংক্রান্ত যুক্ত-কমিটির সুপারিশ আগষ্ট মাসে সংসদে পেশ করার পর একটা মিশ্র প্রতি-ক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে—সংসদের ভিতরে এবং বাহিরে। এম-পি'দের দৈনিক ভাতা ৩১ টাকা হইতে ৫১ টাকা করা, এই সুপারিশটি লইয়াই সবিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি হয়। যুক্ত-কমিটির যে বৈঠকে এই ভাতাবৃদ্ধির সুপারিশ গৃহীত হয়, সেই বৈঠকে কমিটির মোট ২১ জনের মধ্যে ১২ জন সদস্য মাত্র হাজির ছিলেন এবং বৃদ্ধির পক্ষে ভোট পড়ে ৯, বিরুদ্ধে ৩।

বর্ত্তমানে বছরে খরচ হয় প্রত্যেক লোকসভার সদস্যের জন্য ১৭ হাজার টাকা এবং রাজ্যসভার সদস্যের জন্য ১৪ হাজার টাকা। যুক্ত কমিটির নূতন সুপারিশগুলি গৃহীত এবং কার্য্যকর করা হইলে খরচের পরিমাণ ঠিক কত হইবে এখন বলা না গেলেও এম-পি'দের জনপ্রতি খরচা অন্তত দ্বিগুণ হইবেই।

যুক্ত কমিটির সুপারিশগুলি যথাবিহিত বিল আকারে পার্লামেণ্টে পেশ করা হইলে, কয়েকজন প্রকৃত এবং কিছুসংখ্যক বর্ণচোরা এম পি'র হাজার বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি পাশ হইয়া গৃহীত হইবেই, এবং তাহা বিপুল ভোটা-ধিক্যেই (১০ পক্ষে এবং বিপক্ষে ১-এই রকম হারে)। বিলটি আইনে পরিণত হইলে, যাঁহাদের বর্ত্তমানে 'খাইতে' ইচ্ছা নাই' তাঁহারাও হয়ত অত্যন্ত অনিচ্ছা-অরুচির সঙ্গেই বেতন-ভাতারূপ বাড়তি 'আহার্য্য' গ্রহণে বিশেষ আপত্তি করিবেন না। এম-পি, যাঁহারা ভারতের মত একটা অতি ভীষণ দরিদ্র এবং আধপেটা দেশের জনগণের সুখদুঃখের বিধায়ক, তাঁহাদের আত্মরক্ষার সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য 'ক্ষুদ্র-সঞ্চয়ের' প্রতি এত নিঃস্বার্থ আগ্রহ সত্যই বিস্ময়কর। এত অল্পেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইলেন—একমাত্র দেশের করদাতাদের অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া। চাহিলে আরো বেশী তাঁহারা পাইতেন।

লজ্জা-মান-ভয় তিন থাকতে নয়

প্রতিশ্রুতি-প্রতারণার বন্যা বহাইয়া যাঁহারা একবার সংসদ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন, পার্লামেণ্ট ভবনে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের 'সাধারণ-এবং-হীন-মানবোচিত' তিনটি বদগুণ পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি ভবিষ্যতে 'কিছু, করিবার বাসনা থাকে। এই মহৎ বদ-গুণগুলি আর কিছুই নয়—লজ্জা, মান, ভয়। দৃষ্টান্ত বহু দেওয়া যায় কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা আবদ্ধ রাখিব আমাদের, দেশগতপ্রাণ, জনদরদী, নিঃস্বার্থ সদস্যমহাশয়দের মধ্যেই। দেশের সাধারণজন যখন করভারে ন্যুব্জ দেহ, অনাহারে অভাবে মৃতপ্রায়, সর্ব্বপণ্যের প্রত্যহ-মূল্যবৃদ্ধি কষাঘাতে জর্জ্জরিত, ঠিক সেই সময়ে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা নিয়ামক সংসদ-সদস্য মহাশয়গণ আত্মকল্যাণ সাধনে সবিশেষ ব্যস্ত এবং ব্যগ্র হইলেন। কার্য্যটি অবশ্যই করা হইতেছে দেশ এবং দেশবাসীর বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া, কারণ মাননীয় সংসদ-সদস্যগণ উত্তম বেতন, তদোত্তম ভাতা, উত্তম বাসস্থান—অর্থাৎ সর্ব্বভাবে অভাব এবং সংসার-চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিলেই আমাদের কল্যাণ-চিন্তা তথা প্রচেষ্টা প্রকৃষ্টভাবে চালাইতে পারিবেন।

আমরা প্রস্তাব করিতেছি, প্রত্যেক সংসদসদস্যের প্রতিটি পুত্র, না থাকিলে কন্যার বিবাহের জন্য এককালীন ৬০০০ টাকা, সদস্যের মৃত্যু হইলে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম্মের জন্য দশ হাজার টাকা 'অনু'-দান—এবং পদচ্যুতির পর, সদস্যদের জন্য একটি আরামবহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত 'হোমে'র ব্যবস্থা।

যাহারা বলে নিত্য স্মরণীয় শ্রীশ্রীগৌরী সেন মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা মিথ্যাবাদী। গৌরী সেন মহাশয় আজ নিজেকে ভারতের কোটি কোটি করদাতারূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং তাঁহারই আদর্শ-অনুপ্রাণিত জনগণ পরমেশ্বর নির্ব্বাচিত আমাদের সুখ-দুঃখ-নিয়ন্তাদের কষ্টে জীবন যাপনের জন্য অকাতরে কোটি কোটি টাকা শ্রীগৌরী সেনের বেতনভুক কোষাধ্যক্ষ মোররাজী নামক ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দিতেছে—বিনা

প্রতিবাদে, কারণ এক্ষেত্রে প্রতিবাদ নিরর্থক, কোষাধ্যক্ষ মোরারজীর আদেশমত চৌথ করদাতারা দিতে বাধ্য।

এইবার পার্লামেন্টে নূতন একটি বিল হয়ত পেশ হইবে, যাহার দ্বারা পার্লামেন্টের অধিবেশন বৎসরে ৩৬৫ দিন ধরিয়া চলিবে, এবং হাজিরা গর-হাজিরা বিবেচনা না করিয়া প্রত্যেক সদস্যকে প্রত্যহ ৫১ টাকা করিয়া ভাতা অবশ্যই দিতে হইবে। মোটের উপর সংসদের অধিবেশন বছরে যতদিনই হউক না কেন, সংসদ-সদস্যদের দৈনিক ভাতা যেন কোন সময়েই মারা না যায়, এ-ব্যবস্থা অবশ্য করণীয়।

আমাদের আরো কিছু প্রস্তাব আছে—যথা

১। সংসদ-সদস্যদের প্রতি পুত্র এবং কন্যার বিবাহের জন্য—৬০০০৲ টাকা।

২। ঘটনাচক্রে সদস্য-পদচ্যুত হইলে সদস্যদের জন প্রতি অন্তত মাসিক ৩৫০৲ টাকা পেনসন কিংবা কোন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোমে আমরণ অলস চিন্তা-জীবন ব্যবস্থা, বলা বাহুল্য—নিখরচায়।

এবং

৩। সংসদ-সদস্যের স্বর্গলাভে তাঁহার শ্রাদ্ধ যথাযথ-ভাবে করিবার জন্য দশ হাজার টাকা সদস্যের পুত্র কন্যা-দের দান করা।

(সংসদ-সদস্যদের শ্রাদ্ধাধিকারী প্রকৃত পক্ষে আমরা অর্থাৎ করদাতারা, যাঁহাদের কল্যাণের জন্য সংসদ-সদস্য-গণ প্রায় পিতার কর্ত্তব্য পালন করেন। এ বিষয়ে আশা করি কেহ দ্বিমত পোষণ করেন না।)

৪-৯-৬৮
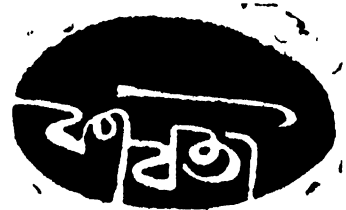
সমাপ্তি

শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

সপ্তর্ষির শেষ পারে
মহাকর্ষ পার হয়ে হয়ে
যেখানে দৃষ্টির দীপ অন্ধকারে লীন হয়ে গেছে,
সেই সেখানে ভৌগোলিক সীমার ওপারে
সমুদ্র বীজন মন্ত্রে আকাশের বৈরাগ্য মিতালা।

মৃত্যুহিম অন্ধকারে
প্রকৃতির স্নিগ্ধ ছায়া রক্তিম অধরে
রূপ নিলো প্রজ্জ্বলন্ত খরসূর্য্যে মধ্যাহ্নের আতপ্ত চুম্বন
নিঃসঙ্গ জীবনে দেখি ব্যর্থতার আপিঙ্গল হাসি
ধরিত্রীর নগ্ন রূপ সমাধি প্রাচীর।

সান্ধ্য বিদায়ের সুরে সুমেরুর শুনেছি ক্রন্দন,
দেখেছি অবাক হয়ে শুভ্রচূড়া পর্ব্বতের দৃঢ়তায়
জীবনের দুর্ম্মদ মিছিল।
আজো দেখি রক্তলোভী শ্বাপদের মতো
হাসিছে নিষ্ঠুর ক্রূর বিষাক্ত আকাশ।

রজনীগন্ধার ঝাড়ে স্তবকে স্তবকে
বৃন্তচ্যুত কামনার ক্লান্তিহীন স্তব
এ সকলি বাদ দিয়ে পার হয়ে প্রেয়সীর স্মৃতি রাঙা
আগ্নেয় প্রহর—শুনি আমি সময়ের
রূঢ় অঙ্গীকার।

ঝঞ্ঝামদ মত্তবায়ু
দ্বিধাকম্প বিপ্লব জোয়ারে
তন্দ্রালসা রজনীর আতপ্ত ললাটে
এঁকে দিলো একটি চুম্বন—রোমাঞ্চ নিবিড়।
মেঘে এলো চিত্ত প্লাবি' ঐশ্বর্য্যের ভারে
নিদ্রার আহুতি।

ভগিনী নিবেদিতাকে : দু'টি প্রশ্নের নৈবেদ্য

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

১

মাতা নও, জায়া নও, পরিচয় শুধুই ভগিনী।
বাগ্মিতা সাহিত্যে, শিল্পে, ধর্মে, কর্মে তুলনা তোমার
সে যুগের ইতিহাসে প্রকৃতই খুঁজে পাওয়া ভার।
বিমূর্ত যুগাত্মা তুমি, বৈপ্লবিক শক্তি-স্বরূপিণী!
অঙ্গে অঙ্গে এত রূপ প্রাণোচ্ছলা তবু বৈরাগিনী
ছিলে তুমি যথার্থই লোকমাতা, রবীন্দ্রবন্দিতা!
কুমারী কুসুম এক অনাঘ্রাতা তুমি অনিন্দিতা!
বোসপাড়া লেনে জোটে সাধু, সুধী, বিপ্লবী, বিজ্ঞানী।

বিবেকানন্দ যে কবি, তুমি তাঁরই রচনা অমর
ভারতীয় রেনেসাঁসে সে যে এক আশ্চর্য ঘটনা।
অরবিন্দ, জগদীশ, অবনীন্দ্রে জোগাতে প্রেরণা,
তিলক, গোখ্‌লে···আরো কত নাম করি পর পর?
কৌতূহল জাগে বটে থাক তবু তার আলোচনা,
মনসিজ ভুল ক'রে ও-হৃদয়ে হানেনি কি শর?

২

আলমোড়ায় সেই রাত ; মেঘলিপ্ত নৈশ মায়াবতী
আকাশ পাহাড় কাঁদে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর ঝড়ে ;
সে আর্ত রাত্রির কান্না মর্মভেদী সে কি মনে পড়ে?
দেহের কেল্টিক রক্ত সহসা চঞ্চল, অশ্রুমতী!
অবুঝ প্রকৃতি কাঁদে ; বর্ষণের নাই ছেদ, যতি।
ঘুমোও নি ; আলো জ্বলে। কে জানে যে রাত হলো কত?
গুরুহস্তে পাওনি কি সেই রাত্রি দিতে পারে যত?
স্নেহের আশিস্-স্পর্শে শান্ত হলে বেপথু ব্রততী।

স্বামীজীর মরদেহ পাশে নিয়ে দুপুর অবধি
শোকমূর্তি পাথা ক'রে গেছ নিয়ে ভক্তিভ হৃদয় ;
মুখাগ্নির শেষ ত্যাটুকু সেও তোমা হতে হয়।
তাঁরি অসমাপ্ত কাজে ব্রতী তুমি ছিল নিরবধি
জীবনের নৌকাডুবি দার্জিলিঙে লিখেছিল বিধি ;
নৌকাডুবি-শেষে কি গো পেলে কোনো নব সূর্যোদয়?

জাগতিক

শঙ্কর চক্রবর্তী

সব পাতা ঝরে গেল, অতঃপর শূন্যতার সীমা
পরিব্যাপ্ত এ-হৃদয়ে যতদূরে দু'চোখ ফেরাই
বিক্ষত হৃদয়ে শীত বেহাগের আদি ধরানাই
বাজায় বিধ্বস্ত হাতে। অঘ্রাণের বিবর্ণ নীলিমা!
অথচ জীবন চেয়ে অনাবিল আলোর প্রতিমা
দু'হাতে সরিয়ে ঢেউ গরলের বিষাক্ত ফেনাই
পেয়েছি অঞ্জলি ভরে। মৃত্যু আহা, মুক্তির সানাই
সত্তার মশালে জলে জীবনের দীপ্ত অরুণিমা!
সব পাতা নিঃশেষিত! পাণ্ডুরের কলার মান্দাসে
লখীন্দর জীবনের দিনগুলি আলোর প্রতীক
প্রত্যহই ঝরে যায়—দীর্ঘশ্বাসে বাতাস আতুর!
আমরা জীবন খুঁজি নিষ্ঠুর দুঃখের অবকাশে
অন্ধকারে বেশ চিনি সত্তাকে; কেননা জাগতিক
মন্থনের রজ্জু হয়ে রোজই শুনি মোক্ষের নূপুর!

সার্থকতা

শ্রীআশীষকুমার গুপ্ত

জীবনের তটে তটে আকাংক্ষার ঢেউ যদি লাগে
সমুদ্রকল্লোলে শুনি অবিরাম সরব আহ্বান।
মনের গহনলোকে সুপ্তিভাঙা প্রেমবন্যা জাগে।
তবে সে কি ব্যর্থ হবে? ব্যর্থ হবে প্রেমের বিজ্ঞান!
দর্শনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিতর্ক বিচার যদি মানি
প্রেম নাকি অপরাধ! প্রেম নাকি জীবনের গ্লানি।
প্রেমের অপর পিঠে আছে শুধু ব্যর্থতার জ্বালা!
তা বলে কি কোনদিন ব্যর্থ হয় বসন্তের বেলা?
যবে এসেছিলে তুমি গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে,
প্রখর রৌদ্রের সাথে খেলেছি তো লুকোচুরি খেলা।
দিইনি তো ব্যর্থ করে ফাগুনের প্রতীক্ষার পালা!
আজ তুমি কাছে নেই। আজ আমি কত দূরলোকে।
যদি সত্য কথা বলি, প্রেমে আসে ব্যর্থতার জ্বালা
বঞ্চনার গ্লানি আনে জীবনেতে পরম ধিক্কার।
তবু তুমি তবু আমি আমাদের সেই কটা বেলা
মুহূর্ত হয়নি ব্যর্থ! শান্তির প্রতীক কবেকার।

মুখ

শ্রীসুধীর নন্দী

কী জানি কেন ?
বোধগম্য হ'ল না ব্রাহ্মীলিপি,
পুরাতত্ত্ব ব্যক্তিজীবনের
অনাবিষ্কৃত, অপঠিত র'য়ে গেল।
আমি বুঝলাম না এই অব্যক্ত মহিমা-
গুপ্ত নৃশংসতা, গোপন বিলাস,
জুগুপ্সা, রিরংসা,
আর হনন করার ইচ্ছা ;
জীবনের কামাতুর মুহূর্ত্তগুলো ;
পিতা হ'তে চেয়েছি ;
ব্যর্থ পিতৃত্বের অভিশাপে
প্রৌঢ়ত্ব রূঢ় হয়েছে ;
গৃহিণী গাবলুদাকে ভালোবাসে—
আমার বিস্তীর্ণ ললাটে
তার কর্ষণচিহ্ন ;
এরা সবাই আছে ;
তবু ত তাদের খুঁজে পাই না
নিস্তব্ধ দুপুরে, নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়
অথবা নিশুতি রাতের আয়নায়।
পাক-খাওয়া অবচেতন মনের
হায়নাগুলো অনুসরণ করছে।
অহর্নিশি তাদের হাসি ;
ঘুম হয়নি।
তাদের কাহিনীও তাকিয়ে আছে
মুখের বহু-ভঙ্গ বার্ধক্যে ;
হনু উঁচু হয়ে উঠেছে—
তবু ব্যর্থ উচ্চাশার চুড়োটাকে
বুঝি সংকেত করেনি।
আবরণ, নিচ্ছিদ্র যবনিকা ;
জীবন-নাট্যের সহস্র অঙ্ক,
সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা
উচ্ছ্রিত লক্ষ লক্ষ দ্বীপ
জেগে আছে ;
এক টুকরো বিবর্ণ চামড়ার নীচে ;
খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি ;
একটু ছোট্ট গোঁফও বুঝি,
সেদিনের বর্বর নাৎসী অভিযানের
স্মরণ-চিহ্ন।

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ

ডঃ প্রফুল্লকুমার সরকার

বছরটা ঠিক মনে নেই—কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর বিরাট পূজার দালানে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্ফারেন্সের সভাপতিরূপে স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন্ত দিক্-প্রকম্পিত-করা ভাষণ দিচ্ছেন; দশহাজার প্রতিনিধি ও সাধারণ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বক্তা অঙ্গুলিনির্দ্দেশে বলছেন—"ঐ তো সেল্ফ গভর্ণমেণ্ট এসে গেল!"—অমনি বিশহাজার চোখ মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দিকে ধাবিত হল।

১৯০৫ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গবিভাগ ঘোষণা করলে সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার, রামানন্দ, অম্বিকাচরণ, কাব্যবিশারদ, লিয়াকৎ হোসেন, দীনমহম্মদ, বেচারাম প্রভৃতি সেই বিভাগের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলনের সেই তড়িৎ-স্পর্শে জাতীয় জীবন তরঙ্গায়িত হল। 'প্রভাতগগনে কোট শিরতুলি—নির্ভয়ে আজি গাহ রে—', 'সেদিন প্রভাতে নবীন তপন নবীন জীবন করিবে বপন—এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে!' 'একবার তোরা মা বলিয়ে ডাক—জগৎ-জনের শ্রবণ জুড়াক। হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক—মুখ তুলে আজি চাহ রে!'—এইরকম গান গেয়ে নবীন প্রবীণ দলে দলে শোভাযাত্রা সহ পথপরিক্রমা করতে লাগলেন। আমরা তখন স্কুলে পড়ি; সে মাইল-খানেক লম্বা শোভাযাত্রার Rear Guard-এর অংশ নিয়ে আমাদের নিজের মত ভাবে গাইতে গাইতে চলতাম আর সুযোগ পেলেই তাকাতাম শোভাযাত্রার Leader-নেতা কৃষ্ণকুমারের জামাই শচীন বসু ও নবদ্বীপের বিখ্যাত গায়ক পক-শ্মশ্রু শ্যামল অধিকারীর পানে।

চারিদিকে অত্যাচার নিপীড়নের মধ্যে দিয়েই ঘটেছিল সে নবজাগরণ। পাবনার সভা ছত্রভঙ্গ হল; ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ ডায়াস থেকে নেমে সরে গেলেন—লাঠি চলতে লাগল এলোধাপাড়ি, বরিশাল কন্ফারেন্সে রেগুলেশন লাঠি চলেছিল। কৃষ্ণনগরের সভায় সুরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে নেতা উকীল বেচারাম লাহিড়ী পিঠের সার্ট তুলে খাওয়া লাঠির দাগ দেখালেন। কৃষ্ণনগরের পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠের সে সভায় সুরেন্দ্রনাথ তরুণদের স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা দিতে সিংহ-গর্জনের মত উদাত্ত আহ্বান জানালেন। অশ্বিনী দত্তের হাতে গড়া চারণেরা গেরুয়া আলখেল্লা পরে তানপুরা বাজিয়ে সভায় সভায় ঘুমুর পায়ে নেচে নেচে 'ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধূলায় ধ্বজা লুটবে, ওদের ধূলায় ধ্বজা লুটবে।'— গেয়ে বেড়াতে লাগলেন। তরুণের প্রাণে চপলতা অন্তর্হিত হল, তা বিশুদ্ধ জাতীয় ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠল—নবদীক্ষিত জাতি আত্মস্থ হয়ে উপলব্ধি করল—

'ধন্য হইল জগৎ তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ,
ধন্য আমরা মোদের জননী জগজ্জননী ভারতবর্ষ!'

দেশের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত ওজস্বিনী বক্তৃতায় দেশকে যুগান্ত নিদ্রা থেকে তুলেছিলেন তিনি। ব্রিটিশ সম্পাদকদের কেউ কেউ তাঁকে 'the organ voice of India'—ভারতের কম্বু কণ্ঠ, "Second Burke of British Empire'—দ্বিতীয় বার্ক বলে সংবর্দ্ধিত করেন, এমন কি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী 'ম্যাঞ্চেষ্টার কুরিয়া'র পত্রিকার সম্পাদক তাঁর তড়িৎশক্তিময় প্রেরণাময়ী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন: 'সে অপূর্ব বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য লোকের জীবনে একবার মাত্রই হতে পারে।—'

মুক্তমালা

(গল্প)

চিত্ররথ

কথাটা মুক্তামালার।

মুক্তার আসল নকল—দর দাম নিয়ে নয়।

সেই মালা কেমন করে কার গলায় উঠল, তারই কথা।

এই ঘটনা সম্বন্ধে যে রটনাটা একদিন শুনেছিলাম, তাই বলছি।

মফঃস্বল শহরের বনেদী বাসিন্দা মুখুজ্জে পরিবার। জমিদার বংশ। বড় না হলেও মাঝামাঝি আয়ের চার-আনার শরিক। সেই বংশের বাঘে গরুতে একঘাটে জল-খাওয়ানর হিম্মৎরাখা দুর্দান্ত জমিদার বিপিনবিহারী যখন মারা যান তখন তাঁর একমাত্র পুত্র বিনোদবিহারীর বয়স বাইশ বৎসর। বিনোদবিহারীর শিক্ষা-দীক্ষা তেমন কিছু ছিল না। সহরের ইস্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্যন্ত উঠেই সরস্বতীর মন্দিরে শেষ প্রণাম জানিয়ে বাবার কাছারী-ঘরে বসে খোলের বোল তুলতে আরম্ভ করেছিল। শাক্তবংশের ছেলের হাতে খড়্গের বদলে খোল ভাল লাগে নাই বাবার। তবুও পুত্রের সঙ্গে এই নিয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করেন নাই। বরং রাগটা পড়েছিল বৈরাগী বোষ্টমদের উপরেই বেশী। গ্রামের নিতাই দাসকে তিনি নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছিলেন।

এমন সময় একটা মিথ্যা খুন-জখমের মামলায় জড়িয়ে পড়লেন বিপিনবিহারী। হারলে নির্ঘাৎ বারবছর জেল। বেঁচে গেলেন বিপক্ষপক্ষেরই সাক্ষ্য সেই নিতাই দাসেরই জবানবন্দীতে।

ডকে দাঁড়িয়ে প্রায়-প্রৌঢ় কৃশদেহ নিতাই দাস। হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন,—কী নাম?

সাক্ষী উত্তর দিল—শ্রীনিতাইচরণ দাস।

—পিতার নাম?

—ঈশ্বর গঙ্গাধর চক্রবর্তী।

সঙ্গে সঙ্গে বিপিনবিহারীর উকিল বিশ্রী রকমের একটা ব্যঙ্গের হাসির তরঙ্গে কাঁচাপাকা গোঁফজোড়াকে উপরে নীচে নাচিয়ে বলে উঠলেন—এ কী রকম হুজুর। দাসের বাবা চক্রবর্তী।

নিতাই দাসের চোখে মুখে কোথাও একটুকু লজ্জা বা দ্বিধার লেশ পর্যন্ত দেখা গেল না। বেশ সহজ সরল ভাবেই সে উকিলবাবুর সেই কথার উত্তর দিল।

—হুজুর, মা আমার দ্বিচারিণী ছিলেন। বৈষ্ণবের ঘরের অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে যৌবনকালে যখন ঈশ্বর গঙ্গাধর চক্রবর্তী মশায়ের রক্ষিতা হয়ে তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন, তখন আমার জন্ম হয়। আদালতে মিথ্যা বলে পাপের ভাগী হব না। এই খুন-জখমে বিপিনবাবুর কোন সংযোগ ছিল না।

সকলে এই জারজ লোকটির সত্যভাষণে হাসাহাসি করতে লাগল। ইংরেজ হাকিম কিন্তু আর অন্য সাক্ষ্য গ্রহণই করলেন না। বিপিনবিহারী বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন।

এর বছর কয়েক পরেই যেমন মুখুজ্জেবংশে তেমনি গোটা দেশটাতেও একটা ওলটপালট হয়ে গেল। আখের ছিবড়ের মত দেশটাকে সম্পূর্ণ রসকষহীন করে ইংরেজরা পাততাড়ি গোটাল। শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল কংগ্রেস সরকার। কর্ণওয়ালিসের কেরামতিকে খতম করে দিয়ে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ঘটাল নতুন সরকার। সামান্য একজন দরিদ্র প্রজা, যে একদিন মুখ তুলে বিপিনবিহারীর চোখের দিকে তাকাতে পারত না, সে

এখন লাঠি তুলে দাঁড়াতেও বিন্দুমাত্র ভয় পায় না। বিপিনবিহারী বোধহয় এতটা সহ্য করতে পারলেন না। বছর দুই পরেই বিনোদবিহারীর মাথায় ছোট হতে বড় আদালতে গণ্ডাকয়েক চলতি মামলার মণখানেক নথিপত্র চাপিয়ে দিয়ে লোকান্তরিত হলেন।

পিতার নিকট হতে বিনোদবিহারী আভিজাত্যের যে ঘন রক্তটুকু পেয়েছিল, নিত্যদিনের অভাব আর অনটনের তাপে ক্রমে ক্রমে তা তরল হয়ে পড়ল। নিতাই দাসের মত সত্যবাদী উপকারী লোকও কোনদিন বিপিনবিহারীর সামনে ফরাসের উপরে বসতে পায় নাই। বিনোদবিহারী এখন সেই নিতাই দাসের চালা-ঘরের দাওয়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোলের বোল তোলে। নিতাইয়ের বিধবা ভগ্নীর ব্রাহ্মণকে প্রণামীস্বরূপ দেওয়া একটা কচিলাউ কিম্বা টাটকা পোনকা শাক কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ঘরে আনতে সে এতটুকুও লজ্জাবোধ করে না।

নিতাইয়ের সংসার বলতে মা-মরা একটি পুত্র আর বিধবা ভগ্নী। ছেলেটি যেন কাল কষ্টিপাথরে গড়া। নাদুসনুদুস গোলগাল। বছর দশ বয়স। আগের সব-গুলির মৃত্যুর পরে এইটিই বংশের একমাত্র বাতি। নাম রেখেছে গোপাল।

তর্কশাস্ত্রে বলে "প্রপার নেম্স্ আর নন-কনোটেটিভ।" গোপালের ক্ষেত্রে কিন্তু তার নাম আর নামের লক্ষণের সঙ্গে মোটেই কোন ভিন্নতা ছিল না। পিসীর দেওয়া আদরের নাম নাড়ুগোপাল।

বাপই বিনোদবিহারীর বিয়ে দিয়েছিলেন আর এক ডাকসাইটে জমিদারের মেয়ের সংগে। নাম ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীই বটে। যেমন রূপ তেমনি গাম্ভীর্য। বিনোদ-বিহারী ভেঙ্গে পড়েছিল, ভুবনেশ্বরী কিন্তু একটুকুও মচকায় নাই।

একটি মাত্র মেয়ের পর ভুবনেশ্বরীর আর কোন সন্তান হয় নাই। অন্নপ্রাশনের সময় দিদিমা একগাছা সোনার সরু বিছের মধ্যে একটি মুক্তা গেঁথে নাতনীর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই হ'তে মেয়ের নাম মুক্তামালা।

স্বামীকে নিষেধ করে ভুবনেশ্বরী।—কেন তুমি যখন তখন নিতাই বোরেগীর বাড়ী যাও? লজ্জা করে না?

বিনোদবিহারী হাসে। বলে—লজ্জাহীন হবার জন্যই যাই সেখানে। নিতাই দাস নানারঙের গামছা বোনে। বেশ লাগে দেখতে। দেখি আর ভাবি, তার তাঁতের মাকুর মতই মানুষের ভাগ্যও সদাসর্বদা অস্থির।

স্বামীর নির্লজ্জ হাসিতে ভুবনেশ্বরীর ফরসা মুখখানা কুল কাঠের আগুনের মত আরও বেশী লাল হয়ে ওঠে।

স্বামীকে পারে নাই, মেয়েকে নিজের হাতে মানুষ করতে চেষ্টা করেছিল ভুবনেশ্বরী।

(২)

মানুষের জীবনে নিয়মকানুন ঘনঘন পাল্টায়। ঈশ্বরের নিয়মকানুনের কোন পরিবর্তন ঘটে না। পৃথিবীর আহ্নিক আর বার্ষিক গতিতে কোন ছেদ পড়ে না।

একটা হাত-তাঁত আর বিঘেচারেক ধেনোজমির উপরে নির্ভর করে ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করেছিল নিতাই দাস। শুধু খাতাপত্তর আর বইই কিনে দেয় নাই বিনোদবিহারী, যেটুকু পারত দেখিয়ে শুনিয়েও দিত। বলতে গেলে বিনোদবিহারীই নাড়ুগোপালের আদি গুরু। গোপাল ইস্কুল-ফাইনেল পাশ করে একটা জলপানিও পেল। তারপরে ভর্তি হল কলেজে। এও বিনোদবিহারীর উৎসাহে। ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম হয়ে বি এ ও সে পাশ করল। তারপরে এম-এতে একবারে টপ্ প্লেস। ছেলের শিক্ষার ফলটাই দেখে গেল নিতাই দাস, সৌভাগ্যটা দেখে যেতে পারল না। বাবার মৃত্যুর পরে আই-এ-এস পাশও করল গোপাল দাস, তফশিলী সম্প্রদায়ের লোক, একটা বড় সরকারী চাকরী পেয়ে কোথায় যেন চলে গেল। সঙ্গে গেল সেই বুড়ী পিসী।

মুক্তামালার বয়সও থেমে ছিল না। নাড়ুগোপালের চেয়ে বছরচারের ছোট। তেইশ বছরের তরুণী। সুন্দরী

মায়ের মেয়ে, রূপে মাকেও হার মানায়। শিরায় মুখুজ্জেবংশের রক্ত। নাক মুখ চুলেও সাজন্ত। তেইশটি বসন্তের সমারোহ তার যৌবন-পুষ্পিত দেহের প্রতিটি ভাঁজে ভাঁজে। অভাবের সংসারে একটি অযাচিত সৌন্দর্য্য যেন ভাঙ্গা টবে ক্যামেলিয়ার কনক-কোরক।

অবহেলায় নিজের লেখাপড়া বন্ধ হওয়ার মনোবেদনায় নিতাই দাসের ছেলে গোপালকে লেখাপড়া শেখাতে ইচ্ছুক হয়েছিল বিনোদবিহারী। তারপরে নিজের মেয়ে মুক্তামালাকেও। নানা প্রতিকূল অবস্থায় মুক্তামালাকে দিয়ে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। সহরেরই কলেজে মাত্র একটা বছর কাটিয়েই তার সমাপ্তি ঘটল। মুক্তামালার তেমন কাজকর্ম নাই। খায়দায় ঘুমোয়। উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ পড়ে।

পাড়ার প্রায় সকল রকবাজদের লুব্ধদৃষ্টি মুক্তামালার বরতনুর প্রতিটি খাঁজে খাঁজে চমকে চমকে হোঁচট খায়। বাঘিনীর মত ভুবনেশ্বরীর সদাসতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে কেউ কোন সুবিধা করতে পারে না।

একমাত্র সুখময়কে বিশ্বাস করে ভুবনেশ্বরী। পাড়ার ছেলে। চক্রবর্ত্তী হলেও স্বজাতি। সুখময়ের বাবা পাকিস্থান হতে এসে ঠিকেদারী করে হালে বড়লোক হয়েছে। সুখময়ও বি-এ পাশ করে বাবার কাজকর্ম দেখাশুনা করে।

সুখময় বলে, সে বিয়ে থা করবে না। রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাস নেবে।

খড়ের চালার নিচে এই লেলিহান অগ্নিশিখা আর রাখা যায় না। কোনদিন হয়ত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে সব পুড়িয়ে ফেলবে। ভুবনেশ্বরী স্বামীকে বলে, এইবার মুক্তোর বিয়ের ব্যবস্থা কর।

অনেকবারের মত একই উত্তর বিনোদবিহারীর। —হবেই একদিন। তড়িঘড়ি ব্যবস্থার মত অবস্থা কোথায়!

—সুখময়ের বাবাকে আবার বল।

বিপিনবিহারীর রক্তের তাপে উষ্ণতা জাগে বিনোদবিহারীর শিরায় শিরায়। বলে—একবার কথা উঠিয়েছিলাম সম্মত হয় নাই। নতুন বড়লোক। ট্যাকশালের টাকাই চেনে। মুখুজ্জেবংশের মুক্তোর মর্যাদা ও জানবে কেমন করে?

মর্যাদায় আঘাত লাগে ভুবনেশ্বরীরও। মুখের আদলটা বদ্‌লে যায়। বলে,—তবে সুখময় এ বাড়ীতে আসে কেন?

—সে তুমিই জান। তাকে আসতে নিষেধ করে দিও।

—তাই দেব!

পরের দিন সুখময় এল। দোতলার নির্জন ঘরে যেমন অন্যদিন বসে গল্পসল্প করে তারা, সেদিনও তেমনি আরম্ভ হল।

—সত্যি সন্ন্যাসীই হবে তুমি? হাসতে হাসতে মুক্তামালা বলল।

—হতেই হবে। গৃহী হবার সুযোগ পেলাম কৈ?

—পেলেনা কেন?

—বাবা রাজী নন।

—তুমি রাজী?

—সে কথা তোমাকেও বলতে হবে!

—বিয়ে করবে কে? তুমি না তোমার বাবা?

চুপ করে বসে থাকে সুখময়। কোন উত্তর দেয় না।

মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে মুক্তামালার।

—তুমি না পুরুষমানুষ! লেখাপড়াও শিখেছ। যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। পারবে নিয়ে যেতে?

—যাবে তুমি? সত্যি যাবে? সুখময়ের বোবামুখে দ্বিগুণবেগে কথা যোগায়।

—মুখুজ্জে বংশের মেয়ে আমি। তারা একবার হাঁ বললে, দ্বিতীয়বার না বলতে জানে না।

সাহস পায় সুখময়। মুক্তামালার কাছ ঘেঁসে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। আলতোভাবে তার একটা হাত তুলে নেয় নিজের কোলের উপরে। দুজনে দুজনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

সহসা ধারাল তরোয়ালের তীক্ষ্ণতার মত তীব্র একটা চিৎকারে চমকে ওঠে দুজনেই।

—মুক্তো!

দরজার দিকে দৃষ্টি পড়তেই অকস্মাৎ যেন একটা তড়িৎস্পর্শে দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়ে।

—সুখময়!

মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে সুখময়।

—বেরিয়ে যাও।

সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দেয়—ভুবনেশ্বরী।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙ্গে চলে যায় সুখময়।

তারপর মা মেয়েকে নিয়ে পড়ে।

—এ কী!

—কিসের কী?

—এই সব!

—কী সব?

—মনে করিস কিছু দেখি নাই—বুঝি নাই কিছু?

—দেখলেই বা—বুঝলেই বা! তোমরা যা পারবে না, আমি তাই পারতে চেষ্টা করছি।

—ও চেষ্টা তোকে অমনভাবে করতে হবে না—করতে দেব না। সুখময়ের সঙ্গে বিয়ে তোর হবে না। ওরা নীচ-হীন-ঘৃণ্য! ওই বাঁদরের গলায় উঠবার জন্ম মুখুজ্জেবংশে তোর জন্ম হয় নাই।

কোমরে দুটো হাত রেখে একপা এগিয়ে আসে মুক্তামালা।

কোন্ দেশের রাজপুত্র আনবে আমার জন্যে? জমিদারপুত্রও দেশ খুঁজে আর পাবে না।

বাঁশীর মত নাকের পাতলা পাতাদুটো কাঁপতে থাকে মুক্তামালার।

ভুবনেশ্বরী চেয়ে চেয়ে দেখে। রাগলে শ্বশুরেরও এমনি নাকের পাতা কাঁপত। আর কোন কথা না বলে সে ধীরে ধীরে চলে যায়।

দিন দুই পরে সন্ধ্যার আগেই অতবড় চকমিলান দালানটার কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না মুক্তামালাকে। তারপরদিন না—তারপরদিনও না।

উপরে থুতু ফেললে নিজের গায়েই পড়ে। চুপিচুপি খবর নিয়ে জানতে পারল বিনোদবিহারী, চক্রবর্তীদের—সুখময়ও নাই।

বিনোদবিহারী ঘরের বাহির হয় না। এক জায়গাতেই চুপ করে বসে থাকে। বিরাট একটা ভুমিকম্পের আলোড়নকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ভুবনেশ্বরীর অমন সুন্দর মুখখানার রূপ হয়েছে কেমন যেন ভয়ংকর। যে কোন মুহূর্তে সমগ্র সংসারকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে পারে।

(৩)

বুদ্ধগয়ার নিকটেই নতুন একটা আবাসিক হোটেল। তারই দশ নম্বর ঘরে সেদিন সকালবেলায় একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে গেল। দিন দুই পূর্বে দু'টি তরুণ-তরুণী হোটেলের একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করছে। বলে, বেড়াতে এসেছে। চালচলনে সাজসজ্জায় অভিজাত বলেই মনে হয়। যুবকটির কপালে ঠিক চুলের গোড়ায় প্রায় দু'ইঞ্চির মত কেটে গিয়েছে। তাজা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে জামাকাপড়। তরুণীটি দৃঢ়ভঙ্গিতে দরজার বাজুতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তা'র শাড়ীর আঁচলেও জায়গায় জায়গায় ছিটেফোঁটা রক্তের দাগ।

বারান্দার পাশ দিয়ে যাবার সময় অন্য একজনের দৃশ্যটা নজরে পড়ল। যুবকটির গাল বেয়ে রক্তের ধারা ঝরে পড়ছে। কেমন একটা আতঙ্কে সে চিৎকার করে উঠতেই অন্য ঘরের বাসিন্দারা সেখানে এসে জড় হয়ে দাঁড়াল।

—কী ব্যাপার—

হাত দিয়ে ক্ষতস্থানটা চেপে ধরে যুবকই উত্তর দিল,

—সিঁড়ি দিয়ে নামতে হঠাৎ পড়ে গিয়েছি—

একজন বলল,—বিশ্বাস হয় না। কী হয়েছে সত্য ঘটনা বলুন!

তরুণীটি এতক্ষণে কথা বলল।—জেরা সওয়াল পরে করবেন। কাছে পিঠে কোথাও হাসপাতাল কিংবা ডাক্তারখানা থাকলে সেখানে ওকে নিয়ে চলুন।

তাই হ'ল। যুবকটিকে একটা সাইকেল রিক্‌শায় চাপিয়ে নিকটেরই এক ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হল। তরুণীটিও চাপল একই রিক্‌শায়—আহতের পাশেই।

ডাক্তার যখন সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে ব্যস্ত তখন একটু দূরে সরোবরের মত বড় একটা জলাশয় দেখতে পেলে তরুণী। বাঁধা ঘাট। মেয়ে পুরুষ উঠানামা করছে। ভাবল, ঐ টলটলে জলে হাতমুখ ধুয়ে নিলে মন্দ হয় না। কাপড়ের বিশ্রী দাগগুলোও ধুয়ে ফেলা যাবে।

পথে নেমে একটু আগিয়ে যেতেই বাধা পেল। বাধা দিল একজন অল্পবয়সী পুলিসের লোক। তার পিছনে একদল সশস্ত্র পুলিস। একটা পুলিস ভ্যান—ছুটো জীপ-গাড়ীও পথের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। একখানা জীপের উল্টোদিকে ফুটবোর্ডে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন কালোরঙের সাহেব।

—কোথায় যাবেন আপনি? জিজ্ঞাসা করল দারোগা।

—কোথায় আবার! ঐ পুকুরটায় হাতমুখ ধুতে।

—আপনার শাড়ীতে রক্তের দাগ কেন?

—ও এমনি! নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল তরুণী।

—এমনি! কী হয়েছে বলুন। আপনি কী কোন হাঙ্গামার মধ্যে পড়েছিলেন? মারপিট—

—না, সে সব কিছুই নয়।

—শুনুন, এখানে একটু সাবধানে থাকবেন। উদ্বাস্তু তিব্বতীদের সঙ্গে এখানকার একদল লোকের ক'দিন ধরে খুব ঝামেলা চলছে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় আজ এস.ডি.ও. সাহেব নিজেই এসেছেন এখানে।

—আমি তিব্বতী নই—বুঝতেই পারছেন। পথ ছাড়ুন—

—কে আপনি—কী হয়েছে ঠিকঠাক না বললে পথ ছাড়ব না। এই রামটহল—

—পথ ছাড়ুন বলছি! তীব্র কণ্ঠের ঝংকারে চমকে উঠল দারোগা।

চমকে উঠল জীপের অপর পার্শ্বের কালো সাহেবও। মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তরুণীর মুখোমুখি হতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দারোগাবাবু সসম্ভ্রমে স্যালুট করে একটু পিছিয়ে গেল।

একটা গল্পের পরে আর একটা গল্প জমে। নাটকের পরে আর একটা নাটকীয় ঘটনার সম্ভাবনাও থাকে।

কালো সাহেব তরুণীর মুখের দিকে মিনিটখানেক তাকিয়ে থাকল। তরুণীর দৃষ্টি ভূমির দিকে নিবদ্ধ। —এস, গাড়ীতে ওঠ। অতি মৃদুস্বরেই কথা তিনটি উচ্চারণ করল কালো সাহেব। মন্ত্রমুগ্ধার মত বিনা-বাক্যে বিনাদ্বিধায় গাড়ীতে উঠে বসল তরুণী। সাহেব নিজেই ড্রাইভ করে সেই মুহূর্তেই সেখান হতে চলে গেল।

এস-ডি ও সাহেবের বিরাট বাংলোর একটা কক্ষে মুক্তামালা দাঁড়িয়ে। সামনে গোপাল দাস। সেই কষ্টিপাথরের নাড়ুগোপাল।

—তুমি এখানে কেন মুক্তা? আর এমন অবস্থায় বা কেন?

সবই অকপটে বলল মুক্তামালা।—সুখময় বিয়ে করবে বলে নিয়ে এসেছে। এখন রাজী হচ্ছে না। বাবার ভয়ে, বিয়ে না করেও কিন্তু বিয়ে করা বউয়ের কাছের পুরো পাওনাটুকু সে আমার কাছে আদায় করতে চায়। দুদিন ধরে কেবলই জপাচ্ছিল আমাকে। কাল রাতে ভয়ানক জ্বালাতন করেছে। সকালেও তাই। স্থির থাকতে না পেরে চেয়ারের একটা ভাঙা পা দিয়ে ওর মাথায় বেশ একটা ঘা বসিয়ে দিয়েছি। ডাক্তারখানায় সে এখন কাটা কপাল সেলাই করাচ্ছে।

—কী করবে এখন? জিজ্ঞাসা করল গোপাল দাস।

—কী আর করব! এখানেই থাকব।

—এখানে! বিস্মিত হল গোপাল দাস। মুক্তামালা বেশ একটু গম্ভীরভাবেই বলল—ভয় পাচ্ছ—না সন্দেহ হচ্ছে? ভয়ের কিছুই নাই—তুমি তো হাকিম। সন্দেহের কিছু থাকলে সুখময়ের মাথা কাটাতাম না।

—কিন্তু—

গোপাল দাসের এই কিন্তু কিন্তু ভাব দেখে মুক্তামালার নাকের পাতাদুটো ঘন ঘন কাঁপতে লাগল। একটু দৃঢ়স্বরেই বলল, কিন্তুই যদি কিছু থাকে তাতে ক্ষতি কী? তোমাদের সমাজে কী আসে যায় তাতে? তোমরা তো সমাজ ছাড়া, আমিও এখন তাই।

আর একটিও কথা না বলে ঘর হতে বেরিয়ে গেল গোপাল দাস।

দশদিনেরও বেশী হল, মুক্তামালা ঘরে ফিরল না। দিনচার হল সুখময় ফিরেছে। কপালের উপরে চওড়া একটা পটি আঁটা। মেয়েটার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করবার উপায় নাই বিনোদবিহারীর। ভুবনেশ্বরী তাহলে দুচোখের আগুন ছড়িয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ ঝলসে দেবে।

সংসারের অভাব-অনটনের অবস্থাও চরমে উঠেছে। চাল ডাল তেল সবই বাড়ন্ত। নগদ একটা টাকাও নাই হাতে।

দশদিন পরে বিনোদবিহারীর কাছে দাঁড়িয়ে ভুবনেশ্বরী আজ একটু কথা বলল। মুক্তামালার ছেলেবেলার একজোড়া দুল বিনোদবিহারীর হাতে দিয়ে বলল,—ঘরে রেখে দরকার নাই। আনা চার হবে। সোনার দর এখন বেড়েছে। মতি স্যাকরার কাছে যাও, সেই গড়েছে। বেচে দিলে যা পাওয়া যাবে, দিন দশ বেশ চলবে।

হাত পেতে দুল দুটো নিল বিনোদবিহারী। ভাঁড়ারঘরের কোন হতে থলে দুটো কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে সদরদরজাটা খুলতেই হঠাৎ ভুত দেখে যেন চমকে উঠল।

সামনেই দাঁড়িয়ে মুক্তামালা। আর তার পিছনে নিতাইদাসের ছেলে নাড়ুগোপাল। মুক্তার সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন জলজল করছে। দুজনেই হেঁট হয়ে প্রণাম করল বিনোদবিহারীকে।

—তোমার জামাই—আমাদের আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

দমকা হাওয়ায় বেতসপাতার মত বিনোদবিহারীর সমস্ত শরীরটা একবার কেঁপে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে মুক্তোর মুঠির মধ্যে সেই দুলদুটো গুঁজে দিয়ে দুজনের মাথায় হাতদুটো রাখল। ঠোঁট দুটিও নড়ল একবার। দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এসে মুখের বলিরেখার মধ্যে আটকে গেল।

সহসা সাপের শিসের মত একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজে পিছন ফিরে তাকিয়েই দেখল, ভুবনেশ্বরী দাঁড়িয়ে আছে। একটা সদ্যনিক্ষিপ্ত অগ্নিবাণ যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে জলন্ত আভায় জলছে।

—ওদের তুমি আশীর্ব্বাদ করলে?

বাণের আগুন এবার তুবড়ির মত ফেটে চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

অন্যদিনের মত আজ কিন্তু সেই আগুনের উত্তাপকে ভয় করল না বিনোদবিহারী। বেশ শান্ত কণ্ঠেই বলল,—তুমিও কর মুক্তোর মা।

—কী! গর্জ্জে উঠল ভুবনেশ্বরী।

—এই অসামাজিক মর্য্যাদাহীন সম্পর্ককে স্বীকার করে ওদের ঘরে নেব আমি?

—কেন নেবে না? সমাজের যে নিয়মকে একদিন মানুষ ফুলের মালার মত স্বেচ্ছায় গলায় নিয়েছিল, তাই যদি আজ তাদের চলার পথে পায়ের বাঁধন হয়ে বাধা দেয়, তবে তারা তাকে ছিঁড়ে ফেলবেই। বর্ত্তমানকে অস্বীকার করা চলে না মুক্তোর মা। শাঁখ বাজিয়ে ওদের ঘরে নাও।

—না, দূর হয়ে যাক ওরা! ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেল সুন্দর মুখখানা।

—তাই চললাম মা! সজল কণ্ঠে যেন স্বগত উক্তি করল মুক্তামালা। দু'জনেই পিছু ফিরল।

পলকের ব্যবধানে ঝড়ের বেগে সহসা মুক্তামালার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভুবনেশ্বরী। তারপরে দু'জোড়া লবণ হ্রদের জলে দু'জনেরই বুকের বসন ভেসে গেল।

উপন্যাস

মূলে ভুল

পুষ্প দেবী

এদিকে বিলেত থেকে খবর এলো গদাই আবার ফেল করেছে। প্রভা তো আরো ভেঙে পড়লো। কিন্তু তারই সঙ্গে একটা অদ্ভুত চিঠিও পেলেন সদাশিববাবু। গদাই লিখেছে, মাষ্টারটা ভারি পাজি। এই নতুন যে ব্যাটাকে রেখেছি, বড্ড ক্যাটকেঁটে কথা তার। আমার সেদিন পাগলা গারদ দেখাতে নিয়ে গিয়ে বলে কিনা, তুমি এখানে ভর্ত্তি হও। আমি তোমার চিকিচ্ছে করি। ব্যাটা ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি। এই মাষ্টারটাই ব্যাদড়া, তবু এই বেটাকে না রাখলে পাশ হওয়ার আশা দুরাশা তাই রাখতেই হল। আমার মনটন ভাল নেই, একটু ইদিক সেদিক বেড়াবার ইচ্ছে আছে। অমুর নাকি আপনাদের বাড়ী আসা বারণ হয়েছে। জানেনই ত পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট, বাপের বাড়ী ঝি নষ্ট। ও নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না।

'অমুর বিষয় আপনারা মাথা গলাতে যাবেন না, ওতে প্রকৃতপক্ষে অমুর ক্ষতিই হবে। যাকে সমর্পণ করে বিদেয় করেছেন তার কথা ভেবে আবার মাথা ঘামান কেন? আমাদের বাড়ীর কেত্তাই আলাদা। শুনছি নাকি খোকন খুকীর সব হুপিং কাফ হয়েছে—ওর চিকিচ্ছে নেই। নাইতে খেতে সেরে যাবে। শাশুড়ী ঠাকরুণ যেন এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে না যান। তাই সাবধান করে দিচ্ছি।'

সারগর্ভ ভাষণ—কিন্তু মায়ের মন বোঝে কই, অথচ নিজে বিছানায় শুয়ে। অমুর কথা যত ভাবেন তত মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। স্বামী নেই, শ্বশুরবাড়ী তো কয়েদখানা। তার উপর ঐরকম শ্বশুরবাড়ী। বাপ গেলে তাঁরা রাগ কর্বেন। বাপ কর্বেন চিঠি দিলে। রাগ কর্বেন ফোন করলে। আবার করুণ সুরে অমুর চিঠি আসে, 'জানো মা আগে এঁরা বলেছিলেন তোমার বাপের বাড়ীর লোক যদি গাড়ী নিয়ে এসে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয় গাড়ী করে, আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু সে যাওয়া বন্ধ হল। বললেন, ফোন করে খবর নিতে পারেন না? এখন বলছেন, সদরে ফোন, ওখানে বাড়ীর বৌয়েরা যেতে পারে না। সবেতেই আপত্তি এঁদের। এঁদের কোন কথার দাম নেই মা। আর আমার মত চুনোপুঁটির সাধ্যি নেই যে এঁদের কথার ওপর কাজ করি, কাজেই ফোন আর তোমরা কোর না মা। করলে এঁরা আমারই শ্রাদ্ধ করে ছাড়বেন।'

প্রভা তো হতবাক্। জানেন না আরো কত শাস্তি বাকী আছে। যা করেন তাতেই দোষ। বাড়ীতে রঘুনাথ বলে একটি ছেলে থাকতো। তার হাত দিয়ে মেলার খেলনা পাঠিয়েছিলেন প্রভা। কিন্তু প্রসন্নবাবু মাটির খেলনা দেখে চটেই অস্থির। বিপদবালা বললো, ঐত দিদিমার আদরের ছিরি। একবস্তা মাটির পুতুল এলো। সন্দেশ না, রসগোল্লা না, মাটির পুতুল, লজ্জাও করে না কুটুমবাড়ীতে পাঠাতে। প্রসন্নবাবু দাঁতে চিবিয়ে চিবিয়ে বল্লেন, না না, ওকথা নয়। সব মাটির খেলনা ত নয় ঠাকুরের মূর্ত্তি। কখন কী থেকে যে কী অলক্ষণ হয় বলা যায় নাত? বাড়ীসুদ্ধ সবাই হাঁ হাঁ করে উঠলো। সত্যি, ত, যদি অলক্ষণ হয়? ওরা না হয় বালিগঞ্জের সায়েব, আমাদের ত গেরস্থর ঘর? প্রভা তো সব শুনে অবাক্। বাপরে বাপ,—এদের যে সবেতেই দোষ। দুটো মেলার পুতুলও পাঠানোর উপায় নেই। আবার গদায়ের চিঠি আসে, এবার নতুন সুর। গদাই লিখেছে,

আমার বন্ধুরা যারা এসেছে সবাই গাদা গাদা সুপারিশের চিঠি নিয়ে এসেছে। শুধু আমি ব্যাটাই খালি হাতে এসেছি। আমি বাবা মরদের বাচ্চা!—যা করবো নিজের হিম্মৎএ কর্ব্ব, কারুর ধার ধারি না। নানা আস্ফালনে ভরা চিঠি—প্রভা চিঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। ভাবেন জানি না কবে ফিরবে গদাই। মরার আগে একবার দেখতে পাবো ত? বাবা ত চলেই গেলেন চিরদিনের মত। জানিনা আমার অদৃষ্টেও দেখা আছে কিনা? মনে নানা আশঙ্কার ঝড় বইতে থাকে। আবার ভাবেন উঃ! মনে এত দুর্ব্বলতাও ছিল। আগে যদি জানতুম গদাই বিলেত যাবে, বিয়ে দিতুম না কক্ষনো। এ কি সেধে শাস্তি! চোখের সামনে অনুর ম্লান নতমুখখানি ভাসে। তারই পাশে বুক আলো করা দুটি অবোধ শিশুর মুখ—ভগবান্‌কে স্মরণ করেন প্রভা, ভাবেন, ভালোয় ভালোয় মার ছেলে মার কোলে ফিরিয়ে দাও ঠাকুর!

এধারে পিতৃবিয়োগ, এধারে গদায়ের বিলেত যাওয়া ওধারে অনুর জন্য নানান-খানা ভাবনা প্রভাকে যেন পাগল করে দেয়। তার ওপর সদাশিববাবুর শরীর যেন দিনে দিনে ভেঙ্গে পড়ছে। চাপা মানুষ তো? দিনরাত কী যে ভাবেন! প্রভা বোঝে, তাঁর ভাবনার খাতও অনুকে ঘিরেই।

সাধারণ কাজ অসাধারণ হয়ে ওঠে গাঙ্গুলি-বাড়ীর মহিমায়। হয়ত দেশ জুড়ে বসন্ত হচ্ছে, বাচ্চাদুটোকে টিকে দেোয়াতে হবে সে এক মহামারী ব্যাপার। তাদের কোন ছুতোয় এবাড়ী নিয়ে আসতে হবে তারপর ডাঃ মল্লিককে এনে টিকে দিইয়ে পাঠাতে হবে। তবু অনুর টিকে দেওয়ান হয় না। তার পিত্রালয়ে আসা নিষেধ। তাতেও শান্তি নেই। বিপদবালা বললো, ঈশ, এ কী কাণ্ড তোদের টিকে দিলে কে? এখন সাতদিন মাছের হেঁশেলে খাওয়া বন্ধ। কী ঝঞ্ঝাট বল দেখি? অনু অপরাধী হয়ে মাটির দিকে চেয়ে থাকে। বাড়ীতে কথার ঝড় বয়ে যায়। কবে কে টিকে দিয়ে মাছ খেয়ে বলা নেই কওয়া নেই পড়লো আর মরলো। কবে কার বাড়ীতে মা শেতলা কিভাবে স্বপ্নে এসে শাসিয়ে গেছলেন। কবে কোন্ সায়েব নিজে গিয়ে শেতলা তলায় পুজো দিয়ে এসেছে। বিস্ময়কর রোমহর্ষক কাহিনী যত। অনুর বলার সাহস হয় না সে বাড়ীতে নিরিমিষ হেঁশেল তো পিসীমা মাসীমা বিপদতারিণীর জন্য রয়েইছে, না হয় সেখানেই বাচ্ছা দুটোর দুমুঠো ভাত হবে। কিন্তু সব কাজই বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। সেই আতপচালের ভাত সহ্য হয় না তাদের, পেটের গোল আরম্ভ হয়—এযেন সুখে থাকতে ভূতে পাওয়া—আবার অন্য ভাইবোনদেব মাছ খেতে দেখে অনুর শিশু মেয়ে কিছুতেই নিরিমিষ ভাত খাবে না। অনু কাঁদ কাঁদ হয়ে মাকে চিঠি লেখে, 'এবাড়ীতে যখন আমায় দিয়েছ মা, এদের নিয়ম মতই আমায় চলতে দিও মা। তুমি যত প্রাণপণেই লড়তে চেষ্টা করো মা, আমার অদৃষ্টে যা আছে তা হবেই। আমায় বাঁচাতে তুমি পার্ব্বে না। অনর্থক শুধু খানিকটা হয়রানি।, তবুও একটা কথা আছে না যে স্বভাব যায় না মলে আর ইল্লত যায় না ধুলে। তাই প্রভার সেই ভালো করার সর্ব্বনেশে চেষ্টা অনবরতই অনুকে বিব্রত করে। হয়ত কখন কখন রক্ষাও করে, তবু মা ও মেয়ে দুজনেই কষ্ট পায়। মার অন্তর মেয়ের অজানা নয়। প্রভা অনুর সব কষ্টের জন্য নিজেকে দায়ী মনে করে দিবারাত্রি কী যে কষ্ট পায় তা একমাত্র অন্তর্য্যামী নারায়ণই জানেন। এদিকে গাঙ্গুলিবাড়ীতে হৈ হৈ কাণ্ড—কর্ত্তা গিন্নি কাশীবাস কর্ব্বেন। কর্ত্তার নাকি প্রেশার বেড়েছে, ব্যবসা থেকে অবসর নেওয়া প্রয়োজন।

বুদ্ধিমতী ভবতারিণীর পরামর্শ মত সব ভার মন্তপ বড় ছেলেকে দিয়ে কর্ত্তা গিন্নি কাশী রওনা হন। অনুর অবস্থা আরো অসহায় হয়ে পড়ে—। যখন দুঃখ আসে তখন দুঃখের আর অন্ত থাকে না, আবার ঠিক সময় মত গদায়ের তৃতীয় বার ফেলের খবর আসে—এর সঙ্গের চিঠিখানি গদায়ের আরো চমকপ্রদ! ঐ সময় প্রভার মামাতো ভাইও বিলেতে ছিল ইনজিনিয়ারিং পড়তে।

তার কথা উল্লেখ করে গদাই লিখেছে, 'এখানে এসে হিঁদুয়ানি রাখা শক্ত। তবু ব্রজ মামাব রোজ গীতা পাঠ করা চাই—খুব চাপা আর কষ্টসহিষ্ণু মানুষ, এখানের কোন দুঃখ কষ্ট আপনাদের জানতে দেন না, বলেন, অকারণ কষ্ট দিয়ে লাভ কি তাদের। কিছু করার যেখানে উপায় নেই, শুধু কষ্ট পাওয়া। আমি বাবা ওসব পারি না। আমি এখানে না খেতে পেয়ে মর্ব্ব আর তারা ভাববে বিলেতে ফুর্ত্তি মারছে ওসবের মধ্যে আমি নেই।' কে যে কত ফুর্ত্তিতে আছে ভেবে ম্লান হাসি ফোটে প্রভার মুখে। কেবলই ভাবেন, আর কেন, এবারও যদি গদাই ফিরে আসে! নাইবা পাশ করলো, ঘরে তো মোটা ভাত কাপড়ের অভাব নেই? কিন্তু গদাই অচল অটল,—পাশ না করে সে ফিরবে না। প্রভার মনে পড়ে সতীর কথা,—সতীর বর কিশারী পাশ করতে চার বছর কাটিয়েছিল। প্রভার ছোট ননদ মালা তখন আশুতোষ কলেজে পড়তো। মাতৃহীনা মালা প্রভার বুকের হার ছিল। মায়ের মমতাতেই তাকে মানুষ করেছিল প্রভা। প্রভার ভীষণ ঝোঁক ছিল বাগানের কিন্তু কলকাতার সহরে মাটি কোথায়? ছাদের টবেই প্রভা সে সাধ মেটাতো। প্রভার অভিধানে কোন জিনিষ না হবার উপায় নেই। চায়ের পাতা, মাছের আঁশ, খোল পচান নানা সারের সংমিশ্রণে তার ছাদের বাগান সত্যিই অনন্ত হয়ে উঠেছিল। মালা একদিন প্রভাকে বললো জানো বৌদি আমাদের কলেজের সামনে মস্ত পার্ক তো? ঐ পার্কের মালিরা বলে আসুন না দিদিমণি কত ভালো ভালো গাছের চারা আছে আপনাকে সস্তায় দোব। যাব বৌদি? প্রভা বলে, না কোথাও যাবেনা দরকার নেই আমার গাছে। বৌদির কথা মালার কাছে বেদবাক্য, কাজেই আর যাবার কথা ওঠে না। কিছুদিন বাদে মালা এসে বলে, জানো বৌদি কী কাণ্ড? —ভাগ্যে তুমি আমায় পার্কে যেতে বারণ করেছিলে, ঐ পার্কে যে অত কাণ্ড হয় তাকি জানি? আমাদের সেই বন্ধু প্রীতি না? সে আমার সঙ্গে কতদিন এখানে এসেছে। কি ব্রিলিয়াণ্ট মেয়ে। তাকে না আর একটা মেয়ে জয়শ্রী কোন এক বড়লোকের ধাপ্পায় পড়ে তার ছেলের সঙ্গে ঐ পার্কে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। ওর তো বিয়ের ঠিক হয়েছিল সেই শিবশঙ্কর মিত্তিরের ছেলের সঙ্গে। এখন ও ঝোঁক ধরেছে এই ছেলেটাকেই বিয়ে কর্ব্বে। অথচ ঐ ছেলেটা ম্যাট্রিক পাশও নয়। আর শিবশঙ্করের ছেলে শুধু ঈশান স্কলারই নয় ওঁর একমাত্র মৃত ভায়ের বন্ধু। তাকে নিজের ছেলের মত ভালোবাসেন প্রীতির মা। ছেলেটিও প্রীতির মাকে নিজের মা বলে জানে। প্রভা কথার মাঝে বলে, এ ঘটনা প্রীতির মা জানেন? মালা বলে, তা জানি না। প্রভা বলে, তোমরা কজন বন্ধু মিলে ওর মার কাছে গিয়ে তাঁকে সব জানাও। মালা প্রীতির বাড়ী থেকে ফিরে বলে, জানো বৌদি প্রীতির মা যেন কি এক ধরণের? বলেন, তাই ক্লাব থেকে ফিরে আমি প্রীতিকে দেখতে পাই না। আমার আবার কী যে নেশা সিনেমার। অথচ ওর পরীক্ষা, তাছাড়া বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অতবড় মেয়ে নিয়ে সিনেমা যাওয়াও সম্ভব নয়। অবিশ্যি একা ওকে থাকতে হয় না। মানুষ করা আয়া তো আছে? আয়া আমায় বলছিল অবিশ্যি প্রীতির বাবা বাড়ী থাকে না, ওর মন মর্জি ঠিক নেই তবে ঘটনাটা যে এতদূর গড়িয়েছে তা জানতুম না। তাই আজকাল অসীম আর আসে না। কথাটা বলে প্রভার পায়ের ধুলো নেয় মালা। বলে আমি ভাবতুম বৌদির সব বাড়াবাড়ি। সর্ব্বদা যেন আমায় আগলে আছে। এখন বুঝছি তুমি আমার জন্যে যা কর্লে মাও বুঝি পারত না। এব পরে একদিন প্রীতি আসে সঙ্গে এক বুড়োকে নিয়ে। হাতে ছাপানো চিঠি। বলে বৌদি, জানেন? আমি অসীমবাবুকে বিয়ে কর্ব্বনা শুনে অবধি মালা আমার সঙ্গে কথা কয় না আমার অতনুকে পছন্দ। অতনুর সঙ্গেই আমার বিয়ের ঠিক হয়েছে। আমি নেমন্তন্ন করতে এসেছি। আপনি বলুন বৌদি মালা যেন যায়। একটু চুপ করে থেকে প্রভা বলে যাবে, তবে ওর দাদাকেও বলে যাও একা অত রাত্তে তো খেতে যেতে পার্ব্বে না? প্রীতির বিয়ের রাত্তে নেমন্তন্ন খেয়ে যখন ফিরে এলো মালা তখন মালা

আর মালার দাদা দুজনের চোখই অশ্রুসিক্ত। মালা বল্লে, উঃ, কি বিয়েরে বাবা, মনে হয় যেন মৃত্যুবাড়ী। মা ঠাকুর ঘরে দরজা বন্ধ করে কাঁদছে। দরজায় বসে অসীম সমানে ডাকছে ওমা, দরজা খোল। সে যা সুর বৌদি, সে কাঁদার চেয়ে বেশী। প্রীতির বাবা চুপ করে বসে আছেন শোবার ঘরে। মুখে সর্বহারার চিহ্ন যেন আঁকা। সদাশিববাবু বলেন, বরযাত্রিরা এতো মদ খেয়ে এসেছে না টলছে সব দাঁড়াতে পাচ্ছে না তারা। মনে হল পাত্রও মদ খেয়ে এসেছে চোখ টকটকে লাল। অত বুদ্ধিমতী মেয়ে কী দেখে যে এমন ভুল করলো! মালা বলে ওর মা যে অমনি। অতবড় মেয়ে ফেলে সিনেমা ক্লাব করে করে বেড়াচ্ছে। আগে আমি কত দিন রাগ করেছি বৌদির ওপর। নিজেও কোথাও যাবে না, আমাদেরও যেতে দেবে না। সব বাড়াবাড়ি বৌদির বলেছি। আজ বুঝি কি ভাবে বৌদি আমাদের রক্ষে করে গেছে। বলেছি আমার কি তোমার বেনুর মত ছোট, যে নিজেদের ভালোমন্দ বুঝি না? বৌদি বলেছে আমার কাছে তোমরা চিরদিনই ছোট। আমার চেয়ে তোমাদের ভালোমন্দ তোমরা কক্ষনো বোঝ না। দেখনা অনু নিরুকে আমি আমার সঙ্গে ছাড়া কোথাও যেতে দিই না। এ নিয়ে এখানে থাকতে ব্রজ কতো রাগ করেছে। আমি বলি দেখ তোর সঙ্গে যেতে দিলে ওদের কাকার সঙ্গেও যেতে দিতে হবে। তোরা না হয় ভালো কিন্তু তোদের বন্ধুবান্ধবরা? সকলকে তো সবাই চেনে না? তার চেয়ে আমার সঙ্গে যাবে না এই ই সবচেয়ে ভালো। এর পরে শোনা গেল প্রীতির স্বামীর দুশ্চরিত্র-তার মাশুল দিচ্ছে প্রীতি। বারে বারে মৃত অন্ধ সন্তান প্রসব করে। বাপ ডাক্তার, শেষের গলিত-দেহ মৃত শিশু তিনি খণ্ডখণ্ড করে বের করেছেন। তারপর নিরুপায় হয়ে ঐ পারিপার্শ্বিক থেকে জামাইকে বাঁচানোর জন্য জামাইকে কিশারী শেখাতে জাপানে পঠিয়েছেন। যাইহোক শেষ রক্ষা হল জামাই ফিরে এসে আজ সুখে শান্তিতে প্রীতিকে নিয়ে ঘর করছে। শোনা যায় প্রীতির বাপের টাকায় প্রলুব্ধ হয়ে প্রীতির শ্বশুর জয়শ্রীকে সোনার হার কবলিয়ে এই মেশামেশি করিয়েছিলেন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রভা ভাবেন, গদাই নেশাও করে না সচ্চরিত্রও বটে, শুধু কমপ্লেক্স এ ভরপুর তার মাথা। এই বৃথা অহঙ্কার আর ভুলবোঝা এথেকে কি কোনদিন মুক্তি পাবে না গদাই?—এ কী অভিশাপভরা জীবন হল অনুর। এ যে জীবন্মৃত্যুর অধিক হল তার অবস্থা।

কত রকম মানুষই যে জীবনে দেখলো প্রভা। মনে মনে ভাবে তার আদর্শমূলক জীবনযাত্রার যে গড়ন সে গড়ে দিয়েছে সন্তানদের মনে, তারই জন্যে যেন অনু নত মুখে এই অসহ জীবন সয়ে যাচ্ছে। সবেতেই নিজেকে বড় বেশী দায়ী মনে হয়। মনে পড়ে জ্যাঠামশায়ের কথা তিনি বলেছিলেন দেখ প্রভা তোর মেয়েরা তো রিটার্ণ টিকিট কাটা মেয়ে নয়? সহ্য করতে পাচ্ছি না তাই চলে এলুম, বলতে ওরা শেখেনি। কাজেই যখন যেখানে গরুকে বাঁধবে, দেখবে খুঁটিটি কেমন। সেখানে যথেষ্ট আলো বাতাস তার আহার্য্য পানীয় আছে কি না। প্রভার মনে হয়, সেখানে প্রভার ত্রুটি হয়েছে। নিজেকে অপরাধী ভেবে হাঁপিয়ে ওঠে প্রভা। কখনো করজোড়ে ঠাকুরকে ডাকে, বলে, ঠাকুর, সাধারণ দৃষ্টি দাও গদায়ের চোখে! কখনো, বলে ঠাকুর, আমি একী করলুম? মনে পড়ে, বরকনে যখন জোড়ে যায় তখন প্রভা বলেছিল বহু কষ্টে এই ঘরে তোমায় দিলুম, মনে রেখো সবাই তোমার মত হবে না। তোমায় তাদের মত হতে হবে। পার্ব্ব না যেন কখনো না শুনি। অনু হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মাকে বলেছিল তুমি আশীর্ব্বাদ করো মা নিশ্চয় পারবো। প্রতিটি কথা বিদ্রূপ হয়ে মনের মধ্যে ফিরে আসে। কত কথা না মনে পড়ে!

একবার সদাশিববাবুর অসুখে প্রভা ডাঃ মল্লিককে কল দিয়েছে, এধারে ছেলে হিসেবে ডেকেছে গদাইকে। দুজনেই সন্ধ্যেবেলা এলো। ডাঃ মল্লিক যাবার সময় ডাকলেন গদাইকে, যাবে নাকি গদাই? চল, তোমায় নামিয়ে দিয়ে আসি। গদাই বললো, না, আমি পরে যাবো। মল্লিক ডাক্তার চলে গেলেন। তার পরমুহূর্তে গদাই বললো আমি যাচ্ছি। প্রভা বললেন সে কী ভবে মল্লিকের সঙ্গে গেলেনা কেন? গদাই মুখ বেঁকিয়ে

বললো, আমায় গাড়ী দেখাতে ঐ কথা বললো। আমি চড়বো ওঁর গাড়ীতে? বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যায় প্রভা। এই মল্লিক আজ ফী নেয় সত্যি কিন্তু সে একান্তই প্রভার জেদে। নিজের সহোদর ভায়ের সঙ্গে বিন্দুমাত্র তফাৎ নেই মল্লিকের। প্রভার বাবার বন্ধুর ছেলে এই মল্লিক। সে আজ অনেক দিনের কথা। হঠাৎ একটি ছেলে প্রভার বাবার কাছে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে বলে, তার দাদা মারা গেছেন তারই মেয়ের স্বামীর চাকরির জন্য সে এসেছে পিতৃবন্ধুর দাবী নিয়ে। রামবাবু ছেলেটির অন্তরের পরিচয় পেয়ে প্রীত হন। শোনেন, এম বি পাশ করে শুধু নিজের ভরসায় সে শুধু নিজের সংসারই নয়, বিধবা মা বিধবা বৌদি তাঁর তিনটি মেয়ে, পাকিস্থানের জমিদারি হারা বোন ভগ্নিপতি ভাগ্নে সকলের দায়িত্ব ঘাড়ে তুলে নিয়ে চলেছে। বহনের ক্লান্তি তার সহনের শক্তিকে ম্লান করতে পারেনি। ভারি ভালো লাগলো রামবাবুর। তখুনি অসুস্থ জামায়ের জন্য মাস মাইনে করে নিযুক্ত করলেন তাকে। নিজের অসুখ হলে গাড়ী করে গিয়ে তাকে দেখিয়ে পুরো ফী দিয়ে আসতেন। চিকিৎসার গুণের সঙ্গে অপূর্ব্ব মমতাভরা হৃদয়ের পরিচয়ে দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করলো ডাঃ মল্লিক রুগীসমাজে। কিন্তু প্রভার কাছে তার আচরণ শিশুর মত। নিজের দিদি বললে মিথ্যা হয়। মায় মত সম্মান সে পেয়ে এসেছে ডাঃ মল্লিকের কাছ থেকে। যখন তার ফী চার টাকা থেকে আট টাকায় উঠলো, তখনো সেই মাসিক পঞ্চাশ টাকায় প্রভার বাড়ীর সব চিকিৎসায় তিনি আসতেন। শুধু আসতেন বললে অন্যায় হবে, সর্ব্বাগ্রে আসতেন। প্রভা লজ্জিত হয়ে এটা ওটা পাঠাতো। নিজের নাতির সঙ্গে ডাঃ মল্লিকের ছেলের একরকম পোশাক হত। নাতির জন্যে ট্রাইসাইকেল কিনতে গেলে মল্লিকের ছেলের কথা ভুলতে পারতেন না প্রভা। সেই রঘুনাথ আবার সেগুলো বয়ে দিয়ে আসতো। শেষে মল্লিকই একদিন হেসে বললো, দিদি ঠিক যতবার আসি ততবারকার ফী ই ত আপনি হিসেব করে পাঠান। মনে হয় বেশীই দেন। তবে কাজ কি রঘুনাথকে অত কষ্ট দিয়ে? আমার ফী ই দেবেন আপনি। প্রভা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু মনে মনে বললো, যত টাকাই দিই তোমায় ভাই, যা আজীবন করলে আমার জন্যে সে ঋণ শোধ হবার নয়। যখন সদাশিববাবুর অসুখে ডাঃ রায়কে আনে মল্লিক, প্রভা তার হাতে চৌষট্টি টাকা গুণে দেয়। বত্রিশ টাকা ফিরিয়ে আনে মল্লিক। প্রভাকে বলে, দিলুম বলে স্যার প্রফেসার মানুষ পুরো ফী আপনি নেবেন কি করে? আমরাই বলে ছাপোষা মানুষ হয়ে ফী নিতে পারি না অর্দ্ধেকই নিন স্যার। এমনি সম্পর্ক মল্লিকের সঙ্গে।

আজ মল্লিকের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। মাষ্টার বুইক গাড়ী হয়েছে। কিন্তু ব্যবহার বদলায়নি। রিক্শা করে হয়ত কোথাও যাচ্ছে প্রভা, মাঝ রাস্তায় গাড়ীর সামনে হয়ত কার গাড়ী থামলো—হাসতে হাসতে মল্লিক নেমে বলতো, চলুন দিদি, কোথায় যাবেন পৌঁছে দিয়ে যাই। রিক্শাওলাকে একট আধুলি ছুঁড়ে দিয়ে প্রভাকে গাড়ীতে তুলে নিত মল্লিক। নিজের ভায়ের দাবীতে। সেই মল্লিককে দেখতে পারে না গদাই। কি করে এসব কথা বোঝান যাবে তাকে? তার ধারণা এত দৃঢ় এত বদ্ধমূল যে তাকে নড়ানো অসম্ভব। মল্লিকের পিতৃহারা ভাইঝিরা মল্লিকের প্রাণের অধিক ছিল। মামণি মাটুকু আর মাগো এই তিনটি নামে তাদের ডাকতো মল্লিক। তার অন্তরের এই সম্পদে প্রভার অন্তর সে জয় করেছিল। সহোদর ভায়ের চেয়ে ডাঃ মল্লিক তার কাছে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। প্রভার এই স্নেহটাই গদাই সহ্য করতে পারতো না—তার মনে হত সবই বালিগঞ্জের সায়েবীপনা। প্রতি পদে অপরাধী হত প্রভা।

ঠিক এমনি ঘটনা ঘটতো মহারাজ এলে। যাঁর দর্শনের জন্য লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, প্রভার সৌভাগ্য ক্রমে তিনি আসতেন প্রভা অসুস্থ হলে। প্রভার এই একটা অপূর্ব সৌভাগ্য ছিল। অজস্রধারে গুণী জ্ঞানী মনীষিদের স্নেহ সে পেয়েছে। প্রভা বুঝতো এটা

তার গুণে নয়। তার পিতৃপুণ্যে সে এ সৌভাগ্যের অধিকারিণী। কিন্তু শিউরে উঠতো গদাই। বাড়ীতে মহারাজ এলে খিড়কি দরজা দিয়ে পালাতো। সে বলতো ঐ রে, চেলাচামুণ্ডা নিয়ে আসছে রে! আসতেন বড় বড় মনীষিরা, কেউবা রামবাবুর বন্ধু, কেউবা সদাশিব-বাবুর বাবার বন্ধু। তারপর প্রভার মমতা সম্ভ্রম ভরা ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে আসাটা হয়ত একটু বেশীই হত। গদাই এসব ভালোবাসতো না। বলতো, বাবা, এসব নাম করা লোকের ভিড় আমার ভালো লাগে না। বড্ড যেন পোশাকী সব। আসলে প্রভার মনে হত, গদায়ের অহঙ্কার ভরা মন অন্যের বড় হওয়া সইতে পারেনি। নিজের সন্তানের মধ্যে অন্তর দারিদ্র্য প্রভাকে পীড়িত করতো।

এরপর অনেক কায়দা করে গদাইকে ফিরিয়ে আনলো ওর ভায়েরা। মায়ের অসুখের মিথ্যা খবর দিয়ে গদাইকে আনার অপ্রীতিকর অধ্যায়টা ভাইরাই করে প্রভাকে মুক্তি দিলো তারা, কিন্তু গদাই ফিরলো একান্ত অসন্তুষ্টি নিয়ে। তার মনের বিরক্তি ছড়িয়ে পড়লো সব কথায় সব কাজে। ঐ সময় সদাশিববাবুর এক বন্ধু দার্জিলিংএ কুচবেহারের রাজার বাড়ীটা লিজ নিয়েছিলেন। সে কী বাড়ী! সাড়া বাড়ী ভেলভেটের গালচেয় মোড়া। কি সব ফার্ণিচার? কী সুন্দর শুধু কাঁচে ঘেরা বারন্দা। বহুদিন ধরে তিনি সদাশিববাবুকে সাধাসাধি কর্চ্ছিলেন একবার যাবার জন্য। দীর্ঘকাল গদাই অনুর ছাড়াছাড়ি ছিল। তাই প্রভা এবার নিজে উদ্যোগী হয়ে ওদের নিয়ে দার্জিলিং গেলেন। ও হরি! সারা দুপুর গদাই চেঁচামেচি করে। মূলকথা হচ্ছে, একে তাকে মাঝ পথে বিলেত থেকে ফিরিয়ে এনে তার আখের নষ্ট করা হয়েছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, এখন কোথায় সে প্রাকটিস গুছিয়ে নেবে, না তাকে কাব্যি করার জন্যে দার্জিলিংএ এনে বন্দী করা হল। যে ক'টা দিন রইল দার্জিলিং-এ বাক্যবাণে জর্জরিত করলো অনুকে। প্রভার এত অর্থব্যয়, এত আয়োজন সব পণ্ড করে হঠাৎ একদিন গদাই অনুকে নিয়ে ফিরে এলো কলকাতায়। ফিরে অনু চিঠি লিখলো, রাস্তায় কী যে বিপদ মা! সারা রাস্তা গাড়ীর ছাদ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়েছে। তার ওপর গাড়ীতে আলো গেলো নিভে দুটো ছেলে মেয়ে কেঁদে সারা। আর দুটো দিন যদি থাকত গদাই রিজার্ভ পাওয়া যেত কিন্তু গদায়ের স্বভাবে নেই নিজের ছাড়া কারুর কথা ভাবা। কাজেই প্রভার অত কষ্টের দার্জিলিং যাওয়ার সব আনন্দকে ধরাশায়ী করে কলকাতায় চলে যাওয়ায় মনপ্রধান প্রভার পক্ষে সে বাড়ী নিরানন্দময় হয়ে উঠলো। সে চলে এলো কলকাতায় ফিরে। সদাশিববাবুর দার্জিলিং যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটল। প্রভার মনে একটা কথা অনবরতই খোঁচা দেয় কি কারণে সে গদায়ের বিষ নজরে পড়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে অনু আর নিরুপমা দুজনের শ্বশুরবাড়ীই ভিন্ন প্রকৃতির বাড়ী। একজনরা জমিদার একজনরা ব্যবসাদার। কিন্তু জামাই দুজনেই শিক্ষিত। প্রভার যে সাজগোজ গদায়ের পক্ষে অসহ্য তা কিন্তু বড় জামাই অতুলের চোখে কোনদিন ঠেকেনি। একদিনের কথা মনে পড়ে প্রভার তখন নিরুপমার সবে বিয়ে হয়েছে। নিরুপমা শ্বশুরবাড়ী জামাই আসার সম্ভাবনা নেই জেনে দুপুর বেলা প্রভা একটা বাতিল রঙীন কাপড় পরে খাটে বার্ণিশ করছিল। টানাটানির সংসার সাদা সাড়ি সাবধানে ব্যবহার কর্ত্তে হয় পাছে দাগ দুগ্ লাগে। সাতাশ বছর বয়েস অবধি তো রঙীন শাড়িই পরছিলেন। সবে জামাই হতে সাদাশাড়ি পরছেন, সে সাদা শাড়ির সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। হঠাৎ অতুল এসে হাজির—বললো, কেমন চমকে দিয়েছি? প্রফেসার আসেন নি, ছুটি হয়ে গেল, ভাবলুম মাকে গিয়ে অবাক্ করে দিই। প্রভা অপ্রস্তুত হয়ে বললো, দাঁড়াও হাতটা ধুয়ে আসি। বলে, বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে এলো।—কিন্তু অতুলের সেদিকে খেয়ালই নেই। এসে দেখে রেণুকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছে অতুল। শিশু রেণুও দাদাকে পেয়ে আত্ম-হারা। তার ঐ রঙীন শাড়ি যে অতুলের নজরে পড়েনি তা আরো বোঝা গেল নিরুর কথায়। কথাপ্রসঙ্গে প্রভা যেই বলেছে কীকাণ্ড রঙীন শাড়ি পরে আমি

খাটে রং লাগাচ্ছি! আর অতুল এসে হাজির আমি ত লজ্জায় অস্থির। নিরু বলে, সে ওর নজরেও পড়েনি মা, কই তাহলে ত বলতো?

কিন্তু এসব বিষয় গদাই একেবারে পাকাচোকা। দার্জিলিং-এ সদাশিববাবুরা সাতদিন আগে গিছলেন, গদাই অনু পরে যায়। অনু একদিন বললো, জানো মা, তোমার জামাই বলছিল রঙীন শাড়ি তোমায় নিয়ে যেতে হবে না। শাশুড়ীঠাকরুণ কি এ অপরচুনিটি ছাড়বেন। বাক্সভরা রঙীন শাড়ি গেছে সঙ্গে দেখো। একই বয়সের দুটি ছেলের মায়ের সম্বন্ধে দ্বিবিধ উক্তি প্রভার মনকে দোলা দেয়।

ইতিমধ্যে লাভে ব্যাং অপচয়ে ঠ্যাং; অনু আবার অন্তঃসত্ত্বা হল। প্রথম দুটি ছেলে মেয়েতে মাত্র এক বছরের ব্যবধান। এবারই যা চার বছর বাদে হচ্ছে—সে শুধু বিলেত থাকার কল্যাণে। যে-বাড়ীতে শিশুর কোনরকম আদর নেই সে-বাড়ীতে আবার শিশুর আবির্ভাবের আশঙ্কায় প্রভা চিন্তিত হন। বিশেষ করে অনুর শারীরিক কথা স্মরণ করে। গদাই বিরক্ত হয়ে জানায়, বলে দিও তোমার মাকে আমার ছেলে আমার বাড়ীতেই হবে—ওঁকে আতুড় তুলতে হবে না। প্রভা ম্লান হাসি হাসেন। অনু মার হাত দুটো জড়িয়ে বলে, না মাগো, আমায় তোমার কাছে নিয়ে যেও, নইলে বাঁচবো না আমি।

ঠিক এই সময়েই নিরুরও একটি ছেলে হল। এক মাস আড়াআড়ি দুবোনের আঁতুড় উঠলো। অর্থে সামর্থ্যে প্রভার তখন জেরবার অবস্থা। কিন্তু বড় জামায়ের সবই অন্য রকম ব্যবহার—নিরুর শরীর খারাপ, নার্স রাখতে হয়, সব টাকা নিরুর শাশুড়ী পাঠিয়ে দেন। বলেন, আমারও ত নাতি গো। গতরও তুমি দেবে, টাকাও তুমি দেবে; শেষে আমি দুয়োরাণী হয়ে যাবো, সে ভাই সইতে পার্ব্ব না।

এদের ব্যাপার সব আলাদা। কথা শোনানর বিচিত্র ভঙ্গী আর বহু মুখ। প্রভা যেন আর সইতে পারেন না। একদিন বলে ফেলেন, একটি ছেলে একটি মেয়ে ত ছিল, আবার ছেলে হল? যা তোদের বাড়ী—মানুষ করে তোলা দুর্ঘট। ব্যস, আর যায় কোথা? গদায়ের আস্ফালন দেখে কে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, আমার যে সন্তান হবে সেইই আপনার অবাঞ্ছিত। দিদির ছেলে মেয়ে সব কামনার জিনিষ। মনের কষ্টে চোখে জল এসে যায় প্রভার, এমন কথা গদাই বলতে পারলো? গদায়ের ছেলেমেয়েরা প্রভার বুকের পাঁজর এক একখানা, তা কি গদাই জানে না? শুধু প্রথম ছেলেই নয়, মেয়েও প্রভার চোখের তারা। শুধু রূপই নয়, গুণও মেয়েটার কম নয়—যখন দিদিমা বলতে পার্ত্ত না দিনেমা বলতো প্রভাকে—একবার ওদের বাড়ীতে সব মাম্পস্ হয়, ছেলেরও হল। প্রভা জোর করে খুকুকে নিয়ে এলো তার কাছে—এখানে এসে খুকুও মাম্পসে আক্রান্ত হল। তখন শিশু রেণুর কথা মনে করে প্রভা গদাইকে জানালো, সে যেন এসে খুকুকে নিয়ে যায় সামলানো ত গেলোই না? খুকু কিন্তু দিনেমাকে ছেড়ে যাবার ভয়ে অত কষ্ট নীরবে সহ্য করলো। বারে বারে মিনতি করছে দিদিমাকে, লক্ষ্মীটি বাবাকে খবর দিও না। খবর পেয়ে গদাই এসে তাকে নিয়ে যেতে কী কান্না তার। খাটভরা খেলনার মধ্যে বসে থাকা মেয়েকে টেনে উঠিয়ে নিতে নিতে গদাই বল্লে, এরকম আদর দিলে কখন ছেলেপুলে যেতে চায়? ওসব কান্না একচড়ে ঠাণ্ডা করে দেব। শুধু এবারই নয় যখনই প্রভার কাছে আসে যেতে চায়না খুকু। প্রতিবার শেষে গদাই-এর চড় খেয়েই তার কান্না থামে। আরো একবার প্রভার সঙ্গে দেওঘর গেছলো খুকু। ষ্টেশনে এসেছিল অনু আর গদাই—পাছে তারা টেনে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেয় সেজন্য ভয়ে প্রভার আঁচল ধরে মুঠো করে বসেছিল খুকু। নিরুপমার ছেলে মেয়ে ঠাকুমাকেই চেনে, দিদিমার বুকে মানুষ হয়নি তারা। তাছাড়া প্রভার সবই দরকার মাসিক বন্দোবস্ত। নিরুপমার ছেলেমেয়ের যত্ন আদরের অভাব নেই, ঠাকুমার চোখের মণি তারা। নিরুপমা অতুল কাশ্মীর গেলো বেড়াতে।

ছেলেকে শাশুড়ীর কাছে রেখে। তার জন্যে একদিনের জন্যে ভাবতে হয়নি প্রভার। এদের যে প্রভা ছাড়া কেউ নেই। এমন কি রোগেও মা সেবা কর্ত্তে পার্ত্তে না সংসার ফেলে। তাহলে ভবতারিণী বিপদতারিণী রেগে দশবাইচণ্ডী হবে।

এই সময় হঠাৎ কাশী থেকে খবর এলো, ভবতারিণী দেহত্যাগ করেছেন। গদাই ছেলেমেয়ে নিয়ে কাশী যাত্রা করলো। কাশীতে তাদের বাড়ীর অপূর্ব নির্মাণ-কৌশল পায়খানা দুটি। একটি হচ্ছে সদরে বাড়ী ঢোকার জায়গায় একেবারে খোলা জায়গায়, দরজা বন্ধ করে আবরুর কোন ব্যবস্থা নেই। আর একটি ছাদে কিন্তু ছাদের ঘরটি এক ছাত্রকে ভাড়া দিয়েছেন প্রসন্নবাবু। ছাদে ওঠা অনুর নিষেধ। আবার শোবারও অপূর্ব ব্যবস্থা। বাপের কাছে এসে ছেলে যদি স্ত্রী নিয়ে শোয় সে নাকি তাঁকে অসম্মান করা হয়। প্রসন্নবাবুর ঘরের মেঝেয় তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে অনুকে শুতে হবে। খাটে থাকবে গদাই আর প্রসন্নবাবু। কিন্তু শেষ রাতে উঠে ঘুমন্ত শিশুদের টেনে টেনে বারান্দায় বসিয়ে সেই ঘর মুছে দিলে তবে প্রসন্নবাবু পুজোয় বসবেন। পাশের ঘরে তাঁর পুজোও যেমন চলবে না শিশুদের রাতে শোয়ানও চলবে না। অনু কেঁদে মার কাছে বলেছিল, আমার শ্বশুরবাড়ীর কষ্ট দেওয়ার যে কত ফন্দী জানা আছে মা, তুমি ধারণাও করতে পার্ব্বে না। আর তোমার জামাই কেবল বক্তৃতার রাজা, কৃচ্ছ্রসাধনের বড় বড় কথা। নিজেকে ত গতর নাড়তে হয় না? যা শত্তুর পরে পরে। পুজো ত নয়, আমাদের প্রাণ বের করার ব্যবস্থা। যাই হোক, এবার শ্বশুরকে একা রেখে গদাইরা ত ফিরে এলো—কিন্তু ভাইদের সঙ্গে বনিবনা হলনা তার। (ক্রমশঃ)

ককেশিয়ান চক সার্ক্‌ল্‌

রচনা—বেরটল্ট ব্রেশট

অনুবাদ—অশোক সেন

স্চনা

বিচারক—ওহে কর্মচারী, এক টুকরো চক নিয়ে এস। ঐ বেঞ্চিটার তলায় চক দিয়ে একটি বৃত্ত আঁক। বৃত্তের মাঝখানে শিশুটিকে রাখবে—তারপর মহিলা দু'জনকে বৃত্তের দু'দিকে গিয়ে দাঁড়াতে বলবে। দু'দিক্‌ থেকে শিশুটির হাত ধরে মহিলারা নিজেদের দিকে টানতে থাকবেন। আসলে যিনি মা, তাঁর টানে যে জোর আসবে, তার আকর্ষণে শিশুটি বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসবে—নকল মার এত জোর হবে না যে শিশুকে বৃত্তচ্যুত করে।

[কর্মচারী চক দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকবে ও শিশুকে ইঙ্গিত করবে তার মাঝে গিয়ে দাঁড়াতে। এরপর মিসেস "মা" শিশুর হাত ধরে টান দিয়ে বৃত্তের থেকে নিয়ে আসবে। হায়টাং কিন্তু এই আকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেবে না।]

বিচারক—এবার পরিষ্কার বোঝা গেল যে হায়টাং এই শিশুর মা নয়, কারণ সে শিশুকে বৃত্তের বাইরে টেনে আনবার জন্য এগিয়ে এল না।

হায়টাং—প্রভু, আপনাকে প্রণতি জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে ক্রোধ সম্বরণ করুন। টানাটানি করতে গেলে আমার শিশুর অঙ্গহানি ঘটবে।

ওভাবে তাকে আমি পেতে চাই না। তার থেকে আঘাতের পর আঘাত নেমে আসুক আমার উপর—সেও বরং সহ্য করবো। কিন্তু শিশুকে ওভাবে বৃত্তের বাইরে আনবার চেষ্টা করবো না।

বিচারক—পুরাকালে এক মহাজ্ঞানী ব্যক্তি একবার বলেছিলেন: কোন মানুষই নিজের আসল চরিত্র গোপন করতে পারে না। এই চক সার্কেলের অদ্ভুত শক্তিটাই দেখ না। বিরাট্‌ সম্পত্তিলাভের লোভে মিসেস "মা" যে শিশুটিকে নিজের বলে দাবী করছে, আসলে সে দাবী তার টিকতে পারে না। চক সার্ক্‌ল্‌ কিন্তু অতি মহনীয়ভাবে আসল সত্য মিথ্যার দিক্‌গুলো আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। মিসেস "মা"র বাইরেটা চিত্তাকর্ষক—অন্তরটা নষ্টামীতে ভরা। এক্ষেত্রে সত্যিকার জননী হচ্ছে হায়টাং—শেষ পর্য্যন্ত তার আসল পরিচয় আমরা জানতে পেরেছি।

[১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের এক অজ্ঞাতনামা লেখক রচিত চাইনিজ নাটক থেকে উপরে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।]

প্রথম পর্ব্ব

১

উচ্চবংশজাত শিশু

[মঞ্চ-আলোক সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলে দেখা যাবে একজন কথক মেঝের উপর বসে আছে। তার কাঁধে জড়ানো রয়েছে একটি ভেড়ার চামড়ার ক্লোক, হাতে একটি ছোট নোটবুক। স্বল্পসংখ্যক একদল শ্রোতা—এরাই নাটকের কোরাস, তার কাছে বসে আছে। কথকের বলবার ভঙ্গী থেকে বোঝা যাচ্ছে এ কাহিনী সে আগেও অনেকবার অনেককে শুনিয়েছে। যন্ত্র-

নজর দিয়ে দেখছে না। যথাযথ ভাবভঙ্গীর সাহায্যে সে প্রত্যেক নতুন দৃশ্য শুরু হবার ইঙ্গিত দেবে।]

কথক

পুরাকালে (যে সময়টাকে রক্তাক্ত ইতিহাসের দিন বলা চলে) ককেশিয়ান শহরে শাসন করতো (এ শহরকে লোকে বলতো অভিশপ্ত নগরী) একজন গভর্ণর।

তার নাম ছিল জর্জি আবাসউইলি। সে ছিল ক্রীশাসের মত ধনী, তার স্ত্রী ছিল পরমাসুন্দরী, তার ছেলেটি ছিল বেশ স্বাস্থ্যবান্। গ্রুসিনিয়ায় আর কোনও শাসকের আস্তাবলে এতগুলো ঘোড়া ছিল না, দ্বারপ্রান্তে ছিল না এত অজস্র ভিক্ষুক, সরকারের চাকরীতে এত সংখ্যক সৈন্য, আদালতপ্রাঙ্গণে এত শত আবেদনকারী। জর্জি আবাসউইলি—কিভাবে তার বর্ণনা দেব ? জীবনকে সে পরমানন্দে উপভোগ করতো। ঈষ্টার সানডের সকালে গভর্ণর এবং তার পরিবার গেছিল গীর্জায়।

[কয়েকজন এসে বাঁদিকে একটি বিরাট্ প্রবেশ-পথের দরজার কাঠামো দাঁড় করিয়ে দেবে—ডানদিকে আরও বড় একটি খিলান দেওয়া সিংহ-দরজা একইভাবে স্থাপিত হবে। ভিক্ষুকের দল এবং বহুসংখ্যক আবেদনকারী সিংহদরজা দিয়ে কাতারে কাতারে বেরিয়ে আসবে—কারোর কারোর কোলে অস্থিচর্মসার শিশু, কেউ ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে, কারোর হাতে আবেদনপত্র। এদের পেছনে দু'জন সৈনিক। এরপর গভর্ণরের পরিবারকে আসতে দেখা যাবে—এদের পোশাক-পত্র খুব দামী।]

ভিক্ষুক এবং আবেদনকারীর দল—মহানুভব শাসক! আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন—আমাদের করের হার ভয়ানক রকম বেড়ে গেছে—দেবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই!

—পারশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার একটি পা খোয়া যায়। আমি কোথায় টাকা পাব······

—প্রভু আমার ভাই নিরপরাধ, একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে······

—দেখুন আমার কোলের বাচ্চাটা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে।

—আমরা আবেদন জানাচ্ছি, সৈনিকবৃত্তি থেকে আমাদের ছেলেকে মুক্তি দেওয়া হোক। এই আমাদের একমাত্র অবশিষ্ট সন্তান—বাকী সবাই যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে!

—অনুগ্রহ করে শুনুন প্রভু। জল-পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীটি ঘুষ খায়।

[একজন রাজ্যসরকারের ভৃত্য এসে আবেদন-পত্রগুলো সংগ্রহ করে নেবে এবং ভিখারীদের কিছু কিছু পয়সা দেবে। সৈনিকরা এবার লোকের ভীড় তাড়িয়ে নিয়ে যাবে—চামড়ার তৈরী চাবুক দিয়ে তারা লোকেদের মারতে শুরু করবে—ভয় পেয়ে জনতা পেছিয়ে যাবে।]

সৈনিক—তফাৎ যাও! তফাৎ যাও! গীর্জার দরজার কাছে ভীড় করো না।

[সিংহদরজা দিয়ে গভর্ণর, তার স্ত্রী এবং এড্জুট্যান্টের পেছনে একটি খুব জমকালো সাজানো গাড়ী এগোতে থাকবে—এতে শুয়ে রয়েছে গভর্ণরের একমাত্র সন্তান।]

জনতা—ঐ গাড়ীতে রয়েছে শিশুটি!

—আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, অত ধাক্কা দিও না।

—হুজুর, ঈশ্বর শিশুটির মঙ্গল করবেন।

[সৈনিকরা চাবুকের আঘাতে জনতাকে হটিয়ে দিতে থাকবে। কথক এবার বলবে—

কথক—ঈষ্টারের রবিবারে এই প্রথম জনগণ তাদের শাসকের উত্তরাধিকারীর দর্শন পেলে। শাসকের চোখের মণি এই শিশুর দুইপাশে দু'জন চিকিৎসক সর্বক্ষণ সজাগ দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কি মহা-শক্তিমান্ যুবরাজ কাজবেকী গীর্জার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শিশুটিকে প্রণতি জানালো।

[একজন মোটা রাজপুত্র এগিয়ে এসে শাসক পরিবারকে অভিনন্দন জানালো।]

মোটা রাজপুত্র—ঈষ্টারের শুভ কামনা গ্রহণ করুন নাটেলা আবাসউইলি! আজকের সকালটা কি চমৎকার! কাল রাত্তে যখন বৃষ্টি পড়ছিল, আমি মনে মনে ভাবছিলাম আজ ছুটির দিনটা বৃথা যাবে। কিন্তু আজ সকালে উঠে দেখলাম আকাশ একেবারে পরিষ্কার। নাটেলা আবাস-উইলি, আমি এই পরিষ্কার আকাশ ভালবাসি, ভাল-বাসি সরলহৃদয়ের লোকেদের। আমাদের এই ছোট্ট মাইকেলের সর্বাঙ্গ থেকে এমন একটা আভিজাত্য ফুটে বেরুচ্ছে যে দেখেই বোঝা যায় শাসক হবার জন্যই যেন সে জন্মেছে। টি…টি…টি (শিশুকে কাতুকুতু দিতে থাকবে।)

গভর্ণরের স্ত্রী—এ ব্যপারে তোমার মত কি আর্কেন? শেষ-পর্যন্ত জর্জি ঠিক করেছে যে পুবদিকে প্রাসাদের একটা নতুন শাখা তৈরী করা শুরু হবে। নোংরা বস্তিগুলো এবং শহরতলীর বাজে বাড়ীগুলো ভেঙেচুরে একেবারে সাফ্ করে ফেলে, সেখানে একটি সুন্দর বাগান করা হবে।

মোটা রাজপুত্র—এত খারাপ খবরের পর এটিই একমাত্র সুখবর। ভাই জর্জি, যুদ্ধের শেষ সংবাদ কি? (গভর্ণর অঙ্গভঙ্গির দ্বারা বুঝিয়ে দেবেন যে এবিষয়ে তাঁর কোন কিছু জানবার আগ্রহ নেই।) শুনলাম সুকৌশলপূর্ণ অপসরণের পথ বেছে নিতে হয়েছে। ছোট-খাট বাধা-বিপত্তি আসাটা খুবই স্বাভাবিক। কখনও ভালর দিকে, কখনও খারাপের দিকে—এই নিয়মেই যুদ্ধ চলে। এতে ঠিক কোনরকম ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

গভর্ণরের স্ত্রী—বাচ্চাটা কাশছে। জর্জি তুমি ওর কাশির শব্দ শুনেছ? (তিক্তভাবে যে দুজন ডাক্তার শিশুর গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের বললে।) বাচ্চাটা কাশছে শুনতে পাচ্ছ?

প্রথম ডাক্তার—(দ্বিতীয়ের প্রতি) নিকো মিকাড্জে, মনে রেখ, শিশুকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করানোয় আমার আপত্তি ছিল। (গভর্ণরের স্ত্রীর প্রতি) শিশুটির স্নানের জল গরম করার ব্যাপারে একটু ভুল হয়ে গিয়েছে মা-ঠাকরুণ।

দ্বিতীয় ডাক্তার—(প্রথম চিকিৎসকের মতই নম্রভাবে) মিকা লোলাড্জে, তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের সর্বসম্মানিত বিখ্যাত মিসিকো ওবোলাডজে তাঁর চিকিৎসা বিজ্ঞানের বইতে শিশুদের যতোটা গরম জলে স্নান করাতে বলে গেছেন এক্ষেত্রেও স্নানের জল ঠিক ততোটাই গরম করা হয়েছিল।

মা-ঠাকুরুণ, আমার মনে হয় গতরাত্রে শিশুর অল্প ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

গভর্ণরের স্ত্রী—তোমরা আরও ভালভাবে ওর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখ। ছেলেটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে জ্বর হয়েছে। তাই না জর্জি?

প্রথম ডাক্তার—(ঝুয়ে পড়ে শিশুকে দেখবে) ভয় নেই মা ঠাকুরুণ। এরপর থেকে আরও উষ্ণ জলে ওকে স্নান করানো হবে। তাহলেই ভবিষ্যতে ও আর কাশবে না।

দ্বিতীয় ডাক্তার—(প্রথম চিকিৎসকের প্রতি বিষাক্ত দৃষ্টি হেনে।) মিকা লোলাড্জে, তোমার এই নোংরা ব্যবহার আমি কখনো ভুলবো না। (গভর্ণরের স্ত্রীর প্রতি) মা ঠাকরুণ, চিন্তার কোন কারণ নেই।

মোটা রাজপুত্র—বেশ, বেশ, বেশ! আমি এসব ক্ষেত্রে কি করি জান? যকৃতে যদি ব্যথা অনুভব করি, অমনি হুকুম দিই চিকিৎসককে পঞ্চাশবার চাবুক লাগাতে—এই ক্ষয়িষ্ণু যুগে এর থেকে আর বেশী শাস্তি দেওয়া চলে না। আগেকার দিনে হলে স্বচ্ছন্দে হুকুম দেওয়া যেত "ডাক্তারকো শির্ লাও!"

গভর্ণরের স্ত্রী—চার্চের ভেতর চল সবাই। এখানে একটা দমকা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা লাগছে।

[শাসক পরিবার এবং তাদের ভৃত্যের দল প্রবেশপথের দরজা দিয়ে ভেতরে যাবে। মোটা রাজপুত্র তাদের অনুসরণ করবে। গভর্ণর ও সুন্দরাকৃতি একটি যুবক এড্জুট্যান্ট দাঁড়িয়ে কথা বলতে থাকবে। আবেদনকারীর দলকে এবার হটিয়ে দেওয়া হবে। একটি পরিশ্রান্ত যুবক

অশ্বারোহী—তার একটা হাত স্লিংএ ঝুলছে—পেছনে এসে দাঁড়াবে।]

এড্‌জুট্যাণ্ট—(অশ্বারোহীর প্রতি ইঙ্গিত করবে—সে সামনে এগিয়ে আসবে) রাজধানী থেকে প্রত্যাগত এই দূতটির কাহিনী—শুনুন প্রভু! ওখান থেকে গোপনীয় কাগজ-পত্র নিয়ে সে আজই সকালে এসে পৌচেছে।

গভর্ণর—পরে শুনবো সালভা—আগে চার্চের অনুষ্ঠানটা শেষ হোক। আচ্ছা, তুমি কি শুনেছ, ভাই কাজবেকী আমাকে ঈষ্টারের শুভকামনা জানিয়েছেন। সে যাই হোক, আমি যতদূর জানি, গতকাল রাত্রে এখানকার কোন জায়গায় বৃষ্টি হয় নি।

এড্‌জুট্যাণ্ট—খোঁজ নিয়ে জানতে হবে।

গভর্ণর—কালকের ভেতরই খোঁজটা পাওয়া চাই।

[এরা চলে যাবে। অশ্বারোহী দেখল বৃথাই তাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল—রাগে ফিরে দাঁড়িয়ে একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে সেও চলে যাবে। একজন মাত্র প্রাসাদের রক্ষী সিমন সাসহাভা প্রবেশপথের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকবে।]

কথক—গীর্জার সামনের চতুষ্কোণ জায়গাতে পায়রাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছিল।
সারা শহর তখন নিস্তব্ধ
প্রাসাদের রক্ষী একজন সৈনিক রান্নাঘরের একজন পরিচারিকার সঙ্গে মস্করা করছিল, পরিচারিকাটি নদীর ধার থেকে ফিরছিল একটি বোঁচকা হাতে।
(মেয়েটির নাম গ্রুসা ভাসনাড্‌জে—বোঁচকাটি নিয়ে সে আসছে।)

সৈনিক সিমন—কি লজ্জার কথা! উপাসনায় না গিয়ে নদীর পারে বসে নিজের রূপ দেখাচ্ছিলে?

গ্রুসা—আমি গেছিলাম কাপড় কাচতে। তাছাড়া আজকের উৎসবের জন্য পোল্‌ট্রি ফার্ম্‌ থেকে একটা হাঁসও কিনে আনতে হল। এ তল্লাটে আমার থেকে ভাল কেউ হাঁস চেনে না—একটা হাঁস কম হওয়াতে আমাকেই যেতে হল।

সিমন—দেখি হাঁসটা—। আমিও নদীতে মাছ ধরতে গেছিলাম।

গ্রুসা—(অনিচ্ছাসত্বেও এগিয়ে এসে) এই দেখ, ওজন অন্ততঃ পনের পাউণ্ড—ওর পেটের ভেতরটা শস্য দিয়ে ঠেসে দেওয়া হয়েছে।

সিমন—একেবারে হংসীদের রাণী আর কি। গভর্ণর নিজেই এটাকে উদরস্থ করবেন। তাহলে যুবতী মেয়েটি আবার নদীর ধারে গিয়েছিল?

গ্রুসা—তাতো গিয়েছিলামই—তারপর পোল্‌ট্রি ফার্মে।

সিমন—তাই নাকি? নদীর ধার দিয়ে পোল্‌ট্রি ফার্মে… উইলোগুল্মের কাছাকাছি?

গ্রুসা—কাপড় কাচবার সময় ওই ঝোপগুলোর আড়ালে গিয়ে আমি বসি। সেটা কি অন্যায়?

সিমন—অন্যায় কেন হবে। সেটাই তো সবথেকে ভাল!

গ্রুসা—তার মানে? তোমার কথা বাপু কিছুই বুঝতে পারছি না।

সিমন—বুঝতে পারলে তো সারা শরীরে তোমার শিহরণ খেলে যেতো।

গ্রুসা—তাই নাকি!

সিমন—ধর উল্টোদিকের ঝোপের আড়ালে বসে একজন তোমার কাপড় কাচা দেখছিল। সেখান থেকে সবকিছু দেখা যায়।

গ্রুসা—কি আর দেখবে? আমি একবার পায়ের পাতাটা জলে ডুবিয়েছিলাম।

সিমন—শুধু পায়ের পাতা নয়—আরও একটু উপর অবধি?

গ্রুসা—বড় জোর তল-পা অবধি?

সিমন—তল-পা? উঁহু আরও উপর পর্যন্ত।

গ্রুসা—(রেগে উঠে) সিমন সাসহাভা, তুমি নির্লজ্জ এবং বেহায়া। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে দেখছিলে একজন মেয়ে বসে নদীতে পা ধুচ্ছে। সঙ্গে বোধহয় একজন তোমারই মত বেল্লিক সঙ্গী ছিল! (দৌড়ে চলে যাবে)।

সিমন—(তার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে) না, না, আর কেউ ছিল না।

[কথক তার কাহিনী শুরু করবে—সৈনিক সিমন প্রবেশপথের দরজার কাছে যাবে, মনে হবে সে যেন দূরথেকে গীর্জার উপাসনা শুনবার চেষ্টা করছে।]

কথক—সারা শহর নিস্তব্ধ, তবে এত অস্ত্রধারী লোকের সমাবেশ কেন?
গভর্ণরের প্রাসাদে তো শান্তি বিরাজ করছে, তবে সেটাকে একটা নগর-দুর্গে পরিণত করবার কারণ কি?
এরপর গভর্ণর ফিরে গেলেন তাঁর প্রাসাদে, নগর-দুর্গটি হল একটি গুপ্ত-বিপদের ফাঁদ, হাঁসটির পালক ছাড়িয়ে তাকে আগুনে ঝলসানো হল, কিন্তু হাঁসটিকে আর কেউ খেলো না, দুপুর বেলাটায় আর কেউ খেতে এল না, দুপুর বেলাটা যেন হয়ে দাঁড়ালো মরবার সময়।

[বাঁ দিকের দরজার প্রবেশপথ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসবে মোটা রাজপুত্র—কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে—চারদিকে চাইবে। ডানদিকের সিংহদরজার কাছে মাটিতে বসে দুজন সৈনিককে ঘুঁটি খেলতে দেখা যাবে। মোটা রাজপুত্র তাদের দেখবে—তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় ইঙ্গিত করবে। সৈনিক দুজন উঠে দাঁড়াবে, একজন বাঁদিকে প্রবেশপথের দিক্‌ দিয়ে ভেতরে চলে যাবে। অন্যজন ডানদিকে রওনা দেবে। পেছন থেকে চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, 'যে যার কাজের জায়গায় যাও।' ইতিমধ্যে প্রাসাদকে অবরোধ করে ফেলা হবে। মোটা রাজপুত্র দ্রুত বেরিয়ে যাবে। দূরে গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাবে। প্রবেশপথ দিয়ে উপাসনা শেষ করে গভর্ণরের পরিবার এবং অনুগামীরা আসতে থাকবে।]

গভর্ণরের স্ত্রী—(এড্‌জুট্যান্টকে ছাড়িয়ে এগিয়ে আসতে আসতে) সত্যিই এই বস্তির সামনে বসবাস করা অসম্ভব। অবশ্য জর্জি নতুনভাবে জায়গাটা গড়ে তুলতে চায়—এসব সে করতে চাইছে ছোট্ট মাইকেলের জন্য। আমার জন্য হলে করতো না। মাইকেলই তার সব—তার জন্য সবই সে করতে পারে!

[এদের দলটা প্রবেশপথ দিয়ে চলে যাবে। এড্‌জুট্যান্ট আগের মতই এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। আহত অশ্বারোহী দরজা দিয়ে ঢুকবে। প্রাসাদের রক্ষী দুজন সৈনিক প্রবেশপথের সামনে এসে পাহারা দেবার জন্য দাঁড়াবে।]

এড্‌জুট্যান্ট—(অশ্বারোহীর প্রতি) নৈশ-আহারের আগে গভর্ণর মিলিটারী রিপোর্ট শুনবেন না—বিশেষতঃ খবর খারাপ হলে তো নয়ই। বিকেল বেলায় মহামহিম শাসক বিখ্যাত স্থপতিদের সঙ্গে আলোচনা-সভায় বসবেন—এঁদের আবার রাত্রে খাবার কথা আছে। ওই তাঁরা এসে পড়েছেন (তিনজন ভদ্রলোককে প্রবেশ-পথের দিকে আসতে দেখা যাবে।)
(অশ্বারোহীর প্রতি) তুমি ভাই রান্নাঘরে গিয়ে নিজের জন্য কিছু খাবার যোগাড়ের ব্যবস্থা দেখ। (অশ্বারোহী চলে যাবে, এড্‌জুট্যান্ট স্থপতিদের অভিনন্দন জানাবে।) ভদ্রমহোদয়গণ, মহামহিম শাসকের ইচ্ছা আপনারা রাত্রে তাঁর সঙ্গে আহার করবেন। আপনাদের মহৎ পরি-কল্পনাগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার জন্য তিনি আর সব কাজ বাতিল করেছেন—তাড়াতাড়ি চলুন।

একজন স্থপতি—এ সময় মহামহিম শাসক গৃহনির্মাণে প্রস্তুত হয়েছেন শুনে আমরা অবাক্‌ হয়ে গেছি। গুজব উঠেছে যে পারসিয়ার যুদ্ধের গতি আমাদের পক্ষে বেশ খারাপ দিকেই গেছে।

এড্‌জুট্যান্ট—সেই জন্যই তো গৃহ নির্মাণ ব্যাপারে আরও বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। ওসব গুজবের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। পারস্য দেশ এখান থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এখানকার সৈন্যবাহিনীর সবাই তাদের গভর্ণরের জন্য জান কবুল করতে রাজী। (প্রাসাদের দিক্‌ থেকে গণ্ডগোল শোনা যাবে। শোনা যাবে একজন স্ত্রীলোকের তীক্ষ্ণ চিৎকারের ধ্বনি। কোনো একজন লোকের জোর গলায় হুকুম দেবার আওয়াজও এখানে ভেসে আসবে। এড্‌জুট্যান্ট বিহ্বলভাবে প্রবেশ-পথের সামনে এগিয়ে আসবে। একজন প্রহরারত সৈনিক তার দিকে বর্শা উঁচিয়ে

ধরবে।) কি সব কাণ্ড ঘটছে এখানে? বর্শা নামা কুত্তা!

(একজন স্থপতি-তুমি কি জানো না যে রাজধানীতে কাল রাতে রাজপুত্রেরা সভা বসিয়েছিল? তারা গ্র্যাণ্ড ডিউক ও তাঁর গভর্ণরদের বিরুদ্ধবাদী। ভাইসব, চলুন আমরা পালাই।)

(তারা পালাবে। এড্‌জুট্যান্ট অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে।)

এড্‌জুট্যাণ্ট—(বিরক্তভাবে বন্দীদের প্রতি) অস্ত্র নামা হতভাগারা। বুঝতে পারছিস না, মহামহিম শাসকের জীবন বিপদাপন্ন?

[রক্ষীরা তার আদেশ অমান্য করবে এবং নির্বিকারভাবে তার দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে থাকবে।]

কথক—বিরাট্‌ ব্যক্তিরা সব দৃষ্টিহীন! তারা ভাবে তারা দেবতাদের মত শক্তি ধরে, অপদার্থের দল কুঁজো হয়ে হাঁটে, ভাবে ভাড়াটে শক্তির দাপটে সবাইকে দাবিয়ে রাখবে, এতকাল দাপট চালিয়ে এসেছে বলে মনে করে চিরকাল এমনটাই চলবে। যুগে যুগে অনেক কিছুই বদ্‌লায়, সেইটেই জনগণের পক্ষে একমাত্র আশার বাণী।

[প্রবেশপথে দু'জন অস্ত্রসজ্জিত সৈনিকের মাঝে গভর্ণরকে আসতে দেখা যাবে—তাঁর হাতে শিকল বাঁধা---মুখ ফ্যাকাশে।]

মহৎ ব্যক্তি, উঠে দাঁড়ান, বুক উঁচিয়ে হাঁটুন! আপনার প্রাসাদ থেকে শত্রুর দল আপনাকে দেখছে। স্থপতিদের দরকার নেই, ছুতোর দিয়ে কাজ চালান। নূতন প্রাসাদে আপনার স্থান হবে না, মাটির তলায় গর্তে গিয়ে সেঁধোতে হবে। নিজের চারদিক্‌টা ভাল করে দেখে নিন, অন্ধ মানব! এমন জায়গায় আপনাকে যেতে হবে যেখানে গেলে কেউ ফিরে আসে না।

[গভর্ণরকে নিয়ে সৈনিকরা চলে যাবে। এলার্মসাউণ্ড বেজে উঠবে শিঙায়। প্রবেশপথের পেছনে হট্টগোল শুরু হবে।]

বিরাট্‌ কোন ব্যক্তির ঘর ভেঙে পড়লে অনেক ক্ষুদ্র লোকেরও প্রাণহানি হয়। মহৎ ব্যক্তির সৌভাগ্যের যারা অংশীদার ছিল না তাদেরও তার দুর্ভাগ্যের বোঝা বইতে হয় সময় সময়।

[চাকরেরা ভয়ানক ভয় পেয়ে প্রবেশ পথ দিয়ে দৌড়ে আসবে।]

চাকরের দল—(নিজেদের মধ্যে বলাবলি করবে।)

—বাস্কেটগুলো!

—এ গুলোকে তৃতীয় উঠোনে নিয়ে রাখ। পাঁচ দিনের খাবার ওতে আছে।

—কর্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। তাঁকে বয়ে নিয়ে আসা দরকার। তাঁর এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই ভাল।

—আমাদের কি হবে? আমাদের তো মুর্গীর মত জবাই করবে, এই রকমটাই সব সময় হয়।

—হা হতোস্মি, কি যে ঘটবে। শোনা যাচ্ছে এর মধ্যেই শহরে রক্তপাত শুরু হয়ে গেছে।

—বাজে কথা, গভর্ণরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করা হয়েছে রাজপুত্রদের সভায় যেতে। সব কিছু মিটে যাবে। আমি খুব বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে একথা শুনেছি।

(চিকিৎসক দুজন দৌড়ে উঠোনে এসে দাঁড়াবে।)

প্রথম চিকিৎসক—নিকো মিকাজজী, ডাক্তার হিসাবে তোমার কর্তব্য নাটেলা আবাসউইলিকে দেখা।

দ্বিতীয় চিকিৎসক—আমার কর্তব্য? না তোমার?

প্রথম চিকিৎসক—আজকে শিশুটির ভার কার ওপর? তোমার না আমার?

দ্বিতীয় চিকিৎসক—তুমি বুঝি তাই মনে কর। আর এক মুহূর্তও এই অভিশপ্ত প্রাসাদে ওই হতচ্ছাড়া শিশুটার জন্য থাকবো ভেবেছ?

(দুজনের মধ্যে হাতাহাতি আরম্ভ হবে—শুধু শোনা যাবে কর্তব্যের ব্যাপার নিয়ে বচসা। দ্বিতীয় চিকিৎসকের মারের চোটে প্রথমজন মাটিতে ছিটকে পড়বে।)

দ্বিতীয় চিকিৎসক—তুমি জাহান্নামে যাও!

(প্রস্থান)

(সৈনিক সিমন সাসহাভা ঢুকবে। ভীড়ের ভেতর সে গ্রুসাকে খুঁজে বেড়াবে।)

চাকরের দল—রাত্রের আগে পর্যন্ত কিছুটা সময় আছে। সৈনিকরা তখন অবধি মাতাল হবে না।

—কেউ কি জান বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে কি না?

—প্রাসাদের রক্ষীরা সব পালিয়েছে।

—কেউ কি আসল্প খবর দিতে পারে না?

—রাজধানীতে গতকাল খবর এসেছে যে আমরা পারস্যের যুদ্ধে হেরে গেছি।

—রাজপুত্রেরা বিদ্রোহ করেছে।

—গুজব রটেছে যে গ্র্যাণ্ড ডিউক পালিয়ে গেছে।

—সমস্ত গভর্ণরদের নাকি হত্যা করা হবে।

—ছোটঘরের লোকেদের কোনও ক্ষতি করা হবে না।

—আমার এক ভাই সৈন্যদলে আছে।

এড্‌জুট্যান্ট—(প্রবেশপথে দেখা দেবে) প্রত্যেকে তৃতীয় উঠোনটাতে গিয়ে হাজির হও। জিনিষপত্র গোছগাছ করতে সাহায্য কর গিয়ে।

(চাকররা এবং এড্‌জুট্যান্ট চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত সিমন গ্রুসাকে খুঁজে পেয়েছে।)

সিমন—এই যে গ্রুসা। তুমি কি করবে ঠিক করেছ?

গ্রুসা—কিছুই ঠিক করিনি। খুব যদি বিপদে পড়ি, পাহাড়ে-অঞ্চলে আমার এক ভাই আছে—তার কাছে চলে যাব। তুকি কি করছ?

সিমন—আমার তেমন কিছু করবার নেই। গ্রুসা ভাসনাড্‌জে, তুমি যে আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা জানতে চাইছ, এতেই আমি খুশী। আমার উপর আদেশ হয়েছে, মাদাম নাটেলা আবাসউইলির রক্ষী হিসাবে আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

গ্রুসা—কিন্তু প্রাসাদের রক্ষীরা তো বিদ্রোহ করেছে?

সিমন—(গম্ভীরভাবে) এ খবর সত্যি।

গ্রুসা—তাহলে ঐ মহিলার সঙ্গে থাকলে তো বিপদ্ ঘটতে পারে?

সিমন—টাইফ্লিসে একটা প্রবাদ আছে—যে ছুরি দিয়ে আঘাত করবে সেটা ভেঙে যেতে পারে।

গ্রুসা—তুমি তো ছুরি নও—তুমি যে একজন মানুষ—সিমন সাসহাভা। ও মহিলার সঙ্গে তোমার সম্পর্কই বা কি?

সিমন—কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই আদেশই আমি পেয়েছি, সুতরাং আমাকে যেতে হবে।

গ্রুসা—তোমার মাথাটা গোবরে ঠাসা। মিছিমিছি বিপদকে ডেকে আনছ—এতে তোমার কোনই লাভ হবে না। যাক্, আমাকে তৃতীয় উঠোনটাতে যেতে হবে—আমার তাড়া আছে।

সিমন—দুজনেরই যখন তাড়া আছে, ঝগড়া করে সময় নষ্ট করবো না। তোমার কি বাপ-মা আছে?

গ্রুসা—না, শুধু একজন ভাই আছে। আমার তাড়া আছে, চললাম।

সিমন—দাঁড়াও—একটা প্রস্তাব আছে। আমি যা রোজগার করি তাতে সহজেই দুজনের চলে যেতে পারে—আর আমার কোন পোষ্যও নেই—আমি খুবই সরলভাবে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছি।

গ্রুসা—(হেসে উঠে) সিমন সাসহাভা, তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম।

সিমন—(গলা থেকে ক্রশযুক্ত একটা হার খুলে নিয়ে) আমার মা আমাকে এই ক্রশটা দিয়েছিলেন—এই হারটা রূপোর—এটা তুমি পর গ্রুসা ভাসনাড্‌জে।

গ্রুসা—অনেক ধন্যবাদ সিমন (হারটা গলায় পরবে)।

সিমন—এবার তুমি তৃতীয় প্রাঙ্গণে চলে যাও। দেরী হলে বিপদ ঘটতে পারে। আমিও গিয়ে ঘোড়াগুলোকে যাবার জন্য প্রস্তুত করি। মাদামকে প্রভুভক্ত সৈন্যদলের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার ভার আমার উপর। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমি ফিরে আসবো। হয়তো সপ্তাহ দুই বা তিন সময় লাগবে—নিশ্চয় এই অল্পদিনের প্রতীক্ষায় তুমি অস্থির বা অধীর হয়ে পড়বে না।

গ্রুসা—সিমন সাসহাভা, আমি তোমার জন্য চিরকাল অপেক্ষা করবো।

সিমন—ধন্যবাদ গ্রুসা ভাসনাড্‌জে—বিদায়।

[দুজনে বাউ করবে—গ্রুসা দ্রুত চলে যাবে। প্রবেশপথ দিয়ে এড্‌জুট্যান্ট আসবে।]

এড্‌জুট্যান্ট—(কর্কশভাবে—সিমনের প্রতি) গাড়িতে ঘোড়াগুলো জোত! ওখানে হাঁদার মত দাঁড়িয়ে থেকো না।

[সিমন সাসহাভা চলে যাবে—দুজন ভৃত্য বিরাট

ভারে তাদের কাঁধ নুয়ে পড়েছে……তাদের পেছনে কয়েকজন মহিলা নাটেলা আবাস-উইলিকে ধরে ধরে নিয়ে আসবে। তার পেছনে একজন মহিলা শিশুটিকে নিয়ে এগিয়ে আসছে দেখা যাবে।]

গভর্ণরের স্ত্রী—বুঝতেই পারছি না, ধড়ে এখনো আমার মাথাটা আস্ত অবস্থায় আছে কি না। মাইকেল কোথায়? ওকে অত শক্তভাবে আঁকড়ে থেকো না। গাড়ীতে ট্রাঙ্কগুলো বোঝাই কর। সালভা, শহরের থেকে নতুন কোন খবর এসেছে?

এড্জুট্যাণ্ট—না—এখন পর্যন্ত সবই শান্ত আছে। কিন্তু নষ্ট করবার মত এক মিনিট সময়ও হাতে নেই। অত-গুলো ট্রাঙ্ক গাড়ীতে ধরবে না। কিছু মাল বেছে নিন্, বাকীগুলো ফেলে যেতে হবে।

গভর্ণরের স্ত্রী—শুধু অতি দরকারী জিনিষগুলো নিতে হবে। ট্রাঙ্কগুলো চট্পট্ খুলে ফেল, মাল বেছে দিই। (বাক্স-গুলো নামিয়ে খুলে ফেলা হবে। নাটেলা কয়েকটি ব্রোকেডের পোশাক বেছে দেবেন।) ঐ সবুজটা! হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফার লাগানোটা নিতে হবে বই কি। নিকো মিকাডজে আর মিস্কা লোলাডজে গেল কোথায়? হঠাৎ আমার মাথার একটা দিকে ভয়ানক ব্যথা শুরু হয়েছে। (গ্রুসা ঢুকবে।) এতক্ষণ কোথায় আড্ডা দেওয়া হচ্ছিল? ছুটে গিয়ে গরম জলের বোতলগুলো নিয়ে আয় হতচ্ছাড়ী। (গ্রুসা দৌড়ে বেরিয়ে যাবে এবং গরম জলের বোতল নিয়ে ফিরে আসবে।) এই! তুই যে আমার হাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলবি।

যুবতী পরিচারিকা—না সরকার, পোশাকটার কোন ক্ষতি হয়নি।

গভর্ণরের স্ত্রী—আমি সাবধান না করলেই হোত। আমি এতক্ষণ ধরে তোর কাজ করা লক্ষ্য করছিলাম। তোর মাথায় কিছু নেই। আর সমস্তক্ষণ ধরে সালিভা জেরে-টেলির দিকে চোখের ইসারা করছিস। তোকে আমি মেরে ফেলবো মাদী কুত্তা! (এক থাপ্পড় দেবে)

এড্জুট্যাণ্ট—(প্রবেশপথে এসে দাঁড়াবে।) একটু তাড়াতাড়ি করুন নাটেলা আবাসউইলি। শহরে গোলাগুলি চলছে। [প্রস্থান।]

গভর্ণরের স্ত্রী—হায় ভগবান্! তোদের কি মনে হয় ওরা আমাদের উপর অত্যাচার করবে? কেন করবে? কেন? (ট্রাঙ্কগুলো ঘাঁটতে থাকবে) মাইকেল্ কেমন আছে? ঘুমিয়ে পড়েছে?

শিশুর রক্ষী স্ত্রীলোকটি—হ্যাঁ, সরকার।

গভর্ণরের স্ত্রী—তাহলে ওকে একটু নামিয়ে রাখ্, আর আমার শোবার ঘরে গিয়ে কমলা রঙের বুটজোড়া নিয়ে আয়। সবুজ পোশাকটা পরলে ওই জুতোজোড়া না হলে মানাবে না। (মহিলা বাচ্চাকে নামিয়ে রেখে চলে যাবে।) দেখ, দেখ, কিভাবে জিনিষগুলো প্যাক করেছে! এতটুকু দরদ দিয়ে, বুদ্ধির সঙ্গে এরা কাজ করতে জানে না। সব কিছু হুকুম দিয়ে করাতে হবে …এই রকম সময়ে বোঝা যায় চাকরগুলোর আসল স্বভাবটা। ওরা শুধু গিলতে জানে—এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। আজকের কথা আমার ভবিষ্যতেও মনে থাকবে।

এড্জুট্যাণ্ট—(উত্তেজিতভাবে ঢুকে) নাটেলা, এখুনি এখান থেকে পালাতে হবে!

গভর্ণরের স্ত্রী—কেন? ঐ রূপো দিয়ে তৈরী পোশাকটা আমাকে নিতেই হবে। এটা কিনতে হাজার পিয়াস্তার খরচ করতে হয়েছিল। আর সেই পোশাকটা, কোথায় গেল—মদের রঙের পোশাকটা?

এডজুট্যাণ্ট—(তাকে ধরে টান দিয়ে) চারদিকে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে। আমাদের এখুনি পালাতে হবে। শিশুটি কোথায়?

গভর্ণরের স্ত্রী—(পরিচারিকার উদ্দেশে) মা-রো, বাচ্চাটাকে নিয়ে তৈরী হ, কোথায় গেলি তুই?

এড্জুট্যাণ্ট—(যেতে যেতে, আর বোধহয় গাড়ীতে যাওয়া চলবে না। ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে।

[গভর্ণরের স্ত্রী—পোশাকপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকবে। একটা সোরগোল উঠবে, ড্রাম বাজার শব্দ শোনা যাবে। যে যুবতী পিটুনি খেয়ে-

ছিল সে সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে যাবে। আকাশের রঙ লাল হয়ে উঠবে।]

গভর্ণরের স্ত্রী—(জিনিষপত্র বাছতে বাছতে) মদ রঙের পোশাকটা পাচ্ছি না। কাপড়গুলো একসঙ্গে করে গাড়ীর ভেতর ফেলে দে! আসজা কোথায় গেল? মারো এখনও ফিরছে না কেন? তোদের সবার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

এড্জুট্যাণ্ট—(ফিরে এসে) তাড়াতাড়ি করুন!

গভর্ণরের স্ত্রী—(প্রথম মহিলাকে) দৌড়ে কাপড়গুলো নিয়ে গাড়ীতে ফেলে দে।

এড্জুট্যাণ্ট—গাড়ীতে যাব না। তাড়াতাড়ি আসুন, ঘোড়ার পিঠে যেতে হবে।

গভর্ণরের স্ত্রী—(প্রথম মহিলা সব কাপড় নিতে পারছে না দেখে, মাগীকুত্তা আস্জাটা গেল কোথায়? (এড্জুট্যাণ্ট তাকে ধরে টান দেবে।) মা-রো, বাচ্চাটাকে নিয়ে আয়। (প্রথম মহিলার প্রতি) মামাকে খুঁজে বের কর্। না, আগে পোশাকগুলো গাড়ীতে রেখে আয়। কি সব ঝঞ্ঝাট! আমি স্বপ্নেও কখনও আগে ভাবিনি যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমাকে কোথাও যেতে হবে! [এড্জুট্যাণ্ট তাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাবে—পেছনে কাঁপতে কাঁপতে প্রথম মহিলা পোশাকগুলো নিয়ে অনুসরণ করবে।]

মা-রো—(বুটজোড়া হাতে প্রবেশপথের কাছ থেকে) মাদাম! (তার নজর পড়বে ট্রাঙ্ক এবং পোশাকগুলোর উপর—শিশুটিকে দেখে এগিয়ে যাবে, তাকে নিজের হাতে কোলে তুলে নেবে।) পশুগুলো বাচ্চাটাকে ফেলে পালিয়েছে। [গ্রুসার হাতে শিশুটিকে দিয়ে] একে একটু ধর দেখি। [গভর্ণরের স্ত্রী যেদিকে গেছে সে দিকে ছুটে যাবে। প্রবেশপথ দিয়ে ভৃত্যের দল ঢুকবে।]

কুক—মজা মন্দ নয়। সবাই দেখেছি পালিয়ে গেছে। খাবার গাড়ীও সঙ্গে নেয়নি, গেছেও একেবারে শেষ সময়ে। এবার আমাকেও পালাতে হবে।

ঘোড়ার আস্তাবলের কর্মচারী—কিছুকালের জন্য এ বাড়ীটা একটা অস্বাস্থ্যকর জায়গায় পরিণত হবে। (একটি মেয়েকে উদ্দেশ করে) সুলিকো, কয়েকটা কম্বল নিয়ে আস্তাবলের সামনে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা কর্।

গ্রুসা—ওরা গভর্ণরকে নিয়ে কি করল?

আস্তাবলের কর্মচারী—(গলা কাটার ইঙ্গিত করে) কি··· কি, কি···কি···কি।

একজন মোটা স্ত্রীলোক—(গলা কাটার ইঙ্গিত লক্ষ্য করে হিষ্টিরিয়া রোগীর মত চিৎকার করে উঠবে) হায়, হায়, হায়, হায়, হায়! আমাদের প্রভু জর্জি আবাসউইলি! সকালে উপাসনার সময় তাকে দেখাচ্ছিল প্রাণরসে ভরপুর—আর এখন! কে কোথায় আছ, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল। পাপের পঙ্কে ডুবে আমরা মারা যাব। আমাদের প্রভু জর্জি আবাসউইলির মত আমাদেরও মৃত্যু ছাড়া গতি নেই!

অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা—(তাকে সান্ত্বনা দিয়ে) শান্ত হও নিনা। তোমাকে নিরাপদ্ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। তুমি তো কখনও কারোর কোনও ক্ষতি করনি?

মোটা স্ত্রীলোক—(তাকে সবাই ধরে নিয়ে যাবে) হায়, হায়, হায়! তাড়াতাড়ি কর! শয়তানরা আসবার আগেই আমাদের পালাতে হবে।

একটি যুবতী—কর্ত্রীর থেকেও এ ব্যাপারে নিনারই বেশী আঘাত লেগেছে। উপর তলার লোকেদের বিশেষত্বই এই—তাদের দুঃখের ব্যাপারে অন্য লোককেই তাদের তরফে শোক প্রকাশ করতে হয়।

কুক—এবার এখান থেকে পালানোই সর্বদিক্ দিয়ে ভাল হবে।

অপর একজন স্ত্রীলোক—(একবার পেছনের দিকে চেয়ে দেখে) পূব দিকের দরজাটায় আগুন জ্বলছে।

যুবতী—(গ্রুসার হাতে শিশুকে দেখে) ও কি! বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করছ?

গ্রুসা—ওকে ফেলে পালিয়েছে।

যুবতী—যে মাইকেলের সামান্য ঠাণ্ডা লাগলে হুলুস্থুল্ কাণ্ড ঘটতো, তাকে ফেলে পালিয়েছে! (ভৃত্যের দল শিশুর চারপাশে এসে জড় হবে।)

গ্রুসা—বাচ্চাটা ঘুম থেকে উঠেছে।

আস্তাবলের কর্মচারী—আমার কথা শোন, ভালয় ভালয় বাচ্চাটাকে মাটিতে নামিয়ে রাখ। ওরা যদি দেখে, কেউ শিশুটিকে রক্ষা করছে, তাহলে তার সর্বনাশ ঘটবে।

কুক—ঠিকই বলেছ। একবার এই ধরণের হত্যাকাণ্ড শুরু হলে পরিবারের সবাইকেই খতম করে ফেলা হয়। চল আমরা পালাই। (গ্রুসা এবং দুজন স্ত্রীলোক ছাড়া সবাই চলে যাবে—গ্রুসার কোলে শিশুটি।)

স্ত্রীলোক-দু'টি—ওদের কথা শুনলে তো? বাচ্চাটিকে মাটিতে নামিয়ে রাখ।

গ্রুসা—ওর ধাত্রী আমাকে বলে গেল কিছুক্ষণের জন্য ওকে কোলে রাখতে।

বয়স্থা স্ত্রীলোক—আরে বোকা, ওই ধাত্রী আর আসবে না।

কমবয়সী স্ত্রীলোক—বাচ্চাটার থেকে দূরে থাকাই ভাল।

বয়স্থা স্ত্রীলোক—(মধুরভাবে) গ্রুসা, তোমার স্বভাবটা বড় সুন্দর, কিন্তু তুমি নিজেও তো জান, সব কিছু বোঝবার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি বলছি, বাচ্চাটার সঙ্গে নিজেকে জড়িও না—ভয়ানক বিপদে পড়বে।

গ্রুসা—কিন্তু ও যে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে, ওর চোখে কি অসহায় দৃষ্টি!

বয়স্থা স্ত্রীলোক—ওর দিকে তোমার চাইবার দরকার কি? বোকামি কোরো না, চলে এস। আমার স্বামীর একটা বলদে-টানা গাড়ী আছে—দেরী না করলে তুমি আমাদের সঙ্গে আসতে পার। একবার তাকিয়ে দেখ —চারদিকে আগুন জ্বলছে।

[স্ত্রীলোক-দুজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে যাবে। গ্রুসা একটু ইতস্ততঃ করে ঘুমন্ত শিশুকে মাটিতে নামিয়ে রাখবে, ওর দিকে একবার চেয়ে দেখবে, সামনের জামা-কাপড়ের স্তূপ থেকে ব্রোকেডের একটি কম্বল নিয়ে শিশুটিকে ভালভাবে ঢেকে দেবে। এরপর স্ত্রীলোক-দুজন তাদের বোঁচকাগুলো টানতে টানতে এসে হাজির হবে। গ্রুসা যেন অপরাধ করেছে এমনভাবে শিশুর কাছে থেকে সরে এসে একপাশে গিয়ে দাঁড়াবে।]

কমবয়সী স্ত্রীলোক—এখনও নিজের জিনিষপত্র প্যাক করোনি? হাতে বেশী সময় নেই তো জান। সৈনিকরা এখুনি তাদের আস্তানা থেকে এখানে এসে পড়বে।

গ্রুসা—আমি আসছি।

[প্রবেশপথ দিয়ে চলে যাবে। স্ত্রীলোক-দুটি সিংহদরজার কাছে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে। ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যাবে। স্ত্রীলোক-দুজন চিৎকার করতে করতে পালাবে। মোটা রাজপুত্র কয়েকজন মত্ত সৈনিকের সঙ্গে এসে হাজির হবে। এদের একজনের বর্শার আগায় গভর্ণরের মাথাটা বসানো।]

মোটা রাজপুত্র—এইখানে! মাঝখানটায়! [একজন সৈনিক বর্শার উপর থেকে গভর্ণরের মাথাটা নিয়ে সিংহদরজার উপর ধরবে।] ওটা ঠিক মাঝামাঝি জায়গা হয় নি—আরও ডানদিকে নাও—এবার ঠিক হয়েছে। (সৈনিক সেই জায়গায় দরজার উপর পেরেক মেরে তার সঙ্গে গভর্ণরের চুল ভালভাবে জড়িয়ে বেঁধে দেবে ঝুলতে থাকবে।] মাথাটা আজই সকালে গীর্জার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে জর্জি আবাসউইলিকে বলেছিলাম: "আমি নির্মল আকাশ ভালবাসি।" আসলে আরও ভালবাসি বিনামেঘে বজ্রপাত হওয়াকে। বড়ই আফশোষের কথা, ওরা বাচ্চাটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে—ওটাকে আমার বিশেষ দরকার ছিল।

[সিংহ-দরজা দিয়ে সৈনিকেরা ফিরে যাবে। আবার ঘোরার পায়ের খুরের শব্দ ভেসে আসবে। গ্রুসা প্রবেশপথের সামনে এসে দাঁড়াবে—সাবধানে চারদিকে চেয়ে দেখবে। বেশ বোঝা যাবে, সে সৈনিকদের ফিরে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। একটা বোঁচকা নিয়ে সে এগিয়ে আসবে। শেষবারের মত সে চেয়ে দেখবে, শিশুটি সেখানে আছে কি না।] তখনও সিংহদরজার উপর গভর্ণরের কাটা মাথাটা দেখে সে

চিৎকার করে উঠবে। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে সে তার বোঁচকাটা আবার তুলে নেবে এবং বেরিয়ে যেতে যাবে। ঠিক তখনি কথক বলতে শুরু করবে এবং গ্রুসা সেখানে দাঁড়িয়ে যাবে—আর তার নড়বার ক্ষমতা থাকবে না।

কথক :

প্রাসাদের অঙ্গন এবং প্রবেশপথের মাঝে সে দাঁড়িয়ে পড়লে, তার মনে হল, শিশুটি যেন তাকে বলছে, আমাকে তুমি সাহায্য কর। একথা জেনে সাহায্যের আবেদনে যে সাড়া দেয় না, সে কখনো জীবনে প্রেমিকের আহ্বান শুনতে পায় না, ঈশ্বরের আশীর্বাদও তার উপর বর্ষিত হয় না।

[গ্রুসা শিশুটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার দিকে ঝুঁকবে।]

একথা শুনে সে ফিরলো, তার দিকে চেয়ে রইলো, তার পাশে বসে পড়লো অল্প সময়ের জন্য। সে ভাবলে, সে ততোটা সময় বসে থাকবে যতক্ষণ না শিশুর মা বা অন্য কেউ এসে যায়।

[একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে গ্রুসা শিশুটিকে দেখতে থাকলো।]

তারপরে সে চলে যাবে, চারদিকে ভয়াবহ ব্যাপার ঘটছে, সারা শহরের বুকে আগুন জ্বলছে, চারদিকে চীৎকার।

[আলো কমে আসছে, মনে হচ্ছে সন্ধ্যা এবং রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।]

ভালো হবার প্রলোভনও তো কম নয়!

[গ্রুসা এবার ঠিকঠাক হয়ে বসলো সারারাত শিশুটিকে পাহারা দেবার জন্য। একবার একটা ছোট বাতি জ্বেলে সে বাচ্চাটাকে দেখে নিল। আরেকবার একটা কোট নিয়ে তাকে ভালভাবে ঢেকে দিল। মাঝে মাঝে সে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলো এবং এদিক্-ওদিক্ নজর দিয়ে দেখলো কেউ, এদিকে আসছে কি না।]

এইভাবে দীর্ঘসময় সে শিশুর পাশে বসে রইল। সন্ধ্যা হল, রাত্রি এল, তারপর আকাশে সকালের আলো ফুটে উঠলো, দীর্ঘসময় সে বসে রইল। বহুক্ষণ ধরে দেখতে লাগলো বাচ্চাটার নিঃশ্বাস ফেলা, তার ছোট দুটি হাতের মুষ্টি, শেষে ভোরের দিকে তার প্রলোভন বেড়ে উঠলো, সে উঠে দাঁড়ালো, নুয়ে পড়ে একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বাচ্চাটাকে তুলে নিল এবং বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

[কথক যেভাবে বর্ণনা দিচ্ছে গ্রুসা সেইমতই ব্যবহার করবে।]

দস্যু যেমন করে লুণ্ঠন করে, গ্রুসা সেইভাবে বাচ্চাটাকে নিয়ে পালিয়ে গেল চোরের মতন।

ক্রমশঃ

মৃত্যু-দণ্ড

বিমলাংশুপ্রকাশ রায়

সুপ্রকাশ বি এস্‌ সি পাশ করবার পর তিন রাস্তার মোড়ে এসে যেন পড়েছিল। এম এস্‌ সি পড়বে, না চাকরীতে ঢুকবে, না সাহিত্যচর্চ্চায় মসগুল হবে? শেষোক্ত পথটাই যেন টানছিল বেশী—কী যেন একটা সম্মোহনী শক্তি পথটাতে! কিন্তু শেষপর্যন্ত বিচার ক'রে বেছে নিতে হয়েছিল মধ্যপথটা—বুদ্ধের বাণীর নির্দ্দেশে নয়, নির্ম্মম বাস্তবতার তাগিদে। আজ কাজে না ঢুকলে কাল খাবে কি? লৌহকারখানার রাসায়নিক হয়ে ঢুকলো লৌহ-সংকল্প নিয়ে।

কিন্তু চাকরীতে ঢুকেই মন যেন বলতে লাগলো—উহুঁ ঠিক হলো না; বিশাল কারখানার নিরন্তর বিকট গর্জ্জন, রাত্রিদিন বিরামহীন রাবণের চিতার প্রজ্বলন, পাগলপ্রায় লোকগুলোর হর্‌দম্‌ দিক-বিদিক উদ্ধাবন—এ কী প্রহসন!

যাই হোক, জলে যখন নামা গেছে, তখন কৌশলে কুমীরের সঙ্গে ভাব ক'রে থাকাই সমীচীন। সুপ্রকাশ স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলে মরুভূমির মাঝে মাঝে মরূদ্যান আছে। কেমিষ্টরা সকলেই নিছক গাধাবাধা পথিক নয়। বাঁধা পথে চলতে চলতে মাঝে মাঝে পথ-ভোলা, পথ ভুলে মরে ফিরে এবং সেই জন্যেই আছে বেঁচে।

কেমিষ্টরা স্যাম্প্‌ল্‌ পায়, তুরন্ত্‌ অ্যানালিসিস্‌ ক'রে রিপোর্ট পাঠায়। কিন্তু স্যাম্প্‌ল্‌ আসতে যখন দেরী হয় তখন লাইব্রেরীতে গিয়ে বই নাড়াচাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য অবসর পায়, তখন নানা আলোচনাও চলতে থাকে। সুপ্রকাশ লক্ষ্য করলে, সেই সব আলোচনার বিষয়বস্তু ও মন্তব্যগুলো খুবই উঁচু দরের। কিন্তু আজ যা বলা হলো কাল তা ভোলা গেল। এই ভাবে চলছে। সুপ্রকাশ ভাবতে লাগলো, কাদুষগুলোকে বেঁধে কাজে লাগানো যায় কি না। ভেবে ভেবে সে এক কাজ করলো: একটা নতুন ফ্ল্যাট্‌ ফাইল্‌ গোপনে এনে তার প্রথম কাগজ যেটা গাঁথলো তাতে লিখলো—"রোজ যে সব আলোচনা এই লাইব্রেরীতে হয়ে থাকে তা প্রায়ই খুব উঁচুদরের কিন্তু তা সবই উবে যায়। সেইগুলোকে ধরে রাখবার ব্যবস্থা এই ফ্ল্যাট ফাইল্‌। যার যা বক্তব্য তা বাড়ী থেকে বেশ গুছিয়ে লিখে এনে এই ফাইলে অপরের অগোচরে গেঁথে দেও এবং লেখকের নামটাও যেন না থাকে। ইচ্ছা হয় ত ছদ্ম-নাম চলতে পারে।" ফাইলটা যে কে রেখে দিলে আর ঐ অভিনব আদেশ বা মিনতি ঝাড়লে তা কেউ টের পেল না। 'কে? কে? কার কীর্ত্তি?' এই রবই চললো প্রথম দিন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল—দু'টি লেখা কখন যে এসে জুড়ে বসেছে ফাইলের বুকে তা কেউ টের পায় নি। কে কে যে লিখেছে কে জানে? লেখকের নাম নেই। লেখা দুটির মধ্যে সাহিত্য-সম্ভোগের মূল ছিল এবং কিছুটা হুলও ছিল। মেঘনাদের অলক্ষ্য বাণের মতো নামহীন মন্তব্যের মোহ ছিল। তাই দেখা গেল তৃতীয় দিন আরও চারটি লেখা এসে ফাইলের বুকে বাসা বেঁধেছে। কে কে লিখেছে কে জানে? কিন্তু চাঞ্চল্য চরম।

এক মাসের মধ্যেই এত উঁচু দরের বেনামী লেখা জুটে গেল যে তখন সকলেরই মনে হতে লাগলো, ল্যাবরেটরী থেকে একটা মাসিকপত্র ছাপা হোক যাতে করে লেখাগুলোর প্রতি সত্যিই একটা সুবিচার

হবে। কিন্তু কাগজ ছাপা মানে টাকার ধাক্কা। তার কি হবে?

সুপ্রকাশ কাজে যোগ দেবার মাস দুই পরেই একজন কেমিস্ট বন্ধু হঠাৎ এসে বললে, "দুটো টাকা দিতে পার ভাই?" সুপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে দুটো টাকা তাকে দিল। সেই দিন ছুটীর একটু আগে সেই বন্ধুটি কয়েকজন বন্ধুর কাছে নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়ে দিল ছুটীর পর যেন চায়ের দোকানে যায়, যেহেতু তাদের "বেপরোয়া অ্যাসোসিয়েশনে" আজ একটি নতুন সভ্য যোগ দিয়েছে। অবিশ্যি সুপ্রকাশকেও নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং সে চায়ের দোকানে পদার্পণ করতেই মহা সমারোহে সকলে তাকে সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে বসে গেল। সে তখন বুঝলো বে-পরোয়া অ্যাসোসিয়েশন ব্যাপারটা কি। টাকা দুটো বন্ধুকে ধার দেওয়া হয় নি—হয়েছে বেপরোয়া অ্যাসো-সিয়েশনে চাঁদা দেওয়া।

এখন, কেউ কেউ প্রস্তাব করলে মাসিকপত্রটা ছাপার জন্যে টাকা এই বেপরোয়াভাবেই তোলা হোক। কিন্তু রতনমণি ব'লে যে ধীর স্থির কেমিস্ট ছিলেন, যিনি ছিলেন নিরামিষাশী এবং খদ্দর প'রে ল্যাবরেটরীতে আসতেন, যাঁকে সমীহ করতো সবাই, তিনি বললেন—না, তা হবে না; সাহিত্য হলো সৎ সৃষ্টি, তা ঐ অসদুপায়ে তোলা অর্থের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে দেবো না। তিনি প্রকাশ্যে চাঁদার খাতায় টাকা তুলতে লাগলেন এবং তাঁরই চেষ্টায় অচিরেই প্রচুর অর্থ-সংগ্রহ হলো। তিনিই মাসিকপত্রটার নামকরণ করলেন "উড়ো খই" এবং তাঁরই সম্পাদনায় মাসে মাসে প্রকাশ হতে লাগলো 'উড়ো খই'। গ্রাহক ও পাঠক বিস্তর জুটে গেল। এই মিতভাষী অমিতব্রতী রতনমণির হাতে কাগজখানি পড়ায় সুপ্রকাশ তৃপ্তিবোধ করলো। রসহীন লোহকারখানার অভ্যন্তর থেকে এই রাসায়নিকদের সাহিত্য-রস পরিবেশন চলতে লাগলো।

যাই হোক, এই সাহিত্য-চর্চা হলো তাদের মস্তিষ্কের বাই-প্রোডাক্ট। তাদের প্রধান কর্তব্য অ্যানালিসিস্ কার্য যথারীতি চলতেই থাকলো। সেই কাজে হঠাৎ একদিন মহাচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো: গলিত ইস্পাতের চুল্লী থেকে স্যাম্প্‌ল্ এলো তিনটি—যার শুধু ফস্‌ফোরাসের পারসেন্টেজ বার করতে হবে এবং খুবই তাড়াতাড়ি। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একটু পরেই চুল্লীর ফোরম্যান্ নিজে এসে হাজির ফসফোরাসের রেসাল্ট জানতে। অ্যানালিসিসে দেখা গেল ফসফোরাসের পার্সেন্টেজ আশ্চর্যরকম বেশী। ফোরম্যান শুনেই বললেন—'সর্বনাশ' এবং পরক্ষণেই চীফ কেমিস্টকে নিয়ে নিভৃত কামরায় প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁরা বেরিয়ে এসে সকলকে বলে দিলেন—ব্যাপারটা যেন চাপা থাকে।

যাই হোক, "উড়ো খই"-এর একটা সংখ্যায় একটা গল্প বেরুলো অতি মর্মান্তিক। লৌহ-কারখানা নিয়েই গল্পটা। গল্পটা এই:—চুল্লীর কাজে বহু মুটে মজুর কাজ করে। একদিন হঠাৎ দেখা গেল একটা মজুর নিখোঁজ। এসেছিল কাজে, সবাই দেখেছে কিন্তু গেল কোথা? যেখানে গেছে বলে সন্দেহ হলো সেই গলিত ইস্পাতের চুল্লী থেকে স্যাম্প্‌ল্‌ এনে দেখা গেল—হাই ফস্‌ফোরাস্। সর্বনাশ! মনুষ্যদেহের ফস্‌ফোরাস, নিশ্চয়!

এই গল্পটা কে লিখলো জানা গেল না অনেক চেষ্টা করেও। কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। জানালেন তাঁরা, লেখককে শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু লেখক যে কে তা ত জানাই যাচ্ছে না। যাই হোক, শাস্তি দেওয়াই হলো—একেবারে চরম শাস্তি—মৃত্যুদণ্ড। "উড়ো খই" পেল দণ্ডটা। কাগজখানি বন্ধ ক'রে দিলেন তাঁরা। উড়ে এসেছিল 'উড়ো খই' আবার উড়ে গেল!

অন্তর্ব্বর্ত্তী নির্ব্বাচন

বিধুভূষণ জানা

এই নির্ব্বাচন জনতা চায় নাই। গদিচ্যুত বেকার নেতাদের এবং নেতাদের দ্বারা পরিপুষ্ট কোন কোন সংবাদপত্র এই নির্ব্বাচনে বেশী উৎসাহী। জনসাধারণ গণতন্ত্র চায়; কিন্তু স্বৈরতন্ত্র চায় না। দেশবাসী সমাজতন্ত্রও চায়—যাহা ভারতের নিজস্ব সমাজতন্ত্র। তাহারা অজ্ঞ জনসাধারণের নিছক মন-মাতান তন্ত্র চায় না—যাহা ২০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে, কিংবা ৯ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে প্রমাণ হইয়াছে। উহাকে যথার্থই স্বৈরতন্ত্র এবং দলীয়তন্ত্র ব্যতীত আর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না।

হিন্দুমহাসভা, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র পার্টি এবং আরও সংস্থা এই পশ্চিমবঙ্গে আছে, তাঁহারাও এই নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন। বস্তুতঃ প্রথম তিনটি সর্ব্বভারতীয় দলের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমিতির মূলনীতি ও কর্ম্মসূচী মূলতঃ এক এবং পরস্পর সহযোগী।

ভারতীয় কংগ্রেস যাহা সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, তাহা ১৯৪৭-৫২ সালের মধ্যে ক্রমান্বয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। কমিউনিষ্টদল রাশিয়া-চীনের অনুগামী। সমাজবাদী নামে দলগুলি ভারতীয় সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর যে সকল ক্ষুদ্র দল ও নেতা আছেন—তাহা তাঁহাদের নিজস্ব এক একটা এলাকার অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, যে যার নির্দ্ধারিত এলাকায়—শুধু ব্যক্তিগত প্রতিভার ভিত্তিতে। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে শেষোক্ত দলগুলি কংগ্রেসকে পরাজিত ও গদিচ্যুত করিবার জন্য একত্রিত হইয়া যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত হইয়াছে কিন্তু বিগত নির্ব্বাচনের সময় হইতেই এই দলগুলি যে যার পৃথক্ সত্তা ও অস্তিত্বকে অটুট রাখিয়াছেন। বিগত নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যুক্তফ্রন্টের কোন ইস্তাহার বা কর্ম্মসূচী প্রকাশ হয় নাই। নির্ব্বাচনের পর ১৮ দফা স্থির হইয়াছিল। এবারে এখনই (সর্ব্বপ্রথমে) ৩২ দফা স্থির হইয়াছে।

কিন্তু ইহারা এখনও একদল বলিয়া পরস্পর আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই, এবং কোন্ দলের বা দলপতির কি মতবাদ তাহাও প্রচার হয় নাই। প্রত্যেকের দলের পৃথক্ সত্তা ও মতবাদকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ইহারা কখনও ১৮ দফায় এবং কখনও ৩২ দফায় যুক্ত হইতেছেন। এই দফাগুলিও জনতার নির্দ্ধারিত অথবা জনতার প্রয়োজনে নয়। এই পরিকল্পিত দফাগুলিকে কার্য্যকর করিবার জন্য "যুক্তফ্রন্টের সকলেই ফ্রন্টের মূল নেতাদের অধীনে (?) এই দফাগুলির স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করিবেন।" পত্রিকাগুলিও ইহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সমর্থন ও সাহায্য করিবেন। বস্তুতঃ জনতার যথার্থ প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করিবার অবকাশ না দিয়া, তাহাদের অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতার সুযোগ লইয়া কৃত্রিম পথে তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করিবার নাম বর্ত্তমান যুগের সমাজবাদ এবং গণতন্ত্র নামে খ্যাতি লাভ করিতেছে। এই অপকর্ম্মের জন্য বিদেশের সহানুভূতি ও বিদেশের টাকা পাওয়াও যেমন সম্ভব হইতেছে, তেমন অযাচিত সেই টাকার অপব্যবহার হওয়াও স্বাভাবিক, নিষ্ঠার অভাব সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক। ফল হইয়াছে শুধু স্বদেশের ও সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন।

যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কোন উক্তি নাই। তাঁহারা শুধু বলিতেছেন, হিংসার দ্বারা সমস্যার সমাধান হইবে না। উঁহারা শাসনকার্য্যে অযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন, কিন্তু ২০ বৎসর যাবতীয় দুর্নীতির,

কুশাসন ও শোষণনীতির প্রবর্ত্তনের জন্ম তাঁহাদের যে কুখ্যাতি তাহার জন্ম অনুশোচনা কিংবা তাহার সংশোধনের মনোভাব আদৌ ব্যক্ত হইতেছে না। তাঁহাদের এই প্রকার অনমনীয় নেতৃত্বে গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া আমরা দৃঢ় মত পোষণ করি।

যুক্তফ্রণ্ট বলিতেছেন, কংগ্রেস বুর্জ্জোয়া এবং ধনতান্ত্রিক; কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের ৩২ দফার মধ্যে একথা নাই কেন?—ভারতের আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী মাহিনা, ভাতা ইত্যাদি যে পরিমাণে নির্দ্ধারিত আছে, তাহার সিকি পরিমাণ মাত্র বরাদ্দ করা হইবে এবং ঐ টাকা সর্ব্বহারাদের দান করিয়া স্থায়ীভাবে তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হইবে। বাংলার সরকারের খাসদখলে ইংরেজদের সময় হইতে যে দশ লক্ষ একর এবং সমগ্র ভারতে ৮ কোটি একর আবাদযোগ্য ভূমি অনাবাদী অবস্থায় আছে (এক বৎসর পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় কৃষিদপ্তরের প্রকাশিত সংবাদ হইতে সংগৃহীত), তাহাকে আবাদযোগ্যরূপে সংস্কার করিয়া বাংলার ভূমিহীনদের এবং কৃষিকর্মীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিব। কই, ঐ সমাজবাদী দল ত এখনও এই কথা বলেন নাই যে, দেশে ও বিদেশে স্বনামে অথবা বেনামে অসৎ উপায়ে অর্জ্জিত ও সঞ্চিত অর্থ ও স্বর্ণ উদ্ধার করিয়া দেশবাসীর খাদ্য ও বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্য্যে ও কুটির শিল্প বিস্তারের কার্য্যে বিনিয়োগ করিব। চোরা-কারবারীদের পি ডি এ্যাক্টে আটক করিয়া তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিব—এমন দৃঢ় সঙ্কল্পের ঘোষণাও নাই। ১৯৬২ সালে দেশরক্ষা তহবিলে দেশবাসীর দান—যাহার পরিমাণ প্রায় ৪০ কোটি নগদ টাকা এবং প্রায় ৮৫ হাজার তোলা স্বর্ণ উদ্ধার করিয়া দেশের উন্নয়ন কার্য্যে বিনিয়োগ করিব। সর্ব্বপ্রকারে সরকারী অপব্যয় বন্ধ করিয়া দেশবাসীকে শোষণমুক্ত করিব। জনতাকে খাদ্য-বস্ত্রের শাসন ও তাহার মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধ করিব ইত্যাদি জনতার যে যথার্থ প্রশ্ন তাহার সমাধান নাই কেন? বস্তুতঃ এই মূল ত্রুটি সংশোধন ব্যতীত যে কোন উন্নয়নের জন্ম টাকা সঙ্কুলান হইতেছে না বলিয়া শোষণ বৃদ্ধি করা হইতেছে—ইহা জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়।

সমাজবাদী তথা গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রণ্টের ৩২ দফা কর্ম্মসূচীর মধ্যে এই সকল একান্ত বাঞ্ছনীয় প্রশ্ন নাই। তৎসম্বন্ধে অনেকে এই ধারণা পোষণ করে যে, প্রবন্ধের ১ম দফা সকল দলের জন্মই স্থিরীকৃত আছে; সুতরাং তাহা একদা নিজেদের দলেরও উপভোগ্য। এখন তাহার বরাদ্দ হ্রাস করিলে, তাহা পরবর্ত্তীকালে আর বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে না; দ্বিতীয়তঃ উহা সমাজবাদের একান্ত প্রশ্ন হইলেও, প্রকাশ পাইলে এখনই দিল্লীশ্বরীর সমর্থন ও মঞ্জুরী বন্ধ হইয়া যাইবে। ২য় দফাকে কার্য্যকরী করিলে ঈর্ষাভিত্তিক সমাজবাদ কিংবা গ্রামাঞ্চলে আবাদী জমির উপর কৃষি-শ্রমিক, ভাগচাষী ও ভূমিহীনদের লইয়া সস্তায় যে রাজনীতি তাহা শুদ্ধ হইয়া যাইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ হইতে টাকার আমদানীও বন্ধ হইয়া যাইবে। ৩য় দফার স্থির ও দৃঢ়সঙ্কল্প ঘোষণা করা অসম্ভব। কারণ ঐ পর্য্যায়ে দুই প্রধান দল আদৌ নিষ্কলঙ্ক নয়। সমগ্র ভারত ও ভারত-সীমান্তব্যাপী এই উভয় দলের অনুগামী ও সমর্থক ছড়াইয়া থাকায় চোরা-কারবারের সকল পথ ও প্রণালী ইহাদের কাহারও অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। কণ্ট্রোল ও চোরাকারবার ওতপ্রোতভাবে একসূত্রে সংশ্লিষ্ট থাকায় পার্টি বা ব্যক্তি বিশেষের উহা যৌথ সঞ্চয়ভাণ্ডারে পরিণত হওয়ায়, উহার সমাধানের পথটিও অনন্তকাল যাবৎ ঐ প্রকারে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। অবশিষ্ট দফাগুলি কার্য্যকর করিতে চেষ্টা করিলে এই দলটি সর্ব্বদিক্ হইতে অর্থনৈতিক অবরোধে অবলুপ্ত হইবে এবং সরকারী পর্য্যায়েও বে-আইনী ঘোষিত হইতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস প্রসঙ্গে এই প্রকার সমস্যা নাই, তাঁহারা এখনও ক্ষমতাসীন আছেন এবং ২য় পক্ষ বিভিন্ন সূত্রে তাহাদের একান্ত সহযোগী থাকায় তাঁহাদের প্রভাব ও প্রাপ্তিযোগ সর্ব্বসূত্রে পরিব্যাপ্ত। ফ্রণ্টের ৩২ দফায় এই সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া "ভণ্ড হিংস

ও ধ্বংসাত্মক কাজের প্রেরণায় একমাত্র কমিউনিষ্টদলের পুষ্টিসাধনের উদ্দেশ্যে শ্রেণী বিশেষের আকর্ষণ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং অপর সকল দল তাহা সমর্থন করিয়াছে।

মধ্যবর্তী পরম সুবিধাবাদী যে দল বা ব্যক্তিরা আছেন, তাঁহারা সাধারণতঃ বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে নির্বাচনে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের ভোট ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিধানসভায় তর্ক-বিতর্ক, ময়দানে জনসমাবেশ, মিছিলের ব্যবস্থাদি সমস্তই এক একটি চমক। ইহার দ্বারা জনমতের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা হয়। ইহাতে ন্যায় নীতি ও আদর্শের কোন বালাই নাই। নির্বাচনে প্রতিযোগিতা হয় কেবল মাত্র গদির জন্য। স্বয়ং নেহরু এই গদির মোহকে বাড়াইয়া গিয়াছেন। দায়িত্ব অপেক্ষা ভোগের লালসাকে বাড়াইয়া গিয়াছেন। দুই প্রধান দলের মধ্যে যে নির্বাচনী প্রতিযোগিতা চলিয়া আসিয়াছে এবং বিরোধী পক্ষের ভূমিকা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা বহু ক্ষেত্রে নিছক ধোঁকাবাজী এবং ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা (sports) বিশেষ। ইহাদের এই প্রতিযোগিতা আদৌ আদর্শগত বলিয়া প্রমাণ হয় নাই। বস্তুতঃপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী পক্ষের ভূমিকা শূন্য ছিল। ২০ বছরের এই গতানুগতিক রাজনীতিতে দেশের ও জনতার কোন কল্যাণ হয় নাই।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার বাতিল হইবার সময় হইতে তাহারাই ব্যাপকভাবে গণতন্ত্রের দাবী জমাইয়াছেন; কিন্তু এই ৩২ দফা জনতার অনুমোদিত নয়, পরন্ত তাঁহারাই ঐ দফার অনুকূলে জনতাকে পরিচালনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। দফাগুলির বিবরণে প্রকাশ যে, কোন ক্ষেত্রে কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে, আবার কোন ক্ষেত্রে জনতাকে পরিচালনা করিয়া আন্দোলন ও বিপ্লব সৃষ্টি করিয়া সংবিধান ও আইন বরবাদ করা হইবে। ইহাদের মূল নীতি নিবদ্ধ আছে সাধারণের সম্পদ্, শিল্প ও কৃষি-ক্ষেত্রের উপর। যেমন জোতদারের সম্পদ্ বাজেয়াপ্ত করা হইবে, দেবত্তর ও প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে (কিন্তু বেনামী কোম্পানী হইলে তাহার সম্পত্তি থাকিবে)। চাষের ক্ষেত্রে ভাগচাষী অক্ষম ও অসৎ হইলেও পুরুষানুক্রমিক অধিকার পাইবে (মন্ত্রী ও এম এল এদের ক্ষেত্রেও এই একই সমস্যা—কোন কারণেই তাহাদের পরিবর্তন করা চলিবে না, উহাতে তাঁহাদের জীবনস্বত্ব ও পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব জন্মাইয়া গিয়াছে)। কৃষক ও মালিকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে—যে কোন ঘটনা ঘটিতে থাকিবে; কিন্তু উহাতে তৎক্ষণাৎ পুলিশ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। ব্যাখ্যা কার বলিতেছেন, কে অন্যায় করিয়াছে, তাহা সরকার বিবেচনা করিয়া দেখিবে। হিংসাত্মক কার্য্য ঘটিলে, কোন্‌টি হিংসাত্মক আর কোন্‌টি হিংসাত্মক নয়, তাহাও স্থির করিবে ঐ সরকার বা দল—পুলিশের হাতে সে দায়িত্ব দেওয়া হইবে না। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে বিগত নকশালবাড়ীর ঘটনাকে স্বাগত জানান হইয়াছে। ৩২ দফায় যুক্তফ্রণ্ট পরোক্ষে ইহাও বলিয়াছেন যে, অনেক লোক (দুর্বৃত্ত হইতেও পারে) একত্রিত হইয়া যে দাবী উত্থাপন করিবে (বে-আইনী বা জাতীয় স্বার্থবিরোধী হইতেও পারে), তাহাকে ঐ সরকার বা দলে "গণআন্দোলন" বলিয়া সমর্থন করিবে—তাহা ন্যায় কি অন্যায়, তাহা বিচার করিবে এইদল বা দলের নিযুক্ত কমিটি (?)। পুলিশ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

রাজ্যে ব্যাপকভাবে কোথাও বৈপ্লবিক ঘটনা কিছু সৃষ্টি হইলে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকিবে, রাজ্যের সরকারের (অর্থাৎ বিভাগীয় মন্ত্রীর) নিকট সেই ঘটনার কাহিনী পৌঁছাইলে, অথবা তন্নিমিত্ত দলীয় কমিটির নিকট ঘটনার কাহিনী প্রাথমিক শুনানী হইলে, তাহা ন্যায়-অন্যায়, হিংসাত্মক কি হিংসাত্মক নয় তাহা বিবেচনা ও বিচারাধীন হইবে। এই পদ্ধতিতে প্রতিকার পাইবার জন্য যে সময় প্রয়োজন হইবে, তাহার মধ্যে যথার্থ যে দুর্বলপক্ষ (সাধারণতঃ ভূমির মালিক এবং সম্পত্তিপন্ন ব্যক্তিরা দুর্বল, কারণ তাঁহারা সংখ্যায় লঘিষ্ঠ ও নিরীহ) সে নিঃশেষিত হইবে। বর্গাদার আইনে, বর্গাদার অসৎ ও অসমর্থ হইলেও ভূমির মালিককে সীমিত আয়ের অংশ দিতে, কিংবা তাহার জন্য ক্ষতিস্বীকার করিতে

জনসাধারণের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে

যোগ দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করুন

ভারত সরকার এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড চালু করেছেন। ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলিতে ফাণ্ডের চাঁদা জমা নেওয়া হয়।

চাঁদা জমা দেওয়ার পদ্ধতি

বার্ষিক নিম্নতম ১০০ টাকা এবং উচ্চতম ১৫,০০০ টাকা পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যায়। ৫ টাকার গুণিতকে যত টাকা খুসী, যে কোন সংখ্যক কিস্তিতে, যে কোন সময়ে জমা দেওয়া যেতে পারে। তবে মাসে একটার বেশী কিস্তি জমা দেওয়া যাবেনা। বর্ত্তমান বছরে যে টাকা জমা দেওয়া হবে তার ওপর শতকরা ৪.৮ টাকা সুদ দেওয়া হবে।

করে রেহাই

আয়কর আইন অনুযায়ী, করযোগ্য আয়ের ওপর যে সব রেহাই পাওয়া যায়, এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে যে টাকা জমা দেওয়া হবে তাতেও সেই রকম রেহাই পাওয়া যাবে। সুদের ওপর কোন আয়কর নেওয়া হবেনা। এই ফাণ্ডে যে টাকা জমা থাকবে তার ওপর সম্পদ কর নেওয়া হবেনা।

জমা টাকা ওঠানো এবং ঋণ নেওয়া

১৫ বছর পর, ফাণ্ডে জমা সম্পূর্ণ টাকা ওঠানো যাবে। ঐ সময়ের মধ্যে জমাকারীর যদি মৃত্যু হয় তাহলে তাঁর মনোনীত ব্যক্তি বা আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীকে সম্পূর্ণ টাকা প্রত্যর্পণ করা হবে। এই ফাণ্ডে যে টাকা জমা দেওয়া হবে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ ওঠানো যাবে বা ঋণ হিসেবে নেওয়া যাবে।

ক্রোক করা যাবেনা

এই ফাণ্ডে যে টাকা জমা থাকবে, কোন আদালতের নির্দ্দেশে তা ক্রোক করা যাবেনা।

চিকিৎসক, আইনজীবী, অভিনেতা এবং ব্যবসায়ীর মতো স্বাধীন বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ এমন কি পেন্সনভোগীগণও এখন স্বেচ্ছায় একটা প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের মাধ্যমে সঞ্চয় করার সুযোগ পাবেন এবং এতে করেও যথেষ্ট রেহাই পাওয়া যাবে।
আরও বিবরণের জন্য ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া এবং এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জনসাধারণের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড

জনগণের কাছে একটি বর স্বরূপ

অর্থ মন্ত্রক, ভারত সরকার

বাধ্য করা হইবে। কৃষিজীবিদের ভূমির সীমাও স্বত্বকে আরও খর্ব্ব করা হইবে। শিক্ষাকে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আর একটি দলীয় শিবিরে পরিণত করিয়া সম্পূর্ণ শিক্ষা সংহারের, অর্থাৎ নিছক বৈপ্লবিক শিবিরের ব্যবস্থা করা হইবে।

যুক্তফ্রন্ট আরও বলিয়াছেন যে, শিল্পক্ষেত্রেও উপযুক্ত (?) কারণ ব্যতীত কারখানার মালিকরা কারখানা বন্ধ রাখিলে তাহাদের শাস্তিদানের ব্যবস্থা করা হইবে। কৃষকের স্বার্থে (?) জমিদারী দখল ও ভূমি-সংস্কার আইনের সংশোধন করা হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুরা যাহাতে ভারতের পূর্ণাঙ্গ নাগরিকের অধিকার লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হইবে। ধান-চাউলের ব্যবসা একচেটিয়া রাষ্ট্রীয়করণ এবং খাদ্য-শস্যের নিয়ন্ত্রণ থাকিবে। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত এই সকল কর্ম্মসূচীতে কাহারও কোন বিষয়ে নিশ্চয়তা নাই এবং উহা সু-শাসন কার্য্যের উপযোগী বুদ্ধি বিবেচনা-প্রসূতও নয়। বস্তুতঃ যে সকল সমস্যা সমাধানের উপর জাতীয় কল্যাণ নির্ভর করে, সেই আদর্শ ও আদর্শবান্ ব্যক্তি যদি প্রশাসন ক্ষেত্রে না থাকে, তবে সমস্যা আরও পরিবর্দ্ধিত হইবে—ইহা অনস্বীকার্য্য।

সাংবাদিকদের কেহ কেহ এই ৩২ দফা কর্ম্মসূচিকে বাস্তবভিত্তিক বলিয়া সমর্থন জানাইয়াছেন। নিছক এই প্রকার সমর্থনে সমস্যা ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহারা যথার্থ "বাস্তবভিত্তিক" দৃষ্টিভঙ্গীতে সরকারী দখলে আবাদযোগ্য ভূমির সংস্কার-সাধনের দিকে চাপ সৃষ্টি করিলে এতদিনে তাঁহাদের সমস্যার সুসমাধান হইতে পারিত। সমগ্র বাংলার অধিবাসীর জীবনকে ও সমস্ত দেশকে এই প্রকারে তছনছ করিবার আবশ্যক হইত না; অধিকন্তু খাদ্য-শস্যের উদ্বৃত্তিও ঘটিত। নির্দ্দিষ্ট একটি দলের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি অন্ধসমর্থনে ও জাতীয়তাবাদী বিচার-বিবেচনার অভাবে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আজ সম্পূর্ণ ধ্বংস ও পরনীতির অধীন হইতে চলিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে, বাংলার ল্যাণ্ড রেকর্ডস বিভাগের কর্ম্মচারীগণ নয়মাস বহু পরিশ্রম করিয়া জোতদারদের দ্বারা অবৈধ উপায়ে সংরক্ষিত ৮১,৪৬৯,৫৪ একর আবাদী জমি উদ্ধার করিয়াছেন। আজ যুক্তফ্রন্ট বলিতেছেন, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পূর্ণাঙ্গরূপে ভারতের নাগরিক অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। আজ ইহা বলিতে দ্বিধা নাই যে, ঐ সকল উদ্বাস্তুদের ইচ্ছা করিয়াই রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যে যে যার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী ব্যবস্থায় পরিপোষণ করা হইয়াছে। ইহাদের যে ভূমিক্ষুধা তাহা নিবারণের জন্য উপরোক্ত ল্যাণ্ড রেকর্ডের কর্ম্মচারীদের, যদি প্রশ্ন করা যায় যে, তাঁহাদের খাসদখলে আবাদযোগ্য ভূমি অনাবাদী ও বসতিশূন্য অবস্থায় কত জমি পড়িয়া আছে এবং কেন এতকাল তাহার সংস্কারের ব্যবস্থা করা হয় নাই? (কোন দল বা পত্রিকা এ প্রশ্ন করিয়াছে বলিয়া জানা নাই।) সম্ভবতঃ তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর বা উৎসাহ পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ তাঁহারা জোতদারদের যে জমি উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আদৌ অপহৃত অথবা অবৈধ উপায়ে সংরক্ষিত সম্পত্তি নয়, তথাপি এই শ্রেণীকে অযথা মামলায় ও সংগ্রামে লিপ্ত করিতে দ্বিধা করেন নাই। যাঁহারা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবেন, কেবল তাঁহারাই সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত হইবেন এবং যাঁহারা মামলার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাও সর্ব্বস্বান্ত হইবেন, কারণ সরকার প্রবল পক্ষ এবং দলীয় শাসনাধীনে। সরকারী কর্ম্মচারীরাও বর্ত্তমানে রাজনৈতিক দলে বিভক্ত—সুতরাং প্রশ্ন জাগে এই কর্ম্মচারিবৃন্দ কোন দলের অন্তর্ভুক্ত? সরকারী কর্ম্মচারীদের সর্ব্বতোভাবে দলনিরপেক্ষ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদের সততা ও সৎপরামর্শের উপর সমগ্র দেশবাসীর, তথা দেশের কল্যাণ নির্ভর করে।

যথার্থই যুক্তফ্রন্টের উপর সর্ব্বত্রে জনতার শ্রদ্ধা ও সমর্থন নাই। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে সমর্থন ছিল বা এখনও আছে, তাহা ঐ ৩২ দফা অথবা ১৮ দফার আনুগত্যে নয়—তাহার মূল কারণ রাজনৈতিক

কোন্দল। তথাপি ঐ দলের দলগত জয়ের সম্ভাবনা বেশী। কারণ ৩২ দফায় নকশাল বাড়ীর ঘটনাকেই পরোক্ষে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর আর সামান্য সময় ঐ সরকার ক্ষমতায় থাকিবার অবকাশ পাইলে, তাহাম পশ্চিমবঙ্গে যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল, তাহাই এবারের নির্দ্ধারিত নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে একমাত্র যুক্তফ্রণ্টের বাক্সে অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় ভোট পৌছাইবে।

২য় পক্ষ মুখ্যতঃ কংগ্রেস। তাহার প্রধান ভূমিকায় এখনও যাঁহারা আছেন, তাঁহারা এখনও কেন্দ্রের সমর্থক এবং পরস্পরের সমর্থক। দলের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইলেই নানা অপ্রিয় কৈফিয়তের সম্মুখীন হইবার আশঙ্কায় দিল্লী রক্ষা ও মানরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে এই ৩২ দফার অনুকূলে থাকিতে হইয়াছে। এজন্য দেশ বা প্রতিষ্ঠান জাহান্নামে যাউক—কিন্তু নীতির পরিবর্ত্তন করা যাইবে না। ঐ নীতি দিল্লীর সমর্থিত এবং অবাঙ্গালী ও বিদেশীর সমর্থিত সারা বাংলার অধিকাংশ কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে (৬।৭।৬৮) খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত মেদিনীপুর জেলা-কংগ্রেসের একটি প্রস্তাব যাহা একান্ত ভাবে জনতার প্রস্তাব—"সর্ব্বপ্রকার বাধা-নিষেধ উঠাইয়া সারা রাজ্যে ধান ও চাউলের খোলা বাজার সৃষ্টি করিয়া ধান ও চাউলের মূল্যের স্থিতিশীলতা আনয়ন করা হউক। ইহা ব্যতীত আন্তঃরাজ্য বাধা-নিষেধও উঠাইবার ব্যবস্থা করা হউক।" কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বহু প্রস্তাবের মধ্যে এই প্রস্তাবটিকেই সর্ব্বাগ্রে উচ্চ ভাষণে বাতিল করিয়াছেন। তাহা না করিলে দুই দলের মধ্যে মনান্তর এবং ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহাদের বিশেষ লোকসানের সম্ভাবনা আছে। প্রতিষ্ঠানগত ভাবে যাঁহারা জয়যুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, অথবা যাঁহাদের কিছুটা জাতীয়তাবাদী মনোভাব, তাঁহারা নিশ্চয় ভুল নীতির সংশোধন করিতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা এখনও দেখা যাইতেছে না এবং একক কংগ্রেসের পক্ষেও জাতীয় স্বার্থরক্ষা, তথা দেশরক্ষার কোন সম্ভাবনা এখন আর নাই। কিন্তু যথার্থ জাতীয়তাবাদী অপর কোন সংগঠনকেও সরকার আদৌ সহানুভূতির চক্ষে দেখিতেছেন না। অবশ্য আমরা দলত্যাগীদের দ্বারা সদ্য নূতন দলের কথা বলিতেছি না—কারণ ইঁহারা পুরাতন নীতির সমর্থক থাকিয়া নিছক গদির প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রশাসনিক ক্ষেত্রের যা কিছু দুর্নীতি ও ত্রুটি, তাহাকে যুক্তফ্রণ্টের সকল সরিকের সঙ্গে ইঁহারা মিলিতভাবে ২০ বৎসর যাবৎ পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। ইঁহাদের দলে আজ যাঁহারা নবাগত তাঁহারা ইঁহাদের অনুগামী মাত্র। কংগ্রেসের মধ্যে যাহারা অভিযুক্ত, অযোগ্য অথবা যাহারা জীবনস্বত্বের দাবীতে, কিংবা পুরুষানুক্রমিক দাবীতে নির্ব্বাচন-প্রার্থী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি জনতার শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ নাই।

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন ভাষণ", শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মূল ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিয়াছেন শ্রীবিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত।

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে নিম্নগমন হইতে ফিরাইয়া উন্নতির পথে চালাইতে পারেন, জাতির তাহা হইলে আর কোন সভ্যতা-ও কৃষ্টি-বিলুপ্তির ভয় থাকে না। উদ্দেশ্য-ও লক্ষ্য-হীনভাবে সকলে মিলিয়া চিৎকার না করিয়া ব্যক্তিগত জীবনকে সুরুচি, সৌন্দর্য্য ও শক্তির আধার করিয়া তুলিতে পারিলে সেই ব্যক্তিসম্পদ্ মিলিত প্রবাহে একটা এমন বিরাটাকার ধারণ করে যাহা জাতিকে স্বভাবতই উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতরশিখরে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম করে।

অলিম্পিকে ভারতের প্রতিযোগিতা

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য বলিয়া যাহা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন তাহার অর্থ হইল এই যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করাটাই বড় কথা; হারজিতের কথাটা গৌণ। যে সকল জাতি অলিম্পিক ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করিতে যা'ন, তাঁহারা কখনই একথা ভাবেন না যে স্বর্ণ রৌপ্য বা ব্রঞ্জ পদক প্রাপ্তিই তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষ্য। ক্রীড়ায় যোগদান করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিজ নিজ ক্রীড়া-ক্ষমতার পূর্ণতম প্রকাশই আসল কথা। এইভাবে প্রতিযোগিতায় লাগিয়া থাকিলে ক্রমে ক্রমে খেলোয়াড়দিগের পক্ষে সেই শক্তি ও ক্রীড়া-কৌশল অর্জ্জন করা সম্ভব হয়; যাহাতে শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি সম্ভব হয়। ভারত (সরকার) কিন্তু এই নীতিই স্থির করিয়াছেন যে পদক আহরণই আসল উদ্দেশ্য এবং পদকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকিলে কাহাকেও অলিম্পিকে যোগদান করিতে দেওয়া হইবে না। কারণ বিদেশী মুদ্রা ব্যয় বন্ধ করা এত অবশ্য প্রয়োজন যে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির আগ্রহে ভারত সরকার অন্য সকল কথাই বিস্মৃতির গহ্বরে ঠেলিয়া রাখেন। এই কারণে ভারত সরকারের ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থা অথবা বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জনক্ষম কোন প্রচেষ্টা ব্যতীত অপর কোন কারণে কাহাকেও বিদেশে যাইতে দেওয়া হয় না। অলিম্পিকে ভারত সরকারের ব্যবস্থায় প্রায় কোন ক্রীড়াবিদ্‌ই যাইতে পারেন নাই। যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা পদকপ্রাপ্তির অন্তত কাছাকাছি পৌঁছাইবেন বুঝিয়াই তাঁহাদের মেক্সিকো যাতায়াতের টিকিট ক্রয় করিতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা কোন পদক পাইবেন বলিয়া মনে হয় না। শুধু হকি খেলাতে কিছু আশা আছে। কুস্তিতে হঠাৎ কিছু জুটিয়া যাইতেও পারে।

ইহা হইতে অনেক উত্তম হইত যদি ভারত সরকার নিজ শিক্ষা ও অর্থনীতি বিভাগগুলিকে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিষয়ে মত প্রকাশ করিতে না দিয়া ভারতের অলিম্পিক সভার হস্তেই সে ভার রাখিতে দিতেন। মোরারজি দেশাইএর বিদেশে গিয়া কর্জ্জা করিবার বিফল প্রয়াস বা ইউ. এন. এ.র আওতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত সরকারের বেতনভোগী বা অনাহারী বক্তাদিগের উদ্গার ব্যবস্থার জন্য যে বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করা হয় তাহার পরিমাণ হ্রাস করিয়া আরও অধিকসংখ্যক ভারতীয় ক্রীড়াবিদ্‌দিগকে মেক্সিকো যাইতে দিলে তাহা জাতির পক্ষে ভবিষ্যতে লাভজনক হইত। কারণ যদি কোন ক্ষেত্রে দেখিয়া শেখা রীতি হয় তাহা হইলে সেই পন্থার বিশেষ মূল্য ক্রীড়াক্ষেত্রেই দেখা যায়। বিগত কয়েকটি অলিম্পিকে ভারতীয়দিগের যোগদান শিক্ষা ও অর্থনীতির অঙ্গ বিবেচিত হওয়ায় উত্তরোত্তর ভারতীয়ের সংখ্যা অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় কম হইতে হইতে নগণ্যতার চূড়ান্তে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের যশ আহরণের সম্ভাবনা ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইবে।

বন্যা

বন্যার ফলে কত লোকের মৃত্যু হইয়াছে ও পরোক্ষভাবে কতলোক বন্যাপীড়িত হইয়া অর্দ্ধমৃত বা সর্বহারা হইয়াছে তাহার হিসাব এখনও হয় নাই। যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যেখানে শতের হিসাব হইতেছে সেখানে সহস্র লিখিত হইবে। এখন শুনা

যাইতেছে যে ভারত সরকার কি করিয়া এই মহা প্লাবন সকলের অজানা ভাবে আসিয়া পড়িল সেই বিষয়ে অনুসন্ধান ব্যবস্থা করিতেছেন ও তাহার পরে যাহাতে এইরূপ প্রলয় আর না ঘটিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ভারত সরকার অতি সাধারণ বিষয়ে যেরূপ দক্ষতা দেখাইয়া থাকেন ; যথা রেলগাড়ীর সংঘর্ষণ বা বিষাক্ত খাদ্য বা পানীয় ব্যবহারে মৃত্যু নিবারণ কার্য্যে ; তাহাতে মনে হয় যে এই অনুসন্ধান হইলে কাহারও কোন লাভ হইবে না। ভারত সরকার যে সকল অকারণ কারণে (বেআইনী আইন অনুকরণে) অর্থব্যয় করেন ও সেই সকল খরচ না করিয়া তাহার পরিমাণ অনুপাতে রাজস্ব আদায় কমাইতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে জাতীয়ভাবে তাহার ফল ভাল হইবে। ভারত সরকারের এখন 'পলিসি' হওয়া উচিত রাজস্ব আদায় কমান ও ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি হইতে দিয়া তাহা দ্বারা জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধি হইতে দেওয়া। সকলের উপরে চরমভাবে রাজস্বভার চাপাইয়া ভারত সরকার কোন কিছুই প্রায় পরিকল্পিতভাবে করিতে সক্ষম হইতেছেন না। এখন জনসাধারণকে সেই চাপ হইতে মুক্তি দিয়া দেখা প্রয়োজন; ব্যক্তিসামর্থ্যে কতটা কি হইতে পারে। বন্যাপীড়িতদিগের সাহায্য করিলে তাহাদিগের মঙ্গল হইবে। বন্যা নিবারণ চেষ্টায় কোন অর্থব্যয়ই ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

সাদা কালোর বিভেদ

ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদ যে সকল অধর্মের সৃষ্টি ও প্রচলন করিয়াছিল তাহার মধ্যে শ্বেতকৃষ্ণ বিচারে কৃষ্ণকায়দিগের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখন ইয়োরোপের সাম্রাজ্য আর নাই বলিলেই চলে কিন্তু বর্ণ-বিভেদ লইয়া অনাচারের শেষ হইয়াছে বলা যায় না। শেষ হইবার কোন লক্ষণও দেখা যাইতেছে না। আমেরিকায় কৃষ্ণকায়দিগের সহিত শ্বেতকায়দিগের কলহ প্রায়ই হিংস্রভাব ধারণ করে ও এই দাঙ্গায় শত শত ব্যক্তি হতাহত হয় ও লক্ষ লক্ষ ডলার সম্পদ্ অগ্নিসাৎ হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে এখন ব্রিটিশ ছাড়পত্র প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণ বর্ণ হইলে ব্রিটেনে আসিয়া বসবাস করিতে পারে না। পথে ঘাটে কৃষ্ণকায়দিগকে আহত ও অপমানিত হইতেও দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় কোন কোন সহরে একটা নূতন নিয়ম হইয়াছে যে রাত্রে সেই সকল সহর হইতে কৃষ্ণকায়দিগকে চলিয়া যাইতে হইবে। দিনে কাজ করিবার অধিকার থাকিলেও রাত্রিবাসের অধিকার কৃষ্ণকায়দিগের থাকিবে না। ইহা একটা নূতন রকমের অত্যাচার এবং ইহার তুলনা পাওয়া কঠিন। প্রাচীনকালে উত্তর প্রদেশের কোন কোন সহর হইতে সন্ধ্যা হইলে কোন কোন জাতির লোকেদের চলিয়া যাইতে হইত। তাহার কারণ ছিল, ঐ সকল জাতির লোকেদের অপরাধ-প্রবণতা। কৃষ্ণবর্ণ ঐ হিসাবে একটা অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে !

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান ঃ অধ্যাপক শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬১+৯২=১৫০। মূল্য ছয় টাকা।

বর্ত্তমানে প্রায়বিস্মৃত রেভারেণ্ড লালবিহারী দে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও তাঁহার লেখা Folk Tales of Bengal, Bengal Peasants, Life বা Govinda Samanta বইগুলি ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সকল পুস্তকের ভাষা হইতে ছেলেরা বিশুদ্ধ ইংরেজী শিখিত আর বাংলার পল্লী-জীবনের খাঁটী চিত্র উপভোগ করিত।

লালবিহারীদের পূর্ব্বপুরুষ রাঢ় দেশের অধিবাসী ছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামার সময় আনুমানিক ১৭৪৫ সনে এই বংশের গোকুলচন্দ্র (লালবিহারীর বৃদ্ধ পিতামহ) ঢাকায় পলায়ন করেন। লালবিহারীর পিতা রাধাকান্ত দুই পুত্র ও স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ঢাকা ত্যাগ করিয়া ১৮০৫ সনে বর্ধমানের সোনা পলাসী গ্রামে আসেন এবং দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। এই গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮২৪ সনের ১৮ই ডিসেম্বর লালবিহারীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা কলিকাতায় বিল এবং হুণ্ডির দালাল ছিলেন। তাঁহার মত নিরামিষাশী, নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব এবং ধর্ম্মপ্রাণের পক্ষে অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন সম্ভব ছিল না। সুতরাং দারিদ্র্যই ছিল তাঁহার অদৃষ্টে লেখা। লালবিহারী গ্রাম্য পাঠশালায় পড়া শেষ হইলে নয় বৎসর বয়সে ইংরেজী শিখিবার জন্য পিতার নিকট কলিকাতায় আসিলেন। পিতা ছিলেন ইংরেজী অনভিজ্ঞ, পুত্র ইংরেজী শিখিয়া যথেষ্ট উপার্জ্জনক্ষম হইবে ইহাই ছিল তাঁহার আশা। সেকালে ইংরেজী শিক্ষার শেষ পর্য্যন্ত লালবিহারীকে পাদ্রী ডাফ সাহেবের জেনারেল য্যাসেম্বি ইনষ্টিটিউসনে ফ্রি ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইতে হইল। যদিও পিতা রাধাকান্তকে তাঁহার আত্মীয়েরা খৃষ্টানী বিদ্যালয়ে পুত্রের ভবিষ্যতে খৃষ্টান হইবার বিপদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। রাধানাথ অল্প লেখাপড়া শিখাইয়া পুত্রকে সরাইয়া আনিবেন এরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ সনে হঠাৎ লালবিহারীর পিতার মৃত্যু হয়। অতি কষ্টে জ্ঞাতিদের সাহায্যে তাঁহার পড়া চলিতে থাকে। তাঁহার হিন্দু কলেজে পড়িবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এই সম্পর্কে ডেভিড হেয়ারের স্কুলে প্রবেশের চেষ্টায় বিফল হইলেন, কারণ হেয়ার উদার এবং মানবতাপ্রেমিক হইলেও নাস্তিক ছিলেন এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। লালবিহারী New Testament পড়ে সুতরাং আধা খৃষ্টান বলিয়া তাহাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল। হেয়ার সাহেবের স্কুলের ছেলেদের হিন্দু কলেজে প্রবেশের যে সুবিধা ছিল লালবহিারী তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

রেভারেণ্ড ডাফ ১৮৩৪ সনে স্বদেশে যান এবং ১৮৪০ সনে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে লালবিহারী ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এদেশে ফিরিয়া ডাফ বহু হিন্দু যুবককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ডাফ ১৮৪৩ সনের ২রা জুলাই লালবিহারীকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা দেন। অতঃপর লালবিহারী ১৮৪৬ সনে ডাফ সাহেবের সহকারীরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন এবং ১৮৫১ সনে ধর্ম্মপ্রচারকরূপে বর্ধমানের অম্বিকা-কালনায় যান। ১৮৫৫ সনে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে ডাফের ফ্রী চার্চে ধর্ম্মযাজক হন। ইহার পরে ডাফ সাহেবের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হয়। দেশী এবং শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টানদের মধ্যে পার্থক্য রাখার জন্যই এই কলহ। এই সম্পর্কে লালবিহারী যে তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন তাহা প্রশংসার্হ। ইংরেজ ভারতীয়কে হেয়-

(Row & Webb's Hints on the Study of English 1874) 'Babu English' বলিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর লেখাকে ব্যঙ্গকটাক্ষ করিলে লালবিহারী ওয়েবের নিজের গ্রন্থের বহু ভুল দেখাইয়া তাঁহাকে জব্দ করিয়াছিলেন। লালবিহারী কেবল ইংরেজী বাংলায় সুলেখক ছিলেন না, সুবক্তাও ছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, ইংরেজী গ্রন্থ রচয়িতা ও পত্রিকা-সম্পাদকরূপে পরিচিত ছিলেন। বাংলা দেশ এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। 'অরুণোদয়' পাক্ষিক পত্রিকার সম্পাদকরূপে বাংলাভাষা শিক্ষার উপকারিতা প্রয়োজনীয়তা ও শিক্ষাপদ্ধতি বিষয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

লালবিহারী ১৮৬৭ হইতে ১৮৮৮ পর্য্যন্ত সরকারী শিক্ষাবিভাগে কাজ করেন—বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৬৭-১৮৭২) এবং হুগলী কলেজের অধ্যাপকের (১৮৭২-১৮৮৮) কাজ করিয়াছিলেন।

'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' পত্রিকা সম্পাদন তাঁহাব অন্যতম কীর্ত্তি। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গ দর্শন' পত্রিকার সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্যই এই পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

লালবিহারী বৃটিশের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ-সমর্থন করেন নাই। বৃটিশ-রাজত্বের একজন সমর্থক হইলেও ইংরেজের ত্রুটি-বিচ্যুতির কঠোর সমালোচক ছিলেন।

খৃষ্টান লালবিহারী কেবল হিন্দুধর্ম্মেব নহে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধেও প্রচার করিতেন। কেশবচন্দ্র সেনের সহিত লালবিহারীর তর্কবিতর্ক সেকালের পাঠকের উপভোগ্য হইত বলিয়া নবীনচন্দ্র সেন "আমার জীবন" গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

১৮৮৯-১৮৯৪ তাঁহার জীবনের শোচনীয় পর্ব্ব। এই পাঁচ বৎসর রোগে ভুগিয়া, পক্ষাঘাতে পঙ্গু এবং অন্ধ অবস্থায় ১৮৯৪ সনের ২৮শে অক্টোবর তিনি পরলোক গমন করেন।

'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' লেখকের নাম ব্যতীতই লালবিহারী দে সম্পাদিত "সম্বাদ অরুণোদয়" পাক্ষিক পত্রিকায় ১৮৫৭ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সনে (বাং ১২৬৬)। টেকচাঁদ ঠাকুরের ছদ্মনামে (প্যারীচাঁদ মিত্র) "মাসিক পত্রিকা" নামক কাগজে ১৮৫৫ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে "আলালের ঘরের দুলাল" উপাখ্যান প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৫৮ সনে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় "আলালের ঘরের দুলাল"-এর প্রায় সমকালীন "চন্দ্রমুখীর" উল্লেখ বা আলোচনা বাংলা সাহিত্যের কোন ইতিহাস বা সমালোচনা-গ্রন্থে দেখা যায় না।

দেবীপদবাবু আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন যে লালবিহারী দে "চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান"-এর লেখক। ডাঃ সুকুমার সেন এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং লালবিহারী দে ইংরেজী লিখিবার পূর্বে বাংলায় গল্প লিখিয়াছিলেন (১৮৫৭ সনে) দেবীবাবু ইহা প্রমাণ করিয়া লালবিহারীকে সমসাময়িক বাঙ্গালী লেখকগণের মধ্যে বিশেষ মর্য্যাদা দিয়াছেন। ডাঃ সুকুমার সেন "অধিবচনে" বলিয়াছেন "টেকচাঁদের ব্যঙ্গদৃষ্টি চন্দ্রমুখী-লেখকের ছিল না। তার পরিচয় রয়েছে পল্লীচিত্রের টুকরোগুলিতে, মানবচরিত্রের খণ্ডগুলিতে। চন্দ্রমুখী উপন্যাস নয়, বড় গল্পও নয়। চন্দ্রমুখী বিগত শতাব্দীর এক অঞ্চলের ক্ষীণদীপ্ত চিত্রমালিকা। তার গাঁথনিতে মুনশিয়ানা নেই কিন্তু এর চিত্রগুলির অকৃত্রিমতা সংশয়াতীত। খ্রীষ্টানেব পত্রিকায় প্রকাশিত সুতরাং অবশ্য তা খ্রীষ্টানি বই, মনে করে তখনকার (ও পরবর্ত্তী কালের) পাঠকেরা (ও লোকেরা) চন্দ্রমুখীকে উপেক্ষা করেছিলেন এবং সেই হেতু চন্দ্রমুখী-রচয়িতাব বাস্তব রসবোধের পরিচয় থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।...চন্দ্রমুখীর ভাষাও প্রশংসার যোগ্য...মোটের উপর লেখকের প্রধান ভাষা যে সাধুভাষা তা সমসাময়িক গদ্যরীতির তুলনায় অনেক স্বাভাবিক অর্থাৎ হালকা ও সহজবোধ্য।...লেখক অনেক মেয়েলি প্রবাদ ও ছড়া জানতেন। তার ব্যবহার বইটির রচনা উপভোগ্যতা বাড়িয়েছে।"

"বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রমুখীর এই দ্বিতীয় প্রবেশ প্রথমবারের মতো যুগপৎ প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণে পরিণত হবে না বলেই আশা করি।"

প্রবীণ সাহিত্যিক ডাঃ সুকুমার সেনের ভাষায় চন্দ্রমুখীর উপরোক্ত পরিচয়ই যথেষ্ট। 'চন্দ্রমুখীর' দ্বিতীয় প্রবেশ অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য্যের অনলস চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে সম্ভব হইয়াছে এজন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। লালবিহারী দের জীবনী এবং তাঁহার লিখিত "চন্দ্রমুখী" বাঙ্গালী-পাঠককে উপহার দিয়া তিনি ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থখানি পাঠকসমাজে আদৃত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

পুস্তকের ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮-শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাঙ্গালীর সুনাম ও জাতীয় গৌরব

ভারতে ইংরেজের আগমন হইলে পরে এক সময় ইংরেজ ভারত বিজয় কল্পনা করিতে আরম্ভ করে। আগমনের সময় তাহাদিগের আকাঙ্খা ছিল শুধু ব্যবসা চালাইয়া আর্থিক লাভের ব্যবস্থা করিবার। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন রাজত্বগুলির মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ প্রকট দেখিয়া ব্যবসাদার বৃটিশজাতির মনে ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার চিন্তা জাগ্রত হয় ও সেই প্রেরণা অনুসরণ করিয়া বৃটিশ চক্রান্তকারীগণ ক্রমে ক্রমে ভারতের নানা স্থান নিজেদের কবলে আনিবার চেষ্টা করে। এইভাবে ভারতের অনেকাংশ স্থান দখল করিয়া সেই সকল স্থানে বৃটিশ শাসনপদ্ধতির প্রচলন করিলে পরে বৃটিশের ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় রাজকর্মচারী নিয়োগ করিবার আবশ্যক হয়। উচ্চকর্মচারীগণ বৃটিশজাতীয় হইত কিন্তু অল্প বেতনে অনেক ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া ভারতে রাজকার্য্য পরিচালনা অসম্ভব হইবে দেখিয়া বৃটিশ শাসকগণ নিম্নস্তরে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় যে সকল ভারতবাসীগণ সহজে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া উচ্চপদস্থ বৃটিশ রাজকর্মচারীদিগের আদেশ ও নির্দ্দেশ বুঝিয়া কাজ করিতে সক্ষম হইত তাহাদিগেরই কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও উন্নতি হইত। এই বিষয়ে বাঙ্গালী-দিগের যোগ্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় ও তাহাদিগকে ইংরেজী শিখাইয়া কাজ করাইবার সুবিধার কথা বিভিন্ন উচ্চপদস্থ শাসকগণ স্বীকার করিয়া অধিক সংখ্যায় বাঙ্গালী-দিগের রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালীদিগের ইংরেজী ভাষা শিক্ষা ও সেই সূত্রে ক্রমশঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও অপরাপর বিষয়ের সহিত পরিচয় এই ভাবেই হয়। সংস্কৃত সাহিত্য, দর্শন কাব্য প্রভৃতির সহিত মানসিক ঘনিষ্ঠতা থাকায় বাঙ্গালীর পক্ষে বিদ্যার কোন নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জ্ঞান আহরণ কঠিন মনে হয় নাই, এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা সহজেই বাঙ্গ

দেশে প্রচলিত হয়। ভারতে বৃটিশ শাসন কার্য্যে বাঙ্গালীর উন্নতি সহজেই হইয়াছিল এবং এই কার্য্যে নিযুক্ত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীগণ ভারতের সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৯০৫ খৃঃ অব্দের স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে বাঙ্গালী শিক্ষা ও বুদ্ধির মর্য্যাদায় ও কর্ম্মশক্তির সুযশে ভারতের সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ঐ সময়ে বাঙ্গালী বৃটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে ও বৃটিশের অন্যতম যে ব্যবসা সেই ব্যবসাতে আঘাত দিবার চেষ্টা করে। বৃটিশ অতঃপর বাঙ্গালীকে নিজেদের প্রধান শত্রু বলিয়া ধরিয়া লয় ও নানা ভাবে বাঙ্গালীকে দমন করিবার চেষ্টা করে। বাঙ্গালীর নিন্দাবাদে বৃটিশ সাম্রাজ্য মুখরিত হইয়া উঠে এবং বৃটিশ সেই সময়ে যে সকল কল্পিত দোষ বাঙ্গালীর উপরে আরোপ করে আজও সেই সকল মিথ্যা বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে প্রচারিত হইতেছে। তখন বৃটিশ যেভাবে বাঙ্গলাদেশকে অঙ্গহীন করিয়া ক্ষুদ্রায়তন করিয়া দেয়, ভারত স্বাধীন হইবার পরেও বাঙ্গলাদেশ নিজের হৃত আয়তন ফিরাইয়া পাইতে সক্ষম হয় নাই। ইহার কারণ ভারতের অপরাপর জাতিগুলির পরস্বগ্রাস করিবার প্রবৃত্তি ও বাঙ্গালীর প্রতি হিংসা। এই হিংসার মূল কারণ পূর্ব্বকালের বাঙ্গালীদিগের রাজকার্য্যে প্রতিপত্তি। যে সকল জাতি বাঙ্গালীর অপযশে আনন্দ লাভ করে ও তাহারা যে বাঙ্গালী অপেক্ষা সর্ব্বভাবে অধিক গুণসম্পন্ন এই কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করে; তাহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর প্রতি হিংসা প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই হিংসা বাঙ্গলা ভাষা, বাঙ্গলার সঙ্গীত, শিল্পকলা কৃষ্টি ও বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে অবদান, সকল কিছুর উপরেই গিয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালী যে নিষ্কর্ম্মা, অযোগ্য এবং জাতীয় প্রগতির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিতে অক্ষম; এই কথাই এখন বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা প্রচার করিতে ব্যগ্র। ভারত সরকার বাঙ্গলা ভাষার প্রতি কোন বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন না। হিন্দী বাঙ্গলা অপেক্ষা বহু প্রয়োজনীয় ভাষা এবং বাঙ্গলা প্রচারে ১৲ টাকা ব্যয় করিলে হিন্দীর জন্য ১০০৲ টাকা ব্যয় করা উচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। যে কোন ভারতীয় ভাষা বাঙ্গলার সমতুল্য ইহাও ধার্য্য হইয়া আছে। বাঙ্গলার কৃষ্টির কোন বিশেষত্ব আছে বলিয়া এবং সেই কৃষ্টির ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন বলিয়া ভারত সরকার মনে করেন না।

এই যে বাঙ্গালীর প্রতি অশ্রদ্ধা; ইহা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে এবং ইহার বিরুদ্ধে বাঙ্গালীরা কিছু করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। বাঙ্গলা দেশের বহু গৃহে ও প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীর প্রতিভার বহু নিদর্শন এখনও জীবন্তভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী যে সকল "নিজত্ব" প্রকটভাবে প্রকাশ করিয়া নিজ অপযশ বৃদ্ধি করিতেছেন, সেগুলির মধ্যে বাঙ্গালীর বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা, প্রেরণা বা জ্ঞানের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার কারণ বাঙ্গলার গুণীজন যাঁহারা তাঁহারা পথে ঘাটে, মুক্ত প্রাঙ্গণে বা সংবাদপত্রের অঙ্গে নিজগুণের পরিচয় দিতে সক্ষম নহেন। যে সকল বাঙ্গালী আজকাল লোকচক্ষে সর্ব্বদা উৎকটভাবে উপস্থিত থাকেন তাঁহাদিগের বুদ্ধি ও জ্ঞান বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করিতে পারে না। কারণ তাঁহারা যাহা কিছু বলেন বা করেন তাহাতে তাঁহাদিগের নিজস্ব প্রতিভার কিছুই থাকে না; উপরন্তু অপরের কথার বা কার্য্যের সস্তার অনুকরণ হওয়াতে সেগুলি সকল উন্নতভাবের বৈপরীত্যে ভরপুর। জাতির যখন দুর্দ্দিন আইসে তখন হীন চরিত্রের লোকেরাই উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়। আজ বাঙ্গালীর যে অবস্থা তাহাতে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সম্মুখে রাখিয়া চলিলে তবেই জাতি অগ্রগমনে সক্ষম হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী তাহা না করিয়া শুধু বুক্‌নির বাজারের বস্তাপচা মাল আনিয়া দোকান সাজাইবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে স্থাপত্যে সঙ্গীতে ও বিবিধ কলায় বাঙ্গালীর বর্ত্তমান বহু প্রচারিত আদর্শের অভিব্যক্তি ঐ একইভাবেই নিজস্ব প্রেরণা ও অনুভূতির সহিত সম্পর্ক বর্জ্জিত। এক কথায় বাঙ্গালী নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিতেছেন। ইহার প্রতিবিধান প্রয়োজন।

যে বাঙ্গালী পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আধার ছিল ও যাহার প্রতিভা বিশ্বের দরবারে আদৃত

হইত. সেই বাঙ্গালী যদি আজ উন্মাদের প্রলাপ আওড়াইয়া সেই আবোলতাবোলকে সূক্ষ্ম আদর্শের চূড়ান্ত বলিয়া দেখাইতে চাহে তাহা হইলে বাঙ্গালার সুনাম রক্ষা কি করিয়া হইতে পারে? পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কেহ যাহা কিছু অন্যায় করিবে তাহার প্রতিবাদে বাঙ্গালী যদি নিজের নাসিকা কর্তন করিতে থাকে তাহা হইলে বাঙ্গালীকে সকলে মূর্খ বলিবে না কেন? এবং যাহারা বাঙ্গালীকে ঐভাবে মূর্খতা দোষদুষ্ট হইতে সাহায্য করে সেই সকল অবাঙ্গালী নেতাগণ যে মতলব অনুযায়ী ভাবে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশের জন্যই ঐরূপ করিতেছেন তাহাই বা আমরা মনে করিব না কেন? কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালার যত প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য তাহার কোন কিছুরই শেষ মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন না কেন? বাঙ্গলা দেশের অল্পবয়স্ক ছেলে মেয়েদের মনের গতি ভিন্নপথগামী করিবার চেষ্টা উপযুক্তভাবে কেন করা হয় না? বাঙ্গলা দেশকে পূর্ব্ব ভারতের জনসামাজিক আঁস্তাকুড় বলিয়া কেন ব্যবহার করা হয়? মানবদেহধারী সকল আবর্জ্জনা এখানে আনিয়া স্তূপাকার করিয়া স্থানীয় লোকদের জীবননির্ব্বাহ প্রায় অসম্ভব করিয়া তোলা হয় কেন? বাঙ্গলার অপহৃত জেলাগুলি বাঙ্গলাকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় না কেন? বাঙ্গলার ও পাঞ্জাবের সর্ব্বনাশ করিয়া ভারত স্বাধীন হইয়াছিল। পাঞ্জাব নানাভাবে নিজের হৃত সম্পদের লোকসান পূরণে কিছুটা সক্ষম হইয়াছে। বাঙ্গলা কিন্তু কোনভাবেই কিছু ফিরাইয়া পায় নাই। ফলে বাঙ্গলা ও বাঙ্গালী শেষ হইয়া যাইতে বসিয়াছে। ভারত সরকার ইহার কোন প্রতিবিধান চেষ্টা করেন না কেন?

বাঙ্গলার যুবজনকে এক প্রকার গায়ের জোরে ঠেলিয়া দুষ্কর্ম ও অপযশের মধ্যে ফেলা হইতেছে। কলিকাতা পূর্ব্ব ভারতের বৃহত্তম বন্দর বলিয়া ইংরেজ ব্যবসাদার এইখানেই বহু কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালী বিদেশীর ব্যবসায় সহিত ঘনিষ্ঠতা বর্জ্জন করে ও অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ সেই ব্যবসা বহুল অংশে নিজ হস্তগত করে। ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে বৃটিশ ব্যবসায়ীগণ নিজেদের প্রায় সকল ব্যবসাই অবাঙ্গালীর নিকটে বিক্রয় করিয়া দিয়া চলিয়া যায় এবং ফলে বাঙ্গালীর অবস্থা আরও খারাপ হইতে থাকে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালীদিগের পক্ষে কি রাজকার্য্য কি ব্যবসায় কোন কিছুতেই স্থান পাওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরন্তু বাঙ্গালী ব্যবসায়ীগণ অবাঙ্গালীর ছল চাতুরী ও অন্যায় পদ্ধতির কার্য্যকলাপের সহিত প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইতেছে না। তথাকথিত জাতীয় আর্থিক পরিকল্পনাসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যেও বাঙ্গালী স্থান পাইতেছে না। কারণ তাহাদিগের মন্ত্রীমহলে যোগাযোগ নাই; অথবা কাহাকে কি ভাবে কোথায় খুসী করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় সে কথাও জানা নাই। এই অবস্থায় বাঙ্গালীর পক্ষে "নিজ বাসভূমে পরবাসী" হইয়া থাকাই রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সর্ব্বঘটে বাঙ্গালীর স্থান অপরের তুলনায় নীচে হইতেছে। যুব আন্দোলন ও রাষ্ট্র বিরোধ কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে প্রথমে যুবজনের জীবনযাত্রা সুগম ও আনন্দময় করিতে হইবে। পরে, পরিণত বয়সে তাহারা যাহাতে অর্থোপার্জ্জন করিতে ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠা আহরণ করিতে সক্ষম হয়, সে চেষ্টা করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য অপরিণতবয়স্কদিগের চেষ্টায় হইতে পারে না। সমাজের সকল ব্যক্তির সমবেত প্রচেষ্টা ব্যতীত ইহা করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং বাঙ্গালীকে সসম্মানে ও উন্নতভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সেই সমবেতভাবে চেষ্টার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অল্পবয়স্কদিগকে গালিগালাজ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ইহা ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি বাঙ্গালীর বিরুদ্ধতা করিতে অগ্রগামী তাহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা ও তাহাদিগের সহযোগিতা ত্যাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ বাঙ্গালীর পক্ষে বর্ত্তমানে নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে সংহত, সংযত ও মিলিত হইতে হইবে। যাঁহারা রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিচরণ করেন তাঁহাদিগের দ্বারা এ কার্য্য হইবে না কারণ তাঁহারা বহু অবাঙ্গালীর সহিত জড়িত ও সেই সকল অবাঙ্গালীগণ বাঙ্গালীকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে দিতে বিশেষ উৎসুক হইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। ভারতের অন্তর্গত এখন যে সকল প্রদেশ সৃষ্টি করিয়া ভেদাভেদের আয়োজন করা হইয়াছে সেগুলির কথা বিশেষভাবে মনে

রাখিয়া চলিতে হইবে। নতুবা বাঙলা দেশের অধোগমন নিবারণ করা অসম্ভব হইবে।

ভারতের যুব ও বয়স্ক সংঘাত

পৃথিবীর সকল দেশেই প্রায় বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত অপরিণত বয়সের ছেলে মেয়েদের একটা সংঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার কারণ দুইটি এবং সেই কারণগুলি পরস্পর-বিরুদ্ধ। একটি কারণ হইল আমেরিকান "মনো-বিজ্ঞান" সম্মতভাবে শিশু, বালক ও যুবকদিগকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভ্যাস। অপরটি হইল হিটলারি ভাবে যুবজনের উপর দমননীতি চালনা। মার্কিন মনো-বিজ্ঞান পিতামাতা-দিগকে এই শিক্ষাই দিয়া থাকে যে ছেলে মেয়েদের উপর কোন সবল উপায়ে শাসন প্রয়োগ করা উচিত নহে। ইহাতে মানসিক "ডিপ্রেশন" বা চাপের সৃষ্টি হইয়া "কমপ্লেক্স" বা মনোবৃত্তিতে জটিলতার উদ্ভব হয়। আসলে যাহা ঘটিতে দেখা যায় তাহা হইল ছেলেমেয়েদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রাদুর্ভাব ও কোন নিয়মকানুন না মানিয়া সমাজের সর্বত্র দাঙ্গা হাঙ্গামা ও দুর্নীতির প্রসার বৃদ্ধি করা। মানসিক স্বাস্থ্য এইভাবে যতই উত্তরোত্তর "উন্নত" হয়, সামাজিক অবস্থা ততই অবনতির গভীরে নামিয়া যাইতে থাকে। আসল কথা হইল শাসন কি ভাবে করা হইতেছে তাহার বিচার। অন্যায়ভাবে যদি জোর জুলুম করা হয় তাহা হইলে ছেলেমেয়েদের মনে তাহার ফলে কোন অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু যদি সকল শাসনের বন্ধন ঢিলা করিয়া দেওয়া হয় ও অন্যায় যথেচ্ছাচার করিলেও বালক বালিকা ও যুবজনকে কিছু বাধা না দেওয়া হয় তাহা-হইলে তাহাদের মনের স্বাস্থ্য আরও বিকৃতরূপ ধারণ করে। সুতরাং সুশাসন অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং মার্কিন পদ্ধতির প্রশ্রয় দিবার ব্যবস্থা যুবজন এবং সমাজের পক্ষে মহা অপ-কারের কারণ। ইহার ফলে যদি সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবল ভাবে বহিতে থাকে তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা হিটলারি বা ডি'গোলীয়ভাবে যুবজনের উপর লাঠি ও কাঁদুনে বাষ্প চালাইয়া হইতে পারে না। তাহা করিলে সমাজে এমন একটা আত্মঘাতের আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যাহাতে জাতির সংহত শক্তি পূর্ণরূপে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটে। আজ-কাল সকল দেশেই যুব ও বয়স্কদিগের কলহ বাড়িয়া চলিতেছে। ইহা বন্ধ করিতে হইলে পুত্রকন্যার মস্তকে লাঠি মারিয়া তাহা করা চলিতে পারে না। ন্যায় ও সুনীতি সুস্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং করা সহজ। জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও ভাষা লইয়া যে সকল বিবাদ তাহাও শান্তি ও মৈত্রী রক্ষা করিয়া মিটান সম্ভব। শুধু যাহারা ঐ সকল বিবাদের মূলে আছে তাহাদিগকে কিছু কিছু শাসন করা প্রয়োজন। কাহাকেও প্রশ্রয় দেওয়া কখনও বাঞ্ছনীয় নহে। তাহাতে বিবাদ আরও বৃদ্ধি পায়। জোর জুলুম ও প্রশ্রয় এই উভয় উপায়ই বর্জ্জনীয়। ভারতে এখন যাহা ঘটিতেছে তাহাতে সর্ব্বত্রই ভুল পথে চলা হইতেছে। সামাজিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিবার উপায় যথাযথ না হইলে কোন লাভ কখনও হইতে পারে না। রাষ্ট্রনেতাদিগকে একথা বুঝান কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না।

খেলার মাঠ ও উদ্যানের প্রয়োজনীয়তা

ভারতের বড় বড় সহরে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, কারখানা এবং মানুষের বাসস্থান ও লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। পূর্ব্বের তুলনায় এই সকল কিছুই পাঁচগুণ দশগুণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু খেলার মাঠ, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা শিক্ষা করিবার কেন্দ্র ও মুক্ত হাওয়ায় বিচরণ ও বনভোজন ইত্যাদির স্থান যে প্রকার ছিল তাহা অপেক্ষা খারাপই হইয়া আসিতেছে। এই মহানগরী কলিকাতাতে যে গড়ের মাঠ ময়দান ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন হইয়া গিয়াছে। ইডেন-বাগান আর বাগান নাই বলিলেই চলে। রাস্তা ও খেলার আখড়াতে উহা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট যাহা যাহা গড়িয়াছে তাহাতে কোন নূতন নূতন উন্মুক্ত এলাকার সৃষ্টি হয় নাই। রাস্তা ও বাসস্থান বাড়িয়া বাড়িয়া সহরের আবহাওয়া আরই অবনতি লাভ করিয়াছে। এখন যে অবস্থা তাহাতে কলিকাতার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রধান রাস্তার উপরে বৃহৎ বৃহৎ ক্রীড়াক্ষেত্র

ও উদ্যানের ব্যবস্থা না করিলে সহরের দশলক্ষ অল্পবয়স্কদিগের দেহের ও মনের স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পাইবার কোন পথ থাকিবে না। ডায়মণ্ডহারবার রোড, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, বোম্বাই রোড, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, দমদম ও বারাসতের রাস্তা ও সোনারপুরের রাস্তা ধরিয়া যাইলে এইরূপ বৃক্ষ প্রাঙ্গণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়। পাঁচ হইতে দশ হাজার বিঘা জমি লইয়া এক একটি কেন্দ্র গঠন করিতে হইবে। ইহার জন্য জমি ক্রয় ও তাহার পথঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হইতে পারে। প্রায়ই শুনা যায় কলিকাতা মহানগরীর উন্নতির জন্য ১০০ শত কোটি টাকার প্রয়োজন তাহার মধ্যে কতটা প্রয়োজনীয় ও কতটা অপব্যয়ের জন্য তাহা আমরা জানিনা। কিন্তু দশ কোটি টাকা ব্যয় করিলে কলিকাতার সামাজিক স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইতে পারে মনে হয়। সেই ব্যবস্থার চেষ্টাও কেহ করিতেছেন বলিয়া শুনি নাই। এই বিষয়ে সম্যক আলোচনা করা আবশ্যক।

আজাদ হিন্দ সরকার

১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ভারত বিভাগ করিয়া যখন বৃটিশসাম্রাজ্যের অন্তর্গত এক ভারতকে দুই টুকরা করিয়া বৃটিশ পার্লামেণ্ট দুইটি দেশের সৃষ্টি করে তখন যে স্বাধীন ভারতের আবির্ভাব হইল তাহার স্বাধীনতা ভারতবাসীরা ঘোষণা করে নাই। ঘোষণা করিয়াছিল বৃটিশ রাজদরবার। ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ব্রহ্মদেশে তদ্দেশীয় ভারতবাসীদিগকে সংগঠিত করিয়া এক স্বাধীন ভারত সরকার স্থাপন করেন ও সেই সংগঠনের নাম দিয়াছিলেন আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট। ঐ সরকার হইতেই স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বাধীন সেনাবাহিনী গঠিত হয় ও সেই বাহিনী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সেনাপতিত্বে ব্রহ্মদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারত আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে নেতাজী জয়লাভ করিতে সক্ষম হ'ন নাই কিন্তু ভারতের বৃটিশ দাসত্বের ইতিহাসে ঐ প্রকার রাষ্ট্রগঠন ও যুদ্ধের অভিযান আর কখনও হয় নাই। সুভাষচন্দ্র বোস শুধু বাক্য-বিপ্লবী ছিলেন না; তিনি সাক্ষাৎভাবে বহু বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছিলেন ও সত্য সত্যই এক মহাসেনাদল অস্ত্র সজ্জিত করিয়া বৃটিশরাজকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে তিনি বৃটিশ পুলিশকে জানিতে না দিয়া কেমন করিয়া ভারত ত্যাগ করিয়া প্রথমে আফগানিস্থান ও পরে রুশিয়া হইয়া জার্ম্মান দেশে গমন করেন সে কাহিনী রোমাঞ্চকর। রুশিয়ার নেতাগণ তাঁহাকে কোন সাহায্য করিতে রাজী না হওয়ায় তিনি জার্ম্মান দেশে হিটলারের নিকট উপস্থিত হ'ন। হিটলার তাঁহাকে সাবমেরিন জাহাজে জাপান পাঠাইয়া দে'ন। জাপানীরা তখন বৃটিশদিগকে দক্ষিণপূর্ব্ব এশিয়া হইতে বিতাড়িত করিয়া ব্রহ্মদেশ অবধি দখল করিয়া লইয়াছে। সুভাষচন্দ্র যখন ভারত আক্রমণের কথা বলেন তখন তাহারা তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হয়। সুভাষচন্দ্র বন্দী বৃটিশ ভারতীয় সৈন্যদিগকে মুক্তি দেওয়াইয়া নিজ সেনাদলে ভর্ত্তি করিয়া ল'ন। অন্য সেনাও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা কার্য্যের দায়ীত্ব গ্রহণ করে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট। বহু টাকা এবং মালমশলাও ঐ গভর্ণমেণ্ট জোগাড় করিয়াছিল। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের এই যে সংগঠন ইহার একটা বিশেষ মূল্য আছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে। বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে যুদ্ধ করা ভারতে কয়েকবার হইয়াছে, কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রগঠন করিয়া ও সেনাবাহিনী লইয়া বৃটিশকে আক্রমণ ও যুদ্ধ চালনা করা ঐ একবারই হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র এই যুদ্ধ করিবার জন্য যে সৈন্যদল গঠন করিয়াছিলেন তাহাতে জাতি, ধর্ম্ম, ভাষানির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীই যোগদান করিয়াছিল। এমন কি নারী সৈনিকও ছিল।

সুভাষচন্দ্রের এই অভিযানের যদি ভারতের স্বাধীনতা "সংগ্রামের নেতাগণ সাক্ষাৎভাবে সমর্থন করিতেন এবং এই দেশেও যদি ঐ সময়ে বৃটিশের উপর হামলা করা

আরম্ভ হইত তাহা হইলে হয়ত সুভাষচন্দ্র তাঁহার ভারত অভিযানে সক্ষম হইতেন। হয়ত তাঁহার অকালমৃত্যু হইত না এবং ভারত স্বাধীন হইয়া এক দেশ এক জাতিই থাকিয়া যাইত। কিন্তু ভারতের জননেতাগণ তখন ভিতরে ভিতরে সুভাষচন্দ্রের বিপক্ষতাই করিতেছিলেন। কম্যুনিষ্ট-দল খোলাখুলিভাবে বৃটিশের সহায়তায় নিযুক্ত ছিল। তাহাদের একমাত্র চিন্তা ছিল রুশিয়ার জয় হইবে কিনা। ভারত মরে বাঁচে তাহাতে যায় আসে না। গৃহশত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক। সেই কারণেই সুভাষ জয়লাভ করিতে পারিলেন না।

পাখতুনদিগের কথা

ভারতে বৃটিশ রাজত্ব যতদিন ছিল ততদিনই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর বিরাট বিরাট ছাউনি ছড়ান ছিল এবং সকল বৃটিশ সৈন্যদিগেরই যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত। এখানে জাক্কাখেল, টোচিখেল, ইউসুফজাই, উমরজাই প্রভৃতি জাতিগুলি দিনে চব্বিশ ঘণ্টা, সপ্তাহে সাতদিন, বৎসরে বার মাস ও ৩৬৫¼ দিন তলোয়ার ও ছোরায় সান দিত এবং গুলিগোলা চালাইবার জন্য চির প্রস্তুত থাকিত। তাহারা বৃটিশকে কখন বাদসা বলিয়া স্বীকার করে নাই এবং তাহাদিগের ঐ প্রদেশে উপস্থিতি সাময়িক পরিস্থিতি হিসাবে সহ্য করিত অথবা কখন কখন সহ্য নাও করিত। অর্থাৎ বৃটিশের ঐ প্রদেশের উপর প্রভুত্ব কোন রাষ্ট্রনীতি অনুগতরীতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে যখন ভারত বিভাগ করিয়া বৃটিশ পার্লামেণ্ট পাকিস্থানের সীমানা স্থির করিল তখন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বা যাহাকে এখন তদ্দেশীয় জাতিগুলি পাখতুনিস্থান বলিয়া থাকে সেই অঞ্চল সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের বিচার অনধিকার চর্চ্চা হইয়াছিল বলা যায়। কারণ যাহারা বৃটিশের রাষ্ট্রীয় অধিকার কখনও স্বীকার করে নাই, তাহাদিগের দেশ কোন রাষ্ট্রে সংযুক্ত করিয়া দিবার অধিকার বৃটিশের ছিল বলিয়া মানা যায় না। পাখতুন জাতির লোকেরা যে এখন পাকিস্তান ছাড়িয়া নিজ রাষ্ট্র গঠন করিতে চায় তাহা কোন ভাবেই অন্যায় বলিয়া বিচার করা যাইতে পারে না। কারণ যখন বৃটিশের প্ররোচনায় মুসলীমলীগের ভারতীয় নেতাগণ ভিন্ন রাষ্ট্র দাবী করে তখন তাহার মূল কারণ দেখান হইয়াছিল যে মুসলমানগণ ভিন্ন জাতির লোক। তাহাদের ধর্ম্ম ইসলাম, ভাষা উর্দ্দু, মাথায় টুপি অধমাঙ্গে লুঙ্গি। কিন্তু পাখতুনদিগের ভাষা পস্তু ও তাহারা মাথায় বাঁধে কুল্লাসাকা। তাহারা ভারতীয় মুসলমানদিগের মত ভোগবিলাসী নহে এবং তাহাদিগের সহিত কোন মেলামেশার চেষ্টা করে না। পাখতুনগণ পাকিস্তানে থাকিতে ইচ্ছুক নহে এবং বৃটিশ পার্লামেণ্টের তাহাদিগের উপর কোন রাজত্বের অধিকার ছিল বলিয়া তাহারা স্বীকার করে না। এই সকল কারণে পাকিস্তানের উচিত হইবে ঐ প্রদেশে একটা "প্লেবিসাইট" বা জনমত নির্দ্ধারণ করিবার ব্যবস্থা করা। তাহাতে যদি দেখা যায় যে ঐ প্রদেশের অধিকাংশ লোক পাকিস্তানে সংযুক্ত থাকিতে ইচ্ছুক তাহা হইলে পাখতুনিস্তানের পরিকল্পনা ত্যাগ করা যাইবে। যদি জনমত অনুসারে পৃথক হওয়াই ঠিক হয় তাহা হইলে ভিন্ন রাষ্ট্র গঠনই উচিত হইবে।

বন্যার তদন্ত

উত্তর বাংলায় যে দারুন ধ্বংসলীলা হইয়া গে'ল তাহার যে তদন্তর ব্যবস্থা হইল তাহাতে দেখা যায় যে বন্যার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সামরিক কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা প্রেরিত খবর জলপাইগুড়িতে বহুঘণ্টা পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু ঐ জেলার রাজকর্ম্মচারীগণ জনসাধারণকে সে কথা জানান প্রয়োজন মনে করেন নাই। যদি সর্ব্ব-সাধারণকে বন্যার আশঙ্কার কথা যথাযথরূপে জানান হইত তাহা হইলে বহু লোকের প্রাণ বাঁচিয়া যাইত। অধিকাংশ লোক কোন কথা না জানিয়া হঠাৎ রাত্রিকালে বন্যার জল-স্রোতে পড়িয়া প্রাণ হারান এবং তাঁহাদিগের মৃত্যুর জন্য বিশেষ করিয়া দায়ী সেই রাজকর্ম্মচারীগণ যাঁহারা জানিয়া

শুনিয়া কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া শুধু নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সকল ব্যক্তির জনহিত সম্বন্ধে অবহেলার ফলেই অধিক লোকের প্রাণ যায়। ভারত অথবা বাংলা সরকারের উচিত ছিল এই সকল ব্যক্তিকে উপযুক্তভাবে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা। আদালতে খাড়া হইয়া অভিযুক্তের অবস্থায় না পড়িলে কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন লোকের শিক্ষা হয় না। যথাযথ বিচারের পরে যদি এই সকল ব্যক্তির আইন অনুসারে শাস্তি হইত তাহা হইলেই জনসাধারণ খুসী হইতেন; কিন্তু রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাজকর্ম্মচারী ও প্রজার জন্য আইনের প্রয়োগ ব্যবস্থা ভিন্ন প্রকার। রাজকর্ম্মচারী যদি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া লোকের অপঘাত মৃত্যুর কারণ হ'ন তাহা হইলে তাঁহাকে কর্ম্মস্থান বদলি করিয়া সাজা দেওয়া হয়। প্রজা যদি কোনভাবে অপরের মৃত্যুর কারণ হয় তাহা হইলে তাহার অপরাধ অনেক কঠিন বলিয়া ধার্য্য হয়। জেল, জরিমানা বা চাকুরী হইতে বরখাস্ত না হইয়া যদি কেহ বাঁচিয়া যায় ত তাহার কপাল ভাল বলিতে হয়। কোন কোন ব্যক্তি না কি বদ্‌লি হওয়াতে বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। ইহাতে নাকি তাঁহাদিগের ইজ্জতের হানি হইয়াছে। লোকের প্রাণহানির শাস্তি যদি শুধু ইজ্জতহানি হয় তাহা হইলে যাহারা শুধু চুরি করে তাহাদের স্বর্ণপদক পাওয়া উচিত।

ভিয়েতনাম ও তৎপরে

আরম্ভে ভিয়েতনাম লইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ হয় দ্বিতীয় বিশ্ব [মহা]যুদ্ধের সহিত সংযুক্তভাবে। সেই সময়ে এই অঞ্চল [ফ]রাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ও ইহার ভিন্ন ভিন্ন দেশের [না]ম ছিল টন্‌কিন্, অ্যানাম ও কোচিন চীনা। জাপানীরা [এ]ই অঞ্চল ১৯৪১—৪৫ অবধি দখল করিয়া ছিল। যুদ্ধের [অ]বসানে জাপানীরা এই অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যায় ও [ফ]রাসীগণ এইখানকার লোকেদের ১৯৫০ অব্দে স্বাধীন[তা দি]য়া দেয়। কিন্তু হো চি মিন্‌হ এর কম্যুনিষ্ট ফৌজের [স]হিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ ১৯৫৪ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। [তৎ]পর জেনিভাতে আলোচনা সভা বসাইয়া উত্তর ও দক্ষিন ভিয়েতনাম বলিয়া দুইটি দেশের এলাকা ভাগ করা হয়। উত্তর ভিয়েতনাম ৬৩০০০ বর্গমাইল ও রাজধানী হানয় স্থির হয় ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম ৬৬২৮১ বর্গমাইল ও রাজধানী সাইগন স্থির হয়। উত্তর ভিয়েতনাম হইল কম্যুনিষ্ট ও দক্ষিণ হইল সাধারণতন্ত্রী। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ১৯৬৩ খৃঃ অব্দ হইতে নানাপ্রকার রাষ্ট্রীয় গোলযোগের সূত্রপাত হয়। যাহারা গোলযোগ করে তাহাদিগের মধ্যে নেতাগণ প্রায় সকলেই উত্তর ভিয়েতনাম ফেরত ও সাধারণ লোকেরাও উত্তর ভিয়েতনাম হইতে আগত। এই সকল লোকেই ভিয়েতকং নামধেয় বিপ্লবীর দল। ১৯৬৪—৬৫ হইতে উত্তর ভিয়েতনাম মারফতে চীন বিপ্লবীদিগকে সাহায্য করিতে আরম্ভ করে এবং আমেরিকার যুক্ত প্রদেশ সরকার সাহায্য দান সুরু করে বিপরীত পক্ষ অর্থাৎ আইনসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে। ইহার ফলে যুদ্ধ ক্রমশঃ ঘোর হইতে আরও ঘোরতর হইয়া উঠিতে থাকে এবং উত্তর ভিয়েতনাম হইতে মর্টার নিক্ষিপ্ত গোলা দক্ষিণ অঞ্চলে আমেরিকান সেনাদিগের উপর পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় আমেরিকান আকাশবাহিনী উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে। বর্ত্তমানে আমেরিকার রাষ্ট্র-বোমা বর্ষণ বন্ধ করিলেও যুদ্ধ প্রবলবেগেই চলিতেছে। প্যারীসে শান্তির বৈঠক বসিয়াছে কিন্তু সেখানে কোন মীমাংসা হইতেছে না। কারণ কেহ কাহারও কথায় বিশ্বাস করে না। উত্তর ভিয়েতনামের ইচ্ছা আমেরিকানদিগকে সরাইয়া দিয়া সারা দেশটি দখল করিয়া লওয়ার। আমেরিকানগণও দক্ষিণ অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে রাজী নহে, যদি না ঐ অংশের পূর্ণ স্বাধীনতার বিশ্বাস-যোগ্য কোন জামিন থাকে। কম্যুনিষ্টগণ ছল, বল ও কৌশল এই তিন পন্থাতেই বিশ্বাসী। আমেরিকা কম্যুনিষ্ট শক্তির নিকট সাধারণতন্ত্রকে বলিদান করিতে অনিচ্ছুক।

চন্দ্রলোক ভ্রমণ

সম্প্রতি রুশ ও আমেরিকার দূরাকাশ বিচরণ প্রচেষ্টার

হইতে বহুদূরে হাউই বা রকেট নিক্ষেপ করিয়া দেখা হইত যে কি ওজনের বস্তুকে কত উর্দ্ধে উৎক্ষেপ করা সম্ভব হয়। এই ভাবে রকেট চালাইয়া চন্দ্র অথবা আরো দূরের গ্রহ-গুলির গাত্রে আঘাত করা সম্ভব হইয়াছিল। সেই সকল রকেটে যন্ত্রপাতি ভরিয়া দিয়া বহুদূরের আকাশের কথা যন্ত্র ও রেডিওর দ্বারা পৃথিবীতে জানিবার ব্যবস্থা করা হইত। পরে রকেটগুলি অনন্ত আকাশে বিচরণ করিয়া পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে এবং প্রথমে ক্যামেরা ও কলকব্জা এবং পরে জীবজন্তুরাও অনন্ত আকাশ প্রদক্ষিণ করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ইহার পরে মানুষ রকেটের ভিতরে থাকিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সুদূর শূন্যমার্গ পরিভ্রমণান্তে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। সম্প্রতি তিনজন আমেরিকান অনন্ত আকাশে এগারদিন বিচরণ করিয়া পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আকাশে ভ্রমণকালে তাঁহারা নিজে-দের রকেটটিকে ইচ্ছামত নানাদিকে চালাইতে সক্ষম হইয়া-ছিলেন এবং অপর একটি ভ্রমণশীল রকেটের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া ও পরে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এখন রকেট আরোহী বৈমানিকগণ চন্দ্রমণ্ডলে পরিভ্রমণক্ষম হইয়াছেন এবং আশা করা যাইতেছে যে তাঁহারা শীঘ্রই চন্দ্রলোকে অবতরণ করিয়া, সেই স্থান পরীক্ষা করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। ইহা করিতে হইলে হয়ত একটি বৃহৎ রকেট শুধু সুদূর নভো-মণ্ডলে পরিভ্রমণরত থাকিবে এবং মানুষ অপর ক্ষুদ্রতর রকেট ব্যবহারে সেই বৃহৎ রকেটে যাতায়াত করিবে। এই ভাবে মানুষ একটি ক্ষুদ্র রকেটের সাহায্যে বৃহৎ রকেটে গিয়া উঠিবে ও সেই রকেট তখন মানুষকে লইয়া চন্দ্রের নিকটে পৌছিবে। অতঃপর মানুষ আবার ক্ষুদ্র রকেটের সাহায্যে চন্দ্রে অবতরণ করিবে এবং সেখান হইতে পুনরায় বৃহৎ রকেটে ফিরিয়া আসিবে। বৃহৎ রকেট তখন মানুষকে পৃথিবীর নিকটে আনিয়া দিবে ও মানুষ ক্ষুদ্র রকেট ব্যবহার করিয়া ভূতলে ফিরিয়া আসিবে।

মানুষের চন্দ্রে গমন করিয়া কি লাভ হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে মানুষের দেহমনের শক্তি ও প্রতিভা সর্ব্বদাই অজানাকে জানিবার জন্য উৎসুক। পূর্ব্বে মানুষ পদব্রজে দূর দূরান্তর গমন করিয়া নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার করিত। পরে অশ্বারোহণে বা জলপথগামী জাহাজে সেই কার্য্য আরও বিস্তৃতভাবে করা হইত। এইভাবে পৃথিবীর সকল অজ্ঞাতস্থলেই মানুষ গিয়াছে। অগস্ত্যঋষি, কলম্বাস বা লিভিংস্টোনের খ্যাতি এইরূপভাবে মানবসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। এখন যে অনন্ত শূন্যে অভিযান তাহাও সেই অজানার অনু-সন্ধানের আগ্রহেই আরম্ভ হইয়াছে এবং ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। চন্দ্রে গমন করিয়া মানুষ কি পাইবে তাহা আমরা এখনও জানি না; কিন্তু চন্দ্রে পৌছাইলেই সেই অভিযান শেষ হইবে না। চন্দ্রকে যাত্রাপথের আরম্ভ বলিয়া ধরিয়া লইয়া সেখান হইতে মানুষ গ্রহ গ্রহান্তরে যাইবার চেষ্টা করিবে। সেই অনন্তের অভিযান মানুষকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। আলোকের গতিবেগ সেই গমনের দ্রুততায় সীমা বাঁধিয়া দিবে; অথবা মানুষ আরও দ্রুততর গতির পথ খুঁজিয়া পাইবে তাহাই বা কে বলিতে পারে। সৃষ্টির বিস্তার আলোকের গতির মাপকাঠিতে মাপিলে শত লক্ষ বৎসরেও মানুষ সৃষ্টির শেষ সীমায় পৌছাইতে পারিবে না। গতির অন্য রূপ থাকিতে পারে কিনা তাহা বিচার্য্য। যদি পারে তাহা হইলে তাহা আবিষ্কৃত হইলে পরে মানুষ সকল নক্ষত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট গ্রহ উপগ্রহগুলিতে যাইতে পারিবে। এইরূপ নক্ষত্র আছে কত কোটি তাহা কেহ পূর্ণরূপে জানে না। সকল নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডলের মধ্যে কোন কোনটিতে যে মানবজীবনের বিস্তার হইতে পারে; অথবা আমাদের জীবনের সহিত তুলনায় জীবন এখনই আছে একথাও অসম্ভব কথা নহে। উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তরে যাহাই পাওয়া যাউক না কেন মানুষের সহিত এই মহাসৃষ্টির গভীরতর সম্বন্ধ স্থাপনে এখন নূতন নূতন পথ উন্মুক্ত হইয়া দেখা দিতেছে, মানুষ এখন বাস্তব ক্ষেত্রে অনন্তের পথের যাত্রী। মন ও আত্মার ক্ষেত্রে অনন্তের বিস্তার সীমাহীন। শুধু সীমাহীন নহে; অবাস্তবের

(এরপর ১৩২ পাতায়)

বেদের দেবতা—অশ্বিদ্বয়

মুক্তাকণা সেনচৌধুরী

পৌরাণিক দেবতা-সমাজে অশ্বিনীকুমারযুগল অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত। বস্তুতঃ পুরাণের মতে তাঁহারা বহুদিন দেবতাসমাজে অপাংক্তেয় ছিলেন। যজ্ঞভাগে ও দেবগণের সহিত সোমপানে তাঁহাদের অধিকার ছিল না। গীতায় ভগবান্ "পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা" (১১।৬) বলিয়া অশ্বিদ্বয়কে দেবতা পর্য্যায়ে রাখিয়াছেন বটে; কিন্তু মহাভারতেরই অনুশাসন পর্ব্বে দেখা যায় দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আখ্যায়িকাটি এইরূপ—মহর্ষি চ্যবন ইন্দ্রকে বলিলেন "অন্যান্য দেবতাদের সহিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ও যেন সোমপানে অধিকারী হন।" ইন্দ্র বলিলেন 'তাঁহারা দেবতার সমকক্ষ নহেন, সুতরাং আমরা তাঁহাদের সহিত সোমপান করিতে পারি না।' চ্যবন পুনরায় বলিলেন 'তাঁহারা সূর্য্যের পুত্র, অতএব তাঁহারা দেবতা এবং দেবতাদের সহিত সোমপানে অধিকারী।' ইন্দ্র তথাপি সম্মত হইলেন না। অতঃপর চ্যবন ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পরাজয়ের জন্য এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া একটি পর্ব্বত উৎপাটন করিয়া এবং বজ্র লইয়া যজ্ঞাভিমুখে ধাবিত হইলেন। মহর্ষি চ্যবন যোগবলে মন্ত্রপূত জলসিঞ্চন করিয়া ইন্দ্রকে অশক্ত করিয়া ধৃত করিলেন। তারপর সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে মদ নামক এক রাক্ষস উৎপন্ন হইল এবং সেই রাক্ষসের বিরাট ব্যাদিত বদন-গহ্বরে ইন্দ্রাদি দেবতা আবদ্ধ হইলেন। তখন অনন্যোপায় হইয়া ইন্দ্র অশ্বিদ্বয়ের সহিত সোমপানে স্বীকৃত হইলেন। অশ্বিদ্বয় দেবসমাজে পাংক্তেয় ও যজ্ঞভাগী হইলেন।*

বাস্তবিকপক্ষে পুরাণে অশ্বিদ্বয় স্বর্গবৈদ্যরূপেই বর্ণিত। নকুল ও সহদেবের জনকরূপে তাঁহারা আমাদের নিকট পরিচিত। জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষির পুনর্যৌবন বিধায়করূপে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধি।

বৈদিক দেবতাসমাজে অশ্বিদ্বয় পঞ্চপ্রধানের অন্যতম। ঋগ্বেদে ৫৭টি পূর্ণসূক্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরো শতাধিক মন্ত্র তাঁহাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হইয়াছে। ইন্দ্র, অগ্নি এবং পবমান সোম ব্যতীত এত অধিক সূক্তে অন্য কোন দেবতা স্তুত হন নাই। বেদে তাঁহারা অশ্বিদ্বয়, নাসত্যদ্বয় এবং দস্রদ্বয় নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ভাষ্যকারগণ 'নাসত্য' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'অসত্যরহিত', 'সৎস্বরূপ' 'সত্যগুণবিশিষ্ট', 'সত্যস্বরূপ' ইত্যাদি। তাঁহারা 'দস্র' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—'রিপুনাশক', 'আধিব্যাধিনাশক', 'দুঃখ উপশমকারী' এবং 'দর্শনীয়' অর্থাৎ সুদর্শন।

পুরাণে অশ্বিদের জন্মকাহিনী বিচিত্র। বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞা স্বামী সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া 'ছায়া' কে স্বামীর নিকট রাখিয়া পিতৃগৃহে পলায়ন করেন। পিতা কন্যাকে তিরস্কার করিয়া স্বামীগৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। কিন্তু সংজ্ঞা বড়বা (সিন্ধু ঘোটকী) রূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুবর্ষে বিচরণ করিতে থাকেন। সূর্য্য তাঁহার সন্ধান পাইয়া অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই মিলনের ফলে যমজ পুত্রের জন্ম হয়। এই যমজ পুত্রদ্বয়ই অশ্বিনীকুমার নামে খ্যাত হন। কোন কোন পুরাণের মতে এই সন্তানদ্বয়ের নাম অশ্বিনী ও রেবন্ত। মতান্তরে দক্ষপ্রজাপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা অশ্বিনী নক্ষত্রই তাঁহাদের মাতা। 'বড়বা' শব্দের একটি অর্থ অশ্বিনী নক্ষত্র। তাঁহার আকৃতিও কতকটা ঘোটকের ন্যায়। আবার বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার একটি নামও অশ্বিনী বটে।

বেদে অশ্বিদ্বয়ের জন্মকাহিনী বেশ সুস্পষ্ট নয়। কতকটা পরস্পরবিরোধী বলিয়াও মনে হইবে। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ৪৬ সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রে তাঁহাদিগকে সমুদ্রের পুত্র এবং ১১৭ সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্রে আকাশের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অবশ্য বেদে সমুদ্র শব্দ এবং অন্তরীক্ষ শব্দ সমার্থবাচক। বেদের প্রাচীনতম শব্দ কোষ 'নির্ঘণ্টু'র রচয়িতা ঋষি কশ্যপ। তিনি বলেন "সমুদ্রঃ অন্তরীক্ষম্।" সায়নাচার্য্যও ১।৪৭।৬ মন্ত্রের ভাষ্যে নিরুক্ত উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন" সমুদ্রাৎ অন্তরিক্ষাৎ। সমুদ্রমিতি অন্তরিক্ষনাম সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উভয় মন্ত্রের দ্বারা 'অন্তরীক্ষের পুত্র' এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা যাইতে পারে।

আবার দশম মণ্ডলের ১৭ সূক্তের প্রথম দুইটি মন্ত্রে অন্য বিবরণ দেখিতে পাই—

ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবন সমেতি।
যমস্য মাতা পর্য্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ। ১।
অপাগুহন্ন মৃতাং মর্ত্তেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদু র্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনা বভরদ্যত্তদাসীদ্ জহাদুদ্বা মিথুনা সরন্যুঃ ।।২।।

এই মন্ত্র দুইটির দেবতা সরন্যু এবং ঋষি যমপুত্র দেবশ্রবা ঋষি।* যমের পুত্র দেবশ্রবা যমের মাতার বিবাহাদির কথা বলিতেছেন। এইরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রার্থ বিশদ হইবে এইরূপই আশা করা যায়। কিন্তু এই মন্ত্র দুইটির মধ্যে কতকটা অসংলগ্নভাব এবং ঘটনার পারম্পর্য্যে বিরোধিতা আছে। স্বর্গীয় রমেশ দত্ত মহাশয় মন্ত্র দুইটির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—'ত্বষ্টা নামক দেবতা আপনার কন্যার বিবাহ দিতেছেন। এই উপলক্ষে বিশ্ব সংসার আসিয়া উপস্থিত হইল। যমের মাতা যখন বিবাহিতা হইলেন, তখন মহান্ বিবস্বানের জায়া অদর্শন হইলেন ।।১। সেই মৃত্যুরহিত সরন্যুকে মনুষ্যদিগের নিকট হইতে গোপন করা হইল। তাঁহার তুল্যাকৃতি এক এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া বিবস্বান্‌কে দেওয়া হইল। তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন। সরন্যু যমজ দুইটি সন্তানকে ত্যাগ করিলেন ।।২।" পুরাণ মতেও সরন্যু স্বয়ংই অদর্শন হইয়াছিলেন কিন্তু বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই নহে। এখানে বলা হইতেছে তাঁহাকে লোকচক্ষু হইতে গোপন করা হইল। কিন্তু কে গোপন করিল? অপর স্ত্রী-ই বা কে নির্ম্মাণ করিল? "তখন দুই অশ্বিকে গর্ভে ধারণ করিলেন"—তখন কখন? কে গর্ভে ধারণ করিলেন? সরন্যু না অপর কন্যা? সরন্যু কখন যমজ সন্তান দুইটিকে ত্যাগ করিলেন? এই সকল প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় কিন্তু এই মন্ত্রদ্বয়ে তাহার কোন সদুত্তর মিলে না।

নিরুক্তে যাস্ক এই মন্ত্র দুইটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'তত্র ইতিহাসঃ সমাচক্ষতে। ত্বষ্ট্রী সরন্যূ বিবস্বত আদিত্যাদ্যমৌ মিথুনৌ জনয়ঞ্চকার। সা সবর্ণামন্যাং প্রতিনিধায়াশ্বরূপাং কৃত্বা প্রদদ্রাব। স বিবস্বানাদিত্যোঽশ্বমেব রূপং কৃত্বা তামনুসৃত্য সম্বভূব। ততোঽশ্বিনৌ জজ্ঞাতে সবর্ণায়াং মনু" (১২।১০)। অর্থাৎ ইতিহাস বলে ত্বষ্টার কন্যা সরন্যূর গর্ভে আদিত্য বিবস্বানের যমজ সন্তান জন্মিয়াছিল। পরে তিনি আপনার মত আর একজনকে (অর্থাৎ সবর্ণা নামক কন্যাকে) রাখিয়া নিজে ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করেন। বিবস্বান অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া তাঁহাতে সঙ্গত হন। তাহাতেই অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়। সবর্ণার গর্ভে বিবস্বানের অন্য এক পুত্র 'মনু'র জন্ম হয়। প্রশ্ন হইতে পারে পূর্ব্বে যে যমজ সন্তান হইয়াছিল তাঁহারা কে? সপ্তম মণ্ডলের ৭২।২ মন্ত্রের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন "ত্বষ্টার যমজ সন্তান হয়। একটি কন্যা, তাঁহার নাম সরন্যু এবং একটি পুত্র, তাঁহার নাম ত্রিশিরা। বিবস্বানের সহিত তিনি সরন্যুর বিবাহ দেন। এই বিবাহের ফলে সরন্যুর ২টি সন্তান হয়; তাঁহাদের নাম যম ও যমী। তারপর সরন্যু পতির অগোচরে নিজসদৃশ এক স্ত্রী সৃষ্টি করিয়া তাহার হস্তে যম ও যমীর রক্ষণভার অর্পণ করিয়া নিজে অশ্বিরূপে বিচরণ করিতে থাকেন। ...সূর্য্য তাঁহার সন্ধান পাইয়া অশ্বরূপে তাঁহার সহিত মিলিত হন। ফলে যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁহাদের নাম নাসত্য ও দস্র। তাঁহারাই অশ্বিদ্বয়রূপে খ্যাত হয়েছেন।" দেখা যাইতেছে ভাষ্যকারগণ এই মন্ত্র দুইটির ব্যাখ্যার অসংলগ্নভাবের নিরসনের জন্য পুরাণের আশ্রয় লইয়াছেন।

এই অশ্বিদ্বয় কে এবং কেন তাঁহাদের অশ্বি বলা হয় সেই সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে (১০।১।১) বলিতেছেন—"অথাতো

দ্যুস্থানা দেবতা স্তাসামশ্বিনৌ প্রথম গামিনৌ ভবতঃ" (অতঃপর দ্যুস্থানীয় দেবতাদের কথা। তাঁহাদের মধ্যে অশ্বিদ্বয়ই প্রথমগামী অর্থাৎ অগ্রগণ্য)। "অশ্বিনৌ যদ্-ব্যাপ্নুবাতে সর্ব্বং, রসেন অন্যো জ্যোতিষা অন্যঃ। (অশ্বি কেন বলা হয়? কারণ একজন রসের দ্বারা ও অন্যজন জ্যোতি দ্বারা সব কিছু ব্যাপ্ত করেন)। "অশ্বৈ রশ্মিনা-রিত্যৌর্ণ নাভঃ (ঔর্ণনাভ বলেন ব্যাপ্ত করেন বলিয়াই তাঁহারা অশ্বি)। "তৎ কাবশ্বিনৌ" (সেই অশ্বিদ্বয় কে?) "দ্যাবা পৃথিবীত্যেকে" (একদল বলেন দ্যাবা ও পৃথিবীই অশ্বিদ্বয়)। "অহোরাত্র বিত্যেকে" (অপরেরা বলেন দিন এবং রাত্রিই অশ্বিদ্বয়)। সূর্য্যচন্দ্রমসাবিত্যেকে" (আবার কেহ বলেন সূর্য্য এবং চন্দ্রই অশ্বিদ্বয়)। "রাজানৌ পুণ্য-কৃতাবিতৈতিহাসিকাঃ" (ঐতিহাসিক মতে পুণ্যবান্ দুই নৃপতিই অশ্বিদ্বয়)।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন (৫।১।৫।১৬) "ইমে বৈ দ্যাবা পৃথিব্যৌ প্রত্যক্ষমশ্বিনৌ" (এই দ্যাবা ও পৃথিবীই প্রত্যক্ষ অশ্বিদ্বয়)। 'ইমে হি ইদং সর্ব্বং অশ্নুবাতাং' (এই দুইটিই সব কিছু ব্যাপ্ত করিয়া আছেন)। "পুষ্করস্রজৌ" (তাঁহারাই পুষ্করস্রষ্টা অর্থাৎ পুষ্টি কর্ত্তা)। "ইত্যাগ্নিরে-বাস্যৈ আদিত্যোঽমুষ্যৈ দিবে" (অগ্নিই ইহার অর্থাৎ পৃথিবীর এবং আদিত্যই উহার অর্থাৎ দ্যুলোকের পুষ্কর)। এই অগ্নিকে এবং আদিত্যকে ধারণ করিয়া আছেন পৃথিবী ও দ্যুলোক। সুতরাং দ্যাবা ও পৃথিবীই "পুষ্কর-স্রজৌ" অশ্বিদ্বয়।

অশ্বিদ্বয়ের কীর্ত্তি-কাহিনীর দীর্ঘ তালিকা ঋগ্বেদে পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে। একমাত্র ইন্দ্র ব্যতীত অপর কোন দেবতার সম্পর্কে এত অধিক সংখ্যক মন্ত্রে এত অধিক সংখ্যক কীর্ত্তি ঘোষিত হয় নাই। একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে "হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! তোমাদের কীর্ত্তি-গুলি সকলের জানা উচিত' (১।১১৭।১০)। 'তোমরা জরা-জীর্ণ চ্যবনের অবস্থ পুরাতন রূপ কবচ উন্মোচনের ন্যায় দূরীভূত করিয়াছিলে। যখন তোমরা তাঁহাকে পুনর্ব্বার যুবা করিলে, তখন তিনি সুরূপা রমণীর বাঞ্ছিত মূর্ত্তিলাভ করিলেন' (৫।৭৪।৫)। 'বৃদ্ধ কক্ষীবান্ ঋষিকে ইন্দ্র বৃচয়া নাম্নী যুবতী স্ত্রী প্রদান করিয়াছিলেন (১।৫১।১৩)। যেমন জীর্ণ রথকে নূতন করা হয়, সেইরূপ তোমরা তাঁহাকে নব যৌবন প্রদান করিলে' (১০।১৪৩।১)। 'কন্ব দৃষ্টিশক্তির অভাবে চলিতে পারিতেন না। তোমরা তাঁহাকে দৃষ্টি-শক্তি দিয়াছিলে' (১।১১৭।৮)। 'প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুগণ অত্রি ঋষিকে বন্ধন করিয়াছিল (১০।১৪৩।২)। তাঁহাকে তুষানলে নিক্ষেপ করিলে তিনি তোমাদের স্তব করিয়া অগ্নির উত্তাপ সুখসেব্য বোধ করিয়াছিলেন (৫।৭৩।৫) এবং তোমাদের সাহায্যে তুষাগ্নি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন' (৫।৭৮।৩)। 'জাহুষ রাজা সর্ব্বদিকে শত্রুকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইলে, তোমরা তোমাদের সর্ব্বভেদক রথে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলে (১।১১৬।২০) এবং তাঁহাকে ভ্রষ্টরাজ্যে পুনঃস্থাপিত করিয়াছিলে' (৭।৭১।৫)। 'দুষ্ট বুদ্ধি সখাগণ ভুজ্যুকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল (৭।৬৮।৭)। সে সমুদ্র-সলিলে তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে ছিল। তোমরা তাঁহাকে পক্ষযুক্ত নৌকায় উত্তোলন করিয়া পরিত্রাণ করিয়াছিলে (১০।১৪৩।৪)। কূপে নিক্ষিপ্ত পাশ-বদ্ধ রেভকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে' (১।১১২।৪)। 'শত্রুগণ কর্ত্তৃক কূপে নিক্ষিপ্ত অন্তক নামক রাজর্ষিকে রক্ষা করিয়াছিলে' (১।১১২।৬)। পঙ্গু পরাবৃজকে গমনসমর্থ করিয়াছিলে" (১।১১২।৮)। 'কুম্ভপুত্র অগস্ত্য দ্বারা স্তুত হইয়া (১।১১৭।১১) গমনে অসমর্থা বিশ্পলাকে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া সংগ্রামক্ষেত্রে যাইতে সমর্থ করিয়াছিলে' (১।১১৬।১৫)। 'দুর্ব্বল-জানু শ্রোণকে গমন-সমর্থ করিয়া-ছিলে' (১।১১২।৯)। 'অন্ধ ঋজ্রাশ্বকে দৃষ্টি-সমর্থ করিয়াছিলে' (১।১১২।৭)। 'বৃকীকে তাহার পিতা দৃষ্টিশক্তিহীন করিয়া দিয়াছিল; তোমরা তাহার দৃষ্টিহীন নয়নদ্বয়ে দর্শনশক্তি প্রদান করিয়াছিলে' (১।১১৬।১৬)। 'রেভ শত্রুগণ কর্ত্তৃক রজ্জুপাশে আবদ্ধ হইয়া দশরাত্রি নয়দিন জলের মধ্যে অবস্থান করিয়া বিপ্লুত ও বেদনা-কাতর হইলে হাত দ্বারা যেরূপ সোমরস উত্তোলন করে সেইভাবে উত্তোলন করিয়াছিলে (১।১১৬।২৪) এবং তাহার বিনষ্ট অবয়ব তোমাদের ভেষজের দ্বারা সংশোধন করিয়াছিলে' (১।১১৭।৪)। 'নৃষদ্ পুত্রকে শ্রবণেন্দ্রিয় দান করিয়াছিলে'

(১৷১১৭৷৮)। 'তিনভাগে বিভক্ত শ্যাব ঋষিকে জীবনদান করিয়াছিলে' (১৷১১৭৷২৪)।

'বুদ্ধিমতী ঘোষা* রোগ অপনয়নের জন্য তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল (১৷১১৭৷১৭) স্বামীপরিত্যক্তা পিতৃগৃহে বিষাদক্ষীণা জরাগ্রস্তা ঘোষাকে (রোগমুক্ত করিয়া) পতিদান করিয়াছিলে' (১৷১১৭৷৭)। 'বৃকের মুখ হইতে বর্তিকাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলে' (১৷১১৭৷১১)। 'শয়ু নামক ঋষির জন্য তাঁহার প্রসব-রহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে' (১৷১১৬৷২২)। 'পৃশ্নিগু ও পুরু কুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে' (১৷১১২৷৭)। 'কুৎস, শ্রুতর্য ও নর্যকে রক্ষা করিয়াছিলে' (১৷১১২৷৯)। উশিজের পুত্র বণিক দীর্ঘশ্রবাকে মেঘ হইতে সুমধুর জল আহরণ করিয়া দিয়াছিলে' (১৷১১২৷১৩)।' 'মান্ধাতাকে ক্ষেত্রপতির কর্ম্ম-সম্পাদনকালে রক্ষা করিয়াছিলে' (১৷১১২৷১৩)। 'অতিথি-বৎসল রাজর্ষি দিবোদাসকে শম্বর হননকালে রক্ষা করিয়াছিলে' (১৷১১২৷১৪)। 'মেধাবী ভরদ্বাজকে এবং ঋষি ব্রশ দস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে' (১৷১১২৷১৩, ১৪)। 'অথর্ব্বা-পুত্র দধীচি ঋষির স্কন্ধে অশ্বের মস্তক যোজনা করিয়া দিয়াছিলে' (১৷১১৭৷২২)।

এই সকল কীর্ত্তির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশ্বিদ্বয়কে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক হিসাবে দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ একটি মন্ত্রে বলা হইয়াছে 'প্রসিদ্ধ দেববৈদ্য অশ্বিদ্বয় আমাদের সুখ বিধান করুন; আমাদের পাপ হইতে মুক্ত করুন এবং শত্রুগণকে দূরীভূত করুন'' (৮৷১৮৷৮)। কিন্তু কয়েকটি মন্ত্রে দেখা যায় তাঁহারা প্রধান প্রধান দেবগণকেও রক্ষা করিয়াছেন যথা—'তোমরা তিন জগৎ হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া দিবারাত্রিসমন্বিত আকাশের সূর্য্যকে রক্ষা করিয়াছিলে' (১৷৩৪৷৮)। 'হে অশ্বিদ্বয়! পিতা মাতা যেরূপ পুত্রকে রক্ষা করেন, সেইরূপ তোমরা নিজশক্তিতেও অদ্ভুত কার্য্যদ্বারা ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে। দেবী সরস্বতী তখন ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত ছিলেন' (১০৷১৩১৷৫)। 'হে কল্যাণমূর্ত্তি অশ্বিদ্বয়! নমুচির সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, তোমরা উভয়ে সোমপান করিয়া ইন্দ্রকে রক্ষা করিয়াছিলে' (১০৷১৩১৷৪)। অশ্বিদ্বয় যে রণনিপুণ ছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের যুদ্ধে গমনকালে তাঁহারাও যে রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ এবং মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রের অনুগমন করিতেন রামায়ণে তাহা সুস্পষ্টভাবেই বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে; যথা—

ততো রুদ্রাঃ সহাদিত্যা বসবো মরুতোঽশ্বিনৌ।
সন্নদ্ধা নির্যযু স্তূর্ণং রাক্ষসানভিতঃ পুরাৎ॥

উত্তরাকাণ্ড, ২৭৷২২

রুদ্রৈ র্বসুভিরাদিত্যৈরশ্বিভ্যাং সমরুদ্গণৈঃ।
বৃতো নানা প্রহরণৈ র্নির্যযৌ ত্রিদশাধিপঃ॥

উত্তরাকাণ্ড, ২৮৷২১

ঋগ্বেদের বহুমন্ত্রে তাঁহাদের মহিমাব্যঞ্জক এবং প্রশংসা-সূচক অজস্র বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাঁহারা 'দ্রবৎ-পাণী, শুভস্পতী, পুরুভুজা' (ক্ষিপ্রপাণী, শুভকর্ম্মের পালক এবং দীর্ঘবাহু। ১৷৩৷১); 'পুরুদংসসা নরাঃ' (বহুকর্ম্মদক্ষ এবং নায়ক। ১৷৩৷২); 'অশ্বমঘা, গোমঘা' (অশ্বধনে ও গোধনে সমৃদ্ধ। ৭৷৭১৷১); 'সুরথা, রথীতমা' (উৎকৃষ্ট রথযুক্ত এবং রথীশ্রেষ্ঠ। ১৷২২৷২); অমর (৭৷৭৩৷১); রাক্ষসঘাতী (৭৷৭৩৷৩); নিত্যযৌবন (৭৷৭৬৷১০, ৭৷৬৭৷১০, ৭৷৬৯৷৮); কামবর্ষী (৭৷৭০৷৭); অভীষ্টবর্ষী (১৷১১৭৷৩,৪); জ্ঞানীগণ বন্দিত (৫৷৭৪৷৭); বিশুদ্ধকর্ম্মা (১৷২৫৷১১); দিবিস্পৃশা (স্বর্গবাসী; ১৷২২৷২) নৃপতৌ (নরগণের পালক, ৭৷১১৷৪); পুষ্টাঙ্গ ও দৃঢ়পাণি (৭৷৭৩৷৩); সুখদাতা (১৷৪৬৷১৩); সর্ব্বজ্ঞ (১৷৪৭৷৪); দ্যুতিমান ও আরোগ্যদাতা (১৷৯২৷৮); জরারহিত (১৷১১৬৷২০); শোভনদানশীল (১৷৪৭৷৮); ঋত-বৃধা (যজ্ঞবর্দ্ধনকারী, ১৷৪৭৷৩); বসুবিভ্রতা (পরম ধনদাতা, ১৷৪৭৷৬); পুরুবসু (প্রভূত ধনযুক্ত, ১৷৪৭৷১০); যুবাকবঃ (দয়ানন্দ কৃত অর্থ মিশ্রণ ও বিশ্লেষণতত্ত্বে পারদর্শী, ১৷৩৷৩); কল্যাণ মূর্ত্তি (১০৷১৩১৷৪ ইত্যাদি।

ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের নয়টি মন্ত্রে তাঁহাদিগকে 'মধুবিদ্যা বিশারদ' বলা হইয়াছে। এই মধুবিদ্যা ত্বষ্টার নিকট হইতে দধীচি লাভ করিয়াছিলেন এবং দধীচি তাহা অশ্বিদ্বয়কে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র পৌরাণিক আখ্যায়িকা অবলম্বনে তাঁহার সুবিখ্যাত 'বৃত্র সংহার' মহা-কাব্য রচনা করেন। সেখানে আমরা দেখিয়াছি দধীচি

স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং দধীচির আত্মোৎসর্গ প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় দধীচি আত্ম-রক্ষার জন্ত অশ্বিদ্বয়ের সহায়তায় নিজ স্কন্ধে অশ্ব মস্তক যোজনা করিয়া পলায়ন করেন এবং প্রতিদানে অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা শিক্ষা দেন। ইন্দ্র 'শর্য্যনাবৎ' নামক সরোবরে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে চারিটি মন্ত্র হইতেই আমাদের বক্তব্য সমর্থিত হইবে। ১ম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের দ্বাদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "অথর্ব্বার পুত্র দধীচি ঋষি অশ্ব মস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন।" ১১৭ সূক্তের দ্বাবিংশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অথর্ব্বা ঋষির পুত্র দধীচির স্কন্ধে অশ্বের মস্তক যোজনা করিয়া দিয়াছিলে; তিনিও সত্য পালন করিয়া ত্বষ্টার নিকট হইতে লব্ধ মধুবিদ্যা তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।" ৮৪ সূক্তের ত্রয়োদশ মন্ত্রে বলা হইয়াছে" অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতিবার বধ করিয়াছিলেন" এবং পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে "ইন্দ্র পর্ব্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্বমস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া সেই মস্তক শর্য্যনাবৎ সরোবরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

দশম মণ্ডলের ২৪ সূক্তের ৪র্থ ও ৫ম মন্ত্রে দেখা যায় বিমদ ঋষির প্রার্থনায় অশ্বিদ্বয় দুইখানি অরণি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করেন। যথা—'হে অশ্বিদ্বয়। যখন দুইখানি অরণি (অগ্নিমন্থন কাষ্ঠ) তোমাদের হস্তে সঞ্চালিত হইয়া একত্র মিলিত হইল, এবং অগ্নির স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, তখন সমস্ত দেবতাই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দেবতারা পুনরায় তোমাদিগকে ঐরূপ করিতে অনুরোধ করিলেন (১০।২৪।৫)। ইহা হইতে অনুমান হয় অশ্বিদ্বয়ই অরণি হইতে অগ্নি উৎপাদনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। ১ম মণ্ডলের ১১৭ সূক্তের ২১ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "তোমরা আর্য্যদের জন্ত লাঙ্গল দ্বারা চাষ করাইয়া, যব বপন করিয়া, বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, দস্যুগণকে বধ করিয়া আর্য্যদের প্রতি মহিমার পরিচয় দিয়াছ।" ইহা হইতে অনুমান হয় অশ্বিদ্বয়ই চাষপদ্ধতির উদ্ভাবক বা প্রবর্ত্তক।

অশ্বিদ্বয়ের অন্ততম প্রধান কীর্ত্তি রথ-চালনা-প্রতিযোগিতায় অপর দেবগণকে পরাজিত করিয়া 'ঊষা'কে বিবাহ করা। ঋভুগণ তাঁহাদের জন্ত যে অপূর্ব্ব একখানি সর্ব্বতোগামী (১।২০।৩) সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতবহনশীল (৮।২৬।৪) স্বর্ণময় (১।৯২।১৮; ৮।৮।১) সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল (৮।৮।২) রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা ত্রিকোণ, ত্রিবৃত্ত, ত্রিচক্র-বিশিষ্ট (১।১১৮।২) এবং তাহা মনের ন্যায় বেগবান (১।১১৮।১; ১।২০।৩)। এই রথে আরোহণ করিয়াই অশ্বিদ্বয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়াছিলেন। মন্ত্রে বলা হইয়াছে "হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের প্রশংসনীয় অশ্বদ্বয় তোমাদের রথে সংযোজিত হইয়া (প্রতিযোগিতার লক্ষ্যস্থল) আদিত্য পর্য্যন্ত সেই রথকে অন্ত সকল দেবগণের পূর্ব্বেই পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। কুমারী সূর্য্যা (ঊষা) এই রূপে বিজিত হইয়া 'তোমরা আমার পতি' এই কথা বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন (১।১১৯।৫)। "হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের দ্রুতগামী অশ্ব থাকায়, সূর্য্যের দুহিতা বিজিত হইয়া তোমাদের রথে আরোহণ করিলেন। সকল দেবগণ হৃদয়ের সহিত ইহা অনুমোদন করিলেন (১।১১৬।১৭)।

বেদে অশ্বিদ্বয় প্রথম হইতেই যজ্ঞভাগী ও সোমপায়ী। প্রত্যেক যজ্ঞেই তাঁহাদের যথাযোগ্য আবাহন করা হয় এবং অপর দেবগণের সহিত সমভাবেই হব্যাদি গ্রহণ করেন। যথা—"হে নাসত্যদ্বয়! এই যজ্ঞে শুভাগমন কর। হব্য দান করিতেছি, তোমাদের মধুপায়ী মুখ দ্বারা মধুর হব্য পান কর (১।৩৪।১০)। "হে নাসত্যদ্বয়! ত্রিগুণ একাদশ দেবগণের সহিত (ত্রিভিঃ একাদশৈঃ সচাভুবা) মধুপানার্থ এই যজ্ঞে আগমন কর" (১।৩৪।১১)। "হে অশ্বিদ্বয়! পুত্রগণ পিতার জন্ত যেরূপ উন্মুখ হয়, যজ্ঞগণ সেইরূপ তোমাদের জন্ত ঊর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে (ঋতে নোর্দ্ধা ভবন্তি পিতরেব মেধাঃ) ৩।৫৮।২। "সর্ব্বলোক তোমাদের আবাহন করিতেছে (বিশ্বে জনাসো অশ্বিনা হবন্তে ৩।৫৮।৪)। "হে অশ্বিদ্বয়! অতীব মধুর-রস-বিশিষ্ট সোম মিশ্রিত হইয়াছে, যজ্ঞশালায় প্রবেশ কর এবং সোম পান কর" (৩।৫৮।৯)। "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, আদিত্যগণ

রুদ্রগণ ও বসুগণের সহিত একত্রে এবং উষা ও সূর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া সোম পান কর—

অগ্নিনা ইন্দ্রেন বরুণেন বিষ্ণুনা আদিত্যৈর্রুদ্রৈঃ
বসুভি সচাভুবা।
সজোষসা উষসা সূর্য্যেন চ সোমং
পিবতাম্ অশ্বিনা॥ (৮।৩৫ ১)

"এই যজ্ঞে হব্য ভক্ষণকারী ত্রয়ত্রিংশৎ দেবগণের সহিত আগমন কর" (৮.৩৫।৭)। "হে ঋত্বিকগণ! অশ্বিদ্বয় প্রাতঃকালে সমস্ত দেবতার অগ্রেই উপস্থিত হন। তোমরা তাঁহাদের পূজা কর" (৫।৭৭।১)। "অশ্বিদ্বয় ব্যতিরেকে অন্যান্য দেবগণ সোমপানে প্রবৃত্ত হন না" (৫।৭৬।৩)।

১। দেবী ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়েও এই আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে।

২। সর্ব্বানুক্রমনীতে ঋষি কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

যস্য বাক্যঃ স ঋষিঃ যা তেন উচ্যতে সা দেবতা।
তেন বাক্যেন প্রতিপাদ্যং যদ্বস্তু সা দেবতা॥

অর্থাৎ মন্ত্রের যিনি প্রবক্তা তাঁহাকেই সেই মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। সেই মন্ত্রের প্রতিপাদ্যকেই সেই মন্ত্রের দেবতা বলা হয়।

৩। এই ঘোষা মন্ত্র দ্রষ্ট্রি মহিলা ঋষিদের অন্যতমা।

তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

(১৫)

সেদিন বিকেলটা কাটল দারুণ কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে। অপু আর অনু মিলে তাদের বাবাকে পরিষ্কার কাপড়-জামা পরিয়ে ভব্য করে তুলতে না তুলতে হুড়মুড় করে অনেকগুলি মানুষ এসে পড়ল। অভয়পদ, প্রবীর, হেমলতা, শান্তিলতা, রঞ্জন এবং তাঁরা সবাই বসতে না বসতেই ডাক্তারবাবুও এসে উপস্থিত হলেন। রামপদ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অভয়পদকে নিয়ে রোগীর ঘরে চললেন। অপু, অনুর তখন দারুণ ইচ্ছা নবাগতদের কাছে গিয়ে বসবার ও কথা বলবার, কিন্তু ডাক্তার এসেছেন তাদেরই বাবাকে দেখতে, সেখান থেকে তখুনি পালিয়ে আসা গেল না, খানিক দাঁড়িয়ে তাঁর কথার জবাব দিতে হল এবং তাঁর নির্দ্দেশ শুনতে হল। রামপদ পুত্রবধূকে আর তার বোনকে লক্ষ্য করে বললেন, "যা বলছেন সব ভাল করে শুনে রাখ। খাতায় লিখে রাখতেও পার তাহলে আর ভুলে যাবার ভয় থাকবেনা, গ্রামে ফিরে গিয়েও ঠিকমত চলতে পারবে।"

রোগী দেখতে খুব বেশী সময় লাগল না। তখন সবাই বসবার ঘরে চলল। অপুর বাবা অবশ্য শুয়েই রইলেন। তাঁর আর ভদ্রতা করে উঠতে ইচ্ছা করল না। অভয়পদ রান্নাঘরে গিয়ে তদারক করতে লাগল চায়ের কি রকম কি ব্যবস্থা হয়েছে। সাধারণতঃ এগুলো অপুই দেখে, তবে বেশী লোকজন এলে অভয়পদও চোখ বুলিয়ে যায়।

অপু আর অনু ঘরে ঢুকেই হেমলতার সামনে পড়ল। তিনি অনুকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, কি বললেন ডাক্তারবাবু তোমাদের বাবাকে দেখে?"

অপু বলল, "পুরনো রোগ, অনেক দিন ফেলে রাখা হয়েছে, সারতে সময় লাগবে। ওষুধ লিখে দিলেন আর খাওয়ার সব নিয়ম করে দিলেন।"

অনু বিজ্ঞভাবে বলল, "ও সব নিয়ম এখানেরই। গাঁয়ে ও সব কি কিছু পাওয়া যায়? সেই ভাত আর মুড়ি, মুড়ি আর ভাত। আটাটাও পাওয়া যায় না অর্দ্ধেক দিন।"

হেমলতা বললেন, "যতদিন এখানে আছ ততদিন ত নিয়ম মেনে চল। তারপর এখান থেকে ত জিনিষ পাঠান যায়, বর্দ্ধমান থেকেও নেওয়া যায়, এমন ত কিছু দূর নয়।"

অনু এর উত্তরে কিছু বলল না, নিজেদের অসুবিধা আর দৈন্য যে কতখানি তা হেমলতার কাছে প্রকাশ করার ইচ্ছা তার ছিল না।

শান্তিলতা আর অনু এক বয়সীই প্রায়, দুজনেই দু জনকে নাম ধরে ডাকে। শান্তি বলল, "অনু আরো লম্বা হয়ে গেছে। আমি সেই আগের মতই আছি। স্বর্ণও আমাকে ছাড়িয়ে গেছে।"

অনু বলল, "কোথায় আর আগের মত? কত গোল-গাল হয়েছ, ফরসা হয়েছ মেমসাহেবের মত। হঠাৎ দেখলে সেই শান্তি বলে আর চেনাই যায় না।"

হেমলতা বললেন "কলকাতার জল হাওয়ার গুণ আছে ত? তাছাড়া আমি যার পিছনে লাগি তাকে কি সহজে ছাড়ি? আইবুড়ো মেয়ে, কত যত্নে রাখি।"

রঞ্জন ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, "আর আমি বুঝি আইবুড়ো মেয়ে নয়? আমাকে কেন ফরসা করছ না তুমি? আমি ত আগের মতই কেলে হয়ে আছি।"

হেমলতা হেসে বললেন, "কেন্দে থাকবে না গো থাকবে না। আগে শান্তি দিদি, স্বর্ণ দিদির পালা শেষ হোক, তারপর তোমাকে নিয়ে পড়ব।"

অপু বলল, "আমার উষাকে দিয়ে আসব আপনার কাছে।"

হেমলতা বললেন, "কেন, ওকি কাল নাকি? দিব্যি উজ্জ্বল শ্যাম রঙ, বয়সের সঙ্গে দেখো, ও ফরসাই হয়ে দাঁড়াবে। আমার মায়ের মুখ পেয়েছে ও, সুন্দরী হবে ঠিক।"

অভয়পদ ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, "আর আমার উষারাণী? ও কার মত দেখতে হয়েছে?

হেমলতা বললেন, "এত ছোটতে বোঝা যায় না। আর বছর দুই গেলে মোটামুটি মুখের ধাঁচ বোঝা যাবে। রং ত খুব ফরসাই আছে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় যেন তোর মায়ের মুখের আদল আসে। সে হলে ত কথাই নেই, অমন চেহারা বাঙালীর ঘরে দেখাই যায় না।"

ক্রমাগত রূপের আলোচনা শুনে শুনে অমু মনে মনে উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল, সে এ সময়ে বলল, "শান্তির যদি সম্বন্ধটা পাকা হয়ে যায়, তাহলে বিয়ে কোন্ মাসে হবে?"

হেমলতা বললেন, "তা হলে ত মাসখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে। ওরা দেরি করতে চায় না, আমরাও কিছু দেরি করতে ব্যস্ত নয়।"

অমু বলল, "ততদিনে যদি আমরা ফিরে যাই তা হলে শান্তির বিয়েটা আমার দেখা হয়ে যাবে।

হেমলতা বললেন, "তোমরা এরই মধ্যে ফিরে যাবে নাকি? এইটুকু সময়ে কি অত পুরনো রোগের কোনো উন্নতি হবে?"

অপু বলল, "ওদের খুব বেশী দিন থাকবার ত সুবিধা নেই। মায়েরও শরীর ত খুব খারাপ, একলা সব কাজ করে উঠতে পারেন না। তার উপর বাইরের কোন কাজ ত তিনি করতেই পারেন না। দাদা শহরেই বেশীর ভাগ থাকে, আসে কম। কাজেই বাবাকেই যেমন করে হোক জমি-জমা দেখতে হয়।"

অভয়পদ বলল, "এ ক্ষেত্রে রুগ্ন বাবাকে টানাটানি না করে দাদাকে এসে ও-সবের তদারক করতে বললেই হয়।"

অমু বলল, "ও কারো কথা শোনে নাকি? বাড়ীতে থাকতে কিছুতেই চায় না, না খেয়ে শহরে পড়ে থাকে সেও ওর ভাল। বাড়ীর নামে ওর গায়ে জ্বর আসে।"

অভয়পদ বলল, "একটা কিছুর ট্রেনিং নিয়ে নিতে হয় তাহলে। পেটে কোন বিদ্যে না থাকলে শুধু শুধু শহরের রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে কি হবে? আখেরে ত গ্রামেই এসে বসতে হবে, আর যখন কোথাও কিছু নেই।"

হেমলতা বললেন, "ওর বয়স কত হল?"

অমু বলল, "দিদির চেয়ে বছর-দুইয়ের বড়। সেই কবে পড়াশুনো ছেড়ে বসে আছে, এখন আর নূতন করে কি শিখবে?"

অভয়পদ বলল, "পড়াশুনোর ট্রেনিং ছাড়া অন্য নানা-রকম কাজের ট্রেনিং আছে, তা সহজেই নিতে পারে। দেখি, শান্তির বিয়ে যদি এমাসে হয় তখন গ্রামে ত যাবই ও ত তখন নিশ্চয়ই আসবে! ধরে পড়ে তখন তাকে বোঝাতে হবে। ভদ্রলোকের ছেলে ত বটে, একটা ভদ্র-গোছের কিছু করে তাকে খেতে হবে।"

অমু বলল, আপনার কথা শুনলেও শুনতে পারে। আর কারো কোন কথা কানেই নেয় না। বাবা মার উপর ওর ভয়ানক রাগ।"

অভয়পদ মনে মনে বলল, "তা রাগ হতেই পারে। জন্ম দিয়ে তারপর মাঠে চরতে ছেড়ে দিলে কেবা খুশী হয়।"

অমু একটু পরে বলল, "জামাইবাবু, আপনি যদি শান্তির বিয়েতে যান, দিদিকে আর বাচ্চাদের নিয়ে যাবেন ত? ওদের কতদিন দেখেন নি মা, উষাকে ত একবারও দেখেন নি। কলকাতায় এসে দেখার ত তাঁর উপায় নেই।"

অভয়পদ বলল, "দেখি, তখন সকলের শরীর ভাল থাকে তবে না? বাচ্চাগুলি ত এমন শহুরে যে পান থেকে চুন খসলেই তাদের অসুখ। হাঙ্গামা কি তাদের নিয়ে কম? তাঁদের আয়া নিতে হবে, পেরাম্বুলেটার নিতে হবে, বিশেষ সব খাবার নিতে হবে, তবে না?"

হেমলতা বললেন, "এ আবার তোর অন্যায় কথা

বাপু। শহরে জন্মেছে বলে তারা দেশ গাঁ কখনও দেখবে না নাকি? কেন, ছোটবেলায় ত কতদিন ধরে একটানা গ্রামে থাকতিস্, তোর কি অসুখ করত! তোরা সঙ্গে থাকবি, আমরা বুড়োর দল থাকব। দিদি ত পাকা গিন্নি, সবরকম সুবিধা করে দেবে, কেন, বাচ্চাকাচ্চার অযত্ন হবে কেন?"

হেমলতার মুখে এত মুখরোচক কথা অপু কোনোদিন শোনেনি। মনে মনে বলল, "যতই কাঁ্যাট কাঁ্যাট করে কথা শোনান, ছোট পিসীমার বুদ্ধি বিবেচনা যথেষ্ট আছে বাপু।"

অভয়পদ পিসীর কথার উত্তরে বলল, "দেখি সব দিক্ ভেবে চিন্তে। বাবাকেও বলতে হয়।"

এই সময় চায়ের জোগাড় এসে পড়াতে সকলের মন সেইদিকে চলে গেল। হেমলতা ভাইঝিদের সরিয়ে নিজেই চা ঢালতে আরম্ভ করলেন। অপু আর ভগীরথ খাবার পরিবেশন করতে লাগল। উষা উমা তৎক্ষণাৎ ভাগ নিতে আসরে অবতীর্ণ হলেন।

হেমলতা চা ঢালা সেরে উমাকে ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিলেন। মস্ত একটা সন্দেশ তার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "এস দেখি ক্ষুদে মহারাণী, তুমি কার মত দেখতে হয়েছ দেখি।"

উমা সন্দেশ পেয়ে খুশী হয়ে বলল, "তোমার মত।"

সবাই হাসল, হেমলতা বললেন, "পোড়া কপাল! আমার মত দেখতে হতে যাবে তুমি কোন্ দুঃখে? আমি ত কেলে পেত্নী। তোমার একজন লাল টুকটুকে ঠাকুরমা ছিল, তুমি তার মত দেখতে হবে।"

রঞ্জন অত্যন্ত চটে বলল, "মা যে কি ছাই ছাই কথা বলে তার ঠিক নেই। কেন তুমি নিজেকে কেলে পেত্নী বলবে?"

অভয়পদ সকলকে থামাবার চেষ্টায় বলল, "থাক, থাক, এখন রূপের আলোচনা থাক। কেউ কেলে পেত্নী নয় সবাই ভাল। ছোট পিসীমা কেন যে বাচ্চাদের ভড়কে দেও, আশ্চর্য্য সব কথা বলে। তোমায় ওসব বিনয় তারা বোঝে না।"

প্রবীর কথাবার্ত্তার মোড় ফিরবার জন্যে বলল, "শান্তি কিন্তু সব গোছগাছ করে তৈরি থাকিস। আমি বারটার ট্রেনে যাচ্ছি, একেবারে খেয়ে দেয়ে এখান থেকে বেরিয়ে, মাসীমার বাড়ী থেকে তোকে তুলে নিয়ে সোজা ষ্টেশনে চলে যাব।"

অপু বলল "মা আর ছোট ভাই বোনগুলোর জন্যে কিছু মিষ্টি দেব, সেটা তোমার বাক্সে ঢুকবে ত?"

প্রবীর বলল, "বিরাট্ পেঁটুলা কোরো না, তা হ'লে ধরে যাবে।"

হেমলতা বললেন, "যাও-না তুমি কি দেবে। শান্তিও ত সুটকেস্ নিচ্ছে, তাতে বেশী কিছু যাবে না। ক'দিন থাকবে তার ত ঠিক নেই, বেশী কিছু নিচ্ছে না। দু-দশ দিন পরে যদি ফিরে আসে, তাহলে আর কিছু দরকার হবে না। আর বিয়ে যদি ঠিক হয়ে যায় তখন ত নূতন পুরনো অনেক জিনিষই পাঠাতে হবে।"

অপু বলল, "শান্তির বিয়ের অনেক জিনিষ-পত্রই আপনি এখন থেকে করে রেখেছেন, না পিসীমা?"

হেমলতা বললেন, "কাপড় চোপড় অনেক করিয়েছি, ওতে সময় লাগে ঢের ত? অন্য জিনিষ বিশেষ কিছু করাই নি। গহনাও তোমার বিয়ের সময় যা হয়েছিল তার বেশী বিশেষ কিছু হয়নি, আমি গোটা-দুই হাল্কা জিনিষ করিয়েছি। বিয়ে ঠিক হলে গহনাগাঁটি আর কিছু কিছু করতে হবে। নগদ কিছু চাইবে কি চাইবে না, তার উপর নির্ভর করে আর কি?"

প্রবীর বলল, "আমার ত মনে হয় না কিছু চাইবে, নিজেরা আগ্রহ দেখাচ্ছে যখন।"

চা খাওয়ার পর্ব এতক্ষণে শেষ হল। হেমলতা উঠে পড়ে বললেন, "চল বৌমা, তোমার বাবাকে একবার দেখে যাই।"

অপু আর হেমলতা রঞ্জন শান্তি সবাই চলল রোগীকে দেখতে। অপুর বাবা খাটের উপর উঠে বসে সকলের অভিবাদন নিলেন ও হেমলতার কথায় দু-চারটে উত্তর দিলেন। বেশী কথা বলাটা তাঁর পক্ষে সহজ হচ্ছে না দেখে সবাই বেশীক্ষণ আর সেখানে দাঁড়াল না। এ

অপছন্দ করবার কোনো কারণই নেই, তবে গ্রামবাসী প্রৌঢ় প্রৌঢ়ার চোখে কেমন লাগবে কে জানে? ছেলে ত আগে আগে পছন্দ করেই রেখেছে মনে হয়। কনকলতা লিখে পাকা গৃহিণী, সাজাগোছাতে খুব ভালরকমই জানেন, সে দিকে কোনো ত্রুটি হবে না। তবু হেমলতার ছটফটানি যায় না। রাতে তার ঘুমই হয় না ভাল করে।

শেষরাত্রির দিকে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে অন্যদিনের চেয়ে তাঁর উঠতে দেরিই হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি করে মুখ হাত ধুয়ে চা জলখাবারের জোগাড় করছেন, এমন সময় সদর দরজায় কে কা দিল। রান্নার চাকরটা তখন বড় ব্যস্ত, কাজেই নিজে গিয়েই তিনি দরজা খুলে দিলেন। গ্রামের মুরারী দাঁড়িয়ে!

হেমলতা বললেন, "এস, সাতসকালে কোথা থেকে তুমি এলে ভাই? হাসিমুখ দেখে বুঝছি যে কোনো ভাল খবরই এনেছ। এস, ভিতরে এস।"

মুরারী ঘরে ঢুকে বলল, "ঠিকই ধরেছ হেমদি। ভাল খবর না হলে কি আর এমন উঠতে পড়তে ছুটে এসেছি? চা সুদ্ধ ভাল করে খাইনি। এই নাও চিঠি, এতেই সব খবর পাবে।"

দিদির চিঠি হাতে করে হেমলতা সেখানেই বসে গেলেন পড়তে। চাকরকে ডেকে বলে দিলেন আর একজনের জন্যে বেশী চা করতে।

কনকলতা লিখেছেন,

"কল্যাণীয়াসু হেম, আমাদের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। বরের মা-বাবা দুজনেই এসেছিলেন। আমার বড়ঘরেই কনে দেখালাম, সেটাইত আমাদের নিয়ম। শান্তিকে স্বর্ণর সেই বেনারসীখানা পরিয়েছিলাম, সেটা ও অভয়ের বিয়ের সময় পেয়েছিল। গহনা ত খানিক ওর গায়েই ছিল, তার উপর স্বর্ণর কঙ্কন আর আমার হারছড়াও দিয়ে ছিলাম। বেশ ভাল দেখাচ্ছিল, মেয়ে ত আমাদের মন্দ নয়?

"বরের মা চমৎকার মানুষ। বাপটি কিছু গম্ভীর তবে গোমড়ামুখো নয়। গিন্নিটি হাসিখুশি সাদাসিদে। বললেন, 'আমরা ভাই দুজনেই এসেছি, যাতে পরে কেউ কাউকে দুষতে না পারে। পছন্দ করব তা প্রায় ঠিক করেই এসেছি। তারপর তোমাদের পরিবারের কথা এ অঞ্চলে কে না জানে? মেয়ে চোখে না দেখি, তার বর্ণনা সবই শুনেছি। এখন চোখে দেখাটাও হল। চমৎকার মেয়ে ভাই তোমার, বাঙালীর ঘরে এর চেয়েও সুন্দর আবার কি হবে? সব চেয়ে ভাল কি জান ভাই, এর গ্রামে থাকার অভ্যাসও আছে, শহরে থাকার অভ্যাসও আছে, দুজায়গায়ই মানিয়ে নিতে পারবে। নাও এখন আশীর্বাদের দিন দেখ। বিয়ে কিন্তু একমাসের মধ্যেই দিতে হবে। জোগাড়যন্ত্র করা হয়ে উঠবে না বলে যে দেরি করবে তা হবে না। যা জোগাড় হবে তাতেই চলবে, আমাদের কিছু বেশী চাই নেই। মেয়েটি সুন্দর হয়, ভালবংশের হয় এই হল আসল কথা।"

এর পরই কনকলতা অন্য ঘরোয়া কথা লিখেছেন।

হেমলতা চিঠি পড়া শেষ করে চট্‌পট্ উঠে পড়লেন, বললেন, "বোসো ভাই, এত ভাল খবর এনেছ, ভাল করে চা মিষ্টি খেয়ে যাও। এখনি হয়ে যাবে, আমি তাড়া দিচ্ছি। পাড়ার অন্য লোকেরাও ততক্ষণে সবাই উঠে গিয়েছে, অনেকেই সামনের ঘরে এসে ঢুকল। হেমলতা চাকরের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জলখাবার চা সব এনে হাজির করলেন। সকালে ভাল করে চা না খেতে পাওয়ার দুঃখটা মুরারীর ভাল ভাবেই কেটে গেল।

সকালের দিকে অত্যন্ত কাজ বেশী, কলেজ স্কুল আছে অফিস আদালত আছে, কাজেই সকালের দিকে আর দাদার বাড়ী যাবার ব্যবস্থা হেমলতা করতে পারলেন না। দুপুরে গেলে লাভ নেই, কারণ দাদা বা অভয়পদ কাউকেই বাড়ীতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং হেমলতা যতই অসহিষ্ণু হোন, ধৈর্য্য ধরে তাঁকে বিকেলের জন্যে অপেক্ষা করতেই হল। অবশ্য এরই মধ্যে তিনি একবার বাজার ঘুরে এলেন, কি একটা বিশেষ রং-এর ব্রাউন্ পিন্ কেনার জন্যে।

যা হোক, বিকেলটা কোনো মতে এল। এইবারে হেমলতা মহোৎসাহে বেরিয়ে পড়লেন। মণ্ডন তাঁর শাড়ীর

আঁচল চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে চলল, কিছুতেই ছাড়ল না। গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে বেশী দেরি লাগল না, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতেই দেখতে পেলেন যে রামপদ নিজের ঘরে খাটে শুয়ে আছেন। "ও দাদা, দাদা", বলে ডাকতে ডাকতে সোজা তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

রামপদ উঠে বসলেন। হেমলতার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে অভয়পদ, অপু, অনু সবাই প্রায় ছুটে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

রামপদ বললেন, "ইস্ একেবারে হাঁপিয়ে পড়েছিস যে? বোস, বোস্, কি ব্যাপার?"

হেমলতা বললেন, "শান্তির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল দাদা। এক মাসের মধ্যেই বিয়ে।"

রামপদ হাসিমুখে বললেন, "খুব ভাল খবর। কিন্তু এক মাসের মধ্যে হয়ে উঠবে কি? ভয়ানক তাড়াহুড়ো হয়ে যাবে না?"

হেমলতা বললেন, "বরপক্ষ দেরি করতে একেবারেই রাজী নয়। বলছে যা জোগাড় হবে তাতেই তারা খুশী, তাদের বেশী কিছু দাবিদাওয়া নেই। আমিও বলি তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল। শান্তির এত ভাল বিয়েতে ঢের লোকেরই চোখ টাটাবে। হিংসুটে লোকের ত অভাব নেই কোথাও? ভাংচি দেওয়া সবই চলবে। যত কম সময় হাতে পায় ততই ভাল। আর বিয়ের কাজ আমরা দুই বোনে খানিক খানিক এগিয়েই রেখেছি। গহনা কাপড়-চোপড় সব বেশীর ভাগই তৈরি হয়ে এসেছে। বাকি বরের জিনিষপত্র, আসবাব আর তত্ত্বতালাশের জিনিষ। এই পর্যন্ত আমরা এখানে বসে করতে পারি, বাকি সব ওখানে না গেলে ত বোঝা যাবে না। আশীর্বাদের দিন ঠিক হলেই দিদি টেলিগ্রাম করবে, আমি অমনি গিয়ে হাজির হব সব খুঁটিয়ে জেনে নেব। দিদিও নিশ্চয়ই হাত পা গুটিয়ে বসে নেই, সেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।"

এমন সময় অপু একটা অসমসাহসিক কাজ করে বসল। সামনে এগিয়ে এসে, রামপদর মুখের দিকে চেয়ে বলল, "বাবা, আমরা যাব না শান্তির বিয়েতে?"

অভয়পদ এমন জোরে চমকে উঠল যে আর একটু হলেই লোকের চোখে ধরা পড়ত। পিছনে ছিল বলে তত কেউ লক্ষ্য করল না। রামপদ পুত্রবধূর ব্যগ্র মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাব বৈ কি মা, সবাই যাব। এই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রথম মেয়ের বিয়ে, সবাইকেই যেতে হবে।"

অভয়পদ বাপের কথার উপর কথা বলে না, তবু ঠেকায় পড়ে ক্ষীণস্বরে বলল, "এদের সব এখন নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে?"

রামপদ বললেন, "ঠিক হবে না কেন? বাধা ত কিছু দেখছি না।"

অভয়পদ বলল, "শরীর ত ভাল নয়।"

রামপদ কিছু বলার আগেই হেমলতা বলে উঠলেন, "কার আবার শরীর ভাল নয়? বউয়ের কথা বলছিস্? দু-মাস পরে বাচ্চা হবে, তার এখন কি? আমরা কি ওখানে দুমাসের জন্যে যাচ্ছি? বড় জোর দিন দশ থাকা হবে। যদি দৈবাৎ কিছু হয়, তাতেই বা কি? আমরা দুই পিসশাশুড়ী থাকব, ওর মাও এসে পড়বে। আর এখন গ্রাম কি সেই আগের গ্রাম আছে নাকি? এখন হাঁসপাতাল হয়েছে, তাতে মেয়েদের ওয়ার্ড হয়েছে, ভাল ডাক্তার রয়েছে চব্বিশ ঘণ্টা, পাশ করা ধাত্রী রয়েছে। বিপদটা আসবে কোন্ দিক দিয়ে?"

রামপদ বললেন, "সেরকম বিপদ কিছু হবার সম্ভাবনা আমি ত কিছু দেখছি না। ওর প্রথম দুটি বাচ্চা অতি সহজে হয়েছে, এবারও তাই হবে। যদি দরকার কিছু একটা হয় ত বর্দ্ধমান অতি কাছে, সেখানে সবরকম সাহায্যই পাওয়া যাবে। কলকাতাও বিশেষ দূর কিছু নয়।"

হেমলতা বললেন, "তবেই দেখ বাছা, আমরা বনে জঙ্গলে কোথাও যাচ্ছি না।"

অভয়পদ আপত্তি তোলায় অপুর মুখটা প্রায় কাঁদ-কাঁদ হয়ে এসেছিল, এখন রামপদ আর হেমলতা এমন প্রবলভাবে তার পক্ষ সমর্থন করায় তার মুখে আবার হাসি ফুটল। অভয়পদ বিরক্ত গম্ভীর মুখে সেখান থেকে সরে গেল এবং চটি ছেড়ে অন্য জুতো পরে একেবারে বাড়ী ছেড়েই বেরিয়ে গেল। এখন ঘরে থাকলে অপুর

সঙ্গে ঝগড়া হওয়া সুনিশ্চিত, সেটা ত আর বাবা বা ছোট পিসীমার সামনে করা চলে না?

অপু আর অনু ফিরে এসে শোবার ঘরে ঢুকল। অনু বলল, "জামাইবাবু খুব রেগে গেছে না রে দিদি?"

অপু মুখ গোঁজ করে বলল, "রাগুক গিয়ে। আমি যেন একটা মানুষ নয়। আমার আর কিছু সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই। শ্বশুরমশায় মত দিয়েছেন, বাস, আমি যাবই তাঁর সঙ্গে। তোর জামাইবাবু রাগ করে ত আর আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না?"

অনু বলল, "তা কি আর পারে? তবে ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি করবে।"

অপু বলল, "অশান্তি এমনিতেও হবে, অমনিতেও হবে। আমি অগ্রাহ্য করব না আমাকে আটকালে? শ্বশুর-মশায়ের মত নিয়ে, তাঁর সঙ্গে যাচ্ছি আমি, ও কোন্ সাহসে আমাকে আটকাবে?"

এদিকে রামপদ আর হেমলতা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। রামপদ বললেন, "বিয়ের দিনের খরচটা ত একটা মস্ত খরচ। আত্মীয় দাওয়াৎ, বরযাত্রী আপ্যায়ন, মণ্ডপ বাঁধা, আলোর ব্যবস্থা, বাজনা সবেরই খরচ। তারপর তত্ত্বের খরচ। ওরা যখন কিছু দাবী করছে না, তখন বস্তু আমাদের ভাল করেই করতে হবে। সব জড়িয়ে মহৎ ব্যাপার, কনক কি এর ব্যবস্থা কিছু করতে পারবে?"

হেমলতা বললেন, "কোন ত এখনও কিছু, গিয়ে দেখব। তুমি টাকার জোগাড়টা কর, তারপর ওর গহনা দেবে, নয় খরচ, খরচা বাবদ ঐ টাকা ধরে দেবে। অবিশ্যি বউ ছেলেপিলে আর সব নিয়ে যেতেও কিছু লাগবে।"

রামপদ বললেন, "সেটা এমন কিছু বৃহৎ ব্যাপার নয়। অতি কম দামের টিকিট, কতটুকুই বা দূর এখান থেকে? আর যাচ্ছেই বা ক'জন? আমি, ছেলে বউ, নাতনী দুটি, তা তারা এখনও বিনে টিকেটের যাত্রী, আর তাদের আয়া।"

হেমলতা বললেন, "আর তোমার বেয়াই আর অপু? তাদের ত তুমি এই খালি বাড়ীতে রেখে যেতে পারবে না?"

রামপদ বললেন, "হ্যাঁ, তারাও আছে বটে, তাদে সঙ্গেই নিতে হবে। তারপর আমরা নেমে যাবার প ওরা সোজা চলে গিয়ে নিজেদের গ্রামে নামবে। আ পনেরো মিনিটের পথ বাড়ীর লোকে এসে নামিয়ে নেবে।"

হেমলতা বললেন, "তোমার ছেলের যা মুখের ভা দেখলাম, তাতে সে যে তোমাদের সঙ্গে যাবে তা মনে হচ্ছে না। গেলেও পরে বিয়ের দিন যাবে।"

রামপদ বললেন, "স্বভাবটা ওর বড় একগুঁয়ে আ জেদী। অল্পবয়সে মা মারা গিয়ে এটা হয়েছে, কোনো শাসন ত ছিল না? ও মনে করে সব বিষয়ে ওর মতটা গ্রাহ্য, আর কোনো কথা শুনবারই দরকার নেই।"

হেমলতা বললেন, "বউটাকে পেয়েছে হাবা গোবা ভীতু, যত খুশি চেঁচাচ্ছে।"

রামপদ বললেন, "স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির কথা বলা উচিত নয় ভেবে আমি অনেকগুলো ওদের কথায় থাকি না। ভাবি, চিরকাল যখন একসঙ্গে থাকতে হবে তখন যেমন করে পারে মানিয়ে নিক। কিন্তু এখা অজয়কে বাধা না দিলে অপুর প্রতি অন্যায় অবিচা হত, অগত্যা জোর করেই নিয়ে যেতে হবে। হো অশিক্ষিত গরীবের মেয়ে, তারও ত মানুষের প্রাণ?"

হেমলতা বললেন, "ভালই করছ দাদা। আমাদে মত থাক যা নাই থাক, দাঁড়িয়ে বিয়ে ত দিয়েছি আমরা মেয়েটার এত হেনস্থা হতে দেব কেন? আচ্ছা চ এখন। দিদির টেলিগ্রাম এলেই জানাব।"

অজয়পদ আর অপু রাত্রিতে ঝগড়া করল কি না ত বাইরের কেউ অন্ততঃ জানতে পারল না। পরদিন দেখ গেল সে চা খেয়েই বাড়ীর থেকে বেরিয়ে গেল, আবা ঘণ্টা দেড় পরেই ফিরে এসে নেয়ে খেয়ে কলেজে চলে গেল। অপু অম্লানবদনে নিজের কাজকর্ম করে যেতে লাগল, মাথা কুটবার বা কাঁদবার কোনোই লক্ষণ দেখা না। এতদিন নীচু হয়ে থেকে থেকে সে এবার মরী হয়ে গেছে। সে হার মানবে না, অজয়পদর যা খুশি

করুক। শ্বশুরমশায় ত তার পক্ষে, আর তিনিই আসল বাড়ীর কর্তা। অভয়পদ বোকা নয়, সে জানে কত ধানে কত চাল হয়। সোজাসুজি বাপের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাতে সে কখনও সাহস করবে না।

বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার খবরটা এল সোমবারে, মঙ্গলবারটা চুপচাপ রইল। আবার বুধবার হতে না হতেই টেলিগ্রাম এল যে শুক্রবারে ভাল দিন আছে, সেইদিনই শান্তির আশীর্বাদ হবে, হেমলতা যেন নিশ্চয় আসেন সেদিন।

হেমলতা ত এক পা বাড়িয়েই ছিলেন। তিনি ছুটলেন স্বামীর কাছে। বললেন, "তাহলে পরশু ভোরেই আমি যাচ্ছি বাপু, সমস্ত খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে আমি তার পরদিনই ফিরব। দিদির যা কিছু করতে হচ্ছে সব নিয়েই যাব। [illegible] ভাবে, সব একসঙ্গে নিয়ে [illegible] প্রাণ হয়ে যাবে, [illegible] পার টাকাকড়ি [illegible]।"

[illegible] উৎসাহে জিনিষপত্র গোছাতে লাগল। [illegible] বাড়ীতে থাকেন না তখনই এ কাজগুলো [illegible] সাহায্য করত। বাচ্চাদের জন্য [illegible] কিছু নিতে হবে, তা আবার খাড়ুইর সাহায্যে আনাতে লাগল। অভয়পদ পরম ঔদাসীন্য দেখিয়ে দূরে থেকে আলাদা হয়ে রইল, এরা যেন তার কেউ না। কিন্তু তাতেও স্ত্রীর ভাবের কোনো বৈলক্ষণ্য না দেখে মনে মনে একটু শঙ্কাকুল হয়ে উঠতে লাগল। বাবা যার ছোটদিদিমা এত দিয়ে অপুর বাড় বাড়িয়ে রেখেছেন, সে মনে করছে অভয়পদর বাধ্য হয়ে চলার তার আর কোনো দরকার নেই।

হেমলতা শনিবারেই ফিরে এলেন। রামপদ তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, সকাল সকাল বেরিয়ে যাননি। হেমলতা এসে ধপ্ করে খাটে বসে পড়ে বললেন, "বাবাঃ, হাঁপিয়ে গেছি। সব দেখে শুনে এলাম। দিদি যা হোক গিন্নী বটে, ঠিক আমাদের মায়ের মত, এত গুছিয়ে কাজ করে।"

রামপদ জিজ্ঞাসা করলেন, "আশীর্বাদ ভালয় ভালয় হয়ে গেছে ত? কি দিয়ে আশীর্বাদ করল ওরা? ক'জন লোক এসেছিল? এরা কবে যাচ্ছে ছেলেকে আশীর্বাদ করতে?"

হেমলতা বললেন, "সব ঠিকমত হয়েছে। ওরা জড়োয়া নেকলেস দিয়েছে। লোক খুব বেশী আসেনি, অন্য সময় হবে। এরা যাচ্ছে কালই আশীর্বাদ করতে।"

রামপদ বললেন, "আর কি শুনে এলি?"

"শুনলাম সবই। এরই মধ্যে দিদি অনেক ব্যবস্থা করে ফেলেছে। আমাদের থাকবার জায়গা করেছে মেজ কাকীমার বড় ঘরে। কাকা মারা যাবার পর, মেজকাকীমা ত আর বাড়ীতে থাকেন না, কাশীতে রয়েছেন বোনের কাছে। তাঁর শরীরের যা অবস্থা শুনি তাতে আর ফিরবেন না। ছেলেরা তাঁর ঘর এখনও দখল করেনি, দিদিকে এই ক'টা দিনের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে। দিদি ঝাড়িয়ে, নিকিয়ে বেশ পরিষ্কার করে নিয়েছে। মুরারিকে দিয়ে মোটা চটের একটা পার্টিশন করিয়ে দুভাগ করেছে। ছোট ভাগটায় তুমি আর তোমার ছেলে থাকবে, যদি সে যায়। আর বড় দিকটায় আমি অপু, তার দুই বাচ্চা আর রতন। আয়াটাও শোবে ঐ ঘরে। অনুকেও ধরিয়ে নেওয়া যাবে ঐ ঘরে যদি তার মায়ের সঙ্গে জায়গা না হয়।"

রামপদ জিজ্ঞাসা করলেন "কনক তার শ্বশুরবাড়ীর লোকদের জন্যে কোথায় জায়গা করেছে? তারা কে কে আসছে?"

হেমলতা বললেন, "ঐ যাঃ আসল কথাটাই বলা হয়নি। দিদি এবার তার শ্বশুরবাড়ীর উপর খুব এক চাল চেলেছে। ওরা ত কোনও দিন দিদিকে এক পয়সা দেয়নি, সব নিজেরা লুটে খেয়েছে, বাড়ীটাও সবটাই দখল করে বসে আছে। এবার দিদি বললে, "আমার প্রথম এই কাজ। মেয়ের বিয়ের জন্যেও কি আমি দাদার

কাছে ভিক্ষে চাইতে যাব? কেন, ওর বাপের কি কিছু নেই? জমি জমাতে আমাদের যা অংশ আছে, বাড়ীতে যা অংশ আছে সব আমি বেচে দেব।' জামাইবাবু বললেন, "রোস আমি প্রথমে মেজকর্ত্তাকে বলে দেখি।' মেজকর্ত্তা প্রথম তেরিমেরি করল, কিন্তু দিদি কিছুতেই ঘোট ছাড়ে না। তখন এধার ওধার ধারধোর করে স্ত্রীর গহনা বেচে দেড় হাজার টাকা ধরে দিয়েছে। জামাই-বাবুও ওর নামে নিজের অংশ লেখাপড়া করে দিয়ে দিয়েছেন। দিদি বলল, এইতেই তার সব খরচ কুলিয়ে যাবে, তোমাকে আর দিতে হবে না। তুমি আমার টাকাটা দিয়ে দাও, আমি একেবারে স্যাকরার বাড়ী হয়ে ফিরব, হার আর কঙ্কন অর্ডার দিয়ে।"

রামপদ হেসে বললেন, "ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, ভগবান্ সবই দেখেন। তা ওরা কি এর পর কেউ আসবে?"

হেমলতা বললেন, "তোমার বেয়ান ত যাবেনই, অনুকে আর ছোট ছেলেটাকে নিয়ে। ওরা কেউ ত মেজ কর্ত্তার উপর খুশী নয়, সকলকেই সে ঠকিয়েছে। মেজ কর্ত্তার খুব ইচ্ছা ছিল না এরপর, কিন্তু স্ত্রী ভজিয়ে ফুশলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তার আর লীলার ভয়ানক সখ শান্তির বিয়ে দেখবার। মেজ কর্ত্তা জামাইবাবুর ঘরেই থাকবে আর গিন্নীরা ছেলেমেয়ে নিয়ে দিদির ভাঁড়ারঘরে থাকবে, সেটাও দিদি ঐ রকম পার্টিশন দিয়ে পুজোর ঘর থেকে আলাদা করে দিয়েছে।"

রামপদ বললেন, "তা হলে কনক ত সবই গুছিয়ে ফেলেছে দেখছি। বিয়ের দিন কিছু ঠিক হয়েছে?"

হেমলতা বললেন, "হ্যাঁ একেবারে মাসের শেষ দিন।"

রামপদ বললেন, "তাহলে তার পাঁচ দিন আগে আমরা যাব। একেবারে বউ ভাত সেরে ফিরব। তবে সেইভাবে গোছগাছ কর। টাকা দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে। অপুকেও জিজ্ঞাসা কর, তার জিনিষপত্র কেনার জন্যে কিছু লাগবে কি না। অভয়পদ বোধ হয় উপুড় হস্ত করেন নি।"

হেমলতা বললেন "তোমার সেই রকম ছেলে কি না? সব খরচ তোমাকেই করতে হবে এ তুমি ধরেই রাখ। আচ্ছা, অপুকে আমি সব বলে যাচ্ছি। এখন চলি।"

এরপর বাড়ীতে দারুণ হৈ চৈ বেধে গেল। অভয়পদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই অপু খোলাখুলিভাবে বাক্স প্যাটরা, বেতের বাক্স গোছাতে লাগল, এমন কি শ্বশুরের সঙ্গে ব্যাঙ্কে গিয়ে গহনাও অনেকগুলি নিয়ে এল।

অনুকে ঘরে ডেকে বলল, "দেখ, এই বালা জোড়া আর হার নিয়ে এসেছি তোর জন্যে, বিয়ের দিন পরিয়ে দেব, আর বেনারসী কাপড়ও একটা বেশী নিচ্ছি।"

অনু বলল, "জামাইবাবু রাগ করবে না ত?"

অপু বলল, "সে বোধ হয় বিয়ের দিনটা শুধু ওখানে থাকবে, অত খোঁজ খবর করবার সময় পাবে না। তা ছাড়া শাড়ীটাড়ি অত চেনেও না সে। গহনাগুলো চেনে, ফিরে এলে খোঁজ করবে, তা দেখতেই ত পাবে যে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। আরো খান দুই সুতি শাড়ী তুই রাখ, ওখানে ত ছেঁড়া কাপড় পরে বেড়ান চলবে না। মায়ের জন্যে কিছু করা সম্ভব হল না।"

অনু বলল, "পিসীমাদের কাছে ধার করবে হয়ত, তাদের দু-চার খানা ভাল কাপড় আছে।"

হেমলতা ক্রমাগত ছুটো ছুটি করতে লাগলেন। কিভাবে দামী জিনিষপত্র ভাগ ভাগ করে নিতে হবে, সে বিষয়ে অপুকে অনেক উপদেশ দিলেন। তার গহনার অর্দ্ধেকগুলো নিজেই রামপদর বড় স্যুটকেসে ঢুকিয়ে দিলেন, বললেন, "বেশি দামী জিনিষ বা বেশী টাকা কখনও একসঙ্গে এক জায়গায় নিতে নেই, নানান জায়গায় রেখে, যাতে একটা বাক্স গেলেই সব না যায়।"

অভয়পদ এদের কাণ্ড কারখানা দেখে বেশ বিচলিতই হয়ে পড়ল। অপুর শেষে এত সাহস বাড়ল? কিন্তু বাইরে কিছু প্রকাশ করল না, উদাসীনভাবে ঘুরতে লাগল।

কিন্তু সে ভাবটাও শেষ অবধি রাখা সম্ভব হল না। লোকে ভাববে কি, বাবাও হয়ত বেশী রকম বিরক্ত হবেন। অতএব বাইরে লোক দেখান আপোষ একটা করতেই হল।

জিনিষপত্র বাঁধাছাঁদায় সাহায্য করল, বাবার কাছে টাকা নিয়ে টিকিট কিনে আনল। যাবার দিন গাড়ী চড়ে তাদের সঙ্গে চলল ট্রেনে তুলে দেবার জন্যে।

শেষ অবধি অপুর সামনে গাম্ভীর্য্যটা বজায় রাখল। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার মুখে ছোট্ট উমা যখন তার কোলে চড়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলল, "বাবা তুমি যাবে না?" তখন অভয়পদর মত ঝানু ছেলেরও চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি তাকে আবার কোলে তুলে দিয়ে বলল, "কি করে যাই বলত? এখানের বাড়ীতে কেউ না থাকলে সব যে চোরে নিয়ে যাবে! তা শান্তি মাসীর বিয়ের দিন ঠিক যাব।"

হেমলতা সপরিবারে এসে হাজির হলেন প্রচুর মোটঘাট নিয়ে। কুলীরা হৈ হৈ করে জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলতে লাগল। ক্রমে যাবার সময় এসে গেল। যাত্রীরা সব গাড়ীতে উঠে বসল, গার্ডের সিটি বাজল, গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। উষা আর উমা চেঁচাতে লাগল "বাবা, টা টা!"

অভয়পদ ঝাপসা চোখ দুটো মুছে বারকয়েক রুমাল নাড়ল, তারপর হন্ হন্ করে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে চলল।

ক্রমশঃ

বিদ্যাসাগরের উইল

সন্তোষকুমার অধিকারী

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যিনি করুণাসাগর নামেই খ্যাত এবং দান ও বিধবাবিবাহের প্রয়োজনে যাঁর ব্যক্তিগত ঋণ এক সময়ে ছিয়াশি হাজার টাকায় পৌঁছেছিল, বৈষয়িক বিচক্ষণতাও তাঁর কিছুমাত্র কম ছিল না। তাঁর সমদর্শী দৃষ্টি এবং দক্ষ আইনজীবির মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় তাঁর রচিত উইল। মৃত্যুর পূর্বে এই সমস্ত ঋণ শোধ করেও তিনি প্রচুর বিষয়সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। তিনি একদিকে যেমন সরকারি চাকুরি তুচ্ছ মনে ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রেস, প্রকাশনা ও পুস্তকালয় স্থাপন ক'রে প্রচুর উপার্জনের পথও সৃষ্টি ক'রেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সন্তান সন্ততি ও পরিজনেরা দারিদ্র্য ভোগ না করে, এ' বিষয়ে তিনি যেমন সচেতন ছিলেন, তাঁর দায় ও দায়িত্ব যাতে অবহেলিত না হয় এবং যেসকল পরিবার তাঁর মুখাপেক্ষী—তারা যা'তে বঞ্চিত না হয়, সেদিকেও তেমনি সজাগদৃষ্টি ছিলেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে বিদ্যাসাগর তাঁর এই বিখ্যাত উইলটি রচনা করেন। উইলটি পুরোপুরি বাংলায় লেখা। আইনের ভাষা ত্রুটিশূন্য যেন পারদর্শী কোন আইনজ্ঞের হাতের রচনা। উইলে কারুকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করা হয়নি। সমস্ত সম্পত্তির ভার তিনজন কার্যদর্শী'র (executor) হাতে দেওয়া হ'য়েছে।

বিদ্যাসাগর প্রতিমাসেই বহু আত্মীয়স্বজন ও অনাত্মীয় দুঃস্থ পরিবারকে নির্দিষ্ট অর্থসাহায্য দিতেন। মৃত্যুর পরও তাঁদের কাউকে তাঁর বদান্যতা থেকে বঞ্চিত করতে চান নি। নিজের ভাইদের তিনি পৃথক ক'রে দিয়েছিলেন কিন্তু তাদেরকে নিয়মিত মাসিকবৃত্তি দিয়েছেন এবং মৃত্যুর পরও সে ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক কন্যা, পুত্রবধূ, ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এমন কি যাঁরা তাঁর বিশেষ বিরাগভাজন হ'য়েছিলেন তাঁদের জন্যও তাঁর পক্ষপাতশূন্য ব্যবস্থা।

বাংলা ১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ (ইংরাজী ৩১.৫.১৮৭৫) তারিখে বিদ্যাসাগর মূল উইলটি সই করেন। সাক্ষীস্বরূপ যাঁরা নাম দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে: রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, শ্যামাচরণ দে, নীলমাধব সেন, যোগেশচন্দ্র দে, বিহারীলাল ভাদুড়ি ও কালীচরণ ঘোষ। যাঁদের কার্যদর্শী (Executor) নিযুক্ত করা হ'য়েছিল তাঁদের নাম: ১] কালীচরণ ঘোষ, ২] ক্ষীরোদনাথ সিংহ ও ৩] বেণীমাধব মুখোপাধ্যায়।

পুত্রবধূ পৌত্রী, কন্যা ও দৌহিত্র দৌহিত্রী সকলের কথাই উইলে উল্লেখ করা হ'য়েছিল। করা হয়নি শুধু পুত্র নারায়ণের নাম। করা হয়নি তা' নয়, তাঁর উইলের শেষ পরিচ্ছেদে পুত্র সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—"আমার পুত্র বলিয়া পরিচিত শ্রীযুত নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় যারপরনাই যথেচ্ছাচারী ও কুপথগামী, এজন্য ও অন্যান্য গুরুতর কারণবশতঃ আমি তাঁহার সংস্রব ও সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। এই হেতুবশতঃ বৃত্তিনির্বন্ধস্থলে তাঁহার নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। এবং এই হেতুবশতঃ তিনি চতুর্বিংশ ধারা নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধকালে বিদ্যমান থাকিলেও তিনি আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত অথবা দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা অনুসারে এই বিনিয়োগপত্রের কার্যদর্শী নিযুক্ত হইতে পারিবেন না।" (দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ধারা কার্যদর্শী বা executors-দের পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশ)।

উইলে যাঁদের নির্দিষ্টহারে মাসিকবৃত্তি দেওয়ার নির্দেশ তাঁদের তালিকায় পিতা ঠাকুরদাস সহোদর দীনবন্ধু,

শম্ভুচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র, তাঁর তিন বোন, স্ত্রী দীনময়ী দেবী, চার কন্যা হেমলতা, কুমুদিনী, বিনোদিনী ও শরৎকুমারী—পুত্রবধূ ভবসুন্দরী, পৌত্রী মৃণালিনী, দুই দৌহিত্র সুরেশ চন্দ্র ও যতীশচন্দ্র সমাজপতি, দৌহিত্রী রাজরাণী (বা সরোজিনী), ভ্রাতৃবধূ, শাশুড়ি, জ্যেষ্ঠা কন্যার শাশুড়ি, জ্যেষ্ঠা কন্যার ননদ, মাতার মাতুলকন্যা ইত্যাদি বহুজনের নাম আছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের মনান্তর ও শেষে কথাবলাবলিও বন্ধ ছিল। কিন্তু উইলে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মাকে ৮৲ কন্যা কুন্দমালাকে ১০৲ ও বোন বামাসুন্দরীকে ৩৲ মাসিক বৃত্তি দেওয়া আছে। এ'ছাড়া আছে ৯ ও ১০ এর ধারা। ধারাগুলি মূল ভাষাতেই উদ্ধৃত করছি।

"৯। আমার দেহান্তসময়ে আমার মধ্যমা, তৃতীয়া, ও কনিষ্ঠা কন্যার যে সকল পুত্র ও কন্যা বিদ্যমান থাকিবেক—কোনও কারণে তাহাদের ভরণ-পোষণ বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ব্যয়নির্বাহের অসুবিধা ঘটিলে তাহারা প্রত্যেকে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাসিক ১৫৲ পনর টাকা বৃত্তি পাইবেক।

"১০। আমার দেহান্তসময়ে আমার যেসকল পৌত্র ও দৌহিত্র অথবা পৌত্রী ও দৌহিত্রী বিদ্যমান থাকিবেক—তাহাদের মধ্যে কেহ অন্ধত্ব পঙ্গুত্ব প্রভৃতি দোষাক্রান্ত অথবা অচিকিৎস্য রোগগ্রস্ত হইলে আমার বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে যাবজ্জীবন মাসিক ১০৲ দশ টাকা বৃত্তি পাইবেক।"

অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশের কেউ যাতে অভাবে কষ্ট না পায় এমনভাবেই তিনি তাঁর উইল রচনা করেছিলেন।

এই উইল রচনা করার ষোল বছর পরে (১৮৯১ খৃষ্টাব্দে) বিদ্যাসাগরের দেহান্তর ঘটে। তখন কার্যদর্শীদের মধ্যে দুজন মাত্র জীবিত। ক্ষীরোদনাথ সিংহ ও কালীচরণ ঘোষ। কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত ভদ্রলোক প্রবেট্ নিতে রাজী হ'লেন না। কারণ অনেকেরই তখন ধারণা বিদ্যাসাগর মৃত্যুর পূর্বে আর একটি উইল (Last will) তৈরী করেছিলেন। কিন্তু এই উইলটি খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেউ কেউ সন্দেহ করেন যে তাঁর মৃত্যুর সময়ে কেউ এই শেষ উইলটিকে নষ্ট করে ফেলেছিল। বিদ্যাসাগর যে দ্বিতীয় আর একটি উইল তৈরী করেছিলেন বিভিন্ন সূত্রে তার সমর্থন মেলে।

সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁর ইংরাজী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রন্থে (পৃঃ ৬৫৮) লিখেছেন—"On the 24th July, (1891) Suggestions were made for a fresh will. Babu Golap Chandra Sastri, a renowned pleader of the High Court, drew up a draft of the last Testament. But Vidyasagar could not subscribe to it." শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 'Vidyasagar in homage to his memory' প্রবন্ধে লিখেছেন—"In 1875 at the age of 54. Pandit Iswar Chandra Vidyasagar drew up his last will and testament He lived 16 years after this date, and had another will drawn up with some what different bequests. One feature of it was the constitution of a board of trustees for the Metropolitan Institution.

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় "বিদ্যাসাগর" গ্রন্থের ৪০৭ পৃষ্ঠায় ফুট্‌নোটে লিখেছেন :—"তাঁহার লোকান্তর গমনের অত্যল্পকাল পূর্বে তাঁহার অভিপ্রায়মত এক সংশোধিত উইল প্রস্তুত হইয়াছিল। অপরাপর অংশ অনুমোদিত হইলেও মেট্রপলিটান কলেজ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবার অবসর লইতে গিয়া পীড়াবৃদ্ধি হয়। পরিশেষে আর সংশোধিত উইল স্বাক্ষর করা হয় নাই।"

চণ্ডীবাবুর বইটি বার হয় ১৩০২ (অর্থাৎ ১৮৯৫ খৃঃ) সালে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর চার বছর পরে। চণ্ডীবাবুকে জীবনীরচনায় সহায়তা করেছিলেন বিদ্যাসাগরপুত্র নারায়ণ। বিদ্যাসাগরের শেষজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা চণ্ডীবাবু বা নারায়ণবাবু কারোরই ছিল না। অথচ 'মেট্রপলিটান কলেজ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিবার অবসর লইতে গিয়া পীড়াবৃদ্ধি হয়'—এত অন্তরঙ্গ সংবাদ চণ্ডীবাবু দিলেন কিন্তু সে উইল কোথায় গেল তা' বললেন না। মেট্রপলিটান কলেজ সম্পর্কিত অংশ ছাড়া উইলের অপরাপর অংশ বিদ্যাসাগর অনুমোদন করেছিলেন এ'কথা যখন তিনি বলছেন, তখন বিদ্যাসাগরের শেষ ইচ্ছার হদিও

পাঠকের সামনে তুলে ধরা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু চণ্ডীবাবু তা' করেন নি।

কাজেই বিদ্যাসাগরের শেষ উইল সম্পর্কে অনেকরকম সন্দেহ অনেকের মনেই থেকে গেছে।

বিদ্যাসাগরের সম্পত্তি কি কি ছিল জানবার জন্য কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর অনেক ঋণ ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে সমস্ত ঋণ তিনি শোধ করে দিয়েছিলেন। দান ও ব্যয়বাহুল্যের জন্য তাঁর খরচের অঙ্ক যেমন মোটা ছিল, তাঁর আয়ের অঙ্কও তেমনি স্ফীত ছিল। ক্ষিতীশপ্রসাদ তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর বাৎসরিক আয় দশ হাজার টাকার উর্দ্ধে ছিল এবং মৃত্যুর পূর্বে এই অঙ্ক ত্রিশ হাজার টাকায় পৌঁছেছিল। এ বিষয়ে প্রামাণ্য অভিমত হচ্ছে C. E. Buckland 'এর 'Bengal under lieutenant governors' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—"Vidyasagar's monthly benefactions ammounted to about Rs 1500, and his income from his publications for several years ranged from Rs 3000 to Rs 4500 per month."

সুবলচন্দ্র মিত্র লিখেছেন—"Before his death he had repaid all his debts. He left his property quite free from embarrassments.' '(Page 631)

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁর এই উইলের সঙ্গে সম্পত্তির যে তালিকা দেওয়া ছিল সেটি উদ্ধৃত করছি—

(ক) সংস্কৃত যন্ত্রের তৃতীয় অংশ

(খ) আমার রচিত ও প্রচারিত পুস্তক—

বর্ণপরিচয় দুইভাগ, কথামালা, বোধোদয় চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী দুইভাগ, বাঙ্গলার ইতিহাস ২য় ভাগ, জীবন চরিত, বেতালপঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস, মহাভারত, সংস্কৃত ভাষা প্রস্তাব, বিধবা বিবাহ বিচার, বহু বিবাহ বিচার এবং উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, ঋজুপাঠ তিন ভাগ, মেঘদূত, শকুন্তলা, উত্তরচরিত। তা ছাড়া Poetical Selections, Selections from Goldsmith.

(গ) যে সকল পুস্তকের স্বত্বাধিকার ক্রয় করা হইয়াছে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রণীত শিশুশিক্ষা রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত কুলীনকুলসর্বস্ব।

(ঘ) কাদম্বরী, সটিক বাল্মিকী রামায়ণ প্রভৃতি মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক।

(ঙ) নিজ ব্যবহারার্থ সংগৃহীত সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী পার্শী ইংরেজী প্রভৃতি পুস্তকের লাইব্রেরী।

(চ) কর্মাটাঁড়ের বাংলো ও বাগান।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে বাদুড় বাগানে অনেক টাকা ব্যয়ে বাসের জন্য একটি দ্বিতলবাড়ী তৈরী করেছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় আরও কয়েকটি বই বার হয়। সুকিয়া ষ্ট্রীটে তাঁর নিজের ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির বিক্রীর জন্য 'ক্যালকাটা লাইব্রেরী' নামে একটি বইয়ের দোকানও খুলেছিলেন। নগদ টাকার উল্লেখ শম্ভুচন্দ্রের গ্রন্থে পাই—তাঁহার বাটিতে নিজ তহবিলে ও ব্যাঙ্কে প্রায় বিংশতি সহস্র টাকা জমা ছিল।" [পৃঃ ৩২৭]

মেট্রোপলিটান কলেজ ও বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

সম্পত্তির কার্যদর্শী হিসাবে প্রবেট নিলেন—ক্ষীরোদনাথ সিংহ (৯৮ আপার সার্কুলার রোড কলিকাতা) কিন্তু তা সত্বেও বিদ্যাসাগরের ইচ্ছা পূর্ণ হ'লনা। কারণ হিতৈষীদের সহায়তায় নারায়ণচন্দ্র আদালতে মামলা করলেন। তাঁর পক্ষে যুক্তি—উইলে যখন কাউকেই উত্তরাধিকারী বলে নির্দিষ্ট করা হয়নি, তখন একমাত্র পুত্রকে (অর্থাৎ নারায়ণকে) সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলেনা। জুরীদের মধ্যে মতভেদ হয়। কিন্তু কেউ বিপক্ষে না থাকায়—শেষপর্যন্ত নারায়ণচন্দ্র সম্পত্তির অধিকারলাভ করেন। সুবলচন্দ্র মিত্র এই প্রসঙ্গে লিখেছেন [পৃঃ ৬০১]

"It may not be out of place to mention here that after his death a case was instituted in the High court for decision whether Narayan chandra being the only son of his father, could be legally debarred from such inheritance according to Hindoo law. The case was decided in favour of Narayan chandra who has since inherited the assets of his father."

নারায়ণচন্দ্র সম্পত্তির অধিকার গ্রহণ করলেন কিন্তু

পিতার বরাদ্দ বৃত্তিগুলির দায় গ্রহণ করলেন না। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যয় এতই অপরিমিত ছিল যে পিতার এই বিপুল দায়ের সম্পত্তিও তিনি আস্তে আস্তে নষ্ট করে ফেললেন। প্রথমে বিক্রী হ'য়ে গেল কর্মাটাঁরের বাংলো ও বাগান। ঋণের দায়ে মর্টগেজড্ হ'লো বাদুড়বাগানের বাড়ী এবং বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত লাইব্রেরী। লাইব্রেরীটি কিনেছিলেন রাজগোলাপরাজ। তিনি এটিকে বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদে দান করেন। কিন্তু বাদুড়বাগানের বাড়ী, যে বাড়ীতে বিদ্যাসাগর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, সেই বাড়ী বিক্রী হ'য়ে গেল তৃতীয় ব্যক্তির হাতে। বিদ্যাসাগরের বাসভবন আজ জাতীয় সম্পত্তি না, এমনকি তাঁর পরিবার-জাত কারও অধিকারেও নেই। সে' বাড়ী তৃতীয় ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নারায়ণচন্দ্র পিতার পুস্তকের কপিরাইটও বন্ধক দিয়েছিলেন। পরিবারের অন্যান্য সকলে তখন নারায়ণের নামে মামলা করেন। মামলাটি "Phani Bhusan Roychowdhury V. Narayanchandra Vidyasagar" নামে খ্যাত। শেষপর্যন্ত আপোষে—(consent decree) নিষ্পত্তি হয়। ২৯.৮.১৯০৬ তারিখের আদেশ অনুযায়ী অবশিষ্ট সম্পত্তি রিসিভারের হাতে দেওয়া হয়। প্রথম রিসিভার হন এ্যাটর্ণি জ্যোতিষচন্দ্র মিত্র।

মেট্রোপলিটন ইন্স্টিটিউসন ও কলেজেরও একই পরিণতি ঘটলো। বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজিন (মার্চ ১৯২৬) থেকে—শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করছি :

"বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর কলেজ ও স্কুলের ভার পুত্র নারায়ণের হাতে পড়ে। তিনি অসমর্থ হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে ভারার্পণ করেন। সুরেন্দ্রনাথ রিপন কলেজ ও মেট্রোপলিটানকে এক করবার চেষ্টা করেন। ফলে মেট্রোপলিটানের অধ্যাপকদের রিপনে গিয়ে পড়াতে হ'ত। মেট্রোপলিটানে পড়ার ব্যবস্থা খারাপ হ'য়ে পড়লো। কলেজেরও দেনা হল। অবস্থা শোচনীয়।

"তখন গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী স্যর রমেশচন্দ্র, স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও অন্যান্য বিশিষ্টলোকের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে কলেজ রক্ষার্থে একটি ট্রাষ্টিসভা গঠিত করলেন। নাম বিদ্যাসাগর ইনষ্টিটিউট"। কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুণ কলেজ পরিচালনার ভার কলেজ কাউন্সিলের হাতে যায় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে।

"In 1896 the management was entrusted to a committee called the college council composed mainly of college professors who were all ex-officio members of the Vidyasagar Institute." [Vidyasagar College Magazine Puja number, 1950 Page 28]

১৯১৭তে মেট্রোপলিটান কলেজের নামকরণ হয় বিদ্যাসাগর কলেজ এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে কলেজের ভার একটি গভর্নিং বডির হাতে দেওয়া হয়। এই গভর্নিং বডি সৃষ্ট হয় হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী—

Suit No 1226 of 1921. Lalit chandra Mitra Plaintiff & Saroda Ranjan Roy & others and Peary Mohan Banerjee Defendants.

এই আদেশে আরও বলা হয় যে—

"Pandit Narayan chandra Vidyaratna shall receive an allowance of Rs 100 per month for life. Babu Peary Mohon Banerjee shall receive an allowance of Rs 60 per month for life."

অন্যান্য সম্পত্তি রিসিভার এর হাতে গিয়েছিল, আগেই বলেছি। রিসিভার নারায়ণের দায় পরিশোধ করে সামান্য যা' উদ্বৃত্ত হ'য়েছে, তা' অন্যান্য উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ করে' দেন। বিদ্যাসাগরের উইল-মত তাঁর পরিবারের কে কোথায় ছিল, জানার একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তাই একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিলাম।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তৃতীয়া কন্যা বিনোদিনী ও তৃতীয় জামাতা সূর্যকুমার মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ শহরে এসে বাড়ী করেন। বিনোদিনী দেবী ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যখন মারা যান তখন তাঁর স্বামী ও পুত্রকন্যারা জীবিত এবং প্রতিষ্ঠিত। সূর্যবাবু প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার সুকুমার অধিকারী (পটলবাবু) মুর্শিদাবাদের বিশিষ্ট জননেতা এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় মানুষ ছিলেন। সম্প্রতি কোন অত্যুৎসাহী গবেষক বিদ্যাসাগর পরিবারের সম্পর্কে ভুল ও অসত্য সংবাদ পরিবেশন করায়, এগুলির উল্লেখ করা হ'ল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—মৃত্যু : ১৮৯১
দীনময়ী দেবী — „ ১৮৮৮

- নারায়ণ / ভবসুন্দরী
  - মৃণালিনী
    - সরোজ মুখার্জী
  - কুন্দবালা
    - প্রফুল্ল কমল হাসি ও নীহার
  - মতিবালা
    - ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
  - প্যারীমোহন
- হেমলতা / গোপালচন্দ্র সমাজপতি
  - সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—১৯২১ / নলিনী দেবী
  - যতীশচন্দ্র
- কুমুদিনী / অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
  - যোগীন্দ্রনাথ
    - শোভাকর ও সুধাকর চট্টোপাধ্যায়
  - নগেন্দ্রনাথ
    - গিরীন্দ্র নন্দলাল ও বীরেন্দ্র
  - উপেন্দ্রনাথ
    - শেখর চট্টোপাধ্যায়
  - রাজরাণী
    - সত্যপ্রসাদ ব্যানার্জী
    - জ্ঞানপ্রসাদ ব্যানার্জী
    - অনন্ত প্রসাদ ব্যানার্জী
    - গৌরী
  - হরিবালা
  - সুশীলা
  - চারুশীলা
- বিনোদিনী—মৃত্যু—১৯১৮ / সূর্যকুমার অধিকারী—১৯২৬
  - নলিনীবালা
    - ফণীভূষণ রায়চৌধুরী তারাপদ ও গিরিজাভূষণ
  - সরযূবালা
    - ঊষা
  - সুকুমার
    - সুশীলকুমার অধিকারী
  - সরসীবালা
  - সুবোধ কুমার
  - সুনীল কুমার
    - সন্তোষকুমার অধিকারী
    - সুহাস অধিকারী
  - বিজনবালা
  - সুনীত
- শরৎ কুমারী / কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
  - হরিমোহন
  - রামকমল

ককেশিয়ান চক সার্ক্‌ল্

রচনা—বের্টল্ট ব্রেশট্‌

অনুবাদ—অশোক সেন

(২)

কথক : গ্রুসা ভাসনাডজে শহর ছেড়ে চললো গ্রুশিনিয়ার রাজপথ ধরে উত্তর-পর্বতমালার দিকে। সে একটা গান ধরলো, কিনলো অল্পখানিকটা দুধ।

কোরাস : এই মানবশিশুট কিভাবে উদ্ধার পাবে রক্তপিপাসু শয়তানগুলোর হাত থেকে? পরিত্যক্ত পর্বতশ্রেণীর দিকে সে চললো গ্রুশিনিয়ার রাজপথ ধরে। সে একটা গান ধরলো, কিনলো অল্পখানিকটা দুধ।

[দেখা যাবে গ্রুসা ভাসনাডজ হাঁটতে হাঁটতে চলেছে। তার পিঠে একটি ঝোলার ভেতর রয়েছে শিশুটি। তার একহাতে একটি বড় লাঠি অন্য হাতে একটি ঝোলা। সে গান করতে করতে চলেছে—]

॥ চার সেনাপতির গান ॥

চার জাঁদরেল সেনাপতি চলেছে বাকুর অভিমুখে। প্রথম জনজীবনে যুদ্ধ করেনি, দ্বিতীয়টি কখনও যুদ্ধ জেতোন, তৃতীয়টি যুদ্ধের অনুকূল আবহাওয়া পায়নি, চতুর্থটির সৈনাপত্যে সৈন্যেরা যুদ্ধ করতে রাজি হয় নি। চারজন জাঁদরেল সেনাপতি এই সব কারণেই যুদ্ধে যেতে পারে নি। সোশ্‌সো রোবা কড্‌জে মার্চ করে গেছে ইরাণে, সেখানে শুরু করেছে ভয়াবহ এক যুদ্ধ, আর এই ভয়াবহ যুদ্ধে হয়েচে বিজয়ী। আবহাওয়া সব সময়েই হয়েছে তার অনুকূল, সৈনিকেরা সব সময় তার অধীনে যুদ্ধ করতে রাজী। সোশ্‌সো রোবাকিডজে সেই আমাদের একমাত্র ভরসা!

[একটি কৃষকের কুঁড়েঘর দেখা যাবে]

গ্রুসা—(শিশুর প্রতি) দুপুর বেলাটা হচ্ছে খাবার সময়। এবার আমরা ঘাসের উপর বসে পড়বো—তারপর ছোট একপাত্র দুধ কিনে আনবো। (শিশুকে মাটিতে নামিয়ে রেখে কুঁড়ে ঘরের দরজায় ধাক্কা দেবে। এক বৃদ্ধ এসে দরজা খুলে দাঁড়াবে) ঠাকুর্দা, আমাকে ছোট একপাত্র দুধ দিতে পারেন? আর একটা কর্ণ-কেক্ যদি থাকে?

বৃদ্ধ—দুধ? আমাদের কাছে দুধ নেই। শহরের সৈনিকেরা আমাদের ছাগলগুলো নিয়ে গেছে। দুধের দরকার থাকলে তাদের কাছে যাও।

গ্রুসা—ঠাকুর্দা, এই বাচ্চাটার জন্য ছোট একপাত্র দুধ নিশ্চয় তুমি দিতে পারবে।

বৃদ্ধ—আর তার জন্য তুমি বোধহয় আমাকে শুধু ঈশ্বরের আশীর্বাদ জানাবে?

গ্রুসা—না, না, পয়সা দেব (টাকার থলি দেখাবে)। ছোট একপাত্র দুধের দাম কত?

বৃদ্ধ—তিন পিয়াস্তার। দুধের দাম বেড়ে গেছে।

গ্রুসা—বল কি! এত বেশী দাম!

[বৃদ্ধ তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবে।]

মাইকেল! শুনলে তো? ওইটুকু দুধের দাম চাইলো তিন পিয়াস্তার। (দরজায় ধাক্কা দিয়ে) ঠাকুর্দা দরজা খোল, আমরা দাম দিয়ে দুধ কিনবো। (বৃদ্ধ দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াবে) অতটুকু দুধ—আমি ভেবেছিলাম আধ পিয়াস্তার দিলেই হবে। বাচ্চাটাকে কিছু না খেতে দিলে তো চলবে না। এক পিয়াস্তার নিয়ো [illegible]

বৃদ্ধ—দু' পিয়াস্তার অন্ততঃ দিতে হবে।

গ্রুসা—(অনেকক্ষণ ব্যাগটার হাত ঢুকিয়ে খুঁজবে) এই নেও দু' পিয়াস্তার। এত চড়া দাম হাঁকাটা খুবই অন্যায়—এতে কিন্তু তোমার পাপ হবে।

বৃদ্ধ—সমস্ত সৈন্যগুলোকে মেরে ফেলতে পারলে তবেই আবার দুধের দাম সস্তা হয়ে যাবে।

গ্রুসা—(শিশুকে দুধটা খেতে দেবে) বুঝলে মাইকেল, এইটুকু দুধ কিনতে এক সপ্তাহের মাইনে চলে গেল। মাইকেল, মাইকেল, তুমি একটা সুন্দর মিষ্টি বোঝা।

[মাইকেলকে আবার পিঠের ঝোলায় বসিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াবে। আবার সে হাঁটতে শুরু করবে। বৃদ্ধ দুধের পাত্রটা হাতে তুলে নেবে।]

কথক : গ্রুসা ভাসনাডজে চলেছিল উত্তরদিকের পথে, এদিকে রাজপুত্রের সৈনিকেরা তাকে ধরবার জন্ম খুঁজছিল।

কোরাস : এই মেয়েটা কিভাবে সৈনিকদের হাত থেকে রক্ষা পাবে, রক্তপিপাসু শয়তানগুলোর হাত থেকে? গভীর রাতেও শিকারের পেছনে তারা ধাওয়া করে চলেছে, এই সব অন্বেষণকারীরা কখনও ক্লান্ত হয় না কসাইগুলোর চোখে ঘুম নেই।

[একজন সৈনিক এবং করপোরেল হাঁটতে হাঁটতে আসবে]

করপোরেল—সত্যিকার ভাল সৈনিক হতে হলে উপরওলার আদেশ মনপ্রাণ দিয়ে মানতে হয়। যদি উপরওলা অফিসার বলে 'তোমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবো' সৈনিক অমনি হাসতে হাসতে মরবার জন্য প্রস্তুত হবে—এই দেখে উপরওলা অফিসারের মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, আর সেইটেই হবে সৈনিকের সবচেয়ে বড় পুরস্কার। তুই কিন্তু আমাকে কখনও সেরকম আনন্দ দিতে পারিস না। হা ঈশ্বর! এই মূর্খটার সাহায্যে গভর্ণরের জারজ ছেলেটাকে খুঁজে বের করি কি করে!

[দৈন্যের পেছন দিকে গিয়ে দাঁড়াবে]

কথক : গ্রুসা ভাসনাডজে সাদুরানদীর কাছে এল, এইভাবে পা দিয়ে বেড়িয়ে সে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে, অসহায় শিশুটিকে মনে হচ্ছে এক বিরাট বোঝা। একটা গোলাবাড়ীর উঠানের কাছে সে এসে দাঁড়ালো।

[একটি ফার্মের সামনে এসে গ্রুসা দাঁড়ালো। একজন স্থূলকায়া কৃষকরমণী দুধের ক্যান নিয়ে দরজা দিয়ে ভেতরে গেল। সে ভেতরে চলে গেলে গ্রুসা বাড়ীটার দরজার কাছে এল।]

গ্রুসা—মাইকেল, এবার আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব। শহর থেকে এ জায়গাটা অনেক দূরে। তোমার খোঁজে অন্বেষণকারীরা এখান অবধি আসবে না। ওই কৃষক-মহিলার মুখটা দেখেই বুঝেছি ওর মনটা খুব নরম। এখানে থাকলে ও তোমাকে অনেক দুধ খাওয়াবে। মিষ্টি মাইকেল, তুমি এখানে সুখে থকেবে।

[বাচ্চাটাকে দোরগোড়ায় রেখে একটু আড়ালে সরে গিয়ে একটা গাছের পেছনে দাঁড়াবে। কৃষক-রমণী বাইরে আসবে—তার চোখ পড়বে শিশুর ওপর—]

কৃষক-রমণী—হা ঈশ্বর! এ আবার কি! ও কর্তা!

কৃষক-পুরুষ—(বাইরে এসে) অত চেঁচাচ্ছিস কেন? সুপটা না শেষ করেই তোর চিৎকারে ছুটে আসতে হল।

কৃষকরমণী—(শিশুর প্রতি) তোমার মা কই গো? মা নেই? ছেলেটা ভারি মিষ্টি দেখতে! পোষাকটাও খুব দামী। দেখেই বোঝা যায় খানদানী পরিবারের শিশু। আর ওকে কিনা আমাদের দোরগোড়ায় ফেলে গেছে! কালে কালে হল কি!

কৃষক—তারা যদি ভেবে থাকে ওকে আমরা খাইয়ে মানুষ করবো, খুবই ভুল করবে। গ্রামের যাজকের কাছে ওকে নিয়ে যাও—এর বেশী আমরা আর কি করতে পারি!

কৃষক রমণী—যাজক ওকে নিয়ে কি করবে? ওর আসল দরকার একজন মায়ের। ঐ দেখ, বাচ্চাটা জেগে উঠেছে। ওকে তো আমরা কাছেই রাখতে পারি?

কৃষক—(চিৎকার করে) না!

কৃষক-রমণী—কেন, আরামকেদারার পাশটায় ওকে শুইয়ে রাখতে পারি। ওর জন্ম শুধু একটা শিশুশয্যার দরকার। মাঠে কাজ করতে যাবার সময় ওকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। দেখেছ, কি মিষ্টি হাসছে? শোন কর্তা, আমাদের যখন একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই আছে, বাচ্চাটাকে এখানে রাখতে কোনই অসুবিধা নেই। এ নিয়ে আর কোন আপত্তিই আমি শুনবো না।

[শিশুকে নিয়ে সে বাড়ীর ভেতর চলে যাবে। কৃষক আপত্তি জানিয়ে তার পেছন পেছন যাবে। গ্রুসা গাছের আড়াল থেকে বেড়িয়ে আসবে—একবার প্রাণভরে হাসবে, তারপর অপরদিকে চলে যাবে।]

কথক: এত খুশীমনে সে বাড়ী ফিরছে কেন?

কোরাস: কারণ শিশুর হাসিটি তাকে নতুন বাপ মা দিয়েছে, গ্রুসা তার দায়িত্ব থেকে উদ্ধার পেয়েছে তাই তার মনটা খুশীতে ভরে উঠেছে।

কথক: তার মুখে কিন্তু একটু বেদনার আভাসও ছিল।

কথক: কারণ এখন সে সম্পূর্ণ মুক্ত, কিন্তু একা, তার সম্পদ অন্যে চুরি করে নিয়েছে, নিজের বলতে তার আর কিছুই নেই, এই দারিদ্র্যই তার মনটা বিষাদে ভরে দিয়েছে।

[গ্রুসা—হাঁটতে হাঁটতে এসে সৈনিক দুজনের মুখোমুখি হবে—তারা তার দিকে বর্শা উঁচিয়ে ধরবে।]

করপোরেল: কোথা থেকে আসা হচ্ছে শ্রীমতীর? যাচ্ছই বা কোথায়?

গ্রুসা—আমার ভাবী স্বামী, হুকার-প্রাসাদ রক্ষী সিমন সাস্‌হাভার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

করপোরেল—সিমন সাসহাভা? আমি তো তাকে ভালভাবেই জানি। যাক্ সে, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি—আমরা একটি শিশুর খোঁজে বেরিয়েছি। খানদানী পরিবারে তার জন্ম—আমরা শুনেছি শহর থেকে তাকে এইরকম কোনও একটা জায়গায় আনা হয়েছে—শিশুটির পরণে খুব দামী পোষাক ছিল। তুমি কি এরকম একটি শিশুর কথা শুনেছ?

গ্রুসা—না ওরকম কোন খবর আমার কানে আসেনি।

[যে পথে এসেছিল সে দিকেই দৌড়িয়ে ফিরে যাবে।]

কথক: দ্রুতবেগে চলে যাও! খুনেরা সব আসছে! অসহায় শিশুকে সাহায্য কর। অসহায়া নারী! ঐ দেখ সে ছুটে চলেছে শিশুকে বাঁচাতে।

কোরাস: চারদিকে যখন চলে খুন আর রক্তপাত তখনও দয়ালু লোকের হয় না অভাব।

[দ্রুতবেগে দৌড়িয়ে এসে গ্রুসা কৃষক-রমণীর কুটিরের ভেতর ঢুকবে—সে তখন শিশুটির শয্যায় উপর ঝুঁকে পড়ে দেখছিল।]

গ্রুসা—লুকিয়ে ফেল দেরী কোরোনা! সৈনিকরা আসছে। বাচ্চাটাকে আমিই তোমার দোরগোড়ায় ফেলে গিয়েছিলাম। ও আমার বাচ্চা নয়—খানদানী পরিবারে ওর জন্ম।

কৃষক-রমণী—কারা আসছে বললে? কোন দলের সৈনিক?

গ্রুসা—প্রশ্ন করে সময় নষ্ট কোরোনা। ওকে যারা খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই সৈনিকেরা আসছে।

কৃষক-রমণী—আমার এখানে ওদের কি দরকার?

গ্রুসা—বাচ্চাটার দামী পোষাকটা খুলে সরিয়ে রাখ।

কৃষক রমণী—আমার বাড়ীতে যা করবার আমিই করবো—তুমি আমাকে হুকুম দেবার কে হে? বাচ্চাটাকে ফেলে পালিয়েছিলে কেন? জানোনা এ একটা মহাপাপ?

গ্রুসা—(জানলার বাইরে তাকিয়ে) ওই ওরা আসছে। আমার ওভাবে দৌড়িয়ে আসাটাই ভুল হয়েছে। সেইজন্তই ওদের মনে সন্দেহ জেগেছে—এখন কি করি।

কৃষক-রমণী—(জানলার বাইরে তাকিয়ে ভয় পেয়ে যাবে।) কি সর্বনাশ! সৈনিকেরা আসছে!

গ্রুসা—ওরা বাচ্চাটার জন্ত আসছে!

কৃষক-রমণী—ধর যদি [illegible]

গ্রুসা—তুমি কিছুতেই বাচ্চাকে ওদের হাতে দেবেনা—বলবে ও তোমার সন্তান।

কৃষক-রমণী—তাই বলবো।

গ্রুসা—ওদের হাতে দিলে, বাচ্চাটাকে ওরা বর্শা দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলবে।

কৃষক-রমণী—কিন্তু ওরা যদি ওকে নিয়ে যেতে চায়?

গ্রুসা—তাহলে তোমার চোখের সামনেই এরা বাচ্চাটাকে এখানে বর্শার আঘাতে মেরে ফেলবে। তোমাকে বলতেই হবে ও তোমারই ছেলে।

কৃষক-রমণী—কিন্তু আমার কথা যদি ওরা বিশ্বাস না করে।

গ্রুসা—খুব জোর দিয়ে তোমাকে বলতে হবে।

কৃষক রমণী—ওরা আমাদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।

গ্রুসা—সেইজন্যই তোমাকে বলতে হবে বাচ্চাটা তোমার। ওর নাম হচ্ছে মাইকেল। এ কথা তোমাকে না বলাই ভাল ছিল। (কৃষক-রমণী মাথা নাড়তে থাকবে) ওভাবে মাথা তুলিও না। কাঁপছ কেন? ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবে।

কৃষক-রমণী—(বিহ্বলভাবে) বুঝেছি!

গ্রুসা—কি বুঝেছ? (ওর ঘাড় ধরে নাড়া দিয়ে) তোমার নিজের কোন সন্তান নেই?

কৃষক-রমণী—সে যুদ্ধে গেছে।

গ্রুসা—তাহলে সেও তো সৈনিক। তুমি নিশ্চয় চাইবেনা একটা শিশুকে সে বর্শা দিয়ে বিঁধে ফেলে? সে তাই করতে গেলে তুমি নিশ্চয় চিৎকার করে তাকে ধমকে উঠে বলবে—"আমার বাড়ীতে ওই বর্শা নিয়ে বদমায়েশী করা চলবে না। আমি কি তোমাকে মানুষ করে তুলেছি এই সব শয়তানী করবার জন্য?"

কৃষক-রমণী—সে কথা ঠিক! আমার ছেলে এ বাড়ীতে ওই-জাতীয় জঘন্য কাজ করবার সাহস পাবে না।

গ্রুসা—আমাকে কথা দেও যে তুমি বলবে ছেলেটা তোমারই সন্তান।

কৃষক-রমণী—কথা দিলাম।

গ্রুসা—ওই ওরা আসছে।

[দরজা ধাক্কার শব্দ। এরা বসে থাকবে। সৈনিকরা এসে ঢুকবে। কৃষক-রমণী মাথা নীচু করে বাউ করবে।]

করপোরেল—কি বলেছিলাম, ঐ তো মেয়েটা বসে রয়েছে। (সৈনিককে) তোকে আগেই বলেছিলাম কিনা? (গ্রুসার প্রতি) ওভাবে দৌড়িয়ে পালালে কেন? (কৃষক-রমণী বারবার বাউ করতে থাকবে।)

গ্রুসা—ষ্টোভে দুধ চাপানো ছিল—হঠাৎ সে কথা মনে পড়াতে ছুটে এলাম।

করপোরেল—(কৃষক-রমণীর প্রতি) এ সময় বাড়ীতে বসে কি করছ? মাঠে কাজ নেই?

কৃষক-রমণী—দোহাই সরকার! আমার কোন দোষ নেই। আমি কিছুই জানতাম না। দয়া করে আমাদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিও না।

করপোরেল—এটা আবার বলে কি?

কৃষক-রমণী—হুজুর, আমি কিছুই জানতাম না। ওই মেয়েটাই আমার দোরগোড়ায় বাচ্চাটাকে ফেলে গেছিল, হুজুর আমি দিব্য করে বলছি।

করপোরেল—(এবার শিশুর উপর চোখ পড়াতে শিস্ দিয়ে উঠবে) আ…হা…শিশুশয্যার উপর একটা বাচ্চা রয়েছে দেখছি! (সৈনিকের প্রতি) এই মাথা মোটা গাধা, হাজার পিয়াস্তারের গন্ধ আমার নাকে আসছে। তুই এই বুড়ি চাষী—মেয়েটাকে বাইরে নিয়ে যা—ওর ওপর নজর রাখবি। আমাকে ওই মহিলাকে জেরা করতে হবে। (কৃষক রমণীকে নিয়ে সৈনিক বাইরে চলে যাবে)। তারপর, যে শিশুটিকে খুঁজছিলাম সে দেখছি তোমার কাছেই আছে। (শিশুশয্যার দিকে যাবে)।

গ্রুসা—অফিসার এ আমার বাচ্চা। তুমি যে শিশুকে খুঁজছ এ সে নয়।

করপোরেল—আচ্ছা, একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক (শিশুশয্যার উপর ঝুঁকে পড়বে। গ্রুসা হতাশভাবে একবার চারদিকে চেয়ে দেখবে)।

গ্রুসা—এ আমার বাচ্চা! আমার নিজের সন্তান!

করপোরেল—পোষাকটা দেখছি খুব দামী! (আবার মনোযোগ দিয়ে শিশুকে পরীক্ষা করবে। গ্রুসা দেখবে করপোরেলের পেছন দিকে একটা লগুড়ের মত কাঠের মোটা দণ্ড পড়ে আছে—আস্তে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে পেছন থেকে ভীষণ জোরে করপোরেলের মাথায় আঘাত করবে। করপোরেল জ্ঞান হারিয়ে ধপাস করে মাটিতে পড়বে। তাড়াতাড়ি শিশুকে তুলে নিয়ে গ্রুসা দৌড়িয়ে বেরিয়ে যাবে)।

কথক: এইভাবে বাইশদিন ধরে শিশুকে নিয়ে গ্রুসা পালিয়ে বেড়ালো সৈনিকদের দৃষ্টিপথ এড়িয়ে। তারপর সে এসে হাজির হল জাঙ্গা টু গ্রেসিয়ায়ের পাদভূমিতে। গ্রুসা ভাসনাডজে ঠিক করলো শিশুটিকে দত্তক নেবে।

কোরাস—সম্বলহীন নারী দত্তক নিলে সহায়হীন শিশুকে।

[অর্ধেক মজে যাওয়া একটি নদীর ধারে গ্রুসা বসলে, হাতের তেলোয় জল তুলে নিল বাচ্চাটির জন্য।]

গ্রুসা—কেউ যখন তোমায় চায় না আমিই তোমাকে নেব, দিনকাল এখন খুবই খারাপ, সুতরাং এই ব্যবস্থাতেই খুশী হতে হবে। অনেক দূর তোমাকে বহন করে এনেছি, হাঁটতে হাঁটতে আমার পায়ের তলাটা গেছে কেটে, তোমার দুধের দাম যোগাতে হয়েছি অস্থির, এই সবের জন্যই তোমার প্রেমে আমি অধীর (তোমাকে ছাড়া আর আমার চলবে না) তোমার দামী জামা দেব ছুঁড়ে ফেলে। এবার থেকে পরাব তোমায় ছেঁড়া পোষাক গ্রেসিয়ায়ের পবিত্র জলধারা দিয়ে স্নান করিয়ে তোমায় করবো পরিষ্কার।

[শিশুর দামী পোষাক খুলে ফেলে, তাকে ছিন্নভিন্ন পোষাক পরাবে।]

কথক: গ্রুসা ভাসনাডজে যখন সৈনিকদের তাড়া খেয়ে এল গ্রেসিয়ারের ভয়াবহ ব্রিজের কাছে, সেটা পার হলে, রাস্তা মেলে পূবদিকের গ্রামগুলোর, সে শুরু করলে গান—"ভয়াবহ ব্রিজের" তারপর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে পার হল ব্রিজটা।

কোরাস: দুটি পাহাড়ের মাঝে বিরাট খাদ। পারাপারের জন্য একটা দড়ির ব্রিজ—দড়িগুলো প্রায় ছিঁড়ে এসেছে—এই ভয়াবহ ব্রিজ পার হতে এখানকার লোকেরা মানা করলে। কিন্তু নিচে সৈনিকদের চীৎকার শোনা যাচ্ছে—তারা গ্রুসা এবং শিশুকে ধরতে আসছে। গ্রুসা আর অপেক্ষা করলো না। ওই ভয়াবহ ব্রিজটার দিয়েই চলে গেল। ওপারে পৌঁছেই ছুরি বের করে দড়িগুলো কেটে দিলে—এপারে তৎক্ষণে করপোরেল এবং তার সঙ্গী এসে পড়েছে। করপোরেলের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। করপোরেল তার সঙ্গের সৈনিককে অযথা গালাগাল করতে লাগল, যেন তার দোষেই গ্রুসা আর শিশুকে ধরা গেল না। ওপার থেকে গ্রুসা শিশুকে তুলে ধরে তাদের দেখালো, তারপর পূবদিকের পথে রওনা দিল।

(ক্রমশঃ)

বিপ্লবের উৎস

কালীচরণ ঘোষ

এমন এক একটা ক্ষণ আসে যখন সব অসম্ভব ঘটনা এক সঙ্গে ঘটে এবং সাধারণ বিচার বুদ্ধিতে তার কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ভারতের ইতিহাসে ১৮৯৩ সেই-রকম একটি বছর, যা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গভীর রেখাপাত করে রেখেছে।

বাঙলার বিপ্লবযজ্ঞের হোতা অরবিন্দ ভারতবর্ষে পৌঁছুলেন ১৮৯৩ আর আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেবল বাঙলার নয়। ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বড় রকম নাড়া দিয়েছিলেন। গণআন্দোলনে বিপ্লবের রশ্মিপাত করেন তিলক গণপতি উৎসবের ভিতর দিয়ে। ঐ সালেই সিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতকে জগতের মাঝে উঁচু করে ধরেন, বিস্মিত আমেরিকা ও অপরাপর সভ্য-দেশ নিজেদের মধ্যে ভারতকে সসম্মানে স্থান ছেড়ে দিয়েছে, এ দেশের পরাধীনতা ভাবুকমহলে স্পন্দন তুলেছিল। এ্যানিবেশান্ট ভারতবর্ষে এসে প্রথম পদার্পণ করলেন। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর অবদানে ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে আছে। আরও ঘটে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সভ্যপদের জন্য দাদাভাই নাওরোজীর বিজয়।

আসল ব্যাপার ঘটলো অরবিন্দর অভ্যুত্থান। ইংলণ্ড পরিত্যাগের আগেই তিনি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন। ভারতে ফিরে তাঁকে শিক্ষানবিশী করতে হয় নি। ইন্দুপ্রকাশে প্রথম প্রবন্ধ বেরোয় ৭ আগষ্ট ৮৯৩ এবং অনিয়মিতভাবে হলেও সেটা চলে ১৮৯৪ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত (সমস্ত প্রবন্ধের নকল শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট টাইপ করা অবস্থায় দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম)।

ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় "পুরাতনের স্থলে নতুন আলো" যখন জোঁদা প্রবীণ রাজনীতিকদের চোখে পড়লো, তখন তাঁদের চোখ একেবারে ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। বাঙলায় আসল বিপ্লবের ভিত্ত সেদিন স্থাপিত হ'লো। কালক্রমে সেই বজ্রাগ্নি লিখন সারা ভারতকে উদ্ভাসিত করে, বিস্ফোরণের বিকট শব্দে বুঝিয়ে দিয়েছিল, সুপ্তোত্থিত ভারত "রণং দেহি" বলে মেতে উঠেছে।

১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস তখন রাজনীতিক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করছে। ফিরোজ সা মেহ্‌টা প্রভৃতি ধুরন্ধররা কংগ্রেসের কর্ণধার। যাঁরাই কিছুটা রাজনীতি চর্চা করেন, তাঁরা সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত। এবং বিরুদ্ধভাব বা ভাষা কোথাও না-থাকাতে বাৎসরিক সভায় নরম গরম বক্তৃতা দিয়ে দেশ-সেবা করে থাকেন।

সেই একটানা সুরে বাদ এসে পড়লো। অ-খ্যাত অরবিন্দ বলেছিলেন কংগ্রেস একটা ভ্রান্ত পথ ধরেছে এবং সে পথে ভারতের মুক্তি নেই। বলাবাহুল্য তখন কংগ্রেস 'মুক্তি'র কথা চিন্তাই করতে পারেনি। কর্ণ-ধারদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনই তখন তার পরম ও চরম লক্ষ্য।

কংগ্রেস পুরাণো হ'য়ে গেছে, তাতে পচন আরম্ভ হয়েছে। নতুন করে ঢেলে সাজা প্রয়োজন। তাজা রক্ত না জন্মালে শক্তিহীন ক্ষীণ হ'য়ে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেবল ধনী ও শিক্ষিতদের কংগ্রেস জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে নি। বিরাট জনসংখ্যার সঙ্গে এর কোনো যোগাযোগ নেই, কাজেই এতে জনমানসের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় না। আছে এতে "বনার্জ্জি" (ডব্লু-সি) "ব্যানার্জ্জি" (সুরেন্দ্রনাথ) ও "ঘোষ"রা (লালমোহন ও মনোমোহন) এবং মাত্র মুষ্টিমেয়

ভারতবাসীর তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করছেন। তা দিয়ে আইন-সভায় ভারতীয় সভ্য সংখ্যা বাড়তে পারে, সমকালে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতে ও ইংলণ্ডে পরিচালিত হ'তে পারে, এখানে ওখানে দুএকটা বড় পদে ভারতীয় নিযুক্ত হ'তে পারে, বা এই জাতীয় ভেক বা মেকি সংস্কার আসতে পারে, তার বেশী আর কিছু সম্ভব নয়। এইভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন আনতে আনতে ভারতের মাটই বজায় থাকবে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ রাষ্ট্রনায়ক-গণের অঙ্গুলি হেলনে ভারতের সকল স্বার্থ উপেক্ষিত হ'য়ে যাবে। শত মৌখিক প্রতিবাদ এবং দীর্ঘ রেজো-লিউশন ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পর্য্যবসিত হবে।

সেই বিরাট জনগণের প্রতিনিধি সেই কংগ্রেসে। তাদের সুখ দুঃখের কথা অনাহার, অর্দ্ধাহার, নিরক্ষরতা, চিররুগ্নাবস্থা, শিল্পনাশ, লুণ্ঠনের দ্বারা দারিদ্র্যসৃষ্টি প্রভৃত অবাধে চলে যাচ্ছে, কংগ্রেস তাকে রোধ করতে পারছে না বলে তত দুঃখ নেই, যত দুঃখ সে বিষয়ে একটা বিধিবদ্ধ চেষ্টা পর্য্যন্ত নেই।

নেতৃবৃন্দ মনে করেন এই রকম কোনো পথ অবলম্বন করতে গিয়ে জোর করে কিছু বলতে গেলে, শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষরা ক্ষিপ্ত হবে, তাদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা রাজদ্রোহী বলে গর্জ্জন করে উঠবে, সর্ব্বশক্তি দিয়ে ইংরেজ তাকে দমন করে দেবে। মডারেট নেতারা ভয় করছেন, যতটুকু হচ্ছে তাও বন্ধ হয়ে যাবে।

অরবিন্দ আরও লিখছেন কিছুই ত হচ্ছে না, দেশ ক্ষয়ের দিকে চলেছে অব্যাহত গতিতে। সেই সর্ব্বনাশ মূক অসহায় দর্শকরূপে নেতৃবৃন্দ দেখে যাচ্ছেন। কোথাও এক-আধটা বক্তৃতা দিয়ে প্রবন্ধ বা বই ছাপিয়ে আসল চিত্র দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু জোর করে "হায়! হায়!" বলবার লোকও নেই। এই শব্দ সাধারণের কানে জোর করে আঘাত করলে তারাই একদিন প্রতিকারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং তাদের ন্যায্য দাবীর প্রচণ্ডতা রোধ করার শক্তি কারও থাকবে না; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে।

এই বিরাট জনশক্তিকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা নিয়ন্ত্রিত করা ভারতের জননায়কদের কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্যে দারুণ-অবহেলা ত আছেই, বরং কংগ্রেসকে ভুল পথে চালিত করা হচ্ছে। নেতামাত্রেই স্বার্থদুষ্ট এ কথা মনে করবার কারণ নেই, কিন্তু তাঁদের দূরদৃষ্টির অভাব আজ সব বানচাল করে দিতে বসেছে। এখন সময় এসেছে যখন আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টা নির্দ্দিষ্ট পথে পরি-চালিত হয়; দাবী উত্তরোত্তর বিস্তৃতক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

বিদেশী শাসকবর্গের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করা, এবং তার ফললাভের জন্য নিশ্চেষ্ট বসে থাকা আত্ম-প্রবঞ্চনার নামান্তর। নানা দুর্ব্বলতা জাতির অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে, তাকে দূর করতে শক্তিচর্চ্চা করতে হবে। নিজে শক্তিহীন হয়ে পরের কাছে যাচ্ঞা করে কোনো জাত বড় হ'তে পারে নি। যার মেরুদণ্ড দুর্ব্বল তাকে যত উৎসাহই দেওয়া যাক্, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সমস্ত জাতির মধ্যে শক্তির তেজের প্রবাহ ছড়িয়ে দিতে হবে, মানুষ নিজেকে চিনে তার নিজের পথ বেছে নিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে, তখন তার গতি দুর্ব্বার হবে, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না, সাহসও করবে না। অন্ততঃ দুপক্ষের একটা দারুণ শক্তিপরীক্ষা হবে; আর দৃঢ়চিত্ত জাতি পরাধীন হলেও যথাকালে স্ব-প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে।

ভারতবাসীর শত্রু বাইরে যতটা তার চেয়ে দেশের ভিতর অনেক বেশী। নানা দুর্ব্বলতা দেশের সকল অস্থিসন্ধি ছেয়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য শিক্ষা, মনের শক্তি, কাম্যবস্তুর প্রকৃত চিত্রের অভাব, আত্মকলহ, পরস্পরে ভেদবুদ্ধি স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িক কলহ প্রভৃতি ত আছেই, সঙ্গে আছে বিদেশীর উস্কানি। দেশের অভ্যন্তরের সকল দুর্ব্বলতা দূর করতে না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছুবার কোনো সম্ভাবনা নেই। পথের মাঝেই স্রোতের গতি রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। সুতরাং সকল মোহ পরিত্যাগ করে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেতে হবে এবং তার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করে চলতে হবে।

এ সব কথা জাতীয়তাবোধের ভিত্তি হিসাবে তিনি

উচ্চারণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার নানা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের নানা ত্রুটির কথা বলে অরবিন্দ ক্ষান্ত হন নি। বাঙ্গলায় এসে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার পূর্ব্বে তিনি আসন্ন সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতির কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন। হাতিয়ার নেই বলে নিরুৎসাহ হবার নিশ্চেষ্ট থাকবার কথা তিনি মনে স্থান দেন নি।

অরবিন্দই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করে বলেন পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া 'স্বরাজ' কথার অন্য অর্থ নেই। সখারাম গণেশ দেউস্কর "স্বরাজ" শব্দটি সর্ব্বপ্রথমে ব্যবহার করেন এবং ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজি সভাপতিরূপে সেটি গ্রহণ করেন, কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ তখন সাহস করে কেউ বলেনি। এটা অরবিন্দর জন্য তোলা ছিল; "বন্দে মাতরম" পত্রিকা সে বাণী প্রচার করে।

বঙ্গভঙ্গের পর অরবিন্দকে যে মূর্ত্তিতে দেখতে পাওয়া যায়, তার প্রায় সবটাই তার আগে প্রকাশ পেয়েছিল 'ইন্দু প্রকাশ'-এর প্রবন্ধ দিয়ে। তার বক্তব্য বিপ্লব (সশস্ত্র) আনতেই হবে, কিন্তু এটা কেবলমাত্র কয়েকজন সাহসী বিপ্লবীর বিপদবরণ ত্যাগের মধ্য দিয়ে হওয়া সম্ভব নয়; এর পশ্চাতে প্রকাণ্ড এক জনসংখ্যার দেশপ্রেমজাত প্রচণ্ড বিক্ষোভের সমর্থন থাকা চাই। তা না হ'লে কয়েকজন কর্মী বেছে বেছে ধরে সাজা দিলে সমস্ত আন্দোলন ব্যাহত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলার এবং তাতে শক্তি সংযোজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

অরবিন্দ সশস্ত্র হিংসাত্মক আন্দোলন সমর্থন করতেন না, এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। তিনি সংগ্রামী গুপ্ত-সমিতির সমর্থক ছিলেন। তিনি 'ব-কলমায়' বলেছেন "he had studied wtih interest the revolutions and rebellions which led to national liberation" যে সকল বিপ্লব ও বিদ্রোহ পরাধীন দেশকে স্বাধীন করেছে, তিনি সে সকলের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন; এবং উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন, "the struggle against the English in mediaeval France and the revolts which liberated America and Italy."—ইংরেজের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের ফ্রান্সের সংগ্রাম এবং সেই সকল বিদ্রোহ যার সাহায্যে আমেরিকা ও ইটালী পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি-লাভ করেছিল। (Aurobindo on himself…P-33-)

স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন কি পথ নেবে তিনি সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর ১৮ই তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের গুণগান করেন ইন্দু প্রকাশের প্রবন্ধে। ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রজা বা সামন্তশক্তির বিরোধের কথা তুলে তিনি উদাহরণ-স্বরূপ বলেন যে রণিমীড (Runnymede) থেকে হল (Kingston-on-Hull) এর হাঙ্গামায় পৌঁছুতে ইংলণ্ডের সাত (?) শতাব্দী লেগেছিল, কিন্তু তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভিন্নপথ ধরেছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে রণিমিড-এ ১২১৫ ২রা জুন সম্রাট জন্‌কে দিয়ে ইংরাজ সামন্ত-শক্তি ম্যাগ্‌না-কার্টা সই করিয়ে নিয়েছিল। আর হল্‌ সহর ১৬৪৩ সালে সম্রাট প্রথম চার্লস-এর সৈন্য-বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছিল স্থানীয় গণতন্ত্রীদলের নেতারা। তারা স্লুইস গেট ("কপাটে কল") খুলে দিয়ে সহরের ঘেরা পরিখা দিয়ে জল এনে আশপাশ সমস্ত অঞ্চল ভাসিয়ে দিলে সম্রাটের দলবল অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অত্যাচারী সম্রাটদের বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধশক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারে এই উদাহরণ অরবিন্দ পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করলেন।

কিন্তু ঐ প্রবন্ধেই আরও গুরুতর ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্ত্তন অমন সহজ সরল পথে এবং সুচারু-রূপে হয় নি। বরং সেখানে রক্ত ও অগ্নিপরীক্ষায় পাপমুক্ত হতে হয়েছিল (the first step of that fortunate country towards progress was not through any decent or orderly expansion but by a purification of blood and fire) ইংলণ্ডের সঙ্গে

তুলনায় ফ্রান্সের রক্তবিপ্লবকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। তিনি বল্লেন এখানে সম্ভ্রান্ত শান্ত-শিষ্ট নাগরিকের সভা এই পরিবর্তন সাধন করে নি (It was not a convocation of respectable citizens but the vast and ignorant prolitariate.....that blotted out in five terrible years the accumulated oppression of seven centuries)—করেছিল অজ্ঞ বিশাল জনতা এবং তারা ভয়াবহ পাঁচ বছরে সাত শতাব্দীর সঞ্চিত অত্যাচার অনাচার ধুয়ে মুছে ফেলেছিল।

এরপর অরবিন্দর নির্দ্দিষ্ট পন্থার কথা নিয়ে আর আলোচনার অবকাশ নেই। তিনি বিপ্লবী দলের কর্ণধার হয়ে বাঙ্গলায় বসেন ১৯০৬ আর প্রবন্ধটি লেখা ১৮৯৩ অর্থাৎ অন্ততঃ বারো বছর আগে।

তিনি ব্যাপক বিক্ষোভ গড়ে তোলার জন্য দেশকে প্রস্তুত হবার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। গভর্ণমেণ্টের মতে অরবিন্দ সারা ভারতবর্ষকে ইংরেজ বিদ্বেষের এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন যাতে একস্থানে বিদ্রোহ দমিত হলে আর একস্থানে প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়তে পারে।

বাঙ্গলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তিনি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করেন। আরামকেদারায় বসে, গায়ে একটিও আঁচড় লাগতে না দিয়ে, কেবল ফতোয়া ঝাড়া আর বাৎসরিক বক্তৃতা দিয়ে দেশের স্বার্থরক্ষার কিছুই হবে না। ইন্দু প্রকাশে তাঁর এইটাই প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। তার ওপর তিনি কাজের মধ্যে দিয়ে দেখালেন স্বার্থত্যাগ করে দেশের সেবা করতে হবে, ক্ষয় ক্ষতি সহ্য করতে হবে। নিজ স্বার্থ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ যে ঢের বেশী বাঞ্ছনীয় সে কথা তিনি আচরণ দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন।

তাঁর সহকর্ম্মীরা বুঝতে পেরেছিল এর পরের স্তর নির্য্যাতন, যেখানে জেল জরিমানা থেকে ফাঁসি কাঠে প্রাণ দান করতে হবে। সাহসী মন চাই, অকাতরে যাতে সকল বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারা যায়। হয়ত নিজ জীবনে পূর্ণ না-হবার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু বর্ত্তমানের আদর্শে ভবিষ্যৎ "সন্তানদল" গড়ে উঠবে যারা ত্যাগ, শৌর্য্য বীর্য্য, নিষ্ঠা সেবা দ্বারা নিজেদের যশ ও দেশমাতৃকার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

বঙ্কিমচন্দ্র মূর্ত্তিদান করলেন, মন্ত্র সৃষ্টি করলেন, অরবিন্দ তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে তাঁকে রণ-রঙ্গিণী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা করলেন।

অগ্রদূত

বাঙ্গলার সশস্ত্র বিপ্লবের আদিকাণ্ডে অরবিন্দর নাম প্রথমেই ওঠে এবং তাঁরই স্থান যে সর্ব্ব প্রধান সে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে হলেও সমসাময়িক কালে আর যাঁরা এ কাজে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ও বন্ধু যতীন্দ্রনাথ তাঁর দুই বাহু-স্বরূপ মনে করা যেতে পারে। অরবিন্দর কথা বিশদ-ভাবে আলোচনা করার আগে বাঙ্গলার মাটীতে যিনি বিপ্লব-মন্ত্র কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য বরোদা থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলা যুক্তিযুক্ত।

যতীন্দ্রনাথের মনে দুটি ভাব অতি প্রবল এবং সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হয়েছিল। যদি তাঁকে আনন্দ-মঠের সন্তানদলের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে খুব ভুল হবে না। একদিক সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের প্রতি আসক্তি, আর দেশপ্রীতি, দেশের পরাধীনতায় বেদনাবোধ তাঁর জীবনের আর একটা বড় দিক।

তদানীন্তন ভারত সরকারের নির্দ্দেশ ছিল বাঙ্গালীকে কোনো স্থানে সামরিক-বিভাগে স্থান না-দেওয়া। নানা স্থানে চেষ্টা করে তিনি বিফল হন, অথচ তাঁর বিশ্বাস ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে তাড়াতে না পারলে তারা বিদায় হবে না, সুতরাং যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য যে উপায়েই হ'ক সৈন্যবিভাগে প্রবেশলাভ করতেই হবে। তাঁর মানসিক প্রস্তুতির পরিচয় কিছুটা মেলে যখন দেখা যায়, তিনি সে-যুগেই একখানা ব্লক (Block) লিখিত মডার্ণ ওয়ার ফেয়ার (আধুনিক যুদ্ধপ্রকরণ) সংগ্রহ করে-ছিলেন এবং বারীন্দ্র তাই থেকে বর্ত্তমান রণনীতি বইখানা লেখেন। আলিপুর বোমার মামলায় তাঁকে

জড়াবার চেষ্টা হয়েছিল এবং রক্ত-লিখিত বইখানা কাছে রাখার জন্ম জবাবদিহি করতে হয়েছিল। তিনি সৈন্য-বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং বইখানি তাঁর অধিকারে রাখা তত দোষাবহ মনে না হওয়ায় তিনি নিষ্কৃতি পান।

বাঁকিপুর ও এলাহাবাদে (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "কায়স্থ পাঠশালায়") শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি উপযুক্ত কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় এবং কি উপায়ে সৈন্যবিভাগে ঢুকতে পারেন তার অনু-সন্ধান হলো তাঁর সর্ব্ব প্রধান প্রচেষ্টা। বরোদায় এক প্রভাবশালী বাঙ্গালী আছেন এবং তাঁর দ্বারা কিছু সুবিধা হতে পারে, এই মনে করে ১৮৯৯ সালে এসে সেখানে উপনীত হন। তিনি যাঁর সন্ধানে এলেন, তিনি অরবিন্দ ঘোষ। সামরিকবিভাগে তাঁর বন্ধুদের সাহায্যে যতীন্দ্রনাথ অশ্বারোহী শ্রেণীতে নিযুক্ত হন।

বরোদায় আসবার পর থেকেই আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা আহরণের জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক হয়ে ওঠেন। তাঁর বুদ্ধি শারীরিক শক্তি এবং ঔৎসুক্যের পরিচয় পেয়ে মাধব রাও যাদব নামে অশ্বারোহী বিভাগের একজন উর্দ্ধতন-পর্য্যায়ের নায়ক তাঁকে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করেন।

বরোদায় অরবিন্দর সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠ আলোচনার সুযোগে তিনি ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ তাঁকে "exceedingly energetic and capable" বলে মনে করলেন এবং ১৯০১ সালে বাঙ্গলায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য, বাঙ্গলায় ছোট ছোট বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা এবং খুঁজে খুঁজে তার সভ্য যোগাড় করা।

তিনি এসে আখড়া খুলেছিলেন এবং সেখানে দস্তুর-মত শরীরচর্চ্চা, কুস্তি এবং লাঠি ছোরা খেলা, তরবারি পরিচালনা, আত্মরক্ষা, শত্রুকে আক্রমণ ঘোড়া চড়া প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি দেখলেন পি. মিত্র, সরলা দেবী ওকাকুরা এ সম্বন্ধে অন্তত মনের দিক থেকে এগিয়ে আছেন। তবে প্রথম দিকে মিত্র মহাশয়ের কাছে ছেলেরা এসে মহারাষ্ট্র থেকে লোক এসে আখড়া করেছে, তাদের কাছ থেকে বিদ্যাশিক্ষার পরামর্শ দিতেন। বেশীদিন লাগেনি ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র বসু অনুশীলন সমিতি স্থাপন করেন মিত্র মহাশয়ের সহযোগিতায়।

১৯০২ সালে বারীন্দ্র এল কলকাতায় হাল চাল দেখতে; মফঃস্বলেও সামান্য ঘোরাঘুরি করে বারীন বরোদায় ফিরে যায়। ইতিমধ্যে পি মিত্রর সঙ্গে যতীন্দ্র নাথের মতভেদ হয় এবং তাঁরা স্বতন্ত্রভাবে দল পরিচালনা করতে থাকেন। এরই পরে বারীন (১৯০৯) কলকাতায় আসে এবং নেতৃত্বের লড়াই নিয়ে দুজনে বিরোধ বাধে। যতীন্দ্রনাথ এই তিক্ততা এড়াবার জন্য কলকাতা ছেড়ে চলে যান। প্রকৃতপক্ষে এরপর অনুশীলন বা যুগান্তর কোনো দলেরই সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল না।

সাধারণতঃ এই পর্য্যন্ত পরিচয় হয়ত বিপ্লবের পথে যথেষ্ট বলে মনে করা যেত। মনটা তাঁর ত্যাগের দিকে ঝুঁকেছিল বেশী সুতরাং তিনি সন্ন্যাস নিয়ে কার্য্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলে বিশেষ বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁকে ভিন্ন ধাতে গড়েছিলেন। কলকাতার কর্ম্মক্ষেত্রের বাইরে বিপ্লবের কাজের জন্য সারা ভারত বিশেষতঃ উত্তর ভারত পড়ে রয়েছে,সে কথা তাঁর বিপ্লবী-মন একবারও ভোলেনি। আরও একটা বিষয় ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। বরোদায় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন অরবিন্দর পরামর্শদাতা ঠাকুর সাহেব, ইংরেজের বেতন-ভুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করতে মনোনিবেশ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ মনে করলেন তাঁর যাযাবর জীবনে তিনি এ-কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। তাই লোকে যখন জানলো তিনি কুটিল কর্ম্মপন্থা ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে গেলেন, প্রকৃত-পক্ষে তিনি দেশের মঙ্গলে এই বিপদসঙ্কুল পথ বেছে নিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদিকার্য্য সম্পন্ন করে তিনি প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তিনি চলেছেন, আর কেউ সংবাদ না রাখুক বাঙ্গলার পুলিশ তাঁর পিছন ছাড়ে নি; দূর থেকে তাঁর কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করে চলেছে। তাদের কথায় জানা যায় তিনি

কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে প্রথম বছরটা দার্জ্জিলিং ও নেপালের তরাই জঙ্গলে পরিভ্রমণ করেছেন, এখানে বৈপ্লবিক কার্য্যের কোনো প্রচেষ্টা করেছেন বলে সন্ধান পাওয়া যায় না।

পর বৎসর তিনি চলতে সুরু করে প্রথমে যান তিব্বত এবং সেখানে মনে হলো যেন জীবনের খেই হারিয়ে যাচ্ছে। শক্ত করে মন বেঁধে নিয়ে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে যাত্রা সুরু করলেন। পথে যেখানে সেনা-কটক ছাউনি পেয়েছেন সেখানে তিনি আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছেন। এইভাবে হিমালয় গাড়োয়াল এবং হরদ্বার জেলার নয়াশরণ অরণ্যে কিছুদিন কাটিয়ে দেন, এতেও এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়।

তৃতীয় বৎসরে, ১৯০৬ সাল নাগাদ তিনি আলমোড়া আসেন এবং সেখান থেকে পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থলে পরিক্রমা চালিয়ে যান। মন অশান্ত; বিশেষ কাজ হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বাঙলায় আগুন জ্বলে উঠেছে, তার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। মনের দিক থেকেই বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছেন না, কারণ কতকটা তিক্ততা নিয়ে তাঁকে বাঙলা ছাড়তে হয়েছিল। যাই হ'ক ১৯০৭ সালে পুলিশ তাঁকে পেশোয়ারে আবিষ্কার করে। কিন্তু তিন দিন মাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করার সঙ্গে সরকারী আদেশে তাঁকে ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করে চলে আসতে হয়। সৈন্যদের মধ্যে আনুগত্য ভঙ্গের প্রচেষ্টা হলো তাঁর বিপক্ষে বড় অভিযোগ।

অস্থাবিধায় পড়লেও তিনি বিশেষ দমে পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পেশোয়ার থেকে ক্যাম্বেলপুর জেলায় পাঞ্জা সাহেব যান। চলার পথ, কাজের সুযোগ না পেলেই আবার চলতে আরম্ভ করেন। এর পর এ্যাবোটাবাদ, সেখান থেকে ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শনের জন্ম তিনি চলে যান। এর মধ্যে কোনো বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কিছুদিন কাশ্মীরে বাস করবার পর তাঁর পর্য্যটনের এবং হয়ত দেশসেবার নেশা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তিনি কলকাতা অভিমুখে রওনা হন এবং অধিকাংশ সময়ই নিজ গ্রামে (চান্না, বর্দ্ধমান) আশ্রমে, কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে বন্ধুভক্ত শিষ্যদের আশ্রয়ে কালযাপন করতেন।

যে কোলাহলময় পথ তিনি পরিত্যাগ করেন, তারপর তাঁকে আর সেই আবর্ত্তের মধ্যে দেখা যায় নি। অরবিন্দর কাছ থেকে কলকাতা এসে তিনি সুরেন্দ্রনাথ, সুরেন ঠাকুর, সরলা দেবী, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পি মিত্র, গোড়া থেকেই সহায়তা করেছেন। গোড়ার দিকে "একলা চল রে" নীতি গ্রহণ করে মন্থরপদে অগ্রসর হতে হয়েছে। ধারীন কলকাতা আসার পর তাঁর একজন সহকর্মী পেয়েছিলেন। আর তার সঙ্গেই মতান্তর বিরোধের ফলে তাঁর সাধের সঙ্ঘ ছেড়ে যেতে হ'য়েছিল। তিনি বিপ্লবীভাবধারা বহন করে এনে সর্বপ্রথম বিপ্লবী সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন, এ কথা স্মরণ করলে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ভরে ওঠে। ঐতিহাসিকের কাছে তিনি আজও যোগ্য সম্মান পেয়েছেন বলে মনে হয় না। সেদিনের এখনও বিলম্ব আছে।

রোমা রোঁলা অরবিন্দকে স্বামিজীর "young friend" যুবা-বন্ধু ও "intellectual heir" চিন্তাপ্রধান বা ধীঃ জগতের উত্তরাধিকারী বলেন। কার্য্যক্ষেত্রে তাই দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু যতদূর জানা যায় স্বামিজীর সঙ্গে অরবিন্দর সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নি। অবশ্য অরবিন্দ তখন বরোদায় যখন স্বামিজী সুদূর পশ্চিম নিয়ে বাংলায় ফিরে আসেন। কিন্তু আজ সন্দেহাতীতভাবে জানা গেছে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে পাকাপাকিভাবে বরোদা ত্যাগ করবার পূর্ব্বে অরবিন্দ মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। দুই-মহামানবের সাক্ষাৎ না হ'লে বিবেকানন্দর প্রভাব অরবিন্দর ওপর যে পড়েছিল, তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। আর কিছু না হ'লেও স্বামিজীর রাজনীতিভক্ত প্রিয় শিষ্যার সঙ্গে অরবিন্দর গভীর যোগাযোগ হ'য়েছিল সে কথা আজ সর্ব্বজন-বিদিত।

অরবিন্দ যখন বরোদায় বসে ধীরে সুস্থে, সাধারণের অজ্ঞাতে বল্লেও চলে, কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক-আন্দোলনের ফসল ফলাবার জন্যে মাটি তৈরী করছিলেন তখন নিবেদিতা পুরোদমে বাঙ্গলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন। তাঁর গুরু তাঁকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, আর সেই শক্তিতে তিনি আপন পথে চলেছিলেন। বিরোধ বেধেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধারগণের সঙ্গে এবং সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। নিবেদিতা রাজনৈতিক যে দলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছিলেন তাতে কেবল অধ্যাত্ম বিষয় এবং কতকটা সেবাধর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারী বিসনজর পড়ার সম্ভাবনা।

বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে জাপানী ওকাকুরার দান অসামান্য। নিজের দেশের জাতীয় অভ্যুত্থানের পরিচয় দিয়ে তিনি বাঙালীকে জেগে ওঠবার জন্যে ঘরোয়া আলোচনা, পরামর্শ, বা প্রকাশ্য বক্তৃতায় উৎসাহ দিতে ছাড়তেন না। ১৯০১ সালে ওকাকুরা ভারতে আসেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার পর ধীরে ধীরে ভারতে তাঁর কর্মপন্থা ঠিক করে নেন। জানুয়ারী মাসে নিবেদিতা গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এখানে ওকাকুরা আবার পি (প্রমথ) মিত্র ও সরলাদেবীর সঙ্গেও আলাপ আলোচনা সুরু করেছেন। তার ফলাফল অন্য সময় আলোচনা করার প্রয়োজন হবে।

নিবেদিতার মনে ক্রমে রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করলেও তিনি তাঁর ধর্মমত ও পথ থেকে বিযুক্ত হন নি। স্বামিজীর বিরাট ব্যক্তিত্বে বেদ উপনিষদ পুরাণের ধর্ম, জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার চেষ্টার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচার, সমাজের সংস্কার ও সেবার পরামর্শ ও ব্যবস্থা, সমগ্র জাতির মনে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও ভগবৎপ্রেমের সামঞ্জস্য রক্ষা করার আদর্শ স্থাপন সম্ভবপর হ'য়েছিল। নিবেদিতা মিশন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লেন জুলাই ১৮, ১৯০২ (স্বামিজী দেহরক্ষা করেন ৪ঠা জুলাই)। তিনি দেশকে বঙ্কিমচন্দ্রের মত মূর্তিমতী দেবী বলে গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে ভারতবাসীকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা তাঁর ধর্মজীবনের অংশ বলে কাজে নেমে পড়েন। তিনি "অজ্ঞেয়" ব্রহ্মের সন্ধানে কালক্ষেপ করার চেয়ে "প্রত্যক্ষ দেশমাতৃকার সেবা"র পরামর্শ দিলেন তাঁর সহকর্মী, সমধর্মী, অনুরাগী, অনুচরদের মধ্যে।

স্বামিজীর মতের অনুকরণে তিনি শিক্ষাদীক্ষা চরিত্রগঠন অনুশীলনের সঙ্গে কলকারখানা, শিল্পবাণিজ্য, আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য উৎসাহদান করলেন, ঠাকুরঘর দেবীপূজা আরাধনা পরে এলে তত ক্ষতি নেই। মানুষের সেবা, দেবপূজা ও তাঁদের উদ্দেশ্যে ভোজ্য উৎসর্গ করা অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়। দেশাত্মবোধের উন্মেষ যাতে যুবকদের মনে সাগ্রিকামে সম্ভব হয় তার জন্যে কোনো চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তাঁর। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা লাভের জন্য কি করেছে সেটা বাংলার যুবকদের জানাবার জন্যে তিনি তৎসংক্রান্ত নানা বই সংগ্রহ করে দিতেন। সে সময় যুবচরিত্র গঠন করবার পক্ষে এ সকল পুস্তকের মূল্য ছিল প্রচুর।

জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, গোখেলে প্রভৃতি তদানীন্তন দেশবরেণ্য নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতে নিবেদিতার এক বিশিষ্ট স্থান হয়েছিল তাঁর পরিবেশের মধ্যে। সেই সময় যখন অরবিন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'লো। তখন নিবেদিতা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধ্যানধারণা, কর্মপদ্ধতিকে রূপ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। গাইকোয়াড়ের আমন্ত্রণে তিনি বরোদায় যান এবং অরবিন্দের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনার সুযোগ ঘটে। তিনি অরবিন্দের 'ইন্দুপ্রকাশে' মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বামিজীর তিরোধানের পর একজন প্রগতিপন্থী সৎসাহসী উগ্রজাতীয়তাভাবাপন্ন নেতার সঙ্গে পরিচয় উভয়ের জীবনে কল্যাণপ্রদ হ'য়েছিল। ১৯০২, অক্টোবরে ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে উভয়ের মধ্যে গভীর আলোচনা চলে।

একটা মত আছে, নিবেদিতা অরবিন্দকে প্রভাবিত

করেছিলেন বাঙলায় এসে সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন কর্মী-দের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য। হয়ত কিছু সত্য এর মধ্যে আছে ; কিন্তু তা নিয়ে বিতণ্ডার অবকাশ নেই। বরোদায় বসেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতি-প্রগতি বদল করবার চিন্তা জেগে উঠেছিল এ কথা অরবিন্দ নিজেই বলেছেন।

নিবেদিতার দান যে কত বিরাট তার কিছুটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি কায়মনোবাক্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন ; এমন কি, তাঁর সন্ন্যাসিনী-জীবন সময় সময় বহুল পরিমাণে ধুয়ে সরে গিয়েছিল। যোগাযোগ স্থাপন, আলোচনা-সভায় অংশগ্রহণ, সভাসমিতিতে যোগদান, বক্তৃতা প্রবন্ধ সাহায্যে যুব-সমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা সবই তাঁর কর্মতালিকায় স্থান পেয়েছিল।

অরবিন্দ এসে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবার আগে নিবেদিতার চেষ্টা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন ; ১৯৬৭ জুলাই সংখ্যা পুরোধা পত্রিকায় স্বামী যে তথ্য প্রকাশিত হয় তাই থেকে আমরা পাই। তখন নিবেদিতার অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেছিলেন, কারণ অরবিন্দ মনে করছিলেন "এখনও সময় হয় নি"। নিবেদিতা প্রকাশ্যভাবেই বলেন, "আমি আপনার দলে"। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে প্রকাশ্যভাবেই বিপ্লবের বার্তা প্রচার করতেন। নানা কথার পর অরবিন্দ বলেন যে, বিদেশী বিশেষতঃ আইরিশ মহিলা এবং বহু গণ্যমান্য নামকরা লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকায় গভর্ণমেণ্ট একটু সমীহ করে চলত। তাঁর কাজ সম্বন্ধে সব কথা এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে লেখা সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ আশীর্বাণী দিয়েছিলেন তাঁকে,

> "Be thou to India's future son
> Mistress, servant, friend in one."

আর তিনি বিপ্লবের কাছে তাঁর পরিচয় রেখে গেছেন। উঁচুমহলে, এমন কি কর্মকর্তাদের পক্ষে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং যাঁকে দিয়ে যতটা কাজ পাওয়া যায় আদায় করে নিতেন। "বিপ্লবী-ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা, টাকা দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, আবার বোমা তৈরী শিখবার জন্যে বিদেশে ছেলে পাঠানো, ইত্যাদি, কত কি!" তারপর আরও যা ছিল' সে সব কাজে অপর কাকে কাকেও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে তাঁর মত খুব বেশী লোক তখন পাওয়া যায় নি।

স্মৃতিচারণ : রামপদ মুখোপাধ্যায়

যোগেশচন্দ্র বাগল

বৎসরখানেক পূর্ব্বে রামপদ মুখোপাধ্যায় গত হইয়াছেন। তিনি আর ইহজগতে নাই, একথা ভাবিতেও যে মন সরে না। কিন্তু ইহা আজ রূঢ় সত্য। মরদেহে রামপদবাবুকে আমরা আর কখনও দেখিতে পাইব না। তাঁহার অশরীরী আত্মা চারিপাশে ঘুরিতেছে, আমরা এই চেতনা হইতে মুক্তি পাই না। হয়ত ইহার কারণ আত্মা অমর বলিয়া।

রামপদবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় চল্লিশ বৎসর-ব্যাপী। তাঁহাকে দেখিবার পূর্ব্বেই তাঁহার একটি গল্প-পাঠে বড় মুগ্ধ হই। বোধহয় ১৯২৯ সালের কথা। মাসিক বসুমতীর কোন এক সংখ্যায় এই গল্পটি বাহির হয়। নাম ঠিক স্মরণ হইতেছে না, তবে বিষয়বস্তু মনে আছে। একটি ছোটগলির দুইপারে দুইটি পরিবার। একটি পরিবার বস্তির বাসিন্দা। অপরটি তেতলা গৃহের অধিবাসী। সুরেশ্বরবাবু আপিস হইতে পাঁচটার পরে ফিরিয়াছেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা—অত বড় বাড়ী খাঁ খাঁ করিতেছে। স্ত্রী বাড়ী নাই। তিনি সিনেমায় গিয়াছেন। সুরেশ্বরবাবু যাহোক করিয়া নিজেই নিজের জলখাবারের ব্যবস্থা করিলেন। অপরপারের ওই বস্তি-বাসিন্দার কথা শুনুন। স্বামী সমস্ত দিন কুলিগিরি করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে। স্ত্রী তাহাকে তেল পৌঁছাইয়া দেয়, স্নানের জলও আগাইয়া দিতেছে। স্নানান্তে স্বামীকে যৎসামান্য আহারাদি প্রীতিভরে পরিবেশন করিল। উভয়ের মধ্যে কি আনন্দ, কি তৃপ্তি!

এই গল্পটি আমার মনে এমন দাগ কাটিয়া গিয়াছে যে আজও, এই চল্লিশ বৎসর পরেও তাহা জ্বলজ্বল করিতেছে। দুইটি পরিবার contrast দেখাইয়া শ্লেষাত্মক অথচ সহৃদয় সুনিপুণ বর্ণনা! রামপদবাবুর কোন গল্প-পুস্তকে এটি স্থান পাইয়াছে কিনা জানি না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ঐ বৎসরের মাসিক বসুমতী খুঁজিয়া ইহা পাঠ করিতে পারেন।

(২)

'৩০-এর শেষ কি ৩১-এর প্রথম। ইতিমধ্যেই রামপদবাবুর কয়েকটি গল্প প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। থাকেন নিকটেই—গিরিশ বিদ্যারত্ন লেনে। কিন্তু এত-দিনে একবারও আমাদের আপিসে আসেন নাই। গল্পের পাণ্ডুলিপি ভ্রাতুষ্পুত্র লইয়া আসিতেন, প্রকাশের পর যথাসময়ে দক্ষিণা লইবার জন্যও তাঁহাকে পাঠান হইত। রামপদবাবুর গল্প বড় মিষ্টি। আমাদের খুবই ভাল লাগে। অথচ এতদিনে তাঁহাকে একটি বারও দেখি নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট গল্পের সুখ্যাতি করিয়া তাহাকে বলিলেন, এখানে কত লেখক আসেন। রামপদবাবু একটি বারও আসিলেন না। তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় তখন প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ুর প্রধান সহকারী সম্পাদক। ব্রজেন্দ্রবাবুর এই কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, রামপদবাবু সম্প্রতি কথাচ্ছলে উহা আমাকে স্মরণ করাইয়া দেন।

যাহা হউক, রামপদবাবু বোধ হয় দুপুরের দিকে একদা প্রবাসী আপিসে আসিলেন। সৌম্য মূর্ত্তি সুঠাম দেহ, মস্তকে স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বা কেশরাজী। পরিধানে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী। একটি কথা এখানে বলি, রামপদ-বাবু বরাবর ঘরে ও বাহিরে খদ্দর পরিতেন। ইহাকে তিনি কখন মিটিং-কাপড় করেন নাই। তাঁহার গল্প মিষ্টি, কিন্তু কথা ততোধিক মধুর। আমরা তাঁহার সঙ্গে অল্প সময়ই বাক্যালাপ করিলাম কিন্তু ইহাতেই মন

ভরিয়া গেল। রামপদবাবু নিরালায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। লেখক-সমাজে তাঁহার গতিবিধি নাই বলিলেই চলে। ব্রজেন্দ্রবাবু কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি এমন শক্তিমান লেখককে নিরালা হইতে বাহিরে টানিয়া আনিতে চান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তখন আমরা ঢুকিয়াছি। অল্পকালের মধ্যে ব্রজেন্দ্রবাবু ইহার একজন কর্তাব্যক্তি হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া রামপদবাবুকে ইহার সভ্য করিয়া লইলেন। পরিষদে এইরূপে তাঁহার যাতায়াত সুরু হয়।

আবার শনিবারের চিঠির বৈঠকেও তিনি তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দিলেন। এই বৈঠকে কত সুধীসজ্জন ও গুণীব্যক্তির আনাগোনা। অল্পেই বুঝিলাম, সাক্ষাৎ-পরিচয় না থাকিলেও অনেকেই রামপদবাবুর লেখায় মুগ্ধ। তিনি শনিবারের চিঠিতেও কিছু কিছু লিখিতে লাগিলেন। রামপদবাবুর প্রথম গল্পের বই একখানি প্রকাশিত হয় কমলা বুক ডিপো হইতে। আমাকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহা প্রচারের তখন কোনরূপ চেষ্টাই হয় নাই। শনিবারের চিঠির সজনীবাবু আগ্রহী হইয়া রামপদবাবুর একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কয়েকটি উৎকৃষ্ট গল্প এই-প্রকাশিত 'আবর্তে' স্থান পাইল। সাময়িকপত্রে কত ভাল ভাল লেখা পড়িয়া থাকে, কিন্তু তাহা পুস্তকে গ্রথিত না হইলে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করে না। 'আবর্ত' রামপদবাবুকে শীঘ্রই সুধী-সমাজে যথোপযুক্ত মর্যাদা দান করিল।

প্রবাসীতে তাঁহার কত গল্পই না বাহির হইয়াছে। ক্রমে তাঁহার কয়েকটি ধারাবাহিক উপন্যাসও এই পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। শাশ্বত পিপাসা, মজানদীর কথা, সেকালের, মনে হয় এ কালেরও বাঙালী-পাঠককে খুবই তৃপ্তি দান করিয়াছে ও করিতেছে। 'বসুমতী' সাহিত্যমন্দির প্রকাশিত রামপদ গ্রন্থাবলীর মধ্যে এ দুইটির বিশিষ্ট স্থান করিয়া দেওয়া হয়। পুস্তকাকারেও এ দুখানি উহার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ভাষা মিষ্টি বা মধুর বলিলে সব বলা হয় না। গাঙ্গেয় অঞ্চলের সাধারণ নরনারীর মুখে এমন সহজ সরল গ্রামীন শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাচনভঙ্গীর প্রয়োগ আর কোথাও এমন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। মেয়েলী ছড়া, প্রবাদ, ব্যবহারিক কথা যেন তাঁহার লেখায় ঠাসা। আমি একবার কৌতূহলবশে তাঁহাকে ইহার কারণ শুধাই। তিনি বলেন, বাল্যে ঠাকুরমা ও পিসিমার কোলে মানুষ হইয়াছিলাম। মাতুলালয় শান্তিপুরের ওপারে কালনায়। নিজবাটি এবং মাতুলালয়ের বর্ষীয়সী মহিলাদের কাছেপিঠে তিনি ছিলেন এবং তাঁহাদের কথাবার্তা বাক্যালাপ তাঁহার নিজের ভাষাকে গড়িয়া তোলে, একটি স্বচ্ছ সহজ রূপও এই প্রকারে অগোচরেই তাঁহার আয়ত্ত হইয়া যায় তাঁহার এই আত্মীয়ারা অনেকে দীর্ঘজীবী ছিলেন। আমি জানিতাম রামপদবাবুর তাঁহার পিসিমাকে দেখিতে বালীগঞ্জে যাইতেন। তখন তাঁহার বয়স নব্বই বৎসরের উপর। রামপদবাবুর লেখার রসমাধুর্য্যবিচারে এই রূপটি কাজী আবদুল ওদুদ বড় ভাল করিয়া ধরাইয়া দিয়াছেন। মনে হয় বাংলা কোন লেখায় তিনি রামপদবাবুর রচনা-শৈলীর উৎকর্ষ ও মাধুর্যের কথা ব্যক্ত করেন। রামপদবাবুর মুখে শুনিয়াছি তিনি তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবেও পরে তাঁহার ভাষা-মাধুর্যের কথা বলিয়াছিলেন।

আমি কয়েকবৎসর পরে আনন্দবাজার পত্রিকার 'দেশ' সাপ্তাহিকে সহকারী সম্পাদকের চাকরী লইয়া যাই। কর্তৃপক্ষ মনে করিয়াছিলেন কিনা জানি না' তবে আমি খ্যাত এবং অল্পখ্যাত অথচ উঁচুদরের যেসব লেখকের সংস্পর্শে এতদিন আসিয়াছি তাঁহাদের লেখা পরিবেশন করাইতে যত্নবান হই। গল্পলেখকদের মধ্যে তিনজনের কথা আমার মনে আছে, পথের পাঁচালির বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধুনা, বিখ্যাত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং আমাদের রামপদবাবু। যতদূর মনে হয় রামপদবাবু একাধিক গল্প আমাকে দেন। এই সময় আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ পাই। তিনি থাকিতেন তিন নম্বর কলেজস্কোয়ারে দ্বিতলের একটি মেসে। আমি থাকিতাম অনতিদূরে তিননম্বর রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ একটি ভবনে। এখানে নব-বিধান ব্রাহ্মসমাজের ছাপাখানা ও প্রকাশনা-বিভাগ ছিল। দ্বিতলে আমাদের জন্য মেস। আমরা উক্ত

উত্তরের স্থলে প্রায়ই যাইতাম, কত কথাই না হইত। রামপদবাবু গল্পের মাধ্যমে তাঁহার এই সাময়িক বাসস্থানটিকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। 'শ্রীমান মধুরেণ' গল্পটি এখানকার কর্তাব্যক্তিকে লইয়া লিখিত।

আমি এতদিন ঢের বিষয়ে লিখিয়াছি। ছেলেদের জন্যও কিছু কিছু লিখিতাম। কিন্তু চলিত ভাষায় কখন লিখি নাই। এক বন্ধুর মাধ্যমে প্রকাশক পাইলাম কিন্তু তাহার খেয়াল চলিত ভাষায় লিখিতে হইবে। মাঝে মাঝে এমন কথাও বলিতেন যে, চলিত ভাষাই থাকিবে, সাধুভাষা এদিনে অচল। এখন ভাবি আমার প্রকাশকপ্রবরের কি ভবিষ্যৎদৃষ্টিই না ছিল! আমার প্রথম কিশোরপাঠ্য বই চলিতভাষায় লেখা। কিন্তু মনের খুঁৎখুঁতানি গেল না। দ্বিতীয় বইও শীঘ্র বাহির হইবে, ভাষা যে ঠিক হইতেছে এ কথা কে বলিয়া দিবে? অগত্যা রামপদবাবুর শরণ লইলাম। এক একটি প্রুফ আসে এবং তাঁহাকে একবার করিয়া দেখাই। এইভাবে সমগ্র বইখানি শেষ হইল। রামপদবাবু রায় দিলেন চলিতভাষায় লেখা হইলেও আমার ভাষা ঠিকই হইয়াছে। অনেকে ভাবেন শুধু ক্রিয়াপদ চলিতভাষায় লিখিলেই লেখা হইয়া গেল; কিন্তু এই ভাষার একটি বিশিষ্ট আদর্শ আছে। তাহা আয়ত্ত করিতে না পারিলে গুরুচণ্ডালী দোষ হয়। রামপদবাবুর অনুকূল মত পাইয়া আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। আমার তৃতীয় পুস্তক, অবশ্য বড়দের জন্য 'মুক্তির সন্ধানে ভারত'—এই চলিতভাষার লেখা। বন্ধুদের অনেকে—ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কলিকাতাবাসীও আছেন, আমার এই চলিতভাষার লেখা আদৌ পছন্দ করিতেন না। একজন তো একদিন বলিয়াই ফেলেন চলিতভাষায় লেখার দরুণ অমন ভাল বইয়ের গৌরবহানি ঘটিয়াছে। রামপদবাবু কিন্তু একটা রক্ষণশীল ছিলেন না। তিনি নিজেও পরে চলিতভাষায় লিখিতে শুরু করেন। গল্প উপন্যাস ভ্রমণকাহিনী অতঃপর এই ভাষাতেই লিখিয়াছেন।

(৩)

রামপদবাবু প্রথমে রেলের শিয়ালদহ ডিভিসনের আপিসে কর্ম করিতেন। ই. বি. আর ইনষ্টিটিউট, বর্তমানে নেতাজী ইনষ্টিটিউট্ লাইব্রেরী হইতে মোটামোটা বই আনিয়া পড়িতেন। ইংরেজীতে অনূদিত ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গল্প ও উপন্যাস। আবার ইংরেজী মৌলিক গল্প-উপন্যাসের বইও আনিতেন। তাঁহার অধ্যয়ন ছিল প্রচুর ও ব্যাপক। আমাদের সাহিত্যিকেরা, অন্তত রস-সাহিত্য যাহাদের লেখ্য বিষয় তাঁহারা বড় স্বল্পায়ু। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর কতটুকু। আহরণ চাই এবং উপলব্ধির জারক-রসে পরিপাক করিয়া তবে নিজ রচনা মাতৃভাষায় পরিবেশন করা দরকার। রামপদবাবুর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর কিন্তু আহরণও ছিল যথেষ্ট। অধ্যয়ন ও অনুধ্যান অভিজ্ঞতার পরিপূরকরূপে তাঁহার বিবিধ রচনাকে ভাবসমৃদ্ধ ও রসমধুর করিয়া তোলে। শেষের দিকে ভ্রমণবিষয়ক রচনাগুলিও এই কারণে খুবই উঁচুদরের হইয়াছিল।

রেলের কর্মীরূপে তিনি দ্বিতীয় মহাসমরকালে প্রায় চারিবৎসর লক্ষ্ণৌতে স্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মাঝে মাঝে পত্রালাপ হইত। তবে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিষয়ের খুঁটিনাটি অতদূরে তাঁহাকে জানান সম্ভব হইত না। আমার কিশোরপাঠ্য চতুর্থ বই 'বীরত্বের রাজটীকা' একখণ্ড তাঁহাকে পাঠাই। আমার কন্যা ও পুত্রের নামে এই বইখানি উৎসর্গ করি। তখন তাহারা খুবই ছোট। রামপদবাবু মনে হয় জানিতেন না। তিনি উৎসর্গ পত্রে নাম দুইটি দেখেন ও 'মানবক' দুইটিকে জানিতে চাহিয়া পত্র দেন। কি সূক্ষ্মরসিকতা ও রসবোধ! তিনি যুদ্ধের শেষদিকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং নূতন একটি মেসে থাকিতে আরম্ভ করেন। তখন রেশন সুরু হইয়াছে। রেলকর্মীদের রেশনের বহর খুব। রামপদবাবু প্রতি শনিবার ভারী ভারী বোঝা লইয়া শান্তিপুরস্থ সূত্রাগড়ের বাটীতে যাইতেন। সহধর্মিণী তখন বাড়ীতে। ক্রমশঃ ভারী ভারী বোঝা বহিবার ফলে তাঁহার একটি নূতন রোগ দেখা দেয় এবং অস্ত্রোপচারের জন্য তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি হন। বোধহয় আরোগ্যলাভের অল্পদিন পরেই শিবপুরের বাসা-

বাটীতে সস্ত্রীক বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মেসে আমি মাঝে মাঝে যাইতাম। একটি কুখ্যাত গলির ভিতর দিয়া ঐস্থানে যাওয়ার সোজা পথ। দেখিতাম নিগ্রো সৈনিকেরা দলবাঁধিয়া ওখানকার ঘর-বাড়ীর দিকে উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। এ বিষয়ে আর অধিক কিছু না বলাই ভাল।

পূর্বেই বলিয়াছি রামপদবাবু নিরালায় থাকা মানুষ। 'শনিবারের চিঠি'র বৈঠকেও তিনি আর যান না। এই সময়, যুদ্ধের শেষার্ধে আগষ্ট বিপ্লবের ফলে বহু জননেতা ও দেশকর্মী কারারুদ্ধ হন। 'মন্দিরা' মাসিকপত্রের পরিচালক, সম্পাদক এবং লেখক-লেখিকা অনেকেই একে একে কারাবরণ করিলেন। এ সময় সরস্বতীপ্রেসের অন্যতম অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় এই পত্রিকাখানি সম্পাদনার ভার লন। বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ দত্তকে দিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আমাকে অনুরোধ জানান। সংক্ষেপে বলি, আমি 'মন্দিরা'য় প্রতি-মাসে লিখিবার প্রতিশ্রুতি দিই এবং অবিলম্বে লিখিতেও আরম্ভ করি। সাহিত্যিক বন্ধুদেরও 'মন্দিরা'র লেখক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি করা হইল। রামপদবাবু সংগোপনে সাহিত্য-সাধনা করেন। প্রবাসীতে তাঁহার লেখা আখছার বাহির হয়। অন্য পত্র-পত্রিকায় লেখার বড় একটা গা নাই। আমি তাঁহাকে শৈলেন্দ্রবাবুর নিকট লইয়া যাই। শৈলেন্দ্রবাবুর অনুরোধে তিনি লেখক-শ্রেণীভুক্ত হইলেন। বলিব কি, আমরা লেখকেরা কিছু কিছু দাক্ষিণ্যও পাইতে লাগিলাম। ১৯৪৫ হইতে '৫৫ এই দশবৎসর আমার লেখার মরশুম। আগে-পরেও লিখিয়াছি। কিন্তু এই সময়ে আমার যেন গণেশের কলম চলিয়াছিল। সে প্রসঙ্গে ব্যক্তিগতকথার অবতারণা তাহাই এখন বলিব।

আনন্দবাজার পত্রিকা ও যুগান্তরে আমার লেখা বাহির হইতে লাগিল। শুধু রবিবারেই নয়, বিশেষ বিশেষ সংখ্যা যেমন শারদীয়া প্রভৃতিতেও লেখা বাহির হইতে থাকে। বন্ধুবর রামপদবাবু কোথাও বড় একটা যান না, লেখা তো দূরের কথা। আমি এই দুইটি স্থলে লেখকরূপে তাঁহাকে আগাইয়া দিবার কার্য করি। আনন্দবাজারে ও যুগান্তরে তাঁহার লেখা বিস্তর বাহির হয়। যুগান্তরে গত শারদীয়া সংখ্যায়ও তিনি গল্প পরিবেশন করিয়াছেন। 'প্রবাসী'র কথা আমি এখানে উল্লেখ করিতেছি না। কেন না ইহার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিল শেষপর্যন্ত সুনিবিড়। বিগত শারদীয়া সংখ্যায়ও তিনি "আগুন" গল্পটি লিখিয়া গিয়াছেন। কি সূত্রে জানি না, 'গল্পভারতী'র সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা জন্মে। তাঁহার অনেক গল্প এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মনে হয় কোন কোন বিশেষ সংখ্যায় তাঁহার এক একখানি পুরা উপন্যাসও বাহির হইয়াছিল। রেডিও-তেও আমার ঘনঘন ডাক আসিতে থাকে এই সময়ে। ডাকে নিশ্চয়ই সাড়া দিতাম। আবার কাহাকে কাহাকেও রেডিওর কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলাম। আজ এই ভাবিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি যে রামপদবাবুকেও তাঁহাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিই। 'সাহিত্যবাসর'এ তিনি কতকগুলি স্বরচিত গল্প পাঠ করেন। কিন্তু কোথাও গিয়া আড্ডা জমান তাঁহার স্বভাব ছিল না। তিনি সে ধাতের মানুষ আদপে নন, কাজেই সম্পর্ক বেশীদিন রাখিতে পারেন নাই। অনেক কণ্ঠরেখাবিশারদ কিন্তু ওখানে অল্পদিনের মধ্যে আসর জমাইয়া লইলেন। মনে হইতেছে তাঁহাকেও আমি ঐ স্থলে আগাইয়া দিবার কাজে কতকটা সহায়তা করি।

ইতিমধ্যে রামপদবাবুর অনেকগুলি বই বাহির হইয়া গেল। সেগুলি সুধীসমাজে বিশেষ আদৃতও হইতে থাকে। দেখি বিভিন্ন প্রকাশক তাঁহার বইগুলি ছাপিতে কতই না আগ্রহী! বসুমতীর সঙ্গে রামপদবাবুর যোগাযোগ বহুদিনের। তাঁহার যে গল্পটি আমি প্রথম পড়ি, পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রথমদিককার বহু গল্প 'বসুমতী'তে বাহির হইয়াছিল। 'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' "রামপদ-গ্রন্থাবলী" বাহির করিয়া তাঁহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বই সাধারণের নিকট সুলভে সহজলভ্য করিয়া দিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি [illegible]

তদীয় "মহানগরী" উপন্যাসখানি আমার নামে উৎসর্গ করেন। আমার একখানি বইও তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়াছি।

(৪)

যতদূর স্মরণ হয় বার তের বৎসর পূর্বে রামপদবাবু চাকরি হইতে অবসর লন। কয়েক মাস এক্‌স্‌টেনশান হয়তো পাইয়াছিলেন। কিন্তু বড় রকমের এক্‌স্‌টেনশান পাওয়ার একটা সম্ভাবনা হয় ডাক্তারী পরীক্ষা সাপেক্ষে। রেলের এক ছোকরা ডাক্তার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলেন কিন্তু স্বাস্থ্যে কোন ত্রুটি না পাইয়াও একথা সেকথা বলিয়া ভাল সার্টিফিকেট দিলেন না। রামপদবাবু আমাকে বলেন, ছোকরা ডাক্তারটির ভাবগতিক দেখিয়া মনে হয় যে কিছু দিলেই সে আমাকে অনুকূল সার্টিফিকেট দিতে পারে। কিন্তু সে প্রবৃত্তি আর হইল না। আমি চাকরি হইতে চিরতরে অবসর লওয়ারই সমীচীন বোধ করিলাম। ইহার কিছু কাল পরে তিনি বাস্তবিকই অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এবং দীর্ঘকাল ভুগিতে থাকেন।

অবসরের পর সুস্থ সময়ে রামপদবাবু একটি ব্যাপারে আমার খুবই সহায় ছিলেন। আমার কনিষ্ঠ পুত্র মারা গেলে বড়ই শোকগ্রস্ত হইয়া পড়ি। বন্ধুবান্ধবেরা সান্ত্বনা দেন, রামপদবাবুও সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু যত রকম দুঃখ বিপদই হোক না কেন কর্তব্য তো করিয়া যাইতে হইবে। আমি কিছুকাল পূর্বে 'সাহিত্য সংসদের' রমেশ চন্দ্র দত্তের উপন্যাসগুলি সম্পাদনার ভার লইয়াছি। কাজ অনেকটা অগ্রসর। এখন প্রেস-কপি তৈরি করিতে হইবে। আমি হিতবাদী সংস্করণকে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করিলাম। কারণ রমেশচন্দ্রের জীবিতকালে ইহাই তাঁহারই গ্রন্থাবলীর শেষ সংস্করণ। পাঠ মিলান কি কঠিন ব্যাপার পূর্বে একবার আমরা তাহা দেখিয়াছি। সাহিত্য পরিষদ দীনবন্ধু রচনাবলী প্রকাশ করেন। নীলদর্পণের পাঠ মিলাইতে আমরা হিমসিম খাইয়া যাই। দীনবন্ধুর জীবিতকালে নীলদর্পণের ছয়টি সংস্করণ বাহির হয়। আমরা ছ'সাত জন একটি টেবিলের চারিধারে বসিয়া পাঠ মিলাইয়াছিলাম। একজনে পড়েন, অন্যেরা যে যে সংস্করণে পাঠের গরমিল আছে তাহা দাগাইয়া লন। রমেশচন্দ্রের বইগুলির পাঠ মিলাইতে এতটা বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু ইহাও কম শ্রমসাধ্য ছিল না। বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন আমাকে উপায় বাৎলাইয়া দিলেন। রামপদবাবুকে পাঠ মিলাইবার কথা বলিবামাত্র রাজি হইলেন। আমি পূজার ছুটির সঙ্গে আরও পক্ষকাল ছুটি লই। রামপদবাবু প্রত্যহ দুইটার সময় শিবপুর হইতে আসিতেন এবং পাঁচটা পর্যন্ত পাঠ মিলাইবার কাজে আমাকে সহায়তা করিতেন। এই রকম বোধ হয় উনিশ কুড়ি দিন চলিয়াছিল। আমার আপিস খুলিয়া গেলে যেটুকু মিলান বাকী ছিল তাহা তিনি শিবপুরে লইয়া যান এবং নাতির সংযোগে তাহা মিলাইয়া আমাকে দেন। তাঁহার শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার আমি কখন ভুলিতে পারিব না। সংসদ হইতে কিছু দক্ষিণার ব্যবস্থা হইয়াছিল বটে কিন্তু পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকারের পক্ষে তাহা ধর্তব্যই নয়।

ইহার পর আমি কলিকাতার বাস ত্যাগ করিয়া নব-ব্যারাকপুরের বাসিন্দা হইলাম। রামপদবাবু দুরারোগ্য অসুখে পড়িলেন। অনেকদিন তিনি এই অসুখে ভোগেন। আমি একদিন তাঁহার বাসায় যাই। তখন তিনি অনেকটা আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। কিন্তু ঔষধপত্র সমানে চলিতেছে। তিনি ভাত খান বটে কিন্তু ডাক্তারের নির্দেশ তৈল ও ঘি ব্যতীত সবকিছু রান্না করিতে হইবে। আমি দুপুরে তাঁহার সঙ্গে আহারে বসিয়া দেখি সবই ভোজ্য প্রস্তুত কিন্তু তেল ছাড়া। তেল ছাড়া বলিয়া খাইতে এতটুকুও বিস্বাদ হয় নাই। তেল ব্যতীত বেগুন ভাজার কথা আপনারা কি শুনিয়াছেন। যাঁহারা মায়েরা পাঠিকা আছেন, তাঁহারাও হয়তো এ বিষয়টি জানেন না। তেলের ভাজার চেয়ে এই বেগুনের স্বাদ এতটুকুও কম হয় নাই। রামপদবাবু ইহার প্রক্রিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। এ ব্যাপারটি চালু হইলে তেলের এই দুর্মূল্যের দিনে গৃহস্থের কতকটা সাশ্রয় হইতে পারে। যাহা হউক, তাঁহার সকাশে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া বাড়িতে ফিরি। এইরূপ মাঝে মাঝে আমি

তাঁহাকে দেখিতে সকালের দিকেই যাইতাম। সুস্থ হইবার পরই তিনিও আমার বাড়িতে আসিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগত ছাড়া পারিবারিক কারণেও কখন কখন আসিয়াছেন। রামপদবাবুকে আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে পাই সাহিত্যিকার বিভিন্ন অধিবেশনে। সেই কথাই একটু বলি।

সাহিত্যিকার বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি তো আসিতেনই এমন কি ঐ স্থল হইতে সাধারণ মাসিক অধিবেশনেও আসিয়া যোগ দিতেন। রামপদবাবু বহু গল্প ও ভ্রমণকাহিনী আমাদের এখানে শুনাইয়াছেন। গত পূর্ব বৎসর আমারা তাঁহাকে বার্ষিক অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথি করিয়া আনি। তিনি এই উপলক্ষ্যে বাঙলা সাহিত্যের উপর এক তথ্যভিত্তিক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। ভাষণ শুনিয়া সভ্যবৃন্দ অবাক হইয়া যান। আমিও অবাক হইলাম। তাঁহার সঙ্গে এতদিনের পরিচয়, নিষ্ঠাবান সাহিত্যস্রষ্টা তিনি, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস এমন করিয়া অনুশীলন করিয়াছেন ইহা তো আগে আদৌ জানা ছিল না। এই বক্তৃতা প্রবন্ধটি গত বৈশাখ সংখ্যা শনিবারের চিঠিতে বাহির হয়। লেখাটির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা করিবার জন্য আমাকে এই অন্ধ অবস্থায় তাঁহার বাড়িতে একবার যাইতে হয়। ইহারও বৎসর তিনেক পূর্বে আমি শেষ তাঁহার ওখানে যাই। তখনই দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল। বলিয়া আসি এই তাঁহার ওখানে শেষ আসা। পরে কয়েকবারই আমার এই কথা উল্লেখ করিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই দুঃখ নিরসনের জন্য কতকটা, এবং তাঁহার কার্যের জন্য আমি শ্রীমান জ্যোৎস্না সেনগুপ্তের স্কন্ধে ভর করিয়া তাঁহার ওখানে যাই। রামপদবাবুর জীবিতকালে সেই আমার শেষবারের মত যাওয়া।

আর তাঁহাকে আমাদের মধ্যে পাইব না, হয়ত এই জন্যই সম্প্রতি পাঁচ মাসের মধ্যে তিনবার আমাদের সাহিত্যিকায় আসিয়া যোগ দেন। বিগত জুন মাসে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষের বাসভবনে সাহিত্যিকার যে অধিবেশন হয় তাহাতে তিনি খাজুরাহ ভ্রমণের কথা আমাদের শোনান। কি চমৎকার লেখা! তাঁহার বহু ভ্রমণকাহিনী শুনিয়াছি, পড়িয়াছি, পুস্তকাকারে ইহার কতটুকুই বা গ্রথিত হইয়াছে। তাঁহার শেষ বইও ভ্রমণ কাহিনী—হিমালয়ের আঙিনায়। খাজুরাহোর চিত্রাবলীর কথা তিনি যখন পড়েন তখন মনে হইল সাধারণের দৃষ্টির বাহিরে তিনি আরও অনেক কিছু দেখেন। তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্মুখী হইয়াছে। যেমন মধুর ভাষা, সুললিত বাচনভঙ্গী তেমনি গভীরভাবে সমৃদ্ধ। রামপদবাবু রেলের কর্মী বলিয়া ভারতবর্ষ পরিক্রমায় তাঁহার বিশেষ সুবিধা ছিল। আমাকে বলেন অবসর লইবার পর বৎসরে দুই বার তিনি ভ্রমণে যাইবার সুবিধা পাইতেন। আসমুদ্র হিমাচল তিনি পরিক্রমা করিয়াছেন। কত ঘটনা, কত কাহিনী, কত দৃশ্য তাঁহার গোচরে আসে। তাঁহার মধুর লেখনী এইসব পরিবেশন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শেষবারের মত গত নভেম্বরে তিনি ভ্রমণে বাহির হন। হরিদ্বার হইতে তিনি আমাকে যে পত্র লেখেন (২২।১১.৬৭) তাহার একটু আপনাদের পড়িয়া শুনাই: "যোগেশবাবু, আপনার পত্র লক্ষ্ণৌতে পেয়েছি। হরিদ্বারে এসেছি—গত রবিবার। আজ পুনরায় লক্ষ্ণৌ ফিরে যাচ্ছি। মধু অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখানে আরও কিছুদিন থাকার ইচ্ছা সত্ত্বেও থাকতে পারলাম না। লক্ষ্ণৌ থেকে যাব এলাহাবাদ—তারপর শিবপুর।"

ডিসেম্বরের প্রথমেই তিনি শিবপুরে চলিয়া আসেন। এবং কয়েকদিনের মধ্যেই কালব্যাধিতে আক্রান্ত হন। আমি তাঁহার পত্র পাইবার আশায় খুবই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম। অকস্মাৎ রে'ডিও মারফৎ এক পঙ্‌ক্তিমাত্র সংবাদ শুনি, 'সাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায় শবপুর পরলোক গমন করেছেন। সংবাদ শুনিবার পর এই ব্যাকুলতা নির্মম প্রশান্তির আশ্রয় লইল। আমার এবং আমার পরিবারের সঙ্গে তাঁহার কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আপনাদের বুঝাইয়া বলিবার ভাষা নাই। রামপদবাবুর মৃত্যুসংবাদ

শুনিয়া আমার পুত্র শ্রীমান দীপক জব্বলপুর হইতে আমাকে যে পত্র দিয়াছে তাহার কিয়দংশ শুনিলে আপনারা আমার কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহার দ্বারাই আমার স্মৃতিচারণ শেষ করিতেছি। শ্রীমান লিখিয়াছে:

"দেশ পত্রিকার মাধ্যমে জানলাম শ্রদ্ধেয় রামপদ জ্যাঠামশায় আর ইহজগতে নাই। এ সংবাদে আমি বিশেষ মর্মাহত হয়েছি। সে দিনটা আমার অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় কেটেছে।

এতে বিশেষ করে তুমি বেশি দুঃখ পেয়েছ।…এখন মনে পড়ে রমেশচন্দ্র দত্তের রচনাবলী প্রকাশের সময় তোমার ও তাঁর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় সে কি প্রগাঢ়তা! এখনো মনে পড়ে হরিসাহার বাজারের সেই মুড়ি সহযোগে গরম জিলিপির কথা। এ সব কথা স্মৃতির মনিকোঠায় অনবরত খোঁচা দেয়, এর প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। সব সময় তাঁর সদাগম্ভীর অথচ শিশু-সরল মুখখানির কথা মনে পড়ে; আর মনে পড়ে তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা। আবার যখন জব্বলপুরে আসবেন আমার এখানে উঠবেন। অথচ বিধির বিধানে সে দিনগুলি আজ স্বপ্নের ওপারে

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কর্ম্মজীবন হইতে অবসরের বয়স—

এদেশে সরকারী চাকরী অবসরের বয়ঃসীমা কোন ক্রমেই ৬০ বছরের বেশী নহে, তবে সাধারণত সরকারী চাকুরীয়াদের ৫৫ হইতে ৫৮ বৎসর বয়স হইলেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। গত কিছুকাল হইতে বেসরকারী বহু সংস্থায় অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বয়স ধার্য্য করা হইয়াছে। এই অবসর গ্রহণ অবশ্যই বাধ্যতামূলক, কারণ বয়স ৫৫ বছর অতিক্রম করিলেই নাকি মানুষ দেহে এবং মনে ক্ষীণবল হইয়া পড়ে, ফলে তাহার কর্ম্মশক্তির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মদক্ষতাও কমিয়া যায়! অতএব উপায় কি? তাহাকে কর্ম্মজীবন হইতে বিতাড়িত না করিয়া অন্য পথ নাই!

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা কিন্তু কেবলমাত্র সাধারণ চাকুরীজীবি মানুষের প্রতি প্রযোজ্য—অসাধারণদের বেলায় এ-নিয়ম খাটে না, খাটিবে না। সেই জন্য—কিছুদিন পূর্ব্বে আচার্য্য বিনোবা ভাবে যে প্রস্তাব করেন. তাহার প্রতিবাদ না করিয়া উপায় নাই। আচার্য্য বিনোবা বলিতেছেন: চাকুরীজীবিদের যদি ৫৫-৬০ বছর বয়সে কর্ম্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিতে আইনত বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে কেন্দ্র এবং রাজ্য মন্ত্রীদেরও কেন ৬০-৬৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হইবে না। লোকসভা এবং রাজ্যবিধানসভার সদস্যরাও কেন এই বয়সে অবসর গ্রহণ করিবেন না? কিন্তু আচার্য্যদেব ভুলিয়া যাইতেছেন, যে বয়সে 'সাধারণ' মানুষের দৈহিক এবং মানসিক কর্ম্ম ও চিন্তাশক্তি কমিতে কমিতে প্রায় লোপ পায়, ঠিক সেই বয়স প্রাপ্ত হইলেই মন্ত্রী এবং লোক ও বিধানসভার সদস্য অর্থাৎ অসাধারণ ব্যক্তিদের, কর্ম্ম-ক্ষমতা এবং চিন্তাশক্তি ৬০ বছর হইতেই—গজাইতে সুরু করিয়া ৮০.৮৫ বছর বয়সে তীব্রতম অবস্থায় উপনীত হয়। একথাও প্রমাণিত সত্য যে মন্ত্রী এবং লোক ও বিধানসভার (রীতিমত বেতনভুক) সদস্যগণ এই বয়সেই দেশ এবং দশের সেবা প্রকৃষ্টরূপে করিতে পারেন, কারণ ৬০ বছর বয়স প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহারা আত্মপর ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র, সর্ব্বক্ষণ দেশের এবং দেশবাসীর মঙ্গল চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকেন—আহার নিদ্রার কথাও প্রায় বিস্মৃত হইয়া!!

আচার্য্য বিনোবা ভাবে বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই যে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়গণ এবং সংসদ এবং বিধান সভার সদস্যবৃন্দ যে 'মালমসলা' দিয়া গঠিত, তাহাতে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মেদমস্তিষ্ক, বুদ্ধি এবং পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিবার বাসনা তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে থাকে এবং গুটিপোকা হইতে যেমন কালক্রমে মনোহর প্রজাপতি বাহির হয়, তেমনি—এই শ্রেণীর ব্যক্তি হইতেই ভীষণ ভীষণ দেশসেবী মন্ত্রীর উদ্ভব হয় এবং যথা সময়ে ঐ মহাশয় আত্মত্যাগী মন্ত্রীমহাশয়গণই আমাদের মত মাটাবালাম জাতীয় সাধারণ মানুষদের হিতার্থে নিজেদের মন প্রাণ নিবেদন করেন। কাজেই সকলদিক বিচার করিয়া একথা বলা অতি কর্ত্তব্য কর্ম হইবে যে—দেশ এবং জাতির কল্যাণ কারণে নিবেদিতপ্রাণ মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের ৬০।৬৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণের কথা উচ্চারণ

করিয়া আচার্য্য ভাবে পরম দেশদ্রোহিতার কাজ করিয়াছেন এবং যে অপরাধের জন্ম তাঁহাকেই হয়ত নিজ কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে! বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু বুদ্ধি-কর্ম্মতৎপরতায় নবীন যুবা শ্রীমোরারজী দেশাইকেই হয়ত শ্রীবিনোবাকে এই অবসর দানপত্র দিতে হইবে। বিশেষ করিয়া এখন ওখানে শ্রীদেশাই—ডেপুটিত্ব পরিহার করিয়া পূর্ণ প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিবার সুযোগ সুবিধা করিতে পারেন নাই। শ্রীদেশাই এখনও দেশের জন্ম বহু কিছু করিবার আশা রাখেন এবং সেইসব 'বহু-কিছু' সার্থক করিতে পারিলে এ ভারত মহাভারতে পরিণত হইয়া এখানে স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইতে বাধ্য!

ভারত হইতে চীনা-বিতাড়ন!

শ্রীমোরারজী ভিক্ষা-মিশনে বাহির হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতের যে অংশ বিশেষ চীনারা বেদখল করিয়া আছে, আলাপ-আলোচনার দ্বারা অর্থাৎ ভালকথায় যদি তাহারা সেই বেদখলী অংশ ছাড়িয়া না যায়, তাহা হইলে তাহাদের অতি অবশ্যই আমরা ঘাড় ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিব! কথাটা সত্যই বীরোচিত, কিন্তু এতদিন তিনি এ-কথাটা জগতবাসীদের কেন শুনান নাই বলিতে পারি না। খুব সম্ভবত শ্রীমোরারজী চীনাদের নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার অবকাশ দিতেছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে চীনারা ভাল কথার মানুষ নহে, সেই অবস্থায় তাহাদের ধমক দেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় পথ আর কি থাকিতে পারে? শ্রীমোরারজী এই সঙ্গে যদি চীনা-বিতাড়নের একটা সময়-সীমা বাঁধিয়া দেন, আমরা খুশী হইব এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পরম শুভ ধাক্কাধাক্কির জন্ম খানিকটা প্রস্তুতও হইতে পারিব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মোরারজী তথা ভারত সরকার বেদখলকারী পাকিস্তানকে কাশ্মীর হইতে ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবার কি ব্যবস্থা করিতেছেন, কিংবা এ-বিষয়ে কি চিন্তা করিতেছেন সে সম্পর্কে একটি কথা বলারও প্রয়োজনবোধ কেন করিতেছেন না। ভারত আর কতকাল, কয়শত বর্ষ, পাকিস্তানীদের হাজারো রকমের নষ্টামী সহ্য করিবে, শ্রীদেশাই সে কথা বলিবেন কি? আমরা যখন চীনাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়া ভারতের বেদখলী অঞ্চল হইতে তাড়াইয়া দিবার মত শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি, তখন চীনা আশ্রিত এবং প্রসাদ-ভোগী নেংটি পাকিস্তানকেও অবশ্যই কাশ্মীর হইতে ঝাঁটাইয়া কিংবা প্রয়োজন হইলে চেলাকাঠাঘাতে হটাইয়া দিবার মত শক্তি রাখি। এ-শক্তি যদি আমাদের থাকে তাহা হইলে—এখনো আমরা চুপ করিয়া পাকিস্তানী লাথি হজম করিব কেন?

এই 'কেন'র জবাব কে দিবেন? প্রতিরক্ষা মন্ত্রী? প্রধানমন্ত্রী? না, অ (ন) র্থ মন্ত্রী—তাহার বিচার ভারত সরকারই করিবেন। গরীব প্রজারা, কর্ত্তব্যপালন করিবে—বিনা প্রতিবাদে ক্রমবর্দ্ধমান করভার বহন করিয়া আদায়ী কর হইতে আকাশচারী মন্ত্রী মার্গীয় মহামানবদের গগন-বিহারী বিমানের ব্যয় নির্ব্বাহ করা সম্ভব করিবে। মোরারজীর হঠাৎ-বীরোচিত সদম্ভ ঘোষণা এবং গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া অভারতীয় প্রায় সকল স্বাধীন রাষ্ট্রই—কৌতুকবোধ করিতেছে। ভিখারীর মুখে ভিক্ষার কাতর আবেদন ছাড়া অন্য কোন প্রকার নীতিবাক্য কিংবা দম্ভবাণী কেহ প্রত্যাশা করে না—এবং এই প্রকার বাণী কোন ভিক্ষুকের শুষ্কবদন হইতে বাহির হইতে দেখিলে সেই ভিখারীকে সকলেই সার্কাসের ক্লাউন বলিয়া মনে করে!

পাপ-পাকচক্র—শেষ কোথায়?

ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তর হঠাৎ কতকগুলি এমন নথিপত্র প্রকাশ করিয়াছেন যাহাতে পাকিস্তান বিদ্রোহী নাগা এবং মিজোদের—কতভাবে কতরকম সহায়তা দিতেছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এতদিন পরে এগুলি প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন ছিল কি? কারণ এসব তথ্য প্রায় সকলেরই একরকম জানা কথা। আমাদের বৈদেশিক দপ্তর এই সকল তথ্য এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কেন গোপন রাখিয়া-ছিলেন, তাহার কারণ আমাদের পক্ষে বুঝা শক্ত। মার

খাইয়া হজম করা কিংবা বেমালুম চাপিয়া যাওয়া সত্যই বিষম রাজনীতি—স্বীকার করিব।

অশুভলগ্নে পাকিস্তানের অশুভ জন্মক্ষণ হইতেই এই দুইরাষ্ট্রের প্রধানতম কাজ ভারতের ক্ষতিসাধন এবং সর্ব্বভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা প্রচার। বলা বাহুল্য, এই প্রকার কৌশলে তাহারা আজ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জন করিয়াছে এবং ভারত এই কুৎসাস্রোত রোধ করিতে সর্ব্বভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ ভারতের কেন্দ্রীয় প্রচারদপ্তর পরিচালনার ভার সর্ব্ববিষয়ে অযোগ্য কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের অনুগৃহীত আশ্রিতজনদের উপর। ভারতের বিদেশস্থ দূতাবাসগুলিকে এককথায় 'অযোগ্যতার ডিপো' বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। এই সকল দূতাবাসের ছোটবড় সকল কর্ম্মচারীর প্রধানতম কর্ত্তব্য—খানাপিনা এবং গৌরীসেনের পয়সায় আমোদ-আহ্লাদে দিনযাপন করা! দূতাবাসগুলিতে এই রাজকীয় আমোদ আহ্লাদেব সঙ্গে ককটেলের স্রোত প্রবর্ত্তনের জন্য প্রধানত দায়ী—জাতীয় "শুদ্ধতার" আদর্শ সংরক্ষক মৃত, অর্দ্ধমৃত ও জীবিত দেশনেতাগণ।

বিশেষ কয়েকজন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত (অ্যাম্বেসেডর) বিদেশে গিয়া শ্রীগৌরী সেন মহাশয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজার হালে রাজকীয় মর্য্যাদায় বসবাস করেন যাহা ভারতের মত দরিদ্রদেশের প্রতিনিধিদের পক্ষে কেবল বেমানানই নহে, মর্য্যাদাহানিকর। স্বর্গত জবাহরলালের আমলেই এই ব্যাপার অতি প্রকট হয়, কিন্তু জবাহরলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তিনি নাকি ভারতের মর্য্যাদা (false prestige ?) রক্ষার কারণেই ভারতীয় রাষ্ট্রদূতদের বিলাসবহুল জীবনযাপন এবং গরীব দেশের রক্তমাখা করের অর্থ অপব্যয় অপচয় প্রতিরোধের কোন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আশা ছিল শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এ-বিষয়ে হয়ত কিছু সুরাহা করিবেন, কিন্তু আমাদের কপালদোষে আর আমাদের রাষ্ট্রদূত এবং দূতাবাসের কর্ম্মীদের কপালজোরে তিনি অকালে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। আমাদের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী নেহরু কন্যা শ্রীমতী গান্ধী,হয়ত বুঝিতেছেন সবই,কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি এতই কমজোরী যে কাজের কাজ কিছু করিবার মত ক্ষমতা তাঁহার আছে কি না সন্দেহ। প্রধানমন্ত্রীর নিজ দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানও যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি দেশের, এই সঙ্কটময় অবস্থাতে বেকার, বিদেশ বিহারে বাহির হইতেন না! উপ-প্রধান মন্ত্রীও কম কিসে—তিনিও ভিক্ষার থলি লইয়া এই সময় বিদেশী মহাজনদের দরজায় ধর্না দিতে বাহির হইলেন! তবে একথাও বলা যায় যে ভিখারীর সময় অসময় জ্ঞান সকল সময় থাকে না, প্রয়োজনের ঠেলা তাহাকে পথে বাহির করে!

আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা থাক। চীনাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়া ভারতে তাহাদের বেআইনী দখলী অঞ্চল হইতে তাড়াইয়া দিবার বাজে হুমকী না দিয়া। মহাবীর শ্রীমোরারজী বলুন পাকিস্তানীদের তথাকথিত আজাদ-কাশ্মীর হইতে ঠেলাইয়া কেন বাহির করিয়া দেওয়া হইতেছে না, কেন গত প্রায় বিশ বছর তাহাদের জবরদখল সহ্য করা হইতেছে? এই ক্লৈব্যনীতির পশ্চাতে কোন মহা রাজনৈতিক মহা-কারণ লুক্কাইত আছে—দেশের লোকের তাহা জানিবার কি কোন অধিকার নাই, কোন দাবীও তাহারা এ-বিষয় করিতে পারে না? পাকিস্তান যখন যেখানে যাহা ইচ্ছা করিবে, খুসীমত ভারতকে কাঁচা ভাষায় গালাগালি করিবে আর আমরা কি তাহার জবাবে ভারতের অফুরন্ত প্রেমমধুভাণ্ড হইতে পাকিস্তানকে কেবল প্রেম বিতরণ করিতে থাকিব? অপেক্ষা করিতে থাকিব, সেই অসম্ভব শুভদিনের জন্য যে-দিন পাকিস্তানের শুভমতির উদয় হইবে?

পাল্টা মার কেন দিব না—

পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে ফিজোর দল নাগা এবং মিজোদের সর্ব্বভাবে, কেবল উস্কানী নহে, 'সামরিক' সাহায্য দান করিতেছে, এতদিন পরে মহামান্য ভারত সরকার তাহা স্বীকার করিয়াছেন নথিপত্র প্রকাশ করিয়া। এই যখন অবস্থা, তেমত ক্ষেত্রে ভারত, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ কেন পূর্ব্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে

ইন্ধন জোগাইবে না? আমরা ঘরের পাশে বাঙালী মুসলমান ভাইদের জন্ত বহু কিছু করিতে পারি, সোজা পথে বহুবিধ 'সামরিক' সাহায্য অর্থাৎ মালমশলার জোগান দিতে পারি—এবং তাহাতে কোন অন্তায় হইবে ব'লয়াও মনে করি না। কথায় বলে যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। অবশ্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের কুকুরের সহিত তুলনা করিলে কুকুরকেই অপমান করা হইবে।

সরকারী ভাবে পাকিস্তান যদি ফিজো-মিজো ব্যাপারে নিজেদের জড়াইয়া কোন কাজ না করিয়া থাকে, ভারতও ঠিক সেই পথেই, পাকিস্থানী টেক্‌নিকেই পাকিস্তানকে শয্যাশায়ী করিতে পারে, সম্পূর্ণ 'বেসরকারী' ভাবেই। আমাদের সরকার দয়া করিয়া হাত গুটাইয়া ব'সিয়া থাকুন না, কাজ যাহা করিবার সাধারণ মানুষেই করিবে। আমাদের কর্তাদের অতিরিক্ত পাক্-প্রেম এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্বজ্ঞানই আমাদের কাল হইয়াছে। বিশ্ব শান্তি রক্ষার দায়িত্বভার দুর্ব্বল ভারতকে কে দান করিল, তাহা আমাদের জানা নাই। স্বর্গত জবাহরলাল একদা বিশ্বপ্রেমে ডগমগ হইয়া সারা বিশ্বে প্রেমের এবং শান্তির বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় নেহরুর বাণী এবং বিরাট মহা মানবীয় ভাবভঙ্গী দেখিয়া বিশ্বের সবল সকল রাষ্ট্রই পরম কৌতুক অনুভব করে এবং নেহরুকে ক্রমাগত খেলো বাহবা দিয়া তাঁহার স্ফীত মস্তকটি আরো ফাঁপাইয়া তোলে। আমরা মনে করিলাম নেহরু মহারাজকে গৌরবের গৌরীশৃঙ্গে তুলিল বিদেশী রাষ্ট্র নায়কগণ—হয়ত সেই উত্তোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, খুব উচ্চ স্থান হইতে ভারতগৌরব নেহরুকে মাটিতে নিক্ষেপ করিলে তাঁহার উচ্চ আদর্শ ও ধর্ম্ম-পুষ্ট কিন্তু অশক্ত শরীরকে একেবারে বেকার করিয়া দিতে সুবিধা হইবে বলিয়া। কাজেও তাহাই হইয়াছিল! চীনাদের প্রথম চপেটাঘাতেই নেহরুর ক্ষমতার চরম প্রকাশ পাইল। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে নেহরুর অসহায়, ভীরু এবং ভাঙ্গিয়া পড়া মুখের ছবির কথা (যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়) মনে হইলে এখনো আমাদের কষ্ট হয়। 'শত যুদ্ধের' বীর যোদ্ধার এমন হতাশায় পূর্ণ চিত্র আমরা ইতিপূর্ব্বে বোধ হয় আর দেখি নাই!

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পাখ্‌তুনিস্তান এক প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং এই যুদ্ধের নেতা সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফর খাঁ ভারতের সাহায্য চাহিতেছেন। বেলুচিস্তানে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বাঁধিতেছে। অন্য দিকে সিন্ধু প্রদেশের মুসলমানেরাও পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর শাসনপাশ ছিন্ন করিতে তৎপর হইতেছে। পাক-নষ্টামীর প্রতিরোধ করিতে হইলে আমরা কেন উল্লিখিত বিদ্রোহীদের সহিত হাত মিলাইয়া পাক বিষদাঁত উপড়াইয়া ইসলামাবাদে কবর দিবার চেষ্টা করিব না? জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় নিরীহ নির্ব্বীর্য্য জাতির মান সম্মান বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না, থাকিতেছে না। বিদেশ বিহারে গিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী যে-সকল নীতি-বাণী এবং ভারতীয় তত্ত্বকথামৃত বিদেশের লোককে শুনাইতেছেন, তাহাতে সভাস্থলে হয়ত বা দুই-চারিটা হাততালি অর্জ্জন করা যায়, সভান্তে বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানদের বাড়ীতে কিংবা হোটেলে ফাউস্বরূপ কিছু ডিনার, লাঞ্চ, ককটেল পার্টিও পাওয়া যায়, দিল্লীর আকাশবাণীর পক্ষে প্রধান মন্ত্রীর "রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায়" বিদেশ সফরের একই সংবাদ দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার ঘোষণা করিবার অবকাশলাভও হয়, কিন্তু ইহাতে ভারতের অর্থাৎ হতভাগ্য কর-ভার-পীড়িত প্রজাসাধারণের নীট লাভ কি হইতেছে বা হইল? নীট লাভ করদাতাদের বেশ কিছু টাকার শ্রাদ্ধ অতি সমারোহে সাধিত হইল। এক কথায় ইহাকে শ্রীভূতের পিতৃদেবের শ্রাদ্ধও বলা যাইতে পারে।

আমরা জানিতে চাই—পাকিস্তান স্থানে-অস্থানে, কালে-অকালে যখন যেখানে যেমন ইচ্ছা তাহার খুসীমত ভারতের টেকো মাথায় খড়ম পিটাইবে আর আমরা অসহায় ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য অবলোকন করিতে থাকিব আর কতকাল?

এদিকে নাই ওদিকে আছে।

রাষ্ট্রসংঘে এক ভাষণে আমাদের মহামান্য প্রতিনিধি তথা মুখপাত্র মহাশয় এক পরম বীরোচিত ঘোষণায় দাবী করিয়াছেন যে—"ইজরায়েল্‌কে তাহার অন্যায়ভাবে অধিকৃত

আরব-অঞ্চল অবশ্যই ছাড়িয়া দিতে হইবে, অন্যায় যুদ্ধের ফলে অন্যায় লাভ ইজরায়েল্‌কে কোন ক্রমেই ভোগ করিতে দেওয়া যায় না।"—আমরা আশা করি ইজরায়েল্‌ ভারতীয় হুমকীর ফলে এইবার ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া তাহার অধিকৃত আরব অঞ্চলগুলি পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে পলায়ন করিবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই!

এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আরবদের দুঃখে বিপদে ভারতের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে—খুবই ভাল কথা, যদিও ভারত যখন পাকিস্তান কর্ত্তৃক হঠাৎ ১৯৬৫ সালে আক্রান্ত হয়, সেই সময় কোন আরবরাষ্ট্র (এমন কি ভারতবন্ধু নেহরু সুহৃদ নাসেরও) ভারতের পক্ষে একটি কথাও বলে নাই। ইসলামী প্রেমের বন্ধন এবং স্বার্থ ইহাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ—কিন্তু ভারতের যে-অঞ্চল পাকিস্তান গত ১৯।২০ বছর ধরিয়া জবরদখল করিয়া আছে, সেই অঞ্চল পাক-কবলমুক্ত করিবার জন্য ভারত আজ পর্য্যন্ত কি করিয়াছে? ১৯৬৫ সালে ইন্দো-পাক্‌ যুদ্ধের সময় ভারতীয়বাহিনী পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অংশ বিশেষ হইতে, কান মলিয়া,পশ্চাতে লাথি মারিয়া পাকিস্তানীদের বদনা-থালা সমেত সিয়ালকোটের পশ্চিম দিকে অনায়াসে ঠেলিয়া দিতে পারিত। জেনারেল চৌধুরী ইহাই করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয়কর্ত্তারা এতটা অগ্রসর হইতে সাহস পায়েন নাই। আরবদের দাবীর জন্য রাষ্ট্রসংঘে গলাবাজী না করিয়া, ভারত যদি সর্ব্বাগ্রে নিজের ন্যায্য দাবী এবং স্বার্থ সংরক্ষণে অধিক মনোযোগী হয়, তৎপরতা দেখায়, তবে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের মর্য্যাদার সঙ্গে সদস্যদের কাছে ভারত প্রতিনিধির কথার মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাইবে। দুর্ব্বল দেশের পক্ষে বীরত্বের বাহাদুরী এবং বিশ্ব রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে অযথা মুরুব্বীয়ানার অভিনয়—জগতসভার শক্তিমান রাষ্ট্রদের পক্ষে অবশ্যই উপভোগের বস্তু, সার্কাসে যেমন—ক্লাউনের পার্ট!

দেশের পরম ঐক্যের কারণে

কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশ পায় যে ভারতের রাজভাষা (কবে হইবে জানা নাই!) হিন্দীর কল্যাণসাধনে গত পাঁচ বৎসরে হিন্দী মুরুব্বি-পীড়িত কেন্দ্রীয় সরকার ব্যয় করিয়াছেন পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা এবং এই সময়ে ভারতের প্রজা ভাষাগুলির (যথা বাঙলা, তেলেগু, তামিল, গুজরাটি, ওড়িয়া, অসমীয়া প্রভৃতি আরো প্রায় সাতটি ভাষার) ভরণ, পোষণ এবং তোষণের জন্য কেন্দ্র কোষাগার হইতে দরাজ হস্তে খরচ করা হইয়াছে ৩৬ লক্ষ টাকা মাত্র! ভারতের প্রজা ভাষাগুলির প্রতি কেন্দ্রীয় হিন্দী মহারাজদের প্রেম যে কত গভীর তাহা এই ব্যয়ের অঙ্ক হইতে বুঝা যায়। অনেকে বলিবেন—টাকাটা কম হইল না কি হিন্দীর তুলনায়? আমরা বলিব না! রাজপুত্র (এক্ষেত্রে রাজভাষা) যদি রুগ্ন এবং ক্ষীণবল হয়, তবে সেক্ষেত্রে দেশের ভবিষ্যত রাজাকে অবশ্যই দেহে মনে শক্তিশালী করিবার জন্য তাহাকে বিবিধ প্রকারে বিবিধ ঔষধ এবং পথ্যাদি দিয়া লালন করিতে হয়। হিন্দীর পক্ষেও আজ ইহাই হইয়াছে। হিন্দী বর্ত্তমানে আমাদের প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ ভাষা এবং সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত রাজভাষা হইলেও হইতে পারে, যদিও না হইবার সম্ভাবনাই সমধিক) ক্ষীণবল, হীন সম্পদ এবং মাত্র ১০।১২ কোটি লোকের ভাষা হইলেও যখন রাজভাষা বলিয়া কয়েক জন কেন্দ্রীয় নেতা বলিয়াছেন, তখন ভারতের করদ রাজ্যগুলিকে ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে।

আমরা সত্যই অবাক হইয়া যাই যখন দেখি দেশের হাজার রকমের অতি কঠিন সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি না দিয়া কেন্দ্রীয় হিন্দী 'জেনারেলের' দল, আর সব কিছু ভুলিয়া, ফেলিয়া রাখিয়া ক্রমাগত বাঁকা পথে এই অপচেষ্টাই করিতেছেন যে কি করিয়া কি ভাবে হিন্দীকে রাজতক্তে বসানো যায়। হিন্দীর জন্য যেভাবে যে অকৃপণ হস্তে টাকা ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে ভারতের রাজস্ব যাহা আদায় হয়, তাহার শতকরা ৯৯ টাকাই যেন হিন্দী ভাষী অঞ্চল হইতে আসে। আর তাহা না হইলে হিন্দীর কল্যাণে পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা আর অন্যান্য ১৪।১৫টি ভারতীয় ভাষার লালনার্থে কেন ৩৬ লক্ষ টাকা মাত্র?

৮-১০ ৬৮

ভিখারী বিদায়??—
আরো আছে—

খাস পশ্চিম বাঙ্গলাতেই দেখুন, হাওড়া ষ্টেশনের মাথায় নিওন সাইনে বাঙ্গলায় "হাওড়া" নামটির হঠাৎ স্থানাভাব হইল, বর্ত্তমানে কেবল হিন্দী এবং ইংরেজীতেই "হাওড়া" নাম জল জল করিতেছে। পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য রেল-ষ্টেশন গুলিতেও নাম পড়িবেন প্রথমে হিন্দীতে তারপর ছোট অক্ষরে ইংরেজী এবং বাঙ্গলাতে। বাঙ্গলার স্থান সর্ব্বশেষে? খাস বাঙ্গলাতেও কি বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলা ভাষা 'হরিজন', এখানেও কি কেন্দ্রীয় হিন্দী ব্রাহ্মণ্যদের দাপট আমাদের নীরবে সহ্য করিতে হইবে? বাঙ্গলায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় বিবিধ সংস্থা এবং কর্ম্মশালাগুলিতে বাঙ্গলা সাইন্-বোর্ড এবং কর্ম্মকর্ত্তাদের নেম্-প্লেট হয় হিন্দী আর না হয় ইংরেজীতে! আমরা সবই দেখিতেছি, সহ্যও করিতেছি সবই। বাঙ্গলা ভাষা এবং বাঙ্গালীর স্থান কি বাঙ্গলাতেও নাই—। হেথা নয়, হোথা নয়—তবে কোন খান্? (৯-১০-৬৮)

মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন—

যাক—অবশেষে আগামী বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচনের সময় ঘোষণাতে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯৯ জন সাধারণজন তথা ভোটদাতা খুসী হইয়াছে। তবে এই ঘোষণার ফলে

স্তম্ভিত হইয়াছেন শ্রীঅজ(য়) মুখার্জি
হতবাক্ হইয়াছেন গণপতি শ্রীজ্যোতি বসু এবং
হতাশা-বজ্রাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের
আপদে বন্‌গিয়া ভাগ্য বিধাতা তীব্র লাল কম্যু-
দলপতি শ্রীসুন্দারাইয়া—

কিন্তু ইহাদের এমন হইবার মূল কারণ কি, নৈতিক না অর্থনৈতিক? নির্ব্বাচনী ফাণ্ডের অর্থ বিবিধ সূত্র হইতে গোপনে এবং প্রকাশ্যে যাহা সংগৃহীত হয়, তাহা বোধ হয়, 'স্বেচ্ছাসেবকদের' খানাপিনা, বেশবাস এবং 'দেওয়াল লিখনের' জন্য আলকাতরা এবং বাঁশের মই খরিদ করিতেই—সবই শেষ হইয়া গিয়াছে! ১৭ই নভেম্বর নির্ব্বাচন হইবে এই হিসাবেই রাজনৈতিক দল-গুলি তাহাদের সংগৃহীত ফাণ্ডের বাজেট প্রস্তুত করে—টাকাও সেইভাবে ব্যয় হইতে থাকে—এমন সময় হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাত!—নূতন করিয়া আবার আরো তিন মাসের খরচ কে দিবে কোথা হইতে আসিবে? যে দু-একটি বিদেশী রাষ্ট্রদল বিশেষকে রাজনৈতিক কারণে নিজেদের স্বার্থে চাঁদা হিসাবে অর্থ দাদন দেয়, তাহারা নূতন করিয়া আর দাদন দিবে না। চাপে পড়িয়া গুঁতার চোটে যে সকল শিল্পসংস্থা বামপন্থী দলগুলিকে অর্থ দিতে এতদিন বাধ্য হয় এখন তাহারাও হাত গুটাইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ শ্রমিকমহল তাহাদের নেতাদের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে—ন্যায্য কারণেই। গত কিছুকালের শ্রমিক-আন্দোলনের দুঃখ কষ্ট সবটাই ভোগ করিয়াছে সাধারণ শ্রমিক, তথাকথিত শ্রমিক-নেতারা (প্রায় সবাই বামপন্থী)—নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখিয়া পানাহারে কাল কাটাইয়াছেন। শ্রমিকদের যখন একদিকে চলিতেছে সপরিবারে অনশন, অনটন অভাব দুঃখ কষ্ট, সেই সময়ে শ্রমিক-দরদী নেতাদের দেহে আগুনের সামান্য তাপও লাগে নাই। (১৬-১-৬৮)

নির্ব্বাচন-তারিখ বদলে 'উকী' মর্ম্মবেদনা?

সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মেদিনীপুরে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া নির্ব্বাচন-কমিশনার শ্রীসেনবর্ম্মা যখন নভেম্বর ১৭ই নির্ব্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন, সেই সময় 'উকী' নেতারা তাঁহাকে ভারতীয় গণতন্ত্রের বাহক এবং ধারক বলিয়া অভিনন্দিত করেন! ইহার প্রধান কারণ হয়ত এই ছিল যে তিনি কংগ্রেসের নির্ব্বাচন পিছাইবার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীঅজয় মুখার্জ্জি, শ্রীজ্যোতি-বসু এবং অন্যান্য উকী নেতাদের ১৭ই নভেম্বরের দাবী গ্রাহ্য করেন! উকীদলপতিরা ইহাকে নির্ব্বাচনে তাঁহাদের "প্রথম"-জয় বলিয়া মনে করেন! কিন্তু হঠাৎ বন্যার কারণে তারিখ পিছাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সেনবর্ম্মাই আজ, 'উকী'দের মতে ভারতে গণতন্ত্রের হত্যাকারী বলিয়া বর্ণিত

হইতেছেন! শ্রী সেনবর্মা নাকি কংগ্রেসী চক্রান্ত এবং কংগ্রেসী কেন্দ্র-সরকারের চাপেই এই তারিখ পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন! 'ইউনাইটেড্ ফ্রন্টের' নেতাদের বিচারে, দেশের এখন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন 'উফী মন্ত্রী' সভার শাসনাধিকার লাভ এবং এই কার্য্যসাধিত হইলেই নাকি পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণের সকল দুঃখ কষ্টের হইবে অবসান, এমন কি দেশের বন্যা-বিধ্বস্ত অঞ্চল-গুলির জনসাধারণও তাহাদের পরম দুঃখ কষ্ট এবং অসহনীয় অবস্থা হইতে ত্রাণ পাইবে! 'উফী' সরকার এমন বিষম-ভাবে তাঁহাদের ত্রাণকার্য্য চালাইবেন বলিতেছেন, যাহার কবল হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার কোন অবকাশ থাকিবে না! বর্ত্তমান রাজ্যসরকার নাকি একেবারে বেকার এবং জনগণের দুঃখকষ্টের প্রকৃত সংবাদই তাঁহারা যথাযথ রাখেন না! আর রাজ্যপাল? তিনি ত গত কয়েকমাস রাজভবনে আরাম-কেদারায় বসিয়া স্বপ্নে 'রিলিফ' পরিকল্পনাই করিতেছেন! হায়! দেশের কি দুর্ভাগ্য, রাজ্যবাসীদের কি পোড়া কপাল, এমন একটা প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সুযোগে 'উফী' দল তাহাদের খেলা দেখাইবার অবকাশ পাইল না! (১৫-১০-৬৮)

ভিক্ষা-ভিত্তিক পরিকল্পনার পরিণাম—

পরের স্কন্ধে ভর করিয়া চিরকাল, এমন কি বেশীদিন এবং দূরপথ অতিক্রম করা যায় না। জবাহরলাল প্রবর্ত্তিত এবং তদীয় পরম স্নেহ বিশ্বাসভাজন শ্রীযুক্ত টার্ণ-কোট অশোক মেঠা লালিত আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার চতুর্থ ধাপেই পরম বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে—যেমন দেখা যাইতেছে তাহাতে বিদেশী কোন রাষ্ট্রই আর এই অতলগহ্বর ভারতের পরিকল্পনাখাতে অর্থ বরবাদ করিতে রাজী নহে। আমরাও এই আশঙ্কা করিয়াছিলাম।

এখন বুঝিতে কষ্ট হয় না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সোভিয়েট রাশিয়া যখন প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় সেই পরম সঙ্কটকালেও এবং আকাশপ্রমাণ শত অর্থনৈতিক সমস্যার জালে জড়িত হইয়াও স্টালিন কেন মার্কিণ-এর নিকট হইতে 'মার্শাল-এড্'-লইতে কিছুতেই রাজী হয়েন নাই! ষ্টালিন বলেন যে দেশ গঠনের জন্য বাহির হইতে অর্থসাহায্য একবার গ্রহণ করিলে জাতীয় চরিত্রের অবনতি ঘটিতে বাধ্য যাহার ফলে আত্মবিশ্বাস তথা আত্ম-নির্ভরতার উপর রাশিয়ার বিশ্বাস বিনষ্ট হইবে চিরতরে। ষ্টালিনের এই মত এবং ধারণা যে কতখানি সত্য তাহা বর্ত্তমান রাশিয়ায় সর্ব্ববিষয়ে চরম অগ্রগতি এবং উন্নতি সাক্ষ্য দিবে। ধ্বংসস্তূপ হইতে রাশিয়া আত্মপ্রচেষ্টা এবং সমগ্র জাতির পরম একাগ্রতার ফলে এক নূতন বিস্ময়কর দেশ এবং জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে রাশিয়ার প্রচণ্ড প্রভাব এবং শক্তির মূল উৎস তাহার আত্মনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস এবং কর্ম্মনিষ্ঠা. বাক্যে নহে বাস্তবে। বর্ত্তমান জাপান, পশ্চিম জার্মানি, চেকোস্লো-ভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশ সম্পর্কে একই কথা বহু পরিমাণে প্রযোজ্য। নয়া-চীন মাত্র ১৮ বৎসরে সকল বিষয়ে কি প্রচণ্ড উন্নতি করিয়াছে—সে-কথা বলা বাহুল্য। সকল প্রকার আদর্শ-গত এবং অন্তর্বিপ্লব থাকা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক, কৃষি বিষয়ক এবং দেশ ও জাতীয় কল্যাণকর সর্ব্ববিষয়ে আজ জগতের অন্যতম রাষ্ট্র, আমাদের সহিত বিষম কলহ তথা প্রায় যুদ্ধকালীন সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আমাদের এ-সত্য স্বীকার করা ছাড়া উপায় নাই। কোন কোন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের মতে—১৯৮০ সাল নাগাদ চীন বিশ্বের সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। (তখনও কি ভারত রাশিয়ার তাঁবে হইয়া দিন-যাপন করিবে?)

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরনির্ভরতার ফল আজ আমরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি বিশেষ করিয়া ১৯৬০ সাল হইতে। বলিতে দ্বিধা নাই স্বর্গত জবাহরলাল নেহরুই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই বিপর্য্যয়ের জন্য প্রধানত দায়ী। বিদেশী 'বন্ধু'—বিশেষ করিয়া মার্কিণ অর্থসাহায্য তিনি একপ্রকার চিরস্থায়ী বলিয়া ধরিয়া লয়েন এবং ঋণের টাকায় বিষম বিষম অবাস্তব এমন সব পরিকল্পনা, করেন যাহা করা উচিত ছিল দেশকে খাওয়া-পরা শিক্ষায় স্বনির্ভর করিবার পর। তাহা না করিয়া তিনি বড় বড় ভারী শিল্প গঠনের দিকে নজর দিলেন

প্রথমেই। স্বর্গত নেহরু প্রায়ই বলিতেন "I love big machines" (আমি বড় বড় যন্ত্রাদি বড়ই ভালবাসি)—অতএব আত্মখেয়াল চরিতার্থ করিতে তিনি বড় বড় "মেসিন" নির্ম্মাণ করিতে গিয়া দেশকে গঠন করিবার পরিবর্ত্তে ভিক্ষুকে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। কথায় কথায় আমরা দেশের মর্য্যাদার কথা বলি কিন্তু উন্নয়ন সাহায্য ভিক্ষার জন্য আমেরিকা এবং রাশিয়া গমণ আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়গণ এবং কিঞ্চিত কম মাননীয় পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের পক্ষে প্রায় একটা নিত্যনৈমিত্তিক আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে!

চতুর্থ পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত কাগজেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। এই পরিকল্পনার অর্থ সংগ্রহের জন্য স্বয়ং উপ-প্রধান এবং অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই মার্কিণ তীর্থযাত্রায় বাহির হয়েন। কিন্তু বিদেশে কোন মহলেই মোরারজীর ওকালতী, মৌখিক আশ্বাস ছাড়া আর কিছু পায় নাই। হতাশ মোরারজী মার্কিণ তীর্থযাত্রা সমাপনান্তে দেশে ফিরিয়াই আত্ম-নির্ভরতার বিরাট প্রবক্তা হইয়াছেন! আমরা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে আত্ম-নির্ভরতা বিষয়ে বহু-প্রকার শ্রীগীতাবাণী শুনিবার জন্য প্রস্তুতও হইয়াছি। তাঁহার উপদেশের প্রথম কিস্তি হইবে "বৈদেশিক সাহায্য পাই বা না পাই, উন্নয়নের গতি আমরা অব্যাহত রাখিবই!"—মোরারজী এই প্রতীক্ষা যদি বাস্তবে কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে করদাতাদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে ভীষণতম কর-জাঁতায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া অকালে অক্ষয় স্বর্গলাভের জন্য।

সকল বিদেশী রাষ্ট্র যদি ভারতকে এবার সর্ব্বপ্রকার অর্থসাহায্য কিংবা ঋণদান বন্ধ করিয়া দেয়, আমরা খুসী হইব। একমাত্র ইহা হইলেই ভারত পরের লাঠিতে ভর না করিয়া পথ চলিতে শিখিবে। কষ্ট অবশ্যই হইবে, কিন্তু জীবনযুদ্ধে জয়ী হইতে হইলে এই কষ্ট-রূপী প্রিমিয়াম্ দেওয়া ছাড়া অন্য আর কি পথ আছে জানি না। ভিক্ষার দ্বারা কেহ কোন দিন পৃথিবীতে দাঁড়াইতে বা আত্ম-সম্মান লাভ করিতে পারে নাই।

মূলে ভুল

(উপন্যাস)

পুষ্প দেবী

একদিন সদাশিববাবু অনুর বাড়ী যেতে তার ভাসুর বললেন, দেখুন না ভায়া আমার ষাঁড়ের গোবর হয়ে ফিরলেন। হঠাৎ এ প্রসঙ্গে কথা কইতে পারেন না সদাশিব বাবু। ওদের বাড়ীর কথার ভঙ্গি বিশ্রি। কোন কথা শুনলে বুঝতে পারবেন না কি বলতে চাইছেন তাঁরা। কাজেই উত্তর দেওয়া আরো কঠিন। মনে দ্বিধা হবে জয় জয় বলি, না ছিঃ ছিঃ বলি—। সংস্কৃত শাস্ত্রে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বলে একটা কথা আছে, যাকে ব্যাজস্তুতি বলে—এদের কথার ধারা সেই ধরণের। সদাশিববাবুর মনে পড়ে একবার গদায়ের চুলকাটা সম্বন্ধে এমনি কথা প্রসন্নবাবু বলেছিলেন। বলেছিলেন, দেখেছেন ঘাড়ের চুলছাঁটার বাহার? পায়খানার হাঁড়ি মাথায় করে নিয়ে যাবে ত? ছলকে পড়লে ধুতে সুবিধে। হঠাৎ এমন উপমা যে কেন তাঁর মনে পড়লো তা সদাশিববাবু জানেন না। একেবারে যাকে বলে উপমা কালিদাসস্য। এরি মধ্যে একটি বেদনাদায়ক ঘটনা সদাশিববাবু প্রভার কাছে গোপন করে রেখেছিলেন। তা প্রকাশ করে দিলো বিপদতারিণীর ছেলে হাবলা—। সেদিন নাকি গদাই এসে বিলেত থেকে। সদাশিববাবু এয়ারোড্রোমএ গেছলেন তাকে আনতে—। যথারীতি ফুলের মালা পরিয়ে গদায়ের বাড়ীর লোক তাকে নিয়ে গেল তাদের বাড়ীতে। সামনে সদাশিববাবুকে দেখেও দেখতে পেল না গদাই। এই স্বভাব তার চিরন্তন। হাবলা একদিন এসে প্রভার কাছে মস্ত রাজভোগ মুখে পুরে বললে, জানেন মাউইমা, মামা তো এবাড়ীর দাদুর সঙ্গে কথাই বললো না, প্রণামও করলো না। আমি ভাবলুম বুঝি ভুলে গেছে, তা না বাড়ী গিয়ে বললো, দেখলি আমার শ্বশুরের মুখটা দেখলি? একটা ফুলের মালাও কিনতে পারেনি কিপটের যাশু। কিন্তু এই ঘটনা উদাসীন সদাশিববাবুর বুকে মস্ত দাগ দিয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে দেখার সময় সন্তানের এই ঔদাসীন্য তাঁকে আঘাত করেছিল। ছাত্রদের কাছ থেকে সম্মান সদাশিববাবু প্রচুর পেয়েছিলেন জীবনে। তাঁর স্বভাবমাধুর্য্যে ছাত্ররা তাঁকে শুধু সম্মানই করতোনা, ভালোও বাসতো খুব। ঠিক এমন অসম্মানকর ব্যাবহার জীবনে কখন পাননি তিনি। কিন্তু অনুর কথা ভেবে বিচলিত প্রভা আরো দুটো রাজভোগ হাবলার পাতে তুলে দিয়ে বলেন, ভুলে গিছলো বাবা ও কথা তোমার সেজমামীমাকে যেন বোলনা—। হেসে হাবলা বললো, হ্যাঁ তা হলে হাতাহাতি হয়ে যাবে—যা আমাদের মামীটির পিতৃভক্তি, বাবা বলতে অজ্ঞান—। মাও তেমনি বলে, জানো চাকরেদের আমরা বড়লোক বলিনা, চাকরেও যা চাকরও তা। প্রভা কথাটা চাপা দেন অন্য কথা তুলে, নইলে না জানি আরো কত কি অপ্রিয় কথাই শুনতে হবে। গাঙ্গুলিবাড়ীকে বড় ভয় করেন প্রভা। মাতৃহীনা প্রভা রামবাবুর কোলে যে শিক্ষাতলায় মানুষ হয়েছিলেন সে জগতে মানুষ মানুষকে ভালোবাসে। হিংসা দ্বেষ কথা শোনান এসব জিনিষ তাঁর জানা ছিল না। তেজস্বিনী [illegible]

লোক যদি কথা শোনাত তিনি নীরবে শুনে যেতেন উত্তর দিতে পারতেন না বা চাইতেন না। যত মেজাজ তাঁর ছিল বাপ স্বামী সন্তানদের কাছে। কিন্তু হিসেবে তাঁর এইখানেই ভুল হল—। সন্তান ভাবলেই কি সন্তান হয়। এই সন্তানশ্রেণীর জীব জামাইরা অন্য বস্তু—। তাছাড়া রক্ত? প্রভা যখন শেষ জীবনে একেবারে ছোটছেলের মত অবুঝ হয়ে গেলেন। ব্রহ্মচারী এক কথাই বলতেন,'মাগো অ মা বুঝছোনা কেন? বাঁশ-ঝাড়ে কি কখনো আখ হয়, বাঁশঝাড়ে বাঁশই জন্মায়। জীবনের ঐ অঙ্ক তুমি শীল করে দাও মা—। নাম জপ করো। দেখো ধ্রুবনারায়ণ কত কষ্ট পাচ্ছেন। তুমি কষ্ট পাচ্ছ দেখে আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। নাম জপ করো মা নাম জপ করো। প্রভা তবু অবুঝের মত বলতো অসু ওরা যে আমার অসুর ছেলেমেয়ে—। গীতা-পাঠের সভায় ব্রহ্মচারী প্রকৃতি ও ব্রহ্মের তত্ত্ব বোঝাতেন যে প্রকৃতি হল মা তার কাছে শুধু আদরই পাবো আমরা, সব নিয়ে আমাদের কিন্তু যেতে হবে সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে পিতার কাছে। পিতা হলেন সৃষ্টির বীজ—তার কাছ থেকে সৃষ্টজীব আবার তাঁর কাছে গিয়ে লয় পাবে। মা হলেন আধার যিনি লালনপালন করেন। শেষ জীবনে আঘাতের পর আঘাত পেয়ে প্রভা যেন জড়গোছের হয়ে গেছলেন। একবার ভাবতে চেষ্টা করলেন তবে যে নজরুল বলেছে—

> "লব আর কুশে জন্ম দিয়েছে তাদের বিলাসীপিতা
> অনায়াসে তারে ত্যজিয়াছে বলে পালন
> করেছে সীতা"

উঃ কী মেধাই ছিল এককালে, আজকাল কিছু মনে থাকে না, ও মা ব্রহ্মচারী কোথায়? ও ত বাবা বসে গীতাপাঠ করছেন

> "দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহাঃ"

উঃ সন্তান কি বস্তু! কতদূর থেকে বাবা এসেছেন আবার প্রভাকে বোঝাতে—বাবা সেই বাবা যাঁকে পেলে সব তুচ্ছ মনে হয়। কোথায় মিলিয়ে যায় মনের মধ্যে ছেলেমেয়ে স্বামী—যার কথা ভেবে যার মৃত্যুতে প্রভা লিখেছিল

> শত শত অসু নিরুর সাধ্য নাই
> তোমার অভাব ক্ষণতরে মেটে যাতে
> দেহ পড়ে আছে প্রাণ জানি সেত গেছে
> তুমি গেছ যেথা তোমারি প্রাণের সাথে

সমস্ত সংসার ভুলে প্রভা ব্রহ্মচারীকে আঁকড়ে ধরে। যেমন ডুবন্ত মানুষ একটা কুটো পেলেও তাকে আঁকড়ে ধরে। মনে মনে বলে, বাবা বাবা বাবা আমার বাবা পেলুম আমি। উঃ কী কষ্ট এখানে? বাবা কি আমার কষ্ট সইতে পারেন? সদাশিববাবু বিপদে পড়েন বিব্রত ব্রহ্মচারীকে দেখে। বলেন, বুঝেছি আপনাকে কত অসুবিধেয় ফেলছি আমরা। কিন্তু আপনাকে পেলে ও যেন অন্য মানুষ—! শান্ত হেসে ব্রহ্মচারী বলেন, আমাদের ত এই কাজ—। মা তোমার ঠাকুরকে ভোগ দেবেনা? উত্তেজিত প্রভা বলেন পূজো করতে পারছিনা যে? কেবল অসুর ছেলেমেয়েরা এসে ঠাকুরের মুখ আড়াল করে দাঁড়ায়। দেখতে পাইনা ঠাকুরের মুখ। ওরকম পূজোয় কি হবে? ঠাকুরকেও আর রাখবো না ব্রহ্ম-চারী। ঠাকুর নিয়ে যাও তুমি—। স্মিতহাসি হেসে ব্রহ্মচারী বলেন নাওতো মা তোমার ধ্রুবনারায়ণকে, কোলে নাও, চলো আমরা দিদিভায়ের বাড়ী বেড়িয়ে আসি।

সত্যি সত্যি ধ্রুবনারায়ণকে বুকে নিয়ে শান্ত হয়ে গেলেন প্রভা—ব্রহ্মচারী বললেন দেখো মা তোমার কোলে উঠে কি খুশী হয়েছে গোপাল। গোপাল গোপাল—আবার চমকে ওঠে প্রভা। আমার অসুর গোপালরা মাহারা গোপালরা? ঠাকুরকে কোল থেকে নামিয়ে চুপ করে বসে পড়েন প্রভা। ব্রহ্মচারী করুণ-সুরে নাম করেন

> "গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় জয় রাধা রমণহরি
> গোবিন্দ জয় জয়"

প্রভা তন্ময় হয়ে যায় কীর্তন শুনতে শুনতে—চোখ

বুজে আসে। ও মা একী! এযে গদাই গদায়ের মুখ—সেই গদাই যে বিলেত যেতে প্রভা লিখেছিল

বুঝাব কেমন ক'রে?
পরাণের নিধি ছেড়ে দিতে দূরে
কি ব্যথা এ বুক ভরে।
গিয়াছ যে দূরে তুমি শুধু নয়
গিয়েছে অনেকখানি,
বারে বারে চোখে আসে তাই জল
কণ্ঠে রুদ্ধবাণী।
তব সাথে গেছে গৃহ আনন্দ
অমুর মুখের হাসি!
তব সাথে গেছে ম্লান সুর হয়ে
শিশুদের কলহাসি।
সেই সাথে গেছে বেনু বোনটির
উচ্ছল কলরব,
তোমারি সাথেতে বিদায় নিয়েছে
সুখ উৎসব সব।
মনের মাঝেতে একী শূন্যতা
সবি যে অর্থহীন,
অমুর বাবার ম্লান হাসিটুকু
তোমার অভাবে ক্ষীণ।
পুত্র বলিয়া বক্ষে ধরিয়া
ভরেছে তৃষিত হৃদি
বঞ্চিত জনে পূর্ণ করিয়া
এ কী ধন দিলো বিধি?
তবু বুঝাবার নয়
পাঠাতে বিদেশে মায়ের প্রাণেতে
কত ভয় সংশয়!
আধবলা বোল লভিয়াছে ভাষা
আধচলা পদ দুটি,
ধরণীর বুকে দৃঢ় হয়ে চলে
তবু মার নেই ছুটি।
অবুঝ পরাণে প্রবোধ না মানে
মিছে ভেবে হয় সারা,
কত ভয় আসে দূর পরবাসে
পাঠাইয়ে আঁখি তারা!
তব সাথে গেছে এ চোখের ঘুম
রাত মোর কাটে না যে,
তন্দ্রার মাঝে তুমি হেথা নাই
শুধু এই কথা বাজে।
নিদহারা রাতে ঘুরে মরি ছাদে
আমার মনের কথা,
বিশ্বের মায়ে জানাই মায়ের
পরাণের ব্যাকুলতা।
সবি সার্থক হইবে যেদিন
ফিরিয়া আসিবে কোলে
স্মরিতে সেদিনে সেকী আনন্দে
চোখ ভরে আসে জলে
রোগ শোক গ্লানি ক্ষণেকের তরে
করিবে না পরশন
আমার আশীষে তোমার তরে
যে নিত্য স্বস্ত্যয়ন।

ব্রহ্মচারী ডাকে মাগো কি বলছো মা? নাম জপ করো নাম জপ করো। ধ্রুবনারায়ণ যে তোমায় ডাকছে মা দেখো চেয়ে দেখো—। জয়গুরু গৌরাঙ্গ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মনারায়ণ হরে কৃষ্ণ রাম—বলো মা আমার সঙ্গে সঙ্গে বলো। প্রভা বলেন পার্চ্ছিনা যে—চেষ্টা ত করছি" চুপ করে চেয়ে থাকেন। সারা জীবনই ষ্ট্রাগল্ করে কেটেছে প্রভার। শুধু আর্থিক অনটনের জন্য নয় বড়, বড় রোগের সঙ্গেও যুদ্ধ করেছেন। ভগবানের অসীম করুণায় ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন। জয়ী হয়েছেন প্রভা, খুসী হয়েছেন নিজের কৃতত্বে—। ঐ অমু? ওরই কি কম অসুখ গেছে? নিরু? নিরুর কি রোগ হয়নি? মাথার কোড়া পায়ে খোস। এক বছরে তিনবার হাম যা নাকি ডাক্তারিশাস্ত্রে কখনো হয় না। ছোটবেলায় এক রিকেটস হল যে বাঁচায় আর কিছু রইল না। কডলিভার অয়েল মালিশ করে করে প্রভার হাতের ছাল উঠে গিছলো। সেই মাথায় টাক কঙ্কালসার মেয়েকে যে

নতুন করে গড়লেন প্রভা। মোমের পুতুলের মত মেয়ে হল নিরু। আর অনু? সে এক অদ্ভুত ঘটনা—পাশের বাড়ীর কর্ত্তা মারা গেলেন। জানলায় বসে বসে সব দেখলেন প্রভা, তখনকার বধূ-জীবন। সব জায়গায় যাতায়াত ছিল না বেশী। দোষণীয় ছিল এসব। রাতে অদ্ভুত স্বপ্নে প্রভার ঘুম ভেঙ্গে গেল। যেন তিনি রাতে বাথরুম থেকে বেরুচ্ছেন। ওধারে শোবার ঘরে ঢুকে দেখেন, একখাটে অনু নিরু—তার সঙ্গে সদাশিববাবু ঘুমুচ্ছেন। অপর খাটেও সদাশিববাবু একা ঘুমুচ্ছেন—। স্তব্ধ হয়ে গেলেন প্রভা—। ভাবলেন দুজন ত নিশ্চয় প্রকৃত সদাশিববাবু নন? তাহলে আমার কী করা উচিত? সন্তানদের কাছেই যাওয়া উচিত। এই ভেবে যেই না অনু নিরুর খাটে উঠেছেন। অমনি অপর খাটের সদাশিববাবু লম্বা হতে লাগলেন। লম্বা হতে হতে খাট থেকে লুটিয়ে ঘর জুড়ে লম্বা হতে থাকলেন। হঠাৎ কচিহাতের ধাক্কা খেয়ে প্রভার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম ভেঙ্গে যেন বাঁচলেন তিনি। গোবিন্দ গোবিন্দ স্মরণ করার আগেই নিরু বলে, দেখো মা অনু কেমন করছে? সত্যিই ত অনু উপুড় হয়ে বেঁকে গেছে ধনুকের মত। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে তার। চোখ চেয়ে আছে কিন্তু শুধু সাদা অংশ দেখা যাচ্ছে কালো মণি নেই। বিপদের দিনে কখনও প্রভাকে কেউ বিচলিত হতে দেখেন নি।

মেয়েকে সদাশিববাবুর কোলে দিয়ে চাকর ভজকে ডাকতে গেলেন তিনি। গিয়ে দেখেন বুড়ী বাসনাঝি সিঁড়িতে বসে আছে। তখন প্রভার বধূ জীবন, ইষ্টারের ছুটীতে শ্বশুরশাশুড়ী পুরীতে গেছেন বেড়াতে। ওঁদের শোবার ঘরে মালা একা তারি ঘরে বাসনা শোয়।

বাসনাকে এই মাঝ রাতে সিঁড়িতে দেখে চমকে ওঠে প্রভা—নামে ঝি বললেও ঝি-শ্রেণীর দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ সে নয়। প্রভার সঙ্গে বাপের বাড়ী থেকে এসে এখানে বরাবরের মত থেকে গেছে বাসনা। একবারে গ্রাম্য মানুষ। অন্তরটি মমতা মধুতে ভরা। তার বাপের বাড়ী থেকে এলে কি হবে, প্রভাবেই ধমকাতো সে কাজের ত্রুটী হলে। বাড়ীতে যেসব আশ্রিত দুঃস্থ ছাত্র ছিল, তাদের স্নেহময়ী জননী ছিলো সে। কাউকে ভয় করা তার ধাত ছিল না। একবার সদাশিব বাবুর বাবা বাজার থেকে কিছু পোকাধরা শাক কিনে এনেছিলেন। বাসনা ঝঙ্কার দিয়ে তাঁকে বলেছিল "বলি পয়সা দিয়ে পোকার বাসা কিনে আনলে, চোখের মাথা কি খেয়েছ? ঠিক এমনি কথা বাড়ীতে প্রভাতো নয়ই, প্রভার শাশুড়ীও কখনো সদাশিব বাবুর বাবাকে বলতে সাহস কর্ত্ত না। তবে সুবিধে এই, তিনি জাত অধ্যাপক। কথাটা কানেও পৌঁছুল কি না জানা গেলো না! শুধু প্রভা বললো, ওকী বাসনা, অমন করে কি বাবার সঙ্গে কথা বলতে হয়। বাসনা বললো, না বলবে না, পয়সা কি গাছের ফল? যে নষ্ট হল তো হল কত কষ্টের রোজগারের পয়সা—। ধারাটা এমন যেন পয়সা রোজগারের কষ্টটা বৃদ্ধ অধ্যাপকের নয়, বাসনার। হয়ত নিচের চৌবাচ্চায় জল ধরতে ভুলে গেছে বাসনা—বকুনিটা খেল যদু মাষ্টার—মালাকে পড়ালেও আসলে ঐ মেধাবী ছাত্রটিকে উচ্চ শিক্ষা দেবার আশায় বাড়ীতে রেখেছিলেন সদাশিব বাবু।—বাসনা তাকে ধমকে বলতো, সকাল থেকে বই মুখে করে বসে আছ যে চৌবাচ্চার জলটা খুলেও কি গেরস্থর উপকার করতে নেই? তাইত বুড়ীমা বড্ড ভুল হয়ে গেছে বলে যদু মাষ্টার তাকে থামাত। ঐ যদু মাষ্টারের হাঁপানি হতে কী প্রাণপাত করে সেবাই বাসনা না করেছিল—। মালিশরে পাঁচনরে কিছুতেই বাসনার ক্লান্তি ছিল না। বুড়ী মা নামের প্রতিদান দিয়েছিল বাসনা। মা! মা! উ! কী সর্ব্বনেশে এই মা ডাক গো? যার জন্যে মানুষ পাগল হয়ে যায়।

যাক বাসনাকে দেখে প্রভা বলে, একি বাসনা, তুমি যে এখানে? বাসনা বলে কী স্বপন যে দেখনু বৌদি, যেন আমার মা মরে গেছে আর মাদুরে জড়িয়ে তার দেহটা আমার বিছানার পাশে কে ফেলে দিয়ে গেছে। মনটা যেন কেমন করে উঠলো, গাটা ছমছম করতে লাগলো। তাই এখানে এসে ভজটাকে ডেকে কথা বলছিনু।

তাকে থামিয়ে প্রভা বলে, বা! আর মালা তার ঘরে একা পড়ে রইলো? আমায় ডাকলে না কেন? বাসনা বলে, না গো বৌদি তা নয় দিদিমনিও দেখি বাতি জেলে পড়তেছে। বাসনা তখন আরো কি কথা বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে প্রভা ভজকে ডেকে বলে, যা দেখি শিগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে নিয়ে আয়। বলবি ছোট খুকী অজ্ঞান হয়ে গেছে। ভজকে পাঠিয়ে শোবার ঘরে ফেরে প্রভা—দেখে মেয়ে অজ্ঞান অচৈতন্য। তাকে বিছানায় শুইয়ে কী একটা ওষুধ তাকে খাওয়ানর চেষ্টা করছে। নিরু ছোট দুটি হাতে মাথায় অনবরত জল দিয়ে যাচ্ছে—। জ্ঞান আর হয় না, এদিকে এমন অদৃষ্ট ভজ ফিরে এসে বললো, ডাক্তারবাবু সিনেমায় গেছে। প্রভা বিপদের সময় বেশী কথা বলেন না চিরকাল। সদাশিববাবুর দিকে চেয়ে বলেন, তুমি যাও। রাত ১১টা তখন। সদাশিববাবু ডাক্তারবাবুর বাড়ী থেকে কোন্ সিনেমা জেনে তার দরজায় ভজকে বসিয়ে বাড়ী আসেন। পথ থেকে অন্য ডাক্তার নিয়ে। সারারাত ধরে সে কী ধস্তাধস্তি! পরে প্রভা শুনেছিল মালাও নাকি ঐ রাতে একটি মৃতের স্বপ্ন দেখে। আরো আশ্চর্য্য হয় সকালে পুরী থেকে টেলিগ্রাফ পেয়ে। শ্বশুর টেলিগ্রাফ করেছেন তোমরা কেমন আছ? সেখানে তিনি কি স্বপ্ন দেখেছিলেন, একথার সদুত্তর পাওয়া যায় নি সদাশিব বাবুর বাবার কাছ থেকে। তবে ভয়ঙ্কর কিছু যে দেখে ছিলেন একথা নির্ঘাৎ। নইলে চট্ করে টেলিগ্রাফ করার মানুষ তিনি নন। উঃ কম ভুগেছে অনুরাণী। সেই যে অসুখ হল না, যখন তখন অজ্ঞান হয়ে যেত অনু। অত প্রাণচঞ্চলা মেয়ে দিনে দিনে যেন কেমন জবুথবু হয়ে গেলো। সারা সংসার বিসর্জ্জন দিয়ে এমন কি সদাশিববাবুর তদারক ভুলে গিয়ে প্রভা অনুকে নিয়ে পড়লো। দেশ বিদেশের ডাক্তার বারব্রত উপোস তার সঙ্গে যতটা তদারক করা যায়। পাঁচ মিনিটের জন্য কোথাও অনুকে ছেড়ে তিনি যেতেন না। যখন বাধ্য হয়ে কোথাও যেতেন, সঙ্গে যেত ফ্লাস্কে করা বরফ, ফ্লাস্কে করা গরম জল। তার সঙ্গে আইস, হট-ওয়াটার ব্যাগ, কৌটভরা ওষুধ। বন্ধুরা কত ঠাট্টা করত, বলতো অনুর তো মাথার অসুখ হয়নি হয়েছে তোমার। প্রভা বলতো হয়ত তাই হয়েছে, এ পাকা ছিট ভাই সারার আশা নেই।

ডাঃ বিধান রায় তখন রুগী দেখেন না। তাঁকেই দেখানো হল। অনুকে আগেই বলেছি না কথাটা মানতে রাজী ছিলেন না প্রভা। একে ওকে দিয়ে শেষে বিধান রায়কেও দেখানো হল কিন্তু তিনি যা বললেন তা সাংঘাতিক কথা। বললেন এ অসুখ সারে না। শতকরা নিরানব্বইটা রুগী শেষে জড় হয়ে যায়। ওষুধ দিয়ে নয়, নিয়ম দিয়ে যদি সামলাতে পারা যায় তবেই সারান যাবে এ রুগীকে। প্রভা বললো, বলুন সেই একটির মধ্যেই পড়বে আমার মেয়ে—নিয়মের ত্রুটি হবে না। আবার জয় হল প্রভার অধ্যবসায়ের। সেই মেয়ে আবার ফিরে পেলেন তিনি, পুনর্জ্জন্ম হল অনুর। লেখায় পড়ায় গানে শিল্পকলায় অতুলনীয়া হয়ে উঠলো অনু। কিন্তু দীর্ঘ এক বছর বিনিদ্র রজনী যাপনের ফলে অনিদ্রাটা বেশ কায়েমী হয়ে বসলো প্রভার জীবনে। সারা জীবন এই চলছে—সারারাত ঘুরে ঘুরে প্রভা দেখেন কার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—কে যেন একটু শিউরে শিউরে উঠছে—এই করে ঘুরে ঘুরে বেড়ান রাত্তির বেলায়। অনু সেরে উঠলো বটে কিন্তু প্রভার চেহারা হল সেকালের টাইফয়েড রুগীর মত। সবাই দেখে চমকে ওঠে। বলে, ঈশ কি চেহারা হয়েছে তোমার। কিন্তু অনুর যেমনি গোলাপী রং তেমনি একতাল কালো কোঁকড়া চুল তেমনি বুদ্ধি উজ্জ্বল চেহারা। লেখায় পড়ায় কোথাও এতটুকু খুঁত ছিল না অনুর। কেউ দেখলে বলতে পারত না সেই হাবাগোবা এপিলেপটিক গোছের মেয়ে এ। যেখানে দাঁড়াতো যেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অপূর্ব দেবীত্বের মহিমায় জ্বলে উঠতো তার শান্ত সমাহিত মাতৃত্বের মমতা বিকশিত দীপ্ত প্রতিমা।

প্রভার নিজের বলে কখনো কিছু ছিল না। স্বামী আর সন্তানরাই তো তার জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ।

তারা ভালো থাকলে তিনি ভালো। তারা খারাপ থাকলে তাঁর জীবন মুহূর্তে মূল্যহীন। নিজের কাছে নিজেকে কী অপরাধীই যে লাগে। এইটেই প্রভার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—সব সময়ে মনে তার দুঃখের সীমা নেই। যার প্রতি যা করণীয় সে যেন তা করতে পারছে। শুধু স্বামী সন্তানই নয় তার যেখানে যা কিছু ভালো-বাসার ধন কারুকেই যেন সে প্রাণভরে দিতে পারছে না যা তাদের প্রাপ্য। নিজের দৈন্যে সে নিজেই আঘাত পায়।

সারা জীবন গীতা উপনিষদের শিক্ষার মধ্যে মানুষ হয়েও প্রভার এই ভুলটুকু গেলো না—যে মানুষ কিছুই করতে পারে না। তার মনে তর্কের ঝড় উঠে। তবে মানুষ না হয়ে পশু হলেই হত। মানুষ হয়ে লাভটা কি হল? বুদ্ধি বিবেচনা জ্ঞান এগুলো ভগবান দিলেন কি জন্য? যা ভাগ্যে আছে হবে একথা বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাটা তার মতে কাপুরুষতা। এমন কি সংসারের ঝামেলা এড়িয়ে পুজো করাটাও সে পলায়নী মনোবৃত্তি ভাবতো। এই মানুষের কর্তব্য বড় কম নয়। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে আপোষ করতে সে রাজী নয়। অমুর মনে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছে তার প্রতিটি রেখা প্রভার মনে গভীর রেখাপাত করত। মনে মনে ভাবতো, ঠাকুর তুমি আমায় এমন করে গড়লে কেন? যাতে আমি অমুকে এই দুঃখের সমুদ্র থেকে বাঁচাতে পারছি না। কেন গদায়ের মনের মত হতে পারছি না আমি। কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম ভাঙানো শক্ত। অনেক ছেলেমেয়ে আছে যারা চোখ বুজে কাঁদে, পাছে কেউ কিছু দেখিয়ে ভুলিয়ে দেয়। এযে গদায়ের সেই ব্যাপার। আবার ভাবেন প্রভা এই একই মানুষ তিনি। বড় জামাইও কিছু তাঁর কোলে মানুষ হয়নি। কই সেতো এমন বিকৃত দৃষ্টিতে তাঁর সবকিছু আচার আচরণ ধরে না। মনে পড়ে যায় এই প্রভাকে দেখেই বড় জামাই কবিতা লিখেছিল—

মা

অন্তর কার কুসুম কোমল
বয়ানে কাহার স্নিগ্ধ হাসি?
নয়নে কাহার দরশ মধুর
মাধবী-রাতের জোছনা রাশি?
পরাণে কাহার বহিছে নিত্য
গোপন স্নেহের ফল্গুধারা?
দিবসরজনী আপনার কাজে
আপনি রয়েছে আত্মহারা?
প্রতিদিন কার আহ্বান আসে
ক্ষুধায় খাদ্য চাওয়ার আগে?
সুশীতল বারি কাহার হস্তে
নেহারি সহসা তৃষ্ণা জাগে?
বিপদে কাহার আকুল হৃদয়
যাচে দেবতার প্রসাদটুক?
অমঙ্গলের বিষম ভাবনা শেল সম
বিঁধে কাহার বুক?
জীবনপথের বিঘ্ন বাধায়
পশ্চাতে ঠেলে কাহার হাত?
সংসার মরু ছায়াময় রয়
সে শুধু কাহার আশীর্বাদ?
সন্তান সুখ গৌরবে কার ভরে আছে
বুক সবার চেয়ে?
শুভদিনে কার হৃদয় কামনা
ঝরে পড়ে দুটি নয়ন বেয়ে?
স্বরগ হতেও প্রিয় আপনার
করিয়াছে কেবা ধরার মাটি
সে তুমি জননী দেবী স্বরূপিনী
চির স্নেহময়ী আমার মাটি।

প্রিয়জনের সঙ্গে লৌকিকতা কর্তে শেখেন নি প্রভা। রামবাবুর উদার প্রসন্ন হৃদয়ের শিক্ষায় মানুষ হয়ে সে জানতো মানুষ তো মানুষকে ভালো বাসবেই। ভালো বাসতেই শিখেছিল, ভয় করতে শেখেনি। কিন্তু গদাইয়ের

সংসারে ভালোবাসার অর্থ ভয় করা। সব সময় লুকো-ছাপি, সামনে একরকম, পেছনে একরকম ব্যবহার। প্রভা কেবল ভাবেন আমি আর কতটুকু ওদের সান্নিধ্যে থাকি? তাছাড়া সদাশিববাবুর মত প্রসারিত বক্ষে যার আশ্রয় তার নিঃশ্বাস নেবার অসুবিধে কোথায়? কিন্তু অনু? তার সেই সাধের মুক্ত বিহঙ্গীর পায়ে একি স্বর্ণ-শৃঙ্খল বেঁধে দিলেন তিনি? নিজের অপরাধের যেন কুলকিনারা পান না। এই বড় জামাই দীপককেই কি কম শাসন করেছিলেন তিনি? কই দীপক তো সরে যায় নি। প্রভার শাস্ত্রে

"শাসন করা তারেই সাজে
সোহাগ করে যেগো"

কাজেই তাঁর প্রিয়জনদের অদৃষ্টে শাসন প্রচুরই জুটতো। সোহাগ? সে কি আবার দেখিয়ে করতে হবে নাকি? এই যে দুপুরবেলা ঘুমুনো নিষেধ, স্বামী ঘুমুতে পান না বলে একি ভালোবেসেই নয়? এই যে কোন মিষ্টিজিনিষ এমন কি আম অবধি খাননা সদাশিববাবুর ডায়বেটিস বলে—একি ভালোবেসে নয়? তবে তাঁর চিরাচরিত ভঙ্গীতে বলেন, ভালো লাগেনা। কি যে মিষ্টি ভালোবাসে মানুষে বুঝতে পারিনা আমি। এই স্বভাব তাঁর চিরকালের।

একদিনের কথা মনে পড়ে যায় প্রভার। মুলো বেগুনের নিরিমিষ ঘণ্ট রেঁধেছিলেন প্রভা। দীপকের ভালো লেগে গেল ঘণ্টটা। প্রথমবার চাইবার পর দ্বিতীয়বার চাইতেই প্রভা শুকনো মুখে বললো আরতো নেই? দীপক বললো "দেখুন হেরে গেলেন। এ হলো আবার খাবো ঘণ্ট যখনই করবেন একটু বেশী করে করবেন।" পুরুষের খাওয়া সাঙ্গ হল। ওদের সঙ্গেই বেনু খেয়ে নিয়েছে। হাঁড়ি হেঁসেল তুলে প্রভা খেতে বসলেন। দীপক এসে একটা পিঁড়ি টেনে নিয়ে বসলো। নিরু শ্বশুড়বাড়ীতে বেহালায় একটা নেমন্তন্ন ছিল বলে দীপক নেমন্তন্ন সেরে শ্বশুরবাড়ীতে রাতে ছিল। পরদিন রবিবার। তাই সকালে আর যায় নি। দেড় বছরের বেণুকে কোলে করে আদর করতে করতে বলেছিল, আজ মা আমার ভাগে। মা আমি খেয়ে যাবো গোঁদল-পাড়ায়। দীপক জানতো সকালে না খেয়ে গেলে প্রভার মনে কষ্টর অন্ত থাকবে না। তাছাড়া তাদের বামুনের হাতের রান্নার প্রতি আকর্ষণও হয়ত একটু ছিল। মা বলছিলুম প্রভা খেতে বসেছিলেন। দীপক হঠাৎ তাঁর পাতের দিকে চেয়ে বললো, কই মা আপনার ঘণ্ট কই? প্রভা সবিস্ময়ে বলেন, ঘণ্ট থাকলে কি তোমায় দিতুম না? দীপক অবাক হয় বলে আমাদের বাড়ীতে কিন্তু অন্য নিয়ম। প্রথমেই সকলের জন্য আলাদা আলাদা তুলে রাখা হয়। তারপর বাড়তি যা থাকে তা সকলে আবার চাইলে দেওয়া হয়। প্রভা বলে গেরস্থবাড়ীতে তা হয় না।

দীপক মস্ত জমিদারের একমাত্র ছেলে। সে বাড়ীতে দীপকের আদর কম নয়। তবু পুত্রহীনা প্রভার জন্য তার মনে একটা মস্ত আসন পাতা ছিল। প্রভা যে তিনমেয়ের চেয়ে তাকে বেশী ভালোবাসেন ছেলে বলেই। একথা সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো জানতো, মা যা করে ভালোবেসেই করে, জামাই বলে খাতির করে নয়। নিজের উদার সরল অন্তঃকরণের দাক্ষিণ্যে মায়ের মনের আধখানা সে জুড়ে নিয়েছিল। এ খবর প্রভার মেয়েরা জানতো। বিশেষ করে অনু দাদা বলতে অজ্ঞান তার সম্ভ্রম সম্মানভরা কৌতুকময় ব্যবহারে দাদাও নিজের বোনের মতই ভালোবাসতো তাকে। অনু বেণু ডাকে দাদা বলে। মা যে দাদাকে তাদের চেয়ে বেশী ভালোবাসে এ বিষয়ে তাদের মনে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কিন্তু গদাই দৃঢ় নিশ্চয় যে এসব ছেঁদো কথায় আর দেখানি ব্যবহারে সে যেন না ভোলে। কাজেই একই প্রভা দুজায়গায় দুরকম ব্যবহার পায়।

প্রসন্নবাবু গিয়েছেন কাশীবাস করতে। আর ভবতারিণীর মৃত্যু ঘটার পর হঠাৎ একদিন গদাই অনুকে নিয়ে এসে হাজির। ঐ কাপুড়েবাবুর গিলে করা পাঞ্জাবীও নেই খোপদোস্ত কুঁচুনো ধুতিও নেই। একি হৃতসর্বস্ব চেহারা? হাউ হাউ করে কেঁদে গদাই বলে

মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে আমায়। পুরুষমানুষের কান্না বরদাস্ত করতে পারেন না প্রভা। আনন্দে চোখে তাঁর জল আসে আসে করুণায়। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদে শানিত তরবারির মত দীপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। ভয় জিনিষটা তাঁর অভিধানে নেই। অবাক হয়ে যান তিনি। বলেন, সে কি? কাঁদছ কেন?

প্রভার বাবার মানুষ করা ছেলে মুক্তিপদ এসেছে দেখা করতে। তার সামনে গদায়ের ক্লীবতায় আরো লজ্জিত হন প্রভা। বলেন, বোসো তোমরা আমি আসছি। বাড়ীর একতলায় ভাড়াটেদের বাড়ী থেকে ফোন করে সদাশিববাবুকে সব খবর দিয়ে প্রভা গৃহ-কর্মে নিযুক্ত হন। ফোন করে অবশ্য লাভ কিছু হয় না। সদাশিববাবু যথানিয়মে সন্ধ্যায় ফেরেন। রাত্রে প্রভাকে বলেন "বুঝছি সবই কিন্তু তোমার ত কিছু অজানা নেই প্রভা? ওদের যদি আশ্রয় দাও বেণুর বিয়ের আশা তোমায় ত্যাগ করতে হবে। সর্ব্বসাকুল্যে চারশোটাকা আয়, তার মধ্যে আগের দেনার জন্য কো-অপারেটিভের ধার আজো শোধ হয়নি, তা কেটে নেবে। পারবে ৩৫০ টাকার মধ্যে আটজনের সংসার চালাতে? বিপদের সময় প্রভা অত্যন্ত স্বল্পভাষী, বলেন পারতেই হবে। না পারলে বেণুর বিয়ে দোব না। তাতে একটা জীবনের সমস্যা। কিন্তু এযে পাঁচ পাঁচটা জীবন ভেসে যায়। নাতি নাতনি প্রভার প্রাণের অধিক। খোকনের চেয়ে বেণুর মূল্য তাঁর কাছে বেশী নয়। কিন্তু সদাশিববাবু কিছুতেই প্রভার সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। সাংসারিক বুদ্ধি প্রভার সত্যি সত্যিই নেই। সব সময় মনকে প্রাধান্য দেন তিনি। কিন্তু সংসারে সে মনের দাম কানাকড়িও নয়। সদাশিববাবু ভাবেন এই যে, পণের-হাজার টাকা খরচ করেছি অনুর ওপর, সে কি তার চিরকালের হিসেব করে দেবার জন্যে নয়। করবনা কেন? বিপদআপদ পড়লে নিশ্চয় করব। কিন্তু এভাবে চিরদিনের ভার গ্রহণ কি সোজা? তার বন্ধুবান্ধবরাও বারণ করেন এ দায়িত্ব নিতে। বারে-বারে সে কথা বোঝাতে যান প্রভাকে। প্রভার সে কথায় কান দোবার অবসর কোথায়! একবস্ত্রে যে জামাই এসেছে—তার সব কিছু পূর্ণ করবার ব্রতে সে কৃত-সংকল্প। সদাশিববাবু শান্ত মানুষ হলেও ভীরুতা ক্লীবতাকে ঘৃণা করেন। বলেন, এমন চোরের মত পালিয়ে এলো কেন গদাই? গাড়ীটা অন্ততঃ নিয়ে আসতে পারতো। গাড়ীতে তো ডাক্তার লেখা ওর-নামে গাড়ী। এসব কথা যখনই সদাশিববাবু বলতে যেতেন, প্রভা দেখতো বেদনায় বিবর্ণ হয়ে যেত অনুর মুখ। প্রভা কথার মাঝে বাধা দিতেন। বলতেন থামো দেখি, আগে প্রাণ কটা রক্ষা হোক, গাড়ী নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? না গাড়ী তোমার কাছে চেয়েছে গদাই। সদাশিববাবু বলতেন প্রাকটিসের জন্যেও যে গাড়ীর দরকার। গাড়ীর কথা যে বলছো, ন হাজার টাকার গহনা না দিলে গাড়ী কি দিতে পারতুম না?

অকারণ কথা বাড়াতে রাজী নন প্রভা, তাছাড়া সময়ই বা কই? যদিও অনু প্রাণপণ চেষ্টা করে মাকে সাহায্য করবার কিন্তু সংসারের কাজ বেড়েছে দশগুণ। প্রথমত ধরোনা কেন কাপড় কাচা? সকাল থেকে পাঁচবার পাঁচটা ধুতি ছাড়বে গদাই। সে কাপড় ছাড়ার এক বিচিত্র ভঙ্গী। সাপের মত এঁকে বেঁকে এক একটা কাপড় এখান থেকে ওখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। আসলে বাড়ীতে গামছার ব্যবহার ছিল প্রশস্ত। এখানে সেটাতে প্রভার বেজায় আপত্তি। কাজেই সকাল থেকে বারে বারে ধুতি জোগাতে হয় প্রভাকে। শেষে প্রভা সদাশিববাবুর বিয়ের জোড় বের করে নিলেন গদায়ের পুজোর জন্যে। কারণ আর যাইহোক রেশমের কাপড় ত? কথায় কথায় অশুদ্ধ হবার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু হাসপাতালে যাবার সুট? বাইরে বেরুনর পাঞ্জাবী? অত করাবার টাকা বা কোথায়? ভগবান সুযোগ দিলেন। গদায়ের বাবা কাশী থেকে চিঠি লিখলেন গদাইকে যেতে। গদাই রওনা হতেই, অনু বললো মা আমি একবার শ্বশুরবাড়ী যাই কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে আসি। প্রভা শিউরে উঠে বললেন, সেকি গদাই বলেছে "সেখানে যাবার কোন উপায় নেই

গেলে জ্যান্ত ফিরতে পারবনা আর" আর তুই বৌ মানুষ হয়ে সেখানে যাবি কি? অনু বললো "আমি জানিনা মা ও কেন যেতে পারবে না, আমি যাবোও এবং ঠিক সুস্থ শরীরে ফিরবোও। দেখো কিছু হবে না।" একা যেতে দেওয়া সম্ভব নয় অনুই ডেকে পাঠালো দীপককে। দীপককে নিয়ে অনু শ্বশুরবাড়ী থেকে গদায়ের পোষাক আর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিষপত্র নিয়ে এলো। একটা ট্যাকসীতে যা ধরে—কিন্তু তার পরও মনে হল আরো কিছু বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ আনা হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় দিন আবার রমেশ মামাকে সঙ্গে নিয়ে আবারো কিছু জিনিষ এলো। কোন বাধাই এলো না চন্দ্রমোহনবাবু বা সেখানের কারুর কাছ থেকে।

এদিকে বিনা মেঘে বজ্রপাত। কাশী থেকে অনুর নামে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির "পাঁচুরমা জানলায় এসে রাত্রে দাঁড়িয়েছিল ওর এটিচিউট ভালো নয়" পাঁচুরমা সত্তর বছরের এক বুড়ী। কাশীবাস করছে। প্রসন্নবাবুকে রেঁধে দেয়। সে জানলায় দাঁড়ানোয় কেন যে গদাই বিপন্ন হবে প্রভা ভেবে পায় না। তাছাড়া অনুই বা কলকাতা থেকে কি করবে? এই বিশ্রি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বিপদ। গদাই কলকাতায় ফিরতে জানা গেলো যে ছাতে জানলার ধারে এসে পাঁচুরমা দাঁড়ানয় তার ভয় হয়েছিল পাছে হাত বাড়িয়ে তার গলা টেপে।

সদাশিববাবু জিগ্যেস করলেন হাত কি বাড়িয়েছিল? গদাই বলে, না। সদাশিববাবু বলেন, তোমরা বিছানাটা টেনে সরিয়ে নিলে না কেন? গদাই বলে বিছানা তো দূরেই ছিলো। সদাশিববাবু বলেন, তবে ভয়ের কি আছে। গদাই বলে, যা বোঝেন না তা জিগ্যেস কর্বেন না। সকালে দরজা খুলতে হবেনা?

পরবর্তী কালেও দেখা গিছলো বাড়ীতে চোর এলে গদাই অনুকে এগিয়ে দিতো—নিজে না গিয়ে। সে যাক যা বলছিলুম, বিপদ হল তার অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। দিবারাত্রি বিপদতারিণীর ছেলেরা আসবে কিন্তু তাঁদের সঙ্গে এমন ব্যবহার হবে যেন দুদিনের জন্য প্রভার কাছে অনু গদাই বেড়াতে এসেছে। না হয় যোড়শোপাচারে তাদের খাওয়ানো হল কিন্তু খোকন তো ইস্কুলে যাচ্ছে। গদাই তো হাসপাতালে যাচ্ছে। এগুলো কিছুই নয় মিথ্যা অভিনয়। এ অভিনয় করা সহজ নয়। প্রতিদিন গদায়ের খাবার রান্না করে একটা কুকারে সাজিয়ে দিতে হবে। সেটা গদায়ের চেম্বারের (যদিও ভাড়া সদাশিব বাবুই দেন) একবার স্টোভে চড়িয়ে গদাইবাবু স্বপাকে ভোজন সারবেন। এ নিয়ে চাকরবাকর মহলেও হাসাহাসি চলতো? তার ঝঞ্ঝাটে বিব্রত হয়ে প্রভা বলতেন, একি অকারণ ঝকমারি বলতো? কার কাছে এ লৌকিকতা? ঐ চেম্বারের হরিদাস চাকরটা ছাড়া কেবা দেখে এই খাওয়া। অনু কাতর সুরে বলতো, কি করবে মা অবুঝ মানুষ এতেই যদি শান্ত হয় মেনে নিতে হবে।

তারপর বিপদ আরো ঘনিয়ে এলো প্রসন্নবাবুর কাশী বাসের খরচা বন্ধ করলেন চন্দ্রমোহনবাবু। তাঁর সন্দেহ গদাই নাকি বাপকে হাত করে তাঁর নগদ টাকাকড়ি সরাচ্ছে। গদাই ভড়পাতে লাগলো কেস করব আমি, বাছাধনদের ধরে আচ্ছা করে ধোলাই দিয়ে ঠাণ্ডা করিয়ে দোব। কথাটা শুনে প্রভা বললেন, বাবা গেছেন সত্যি কিন্তু বাবার বন্ধুরা আছেন প্রতুল গুপ্তকে একবার সব বলে দেখবো, দেখা যাক না তিনি কি বলেন? তখন গদায়ের পৌরুষত্ব জেগে উঠলো বললো, কবে তিনি মারা গেছেন এখন তাঁর বন্ধুর কাছে আমি যাব মেয়েমানুষের আঁচল ধরে? সে হবেনা আমার দ্বারা।

মহাবিপদে পড়লেন প্রভা। এ অবুঝকে বুঝবেন কি করে? এদিকে কেস আরম্ভ করলেন চন্দ্রমোহনবাবুই, আর উকীল করলেন প্রতুল গুপ্তকে। নিরুপায় প্রভা সব জানালেন বনবিহারীবাবুকে। তিনিও প্রভার বাবার বন্ধু—এবং বেশী ঘনিষ্ঠ। তিনি বললেন. দেখো, প্রভা আমি সারা জীবন হাকিমী করে এসেছি। যতই বলো না কেন, মনে হচ্ছে গদাইও নির্দ্দোষ নয়। কিন্তু প্রভা সব ঘটনা জানবেন কেমন করে? সবই ঢাকঢাক গুড়গুড় ব্যাপার। সদাশিববাবুর ছাত্র বিনা পয়সায় কেস করছেন বটে। কিন্তু গদাই কখনও সদাশিববাবুকে সঙ্গে নেবে না। কারণ উনি নাকি আবোলতাবোল

বকেন। কেস খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু যতই গদাই অবুঝ হোক না কেন, যত অসম্মানই করুক না কেন—অনু আর শিশু তিনটির কথা ভেবে প্রভা চুপ করে থাকতে পারেন না। আবার বনবিহারীবাবুকে বলেন, আপনি যা বলছেন হয়ত তাই ঠিকই হবে কিন্তু অনুর কথা ভেবে চুপ করে থাকার উপায় কই? তখন বনবিহারীবাবু বললেন, প্রতুল তো এলাহাবাদে গেছে বেড়াতে, সেখানে তোমার পরিচয় দিয়ে চিঠি লেখো সে গাঙ্গুলি ভার্সেস গাঙ্গুলির যে কেস আপনি হাতে নিয়েছেন তার বিপক্ষ হচ্ছি আমি অর্থাৎ আমার মেয়ে ও তিনটি শিশু।

রামবাবুর বন্ধুভাগ্য অদ্ভুত। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এলো নিশ্চিন্ত থেকো, তুমি রামের মেয়ে কাজেই আমারও মেয়ে, আমি গিয়ে যা করবার করব। তার পরেও কম বিপদ গেলো না প্রভার। মেয়েমানুষের সঙ্গে গদাই কিছুতে যাবে না প্রতুলবাবুর কাছে। অথচ বনবিহারীবাবু বলেন কেন, তোমার জামাই বুঝছে না প্রভা। বন্ধুর কথার চেয়ে মৃত বন্ধুর মেয়ের কথা অনেক মূল্যবান প্রতুলের কাছে।

দুরদৃষ্ট গদায়ের সেই প্রভার সঙ্গেই গিয়ে দাঁড়াতে হল তার প্রতুলবাবুর কাছে। প্রতুলবাবু শুধু ও পক্ষের কেস ছেড়েই দিলেন না, এ পক্ষের যাবতীয় নির্দেশ তিনিই দিয়ে রক্ষা করলেন গদাইকে। সে এক নব-মহাভারত পর্ব।

কিন্তু প্রাণান্ত হল সদাশিববাবুর। যত আস্ফালনই গদাই করুক না যে ধার করছি আমি নিচ্ছি না ত? আর যত গলা জাহিরই প্রভা করুক না, সাড়ে তিনশো টাকায়ই আমি চালাবো; তা চললো। মাসে মাসে কাশীতেই পাঠাতে হতে লাগলো দুশো করে টাকা।— আবার টিউশানি নিলেন সদাশিব বাবু। কিন্তু তাতেই বিপদ কাটলো না। প্রসন্নবাবু মাসের গোড়ায় টাকা পাঠানোর পরই টেলিগ্রাম এলো "সেও মানি" গদাই বললো, বাবার বোধহয় পুজোপার্ব্বন আছে। অনুর মুখ তো কাঁদো কাঁদো। পরে জানা গেলো সারামাসের ২০০ টাকা তিনি একজন কন্যাদায়গ্রস্তকে দান করে আবার টাকা পাঠানোর হুকুম করেছেন। কিন্তু যে চাক্‌রেদের ওঁরা চাকর ছাড়া কিছু বলেন না—তাকেই আবার ছুটোছুটি করে প্রসন্নবাবুর কাশীবাসের পাথেয় যোগাড় করতে হয়। শুধু কাশীবাসের টাকাই নয়, টাকা নিয়ে রওনা হল গদাই নিজে। তার যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া আছে আবার শুধু হাতে তো যাওয়া যাবে না মালয়ে মেওয়ারে সন্দেশরে—নানা খরচের ব্যবস্থা প্রশস্ত —তাছাড়া এ তো হেজিপেজি মানুষ নন, খাস মদনমোহন তলার প্রসন্ন গাঙ্গুলি। সহজে প্রসন্ন হবার মানুষ নন। এবার আরো চমকপ্রদ ঘটনা ঘটলো, কাশী থেকে অনুর নামে টেলিগ্রাম করলো গদাই, প্রসন্নবাবু একটা উইল করবেন সদাশিববাবু আর নিরুপমার গুরুদেব রতনকাকা যেন ছদ্মবেশে কাশী যায়।

সব হেঁয়ালি সব ধোঁকার ব্যাপার। প্রভা ভাবেন, ভবতারিণীর বুদ্ধিতে সর্ব্বস্ব ত মোদোমাতাল ছেলেদের দিয়েছেন প্রসন্নবাবু, অতপর বিরাট ব্যবসা। আজ যদি সামান্য ঐ গলির মধ্যের বাড়ীটুকুও গদাইকে দিতে চান তার মধ্যে এত জালজালিয়তি কেন? কিন্তু গদায়ের ব্যাপারই আলাদা—। তাই সদাশিববাবুকে গগলস চোখে দিয়ে মাড়োয়ারীর মত কাছি কোট আর শালের টুপি মাথায় দিয়ে আর অসংসারি ব্রহ্মচারী রতনদাকে মিলিটারী খাকি পোষাক পরে রওনা হতে হল কাশী। কিন্তু কাশী গেলেই ত হল না? দুজন চোরকে লুকিয়ে থাকতে হল বড় মেয়ে নিরুপমার জায়ের বোনের বাড়ী। বড় মেয়ে নিরুপমার বাড়ীতে নানা প্রশ্ন সদাশিববাবুর সরল দেবচরিত্রে কলুষতায় কালিমাখা। যেন কি অন্যায় কাজ করছেন। প্রভার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে সে সর্ব্বস্ব বিকিয়ে অত খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে আজ আবার একি পাপের প্রায়শ্চিত্ত। গদাই মুখে তেল মেখে তেল চুকচুকে মুখে ঘুরে বেড়ায় যেন এইসব চক্রান্তের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। এই চক্রান্তের মূল চক্রী হল সদাশিববাবু। লজ্জায় ক্ষোভে প্রভার কান্না পায়।

ক্রমশঃ

নিবেদিতার অবদান

শ্রীননী দাস

১। কি সাধারণ কি অসাধারণ প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন এক একটি দিন আসে যাহার স্মৃতি সে কখনই ভুলিতে পারে না। যদিও সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ইহার বিশেষ গুরুত্ব থাকে না কিন্তু অসাধারণ মানুষের বেলায় এই সমস্ত ঘটনার মূল্য অতুলনীয়।

২। স্বামী বিবেকানন্দের সহিত লণ্ডনে মার্গারেট নোবেলের প্রথম সাক্ষাৎ তাঁহার জীবনের সর্বপেক্ষা স্মরণীয় দিন। এই দিনটির স্মৃতি তিনি জীবনে কখনই ভুলিতে পারেন নাই।

৩। এই পর্য্যন্ত ছোট বড় অনেক ঘটনাই দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার অধিকাংশই আজ ভুলিয়া গিয়াছি। আর যাহা এখনও ভুলি নাই তাঁহার বিশেষ গুরুত্ব অনুভব করি না। কিন্তু নিবেদিতা স্কুলে গিয়া যেভাবে আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাঁহার স্মৃতি কখনই ভুলিতে পারিব না। অপরের নিকট ইহার গুরুত্ব হয়তো বিশেষ নাই, কিন্তু আমার নিকট ইহার মূল্য অপরিসীম।

৪। সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে ভারতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মহান হিন্দুধর্মের প্রচার শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের পর বিদেশ হইতে আনীত যে অমূল্য উপহার তিনি দেশবাসীর নিকট নিবেদিত করিয়াছিলেন সেই লোকমাতা নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত স্কুল আজ সমগ্র দেশবাসীর একটি বিরাট গর্বের বস্তু। বোস পাড়া লেনের ক্ষুদ্র গৃহে যে স্কুল ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আজ তাহা এক বিশাল রূপ ধারণ করিয়া একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

৫। কিছুদিন পূর্বে ঠিক ৫টায় স্কুল প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া অফিস ঘরে বসিয়া থাকি। পূর্ব হইতেই শ্রদ্ধাপ্রাণাকে আমি জানিতাম। তাই স্কুল দেখিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম। মাতৃসম এই মহিলাকে দূর ও কাছ হইতে কয়েকবার দেখিয়াছি কিন্তু আজকের মতন এত নিকট হইতে কখনই দেখি নাই। যে দুইটি কারণে আমার নিকট এই দিনটি স্মরণীয় তাহা হইল ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত এই এই স্কুলটি দেখার সৌভাগ্য এবং অপরটি শ্রদ্ধাপ্রাণার সহিত ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার। শ্রদ্ধাপ্রাণার নিমন্ত্রণেই আমি স্কুল দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি দেশের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি কিংবা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নই। কোন একটি মিশনের সাধারণ কর্মী মাত্র। তাঁহার কাছ হইতে ভাল আচরণ পাইব ইহা অবশ্য জানিতাম। কিন্তু সেদিন যে ব্যবহার তিনি আমার ন্যায় একজন সাধারণ ব্যক্তির সহিত করিয়াছেন তাহা কখনই ভুলিব না। এইরূপ মধুর আচরণ ইহার পূর্বে কাহারও নিকট পাইয়াছি মনে পড়ে না; এবং ভবিষ্যতে পাইবো এইরূপ প্রত্যাশাও বড় রাখি না। যে মর্যাদার সহিত তিনি স্কুলভবনটি আমাকে দেখাইয়াছেন তাহা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নহে। একমাত্র স্মৃতিই তাঁহার মর্যাদা বহন করিবে।

৬। বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহাপুরুষদের নাম শুনিলেই ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মন পরিপূর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অনেকের পক্ষেই ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না। এই শ্রদ্ধা

মনের এত গভীরতম স্থান হইতে উত্থিত হইয়া থাকে যাহার খোঁজ কেহই রাখেন না। শ্রদ্ধাপ্রাণাকে দেখিলেই আমার মন এইরূপ পবিত্র শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়। অথচ এই শ্রদ্ধার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভাষায় ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

৭। কিছু সময় অফিসঘরে কথা বলার পর তিনি আমাকে স্কুলের ভিতর দেখাইতে লইয়া যান। প্রথমেই প্রবেশ-পথে লোকমাতা নিবেদিতার প্রতিকৃতির সম্মুখে উপস্থিত হই। বিরাট আকারের এই ছবিটি ভাল করিয়া দেখিতে হইলে মাথা উঁচু রাখিতে হয়। আমিও সেইভাবে দেখিতেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ অন্য আর একটি ঘটনায় আমার মন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। মনে পড়ে বিপ্লবী অরবিন্দ, কবি রবীন্দ্রনাথ, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও মহামতি গোখেলের নাম। এক সময় তাঁহারা সকলেই নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, অরবিন্দের ন্যায় চরমপন্থী বিপ্লবী-নেতা তখন সারা ভারতে আর কেহ ছিলেন না। যাঁহার নামে বৃটিশ সরকার আতংকিত হইয়া পড়িত। অথচ তিনি যখন নিবেদিতার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন তখন ইস্পাত-সম কঠিন এই অরবিন্দ অন্য আর এক মানুষে পরিণত হইতেন। ভাবিলে সত্যই অবাক হইতে হয়। মহামতি গোখেলে প্রথম জীবনে খুবই বাঙালী-বিদ্বেষী ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন ভারতের আপোষপন্থী নেতাদের একজন। অরবিন্দের নেতৃত্বে বাঙালীর আপোষহীন বিপ্লবী-নীতিকে তিনি পছন্দ করিতেন না। অথচ অরবিন্দের সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের মানুষ গোখেল যখম নিবেদিতার সংস্পর্শে আসেন তখন শ্রদ্ধায় তিনি বিমূঢ় হইয়া পড়েন। এই শ্রদ্ধা শুধু সাময়িক ছিল না। নিবেদিতার প্রতি অন্তরের এই গভীর শ্রদ্ধা জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে অটুট ছিল। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তাকে সারা ভারতের পণ্ডিতসমাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু প্রথমে বাঙালীর প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন গোখেলে নিবেদিতার সংস্পর্শে আসার অল্প পরে যে প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলে তাহার তুলনা নাই। ইহার পিছনে বাঙালী জাতি অবদান কতখানি ছিল জানি না, কিন্তু নিবেদিতা গভীর বাঙালী প্রীতির যে পরিচয় ইহাতে পাওয়া যা তাহা তুলনাহীন। ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় মাথা আপন হইতেই কখন নিবেদিতার পায়ের নিকট আনত হইয় পড়িয়াছে জানিতে পারি নাই। ভক্তি ভরে প্রণা জানালাম এই মহিয়সী নারীকে। এই সময় শ্রদ্ধাপ্রাণ আমাকে বলিলেন "নিবেদিতার মুখ দেখেছ? কি সুন্দর!" কি অপরিসীম শ্রদ্ধাই না এই কয়েকটি কথা প্রকাশিত হইল।

৮। স্কুলের বিভিন্ন দেয়ালে অশোকচক্র দেখাইয়া বলিলেন যে, নিবেদিতা যখন অজন্তা, ইলোরাসহ অন্যান্য স্থান দেখিতে যান তখন তিনি এই চক্র সংগ্রহ করিয়া আনেন। নিবেদিতাই প্রথম অশোকচক্রকে জাতীয় মর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

৯। কথাপ্রসঙ্গে স্কুলের ছাত্রীদের কথা আসিয়া পড়ে। দেশের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থা যখন গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে তখন এই স্কুলটি কিন্তু তাহার নিজ আদর্শে অবিচল রহিয়াছে। ইহা সম্ভব হইয়াছে ছাত্রীদের সহিত স্কুল পরিচালক-বর্গের গভীর হৃদয়স্পর্শের জন্য, প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা স্বয়ং হইলেন সেই স্নেহধারার উৎস।

১০। ছাত্রদের সুখ দুঃখের কথা আজকাল কজন ভাবেন তাহা অবশ্য সঠিক বলা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রদ্ধা-প্রাণা তাঁহার স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলার সময় যে গভীর স্নেহের পরিচয় পাইয়াছি তাহা কখনই ভুলিব না। দেশে এইরূপ ছাত্র-দরদী শিক্ষকের অভাবই আজ ছাত্র-উশৃংখলতার অন্যতম কারণ। আজকাল ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক যখন এক চরম তিক্ততায় পৌছিয়াছে ঠিক সেই সময় শ্রদ্ধাপ্রাণা তাঁহার স্কুলের ছাত্রীদের কিরূপ স্নেহের সহিত দেখেন তাহার একটি ছোট ঘটনা

বলিতেছি—এই ঘটনাটি তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠা শ্রীমতী অতরা দাশগুপ্তার নিকট হইতে শুনিয়াছি। তিনিও এক সময় এই স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। অনেক সময় ছাত্রীদের অভিভাবকরা শ্রদ্ধাপ্রাণার নিকট মেয়েদের আরও একটু বেশী শাসন করিবার জন্ম বলিতেন। কারণ মা বাবা হইয়া তাঁহারা ইহা করিতে চাহেন নাই। তাহার উত্তরে শ্রদ্ধাপ্রাণা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই "মা বাবা হইয়া আপনারা শুধু আদর দেবেন, আর পুলিশের কাজটি আমাকে দিয়া করাইতে চান—আমিও তো আপনাদের মতন ওদের একটু আদর করিতে পারি।" দেশের দুর্ভাগ্য এইরূপ আদর্শময়ী শিক্ষয়িত্রী আজ আর নাই বলিলেই চলে।

১১। নিবেদিতার ব্যবহৃত যে সমস্ত মুল্যবান জিনিষ স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া রাখিয়াছেন তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল একটি টেবিল। এই টেবিলেই তিনি প্রায় সমস্ত লেখাপড়ার কাজ করিতেন। কর্ত্তৃপক্ষ এইটিকে "নিবেদিতা টেবিল" নামকরণ করিয়াছেন। নীচের মন্দিরঘরটিও খুব সুন্দর। রামকৃষ্ণ, সারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দ সহ অনেকের মুল্যবান ছবিদ্বারা ঘরটি পরিপূর্ণ। এইখানেই ছাত্রীরা প্রার্থনা করে। এই নিয়ম আজকাল অন্য কোথাও বিশেষ পালন করা হয় না। স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা আটশত, তার মধ্যে চারশত ছাত্রী বিনা খরচায় শিক্ষালাভ করে। এই স্কুলে যে সমস্ত বিষয়ে ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার মধ্যে আছে অবৈতনিক প্রাথমিকবিভাগ, মাধ্যমিকবিভাগ' সারদা মন্দির ও শিল্পবিভাগ।

১২। স্কুল পরিচালনার অর্থ কিভাবে সংগ্রহ হয় জানিতে চাহিলে শ্রদ্ধাপ্রাণা বলিলেন যে, নিবেদিতার আদেশ অনুযায়ী স্বাধীনতার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দেশের জনসাধারণের দেয়া অর্থ হইতেই চালান হইত। কারণ, নিবেদিতা বিদেশী সরকারের দেওয়া সাহায্যে স্কুলচালনা পছন্দ করিতেন না। এবং কখনই ইহা গ্রহণ করেন নাই। অবশ্য স্বাধীনতার পর হইতে জাতীয় সরকার নিয়মিত সাহায্য করিতেছেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার-ক্ষেত্রে নিবেদিতার পর যাঁহাদের নাম বিশেষ স্মরণীয় তাঁহারা হইলেন—বেলুড় মঠের প্রথম সম্পাদক স্বামী-সারদানন্দ, ভগিনী ক্রিষ্টিন ও ভগিনী সুধীরা।

১৩। ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীব-সেবার আদর্শ গ্রহণ করিয়া যাঁহারা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, শ্রদ্ধাপ্রাণা তাঁহাদের একজন। স্বামীজী এক সময় বলিয়াছিলেন "Man making is my misson" শ্রদ্ধাপ্রাণা এই উক্তির যাথার্থ উপলব্ধি করিয়া চরম সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

আজ এইরূপ আদর্শময়ী নারীর সংখ্যা খুবই অল্প। তাঁহার সহিত আমার নানা বিষয়ে অনেক কথা হইয়াছে। ইহাতে যে শুধু তাঁহার পাণ্ডিত্যই প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নহে, সব চাইতে যে জিনিষটি আমার নজরে আসিয়াছে তাহা হইল শ্রদ্ধাপ্রাণার ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোন অসার দাম্ভিকতা নাই, আছে সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা। এই ব্যক্তিত্বই তাঁহার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা আনিয়া দিয়াছে।

১৪। দেশে নারী শিক্ষার জন্য অনেক মহাপুরুষ নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু নিবেদিতার ন্যায় চরম সাফল্যলাভ কেহই করিতে পারেন নাই। বিদেশী একজন মহিলা কি ভাবে যে এই সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহার সঠিক ইতিহাস দেশের অধিকাংশ লোকের কাছে আজ পর্য্যন্তও অজ্ঞাত রহিয়াছে। অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন যাপন করিয়া নিজের জীবনকে তুচ্ছ-করিয়া দেশের নারী-সমাজকে উন্নতির সুউচ্চ সোপানে তিনিই প্রথম তুলিয়া ধরেন। আজ সমগ্র ভারতে নারী-প্রগতির মুলে যাঁহার অবদান সর্ব্বাগ্রে তিনি নিবেদিতা। তাঁহার ন্যায় গভীর আত্মবিশ্বাস আজ আর চোখে পড়ে না। যে নারীজাতির মুক্তির জন্য তিনি প্রাণ দিলেন সেই ভারতীয় নারী-সম্প্রদায় আজ তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছে। ইহা যেমন দুঃখের, তেমন লজ্জার ব্যাপার।

১৫। এই প্রতিষ্ঠানের আর যে জিনিষটি আমার চোখে পড়িয়াছে তাহা হইল পরিচ্ছন্নতা। দেশের বিভিন্ন প্রদেশে বহু বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। কিন্তু এইরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠান বড় দেখি নাই। যাঁহারা জানেন না বাহির হইতে তাঁহাদের নিকট স্কুলভবনটিকে একটি মন্দির বলিয়া মনে হইবে। ছোট্ট জায়গার উপর চারদিক ঘিরিয়া স্কুলভবনটি তৈয়ারি করা হইয়াছে। ভিতরে ছোট একটুখানি জায়গা আছে যেখানে ছাত্রীরা খেলাধূলা করে। বাড়ী তৈয়ারির মধ্যে বর্তমানের ন্যায় কোন বাহুল্যতা নাই, আছে মন্দিরের পবিত্রতা।

১৬। কথার ফাঁকে শ্রদ্ধাপ্রাণাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম এই সন্ন্যাস-জীবন তাঁহার কেমন লাগে। তিনি উত্তর দিলেন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—তাও উপমার সাহায্যে—"টকের ভয়েতে পালিয়ে গিয়ে তেঁতুলতলায় আশ্রয় নেয়া" এই কথাটির মধ্যে হয়তো অনেকেই বেদনার সুর অনুভব করিবেন। কিন্তু আমার নিকট তাহা কখনই মনে হয় নাই। এতো বড় ত্যাগও মানুষ কত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। শ্রদ্ধাপ্রাণা তাহা প্রমাণ দিলেন কিছুমাত্র না বলিয়া। নিবেদিতার আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য অনেকেই অনেক কথাই বলিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কিছুমাত্র বাহ্যিক আড়ম্বর না দেখাইয়া যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন তাহার তুলনা উপমায় সম্ভব নহে। এইখানেই শ্রদ্ধা-প্রাণার ত্যাগের বৈশিষ্ট্য। আসার সময় তিনি বলিলেন, আবার পরে দেখা হবে; আর বলিলেন, ঈশ্বর অথবা জনসেবায় তোমার মন যেমন চায় তেমন থাকিবে।

সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাগবতদাস বরাট

গত ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৬। বাংলার অদ্বিতীয় রোমান্টিক কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীর নাট্য-মঞ্চের অভিনয় শেষ করলেন। নীলরতন সরকার হাসপাতালের উডবার্ণ ওয়ার্ডে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন রাত্রির শেষ অধ্যায়। পুতুলনাচের ইতিকথায় উদ্‌ঘাটন মুহূর্ত্তটাই যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠল। তাঁর এই হাসপাতালে লোকান্তর মহাকবি মধুসূদনের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দুঃখ দুর্দ্দশার চরম ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁর জীবনতরী মাঝ নদীতে ডুবে গেল। একটি উজ্জ্বল মানিক বাংলার সাহিত্য-জগতের রত্নাগার হতে রাত্রি শেষে হারিয়ে গেল। এই হারাণো মানিকের হারাণোর ব্যথা বাংলার সাহিত্যরসিকগণের পক্ষে অতীব বেদনাদায়ক।

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত দুমকা জেলায় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় সেটেলমেণ্ট বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারী। মাতা ৺নীরদাসুন্দরী দেবী। হেথাহোথা ঘুরাঘুরি করেই মানিকবাবুর শৈশব কাটে। তার কারণ, পিতার চাকরি আজ এখানে তো কাল সেখানে। মানিকবাবুও ওঁর বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন। বাল্যকালেই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার বহুগ্রাম ও সহরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছে। নানারকম মানুষের সংস্পর্শে এসে তিনি তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এইসব চাক্ষুষ দেখা মানুষের রূপ ও চরিত্র তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে আপনার স্বীয় মাধুর্য্যে বাস্তবের নিখুঁত রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে। এইজন্যই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি এতটা বাস্তবধর্ম্মী ও সত্যাশ্রয়ী।

শৈশবে মানিকবাবু খুব দুর্দ্দান্ত ছিলেন। বাড়ীর লোকজন তাঁর দুরন্তপনায় তটস্থ থাকতেন। নিষেধের শৃঙ্খলকে তিনি মানতেন না। শৈশব থেকেই তিনি তাঁর জীবনটাকে ভালবাসতে পেরেছিলেন।

আলোচনার প্রারম্ভেই সকলকেই জানাচ্ছি যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কোন-দিন তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। দূর থেকে তাঁকে দেখেছি। ওঁর লেখা হতেই ওঁর পরিচয় পেয়েছি। অপরের লিখিত জীবনী হতে ওঁর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছি। আমার এই অনুশীলনী ও অনুধাবনের প্রচেষ্টাই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু।

হয়ত আমার এই আলোচনায় অনেকের মনের খোরাক মিটবে না। ক্ষুণ্ণ হবেন অনেকে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত অসহায় বোধ করবেন কেউ কেউ। তবু বলব এই আলোচনারও প্রয়োজন আছে। গোষ্পদে প্রতিবিম্বিত আকাশের রূপ এবং সেই রূপের চিত্রাঙ্কন কতখানি যে নিখুঁত হল তার হিসাবনিকাশও কম লাভ নয়।

স্বর্গতঃ কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ করে তাঁর জীবন-বেদ তুলে ধরায় অধিকার শুধু আমার কেন প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগী সুধিবৃন্দেরই আছে। তাঁর সম্বন্ধে যাঁর যতটুকু জানা আছে, তা যেমনভাবেই অর্জ্জিত হোক পরিবেশনের প্রয়োজন। তাঁর পদাঙ্কনুসরণে যদি কেউ উপকৃত হন বা কারো সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে তা হলেই আলোচনার সার্থকতা। সে উদ্দেশ্যে এই স্মৃতিতর্পণ। স্মৃতির রোমন্থন নয়। পথ চলতে চলতে

কুড়িয়ে পাওয়া ইট পাটকেল দিয়ে খানা ডোবা ভরাট প্রচেষ্টা নয়, সেতুবাঁধার ব্যবস্থা।

১৯২৬ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়া কলেজে পড়তেন। এখানের কলেজ হতে তিনি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজ ভর্ত্তি হন। এবং গণিতে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি পড়তে সুরু করেন। সুতরাং বাঁকুড়ার জল-বাতাস ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া তাঁর কল্পনাবিলাসী মনকে পরিপুষ্ট করে থাকেন এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির উপাদানও তিনি মল্লভূম বাঁকুড়ার জঙ্গলমহল থেকে সংগ্রহ করে থাকবেন। একথা অস্বীকার করা চলে না। আজ একথা স্মরণ করে বাঁকুড়াবাসী মাত্রেরই গর্ব্বানুভব হওয়া উচিত। বাঁকুড়া কলেজের অধুনা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকবৃন্দ এবং প্রবীণ অধ্যাপক, যাঁরা এখনও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের কাছ থেকেই তিনি জ্ঞানার্জ্জন করেছেন। তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা তাঁদের কাছে নিবেদিত হয়েছে। আবার কারো কাছে তিনি প্রিয় ছাত্ররূপে স্নেহ-ছায়াও পেয়েছেন। তাঁরা হয়ত তাঁর সেদিনের সেই মুখ স্মরণ করতে পারবেন না আজ।

সেদিন এই কথাই হচ্ছিল। বাঁকুড়া কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন জীবিত ছিলেন। সে আজ বেশ কয়েক বছর আগের কথা। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ বাঁকুড়ায় ছড়িয়ে পড়তে বাঁকুড়ার প্রধান ডাক্তার ও সাহিত্যিক কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক শশাঙ্কবাবুকে জানালেন, আপনার ছাত্র লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন।

সাহিত্যিক মাণিকবাবুর নাম শশাঙ্কবাবুর জানা ছিল। তবে তিনি যে তাঁর ছাত্র ছিলেন সে কথা তিনি জানতেন না। তাই তিনি কালীবাবুর দিকে বিস্ময়-নেত্রে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার 'ছাত্র—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার ছাত্র? কালীবাবু উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ তাই তো শুনছি। মাণিকবাবু যে সময়ে বাঁকুড়া কলেজে পড়তেন, তখন তো আপনি প্রফেসার। শশাঙ্কবাবু জানালেন, তা হবে। কত যে হাজার হাজার ছাত্র পড়িয়েছি তার তো হিসাব নেই। আর সবার নাম-ধাম আর চেহারাও মনে নেই।

কালীবাবু একটু হাসলেন, জানালেন—তা নয়। সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন তো মাণিক নামে পরিচিত ছিলেন না। তাঁর নাম ছিল প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

হ্যাঁ প্রবোধ নামে মাণিকবাবু তাঁর ছাত্র-জীবনে পরিচিত ছিলেন। স্কুল ও কলেজের খাতায় ওঁর ছাত্র-তালিকায় নাম ছিল প্রবোধ। সেই প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে নবজীবন লাভ করে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। আর আমৃত্যু তিনি স্বীয় রচনায় বাণীর অর্চ্চনা করে গেলেন। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টাতেই তিনি পাঠকমনে বিশিষ্ট আসন দখল করতে সক্ষম হলেন। বাণীর বরপুত্র তিনি। স্বভাবসিদ্ধ ও সহজাত সাহিত্যিক। সাহিত্য-জগতে স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। এমনি পথে যেতে যেতে গাছ থেকে তুলে নেওয়া ফুল-ফলের মত তিনি সাহিত্যিক মর্য্যাদা হাতের নাগালে পেয়ে গেলেন। তাঁর মনীষা সর্ব্বসাধারণের কাছে আজও স্বীকৃত। স্বীয় প্রতিভায় সমুজ্জ্বল তিনি।

মাণিকবাবুর সাধ ছিল লেখক হবার। কিন্তু ছেলে-বেলা হতে তিনি লেখালেখির চর্চ্চা মোটেই করেন নি। এবং লেখবার চেষ্টাও করেন নি। এমন কি স্কুল-ম্যাগাজিনেও না। জীবনকে বুঝবার প্রতীক্ষা করে-ছিলেন। বাজারে চালু পত্র-পত্রিকায় যেসব ন্যাকামি ও ভাব-প্রবণতার কাহিনী প্রকাশ পেত তা মাণিক বাবুকে মুগ্ধ করতে পারত না। তাঁর মতে এগুলো জীবনের গল্প নয়। রচনায় বিশিষ্টতা নেই। বলিষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টির জন্তে সাধনার প্রয়োজন।

ত্রিশ বৎসর বয়সের আগে তিনি কলম ধরবেন না, এই ছিল তাঁর প্রতিজ্ঞা। তবে অন্তরে লেখার প্রস্তুতি চলবে। সাহিত্য-চর্চ্চার বাস্তব দিকগুলো তিনি ইতি-মধ্যে ঠিক করে ফেলবেন।

সাহিত্যিক হতে হলে চাই একটা চাকরি। যাতে মাসে মাসে টাকা আসে। আর চাই নিরুদ্বিগ্ন অবকাশ।

চাকরির ভূমিকা তৈরী করতে তিনি মেদিনীপুরের ইস্কুল হতে ম্যাট্রিক পাশ করে বাঁকুড়া কলেজে আই-এস-সি ক্লাসে ভর্ত্তি হলেন। কিন্তু মন যা ভাবে ঘটে তার উল্টো। আই-এস-সি পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এস-সি পড়তে পড়তে তাঁর মনে সাহিত্যের জোয়ার উঠল। ভেসে গেল কলেজে পড়া। সাহিত্য তাঁকে সাদরে আলিঙ্গন করে নিল।

একদিন কলেজের ল্যাবোরেটারীতে মাণিকবাবু বিজ্ঞান অনুশীলনে রত। সেই সময় তাঁর কাছেই কয়েকজন বন্ধু মিলে আড্ডা জমিয়েছেন। সাহিত্যের আলোচনা। কল্লোল, শনিচক্র থেকে গড়াতে গড়াতে আলোচনাটা থমকে দাঁড়াল সম্পাদকদের বুদ্ধিহীনতায়। একজন জানাল,—পত্র-পত্রিকায় যেসব লেখকের লেখা পত্রস্থ হয় তাঁরা হয় সম্পাদকদের দলের লোক আর না হয় আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয়। আর একজন জানাল, নাম-করা লেখক না হলে সম্পাদকরা লেখা যত ভাল হোক না কেন, তা প্রকাশ করে না। একজনের তিনটা লেখা কোন এক মাসিক কাগজের সম্পাদকের কাছ হতে ফেরৎ এসেছিল। সে তো রাগে অভিমানে সম্পাদককে ভূয়সী নিন্দায় ভূষিত করল। বলল, সম্পাদকরা ঘুষ-খোর। বিজ্ঞানের অনুশীলনের মধ্যে মাণিকবাবু এই সবই ছিঁটেফোঁটা কথা শুনছিলেন। কোন উত্তর করেন নি। এইবার মুখ খুললেন,—কেন বাজে বকছ। সম্পাদকরা কি এতই বোকা যে ভাল লেখা হাতে পেলে ছাপবে না। ভাল তো দূরে থাক্, চলনসই একটা কোন লেখা পেলে সাগ্রহে তা ছেপে থাকেন।

মাণিকবাবুর কথা শুনে তারা তখন পত্রিকা সম্পাদককে ছেড়ে দিয়ে তাঁকেই আক্রমণ করল। একজন বলল,—আপনি কি করে জানলেন? মাণিকবাবু উত্তর দিলেন, আমি সব জানি। উৎকৃষ্ট লেখা সৃষ্টি করতে সাধনার প্রয়োজন। এবং তা প্রকাশের জন্যে কারো সুপারিশের দরকার হয় না।

এই কথায় ওরা সকলে একসঙ্গে ভেঙ্গে উঠে। পরিহাসছলে মানিকবাবুকে জানায়,—বেশ তো আপনি একটা কোন গল্প লিখে পত্রিকায় তা প্রকাশ করে সম্পাদকের ন্যায়বিচারের প্রমাণ দিন।

মাণিকবাবু শান্তকণ্ঠে জানাম,—আমার প্রতিজ্ঞা আছে ত্রিশ বছর বয়সের আগে আমি কিছু লিখব না।

বন্ধুরা এবার আগুনে ঘি ঢালার মত জ্বলে উঠে। নানা কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। পরে তর্কের মীমাংসা হল বাজি রেখে। বাজি হল এই যে মানিক বাবুকে একটি গল্প লিখে তিন মাসের মধ্যে ভারতবর্ষ, প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে তাঁর কথার সত্যতা প্রমাণ করতে হবে।

মাণিকবাবু জানতেন যে এই বাজিতে তাঁর জয় অনিবার্য্য। তিনি যদিও ইতিপূর্ব্বে লেখাদির চর্চ্চা করেন নি, তবু তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি যা লিখবেন তা সম্পাদকমাত্রই প্রকাশ করবেন। তবে তিনি নিজের প্রচলিত নামে লিখবেন না। কারণ, তাঁর অসময়ের অপরিপক্ক লেখার দোষ ত্রুটির ছোঁয়াচ তাঁর নামের সঙ্গে যেন না এঁটে থাকে। পরে যখন তিনি ভাল লিখবেন তখন তাঁর কলেজের নাম প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নামে তা প্রকাশ করবেন। বন্ধুদের বললেন কলেজের নামে না লিখে বাড়ীর ডাক নামে তিনি গল্প লিখবেন।

বাজি ধরে মহা চিন্তায় পড়লেন মাণিকবাবু। কি নিয়ে গল্প লেখা যায়? বাজারে পত্র-পত্রিকায় চালু এক ঘেঁয়ে ছ্যাবলামি গল্প লিখতে তাঁর ইচ্ছা হল না।

মনে পড়ল পূর্ব্ব বাংলার এক দম্পতির কথা। বাস্তব-জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওঁদের দেখেই তিনি পেয়েছিলেন। দম্পতিটির সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা জন্মে-ছিল। সেই দম্পতিকে কেন্দ্র করে তিনি একটি ট্রাজি গল্প লিখলেম। গল্পের নাম হল—অতসী মাসী।

বাংলা মাসের মাঝামাঝি। বিচিত্রা পত্রিকা অপিসে গল্পটি নিয়ে তিনি হাজির হলেন। তখন সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বিচিত্রার সম্পাদক এবং সহঃ সম্পাদক ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত। পত্রিকা-অপিসে উপেন্দ্রবাবু ছিলেন না, ছিলেন অচিন্ত্যবাবু। মাণিকবাবু তাঁর হাতে গল্পটি তুলে দিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তারপর অনেকদিন কেটে গেল।

আর একদিনের কথা। বাড়ীতে পড়ার ঘরে বসে মাণিকবাবু চিন্তা করছেন কলেজ যাবেন কি না, ঠিক সেই সময় বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রবাবু তাঁর খোঁজে সেখানে হাজির হলেন। লেখার সঙ্গে দেওয়া ঠিকানাটা মিলিয়ে বাড়ীটা চিনে নিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন,—এখানে কি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নামে কেউ থাকেন? মাণিকবাবু উত্তর দিলেন,—বলুন আমারই নাম মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। উপেন্দ্রবাবু তখন নিজের পরিচয় দিয়ে জানালেন—আপনার বিচিত্রায় প্রকাশার্থ লেখা অতসী মাসী গল্পের পারিশ্রমিক হিসাবে এই কয়টা টাকা রাখুন।

কথার শেষে তিনি মাণিকবাবুর হাতে পাঁচটি টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললেন,—আর একটি গল্প চাই কিন্তু। এই সামান্য কয়টি দাবির কথা মাণিকবাবুর মনে সুপ্ত সাহিত্যিক মনোভাব মাথা চাড়া দিয়ে জেগে উঠল। নুতন জোয়ারে তিনি ভেসে গেলেন। বড় চাকুরে দাদা ক্রুদ্ধ হলেন। পরিবার পরিজন ও আত্মীয়বৃন্দ চিন্তিত হলেন। কিন্তু জেদী মাণিকবাবুকে নিবৃত্ত করা গেল না। সাহিত্যের প্রতি তাঁর সুগভীর প্রেম, সেই প্রেমের জোয়ারে আত্মীয়পরিজনের ইচ্ছা আকাঙ্খা ও সমাজ-সংসার ইত্যাদি সবই ভেসে গেল। স্বার্থবুদ্ধি ও বিষয়-বুদ্ধি লোপ পেল। সাহিত্যকে জীবনের সর্ব্বস্ব হিসাবে গ্রহণ করে পরিবার ও পরিজন থেকে পরিত্যক্ত হলেন তিনি। দরিদ্রতা হল নিত্য সহচর।

কিছুকাল পরে তিনি লিখলেন 'দিবারাত্রির কাব্য'—বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিকের শীর্ষবিন্দু। তাঁর রচিত পদ্মানদীর মাঝি ও পুতুলনাচের ইতিকথা বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম দুটি উপন্যাস। পদ্মা-নদীর মাঝি ইংরেজী, চেক ও চীনাভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাই অনেকে এই বইটিকে মাণিকবাবুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্ত্তি বলে মনে করেন।

মাণিকবাবু কিছুকাল বঙ্গশ্রী পত্রিকায় সহঃসম্পাদক হিসাবে চাকরি করেন। বেতন ছিল মাসিক আড়াইশ' টাকা। কিন্তু সে চাকরিটাকে তিনি বেশীদিন টিকিয়ে রাখতে পারলেন না। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ন্যাশেনাল ওয়ার ফ্রণ্টে (National War front) চাকরি গ্রহণ করেন সেই অস্থায়ী পাবলিসিটি-অফিসারের (Publicity officer) চাকরিও তাঁর ভাগ্যে বেশী দিন রইল না। এরপর তিনি লেখাকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে অনিশ্চিত আয়ের উপর জীবনটাকে সঁপে দিলেন।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মাণিকবাবু বিয়ে করেন। ময়মনসিংহের হেডমাষ্টার ৺সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা কমলার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। মমতাময়ী বিধবা স্ত্রী, দু'ছেলে, দু'মেয়ে রেখে তিনি গত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে পরপারে যাত্রা করেন। বাংলা সাহিত্যাকাশের একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সেদিন খসে গেল। পরিণত বয়সে তাঁর লোকান্তর ঘটলে অবশ্য বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তাঁর অসময়ে এই মৃত্যুর ডাক সত্যই মর্ম্মন্তুদ।

মাণিকবাবু ছিলেন রোমান্টিক। তাঁর মত রোমান্টিক কথাশিল্পী বাংলাসাহিত্যজগতে দুর্লভ। ছেলেবেলা থেকেই জীবনটাকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। ভাবপ্রবণ ছিলেন না, ছিলেন স্পর্শকাতর। যুক্তিবাদী। বিজ্ঞানের ছাত্র বলেই তাঁর দৃষ্টি ও মন বিজ্ঞানধর্ম্মী হয়ে পড়েছিল। ফলে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি বাস্তবমুখী ও সত্যাশ্রয়ী হতে পেরেছে। এতে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধই হয়েছে।

প্রথম জীবনে ফ্রয়েডী তত্ত্ব তাঁকে আলো দেখিয়েছিল, উত্তরকালে মার্ক্সীয় দর্শননীতি তাঁকে পথ দেখিয়েছে। শৈশব থেকেই জীবনকে ভালবাসতে পেরে-

ছিলেন বলেই সাহিত্য-জীবনের অতল ও অসীম দুঃখ কষ্ট ও অভাব অনটনের বোঝাকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে একটুও কষ্ট হয় নি। বরং দুঃখকে বরণ করে সাহিত্য-সাধনায় অবতীর্ণ হলেন। দুঃখময় জীবন-যাপনের মাধ্যমে তিনি সাহিত্যপথের অভিযাত্রীদের বুঝাতে চেয়েছেন এজীবন সুখময় নয়। দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় শয়ন করার অভিলাষ যেন কেউ এপথের যাত্রী না হয়।

যে দেশের অধিকাংশ নাগরিক জীবন দুঃখকষ্ট ও অভাবের মধ্যে কাটে, দেশের সাহিত্যসৃষ্টি করতে হলে লেখককেও দুঃখকষ্ট বরণ করতে হবে। নেমে আসতে হবে সাধারণের মাঝে। নতুবা সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হবে না।

তিনি ছিলেন সত্যিকারের সাধক। নিজের আদর্শকে সামনে তুলে ধরে সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টায় তিনি আজীবন বাণীর অর্চনা করে গেছেন। জাগতিক দুঃখ কষ্টকে মোটেই গ্রাহ্য করেন নি।

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর পরিক্রমায় বৎসরের পর বৎসর কেটে যাবে। যুগের পর যুগ গত হবে। কত নূতন ও নবীন সাহিত্যিকের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটবে। আজ যাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ কাল হয়ত তাঁরা এ জগতে থাকবেন না। কিন্তু তা বলে কি তাঁর সৃষ্টি লোপ পাবে? কালের গতিতে কি মানুষ ভুলে যাবে গতায়ুদের সাধনলব্ধ দানের কথা?

যুগ যুগ ধরে মাণিকবাবু তাঁর সাহিত্যের মধ্যে জীবিত থাকুন। তাঁর অনুসরণে একদল যাত্রী এগিয়ে যাক্। তাঁর পদানুসরণে মুষড়ে পড়া মন নব উদ্যমে জেগে উঠুক। তবেই সার্থক হবে তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনা।

সার্থক স্মরণ

শান্তশীল দাশ

নানা আড়ম্বর ক'রে পূজা ক'রে মহৎ জীবন,
স্মৃতির উদ্দেশ্যে দিয়ে মালা আর পুষ্পের স্তবক ;
সার্থক হয় না পূজা—যদি না সে মহা জীবনের
আদর্শ গ্রহণ করে চলি তাঁর নির্দেশিত পথে।
জীবন মহৎ হ'ল যে-বন্ধুর পথ ধরে চলে,
যে-দুঃখদহন সয়ে ; কণ্টক দু'পায়ে মাড়িয়ে
জীবন সার্থক হল ; সে-দুঃখজয়ের মন্ত্র নিয়ে
এগিয়ে চলতে হবে ; সে-চলাই সার্থক স্মরণ।
শুধু পূজা আড়ম্বরে, আর নানা বাক্যের বিন্যাস ;
জীবন গ্রহণে নেই এতটুকু কোন অঙ্গীকার ;
সেই পূজা অর্থহীন, বিলাসিতা সে বাণীবৈভব,
জীবনের স্পর্শ নিয়ে না জাগালে মহৎ জীবন।
চারিধারে শুধু দেখি স্মৃতি নিয়ে আড়ম্বর ঘটা,
বহু অর্থ ব্যয় করে মন্দিরেতে স্মৃতি সংরক্ষণ ;
এ এক বিলাস যেন, অলসের মহার্ঘ বিলাস,
অর্থহীন মনে হয়। স্মরণ সার্থক গ্রহণেতে।
মহৎ জীবনাদর্শ নিতে হবে দুঃখের দহনে,
ত্যাগের গৈরিকবাসে, আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে
জীবন জ্বালাতে হবে ; আর সেই প্রদীপ্ত জীবনে
অনেক জীবন জ্বলবে তার শুভ্র দীপ্ত শিখা নিয়ে।

"প্রবাসী"

জ্যোতির্ময়ী দেবী

তুমি তো তেমনি আছ।
আমরাও দেখছি তো হয়নি বদল।
অথচ কত ধন তোমার তো চারদিকে রয়েছে ছড়িয়ে
লুটে নিতে ভরিয়া আঁচল।
চারদিকে ঘোরে ফেরে ঘোর ফিকে শাদা কালো দল।
এবং প্রাসাদে প্রাসাদে বসে আছে ভোগাসক্ত বৃদ্ধ যযাতি
রাজারা
সাজিয়া জনকরাজা এবং শ্রীরাম।
শোষণ করিয়া দেশ ভ্রমিছে বিদেশ, সারায় শরীর।
মুখে বেদান্তের বাণী পঞ্চশীল এবং 'আরাম হারাম'।
আর ছোট রাম-সাজা দল প্রাণপণে শোনাবেই রাম-
ধুনগান।
অর্থ যার "রাম নাম সত্য হায় সত্য রাম নাম"...
কারণ দেশ হচ্ছে তো শ্মশান।

বৃথা গেছে বিশটা বছর।
জানিনা কি জীবন নশ্বর।
একভাবে বসে আছ কপালে আঁকিয়া কবেকার
সাতটা অক্ষর
"সত্য শিব এবং সুন্দর।"
সঙ্গে তার "নায়মাত্মা" ইত্যাদি।
যার দাম কানাকড়ি নয়।
জান নাই অর্থগুলো সব হয়েছে বদল।
'সত্যের' ঘোমটা তলে, মিথ্যা বসে দলে দলে।
"শিব" মানে দল।
এবং "নায়মাত্মা ধনহীনেন লভ্যঃ"—
আর সোনাই "সুন্দর"।
স্বাধীনতা যুগে তার মানে তাই হল।

আশ্বিন' ৭৫

(প্রবাসীর শেষ পাতা পনে

মশার গান

শ্রীসুধীর গুপ্ত

নিস্তরঙ্গ বদ্ধজলা এখন মুখর
মশার মধুর গানে। দলে দলে তা'রা
ঝোপেঝাড়ে চারিধারে জাগাইয়া সাড়া
বাতাসে ভাসায় সুখে স্বরের লহর।
অন্ধকার ধীরে ধীরে হ'লে গাঢ়তর,
তা'দের যাবে না দেখা ; শুধু শব্দ-ধারা
সুখ-সুপ্ত শর্ব্বরীর প্রাণের কিনারা
স্পর্শে ক'রে ক'রে যাবে সমৃদ্ধ সুন্দর।
সমীর-নির্ভর শব্দ ভেসে ভেসে যায় ;
কিছু তা'র হেথা হোথা ছলকিয়া পড়ে,—
নক্ষত্র-চুম্বিত জলে, বন-গুল্ম গায়,
পুষ্পগুচ্ছ-সমাকীর্ণ পল্লবের স্তরে।
দংশক মশক-শব্দে ঝিঁঝিরা ঝিমায় ;
বদ্ধজলা পোষে মশা তাই কি আদরে !

অনেক বন্যার পর

করুণাময় বসু

অনেক বন্যার পরে
জল সরে গেছে, নরম মাটির পথ শিশুদের যেন কচি ঠোঁট,—
নতুন জীবন-তৃষ্ণা : কোন ক্ষেতে ক্ষীণ শীর্ণ সবুজ অক্ষরে
লেখা হয় ফসলের, জীবনের নব ধারাপাত ;
মায়া-বনে মৌচাকে হঠাৎ
বুঝি কিছু স্মৃতির গুঞ্জন :
আবার আশ্চর্য স্বপ্ন, আবার চঞ্চল শিহরণ,
আবার ধানের গোলা, ফাগুনের পুষ্পিত পল্লব,
মৃত্যুকে পরাস্ত করি জীবনের অজস্র উৎসব !
বাঁধভাঙা ঢেউভাঙা বিপুল শব্দের কলরব
কি যেন যাদুর মন্ত্রে স্তব্ধ হয়, ফুলের পাপড়ি হয়,
আবার বাঁচার স্বপ্নে রক্তে দোলা, তরঙ্গ-হৃদয়
ফিরে পায় লুপ্ত আশা, সুপ্তভাষা, মুছে ফেলে সব পরাভব।
মৃত্যুর শিয়রে বসি ধ্যান করে,
হেসে ওঠে একগুচ্ছ কুসুমের স্তবকের স্তব।

খুঁজে ফেরে

রেবা ভবানী

রোজ ভাবি ওকে দেখবো ;
ও কে ? নিস্তব্ধরাতের
স্তব্ধতাকে উচ্চকিত করে
প্রতি রাতে প্রহরে প্রহরে
যে ফেরে পথে পথে
লাঠি ঠুকে ঠুকে—
এক-দুই-তিন-চার
এক-দুই-তিন ;
এক-দুই-তিন-চার
এক-দুই-তিন।
বিচিত্র ওর অন্বেষণের ধারা—
রাত গাঢ় হলে, যখন
সবাই পড়ে ঘুমিয়ে
ও একলা নামে পথে।
জল-ঝড়-ঠাণ্ডা কিছুতেই
ওর ভ্রূক্ষেপ নেই
ও ভয় পায় না কিছুতে।
রাতের অন্ধকারে ও হয়ত
খুঁজে ফেরে ওর হারান সত্তাকে
যা একদিন হারিয়ে গেছে
অনেক কাল আগে
এমনি নির্জ্জন আর নিস্তব্ধ
কোন একটা পথের বাঁকে।

কবি তানসেন

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতকার তানসেনের নাম ভারতবর্ষে সকলেই জানে। কিন্তু তানসেন কেবল যে একজন যুগাবতার সঙ্গীত-রচয়িতা ও গায়ক ছিলেন তাহা নহে,—তিনি এক-জন উচ্চ শ্রেণীর কবিও ছিলেন, ইহা তাঁহার রচিত ধ্রুপদ গানের বাণী বা কথা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বিভিন্ন রাগে তিনি যে সব গান রচিয়া গিয়াছেন, সেগুলি তাঁহার অতুলনীয় কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক।

ভারতের কালোয়াতী অর্থাৎ কলাবন্তগণের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীত-রীতিই এদেশের প্রাচীন (অর্থাৎ মুখ্যতঃ মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের) সঙ্গীত-রীতির ধারা রক্ষা করিয়া বিদ্যমান। এই কলাবন্ত-সঙ্গীতই ভারতের classical অর্থাৎ প্রাচীন কাল হইতেই উচ্চকোটির বলিয়া গৃহীত সঙ্গীত। ভারতের কলাবন্ত-সঙ্গীত দুইটী বিভাগে বা রূপে মিলে—হিন্দুস্থানী বা উত্তর ভারতীয়, এবং কর্ণাটী বা দক্ষিণ ভারতীয়। বিগত কয় শতকের ইতিহাসে, উত্তর ভারতীয় চালের সঙ্গীতে তানসেন, এবং দক্ষিণ ভারতীয় চালের সঙ্গীতে শ্রীরামের ভক্ত তেলেগুজাতীয় গায়ক ত্যাগরায় (ইঁহার মৃত্যু খ্রীষ্টাব্দ ১৮৪৭-এ হয়)—এই দুই জনের নাম সর্ব্বপ্রধান। একজাতীয় হইলেও, হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটী সঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য আছে। সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে কর্ণাটী সঙ্গীতই শুদ্ধতর, ইহাতে বাহির হইতে মুসলমানদের আনীত তুর্কী ও ইরাণী উপাদান প্রবেশ করে নাই; কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পারস্য তুরস্ক ইরাক ও আরব হইতে আহৃত উপাদান কিছু কিছু মিলিয়া ইহার প্রাচীন বা হিন্দু বিশুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। উত্তর ভারতের ধ্রুপদ সঙ্গীতে যে বাইরের জিনিস ততটা আসিতে পারে নাই, ইহাও একরকম সর্ব্ববাদিসম্মত। প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের রূপটী ধ্রুপদেই অনেকটা অব্যাহত আছে। তানপুরা পাখোয়াজ ও বীণাযোগে গীত ধ্রুপদে আমরা সহস্র কি তদধিক বৎসর পূর্ব্বেকার কালের হিন্দুসঙ্গীতের একটু আভাস পাই। খেয়াল, টপ্পা ও ঠুম্‌রী, এগুলি পরবর্ত্তী কালে মুসলমান বাদশাহদের দরবারে ধ্রুপদের আধারের উপরেই সৃষ্ট—ভারতের নানা স্থানীয় প্রাদেশিক তথা ভারত-বহির্ভূত নানা বিদেশী জিনিষ এগুলিতে আসিয়া গিয়াছে। শুদ্ধ ধ্রুপদের ঋজু, সবল ও বিরাট মহিমার তুলনা ভারতীয় সঙ্গীতে নাই,—অন্য দেশের সঙ্গীতেও এরূপ বস্তু বিরল।

আমরা আজকাল যে ধ্রুপদ শুনি, তাহার মূল হিন্দুযুগে গিয়া পঁহুছাইলেও, মুখ্যতঃ ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতকের বস্তু। ভারতে ভাষায় ও শিল্পে যে ধরণের বিকাশ বা ক্রম-বিবর্ত্তন পাই, সে ধরণের বিকাশ ভারতীয় সঙ্গীতেও অপেক্ষিত বলিয়া মনে করিলে অন্যায় করা হয় না। সংস্কৃত, তাহার বিকারে প্রাকৃত, এবং প্রাকৃতের বিকারে হিন্দী বাঙ্গলা প্রভৃতি আধুনিক আর্য্য ভাষা। মৌর্য্যযুগের ও শুঙ্গযুগের শিল্পে ভারতীয় হিন্দু-শিল্পের পত্তন; কুষাণ ও অন্ধ্র যুগের শিল্পের মধ্য দিয়া গুপ্ত যুগের ও তৎপরবর্ত্তী দুই চারি শত বৎসরের চরম উন্নতির অবস্থায় তাহার বিকাশ; তদনন্তর পরবর্ত্তী যুগের জটিলতর ধারায় হিন্দু-শিল্পের আংশিক অবনয়ন। সঙ্গীত-সম্বন্ধেও এরূপ ক্রম বা ধারা আমরা অনুমান করিতে পারি; কিন্তু এই ধারার শেষ অবস্থা, যাহা অধুনা-প্রচলিত ধ্রুপদে পাই, তদপেক্ষা প্রাচীনতর অন্য অবস্থার কোনও নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই। ধ্রুপদকে নিম্ন-মধ্য-যুগের হিন্দু শিল্পের সহিত

তুলিত করা যায় ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বরূপ উর্ধ্ব-মধ্যযুগ, বা গুপ্ত বা কুষাণ যুগের শিল্পের সঙ্গে যাহার তুলনা করা যায়, তাহা আমরা পাইতেছি না।

যাহা হউক, গোপাল নায়ক, আমীর খুসরৌ, হরিদাস স্বামী, বৈজু বাওরা, তানসেন, সদারঙ্গ, শোরী মিয়াঁ প্রভৃতির নিকট আমরা চির-কৃতজ্ঞ, কারণ প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীতের সংরক্ষণে ও ইহার নবীন বিকাশে ইঁহারা অনেক কিছু করিয়া গিয়াছেন। নূতন অনেক জিনিষও ইঁহারা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। খেয়াল আমীর খুসরৌয়ের সৃষ্টি বলিয়া পরিচিত ; তানসেন স্বয়ং কতকগুলি প্রাচীন রাগের নূতন রূপ দিয়াছেন, যেমন মল্লার রাগের নূতন রূপ তাঁহার নাম অনুসারে 'মিয়াঁ-কী-মল্লার' নামে পরিচিত, এবং 'দরবারী কানড়া' নামে নবীন রাগও তাঁহার সৃষ্ট। কিন্তু মুখ্যতঃ ইঁহারা সংরক্ষকই ছিলেন—প্রাচীন সঙ্গীতের প্রতি ইঁহাদের অনুরাগ এবং প্রাচীন ধারাকে অবিকৃত রাখিবার প্রয়াস ইঁহাদের মধ্যে না থাকিলে আমাদের হিন্দু যুগের বা মধ্য-যুগের সঙ্গীত যতটুকু রক্ষিত হইয়াছে ততটুকুও হইত না।

প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে ধ্রুপদ সঙ্গীত নিছক প্রাচীনের সংরক্ষণ বা অন্ধ অনুকরণ-মাত্র ছিল না। তাহা হইলে ধ্রুপদ এতদিন এ ভাবে টিঁকিয়া থাকিতে পারিত না। এখনও বহু বহু ব্যক্তি ধ্রুপদে যথেষ্ট আনন্দ পান, এবং ইঁহারা সকলেই পেশাদার ওস্তাদ বা শিক্ষিত কলাবন্ত নহেন—'গোলা লোক'ও ইঁহাদের মধ্যে আছেন। সাধারণের নিকট 'কলাবন্ত-সঙ্গীত' আজকাল ততটা প্রিয় নহে—কিন্তু ইহার আলোচনা ও উপযুক্ত সমাদর শিক্ষিত সমাজে এখন বাড়িতেছে বলিয়াই মনে হয়। ধ্রুপদ সঙ্গীতে এখনও যে নূতন সৃষ্টি হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহার উদাহরণ-স্বরূপ, কিছুকাল পূর্ব্বে সঙ্গীতরত্নাকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহাত্মা গান্ধীর বিগত উপবাস উপলক্ষে যে 'রাগ গান্ধী' নাম দিয়া অতি মনোহর নূতন একটী রাগ বা সুর সৃষ্টি করেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে (এই 'রাগ গান্ধী' ও তদানুষঙ্গিক ব্রজভাষা-'হিন্দী'তে রচিত বাণী গত বৎসরের অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসী'তে স্বরলিপি সমেত প্রকাশিত হইয়াছে—হিন্দী 'বিশাল ভারত' পত্রিকায়ও ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের সংখ্যায় বাহির হইয়াছে)। এইরূপ নূতন রচনা-দ্বারা আর কিছু না হউক, ধ্রুপদ সঙ্গীত যে একেবারে মরে নাই তাহা প্রমাণিত হয়। মৃত বা অপ্রচলিত সঙ্গীত-পদ্ধতি বলিয়া ধ্রুপদের আদর বা চর্চ্চা বন্ধ করা, মৃত-ভাষা বলিয়া সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত বা গ্রীক লাটিন প্রভৃতির অনাদর করা বা এগুলির চর্চ্চা বন্ধ বা অনুচিত ভাবে সীমাবদ্ধ করারই মত হইবে।

আকবর, তানসেন ও হরিদাস স্বামী

সৌভাগ্যক্রমে সম্রাট আকবরের সহিত তানসেনের সম্মিলন ঘটিয়াছিল বলিয়া তানসেনের জীবনী বা জীবনের দুই চারিটী ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কিছু সংবাদ পাই। আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের চিত্রশিল্পে তানসেনের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছিল। জাহাঙ্গীরের সময়ে অঙ্কিত দুই চারিখানি মোগল-চিত্রে তানসেনের ছবি পাওয়া যায়। এইরূপ একখানি চিত্রে তানসেনের মূর্ত্তির পাশে

ফারসী অক্ষরে তাঁহার নামও লেখা আছে। তানসেন একটু খর্ব্বকায় কালো চেহারার মানুষ ছিলেন, মুখে অল্প একটু গোঁফ ছিল। একখানি ছবিতে উপবিষ্ট জাহাঙ্গীরের চিত্রে জাহাঙ্গীরের দরবারে গায়ক ও বাদকের দলে তানসেনের ছবি পাওয়া যায়। আরও একখানি চিত্র আছে—এটী আকবরের ও তানসেনের জীবনের একটী

দরবারের গায়ক ও বাদক-মণ্ডলী মধ্যে তানসেন (মধ্যে বামদিকে)

সামনে তানসেন দণ্ডায়মান—জাহাঙ্গীর যখন যুবরাজ, তখনকার কোনও দিনের ছবি; জাহাঙ্গীর তানসেনের গুণের প্রশংসা করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আর একখানি ঘটনার চিত্র। তানসেনের সঙ্গীত-গুরু ছিলেন হরিদাস স্বামী। ইনি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন, বৃন্দাবনে থাকিয়া সঙ্গীতের মধ্যেই সাধন-ভজন করিতেন।

তাঁহার গুণপনার কথা শুনিয়া আকবর তাঁহার গান শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হন, কিন্তু সাধু হরিদাস রাজ-দরবারে আসিতে চাহিলেন না। তখন আকবর স্বয়ং তানসেনের সঙ্গে হরিদাস স্বামীর আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিদাস সমাগত সম্রাটের সমক্ষেও গান গাহিতে চাহিলেন না। শেষে তানসেন নিজে গুরুর সামনে গান ধরিলেন, ও ইচ্ছা করিয়া ভুল করিয়া গাহিলেন। ইহাতে হরিদাস স্বামী তানসেনকে সংশোধন করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে স্বয়ং গান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গান চলিল; কথিত আছে যে সাধক হরিদাস স্বামীর গান শুনিয়া আকবর ভাবাবেশে এরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তিনি কিয়ৎকাল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ছিলেন। জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে পর তিনি তানসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তানসেনের গান এত ভাল হয় না কেন। তাহাতে তানসেন উত্তর দেন—'মহারাজ, আমি গান গাহি একজন পার্থিব সম্রাটের দরবারে; আর আমার গুরু গান গাহেন স্বয়ং পরমেশ্বরের দরবারে।' এই সুন্দর গল্পটি একটী মোগল-চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। দীর্ঘাকৃতি শীর্ণকায় হরিদাস স্বামী, কুটীর দ্বারে তানপুরা লইয়া মৃগচর্ম্মাসনে বসিয়া গান করিতেছেন কুটীর-দ্বার-প্রান্ত কদলী ও অন্যান্য বৃক্ষের হরিদ্বর্ণ পত্রে ছায়া-শীতল, রোগা পাতলা কালো চেহারার তানসেন মাটীতে বসিয়া, ও সম্রাট আকবর দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছেন; বহুদূরে সম্রাটের তাঁবুর কানাত ও যান-বাহন উষ্ট্রাদি দেখা যাইতেছে; এবং আরও দূরে একটী নগরের দৃশ্য।

তানসেনের ছবি পাইতেছি, তানসেন-সম্বন্ধে কতকগুলি গল্পও পাইতেছি—কিন্তু তাঁহার জীবনের সব খবর পাইতেছি না—অনেক কথা ঘোরতর রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে। আকবরের দরবারে ঐতিহাসিক আবুল্-ফজল আঈন্-ই-আকবরী গ্রন্থে আকবরের বেতনভোগী ছত্রিশ জন দরবারী গায়ক ও বাদকের নাম দিয়াছেন—তন্মধ্যে তানসেনের নাম সর্ব্বপ্রথমে আছে, এবং তানসেন সম্বন্ধে আবুল-ফজল মন্তব্য করিয়াছেন যে তাঁহার ন্যায় গায়ক বিগত সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে হয় নাই। ১৯৩৪ সংবতে (১৮৭৭-১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) শিবসিংহ সেঙ্গর 'শিবসিংহ-সরোজ' নামে হিন্দু কবিদের জীবনীময় একখানি কবিতা-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি তানসেনের জীবনের কতকগুলি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্যর জ্যর্জ্ আব্রাহাম্ গ্রিয়ার্সন্ ১৮৮৯ সালে Modern Vernacular Literature of Hindustan নামে যে অতি উপযোগী পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি 'শিবসিংহ-সরোজ' হইতে তানসেনের জীবনী-কথা উদ্ধার করিয়া দেন। শিবসিংহের মতে তানসেনের জন্মের তারিখ হইতেছে ১৫৮৮ সংবৎ (অর্থাৎ ১৫৩১-১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ)। শিবসিংহ কোনও প্রমাণ দেন নাই। তাঁহার প্রস্তাবিত এই তারিখ ঠিক নয়, কারণ এই তারিখে জন্ম ধরিলে তানসেনের জীবনের অনেক ঘটনার মধ্যে অসঙ্গতি দেখা যায়। বোধ হয় তানসেন ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আকবরের দরবারে লিখিত ফারসী ইতিহাস অনুসারে তাঁহার মৃত্যুকাল ৯৯৭ হিজরী অর্থাৎ ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। তানসেন মকরন্দ পাঁড়ে নামে এক গৌড় ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর নিকট প্রথম কবিতা রচনা ও গান শিক্ষা করেন। পরে তিনি গোয়ালিয়রের সুফী সাধক মোহম্মদ ঘৌসের শিষ্য হন। এই সুফী সাধক একজন খুব বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। তিনি বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের সমকালীন ছিলেন, এবং লোকে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। গোয়ালিয়র যখন হিন্দুদের হাতে—তোমর-বংশীয় রাজপুতদের হাতে—ছিল, তখন হইতেই মোহম্মদ ঘৌস্ গোয়ালিয়রে বাস করিতেন, এবং এই মুসলমান সাধুটীর সলা-পরামর্শ অনুসারে বাবরের সেনাপতি রহীম-দাদ মোগলদের হইয়া গোয়ালিয়র দখল করিতে সমর্থ হন। কথিত আছে যে মোহম্মদ ঘৌস্ নিজের জিভ তানসেনের জিভে ঠেকান, তাহাতেই তানসেনের অসাধারণ সঙ্গীত-শক্তির উন্মেষ হয়। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে তানসেন আকবরের দরবারে আসেন, এবং ইহার পরে তিনি মুসলমান হন।

তানসেনের মুসলমান ধর্ম্ম স্বীকার করার কারণ রহস্যাবৃত। আকবরের প্ররোচনায় মুসলমান হওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ আকবর এই ধর্ম্ম সম্বন্ধে বরাবরই উদাসীন ছিলেন, এবং শেষ জীবনে এই ধর্ম্ম একপ্রকার ত্যাগই করিয়াছিলেন। তানসেনের রচিত গানের ভাব ও ভাষা দেখিয়া মনে হয় না যে তিনি ভক্তপ্রাণ হিন্দু ছাড়া আর কিছু ছিলেন। মুসলমান ভাবে অনুপ্রাণিত তানসেনের নামে যে কয়টী গান পাওয়া যায়, সেগুলিতে এই আন্তরিকতার সুরের বিশেষ অভাব দেখা যায়। ওস্তাদ মোহম্মদ ঘোসের প্রভাবে পড়িয়া তবে কি তানসেন মুসলমান হন? মোহম্মদ ঘোস হিন্দুদের খুব প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন অনুমান করা যায়—অন্ততঃ যোগ্যস্থলে হিন্দুদেরও তিনি খাতির করিতেন বলিয়া গোঁড়া মুসলমানদের কেহ কেহ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইত, ইহার প্রমাণ আছে। ভারতবর্ষে মুসলমান পীর বা ফকীরের লোক-প্রিয়তা অনেক ক্ষেত্রে হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রচার-কার্যে সহায়তা করিয়াছে, ইহা দেখা যায়। আবার ইহাও হইতে পারে যে যৌবনে তানসেন মুসলমান রাজ-দরবারে ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন বলিয়া মুসলমান-সংস্পর্শ-হেতু আচারে ব্যবহারে ব্রাহ্মণত্ব বজায় রাখিতে না পারায় স্বজাতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তানসেন শেরশাহের পুত্র দৌলত খাঁর বিশেষ বন্ধু হইয়া আগরায় রাজ দরবারে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে হয় তো তানসেনের স্বজাতীয় অনেকগুলি ব্যক্তিকে মোগল কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র বিজয়ের পরে জোর করিয়া ধরিয়া মুসলমান করিয়া দেওয়া হয়—জাতিকে জাতি ধরিয়া মুসলমান করার উদাহরণ ভারতের ইতিহাসে বিরল নহে। একটা লক্ষণীয় বিষয়—আবুল্-ফজল আঈন্-ই আকবরীতে আকবরের সভায় যে ছত্রিশ জন ওস্তাদের নাম করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পনের জন গোয়ালিয়রের লোক—এবং এই গোয়ালিয়রের ওস্তাদ বা কলাবন্ত দের অনেকেই হিন্দুনাম-যুক্ত মুসলমান; যথা—'মিয়াঁ তানসেন' স্বয়ং তাঁহার পুত্র 'তানতরঙ্গ খাঁ'; এবং 'শ্রীজ্ঞান খাঁ', 'মিয়াঁ চাঁদ', 'বিচিত্র খাঁ', (তদ্‌ভ্রাতা 'সুরজ্ঞা খাঁ), 'বীরমণ্ডল খাঁ', 'প্রবীণ খাঁ', 'চাঁদ খাঁ।' গোয়ালিয়র-নিবাসী হিন্দু—খুব সম্ভবতঃ তানসেনের গোষ্ঠীর—অনেক ঘর ব্রাহ্মণ গায়ক ও বাদককে মুসলমান করিয়া দেওয়ায়, বা কোনও কারণে তাঁহাদের মুসলমান হইয়া যাওয়ায়, এইরূপটী ঘটিয়া থাকিবে। আরও একটা কারণ থাকিতে পারে—হয় তো তানসেন কোনও মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়িয়া ধর্ম্মত্যাগ বা হিন্দুনাম ত্যাগ করিয়া থাকিবেন। একটা বাজে গল্প আছে যে তানসেনকে নিজ দরবারে আনিয়াও আকবর গান গাওয়াইতে পারেন নাই, শেষে নিজ কন্যাদান করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা-সাধন পূর্ব্বক গান গাওয়াইতে পারিয়াছিলেন। এই গল্পের মূলে, প্রেমে পড়িয়া ধর্ম্মত্যাগের কথা থাকিতে পারে। যাহা হউক, মোহম্মদ ঘোসের প্রভাব তানসেনের জীবনে বিশেষ ভাবেই কার্য্যকর হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। তানসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ গোয়ালিয়রের বিরাট পর্ব্বত-দুর্গের পাদদেশে মোহম্মদ ঘোসের সমাধি-মন্দিরের পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমাহিত হয়। পাথরে গাঁথা তানসেনের সমাধি এখন উত্তর ভারতের গায়কগণের পক্ষে এক মহাতীর্থস্থান; এই সমাধির পার্শ্বে একটী তেঁতুল গাছ আছে, গায়কেরা শ্রদ্ধার সহিত এই গাছের পাতা চিবায়, তাহাতে নাকি সঙ্গীত-গুরু তানসেনের আশীর্ব্বাদে কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়।

তানসেনের প্রথম যৌবনের পৃষ্ঠপোষক শেরশাহ পুত্র দৌলত খাঁর মৃত্যুর পর তিনি মধ্যভারতের রীবাঁ (রেওয়া) রাজ্যের অন্তঃপাতী বান্ধোর রাজা রামচাঁদ সিংহ বাঘেলার আশ্রয়ে বহু বৎসর যাপন করেন। তানসেন বহু ধ্রুপদ গানে 'রাজা রাম' নাম দিয়া এই রাজার যশ কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; ইনি তানসেনকে সম্মান ও অর্থ দান করিতেন যথেষ্ট। তানসেনের খ্যাতি ইতিমধ্যে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং বাদশাহ ইব্রাহীম খাঁ আগ্রায় নিজ দরবারে তাঁহাকে আহ্বান করেন, কিন্তু তানসেন রেওয়া ত্যাগ করিয়া আসিতে চাহিলেন

না। ইতিমধ্যে হুমায়ুন বাদশাহ আসিয়া পাঠান শেরশাহের বংশধরদের পরাজিত ও উৎখাত করিয়া ১৫৫৬ সালে পুনরায় মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন। আকবর নিজ রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে জলালুদ্দীন কর্চী নামে এক মনসবদারকে রেওয়ায় পাঠাইয়া তানসেনকে নিজ দরবারে ডাকিয়া আনাইলেন—এবার তানসেন আপত্তি করিতে পারিলেন না। তানসেনের অবশিষ্ট জীবন আকবরের দরবারেই অতিবাহিত হয়। কোনও সময়ে নিজেকে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন তাঁহার জীবনে অতঃপর উল্লেখযোগ্য আর কোনও ঘটনা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

তানসেন গানে অদ্বিতীয় ছিলেন—কলাবন্ত ও সঙ্গীতকার বলিয়া তাঁহার অসীম খ্যাতি—কিন্তু কবি-হিসাবেও তিনি কম ছিলেন না। তানসেন যে যুগে জীবিত ছিলেন সে যুগ প্রাচীন হিন্দী সাহিত্যের বিশেষতঃ কাব্য সাহিত্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে এক দিকে ছিলেন তুলসীদাস, এবং তাঁহা অপেক্ষা অন্ততঃ এক পুরুষ প্রাচীন ছিলেন অন্ধ কবি সূরদাস। আকবরের দরবারে যেমন একদিকে ফারসী ছিল রাজভাষা, পোষাকী ভাষা—ফারসী সাহিত্যের চর্চ্চা ও ফারসীতে ইতিহাসাদি রচনায় যেমন একদিকে আকবর ও তাঁহার অমাত্যগণের পূর্ণ উৎসাহ ছিল, তেমনি অন্যদিকে দেশ-ভাষা হিন্দীর (ব্রজভাষার) চর্চ্চা ও ইহাতে কবিতা-রচনায় সম্রাট ও তাঁহার সভাসদ্‌গণের উৎসাহের অন্ত ছিল না। আকবর নিজে হিন্দীতে কবিতা রচনা করিতেন,—অকব্বর' বা অকব্বর সাহি' এই ভণিতায় আকবরের রচনা বলিয়া প্রচারিত কতকগুলি হিন্দী দোহা বা কবিতা পাওয়া যায়। তাঁহার সভাসদ্‌গণের মধ্যে রাজা বীরবল, মীরজা আব্দুর্-রহীম খাঁ-খানান ও বীকানেরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ রাঠৌড় উচ্চদরের কবি বলিয়া হিন্দী ও রাজস্থানী সাহিত্যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

গায়ক বলিয়া অতুলনীয় যশের অধিকারী হওয়ায়, কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ তানসেনের ভাগ্যে ততটা ঘটিয়া উঠে নাই। সঙ্গীতজ্ঞ কলাবন্ত তানসেনের আড়ালে কবি ও সাধক তানসেন যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। এইরূপটী হইবার কারণ এই ছিল যে তানসেন কেবল মাত্র কবি ছিলেন না—কেবল কবিতা রচনা তাঁহার একমাত্র পেশা ছিল না; দরবারে বা সভায় সুর-সংযোগে পাঠ করিয়া তারিফ বা সাধুবাদ লইবার জন্য বড় বড় কাব্য বা ছোট-খাটো দোহা বা পদ রচনা করা তাঁহার কার্য্য ছিল না। Lyric Poet অর্থাৎ গীতিকবিতাকার বলিলে যাহা বুঝায়, তানসেন নিছক তাহাই ছিলেন। তিনি নিজে যে গান রচিতেন তাহা তিনি স্বয়ং গাহিতেন। কাব্য-রস অপেক্ষা সঙ্গীত রসই ছিল এই সকল গানের প্রধান আকর্ষণ। কবি বা সাহিত্যিকের মজলিস অপেক্ষা কালোয়াতের জলসায় এই সকল গানের প্রচলন বেশী ছিল; এবং এই কালোয়াতেরা বেশীর ভাগ ছিলেন সুর ও তানের বৈয়াকরণ, কাব্য-রসের দিকটা তাঁহাদের কাছে ছিল গৌণ বস্তু। সুতরাং তানসেনের কাব্য-সরস্বতী অরসিকের হাতে পড়িয়াই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন—তানসেনের সঙ্গীতের কাব্য-সৌন্দর্য্যে কবি-চিত্ত আকৃষ্ট হইবার তাদৃশ সুযোগ পায় নাই। তানসেনের মত একাধারে কবি ও গায়ক—অনেকেরই এই অবস্থা ঘটিয়াছে; তানসেনের সমসাময়িক কবি ও গায়ক বাবা রামদাস ও তৎপুত্র সূরদাস (ইনি অন্ধ কবি সূরদাস হইতে পৃথক ব্যক্তি), এবং তানসেনের বহু পূর্ব্বেকার অপর সমস্ত কবি ও গায়ক সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়।

মুখ্যতঃ কবি বলিয়া খ্যাতি বা স্বীকৃতি লাভ না করায়, তানসেনের গানগুলির বাহিরে যতটা প্রচার হওয়া উচিত ছিল ততটা প্রচার ঘটিতে পারে নাই। সাহিত্যরসিকগণ ও পুস্তক-অনুলেখক বা নকলকারগণ সূরদাস বিহারীলাল তুলসীদাস ভূষণ প্রভৃতি কবিদের

লইয়াই মাতিয়াছিলেন। কালোয়াৎ-সম্প্রদায়ের বাহিরে আর কেহ এ বিষয়ে ততটা আকৃষ্ট হন নাই; এবং ব্যবসায়ী কালোয়াতের দলও সঙ্গীত-বিদ্যার প্রধান গুরুস্থানীয় তানসেনের গান নিজেদের মধ্যেই নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন,—বাহিরের লোকেরা গায়ক হিসাবেই তাঁহার স্মৃতির সম্মাননা করিয়া ক্ষান্ত থাকিত। যতদূর সন্ধান লইয়াছি, কাব্যের দিক হইতে তানসেনের গানের কোনও সংগ্রহ-পুস্তক আমি পাই নাই। অথচ উত্তর ভারতের কলাবন্ত সঙ্গীতের যে কোনও বইয়ে তানসেনের গান দুই দশটী থাকিবেই। একটা সুখের বিষয়—ফারসী হিন্দী বাঙ্গালা মারহাট্টা প্রভৃতি ভাষার প্রাচীন রীতি অনুসারে, অন্য কবিদের ন্যায় তানসেনও স্বরচিত পদে নিজ ভণিতা দিতেন। এই ভণিতা ধরিয়া তানসেনের গানের সংগ্রহ আরম্ভ করা যাইতে পারে। হয় তো অন্য লোকের লেখা অনেক বাজে কবিতায় তানসেনের ভণিতা আসিয়া গিয়াছে; আবার হয় তো তানসেনের রচিত পদের ভণিতা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া পদটী অন্য কবির নামেই চলিতেছে। এসব বিচার করিয়া তানসেনের গানের বাণীর একটী সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করা হিন্দী সাহিত্যের তথা ভারতীয় সাহিত্যের একটা বড় কাজ হইবে—এই সংগ্রহের প্রধান উদ্দেশ্য থাকিবে, পদগুলির কাব্যাংশ বিচার। মুদ্রিত পদও যথেষ্ট আছে, এগুলিকে লইয়া কাজ আরম্ভ করা চলে। খ্রীষ্টীয় ১৮৪৩ সালে কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ লালগোলার রাজা বাহাদুরের ব্যয়ে ১৯১৪—১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত) কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের বিরাট সঙ্গীত-সংগ্রহ 'সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম' গ্রন্থে তানসেনের ভণিতা দেওয়া বহু বহু পদ আছে। খ্রীষ্টীয় ১৮৮৫ সালে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গীতসূত্রসার' পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দীতে মারহাট্টীতে ও অন্য ভাষায় ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে যত পুস্তক বাহির হইয়াছে, সেগুলিতে তানসেনের পদ আছে। আবার যাঁহারা 'খানদানী' কালোয়াৎ, অর্থাৎ বংশানুক্রমে বহু পুরুষ ধরিয়া কলাবন্তের বৃত্তি পালন করেন, তাঁহাদের কণ্ঠে ও ঘরের হাতেলেখা বইয়ে কিছু কিছু রক্ষিত আছে; যেমন বাঙ্গালা দেশে বিষ্ণুপুরের খান্‌দানী সঙ্গীতজ্ঞ, ভারতের অন্যতম অদ্বিতীয় ধ্রুপদী, সঙ্গীত-নায়ক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—তানসেনের এক বংশধর ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বিষ্ণুপুরে আগত বাহাদুর সেন বা বাহাদুর আলী খাঁর শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত ইনি; ইঁহার রচিত সঙ্গীত-বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকে তানসেনের পদ কিছু কিছু দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালা অক্ষরে 'ধ্রুপদ ভজনাবলী' নামে কলিকাতা হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত, অধুনা দুষ্প্রাপ্য ক্ষুদ্র একখানি পুস্তকের উল্লেখ করিতে হয়। রঙ্গপুরের উকীল রামলাল মৈত্র মহাশয় নিজ সঙ্গীত-শিক্ষক শিবনারায়ণ মিশ্রের নিকট বহু ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন, অমৃতবাজার পত্রিকার স্বর্গীয় শিশির-কুমার ঘোষ মহাশয়ের উৎসাহে এইরূপ ৩৭১ খানি ধ্রুপদ গানের বাণী তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে ১৮০টী অধিক গান তানসেনের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে। এই 'ধ্রুপদ ভজনাবলী'তে হিন্দী শব্দগুলির যে দুর্দশা হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত; তথাপিও এই বইখানি বিশেষ মূল্যবান্।

প্রাচীন যুগের হিন্দী কবিদের মত তানসেন ব্রজভাষায় তাঁহার পদ রচিয়া গিয়াছেন। ব্রজভাষা ব্রজমণ্ডল অর্থাৎ মথুরা-অঞ্চলের জন-ভাষা। (বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলীতে যে 'ব্রজবুলী' নামক বাঙ্গালা ও মৈথিলের মিশ্রণ-জাত এক কৃত্রিম সাহিত্যের ভাষা পাওয়া যায়, তাহা হইতে মথুরা-বৃন্দাবনের এই 'ব্রজভাষা' সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।) ব্রজভাষায় বিরাট একটী সাহিত্য আছে; এই ভাষা বহু কবির এবং গদ্য লেখকের দ্বারা গঠিত। উত্তর ভারতের আর্য্য ভাষাগুলির মধ্যে শ্রুতি-মাধুর্য্যে ও গাম্ভীর্য্যে ব্রজভাষা অতুলনীয় সুন্দর ও শক্তিশালী,—গীতি-কবিতার পক্ষে এই ভাষা বিশেষ উপযোগী। দিল্লী ও পাঞ্জাব অঞ্চলের কথিত ভাষার

আধারের উপরে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী (আধুনিক সাধু-হিন্দী এবং উর্দু) তানসেনের যুগে সাহিত্যের দরবারে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই—কবিতা বা অন্য কিছু দেশভাষায় লিখিতে হইলে সাধারণতঃ একাধিক প্রাদেশিক ভাষাই ব্যবহৃত হইত—ব্রজভাষা, বা ডিঙ্গল অর্থাৎ রাজস্থানী, অথবা অবধী অর্থাৎ অযোধ্যা-অঞ্চলের ভাষা। তানসেনের ও অন্য হিন্দী কবিদের ব্রজভাষা হইতেছে মধ্য-যুগের আর্য্যভাষা—স্বরবর্ণ-বহুল বলিয়া বিশেষ শ্রুতিসুখকর; এই ভাষার প্রায় তাবৎ শব্দ স্বরান্ত। গানের ভাষা হইবার পক্ষে ইহা একটি বিশেষ উপযোগিতা। গানে ব্যবহৃত হইলে ব্রজভাষায় একটু উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য দুই এক ক্ষেত্রে আসিয়া যায়—অন্ততঃ ধ্রুপদ-গানের কোনও কোনও ধারায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়—অনুনাসিক বর্ণের পরে বর্গের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বর্ণ আসিলে, এই অনুনাসিক-যুক্ত সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বেকার অ-কারকে ঔ-কারবৎ উচ্চারণ করা হয়—অ-কারের সাধারণ হিন্দী আকার-ঘেঁষা উচ্চারণ না হইয়া, কতকটা বাঙ্গালার দীর্ঘ অ-কারবৎ উচ্চারণ আসে; যেমন—'পঙ্কজ, শঙ্খ, গঙ্গ, পঞ্চ, অঞ্জন, মণ্ডপ অন্ত, পন্থ, চন্দ, সুগন্ধ, অম্ব' ইত্যাদি শব্দ গানের সময়ে উচ্চারণে শোনায় যেন 'পৌঙ্কজ, শৌঙ্খ, গৌঙ্গ, পৌঞ্চ, ঔঞ্জন, মৌণ্ডপ, ঔন্ত, পৌন্থ, চৌন্দ, সুগৌন্ধ ঔম্ব' ইত্যাদি। ইহাতে গীতকালে এই সানুনাসিক সংযুক্ত-বর্ণগুলির বিশেষ একটু শ্রুতিমাধুর্য্য আসিয়া যায়।

তানসেনের পদ এবং তানসেনের সমকালীন অনুরূপ হিন্দী কবিতায় একটী লক্ষণীয় বিষয় হইতেছে—পদের ভাষায় সংক্ষেপ বা সংকেত। ব্যাকরণ-ঘটিত শব্দ ও ধাতুরূপ যতদূর সম্ভব বর্জ্জন করিয়া, ব্যাকরণকে যেন বাদ দেওয়া হয়—post-position বা অনুসর্গ ও প্রত্যয় এবং অন্য সহায়ক পদ বা পদাংশ যেখানে না থাকিলে চলে না, যথাসম্ভব মাত্র সেখানেই প্রযুক্ত হয়। নাম-শব্দের প্রাতিপাদিক রূপ, এবং মাত্র আকারান্ত ধাতুর দ্বারাই কাজ চালানো হয়। বাক্যে থাকে—কেবল পর পর সজ্জিত মূল শব্দ বা সমস্ত-পদ—এই সকল পৃথক্ অবস্থিত বিভক্তি-প্রত্যয়-বিরল 'নিরেট' শব্দগুলি যেন যেন একটু বিশেষ শক্তির দ্যোতনা আনিয়া দেয়, ভাষাকে খুব জম-জমাট করিয়া তুলে। তানসেনের পদে প্রায়ই এইরূপ পাওয়া যায় যে কেবল শব্দগুলির অবস্থানেই পর পর কতকগুলি চিত্র আমাদের মানসপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে।

তানসেনের পদ ধ্রুপদ গানের আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, ও আভোগ এই চারিটি অংশ অবলম্বনে চারি ভাগে বিভক্ত। পদের ছন্দ সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়—চারি ছত্রের বড় বড় হিন্দী ছন্দই পাওয়া যায়; আবার চারি ছত্রে বিভক্ত গদ্য রচনাও খুব মিলে।

ধ্রুপদ গানের জন্যই বিশেষ ভাবে এই সকল পদ বা গান বাঁধা হয়, ইহা তানসেনের কাব্য-সরস্বতীর স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তির পক্ষে যেন এক বিষম অন্তরায়। একদিকে বাহ্য রূপটী যেমন ধরা-বাঁধা, অন্য দিকে বিষয়-বস্তুও তেমনি সুনির্দ্দিষ্ট। ধ্রুপদ-গানের বাণীর বিষয় এই কয়টি মাত্র হইতে পারে—পরব্রহ্ম, অথবা পরব্রহ্মের ধ্যান-গ্রাহ্য স্বরূপ শিব উমা বিষ্ণু সূর্য্য গণেশ শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দু-ধর্ম্মের দেবতার মহিমা কীর্ত্তন, দেবতাদের রূপ ও লীলা বর্ণন; প্রকৃতি বর্ণনা, বিশেষতঃ ঋতুবর্ণনা; সঙ্গীতের মহিমা-কীর্ত্তন; রাধা-কৃষ্ণ অথবা সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রেম বর্ণনা; বিরহ; এবং রাজা-রাজড়াদের গৌরব-বর্ণনা। মুসলমান মতের ধ্রুপদে আল্লার মহিমাকীর্ত্তন, নবী মোহম্মদের ও মুসলমান সাধকদের গুণ-বর্ণন,—এই সব পাওয়া যায়। ধ্রুপদ গানে ব্যবহৃত শব্দ প্রায় সব-গুলিই প্রাচীন হিন্দীর এবং সংস্কৃতের হইয়া থাকে—তানসেনের সময়ে ফারসী-আরবী-শব্দ-বহুল উর্দুর সৃষ্টি হয় নাই; কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মমতের অনুকূল পদে আরবী-ফারসী নাম এবং শব্দ, এমন কি বাক্য পর্য্যন্তও মিলে।

মোটের উপর, ধ্রুপদ রীতির পদে কবির কাব্যশক্তির স্ফূর্তির কতকগুলি বিশেষ অন্তরায় ছিল। তথাপি তানসেন যে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাবান্ কবি

ছিলেন, তাহা এই বন্ধনের মধ্যেও তাঁহার পদের বাণীতে বিশেষভাবে প্রকট। ধ্রুপদের পদে একটা ধীরোদাত্ত, একটা স্নিগ্ধ-গম্ভীর ভাব আছে—বিরাট্ বাস্তশিল্পের অনুরূপ ইহার পরস্পর-সম্বন্ধ গঠন-প্রণালী; ইহার দ্বারাই তাঁহার রচনাতে একটা মহিমা, একটা উচ্চ-ভাব আসিয়া যায়, যাহা আবার তাঁহার রচনা-শৈলীর উদারতা ও আভিজাত্য দ্বারা, তাঁহার শব্দ-চয়নের ক্ষমতার দ্বারা আরও পুষ্ট হয়, আরও সমৃদ্ধ ও উদ্ভাসিত হয়। দেবতাদের মহিমা কীর্ত্তনের সময় তাঁহার পদে যে সকল বিশেষণ বা সংজ্ঞা তিনি প্রয়োগ করিয়াছেন, সেগুলির মধ্যে যেন একটা আদিম বা মৌলিক মহত্ত্ব ও বিশালত্ব আছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম বা শিব বা বিষ্ণু বিষয়ক কতকগুলি পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাখীর গান ও দক্ষিণ পবনের সঙ্গে বসন্ত ঋতুর আনন্দময় রূপ; পুরবী বাতাস, মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের চমক ও মেঘগর্জ্জন এবং বৃষ্টিপাতের মনোমুগ্ধকর স্নিগ্ধ ধ্বনির সহিত বর্ষা ঋতু; রাধা ও কৃষ্ণের অনৈসর্গিক প্রেমলীলা;—ভারতীয় কাব্য-সাহিত্যে মহিমময় ও মাধুর্য্যময় যাহা কিছু আছে, সে সমস্তের দ্বারা তানসেনের পদ যেন ভরপুর, প্রাচীন ও মধ্য-যুগের হিন্দু কাব্য ও ভক্তিবাদ মথিয়া নবনীতটুকু যেন তানসেনের পদে ধরিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধ্রুপদের বাণী, এবং অন্য কবিদের রাগরাগিণী বর্ণনার পদ—এইসব পদে যেন প্রাচীন রাজপুত ও মোগল চিত্রের কবিতাময় ব্যাখ্যা বা বর্ণনা পাওয়া যায়—এই দুইটী বস্তু ভারতের কাব্যোদ্যানে দুইটী অনিন্দ্যসুন্দর সৌরভময় পুষ্প। ঋগ্বেদের ঋষিদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রাচীন ও মধ্য-যুগের কবি-পরম্পরার মধ্যে তানসেনের আসন অতি গৌরবময়।

তানসেন রাজসভার কবি, জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে যিনি অন্যতম, সেই আকবরেরই উপযুক্ত সভাসদ্ ও গায়ক তিনি। কিন্তু তাঁহার কাব্য-বস্তু দেশের জন-সাধারণের অনুভূতির বাহিরে নহে—রাজ-সভায় বসিয়া তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত পণ্ডিত ও অভিজাতজন, এবং বণিক ও যোদ্ধা, এবং ইহাদের মতই দীন পল্লীবাসী কৃষক, সকলেরই নাড়ীর টান আছে;—'আবির্ অকৃত প্রিয়াণি'—যে সব জিনিষ আমাদের প্রিয়, যাহা আমরা ভালবাসি, সেই সব জিনিষ তিনি সর্ব্বজন-সমক্ষে যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের ও সঙ্গীত-বিদ্যার আলোক-পাত দ্বারা প্রকাশিত করিয়া দিয়াছেন। তানসেনের কবিতা ভারতের জাতীয় চিত্ত হইতেই রস পাইয়া রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

তানসেনের নামে যে-সব পদ বা কবিতা পাওয়া যায়, সেগুলি খণ্ডাকারে বিক্ষিপ্ত ভাবে মিলিতেছে, পারম্পর্য্য বা ক্রম-বিকাশ ধরিয়া সেগুলিকে সাজানো এখন প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। রামলাল মৈত্র মহাশয় সঙ্কলিত ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত 'ধ্রুপদ ভজনাবলী' পুস্তিকার ভূমিকায় বলা হইয়াছে যে তানসেনের কবি-জীবন তিন পর্য্যায়ে পড়ে;—প্রথম, যৌবন—এই সময়ে তিনি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজা-রাজড়াদের গৌরব গান করিয়াছেন, এবং ঋতু প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন—এই পদগুলি উল্লাস ও ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর; দ্বিতীয়, প্রৌঢ় অবস্থা,—এই অবস্থায় তিনি দেবতাদের লীলা ও মহিমা কীর্ত্তন করেন,—এই শ্রেণীর পদগুলিতে ঐশ্বর্য্য-বোধ ও অন্তর্দৃষ্টি উভয়ই আছে, কিন্তু গভীর আত্মানুভূতি নাই; তৃতীয় পর্য্যায়ে তাঁহার পরিণত বয়সের ও বার্দ্ধক্যের কবিতাগুলিতে তিনি রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—ভাবগাম্ভীর্য্যে ও ভক্তির গভীরত্বে এগুলি অতুলনীয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, তানসেনের পদের এরূপ ঐতিহাসিক ক্রম নির্দ্ধারণ করা সম্ভবপর নহে।

তানসেনের বিনয় বা প্রার্থনাত্মক পদগুলি, সরল অকপট বিশ্বাস ও প্রীতিতে অতুলনীয়। তাঁহার ধর্ম্ম-বিষয়ক পদগুলিতে আমরা একজন তান্ত্রিক, মর্ম্মজ্ঞ ও ভক্তের প্রাণের পরিচয় পাই। নিজের জাতীয় সংস্কৃতির প্রধানতম বিষয়গুলির সহিত সুপরিচিত, এবং সেগুলি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও আস্থাশীল যথার্থ ব্রাহ্মণের পরিচয়ও তানসেনের পদে পাই। শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, গণেশ, দেবী,

সরস্বতী প্রভৃতির মহনীয় ও বিরাট্ কল্পনার অন্তর্নিহিত গম্ভীর চিন্তা, জ্ঞান ও উপলব্ধি এবং সৌন্দর্য্যবোধ—ইহার কোনটিই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। বেদ, উপনিষদ হইতে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ এবং তন্ত্র, ও মধ্য-যুগের সাধু ও সন্তগণের ভক্তিবাদ—এ সমস্তের মধ্যে যে জ্ঞান যে সত্যদৃষ্টি যে প্রাণ এবং যে রসসৃষ্টি আছে, তানসেন সে সমস্তেরই উত্তরাধিকারী। তানসেনের ধ্রুপদ গান শ্রবণে শ্রোতার মনে প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের মত দিব্যভাব জাগরিত হয়, ইহাও দেখা গিয়াছে।

দেবমন্দিরে দেববিগ্রহের সমক্ষে, কিম্বা বন্ধু-গোষ্ঠীতে বা রসিক-সমাজে, জ্যোৎস্না-রাত্রিতে সৌধশীর্ষে বা উদ্যানে নক্ষত্র-খচিত রজনীতে নদী বা বিরাট জলাশয়ের তীরে কোনও আশ্রমে বা কুঞ্জবনে বসিয়া ধ্রুপদ গান গীত ও শ্রুত হইবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত পারিপার্শ্বিক। বাণভট্টের কাদম্বরীতে, অচ্ছোদ-সরোবর-তীরে শিবমন্দিরে বিরহিণী কুমারী মহাশ্বেতার বীণার সঙ্গে গানের অতি মনোহর চিত্রটি বর্ণিত আছে; শিবের মহিমা মহাশ্বেতার কণ্ঠে যে সঙ্গীতে গীত হইয়াছিল, তাহা এখন হইতে এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার কালের ধ্রুপদ সঙ্গীত ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মেঘদূতের বিরহিণী যক্ষ-পত্নী বীণা বাজাইতে বাজাইতে বেদনাতুর হৃদয়ে স্বামীর গুণবর্ণনায় যে পদ গাইতেছিলেন, এবং গানের মধ্যে নিজের রচিত যে মূর্চ্ছনা ভুলিয়া যাইতেছিলেন, তাহা কালিদাসের যুগের ধ্রুপদ ভিন্ন আর কি? ঈশ্বরের যে স্তুতি নিসর্গের সুন্দর বস্তু এবং সুশ্রাব্য ধ্বনি-নিচয় দ্বারা অহরহ ধ্বনিত হইতেছে—হিমালয়ের অরণ্য-সঙ্কুল উপত্যকায় শুষির বংশদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বায়ু যে বংশী-নিঃস্বন মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, পর্ব্বত-গুহায় প্রতিধ্বনি জাগাইয়া মেঘের গুরুগর্জ্জনে যে মৃদঙ্গ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, অদৃশ্য কিন্নরীকণ্ঠের সহিত মিলিত প্রকৃতির সেই শিব-মহিম্ন-স্তোত্র এই ধ্রুপদেই যেন কথঞ্চিত প্রকাশিত হয়; এবং রাধিকার জন্য যুগ যুগ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি, শ্রীকৃষ্ণের জন্য রাধার শাশ্বত অভিসারযাত্রা—ইহারও আভাস ধ্রুপদেই ধ্বনিত হইতেছে।

রোমান-কাথলিক ধর্ম্মের সব চেয়ে মনোহর ও গাম্ভীর্য-পূর্ণ পূজাপদ্ধতি দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছিল; আমাদের হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব শ্রী ও শোভা মণ্ডিত বহু পূজা পাঠ ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানও দেখিয়াছি। নানা প্রকারের পাঠ-পদ্ধতি শ্রদ্ধার সহিত শুনিয়াছি—কাশীতে পুরীতে, দক্ষিণভারতের তামিলদেশের মন্দিরে, এবং অন্যত্র। সাধারণতঃ এই সকল পাঠের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ করিয়া আমার মনে জাগে—উদয়পুর রাজ্যে একলিঙ্গজীর মন্দিরের একটী দিনের ভোরের পূজার কথা; গৈরিক-বসন পরিহিত রুদ্রাক্ষের মালাধারী তেজঃপুঞ্জকলেবর সন্ন্যাসী পূজক, চমৎকার বিশুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজার অনুষ্ঠান পালন করিতেছেন; মাঝে মাঝে গর্ভগৃহের দ্বার রুদ্ধ হইতেছে; এদিকে অলঙ্করণ-মণ্ডিত প্রস্তরময় নাট-মন্দিরে এক ধ্রুপদ-গায়ক মৃদঙ্গী ও সারেঙ্গী-বাদকের সহিত বসিয়া, পূজার মাঝে মাঝে মহাদেবের স্তুতিময় একখানি ধ্রুপদ চৌতাল ধরিতেছে—সমস্তটা মিলিয়া পূজার যে অপূর্ব্ব আয়োজন, কথায় তাহার বর্ণনা করা যায় না; সর্ব্বোপরি পূজারী সন্ন্যাসীর শেষ মন্ত্রগুলির মধ্যে একটির ঝঙ্কার আসিয়া সমগ্র অনুষ্ঠানটির সম্বন্ধে শেষ কথা যেন বলিল—এই মন্ত্রের সম্পূর্ণ শ্লোক কয়টি মনে রাখিতে পারি নাই, কিন্তু একটি শ্লোকের একটি অংশ যেন এইরূপ ছিল—'শিবে ভক্তিঃ শিবে ভক্তি র্ভক্তি র্ভবতু মে সদা।'

তানসেনের ধ্রুপদের কবিতার একমাত্র উপযুক্ত ছবি হইতেছে রাজপুত ও মোগল শিল্পের ছবি, এই সব ছবি এবং তানসেনের কবিতা—এই দুইটি পরস্পরকে ফুটাইয়া তুলে। ধ্রুপদগানের উপযোগী পারিপার্শ্বিক বা দৃশ্যে এই প্রকারের চিত্র ভরপুর। রাগমালা বিষয়ক চিত্রগুলিকে 'দৃশ্যমান সঙ্গীত' (Visualised Music) আখ্যা দেওয়া হইয়াছে—সার্থক এই আখ্যা। রাজকুমারী উমা একাকিনী বা সখী-সহিত অরণ্য-সঙ্কুল গিরি পার্শ্বে গভীর

নিশীথে শিবপূজা করিতেছেন; সঙ্গীতকার, বাদক ও যোগী মিলিয়া নদীর ধারে কোনও আশ্রয়ে বসিয়া সঙ্গীত-চর্চা করিতেছেন; শরৎকালের প্রভাতরৌদ্রে অচিরস্নাতা কুমারী পূজা-নিরতা; এই প্রকারের বহু বহু চিত্র, ধ্রুপদ গানেরই যেন রূপময় প্রকাশ।

তানসেনের কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত বা গায়কের কণ্ঠে রক্ষিত বিকৃত পাঠ হইতে পদগুলির ভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিবার যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছি, ভুল-চুকগুলি বিশেষজ্ঞ পাঠকগণ সংশোধন করিয়া লইবেন।

উষা-সম্পর্কীয় পদগুলিতে বৈদিক উষা-বিষয়ক সূক্ত বা ঋকের আভাস পাওয়া যায়।

[ব = অন্তঃস্থ ব, ইংরেজীর w-এর মত; মূর্দ্ধণ্য ষ-এর উচ্চারণ 'খ' এবং ক্ষ-র উচ্চারণ 'চ্ছ'।]

[১] রাগ ললিত-ভৈরব। তাল চৌতাল॥

হেম-কিরটিনী উষা দেবী কনক-বরনী সবিতা-গেহিনী উদত মধুর হাস জগ হসায়ৌ॥

সিন্ধু-বারি উদত ভানু, বিমল সোহ জৈসে মানৌ দিশ-নাগরী কনক-গাগরী পানী ভরি ভরি মঙ্গল-অসনান করায়ৌ।

বিহগ মধুর ললিত তান গাবৈ, ভুবন নব জীবন, আনন্দ-মগন সব জগ-জন মঙ্গল গীত গায়ৌ॥

আয় উষা কমল-নেত্রী, গায়ত্রী, জগ-ধাত্রী, লেকে অরুন-কিরণ-মঞ্জন তানসেন-মানস-তামস দূর কিয়ৌ॥

[উষা]

হেম-কিরটিনী কনক-বর্ণা সবিতৃ-গৃহিণী উষা-দেবী উদিতা হইয়া মধুর হাসির দ্বারা জগৎকে হাসাইয়াছেন (উল্লসিত করিয়াছেন)॥

ভানু সিন্ধু-বারি হইতে উদিত হইতেছেন; কি বিমল শোভা! যেন মনে হয়, দিগঙ্গনাগণ কনক-গাগরীতে জল ভরিয়া ভরিয়া মঙ্গল-স্নান করাইয়াছে॥

বিহঙ্গ মধুর ললিত তানে গায়; ভুবনময় নব জীবন; সমস্ত জগৎ আনন্দ-মগ্ন হইয়া মঙ্গল গীত গাহিয়াছে। কমল-নেত্রী, সঙ্গীতময়ী (গায়ত্রী), জগৎ-পালিকা উষা দেবী আসিয়াছেন—অরুণ-কিরণ-রূপ নেত্র-মঞ্জন লইয়া তিনি তানসেনের মনের অন্ধকার দূরে লইয়া গিয়াছেন॥

[২] রাগ ভৈরব। তাল ধীমা তিতালা॥

মহাদেব মহাকাল ধূর্জটী শূলী পঞ্চ-বদন প্রসন্ন-নেত্র।

পরমেশ্বর পরাৎপর মহা-জোগী মহেশ্বর পরম-পুরুষ প্রেমময় পরা-শান্তি-দাতা॥

সরিতা-গণ=(নদী-সমূহ) ভিন্ন ভিন্ন পন্থ জৈসে আবত, সিন্ধুবা পাই রহত মগন—

তানসেন কহৈ—তৈসে ভগত ভিন্ন ভিন্ন মূরতি উপাসত একহী ব্রহ্ম আবত॥

[৩] রাগিনী ললিত। তাল চৌতাল॥

গন-মণ্ডল-মধ্য উদয়াচল-পর অষ্ট বাজী কনক-রথ-মেঁ অরুণ সারথি হোত, প্রিয়া উষা সবৈ অরুণ-বরন রঙ্গী বসন পহিরি ভানু উদত।

গগনাঙ্গন অঁধার-ধূরিয়া কিরণ-মঞ্জন দূর কিয়া;—হুল্লাস প্রকৃতি হসত অমিয়া, বিচিত্র ভূষণ মোহন সাজত॥

কানন কুন্তল নীহার-বুঁদন জড়িত মুকুতা-মাল মানৌ, সিন্ধু নিচোল, অচল মেখলা, নিতম্ব ধরণী বিশাল॥

বালার্ক সিন্দুর-বুঁদ ভাল, গ্রহ-উড় সুখ্যবি-মণ্ডল সোহত; প্রকৃতি-সোহ (=শোভা) নিহারি তানসেন প্রাণ মতাবত॥

[৪] রাগিনী ভৈরবী। তাল চৌতাল॥

অন্ত-কাল কৃপা করো, হিয়া-পর ঠাঢ়ো, হরি কমল-নৈন, বংশী-পাণি, মুরলী অধর, ললিত-মধুর, বঙ্কিম ভই বঙ্ক-বিহারী॥

বদন খীন, (=দেহ দুর্ব্বল) ইন্দ্রিয়-হীন; পাপ সুমরি সুমরি (=স্মরিয়া স্মরিয়া) অস্থির প্রাণ; নিরাশা প্রবল (=প্রবল) বিশ্ব অঁধার, গেহ ছোড়ি প্রাণ জাত, হরি॥

বিষয় আপদ, সুখ সম্পদ ধন জন দারা বান্ধব সুত সব-কো ছোড়ি চলহৌ (=আমি চলিয়া যাইব),—এক করম অব সঙ্গি (=সঙ্গে) রাহয়ৌ (=রহিয়াছে)॥

পতিত-পাবন প্রভু জনার্দন, পতিত দীন তানসেন;

বিশ্ব-মোহন, পারগামী প্রাণ-আশ্রয় দীজে, গোলোক-বিহারী ॥

[৫] রাগিণী দরবারী তোড়ী। তাল চৌতাল॥

প্রাণ মেরো হী রোবত হৈ বিরহ প্রাণ-বল্লভ নিসি-দিন; হে হেরি, শরণাগত দীন-কো দরসন কাহে ন দিন ॥

তুঁভি হির্দ (=হৃদয়ে) ন পাবে নিধি—যা বিধি তেরী বিধি; হির্দ-নাথ, দীন-নাথ, কৌন গতি কীন (=করিল) মেরে অপরাধকে কল ॥

শূন (=শূন্য) প্রাণ, শূন মন, শূন হির্দ-আসন; অঁধার ভয়ো (=হইয়াছে) বিশ্ব-সংসার, হে নাথ ॥

তানসেন বিনতী করতঃ আই (আসিয়া) হির্দ জগন্নাথ মরুভূম প্রেম-বারি বরখি প্রাণ কীজে শীতল ॥

[৬] রাগিণী ভৈরবী। তাল চৌতাল ॥

জগত-জীবন হো (=তুমি হইতেছ) প্রভু, ভগত-বচ্ছল তুঁহী ভগবান; ভগত-হিয়-পঙ্কজ-রাজ অচল-রাজ রাজ-রাজেশ্বর, অগন-ভুবন-পালক ॥

তুঁহী মাতা, তুঁহী পাতা, তুঁহী ধাতা বান্ধব; তুঁহী প্রিয় প্রাণারাম, তুঁহী শান্তি, সুখ গতি-মোক্ষ-ভক্ত-দাতা ব্রহ্ম তারক ॥

প্রাণ-বল্লভ (বল্লভ), বহু-বল্লভ—তানসেন-কো এক বল্লভ, মায়া-মোহ-মুগধ চীত সংসার-তাপ তপত (=তপ্ত হইতেছে); শান্তি-দাতা, দীজে শান্ত দীন-কো ॥

[৭] রাগিণী হিন্দোল। তাল চৌতাল ॥

সুন্দর সরস ঋতুরাজ বসন্ত আবত ভাবন, কুঞ্জ কুঞ্জ ফুলি ফুলি (=ফুলে ফুলে) ভবঁর (=ভ্রমর) গুঞ্জ, কোয়িল-পঞ্চম গান মতাবে নর-নারী ॥

কানন কানন ফুটত চমেলী, বকুল গন্ধরাজ বেলী, জাতিয়া গুলাব সুগন্ধ মনোহারী ॥

পবন চলত মন্দ মন্দ, বিছুড় গন্ধ চহুঁ দিস; গুঞ্জন মন নাদ পঞ্চম পূরত সবহুঁ বন-ভুব ॥

রতি-পতি ভজ জুবক-জুবতী, নাচত গাবত হিন্দোল গতি; গোবিন্দ-মঙ্গল তানসেন গাবৌ রী ॥

[৮] রাগ মল্লার। তাল চৌতাল ॥

বাদর আয়ো রী বাল (=বালা) পিয়া বিন লাগই ডর পাবন ॥

এক তো অঁধেরী কারী (=কৃষ্ণবর্ণ), বিজুরী চমকত, উমড়-ঘুমড় বরখাবন ॥

জব-তেঁ (=যখন হইতে) পিয়া পরদেশ গবঁন কী নৌ (=গমন করিলেন) তব-তেঁ ভয়ো মো তন-তাবন (=বিরহ আমার তনু-তাপকারী হইল) ॥

সাবন (=শ্রাবণ) আয়ো, অত (=এখানে) ব্রহ্ম লাবত; তানসেন প্রভু ন আয়ে মন-ভাবন ॥

[৯] রাগিণী বিহাগ। তাল চৌতাল ॥

সাঁঈ, তুঁন আবৈ আজ, আধী রাত (আঁধী রাত), মাঝ মাঝ সিংহনী জগাবৈ সিংহ কানন পুকার ॥

চন্দন ঘসত ঘসত ঘস গয়ে নখ মেরে—বাসনা ন পূরত মাগ-কো নিহার (=তোমার মার্গ বা পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া) ॥

ধিক জনম মেরে, জগ-মেঁ জীবন মেরে বিমুখ লগাবৈ নাথ পকরি বেনু বার বার (=হে নাথ, বার বার বেণু ধরিয়া তুমি পৃথিবীতে আমার জীবনকে বিপথে লইতেছ) ॥

হোঁ (=আমি) জন দীন অতি, নয়নহু বারি বহে; তানসেন অন্তর-বাণী ধ্রুপদ পুকার (=এই ধ্রুপদে তানসেনের অন্তর্বাণী যেন চীৎকার করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে) ॥

[১০] রাগ বিলাবলী। তাল চৌতাল ॥

তন-কী তাপ তব হী মিটেগী মেরী, জব প্যারে-কো দৃষ্টি-ভর দেখৌঙ্গী ॥

জব দরস পাউঁ প্রাণ-প্রীতম-কো, জনম জীতব সকল অপনো লেখাউঙ্গী ॥

অষ্ট-জাম মোহি-কো ধ্যান রহত বা-কো (=অষ্টযাম আমাতে কেবল উঁহারই ধ্যান বিদ্যমান), আলী-কো (সখীকে) লে ভেটৌঙ্গী ॥

তানসেন প্রভু কোউ আন মিলাবৈ, তা-কে পাবন সীস টেকাউঙ্গী (=তানসেনের প্রভুকে যদি কেহ আনিয়া মিলায়, তার দুইটী পায়ে আমার মাথা ঠেকাইব) ॥ (১৩৪০)

গান্ধীজি ঃ গঠন কর্ম ঃ অস্পৃশ্যতাবর্জন

কানাইলাল দত্ত

স্বাধীনতালাভের পর আমরা যেন অতিমাত্রায় রাজনীতি কেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছি। এম, পি, এম, এল, এ—নিদেনপক্ষে রাজনৈতিকদলের একটা হোমরা-চোমরা হওয়াই আমাদের ধ্যানজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার জন্যই, অনেকে মনে করেন, দিকে দিকে নিত্যনূতন রাজনীতিকদল হইতেছে—কংগ্রেস ভাঙিয়া চার পাঁচটাদল হইয়াছে; কম্যুনিষ্ট পার্টি ভাঙিয়া হইয়াছে কেউ বলেন তিনটি, কেউ বলেন নয়টি। নূতন নূতন দল গড়িবার পশ্চাতে নেতা হইবার আকাংখা আছে এ কথাটা অশ্রদ্ধেয়। তথাপি বাস্তবে যাহা ঘটিতেছে তাহাতে ইহা মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নহে। এই পথে রাজনীতি আজ জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। শ্রমিক-কর্ম্মচারী ইউনিয়ন, সেবাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্র যুব সংগঠন এমন কি পাড়ার সংঘ সমিতিগুলিতেও এখন রাজনীতি ভর করিয়াছে। নানাদিকে মধ্যে মধ্যে যে সকল দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিশৃঙ্খলা হত্যা লুণ্ঠন প্রভৃতি মাথা চাড়া দিয়া ওঠে তাহার মূলে রহিয়াছে হৃদয়হীন রাজনীতির ইন্ধন। রাজনীতি করার অর্থই হইতেছে ক্ষমতা অর্জ্জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইহার জন্য দল দরকার। আর দল দাবি করে সার্বিক ও অন্ধ আনুগত্য। এই দুর্দৈবের জন্য ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষকে দোষারোপ করা সমীচীন হইবে না। চলতি রাজনীতির ধারাই এটা। ইহা হইতে মুক্তির পথ,—গান্ধী-পথ, পরিত্রাণের উপায় গান্ধীজির শরণ।

আমাদের সকল চিন্তা ভাবনা ও কর্ম্মের অন্তিম লক্ষ্য মানুষ। এই কথাটা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দলের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা, গদীলাভের লোভ নীতিহীন দলবদল ও জোটবদ্ধতা প্রভৃতির মধ্যে মানুষের কথা কতটুকু স্বীকৃত হইতেছে তাহা সন্দেহের বিষয়। তাই আজ গান্ধীজির কথা মনে হইয়াছে। সকল অশুভ ও অকল্যাণের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য গান্ধীজির গঠনকর্ম্মের উপর নির্ভর করা যায়। ইহা সত্য যে, রাজনীতি বর্জ্জিত হইয়া দেশ চলিতে পারে না। কিন্তু শুধুমাত্র রাজনীতিকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিলে বর্ত্তমানে আমরা যে-সকল অসুবিধা এবং ক্ষতিকর অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি তাহার নিরসন হইবে না। সুতরাং সুস্থ ও আনন্দময় জীবনের প্রত্যাশা মিটাইবার জন্য রাজনীতির অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজন। সে বিষয়টি কি তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু কিছু একটা যে দরকার, আশাকরি ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে গান্ধীজি একটি সুচিন্তিত কর্ম্মপন্থা এই জন্য রাখিয়া গিয়াছেন।

গঠন কর্ম্মপন্থা গান্ধী-জীবনের ইচ্ছাপত্র বা Testament. গান্ধীজি সারা জীবন ধরিয়া নানা বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিয়া সত্যে উপনীত হইয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার পদ্ধতি ছিল ইহাই। নিজে পরীক্ষা না করিয়া তিনি কেবলমাত্র বুদ্ধির বিচারে কিছুই গ্রহণ করেন নাই। এই রকম একটা সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া তিনি "গঠনমূলক কর্ম্মপন্থা-মত ও পথ" নামক পুস্তিকাখানি লেখেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যথাযথভাবে গঠনকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিলে স্বাধীনতা আপনা আপনিই আসিয়া যাইবে। ঐ পুস্তিকায় গান্ধীজি ব্যাখ্যাসহ ১৮টি কাজের

একটি তালিকা দিয়াছেন। আজকের অনেক যুবক ও ছাত্রের তাহা জানিবার সুযোগ ঘটে না। এখন আমরা বক্তৃতার যুগে বাস করিতেছি। আমার দলের সব ভাল—অন্য সকলদের সবটুকুই মন্দ—এই কথা বেদ-বাক্যের সত্যের মত উচ্চারণ করাই এখন দলীয় লোকদের রীতি হইয়াছে মিথ্যাচার আর কতদূর যাইতে পারে? ইহার মধ্যে হাতে হাতিয়ারে কাজ করিতে গেলে মুশকিল। গান্ধীজি ১৮ দফা কর্মসূচী হইল:

(১) সাম্প্রদায়িক একতাবিধান, (২) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন, (৩) মাদক নিবারণ, (৪) খাদি উৎপাদন ও ব্যবহার, (৫) অন্যান্য পল্লীশিল্প গঠন, (৬) পল্লীস্বাস্থ্য বিধান, (৭) নূতন বুনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্তন, (৮) বয়স্ক শিক্ষার ব্যবস্থা (৯) নারীজাতির উন্নতি (১০) স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা, (১১) প্রাদেশিকভাষার উন্নয়ন (১২) রাষ্ট্রভাষার প্রসার (১৩) ধনসাম্য প্রতিষ্ঠা, (১৪) কৃষকদের উন্নতি-বিধান, (১৫) শ্রমিক সেবা, (১৬) আদিবাসী সেবা, (১৭) কুষ্ঠরোগী সেবা, এবং (১৮) ছাত্র সেবা।

বইখানির ভূমিকায় গান্ধীজি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন এই কার্যক্রম কংগ্রেসের অনুরোধে বা প্রয়োজনে তিনি রচনা করেন নাই। গান্ধীজি লিখিতেছেন—"এই কাজগুলি যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গস্বরূপ হইতে পারে ইহা শুনিয়া পাঠক উপহাস করিবেন না। ···একটি দরিদ্র বিধবার হাতে চরকা সামান্য একটা পয়সা রোজগারের উপায় মাত্র। কিন্তু জওহরলালের হাতে এই চরকা স্বাধীনতা সংগ্রামের অস্ত্র।" একই কাজের দ্বারা কর্মীর যোগ্যতা ও অভীপ্সা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ফললাভ হইয়া থাকে। তবে চরকা যে স্বাধীনতার সংগ্রামের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ইহা অনেকের নিকট আজিও উপহাসের বিষয় হইয়া আছে। চরকার অন্তরের কথাটি দৃষ্টিগ্রাহ্য নহে। বুঝিবার সুবিধার্থে সামান্য প্রসঙ্গান্তর হইলেও, সহজবোধ্য অন্য একটি বিষয়ের কথা এখানে একটু বলি।

প্রখ্যাত গান্ধীপন্থী নেতা ও কর্মী শ্রীযুক্ত রতনমণি চট্টোপাধ্যায় গান্ধীমানস গ্রন্থে অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"জওহরলাল থেকে অখ্যাত পল্লীর দীন হরিজন পর্যন্ত ঐ একটা মানুষের [গান্ধীজি] দিকে চেয়েছে—কেউ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য, কেউ দাড়ি কামাবার জন্য। দাড়ি কামানো। ১৯৪১ সন। আরামবাগ মহকুমার গ্রামের একটি সত্যাগ্রহ শিবির। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনসহ অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা তখন কারারুদ্ধ। কাজকর্মে তাই কিছু ভাটার টান ধরিয়াছে। একদিন রতনমণি কয়েকজন কর্মীসহ শিবিরে বসিয়া গল্পসল্প করিতেছেন এমন সময় কয়েকজন হরিজন (হাড়ি) আসিলেন। সকলের মত তাহারাও সমাদরে অভ্যর্থিত হলেন। রতনদারা যে চাটাইটাতে বসিয়া ছিলেন তাহারই অপরপ্রান্তে তাহারা বসিবার আসন পাইলেন। কথাবার্তায় বেলা বাড়িয়া দুপুরের খাওয়ার সময় হইল। রতনদা তাহাদের খাইয়া যাইতে বলিলেন। ইহাতে তাহারা খুসিই হইল। একটি ঘরের মধ্যে সামনা-সামনি আসনে বসিয়া তাহারা রতনদাদের সহিত আহার করিলেন। ইহা তাহাদের জীবনে এক নূতন আনন্দময় অভিজ্ঞতা। প্রাথমিক আড়ষ্টতা কাটিয়া যাইতে বেশী দেরি হইল না। হাড়ি ভাইয়েরা মন খুলিয়া তাহাদের সুখদুঃখের কথা কহিতে শুরু করিলেন। কত তাহাদের দুঃখ! একজন বলিলেন—"হ্যাগা মশাই, তোমার গান্ধীকে একটা চিঠি লিখে দাও তো আমাদের নাপিতের ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যাক।" সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। কি সে ব্যাপার যাহা ঠিক করিবার জন্য গান্ধীজিকে চিঠি লিখিতে হইবে। কোর্ট কাছারি থানা পুলিশ না করিয়া গান্ধীজিকে চিঠি!

অভিযোগ—হাড়ি ভাইরাও হিন্দু, হরিনাম করে, অভক্ষ্য (গোমাংস) মাংস খায় না অথচ নাপিত তাদের কামায় না। কিন্তু ঐ নাপিত হাটে বাজারে মুসলমান সহ বারোজাতের লোক কামায়। গান্ধীজি ছাড়া এই দুঃখ আর কে বুঝিবেন, কেই বা ইহা দূর করিতে

পারেন! একেবারে পণ্ডগ্রামের তথাকথিত শিক্ষাদীক্ষা-হীন একজন হরিজনের নিকট গান্ধীজি কি রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন তাহা ইহা হইতে অনুধাবন করা যায়। এবং ইহা কোন বক্তৃতার দ্বারা হয় নাই। সেবামূলক কাজ ও গঠন কাজের দ্বারাই হইয়াছিল।

আমরা অনেকেই জানি গান্ধীজির ক্ষৌরকার ভীমভাই হরিজনদের ক্ষৌরী করিত না জানিয়া তিনি আধাছাঁটা অবস্থাতেই ভীমের হাতে চুল ছাঁটিতে অস্বীকার করেন। ভারতের এক প্রান্তের এই নীরব সাধনা অপরপ্রান্তের একটি নিরক্ষর ভাইয়ের হৃদয়ে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল কেমন করিয়া! ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তিনি হয়তো বোঝেন না, নাপিতের সমস্যার সমাধান হইলেই তাহার স্বাধীনতা হইল। এই জন্যই গান্ধীজি বলিয়াছেন ক্ষেত্র বিশেষে একই কর্ম পয়সা রোজগারের উপায় অথবা স্বাধীনতার অস্ত্র।

গান্ধীজির ১৮ দফা কাজের সবগুলি সকলের মনোমত নাও হইতে পারে। হইবার দরকারও নাই। যাহার যতটুকু ভাল লাগে তিনি তাহাই করুন। তাহার দ্বারাই দেশের সর্বোত্তম সেবা হইবে। ইহার মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই কর্মের পথে একদিন আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত দুঃখ-দৈন্যে ভরা এই দেশ সোনার দেশ হইবে।

কথাপ্রসঙ্গে আজিকার আলোচনায় হরিজন তথা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনপ্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এইটিই ছিল গান্ধীজির অতীব প্রিয় বিষয়। এই সম্বন্ধে তাঁহার রচনা ও বক্তৃতার পরিমাণ সর্বাধিক। হরিজন উন্নয়ন ও অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন তাঁহার জীবনের সর্বপ্রধান কাজ বলিয়া তিনি দাবি করিতেন। লুই ফিশার গান্ধীজীবনী গ্রন্থে (The Life of Mahatma Gandhi vol II) লিখিয়াছেন—If Gandhi had done nothing else in his life but shatter the structure of untouchability he would have been a great social reformer। গান্ধীজি বলিয়াছিলেন—আমাদের দেশের মানুষ কুকুর বিড়ালকে অস্পৃশ্য মনে করে না, অথচ মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করে। ইহাকে ইহাকে তিনি পাপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই পাপ হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি পরে একান্তভাবে ব্রতী হইলেন। একজন্মে তিনি যদি সাফল্য লাভ করিতে না পারেন তবে জন্ম-জন্মান্তর ঐ কাজে ব্রতী থাকিবার বাসনাও ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯২১ সনের ৬ই এপ্রিল এক প্রার্থনান্তিক ভাষণে তিনি বলেন :"

"আজ আমি এই প্রার্থনা করি যে পুনরায় যদি জন্মগ্রহণ করিতে হয় তবে আমি যেন তোমাদের ঘরে হরিজন হইয়া জন্মাই…মরণকালে যদি কোন বাসনা আমার অপূর্ণ থাকে হরিজন সেবা যদি আমার অসমাপ্ত থাকে…তবে আমি তোমাদের [হরিজনদের] মধ্যে আবার জন্মগ্রহণ করিয়া আমার হিন্দুধর্মপালনে যেন সিদ্ধকাম হই।"

দেশ স্বাধীন হইবার পর জাতীয় সরকার এই কলঙ্ক দূর করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা এখন দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু আইন দিয়া অবজ্ঞা ও অনাদর দূর করা যায় না বা মর্যাদা দান করা যায় না। সেজন্য মানবিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। আইন অবশ্য সহায়ক শক্তির কাজ করে।

হরিজন সেবা তথা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন সম্বন্ধে গান্ধীজি গঠনমূলক কর্মপন্থা গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"হিন্দুধর্মের এই কলঙ্ক ও অভিশাপ দূর করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আজিকার দিনে নিষ্প্রয়োজন। কংগ্রেস-সেবীরা অবশ্য এ বিষয়ে অনেক কিছু করিয়াছেন। কিন্তু আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, অনেক কংগ্রেসসেবী শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়াই করিয়াছেন। হিন্দুধর্মরক্ষার জন্য হিন্দুদের পক্ষে ইহা অবশ্যকরণীয়, এ কথা মনে করেন নাই। যদি হিন্দু কংগ্রেসসেবীরা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের উদ্দেশ্যেই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনকে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা 'সনাতনীরা' এখন

যতখানি প্রভাবিত হইয়াছেন তদপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবিত হইবেন। কংগ্রেসসেবীরা বিরোধী মনোভাব লইয়া সনাতনীদের কাছে যাইবেন না। তাহারা অহিংসপন্থী, সুতরাং বন্ধুভাবেই তাহাদিগকে যাইতে হইবে। তারপর হরিজনদের কথা। হরিজনেরা আজ সমস্ত সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন। এমন নিদারুণ নিঃসঙ্গ জীবন বোধ হয় পৃথিবীতে আর কোথায়ও নাই। আজ প্রত্যেক হিন্দুকে হরিজনদের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং আপনার সেবা ও সাহচর্যের দ্বারা তাহাদের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা দূর করিতে হইবে। এ কাজ যত কঠিনই হউক না কেন ইহা স্বরাজ-সৌধ নির্ম্মাণের একটি অঙ্গ। স্বরাজের পথ অতীব সংকীর্ণ ও দুর্গম। এই পথে কোথায়ও পিচ্ছিল গিরিবর্ত্ম, কোথায়ও বা গভীর গহ্বর। যদি আমরা স্বরাজের শৈলশিখরে উপনীত হইয়া স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করিতে চাই তাহা হইলে অবিচলিত পদে এই সমস্তই আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে"।

গান্ধীজি অন্যান্য কথার মধ্যে এখানে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন—এই প্রয়োজনীয় কাজটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের মতলব ছাড়াই করিতে হইবে। সেবার হৃদয় দিয়া করিতে হইবে। তাহার দ্বারাই স্বরাজ-সৌধ নির্ম্মিত হইবে। আজও আমরা একথা বলিতে পারি যে, এই সেবার পথেই আমাদের স্বাধীনতা স্থায়িত্বলাভ করিবে এবং কল্যাণপ্রসূ হইবে। রামানন্দ কবীর তুকারাম তুলসীদাস শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনেরা রাজ্যপাট শাসন করেন নাই। তাঁহারা সমাজের অবহেলিত অচ্ছ্যুৎ মানুষকে মানুষের পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন মাত্র। বহু যুগ পরেও তাহাদের সেই মহৎ উদ্যোগকে আমরা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নিত্য স্মরণ করি। ইহাদের কর্মকৃতির পুণ্যফল আমরা এখনও ভোগ করিতেছি। "বেরুক নূতন ভারত···জেলে মুচি মেথরের ঝুড়ির মধ্যে হতে। ভুলিও না নীচজাতি মূর্খ দরিদ্র অজ্ঞ মুচি মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই"—এই কথা বলিয়া আত্মবিস্মৃত অবনত জাতির চিত্তে স্বামীজি বিবেকানন্দ সাহস ও চৈতন্য সঞ্চার করিয়াছেন। অন্ধকারে দিশেহারা জাতিকে পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুদীর্ঘকালের পরবশ্যতার ফলে সত্য ও শ্রেয় বোধ সম্পর্কে আমরা ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হইতেছিলাম। বিবেকানন্দ সেই ভুল হইতে জাতিকে সত্য পথে পরিচালনা করেন। রাজনীতির সহিত তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। তথাপি তিনি আমাদের রোগ নির্ণয়ে ভুল করেন নাই, নিদান নির্দ্দেশেও তিনি অভ্রান্ত। স্বামীজির এই বাণীমূর্ত্তি গান্ধীজির কর্মের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বলিলে বড় বেশী অত্যুক্তি হইবে না। মানুষের সমস্যা মানবিক দৃষ্টি দিয়াই বিচার করিতে হইবে। সমাধানের পথও ভিন্ন হইতে পারে না। সেই জন্যই গান্ধীজি হরিজনদের মন্দির প্রবেশের অধিকারকে বিশেষ মূল্যবান বিবেচনা করিতেন। গান্ধীজি বলিয়াছেন "মন্দির প্রবেশের অধিকার দিয়া অধ্যাত্মক্ষেত্রে হরিজনদের মুক্ত ঘোষণা না করিলে অস্পৃশ্যতা পরিহার কার্য অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ হইবে।"

রাজনীতি মানুষকে আর যাহাই দিতে পারুক অধ্যাত্ম সম্পদ দিতে পারে না। আর এই সম্পদ ছাড়া মানুষের কোন সম্পদই পূর্ণ নহে, কল্যাণকর নহে। বর্ত্তমানে অধ্যাত্মসম্পদের গুরুত্বের প্রতি যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হইতেছে না। সেই জন্য নানা আইন ও শুভ সকল্প থাকা সত্ত্বেও নীতিহীন কর্মের প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে এবং সামগ্রিকভাবে বিচার করিলে মানুষের দুঃখ বাড়িতেছেই বলিতে হইবে। আজ মানুস অনাহারে হয়তো মরে না কিন্তু নীতিনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী কল্যাণব্রতী মানুষের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া আপশোষের অন্ত নাই। গান্ধীজির গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করিলে আবার আমাদের জীবন সেবাময়, সত্যময় ও শুভময় হইয়া উঠিবে। আজ যে সকল অনাচার অত্যাচার ব্যভিচারের দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবন ক্ষতবিক্ষত হইতেছে

তাহার অবসান ঘটিবে। এক মুষ্টি ক্ষুধার অন্নের জন্য মনুষ্যত্বের মর্যাদাটুকু বিকাইয়া দিতে হইবে না।

জলপাইগুড়ির শশ্মানের বুকে রাজনৈতিক সেবাব্রতীদের আচরণ লক্ষ্য করিলে আমরা সকলেই বুঝিতে পারিব—ঐ প্রাণ দিবার কাড়াকাড়ির মধ্যে ভোটের স্বার্থ কতখানি রহিয়াছে। অতএব দুর্দৈবের আঘাতও আমাদের সম্বিৎ ফিরাইয়া দিতে পারিতেছে না। সুতরাং আসুন অন্য পথের সন্ধান করি। চলুন গান্ধী শতাব্দীতে আমরা মহাত্মার পথের পথিক হইতে চেষ্টা করি। মনে রাখিতে হইবে, If we are to make progress we must not repeat history but make new history. সেই গান্ধীজির নতুন ইতিহাসের সন্ধান করিতে হইবে ভালবাসার পথে। শ্রমসাধ্য সেবার পথে—প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথে নহে। ইহাই গান্ধীজির শিক্ষা, ইহাকে জনগণের নিজস্ব কর্মোদ্যোগ বলিতে পারি। লক্ষ্য ও পন্থার শুদ্ধতায় বিশ্বাসী মানুষ এই উদ্যোগের মধ্যে সার্বিক কল্যাণ সহজেই অনুভব করিবেন। আর ইহাই বোধহয় গান্ধীজির গঠনকর্মের প্রধানতম শিক্ষা। এই শিক্ষার আলোকে ভারতবর্ষের সাতলক্ষ গ্রাম আলোকিত হউক এই প্রর্থনা করি।
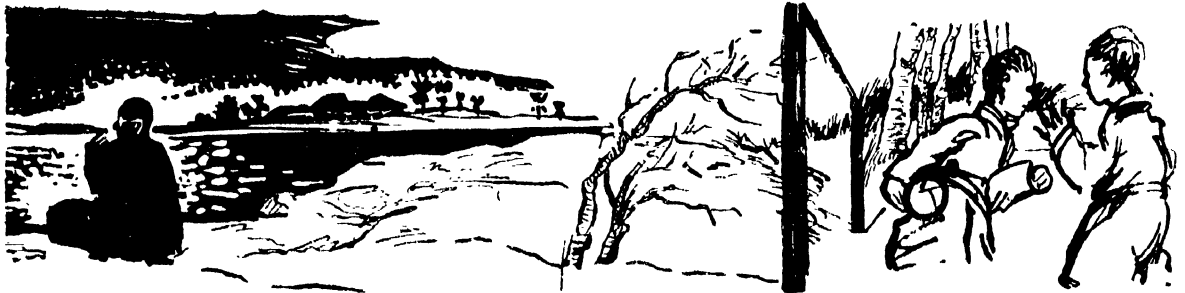
স্মৃতির টুক্‌রো

(২য় পর্ব্ব)

সাতকড়িপতি রায়

আমার লিখিত স্মৃতির টুকরো ধারাবাহিকভাবে প্রবাসী মাসিক পত্রিকায় ১৩৭৪ সালের অগ্রহায়ণ হইতে ১৩৭৫ সালের ভাদ্র সংখ্যায় শেষ হইয়াছে। উহাতে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ করত: বৃটিশ যে ভারত জাতীয় কংগ্রেস ও মোস্লেমলীগ উভয়ের হাতে শাসন কার্য্যের ভার দিয়া সরিয়া দাঁড়ায়, তাহারই বিবরণ পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলাম। স্বাধীন ভারত ও পাকিস্থান জাতীয় সরকারের হাতে আসিয়া তাহাদের কি হাল হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখি নাই। এখন তাহাই লিখিব।

প্রথমতঃ বৃটিশ কেন এইভাবে এত বড় সাম্রাজ্যের শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করিল, সে সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তাহাই বলি।

পৃথিবীর যে দ্বিতীয় যুদ্ধ ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত চলে, তাহাতে বৃটিশ, আমেরিকা ও রুশ্ একত্রিত হইয়া জার্ম্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে জয়ী হইলেও (ইটালিকে বাদ দিলাম) বৃটিশ যে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল, তাহাতে জোর করিয়া সৈন্যের সাহায্যে ভারতবর্ষের মত বৃহৎ ভূখণ্ডকে শাসনের বশে রাখার মত শক্তি বৃটিশের ছিল না। ১৯৪২ সালে ৯ই আগষ্ট ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস যে quit India প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহাতে ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমান অধ্যুষিত অংশ ছাড়া অন্য অংশে যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তাহাও বৃটিশ শক্তিকে বিশেষ সন্ত্রস্ত করেছিল। তার উপর সুভাষ বাবুর পূর্ব্ব এশিয়ার আজাদ হিন্দ ফৌজে বৃটিশের ভারতীয় সৈন্যদলের যাহারা জাপানের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেছিল, এবং পরে আজাদ্ হিন্দ দলে যোগ দিয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজনের যে বিচার দিল্লীর লাল কেল্লায় বৃটিশ সরকার ভুল করে করেন এবং যে বিচারে সুভাষ বাবুর অনম সাহসিক কীর্ত্তির বিবরণ বাহির হয়, তাহাতে ভারতের সাধারণ মানুষ শুধু নয় ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্যে নৌসৈন্য ও আকাশসৈন্যের মধ্যেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ঐরূপ সৈন্যের উপর নির্ভর করিয়া এতবড় সাম্রাজ্য শাসনে রাখা যায় না। এইসব বিবেচনা করিয়াই বৃটিশের লেবার দলের বৃটিশের তদানীন্তন Prime minister অ্যাটলি সাহেব ১৯৪৬ সালে পার্লিয়ামেন্টে প্রচার করেন যে ভারতকে—স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। তারজন্য ক্যাবিনেট মিশনও ভারতে আসে, তাঁদের অখণ্ড ভারত রাখিয়া প্রস্তাবও কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগ্ গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি চঞ্চলমতি জহরলাল নেহেরুর প্রেস্ কন্‌ফারেন্সের উক্তিই মহম্মদ আলি জিন্না মস্লীমলীগের সর্ব্বেসর্ব্বাকে বিচলিত করে। তিনি তখন দেশ বিভাগ ছাড়া আর কিছুতেই রাজী হইলেন না। অথচ বড় লাট লর্ড ওয়াভেল সাহেব দেশ বিভাগে রাজী না হওয়ায়, তিনি পদত্যাগ করে চলে যান। তারপর লর্ড ও লেডী মাউণ্ট ব্যাটন খুব অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসকে দেশ বিভাগে রাজী করিয়ে ভাগ করে দেন আর ভারত ইউনিয়ন ও পাকিস্থান বৃটিশের কাছে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস প্রাপ্ত হয়। ভারত ইউনিয়নের কর্ত্তা কংগ্রেস এবং পাকিস্থানের কর্ত্তা মুস্লীমলীগ।

সে সময় কংগ্রেস মানে জহরলালনেহেরু এবং মুস্লীম

লীগ মানে জিন্না সাহেব। শীঘ্র পাকিস্থানের পশ্চিমার্দ্ধের সমস্ত হিন্দু ও শিখ চলিয়া আসায় উহা কেবল মুসলমানের বাসভূমিতে পরিণত হয়। কিন্তু পূর্ব্বার্দ্ধে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে তখন কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাহার কারণ পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ মানুষ কি হিন্দু কি মুসলমান দিল্লীতে বসিয়া যে রাজনৈতিক বাটয়ারা হইয়া গেল, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি হইতে যে সকল মুসলমান পশ্চিম পাঞ্জাবে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল এবং সর্ব্বাধিনায়ক জিন্না সাহেব ও তাঁর পার্শ্বচর লিয়াকত আলির হুয়ায় উহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ব্ব পাকিস্থানে বড় বড় সরকারী চাকরী পাইয়া আসিল, তাহারাই পূর্ব্ববঙ্গ বা পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুসলমানগণকে হিন্দু বিতাড়নে ওয়াকিবহাল করিয়াছিল যাহার ফলে তিন বৎসর বাদে ১৯৫০ সালে প্রথম হিন্দু বিতাড়ন সুরু হয়। ইহার কথা বিশদভাবে আর একদিন বলিব। আজ কেবল এই কথাই বলিব ক্ষমতার লোভে ভারতীয় নেতৃবর্গ (হিন্দু মুসলমান উভয়েই) অর্ব্বাচীনের মত দেশ বিভাগ করতঃ যে পাপ অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ভারত ইউনিয়ন এবং পাকিস্থান অর্থাৎ উভয় ভাগের সাধারণ অধিবাসী যাহারা কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত নহেন তাঁহারা এই ২০।২১ বৎসর ধরিয়া তাহার মাশুল গণিতেছেন এবং যতদিন এই বিভাগ থাকিবে ততদিন গণিতে থাকিবেন। দিল্লীতে Constituent Assembly বসিয়াছে। কেবল যে কংগ্রেসের সভ্যরাই আছেন তাহা নহে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় আছেন, ডক্টর আম্বেদকর আছেন, এইরূপ ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আছেন। ভারত বৃটিশের কাছে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস পাইয়াছে পাকিস্থানও পাইয়াছে। লর্ড মাউণ্ট ব্যাটন উভয় রাজ্যের গভর্ণর জেনারেল থাকিবেন ইহাই সর্ত্ত হয়। ভারতের কর্ত্তাগণ সে সর্ত্ত প্রতিপালন করিলেন। কিন্তু জিন্না বা মস্লীমলীগ করিলেন না। জিন্না নিজে সেখানে গভর্ণর জেনারেল হইলেন।

ভারতের কিরূপ Consitutio হওয়া উচিত এটা তখন আমার মাথায় একটা খেয়ালের মত এসেছিল। মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত যত আলাপ করিয়াছি, তাহাতে এটাই পরিস্ফুট হইয়াছে যে, গ্রামকে গড়িতে হইলে তাহাকে স্বাধীন সত্তা দিতে হইবে। যে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব এসেছিল এবং যেটা প্রথম কংগ্রেস ও মুস্লীমলীগ গ্রহণ করেছিল তাতে ভারতের federated Central Government কেবল foreign relation, defence এবং communication নিয়া থাকিবেন, অন্য সব বিষয়ে প্রত্যেক প্রদেশ autonomous হবে। আর ইহাও ছিল যদি কোনও প্রদেশ ঐ fedaration এর মধ্যে ভবিষ্যতে না থাকতে চায় তবে তার option থাকবে পৃথক হবার।

আমি এই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে যা চিন্তা করেছিলাম তার ফলে বাংলায় একটা ছোট পুস্তক লিখি, তার নাম হিই সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠন। তাইতে আমি দেখাইয়া ছিলাম প্রত্যেক গ্রাম ও প্রত্যেক সহর মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হবে। গ্রাম মিলে জেলা সংস্থা গড়বে। জেলা সংস্থা প্রদেশ সংস্থা গড়বে, প্রদেশ সংস্থা কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়বে। রাজনৈতিক ক্ষমতা পূর্ণ বিকেন্দ্রীকৃত হইবে। যদি প্রয়োজন হয়, আমার সে ছোট বই আমার স্মৃতির টুকরোতে এইখানে সংযোজিত হতে পারে।

বইটা নিয়ে আমি দিল্লী যাই। সেটা ১৯৪৯ সালের মার্চ্চ মাস। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ consituent assembly-র চেয়ারম্যান। তিনি আমার পুরাতন বন্ধু, একসঙ্গে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করি। একই ঘরে লাইব্রেরীতে বসতাম। পাটনা হাইকোর্ট হলে তিনি ১৯১৬ সালে চলে যান। আবার গান্ধীজীর আন্দোলনে উভয়েই ওকালতি ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তাঁর সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করি। তিনি বাংলা ভাল জানতেন। সব পড়ে বলেন ইহাই গান্ধীজীর idea, village republic consitution-এর এইরূপই রূপ হওয়া উচিত। বিকেন্দ্রীভূত consitution-ই ভারতের মত বিশাল দেশে খুবই প্রয়োজন। প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা, সমাজ, পরিচ্ছদ, খাদ্য সবই পৃথক, সুতরাং নিজ নিজ প্রয়োজনে স্বাধীন সত্তা না থাকলে চলবে কেন?

আমি বল্লাম জহরলালের সঙ্গে আমি কখনও খুব ঘনিষ্ঠ হইনি, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও ত ভাল হয়। বিশেষ তুমি এর প্রেসিডেন্ট বা চেয়ারম্যান। জহরলালজীর সঙ্গে সময় ঠিক করে উভয়ে গেলাম। তিনি প্রথম খুব মনোযোগ দিয়ে আমার স্কীমটা শুনলেন। তিনি বাংলা জানতেন না। রাজেন্দ্রবাবু বল্লেন মহাত্মাজী ইহাই চেয়েছিলেন। তিনি ত নাই, কিন্তু সাতকড়ি বাবুর যে স্কীম ওটা গ্রামকেই কেন্দ্র করে নীচে থেকে গড়ে আসা, ওটাই মহাত্মা গান্ধীর village Republic এরই idea। তারপর তুড়ি মেরে সব উড়িয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন সমস্ত বিশ্বে Socialism (সমাজতন্ত্র) হতে বাধ্য। সমাজের রাষ্ট্রের ঐ সমাজতন্ত্র রূপই সর্ব্বসাধারণকে সমান opportunity দিতে পারে, ধনী নির্ধনের প্রভেদ দূর করতে পারে। আর সমাজতন্ত্র আনতে হলে কেন্দ্রীভূত constitution ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। কারণ সমাজতন্ত্র আনতে হলে, দেশে মানুষের personal property (ব্যক্তিগত সম্পত্তি) যত কম থাকে, ততই ভাল, তা নৈলে সম্পত্তির সমানভাবে বন্টন হবে কি করে? এইরূপে সমাজতন্ত্রের বহু গুণগান করলেন। আমি বল্লাম কমিউনিষ্ট পার্টিও ত সমাজতন্ত্র চায়। তারাও সব সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করতে চায়। তবে আপনাদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ কোথায়? নেহেরুজী বল্লেন প্রভেদ পন্থার। তারা যায় জোর করে রাষ্ট্রায়ত্ত করতে, আর আমার idea সমস্ত দেশব্যাপী নির্ব্বাচন করে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ মিলে আইনসভায় আইন করে ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত করা। ঐ নির্ব্বাচনে কেলেরই প্রতিনিধি আসবে। তারপর যাদের অধিক সংখ্যক হবে, তারাই আইন প্রণয়ন কর্ব্বেন। গরীবদের প্রতিনিধিই অধিক হবে তখন আইন করে যাদের সম্পত্তি আছে, তাহা সহজেই রাষ্ট্রায়ত্ত করা যাবে। সুতরাং গ্রামকে স্বাধীনতা দিয়ে নীচে থেকে রাষ্ট্রগঠন করলে কিছুই হবে না। তাছাড়া এখন দেশকে একসঙ্গে রাখতে হলে কেন্দ্রের হাতেই ক্ষমতা রাখতে হবে। আমি তাঁকে শেষ বলেছিলাম, আমরা হিন্দু, আমরা কর্ম্মফলে বিশ্বাস করি, জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করি, আমরা বিশ্বাস করি বৈচিত্রতাই ভগবানের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। সবারই সমান অবস্থা কখনও হতে পারে না। কারণ প্রত্যেকের প্রারব্ধ কর্ম্ম যায় ফল সে ভোগ করতে জন্মেছে সেটা বিভিন্ন। সমাজতন্ত্রের পুজারী নেহেরুজী ঠাট্টা করেছিলেন।

তারপর ডক্টর আম্বেদকরের কাছে গেলাম। দেখলাম যেন খেঁকি কুকুর। হিন্দুর নাম শুনলে খেঁকিয়ে উঠেন। তিনি আইনজ্ঞ, বিদ্বান ব্যক্তি, বল্লেন ১৯৩৫ সালে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট শাসনযন্ত্রের যে কাঠামো প্রস্তুত করেছেন সেটাই থাকবে কেবল মুখবন্ধে Republic বলা হবে, বৃটিশের সঙ্গে আর সম্পর্ক থাকবে না। ব্যানাগল রাও যিনি পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ছিলেন, তিনি constitutionটা Draft করেছিলেন, আমি তাঁর কাছে practice করেছি, আলাপ ছিল। দেখা করলাম, তিনিও ঐ একমত। কেন্দ্রীভূত সরকার ভিন্ন দেশকে একসঙ্গে রাখতে পারা যাবে না। তারপর শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করি। তিনিও সদস্য। দেখলাম, একমত, রাজনৈতিক ক্ষমতা সব কেন্দ্রীভূত হওয়াই ভাল।

এখনও আমার মনে হয় যে যদি ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশ আত্ম-নিয়ন্ত্রিত হত, তবে মানুষ, সাধারণ মানুষ অনেক বেশী সুখী হত। যাক্, যা হয়নি তা নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ কি?

ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসে শ্রীঅনিলবরণ রায় যিনি পূর্ব্বে আমাদের সহকর্ম্মী ছিলেন এবং তখন শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের একজন বড় কর্ত্তা তার কাছে ঐ বই ২।১ কপি পাঠিয়ে দিয়ে লিখলাম শ্রীঅরবিন্দ উহা পড়ে কি বলেন যেন জানায়। অনিলবরণ জানালে, শ্রীঅরবিন্দ আপনার সমাজ ও রাষ্ট্রসংগঠন পড়ে আপনাকে আশ্রমে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বল্লেন। অতএব আপনি আসুন। আমার পরম বন্ধু ছোট ভাইএর মত ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাসগুপ্ত (Dr. J. M. Das Gupta) শুনে সেও যেতে চাইলে। আমরা উভয়ে একত্রে মাদ্রাজ মেলে ৩০ই আগষ্ট ১৯৪৯ রওনা হই। তখনও পণ্ডিচেরি ফরাসী অধিকারের মধ্যে,

তাই পাশপোর্ট নিয়ে যেতে হয়। মাদ্রাজ থেকে অন্য ট্রেনে ১৩ই তারিখে প্রাতে ৯টা নাগাদ পণ্ডিচেরী পৌঁছাই। ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিন। সে দিন তিনি সকল ব্যক্তিকে দর্শন দেন। তাই প্রাতে উঠে স্নান করে তাঁর দর্শনে উত্তয়ে গেলাম। যা দেখলাম, তা বর্ণনা করাই দুরূহ। যে অরবিন্দকে ১৯০৫ থেকে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত দেখেছি যিনি ছিলেন শ্যামবর্ণ, এমন কি, 'কাল' বলা চলে, সেই অরবিন্দ ধপ্‌ ধপ্‌ করছে সাদা রং, লম্বা দাড়ী, ধুতি আর একটা চাদর পরনে। দেখে চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারি নি। তখন কোনও কথা বলার সময় নয়। ফিরে এসে অনিলকে বল্লাম এটা কি করে হল। অনিল বল্লে সেও ১৯২৬ সালে এসে শ্যামবর্ণ দেখেছিল, ক্রমশঃ ক্রমশঃ সব বদলেচে। যোগে নাকি মানুষের দেহ বদলে যায়। শুনলাম, দিনে একবার ৪।৫ চামচে ভাত ও ঐ পরিমাণ আশ্রমের ঘ্যাঁট তরকারি মাত্র আহার করেন।

পরদিন আহারের পূর্ব্বে সাক্ষাৎ। বললাম অনিলবরণ জানিয়েছিল, আপনি আমার রচিত সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠন বইটি পড়েছেন। বল্লেন, হ্যাঁ পড়েছি সাতকড়ি, ঐ বই-এ তুমি ভারতের সমাজের ও রাষ্ট্রের যে কাঠামোর বর্ণনা করেছ, যদি কখনও উহা হয়, তবেই, সত্যিকার ভারত হবে। তুমি কতগুলি ছাপিয়েছ? আমি বল্লাম এক হাজার কপি। তিনি বল্লেন, ঐ হাজার কপি বিলি কর, আরও এক হাজার ছাপাও। আমি বল্লাম, আমার ত পয়সা নাই। বল্লেন, আশ্রম থেকে টাকা নাও। এটার একটা ইংরাজী হলে ভাল হয়। টাকাও তিনি দিয়েছিলেন এবং আরও এক হাজার ছাপান হয়েছিল এবং বিলিও করা হয়েছে। ফল কিছুই হয় নাই। তখন সাধারণ মানুষ স্বাধীন হয়েচে, রাষ্ট্রের, সমাজের কি রূপ হলে মানুষ সুখী হবে সে চিন্তা করবার অবসর কোথায়?

শ্রীঅরবিন্দকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম, এবং তিনি খুব সামান্য কথায় উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এই দেশ বিভাগ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছিলেন, তাই ধরেই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যদি বাংলা ভাগ থাকবে না, এটাই ভবিষ্যৎ সত্য হয়, তবে এ ভাগ হল কেন? তিনি বল্লেন, Ordial of Bengal আমি বল্লাম "বাংলা এক হবে," কথার অর্থ কি দুইটি বাংলা থাকবে, তবে এক গভর্ণমেণ্ট বা শাসনের অধীন হবে? তার উত্তরে বল্লেন, Bengal is indivisible। আমাদের এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য কি জিজ্ঞাসা করায়, বল্লেন, To work in this line. আর কথা হয় নাই। তিনি শয়নকক্ষে গেলেন।

আমি আরও ২।১ দিন থেকে আশ্রমের সব কাজকর্ম দেখে Bus-এ করে মাদ্রাজ আসি। তারপর কলকাতা। যতীন ঐ ১৫ই আগষ্টই চলে আসে। কারণ তার স্ত্রী খুব অসুস্থ দেখে গিয়েছিল। আশ্রমে থেকে ফিরে আসবার সময় ট্রেনে যে একটা সংবাদ শুনেছিলাম সেটা এখানে বলি। মাদ্রাজে এসে মাদ্রাজ-মেলে যে সেকেণ্ড ক্লাসে আমার বার্থ রিজার্ভ করা ছিল, সেই সেকেণ্ড ক্লাসে আর একটা বার্থ পাটনা কলেজের একজন প্রফেসারের রিজার্ভ ছিল। তিনিও এলেন, তিনিও বাঙালী। আমরা একসঙ্গে কলকাতা আসি। তাঁর নাম বিস্মরণ হয়েছে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কেন অরবিন্দ আশ্রমে এসেছিলেন। তিনি যে গল্প বলেছিলেন সেটাই বলি তাঁরা তিন ভাই। তিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে T. B.তে মারা গেছেন। এখন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার T. B. হয়েছিল। দুটী ফুসফুসই আক্রান্ত হয়েছিল। তখন T, B. হলে সহজে ভাল হবার ঔষধ বাহির হয় নাই। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে বাৎসরিক একটা magazine বাহির হইত। পূর্ব্ব বৎসরের ঐ magazineএ তিনি দেখিয়াছিলেন, আশ্রমের mother এর অনৈসর্গিক ক্ষমতার কথা সেই ম্যাগাজিনে বাহির হইয়াছিল। তাই তিনি তাঁর বিশেষ পরিচিত একজন প্রফেসার যিনি রিটায়ার করে তখন আশ্রমবাসী তাঁকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতার ব্যারামের কথা জানিয়েছিলেন এবং কাতরভাবে লিখেছিলেন যদি সেই প্রফেসার motherকে বলে তাঁর ভ্রাতার আরোগ্য হবার কোনও ব্যবস্থা কত্তে পারেন, তবে তিনি চিরঋণী থাকবেন। সেই প্রফেসার mother এর নিকট সমস্ত বলে প্রার্থনা করেছিলেন। mother তাঁকে একটা ফুল দিয়ে

বলেছিলেন ঐ ফুলটা সেই রুগীকে পাঠিয়ে দিতে। যেন সেই রুগী প্রত্যহ ঐ ফুল ধুয়ে সেই জল প্রাতে খায়, এবং ফুলটা মাথার বালিশের নীচে রেখে দেয় এবং আর কোনও ঔষধ না খায়। তিনি সেই ফুলটা এই ভদ্রলোককে ঐ উপদেশ সহ পাঠিয়ে দেন। উনি ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করলে তাঁরা বল্লেন, উভয় lungs perforated হয়েছে তাঁদের ঔষধে বাঁচার সম্ভাবনা নাই বল্লেই হয়। যদি ঐ ভাবে দৈব দ্বারা উপকার হয়ত করুণ। তিনি তাই ঐ mother এর ফুলই গ্রহণ কর্ল্লেন এবং নিয়ম করে প্রতিদিন প্রাতে সেই ফুল গঙ্গাজলে ধুয়ে সেই জল খাওয়াতে লাগলেন এবং ফুলটা মাথার বালিশের নীচে রেখে দিলেন।

একমাস এইভাবে যাবার পর ডাক্তারগণ lungs পরীক্ষা করে বল্লেন উভয় lungs T. B. থেকে মুক্ত হয়েচে। সে ভায়ের স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভাল হয়ে গেল। এই আশ্চর্য্য ফল দেখে তিনি ঐ mother এর দর্শন জন্য এসে তাঁর ঐ বন্ধুর কাছে ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দও নাকি একবার প্রকাশ্যভাবে বলেছিলেন mother এর occult power আছে। তাঁর নিজের ও সব ক্ষমতা নাই। আমি সেই প্রফেসারের কথা শুনে উহা খুবই বিশ্বাস করেছিলাম। কারণ আমি হিন্দু। যোগ দ্বারা যে ক্ষমতা অর্জ্জন করা যায়, সেটা বিশ্বাস করি।

শ্রীঅরবিন্দের এই বাণী পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে কলিকাতায় এসে কাজও আরম্ভ করেছিলাম। Unity party করে যতীন ঘোষকে সভাপতি করে কলিকাতার পার্কে পার্কে বক্তৃতাও দেওয়া হচ্ছিল। বাদ সাধলে জহরলালজী। তিনি ফতোয়া জারী করলেন, যে এই ভারত ভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে তাকে গ্রেপ্তার কর। হুকুমটা আমাকে শোনান তখন পশ্চিম বাংলার চীফ্ সেক্রেটারী শ্রীসুকুমার সেন। তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করে বলেন, আপনারা একটু রেখে।ঢেকে প্রচার করুন যাহাতে নেহেরু সাহেবের কানে না যায়। কেন, জিজ্ঞাসা করায় বলেন তিনি, এই partition এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করবে তাকে গ্রেপ্তার করতে বলেছেন। আমি বল্লাম, গ্রেপ্তার করুন না তাতে কাজটা কিছু এগিয়ে যাবে। তিনি মুখ গম্ভীর করে বল্লেন, "আমি পূর্ব্ববঙ্গবাসী, আমার মা এখনও ঢাকায়। আমার মন কি চায় তা কি আপনি বুঝতে পারেন না? কি করব, চাকরী করি তাই আপনাকে বল্লাম।" কিছু করলেন না। ১৯৫০ সাল পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হল।••সারবন্দী হয়ে হিন্দু-পরিবার পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসতে লাগল। নেহেরুজী বৃথায় জিন্না সাহেবের কাছে অভিযোগের উপর অভিযোগ করলেন। বল্লভভাই প্যাটেল রুখে উঠলেন। যেমন নিজামে হয়েছিল এখানেও সেইরূপ পুলিশি action গ্রহণে তিনি প্রস্তুত হলেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ সৈন্য সমাবেশ ছিল না। পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি সাহেব পূর্ব্ববঙ্গ ঘুরে গিয়ে ভীত হয়ে পড়লেন। তখন চক্রবর্ত্তী রাজাগোপাল আচারী গভর্ণর জেনারেল। পাকিস্থান থেকে বিলাতে সংবাদ গেল। পূর্ব্ব পাকিস্থান লোপ পায়। ত্বরিতপদে লেডী মাউন্ট ব্যাটেন এসে গেলেন। নেহেরুজীকে রাজী করিয়ে লিয়াকত আলি নেহেরু চুক্তি-পত্র স্বাক্ষরিত হল বারাণসীতে। আর অত্যাচার হবে না। তখন প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোক ভারতে এসে গেছে। চারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় ভারতের পক্ষে পর্য্যবেক্ষকরূপে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়ে দেখবেন কোন অত্যাচার হচ্ছে কিনা। প্যাটেল সাহেবের প্রচেষ্টা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আমাদের দলও তখন উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। পুরী গোবর্দ্ধন মঠের শঙ্করাচার্য্যের দ্বারা আমরাও তাঁর মন্ত্র-শিষ্য প্যাটেলসাহেবের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছিলাম Raid চালাবার। কিন্তু সব বানচাল হ'য়ে গেল। লিয়াকত আলি সাম্‌লে নিয়ে পূর্ব্ববঙ্গে সৈন্য আমদানি করতে লাগলেন। তারপর রক্ষাকার্য্য মজবুত্ করে চুক্তি ভঙ্গ করে পরে আবার ভীষণ অত্যাচার সুরু হ'য়েছিল। কখনও পাকিস্থান সে চুক্তি রক্ষা করে নাই। ১৯৫১ সালে Unity পার্টি উঠিয়া গেল।

(৩)

১৯৫১ সাল। শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি মহাশয় হিন্দু মহাসভা ত্যাগ করিয়াছেন। নূতন জনসংঘ গঠন

করিতেছেন। দিল্লীতে জনসংঘদলের All India convention। হঠাৎ একদিন শ্যামাপ্রসাদবাবু আমার বাড়ীতে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি ত আর কংগ্রেসে নাই ?" আমি বলিলাম, না। যেদিন কংগ্রেস যুদ্ধ অন্তে রাজনৈতিক দলে পর্য্যবসিত হইয়াছে আমি সেইদিন হইতে উহার সদস্য নহি বটে, কিন্তু উহার সংস্রব ত্যাগ করিব কিরূপে ? বাংলার কংগ্রেসকে নিজের রক্ত দিয়া গড়িয়াছি। তিনি বলিলেন নেহেরুজী কংগ্রেসকে বিপথে লইয়া যাইতেছেন। ভারতের যে আদর্শ হওয়া উচিত নেহেরুজীর কংগ্রেস সে আদর্শের অনুগামী নহে। আমি বলিলাম, আপনার হিন্দু মহাসভা কি বর্ত্তমান ভারতের আদর্শের অনুগামী ? তিনি বলিলেন, হিন্দু মহাসভার কোনও আদর্শ নাই। আমি ভুল করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলাম। উহা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি বর্ত্তমান ভারতের আদর্শে জনসংঘ নামে নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করিতেছি। আপনি ইহাতে আসুন। আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম, আমায় ক্ষমা করিবেন, আমি কোনও রাজনৈতিক দল পছন্দ করিনা। যদি রাজনৈতিক দলেই যোগ দিব, তবে কংগ্রেস কি অপরাধ করিল ? প্রায় ২৭।২৮ বৎসর উহার মধ্য দিয়াই ত দেশের সেবা করিয়াছি। তিনি বলিলেন আমাদের জনসংঘের একটি সর্ব্বভারতীয় Convention দিল্লীতে হচ্ছে। আপনাকে যেতে হবে। আমি কিসের জন্য যাব জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন এই কংগ্রেসের constitution এ আপনার হাত ছিল, আর কিছু না হ'ক্ জনসংঘের constitutionটা আপনি করে দিন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল স্যার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ মাতুলের কন্যা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী। তাঁহার উক্ত মাতুল সন্যাস গ্রহণ করত: নিরুদ্দেশ হইলে স্যার আশুতোষই. এই মামাত ভগ্নীর বিবাহ দেন। সুতরাং বহুদিন হইতেই তাঁর সংসারের সঙ্গে আমি জড়িত। শ্যামাপ্রসাদ মহাশয়ের সঙ্গে আমার আর এক আত্মীয় এসেছিলেন। শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি তখন সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করতঃ রাজনীতিতে যোগ দিবেন। আমি যাইতে স্বীকৃত হইলাম।

দিল্লী জনতা Expressএ আমরা সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। বাংলা হইতে উক্ত convention এর অনেক ডেলিগেট চলিয়াছে। আমি ৭২ বৎসরের বৃদ্ধ। রাঘব আমার জামাতার দাদা খুব যত্ন করেই নিয়ে গেছল। কি মাস মনে নাই। জনতা Express প্রাতে দিল্লী পৌছুল। আমাকে উহারা হিন্দু মহাসভার এক প্রকাণ্ড বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। তার পাশেই শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লার এক প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী। তখন দিল্লীতে কালীবাড়ী হয়েছে। সেটাও খুব নিকটে। কালী দর্শন করতে গিয়ে দেখি সেখানে যিনি ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছেন, তিনি আমার গ্রামের লোক। মেদিনীপুর জেলায় জাড়া নামে গ্রাম আমার পিতৃভুমি ? আমাদের ঐ গ্রামে সভাপণ্ডিত ছিলেন শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য্য B.A. পাশ করে পোষ্টাল বিভাগে চাকরি গ্রহণ করেন। তাঁর শেষ চাকরিস্থল দিল্লী। ঐখানেই অবসর গ্রহণ করেন। তিনিই কালীবাড়ীর কর্ম্মকর্তা। দেখা হওয়ায় তিনিই কালীবাড়ীর যে ধর্ম্মশালা গোছ আছে সেখানেই আমার নিরামিষ খাবার ব্যবস্থা করে দেন।

শ্যামাপ্রসাদবাবু আমায় তাঁদের জনসংঘের conventionএ নিয়ে গেলেন। দেখলাম বাংলার অপেক্ষা বাংলার বাহিরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তাঁর প্রভাব অনেক বেশী। তিনি conventionএ আমার পরিচয় দিলেন "মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে যে কংগ্রেস গঠিত হয়, বাংলায় সে কংগ্রেস গঠনকারী শ্রীসাতকড়িপতি রায়। কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। উনি এখন আর কংগ্রেসের সদস্য নাই। এই কথা বলার পর আমাকে যে ovation ঐ ডেলিগেটগণ দিলেন যে হৃদ্যতাপূর্ণ। আমি বললাম আমি কংগ্রেসের সদস্য না হলেও, তার সংস্রব ছাড়িনি। আমি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত হতে চাইনা বলেই কংগ্রেসের 'সদস্যপদ ত্যাগ করেছি। যতদিন ইংরাজ বিতাড়ন চল্‌ছিল, ততদিন আমি তার মধ্যে ছিলাম।

আমি জনসংঘের কংগ্রেসেরই অনুকরণে নিয়মকানুন সব লিপিবদ্ধ করে দিই। উত্তর ভারতবাসীগণ উচ্চারণ করলেন 'জন সং' বলে।

একই মাঠে দুইটি সভা আহূত হয়েছে। নেহেরুজীর কংগ্রেসের দ্বারা আহূত জনসভা। শ্যামাপ্রসাদের জনসংঘ আহূত সভা। প্রকাণ্ড মাঠ। রামলীলা ময়দান। শ্যামাপ্রসাদ আমায় সভায় নিয়ে গেলেন। দিল্লীর জনসংঘের এক সদস্য সভাপতি। তাঁর হিন্দী আমি খুব কমই বুঝতে পারলাম। অধিকাংশই উর্দু। প্রায় ৩০।৩২ হাজার লোকের সমাগম। শুনলাম নেহেরুজীর সভায় ৫।৭ হাজারের অধিক লোক হয়নি। হঠাৎ শ্যামাপ্রসাদ আমায় বললেন আপনি প্রথম বক্তা। আমি ত অবাক হয়ে গেলাম। বললাম হিন্দীতে বক্তৃতা করা আমার অভ্যাস নাই। আমার হিন্দী প্রায় বাংলার কাছাকাছি এদেশের লোক কিছুই বুঝতে পারবেন না। ইংরাজীতে বলতে পারি, কিন্তু দেখছি পাঞ্জাবী রিফিউজিতেই ত সভা পূর্ণ। এরা কি ইংরাজী বুঝতে পারবে? সভাপতি মহাশয় বললেন, তা পারবে। কি করি, টেনে আমায় রোস্ট্রামে তুলে দিলেন। আমি ইংরাজীতে ৩০।৩২ মিনিট বলেছিলাম। রিফিউজিপূর্ণ সভা। নেহেরু সাহেবের ফতোয়া যাহা সুকুমার সেন মহাশয় আমায় জানিয়েছিলেন, সেটায় জ্বালা আমার হৃদয় মধ্যে ছিল। আমার প্রায় সমস্ত বক্তৃতাই ভারত বিভাগের উপর ছিল। ভারত বিভাগ যে কতবড় অন্যায়, ইহা ভারতের যে কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশ করেছে সেটাই আমি অল্প কথায় প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিলাম। শেষে বললাম নেহেরুজী ভারতের প্রধান মন্ত্রী ফতোয়া দিয়েছেন, যে এই ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে প্রচার করবে তাকে তখনই গ্রেপ্তার কর। আমি রাজধানীতে তাঁর নাকের সামনে বলে যাচ্ছি তিনি ভারত বিভাগ করে ভারতের যে সর্বনাশ করেছেন, ইংরাজ ২০০ বছরে তা করতে পারেনি। তিনি আমায় গ্রেপ্তার করুন, এই বলে আমি জয়হিন্দ বলে শেষ করাও আর সে কি তীব্র ovalion! বোধহয় ৫।৭ মিনিট আমার নাম ধরে জয় জয় হতে লাগল। শ্যামাপ্রসাদ আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন, "তবে যে বলছিলেন আপনি নৈব বক্তা। এখানে কি বলতে পারবেন? এই অল্প সময়ে সভা যা জমিয়ে দিলেন! সভাপতি আমায় আলিঙ্গন করে ধরলেন। আমি ত লজ্জায় মরি। আজ মনে হয় সেদিন কি সরস্বতী আমার কণ্ঠে বিরাজ করেছিলেন?

আজ শ্যামাপ্রসাদ নাই। জনসংঘ চলছে। এই রাজনৈতিক দল নেহেরুজীর তথা কংগ্রেসের পশ্চিমের অনুকরণে সমাজতন্ত্রের উপাসক নয়। আর কয়েক বৎসর পূর্বে ভুবনেশ্বর কংগ্রেসের পরে যে স্বতন্ত্রদল গঠিত হয়েছে সে দলও ঐ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে। আর যত রাজনৈতিক দল ভারতে গঠিত হয়েছে, সকলেই ঐ সমাজতন্ত্রের বুলি কপচান। এই জনসংঘ গঠন করবার পর শ্যামাপ্রসাদ বাবু সামান্য দিনই জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্মশক্তি, গঠন শক্তি দিয়ে এই রাজনৈতিক দলকে খুবই বিস্তৃত করে গিয়েছিলেন। বাংলায় ইহার প্রভাব বিশেষ হয় নাই। নেহেরুজী এই দলকে কমিউন্যাল দল বলতেন এবং তাঁর সহকর্মীরাও তাই কপচান। শ্যামাপ্রসাদের যে যোগ্যতা ছিল, যদি তিনি আজ পর্যন্ত জীবিত থাকতেন আমার মনে হয় তিনি ভারতবর্ষের রাজনীতির গতি ফিরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু ভগবানের তা অভিপ্রেত নয়, তাই চক্রান্তের মধ্যে পড়ে, কাশ্মীরের আবদুল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই উদীয়মান রাজনীতিজ্ঞকে সেখানে অযথা বন্দী করে নেহেরুজী ভারতের আর একটি মহা অনিষ্ট সাধন করেছেন। কাশ্মীরের দারুণ শীতে কারাগারের মধ্যে থেকে ভারতের একটি উজ্জ্বল রত্ন অকালে দেহত্যাগ করেছেন। দুঃখ করিয়া লাভ নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিতেছে।

পূর্বে বলিয়াছি ডিওডিনাল আলসার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হই এবং ডাক্তার বিধান বাবুর চিকিৎসায় নিরাময় হইলেও কংগ্রেসের কর্মতৎপরতা হইতে বিরত হইতে হয়। বাড়ীতে নিকর্মা হইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব বলিয়া এক বৎসর বাদে মহাত্মা গান্ধীর উপদেশানুসারে পুনরায় হাইকোর্ট বারে যোগদান করি। ১২।১৩ বৎসর বিরতির পর প্রাকটিস যেরূপ হইবার তাহাই

হয়। তবে, হাইকোর্ট ছাড়াও মেদিনীপুরে, হাওড়ায়, হুগলীতে ও আলিপুরে কিছু কিছু করিয়া মোকদ্দমা করিয়াছি। এমন কি, ধানবাদে ও আসানসোলেও গিয়াছি। কিন্তু ১৯৫০ সালে বাদ সাধিল আমার শ্রবণশক্তি। বাম কান নষ্ট হইল ডান কানেও ক্রমশঃ কম শুনিতে লাগিলাম। একদিন মিষ্টার জাষ্টিস্ সেনএর এজলাসে সওয়াল জবাব করছি। জজেদের জিজ্ঞাস্য বিষয় সব শুনতে পাচ্ছিলাম না। বুঝতে পেরে জাষ্টিস্ সেন বললেন, আপনি Hard of hearing হয়েছেন, আপনি বেঞ্চক্লার্ক যেখানে বসেন ঐখানে আসুন, কারণ আমরাও চেঁচিয়ে কথা বলতে পারব না। অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে তাঁদের আদেশ মান্য করে সে আপীলের সওয়াল জবাব শেষ করে এলাম। সেইদিনই স্থির করলাম্ এভাবে কাজ করা যাবে না।

ছেলেরা সকলেই কর্মক্ষম হয়েছে। তিন ছেলের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কলকাতাতেই কণ্ট্রাক্টারের ব্যবসা করে, দ্বিতীয় যার বাম হাত বোমা করতে গিয়ে নষ্ট করেছিল, সে তখন সুন্দরবনের জমি চাষ-আবাদ করে এবং বৌমাকে নিয়ে সেখানেই থাকে। কনিষ্ঠ মেকানিক্যাল্ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে প্রথম বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল্ কোম্পানিতে এবং পরে ইছাপুর গভর্ণমেণ্ট অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে চাকরী করছিল। পরে যুদ্ধের সময় গৌহাটীতে স্যালভেজ অফিসার হয়ে যায়। সেখানে আমি কমেণ্ডার একদিন ডিনারের সময় জোর করে মদ খাওয়াতে চাইলে, সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দিয়ে কলিকাতায় সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে। সুতরাং সংসারের ভার তাদের উপর দিয়ে প্রাক্টিস্ ছাড়া যায়। কন্যাদের বিবাহ হয়ে গেছে। আমার জামাতা বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায় তখন হাইকোর্টের ভাল উকিল হয়েছে। যে সকল আপীল দায়ের ছিল সেগুলির ভার তার উপর দিয়ে কোর্টে আর যাওয়া বন্ধ করলাম। অবশ্য লাইব্রেরীতে যেতাম। এখনও এই বৃদ্ধ বয়সেও কখনও কখনও লাইব্রেরীতে যাই।

যখন নিজের পারিবারিক কথা লিখিতেছি তখন ইহাই লিখিয়া শেষ করি। ১৯৫১ সালে আমার দ্বিতীয় জামাতা হাইকোর্টের উকিল বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। তার প্রথমা কন্যার বিবাহ আমিই দিই। এমন কি বীরেশ্বর বা তার কাকা হাইকোর্টের উকিল শ্রীপ্রবোধ চট্টোপাধ্যায় উহারা কেহ আশীর্ব্বাদের পূর্ব্বে পাত্র দেখে নাই। আশীর্ব্বাদের দিন গিয়া পাত্র দেখিল এবং বিবাহ হইল। বীরেশ্বরের মৃত্যুর পর তাহার অন্য দুই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। উহার পুত্র সন্তান হয় নাই। আমার বিধবা কন্যা নিজ বাড়ীর নীচের তলা ভাড়া দিয়া দোতলায় নিজে থাকে। উহার দ্বিতীয়া কন্যা M.A. পাশ করিবার সময় তাহার প্রাইভেট টিউটারকে অসবর্ণ বিবাহ রেজেষ্ট্রী করিয়া করে। তাহার পিতার ইহাতে ভয়ানক অসম্মতি ছিল। পিতামাতার অসম্মতিতে বিবাহ হওয়ায়, আমি তাহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছি। তৃতীয়া কন্যার বিবাহ আমি দিই, প্রথমা কন্যার দেবরের সহিত। সে সম্বন্ধ তাহার পিতা জীবিতকালেই করিয়াছিল।

এই যে অসবর্ণ বিবাহ ইহা হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। তবে শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের বিধান আছে অর্থাৎ বর্ণধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ বর্ণের পুরুষ ও নিকৃষ্ট বর্ণের স্ত্রীলোকের বিবাহের বিধান আছে। সুতরাং সেরূপ বিবাহ অভিভাবকদের সম্মতি থাকিলে, শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে অগ্নিসাক্ষী করিয়া বিবাহ হওয়ার কোনও বাধা নাই। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ স্থলে উচ্চবর্ণের স্ত্রীলোক এবং নিম্নবর্ণের পুরুষের বিবাহ হইতেছে। আমি ২।১টী অসবর্ণ বিবাহ দেখিয়াছি যাহাতে উচ্চবর্ণের পুরুষ এবং নিম্নবর্ণের স্ত্রীলোক অভিভাবকদের সম্মতি মতে অর্থাৎ অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক স্থির কৃত হইয়া হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ হইয়াছে। রেজেষ্ট্রীশনের প্রয়োজন হয় নাই। যদি সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিতে হয়, তবে অনুলোম বিবাহ—অভিভাবকদের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া হইতে থাকিলে, তবেই উহা সহজে সমাজে গৃহীত হইবে। রেজেষ্ট্রী করা প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ সমাজে গৃহীত হওয়া সম্ভব নহে।

বর্ণ বর্তমানে বংশগত হইয়া গিয়াছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ।" গুণ ও কর্মদ্বারা বর্ণ স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। তথাপি যতদিন তাহা হিন্দুসমাজে আনিতে না পারা যায়, ততদিন বংশগত বর্ণই মানিয়া চলা উচিত। ইহাই আমার অভিমত।

আমার চতুর্থ কন্যার এক কন্যা এবং পঞ্চম কন্যার এক কন্যা ঐরূপ রেজেষ্ট্রী করিয়া প্রতিলোম বিবাহ করিয়াছে। ইহাও পিতামাতার অসম্মতি সত্ত্বেও। কালের প্রভাবে যাহা হইতেছে তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ইহা যদি সুফলপ্রদ না হয়, তবে খুবই দুঃখের কারণ হইবে।

আমার সংসারে আর একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আমার যমজ কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দিয়াছিলাম, তাহার একটি অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে। তাহার ১৯৪৯ সালে বিবাহ হয়, ১৯৫৮ সালে বিধবা হইয়াছে। একটী মাত্র কন্যা। এরূপ ঘটনা জগতে অহঃরহঃ হইতেছে। সুতরাং ইহা সহ্য করিয়া যাওয়াই কর্তব্য। কিন্তু আমার স্ত্রীর মৃত্যুর অন্যতম কারণ এই দুই জামাতার মৃত্যু। বিশেষ করিয়া শেষ যমজ এক কন্যার অল্প বয়সে বৈধব্য হওয়ায়, তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন। তারপর ৪।৫ বৎসর রোগভোগের পর ১৯৬৪ সালে ২৪শে মে (আমার জন্ম তারিখে) ৬৩ বৎসর বিবাহিত জীবনযাপনের পর দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার যে এতগুলি পুত্রস্থানীয় ব্যক্তি ছিল তাহা জানিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ কলিকাতার সমস্ত ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার অব্যবহিত পরেই, কয়েকটি পত্র এলাহাবাদ, বারাণসী, গয়া ও পুরীধাম হইতে আসে। তাহাতে লিখিত ছিল, তাহারা সত্য সত্যই মাতৃহীন হইল। তিনি আমার সঙ্গে এই কয়স্থানে কিছুদিন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সব স্থানে যেসব কিশোর যুবককে পুত্রের স্থান দিয়াছিলেন, তাঁহারা পরিণত বয়সেও তাহা স্মরণ রাখিয়াছে দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য না হইয়া পারি নাই। আমার বয়স বর্তমানে ৮৯ বৎসর। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৫৮ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছে এবং জ্যেষ্ঠ কিশোরীপতি রায় কংগ্রেস M. L. A. থাকিতে থাকিতে ৭১ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯২১ থেকে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত একনিষ্ঠভাবে দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। বহু ঝড়ঝাপ্টা মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার সমবয়সী তাঁহার বিধবা পত্নী আজও জীবিত। প্রায় শয্যাশায়ী। আমার ইহাই ইতিহাস।

৫

১৯৫২ সাল। ভারতের কেন্দ্রীভূত Conslitulion গৃহীত হইয়াছে। ২৬শে জানুয়ারী ভারত রিপাবলিক অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র ভারত প্রচারিত হইল। ১৯৫৩ সালে ভারতের সর্বসাধারণের ভোটের অধিকারের দ্বারা নির্ব্বাচন-পর্ব্ব সমাধা হয়। চক্রবর্তী রাজা গোপালআচারী গভর্ণর জেনারেলের পদ পরিত্যাগ করে পশ্চিম বাংলার গভর্ণর হইলেন। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হইলেন। এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেস সব অঙ্গ রাজ্যে এবং ভারত ইউনিয়নের সরকার গঠন করেন। নেহেরুজী মানেই কংগ্রেস। সুতরাং তিনি প্রধান মন্ত্রী, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

Conslitulion এ নেহেরুজী ভারত ইউনিয়নের প্রত্যেক সাবালক অধিবাসীকে, তিনি পুরুষ বা স্ত্রীলোক হউন নির্ব্বাচনপর্ব্বে ভোটাধিকার দিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতের সমস্ত সাবালক অধিবাসী নিজের নিজের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু গোল বাধিল তাহাদের লইয়া যাহারা লিখতে পড়তে জানে না। আবার তাদের সংখ্যা শতকরা ৯০.৯৫ জন। সুতরাং ভোটপত্রে নাম ত পড়তে পারবে না। অতএব স্থির হইল প্রত্যেক প্রার্থীর একটি করিয়া প্রতীক্ দেওয়া হউক। তাহাই হইল কাহারও হাতী, কাহারও ঘোড়া এইরূপ। এই প্রথম নির্ব্বাচনপর্ব্বে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলি।

আমার গ্রামে একটা নির্ব্বাচন সেণ্টার হয়েছে আমাদের গ্রামের স্কুল বাড়ীতে। ১০।১২ জন মুচির মেয়ে ভোট

দিয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কাকে ভোট দিলি গো। বললে, আমরা সব ধানশীষে ভোট দিলাম। অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের যে প্রতীক ধান গাছ আঁকা আছে যে বাক্স সেই বাক্সতে ভোটের কাগজ ফেলেছে। আমি বললাম, জোড়া বলদে না দিয়ে ধান শীষে দিলি কেন? তারা বললে গতকাল রাতে দাদাঠাকুর (একজন গ্রামের ব্রাহ্মণ কমিউনিষ্ট) যে বললে আজ ধান শীষে ভোট দিলে, আসছে কাল জনাকি পাঁচ বিঘা করে জমি মিলবেক। এই ভোট-যুদ্ধে মানুষকে কত জঘন্য কাজ করতে হয় তারই উদাহরণ। দ্বিতীয়বার যখন নির্বাচন হয়, তখন আমি মেদিনীপুর সহরে ছিলাম। আমার বাড়ী মেরামত করাইতেছিলাম। একদিন বৈকালে মিস্ত্রী কুলী প্রভৃতি বলিল, পরের দিন তারা কাজে আসিবে না। আমি বলিলাম, কেন আসিবে না? তাহারা বলিল কাল ভোট হবে বাবু। আমি বললাম ভোট দিয়ে চলে এস। মিস্ত্রী বললে "রানীমা বলেছেন একটা করে ভোট দেওয়াতে পারলে ৫৲ টাকা করে দিবেন। যদি দশটা ভোট সংগ্রহ দিতে দেওয়াতে পারি, ৫০৲ টাকা রোজগার করব। আমি জানি এরূপ ভোট খরিদ হয়। তবে, নাড়াজোলের কুমারের স্ত্রী শ্রীমতী অপ্রমলা খাঁ এরূপ করিয়াছেন কিনা জানি না। শুনিতে পাই এক একটা নির্বাচনে এক একটা রাজনৈতিক দল লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। ইহাতেই বুঝিতে হয়, যে, সমস্ত রাজনৈতিক দলের নীতিবোধ কোথায় যাইতেছে এবং সমাজকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। ইহাই যদি দলের নীতিবোধের নমুনা হয়, তবে তাহারা গদীতে বসিয়া দেশবাসীকে কি নীতি শিখাইবে। আমাদের দেশবন্ধু নেতৃত্বে নির্বাচনের কথা আজ মনে পড়ে। বড়বাজারে শ্রী এস, আর, দাস (সতীশরঞ্জন দাস) এর বিরুদ্ধে আমার নির্বাচনের কথা। ২৫০৲ টাকা ডিপোজিট করিতে হয়, স্বেচ্ছাসেবকদের নির্বাচনের দিন জল খাওয়া-ইতে খরচ পড়ে ঐরূপ ২৫০৲ আর নির্বাচনের জন্য wall placard ছাপাতে খরচ পড়ে ৫০৲। বীরেন শাসমল ছটা কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়ে ছিল। কাঁথি তমলুক মেদিনীপুর জেলায়, ডায়মণ্ডহারবার ২৪পরগণা জেলায়। ডিপোজিট বাদে তার সর্বশুদ্ধ ৩৫০৲ খরচ পড়েছিল। নেহরু সাহেব ভারতের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ দলের শীর্ষস্থানে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৪ সালের মে মাস পর্য্যন্ত উপবিষ্ট ছিলেন। এই ১৭ বৎসরে ঐ দল যে নৈতিক বিষয়ে কত নীচে নেমে গেছল, তাকি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন?

আমাকে একবার সম্ভব ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে মেদিনীপুরের তদানীন্তন কংগ্রেসকর্ম্মীরা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন ঐ কমিটীর ঐ সভায় তিন মাসের খরচের হিসাব বিবেচিত হইতেছিল। যাতায়াত খরচ খাতায় দেখলাম তিন মাসে ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা খরচ। আমার খুবই আশ্চর্য্যবোধ হইল। আমি প্রশ্ন করিলাম কংগ্রেসের টাকায় রাগা খরচ কাহাদের দেওয়া হয়। শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় সভাপতি। তিনি বলিলেন, কংগ্রেসের কাজে যাদের যাতায়াত করিতে হয়। প্রধানত: সভাপতি ও সম্পাদক। আমি বলিলাম, বিল করিয়া টাকা গৃহীত হয় এবং সে বিল পাস করে কে? উত্তর পাইলাম লিখিত বিল সব সময়ে হয় না আর পাশ করে হয় সম্পাদক নয় সভাপতি। তিন মাসে সম্পাদক ও সভাপতি কংগ্রেসের কাজে এত যাতায়াত করিলেন যে, মাসে এক হাজার টাকার বেশী খরচ হইল। আমার বেশ মনে আছে. শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন, এ কি আপনাদের সময়ের কংগ্রেস? আমাদের এখন ট্যাক্সী ছাড়া চলাই যায় না। আমার মনে পড়িল দেশবন্ধু একদিন কিরণকে ও আমাকে হাওড়ায় সুশীল বাঁড়ুয্যে হাওড়ার সেক্রেটারী আর শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে যে বিবাদ হয়েছিল সেটা মিটমাট করে দিয়ে আসতে বলেন। কিরণ দেশবন্ধুর বাড়ী থেকে বেরিয়েই বললে সাতকড়ি দা একটা ট্যাক্সি করুন। শিবপুর শরৎবাবুর নিকট যেতে হবে। আমি তখন বি, বি, সি, সি, এর সেক্রেটারী। আমি বললাম, ভাই চল ট্রামে চলে যাই. ট্যাক্সির টাকা কংগ্রেসের খরচ করা উচিত নয়। তবে তুমি যদি ট্যাক্সি ভাড়া দাও ট্যাক্সি করতে পারি। কিরণ বল্লে, সেই ভাড়া দেবে। তখন ট্যাক্সি করেছিলাম। আজকাল সভাপতি ও সেক্রেটারী ট্যাক্সি ও এ্যারোপ্লেন ছাড়া চলেন না। বল্লাম

এটা কংগ্রেসের পরিবর্ত্তন, না কংগ্রেস কর্ত্তাদের পরিবর্ত্তন। টাকাটা যাতায়াতে খরচ না করে সৎকাজে খরচ করলে ভাল হত। এই যখন কর্তৃপক্ষের মনের অবস্থা, সে সংস্থায় আমার স্থান নাই। ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছিলাম। এই বিলাসিতার প্রতি আসক্তিই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে ক্রমশঃ এত নীচে নামিয়ে দিয়েছে। ত্যাগের সেবার যে আদর্শ কংগ্রেসকে বড় করেছিল, ভোগের ও কর্তৃত্বের আদর্শ তাকে নীচে নামিয়েছে। আমরা যখন কংগ্রেসের কাজ করিয়াছি, তখন কংগ্রেসকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছিলাম। আমরা কর্ম্মীগণ সকলেই ত্যাগের আদর্শ, সেবার আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হয়েছি। দেশবাসী বুঝেছে এরা মহৎ, এরা সেবক, সুতরাং এরা দেশ সবাপন্ন, অতএব এদের মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে। তাই মহাত্মা গান্ধী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেখানে গেছেন সেখানেই মানুষের মস্তক তাঁদের চরণে নত হয়েছে। আর বর্ত্তমান কংগ্রেসের কর্ম্মীগণের ব্যবহার দেশবাসীর নিকট পরিস্ফুট হয়েছে এই বলে যে এরা ভোগের জন্য কর্তৃত্বের জন্য এই প্রতিষ্ঠানে এসেছেন। সুতরাং কিসের জন্য এদের চরণে প্রণত হব বরং এরা আমাদের চেয়েও হীন, কারণ এরা কংগ্রেসের মত একটা প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহার করছেন। আমার মনে হয় এই জিনিষটা বুঝাবারও এদের শক্তি নাই। যারা নিজের কাজ গোছাতে চায় তারা এদের সামনে খোসামুদী করে দেখায় যেন এদের খুব শ্রদ্ধা করে, মনে মনে এদের ঘৃণা করে, এমন কি, নিজেদের চেয়েও এদের নীচ বলে মনে করে। একথা ধ্রুব সত্য।

কংগ্রেসকর্ম্মীদের এই মনের অবস্থা এসেছে নেহেরুজীর দৃষ্টান্ত থেকে। নেহেরুজী এই প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার এই আচরণ পছন্দ করেন নাই তাঁহারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্য দল করেছেন বা রাজনৈতিক কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন। নেহেরুজীর উদ্দেশ্য যে আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহা বলিতে চাহিতেছি না। তাঁর উদ্দেশ্য আরও গভীর। তিনি সমস্ত দেশটাকে ইউরোপের সমাজতন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন এবং তাহা সর্ব্বময় কর্ত্তা ছাড়া কেহ পারে না। কিন্তু তাঁর খোসামুদের দল যাঁরা তাঁকে ঘিরে ছিল, এবং এখনও রহিয়া গিয়াছে তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য আত্মপ্রতিষ্ঠা।

ক্রমশঃ

নাম মাহাত্ম্য

বিমলাংশুপ্রকাশ রায়

দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর ইংরেজ রাজত্বে যে-সব রাস্তার নাম ইংরেজদের নামে ছিল বা অন্য নাম ছিল, সেই সব অনেক রাস্তার নাম বদলে দেশ-প্রেমিকদের নামে হয়েছে। যেমন হ্যারিসন রোড হলো মহাত্মা গান্ধী রোড। এখানে এটুকু বলা দরকার যে, এই রাস্তাটা যখন প্রথম নির্মিত হয় তখন এর নাম দেওয়া হয়েছিল সেন্ট্রাল রোড, তারপর হ্যারিসন সাহেবের নামে হয়। যাক সেকথা। ক্লাইভ স্ট্রীট হলো নেতাজী সুভাষ রোড, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হলো বিধান সরণী, রসা রোডের অর্দ্ধেক হলো আশুতোষ মুখার্জি রোড ও অপরার্দ্ধ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড। বাপ বেটায় আধাআধি করে নিয়েছেন। লোয়ার সার্কুলার রোড হলো আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, ও আপার সার্কুলার রোড হলো আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। দুই জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী ঘিরে রয়েছেন সর্বচক্রাকারে কলকাতার পূর্ব দিক। চিৎপুর রোড হলো রবীন্দ্র সরণী।

উত্তর কলিকাতার একটা রাস্তার নাম ছিল করিয়াপুকুর লেন, সেটাকে করা হলো শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট। শিবদাস ছিলেন মোহনবাগান ফুটবল ক্লাবের বিখ্যাত ফরওয়ার্ড খেলোয়াড়। তাঁরই আমলে এই বাঙালী দল সেকালের দুর্দান্ত মিলিটারি ও সাহেব দলদের হারিয়ে প্রথম আই, এফ, এ, শিল্ড প্রাপ্ত হয় ১৯১১ সালে। সেই দলে একজন ব্যাক শুধু বুট পরে খেলতেন, অন্যেরা সবাই খালি পায়ে। শিবদাস যখন বল পেতেন তখন বল নিয়ে এমন ছুট দিতেন যে বুট পরা প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার নাগাল আর পেত না, শিবদাস নক্ষত্রবেগে ছুটে চলেছেন, পাশে পাশে ছুটছেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়, যিনি মাঝে মাঝে বলছেন "দিবে দিবে।" অর্থাৎ মাঝে মাঝে যেন তার কাছে বলটাকে 'পাস' করে দেওয়া হয়। শিবদাস কখনো 'পাস' কে আবার ফিরে পান, তখন যে চরম ছুটটা দেন বল নি তা একেবারে 'গোলে' সুট্ করেই শুয়ে পড়েন। ব্য বাজীমাৎ।

আচ্ছা, এইবার একটা করুণ কাহিনী? ভবানীপু একটা রাস্তার নাম হয়েছে নফরচন্দ্র কুণ্ডু লেন, আ এর অন্য নাম ছিল। এই নামকরণের কারণ কাহিনীটা এই: কলকাতার রাস্তার 'ম্যানহোল' দিয়ে নি নেমে গিয়ে ড্রেন সাফ করতে হয় মাঝে মাঝে। ধাঙড়ে ছেলেরাই এই ভাবে নামে। কিন্তু মাঝে মাঝে রাস্তা নিচেকার ঐ ড্রেণে দূষিত গ্যাস্ জমা হয়। এইরক গ্যাস্ জমা হয়েছিল একবার ঐ রাস্তায়। তা আ থাকতে বোঝা যায় নি। দুটি ধাঙড় ছেলে ভিতরে নে গেছে ড্রেণ সাফ্ করতে, কিন্তু আর তাদের সাড়া পাওয় যাচ্ছে না? উপরের লোকেরা আতংকিত, কিন্তু নে গিয়ে ছেলে দুটিকে রক্ষা করতে এগুচ্ছে না কেউ, এম সময় এই নফরচন্দ্র কুণ্ডু সটান নেমে গেলেন ছেলেদের কাছে এবং তাদের তুলে আনতে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু হায়? দূষিত গ্যাস তাঁকেও আক্রমণ করলো। ফ তিনজনেরই জীবন অবসান হলো! এই যে পরের জন্যে নিজজীবন দান করলেন, এই মহৎ কাজের জন্যেই কলকাতার কর্পোরেশন তাঁর নামে ঐ রাস্তার নাম বদলে দিলেন, নফরচন্দ্র কুণ্ডু লেন। নফরচন্দ্র ছিলেন একটা আফিসের কেরানী। তাঁর নাম অমর হয়ে রইল।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ করা হয়েছে। এই রাস্তাটার দৈর্ঘ আগে খুব কম ছিল। তখন এর নাম ছিল হ্যালিডে স্ট্রীট। দুবার নাম বদল হলো।

কিছুকাল আগে মধ্য কলিকাতায় সুকিয়া স্ট্রীট নামে এক বিখ্যাত রাস্তা ছিল। এই রাস্তায় 'শশিবর্ণা'

[i]মাঙ্কিত বাড়ীতে প্রথম বিধবা বিবাহ দেন বিদ্যাসাগর [ম]হাশয়। রাস্তাটা অবিশ্যি এখনও আছে কিন্তু সুকিয়া [না]মটা অবলুপ্ত! তার খানিকটা অংশ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট [না]ম আগে, পরে বাকি অংশটার নাম হয় মহেন্দ্র শ্রীমানি [রো]ড। তখনই সুকিয়া নাম একেবারে লোপ পেয়ে যায়। [স]ময় অনেকেই আপত্তি জানিয়েছিলেন, কারণ সুকিয়া [ছি]লেন একজন দানবীর পুরুষ। তিনি ছিলেন একজন [বড়ো] মহা ধনী সদাগর। তিনি যত অর্থ উপার্জন [ক]রেছেন এদেশে, তার এদেশেই প্রায় সমস্তই দান করে [গে]ছেন। এই নাম বদলের সময় অনেকেই কাগজে [প্র]তিবাদ করেছিলেন এমনকি আমাদের জাতীয় অধ্যাপক [ডক্ট]র সুনীতি চ্যাটার্জি মহাশয়ও সুকিয়া সাহেবের অনেক [সু]খ্যাতি বর্ণনা করে তাঁর নামের রাস্তার নামবদলের [তী]ব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু হায়! পৌরপিতাগণ [সে]ই অগ্রাহ্য ক'রে সুকিয়া নামের অবসান ঘটালেন!

নিচে আরও কয়েকটা নাম বদলের তালিকা দেওয়া [হ]ল:

আগেকার নাম	এখনকার নাম
শ্যামবাজার ষ্ট্রীট	ভূপেন বসু অ্যাভিনিউ
ল্যান্সডাউন রোড	শরৎ বসু রোড
মিশন্ রো	রাজেন্দ্র মুখার্জি রোড
কর্পোরেশন ষ্ট্রীট	সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ষ্ট্রীট
বাদুড়বাগান রো	রামানন্দ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট	রফী আহাম্মদ কিদোয়াই রোড
ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট	নির্ম্মলচন্দ্র ষ্ট্রীট
বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট	বিপ্লবী পুলিন দাস ষ্ট্রীট
মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট	কেশব সেন ষ্ট্রীট
মির্জাপুর ষ্ট্রীট	সূর্য সেন ষ্ট্রীট
বেলগাছিয়া রোড	আর, জি, কর রোড
ক্যানিং ষ্ট্রীট	বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
গ্রে ষ্ট্রীট (অংশ)	অরবিন্দ সরণী
গ্রে ষ্ট্রীট (অংশ)	মহার্ষি দেবেন্দ্রনাথ রোড
মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট (অংশ)	রাজেন্দ্র দেব রোড
মানিকতলা ষ্ট্রীট (পূর্ব-অংশ)	শিশির ভাদুড়ী পথ
মানিকতলা ষ্ট্রীট (পশ্চিম অংশ)	রায় দুলাল সরকার ষ্ট্রীট।

এর মধ্যে কতক গুলি নামবদল স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই হয়েছে। কিন্তু থিয়েটার রোডকে বদলে নাম হলো সেক্সপিয়ার সরণী। এখানে গুণীর সমাদর। "বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে" স্বদেশ বিদেশ বিচার চলে না এ ক্ষেত্রে।

যাই হোক, এখন একটা কথা বলি। এই যে, মহৎ ব্যক্তিদের নামে এতকাল এত রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে কলকাতার সহরে, তাঁদের সকলের জীবন বৃত্তান্ত কি আমরা জানি? আমরা নিশ্চয়ই অনেক ভুলেছি এবং ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা আরও ভুলবে। তখন তারা ইচ্ছামত আবার নাম বদলাবে। কারণ যাঁদের জীবনের কথা তাদের জানা নেই তাঁদের নামে রাস্তা রাখারও দরকার-বোধ করবে না। তাই বর্তমানে কর্পোরেশনের উচিত কলকাতার সব রাস্তার (লেন, ষ্ট্রীট, রোড, সরণী সবই) নামাঙ্কিত জনের ছোট ছোট জীবন-বৃত্তান্ত লিখে রাখা তাঁদের আফিসে বা লাইব্রেরীতে এবং সম্ভব হলে তা মুদ্রিত ক'রে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। এ বৃহৎ কাজের ভার একজনের দ্বারা বহন করা সম্ভব নয়, তাই নিজ নিজ ওয়ার্ডের পৌর পিতাগণের উচিত হবে সেই সেই ওয়ার্ডের রাস্তার নামাঙ্কিত জনের জীবন কথা সংগ্রহ করা। এবং তাঁদের পক্ষে তা সহজ হবে সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের দৃষ্টি এতদ্বারা আকর্ষণ করছি।

(১২৮ পাতার পর)

তাণ্ডারে সম্ভব ও অসম্ভবের প্রকার বিচার করিয়া তাহার বৈচিত্রের পূর্ণ উপলব্ধি কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না।

চন্দ্রলোকের অভিযান কত শত নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ তাহা বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ অর্গলবদ্ধ কক্ষদ্বার এক এক করিয়া খুলিয়া মানুষ কি পাইবে তাহা সে এখনও নিজেই জানে না। শুধু রহিয়াছে নূতন আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা।

আদর্শে ভেজাল দেওয়া

আদর্শবাদীদিগের মতে সকলের নিজ নিজ আদর্শ পবিত্র, সত্য ও অভ্রান্ত। কেহ সেই সকল আদর্শে কাট ছাঁট করিয়া নূতনত্ব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিলে তাহা পরিবর্তন বিরোধীদিগের মতে অমার্জ্জনীয় পাপ। পূর্ব্বে, আদর্শবাদ অধিকাংশ স্থলে শুধু ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই ব্যক্ত হইত। ঈশ্বর নানা ভাবে নানা মহাপুরুষের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন সম্ভব করিতেন বলিয়া বলিয়া মানুষ বিশ্বাস করিত। এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের বাণী ঈশ্বরের বাণী বলিয়াই গ্রাহ্য হইত। কিন্তু ধর্ম্মমতে নানা প্রকার বৈপরীত্য থাকতে সেইরূপ ধারণা নিরপেক্ষ বিচারে অলীক মনে হইত। বর্ত্তমান রাষ্ট্রক্ষেত্রের আদর্শবাদ মানবজীবনের নানা দিকে বিস্তৃত হইবার চেষ্টা করে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ, অর্থনীতি ও কৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে সেই সকল আদর্শ প্রতিফলিত হইতেছে এই অজুহাতে নানাপ্রকার সুবুদ্ধি, সুনীতি ও সৌন্দর্য্য বিরুদ্ধ "সৃষ্টি" কার্য্যের সহিত আমাদিগের পরিচয় হয় যাহার অর্থ অথবা মূল্য জোর করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। আদর্শবাদের বাজারে এখন যে সকল বৃহৎ বৃহৎ সওদাগরি কারবারী রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মার্কিণ, রুশিয়ান ও চীনাদিগের নামই সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া থাকে। মার্কিণ ধরণের জীবনযাত্রা একটা মহামূল্যবান মানব প্রগতির প্রতীক বলিয়া মার্কিণ প্রচারকগণ বলিয়া থাকেন। কিন্তু মার্কিণ জীবনযাত্রার ধরণধারণ সিনেমায় দেখিয়া অনেকেরই খুব উপভোগ্য মনে হয় না। রুশিয়ান জীবনাদর্শ অথবা চীনা মতবাদ বাস্তবে কি রূপ ধারণ করে তাহা পরিষ্কার বোঝা বাহিরের লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। ইহার কারণ উভয় কম্যুনিষ্ট জাতিই আদর্শের ক্ষেত্রে মন্ত্রবাদ ও অব্যক্ত স্বরূপবাদে বিশ্বাসী। যাহা বলা হয় মন্ত্রের মত তাহার অর্থ কি তাহা পূজারীগণ ব্যতীত কেহ বুঝে না এবং যাহা বোঝান হয় তাহার সত্যরূপ অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। এই জন্য মার্কস, লেনিন স্টালীন অথবা মাওৎ সেটুং কি বলিয়াছেন তাহার টীকার দৈর্ঘ্য মূল বাণীর তুলনায় অসীম আকার ধারণ করে। কিছুদিন পূর্ব্বে রুশীয় জ্ঞানীদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমেরিকানদিগের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে আমেরিকান আদর্শবাদ বিশ্বমানবের আত্মার ক্ষতির কারণ হইতেছে; কারণ আমেরিকার আদর্শগুলি পবিত্র ও মানব উন্নতিকারক নহে। আমাদিগের মতে সকল জাতির লোকের আদর্শবাদই নিজ নিজ জাতির সুবিধার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। এবং সেই সুবিধা জাতির সকল লোকের সুবিধা নহে। শুধু নেতা ও দলপতিদিগের সুবিধা। আদর্শবাদের যে সকল আধুনিক সংস্করণ দেখা যাইতেছে সেগুলির প্রত্যেকটিই এইরূপ সুবিধাবাদের অভিব্যক্তি। এবং সুবিধাবাদ সর্ব্বদাই আসল কথা গোপন রাখিয়া ছদ্মবেশ ধরিয়া বাজারে ঘোরাফেরা করে বলিয়া তাহার প্রকৃত পরিচয় সহজে পাওয়া যায় না।

হাওড়া জেলার মাটির ঘর

তারা সাঁতরা

পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার পরিধি খুব বিস্তৃত নয়। এই ক্ষুদ্র জেলাটির শিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে খুব বেশী আলোচনা হয়নি; বরং উপেক্ষার দৃষ্টিতেই বেশী করে দেখা হ'য়েছে। অথচ বঙ্গ সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্যের বা প্রবাহের কথা চিন্তা করতে গেলে, হাওড়া জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা চলে না। কেননা প্রায় সব জেলারই কিছু না কিছু আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংমিশ্রণেই বঙ্গ সংস্কৃতির সমগ্রতা ও বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

দেশের সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বুঝতে গেলেই প্রয়োজন হয় আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ অনুশীলন এবং এই অনুশীলনের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়, দেশের সাংস্কৃতিক রূপের ঐক্য। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত 'হাওড়া জেলার লোক-উৎসব' গবেষণা গ্রন্থে বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক এই জেলার গ্রামীণ সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধারার অস্তিত্ব সম্পর্কে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হ'য়েছিলেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হাওড়া জেলার মাটির ঘর পর্যায়ে আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই মূল উদ্দেশ্য।

হাওড়া জেলার সামান্য মাটির ঘরের মধ্যে আঞ্চলিক সংস্কৃতির কী উল্লেখযোগ্য উপাদান থাকতে পারে এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এ প্রশ্নের আলোচনা করার পূর্ব্বে একটি বিষয়ে আগ্রহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এবং তা হোল বর্ত্তমানে পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলির দ্রুত রূপান্তর হওয়া সম্পর্কে। আগেকার মত গ্রামীণ সংস্কৃতি বর্ত্তমানে স্থিতিশীল থাকছে না এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গ্রাম্য সমাজের গড়ন এবং সেই সঙ্গে মানুষের আচার-অনুষ্ঠান ও ধ্যানধারণার পরিবর্ত্তন ঘটছে। ভবিষ্যতে আমাদের সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন ইতিহাস-রচনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, হাওড়া জেলায় আমরা বিগত কয়েক দশকের মধ্যে যে কয়টা মাটির বাড়ি দেখেছি, বর্ত্তমানে তার অস্তিত্ব বহু স্থানে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিককালে কয়েকবার ভয়াবহ বন্যার ফলে এইসব মাটির ঘর বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে মাটির ঘরের স্থানে এসেছে পাঁচ ও দশ ইঞ্চি পরিমিত ইটের দেওয়ালের বাড়ী এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় তা নির্ম্মিত হয়েছে। অথচ আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে নির্ম্মিত এই সব মাটির দেওয়ালের এক একটি বাড়ীর পিছনে ঘরামী বা মিস্ত্রিরা যে অধ্যবসায় ও কর্ম্মনিপুণতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বর্ত্তমানে এই জেলার মাটির বাড়ীগুলি, যা এখনও অবশিষ্ট আছে তা বহুক্ষেত্রেই এখন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়ে চলেছে। সুতরাং এই পরিপ্রেক্ষিতে, হাওড়া জেলার মাটির ঘর শীর্ষক আলোচনা, হাওড়া জেলার স্থাপত্যকীর্ত্তির অংশ-বিশেষ হিসেবে গণ্য হবার দাবী রাখে।

এই নদীবহুল দেশে পলিমাটির প্রাচুর্য্য যে শুধু তার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার নানা কাজে লেগেছে, তা নয়; বাংলার শিল্প ও স্থাপত্যকলার অন্যতম উপকরণ হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে। পাথর দুর্লভ বলে নিম্ন-বঙ্গের অন্যান্য জেলার মতই হাওড়া [illegible]

উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাঁশ, কাঠ ও খড় প্রভৃতি। পোড়া মাটির বা ইঁটের ব্যবহার যে ছিলনা তা নয়—তবে তা জমিদার বা ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ইঁটের বাড়ী তৈরীর বিষয়ে সামর্থ থাকলেই যে করা যেতে পারত—এমন নয়; এ বিষয়ে একটা গ্রাম্য সংস্কার ছিলো। 'ইঁট পোড়ানো সকলের সহ্য হয় না-' এই ধরণের একটা সংস্কার ও ধারণার বশবর্তী হ'য়ে অনেকে ইঁটের বাড়ী তৈরী থেকে বিরত থাকতেন।

প্রাচীনকালে কোন মন্দির বা মূর্ত্তি যেমন শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ম্মিত হোত তেমনি গ্রামাঞ্চলে কোনস্থানে গৃহনির্ম্মাণের পূর্ব্বে গৃহস্থেরা গৃহনির্ম্মাণের যথাযোগ্য স্থান এবং গৃহের সম্ভাব্য গঠনাদি সম্পর্কে স্থানীয় আচার্য ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। আচার্য ব্রাহ্মণেরা 'বাস্তুশাস্ত্র' বিষয়ক পুঁথি অবলম্বন করে যথাযোগ্য পরামর্শ দান করতেন। তখনকার দিনে বলতে গেলে এই সব আচার্য ব্রাহ্মণেরা ছিলেন গ্রামীণ গৃহনির্ম্মাণের এক এক জন ছোটখাটো ইঞ্জিনীয়র বা স্থপতি।

হাওড়া জেলার মাটির বাড়ী শুধুমাত্র একতল বিশিষ্ট নয়; দ্বিতল ছাড়া ত্রিতল বিশিষ্ট বাড়ীও অস্তিত্ব ছিল বলে জানা গেছে। আজ থেকে তিনশো বছর আগেও হাওড়া জেলায় যে দোতলা বাড়ীর অস্তিত্ব ছিল সে সম্পর্কে আমরা জানতে পারি জোড়হাট (আন্দুল) এলাকার প্রাচীন কবি কৃষ্ণদেব শর্ম্মার রচিত 'শীতলামঙ্গল' ও 'রায়মঙ্গল' পুঁথি থেকে। মাটির এই সব ঘরগুলির ছাউনী শুধুমাত্র দোচালা বা চৌচালা ছিল না, বারান্দা সমেত আট চালাও ছিল। ছাউনীর উপকরণ হিসেবে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য খড় তালপাতা বা উলু ব্যবহার করা হোতো। বৃষ্টির সময় সহজেই যাতে জল গড়িয়ে যেতে পারে সেজন্যে চালগুলিকে পিরামিডের মতই উঁচু করা হোত। কিন্তু চতুর্দ্দিকেই এর ঢালু চাল নীচেরদিকে সোজা না হ'য়ে অর্দ্ধবৃত্তাকার হিসাবে বেঁকে যেত। একটা নৌকোকে উল্টে দিলে যে আকার ধারণ করে, ঠিক সেইমত। এই ধরণের বাঁকা চাল তৈরীর পদ্ধতিকে বলা হোত 'ভায়র' দেওয়া। এর ফলে এই সব ঘরগুলির মধ্যে একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো এবং এই সব মাটির ঘরের অনুকরণেই বাংলাদেশের মন্দির নির্ম্মাণ বহুলাংশে যে প্রভাবিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মাটির এই সব দোচালা, চৌচালা; ও আটচালা প্রভৃতি ঘরের অনুকরণে শিল্পীরা মন্দির ও দেবালয় নির্ম্মাণ করেছেন। লোকগৃহ ও দেবগৃহের মধ্যে ব্যবধান তাঁরা রাখেন নি।

হাওড়া জেলায় ঘরের যে মাটির দেওয়াল দেওয়া হোত, তা প্রায় তিন থেকে চার হাত পর্যন্ত পুরু হোতো। আশ্বিন কার্ত্তিক থেকে সুরু হোত দেওয়ালের কাজ এবং কালবৈশাখীর আগেই শেষ করা হোত। পাকা ঘরের দেওয়ালের মতো মাটির ঘরের ভিত কিছুটা খুঁড়ে নিয়ে সেই ভিতের তলমাটি ভালোভাবে জলে ভিজিয়ে বা জাবকিয়ে নিতে হোত। এরপর দেওয়ালের পাট তোলার কাজ সুরু।

যেখান থেকে মাটি সংগ্রহ করা হবে তাকে বলা হয় 'জাবখানা'। জাবখানার মাটি দোআঁশলা হ'লেই ভাল হয়, এঁটেল মাটিতে ফাট ধরে। জাবখানার মাটি বেশ ভাল করে জল দিয়ে চার পাঁচ দিন ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর প্রস্তাবিত দেওয়ালের কাছাকাছি একটা জায়গায় লম্বাভাবে ছয় থেকে নয় ইঞ্চি পরিমাণ ভিজে মাটি তুলে এমনিভাবে ছয় ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মুগুরের আকারে বাবলা কাঠের তৈরি 'পিঠেন' দিয়ে সেই মাটিকে বেশ শক্ত ভাবে জমাট করে তুলতে হয়। এবার এক ইঞ্চি বা দু ইঞ্চি পরিমিত মাটির চাপ কোদাল দিয়ে কেটে দেওয়াল তৈরী সুরু করা হয়। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন কাঁচা ইঁটের তৈরী বাড়ী। দেওয়ালগুলি সাধারণতঃ দেড়ফুটের বেশী উঁচু করা হোত না। এইভাবে একতলা বা দোতলা বাড়ীর দেওয়ালের কাজ পরিমাপ মত তুলে শেষ করা হোত।

দেওয়াল শেষ হওয়ার পর অসমতল দেওয়ালের গায়ে ঠিক তখনই কোন মাটির লেপন ইত্যাদি দেওয়া হোত না। কেননা ভিতরের মাটি কাঁচা থাকার জন্যে দেওয়ালের গায়ে কোন কিছুর লেপন দিলে তা পরে ফেটে যাবার বা ফুলে উঠবার সম্ভাবনা থাকতো। তাই আগামী শীত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হোত।

শীতের সময় শুরু হোত উলুটির কাজ। হাওড়া জেলায় উলুখড়ের বন ছিল সর্বত্র। উলুবেড়িয়া ও কুশবেড়িয়া প্রভৃতি নামের মধ্যে অতীত দিনের প্রাকৃতিক বনজ সম্পদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। উলু ও মাটির সংমিশ্রণকেই বলা হয় উলুটি। খড়ের কাঠি যেমন ফাঁপা তেমনি উলুর কাঠি নীরেট। ফলে এই কাজে উলুর উপযোগিতা ও দীর্ঘস্থায়িত্বতা ছিল বেশী। পচা-পুকুরের এঁটেল মাটির পাঁক তুলে ছায়াশীতল স্থানে এক দিনের জন্যে রেখে দেওয়া হোত। পরদিন দু'ইঞ্চি পরিমাণ উলু কুঁচি করে কেটে ঐ পাঁকের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হয়। হাতখানেক ব্যাসের একটি গর্ত খুঁড়ে নিয়ে, সেই গর্তে ঐ পাঁক ও উলু মেশানোর কাজ পা দিয়েই করা হয়। যখন উলু ও পাঁক ভালভাবে মেশানো শেষ হয়, তখন দেওয়ালের গায়ে ঐ তৈরী মণ্ডটির ছোব লাগানো শুরু করা হয়। ছোব লাগনোর পূর্ব্বে মাটির দেওয়াল ভালভাবে কোদাল দিয়ে ছুলে ফেলতে হয়—এতে মরা মাটি ঝরে পড়ে। এবারে দেওয়ালের গা অসমতল হ'লে এই ছোবের সময় আন্দাজমত নীচু জায়গায় পুরু ও উঁচু জায়গায় পাতলা করে কাদা ধরাতে হয়। ছোব একটু টেনে গেলে ওলন ধরে একেবারে যথাযথ সমান মাপে পাটা দিয়ে চৌরস করতে হয়। এরও পরে যখন দেওয়াল আরও শুকিয়ে যায়, তখন উলুবিহীন পাতলা পাঁক দেওয়ালের গায়ে লেপে দিতে হয়। তারপর ছয়ইঞ্চি পরিমাণ করে কাটা উলু ঐ পাতলা কাদার ওপর আস্তে আস্তে ঘন করে বসিয়ে দিতে হয়। এবারে মিস্ত্রির 'উসো' দিয়ে সমান করার কাজ চলে। গৃহের মধ্যে কোন মূর্ত্তি, নকসা বা কার্নিস জাতীয় কিছু করার থাকলে, উলুটির ছোব সেই স্থানগুলোয় একটু উঁচু করে মাটি দিয়ে রাখতে হয়। পরবর্ত্তী পর্যায়ে সেগুলির পূর্ণাঙ্গ রূপদান করা হয়।

উলুটির কাদা যখন শুকিয়ে যায়—তখনই শুরু হয় তুষুটি। ঢেঁকিভানা ধান থেকে তখন প্রচুর পরিমাণে তুঁষ পাওয়া যেত। এই তুঁষকেও ঐ ভাবে পচা পাঁকের সঙ্গে সামান্য গোবর মিশিয়ে পাতলা করে দেওয়ালের গায়ে লাগিয়ে 'উসো' দিয়ে পুনঃ পুনঃ মাজতে হয়। যত মাজতে পারা যাবে ততই শক্ত হবে। বেশ কিছুক্ষণ মাজার পর যখন একটা উজ্জ্বলতা দেখা দেয়—তখন শেষ হয় তুষুটির কাজ।

তুষুটি পর্যায়ের পর শুরু হয় পেটুটির কাজ। পেটুটির কাজ সাধারণতঃ বিত্তবানরাই করতেন। পেটুটির জন্য সাধারণতঃ মাঠের এক ধরণের সাদা বালি ব্যবহার করা হোত। (সাধারণতঃ এই অঞ্চলে ইঁট তৈরীর জন্যে 'ধুলা বালি' নামে যে বালি ব্যবহার করা হয়)। পাটের কুঁচ প্রায় ইঞ্চিখানেক পরিমাণ করে কেটে নিয়ে ঐ বালি ও পাঁকের সঙ্গে মেশাতে হয়। পাট মাটির পাতলা প্রলেপ লাগিয়ে 'উসো' দিয়ে মাজতে হয়। আগেই বলা হয়েছে গৃহস্থ যদি ভিতরে বা বাইরের দেওয়ালে কোন মূর্তি বা নক্সা করার ইচ্ছে করেন, তবে উলুটির সময় উঁচ নীচু অসমাপ্ত কাজটি তুষুটির সময় শেষ করতে হয় এবং সর্ব্বশেষে পেটুটির সময় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তোলা হয়।

অনেক বিত্তবানরা পেটুটির পর তুলুটির কাজও করতেন। রেড়ীর তেল, তুলো এবং পাঁক সহযোগে এক মণ্ড তৈরী করে, ঐ পেটুটির গায়ে 'উসো' দিয়ে লাগানো হোত। এর ফলে দেওয়াল এত চকচকে ও মসৃণ হোত যে, দেওয়ালের ওপর দিয়ে কোন পিঁপড়ে চলাফেরা করতে পারতো না।

দেওয়ালের বাইরে অনেক সময় ভিত্তি চিত্র (Fresco) করা হোত। স্থানীয় পটুয়া বা সূত্রধরদের ডাক পড়তো সেই সব কাজের। বিশেষ করে ফুল, লতা-পাতা ও জ্যামিতিক নক্সার কাজ হাওড়া জেলার দু-এক

স্থানে আমরা দেখেছি। উলুট করা দেওয়ালের গায়ে অনেক সময় যে মূর্তি তৈরী করা হোত—তাতেও রঙ সহযোগে চিত্র বিচিত্রিত করা হয়েছে—এমনও নজরে পড়েছে।

হাওড়া জেলার গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে-যেয়ে, একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং তা হোল যে, আজ থেকে দু হাজার বছর আগে অজন্তা ও ইলোরা প্রভৃতি স্থানে পাথরের গায়ে যে ভিত্তি-চিত্র প্রস্তুত করা হোত, তারও উপকরণ ও পদ্ধতি ঠিক মাটির ঘরের উলুটি, ঘুঘুট ও পেটুটির মতই ছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বেশ বোঝা যায়, অতীতের সেই নির্ম্মাণ-পদ্ধতির ধারা আজও গ্রামাঞ্চলে অনুসৃত হয়ে চলে আসছে বছরের পর বছর। সুতরাং বাংলাদেশের এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় গৃহ ও গৃহের দেওয়াল প্রভৃতির বিবরণ সম্পর্কে আরও বিস্তৃত গবেষণার অবকাশ থেকে যায়।

পরিশেষে, শিল্প ও সংস্কৃতি কোনদিন কোন একটা গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাই হাওড়া জেলার মাটির ঘর আলোচনার সময় এই জেলার ভৌগোলিক সীমানার কথা মনে করে বলা যেতে পারে যে, হাওড়া জেলা হোল কাছাকাছি হুগলী মেদিনীপুর ও ২৪পরগণা এই তিনটি জেলার সঙ্গমস্থান। সুতরাং ঐ সব জেলার সাংস্কৃতিক উপাদানের মিশ্রণ দেখা যেতে পারে এই জেলার শিল্প-সংস্কৃতির মধ্যে। তাই আপাতঃদৃষ্টিতে হাওড়া জেলার সংস্কৃতির সঙ্গে পাশাপাশি জেলাগুলির সংস্কৃতির যে বহুলাংশে মিল থাকবে- একথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ হাওড়া জেলা সংস্কৃতি সমন্বয়ের এবং সাংস্কৃতি বিবর্ত্তনের একটি উজ্জ্বল পটভূমি। সুতরাং বলা যেতে পারে এই অঞ্চলের শিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য আঞ্চলিক লোক চেতনারই গীর নির্ঝর বিশেষ।
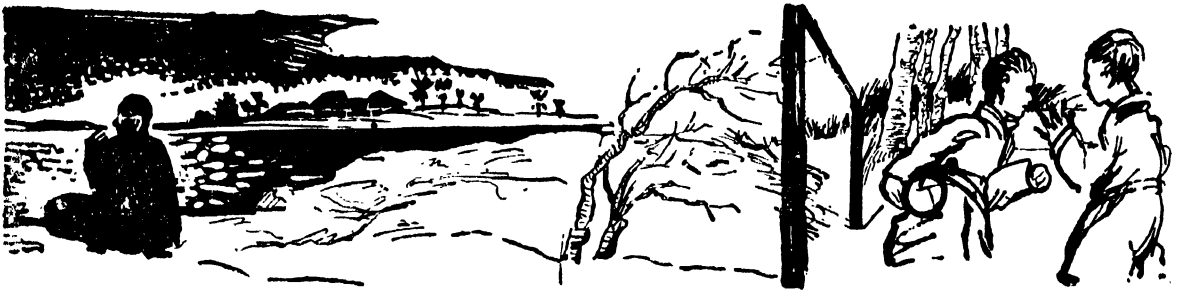
রক্তকমল: সন্তোষকুমার অধিকারী, প্রফুল্ল-গ্রন্থাগার, ৫।১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯। মূল্য আড়াই টাকা।

রক্তকমল উপন্যাসখানি গতানুগতিক ধারাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। চরিত্রগুলি জীবন্ত, আর জীবন্ত বলিয়াই মনে দাগ কাটে। অমলা সেনের চরিত্র ইহার প্রধান উপজীব্য। একটি উল্কার সহিত ইহার তুলনা করা চলে। বিদ্যুতের গতি লইয়া আলো বিকীরণ করিয়া নিজেই পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। সে চাহিয়াছিল স্পীড—স্পীডেই তাহার পরিসমাপ্তি। এরূপ চরিত্র কখনো নীড় বাঁধিতে জানে না। যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মে কখনো কখনো উদ্বেলিত হইতেও তাহাকে দেখিয়াছি, কিন্তু বাঁধ অতিক্রম করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

যাহাকে সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তিনি দার্শনিক সুনন্দ। বিবাহের প্রস্তাবে "অমলা ইতস্ততঃ করেছে। অনেক বেশী তার দ্বিধা। সুনন্দকে নিবৃত্ত করার জন্যই হয়ত বলেছে—আমি বড় অস্থির। বাঁধন যদি আমার ভালো না লাগে।

—তাহলে সে বাঁধন তুমি রেখো না। তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি—সুনন্দ দৃঢ়কণ্ঠে বললো—তোমার স্বাধীনতার এতটুকুও হানি হবে না। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।

অমলা বিশ্বাস করেছিল। এবং সুনন্দও তার কথা রক্ষা করে চলেছে। আজও অমলা আগুনের শিখার মত প্রদীপ্ত ও চঞ্চল। সুনন্দ তাকে বাঁধবার কোন চেষ্টা করেনি।"

এই চেষ্টা না করাই তার কাল হইল। মাঝে মাঝে বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া সংযত হইতে হইয়াছে। অমলাও মধ্যে মধ্যে বিচলিত হইয়াছে, কিন্তু স্বামীর সংযম লক্ষ্য করিয়া সে দরজা হইতে ফিরিয়া গিয়াছে—সারারাত্রি নিজের ঘরে মাথা খুঁড়িয়াছে কিন্তু নিজেকে ধরা দিতে পারে নাই। গ্রন্থকারের কথায় বলি, "...দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে সুনন্দর দিকে চাইলো। তারপর ছুটে গেল তার নিজের ঘরে। ঘরে এসে আলো জেলে দিয়ে অমলা আয়নার সামনে দাঁড়ালো। আধুনিকা অনন্যনির্ভর অমলা সেন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো এক যৌবনবতী তরুণীর চোখ দিয়ে কেমন ক'রে গড়িয়ে জল নামছে। অমলা সেন কাঁদছে। যৌবনের এ'দাহ সে সহ্য করে কেমন করে?"

উভয়ের এই মর্মদাহে উভয়েই জ্বলিয়াছে, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে নাই। এই প্রকাশ না-করিবার ফলে সুনন্দ অপরের ভালবাসায় আত্মসমর্পণ করিল। অমলা যখন জানিল তখন ঘর ছাড়িল।

ঘর ছাড়িল তাকে লইয়াই যে গৌতম চক্রবর্তীর ভাই। তার গৃহ-শিক্ষক গৌতম চক্রবর্তী, "যে তার জীবনের প্রথম অনুভূতিকে জেলে দিয়েছিল। যাকে দীর্ঘদিন ধরে ভুলবার সাধনা করেছে অমলা। ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে

তার ছোট ছোট কয়েকটি চিঠি। মুছে দিতে চেয়েছে যার ছবিকে স্মরণের ক্যানভাস থেকে। যে তার হৃদয়ে শুধু বেদনার রঙে রাঙা। তার শিক্ষক, গুরু।...মনে পড়ে গেল সেই চেহারাটা। পরুষদীর্ঘ চেহারা। মুখে প্রতিজ্ঞার দৃঢ় নীরবতা। বুকে অনমনীয় মন। নিজেকে তুচ্ছ করে সে এগিয়ে গিয়েছিল মানুষের কাজে। দেশের অগণিত মূর্খ, শ্রমজীবি মানুষের কাছে। হয়ত তাদেরই হাতে আত্মদান করতে হলো তাকে। গৌতম আজ শুধু স্মৃতি।"

অমলার উদ্দামতার মধ্যে চমৎকার একটি সংযম আছে। এই সংযমের বাঁধ কোথাও ভাঙে নাই—মরণের পূর্বেও নয়। মৃত্যু ছাড়া এ চরিত্র কল্পনা করাও যায় না। গ্রন্থকারও এখানে অপূর্ব সংযমের পরিচয় দিয়াছেন।

"গাড়ী কখন মাঝেরহাট ব্রীজ পার হয়ে গেছে। নিউ আলিপুর নয়, তারাতলায় এসে মোড় ঘুরলো, তারপর নির্জন রাস্তায় একটা এ্যাক্সিডেণ্ট ঘটতে পারে।

খিল খিল করে হেসে উঠলো অমলা—ভীরু, এখনও দ্বিধা? জানো না, আমি পেছনের পথ ধরি না। ফেরার পথ আমার জন্তে নয়। বলো দেখি,

'চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার,
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা...

একটা কালভার্টে ধাক্কা খেয়ে গাড়ী লাফিয়ে উঠলো। কমল ছিটকে এসে পড়লো অমলার গায়ে। অমলা ভ্রূক্ষেপহীন। বলে চললো:

যে পথে অনন্তলোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তের।

কমলের চোখের দিকে চাইলো অমলা। কমলের একটি হাত সে নিজের কোলে তুলে নিল। তার দুই চোখে যেন এক সুদূর দিগন্ত লোকের কল্পনা।

হাইড্ রোড মোটরের হেডলাইটের তলায় দ্রুত সরে যাচ্ছে। নির্জন অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীই যেন ছিটকে সরে যাচ্ছে পেছনে। কমলের মনে হ'ল যুগ যুগ ধ'রে প্রধাবিত হ'য়ে চলেছে এই পথ শুধু তাদেরই পায়ের তলায়। কিসের দ্বিধা? মৃত্যু শুধু ভীরুর জন্য। চলমান মন সমস্ত জড়তা, সকল সীমার তুচ্ছতাকে অতিক্রম ক'রে ছুটে চলেছে। যাত্রাপথের দুধারে শুধু অযুত সূর্যের জ্যোতির্ময়তা।

হঠাৎ দুরন্ত একটা গতিতে গাড়িটা লাফিয়ে উঠলো। কমল চমকে উঠে বললো—অমলা?

অমলা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। তার কণ্ঠে তখন সুর—'সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খ করি…'

একটা মোড়ের মুখ। ব্রেক কষে গাড়ী সামলাে গেল অমলা। কিন্তু পলকের মধ্যে পথ ছেড়ে শূন্যের মে লাফিয়ে উঠলো গাড়ী। এক মহাশূন্যের দোলায় ছিটে গেল। রাস্তা থেকে বহদূরে একটা খাদের মধ্যে মাথা নী ক'রে লুটিয়ে পড়লো।"

হাসপাতালে শুয়ে কমল শুনলো, অমলা মারা গে ষ্টিয়ারিং বুকে বিঁধে।

এককথায় বইখানি অনন্যসাধারণ। পড়িতে বসি শেষ না করিয়া পারা যায় না। কোথাও ভাষার আড়ষ্ট নাই। ছোট ছোট কথা, কিন্তু গতি কোথাও মন্থর হ নাই। নামকরণও হইয়াছে সুন্দর। প্রচ্ছদপটে শিল্পী শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

গৌতম সেন

———

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

পতাকা ঘাড়ে করিয়া "বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক" বলিয়া চীৎকার করিলে এবং ভাড় করিয়া উত্তেজক বক্তৃতা শুনিলেই দেশের ডাকে সাড়া দেওয়া হয় না।
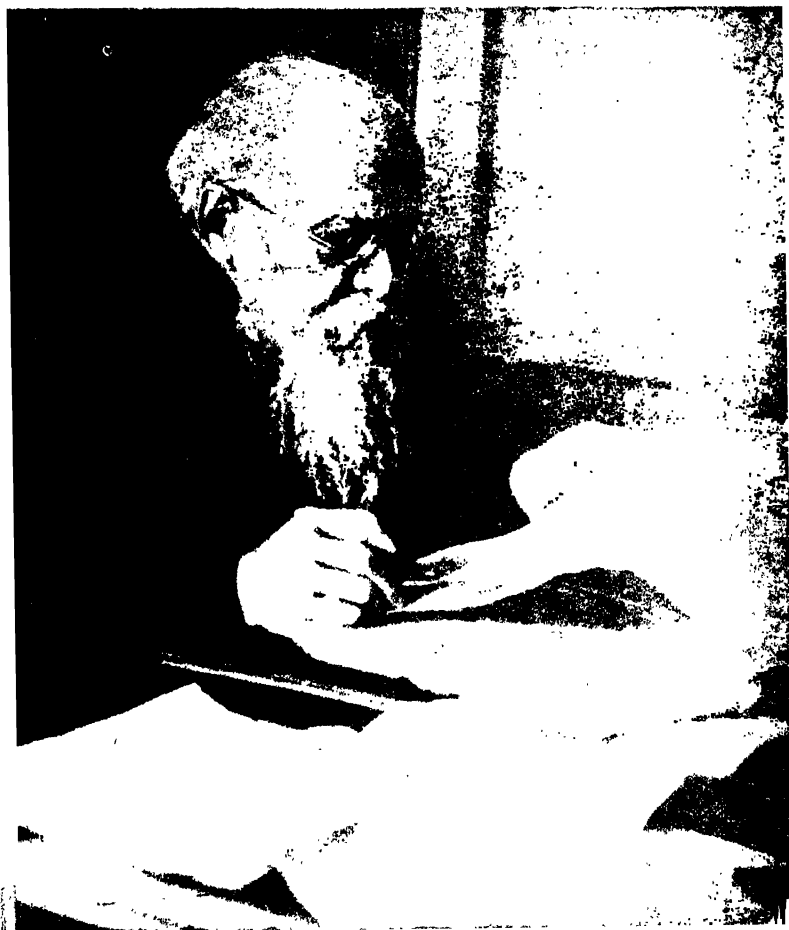
মহাকাল সিংহাসনে সমাসীন বিচারক
শক্তি দাও, শক্তি দাও, মোরে,
কণ্ঠে মোর আন বজ্রবাণী,
শিশুঘাতী, নরঘাতী, কুৎসিত বীভৎসা 'পরে
ধিক্কার হানিতে পারি যেন।

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

পৌষ, ১৩৭৫

৩য় সংখ্যা

নবীন-প্রবীণ সংঘাত

পৃথিবীর সকল দেশেই আজকাল অল্পবয়স্কদিগের সহিত পরিণত বয়সের লোকেদের মতান্তর ও কলহ আরম্ভ হইয়াছে। এই কলহের আরম্ভ হয় অল্পবয়স্কদিগের শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত রীতি পদ্ধতি প্রভৃতি অমান্য করিয়া নূতন ব্যবস্থা করাইবার চেষ্টা হইতে। পূর্ব্বকালের শান্তশিষ্ট সুশীল ও সুবোধ বালকেরা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় বাধ্যতার প্রতীক নাই। তাহারা কোন কথাই আর মাথানীচু করিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নয়। ইহা কি একান্তভাবে তাহাদেরই অবাধ্য মনোভাব পরিচায়ক, না এইরূপ একটা চরিত্রগত মহা পরিবর্ত্তনের মূলে অপর কোন কারণ থাকিতে পারে এবং আছে? নিয়ম করিয়া যথেচ্ছাচার অথবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মহারথীদিগের রচিত শিক্ষা বা পরীক্ষা-পদ্ধতির দোষধরা ছাত্রছাত্রীদিগকে কে শিখাইয়াছে অনুসন্ধান করিলে প্রথমেই মনে পড়ে সেই সকল দেশ নেতাদিগের কথা যাঁহারা অপরের অপরাধ প্রমাণ করিতে চিরব্যস্ত ও নিজেদের অক্ষমতা বিচার করিতে পূর্ণরূপে উদাসীন। বর্ত্তমানকালে সকল দেশ-নেতাদিগেরই প্রতিপক্ষ থাকে। এই কারণে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মহাপুরুষকেই লোকচক্ষে হেয় প্রমাণ করিবার প্রবল বিরুদ্ধ প্রচারের ব্যবস্থা সর্ব্বত্রই দেখা যায়। অর্থাৎ পূর্ব্বকালে সকল দেশেই যে কিছু কিছু লোক পূজ্যপাদ, শ্রদ্ধেয় ও সর্ব্বজন সম্মানিত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন; বর্ত্তমানে কোথাও সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় না। ইহার কারণ যে শুধু রাজনীতির আসরে নহে সর্ব্বস্থলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উগ্র আবেগের প্রকাশে সমাজে কোন লোকেরই মর্য্যাদা আর অক্ষতভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। কাব্যে, সাহিত্যে, চিত্রকলায়, বিদ্যা জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে সকলগুণীর বিষয়েই প্রতিকূল সমালোচনার ক্রমাগত চলিতে থাকে। এবং এই সমালোচনার মধ্যে অন্যায় ও অসভ্য ভাষা ব্যবহারও একটা প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সভ্য-

চলিতেছে। দাঙ্গা, হাঙ্গামা, ইষ্টক নিক্ষেপ ত চলিয়াই থাকে। কখন কখন গুপ্তহত্যার কথাও শুনা যায়। শুধু বয়স্ক ও যুবজনের মধ্যেই এই চরিত্রগত দোষ সংক্রমিত হয় নাই। শ্রমিক-শ্রমিক ও শ্রমিক-মালিকের বিবাদেও আলোচনা বিচার ও তর্কের পরিবর্ত্তে গালি-গালাজ ও লগুড় ব্যবহার প্রায়ই হইয়া থাকে। এই অবস্থায় আইন চালাইবার চেষ্টা হইলে যে তাহার প্রতিবাদও কঠোর কণ্ঠে ও কঠিনহস্তে চালিত হইবে ইহা স্বাভাবিক। সভা-সমিতিতে অসভ্যতা ও বর্ব্বরোচিত ব্যবহার আজকাল নবীন প্রবীণ নির্ব্বিশেষে সকলেই করিয়া থাকেন এবং এইরূপ আচরণ করিতে কাহাকেও লজ্জিত হইতে দেখা যায় না। কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয় ও যাঁহাদিগের উপর সমাজের শাসন-কার্য্য ও জাতীয় উন্নতি তথা সামাজিক মঙ্গল ব্যবস্থার ভার দেওয়া হইয়া থাকে; সেই সকল রাষ্ট্রের উচ্চস্তরের লোকেরা প্রায়ই নিজ নিজ কার্য্যক্ষেত্রে যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে সামাজিক ব্যবহারের আদর্শ আজ কোন পথে চলিয়াছে। নবীনদিগের প্রবীণ সম্বন্ধে মনোভাব যাহাই থাকুকনা কেন তাহারা যে অধিক বয়সের লোকেদের ব্যবহার দেখিয়া নিজেদের চালচলনের আদর্শ নির্দ্ধারণ করে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধে যেখানে অসভ্যতা ও বর্ব্বরতা উৎকটভাবে উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়; সেখানে যে অল্পবয়স্ক ব্যক্তিগণ সেই সুরুচি বিরুদ্ধ আচরণের উদাহরণ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বকার্যে সুনীতির পথ ছাড়িয়া কুপথচারী হইবেন তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি থাকিতে পারে? অর্থাৎ বয়স্কদিগের কার্য্য হইল পথ দেখাইবার। তাঁহারা যদি নিজেদের ব্যবহারে ক্রমাগতই সকল সুসভ্যতার আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন তাহাহইলে তাঁহাদিগের উপদেশ ত কেহ গ্রহণ করিবেই না; উপরন্তু তাঁহাদের অনুসরণে অল্পশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ লোকেরা সভ্যতা বর্জ্জন করিয়া পূর্ণমাত্রায় অমার্জ্জিত ব্যবহারে আত্মনিয়োগ করিবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে যদি আমরা সমাজে সুনীতি সুরুচি সুরীতির প্রতিষ্ঠা আকাঙ্খা করি, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের মুরুব্বীদিগকে নিজেদের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপভাবে চলিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদিগের ব্যবহার দেখিয়া সমাজের সকল ব্যক্তিই নিজ নিজ চালচলন সংস্কার করিয়া সমাজে সুসভ্য ব্যবহারের আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম হয়েন। ছাত্রসমাজ উচ্চপদস্থ লোকেদের অনুকরণ করিয়াই চলিয়া থাকে। উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ যদি রাষ্ট্রক্ষেত্রে, পৌরপ্রতিষ্ঠানে ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানে সমবেত হইয়া পরস্পরকে গালি-গালাজ করিয়া জুতা, খাতা ও দোয়াত ছুঁড়িয়া মারিয়া ও বিকট চিৎকার করিয়া কথা বলিতে না দিয়া জাতীয় সভ্যতার আদর্শ পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়া শ্বাপদ জগতের আরণ্য রীতিনীতি মনুষ্যসমাজে চালাইবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনুকরণে যদি ছাত্র ও মজদুরের চেঁচামেচি মারপিট ও ঘেরাও বন্ধ চালাইতে থাকে তাহা হইলে ঐ অপরিণতবুদ্ধি সাধারণকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না।

যাঁহারা সর্ব্বসময়েই ছাত্রদিগের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে ক্রীড়া ব্যায়াম প্রভৃতির শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সহিত আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ছাত্র ও তরুণদিগের মধ্যে উদ্ধত ব্যবহার কিম্বা কলহ বিবাদ আগ্রহ সচরাচর বিশেষ লক্ষিত হয় না। তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করিলেও দেখা যায় যে তাহারা ন্যায় ও সুতর্ক বিরুদ্ধতাদোষ দুষ্ট নহে। বুঝাইয়া বলিলে তাহারা সকল বিষয়েই সুসংযত থাকিতে প্রস্তুত থাকে দেখা যায়। অকারণে বিরুদ্ধবাদ তাহাদিগের অধিকাংশের মধ্যেই দেখা যায় না। শুধু কিছু কিছু তরুণ-তরুণীগণ রাষ্ট্রীয় দলের সহিত যোগ থাকার ফলে ও সেইসকল দলের নেতাদিগের প্ররোচনায় অবিবেচনার-আবর্ত্তে পড়িয়া ধর্ম্মান্ধভাবে উন্মত্ত ব্যবহার করিয়া সমাজের লোকের অসুবিধার ও ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই সকল ক্ষেত্রেও ঐ রাষ্ট্রীয়দলগুলির

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণই এই সমাজবিরুদ্ধতার জন্য দায়ী। এবং ঐ নেতাগণ সর্ব্বত্রই বয়সে প্রবীণ ও পরিণতবুদ্ধি বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকেন। শ্রমিকদিগের মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তি কলহপ্রিয় নহেন। শ্রমিকদিগকে যাঁহারা উস্কাইয়া থাকেন তাঁহারা প্রথমত শ্রমিক নহেন ও দ্বিতীয়ত তাহারা সকলেই অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বহুক্ষেত্রে তাঁহারা শ্রমিকদিগকে উস্কাইয়া তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের নিয়োগকর্ত্তাদিগের ক্ষতির কারণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের লাভের সম্বন্ধে বিশেষভাবে সজাগ। দেখা যায় যে শ্রমিক-আন্দোলনের ফলে যদি কাহারও নিছকলাভের খাতায় নাম লিখিত হয় তাহা হইলে তাঁহারা শ্রমিক নেতা। কলহ করিয়া শ্রমিকদিগের কোন লাভ প্রায় কখনও হয়না বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হইবে না। শ্রমিক-মালিক মিলিত বৈঠক বসাইয়া অথবা মালিকদিগের এক তরফা শ্রমিকদিগের অভাব মোচন চেষ্টা হইতে লাভ হয়। সরকারী শ্রমিক আদালতের বিচারেও লাভজনক নিষ্পত্তি কখন কখন হয়। হরতাল অথবা হাঙ্গামা করিয়া শ্রমিকদিগকে লাভবান হইতে প্রায় কখনও দেখা যায় না। শ্রমিকদের মত জানিলে দেখা যাইবে যে তাহারাও জানে কোন পথে চলিলে তাহাদিগের মঙ্গল সম্ভাবনা সর্ব্বাধিক। শ্রমিকগণ যে প্রায়ই গোলযোগ করে তাহার মূলে দেখা যাইবে রাষ্ট্রীয়দলগুলির প্ররোচনা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ছাত্র-আন্দোলনে রাষ্ট্রীয়দলগুলির ছাত্রমহলে উত্তেজনা সৃষ্টি করার ফলে গোলযোগের আরম্ভ হয়। ছাত্রসংঘ প্রভৃতি গঠন করার মূলেও রাষ্ট্রীয়দলগুলির প্রচার ও প্রচেষ্টা রহিয়াছে। ছাত্রদিগের পাঠের ব্যবস্থা, পরীক্ষার মান, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন, ছাত্রনিবাস ব্যবস্থা ক্রীড়া, আমোদ, ব্যায়াম ও অপরাপর উপায়ে দেহ, মন, জাতীয়তা, কৃষ্টি ও ভব্যতা গঠন ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা, এ সকল বিষয়ে বয়স্ক ব্যবস্থাপকদিগের ছাত্রগোষ্ঠীর সহিত পরামর্শ ও আলোচনা প্রভৃতি করিলে উভয়পক্ষের ভিতর মতান্তরের সম্ভাবনা কমিয়া যাওয়া সহজ হয়। শ্রমিকদিগের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা আজকাল একটা নিয়মের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বুদ্ধি ও জ্ঞানের দিক দিয়া ছাত্রগণ শ্রমিক অপেক্ষা উচ্চস্থান পাইবার অধিকারী। তাহাদিগের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিলে তাহা ফলপ্রসূ হইবার সম্ভাবনা অনেক অধিক। কোনপ্রকার মতদ্বৈধ হইবার পূর্ব্বেই যদি ঐরূপ নানান বিষয়ে আলোচনা-সভা বসাইবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে ছাত্র অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার ব্যবস্থাপক প্রভৃতির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সহজ ও বন্ধুত্বের উপর স্থাপিত হইয়া অকারণ মতবিরোধের সম্ভাবনা দূর হইয়া শান্তিপূর্ণ হইতে পারে।

কম্যুনিজমের প্রকার বৈচিত্র্য

১৯১৭ খৃঃ অব্দে যখন রুশিয়ার বিপ্লবীরা জার্ম্মান সমরশক্তির দ্বারা পরাজিত রুশ সম্রাটের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া রাজশক্তি হস্তগত করিল ও পরে রোমানফ সম্রাটকে সপরিবারে ধরাবক্ষ হইতে অপসৃত করিয়া সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিল, তখন পৃথিবীর সকল জাতির শ্রমিক ও অল্পবিত্ত লোকেদের প্রাণে একটা নূতন আশার বাণী ধ্বনিত হইতে আরম্ভ করিল। কিষাণ মজদুর ও দেশরক্ষক সৈন্যবাহিনীর রাজত্ব হইবে ও জাতির সকল ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী শ্রম করিলে যাহার যতটা প্রয়োজন সেই পরিমাণ অর্থ জাতীয় উপার্জ্জনের নিজের প্রাপ্য অংশ হিসাবে পাইবে, এই আশা সকলের প্রাণে জাগ্রত হইয়া উঠিল। দেনাপাওনার এই সহজ হিসাব অবশ্য রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট রাজত্বে চালান সম্ভব হইল না। ষ্টালিন দেখিলেন যে কাজ করিবার বেলা অধিকসংখ্যক ব্যক্তিই ততটা মূল্য উৎপাদনে সক্ষম হইলেন না; যদিও আবশ্যকীয় মূল্যবান বস্তুর মোট পরিমাণ কাহারও বিশেষ কমের দিকে যাইল না। সুতরাং যথাসম্ভব শ্রমের পরিবর্ত্তে যথা প্রয়োজন উপার্জ্জন ব্যবস্থা চালিত রাখা সম্ভব হইল না। ষ্টালিন নিয়ম করিলেন যে সকল ব্যক্তির প্রাপ্য নির্দ্ধারণ করা হইবে প্রত্যেকের

উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করিয়া। এই অর্থনীতি চালনা করিবার সময় আরো দেখা হইল যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ উৎপাদনের একটা উপযুক্ত অংশ দেশের ও দশের সেবার জন্য উদ্বৃত্ত রাখিয়া অবশিষ্ট অংশের মধ্যেই নিজ নিজ জীবনযাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হ'ন। অর্থাৎ কর্ম্মীদিগের বেতন সেই হারেই নির্দ্ধারিত হইতে লাগিল যাহাতে রাষ্ট্রের সকল প্রয়োজনীয় রাজস্ব অনায়াসে বাদ রাখিয়া বেতনের হার বজায় রাখা সম্ভব হয়। যে বেতনের অতিরিক্ত অংশ মালিক লইতেছে বলিয়া শ্রমিকগণ যুগে যুগে অভিযোগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক অংশ তাহারা রাষ্ট্রের পাওনা হিসাবে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

কিন্তু আর্থিক ভাগবাট ঐরূপ হইলেও মানুষ তাহার মধ্যে কোন অন্যায় দেখিল না ; কারণ তাহারা এই বলিয়া মনকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল যে ঐ অতিরিক্ত অংশ কোন ব্যক্তি পাইল না; পাইল রাষ্ট্র অর্থাৎ সমাজের সকল ব্যক্তি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাহারা দেখিল যে কম্যুনিজমে শুধু অর্থের লোকসান হইতেছে তাহা নহে, ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর বহু প্রকার শৃঙ্খল নিবদ্ধ করিয়া রাষ্ট্রের একছত্র অধিপতিগণ সমাজের সকল কর্ম্মীকে এক নূতন দাসত্বে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন। কে কি কাজ করিবে, কোন কারখানা বা কৃষিকেন্দ্রে নিযুক্ত হইবে, কোথায় বাস করিবে ইত্যাদি বহু বিষয়ে কম্যুনিজম মানুষকে স্বেচ্ছায় চলিতে দিল না এবং ইহা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে যথা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ অথবা ইচ্ছামত দেশ ভ্রমণ প্রভৃতিতেও বাধা দিতে লাগিল। কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পরিশ্রমের দ্বারা লাভবান হইবে না একথাটা যেমন অর্থনীতির ন্যায়ের ক্ষেত্রের বড় কথা, তেমনই অথবা ততোধিক বড় কথা হইল যে পরিশ্রম করিয়া কোন ব্যক্তি কি পাইল। ধনবাদী দেশের কোন কোনটিতে শ্রমিকের বেতন এতই অধিক হইয়াছে যে তাহারা মালিককে লাভ কতটা দিতেছে তাহার আলোচনা কেহ করা প্রয়োজন মনে করে না। উপরন্তু সেই সকল দেশের রাষ্ট্র সকল মানবকে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করিয়া যে কোন অবস্থায় অভাবমুক্ত রাখিতে পারায় ব্যক্তিগত অধিকার লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন কেহ বোধ করে না। যথা বার্দ্ধক্যের ভাতা বৈধব্যের ভাতা, বেকার ভাতা, বৃহৎ পরিবারের ভাতা, অনাথ অবস্থার ভাতা ইত্যাদি। ইহার উপর আছে বিনা মূল্যে সকল চিকিৎসা ও সকল শিক্ষা, অল্প ভাড়ায় বাসস্থান, অল্প ব্যয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা ও আরও নানা প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা। রুশিয়া ও তাহার সহকম্যুনিষ্ট অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে কম্যুনিজমের কঠোর নীতি চালাইয়া চলা ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিতে লাগিল। ইউগোস্লাভিয়া রুশিয়ার পথ ছাড়িয়া নিজের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। অ্যালবেনিয়া কঠোরতম পন্থার কম্যুনিষ্ট চীনদেশের সহিত মিতালি করিতে লাগিল। চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়া কঠোরনীতি পরিবর্ত্তন করিয়া জীবনযাত্রা সহজ ও আরামপ্রদ করিবার দিকে ঝুঁকিল। ব্যক্তি স্বাধীনতার চেষ্টাও চলিতে লাগিল। রুশিয়া ও তাহার সঙ্গের কঠিন পন্থী পোলাণ্ড, পূর্ব্ব জার্ম্মাণী ও হাঙ্গেরী কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল না। এই কথা লইয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার শাসন-রীতি পরিবর্ত্তন চেষ্টার কারণে রুশিয় ও পোলিশ সৈন্য-দল চেকোস্লোভাকিয়া দখল করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে একটা আন্তর্জাতিক মহাসঙ্কটের অবস্থার সৃষ্টি করিল। এই গোলযোগ এখনও চলিতেছে।

ওদিকে চীন যে ধরনের কম্যুনিজম চালাইয়া চলিতেছে তাহা ইয়োরোপের কঠোরতম কম্যুনিজমের তুলনায় আরও উৎকটভাবে কঠোর। চীনের মানুষ নিজের চিন্তার ধারা, পছন্দ অপছন্দ, গৃহের আসবাব, অঙ্গের বসন কিম্বা খাদ্যবিচার লইয়া স্বাধীনভাবে চলিতে পারে না। সকল বিষয়ই তাহাদের জাতীয় নেতা মাওৎসে তুঙের পরিকল্পনা অনুগত ভাবে চলিতে হইবে। মাও এর চিন্তা সর্ব্বব্যাপ্ত ও মানব জীবনের

সকল অঙ্গেই তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। চীনের মানব যাহাতে মনে প্রাণে এক ছাঁচে ঢালা হইতে পারে তাহারই চেষ্টা চলিতেছে। উত্তর কোরিয়া এবং উত্তর ভিয়েৎনাম উভয় দেশেই মাওবাদ প্রচলিত। এই ভাবে দেখা যাইতেছে যে এখন সারা বিশ্বে কম্যুনিজম তিন প্রকার দাঁড়াইয়াছে। 'ইয়োরোপে রুশিয় পোলিশ পূর্ব্ব জার্মান হাঙ্গেরীয়ান কঠোর নীতির সমর্থক দেশগুলি। ইয়োরোপের উদারপন্থী দেশগুলি অর্থাৎ চেকোস্লো-ভাকিয়া ইউগোস্লোভিয়া, রুমেনিয়া এবং বুলগেরিয়া। এশিয়ায় চীন, উত্তর কোরিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম ও ইয়োরোপের অ্যালবেনিয়া। যে সকল দেশে কম্যুনিষ্ট শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হয় নাই, শুধু রাষ্ট্রমত ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সকল দেশেও রাষ্ট্রমতের বাজারে কম্যু-নিজমের ত্রিধারা লক্ষ্য করা যায়। উদারপন্থী, কঠোর পন্থী এবং অতিকঠিন পন্থা। অর্থাৎ কম্যুনিজমে আর একতা নাই। নানা মুনির নানা মত। ইহার পরে কি হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

কলিকাতার গমনাগমন ব্যবস্থা

কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের যাতা-য়াতের অসুবিধা এত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে যে দৈনিক কর্ম্মস্থলে গমন ও গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্যই লোকের কয়েক ঘণ্টা সময় লাগিয়া যায়। সময়ের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বাস বা ট্রামে এত ধাক্কাধাক্কি হয় যে বয়স কম এবং গায়ের জোর বেশী না হইলে কাহারও পক্ষে বাসে ট্রামে যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। এই পরিস্থিতিতে বিগত কয়েক বৎসর হইতেই আলোচনা চলিতেছে যে কি উপায়ে কলিকাতায় গমনাগমনের ব্যবস্থা উন্নততর করা যায়। বর্ত্তমানে কি কারণে পথ চলাচল কষ্টকর ও সময়সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কলিকাতার যান-বাহন প্রথমতঃ গতিশক্তির হিসাবে এক জাতীয় নহে। কোনটি কচ্ছপের মত ধীর মন্থর গতিতে চলিয়া দ্রুতগামী যানগুলিকে বাধা দিয়া সময় নষ্ট করায় যথা রিকশা, ঠেলা, ঘোড়ারগাড়ী ও বাইসিকল। ইহার সহিত আছে পদব্রজগামী লোকের ভিড়। এই সকল লোক সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দ্রুতগামী যানগুলিকে বাধা দিয়া তাহাদের গতিবেগ খর্ব্ব করেন। রাস্তা পার হওয়া যত্রতত্র এবং অতি মন্থর গতিতে হয়। মোটরগাড়ী দেখিলেই ইচ্ছা-কৃতভাবে সেগুলিকে পথ ছাড়িয়া না দেওয়া ইত্যাদি অভ্যাসও বহু ছেলেছোকরাদের মধ্যে দেখা যায়। ইহারা এইরূপ করিয়া অপরের যাতায়াতে বাধা দিয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করে। কলিকাতার বাহিরে বড় বড় রাজপথে গাড়ীর উপর ইষ্টক নিক্ষেপ করাও কখন কখন দেখা যায়। শুধু যে রিকশা, ঠেলা, সাইকল ও পায়েহাঁটা লোকেরাই দ্রুতগামী যানগুলির গতিতে বাধা দেয় তাহা নহে। ট্যাকসিচালকগণও ভাড়ার খোঁজে মাঝখান দিয়া অতিমন্দ গতিতে চলিয়া অপর যানগুলিকে বাধা দিয়া থাকে। বাসগুলি প্রায়ই থামিবার সময় রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াইয়া যায় ও ফলে অপর যান-বাহন পথ না পাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কলিকাতায় যদি মন্দগতি যানগুলির সংখ্যা হ্রাস করিয়া অধিক সংখ্যায় মোটরসাইকল রিকশা ও ছোট মাল-বহন করিবার মোটরগাড়ী বাড়ান হয় ও সকল গাড়ী ও পদচারীগণ যদি অপরের যাতায়াতে বাধা না দিয়া যথা সম্ভব শীঘ্র শীঘ্র নিজ পথ ধরিয়া চলিতে অভ্যাস করে তাহা হইলে যাতায়াতের কষ্ট কিছুটা দূর করা যাইতে পারে। ট্যাক্সী, বাস, লরী, প্রভৃতি যানগুলিকেও সমাজবিরুদ্ধ ব্যবহার হইতে বিরত করার প্রয়োজন। পুলিশের গাড়ীগুলিও অপরের গমনে বাধার সৃষ্টি করিয়া থাকে। এক কথায় যানবাহনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ও তাহাদিগের চালকদিগকে সমাজ সহায়তা শিক্ষা দিলে মনে হয় কলিকাতায় পথে চলা অন্তত টাকার চারআনা উন্নতি লাভ করিতে পারে। যে সকল যানবাহন আছে তাহার পূর্ণ ব্যবহার হয় না বলিয়া চলাচলের অসুবিধা ঘটে। বাধা না পাইলে একই গাড়ী (বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি প্রভৃতি) একই সময়ে অধিকবার যাতায়াত করিতে পারে।

ইহার পরে আসিবে বড় বড় ব্যবস্থার কথা। কলিকাতা একটি অতি বৃহৎ নগরী। ইহা ভাগীরথীর উভয় তীরে নির্মিত এবং উভয়দিকের লোকাবাস কেন্দ্রগুলির নাম বিভিন্ন হইলেও এই বৃহৎ শহর গমনাগমন ব্যবস্থার দিক দিয়া একই মহানগরী। ভাগীরথীর উপরে এখন মাত্র দুটি সেতু রহিয়াছে। ইহার মধ্যে একটি কলিকাতার কেন্দ্রস্থলগুলি হইতে বহু দূরে। কলিকাতার গমনাগমনের ব্যবস্থা উন্নততর করিতে হইলে সেতুর সংখ্যা বৃদ্ধি করা আবশ্যক এবং হাবড়ার রেলষ্টেশনে সকল যাত্রী অবতরণ করিয়া কলিকাতায় আসার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া ট্রেনগুলি কলিকাতার ভিতরে আসিয়া লোক নামাইবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সকল স্থানীয় ট্রেনগুলি যদি নদী পার হইয়া আসিয়া এসপ্লানেড ও পার্ক ষ্ট্রীটের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে থামিয়া যাত্রী নামাইবার ব্যবস্থা করে তাহা হইলে ঐ যাত্রীগণ অনায়াসেই নিজ নিজ কর্মস্থলে যাইতে পারেন। ঐ রেলপথকে হাবড়া হইতে তিন চার মাইল দূর হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চতর স্থিতিতে উত্তোলন করিয়া নদীর নবনির্মিত সেতুর উপরতলা দিয়া নদী পার করাইয়া রাস্তা হইতে অন্তত ২০।২৫ ফুট উপরে অবতরণ কেন্দ্রে আনা প্রয়োজন। ঐ পথ তৎপরে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি রোডের দুই পার্শ্বে থাম গাঁথিয়া তাহার উপরে রক্ষিতভাবে কলিকাতার পূর্ব্বপ্রান্তের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র রোডের উপর দিয়া কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণদিকে যাইতে পারে। দক্ষিণে ঐ পথকে আমির-আলি অ্যাভেনিউ ও পরে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ অথবা সাদার্ণ অ্যাভেনিউএর উপর দিয়া লইয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে খিদিরপুরের ট্রাম ধরিয়া উচ্চপথে নূতন প্রধান কেন্দ্রে ফিরাইয়া আনা যায়। উত্তরে ঐ পথ গালিফ ষ্ট্রীট বা অন্য দিক দিয়া চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউএ কিম্বা ষ্ট্র্যাণ্ডরোডে যাইতে পারে। আসল কথা হইল উচ্চ রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়া সেই পথে হাবড়ার বৈদ্যুতিক গাড়ীগুলিকে নূতন সেতুপথে নদী পার করাইয়া সহরের নানান কেন্দ্র ঘুরাইয়া হাবড়ায় ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থা করিলে বর্ত্তমানের যে হাবড়া সেতু আছে তাহার ভীড়ও হ্রাস হইবে; নূতন সেতুরও ভিড় কমিবে এবং হাওড়া রেলষ্টেশনে যে পরিমাণ গাড়ী ট্যাক্সি, বাস ও ট্রাম যাওয়া আসা করে তাহা অনেকটা কমিয়া সেই যানগুলিই অন্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যানবাহনের অভাব মোচন করিতে সক্ষম হইবে। কলিকাতার নীচে সুড়ঙ্গপথে রেলগাড়ী চালান কখন অল্পব্যয়ে নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইবে না। তাহা নিরাপদও সম্ভবত হইবে না। আরও বহু রাস্তা নির্ম্মাণেরও স্থান নাই। উচ্চপথে রেল বসাইয়া একাধারে দূর প্রসারিত মহানগরীর কার্য্যে লাগানই শ্রেষ্ঠ পন্থা।

রুশিয়ার অভিমান

ওয়ারশ প্যাক্টের রাষ্ট্রগুলি যখন চেকোস্লোভাকিয়াতে সৈন্য পাঠাইয়া সেই দেশের শাসনপদ্ধতি সংস্কার চেষ্টাতে বাধা দিবার ব্যবস্থা করিল অর্থাৎ রুশিয়া যখন চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যক্তিস্বাধীনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা কম্যুনিজম বিরুদ্ধতা বলিয়া চেকদিগকে দমন করিবার জন্য সামরিক পদ্ধতি অবলম্বন করিল; পৃথিবীর সকল মানব-স্বাধীনতাকাঙ্খী দেশই তখন রুশিয়ার কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে আর একবার রুশিয়া ঐরূপ প্রচেষ্টায় নামিয়া বিশেষ নিন্দাভাজন হইয়াছিল। সেবার হাঙ্গেরীর লোকেরা কম্যুনিজমের কঠোর নীতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন চেষ্টা করিয়াছিল ও রুশিয়ার সৈন্যদল ঐ দেশে গিয়া সংস্কারকদিগকে সশস্ত্র আক্রমণে বিধ্বস্ত করিয়া ঐ কঠোর নীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। এইবারে চেকোস্লোভাকিয়াকে বিশেষ কোন আক্রমণ করিবার প্রয়োজন হয় নাই; কারণ চেকোস্লোভাকিয়ার জনসাধারণ কোন প্রকার সামরিক বাধা না দিয়া রুশসৈন্যদিগের সহিত সকল সম্বন্ধ বর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে অহিংস অসহযোগের দ্বারা একটা আড়ষ্ট নিষ্ক্রিয়তার পরিস্থিতিতে স্থাপন করিয়া দেয়। সেই কারণে রুশসৈন্যগণ সামরিক শক্তি ব্যবহারে সক্ষম না হইয়া বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। এবং বিশ্ববাসীর মতামতও রুশনেতাদিগের আত্মবিশ্বাসে এমন একটা আঘাত লাগায় যাহাতে রুশিয় আত্ম-

র্জাতিক সম্বন্ধ রক্ষা নীতিতে একটা অনিশ্চয়তার ভাব আসিয়া পড়ে।

বৃটেনের কিছু গীতবাদ্যের দল ঐ সময় রুশিয়া যাইতেছিল এবং কিছু রুশিয়দল বৃটেনে আসিতেছিল। বৃটেনের দলগুলি রুশ গমন বন্ধ করিয়া জানাইয়াছিল যে তাহারা ঐ সময়েও ঐ পরিস্থিতিতে রুশিয়া যাইতে পারিবে না এবং যাহারা রুশিয়া দলগুলিকে বৃটেনে আনাইতেছিল তাহারাও সেই ব্যবস্থা খারিজ করিতে বাধ্য হয়, কেননা বৃটিশ জনসাধারণ ঐ সময় রুশিয়ার প্রতি বন্ধুত্বভাব পোষণ করিতেছিলেন না।

বিষয়গুলির রাষ্ট্রীয় তাৎপর্য্য কিছু ছিল না কারণ ঐ জাতীয় নৃত্যগীতের দল লইয়া যাওয়া বা আমন্ত্রণ করা বৃটেনে রাষ্ট্রীয়ভাবে করা হয় না। রুশিয়া কিন্তু ঐ নিমন্ত্রণ খারিজ করার বিষয় লইয়া উচ্চস্তরের একটা রাষ্ট্রীয় অনুযোগ অভিযোগের অবতারণা করিল এবং তাহা লইয়া বৃটিশ জনসাধারণ আরই রুশনেতাদিগের বুদ্ধির সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইল। যদি কোন জাতির লোকেরা অপর কোন জাতির প্রতি বন্ধুত্বভাব পোষণ করিতে না পারে তাহা হইলে সেই কথা লইয়া কোন নালিশ করা রাষ্ট্রীয়ভাবে চলে না। যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহাকে ভালবাসে। জোর করিয়া অথবা কোন রাষ্ট্রগত উপায়ে কোন জাতি অপর কোন জাতিকে ভালবাসিতে বা ভালবাসাইতে পারে না। রুশিয়া যদি গায়ের জোর দেখাইয়া কোন ক্ষুদ্রজাতিকে নিজের বিশ্বাসের বিপরীত পথে চালাইতে চেষ্টা করে তাহা হইলে রুশিয়াকে বিশ্ববাসী কখনই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টেরও এমন কোন আইন-সঙ্গত শক্তি নাই যাহাদ্বারা বৃটিশ জনসাধারণকে তাহারা রুশিয়াকে ও রুশিয়ার নৃত্যগীতকারীদিগকে ভালবাসাইতে অথবা বন্ধুভাবে আমন্ত্রণ করাইতে সক্ষম হইতে পারে; কারণ রুশিয়ায় যাহা করা যায় বৃটেনের আইনে তাহা করা সম্ভব হয় না। রুশিয়াতে মানুষকে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রের হুকুমে চলিতে হয়। এই রাষ্ট্রের হুকুম চালাইবার ক্ষমতার রুশিয়াতে কোন সীমা নাই। সকল ক্ষেত্রে ও সকল কার্য্যেই রাষ্ট্র হুকুম দিয়া সকল মানুষকে হুকুম অনুযায়ীভাবে কার্য্য করিতে বাধ্য করিতে পারে। বৃটেন আমেরিকা বা অপর বহু দেশেই রাষ্ট্রের প্রভুত্ব বিশেষ করিয়া সীমাবদ্ধ। বহুক্ষেত্রে ও বহুকার্য্যেই রাষ্ট্র কোনরূপ আদেশ বা নির্দ্দেশ দিতে পারে না। এই কারণে রুশদেশীয় রীতিনীতি বৃটেনে চলে না এবং বৃটিশ জনসাধারণ যদি রুশিয়ার সহিত সখ্য ও আদানপ্রদান বন্ধ করা স্থির করে তাহা হইলে বৃটিশ রাষ্ট্রশক্তি তাহার কোন প্রতিকার করিতে সক্ষম হইবে না। রুশিয়ার অভিযোগপত্র এই কারণে কার্য্যকর হয় নাই এবং ঐরূপ পত্র লিখিয়া রুশিয়ার শাসকগণ শুধু নিজেদেরই হাস্যাস্পদ করিয়াছেন। এখন পরিস্থিতি যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে রুশিয়া বিশ্বের জনমত সম্বন্ধে পূর্ব্বের ন্যায় আর তেমন উদাসীন থাকিতে সক্ষম হইতেছে না। কারণ রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট শত্রু চীন, চেকোস্লোভাকিয়া ইউগোস্লাভিয়া, রুমেনিয়া এবং বুলগেরিয়া একদিকে থাকায় অপরদিকের সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির সম্বন্ধে রুশের ভীতি প্রকটতর হইয়াছে।

ইসরায়েল আরব সমস্যা

ছয়দিনের যুদ্ধের পর ইহুদি সমরশক্তির নিকট আরব জাতিগুলি পরাজিত হইয়া অদ্যাবধি কোনকিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইসরাইল নিজেদের এলাকার বাহিরে বহু স্থল দখল করিয়া রহিয়াছে এবং সে সকল অঞ্চলের আরববাসিন্দাগণ দেখা যাইতেছে ইসরাইলের শাসন মানিয়া চলিতে কোন আপত্তি প্রকাশ করিতেছে না। ইহার কারণ এই যে আরবদিগের শাসনে তাহারা যে সকল সুখসুবিধা উপভোগ করিত সেই তুলনায় ইহুদিশাসনে তাহাদিগের অবস্থা উন্নততর হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। আরবদিগের সহায়ক রুশিয়া এবং ইসরায়েলের সমর্থক আমেরিকা এই দুই মহাশক্তিরও যুদ্ধ করিয়া ইসরায়েল আরব সমস্যার সমাধানের কোন আগ্রহ দেখা যায় না পরন্তু

তাহারা শান্তিই প্রতিষ্ঠিত রাখা প্রয়োজন মনে করেন। ফলে যে আরব দেশের বহু অংশ ইসরায়েলের করায়ত্ত হইয়া রহিয়াছে সেই সকল স্থান আরব রাজত্বগুলিকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থাও হইতেছে না। ইসরায়েল চাহিয়াছে যে তাহার রাজত্বে পুরাতন সীমানা ও তাহার রাষ্ট্রীয় অধিকার আরবজাতিগুলি মানিয়া লয়। কিন্তু আরবজাতিগুলি তাহাদিগের পুরাতন দাবী ধরিয়া বসিয়া আছে। সেই দাবী স্বীকার করিয়া লইলে ইসরায়েল রাষ্ট্রের আর কোন অস্তিত্ব থাকে না এবং পৃথিবীর সকল ইহুদিদিগের মাতৃভূমি বলিয়া আর কিছু থাকে না। পৃথিবীর ইহুদিগণ খুব অসহায় দরিদ্র নহে, তাহারা সহস্র সহস্র কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইসরায়েল রাষ্ট্রকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে সেই রাষ্ট্র অপরাপর সমবায় রাষ্ট্রের তুলনায় বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। ইহুদিগণ বিশ্বের বহুজাতির কথায় ও সাহায্যে ঐ স্থলে ইসরায়েল রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছে ইহা যদি অন্যায় হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই অন্যায় ইহুদিরা করে নাই; করিয়াছে বৃটেন, আমেরিকা প্রভৃতি জাতিগুলি। ইসরায়েল স্থাপিত হইবার পর রুশিয়া আমেরিকা ও বৃটেনের সন্ধিবদ্ধ বন্ধু-রাষ্ট্র ছিল ও ঐভাবেই হিটলারের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া ছিল। আমরা যতটা জানি রুশিয়ার ইহুদিদিগের মধ্যেও অনেকে ইসরায়েল আসিয়া সেই রাষ্ট্রের প্রজা হইয়াছেন। কেহ কেহ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া ঐদেশের শাসনকার্য্যও চালাইতেছেন।

সকল অবস্থা বিচার করিয়া একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে আরবদিগের দাবী মানিয়া ইসরায়েল রাষ্ট্র উৎপাটিত করার কথা সম্ভাব্য পরিকল্পনা হইতে পারে না ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে এবং তাহাকে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেওয়াই একমাত্র পন্থা। পৃথিবীতে বহু রাষ্ট্রই গঠিত হয় ও প্রতিষ্ঠিত থাকে, যাহার মূল কথা খোঁজ করিলে দেখা যায় যে জাতীয় ঐতিহাসিক বা মানবীয় আদর্শ বিচার করিয়া কোন কোন রাষ্ট্র গঠিত হইলেও তাহার প্রতিষ্ঠা লইয়া কেহ আপত্তি করিতেছে না। যথা পাকিস্তান। এই রাষ্ট্র শুধু পূর্ব্বযুগের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের চেষ্টায় গঠিত হইয়াছে ও ভারতকে ভাগ করিয়া তাহার জাতীয় শক্তি লাঘব করা ব্যতীত তাহার অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আরব দেশের বহু ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র গঠনের মূলেও বৃটিশের কারসাজি ব্যতীত আর কোন কারণ বা আদর্শ দেখা যায় না। ইসরায়েলের গঠনও ঐভাবেই হইয়াছে। সুতরাং বিশেষ করিয়া ইসরায়েলের উৎপাটন চেষ্টার কোন বিশ্বমানবীয় মূল্য নাই। রুশিয়া যে ক্ষেত্রে আর একটি ধর্ম্মান্ধতাক্লিষ্ট রাষ্ট্রের সংরক্ষণের জন্য বৃটেন ও আমেরিকার সহিত মিলিতভাবে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে রুশিয়ার নবজাগ্রত পাকিস্থান প্রীতির কোন সমর্থনযোগ্য অর্থ কেহ বুঝিতে পারিতেছে না; সে অবস্থায় রুশিয়া যদি আরবদিগের ইসরায়েল ধ্বংস চেষ্টার সাহায্য করেন তাহা হইলে রুশিয়ার সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শবাদ সম্বন্ধে সকলের একটা স্বাভাবিক সন্দেহ অনায়াসেই জাগ্রত হইতে পারে।

আরবদিগের পক্ষেও ইসরায়েল রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ও আর্থিক বিলি ব্যবস্থার ধারা দেখিয়া চলা উন্নতিকর হইবে। কারণ আরবজাতিগুলি অতি দরিদ্র এবং সুশাসিত নহে। মিশরে এখনও শতকরা ৭৪ জন কৃষকের নিজের জমি নাই। মিশরের ছাত্র-আন্দোলনের জন্য সভাপতি নাসের যদিও ইহুদি প্ররোচকদিগকে দোষ দিয়াছেন; তাহা হইলেও বস্তুতঃ নাসেরের নিজের বিলিব্যবস্থাই সেই বিক্ষোভের কারণ। অন্যান্য আরব-দেশেরও অবস্থা খুব উত্তম নহে; কারণ তাহা যদি হইত তাহা হইলে ইসরায়েল অধিকৃত আরব অঞ্চলে নানাপ্রকার গোলযোগ হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে আরব জনসাধারণ ইহুদিদিগের প্রভুত্ব মানিয়া চলিতে বিশেষ কোন অসম্মতি প্রকাশ করিতেছে না। বরঞ্চ তাহারা ইসরায়েলের ব্যবস্থা নিজেদের পক্ষে সুবিধাজনক বলিয়াই মনে করিতেছে ব'লয়া অনেকের ধারণা।

(এরপর ৩৩৫ পাতায়)

সৌন্দর্যের কবি বিদ্যাপতি

অসীম বর্দ্ধন

"জোয়ান রাজপুত সৈনিকরা ধেয়ে চলেছে, তুরঙ্গ অর্থাৎ অশ্বকে নাচাচ্ছে, গাঢ়স্বরে কথা বলছে, লাল হলদে শ্যামল রংয়ের চামর নিয়েছে তাদের কানে কুণ্ডল দুলছে। আবর্তন বিবর্তন পদপরিবর্তনে, তাদের ঘোড়া-ফেলায় মনে হচ্ছে যুগ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তবলের ঘন আওয়াজে কানে কিছু শোনা যাচ্ছে না, পরস্পরকে সানে ইশারায় কথা বোঝাতে হচ্ছে।"

"জোঅন্না ধাবহিঁ তুরঙ্গ নচাবহি
বোলহি গাঢ়য় বোলা
লোহিত পিত্ত সামর লহি অঁউ চামর
সবনহি কুণ্ডল ডোলা
আবত্ত-বিবত্তে পঅ পরিবত্তে
জুগ পরিবত্তণ ভাণা
ঘন তবল নিসানে সুনিঞ্চ ন কানে
সাণে বুজ ঝাবই আনা।"

শব্দময় ছবির মতো, সবাক চলচ্চিত্রেরই মতো এই বর্ণনাটি মিথিলার বিদ্যাপতি ঠাকুরের লেখা প্রায় পাঁচশো বছর আগে। 'জোঅন্না ধাবহিঁ তুরঙ্গ নচাবহি' —এ বাংলা ভাষা নয়, পাঁচ-শো বছর আগে মিথিলার মৈথিলী অবহট্ঠ ভাষায় এ পদ লেখেন কবি বিদ্যাপতি —'জোয়ানরা ধেয়ে চলেছে, তুরঙ্গ নাচাচ্ছে'। বিদ্যাপতি ঠাকুর ছিলেন মিথিলার মহারাজা কীর্তিসিংহের রাজ-সভায় রাজকবি—মহারাজ কীর্তিসিংহের জীবনী নিয়ে মহারাজার প্রশংসা করে "কীর্তিলতা" নামে তিনি যে কাব্য লিখেছিলেন, তাতেই যুদ্ধ বর্ণনা দিতে গিয়ে ঐ পদটি তিনি লিখেছেন। "কীর্তিলতা" কাব্যে বিদ্যাপতি সমাজের ছবি এঁকেছেন, যুদ্ধের ফলে সমাজের কত ক্ষতি হয়, তার বর্ণনা করেছেন। তেমনি "কীর্তিপতাকা" নামে আর একখানি কাব্যে মহারাজ শিবসিংহের জীবনের কথা, বীরত্বের কথা লিখেছিলেন।

বিপুল অভিজ্ঞতা আর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বিদ্যাপতি ঠাকুরের। যখন পঁচিশ বছরও বয়স হয়নি, তখনই নৈমিষারণ্যের তপোবনে গিয়ে ছাত্র হয়ে তিনি ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র নিয়ে চর্চা করেছেন। জীবন তাঁর বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ, কখনো রাজসভার কবি, কখনো হয়তো যুদ্ধে পরাজিত বিতাড়িত রাজা কীর্তিসিংহের সঙ্গে বনে বাস, কখনো পালিয়ে বেড়িয়ে উদাসীন অন্যমনস্ক পথিক হয়ে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ—সে এক বিচিত্র জীবনধারা। শান্ত হয়ে বসে রুদ্ধ মন নিয়ে তিনি কাব্য লেখেননি—অনেক দেখেছেন, অনেক শিখেছেন, দেশবিদেশ বহু ঘুরেছেন। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন। সবকিছু তিনি চোখ মেলে দেখতেন, তাই তীর্থ ভ্রমণ নিয়ে তিনি সংস্কৃতভাষায় যে বই লিখেছিলেন "ভূপরিক্রমা" নাম দিয়ে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে, তাতে মিথিলা থেকে নৈমিষারণ্য পর্যন্ত যেসব তীর্থক্ষেত্র ছিল সেগুলির চমৎকার বিবরণ ধরা পড়েছে। একবার রাজা পুরাদিত্যকে খুশি করবার জন্যে "লিখনাবলী" নামে একখানি পুঁথি লিখেছিলেন যাতে চিঠি লেখার নানা-ধরনের পদ্ধতি ও সংকলন করেছিলেন কবি বিদ্যাপতি। আবার এক সময়ে তিনি নিজের হাতে ভাগবতের

অনুলিপিও করেছেন। প্রতিভা ছিল তাঁর বহুমুখী, ইচ্ছা আর রুচির মধ্যে ছিল বৈচিত্র্য। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবির এরকম বহুমুখী প্রতিভার কথা জানা যায়নি। নানাবিষয়ে তিনি লিখে গেছেন—ভূগোল, ইতিহাস, ন্যায়, স্মৃতি, নীতি, শিবদুর্গার গান রাধাকৃষ্ণের পদাবলী, কত কি। তাঁর লেখা গ্রন্থ অনেক—ভূপরিক্রমা, কীর্তিলতা, পুরুষপরীক্ষা, কীর্তিপতাকা, লিখনাবলী, শৈবসর্বস্বহার, গঙ্গাবাক্যাবলী, বিভাগসাগর, গয়াপত্তন, দানবাক্যাবলী, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী। কয়েকখানি গ্রন্থ আজও চর্চা করা হয়। আর অধ্যাপনাও করেছেন তাষার অলঙ্কারশাস্ত্রে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে আশী বছর বয়স পর্যন্ত।

কবি বিদ্যাপতি—মিথিলার কোকিল বিদ্যাপতি—নিজেকে তিনি বলতেন 'অভিনব জয়দেব'; কেউ বলতেন 'নব জয়দেব'—কারণ বিখ্যাত কবি জয়দেবের সংস্কৃতভাষার কবিতা-ঝরণাকে তিনিই প্রথম মাতৃভাষায় অভিনব রূপ দিয়ে সবার হৃদয়ের কাছে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর আর এক উপাধি হয়েছিল 'কবিকণ্ঠহার'। এদেশের আকাশে-বাতাসে তাঁর কাব্যগীতির সুর প্রথম ছড়িয়ে পড়েছিল—সে আজ পাঁচশো বছর আগের কথা। মিথিলার বিদ্যাপতিঠাকুর মৈথিল ভাষাতেই কবিতা লিখতেন, সে ভাষা কিন্তু বাংলাদেশে কেউ বুঝতো না; তবু কেমন করে তাঁর গান কবিতা বাঙালীর মন জয় করলো, সে কথা জানতে সত্যিই ইচ্ছে হয়। আর, সে-কথা জানতে হলে প্রায় ছ'শো বছর পেছনে ফিরে যেতে হবে আমাদের।

মাতৃভাষাকে তিনি ভালোবাসতেন, তাই মাতৃভাষা মৈথিলীতেই বেশী লেখা লিখেছেন। মৈথিলী ভাষা ছিল অনেকটা বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া এবং অসমীয়া ভাষার মতোই। সাধারণ মানুষের চলতি ভাষা। ঐ কারণেই বিদ্যাপতির লেখা গান, কবিতা অত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাঙালী বহু ছাত্র সে সময়ে ন্যায়শাস্ত্র চর্চা করবার জন্যে মিথিলায় যেতেন, তাঁরাও বিদ্যাপতির বহু গান বহু পদ বাংলা দেশে নিয়ে এসে প্রচার করতেন। বাংলা ও মৈথিলীভাষার অক্ষরও প্রায় একরকম ছিল। তাই বাংলাদেশেও বিদ্যাপতির পদ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্যাপতি নরনারীর ভালোবাসা নিয়ে যেসব পদ লিখেছিলেন, সেগুলি শ্রীচৈতন্যদেবের খুব ভালো লাগতো। বিদ্যাপতির লেখা রাধাকৃষ্ণের পদাবলী তাঁকে গান গেয়ে শোনানো হতো। ওগুলি তাঁর খুব ভালো লেগেছিল বলেই বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল খুব তাড়াতাড়ি। বাংলাদেশে গোবিন্দ দাস জ্ঞানদাস বলরামদাস ইত্যাদি যাঁরা পদাবলী লিখতেন, তাঁদের ওপরেও বিদ্যাপতির প্রভাব পড়েছিল; তাঁরাও বাংলা-মৈথিলী মেশানো "ব্রজবুলি" নামে একরকম ভাষায় পদ লিখতেন, ফলে বিদ্যাপতির ধরণের পদাবলী খুব ছড়িয়ে পড়ে। নইলে বিদ্যাপতির মৈথিলীভাষা বাঙালী ভালোভাবে বুঝতেই পারতো না।

বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলেন। জন্ম আনুমানিক ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে, বেঁচেছিলেন অনুমানিক ১৪৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। মোটামুটি এই আশীবছর জীবনে তিনি যে কবিখ্যাতি লাভ করেছিলেন, তার সুরু হয়েছিল অতি অল্প বয়সেই। তরুণ বিদ্যাপতির কবিত্ব-শক্তিতে মুগ্ধ হয়ে মিথিলার মহারাজা শিবসিংহ তাঁকে সুকবিত্বের সম্মানে বিসপী নামে একটা গোটা গ্রামই উপহার দিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করতেন।

মহারাজ শিবসিংহকে একবার দিল্লীর সম্রাট বন্দী করে মিথিলা থেকে নিয়ে যান দিল্লীতে। তখন বিদ্যাপতি গিয়েছিলেন দিল্লীতে তাঁকে উদ্ধার করতে। সেখানে গিয়ে দিল্লীর সম্রাটকে তিনি তাঁর কবিতা শুনিয়েছিলেন এবং সম্রাটকে মুগ্ধ করে মহারাজ শিবসিংহকে মুক্ত করে আনতেও পেরেছিলেন। যে-ভালোবাসা যে-প্রেমের অনুভূতি মানুষের ক্ষুদ্র হৃদয় থেকে সৃষ্টি হয়, তা মানুষকে ছাড়িয়ে সমস্ত বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডকে আলিঙ্গন করে, এই ভাবটুকু আদি কবি বিদ্যাপতি মধুরভাবে বর্ণনা করতে পেরেছিলেন বলেই এতবড় কাজ সমাধা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

সত্যিই কবিতা মানুষের হৃদয়ের মনের ভাব-আবেগকে প্রকাশ করে মধুরভাবে। ভগবানের প্রতি ভক্তি এবং মানুষের ভালবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে মানুষের মনের আবেগ এতো সূক্ষ্ম এতো গভীর হয়ে ওঠে যে, তার জন্য কবিতার মতো মধুর বর্ণনাভঙ্গী আর ভাষার অলঙ্কারের প্রয়োজন হয়। অনেকে যে বলেন, যাকে আমরা ভালবাসি, কেবল তারই মধ্যে আমরা অনন্ত বিশ্বকে অনুভব করতে পাই, তার মধ্যেই সব কিছু পেয়ে যাই মনে হয়, মনপ্রাণ ভরে যায়, কথাটা সত্যি। এমন কি সামান্য জীব, গাছপালা, জড় প্রকৃতির মধ্যেও অনন্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডকে অনুভব করার নামই ভালবাসা। তাই সব ভালবাসাই মহৎ, সব ভালবাসাই স্বর্গীয়, সব স্নেহ সমস্ত প্রেমই অনন্তের অনুভব ছাড়া আর কিছুই নয়। মা যখন আপন সন্তানের মধ্যে আনন্দের শেষ খুঁজে পান না, সমস্ত হৃদয়খানি খুলে দিয়েও ছোট্ট মানুষটিকে ঘিরে রাখতে পারেন না, তখন নিজের সন্তানের মধ্যে ভগবানের অনুভব তিনি করতে থাকেন। যখন প্রভুর জন্য ভৃত্য প্রাণ দেয়, বন্ধুর জন্যে বন্ধু সব কিছু অর্পণ করে, প্রাণ দিয়ে ফেলে, দুটি হৃদয় মন প্রাণ যখন পরস্পরের কাছে নিজের সব কিছু সমর্পণ করার জন্যে আকুলতা বোধ করে, তখন ঐ ভালবাসার মধ্যেও মস্তবড় ঐশ্বর্য অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> "দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
> প্রিয়জনে,—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
> তাই দিই দেবতারে ; আর পাবো কোথা ?
> দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা !"

কবি বিদ্যাপতির কাব্যেও তাই দেখা যায়। স্নেহ ভালবাসা সৌন্দর্যের বর্ণনা তিনি এমন সুন্দরভাবে, সুন্দর উপমা আর চমৎকার অলঙ্কার দিয়ে কাব্যে গেঁথেছেন যা পড়তে পড়তে বিভোর হয়ে যেতে হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছিলেন, এবং সেই লেখাতেই তাঁর সুনাম বেশি। তাহলেও তাঁর লেখা হরগৌরী পদগুলিও খুব ভাল। তিনি যে শিবভক্ত ছিলেন, একথা অনেকেরই জানা নেই। পদাবলী লিখে তাঁর এত নাম যে, লোকে তাঁকে বৈষ্ণব আর রাধাকৃষ্ণের ভক্ত বলেই জানে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাপতি কোনো সম্প্রদায়ের কবি ছিলেন না ; তিনি রাধাকৃষ্ণের পদ লিখেছেন, হরগৌরীর পদও লিখেছেন, দুর্গার ভক্ত ছিলেন, তাই 'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী' বই লিখেছিলেন।

বিদ্যাপতির শিবগীতগুলি অর্থাৎ হরগৌরী পদগুলি খুব জনপ্রিয় হয়নি এদেশে। মিথিলা অঞ্চলে শিবগীত-গুলিকে আজও "নাচারী" এবং "মহেশবাণী" বলা হয়। এগুলি এখনও বিবাহ-উৎসবে মেয়েরা গেয়ে থাকেন। এই গানগুলিতে স্নেহ, কৌতুক, করুণভাব এবং অদ্ভুত বর্ণনা চমৎকারভাবে মিশে গেছে। একটি শিবগীতে আছে : শিব বিয়ে করতে এসেছেন বুড়ো বলদে চড়ে —হাতে ত্রিশূল, গলায় রুদ্রমালা, পরণে বাঘছাল, সর্বাঙ্গে ছাইমাখা, আর সঙ্গে ভূতপ্রেত। এই অদ্ভুত বর দেখে প্রতিবেশিনীরা বড় কৌতুকবোধ করলো, তারা নানাভাবে বিদ্রূপ করতে লাগলো, আবার সাপের ফোঁসফোঁসানি শুনে ভয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু ভোলানাথ শিব ওসব উপহাস বিদ্রূপে মোটেই লজ্জা পেলেন না। এখানে মহাদেবের বেশভূষা, চলাফেরা নিয়ে মজার বিবরণ ঠাট্টাতামাসা থাকলেও তিনিই যে গৌরীর আরাধ্য দেবতা, ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তা কবিতায় ফুটে উঠেছে। পরে আর একটি পদে ফুটে উঠেছে ঘরের সুখদুঃখের কথা। ঘর সংসারে শিবের অনেক জালা। বলছেন, "গণেশের ইঁদুর আমার ঝুলি কেটে দিয়ে ছুটোছুটি করছে। ঝুলি কেটে ইঁদুরটা মাথায় জটাও কাটছে। মাথায় বসে গঙ্গার জল পান করছে। বেটা কার্তিক এক ময়ূর পুষেছে, সেটা দেখে আমার

দা' ভয়ে কাঁদে। গৌরী, তুমি যে বড় মোটা এক সিংহ পুষেছো, তাকে দেখে আমার ষাঁড়টা ভয় পায়।" সংসারে কেবল দুঃখ আর দুঃখ, এ দুঃখ যেন প্রজাপতিরও:

আই তাঁ শুনিঅ উমা ভল পরিপাটী
উমগল ফিরে মুস ঝোরী মোর কাটি॥
ঝোরীরে কাটিএ মুস জটা কাটি জীবে।
সিরম বৈসল সুরসরি জল পীবে॥
বেটারে কাতিক এক পোসল মজুর।
সেহো দেখি ডর মোর ফণিপতি ঝুর॥
তোঁক যে পোসল গৌরী সিংহ বড় মোটা।
সেহো দেখি ডর মোর বসহা গোটা॥
ভনহি বিদ্যাপতি বাঁসক সিঙ্গা।
তপবন নাচথি ধতিঙ্গা তিঙ্গা॥

বিদ্যাপতি বলছেন, বাঁশের সিঙ্গা বাজিয়ে তপোবনে মহাদেব ধতিঙ্গা তিঙ্গা করে নাচছেন।

বিদ্যাপতির লেখা আর একটি 'মহেশবাণী' বা শিব-গীতে ভোলানাথ শিবের প্রতি কবি প্রার্থনা জানাচ্ছেন: "হে ভোলানাথ, তুমি কখন আমার দুঃখ হরণ করবে? দুঃখেই জন্ম হলো, দুঃখেই কাটাবো, সুখ তো স্বপ্নেও হলো না। যদিও ভবসাগরে কোথাও থই নেই, হে ভৈরব, এসে আমার হাত ধর।

"কখন হরব দুঃখ মোর, হে ভোলানাথ
দুখহি জনম ভেল দুখহি গমায়ব
সুখ সপনহি নহি ভেল, হে ভোলানাথ।
যদি ভবসাগর থাহ কতহুঁ নহি
ভৈরব ধরু কর আয়ে, হে ভোলানাথ।"

হরগৌরী পদগুলির একটিতে আছে, "গৌরী বলছেন, হে নাথ, আজ এক মহাব্রতে মহাসুখ হবে, আনন্দ হবে। তুমি শিব নটবেশ ধরো, ডমরু বাজাও, নাচো। তখন শিব না নাচবার মতলবে বলছেন, গৌরী, তুমি নাচতে বলছো, আমি কেমন করে নাচবো? আমার চারটি জিনিসের চিন্তা আছে, তার কি হবে? আমি নাচলে দেহ থেকে অমৃত চুঁইয়ে মাটিতে ঝরে পড়বে, অমৃত পেয়ে আমার বাঘের ছাল জেগে উঠে বাঘ হয়ে যাবে, আমার বাহন ষাঁড়টিকে ধরে খেয়ে ফেলবে। আমার মাথা থেকে সাপগুলো সর্ সর্ করে দশদিকে ছুটবে, কাতিক একটা ময়ূর পুষেছে, সেই ময়ূরটা সাপগুলোকে ধরে খাবে। আমার জটা থেকে গঙ্গা উছলে মাটিতে ছড়িয়ে পড়বে, হাজার ধারায় ছুটবে, সামলানো যাবে না তাকে। আমার গলা থেকে মুণ্ডমালা ছিঁড়ে পড়বে, আর তাহলে যে পৃথিবীতে জেগে উঠবে শ্মশান। গৌরী, তখন তুমি পালিয়ে যাবে, নাচ আমার দেখবে কে?" বিদ্যাপতি বলছেন, আমি গান করে শোনালাম, গৌরীর মানরক্ষা হলো, এবং চারি চিন্তাও বাঁচলো, অর্থাৎ নাচতেও হলো না, মহাদেবকে বিপদে পড়তেও হলো না।

আজু নাথ এক ব্রত মহাসুখ লাগত হে।
তোহেঁ সিব ধরু নটবেস ডমরু বজাবহ হে॥
তোহেঁ গৌরী কহৈছহ নাচয় হম কোনা নাচব হে।
চারি সোচ মোরা হোয় কৌনে বিধি বাঁচত হে॥
অমিয় চুবিয় ভূমি খসত বঘম্বর জাগত হে।
হোএত বঘম্বর বাঘ বসহা কেঁ খাএত হে॥
সির সোঁ সসরত সাঁপ দহোদিসি জাএত হে।
কাতিক পোসল ময়ুর সেহো ধরি খায়ত হে॥
জটা সোঁ ছিলকত গঙ্গ ভূমিপর পাটত হে।
হৈত সহস্রমুখ ধার সমটিও নে জাএত হে॥
রুণ্ড মাল টুটি খসত মসানী জাগত হে।
তোহে গৌরি জয়বহ পড়ায় নাচকে দেখত হে॥
ভনহিঁ বিদ্যাপতি গাওল গাবি সুনাওল হে।
রাখল গৌরী কের মান চারু বচাওল হে॥

বিদ্যাপতির রচনা থেকে কৌতুকের পদ আর একটি দিচ্ছি আগে, এখনকার বাংলায় বলি—

"কাঙালের যদি ধন কিছু হয়
উৎসাহ তার সীমানা ছাড়ায়;
শিয়ালের যদি শিশু জনমায়
পাহাড়কে সে ওপড়াতে চায়।

পিঁপড়ের যদি পাখা জনমায়
ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আগুন ভেতর,
একটুকু জলে কে বা নাহি জানে
পুঁটিমাছগুলি করে কর্‌ কর্‌।।"

বিদ্যাপতির ভাষায় এই পদটি এই রকম—

"নিধন কা জগো ধন কিছু হো
করএ চাহ উছাহ।
সিআর কা জগো সীঁগ জনমএ
গিরি উপারএ চাহ।।
পিপড়ী কা জগো পাঁখি জনমএ
অনল করএ ঝপান।
ছোটা পানী চহ চহ কর পোঠী
কে নহি জান।।"

বিদ্যাপতির সবচেয়ে বেশি খ্যাতি রাধাকৃষ্ণের পদাবলীর জন্যে। এগুলিকে ঠিক বৈষ্ণব পদাবলী বলা যায় না। কোথাও তিনি একবারও শ্যাম নাম ব্যবহার করেন নি, কোনো কোনো পদে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ পর্যন্ত নেই, কিন্তু মানুষের ভালবাসা ও সুখদুঃখের অনুভূতি এবং দেহসৌন্দর্য এমন মনোরমভাবে প্রকাশ করেছেন যে, তিনি মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে অমর হয়ে রয়েছেন। তাঁর উপমা, তাঁর বর্ণনার সুন্দর কৌশল চিরকাল মানুষকে আনন্দ দেবে। তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বসন্ত ও বর্ষা এই দুটি ঋতু সম্পর্কে অনেকগুলি পদ লিখেছিলেন। বর্ষা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন—"গগনে গরজে ঘন ফুকরে ময়ূর।" আর একটি বিখ্যাত পদে বলছেন, "বাজ পড়ছে শত শত, আমোদিত ময়ূর নাচে মেতেছে, ব্যাঙ ডাকছে আনন্দে মত্ত হয়ে, ডাহুক পাখী ডাকছে।"

"কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী।"

ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের গানের মতো: হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।" অবশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো এতখানি উন্মাদনা বিদ্যাপতির বর্ষার গানে ফুটে উঠতে পারেনি।

আবার বসন্তের আহ্বান শুনে বিদ্যাপতি বলেছেন, "চল, বসন্ত ঋতু দেখতে যাই, যেখানে, কুন্দ-কুসুম কেতকী হাসছে, যেখানে নির্মল চন্দ্র, ভ্রমর কালো, রজনী এতো সুন্দর এতো উজ্জ্বল, যেন দিনও অন্ধকার মনে হচ্ছে।"

"চল দেখএ যাউ ঋতু বসন্ত।
যহাঁ কুন্দ কুসুম কেতকী হসন্ত।।
যহাঁ চন্দা নিরমল ভমর কার।
রয়নি উজাগর দিন অন্ধার।"

এখানে বসন্তের বর্ণনাটি ভারী সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর হয়েছে 'দিনকেও অন্ধকার মনে হচ্ছে' কথাটি। বসন্তের রাত্রির সৌন্দর্য এতো ভালো লাগে যে, সেই সৌন্দর্যের অনুভূতির ফলে দিনের বেলাও অন্ধকার ম্লান মনে হয়। আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে বিদ্যাপতি এই কাব্যভাবটুকু মাত্র দু' একটি শব্দে কেমন চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কারণেই তাঁকে সবাই বলে 'সৌন্দর্যের কবি'। তিনি বলেছেন, "বসন্তের সৌন্দর্য দেখে মাধব অর্থাৎ কৃষ্ণের মনে উল্লাস হলো, বৃন্দাবনে তাই বসন্ত ব্যক্ত হলো"—

"দেখি দেখি মাধব মন উলসন্ত।
বিরিন্দাবন ভেল বেকত বসন্ত।।"

আনন্দস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের মনে যখন উল্লাস জাগে, তখনই বসন্ত জাগে। তেমনি মানুষের মনের আনন্দেই বসন্ত—এই ভাবটি বিদ্যাপতির ছোট্ট এই পদটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এখানে শুধু সৌন্দর্যের বর্ণনাই নেই, আছে অনুভূতির গভীর অর্থ, আনন্দের মর্যাদা মূল্য।

বৃদ্ধ বয়সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বিদ্যাপতি বলেছিলেন, "মাধব, তোমায় বহু মিনতি করছি। তিল তুলসী দিয়ে আমার দেহ তোমাকে সমর্পণ করলাম। নাথ, আমার প্রতি দয়া ছেড়ো না।"

"মাধব বহুত মিনতি কর তোয়।
দএ তুলসী তিল দেহ সোঁপল
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।।"

বাংলার প্রিয় আদি কবিদের অন্যতম এই বিদ্যাপতির প্রভাব চারশো বছর পরে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও জেগেছিল —রবীন্দ্রনাথের লেখা "ভানুসিংহের পদাবলী" বিদ্যাপতিরই অনুসরণে সে-যুগের কবিতা-মাধুর্যের আধুনিক রূপ।

আরণ্যক

ডাঃ নন্দলাল পাল

বৃদ্ধ ইয়ংকিবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর ভাবে এ কী হল। দিনে দিনে তার চারপাশের প্রকৃতি যেন পাল্টে যাচ্ছে—অতীতের কোন চিহ্নই যেন আর থাকছে না। পরিবর্তনটা মামুলী নয়, মন্থরও নয়। একেবারে রাতারাতি তার চোখের ওপর সত্তর বছরের পরিচিত পরিবেশ কে যেন মন্ত্রবলে পাল্টে দিচ্ছে।

ইংয়কিবা একবার আকাশের দিকে তাকায়। বেলা আর কত আছে। না খুব নেই। একটু জোরে পা না চালালে গ্রামে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যাবে। আজকাল চোখ দু'টোতেও আর আগের মত দেখতে পায় না সে। একটু জোরে হাঁটতে গেলে হাঁফ ধরে। আকাশের দিকে তাকানোর ফলে চোখ দু'টো জলে ভরে গিয়েছে। ময়লা কাপড়ের খুঁট দিয়ে একবার সে মুছে নিল চোখ দু'টো। তারপর লাঠি ভর দিয়ে আবার খুট খুট করে চলল।

মনে মনে হাসে ইয়ংকিবা। ছ' মাইল রাস্তা মোটে বাকী—তারপরই গ্রাম। দশ মাইল এসেছে, আরো ছ' মাইল বাকী। মাইল কী জিনিষ তারও মাথামুণ্ডু সে বুঝে না। বুঝবার দরকারও হয়নি কোনদিন। এমন কত ষোল মাইল সে মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা নিয়ে এক-বারও না থেমে গিয়েছে এ রাস্তা দিয়ে। তখন ত রাস্তা ছিল আরো কত খারাপ। মানুষের পায়ে হাঁটার চিহ্ন ছাড়া আগাগোড়া সবই ছিল জঙ্গল। আর সে জঙ্গলে কত বিপদ। বাঘ, ভালুক বুনো মহিষ চরত পালে পালে। বুনো হাতীও দেখা যেত মাঝে মাঝে। ওরা নাকি আসত বর্মা থেকে। এ সব পথে দল বেঁধে ছাড়া মানুষ চলত না। কিন্তু ইয়ংকিবা নিজে কোনদিন এ সবের ধার ধারত না। হাতে বর্শা আর কোমরে দা নিয়ে সে সহস্রবার যাতায়াত করেছে এ পথে।

আর আজ! আজ কত পরিবর্তন! ইয়ংকিবা নিজের চোখ দু'টোকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। এক একবার ভাবে, সত্তর বছরের ঘোলাটে চোখ দু'টো ফাঁকি দিচ্ছে না ত।

সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবকিছু যেন ওলট পালট হয়ে গেল। সরকার কী জিনিষ তা সে আজও বুঝে উঠতে পারল না। সরকার আসার ফলে দলে দলে মানুষ লাগল জঙ্গল সাফ করতে, রাস্তা কাটতে। এখন আর আগের মত চড়াই-উৎড়াই ভাঙতে হয় না। উঁচু পাহাড়ের গায়ে গায়ে বিরাট একটা অজগরের মত রাস্তাটা চলে গেছে আর তার ওপর দিয়ে দিনরাত চলছে গাড়ী। মামুলী রাস্তা, তবু ইয়ংকিবার আজ হাঁফ ধরে।

গাড়ীর হর্ণের শব্দে ইয়ংকিবার হুঁস হয়। রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়ায় সে। ধুলির একটা গৈরিক ওড়না উড়িয়ে চলে চলে গেল গাড়ীটা। খুস খুস করে কেসে উঠল সে।

আবার পথ চলে ইয়ংকিবা এক, চলতে চলতে একসময় সে এসে পড়ল ঝুমকি নদীর কাছে।

আবার হর্ণের শব্দে ফিরে তাকায় ইয়ংকিবা। রাস্তা থেকে দূরে সরে দাঁড়ায় সে। একটার পর একটা গাড়ী যাচ্ছে আর এক এক ঝলক ধুলোর ঝাপটা এসে তার চোখেমুখে লাগছে। একটা গাড়ী চলে যায় আর ভাবে এই বুঝি শেষ হল গাড়ীর শোভাযাত্রা। কিন্তু কোথায়। এ যেন এক অগুন্তি পিপঁড়ের দল চলেছে সারবেঁধে।

ইয়ংকিবা বিরক্ত হয়। আবার আকাশের দিকে তাকায়। সূর্য পাহাড়ী মাটির ধূলির মত গোধূলির ওড়না উড়িয়ে দিগন্তের ওপাশে নেমে যাচ্ছে। তার লাল দেহটা এখনও ব্রীজের নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

ইয়ংকিবা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। তা'কে আরো ছ' মাইল রাস্তা যেতে হবে। সন্ধ্যার পর মা-বাপ-মরা নাতনীটা ভয় পাবে আর বার বার রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখবে। ইয়ংকিবার আর কে আছে। ওই ত একটি মাত্র নাতনী। তার মুখ মনে পড়ায় ইয়ংকিবা অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু যাবে কী করে। মিলিটারী গাড়ীর কনভয় যাচ্ছে। দু'পাশে ব্রীজ পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সিপাই। সব গাড়ী ব্রীজ পার না হলে অন্য লোকের যাতায়াত নিষিদ্ধ।

নীচে নদীর দিকে তাকায় ইয়ংকিবা। ভাবে, হেঁটে নদী পার হওয়া সম্ভব কি না। কিন্তু পাহাড়ী নদীর উচ্ছল উদ্দাম গতি দেখে শিউরে ওঠে। না, সম্ভব নয়।

হঠাৎ একটা শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় ইয়ংকিবা। কে যেন তাকেই ডাকছে। কিন্তু গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দে বুঝতে পারেনা শব্দটা কোন দিক থেকে আসছে।

একটু পরে একটি মানুষ এসে দাঁড়ায় তার পাশে। আগন্তুক বলে, "চিনতে পারছ না ইয়ংকু, ভাই। এতক্ষণ তোমাকে ডেকে ডেকে হয়রান।"

ইয়ংকিবা একটু এগিয়ে যায়। গলাটা বাড়িয়ে ভাল করে তাকিয়ে দেখে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও আগন্তুককে চিনতে তার ভুল হয় না। হঠাৎ মুখটা তার খুসীতে ভরে ওঠে। বলে, "ও ভাই হেরামুং, তোমার ঘর যে এখানে তা ভুলেই গিয়েছিলাম। গলার শব্দটাও তাই কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। কিন্তু পোড়া কপাল! রাজ্যের যত গাড়ী যেন আজ একসঙ্গে লেগেছে। এর বুঝি কোন শেষ নেই। সন্ধ্যাও হয়ে গেছে। এখনও এতটা রাস্তা বাকী। কখন যে যাব।"

আগন্তুক নিজেও বয়স্ক। তবে ইয়ংকিবার মত এতটা নয়। বয়স তার ষাটের কাছাকাছি। চোখে এখনও সে ভালই দেখে।

হেরামুং বলে, "আহা, বলছ কি। এখন কেমন করে এতটা রাস্তা যাবে? আর যেতে চাইলেই বা তোমাকে যেতে দিচ্ছে কে? এসো আমার ঘরে। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল।

ইয়ংকিবা বলে, "না ভাই, যেতেই হবে আমাকে। বেচারী রিতন্‌সির জন্যই আমার যত জ্বালা। হতভাগী মা-বাপকে খেয়েছে ছোট বেলায়। আর এখন আমারই যত ভাবনা। আমি না গেলে ও রাত্রে ঘুমুবেই না।

হেরামুং ইয়ংকিবার কথায় কর্ণপাত করে না। বলে, "আহা, নাতনীর জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, ইয়ংকু ভাই? তোমার শরীরের যা অবস্থা হয়েছে, কাল যদি মরে যাও তবে ত সে একাই থাকবে।"

এক প্রকার জোর করেই ইয়ংকিবাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় হেরামুং। ইয়ংকিবা প্রতিবাদ করবারও আর ফুরসৎ পায় না।

কনভয় চলে গিয়েছে। ভারী মিলিটারী গাড়ীর কর্কশ শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না।

ঘরের মাঝখানে চুল্লীর চারপাশে বসেছে সবাই—ইয়ংকিবা, হেরামুং, তসিমং, ও মুছিমং। মধুর (নাগাদের ঘরে তৈরী ভেতো মদ) চোঙা প্রত্যেকের হাতে।

কয়েকটা মুহূর্তের একটানা স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ইয়ংকিবা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। চারপাশের বাতাসটা একটু যেন কেঁপে ওঠে আর কেঁপে ওঠে ইয়ংকিবার সত্তর বছরের বুড়ো বুকটা।

হেরামুং বলে, "কী হল, ইয়ংকু ভাই! এমন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছ কেন?"

হেরামুং-এর কথায় একটু যেন চমকে ওঠে ইয়ংকিবা। মধুর চোঙায় চুমুক দিয়ে বলে, "এ কী হল রে ভাই নাগাপাহাড়ের। আজ এ কী দেখে এলাম মতুংরিতে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হয় না।"

এক প্রকার বিচিত্র শব্দ করে হেরামুং হাসে। বলে, "বুঝেছি দাদা, বুড়ো শরীরটাকে টেনে তুমি আজ মতুংরি দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু এত তোমার ভাববার কী হল। আর তুমি নিজেই কি তা অস্বীকার করতে পার যে যা হচ্ছে তা ভাল হচ্ছে না? এই সেদিনও তো দেখেছ মতুংরি টিলা। নিবিড় জঙ্গলে ঢাকা এই টিলাটা নিয়ে কী কাণ্ডটাই না হল।"

ইয়ংকিবা মাথা নড়ে। বলে, "হেরামুং, তুমি ত সেদিনের ছোকরা হে। মতুংরিতে বস্তির পত্তন নিয়ে সেমা সর্দার শাখালুর সঙ্গে যখন দাঙ্গা হয়, তখন সেলোমির দলটাকে কে চালনা করেছিল? এই শ্রীমান আর চিতৎকুব তীর বুকে লেগে যখন শাখালু মাটিতে লুটিয়ে পড়ল, তখন তার মাথাটাও এনেছিল এই শ্রীমান।

অতীত যৌবনের কথা স্মরণ করে ইয়ংকিবা উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

এমনি সময়ে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল কিচিংবা। তার পেছনে বছর তিরিশের শক্তসমর্থ এক যুবক। যুবকের দিকে তাকিয়ে হেরামুং ভ্রূ কুঁচকে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর কিচিংবাকে বলল, "বস ভাই, কী খবর?" এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসরায় উপস্থিত যুবকের পরিচয় জিজ্ঞেস করল।

কিচিংবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ইয়ংকিবাও। তারও চোখে একই প্রশ্ন, আগন্তুক কে?

পেছনে দাঁড়িয়েছিল চুবালা। তার দিকে চেয়ে হেরামুং বলল, "দেখতে পাচ্ছ না ঘরে দু'জন লোক এসেছে। হাঁ করে না দাঁড়িয়ে আরো দু'টো চোঙায় মধু দিতে পারছ না?"

স্বামীর কথায় চুবালা লজ্জিত হয়। ক্ষুব্ধও। ঐ একই ধারা লোকটার। আজ ত আর নতুন নয়। দীর্ঘ তিরিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে স্বামী সম্বন্ধে চুবালার একই অভিজ্ঞতা। স্থান-কাল পাত্র ভেদে কথা বলতে জানে না হেরামুং। একটু ফাঁক পেয়েছে ত অমনি দশ কথা শোনাবে। একা একা যদি বলে তবে এটুকু কেন দু' ঘা মেরে দিলেও চুবালা সহ্য করতে পারে। কিন্তু অজানা অচেনা লোকের সামনেও একই ব্যবহার। তারও বয়স হয়েছে, একা হেরামুং-এরই হয়নি। পঞ্চাশ বছরের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের শরীরে যদি একটু ক্লান্তি বা জড়তা আসে, তবে নিশ্চয়ই শরীরকে দোষ দেওয়া যায় না।

একটা অবরুদ্ধ লজ্জা আর আক্রোশের তাড়নায় চুবালা চলে গেল এবং কিছুক্ষণ পর দু'চোঙা মধু দু'হাতে নিয়ে এসে উপস্থিত হল।

মধুর চোঙা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল কিচিংবা। তারপর চারদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে সঙ্গের যুবকের দিকে চেয়ে নীচু গলায় বলল, "কী বল হুসিতং, শুরু করা যাক।"

সঙ্গের যুবক মাথা নেড়ে সায় দিল।

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে হেরামুংকে সম্বোধন করে কিচিংবা বলল, "তোমাদের এতজনকে এক সঙ্গে পেয়েছি, ভালই হল। নইলে আবার প্রত্যেকের ঘরে ঘরে যেতে হ'ত। বিশেষ জরুরী কথা, সকলেরই জানা প্রয়োজন।"

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে রইল কিচিংবার মুখের দিকে।

মধুর চোঙায় চুমুক দিয়ে কিচিংবা বলল, "পরশু তোমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। কিন্তু আগে 'ম' দেবতার নামে শপথ করে বল, কেউ তা প্রকাশ করবে না।"

সামনের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে চেয়ে সকলে শিউরে উঠল। 'ম' (অগ্নি) দেবতার অসংখ্য লক লকে জিহ্বা যেন তাদের মুখ থেকে কী একটা ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা শোনার জন্য অস্থিরভাবে অপেক্ষা করছে।

ফোঁস করে উঠল তসিমং। বলল, "দেবতার নামে শপথ না করলে কি চলে না কিচিংবা খুড়ো? জাতিতে

"ডক্টর, গিভ মি মরফিন, মরফিন প্লীজ।"

ক্যাপ্টেন রায় আমার আমার হাত দু'টো চেপে ধরল। তারপর আচ্ছন্নের মত বলল, "আই ডোণ্ট লাইক টু ডাই ডক্টর, আই ডোণ্ট লাইক টু ডাই। আমি মরতে চাই না ডাক্তার, আমি মরতে চাই না। আমায় বাঁচাও, যেভাবে পার আমায় বাঁচাও। উঃ, কী ব্যথা.........."

আমি বললাম, "তুই কিছু ভাবিস না, মনীস। তুই বাঁচবি, আরো বহুদিন তুই বাঁচবি। তোকে যেমন করেই হোক আমি বাঁচাব "

নিবন্ত দীপশিখা যেমন শেষবারের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠে, তেমনি মুমূর্ষু মনীশের চোখ দু'টো একবার জ্বলে উঠল। দৃষ্টিকে যথাসাধ্য প্রখর করে সে বলল, "ডাক্তার, তুমি কি আমায় চেন? আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি না তোমাকে, ডাক্তার। আমার চোখ দু'টো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছে।"

মৃত্যুপথযাত্রী মনীশকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "তুই বোধ হয় এখনো আমাকে চিনতে পারিস নি, মনীশ। আমি কিন্তু কাল তোকে অপারেশন-টেবিলেই চিনেছি। মনে করে দেখ ত রাখালকে তুই চিনতে পারিস কি না।"

একটুখানি চুপ করল মনীশ। যেন কোন সুদূর অতীতে সে ডুব দিল। তারপর অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে সে বলল, "রাখাল বলিস কি, তোকে চিনব না? সেই মহীউদ্দিন, সেই এ প্লাস বী হোল স্কোয়ার......"

উত্তেজনায় অক্সিজেনের নলটা মনীশের নাক থেকে সরে গেল। আমি তাড়াতাড়ি সেটা ঠিক করে দিয়ে নার্সকে ইনজেকশন দিতে বললাম।

মরফিনের ক্রিয়া শুরু হতে হতে বিড় বিড় করে মনীশ বলল, "রাখাল, তুই আমাকে বাঁচা। সুমিতা য় আমার পথ চেয়ে বসে আছে। আর যে দু' মাস রেই আমাদের বিয়ে। তোকে কিন্তু আমাদের বিয়েতে যেতে হবে, রাখাল। না গেলে চলবে না..."

* * *

মণীশের বুকের ডানদিকে গুলি লেগেছিল। অপারেশন করে ডানদিকের ফুসফুস থেকে গুলি বের করা হয়েছিল। জানতাম, মণীশ বাঁচবে না। তবু দু'দিন ধরে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে তার চিকিৎসা করেছি। একবারও তার কাছ থেকে উঠে যাইনি। কিন্তু মণীশকে বাঁচাতে পারিনি। আবার তার মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। সে রক্ত আর বন্ধ হয় নি।

* * *

শববাহী জীপ আর তার সঙ্গের শোভাযাত্রা দূরে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল। কেবল বিউগলের শব্দটা একটু একটু শোনা যাচ্ছিল। চোখ দু'টো নিজের অজান্তেই ঝাপসা হয়ে এল। বহুদিনের পুরনো স্মৃতির খাতার একটা পাতা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

মফঃস্বলের ছোট সহর স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়তাম। মনীশ ছিল আমার সহপাঠী। সে অনেকদিন আগেকার কথা। মনীশ ছিল ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে ছেলে! পড়াশুনায় মন্দ ছিল না, কিন্তু দুষ্টুমিতে সে ছিল 'একমেবাদ্বিতীয়ং'।

নতুন মাষ্টার মশায় মহীউদ্দিন সাহেব ক্লাসে এসেছেন। ছ' ফুট লম্বা দেহ, ঘোর কৃষ্ণ শরীরের রঙ, পরণে চিলে পাজামা, গায়ে গলাবন্ধ কোট ও মাথায় ফেজটুপি। মহীউদ্দিন সাহেব পান খেতেন খুব বেশী। গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে চকচকে একটি ডিব্বা বের করে একটার পর একটা পান খেতেন তিনি। দুর্মুখেরা বলত, পান ছাড়াও মহীউদ্দিন সাহেবের নাকি অন্য পানাসক্তিও ছিল। পানের রসে ঠোঁটদু'খানা সব সময় লাল থাকত—দাঁতগুলোও বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের স্কুলে আসার আগেই মহীউদ্দিন সাহেব সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছিলাম। ভয়ানক রগচটা লোক, অঙ্কে পারদর্শী, সাহেবের মত ইংরাজী বলেন ইত্যাদি। মহীউদ্দিন সাহেবের ইংরাজী শুনে যুদ্ধের সময় কোন

মিলিটারী সাহেব নাকি সেখে গিয়ে তাঁর সঙ্গে 'হ্যাণ্ডসেক' করেছিল।

এহেন মহীউদ্দিন সাহেব ক্লাসে এসেছেন। আমরা ভয়ে তটস্থ। নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে যে যার সীটে চুপ করে বসে আছি। অঙ্কের পিরিয়ড। তাই অঙ্কের খাতা বের করে সামনে রেখে এমন ভাবে বসেছিলাম, যেন সবাই অঙ্কের মধ্যে ডুবে আছি। মাঝে মাঝে আড়চোখে মহীউদ্দিন সাহেবের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে মনে মনে দুর্গানাম জপ করছিলাম।

মনীশও অঙ্কের খাতা খুলে সামনে রেখেছিল। কিন্তু ততক্ষণে সে খাতার ওপর মহীউদ্দিন সাহেবের এক স্কেচ এঁকে নীচে ক্যাপশন দিয়েছে 'সেকেণ্ড ফজলুল হক'।

মহীউদ্দিন সাহেব ক্লাসে এসে চেয়ারে বসলেন না। বসলেন টেবিলের একপাশে পা ঝুলিয়ে। তারপর পকেট থেকে পানের ডিব্বা বের করে একসঙ্গে গোটা চারেক পানের খিলি মুখে দিলেন এবং ছোট একটি কৌটো থেকে খানিকটা দোক্তা ও জর্দা মুখে দিয়ে চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানে সন্ধ্যা হয়। মহীউদ্দিন সাহেবের দৃষ্টি প্রথমেই পড়ল মনীশের ওপর। তিনি মনীশের দিকে ডান হাতের তর্জনী প্রসারিত করে বললেন, "ইউ বয়, এখন কী পড়ানো হবে?"

তড়িৎগতিতে মনীশ সামনের খাতাটা ডেস্কে নীচের তাকে রেখে আর একটা খাতা বের করে বলল, "স্যার, এখন এল্জাব্রার পিরিয়ড্।"

মহীউদ্দিন সাহেব বললেন, "ওয়েল, বল দিকিনি 'এ প্লাস বী হোল স্কোয়ার, মাইনাস এ মাইনাস বী হোল স্কোয়ার' কত হয়।

মনীশ উঠে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে বাঁ হাত দিয়ে কাঁধটা একটু চুলকে 'এ প্লাস বী হোল স্কোয়ার, এ মাইনাস বী হোল স্কোয়ার' বার কয়েক উচ্চারণ করে চুপ করে রইল এবং তার স্বভাব মাফিক বাঁ হাত দিয়ে কাঁধটা চুলকাতে লাগল।

একটা হায়নার মত মহীউদ্দিন সাহেব হি হি করে হেসে উঠলেন। পানের রসে বিবর্ণ দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ে মহীউদ্দিন সাহেবের প্রকাণ্ড মুখখানাকে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলল। কিন্তু মহীউদ্দিন কাব্য করে বললেন, "না, তোমা হতে এ কার্য হবে না সাধন।" তারপর তিনি চারদিকে তাকাতে লাগলেন।

মাড়োয়ারী ছেলে হনুমানজী আগরওয়ালকে এবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন মহীউদ্দীন সাহেব। সে-ও বার দু'ই শুধু প্রশ্নটাকেই আওড়ে চুপ করে রইল।

"আচ্ছা, তোমার নাম কি?"

"হনুমানজী আগরওয়াল, স্যার।"

"তবে তুমি এখানে কেন, বাপু? হনুমান হয়ে গাছে গাছে ঝোল গিয়ে, যাও।"

মাষ্টারমশায়দের দৃষ্টি সাধারণত পেছনের বেঞ্চেই আগে পড়ে। তাই সামনের বেঞ্চে মহীউদ্দিন সাহেবের একেবারে সামনের সীটে বসে কিঞ্চিৎ নিরাপদ বোধ করছিলাম। কিন্তু এড়াতে পারলাম না। মহীউদ্দিন সাহেবের প্রসারিত তর্জনীর টোকা এবার এসে সোজা-সুজি পড়ল আমার কপালে। মাথা নীচু করে বসে-ছিলাম। চমকে উঠলাম। মহীউদ্দিন সাহেব বললেন, "ইউ বয়, তুমি বলত 'এ প্লাস বী হোল স্কোয়ার মাইনাস এ মাইনাস বী হোল স্কোয়ার' কত হয়।"

এই রে, গে'ছি আমি। এতক্ষণ দুর্গানাম জপ করে এই ফল হল। যাহোক, ততক্ষণে উত্তরটা মনে মনে তৈরী করে ফেলেছিলাম। তবু গলা এবং বুকটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। গলা দিয়ে স্বর যেন বেরুতে চায় না। অতি কষ্টে বললাম, "স্যার, ফোর এবী।"

"ইয়েস, এ রকম অ্যানসারই আমি এক্সপেক্ট করি।" সশব্দে টেবিলের ওপর এক চাপড় মেরে বললেন মহীউদ্দিন সাহেব। তারপর মনীশের দিকে চেয়ে বললেন, "ইউ লাষ্ট বেঞ্চার, কাল যদি তুমি পড়া বলতে না পার, তবে আমার কব্জির জোর টের পাবে।"

আমরা ইমচুংগর। তুমি নিজের সগোত্র সম্বন্ধে এখন সন্দিহান হয়ে উঠলে কবে থেকে? তুমি কি জান না, ইমচুংগররা প্রাণ গেলেও সত্য ভঙ্গ করে না।"

অন্য সকলে একবাক্যে তসিমংকে সমর্থন করে।

ঘরের হাওয়া একটু উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বেগতিক দেখে কিচিংবা তার স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ত হাসি হেসে বলে, "আহা, অমন করে কথা বলছ কেন তোমরা? আমি কি জানি না ইমচুংগর জাতির নিষ্ঠা, দেশপ্রেম। তবে তোমরা ছেলে-ছোকরা মানুষ; তাই দেবতার নাম করে নিলাম প্রথমে।"

তসিমং জ্বলে উঠল। বলল, "দেখ কিচিংবা খুড়ো, তুমি আবার আমাদের বয়সের দোষ দিচ্ছ। নাগার ছেলে—তার কাছে সাত যা সত্যরও তাই। প্রাণ দিয়েও সে কথার মর্য্যাদা রাখে।"

কিচিংবা হঠাৎ যেন খুসী হয়ে উঠল। বলল, "হ্যাঁ বাবা, তোমরা বেঁচেবর্তে থাক। তোমরাই ত আমাদের ভবিষ্যৎ। আমরা আর ক'দিন আছি। তারপর ত তোমরাই টেনে নিয়ে যাবে এ বোঝা যা আজ আমরা বয়ে চলেছি।"

একটু থেমে কিচিংবা আবার বলে, "পরশু সকলকে কাজে যেতে হবে। অনেকদিন হয়ে গেছে, এদিকে কোন কাজকর্ম হচ্ছে না। তাই উনি এসেছেন এ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে।"

এতক্ষণ সকলে যেন উপস্থিত যুবকের অস্তিত্ব প্রায় ভুলে গিয়েছিল। কিচিংবার কথায় তার দিকে আবার চোখ ফেরাল সকলে।

কিচিংবা বলল, "ওঁকে হয়ত তোমরা চেন না। না চেনবারই কথা। উনি হসিতং সেমা। সেমা রেজিমেণ্টের মেজর।"

কিচিংবার এতক্ষণের ভণিতার উদ্দেশ্যটা যেন হঠাৎ সকলের কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল। কিন্তু তবু কিচিংবার মুখ থেকেই আসল কথাটা শোনার জন্য সকলে পরস্পরের মুখের দিকে একবার চেয়ে নিল।

কিচিংবা ফিস ফিস করে বলল, "পরশু আবার এই রাস্তায় কনভয় যাবে। ঐ দিন ওটাকে খতম করতে হবে।" তারপর একটু থেমে আবার বলল, "এ সময়ে তোমাদের সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন।"

মুহূর্তের মধ্যে ঘরে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। আগুনের আভা মুখে পড়ে কিচিংবার মুখখানাকে যেন একটা অমানুষিক নিষ্ঠুরতায় ভরে তুলল।

একটানা নীরবতার ভেতর দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত কাটে। বলবার মত কোন কথা যেন কেউ খুঁজে পায় না।

প্রথমে কথা বলে হেরাখুং। বলে, "একটা কথা না বলে পারছিনা কিচিংবা। কিছু মনে করো না। তুমি যা বলেছ, তা না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু তোমার আচরণ আমার বিশেষ ভাল লাগছে না। তোমাকে যেন আজ নতুন করে চিনতে হচ্ছে। এতদিন তোমার এ রূপটা আমার কাছে স্বচ্ছ ছিল না। তুমি মাসে মাসে সরকারের মাহিনা নিচ্ছ। এতদিন ত তোমাকে আমরা সরকারের বিশ্বস্ত দো-ভাষী বলেই জানতাম। মাঝে মাঝে আমাদের তুমি ভাল করে কাজ করতে বলেছ। বলেছ, এ কাজ আমাদের কাজ। সরকার আসার পর এত রাস্তাঘাট হয়েছে, স্কুল হয়েছে, হাসপাতাল হয়েছে। আগে ত নাগাদেশে পায়ে-হাঁটা রাস্তা ছাড়া আর কিছু ছিল না। রোগে ভুগে, মহামারীতে অসংখ্য মানুষ মরেছে। ঔষধ কী বস্তু আমরা তা জানতাম না। আর এখন—এখন যা হচ্ছে সত্যি কি তা ভাল নয়। চমৎকার রাস্তার ওপর দিয়ে আজ আমরা অক্লেশে হাঁটছি, গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা, গ্রামে গ্রামে স্কুল, কত কাছে হাসপাতাল। নেহাৎ পরমায়ু শেষ না হলে আজ আর কেউ রোগে ভুগে মরছে না। খবর পেলেই ডাক্তার-কমপাউণ্ডার ঔষধের বোঝা নিয়ে এসে আমাদের বস্তিতে বস্তিতে বিলিয়ে দিচ্ছে। স্কুলে পড়ছে তোমার আমার ছেলেমেয়ে।"

কঠিন হয়ে উঠল কিচিংবা। মুখের চোয়াল দু'টিকে

শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "তুই রাজনীতির কী বুঝিস, হেরামুং। আমি শুধু সরকারের দোভাষীই নই, দুমুখো সাপও বটে।" তারপর সাপের মতই হিস হিস করে বলল, "যদি এ কথা প্রকাশ পায়, তবে জানিস, একটা কুকুরের মত তোকে গুলি করে মারব।" এরপর আর কোন কথা বলার ফুরসৎ না দিয়ে হসিতং-এর হাত ধরে ঘরের বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কিচিংবা, কিন্তু খানিকক্ষণ পরেই গুড়ুম করে একটা শব্দ হল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানুষিক পৈশাচিক হাসি অন্ধকারের বুক চিরে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল, আর লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি হেরামুং-এর গায়ে না লেগে ইয়ংকিবার মাথার খুলিটা ফুটো করে বেরিয়ে গেল। হতভাগ্য ইয়ংকিবার সত্তর বছরের বুড়ো শরীরটা একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়েই স্থির হয়ে গেল।

(২)

যাত্রা শুরু হল। মহাযাত্রা—মহাশ্মশানের পথে। অগ্রবর্তী জীপের ভেতরে সাদা কাপড়ে মোড়া ক্যাপ্টেন মনীশ রায়ের প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহটাকে শুইয়ে দেওয়া হল।

জীপের সম্মুখ সারে নিশান-হাতে একটি সিপাই সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে রইল।

কর্ণেল কিংশটার, মেজর তেজবাহাদুর প্রভৃতি সামরিক অফিসাররা এসে মাথার টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শন করেন মৃত ক্যাপ্টেনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

বিউগল বেজে উঠল—রণউন্মাদনায় নয়, বিদায়ের করুণ তানে, যেন অসংখ্য নিশাচর পাখী একসঙ্গে কলরব করে উঠল। বিদায়ের বিষণ্ণ ব্যঞ্জনায় গোটা পরিবেশটা থম থম করতে লাগল।

আস্তে আস্তে চলছে জীপ। সঙ্গে সঙ্গে চলছে অসংখ্য সিপাই। নিঃশব্দে এক সঙ্গে পা উঠছে, পা পড়ছে।

হাসপাতালের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দেখলাম সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য। গতকালের সমস্ত ঘটনা মনে পড়ল।

* * *

রাত্রি শেষ প্রহর। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া পাইনগাছের চিকণ চিকণ পাতায় শন্ শন্ শব্দ তুলে বইছিল। কিছুক্ষণ আগে বাঁকা চাঁদ দীর্ঘ ঋজু পাইনগাছের আড়ালে ডুবে গেছে।

আকাশে শুকতারাটা জ্বল জ্বল করছিল। বিছানায় শুয়ে কাঁচের জানালা দিয়ে একমনে দেখছিলাম শুকতারাটাকে।

ঘুম ভেঙে গিয়েছে। তাই রাজ্যের যত ভাবনা এসে মাথায় ভিড় করছিল। অনেক দিনের অনেক কথা—কতক টাটকা, কতক পুরনো।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। চিন্তায় ছেদ পড়ল। গুড়ুম গুড়ুম শব্দে ভোরের হাওয়া ভারী হয়ে উঠল। হালকা মেসিন-গানের একটানা ঢু-ঢু-শব্দ, মাঝে মাঝে মর্টারের দুম দুম। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গুরুতর। বিছানায় বসে কান পেতে শব্দটা কত দূর থেকে আসতে পারে, অনুমান করতে লাগলাম।

ঠিক এমনি সময়ে টেলিফোনটা বেজে উঠল। বিছানায় বসে বসেই হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলাম। ওপাশ থেকে ডি. এম. ও ডঃ রঙ্গনাথনের গলা ভেসে এল।

"হ্যালো, ডঃ চৌরাশী ?"

"ইয়েস্ স্যার, গুড্ মর্ণিং।"

"গুড্ মর্ণিং ডক্টর। ওয়ান কনভয় ইজ অ্যাটাকড্ নীয়ার দি রিভার ঝুমকি। ক্যাজুয়েলিটি ইজ এসটিমেটেড্ টু বী হেভী। প্লীজ গো টু দি হস্‌পিট্যাল এণ্ড কীপ দি ও. টি (O T) রেডি।"

"সিয়্যরলি ইয়েস্ স্যার।"

* * *

ছন্দের রাজা সুকুমার রায়

বিনায়ক সেনগুপ্ত

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ছন্দের রাজা হ'লো সুকুমার রায়'। সুকুমার রায়কে আমরা ছড়াকার বলেই জানি। জানি তিনি শিশুদের জন্য কয়েকখানি অনবদ্য ছড়া লিখে রেখে গেছেন। আমরা যারা আজকের বৃদ্ধ, তারা, যাদেরই ছেলেবেলা এতটুকুও পড়বার অভ্যাস ছিল, নিজেদের শৈশবে ও কৈশোরে সন্দেশে সে ছড়া পড়েছি। পরে আবোল-তাবোলে যখন তা পুস্তকাকারে বেরোয় আমাদের ভাল লাগতো। কারু কারু কাছে তা এখনও লাগে, আমরাও পড়েই খুসী হ'য়েছি কিন্তু কোনদিন তলিয়ে দেখিনি তিনি কতবড় ছন্দের যাদুকর ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন ছন্দের পাকা যাদুকর। তাই সুকুমারের এই লুকোনো দিকটাও তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল।

লুকোনো বলছি এই জন্য যে আবোল-তাবোলে যে ছড়াগুলো রয়েছে তার ভিতরে কয়েকটি আছে যার ছন্দের মাধুর্য্য একেবারেই স্বপ্রকাশ, যার এতটুকুও ছন্দজ্ঞান আছে তার কাছেই তা ধরা পড়বে স্বতঃই। কিন্তু এমন আরও অনেকই ছড়া আছে যার ভিতরে রয়েছে রীতিমত প্যাঁচ যা বেশ ভাল করে লক্ষ্য না করলে তার আভ্যন্তরিক মজাটি ধরা পড়ে না। আর ঠিক সেইটিই পড়েছিল কবিগুরুর কাছে, আর তাই তিনি তাঁকে অতবড় অভিনন্দন দিয়েছিলেন যা আর কারু মুখ থেকেই বেরোয়নি যে, 'ছন্দের রাজা হচ্ছে সুকুমার'

প্রথমেই বিচার করা যাক ছন্দ জিনিষটা কি? কবিতা বা পদ্য মাত্রেরই পঙ্‌ক্তি শেষে দু'টি পঙ্‌ক্তিতে থাকে মিল। আবার প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তির অক্ষর থাকে গোনা, যদি না তা নিতান্তই আধুনিক গদ্য-কবিতা হয়। আবার পঙ্‌ক্তির ভিতরেও থাকে মাত্রা, থাকে যতি। কবিগুরুর কথা দিয়েই যখন আরম্ভ করা গেছে তখন তাঁরই একটি কবিতার দু'টি পঙ্‌ক্তিকে ধরা যাক—

> একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
> পড়িবে নয়ন পরে অন্তিম নিমেষ।

চোদ্দ অক্ষরের পঙ্‌ক্তি, প্রথম পঙ্‌ক্তিতে তার মাত্রা প্রতি দু' অক্ষরে। কিন্তু দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে চোদ্দটি অক্ষর ঠিক থাকলেও তার মাত্রা হচ্ছে প্রতি তিন অক্ষরে কেবল মাঝখানের একটি শব্দ ছাড়া। প্রথম পঙ্‌ক্তিতে শব্দসংখ্যা সাতটি কিন্তু পরেরটিতে পাঁচ। ঠিক এই ছন্দ এই মাত্রার বাঙলায় বহু অতীত আর একটি পদ্যের শেষ দুই পঙ্‌ক্তি ধরা যেতে পারে—

> উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ,
> আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ।

একই ছন্দ, একই মাত্রা এক গতি।

আবোল-তাবোলে সব শুদ্ধ ছড়া আছে ছয়-চল্লিশটি, তার চব্বিশটিই হচ্ছে বিভিন্ন ছন্দে। আরগুলি প্রায়ই চোদ্দ অক্ষর, ষোল অক্ষর, আঠারো অক্ষর, কুড়ি অক্ষরের পঙ্‌ক্তি। কিন্তু তার ভিতরে রয়েছে অত্যন্ত মধুর শব্দ-বিন্যাস। আর একটি মজা লক্ষ্য করবার এই যে সুকুমারের এই ছড়ার, এতগুলো ছড়ার একটিতেও কোথাও এতটুকুও ছন্দপতন হয়নি, মিল, যতি, মাত্রার সামান্যতম বিচ্যুতিও কোথাও নেই। সে যেন স্বতঃস্ফূর্ত নির্ঝরের মত বয়ে চলেছে অতি সহজ, সরল, সাবলীল।

আবোল তাবোলের প্রথম ছড়া হ'লো 'আবোল-তাবোল'। তার ছন্দ, মাত্রা, যতি মিল একেবারে ছন্দান্ধেরও কান এড়াবেনা তা এমনিই সহজ। তার পরেরটি হ'লো 'খিচুড়ী' চোদ্দ অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া খুবই সহজ। তারপরে 'কাঠ-বুড়ো' তাও চোদ্দ অক্ষরের

পঙ্‌ক্তির সাধারণ ছড়া। কিন্তু প্রথমেই প্রথম পঙ্‌ক্তিতে লক্ষ্য করবার মত শব্দ ব্যবহার, 'হাঁড়ি নিয়ে দাঁড়িমুখো'। এই ধরণের শব্দ ব্যবহার সুকুমারের ছড়ায় অজস্র। একে ছন্দ বলুন, মিল বলুন, অনুপ্রাস বলুন, যাই কেননা বলুন। আরও আছে 'মাথা নেড়ে গান করে' 'আরে মোলো, গাধাগুলো'। এর পরের ছড়া গোঁফ চুরি'। সে হচ্ছে আঠারো অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া। তার মিলের ভিতরে দেখবার—'রেগে আগুন তেলে বেগুন' 'নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা' ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে' ইত্যাদি।

এর পর সৎপাত্র, দশ অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া। ছন্দের দিক থেকে এমন কিছু নয় কিন্তু তার শব্দ বিন্যাসটি হচ্ছে 'কংস রাজার বংশধর' এ। তার পর গানের গুঁতো। আঠারো অক্ষরের পঙক্তির ছড়া। 'গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন' আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা,' 'বাঁধন-ছেঁড়া মহিষ ঘোড়া' 'চারপা তুলি জন্তুগুলি' 'লাঙ্গুল খাড়া পাগল পারা' 'গাছের বংশ হচ্ছে ধ্বংশ' "গানের দাপে আকাশ কাঁপে' ভীষ্মলোচন গাইছে ভীষণ 'এমনি শব্দ ব্যঞ্জনার ছড়াছড়ি। এরা পঙ্‌ক্তি নয় পঙক্ত্যাংশ। এইটিই বিশেষ সুকুমারী কায়দা।

এর পর 'খুড়োর কল', সেও আঠারো অক্ষরের পঙক্তির ছড়া, সেখানেও আছে শব্দবিন্যাস কিন্তু কেবল একটি, 'বুদ্ধি জোরে এ সংসারে'। এর পর 'লড়াই ক্ষ্যাপা, 'এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি' 'দাঁকের চোটে হাঁকিয়ে ওঠে' 'এসব হ'লো তার শব্দবিন্যাস। এর পরের ছড়াটি 'সাবধান' তাতে আছে' চেয়োনাকো আগেপিছে যেওনাকো ডাইনে'। তার পর 'ছায়াবাজি' ষোল অক্ষরের পঙ্‌ক্তির, 'রোদের ছায়া চাঁদের ছায়া', কাগের ছায়া বগের ছায়া' ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং্‌গজাবে'।

এবার 'কুমড়ো-পটাশ'। আগাগোড়াই ভিন্ন ছন্দের। শব্দবিন্যাস, 'চারপা তুলে থাকবে ঝুলে' 'উপুর হয়ে' মাচার শুয়ে' 'হুঁকোর জলে আলতা গুলে' 'শামলা এঁটে গামলা চ'ড়ে ইত্যাদি। তার পর 'প্যাঁচা আর প্যাঁচানী' অত্যন্ত সরল ছন্দের ছড়া। 'কাতুকুতু বুড়ো'ও সরল ছন্দের ছড়া যাতে কোন সুকুমারী শব্দ-বিন্যাস নেই।

এইবার 'বুড়ীর বাড়ী'। এটি একটি সুন্দর ছন্দের ছড়া, মাত্রা যতির অতি সুন্দর সমন্বয় আর মিল কেবল পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতেই নয় তার ভিতরে ভিতরেও—

> গালভরা হাসিমুখে চালভাজা মুড়ি
> ঝুরঝুরে পড়ো ঘরে থুরথুরে বুড়ি

আগাগোড়া ছড়াটিই অই বিশেষ ছন্দে—

> কাঁটা দিয়ে আঁটা ঘর আঠা দিয়ে সেঁটে
> সুতো দিয়ে বেঁধে রাখে থুতু দিয়ে চেটে।
> মেরামত—দিনরাত কেরামত ভারী
> থুরথুরে বুড়ী তার ঝুরঝুরে বাড়ী।

রবীন্দ্রনাথ শুধু শুধু বলেন নি, 'ছন্দের রাজা সুকুমার'।

'হাতুড়ে' চোদ্দ অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া, পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে মিল আর তার মাত্রা যতি ছাড়া খুব বেশী সুকুমারী শব্দবিন্যাস নেই। তবু 'গেঁটে বাত ঘেঁটে ঘুটে' মনে রাখবার মত।

'কিম্ভূত' একটি অদ্ভুত ছড়া। কেবল তার ভাবের দিক থেকেই নয় ভাষার দিক থেকেও। ষোল অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া, প্রতি আট অক্ষরে অক্ষরে তার মিল। সম্পূর্ণ পঙ্‌ক্তি :

> বিদঘুটে জানোয়ার কিমাকার কিম্ভূত
> সারাদিন ধরে' তার শুনি শুধু খুঁত-খুঁত।

এটিকে ভিন্নভাবে লেখা যাক—

> বিদঘুটে জানোয়ার
> কিমাকার কিম্ভূত
> সারাদিন ধরে তার
> শুনি শুধু খুঁত খুঁত।
> বিদঘুটে জানোয়ার
> সারাদিন ধরে তার
> —আবার—
> কিমাকার কিম্ভূত
> শুনি শুধু খুঁত খুঁত।

প্রথমদিন বলে মহীউদ্দিন সাহেব সেদিন আর পড়ালেন না। ক্লাস থেকে চলে গেলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ঘাম দিয়ে যেন আমাদের জ্বর ছাড়ল।

পরদিন প্রথমেই অঙ্কের ক্লাস—মহীউদ্দিন সাহেবের ক্লাস। সবাই যথাসাধ্য তৈরী হয়ে এসেছি। তবু বসে কেউ চৌবাচ্চার অঙ্ক, কেউ দুর্গের অঙ্ক, কেউ বা সুদাসলের অঙ্ক কষছি। কারণ মহীউদ্দিন সাহেব কোথা থেকে আরম্ভ করবেন, কেউ জানে না। মাঝে মাঝে বই-এ আঙুল ছুঁইয়ে সে আঙুল কপালে ঠেকাচ্ছিলাম, —রক্ষা কর মা সরস্বতী, মহীউদ্দিন সাহেবের দৃষ্টি যেন আমার ওপর না পড়ে—আর একান্তই যদি পড়ে, তবে রসনার এবং কলমের অগ্রভাগে অধিষ্ঠান করে স্বয়ং তুমি উত্তরটি তৈরী করে দিও, মা।

শেষ মুহূর্তে মনীশ এল। তার দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম আমরা। লম্বা ঢেউ-খেলানো চুল মাঝখানে সিঁথি করে মেয়েদের মত আঁচড়িয়েছে এবং প্যাণ্ট ও শার্ট দু'টোই উল্টো করে অর্থাৎ বোতামের দিক পেছন দিকে পড়েছে। আমরা বললাম, "মনীশ, এ কী কাণ্ড। এখনই মহীউদ্দিন সাহেব আসবেন এবং এসে যদি তোকে এ অবস্থায় দেখেন তবে পরিণামটা কি হবে, বুঝতেই পারছিস।"

নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে ডেস্কে মাথা গুঁজে রইল মনীশ।

আর সময় নেই! আমি এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, মনীশ, করছিস কি তুই। তুই কি জানিস না মহীউদ্দিন সাহেবের ক্লাস—যমদূতের ক্লাস। এখনও সময় আছে। চট করে অন্ততঃ শার্টটা ঠিক করে পরে নে, তাহলে প্যাণ্ট ততটা চোখে পড়বে না।"

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। অবজ্ঞাভরে মাথা তুলে বোকার মত পিট পিট করে তাকিয়ে মনীশ বলল, "আরে ছেড়ে দে, সেকেণ্ড কজলুল হক বলেছে আমাকে তার জোর দেখাবে। দেখাই যাক না, কত জোর ওর কব্জিতে।"

মহীউদ্দিন সাহেব ক্লাসে এলেন। এসেই বললেন "কোথায় হে ব্যাক্-বেঞ্চার, কোথায় তুমি, দাঁড়াও দেখি।"

আমরা সকলে একটা প্রচণ্ড প্রলয়ের অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। এই অপরিণামদর্শী ছেলেটার পরিণাম কী হয় দেখবার জন্য। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মনীশ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার মধ্যে চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই। যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে সে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে।

মহীউদ্দিন সাহেব মুহূর্তে ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন। একটা ক্ষিপ্ত বাঘের মত তিনি ছুটে গেলেন তার দিকে। তারপর সামনের খাতাটা টেনে নিয়ে বললেন, "দেখি, কী কষেছ।"

মহীউদ্দিন সাহেবের হাতে খাতায় যে পাতাটা উল্টে এল, তা অঙ্ক নয়—তা মনীশের স্কেচ্ 'সেকেণ্ড কজলুল হক।'

মহীউদ্দিন সাহেব ঝাঁপিয়ে পড়লেন মনীশের ওপর। জাপটে ধরলেন তার লম্বা ঢেউ-খেলানো চুলে। তারপর চলল অবিরাম কিল ও চড়।

মহীউদ্দিন সাহেব যেন একটু হাঁপিয়ে উঠলেন। সবেগে তিনি বেরিয়ে গেলেন ক্লাসরুম থেকে এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরে এলেন হাত দুই লম্বা এক বেত নিয়ে। তারপর শুধু সপাৎ সপাৎ শব্দ। আমরা আর তাকাতে পারছি না। ক্রমশঃ মহীউদ্দিন সাহেবের হাতের বেত টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে পড়তে লাগল এবং মনীশের শার্টের এখানে-ওখানে রক্তের ছোপ দেখা দিল।

তবু থামলেন না মহীউদ্দিন সাহেব। ঘাড় ধরে জাপটে মনীশকে সশব্দে বাইরে ফেলে দিলেন।

'মাগো' বলে মনীশ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। মনীশের জীবনে এই বোধহয় প্রথম মার খেয়ে কান্না।

এরপর জল অনেক ঘোলা হয়েছিল। অজ্ঞান মনীশকে দেখতে ডাক্তার এসেছিলেন, তার মাথায় বালতি বালতি জল ঢালা হয়েছিল এবং স্কুল কমিটির মিটিং-এ এ বিষয় নাকি আলোচিত হয়েছিল, এবং সেই যে মনীশ ক্লাস থেকে চলে গিয়েছিল আর কোনদিন ক্লাসে আসেনি।

* * *

তারপর এই দেখা। কিন্তু এমনিভাবে মনীশের সঙ্গে দেখা হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে দেখা হল তা ভেবে আমার দু'চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এল।

ততক্ষণে বিউগলের শব্দটাও আর শোনা যাচ্ছে না।

প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক বঙ্গ অখণ্ড থাক্ বা খণ্ডীকৃত হউক, বাঙালীদিগকে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ ও রাজ্যে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বাস করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহারা বাংলার ভাষা, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতির সহিত যোগরক্ষা না করিলে তাঁহাদের ও তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি-দের অপকার হইবে। পক্ষান্তরে সকল বাঙালীর পরস্পরের সহিত কৃষ্টিগত যোগ থাকিলে প্রত্যেকের ও সমষ্টির কল্যাণ হইবে।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪২

ছত্রিশ পঙ্‌ক্তির ছড়া, সবটাই আগাগোড়াই এই ছন্দের, পঙ্‌ক্তির অর্দ্ধেকে অর্দ্ধেকে মিল—

কাঙারুর লাফ দেখে	ভারী তার হিংসে
ব্যাঙ চাই আজ থেকে	ট্যাঙ ট্যাঙে চিমসে।
একলা সে সব হ'লে'	মেটে তার প্যাখনা
যারে পায় তারে বলে	মোর দশা দ্যাখনা।
মাছ ব্যাঙ গাছ পাতা	জল মাটি ঢেউ নই
নই জুতা নই ছাতা	আমি তবে কেউ নই।

তারপরে হ'লো 'চোর ধরা' এটি পনেরো অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া। রয়েছে মাত্র একটি বিন্যাস 'খাড়া আছি সারাদিন'। 'ভালরে ভাল' ত একটি একেবারে নতুন ধরণের ছন্দ। ছন্দের জন্য নয়। ছন্দের ওর বিশেষ কায়দাটির জন্য। চব্বিশ পঙ্‌ক্তির ছড়া কিন্তু তার মিল হচ্ছে প্রথম পঙ্‌ক্তি আর শেষ পঙক্তিতে। 'দেখছি ভেবে অনেক দূর' আর পাঁউরুটি আর ঝোলো গুড়' এ। আর বাইশটি পঙ্‌ক্তিরই শেষ শব্দটি একটি মাত্র শব্দে, 'ভাল'—

আকাশ ভাল
বাতাস ভাল
বর্ষা ভাল
ফর্সা ভাল
ঢাকও ভাল
টাকও ভাল
ঠেলতে ভাল
বেলতে ভাল
ইত্যাদি ইত্যাদি।

'অবাক কাণ্ড' অতি সাধারণ ছন্দ এমন কিছু নয়। কিন্তু 'বাবুরাম সাপুড়ে' আবার একটি নতুন ধরণের ছন্দ। এটি চোদ্দ অক্ষরের পঙ্‌ক্তির, কিন্তু অনায়াসেই তাকে সাত অক্ষরের করা যেতো। হয়তো গোড়ায় তা তাই ছিল—

বাবুরাম সাপুড়ে
কোথা যাস বাপুরে?
আয় বাবা দেখে যা
দুটো সাপ রেখে যা
যে সাপের চোখ নেই
সিঙ নেই চোখ নেই।

'বোম্বাগড়ের রাজা'ও ষোলো-সতেরো-আঠারো অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া। শব্দ-বিন্যাস কেবল একটি। 'টাকের উপর পণ্ডিতেরা ডাকের টিকিট মারে'। তারপর 'শব্দ-কল্পদ্রুম' বাদ দিলুম তা।

'নেড়া বেল তলায় যায় কবার' আর একটি ছড়া যার মিল, যতি, মাত্রা স্বপ্রকাশ এবং সম্ভবতঃ সারা আবোল-তাবোলের সব চাইতে ছন্দসার ছড়া, প্রতি পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে যার তিনটে করে যতি আর যতিতে যতিতে মিল। এরপর 'বুঝিয়ে বলা' এও ষোলো-সতেরো-আঠারো অক্ষরের পঙ্‌ক্তির। লক্ষ্য করবার মত মিল 'গোড়ায় তবে দেখতে হবে' 'আকাশ পানে তাকাস্ খালি'। 'হুঁকো-মুখো হ্যাংলা'র ছন্দও স্বপ্রকাশ। প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতে দুটি করে যতি এবং এখানেও রয়েছে যতিতে যতিতে মিল। 'একুশে আইন' একটি বিশেষ ছন্দ। 'এতে আছে এ্যাকুশ আনা ট্যাকশ চায়' খুঁচিয়ে পিঠে গুঁজিয়ে ঘাড়'। 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম' আঠারো অক্ষরের পঙ্‌ক্তির। এখানকার শব্দবিন্যাসও অভিনব। 'ছুটছে মটর ঘটর ঘটর' 'ছুটছে লোকে নানান ঝোঁকে' 'ছুটছে কত ক্ষ্যাপার মত' 'ঠাণ্ডা রাতে সর্দ্দি বাতে' 'মুখ্যু যারা হচ্ছে সারা' 'হাটুছ কত খাটুছ কত' ইত্যাদি। এসব একেবারেই সুকুমার।

তারপর 'গল্প বলা' বাদ দিলুম। তারপর 'নারদ-নারদ'। এটিও আঠারো-উনিশ-কুড়ি অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া। কিন্তু পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে এর মিল নয়, মিল হচ্ছে পঙ্‌ক্তির অর্দ্ধেকে অর্দ্ধেকে। ঠিক বাবুরাম সাপুড়ের মত—হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল, সাদাকে বলেছিলি লাল'? এটিকেও অর্দ্ধেক ভেঙে ভেঙে অনায়াসেই ছড়াটি করা যায়—

হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল
সাদাকে বলেছিলি লাল?

চোপ্ রাও তুম স্পিকটি নট্
মারব রেগে পটাপট্।
আই ডোণ্ট কেয়ার কানাকড়ি
জানিস আমি স্যাণ্ডো করি?
ডোণ্ট পরোয়া অল-রাইট্
হাউ ডুডুডু গুড্ নাইট।

তারপর 'কি মুস্কিল' একুশ-বাইশ অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া, অতি সাধারণ। 'ডানপিটে' 'বাপ্ রে কি ডানপিটে ছেলে' এটি চোদ্দ অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া কিন্তু প্রত্যেক স্তবকের প্রথম পঙ্‌ক্তি হলো এইটি, দশ অক্ষরের। এখানেও সুকুমারী মিল আছে পঙ্‌ক্তির ভিতরে। 'রেগে তাই দুই ভাই' 'বাপ্ বাপ বলে' 'চাচা লাফ দিয়ে ভাগে'।

'ভুতুড়ে খেলার' তো সুকুমারী মিলের ছড়াছড়ি। 'পান্তভূতের জ্যান্ত ছানা' দেখছে নেড়ে ঝুন্‌টি ধরে' 'যেমন খুসী মারছে ঘুসি' 'আদর করে আছাড় মেরে' 'ন্যাখনা ফিরে প্যাখনা ধরে' 'অন্ধ বনের গন্ধ গোকুল' 'রান্নাহাঁড়ির কান্নাহাসির' কোথায় বা কি ভূতের ফাঁকি' কত বলব। 'আহ্লাদী' আঠারো-উনিশ-কুড়ি অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া। এটিতে সুকুমারী শব্দবিন্যাস নেই বটে তবে আছে আর একটি নতুন জিনিষ, প্রত্যেক পঙ্‌ক্তির শেষে দুটি দুটি করে শব্দের মিল। 'ভ্যাক করে' ফ্যাক্ করে' 'চোখ বুজে' 'নোখ-গুঁজে' 'জেলের দাঁড়' 'তেলের ভাঁড়' প্লেট দেখে' -পেট থেকে' এই রকম। এর পর 'রাম-গরুড়ের ছানা' এটিও বিশেষ ছন্দের আট অক্ষর, আট অক্ষর, দশ অক্ষরের পঙ্‌ক্তির, এও স্বপ্রকাশ। 'হাত-গণনা' সতেরো-আঠারো অক্ষরের পঙ্‌ক্তির সাধারণ ছড়া। এর পরের ছড়া 'গন্ধবিচার'এ আছে দু'টি সুকুমারী শব্দবিন্যাস' 'ছিল হাজির বৃদ্ধ নাজির' 'রাজা বলেন হাজার টাকা'।

এর পর 'হুলোর গান' প্রতিটি পঙ্‌ক্তি চোদ্দ অক্ষরের কিন্তু লক্ষ্য করবার ব্যাপার যেটি তা হচ্ছে বাইশ পঙ্‌ক্তির এই ছড়ায় মাত্র চারটি শব্দ হ'লো যুক্তাক্ষরের আর সব শব্দই হয় দু'অক্ষরের না হয় চার অক্ষরের। আর মাত্রা হচ্ছে প্রতি দু' অক্ষরে আর যতি প্রতিটি চার অক্ষরে—

পূবদিকে মাঝরাতে ছোপ দিয়ে রাঙা
রাতকানা—চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা
ধুক করে' নিভে গেল বুক ভরা আশা।

'কাঁদুনে' আঠারো-কুড়ি অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া। আরম্ভই তো 'ছিচ-কাঁদুনে মিচ্‌কে পারা' দিয়ে। তার পর আছে 'কাঁদন ঝরে শ্রাবণ-ধারে' 'বাতাস কর চাপড়ে ধর' 'কান্নাভরে উলটে পড়ে' ইত্যাদি। 'ভয় পেওনা' আঠারো-কুড়ি অক্ষরের পঙ্‌ক্তির ছড়া। সাধারণ ছড়া, সুকুমারী শব্দবিন্যাস এতে কিছু না থাকলেও আছে সুকুমারী কায়দায় শেষ দু'টি দুটি শব্দে মিল পঙ্‌ক্তি শেষে 'নয় ছেলে' 'আর' ভয় পেলে'। 'ট্যাশ গরু' চোদ্দপোনেরো-ষোল অক্ষরের পঙ্‌ক্তির। 'নাট্ খটে হাঁড়-গোড় খট্ খট্ নড়ে যায়' ধমকালে ল্যাগ ব্যাগ্ চমকিয়ে পড়ে' যায়' 'ট্যাশ গরু' খাসি খায় ঠ্যাশ দিয়ে দেয়ালে'। 'নোটবই' পনোরো-ষোল অক্ষরের পঙ্‌ক্তির, সাধারণ। তার পর 'ঠিকানা' এও পনেরো-ষোল অক্ষরের পঙ্‌ক্তির, সাধারণ। তারপর 'বিজ্ঞান-শিক্ষা' উনিশ কুড়ি অক্ষরের পঙ্‌ক্তির, এও সাধারণ।

এইবার ফস্‌কে গেল একটি অনবদ্য ছন্দ, একেবারেই নতুন ধরণ। কুড়ি অক্ষরের পঙ্‌ক্তি, প্রত্যেক দুই পঙ্‌ক্তিতে দশ অক্ষর করে পর পর যতি, যতিতে যতিতে মিল। তারপর একটি মাত্র দু'অক্ষরের ধ্বন্যাত্মক শব্দ আর সঙ্গে আবার দু' পঙ্‌ক্তি বাদে মিল। আট পঙ্‌ক্তির ছড়া সবটাই উল্লেখযোগ্য।

দেখ বাবাজি দেখবি নাকি দেখরে খেলা দেখ চালাকি
ভোজের বাজি ভেলকি ফাঁকি পড় পড় পড় পড়বি
পাখী—ধপ্
লাফ দিয়ে তাই তালটি ঠুকে তাক করে যাই
তীর ধনুকে
ছাড়ব সটান ঊর্দ্ধমুখে—হুশ করে' তোর লাগবে
বুকে—খপ

গুড় গুড় গুড়িয়ে হামা খাপ পেতেছেন গোষ্ঠ মামা
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে থাবা এইবারে বাপ চিড়িয়া
নামা—চট্!
ঐ যা গেল ফস্কে যে সে—হেঁই মামা তুই ক্ষেপলি
শেষে?
খ্যাঁচ্ করে' তোর পাঁজর ঘেঁসে লাগল কি বাণ
ছটকে এসে—কট্?

'পালোয়ান'

খেলার ছলে ষষ্ঠীচরণ—হাতী লোফেন যখন তখন
বিকালবেলা খায়না কিছু গণ্ডাদশেক মণ্ডা ছাড়া
বললে বেশী ভাববে শেষে এসব কথা ফেনিয়ে বলা
দেখবে যদি আপন চোখে যাওনা কেন বেনিয়া-
টোলা

আবোল-তাবোল শেষ হ'লো আবার এলো 'আবোল-তাবোল' সুকুমারী মিলে মিলে ছন্দলাপ—

আলোয় ঢাকা অন্ধকার
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার:
গোপন প্রাণে স্বপন দূত
মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত।
হ্যাংলা হাতী চ্যাং দোলা,
শূন্যে তাদের ঠ্যাং তোলা।
মক্ষিরাণী পক্ষিরাজ——
দস্যি ছেলে লক্ষ্মী আজ।
আদিমকালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।

আশ্চর্য্য এই যে সুকুমার আমরা সবাই পড়েছি। অবচেতন মন থেকে তার ছন্দের মাত্রা, যতি, মিল, মাধুর্য্য মার-প্যাঁচ উপভোগও করেছি। কিন্তু তিনি যে কত বড় ছন্দের রাজা ও যাদুকর ছিলেন এই কথাটা বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল আর এক ছন্দের রাজা ও যাদুকর রবীন্দ্রনাথের মত চেতন মনের। আমরা কেউই ত কথাটা কোন দিন ধরতেই পারি নি!!

ককেশিয়ান চক সার্ক্‌ল্

রচনা—বেরটল্ট ব্রেশট

অনুবাদ—অশোক সেন

পূবদিকের পাহাড়ের দেশে

কথক

সাতদিন ধরে তুষারেভরা পথ দিয়ে গ্রুসা সমানতেজে এগিয়ে চলল শিশুকে পিঠে নিয়ে উৎরাই-এর পথ দিয়ে সে নেমে চলেছিল, ভাবছিল—ভাইয়ের বাড়ীতে যখন পৌছাব, সে বলবে গ্রুসা এসেছিস নাকি! কতকাল তোর আসবার জন্য প্রতীক্ষা করছিলাম। এই হচ্ছে আমার গোলা-বাড়ী, শিশুকে নিয়ে টেবিলে এসে বস্‌। খেয়ে নিয়ে শান্ত হয়ে ভালভাবে বিশ্রাম কর্‌। একটা ভারি সুন্দর উপত্যকায় ভাইয়ের বাড়ীতে এসে হাজির হল গ্রুসা। দীর্ঘদিন হাঁটতে হাঁটতে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে দেখে তার ভাই খাবার টেবিল থেকে উঠে এল।

[এক মোটা কৃষক-দম্পতি খাবার টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াবে। লাভরেন্টি ভাসনাজজের গলায় তখনও ন্যাপকিন আঁটা! গ্রুসাকে অত্যন্ত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে—সে এত দুর্বল যে একজন ভৃত্য তাকে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দেবে। গ্রুসার কোলে শিশু।]

লাভরেন্টি—তুমি কোথা থেকে আসছ গ্রুসা?

গ্রুসা—(দুর্বলকণ্ঠে) জান্‌-টুর পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসেছি লাভরেন্টি।

ভৃত্য—উনি গোলাবাড়ীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কোলে ছিল বাচ্চা।

ভ্রাতৃবধূ—(চাকরের প্রতি) তুমি এখন যাও—ঘোড়াটার তদারক কর গিয়ে। [ভৃত্য চলে যাবে।]

লাভরেন্টি—এই হচ্ছে আমার স্ত্রী এ্যানিকো।

ভ্রাতৃবধূ—আমি জানতাম তুমি নু'কাতে চাকরী করছ।

গ্রুসা—(দুর্বলতার জন্য অস্ফুটস্বরে) হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছিলে।

ভ্রাতৃবধূ—চাকরীটা কি ভাল ছিল না? আমরা শুনেছিলাম তুমি খুব ভাল চাকরীতে ছিলে।

গ্রুসা—আমাদের গভর্ণরকে খুন করা হয়েছে।

লাভরেন্টি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দাঙ্গার খবর আমরাও পেয়েছি। মনে পড়েছে এ্যানিকো, তোমার আন্ট আমাদের এ-খবর দিয়েছিলেন?

ভ্রাতৃবধূ—আমাদের এ জায়গায় সবাই খুব শান্ত—কখনও কোন গোলমাল হয় না। শহরের লোকেরা হৈ চৈ ছাড়া বাঁচতে পারে না। (দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে বললে—) সোসো, সোসো, এখনও চুল্লী থেকে কেক্‌টা বের করে এনো না—আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? কোথায় গেল সোসো? [তাকে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যাবে]

লাভরেন্টি—(নীচুগলায় তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করবে) বাচ্চাটার বাপ আছে? (গ্রুসা মাথা নাড়বে) আমিও তাই ভেবেছিলাম। একটা কিছু উপায় ঠাওরানো যাক্‌—আমার স্ত্রী আবার বড্ড বেশী নীতিবাগিশ।

ভ্রাতৃবধূ—(ফিরে এসে) চাকরগুলো যা হয়েছে! (গ্রুসাকে) ঐটি তোমার ছেলে!

গ্রুসা—হ্যাঁ, আমার ছেলে (হঠাৎ সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। লাভরেন্টি তার সাহায্যের জন্য ছুটে আসবে।)

ভ্রাতৃবধূ—হায় আমার কপাল! মেয়েটা অসুস্থ—ওকে নিয়ে আমরা করি কি।

লাভরেন্টি—(গ্রুসাকে ষ্টোভের ধারে একটা বেঞ্চের কাছে নিয়ে যাবে।) বসে পড়, বসে পড়। এ্যানিকো আমার মনে হয় এটা নিছক দুর্বলতা।

ভ্রাতৃবধূ—স্কারলেট ফিভার না হলেই বক্ষে!

লাভরেন্টি—তাহলে গায়ের চামড়ায় দাগ দেখা যেত। দুর্বলতার জন্যই এটা হয়েছে—চিন্তা কোরোনা এ্যানিকো। (গ্রুসার প্রতি) বসে পড়লে ভাল লাগবে।

ভ্রাতৃবধূ—বাচ্চাটা কি ওর সন্তান?

গ্রুসা—হ্যাঁ, ও আমার।

লাভরেন্টি—ও স্বামীর কাছে যাচ্ছে।

ভ্রাতৃবধূ—তাই বুঝি! তোমার প্লেটের মাংসটা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে (লাভরেন্টি বসে পড়ে খাওয়া শুরু করবে।) ঠাণ্ডা মাংস তোমার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়—চর্বিগুলোকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া উচিত না—তুমি তো জান তোমার হজমের গোলমাল আছে। (গ্রুসার প্রতি) তোমার স্বামী তাহলে শহরে নেই? আছে কোথায়?

লাভরেন্টি—পাহাড়ের ওপারে ওর বিয়ে হয়েছে।

ভ্রাতৃবধূ—পাহাড়ের ওপারে? (সেও বসে পড়ে খেতে শুরু করে দেবে।

গ্রুসা—লাভরেন্টি, কোথাও একটু শুতে পারলে শরীরটা ভাল বোধ হবে।

ভ্রাতৃবধূ—যক্ষ্মা হয়ে থাকলে আমাদের সবারই ছোঁয়াচ ব। (জেরা করতে শুরু করে দেবে) তোমার স্বামীর ক কোন গোলাবাড়ী আছে?

—সে একজন সৈনিক।

লাভরেন্টি—কিন্তু বাপের কাছ থেকে অল্পদিনের ভেতরই উত্তরাধিকার সূত্রে সে একটা ছোটখাট গোলাবাড়ী পাবে।

ভ্রাতৃবধূ—কিন্তু সে তো যুদ্ধে যোগ দিয়েছে।

গ্রুসা—দিয়েছে বৈকি!

ভ্রাতৃবধূ—তাহলে তুমি গোলাবাড়ীতে যেতে চাচ্ছ কেন?

লাভরেন্টি—যুদ্ধ থেকে ফিরে ঐ গোলাবাড়ীতেই সে এসে থাকবে।

ভ্রাতৃবধূ—তুমি তাহলে সেখানেই এবার যাবে?

লাভরেন্টি—হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবে।

ভ্রাতৃবধূ—(খ্যানখ্যান গলায়) সোসো, কেকটার উপর নজর রেখ।

লাভরেন্টি—তুমি নিজে গিয়ে একবার দেখে এস এ্যানিকো।

ভ্রাতৃবধূ—কিন্তু লোকের মুখে শুনেছি আবার যুদ্ধ বেধেছে। তাহলে কবে তোমার ভগ্নীপতি ফিরে আসবে? (হেলে-দুলে যেতে যেতে চীৎকার করে বলবে) সোস্…সো! কোথায় যে সব থাকে! সোস্…সো!

লাভরেন্টি—(তাড়াতাড়ি উঠে গ্রুসার কাছে আসবে) একটু বাদেই তোমার শোবার জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে। এ্যানিকোর অন্তরটা কিন্তু সত্যিই ভাল।

গ্রুসা—(বাচ্চাকে তুলে ধরে) ওকে নেও।

লাভরেন্টি—(বাচ্চাকে নিয়ে একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে নেবে) বাচ্চা নিয়ে এখানে কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারবে না। আগেই বলেছি এ্যানিকো বড্ড নীতি-বাগিশ।

[গ্রুসা আবার জ্ঞান হারাবে লাভরেন্টি তাকে ধরে ফেলবে।]

কথক :

বোনটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ল, ভীতু ভাইটি বাধ্য হল তাকে আশ্রয় দিতে, গ্রীষ্ম গেল, শীত এল, দীর্ঘদিনের শীত। স্বল্পকালের শীত ঃ

লোকেরা যেন জানতে না পারে। টিকটিকিরা যেন কামড়াতে না পায়, বসন্তঋতু যেন না আসে।

[তাঁত বোনার কাজ হয়, এমন একটি ঘরে, গ্রুসা শিশুকে নিয়ে বসে আছে—কম্বলে তাদের সারা অঙ্গ মোড়া।]

গ্রুসা—মাইকেল, আমাদের চতুর হতে হবে। আমরা যদি আরসোলার মত নিজেদের ছোট করে গুটিয়ে নিতে পারি তাহলেই আমার ভাইয়ের বউ ভুলে যাবে আমরা এ বাড়ীতে আছি। সেক্ষেত্রে বরফ-গলা অবধি আমরা এখানে থাকতে পারবো।

[লাভরেন্টি ঢুকবে—এসে বোনের পাশে বসবে।]

লাভরেন্টি—তোমরা দুজনে এমন গুটিসুটি হয়ে বসে আছ কেন? এ ঘরটা কি খুব ঠাণ্ডা?

গ্রুসা—না, তেমন কি ঠাণ্ডা।

লাভরেন্টি—বেশী ঠাণ্ডা হলে এ ঘরে থাকবার দরকার কি। এ্যানিকো একথা জানলে দুঃখ পাবে। (একটু চুপ করে থেকে) যাজক বাচ্চাটা সম্বন্ধে তোমাকে কোন প্রশ্ন করে নি তো?

গ্রুসা—করেছিল, কিন্তু আমি তাকে কিছুই জানাই নি।

লাভরেন্টি—সেই ভাল। এ্যানিকোর কথা তোমাকে বলি—ওর মনটা ভাল, কিন্তু বড্ড নরমস্বভাবের মেয়ে। তুমি ঠিক জান তো আমাদের আশেপাশে কোন টিকটিকি নেই? ওরা দেখা দিলে কিন্তু তোমার এ বাড়ীতে থাকা চলবে না। হ্যাঁ, এ্যানিকোর কথা বলি। তুমি ধারণাতেও আনতে পারবে না তোমার সৈনিক-স্বামীর সম্বন্ধে ও কত চিন্তিত। সারারাত ও ঘুমোতে পারে না—ভাবে সে যদি ফিরে এসে তোমাকে খুঁজে না পায়। আমি ওকে বলি—বসন্তকালের আগে সে এখানে আসবে না। ভারি ভাল মেয়ে এ্যানিকো। তোমার মনে হয় সে কবে আসবে। (গ্রুসা চুপ করে থাকবে।) বসন্তকালের আগে নয়, তাই না? (গ্রুসা চুপ করে থাকবে।) তুমি কি মনে কর সে আর আসবে না? (গ্রুসা চুপ করে থাকবে।) বসন্ত আসবার পর, তুষার গলতে শুরু হবে, তুমি কিন্তু এখানে থাকতে পারবে না। তারা এসে তোমার খোঁজ করতে পারে। লোকে এরই ভেতর অবৈধ সন্তান সম্বন্ধে কথা-বার্তা বলতে শুরু করেছে। গ্রুসা বরফ গলতে আরম্ভ হয়েছে—বসন্তকাল আসছে।

গ্রুসা—তা আসছে।

লাভরেন্টি—(ব্যগ্রভাবে) আমরা এখন কি করব তা তোমাকে বলি। তোমার যাবার মত একটা জায়গার দরকার, শিশুটির খাতিরে একজন স্বামীও থাকা চাই—তাহলেই লোকে কোন কথা বলতে পারবে না। তোমার একজন স্বামী যাতে পাওয়া যায়, সেজন্য আমি খুব সাবধানে খোঁজখবর নিয়েছি। গ্রুসা তেমন একটি স্বামী আমি পেয়েও গেছি। একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি তার ছেলে আছে। পাহাড়ের অপরধারে ছোট এক গোলাবাড়ীতে তারা থাকে। মহিলার এ বিয়েতে অসম্মতি নেই।

গ্রুসা—আমি কারোকে বিয়ে করতে পারি না। সিমন সাসহাভার জন্য আমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে।

লাভরেন্টি—তা ত বটেই। ও বিষয়ে নজর রেখেই ব্যবস্থা করেছি। আসল স্বামীর তোমার দরকার নেই—তোমার দরকার কাগজ দেখিয়ে প্রমাণ করা যে তোমার একজন স্বামী আছে। ওই কৃষকরমণীর ছেলেটি মরতে বসেছে—ওর প্রায় শেষ অবস্থাই বলতে পার। তোমাকে যদি ওর স্ত্রী এবং কয়েকদিন বাদে ওর বিধবা হিসাবে চালিয়ে দেওয়া যায়—অবশ্য কাগজে-কলমে তা প্রমাণ করার ব্যবস্থা করা হবে—তাহলে তোমার কোনও আপত্তি থাকবে না তো?

গ্রুসা—ষ্ট্যাম্প দেওয়া পাকা দলিল পাওয়া গেলে, মাইকেলের খাতিরে আমি এ প্রস্তাবে রাজী হব।

লাভরেন্টি—তোমার একটা বাসস্থানও হয়ে যাবে।

গ্রুসা—এসবের জন্য ঐ কৃষকরমণী কত টাকা চায় ?

লাভরেন্টি—চারশো পিয়াস্তার।

গ্রুসা—এ টাকা পাবে কোথায় ?

লাভরেন্টি—এ্যানিকোর দুধ বেচার টাকা।

গ্রুসা—পাহাড়ের ওপারে কেউ আমাদের চিনবে না। আমি তোমার প্রস্তাবে রাজী।

লাভরেন্টি—(দাঁড়িয়ে উঠে) কৃষক রমণীকে গিয়ে এখনই খবরটা দিচ্ছি। [দ্রুত চলে যাবে।]

গ্রুসা—মাইকেল, তোমার জন্য অনেক গোলমালের সৃষ্টি হচ্ছে। আমার পক্ষে অনেক ভাল হোত ঈষ্টার সানডেতে কুস্কাতে আমি যদি তাড়াতাড়ি কেটে পড়তাম। এখন আমি একেবারে বেল্লিক বনে গেছি।

কথক :

বর তার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে ছিল। এমন সময় সেখানে এল কনে। বরের মা দরজার কাছে অপেক্ষায় ছিল, বধূকে সে বললে তাড়াতাড়ি করতে। বধূ সঙ্গে করে এনেছিল একটি শিশু। সাক্ষী বিয়ের সময় তাকে লুকিয়ে রাখলে।

[একদিকে শয্যা। মশারীর ভেতর একজন অসুস্থ লোক শুয়ে আছে। গ্রুসাকে টেনে নিয়ে এল তার শাশুড়ী—তাদের পেছনে এল লাভরেন্টি শিশুসহ।]

শাশুড়ী—তাড়াতাড়ি কর। দেরী কোরোনা। বিয়ের আগেই না মারা যায়। (লাভরেন্টিকে) আমাকে তো আগে বলনি যে ওর একটি সন্তান আছে।

লাভরেন্টি—তাতে আর এসে গেল কি। (শয্যার দিকে দেখিয়ে) ওর যা অবস্থা—কোন কিছুতেই ওর কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

শাশুড়ী—ওর কিছু না হতে পারে। কিন্তু এর পর আমার পক্ষে বেঁচে থাকাটা একটা লজ্জার ব্যাপার হবে। লোকে আমাদের সৎ প্রকৃতির বলে জানে। (কাঁদতে শুরু করবে) আমার জুসুপকে সন্তানবতী মেয়েকে বিয়ে করাবার দরকার করে না।

লাভরেন্টি—ঠিক আছে আরও দু'শো পিয়াস্তার তোমাকে দেব।

শাশুড়ী—(চোখমুছে) এতে ফিউনেরালের খরচই উঠবে কিনা সন্দেহ। যাই হোক তোমার বোন এরপর কাজে কর্মে আমায় সাহায্য করবে আশা করি। কিন্তু মঙ্কের পাত্তা নেই কেন? জুসুপের শেষ সময় এসেছে জানতে পারলে সারা গ্রামের লোক এখানে ছুটে আসবে। যদি মঙ্ককে ধরে আনি গিয়ে—দেখ সে যেন বাচ্চাটাকে দেখতে না পায়।

লাভরেন্টি—আচ্ছা আমি দেখব যাতে শিশুটির কথা সে জানতে না পারে। কিন্তু প্রিষ্টকে না ডেকে মঙ্ককে ডাকতে যাচ্ছ কেন?

শাশুড়ী—মঙ্ককে দিয়ে কাজ চলবে। আমি শুধু একটাই ভুল করে বসেছি—ওকে তার ফির অর্দ্ধেক আগাম দিয়ে দিয়েছি। অবশ্য পানশালায় যাবার জন্য ঐ টাকাই যথেষ্ট। আমার শুধু আশা আছে······(দৌড়িয়ে বেরিয়ে যাবে।)

লাভরেন্টি—সস্তায় কাজ সারবে বলে প্রিষ্ট না ডেকে মঙ্ককে আনছে।

গ্রুসা—সিমন সাসহাভা ফিরে এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

লাভরেন্টি—তাই পাঠাবো। (রোগীর দিকে দেখিয়ে) ওকে একবার দেখব না? (গ্রুসা মাইকেলকে নিজের কোলে নেবে—তারপর মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাবে।) লোকটির চোখের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। আমাদের কি শেষ পর্যন্ত বড্ড বেশী দেরী হয়ে গেল?

(অপর দিক থেকে প্রতিবেশীরা এসে দাঁড়াবে—তারা প্রার্থনা করতে থাকবে। লোকটির মা একজন মঙ্ককে নিয়ে ঢুকবে। লোকজন দেখে একটু বিরক্তির ভাব তার মুখে ফুটে উঠবে—প্রতিবেশীদের প্রতি বাউ করবে।]

শাশুড়ী—তোমাদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আমার ছেলের কনে এইমাত্র শহর থেকে এসে হাজির হয়েছে। এক্ষুনি ওদের বিয়ের ব্যাপারটা সমাধা করা হবে। আমি এবং কনের ভাই হব সাক্ষী—আমার হাতে বিয়ের লাইসেন্সটাও আছে—কনের ভাই এক্ষুনি আসছে।

[মাইকেলকে নিয়ে লাভরেন্টি পেছন দিকে চলে গেছিল—শাশুড়ী তাকে ইঙ্গিত করে যেতে বলবে। গ্রুসা মঙ্ককে বাউ করবে। এরা বিছানার ধারে যাবে। শাশুড়ী মশারীটা তুলবে। মঙ্ক লাতিন ভাষায় বিয়ের মন্ত্র পড়তে শুরু করবে।]

মঙ্ক—তুমি কি এই লোকটির প্রতি বিশ্বাসী, এবং এর বন্ধু ও সৎ স্ত্রী হতে রাজী—একং যতদিন না মৃত্যু এসে তোমাদের ভেতর ব্যবধানের সৃষ্টি করে, ততদিন এর জীবনের সঙ্গে যুক্ত থাকবে?

গ্রুসা—রাজী এবং তাই থাকবো।

মঙ্ক—[অসুস্থ লোকটির প্রতি] তুমি কি তোমার স্ত্রীর প্রতি মৃত্যু পর্যন্ত সৎ থাকবে এবং সারাজীবন তাকে ভালবাসবে? [অসুস্থ কৃষকপুত্র কোন উত্তর করবে না? মঙ্ক জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে চারদিকে চাইবে।]

শাশুড়ী—নিশ্চয় সৎ থাকবে এবং ভালবাসবে। (মঙ্ককে) আমার ছেলে যে তোমার কথায় রাজী হয়ে উত্তর দিল শুনতে পেলেনা?

মঙ্ক—তা বটে! বিষয়ের চুক্তি তো তাহলে সম্পন্ন হল—

[এবার সবাই পানাহারে ব্যস্ত হবে।]

একজন অতিথি—শুনেছ, গ্র্যাণ্ড ডিউক নাকি ফিরে আসছে। রাজপুত্ররা কিন্তু সবাই তার বিপক্ষে।

অন্য একজন—শা অভ্‌ পারসিয়া নাকি তাকে এক বিরাট সৈন্যদল দিয়েছেন—তাদের সাহায্যে সে গ্রুসিনিয়ার শান্তি ফিরিয়ে আনবে।

অন্য আরেকজন—কিন্তু সেটা কি করে সম্ভব? একথা তো সবাই জানে শা শত্রুপক্ষের লোক।

আরেকজন—আরে গাধা সে গ্রুসিনিয়ার শত্রু - গ্র্যাণ্ড ডিউকের নয়।

অন্যজন—সে যাই হোক, যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, আমাদের সৈন্যরা সব ফিরে আসছে।

[গ্রুসার হাত থেকে কেক্‌-প্যান পড়ে যাবে। অতিথিরা কেকটা তুলে দেবে।]

একজন বৃদ্ধা—(গ্রুসার প্রতি) তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে? স্বামীর অসুখের চিন্তাতেই তুমি উত্তেজিত হয়েছ। এখানে বসে একটু বিশ্রাম কর।

[গ্রুসা বেশ বিচলিত হয়ে উঠবে।]

অতিথিরা—আবার সেই আগের অবস্থা ফিরে আসবে। ট্যাকসের হার বেড়ে যাবে—কারণ বাড়তি খরচটা আমাদেরই পুষিয়ে দিতে হবে।

গ্রুসা—(দুর্বল গলায়) কেউ কি বললো যে সৈনিকেরা ফিরে আসছে?

একজন লোক—আমি বলেছি।

গ্রুসা—এ কথা সত্যি হতে পারে না।

প্রথম মানুষ—(একজন মহিলাকে) ওকে শালটা দেখিয়ে দেও—আমরা এটা একজন সৈনিকের কাছ থেকে কিনেছি। এটা পারসিয়ার থেকে আনা।

গ্রুসা—(শালটা দেখে) সৈনিকরা ফিরে এসেছে। (উঠে একপা এগিয়ে জানু পেতে বসবে। ব্লাউজের ভেতর থেকে সিল্‌ভার ক্রশ এবং চেনটা বের করে চুম্বন করবে।)

শাশুড়ী—(অতিথিরা যখন নিঃশব্দে গ্রুসার দিকে চেয়ে আছে) ব্যাপার কি? আমাদের অতিথিদের আপ্যায়ন করবে কে?

অতিথির দল—(তারা নিজেদের ভেতর কথাবার্তা বলতে থাকবে—গ্রুসা থাকবে প্রার্থনারত।) ইচ্ছা করলে সৈনিকদের কাছ থেকে পারশিয়ান ঘোড়ার জিনও কিনতে পাওয়া যায়—সৈনিকদের ভেতর কেউ কেউ জিনের বদলে ক্রাচ্‌ নিতে চায়। —এক দিকের মহারথীরা হয়তো যুদ্ধে বিজয়ী হন, কিন্তু দু'দলের সৈনিকদেরই হয় পুরোপুরি লোকসান? —যাই হোক যুদ্ধ এবার শেষ হয়ে গেছে। আর সৈন্যদল যোগ

দেবার জন্য আমাদের বাধ্য করতে পারবে না। (এবার মৃত্যুপথযাত্রী সেই কৃষক যুবক বিছানার উপর উঠে বসবে সটান হয়ে—সে শুনতে থাকবে।) আমাদের এখন সব থেকে বেশী দরকার দু' সপ্তাহের জন্য ভাল আবহাওয়া। —পিয়ার গাছগুলোতে এবছর কিছুই ফল হয় নি।

শাশুড়ী—(সবাইকে কেক্ বিতরণ করতে করতে) আরও নেও—সবাই মিলে আনন্দ কর। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরও অনেক কেক আছে। খালি কেক-প্যানগুলো নিয়ে পাশের ঘরে যাবে। দুটো ঘরের মাঝে শুধু একটা দেয়াল—সুতরাং প্রেক্ষাগৃহ থেকে দুটি ঘরই দেখা যাবে মৃত্যুপথযাত্রী তার ছেলের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে শাশুড়ী অর্থাৎ মৃত্যুপথযাত্রী কৃষক যুবকের মা আর একটা কেকের ট্রে তুলে নেবার জন্য যখন এ ঘরে এসেছে, তার ছেলে কর্কশকণ্ঠে বলে উঠবে—)

কৃষক যুবক—ওদের কত কেক্ গেলাবে? আমি কি টাকার গাছ পুঁতেছি নাকি! (তার মা অর্থাৎ গ্রুসার শাশুড়ী বিহ্বলভাবে ছেলের দিকে চেয়ে থাকবে—কৃষক যুবক এবার মশারী থেকে বেরিয়ে খাট থেকে মাটিতে নামবে।)

প্রথম মহিলা—(পাশের ঘরে গ্রুসাকে বলবে) নববধূর কোন প্রিয়জন কি ফ্রন্টে আছেন?

একজন ভদ্রলোক—ভাল খবর হচ্ছে, ফ্রন্ট থেকে সৈনিকেরা বাড়ী ফিরছে।

কৃষক যুবক—(এপাশের ঘরে মাকে বলবে) হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে থেকনা। আমার গলায় যে স্ত্রীটিকে ঝুলিয়ে দিয়েছ, সে কোথায়?

(কোন উত্তর না পাওয়াতে সে অন্য ঘরে আসবে —তার মা কাঁপতে কাঁপতে কেক-প্যান হাতে তার অনুসরণ করবে।)

অতিথিরা—কৃষক যুবককে দেখে চীৎকার করে উঠবে) জুসুপ!

[প্রত্যেকে ভয়ে বসবার জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠবে। মেয়েরা দরজার দিকে পালাবে। প্রার্থনারত গ্রুসা মুখ ফিরিয়ে কৃষক যুবকের দিকে তাকাবে।]

কৃষক যুবক—মৃত্যু-উৎসবের নৈশ আহার! ভারি মজা পেয়েছ, না! বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে!

(সবাই পালাবে। গ্রুসার প্রতি—) তোমার স্বপ্নজাল ছিঁড়ে গেল, কি বল? (কোন উত্তর না পাওয়াতে ঘুরে দাঁড়িয়ে মার হাতের কেকপ্যান থেকে একটি কেক তুলে নেবে।)

কথক—কি বিশৃঙ্খলা! স্ত্রী আবিষ্কার করলো তার স্বামী বেঁচে আছে, দিনের বেলায় শিশুপুত্র, রাত্রিতে স্বামী। এদিকে প্রেমিক দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, দেশের দিকে ফিরে আসছে, স্বামী এবং স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের শোবার ঘরটি খুবই ছোট। কৃষক যুবক তার দাম্পত্য অধিকার পেতে চায়, গ্রুসা ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করে। স্বামী স্ত্রীর প্রতি কুৎসিত ইঙ্গিত করে, মাইকেল সম্পর্কে গ্রুসা এসব ইঙ্গিত গায়ে মাখেনা।

কৃষক যুবক—তোমার সৈনিক বন্ধু ফিরে এলেও দেখবে যে তোমার আগেই বিয়ে হয়ে গেছে।

গ্রুসা—তা দেখবে।

কৃষক যুবক—কিন্তু আমি বলছি সে আসবে না।

গ্রুসা—সে আসবেই।

কৃষক যুবক—তুমি আমাকে ঠকাচ্ছ। আইনমতে তুমি আমার স্ত্রী, অথচ আসলে তুমি আমার স্ত্রী নও।

কথক: নদীতে গিয়ে গ্রুসা যখন কাপড় কাচতো জলের উপর প্রতিফলিত হত সিমনের মূর্তি, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা হয়ে উঠছিল অস্পষ্ট। ধোয়া কাপড়গুলো নিয়ে সে যখন উঠে দাঁড়াতো মেপল গাছের মর্মরধ্বনিতে সে সিমনের কণ্ঠস্বর দিনের পর দিন কাটছিল, কণ্ঠস্বর হচ্ছিল অস্পষ্ট, অন্যমনা হয়ে গ্রুসা অনেক দীর্ঘশ্বাস ফেললো, পরিশ্রমে সে ক্লান্ত হত, চোখে আসতো জল। সময় কাটবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুও বড় হয়ে উঠল।

[গ্র সা ছোট পাহাড়ে নদীর ধারে বসে কাপড় কাচছে—তার পেছনে কয়েকটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।]

গ্র সা—(মাইকেলের প্রতি) তুমি ওদের সঙ্গে খেলতে পার মাইকেল, কিন্তু যেহেতু তুমি বয়সে ছোট ওরা যেন তোমাকে হুকুম দেবার সাহস না পায়।

[মাইকেল মাথা নেড়ে জানাবে যে সে বুঝেছে। সে এবার অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে মিলে খেলা শুরু করবে। গ্রুসা মাঝে মাঝে মাথা তুলে ওদের খেলা দেখবে, হঠাৎ তার চোখে পড়বে অপর পারের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সিমন সাসহাভা।]

গ্রুসা—সিমন!

সিমন—গ্র সা ভাসনাডজে বলে মনে হচ্ছে?

গ্রুসা—তুমি ফিরে এসেছ এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সিমন—খবর কি? এখানে শীত পড়েছিল কেমন?

গ্রুসা—বেশ কনকনে শীত পড়েছিল। খবর মোটামুটি।

সিমন—জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে এখনও কি একজন যুবতী কাপড় কাচবার সময় জলে পা ডুবিয়ে রাখে?

গ্র সা—না রাখেনা—কারণ ঝোপের আড়ালে এক জোড়া চোখ লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে।

সিমন—যুবতী বোধহয় সাধারণ সৈনিকের কথা বলছে। এখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন পে-মাষ্টার।

গ্র সা—মাইনা বোধহয় বিশ পিয়াস্তার?

সিমন—আর বিনাপয়সায় থাকবার ব্যবস্থা।

গ্র সা—সিমন সাসহাভা, আর আমি সু'কাতে ফিরে যেতে পারবো না। এর মধ্যে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে।

সিমন—যেমন?

গ্রুসা—প্রথমতঃ, আমি একজন সৈনিককে উত্তম মধ্যম দিয়ে পালিয়ে এসেছি।

সিমন—নিশ্চয় তার পেছনে কোন কারণ ছিল।

গ্রুসা—সিমন সাসহাভা আমার নামের পদবী বদলেছে।

সিমন—(একটু থেমে) ঠিক বুঝতে পারলাম না।

গ্র সা—মেয়েদের কখন পদবী বদল হয় সিমন? আমি সবই বুঝিয়ে বলছি। আমাদের ভেতরকার সম্পর্ক অবশ্য একই রকম আছে। আমার কথা তোমাকে বিশ্বাস করতেই হবে।

সিমন—পদবী বদলেছে—অথচ আমাদের সম্পর্ক আগের মতই আছে?

গ্র সা—কি করে এত তাড়াতাড়ি তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলি—নদী পার হয়ে আমার কাছে চলে এস।

সিমন—হয়তো তার আর দরকার হবে না।

গ্রুসা—খুব দরকার হবে। তাড়াতাড়ি এ পারে চলে এস সিমন।

সিমন—যুবতী কি বলতে চায় যে একজন অনেক দেরীতে ফিরে এসেছে?

[গ্রুসা হতাশভাবে তার দিকে চাইবে—তার দুচোখ বেয়ে জলধারা গড়িয়ে পড়বে। সিমন সামনের দিকে চেয়ে থাকবে।]

সিমন—ওখানে মাটিতে একটা বাচ্চার টুপী পড়ে আছে। এথেকে কি বুঝবো এরই ভেতর একটি শিশুর জন্ম হয়েছে?

গ্রুসা—একটি শিশু আছে বটে—আশ্রয়হীন শিশু। কিন্তু এ নিয়ে চিন্তার কারণ নেই—শিশুটি আমার সন্তান নয়।

সিমন—এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই।

কথক

অন্তরে ছিল গভীর আকাঙ্খা, কিন্তু অপেক্ষা করল না। প্রতিজ্ঞা করে তা ভাঙলো, কেন—কেউ জানে না। যুবতীর মনে যা ছিল তা সে বলেনি —সেটা শোন:

"তুমি যখন ব্যস্ত ছিলে সৈনিক,
রক্তাক্ত যুদ্ধ, অতি নোংরা যুদ্ধ
আমি এক সহায়হীন, শিশুকে দেখতে পেলাম
আমার অন্তর বলে উঠলো ওকে রক্ষা কর।"

সিমন—যে ক্রশটা দিয়েছিলাম সেটা আমাকে ফেরৎ দেও। না, ওটা এই নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই আরও ভাল হবে। (চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াবে।)

গ্র সা—(উঠে দাঁড়িয়ে) সিমন সাসহাভা, চলে যেওনা।

বিশ্বাস কর ওই শিশু আমার সন্তান নয়। (হঠাৎ শিশুদের কলরোল শোনা যাবে।) কি ব্যাপার, তোমরা বাচ্চারা চেঁচাচ্ছ কেন?

বাচ্চারদল—সৈন্যেরা এসেছে। তারা মাইকেলকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে।

[একথা শুনে গ্রুসা বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। দুজন সৈনিক গ্রুসার দিকে এগিয়ে আসবে—তাদের মাঝে মাইকেল।]

সৈনিক—আমাদের আইনের নামে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তোমার কাছে যে ছেলেটিকে পাওয়া যাবে তাকে শহরে নিয়ে যেতে। সন্দেহ করা হচ্ছে এই শিশুটিই হচ্ছে মাইকেল আবাসউইলি—স্বর্গগত গভর্ণর জর্জ আবাস-উইলি এবং নাটেলা আবাসউইলির একমাত্র সন্তান এবং উত্তরাধিকারী। এই দেখ শীলমোহর করা সরকারী আদেশপত্র। (শিশুকে নিয়ে ওরা চলে যাবে।)

গ্রুসা—(ওদের পেছন পেছন ছুটতে ছুটতে চিৎকার করবে—) ওকে ছেড়ে দেও। দয়া করে ওকে মুক্তি দেও—ও আমার সন্তান।

কথক

সৈনিকেরা শিশুকে নিয়ে গেল, তার প্রিয় সন্তানকে, হতভাগিনী যুবতী তাদের অনুসরণ করে শহরে এল, ভয়াবহ সেই শহর।

তার জন্মদাত্রী শিশুকে দাবী করে বসল।

শিশুর ধাত্রীমাতার বিচার হবে,

কিন্তু বিচারে রায় দেবে কে?

শিশুর অধিকার দেওয়া হবে কাকে?

কে হবে বিচারক? ভাল অথবা খারাপ?

সারাশহরে তখন আগুন জ্বলছে

বিচারকের আসনে বসলো আজডাক।

(ক্রমশঃ)

চিত্তরঞ্জনের কবি কর্ম্ম

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

প্রাক স্বাধীনতার যুগে রাজনীতির বন্ধুর পন্থায় যিনি সুদৃঢ় পদক্ষেপ করিয়াছিলেন অথবা বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর কুটিল স্বার্থসংরক্ষণকারী আইনের উত্তাল আবর্ত্ত-সঙ্কুল উজানী স্রোতে পাল তুলিয়া নির্ভীক চিত্তে মুক্তি-বন্দরপানে নৌকা সঞ্চালন করিয়াছিলেন তিনি যে মূলতঃ একজন কাব্যমার্গের সাধক ছিলেন একথা আজ অনেকেই বিস্মৃত হইয়াছেন। বস্তুতঃ চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিজীবনের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় এই যে তিনি ছিলেন একাধারে কাব্যরসের স্রষ্টা ও বোদ্ধা। অতিশয় অল্পবয়সেই তাঁহার কবিকল্পনার উন্মেষ ঘটে এবং কাব্য রচনায় তিনি প্রয়াসী হন। তাঁহার কবিমানস সর্ব্বাগ্রে সঙ্গীত-সৃষ্টিতে স্ফুর্ত্তিলাভ করে। তখন তাঁহার বয়সমাত্র পনের বছর (১৮৮৫সাল)। এই অপরিণত বয়সেই কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে একটি অকৃত্রিম ভক্তিভাবের উদ্রেক হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর আস্তিক্যবুদ্ধি ও অকৃত্রিম আস্থায় তিনি উদ্বুদ্ধ হন। নিম্নোক্ত ছত্রে ইহার নমুনা সুস্পষ্ট :

"ভক্তিপুষ্প দিয়ে মাগো! গাঁথিয়াছি হৃদিহার
বড় সাধ দিব তুলে ওই চরণে তোমার!

* * *

তুমি যদি আলো ক'রে থাক মা হৃদয় 'পরে
দুঃখ মোর সুখ হবে, দূরে যাবে অন্ধকার"

১৮৯২ সাল থেকে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত বিদেশে ছাত্রজীবন-যাপন করা কালেও তাঁহার মনে এই ভাব অটুট ছিল। সেই সময়ের একটি রচনা :

"আমার ভরসা তুমি
সুখে থাকি দুঃখে থাকি আমার ভরসা তুমি।
বিপদে পড়িলে পরে আমার পরাণ উপরে
রবে তুমি আলো করে জানি আমি জানি আমি।"

তাঁহার যে একটি মাত্র কবিতা ছাত্রপাঠ্য-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহাতেও ভগবদ্ভক্তি ও বিশ্বাসের সুরই অনুরণিত হইয়াছে। সেই বহু উচ্চারিত ও অতিপরিচিত কবিতাটি এই :

"যখন দেখিতে নারি, অন্ধকার আসে,
পথ খুঁজে মরে প্রাণ, তারি চারিপাশে।
কোথা হ'তে জ্বলে দীপ, সম্মুখে তাহার?
নয়নে দরশ আসে, চলে সে আবার!
যখনি হৃদয়যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধা'র।
কোথা হ'তে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর?
মহান সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর!"

চিত্তরঞ্জনের সমগ্র কবিকর্ম্মের সহিত পরিচয় করিতে হইলে তাঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি কেবল অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই হইবে না সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিমানসের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। অপ্রকাশিত রচনাবলী ব্যতিরেকে চিত্তরঞ্জনের প্রকাশিত কাব্যের সংখ্যা পাঁচটি। এইগুলিতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারের একশত সত্তরটি কবিতা বিধৃত। ইহার সহিত অপ্রকাশিত কবিতা ও গীতগুলি সংযুক্ত হইলে রচনার মোট সংখ্যা দুইশতকেরও অধিক হইবে। কবির সুযোগ্য কন্যা অপর্ণাদেবী এই কাব্যগ্রন্থগুলি সম্পাদনা করিয়া 'কবিচিত্ত' নামে প্রকাশ করিয়া কাব্যামোদী বাঙালী পাঠক ও রসিকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কারণ তাঁহার এই সাধু-

প্রচেষ্টা ভিন্ন কবিতাগুলি পুনরায় একত্রে সূর্য্যালোকের মুখ দেখিবার সুযোগ পাইত কিনা সন্দেহ।

চিত্তরঞ্জনের কাব্য ও তাঁহার কবিমানসকে আনুপূর্ব্বিক বিশ্লেষণ করিলে সর্ব্বাগ্রে যে বিষয়টি পাঠকের উপলব্ধি হয় তাহা এই যে, কবি আপনাকে নানাভাবে আত্মনিবেদন করিলেও জীবনের পরম ও চরম সত্যের প্রতি তাঁহার যে আকুল আস্পৃহা তাহাকে কখনও ত্যাগ করেন নাই। অন্তরের ব্যাকুলতা ও সত্যের প্রতি নিরন্তর অনুসন্ধিৎসার সার্থক পরিণতির স্বাক্ষর তাঁহার কাব্য। প্রকৃতপক্ষে কাব্যরচনাকারী যে কল্পলোকবিহারী বিচিত্র একশ্রেণীর প্রাণী নন বরং এই বস্তুময় জগৎ ও জীবনের মাঝে অবস্থান করিয়াও তিনি ইহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শ সব কিছুকে অবলম্বন করিয়াই কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁহার চলার পথে প্রধান পাথেয় চিরন্তন সত্য—চিত্তরঞ্জন অকপটে ইহা স্বীকার করিতেন এবং এই বিশ্বাসে আজীবন অটল ছিলেন। জীবনের পরমসত্যকে জানিতে হইলে অনন্ত মুহূর্তের অনুভূতি লাভ করিতে হয়। এবং সেইজন্য প্রয়োজন আত্মস্থ হইয়া বিশ্বাত্মার সহিত যোগ স্থাপন। এই অবস্থাতেই প্রাজ্ঞব্যক্তিরা 'ব্রহ্মস্বাদ সোদর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমাদের বাংলা সাহিত্যে কাব্যসৃষ্টির একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহার মূল সুর গীতিধর্মী এবং ইহার প্রধান বক্তব্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ঐতিহ্যকে বহন করা। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে ইহার সূচনা এবং জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস প্রমুখ পদকর্ত্তাদের অবদানে সমৃদ্ধ হইয়া উত্তরকালে সাধক রামপ্রসাদের কৃতি পর্য্যন্ত প্রসারিত। পরবর্ত্তীকালে কাব্যসাহিত্যের যত বড় স্রষ্টা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কেহই এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সম্পদ হইতে কিছু না কিছু ঐশ্বর্য্য আহরণ না করিয়া দিতে পারেন নাই। বিহারীলাল অক্ষয়বড়াল হইতে রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহিতলাল এবং তাঁহাদের সমকালীন কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় সকলেই বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যের অমূল্য রত্নভাণ্ডার হইতে মণি আহরণ করিয়া স্ব স্ব কল্পনাকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধতর করিয়াছেন। যৌবনের প্রারম্ভে চিত্তরঞ্জন ইংরাজী-সাহিত্যের ভাবরসে আপ্লুত থাকিয়াও বৈষ্ণবকাব্যের অনুপ্রেরণাতেই কাব্য রচনায় ব্রতী হন। তাই ইংরাজ কবিদের Idealism ও Realism-এর বাদানুবাদ হইতে আপনাকে দূরে সরাইয়া লইয়া তিনি খাঁটি বাংলাকাব্যের ধারা অনুসন্ধানে এবং সেই অফুরন্ত কাব্য নির্ঝরিণী হইতে রসসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া অন্তরের গভীর পিপাসা নিবারণ করিতে অগ্রসর হন। তাই তাঁহার কবিকর্ম্মে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের ভাব ও কল্পনার সাক্ষাৎ অনুসরণ সহজেই লক্ষ্যনীয়। অর্থাৎ তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন উহাতে যে মূল সুরটি ধ্বনিত হইয়াছে তাহা বৈষ্ণব কল্পনারই অনুগামী। আবার সকল বৈষ্ণবকবিদের তুলনায় তিনি চণ্ডীদাসকে শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের অমরবাণী—

"বঁধু কি আর বলিব আমি
মরণে জীবনে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি"

* * *

কিম্বা "সুখ দুখ দুটিভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারই ঠাঁঞি"

অথবা * * *

মাটির জনম ছিলনা যখন
তখন করেছি চাষ
দিবস রজনী না ছিল যখন
তখন গণেছি মাস
(এখন) একুল ওকুল দুকুল ডুবিল
পাথারে পড়িল দেহ

কহে চণ্ডিদাস কে আমি কে তুমি
ইহা না বুঝয়ে কেহ"— ইত্যাদি

চিত্তরঞ্জনকে কেবল মুগ্ধ করে নাই, তাঁহার কবি-মানসকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল। বৈষ্ণব রস-সাধনা ও সহজিয়া ধর্ম্মের যে চরমস্ফূর্ত্তি তাহা তিনি একমাত্র চণ্ডিদাসের কাব্যেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার নিকট নিছক কল্পনার বস্তু নয় প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় ছিল। তিনি এই অভিমত পোষণ করিতেন—"চণ্ডিদাসের গীতিকাব্য বাংলার যথার্থ গীতি-কাব্য। ইহাতে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় তাহাই গীতি কবিতার প্রাণ।" অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন: "চণ্ডিদাসের গানে যা অভাব ছিল, মহাপ্রভুর জীবনে তাহার পূরণ হইল।...চণ্ডিদাস যেন মহাপ্রভুর সৃষ্টিকে আনিতে ছিলেন।...চণ্ডিদাসের গান আর মহাপ্রভুর জীবন বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব।" কিন্তু এ প্রসঙ্গ থাক, আমরা চিত্তরঞ্জনের কাব্য আলোচনায় মনোনিবেশ করি। চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব-কবিদের রসপ্রেরণায় কিরূপ উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার কাব্যগুলি বিশ্লেষণ করিলেই অনুভূত হইবে। গভীর আস্তিক্যবুদ্ধি, বাসনাবিমুক্ত প্রেম কল্পনা চিত্তরঞ্জনের আজীবন সাধনবস্তু ছিল। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মালঞ্চ' (১৮৯৬) হইতে কিছু অংশ উদ্ধার করিয়া তাহার প্রমাণ লাভ করিব:

"সমস্ত হৃদয় তব
অজানিত নিত্য নব
বিশাল ধরণী আর অনন্ত গগন
তোমারও প্রেম সেই তোমারি মতন।"

জাগ্রতাবস্থায় কি স্বপ্নঘোরে কবি যাহা কিছু উপলব্ধি করেন তাহার সবই ঈশ্বরসান্নিধ্যযুক্ত। অনন্তের কল্পনা, সুন্দরের স্পর্শ আর প্রেমের অমৃত মাধুরীর অভিব্যক্তি তাঁহার অধিকাংশ কাব্যেই উপজীব্য। 'জীবনের গান' কি তাহার বর্ণনায় কবি বলিয়াছেন:

"আসে প্রেম অনন্ত সুন্দর।
তুলে দেয় হস্তে মোর
রক্ত ফুল তার
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয়
মধু গন্ধ ভার।
স্বপ্ন দেয় ভরিয়া—
গোপনে চুম্বিয়া যায় আমার অন্তর
এ প্রেম সুন্দর!"

কবির প্রাণে কাব্যের অফুরন্ত কল্পনা তীব্রভাবে নাড়া দিলেও ভাষা ও ছন্দে রূপায়িত করার সময় যেন সেই ভাবৈশ্বর্য্যের অনেকখানি অনবদ্য থাকিয়া যায়। ফলে তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন সে যেন তাঁহার নিকট একপ্রকার দারিদ্র্যের দহন।

"অনন্ত সঙ্গীতরাশি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
দিবসরজনী করে উন্মাদ আমারে।
হৃদয় সম্পদরাশি ফুটে না ভাষায়
বাহিরে আসিলে সব সৌন্দর্য্য হারায়।"

* * *

কি যেন গাহিতে চাই, কি যেন গাহিতে যাই
অভিশপ্ত হৃদি মোর, গাহিতে পারি না তাই।"

'মালঞ্চ' কাব্যে কবির যে ভাবকল্পনা অপরিণত রূপ লইয়া অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত হইয়াছিল 'মালা' কাব্যে তাহার স্বরূপ পূর্ণ প্রতিভাত হইল। তাঁহার ভগবৎবিশ্বাস যেন গভীর প্রেরণা লাভ করিয়া ঈশ্বরীয় ভাবচিন্তায় অনুপ্রাণিত হইয়া আপনাকে নূতনরূপে আবিষ্কার করিয়াছে। কবি প্রত্যক্ষ করিতেছেন:

"সকল গগন ঘেরা সাঁঝের স্বপন ছায়া
সকল ধরণী পরে বিছায়েছে ম্লান মায়া!
এরি মাঝে সত্যরূপে উজলি উঠেছে ওই!
তোমার প্রদীপখানি!
কি সত্য সুন্দররূপে আঁধারে জ্বলিছে ওই
অপূর্ব্ব প্রদীপখানি!"

বস্তুতঃ এই তদ্গত চিন্তাই কবিকে ঈশ্বরসান্নিধ্যে নিকট তর করিয়াছে। কবি তাই বলিতেছেন:

"আজ পাইয়াছি তব সত্য পরিচয় !
আছিলে গোপনে মোর মন অন্তঃপুরে
আমারি বাসনা, আমারি পঞ্জর জুড়ে !
যেমনি বাজাহু বাঁশি, সলাজ চরণে—
বাহিরিলে—দাঁড়াইলে—অপূর্ব্ব ধরণে ;"

'সাগর সঙ্গীত' (১৯১৩) কাব্যে কবি আপনাকে যেন উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অগাধ বারিধির অনাদ্যন্ত তরঙ্গলীলা তাঁহার প্রাণে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে কবি আত্মগত কণ্ঠে তাহার নিত্যপরিবর্ত্তনশীল সত্তাকে ছন্দবন্ধনে আবদ্ধ রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইংরাজ কবি শেলীর কাব্যে যেমন একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির অনির্ব্বচনীয় আস্বাদ লাভ করা যায় যাহাকে কবি সঠিক-ভাবে বর্ণনা করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন "Be it Love Light, Harmony or Universal Soul' তেমনি 'সাগর সঙ্গীতের' কবিও তাঁহার ভাবরাশিকে কেবলমাত্র অন্তরে ধারণ না করিয়া সেই অচিন্ত্যনীয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন :

"অনন্ত শব্দভরা অকূল নির্জ্জন
বিচিত্র এ সঙ্গীতের নীরব গর্জ্জন !
* * *
কি অনন্ত শান্তিভরা জোছনার রাশি
পরাণে সঞ্চারি ওঠে আনন্দে অবাধে !
* * *
এ কি সুখ ? একি দুঃখ—প্রণয় গভীর
একি ? উত্তাল, উন্মাদ, অশান্ত অধীর !

এবং সবশেষে কবির অন্তরের এই প্রার্থনা :

"হে মোর আজন্ম সখা ! কাণ্ডারী আমার
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।"

—কবির সেই বিশ্বাতীত অনুভূতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যাহা তাঁহার আজন্ম সন্ধানী আরাধ্য ছিল।

কবি শেলী যেমন তাঁহার কাব্যে বলিয়াছেন, 'Make thy lyre even as the strings were thyne' তেমনি চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন :

"আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী !—বাজাও আমারে
দিবস রজনীভরি আলোকে আঁধারে,
বাজাও নির্জ্জনতীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়,
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায় !

'সাগর সঙ্গীত'-এর উনচল্লিশটি কবিতা এক একটি তরঙ্গের ন্যায় সঙ্গীতধ্বনি ও সুরমাধুরী সৃষ্টি করিয়াছে। কাব্যের উপসংহারে কবির প্রার্থনা ভগবানের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সে প্রার্থনা এই :

"এপার ওপার করি পারিনা ত আর
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।
* * *
খুঁজেছি তোমারে কত তরঙ্গের মাঝে
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে।
তোমার অপূর্ব্ব ওই আলো অন্ধকারে
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে।
হে মোর আজন্ম সখা ! কাণ্ডারী আমার !
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার !"

'অন্তর্যামী' চিত্তরঞ্জনের অন্তরের আকুতিকে সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ করিয়াছে। জীবনের সূচনাকাল হইতে কবি যে দেবতাকে ইহলোকের পরমনির্ভরশীল আরাধ্য-বস্তু হিসাবে গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হইয়াছে। তাঁহার কবিজীবনের প্রত্যূষলগ্নে প্রেম ভক্তি ও ত্যাগ—এই তিনটি সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান গুণাবলীকে আশ্রয় করিয়া প্রাত্যহিক জীবনের যাত্রাপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপে ভূমানন্দের স্পর্শলাভ করিয়া তিনি যেন বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'অন্তর্যামীকে' প্রশ্ন করিয়াছেন :

"ওগো অন্তরতর।
মিটেছে কি সকল তিয়াস
আসি অন্তরে মম ?"

চিত্তরঞ্জন তাঁহার অন্তর্যামীকে বলিয়াছেন :

"যে পথেই ল'য়ে যাও, যে পথেই যাই,
মনে রেখ আমি শুধু তোমারেই চাই।

অথবা "তোমার আছে অনেক সুর, একটি সুর দাও!
যে সুরটি হারিয়ে গেছে তাহারে ফিরাও!

* * *

তোমার আছে অনেক গান, একটি গান গাও!
যে গান আমি ভুলে গেছি, সে গান শুনাও!"

কিম্বা "আঁধার যদি আসে আরো, নেব তারে টানিয়ে
প্রাণের মাঝে রাখব তারে,
প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়ে।"

আরও "এস আমার মরণকালে এস হাসি হাসি!
আন তোমার মরণ-হরা সব ভুলান বাঁশী!

এবং পরিশেষে

"এস আমার মৃত্যুঞ্জয়! এস অবিনাশি!
বুকের মাঝে বাজিয়ে দাও অভয়
তোমার বাঁশী!
ভয় ত্রাস ঘুচে গেছে, চিরদিনের তরে!
নাইক আর আঁধার কোন,
আমার আঁখির 'পরে!

* * *

থাক আমার প্রাণের প্রাণে, থাক অনুক্ষণ!
মনের মাঝে সাড়া দিও ডাকিব যখন!"

চিত্তরঞ্জনের শেষ কাব্যগ্রন্থ 'কিশোর কিশোরী' (১৯১৫) গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে স্বসম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাসাহিত্যে পত্রপত্রিকার ইতিহাসে 'নারায়ণ' পত্রিকার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। স্বদেশী যুগের বৈপ্ল'বক চিন্তা এই পত্রিকার মাধ্যমে কেবলমাত্র প্রচারিত হয় নাই তাহা দেশের সর্বস্তরের জনমানসে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। বিপিনচন্দ্র পাল শরৎচন্দ্র প্রমুখ শক্তিশালী লেখকগণ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 'কিশোর কিশোরী' কাব্যে সেই বৈপ্লবিক চিন্তার কোনও স্পর্শ পাওয়া যায় না। ইহাতে কবির আজন্ম সঞ্চিত বৈষ্ণব পদাবলীর সুরমূর্চ্ছনাই অনুরণিত হইয়াছে।

'ব্রহ্মসত্য জগৎমিথ্যা' মায়াবাদী দার্শনিকদের এ চিন্তাকে বৈষ্ণবকবিগণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এ জগৎপ্রপঞ্চ তাহা কখনই সম্পূর্ণ মিথ্যা হইতে পারে না ইহার মধ্যেও সৃষ্টিকর্তার মনের অন্তর্নিহিত সত প্রতিভাত হইতে পারে মানুষ যদি সাধনার দ্বারা তাহাকে অনুসন্ধান করিতে তৎপর হয়। তাই বৈষ্ণবকবির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয় বলিয়া গৃহীত হয় নাই অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শুদ্ধি ভোগ ও ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত এক কথায় এই ইন্দ্রিয়ই ভাগবত ভোগের ইন্দ্রিয়। চিত্তরঞ্জনের 'কিশোর কিশোরী' কাব্যে এই বিশ্বাস ও মতবাদই অভিব্যক্ত হইয়াছে :

"মিথ্যা সেই সত্যরূপী মুরতি তোমার
আমি মিথ্যা, তুমি মিথ্যা সবই মিথ্যাকার।
জগৎ সংসার মিথ্যা মায়ার ছলনা।
বল কোন্ প্রবঞ্চক দৈত্যের রচনা!"

* * *

অথবা "এ কি সত্য? এ কি মিথ্যা?
জানিনা জানিনা
জানি শুধু এই লীলা অনন্ত কালের।
জানি আমি জন্মে জন্মে তোমারে পেয়েছি,
লভেছি পরশ কতভাবে কতবার!"

চিত্তরঞ্জনের কাব্যগুলির মূল বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তাঁহার রচনাবলী সম্পর্কে সাধারণভাবে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। যেমন, তাঁহার কাব্যের ছন্দ সম্বন্ধে বলা যায় তিনি পয়ার, দ্বিপদী, ত্রিপদী ছন্দে যেমন কাব্য রচনা করিয়াছেন তেমনি তাহাতে Long Verse, Ter Rima প্রভৃতির নমুনাও দেখা যায়।

চিত্তরঞ্জনের কবিতা সংগ্রহের মধ্যে চতুর্দ্দশপদী কবিতা বা সনেটের সংখ্যাও নগণ্য নয়। সনেট রচনায় অবশ্য তিনি পেত্রার্কা, মিল্টন, রসেটি, ব্রাউনিং, কীটস প্রভৃতির ন্যায় গাঢ়বদ্ধ ভাব বা কঠিন নিয়মবন্ধন পালন করেন নাই তথাপি সেগুলি যে অপকৃষ্ট রচনা এমন কথা বলিবার দুঃসাহস কারও হইবে না। বস্তুত বাংলা কাব্যে সনেট রচনায় মধুসূদন, মোহিতলাল, নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রমুখ গুটি অল্প কয়েকজনই সনেটের সুডোল Form বা বাঁধুনিকে

অনুসরণ করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য রচয়িতা সেক্সপীয়র সনেট রচনায় স্বকীয়তা অবলম্বন করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সেক্সপীয়রের ধারাকে অনুসরণ করিয়াছেন, পক্ষান্তরে প্রমথ চৌধুরী ফরাসী কাব্যের Art formকে বাংলা সনেটে রূপায়িত করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জনের সনেটে রচনায় দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আবার তাঁহার সনেট পরম্পরাগুলিও (Sonnet Sequence) রসেটি বা ব্রাউনিং-এর পন্থা হইতে ভিন্ন পন্থার অনুগামী। কিন্তু যেগুলিতে ভাবের গভীরতা অথবা প্রেমের নিবিড় অনুভূতি বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা রসিক পাঠকের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না।

চিত্তরঞ্জনের সনেট কবিতা হিসাবে কতখানি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার বিচার করিতে হইলে সেই রচনাগুলির অন্তর্নিহিত রসকল্পনা বিশ্লেষণ করিতে হইবে। অনুরাগী পাঠকদের কৌতূহল নিবারণের জন্য নিম্নে দুইটি সনেট উদ্ধৃত হইল: সুখ ও দুঃখ জীবনের এই দুইটি সঙ্গী মানুষকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিতেছে। দুঃখে মানুষ যেমন হতবুদ্ধি হইয়া যায়, সুখে তেমনি সে আপনার আত্মসম্বিৎ হারাইয়া ফেলে। তাই সুখ ও দুঃখের মূল যে চেতনা তার বর্ণনায় চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন:

১। "তুমি চিরদিন ভ্রম কনক কাননে
প্রাণপূর্ণ আশাপুষ্প চোখে হাস্যভাতি
কি স্বর্ণ মোহনমন্ত্র তব শুভ্রাননে
বিকশিত পুণ্যালোকে প্রতি দিনরাতি।
দেবতার সুধাভাণ্ডে হে শুভ্র বালক!
ঢালিছ অনিন্দ্যহাসি সে সুধা জিনিয়া
কুসুম দুর্ব্বলদেহ অশান্ত অলক
নন্দনের স্বর্ণ করে নিত্য ঝলসিয়া।
অপ্সরার বক্ষস্তরে তুমি খেলা কর,
কৌতুকে চুমিয়া লও কিন্নরীর মুখ:
নির্ঝরের মত হেথা ছদ্মবেশ ধর—
নিতান্ত মানবাতীত হে সুন্দর মুখ!
ধরণীর মায়ামৃগ সুবর্ণ-মণ্ডিত,
থাক তুমি স্বর্গপুরে সুরেন্দ্রবন্দিত।"

২। "তোমারে চিনেছি দুঃখ। তুমি রাখ মোরে
আবরিয়া কি অপূর্ব্ব প্রেয়সীর মত
সংসারের সর্ব্বসুখ হতে। সাধ ক'রে
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লও প্রাণপুষ্প শত।
অধর চুম্বনছলে রক্ত কর পান—,
নিঃশ্বাসে মরণ আন অন্তরে আমার,
আলিঙ্গনপাশে বাঁধ মৃত্যুর সমান,
বিমুক্ত কুন্তলে কর অনন্ত আঁধার।
সমস্ত জীবন ওগো রহস্যমধুরা।
দিবসে নিশীথে কর খেলনা তোমার:
সর্ব্বদা করেছি পান ওগো তৃষ্ণাতুরা।
আশাভয় প্রেম সুখ সর্ব্বস্ব আমার।
অন্তরে জলিছে চির চুম্বন তোমার
অনন্ত সুন্দরী তুমি প্রেয়সী আমার।"

চিত্তরঞ্জনের সনেটগুলির মধ্যে বিষয়বস্তু ও বক্তব্যের একটি বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তাহাতে প্রেমকল্পনা ছাড়া ব্যঙ্গের স্পর্শও বর্ত্তমান। এই কারণে সেকালের রক্ষণশীল সমাজের শিক্ষিতগণ এবং ধার্ম্মিক জন সমাজের গোঁড়া প্রধানগণ এগুলি সুনজরে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহার 'ঈশ্বর' ও সোঽহং সমাজের কপটতার আবরণকে উন্মোচিত করিয়া দিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'বারবিলাসিনীর প্রতি' রক্ষণশীল ব্যক্তিদের নিকট অনাদর লাভ করিয়াছিল। তথাপি তিনি এই আচরণে বিচলিত হন নাই বরং দৃঢ়তার সহিত সকল তিরস্কার ও ভর্ৎসনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। মোনালিসার চিত্র দর্শনে রচিত তাঁহার কবিতা যেমন সুখপাঠ্য তেমনি ওকিলিয়া হৃদয়গ্রাহী। 'অভিশাপ' কবিতায় নিপীড়িত জনগণের করুণ আর্ত্তনাদের প্রতিধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে:

'সৃষ্টির নিগড় গড়ি চরণে পরিয়া আমি

অনন্ত ক্ষমতা নাই, অপার অনন্ত দুঃখ
স'ব চিরদিন'

যৌবনের প্রারম্ভে এবং ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে আইন অধ্যয়নকালে (১৮৯২-১৮৯৬) তিনি কতকগুলি সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ঐগুলির অধিকাংশ ভক্তিরসাশ্রয়ী। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে—লণ্ডনের সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে তিনি কিরূপে ঐপ্রকার খাঁটি বাঙালী মনের উপযোগী সঙ্গীত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতঃপর ১৯১০-১৬ সালের মধ্যেও তিনি কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করেন যেগুলি 'নারায়ণ' ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ঐগুলিতে সুর সংযোজনা করিয়াছিলেন এবং তাহা পরিবেশিত হইয়া রসিকচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার একটি সঙ্গীত নমুনাস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"একি বেদনার বাস পরালে আমায় !
একি জ্বালা জেলে দিলে হিয়ায় হিয়ায় !
ওগো নিদয় ! ওগো নিঠুর !
ওগো মোহন ! ওগো মধুর !
একি দুঃখ একি ব্যথা প্রাণে গরজায় !
হয় দাও, দাও দাও, দাও প্রাণ ভরে
নয় লও, লও লও, সব শূন্য করে ;
প্রাণ যে দেখিতে নারি এত যাতনায়
এই ঘোর আশাভরা আশা নিরাশায় !
ওগো নিদয়, ওগো নিঠুর !
ওগো মোহন ! ওগো মধুর !
কাতরে ডাকিছি আজ প্রাণের জ্বালায় !"

একথা হয়তো সত্য যে চিত্তরঞ্জনের কাব্যে মৌলিকতার কোন পরিচয় নাই তথাপি কবির আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, কাব্যসৃষ্টিতে স্বাভাবিক অনুরাগ তাঁহার রচনাগুলিকে পাঠকচিত্তের অনুকূল আবহ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্ব্বে তিনি যে কাব্যরচনার মাধ্যমে জনসাধারণের চিত্তে একটি সাড়া জাগাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাহা অবিসম্বাদিত ভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু তাঁহার কাব্যে যে সাম্য, স্বচ্ছতা, অর্থব্যক্তি ও যাথার্থ্য আছে তাহাতে তাঁহার কাব্য চিরায়ু না হইলেও যে স্বল্পায়ু হইবেনা তাহা ইতিমধ্যে প্রমাণিত হইয়াছে।

সাহিত্যে শ্লীলতা

বিনায়ক সান্যাল

কাব্যে অর্থাৎ সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতা নিয়ে বিতর্কটা আজকের নয়, চিরকালের। ভাস-কালিদাসের আমলেও প্রশ্নটা যে আলংকারিদের মনে উদয় হয়েছিল তাঁদের লেখা গ্রন্থাবলীতে তার প্রচ্ছন্ন প্রমাণ আছে। অশ্লীল রস বলে পৃথক কোন রসের অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও শৃঙ্গারের মধ্যে তাঁরা এর ইঙ্গিত করেছেন। রসটা আদি (এবং কতকটা অনাদি) বলেই বোধহয় চিত্রীর তুলি ও কবির লেখনীর মুখে আপনা থেকেই এটা এসে পড়েছে; আর পাঠকসমাজ বিদগ্ধজনও বাদ যান না—রসটা মনে মনে উপভোগ করেও মুখে এর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছেন। অবশ্য রস-পাকটা যেখানে নিতান্তই কাঁচা হাতের মুখরতাটা সেখানে শুধু মুখের নয়, অন্তরের দায়ও তাতে থাকে। সে যা হোক্, এটা ঠিক যে ভারতীয় অলংকারে বিষয়টা সংকেতিত হয়েছে প্রসঙ্গক্রমেই, বিতর্কিত হয়নি বিশেষভাবে ওদেশের অলংকারের মত। তবুও মনে হয় বিষয়টা আরও বিশদভাবে পর্যালোচনার যোগ্য। বর্ত্তমান শতকের বাঙলা কথাসাহিত্যের বিবর্তনধারা লক্ষ্য করে একথা না মেনে উপায় নেই। এদেশের এযুগের কাব্য তথা কথা-সাহিত্য অনেকাংশে পাশ্চাত্য প্রভাবিত। প্রভাবটা কোথাও প্রকট, কোথাও বা প্রচ্ছন্ন—কোথাও অনুসরণ, কোথাও বা অচ্ছদ্ম অনুকরণ। তাই সমীক্ষার ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিচারের মাপকাঠিটাও ওদেশী। পরিমাপক সূত্রগুলি প্রধানতঃ স্যাঁতব্যভ, ক্রোচে, ক্লাইভবেল, সান্টাইয়াণা প্রভৃতি নামী সমীক্ষকদের দামী উক্তিরই অস্বীকৃত উদ্ধৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা কিন্তু বর্তমান আলোচনায় স্বকীয় চিন্তা ও যুক্তির সঙ্গে প্রয়োজনমত পরকীয় চিন্তাস্রোতগুলি যুক্ত করে দেবো। রচনাটিকে রাশভারী করার জন্যে নয়, নিছক আত্মপক্ষ সমর্থনের দায়ে। যা হোক্ ভূমিকায় যবনিকা তুলে এবার রঙ্গপীঠে অবতীর্ণ হই।

কাব্যের ভাব ও ভাবের বাণীরূপ প্রসঙ্গে যে নিপুণ বিশ্লেষণ এদেশের আলংকারিকরা ক'রেছেন, তার মধ্যে নীতির প্রসঙ্গটা কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে পর্যালোচিত হয় নি; নীতির নিরিখে সাহিত্যের মূল্যায়ন কোন দেশে কোন যুগেই করা হয় নি; প্রশ্নটা তাই এর যুক্তিযুক্ততা নিয়ে। হিতের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী, আর হিতের সঙ্গে নীতির প্রশ্নটা এসে পড়াই স্বাভাবিক; একে গৌণ ব'লে গণ্য করে কৌশলে এড়িয়ে গেলে কিংবা কেবল আলগোছে ছুঁয়ে গেলে আলোচনার একটা প্রধান দিকই অনালোচিত থাকে। প্রাচীন সমীক্ষাশাস্ত্রে কি আছে না আছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অর্বাচীন কথাসাহিত্যের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে বলতেই হবে যে আলোচনাটা অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে। সমাজরূপের রূপান্তর ঘ'টেছে—বিশ্বের সঙ্গে পরিচয়ের ব্যাপ্তির ফলে নব নব চিন্তা ও ধারণা মানুষের মনকে আলোড়িত ক'রছে, বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবোধ কাল যা' ছিল আজ তা' নেই। বর্তমানের মধ্যেই ভাবীকালের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের শ্রমবিভাগ আর নেই। আর্থনীতিক সংকটের কারণে জীবনযাত্রা ক্রমেই কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে; নারীকে অনেক সময় নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই বিদ্যার বিনিময়ে উপার্জ্জনের পথ ধরতে হচ্ছে। ফলে সবক্ষেত্রেই নারী এসে দাঁড়াচ্ছেন পুরুষের পাশে। ঘর ও বাহিরের মাঝখানে যে প্রভেদের পরদাখানি ঝুলছিল কালের দমকা হাওয়ায় সেটা উড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে প'ড়েছে ধূলায়। তাই স্বভাবতই এর প্রভাব প্রতিফলিত হ'য়েছে সমসাময়িক সাহিত্যে। বিশ্বের নানা দেশের [illegible]

এসে যোগ দিয়েছে এর সঙ্গে—সাহিত্যচিন্তার ধারাও তাই স্বদেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে মোড় ফিরেছে। তাই ব'লে এই বিবর্তনের সবটাই স্বচ্ছন্দ তা' ভাবলে ভুল হবে। সাহিত্যিকদের চিন্তায় উগ্র আধুনিক হবার নেশাও যে মিশে নেই তা' বলা যায় না। সাহিত্য সমাজ সৃষ্টি করে এ কথা যেমন সত্য, সমাজও যে সাহিত্য সৃষ্টি করে, এ কথাও মিথ্যা নয়। সাধারণ সাহিত্যিকদের দল চলে যুথপতির পথ ধ'রে;—নিজের পথ নিজে রচনা করার প্রতিভা ক'জনেরই বা আছে? কাজেই সাহিত্য তাঁদের হাতে হয়ে দাঁড়ায় অনুকৃতি এবং অনুকৃতি থেকে অনিবার্যরূপে আসে বিকৃতি। সাহিত্য-রচয়িতাদের মধ্যেও ক'জনেই বা প্রকৃত ও বিকৃতরসের মধ্যে পার্থক্য-নিরূপণ ক'রতে পারেন? ফলে তাঁরা যা পরিবেশন করেন তা' তাজা রস না হয়ে হয় গাঁজারস; পান ক'রে পাঠকের মনে শুধু নেশাই লাগে এবং মৌতাতে অভ্যস্ত হ'য়ে প'ড়লে এর আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়া শক্ত হয়। 'মাইও পিয়া'য় দৃষ্টি যাদের আচ্ছন্ন, দূরকে তারা দেখতে পায় না। স্বীকরণের চেয়ে অনুকরণকেই এরা বেশি পছন্দ করে; তাই এদের সৃষ্ট সাহিত্য-বিগ্রহের মধ্যেভাবী-যুগের রূপটি প্রতিভাসিত হয় না। যুগান্তরের অভ্যুদয়ের আগমনী নেই এদের কণ্ঠে, তাই বিদেশের অন্ধ অনুকরণ ক'রে এরা রুচির শুচিতা হারিয়ে ফেলে এবং সমাজের সামনে কোন নতুন আদর্শ তুলে ধরতে পারে না। ফলে সাহিত্য হ'য়ে দাঁড়ায় খোর-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি-খোড়; প্রত্যাসন্ন প্রভাতের রবিচ্ছবি নেই এদের অংকিত আলেখ্যে—এদের সৃষ্টি বন্ধ্যা। তবুও সেই অফলা ভূমিতে হলচালনার প্রয়োজন আছে—প্রয়োজন আছে আগাছা-গুলো তুলে ফেলে নতুন বীজ বপনের। সাহিত্যের কল্যাণশ্রী যাঁরা কামনা করেন, সেই সব নিরপেক্ষ সমীক্ষকদের দৃষ্টি আমি এদিকে ফেরাতে চাই। এদেশের মম্মট ভট্ট অভিনবগুপ্তের মত ওদেশের কোল্‌রিজ্, আর্নল্ড কিংবা পাউণ্ড এলিয়টের মত সূক্ষ্ম সমীক্ষকদের প্রয়োজন আছে যাঁরা সমসাময়িক সাহিত্যের প্রকৃতিটা বুঝে নিয়ে প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারবেন। অলংকারের সূত্র ধরে সাহিত্যসৃষ্টি কোন দেশে কোন কালেই হয় নি নিয়ম মেনে অংক কষা চলে, রসসৃষ্টি করা যায় না তাই ব'লে অলংকার অনাবশ্যক নয়; আবহসঙ্গীতে মত এর অলক্ষ্য প্রভাবটা লেখকদের মনের ওপর ছা ফেলে; তাই বা কম কি? তা ছাড়া উচ্চাঙ্গে সমালোচনা শুধু তর্কের কচ্‌কচি বা যুক্তির সমষ্টিমাত্র ন —বিশিষ্ট সৃষ্টি। এলিয়ট ও রবীন্দ্রনাথের এই জাতী রচনাই তার প্রমাণ।

অনেকে মনে করেন রসরচনা তথা রসাস্বাদনা নীতির চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। রসসত্রে প্রবেশের মুখেই যদি নীতি নির্বাক নিষেধের মত তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে থাকে তা' হলে সেখান থেকে সেলাম ঠুকে স'রে পড়া ছাড়া আর উপায় কি? রস-রঙ্গপীঠে নীতির ভূমিকা গৌণ, প্রধান পাত্র সেখানে রীতি এবং তার আলোচনা রীতিমত হওয়া উচিত। রচনা রোচনা হয় রীতির গুণে। তাই রসবিচারে পাকপরিণতিই বড় কথা, মশলার মিশেল নয়। রীতিবাদী বামন একে বলেছেন 'কাব্যের আত্মা'। অন্যকথায় বিশ্বনাথ বলেছেন প্রকাশ-শরীর থেকে রস অনন্য। সিংহাবলোকন ন্যায়ে বর্তমান থেকে অতীতের দিকে ফিরে তাকালে দেখা যাবে সর্বকালীন কথাসাহিত্যের পটভূমিকা তথাকথিত দুর্নীতির কণ্টকে সমাকীর্ণ। বালজাক্, মোপাসাঁ প্রভৃতি বিদেশের বিশ্রুত লেখকদের কথা ছেড়ে দিয়ে স্বদেশের দিকে তাকাই। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মত সেরা সাহিত্যিকদের লেখাতেও কি সংস্কার-বিরোধী প্রেমের চিত্র স্থান পায় নি? বঙ্কিমের রোহিণী-শৈবলিনী, রবীন্দ্রনাথের বিমলা-চারুলতা, শরৎচন্দ্রের অচলা-কিরণময়ীকে কি সুধীসমাজ সহজ মনে মেনে নিতে পেরেছিল? এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া কিন্তু স্থায়ী হ'তে পারে নি কারণ সাময়িক সমাজনীতির বিরোধী হ'লেও এরা ছিল শাশ্বত হৃদয়ধর্মের অনুমোদিত—নীতির পরাভব হল প্রীতির কাছে। আর একটু বিচার করলে দেখা যাবে এই চিত্রগুলির পেছনে আছে অন্যতর উদ্দেশ্য—একটি মহনীয় জীবনাদর্শ। পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে যারা ছিল অচল, সমূহদৃষ্টিতে তারাই হল "অচল-চল"। শুধু তাই নয়,

সুধীসমাজের পাঁতিতে এরা পেয়েছে শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রগুলির পাশে বসবার অধিকার। কারুর কারুর মতে জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল হলেও সহৃদয় সামাজিক জনের দিক থেকে যে প্রতিবাদ-ধ্বনি ওঠে নি তার কারণ তাঁরা মনে করতেন যে কাব্য-রসাস্বাদনের জন্য রুচির চর্চা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত, কারণ ঠিক এই নয়। জয়দেব ও ভারতচন্দ্র যে নিন্দিত না হয়ে নন্দিত হয়েছিলেন তার কারণ স্থূল উপাদানগুলি তাঁরা এমন আশ্চর্য কৌশলে রূপায়িত তথা রসায়িত ক'রে তুলেছেন যে রুচির প্রসঙ্গ আপনাথেকেই গৌণ হয়ে পড়েছে। মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহারকেও রুচির কষ্টিপাথর দিয়ে বিচার করলে অশ্লীলতার কোঠায় ফেলা যায়, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন রসবোদ্ধা কাব্যখানিকে অপাঠ্য বলে অপাংক্তেয় করে রেখেছেন কি? রুচিহীনতার অজুহাতে শেক্স্‌পীয়রের 'Venus and Adonis' সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হ'য়েছে কি? আর শালীনতার সীমা উৎকটভাবে লঙ্ঘন করেও 'Don Juan' তো সুধীসমাজে আজও বাইরনের কবিপ্রতিভার অভিরূপ অভিজ্ঞান ব'লে স্বীকৃতি পাচ্ছে। যারা রুচিহীনতার ধুয়ো তুলে বাইরে আস্ফালন করেন তাঁরাই আবার ঘরে খিল দিয়ে ঐ সব বই নিয়ে বিভোর হ'য়ে যান। যৌন-চেতনা মানুষের আদিম বৃত্তি। সুতরাং এর উদ্দীপক যে সাহিত্য তা' মানুষের মনকে টানবেই ঠিক যেমন চুম্বক টানে লোহাকে, দীপশিখা টানে বহ্নি-বিবিক্ষু পতঙ্গকে। তাই বলে' মানুষের প্রবৃত্তিকে আরও ক্ষিপ্রবেগে পতনের মুখে এগিয়ে দিতে হবে, তা নয়। রাশ টেনে ধরার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। নারীর পরপুরুষের প্রতি আসক্তি সব সভ্যসমাজেই নিন্দিত, তাই বলে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন ক'রে যে রসভাস্বর অলৌকিক কাব্যলোক কল্পিত হয়েছে, বিশ্বের কোন সাহিত্যে তার তুলনা আছে কি? মূর্তিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় শুধু মাটি-কাঠ-খড়, শুধু ওপরের কাঠামোটা, তার অন্তর্লীন আনন্দকে নয়। উপাদানের উপযোগে যেরূপ প্রতিমাটি নির্মিত হয় সেই শিল্পনির্মিতির নামই সাহিত্য। এই প্রসঙ্গে মনস্বী অস্কার ওয়াইল্ড-এর একটি উক্তি স্মরণীয়। তাঁর মতে শিল্পের ক্ষেত্রে নীতির প্রসঙ্গই অবান্তর—কি সুনীতি কি দুর্নীতি। সাহিত্যকৃতিটি সুলিখিত কিনা সেইটাই একমাত্র বিচার্য। তাই বলে কামায়নকে রসায়ন ব'লে মনে করলে ভুল হবে। লৌকিককে অলৌকিকের স্তরে নিয়ে যেতে না পারলে অর্থাৎ বিষয়-বস্তুকে ইন্দ্রিয়লোক থেকে ইন্দ্রিয়াতীতে উত্তীর্ণ করতে না পারলে তা' সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। 'মোহমুদ্গর' নিছক নীতিকথা, সাহিত্য নয়। কেবলমাত্র তথ্যের অনুলিখনকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দিলে ভুল হবে। এদেশের আলংকারিকরা বারবার বলেছেন তথ্যের উদ্ভাস (Sublimation) না হ'লে তা' সত্য হয় না, তাই সাহিত্যও হয় না। রূপের রসায়ন সম্ভব হয় তখনই, যখন তা' কায়াকে ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে সহৃদয় সামাজিকের মনোলোকে। উপ্‌চিয়ে-পড়া এই মাধুরী-ধারা অঙ্গনাগণের অঙ্গাতিশায়ী লাবণ্যের মত বিমুগ্ধ দর্শককে রসার্দ্র করে তোলে। এই ধ্বনি লাবণ্যের নামই রস। রূপের ইঙ্গিত যেখানে তার পরিলেখের মধ্যেই পরিমিত বা সীমায়িত, লোচনের ভাষায় রসধ্বনিও সেখানে অনুপস্থিত। শব্দ-সম্ভার কামধুক্‌, সুপ্রযুক্ত হ'লে তা অন্তহীন অর্থধারা ধারণ করে, সহৃদয়-হৃদয়ে তার রসস্ফূর্তির বিরাম থাকে না। ম্যাথু আর্নল্ড বলেছেন কাব্যজীবনের ওপর অধ্যাত্মের উদ্ভাস। আচার্য অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যানের সঙ্গে এর মৌলিক ঐক্য আছে। শিল্পজীবনকে বাদ দিয়ে নয়, বস্তুলোককে অস্বীকার বা পরিহার করেও নয়, পরন্তু তাকে অঙ্গীকার ক'রে তাকে অতিক্রম করা। এই অতিক্রমণই সাহিত্য-কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। এই কারণেই এদেশে সাহিত্য-প্রসঙ্গে বিশেষ করে নীতির কথাটা আলোচিত হয় নি। নানাদিক থেকে দেখে কাব্যের যে মূল্যায়ন তাঁরা করেছেন সেই নিপুণ সমীক্ষার মধ্যেই এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তরটি নিহিত আছে। বস্তু যেখানে বস্তুই থাকে—নীতি (সু এবং কু দুইই) যেখানে নগ্নরূপে উন্মুক্ত, সেই রূপধেয়কে সাহিত্য আখ্যা দিলে সাহিত্যের মর্যাদাহানি হয়। পুলিস্‌-কোর্টের মামলার বিবরণ না

গীর্জার পাদরির সার্মনকে কেউ সাহিত্য বলবেন কি? উপদেশও সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যদি সে শীলোপদেশ কান্তা-সম্মিত হয়। এই হল সাহিত্য-বিচারের উচ্চতম আদালতের রায়।

এছাড়া শ্লীলতার সংজ্ঞা নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। নীতি বা রুচির ধারণা বা আদর্শ গড়ে ওঠে অনেকটাই সমাজব্যবস্থার বিশেষ প্রভাবের ফলে। তাই আলংকারিকরা সহৃদয়তার সঙ্গে সামাজিকতার কথা এত জোর দিয়ে বলেছেন। এক সমাজে যাকে বিকার বলে গণ্য করা হয়, অন্য সমাজে তাকেই স্বচ্ছন্দে স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'চ্ছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই প্রসঙ্গে জনৈক খ্যাতিমান সাহিত্যিকের একটি মন্তব্য খুবই সঙ্গত ব'লে আমার মনে হ'ল। তাঁর মতে সাহিত্যে শ্লীলতা বড় সমস্যা নয়। বক্তব্যও থাকবে অথচ অশ্লীলতাও থাকবে, তা হয় না। সাহিত্যের দুটো দিকই আছে—বক্তব্য ও শিল্পরূপ। যদি তাঁর কোন উপন্যাসে কোন সমীক্ষক বক্তব্যহীন অশ্লীলতার সন্ধান পেয়ে থাকেন, তা' অবশ্যই দূষণীয়। অশ্লীল ইঙ্গিত দেবার জন্যই যেখানে অশ্লীলতার অবতারণা, সেখানে সাহিত্যের শ্লীলতা ক্ষুণ্ণ হয়, সেখানে শ্লীলতা থাকা বা না থাকা একই হয়ে দাঁড়ায়। সাহিত্য বিচারে পাঠ-শেষের অনুভূতিই বড় কথা, শিল্পের জন্যই শিল্পকথার কথা মাত্র। শিল্প জীবনের উজ্জীবন। অন্যকথায়, শিল্প সাহিত্য প্রাকৃত জীবনের অনুকারী বা অনুসারী নয়, নবতর জীবনের উৎসভূমি। পাউণ্ডের মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সুগভীর অর্থের দ্বারা বিদ্যোতিত—'রমণীয়ার্থ-প্রতিপাদক' না হ'লে শিল্পায়ন নিরর্থক হ'য়ে পড়ে। জীবনের পূর্ণ চিত্র আঁকতে গেলে পাপপুণ্য, আলো-অন্ধকারকে পাশাপাশি দেখাতেই হয়, নতুবা আলেখ্যের অঙ্গহানি ঘটে। তা'ছাড়া জীবনের মূল্যায়নে তার উদ্দীপক কারণটি উপেক্ষণীয় নয়। বিভাব থেকে ভাবে, ভাব থেকে রসে ধাপে ধাপে উঠতে হ'য়। বিভাবের রসে রূপান্তরই তো কাব্য। সুতরাং কারণ ও কার্যের সূত্রে গ্রথিত যে চিন্তা, তার শিল্পরূপই প্রত্যাশিত। শিল্প-নিষ্পত্তি এরই সমবায়রূপ। কাজেই কোন লেখক যদি পণ করে থাকেন পুণ্যের চিত্র ছাড়া তিনি আর কিছুই আঁকবেন না, তা'লে সাহিত্যের সেই খণ্ডিত রূপ পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে; ড্রাইডেন্-এর যুগে জেরেমি কোলিয়ার-এর যে দশা হয়েছিল তারও সেই হাল হবে। সম্মার্জনী চালিয়ে পাদরি সাহেব সে যুগের সাহিত্যের জঞ্জাল একটুও সাফ্ করতে পেরেছিলেন কি? তাই নিছক নীতির সাফাই গাইতে যাওয়া নিরর্থক। ব্যাধি-মুক্তির উপায় হচ্ছে "সাপ ও মরে, লাঠিও না ভাঙে" নীতি অনুসরণ করা। পাপের ছবি আঁকো কিন্তু তাকে লোভনীয় করে মানুষের লালসার ঘুম ভাঙিও না। প্রবৃত্তিকে প্ররোচিত ক'রে তার শুভ সত্তাকে নিরয়ের পথে নামিয়ে দিও না। এই কথা ব'লতে গিয়ে আনাতোলের "থেইস" বইখানির কথা মনে পড়ছে;—কেমন ক'রে এক বারনারী সম্ভোগের পথ ছেড়ে দেবী পদবীতে আরূঢ় হ'লো এবং এক যতী ব্রহ্মচারী তার রূপের ফাঁদে প'ড়ে নিবৃত্তির শূন্যতা থেকে প্রবৃত্তির চোরাবালির দিকে পা বাড়ালো, লেখক তারই একটি চিত্তহারী চিত্র এঁকেছেন এই বইটিতে।

শিল্পে, বিশেষ ক'রে কথাসাহিত্যে, বাস্তবতা দোষের নয়; দোষ হয়ে দাঁড়ায় বিবৃতির বিকৃতির অর্থাৎ অশালীন অংশগুলোকে অশোভনভাবে তুলে ধরার ফলে। কপোল কল্পনার স্থান নেই একালের কথাবস্তুতে, আছে সৃজন-ধর্মী কল্পনার। বাস্তবচিত্রটি নিখুঁতভাবে আঁকতেই হয় সত্যের অনুরোধে; কিন্তু এখানেই শেষ নয়, তাকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলতে হয় এই কল্পনার আলোয়। কলা শিল্পের রসনিষ্পত্তি নির্ভর করে কলাশৈলীর কুশলতার ওপর—সুষ্ঠুতার ওপর নির্ভর করে স্বাদুতা। রূপকল্পটি নিহিত থাকে শিল্পীর অন্তরে, এই সংজ্ঞাই তাকে বলে দেয় কতটুকু রাখলে আর কতটুকু ফেললে, কতদূর গেলে আর কোথায় থামলে আলেখ্যটি সহৃদয় সামাজিকের গ্রহণীয় হবে। ঘটনাবলীর সমবায় রূপই শিল্প, বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো নয়। বিশ্লিষ্টরূপে যা অশিষ্ট

অশ্লিষ্টরূপে অনেকসময় তাই হয়ে ওঠে বিশিষ্ট, ভঙ্গনার গুণে। গ্রীক্ কারুমূর্তিগুলির কোন কোনটি নিরাবরণ, কিন্তু তাই বলে কে কবে তাদের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পেরেছে? কায়মনেই বা এরা বিকার এনেছে? রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকেও একসময় মসীচিহ্নিত ক'রে ঠেলে রাখবার চেষ্টা তো নেহাৎ কম হয় নি, কিন্তু তাতে বিদগ্ধজনের অন্তরে তা আসন একটুও টলেছে কি? প্রাকৃত সত্য যখন পরিণত হয় প্রকৃত সত্যে কাব্যমায়ায়, তখনই হয় তা সুন্দর, তার ব্যঞ্জনার আর বিরাম থাকে না। নীতির শাসন এ মানে না—এ একধারে রঞ্জন ও নিরঞ্জন।

হেলিংওয়ের একটি সার্থক উক্তি মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে; তাঁর মতে সাহিত্যে তাই সুনীতি যা পাঠশেষে চিত্তে আনে মাধুর্যের অনুভূতি আর দুর্নীতি তাই যা দেয় তিক্ততার স্বাদ। এর চেয়ে খাঁটি কথা আর নেই। নীতিগ্রন্থ পাঠ করে কারো নৈতিক চেতনা উন্মেষিত হয়েছে বা যৌন-চেতনা অবদমিত হয়েছে এমন খবর আমাদের জানা নেই। কান্তা-সম্মিত না হ'লে নীতিকথা নেতি কথায় পর্যবসিত হয়। হিতকথা যেমন রোচিষ্ণু না হ'লে আনে না অভিরূপ প্রতিক্রিয়া, ঠিক তেমনি ক্লিন্ন কুৎসিত পাপের চিত্রও আনতে পারে না বিরূপ প্রতিক্রিয়া তার কদর্যতাকে ঘোমটা খুলে তুলে না ধরলে। বীভৎস বা ভয়ানক তাই দেশীয় অলংকারে রসের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিরাগ সৃষ্টিই এখানে উদ্দিষ্ট, তাই রসানুরূপ তথ্য ও চিত্রায়ণও অপরিহার্য। ব্যঞ্জনা বা ধ্বনিই শিল্পের বড় কথা। এই সংগূঢ় শব্দশক্তিই চিত্রকে ক'রে তোলে বিচিত্র—নির্জীবরূপ প্রতিমায় করে প্রাণসঞ্চার।

পরিশেষে একটি কথা বলব এই প্রসঙ্গে। রাজনীতির মত শিল্পনীতিতেও দল ও মতের অন্ত নেই। একদল যাকে অশ্লীল বলে মনে করেন, আর একদল হয়ত তাতে আপত্তির কোন কারণই খুঁজে পান না। সাহিত্যে শুচিতার ব্যাপারে জনরুচিই একমাত্র নিয়ামক। সাহিত্যের গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধি ব'লে কিছু নেই—রায় দেবার মালিক সারাদেশের রসপিপাসু মানুষ, শুধু সমসাময়িক কালের নয়, আগামীকালেরও। বিধানসভায় হাততোলার জোরে আইন পাশ করিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু সারস্বত সভায় এটা অভাবনীয়। শুধু তর্কের ঝড় ওঠে মাঝে মাঝে, তাতে সিদ্ধান্তের রাস্তাগুলোই শুধু ধূলিকীর্ণ হয়—লক্ষ্যটা হয়ে ওঠে আরও অলক্ষ্য। আধুনিক গান ও কবিতার বেলায়ও একথা খাটে। কোন বিশেষ ঠাটের গান বা বিশেষ ধাঁচের কবিতা কালোত্তীর্ণ হবে কিনা তা' বোঝা যায় না দূরের দূরবীণ দিয়ে না দেখলে। নিকটের পক্ষপাত থেকে মুক্ত না হলে শিল্পরূপের স্বরূপটি ঠিক ধরা পড়ে না। সমসাময়িক কালে টেনিসনের আওতায় ঢাকা পড়েছিলেন ব্রাউনিং; পরবর্তী কালের সুধীসমাজ কিন্তু তাঁকে তুলে ধরেছেন টেনিসনের ওপরে। সে যা' হোক্ এ কথা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন যে স্বাদ ঠিক থাকলে শিল্পে খাদে কোন দোষ নেই। শিল্প-সাহিত্য অলংকার; খাঁটি সোনায় গহনা হয় না, খাদ কিছুটা দিতেই হয় তামার বা পেতলের; বিবাদটা আসলে খাদ নিয়ে নয়, তার অনুপাতটা হবে কি ধরণের এবং কতটা তাই নিয়ে। যা' চটুল ও চমকপ্রদ তা' প্রায়ই হয় ক্ষণিক ও ভঙ্গুর; যা আপাত মনোহর তা প্রায়ই পরিণাম রমণীয় হয় না। আতসবাজীর মত তার দীপ্তি ফুটে উঠেই যায় মিলিয়ে, মানুষের চিত্তাকাশে চিরকালের তারা হয়ে বিরাজ করে না। সুতরাং সাহিত্যে শুচিতা ও শালীনতা "গেল, গেল," বলে আক্ষেপ করা নিষ্ফল

সমিতি ও সঙ্ঘ

কালীচরণ ঘোষ

কোনো একটা বড় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হলে তার পিছনে চাই লোকবল। কেবল কথায় বলে ছেড়ে দিলে চলে না, তার প্রচার অতি প্রয়োজন, লোকের কাছে বার্ত্তা পৌঁছান চাই। নিজেরা কাজ করে, আদর্শ স্থাপন করতে পারলে তবে অপরে সেটা গ্রহণ করতে পারে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য সমিতিগুলি একটু ভিন্ন ধরণের মনে করতে হবে। পল্লীর দিকে সাধারণতঃ একটা বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে নানা লোক এসে মিলিত হতো এবং সেটা উদ্ধার হয়ে গেলে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তো। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অর্থাৎ কীর্ত্তনগান, যাত্রাদল একটু ভিন্ন পর্য্যায়ে পড়ে। সমাজসেবা অপেক্ষা অধ্যাত্মচর্চ্চা ছিল এ সকল সভার (হরি সভা প্রভৃতি) মূল লক্ষ্য। নিজ গ্রামের বা ক্ষুদ্র সমাজের গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর সমাজের কল্যাণে দলবাঁধা এবং তাতে কিছুটা স্থায়িত্বদান সুরু হয়েছে যখন থেকে, সমাজ তখন থেকে খুব বড় এক ধাপ এগিয়ে পড়েছে বুঝতে হবে।

সেবার ক্ষেত্রে একটু রূপ পরিবর্ত্তন হয়েছে। লোকের বিপদে আপদে এসে দাঁড়ান, রোগে সেবা, অগ্নিকাণ্ডে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে পরস্পরকে সাহায্যদান, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উৎসবাদি উপলক্ষ্যে মিলন, দরিদ্রের কষ্ট লাঘব, প্রভৃতি সেবার ওপর যোগ হলো, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ও উন্নতিবিধান, শিক্ষাবিস্তার, নৈশবিদ্যালয় স্থাপন, প্রাচীন গ্রাম্য-শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নূতনের প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্যমোচন ব্যবস্থা এবং আত্মনির্ভরতার শিক্ষা, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি দেখা দিয়েছিল।

এ সকলের মূল খুঁজতে গেলে রাজনারায়ণ—শিবনাথ—নবগোপালের কাল বিচার করতে হয়। তখন উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। এসময় কিছু কিছু বড় অনুষ্ঠান আচরিত হতে থাকে; সুতরাং তাদের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। প্রতিবছরই একই রকম অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য থাকলে এই সকল দল একটু স্থায়িত্বলাভ করে। প্রতিবারে অনভিজ্ঞ নতুন লোক দিয়ে কাজ করানোর অসুবিধা থাকে না।

বাঙলায় এ প্রয়োজনের উদ্ভব হয় স্বদেশী মেলা (১৮৬৭) কে অবলম্বন করে। তখন "ন্যাশন্যাল (জাতীয়) নানা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে এবং সেই সম্পর্কে নবগোপাল মিত্রর উৎসাহ নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র দ্বিতীয় স্তর পার করে, নতুনভাবে দেখা যায়: এখন এসেছে শরীরচর্চ্চার (একটি প্রধান লক্ষ্য) উৎকর্ষতা, ক্রীড়ানৈপুণ্য, কুস্তি জিমনাষ্টিক প্রভৃতি। "স্বদেশীমেলা"র লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করলে কর্ম্মক্ষেত্র কতদিকে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য সেটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮৬৮) কালে সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন," আমাদের এই মিলন ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য নহে, কোনো বিষয়সুখের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য ইহা ভারতভূমির জন্য। "এর সঙ্গে আর যে উদ্দেশ্য যুক্ত ছিল সেটা হচ্ছে "আত্মনির্ভরতা।" এই চেতনা দেশবাসীর মধ্যে বদ্ধমূল করতে এবং লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যেতে হলে কর্ম্মকাণ্ড যেরকম হওয়া উচিত, তার জন্য যথারীতি উপকরণের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

উদ্যোক্তারা একেবারে নিরাশ হন নি। পুরাতন ও নূতন কর্মপন্থা নিয়ে যুবকদল সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠা শিখেছিল। এমন সময় এলো স্বামিজীর উদাত্ত আহ্বান। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, আর্ত্ত, অছ্যুৎ, মূর্খ, ধনী দরিদ্র আপামর-সাধারণের সেবা, প্রতিদানের কথা না ভেবে "দিয়ে যাও আর ফিরে নাহি চাও" হৃদয়ের সমস্ত সম্বল উজাড় করে দেওয়ার নির্দেশ, প্রেম, আর প্রেম—সৃষ্ট জীবমাত্রকে প্রেম দান করতে হবে, তার ভিতর দিয়ে ঈশ্বরের সেবা করা হবে; "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—দেহে শক্তি মনে শক্তি, জগতে মর্য্যাদা লাভ করতে হলে, শক্তিমান হতে হবে. চরিত্রবলে বলীয়ান মানুষ অসীম বলের অধিকারী। আর সর্ব্বশক্তি সর্ব্বচেতনা দিয়ে মাতৃভূমির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে, তবে স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা মনে স্থান দিতে পারবে।

পরাধীনতা থেকে মুক্তির কথা এর আগে এমন স্পষ্ট ভাষায় আর কেউ বলেন নি, পথ সম্বন্ধে নির্দেশ এর আগে এমন করে আর আসেনি। সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধতাকে আর এক পর্য্যায় এগিয়ে দিলেন বিবেকানন্দ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "মিশন" ছাড়া যে সকল সমিতি নানাস্থানে গঠিত হলো সে সময়, তারা এই নূতন ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ধীরে ধীরে "সমিতি"র লক্ষ্য তার পূর্ব্বের সীমা অতিক্রম করে চললো।

এলেন অরবিন্দ, (তিলকও) সঙ্ঘ আরও নতুন পথে ছড়িয়ে পড়লো। শক্তি আর গণশক্তি, তাকে জাগাতে হবে দেশ উদ্ধার কাজে। ত্যাগ আর নির্য্যাতন ভোগ হলো তার সাথী। যারা মায়ের সন্তান তারা একলক্ষ্য হয়ে খালি এগিয়েই চলবে। এই রকম মন তৈরী করবার শক্তি বারোয়ারী যাত্রাদল, হরিসভার সভ্যদের মধ্যে নেই; সভা আর ধর্ম্মসভার মধ্যে নেই। বীজ যদিই বা থাকে, অনুকূল পরিবেশ না হলে তা পাতা নিয়ে বাইরে আসতে পারে না। বিপ্লবের হাওয়া যখন বইতে সুরু করলো তখন সমিতি সঙ্ঘের রূপ পরিবর্ত্তন হতে লাগলো।

বঙ্গ বিভাগের (১৬-ই অক্টোবর ১৯০৫) পূর্ব্বেই অনেক সমিতি গড়ে উঠেছিল। তার কেন্দ্রীয় চিন্তা ইংরেজের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। যারা এ কর্মতালিকা নিয়ে আবির্ভূত হয় নি তারাও ক্রমে এই পর্য্যায়ে এসে পড়েছিল। দেশ-সেবকদের মধ্যেও এই পরিবর্ত্তনের ধারা বেশ লক্ষ্য করা যায়। কলম দিয়ে বক্তৃতা করে যাঁরা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, তাদের অনেকে এ পথে এসে পড়ে-ছিলেন। কত ছেলে সাধু হবার জন্য বেরিয়ে বিপ্লবীদলের মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এখন 'সমিতি'র কথা আলোচনা করতে গেলে যতদূর খবর পাওয়া যায়, তাতে বাঙলার মধ্যে আত্মোন্নতি সমিতির নাম প্রথমেই মনে পড়ে। ১৮৯৭ সালে ওয়েলিংটন স্কোয়ার (রাজা সুবোধমল্লিক পার্ক) ছিল উদ্ভবের স্থান; পরে ১৩।১ বহুবাজার (বিপিন গাঙ্গুলী) ষ্ট্রীটে উঠে যায়। একেবারে গোড়ার দিকে এর উদ্যোক্তা ছিলেন নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। সেবা, শিক্ষা, স্বার্থচর্চ্চা ছিল প্রধান কার্য্য-তালিকা; আর ১৯০৫ সাল থেকে দস্তুরমত বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র দেব, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি খাঁটি বিপ্লবীদের দ্বারা পরিচালিত হয়।

সমসাময়িককালে (১৮৯৭) বোম্বাইয়ের বাইরে কাশীতে এক মহরাষ্ট্র বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। আরও কোথাও কোথাও হয়ত হয়ে থাকবে কিন্তু এর সঙ্গে বাঙলার কিছু সম্পর্ক ছিল বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে অপরাপর স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৮৯৮ সালে এই প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক একটি মারাঠি স্কুল স্থাপিত হয়। বস্তুতঃ তখন এত মারাঠী কিশোর যুবক কাশীবাস করতো না যাতে একটা স্কুল স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। এই থেকে উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য বুঝতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

এই ঘটনার পূর্ব্বে তিলক যখন লক্ষ্ণৌ আসেন (১৮৯৪) তখন এই বিদ্যালয়ের ভাবী প্রতিষ্ঠাতারা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। যতদূর বোঝা যায়, এঁরা তিলকের সমর্থন লাভ

করেছিলেন। তিনি ১৯০০ সালে স্বয়ং কাশী আসেন এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নিয়ে কর্ম্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এরই পরে "চাপেকার ক্লাব"-এর কয়েকজন সভ্য কাশীতে আসেন এবং তাঁদের সঙ্গে পরামর্শের ফলে "কালিদাস" নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

সুরু হতেই "কালিদাস" যে ভাষা ব্যবহার করে বললো তাই থেকে তার মতিগতি বুঝতে কষ্ট হয় নি। এ রকম মনে করা ভুল হবে না যে উত্তরপ্রদেশে এখন থেকে যে বিপ্লবের রেশ উঠেছিল তা একেবারে অন্তর্হিত হয়ে যায় নি।

কয়েক মাসের মধ্যে সম্পাদক কে, এ, গুরুজীর ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং তাঁর নিকট আট হাজার টাকা পরিমাণ জামীন তলব করা হয়। কোনোক্রমে সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠলেও 'কালিদাস' আর পূর্ব্বের অধ্যায়ে ফিরে যেতে পারে নি। শেষ পর্য্যন্ত গো-বীজ টিকা দেওয়ার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করায় পত্রিকা সরকার কর্ত্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কালে কাশীর কেন্দ্র বেশ জম-জমাট হয়ে উঠেছিল এবং ৪ঠা জানুয়ারী ১৯০৬ এক সভায় তিলক স্বয়ং ও তাঁর তিন সহকর্মী উপস্থিত হন। পূর্ব্ব হতে মহারাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙলার ঘনিষ্ঠ-সম্পর্ক থাকলেও কাশীর কেন্দ্র উভয়ের মধ্যে সেটা দৃঢ়তর করতে সমর্থ হয়।

ময়মনসিংহের সুহৃৎ সমিতির আবির্ভাবকাল ১৯০০-০১। প্রথম দিকে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বনামধন্য ব্রজেন্দ্র-কিশোর চৌধুরী। এই সমিতির একটু বিশেষত্ব আছে। ১৯০৪ সালে জানুয়ারী মাসে বঙ্গভঙ্গ প্রতিবাদ সভায় উদ্যোক্তারা বড় করে লিখে দিয়েছিলেন "বন্দে মাতরম্"। আর উৎসাহ হর্ষ সমর্থন প্রভৃতি জ্ঞাপন করতে সমবেত-ভাবে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উঠেছিল চারি দিক থেকে। যতদূর সংবাদ পাওয়া যায়, এইখান থেকেই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি সারা বাঙলা কেন, সারাভারতে ছড়িয়ে পড়েছে—জাতীয় সকলভাব ভাষায় ব্যক্ত করবার জন্তে।

১৯০৫ সালে সরলাদেবী "সমিতি" পরিদর্শনে গিয়ে কর্ম্মীদের "সন্তান" বলে অভিহিত করেন। পর বৎসর অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, সুবোধচন্দ্র (মল্লিক) সমিতির সভ্যদের সঙ্গে মিলিত হ'লে উৎসাহ ও কর্মশক্তি বহু গুণ বৃদ্ধি পায়।

ঢাকায় মুক্তিসঙ্ঘ স্থাপিত হয় ১৯০৫; হেমচন্দ্র ঘোষের নাম পত্তন হতেই জড়িত আছে। এক সময় বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্ত্তীকালে এরই অং বি. ভি. (বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স্ নামে বিশেষ পরিচয় লাভ করে।)

বৈপ্লবিক ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত হলো "অনুশীলন সমিতি"। বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম্মতত্ত্ব অনুশীলন' থেকে নামটি গ্রহণ করা হয়। সংক্ষেপে বলে রাখা যাক্ প্রারম্ভে এটি ছিল "ভারত অনুশীলন সমিতি", পরে 'ভারত শব্দ পরিত্যাগ করা হয়।

আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতায় ১৯০২ সালে স্থাপিত হলেও তার বৎসরখানেক আগে সতীশচন্দ্র বসু কলেজে ছাত্রাবস্থায় ব্যায়াম, পাঠ, চরিত্রগঠন প্রভৃতি লক্ষ্য করে কয়েকজন যুবক নিয়ে কাজ আরম্ভ করেন। তিনি এ কাজে কলেজের (General Assembly Institution) কোনো কোনো অধ্যাপকের সহায়তালাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন বেশ গড়ে উঠেছে তখন মদন মিত্র লেনে আখড়া স্থাপন করেন। পি, মিত্র এই প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অবগত হলে সতীশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং অনুশীলন সমিতি পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ করে।

প্রাথমিক কর্ম্মিদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা উত্তরকালে "যুগান্তর" দলের প্রতিষ্ঠাবান নেতা বলে পরিচিত হয়েছেন।

অনুশীলন সমিতির বড় করে পরিচয় হয় তার ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত শাখার সাহায্যে। ১৯০৫ সালে পি, মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গ সফরে গেলে ঢাকার কর্ম্মিদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় (৩রা মার্চ্চ ১৯০৫)। উত্তরকালে প্রচুর খ্যাতিমান পুলিনচন্দ্র (দাস)

এই সমিতি পরিচালনা করে এক নব উন্মাদনা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। নানাস্থানে শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এক সময় তার সংখ্যা পাঁচ শ'য়ের বেশী হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা সমিতির প্রভাবে কলকাতার সমিতি ম্লান হয়ে পড়ে। কলকাতায় মদন মিত্র লেনে (পরে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে) অবস্থিত কেন্দ্র ছাড়া আরও দু'তিনটি কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে ১৩, ঈশ্বর ঠাকুর লেনের কেন্দ্র জমিয়ে বসতে পেরেছিল।

তার একটু আগের কথার উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে (১৯০১) একটি 'আখড়া' প্রতিষ্ঠা করেন আপার সার্কুলার রোড (আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) ও সুকিয়া ষ্ট্রীট (কৈলাস বসু) ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের কাছাকাছি। সেখানেই প্রথম লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা, ড্রিল, ঘোড়াচড়া, কুস্তি, মুষ্টি যুদ্ধ, সাঁতার প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পি, মিত্র মহাশয়কে এ সংবাদ জানিয়ে জানিয়ে রাখা হয়। প্রথম দিকে তাঁর নিকট কোন যুবক এ সকল বিষয় শিক্ষার সন্ধানে এলে তিনি "বরোদা থেকে যারা এসে আখড়া স্থাপন করেছে" তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

প্রতিষ্ঠার সময় সমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত ছিলেন সুরেন্দ্র হালদার, চিত্তরঞ্জন দাশ, রজত রায়, এচ্ ডি, বসু প্রভৃতি তাৎকালীক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ। দুটি সংস্থা একযোগে কাজ করাতে এবং যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ায় যুবকের দল এসে যোগ দিতে আরম্ভ করে এবং স্বল্পকালের মধ্যে অনুশীলন সমিতি এ শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়।

পি, মিত্রের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ আবার স্বতন্ত্র হয়ে যান এবং বারীন্দ্র এসে কলকাতায় অধিষ্ঠিত হবার পর উভয়ের মধ্যে প্রবল বিরোধ জমা হয়ে ওঠে, ফলে যতীন্দ্রনাথ কলকাতা ছেড়ে চলে যান।

একদিকে অনুশীলন সমিতি গড়ে উঠছে অন্যদিকে সরলা দেবী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১৯০০ সালে যখন ওকাকুরার সঙ্গে পি, মিত্রের আলোচনা হয় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং কিছুটা কাজেরও ভার নেন। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না, এবং তিনি নিজে স্বতন্ত্র আখড়া প্রতিষ্ঠিত করেন। তার প্রথমটি হ'লো কর্ণওয়ালিশ (বিধান সরণি) ষ্ট্রীটে "লক্ষ্মী ভাণ্ডার" (১৯০৩)। এটার কতকটা আখড়া, কিছুটা 'ভাণ্ডার' বলে ধরা যেতে পারে, মূলে ছিল একটি মিলনের কেন্দ্র যেখানে দেশ-সেবকরা এসে মেলামেশা করতে পারে।

কিন্তু সরলা দেবীর আসল পরিচয় হ'লো বালিগঞ্জে স্থাপিত স্বাস্থ্য "এ্যাকাডেমী" (Academy 1904), এই খানে দস্তুরমত আক্রমণ ও প্রতিরোধ প্রণালী, লাঠি, ছোরা, তলোয়ার পরিচালনা, জিউজিৎসু, বক্সিং, ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হ'তো এবং তিনিই প্রথম এসব কাজের যোগ্য শিক্ষক মুর্ত্তাজা সাহেবকে নিযুক্ত করেন। বড় লাঠি খেলায় তিনি কয়েকটি বিখ্যাত শিষ্য তৈরী করেছিলেন তার মধ্যে পুলিন দাস অন্যতম।

সরলা দেবী কবে এবং কিভাবে ভারত স্বাধীন হবে সে উপায় চিন্তা করার সঙ্গে যুবকদের মনে শক্তির বিশ্বাস ও বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন। তিনি ভারতীর (আষাঢ় ১৩১০ পৃঃ ২১৬) পৃষ্ঠায় "বিলাতী ঘুষি বনাম দেশী কিল" কাহিনী সম্বলিত প্রবন্ধ ছাপিয়ে ছিলেন। আবার কার্ত্তিক সংখ্যায় (পৃঃ ৬৯০) ছাপালেন "কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম" তার অন্তর্গত ছিল "চাবুক পরিপাক" ও "ঠনঠনের নিমকি" প্রথম প্রবন্ধের পাদটীকায় লেখা ছিল : "আমাদের অভিধানে "ঘুষি" শব্দ দাঁত খিচুনি, মুখ ভ্যাঙানি, গালিগালাজ, লাঠির গুঁতা, ছাতার খোঁচা, চাবুকের আঘাত, প্লীহা ফাটানো, ও বন্য পশু ভ্রমে (মানুষ) শিকার।" আর 'কিল' শব্দ (বাঙালীর দাওয়াই) "আক্রান্তের আত্মরক্ষার ত্রিবিধ উপায়বাচক, যথা, বল, ছল ও কৌশল।" দুই প্রবন্ধেই বাঙালীর হাতে ফিরিঙ্গী (বা শ্বেতাঙ্গ)-র লাঞ্ছনার উদাহরণ দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় এই "মায়ের বদলে মার" নীতির প্রচার বাঙালীর বুকে সাহস ও বাহুতে বল এনে দিয়েছে। পূর্ব্বে যখন লাঞ্ছিত হ'লে "হজম" করে নেওয়া

উপেক্ষা করা, চেপে যাওয়া রীতি দাঁড়িয়েছিল, এখন অপমান বোধ এসে সে স্থান অধিকার করে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারের চিন্তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এবং নানা ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হ'লো যে অত্যাচারীর কাপুরুষতার সীমা নেই, ঘুরে দাঁড়ালেই "সত্রাসে পথ কুক্কুরের মত" পালিয়ে যায়। বাঙ্গলার বিপ্লবী-আন্দোলনে এই বলিষ্ঠ চিন্তা ও কার্য্যধারা একটা নূতন পথ দেখিয়ে দিয়েছে। ব্রহ্মবান্ধবের "সন্ধ্যা" এই নীতি প্রচারে শতমুখ হয়ে উঠেছে ভারতীর এই প্রবন্ধদ্বয় "সন্ধ্যা" আবির্ভাবের কিছু আগেই প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক সরকারী রিপোর্ট বলেছে—

"It worked the beginning of organised expression of the sprit of assertive nationalism in Bengal."

এখানে তাঁর "বীরাষ্টমী"র উল্লেখ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। ১৯০৪ সালে তিনি এই "ব্রত"র প্রবর্ত্তন করেন। এ উপলক্ষ্যে প্রদর্শনী হয়েছে যেখানে নানারকম শক্তির পরীক্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুষ্ঠিত হ'তো। তিনি নিজে রঙ্গমঞ্চে অসি ধরে আবির্ভূতা হ'তেন এবং পরিচালনার দক্ষতার পরিচয় দিতেন। সে যুগে এক মহিলার পক্ষে অতি সাহসের নিদর্শন বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। বীরাষ্টমীর গান "মাতৃভূমি তরে "অকাতরে প্রাণ দান করলে গোলোকে যে স্থান হয় সে কথা ভারতী (কার্ত্তিক ১৩১১) জোর গলায় বলেছে।

খড় কুটি ছিঁড়ে উঠিয়ে দিলে হাওয়ার গতি সম্বন্ধে ধারণা করতে কষ্ট হয় না। শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্রবল, দেশবিদেশের জ্ঞান আহরণ, নিজ দেহ মন সমাজের সকল প্রকার দুর্ব্বলতা অপসারণ প্রভৃতি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯০২ সালে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটি স্থাপিত করেছিলেন। ডন পত্রিকার জন্ম হয় ১৮৯৩ সালে এবং চলেছিল ১৯১৩ পর্য্যন্ত।

১৯০৪ সালে কলকাতায় ছাত্র ভাণ্ডার স্থাপিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন ইন্দ্রনাথ নন্দী, মিথিলেশ্বর রায় মৌলিক প্রভৃতি কয়েকটি যুবক। "ভাণ্ডার" একটি ছিল, ব্যবসার দিক দেখবার জন্যে, কিন্তু এর মেস বা আবাসটি ছিল বিপ্লবীদের মেলামেশার গোপন আস্তানা।

বরিশালের শক্তিশালী স্বদেশ বান্ধব সমিতি স্থাপিত হয় ৬-ই আগষ্ট ১৯০৫। পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (জমিদার) উপেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মান্য গণ্য লোকেরা। সমিতি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং পার্টিসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে ১৫৯টি শাখা।

প্রায় কোনো জেলাই বাদ যায় নি। ফরিদপুরে ১৯০৬ সাল নাগাদ গড়ে উঠেছিল ব্রতী সমিতি। প্রথম দিকটায় অম্বিকা চরণ মজুমদার ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। এক সময় এর দুর্দ্দান্ত প্রতাপে গভর্ণমেণ্ট বিব্রত হয়ে উঠেছিল। কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা দরকার মনে হওয়ায় ৬ কলেজ স্কোয়ারে এক শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এখানে যাঁরা পরিচালনা করতেন তার মধ্যে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার নাম উল্লেখযোগ্য।

ললিতমোহন ঘোষালের উদ্যোগে ৩৫ আহিরীটোলা লেনে গড়ে ওঠে (১৯০৭) স্বদেশসেবক সমিতি। এই বৎসরই রাণাঘাট (নদীয়া)-এ শক্তি সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। ছোট্ট প্রতিষ্ঠান কিন্তু নানা বিপজ্জনক কাজে লিপ্ত হ'য়ে পড়ায় প্রতিষ্ঠানের কোনো কোনো কর্ম্মী দীর্ঘ কারাযন্ত্রনা ভোগ করেছে।

এ সকল পার্টিসনের পরের ঘটনা, কিন্তু একই ধারায় চলেছে বলে আরও কিছু উল্লেখ করা হচ্ছে।

২৭ বলরাম বসু ষ্ট্রীটে ছিল এথ্লেটিক ক্লাব [Athletic Club] এবং সঙ্গে আরও ছিল হোগলকুরিয়া লেনে রায় বাগান ক্লাব, জগন্নাথ সেন লেনে বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে ও কালিদাস সিংহী লেনে আখড়া নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীটে যুবক সমিতি, ছিদাম মুদি লেনে মডেল এ্যাথলেটিক এ্যাসোসিয়েসন কালীঘাটে কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেবক সমিতি, রসা রোডে শান্তি শিক্ষা সমিতি, মল্লিক লেনে আর্য্য কুমার সমিতি, প্রভৃতি অজস্রসংখ্য বাঙ্গলার নানা স্থানে গড়ে ওঠে। এর মধ্যে যুগান্তর পার্টির কথা একটু স্বতন্ত্র ভাবে বলা দরকার।

যাদের নাম সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা গেল তারা প্রায় সকলেই পুলিশের সন্দেহভাজন হয়েছিল এবং তাদের অনেকানেক সভ্যর ওপর "নজর" রাখা হ'তো। বর্ত্তমানে পরিচয়হীন আরও নানা প্রতিষ্ঠান ছিল, বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করা হলো না। এই থেকেই বয়কট আন্দোলনের কর্ম্মী বেরিয়েছে। ভলন্টিয়ার বেরিয়ে নানা জাতীয়তাবাদী জনহিতকর বা বিপজ্জনক কাজে দেখা গেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত বিপ্লবাত্মক ঘটনায় লিপ্ত হয়েছে। যারা এসেছিল গোড়ায় দিকে তাদের নিবিড় দেশপ্রেম, সমগ্র জাতির কল্যাণই সামনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে, নিজেদের অমঙ্গল তারা বিপদকে যেন আবাহন করে এনে ছিল। সারা জীবন এই এক ব্রতে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল অনেকে। বিদ্যা বুদ্ধি, চরিত্র, স্বাস্থ্য, বংশগৌরব অনেকেরই প্রচুর ছিল, এবং সে সকলের সাহায্যে তারা বিত্ত, সম্মান, প্রতিপত্তি, সরকারী খেতাব লাভ ও বংশধরদের "স্থিতি" করে দিয়ে যেতে পারতো। বরং বিপরীত দিকে তারা গিয়ে পড়ে, যার পরিণামস্বরূপ কপালে "কালাপানি" যাত্রা ঘটেছে, ফাঁসির দড়িও কণ্ঠসংলগ্ন হয়েছে।

ক্ষুদ্র কয়েকজন তাদের স্মৃতি রাখার চেষ্টা করে চলেছে। দেশ যাদের গৌরবে সম্মানিত হ'তো, তাদের হীন করবার, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে নাম বাদ দেবার চেষ্টা দেশীয় সরকার করে চলেছে। এর চেয়ে কৃতঘ্নতার উদাহরণ কোনো দেশে আছে বলে জানা নেই। যাই হক্ রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন এবং লক্ষণও কিছু কিছু প্রকাশ পাচ্ছে যে এসকল সত্য চিরকাল চাপা থাকবে না। যেখানে পিতাপিতামহ "পণ্ডিত" বংশর বলে "পণ্ডিতজী" নাম মাত্র থাকবে, সেখানে দেশের সেবায়, ত্যাগের, বিপদবরণের মূর্ত্ত প্রতীক "নেতাজী" নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরকাল।
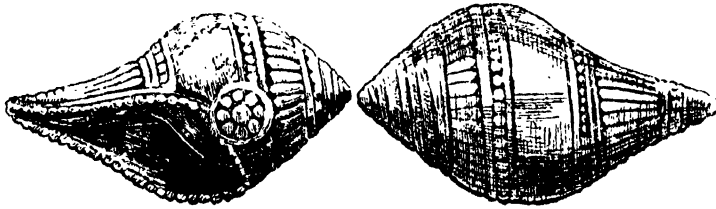
গান্ধীজির বইপড়া

কানাইলাল দত্ত

জনৈক পাশ্চাত্য লেখক মন্তব্য করিয়াছেন,—কোন অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে কি ধরণের বই পাঠকেরা পড়িবার জন্ম নেন তাহা দেখিয়াই সেখানকার জনসাধারণের রুচি ও নীতি সম্পর্কে একটা নির্ভরযোগ্য ধারণা করা যায়। ব্যক্তিমানুষের জীবনেও এই মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা আমাদের রুচি অনুযায়ী পড়াশুনা করি। দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট সারাজীবন মাত্র তিনটি দিন উপন্যাস পাঠে ব্যয় করিয়াছিলেন। এই তিনটি দিনের জন্যও তাঁহার কত দুঃখ। আবার অনেকে আমরা গল্প উপন্যাস গোয়েন্দা-কাহিনী ছাড়া অন্য কিছু পড়িই না। সুতরাং মানুষ কি পড়ে তাহা জানিলে মানুষটিকে জানা ও বুঝা সহজতর হয়। আমরা তাই এখানে গান্ধীজির পড়াশুনা লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনার দ্বারা তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিব।

প্রারম্ভে একটা কথা বলা দরকার। সূর্যোদয়ের বহুপূর্বে, সাধারণত রাত্রি চারি ঘটিকা হইতে গান্ধীজির দৈনন্দিন কাজকর্ম সুরু হইত। তখন হইতে রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র সময়টাতে নানা কাজের এমনই চাপ ছিল যে তিনি পড়াশুনা করিবার পর্য্যাপ্ত সময় পাইতেন না। অথচ পড়িবার জন্য তাঁহার এত প্রবল আগ্রহ ছিল যে স্নানের পূর্বে তেল মাখায় সময় এমন কি পায়খানাতে বসিয়াও তিনি কিছু কিছু পড়াশুনা করিতেন, এক সময়ে তেল মাখিতে তাঁহার একঘণ্টা সময় ব্যয় হইত। অপরে তাঁহাকে তেল মাখাইয়া দিতেন। এই সময় গান্ধীজি একখানি প্রাকৃতিক চিকিৎসার বই পড়িতেন। পায়খানায় বসিয়া খবরের কাগজ দেখিতেন বা বাংলা শিখিতেন। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে ইহা তাঁহার 'গান্ধী চরিত' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একদিকে গান্ধীজির সময়ের অভাব অপরদিকে কেতাবী জ্ঞানের উপর তাঁহার আস্থাহীনতা—এই উভয় কারণে সাধারণ্যে একটা ভাসা ভাসা ধারণা আছে যে মহাত্মা গান্ধীর পঠিত বইয়ের সংখ্যা বোধ হয় বেশি নহে। কিন্তু আসলে তিনি বিচিত্র বিষয়ে বিস্তর পড়াশুনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পঠিত নানা বিষয়বস্তুর উপর বিপুল সংখ্যক পুস্তকের কথা মনে করিলে বিস্ময়ে হতবাক হইতে হয়। জীবন ভোর কাজের মধ্যে আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকিয়া তিনি এত পড়িলেন কেমন করিয়া! আবার যেমন তেমন করিয়া পড়া নয়। গান্ধীজী বলিয়াছেন "যে অল্প পুস্তক যাহা পড়িয়াছি তাহা আমি ভালরকম হৃদ্গত করিয়াছি এ কথা বলিতে পারি।"

অনেকগুলি বই আধখামচা করিয়া পাঠ করা অপেক্ষা একখানা বই ভালভাবে পড়িলে অধিক জ্ঞানলাভ হয়। গান্ধীজি স্বাভাবিক বিনয়ে অল্প পুস্তক পাঠের উল্লেখ করিলেও বস্তুতঃ তিনি বিপুল সংখ্যক বইই ভালভাবে পড়িয়াছেন। এক্ষেত্রেও গান্ধীজি মহাবিস্ময়কর মানুষ। তাঁহার নিজের রচনাবলী, মহাদেব দেশাইয়ের ডায়েরি, পিয়ারেলালজি প্রভৃতির লেখা হইতে গান্ধীজির অধ্যয়ন বিষয়ে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশেষভাবে পড়াশুনা ও গবেষণা করিলে গান্ধীজীবনের ক্রমবিকাশের উপর নূতন আলোকপাত হইতে পারে। এই প্রবন্ধের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ। সুতরাং কয়েকটী নির্বাচিত বিষয় ও অল্প কিছু বই লইয়াই এখানে আমরা আলোচনা করিব।

মহাত্মা গান্ধী নিজের পড়াশুনার বিষয়ে যারবেদা জেল হইতে একখানি পত্রে (১৩ই জুলাই ১৯৩২) লেখেন :

I would surely like to read literature. At School I could not go beyond the School lessons. After that I have been so busy with onething or another that there was little time to read outside prison. In prison only I was able to read something. But I do not think I have lost much on this account. For, if I could not read, I could think a great deal, and the school of life is any way superior to the School of books. গান্ধীজি বই পড়িতে ভালবাসিতেন। স্কুলপাঠ্য পুস্তকের বাহিরে কিছু পড়িবার সুযোগ পান নাই। তাহার পর এ-কাজে সে-কাজে এতই ব্যস্ত হইয়া পড়েন যে জেলের বাহিরে পড়িবার অবসর ঘটিত না। জেলেই তিনি কিছু কিছু পড়াশুনা করেন। এজন্য তাঁহার কোন অনুতাপ ছিল না। পড়িবার সুযোগ না হইলে চিন্তা করিতেন এবং জীবন হইতে পাঠগ্রহণ বই পড়া অপেক্ষা তিনি শ্রেয়তর মনে করিতেন। গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৪৯ দিন এবং ভারতে ২০৮৯ দিন—মোট ২৩৩৮ দিন কারাবাস করেন। গান্ধীজির বইপড়া সম্যকভাবে বুঝিবার জন্য এই বাক্য কয়টি বিশেষ সহায়ক বলিয়া মনে করি বলিয়াই একটু দীর্ঘ হইলেও উদ্ধৃত করিলাম।

ছাত্রজীবনে পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন আর যে বিশেষ কিছুই পড়েন নাই গান্ধীজি তাহা আত্মজীবনীতে অকপটে বিবৃত করিয়াছেন। গল্পের বই পড়া কিশোর বয়সের নানা নেশার অন্যতম। গান্ধীজির তাহাতেও কোন আকর্ষণ ছিল না। সম্ভবতঃ 'শ্রবণের পিতৃভক্তি' পুস্তিকাখানি তাঁহার স্কুলের পড়ার বাহিরে পঠিত প্রথম পুস্তক। অন্ধ মাতাপিতার প্রতি শ্রবণের অনন্যসাধারণ সেবা কিশোর গান্ধীর চিত্তে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান লইয়া রচিত যাত্রাভিনয় দেখেন। পিতৃভক্ত শ্রবণ ও সত্যাশ্রয়ী হরিশ্চন্দ্রের মধ্যে গান্ধীজির প্রতিবিম্ব আমরা এখন সুস্পষ্টভাবে দেখিতে পাই না কি ?

কয়েকখানি ছোট বড় ধর্মগ্রন্থ তিনি এই সময় হয় নিজে পাঠ করেন নতুবা অপরের কণ্ঠে শোনেন। সে সকল বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি হইল —রামরক্ষা, রামচরিত মানস, তুলসীদাসের রামায়ণ এবং বিষ্ণুর সহস্রনাম। বিশ্বেশ্বর লাধা নামক জনৈক ভক্তের সুমিষ্ট কণ্ঠে তিনি রামায়ণ পাঠ শোনেন। মুগ্ধ হইয়া তিনি তুলসীদাসের রামায়ণকে ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের মর্যাদা দেন। ছাত্রাবস্থায় রাজকোটে অবস্থানকালে তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের নিকট ভাগবত পাঠ শোনেন। ইহাও এক দুর্লভ সৌভাগ্য। এইপ্রসঙ্গে শ্যামল ভট্টের নীতি কবিতার কথাটিও মনে পড়ে ;—আত্মজীবনীতে গান্ধীজি এই কবিতা হইতে কয়েক পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতেই বুঝিতে পারি শ্যামল ভট্ট তাঁহার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মনুসংহিতা তিনি অনুবাদে পড়েন। ইহা তাঁহার চিত্তে সংশয়ের সঞ্চার করেন। তিনি নাস্তিকতার দ্বারা প্রলুব্ধ হইলেন। সবকিছুই স্বীয় বুদ্ধির আলোকে বিচার করিবার প্রবণতা তাঁহাকে পাইয়া বসে। জনৈক আত্মীয়ের নিকট তিনি এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা উপস্থিত করিলে চিরাচরিত উত্তর পাইলেন —"বয়স হইলে এই সকল প্রশ্নের উত্তর বুঝিতে পারিবে, —এ প্রশ্ন ছেলেদের করিতে নাই।" এই উত্তরে গান্ধীজির চিত্ত শান্ত হইল না। তিনি আপন বুদ্ধিতেই সিদ্ধান্ত করিলেন—"এই জগৎ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নীতিমাত্রেরই প্রতিষ্ঠা সত্যে।" সত্যসন্ধ গান্ধীর জীবনে সত্যের অনুসন্ধান পূর্বেই শুরু হইয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও কর্মে যে সকল পুস্তকের প্রভাব সর্বাধিক সেগুলি দৈবক্রমে তাঁহার হাতে আসিয়াছে। এমন কি যে শ্রীমদ্ভাগবদগীতা পরবর্তী জীবনে তিনি নিত্য অধ্যয়ন করিতেন তাহাও তিনি প্রথম পাঠ করেন ছাত্রাবস্থায় বিলাতে অবস্থানকালে জনৈক

থিয়োসফিষ্ট বন্ধুর নির্দেশে। গীতার আদর্শে গান্ধীজি স্বীয় জীবন গঠন করেন। স্থিতপ্রজ্ঞে শ্লোকগুলি ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিত্য প্রার্থনার মন্ত্র হয়। জীবনের হতাশা-পীড়িত ও সন্দেহজর্জর মুহূর্তগুলিতে তিনি গীতার মধ্যে আশ্রয় খুঁজিতেন,—পাইতেনও। গীতা-নির্দেশিত জীবন যাপনের জন্ম তাঁহার তীব্র আকৃতি ও সনিষ্ঠ সাধনা গভীর শ্রদ্ধা ও পরম বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভারতীয় হিন্দুর নিকট গীতা অতি পবিত্র ও অমূল্য ধর্মগ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত। গান্ধীজি বলিতেন—"I am Hindu first and therefore a true Indian.—

সর্বাগ্রে 'আমি হিন্দু এবং সেজন্যই আমি খাঁটি ভারতীয়। গান্ধীজি ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামী ছিল না। ভারতীয় হিন্দুর ন্যায় গীতা তাঁহার নিত্য:পাঠ্য ছিল, কিন্তু অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ হইতেও তিনি নিয়মিত পাঠ করিতেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে পদযাত্রাকালে (১৯৪৫-৪৬) গান্ধীজির গীতাপাঠের সূচী ছিল নিম্নরূপ :

অধ্যায়	১, ২	— শুক্রবার
	৩, ৪, ৫	— শনিবার
"	৬, ৭, ৮	— রবিবার
"	৯, ১০, ১১, ১২	— সোমবার
"	১৩, ১৪, ১৫	— মঙ্গলবার
"	১৬, ১৭	— বুধবার
"	১৮	—বৃহস্পতিবার

বিশেষ বিশেষ দিনে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি পাঠের ব্যবস্থা থাকিত। এই রকম একটা চিহ্নিত দিন ছিল প্রতি ইংরাজী মাসের ২২ তারিখ। ২২শে ফেব্রুয়ারি (১৯৪৪) গান্ধীপত্নী কস্তুরবা বন্দী অবস্থায় ইংরেজ কারাগারে (আগা খাঁ প্রাসাদে) পরলোক গমন করেন। কস্তুরবার স্মরণে তাঁহার ইংরেজি মৃত্যু তারিখটিতে পুরা গীতাখানি পঠিত হইত।

গান্ধী-শিবিরে গীতাপাঠের এই সূচী গৃহীত হইবার পূর্বেও গান্ধীজি প্রত্যহ একটু একটু করিয়া পনের দিনে সাতশত শ্লোকের পূর্ণ গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিতেন গীতা গ্রন্থকে তিনি মাতৃস্বরূপা এবং সদ্গুরু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অনাসক্তিযোগ বা 'গীতাবোধ গ্রন্থখানি গীতামহামন্ত্রের গান্ধী ভাষ্য। গান্ধী-চরিত্র অনুধাবনে যত্নশীল মানুষকে এই বইখানি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়িতেই হইবে।

মহাত্মা গান্ধীর পিতৃদেব শেষ বয়সে গীতাপাঠ করিতেন। তখন ইহা গান্ধীজির উপর কোন প্রভাবই বিস্তার করিতে পারে নাই। পূর্বেই আমরা জানিয়াছি, বিলাতে থিয়োসফিষ্ট বন্ধুদের নিকট গীতার মাহাত্ম্য শুনিয়া তাঁহাদেরই আহ্বানে স্যার এড়ুইন আর্নল্ডের গীতার ইংরেজী অনুবাদ The Song Celestial প্রথম পাঠ করেন। ক্রমান্বয়ে তিনি আরও অনেকগুলি অনুবাদ ও সংস্কৃতে মূল গীতা পড়িয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকিবার সময় গীতা কণ্ঠস্থ করিতে প্রয়াসী হন। ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত তাঁহার মুখস্থ ছিল। এ জন্য তিনি একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকটি শ্লোক একখানি কাগজে লিখিয়া স্নানের ঘরের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দিতেন; দাঁত মাজা এবং স্নান করিবার সময় সেগুলি বারংবার আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ করিতেন। গান্ধীজি ছোটবেলায় সংস্কৃত তেমন শেখেন নাই। পরিণত বয়সে চর্চার দ্বারা সংস্কৃতের জ্ঞান বাড়ান এবং মুখ্যত: দক্ষিণ ভারতের পণ্ডিতদের নিকট নির্ভুল উচ্চারণ শেখেন।

লণ্ডনে গীতাপাঠের সঙ্গে থিওসফী আন্দোলনের কিছু বইপত্র পড়েন। ইহার মধ্যে মাদাম ব্লাভাটস্কীর A Key to Theosophy বইখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধ্যাত্মিক জ্ঞান-লাভের বা ঈশ্বরদর্শনের এই পদ্ধতির মধ্যে তিনি কোন প্রেরণা পাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। প্রায় সবসময়ে তিনি 'বাইবেল' প্রথম পাঠ করেন। প্রথম অংশ পড়িয়া কোন আনন্দ পান না, কষ্টে উহা পড়েন। কিন্তু সারমন অন দি মাউণ্ট তাঁহাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। বিলাতে

বিদ্যার্থী গান্ধী পাঠ্যাতিরিক্ত যে বইখানি পড়েন তাহা হইল নিরামিষ আহার-তত্ত্বের ক্ষুদ্র একখানি পুস্তক। আহার ও স্বাস্থ্য বিষয়ে গান্ধীজি বিস্তর পড়াশুনা করিয়া নিজের মত গঠন করেন। অবশ্য গান্ধীজি কেবল পুস্তকের উপর নির্ভর করিতেন না। তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইতে না পারিলে কোন কিছু প্রকাশ করিতেন না। ইহার বিস্তারিত আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অপ্রয়োজনীয়। তবে গান্ধীজির Key to Health, Diet and Diet Reform, প্রভৃতি পুস্তকে যে তথ্যাদি পরিবেশন করিয়াছেন তাহার ভিত্তি হইল—নিজের বাস্তব ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সহিত আহার-তত্ত্ব ও খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে বিস্তর পড়াশুনা।

নিরামিষ আহারপ্রসঙ্গে হেনরি সল্টের A plea for vegetarianism বইখানি গান্ধী প্রথম পড়েন। গান্ধীজি লিখিতেছেন: সল্টের পুস্তক আহার [নিরামিষ] সম্বন্ধে আমার জানিবার ইচ্ছা বাড়াইয়া দিল।" নিরামিষ আহার বিষয়ে তিনি যত বই সংগ্রহ করিতে পারিলেন সবই বিশেষ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। ইহার সহিত তাঁহার একটি ব্যক্তিগত সমস্যা জড়িত ছিল। বিলাতযাত্রাকালে মাতৃদেবীর নিকট তিনি তিনটি প্রতিশ্রুতি দেন। তাহার একটি ছিল,—মাংস বা আমিষ অহার করব না। শীতপ্রধান দেশে মাংস আহার না করিয়া কেহ সুস্থ থাকিতে পারে না বলিয়াই সাধারণের ধারণা ছিল। সেজন্যই তাহারা গান্ধীজিকে মাংস খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। নিরামিষ সুখাদ্যের অভাব এবং এই পীড়াপীড়ি প্রভৃতি মিলিয়া মাতৃদেবীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়া চলা গান্ধীজির নিকট ক্লেশকর কার্য বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু সল্টের বইখানা পড়িয়া তিনি যেন অকুল সমুদ্রে কূল পাইলেন। এতদিন কর্তব্যবুদ্ধির দাবিতে বস্তুত: নিরানন্দ চিত্তে যাহা করিতেছিলেন আজ তাহার একটা দৃঢ় নৈতিক ভিত্তি তিনি লাভ করিলেন। তিনি কেবল নিরামিষ আহারেই যে সংশ্লিষ্ট রহিলেন তাহা নহে, নিরামিষ আহার আন্দোলনের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। এই বিষয়ে অপর যে বইখানার কথা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হাওয়ার্ড উইলিয়মের The Ethics of Diet বইখানিতে বিভিন্ন যুগের জ্ঞানী, গুণী ও মহাপুরুষদের আহার্যের বিবরণ ও খাদ্য সম্পর্কে তাঁহাদের বক্তব্য আছে। পিথাগোরাস যিশু প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে নিরামিষ আহার করিতেন লেখক তাহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঔষধের পরিবর্তে আহার্য বা পথ্যের পরিবর্তন করিয়া আরোগ্যলাভের পদ্ধতি বিষয়ক কুহ্নে, ডাঃ এলিনসনের বই, জস্টের Return to Nature প্রভৃতি পাঠ করিয়া গান্ধীজি প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিষয়ে উৎসাহী হন।

বিলাতে থাকিতে থাকিতেই 'মুখ-সামুদ্রিক বিদ্যা'—অর্থাৎ মুখ দেখিয়া মানুষের মনের কথা জানিবার জ্ঞান সম্পর্কে কয়েকখানা পুস্তক পাঠ করেন। বিচিত্র বিষয়ে পড়াশুনা করিবার আগ্রহ গান্ধী-জীবনে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বিলাতে আহারতত্ত্ব, ভাষাশিক্ষা, ধর্মচর্চা, আইন পড়া প্রভৃতি বস্তুত: একই সময়ে গান্ধীজি পড়িতে থাকেন। থোরোর লেখার সহিত এই সময় তাঁহার পরিচয় ঘটে। যারবেদা জেলে (১৯৩২) তিনি গভীর অভিনিবেশসহকারে জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করিতেন। তিনি মহাদেব দেশাইকে বলিয়াছিলেন:—"জ্যোতিষ-চর্চা বাস্তবিকই আমাদের দৃষ্টিকে উদার করে। It broadens our outlook."

ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গান্ধীজি ফ্রেডারিক পিঙ্কটের সহিত দেখা করিতে যান। পিঙ্কট আলোচনা-প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলেন: "তোমার ব্যাধি আমি বুঝিয়াছি। তোমার সাধারণ পড়াশুনা খুব কম।...তুমি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড় নাই। প্রত্যেক ভারত-বাসীরই ভারতের ইতিহাস জানা আবশ্যক।" ইঁহার নির্দেশে গান্ধীজি কে, ও, মলিসনের ১৮৫৭'র বিদ্রোহের ইতিহাস পড়েন। গীবনের Decline and Fall of

Roman Empire প্রভৃতি অন্যান্য ইতিহাসের বইও তিনি পরে পাঠ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে মহাত্মা গান্ধী ধর্ম ব্যাপারে বিশেষ সংকটে পড়েন। খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্মের দিকে টানিতে চাহেন। মুসলমানেরা চাহিলেন তিনি মুসলিমধর্ম গ্রহণ করুন। কিন্তু গান্ধীজি সিদ্ধান্ত করেন: "আমার নিজের ধর্ম যতদিন না সম্পূর্ণভাবে জানিতেছি ততদিন অন্যধর্ম গ্রহণ করিবার কথা ভাবিব না।" তিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া সবকিছু পড়িবার ও জানিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মিস্ হ্যারিস ও মিস্ গেবের আগ্রহাতিশয্যে প্রতি রবিবার তাঁহার প্রদত্ত পুস্তকাদি লইয়া তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতেন। কোটস্ নামক জনৈক কেয়েকার বন্ধুর আগ্রহেও গান্ধীজি বহু ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন। আত্ম-জীবনীর প্রথমখণ্ডে (বাংলা) ইহার উল্লেখ আছে। তখন তিনি ডাক্তার পার্কারের নীতিশীর্ষক বই 'সিটি টেম্পলের টীকা', পিয়ারসনের 'মেনি ইনফলিবল প্রুফস্' ও বাটলারের 'এনালজি' পাঠ করেন। গান্ধীজির কথায় —"বাটলারের 'এনালজি' খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন বই। উহা বুঝিতে হইলে চার পাঁচবার পড়া দরকার। নাস্তিককে আস্তিক করিবার উদ্দেশ্যেই ইহা লিখিত।" কিন্তু বইটি যত্ন করিয়া পড়া সত্ত্বেও গান্ধীজির উপর তাহা বিশেষ কোন ছাপ রাখিতে পারে নাই। তিনি একান্তভাবে ভগবদ্বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু হিন্দুধর্মশাস্ত্রের সহিত নিবিড় পরিচয়ের অবকাশ ঘটে নাই বলিয়া মধ্যে মধ্যে তিনি ধর্মসংকটে পড়িতেন।

প্রিটোরিয়াতে থাকিবার সময় গান্ধীজি হিন্দুধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে লিপ্ত হন। কবি রায়চাঁদ তাঁহার সংশয়াকুল চিত্তের কথা জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠান। এই বইগুলির মধ্যে যোগবাশিষ্টের মুমুক্ষু প্রকরণ', হরিভদ্র সূরীর 'ষড় দর্শন সমুচ্চয়' ও পঞ্চীকরণ 'মণিরত্নমালা' প্রভৃতি ছিল। হিন্দুধর্মশাস্ত্র পাঠের ফলে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়। অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থও তিনি অবশ্য পাঠ করিতে থাকেন। সেলের 'কোরাণের' অনুবাদ তিনি এই সময় পড়েন। ধর্মবিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনার অবসরে তিনি মহামতি টলষ্টয়ের 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ' বইখানি পড়িয়া একেবারে অভিভূত হইয়া যান। আত্মজীবনীতে পাই: উহার ছাপ আমার হৃদয়ে বিশেষভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল। এই পুস্তকের স্বাধীন চিন্তাধারা, প্রগাঢ় নীতি-বোধ, ও সত্যের উজ্জ্বল প্রকাশের মধ্যে তিনি যেন এতদিন যাহা ব্যাকুলহৃদয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলেন তাহাই পাইলেন। তাঁহার অশান্তচিত্তে শান্তি আসিল। ইতিপূর্বে এডওয়ার্ড মেটল্যাণ্ডের 'দি নিউ ইনটার প্রেটেশান অব বাইবেল', 'দি পারফেকট ওয়ে অব দি কাইণ্ডিং অব ক্রাইস্ট' প্রভৃতি বই পাঠ করিয়া শান্তি পান নাই। এই স্থানে তিনি নর্মদাশঙ্করের 'ধর্মবিচার' ম্যাকসমুলারের 'হিন্দুস্থান কি শিখাইতে পারে' (what Hindusthan can teach), থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রকাশিত উপনিষদের অনুবাদ, ওয়াশিংটন আরভিং রচিত 'মহম্মদ চরিত', কার্লাইলের 'মহম্মদ স্তুতি' এমন কি জরথুস্ত্র-এর বচন ও আর্নল্ডের 'লাইট অব এশিয়া' প্রভৃতি পাঠ করিবার অবকাশ পান।

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর গান্ধীজি কিছুকাল গোখ্‌লের সহিত কলিকাতায় ছিলেন। তখন তিনি যে সকল পুস্তকাদি পাঠ করেন তাহার মধ্যে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কেশবচন্দ্র সেনের জীবনীর কথা তিনি আত্মজীবনীতে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সময়েই তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বইপত্র পড়িয়া বুঝিতে চেষ্টা করেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ, ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ মনিষীদের রচনা তিনি কিছু পরে পড়েন। বিবেকানন্দের রাজযোগ গান্ধীজি যত্নের সহিত পাঠ করেন। একই সঙ্গে মতিলাল নভুর রাজযোগও পড়িয়া ফেলেন। গান্ধীজি একদা 'জিজ্ঞাসু মণ্ডল' নামে একটি ছোট্ট মণ্ডলী গঠন করিয়া ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি সমবেত পাঠের আয়োজন করেন। এই

মণ্ডলীতেই পতঞ্জলির 'যোগ দর্শন' তিনি পড়িয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

গান্ধীজি সপরিবারে যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করিতেছিলেন তখন আসন্নপ্রসবা কস্তুর বাঈকে সাহায্য করিতে পারেন এমন কোন আত্মীয়া ছিলেন না। ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণ করা জাতীয় সম্মানের পরিপন্থী। সুতরাং গান্ধীজি নিজেই ধাত্রী-বিদ্যার বই পড়িতে সুরু করিলেন। আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন "ডাক্তার ত্রিভুবন দাসের 'মায়ের জন্য উপদেশ' নামক পুস্তক পড়িলাম। সেই বই পড়িয়া এবং এ-দিক সে-দিক হইতে যাহা শিখিয়াছিলাম তাহার সাহায্যেই আমি দুইটি শিশুকে আঁতুড়ে সাহায্য করিয়াছিলাম বলা যায়।"

মহাত্মা গান্ধী চিকিৎসা করিতে ভালবাসিতেন। অতএব চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু বই যে তিনি অবশ্যই পড়িয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ কি। কস্তুরবাকে একদা তিনি নিজে কঠিন পীড়ায় জল-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রোগ নিরাময় হইতেছে না দেখিয়া তিনি ডাল ও নুন আহার বন্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। কস্তুরবা ইহাতে রাজি হইতেছেন না দেখিয়া স্বীয় বক্তব্যের সমর্থনে একখানা বই আনিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শোনান। দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই গান্ধীজি ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করেন। বিস্তর পড়াশুনার ফলেই তাঁহার হৃদয়ে এই ব্রত গ্রহণের বাসনা জাগ্রত হয়। জীবনযাত্রা সরল করিবার দিকে তাঁহার আগ্রহ সর্বজনবিদিত। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইহার সূচনা। এই সময়ে তিনি নিজের জামা কাপড় নিজে কাচিতে সুরু করেন। বই পড়িয়া তিনি ধোপার বিদ্যা আয়ত্ত করেন। ধোপাগিরি তিনি মন্দ শেখেন নাই। একদা দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজি গোখলের একখানি উত্তরীয় ইস্ত্রি করিয়া দিয়াছিলেন এ কথা আনন্দমিশ্রিত গর্বের সঙ্গেই আত্মজীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে।

পুঁথিগত বিদ্যার প্রতি গান্ধীজির আস্থা কম ছিল। তিনি নিতান্ত প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও পুত্রদের বইপড়া বিদ্যা শিক্ষা দিতে উৎসাহী হন নাই। গান্ধীজি লিখিতেছেন "আমার পুত্রেরা পুস্তকের বিদ্যায় কাঁচা রহিয়াছে।" কিন্তু তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, সে জন্য দেশের কিছু লাভ হইয়াছে। স্বীয় বিদ্যার্থী-জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করিয়া তিনি লিখিয়াছেন: "আমার শিক্ষকেরা পুস্তক হইতে আমাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন তাহা সামান্যই আমার মনে আছে। কিন্তু বই ছাড়া যাহা শিখাইয়াছেন তাহার এতটুকুও ভুলিয়া যাই নাই।" বইয়ের বিদ্যায় গান্ধীজির এই অনীহা সত্ত্বেও আমরা দেখিয়াছি তিনি নানা বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন করিয়াছেন। এবং অধ্যয়নের দ্বারা তিনি অল্প বিস্তর প্রভাবিত হইয়াছেন। কেবল নিজেই পড়েন নাই। ভাল কিছু পড়িলে অপরকে তাহা পড়িবার জন্য বলিতেন। যারবেদা জেলে Adam's Peak to Elephanta এবং মিথিলা শরণের 'অনঘ' তিনি মহাদেব দেশাইকে পড়িতে বলিয়াছিলেন। অপর দিকে মহাদেব ভাই লিখিয়াছেন একদা আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধীজি গুজরাটি উপন্যাস হইতে বাক্যাংশ উদ্ধৃত করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, অল্প হইলেও তিনি উপন্যাস পাঠ বর্জন করেন নাই।

এখন যে পুস্তকখানির কথা আমরা আলোচনা করিব সে সম্পর্কে গান্ধীজি আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন—"এই-খানাই আমার জীবনে মহত্ত্বপূর্ণ পথ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। আমার হৃদয়ে যে গভীর বিশ্বাস নিহিত ছিল আমি তাহারই কতকগুলি প্রতিবিম্ব এই বইখানিতে দেখিতে পাইলাম।" গান্ধীজি বলিয়াছেন—"সব কবি সকলের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন না, কেননা সকলের ভাবনা একরকমে গঠিত নয়।' গান্ধী জীবন ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই বইখানি বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। পুস্তকখানি হইল রাসকীনের 'আন্ টু দিস লাষ্ট'। গান্ধীজি 'সর্বোদয়' নাম দিয়া একখানি গুজরাটি অনুবাদ প্রকাশিত করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, সর্বোদয় প্রকাশের পূর্বেই তিনি আর একটি

অনুবাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্লাটোর 'দি অ্যাপোলজির' সার সংক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান ওপিনীয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। মানুষ হিসাবে আমাদের কর্তব্য কি তাহাই ছিল ইহার মূল কথা। দক্ষিণ আফ্রিকায় নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সর্বোদয়ের আদর্শে গান্ধীজি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। রাসকীন যে ভারতবর্ষে দুর্লভখ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন তাহার মূলে মহাত্মা গান্ধীর প্রযত্ন স্মরণীয়।

'আন টু দিস লাষ্ট' এর গুজরাটি অনুবাদের নাম 'সর্বোদয়' তাহা একটু আগেই বলিয়াছি। সর্বোদয়ের সিদ্ধান্ত :

"১। সকলের হিতে নিজের হিত নিহিত।

"২। উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য একই রকম হওয়া চাই। কেননা জীবিকা উপার্জ্জনের অধিকার উভয়েরই সমান।

"৩। শ্রমিক ও কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন।

নাটাল যাইবার পথে পড়িবার জন্য গান্ধী-বন্ধু পোলক সাহেব গান্ধীজিকে এই বইখানি উপহার দেন। দৈবক্রমে হাতে আসা বইখানি গান্ধী-জীবনের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া দিল। গাড়িতেই তিনি বইখানি পড়িয়া অভিভূত হইয়া পড়েন এবং "পুস্তকে লিপিবদ্ধ নির্দেশ অনুযায়ী আচরণ করিতে কৃতনিশ্চয়" হন।

যারবেদা জেলে আটক থাকিবার সময় রাসকীনের অপর বিখ্যাত বই Fors Clavigera বা হাতুড়িপেটা শক্তি মহাত্মা গান্ধী পাঠ করিবার সুযোগ পান। 'গান্ধীজির জীবন দর্শন' ও প্রবন্ধে (রবীন্দ্রভারতী প্রকাশিত গান্ধীমানস) অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন লিখিয়াছেন—"গান্ধীজি রামরাজ্যের সমর্থন পেয়েছেন রাসকীনের Fors Claviqeraতে।" এই বইয়ের আলোচনার ভিত্তিতে গান্ধীজির Indian Home Rule রচিত বলিয়া মনে হয়। জেলই গান্ধীজির বই পড়ার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ছিল তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। যারবেদা জেলে গান্ধীজির পড়াশুনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় মহাদেব ভাইয়ের দিনলিপিতে। কত বিচিত্র বিষয়ের প্রতি গান্ধীজির আকর্ষণ ছিল তাহা বুঝাইবার জন্য যারবেদা জে[illegible] পঠিত কয়েকখানা পুস্তকের নামমাত্র উল্লেখ করিতেছি Upton Sinclair-এর সামাজিক অনিষ্টকর বিষয়ের উপ[illegible] লিখিত The wale parade, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়ে Si[illegible] Samuel Hoare-এর রাশিয়ার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিখ্যাত বই—The fourth seal ; Munder-এর Astronomy without a Teliscope ; Gibbon-এর বিশ্ববিখ্যাত বই Decline and Fall of Roman Empire ; Woodroffe এর একটি অশ্লীল (?) বই, কীর্তিকারের—Studies in Vedanta, বিড়লার—Indian Currency, গোথের—Faust, কিংসলের—Westward Ho! ইহা ছাড়া এই স্থানে কয়েকখানি উর্দু পাঠ্যপুস্তকও তিনি বিশেষ গুরুত্বের সহিত পাঠ করেন। ঐ বইগুলির দ্বারা সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো হইতেছিল। মহাদেব দেশাইয়ের দিনলিপি হইতে জানা যায় জেলেই গান্ধীজি উর্দু, জ্যোতির্বিদ্যা এবং কারেন্সির উপর এত বই সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে, তাহাই একটি পাঠাগার হইয়া উঠিয়াছিল। এইখানেই তিনি নানা ভাষ্যে ঈশোপনিষদও যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। একটিমাত্র প্রবন্ধের পরিসরে গান্ধীজির বই পড়া বিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা অসম্ভব। আমি কেবলমাত্র পাঠকের মনোযোগটিকে গান্ধীজির বিপুল ও বিচিত্র পড়াশুনার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিলাম। পড়াশুনা, জীবনভোর সৎগ্রন্থ পাঠ ভিন্ন বড় হইবার আর কোন উপায় নাই বলিয়া মনে হয়।

মানবজীবন হইতে শিক্ষাগ্রহণটা কি তাহা সচরাচর বুঝা সুসাধ্য নহে। তবে মানুষকে বুঝিতে জানিতে তাঁহার চিঠিগুলি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত। প্রতিদিন শতশত চিঠি গান্ধীজির নিকট আসিত। তাহার প্রায় প্রত্যেকটির তিনি উত্তর দিতেন। একসময়ে সত্তর-আশিখানা চিঠি কখন কখন তিনি প্রত্যহ নিজ হাতে লিখিয়াছেন।

তাঁহার প্রাপ্ত পত্রের দৈর্ঘ্য এবং পত্রাদির সহিত প্রেরিত সংবাদপত্রাদির ক্লীপিং কম ছিল। একস্থানে মীরাবেনের

পঁচিশ পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠির উল্লেখ পাইয়াছি। গান্ধীজির চিঠিও অনেক সময় খুব দীর্ঘ হইত। ল্যুই ফিশার বলিয়াছেন—Gandhi wrote long letters, some of which were pamphlet length। গান্ধীজি দীর্ঘ চিঠি লিখিতেন। তাঁহার অনেক চিঠির দৈর্ঘ পুস্তিকার মতই ছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রাক্কালে বড়লাট আরউনকে লেখা চিঠির কথা আমরা অনেকেই স্মরণ করিতে পারি। তাঁহার চিঠির ভাষা সুন্দর ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট ও তথ্য-নির্ভর হইত। চিঠিকে তথ্য নির্ভর করিতেও তাঁহাকে বিস্তর বই-পত্র-পত্রিকা যে পড়িতে হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। প্রবন্ধ-নিবন্ধ-টীকা-টিপ্পনী যে তিনি কত লিখিয়াছেন তাহা ইয়ত্তা করা যায় না।

গুজরাটি মহাত্মার মাতৃভাষা। দেশের স্কুলে ইংরেজি এবং লণ্ডনে অবস্থানকালে লাটিনভাষা তিনি শেখেন। দেশে ফিরিয়া হিন্দী, উর্দু, ও তামিল ভাষাও তিনি শিক্ষা করেন। গান্ধীজি জীবনসায়াহ্নে বাঙলা শিখিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বাঙলা সামান্য লিখিতে ও পড়িতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাঙলাভাষায় রচিত গান্ধীজির চিঠিপত্র অপরে লিখিয়া দিতেন। উপরের পাঠটুকু তিনি নিজহাতে বাঙলায় লিখিয়া বাঙলাতেই নাম সহি করিতেন।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্বে গান্ধীজির পুস্তক নির্বাচন বিষয়ে এই একটি কথা বলা প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। মহাত্মা গান্ধী হাতের নিকট যাহা পাইতেন তাহাই পড়িতেন। কিশোর বয়সে গান্ধীজির বিবাহ হয়। সে সময় 'দম্পতি প্রেম', 'মিতব্যয়িতা', 'বাল্যবিবাহ', প্রভৃতি পুস্তিকা তিনি পড়িতেন। গান্ধীজি লিখিতেছেন: "এই ধরণের কোন নিবন্ধ আমার হাতে আসিলেই আমি পড়িয়া ফেলিতাম। আমার অভ্যাস ছিল যে, যাহা পড়ি তাহার মধ্যে যাহা ভাল না লাগে তাহা ভুলিয়া যাই। আর যাহা ভাল লাগে তাহা কার্যে পরিণত করার চেষ্টা করি।" প্রয়োজনবোধে মধ্যপথেও পাঠ করা বন্ধ করিয়া দিতেন। Woodroffe-এর একখানা বইয়ের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইন্দুলাল যাজ্ঞিক এইখানি গান্ধীজিকে পড়িতে দেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর গান্ধীজি উহা পাঠ করা সমীচীন মনে করেন নাই। তখনই উহা বন্ধ করেন। ভাল বইয়ের কথা শুনিলে তাহা চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতেন। মহাদেব ভাইয়ের দিনলিপি হইতে ইহা জানা যায়। জেলের গ্রন্থাগারের বইপত্রের তিনি খোঁজ করিতেন। এই-ভাবে রোমাঁ রলাঁর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ জীবনী, Imitation of Christ, জেমস্ জীনসের বই তিনি খুঁজিয়া পাতিয়া আনিয়া পড়েন বলিয়া জানা যায়। এ কথা কে অস্বীকার করিবেন যে গান্ধীজির জ্ঞানস্পৃহা ছিল অনন্যসাধারণ এবং পুস্তক পাঠের মধ্যে তাহা তৃপ্তি খুঁজিত বলিলে অন্যায় বা অসত্য বলা হইবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগ্রন্থাগার হইতে গান্ধীজি হেনরি ডেভিড থোরোর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ Civil Disobedience সংগ্রহ করিয়া পাঠ করেন। ঐ দেশের কারাগারেই তিনি কার্লাইলের French Revolution পাঠ করেন। কত বিচিত্র বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল! জেল হইতে পুত্রকে লিখিত চিঠিতে অনুরোধ করিতে-ছেন: একখানা বীজগণিত পুস্তক পাঠাইও। যে কোন বই হইলেই চলিবে। সংস্কৃত ও অঙ্ক শেখা তিনি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন।

নূতনকে জানিবার আগ্রহেই তিনি অধ্যাপক নির্মল-কুমার বসুর নিকট ফ্রয়েডীয় দর্শন সম্পর্কে জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়া সম্পর্কে কিছু বইপত্র পড়েন। বিশ্ববিশ্রুত বই ক্যাপিটাল পড়িবার পর গান্ধীজির মন্তব্যটি চমৎকার:

"I think I could have written it better, assuming, of course, that I had the leisure for the study he has put in."

গান্ধী মার্কসের মত পড়াশুনা করিবার সময় পাইলে মার্কস্ যাহা লিখিয়াছেন তদপেক্ষা সুন্দর বা নিপুণভাবে তিনি লিখিতে পারিতেন! মার্কস এবং গান্ধী উভয়েই

কোনদিন কোন রাষ্ট্রের কর্ণধার হন নাই, অথচ সর্বাধিক আলোচিত, বিতর্কিত মানুষ।

শুধু পড়া নয়। অধীত বিদ্যাকে প্রয়োগ করিবার কৌশল জানাকে গান্ধীজি প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন। পূর্বে এ বিষয়ে গান্ধীজির একটি ছোট মন্তব্য আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। কিশোরীলালজির নিকট লিখিত একটি চিঠিতেও (১-৭-১৯৩২) গান্ধীজি এই সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন :

"To my mind there is one thing needful for every one of us—viz, that we should think over what we have read, digest it and make it an integral part of our daily life.

ইহাই তো অধ্যয়নের সত্যকার কাম্য ফলশ্রুতি। আবার বইতে লেখা আছে বলিয়া সবকিছু বেদবাক্যের মত মানিবার মূঢ়তা সম্পর্কে তিনি আমাদের সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

"Every thing written in Books must not be considered authentic. Anything that is immoral or inhuman must not be believed no matter in what sacred book it occurs."—

অর্থাৎ পবিত্রগ্রন্থেও নীতিহীন এবং অমানবীয় কিছু মুদ্রিত থাকিলে তাহা বিশ্বাস করিবার দরকার নাই। গান্ধীজি যন্ত্রদানবের নিকট 'নমো যন্ত্র' বলিয়া যোড়করে দাঁড়ান নাই, আবার নমো-গ্রন্থ বলিয়া গ্রন্থ-কীট হ'ন নাই। নিজের বিবেকবুদ্ধি নীতি ও মনুষ্যত্ব-বোধের ক্ষেত্রে যেখানে বিরোধ ঘটিয়াছে সেখানে গান্ধীজি আপোষ করেন নাই। তিনি স্বীয় জীবনের ন্যায় নীতি ও সত্যবোধের আলোকে দশদিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া চলিতেন। অবশ্য তিনি স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত সর্বদাই বলিয়াছেন : "নূতন কোন নীতি বা মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছি ইহা আমি দাবি করি না।" ইহা সত্ত্বেও হিংসাজর্জর সংশয়বিদ্ধ পৃথিবীতে প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র বৃহৎ সামান্য অসামান্য প্রয়োজন মিটাইবার একটা নূতন কল্যাণময় মানবিক পথের সন্ধান তিনি দিয়া গিয়াছেন। এই পথ নির্ণয়ে ও এই পথে চলিতে বই পড়া জ্ঞান তাঁহাকে অনেকখানি সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে কি? গান্ধীজির বই পড়ার উপরে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের একটি মনোরম মন্তব্য উল্লেখ করিয়া আজিকার আলোচনা শেষ করি। "শাস্ত্র তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে, দেশ বিদেশের মনিষীদের লেখা তিনি পড়েছেন; তাঁর নিজের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও সত্য-নিষ্ঠা তাঁকে পরিচালিত করেছে; বইপড়া জ্ঞান নয়। আবার বই না-পড়া জ্ঞানও নয়।"

তিন কন্যে
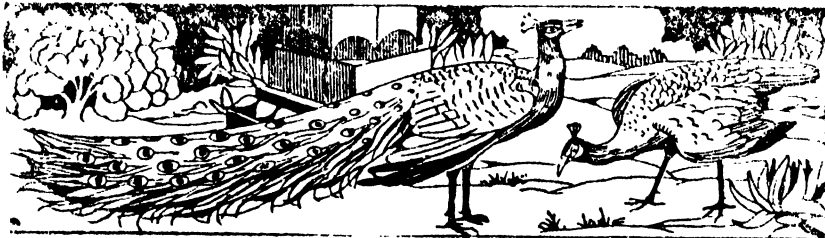
(উপন্যাস)

সীতা দেবী

(১৭)

বেশ অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। রামপদর কলকাতার
াড়ীর আর আগের চেহারা নেই। কিছু কিছু বদল হয়ে
গছে। বাড়ীর বাইরেটা আগে শাদাশিদা "হোয়াইট্
য়াশ" করা ছিল, এখন রঙীন চেহারা হয়েছে। একতলার
রেণো ভাড়াটেরা নেই, তার জায়গায় একটি দেশী খৃষ্টান
রিবার বাস করে। তাদের দুটি তরুণী কন্যা লিলি আর
জি সকলের খুব চোখে পড়ে।

দোতলার চেহারাও কিছু কিছু বদল হয়েছে। যে ঘরে
মপদ থাকতেন সেটাতে এখন বাড়ীর তিনটি মেয়ে থাকে।
হসজ্জা একেবারে বদলে গেছে। দেওয়ালগুলি "ডিস-
ম্পার" করা। ছবি দুচারখানা দেওয়ালে আছে, মেয়েদের
জেদের ফোটোগ্রাফ আর বন্ধুবান্ধবের ফোটোগ্রাফ। ঘর
তন আসবাবে ভর্ত্তি, তবে খুব গোছান বা সুসজ্জিত নয়।
র্দ্দিকে বই আর মাসিক পত্রিকা ও সাপ্তাহিক পত্রিকা
র্ব্বিচারে ছড়ান। বেশীর ভাগই ইংরেজি এবং সিনেমা
ষয়ক। তিনখানি খাটের উপরও কাপড় জামার মেলা। মধ্যে
্য গৃহিণী বা আয়া সেগুলি পাট করে আলনায় তোলেন,
ন্তু ঘণ্টাকয়েক পরেই যে কে সেই। বড় বড় দুটো
সিং টেব্ল, তার উপর ক্রীম পাউডার, সুগন্ধীর মেলা,
নেটা পাউডারে শাদা হয়ে গেছে। এক কোণে
ডিও। মেয়েরা যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, সেটি বাজতেই
ক। অনেক সময় বাবা বা মায়ের তাড়ায় বাজনা বন্ধ
।

রামপদ এখন আর কলকাতায় থাকেন না, গ্রামে একটি
মাঝারিগোছের বাড়ী করেছেন, সেইখানেই থাকেন।
কনকলতা পাশে থাকেন কাজেই কোন অসুবিধা হয় না।
রামপদর লাইব্রেরী আর জিনিষপত্র বেশীর ভাগই এইখানে
চলে এসেছে। যা বাকি আছে তা কলকাতার বাড়ীর
লাইব্রেরীঘরে বন্ধ আছে। রামপদ নিজের ঘর তিন
নাতনীকে ছেড়ে দিয়ে ঐ ঘরটাই নিজের ঘর বলে
নিয়েছেন, কালে ভদ্রে কখনও যদি কলকাতায় আসেন ত
এই ঘরেই থাকেন। তাঁর বয়স এখন পঁয়ষট্টি বা ছেষট্টি
হয়েছে। মাথার চুল আগাগোড়া সাদা হয়ে গেছে, তবে
শরীরটা মোটামুটি একরকমই আছে। কাজ থেকে অবসর
গ্রহণ করে তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন গ্রামে বাড়ী
করতে। অনেক কষ্টে টাকাকড়ি জমিয়ে বাড়ীটা করে
ফেলেন এবং গোছগাছ করে তার পরেই সেখানে চলে যান।
নিজের জিনিষপত্র বেশীর ভাগই এখানে এসে গেছে।
কলকাতার বাড়ীতে কিছু আছে, বেশী দামী দু'চারটে
জিনিষ হেমলতার বাড়ীতে আছে। পুত্র ও পুত্রবধূর
সংসার ক্রমেই তার কাছে বেশী করে অরুচিকর হয়ে
উঠছিল। এরা এখন বেশীর ভাগ সময় ঝগড়া তর্কাতর্কি করে
কাটায়, এটা তাঁর ধাতে একেবারে সহ্য হয় না। স্বামী-স্ত্রীর
মনের মিল থাকবে তারা শান্তিতে সংসার করবেএইটিই ছিল
তাঁর আদর্শ তাঁর নিজের সংসার। এইরকমই ছিল বাবামায়ের
সংসার এইরকমই তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু অভয়পদ আর অপু
একেবারে অন্য জগতের মানুষ। অভয়পদ অতি প্রভুত্বপরায়ণ,
স্বার্থপর ও অতিহিংসাবী মানুষ। অপু প্রথম প্রথম ভয়ে সব

দিয়ে যেত, বাধ্য হয়ে চলবারই চেষ্টা করত। কিন্তু ক্রমাগত অন্যায় শাসন সহ্য করে করে তারও ধৈর্য্য কমে গেছে। এখন অল্পেতেই সে চটে যায়, কোমর বেঁধে ঝগড়া করে। সে গ্রাম দেশের মেয়ে এতে সে কিছু অশোভন দেখেনা। অভয়পদর কিন্তু একতলা আর তেতলার ভাড়াটেদের কাছে ধরা পড়ায় বড় ভয়, বাবার কাছে ধরা পড়ারও একটা লজ্জা আছে। কাজেই তাকে মাঝপথে থেমে যেতে হয়, এবং এর জন্য অপুর উপরে তার রাগ আরো বেড়ে যায়।

অথচ তারা স্বামী স্ত্রী, একসঙ্গে সংসার করছে, তিনটি মেয়ে হয়েছে। উষা আর উমার সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে। শান্তিলতার বিয়ে দেখে ঘুরে এসে তৃতীয় মেয়েটি হয়। বারে বারে মেয়ে হওয়াতে সকলেই দুঃখিত, কেবল রামপদ কোনো দুঃখ প্রকাশ করেননি। বোনেদের তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, নিজেরও একটি কন্যার সখ ছিল, কিন্তু ভগবান সে সখ পূর্ণ করেননি। কাজেই ছেলের ঘরে মেয়ের আতিশয্যে তিনি কিছুই বিচলিত হননি। ফুটফুটে মেয়েটি, ঠিক যেন একটি বড় শ্বেত পাথরের পুতুল। অভয়পদ রাগ করে বলল, খুব আমার ঘর চিনে নিয়েছ তোমরা। আমি এর নাম রাখব 'ক্ষান্তি'।

অপু ফোঁস করে উঠল। "আহা, তা আর না? সবাই কেমন "ক্ষেন্তি," বলে ডাকবে। ও নাম কি আবার ভদ্রলোকের বাড়ীতে চলে নাকি?"

অভয়পদ ঠোঁট উল্টে বলল "চমৎকার একটা নাম রাখলেই ত আর হয়না? নিজে চমৎকার হওয়া চাই।,'

অপু বলল, "আমার মেয়েরা চমৎকার নয় নাকি? উষা উমা কার চেয়ে মন্দ? দেখো এও কিছু বোনদের চেয়ে নিরেশ হবে না। আমি বাবাকে বলছি ওর জন্যে ভাল একটা নাম রেখে দিতে।"

অভয়পদ বলল "তাই বল গিয়ে। বাবাই ত এখন তোমার গুরুদেব। যত অবাধ্যতাকে প্রশ্রয় দেন কিনা", বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পাছে অপু কিছু একটা কড়া জবাব দেয়।

রামপদ নাতনীর নাম রাখলেন স্বাতী। অপুর পছন্দ হল, অভয়পদ ভাল মন্দ কিছুই বলল না হেমল জিজ্ঞেস করলেন "নামের মানে কি গো?"

অপু বলল "নক্ষত্রের নাম নাকি বাবা বললেন। ছায়া যখন ঝিনুকের উপর পড়ে তখন মুক্তোর জন্ম হয়।",

হেমলতা বললেন "ও বাবা, ভীষণ কবিত্বপূর্ণ নাম দেখি। তা নামটা শুনতে সুন্দর, মানে সবাই বুঝুক নাই বুঝুক।

বছর দশ বয়স অবধি স্বাতী নামটা মেনেই নিয়েছিল বাড়ীতে অবশ্য ডাক নাম ছিল 'ছুটকি'। কিন্তু হঠা একদিন স্কুল থেকে এসে বলল "আমার স্বাতী নাম খাতা যেমন লেখা আছে তাই থাক, কিন্তু আমার একটা ভা ডাকনাম রাখতে হবে। স্বাতী মানেই কেউ বোঝেনা মেয়েরা হাসে। আমি তাদের বলেছি আমার ডাক না রিণি, তোমাদেরও তাই বলতে হবে, ওসব "ছুট্কী মুট্কী" বললে আমি আর সাড়া দেবো না।" এ ফতোয়া বাড়ী কেউ বা মানল, কেউ বা মানলনা, তবে স্কুলে রীনি নামটা চালু হয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই অভয়পদ আর অপুতে প্রচণ্ড এক ঝগড়া হয়ে গেল। অপুর বাবা এই সময় দারুণ পীড়িত হয়ে পড়লেন। এখন কিছু টাকা না পাঠালে কোন চিকিৎসা তাঁর হওয়া অসম্ভব। অপুকে বাধ্য হয়ে অভয় পদর কাছে টাকা চাইতে হল, কারণ মাসের শেষে হাত তার প্রায় খালি হয়ে এসেছিল। অভয়পদ ত তেলেবেগুনে জলে উঠল। কিছুদিন থেকেই সে অপুর লুকিয়ে লুকিয়ে টাকা পাঠান, জিনিষ পাঠান লক্ষ্য করছিল। তাই ব'ল একেবারে পঞ্চাশটাকা দিতে হবে ঐ হতভাগা বুড়োর জন্যে? বিড় বিড় করে বলল "একেবারে পঞ্চাশটাকা! তোমার বাবা কোনোদিন পঞ্চাশটাকা একসঙ্গে চোখে দেখেছেন? আচ্ছা জ্বালায় পড়েছি আমি ভিখিরির ঘরে বিয়ে করে।"

আর যায় কোথায়। লেগে গেল খুব ঝগড়া। অপু পাগলের মত দেওয়ালে মাথাকুটে চেঁচাতে লাগল। "ওগো

মাগো, তুমি আমাকে কেটে দুখানা করে জলে ভাসিয়ে দেওনি কেন? সেও যে ভাল হত এমন বড়লোকের ঘরে বিয়ের চেয়ে। এদের দাঁতের বিষ আর যে সহ্য হয় না।"

অভয়পদ দুম্‌দাম্ করে জানালা দরজা বন্ধ করতে লাগল। কিন্তু রামপদ তখন বাইরে যাচ্ছিলেন, বারান্দার মাঝামাঝি আসতেই অপুর আর্তনাদ তাঁর কাছে এসে পৌঁছাল। তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে গেলেন। আধঘণ্টাখানিক পরে আয়াকে ডেকে বললেন "তোমার দাদাবাবুকে একটু এখানে ডেকে দাও।"

অভয়পদ গোঁজমুখ করে এসে দাঁড়াল। রামপদ বললেন "দ্যাখ খোকা, এবাড়ীটাতে আমি এখনও আছি, এটাকে আমার সংসার বলেই লোকে এখনও জানে। আমি যতদিন না অন্য জায়গায় থাকবার ব্যবস্থা করতে পারি ততদিন তোমরা একটু সংযত হয়ে চলতে পারনা? এটা ত মেছোহাটা নয়, এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। আর যদি সেটা একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বল আমি এখনই কোনো মেস্‌টেস্ দেখে উঠে যাই।"

অভয়পদ খানিকক্ষণ গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তারপর বলল "ফের যদি এরকম কাণ্ড ঘটে, তাহলে আমিই না হয় মেসে চলে যাব।"

ফিরে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দেখল অপু তখনও জানলার কোণে বসে ফোঁপাচ্ছে। মুখটা তার দেওয়ালের দিকে ফেরান। তার ঘাড় ধরে একটা ঝাঁকড়ানি দিয়ে বল্‌ল "শুনছ, তোমার গলার বহর দেখে বাবা মেসে চলে যেতে চাইছেন। গলাটা একটু খাট করতে হবে বুঝলে, নইলে মেয়ে তিনটাকে নিয়ে গাছতলায় গিয়ে থাকতে হবে। বাড়ীটা আমার নয়, আমার বাবার, সেটা বোধ-হয় তোমার জানা আছে।"

অপু ফিরে তাকাল। চোখ মুছতে মুছতে বলল "বেশ যাব গাছতলায়। কিন্তু তুমিও যাবে ত? দোষটা শুধু আমার নাকি? আমি গলা খাট করতে রাজীই আছি, তুমি তোমার জিভের বিষ কমাও ত। ভদ্র ব্যবহার যারা চায় তারা নিজেরা আগে ভদ্রব্যবহার করে।"

পাছে আর একপালা সুরু হয় এই ভয়ে অভয়পদ সরে পড়ল। একেবারে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল। অপু বসে বসে নাক চোখ মুছতে লাগল। খানিক পরে আয়া এসে একখানা মুখ বন্ধ করা খাম তার হাতে দিয়ে বল্‌ল "এইটে বড়বাবু আপনাকে দিতে বললেন।"

অপু একটু অবাক হয়ে খামটা খুলে দেখল তার ভিতর পঞ্চাশটাকার নোট রয়েছে। একটুকরো কাগজে লেখা "তোমার বাবার চিকিৎসার জন্য।"

রামপদ আর বসেননি, সোজা বেরিয়ে হেমলতার বাড়ী চলে গেছেন। হেমলতা তখন বিকেলের চা খেয়ে সবে একটু বসেছেন, দাদাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে বললেন. "কি দাদা এমন সময়ে যে? কোনো খবর আছে নাকি? বোসো, একটু চা দিতে বলি?"

রামপদ বললেন, "আচ্ছা দিদি ত একপেয়ালা চা শুধু দে, খাবার-টাবার না। এলাম একটা বিষয় তোর সঙ্গে একটু আলোচনা করতে।"

"কি বল ত?"

রামপদ বললেন "এই খোকা আর তার স্ত্রীর কথা। অপুকে বিয়ে করবার জন্যে যখন খোট ধরল, তখনই আমার মনে হয়েছে এ বিয়ের ফল ভাল হবেনা। খোকা বেজায় প্রভুত্বপরায়ণ আর একগুঁয়ে তার উপর কৃপণ। অপু বোকা, অশিক্ষিত এবং অতি দরিদ্রের মেয়ে। এর ফলে যা হবার তা হয়েছে। প্রথম প্রথম অপু ভয়ে সব কিছু সহ্য করে যেত। কিন্তু এখন বয়সও বেড়েছে, তিনটি মেয়ের মা হয়েছে। বাপের সংসারের অভাবও বেড়েছে. তার উপর বাপ এখন সাংঘাতিক পীড়িত। এখন সে স্বভাবতঃই তাদের কিছু সাহায্য করতে চায়, কিন্তু তার স্বামী তাতে সম্পূর্ণ নারাজ। এই নিয়ে ভীষণ ঝগড়া করেছে আজ। অপু এমন চেঁচিয়েছে যে বাড়ীর সব ভাড়াটেরাই শুনেছে, পাড়ার অন্য লোকেরাও শুনে থাকতে পারে। আমি কোনোদিন ওদের কোনো কথায় থাকিনা, কিন্তু আজ আর থাকতে না পেয়ে খোকাকে ডেকে শাসন করেছি। বলেছি আমি শীগ্‌গিরই অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা

করছি। যতদিন না তা করতে পারছি ততদিন তাদের সমঝে চলতে হবে। না যদি যায়, তাহলে আমি মেসে চলে যাব।"

হেমলতা বললেন "ভ্যালা কাণ্ড। তোমার বাড়ী তোমার ঘর, তুমিই বেরিয়ে যাবে? ওদের খেয়োখেয়ি করতে হয়, রাস্তায় গিয়ে করুক না?"

রামপদ বললেন "সেটা ত আর সত্যিই করতে দেওয়া যায় না? আমারই আত্মসম্মানে বাধবে। আমার নিজের ছেলে, অন্নপূর্ণার একমাত্র সন্তান, তাড়িয়ে দেব কি করে? আর বউয়ের খানিক দোষ থাকলেও নাতনীগুলি ত কোনো দোষে দোষী নয়, তাদের উপর এত নিষ্ঠুর হব কি করে?

হেমলতা বললেন, "তা হলে কি করতে চাও? সত্যিই ত আর মেসে যাবেনা? তার চেয়ে বরং আমার বাড়া এস।"

রামপদ হেসে বললেন "নারে কোথাও যেতে হবেনা, এখন কিছু দিন অন্ততঃ ওরা সামলে চলবে। তার মধ্যে একটা ব্যবস্থা আমি করে নেব। জ্যাঠামশায়ের যে জমিটা আমি কিনে ছিলাম খোকার বিয়ের সময়, সেখানে একটা ছোট বাড়ী করে আমি দেশে গিয়ে থাকব এটা আমার ঠিক করাই আছে। খুব তাড়াতাড়ি এটা করতে চাই। টিউবওয়েল আর সেপ্‌টিক ট্যাঙ্কের ল্যাট্রিন ত করাই আছে, কনক সেগুলিকে ভাল ভাবে চালুই রেখেছে, এখন খানদুই ঘর আর রান্নাঘর একটা তৈরি হলেই আমি চলে যেতে পারি। সব বাড়ীটা পছন্দমত শেষ করতে কিছু দেরি লাগবে, তা সে হবে এখন ধীরে ধীরে। এখন কথা হচ্ছে বাড়ী করার টাকাটা নিয়ে। সম্প্রতি এখনই হাতে আর আমার কিছু নেই, সবই আটকে আছে, তুলতে দেরি লাগবে। কিন্তু আমি ওটা আরম্ভ করতে চাই অবিলম্বে। তুই আমাকে হাজার চার টাকা জোগাড় করে দিতে পারিস?"

হেমলতা বললেন, "দেখি। রঞ্জনের বিয়ের সময় কিছু ধারধোর হয়ে গিয়েছিল, সে সব মিটিয়ে ব্যাঙ্কে কিছু বেশী নেই বোধহয়, তবু কিছু আছে। বলি তোমার ভগ্নীপতিকে। সে খানিক দিক, আর আমার হাতে নগদ টাকা না থাক, গহনা অনেক আছে। বাঁধা দিয়ে হাজারদুই টাকা আমি খুব দিতে পারব।"

রামপদ বললেন "গহনা বাঁধা দিয়ে? এসবও তোর চলে নাকি? কার কাছে বাঁধা দিস্?"

হেমলতা বললেন "তা মধ্যেসধ্যে করতে হয়েছে বৈকি? এই মেয়ের বিয়ের সময়ই ত হঠাৎ ঠেকে গেল। পাওনা টাকা সময়মত পেলাম না। তখন অগত্যা পাড়ার মিত্তির-গিন্নির কাছে বেশ কিছু গহনা বাঁধা দিয়ে দুহাজার টাকা নিয়ে এলাম। সে গহনা অবিশ্যি তোমার ভগ্নীপতি দু-মাসের মধ্যেই ছাড়িয়ে এনেছেন। আরো কখনও-সখনও করতে হয়েছে ঠেকায় পড়লে। তা মিত্তির গিন্নী লোক ভাল, আমাকে ভালও বাসে খুব। আমি টাকা চাইলে কখনও না বলেনা, সুদও কম নেয় অন্যদের চেয়ে।"

রামপদ বললেন "তাহলে তাই দে। আমিও অল্প-দিনের মধ্যেই ছাড়িয়ে দেব। টাকা যে নেই তা ত নয়, এখনই হাতে পাচ্ছি না তাই। টাকাটা পেলেই আমি গ্রামে গিয়ে বাড়ীর ভিত্তি দিয়ে আসব, মুরারীকে টাকা-কড়ি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করতে বলে আসব।"

হেমলতা বললেন, "আজই বল্‌ব ওঁকে, মিত্তির গিন্নির কাছেও আজ একবার যাব। হ্যাঁ দাদা, তোমার ক'খানা ঘর থাকবে?

রামপদ বললেন "খানচারেক করতে হবে বোধহয়। আমি মানুষ একলা, কিন্তু জিনিষপত্র ত অঢেল। তারপর তুই ত যাবি মাঝে মাঝে নিশ্চয়? আর আমার দিদিমণিরা। তাদের বলে রাখব যখনই ইচ্ছা গিয়ে হাজির হতে। অভয়পদ আর অপুকে আমি নেমন্তন্ন করছিনা, তবে ইচ্ছা করলে তারাও যেতে পারে।"

"হ্যাঁ ওদের নেমন্তন্ন করবে না আর কিছু। দুটোতে হাড়ি ক্যারোটের মত ঝগড়া করে তোমায় ঘরছাড়া করল। ওরা থাক যেখানে আছে, গ্রামে যাবার ওদের কি দরকার?"

রামপদ বললেন "আমি তাদের ডাকবনা ঠিকই। তবে নিজের ইচ্ছায় যদি যায়, তাহলে বাধা দেবনা।" আর দুচারটে কথার পর তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

বাড়ী এসে দেখলেন, সব ভয়ানক রকম চুপচাপ। অভয়পদ বাড়ী নেই, অপু নিজের ঘরে আলো নিভিয়ে শুয়ে আছে। মেয়েরাও নিজেদের ঘরে, সেখানে আলো জ্বলছে বটে তবে রেডিও বাজছেনা। বই বা পত্রিকা পড়ছে বোধহয়।

হেমলতাকে কোনো কাজ দিলে সেটা সম্পন্ন না হওয়া অবধি তাঁর আহার নিদ্রা থাকেনা। দুতিনদিনের মধ্যেই তিনি টাকা জোগাড় করে নিয়ে রামপদর কাছে এসে হাজির হলেন। অভয়পদর ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "ঠাকুর ঠাকরুণ আছেন কেমন? ঘরের ছাদ ফাটিয়েছেন আর?"

রামপদ বললেন "নাঃ, চুপ মেরে গেছে। তবে এভাবটা কতদিন থাকবে তা বলা যায়না।"

হেমলতা বললেন "যাক্গে। এই নাও তোমার টাকা দাদা। ঠিক চারহাজারই আছে। "আমিও গেলে পারতাম।"

রামপদ টাকা তুলে রেখে বললেন "আজই কনককে টেলিগ্রাম করছি তাহলে। কাল গিয়ে পৌঁছব, পরশু আবার ফিরে আসব।"

"তুই গেলে ত ভালই হত, তবে কনকের এখন জায়গার অভাব। রোস্ ঘরদুটো হোক আগে তারপর হপ্তায় হপ্তায় যেতে পারবি ইচ্ছে হলে। কনকের বাড়ীতে ত এখন জায়গার টানাটানি, দুই বউ এসে গেছে। আমার বাড়ীটা হয়ে গেলে আর কোনো অভাব থাকবে না।"

হেমলতা আজ আর অভয়পদ বা অপুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা না করে চলে গেলেন।

কনকলতা দাদার টেলিগ্রাম পেয়ে কিছুই বুঝতে পারলেন না, কি কাজে তিনি এত তাড়াতাড়ি করে আসছেন। দেখা হতেই তাঁকে বসিয়ে পাখার হাওয়া করতে করতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি কাজে এসেছ দাদা?"

রামপদ বললেন "বাড়ীটার ভিত্তি দিয়ে যাব। মুরারী যদি পুজোর আগে খানদুই ঘর আর একটা রান্নাঘর করে দিতে পারে তাহলে সেই সময় একেবারে চলে আসব, তাই তাড়া দিয়ে করাতে এসেছি। ওকে একবার ডেকে পাঠাবি?"

"পাঠাচ্ছি, তুমি আগে হাত মুখ ধোও, চা টা খাও। একেবারে চলে আসবে, কলেজে আর কাজ করবেনা।"

রামপদ বললেন "চাকরির মেয়াদ ত চারপাঁচ বছর হল শেষ হয়েছে। ওরা ছাড়তে চায়না, খালি সময় বাড়িয়ে দিচ্ছিল। তা এবারে আমি বলে দিয়েছি পুজোর পরে আমি কলকাতায় আর থাকবনা। ওখানে আমার আর একেবারে মন টিঁকছেনা।

কনকলতা বললেন "কি হয়েছে দাদা? খোকা বা অপু কেউ খারাপ ব্যবহার করেছে? অপুটার আর কোনো গুণ না থাক, বাধ্য ত ছিল খুব।"

রামপদ বললেন "আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার কিছু করে'ন কিন্তু নিজেরা এত ঝগড়া করে, অশান্তি করে যে সেখানে আর কেউ টিঁকতে পারছেনা। মেয়েগুলিরও স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে। কিন্তু তাদের মেয়ে ত তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায়না? কিন্তু চোখের সামনে এত অসভ্যতা দেখে চুপ করে থাকাও যায়না। ওখানে আমাকেও ওদের ঝগড়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে। তাই ঠিক করেছি চলেই আসব।"

কনকলতা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন "মেয়েটা বড় পোড়াকপালে। এত ভাল ঘরে বিয়ে হল, তাও সুখে-শান্তিতে থাকতে পারলনা। মেয়েমানুষের ধৈর্য্য না থাকলে কি সংসার টেঁকে? স্বামীরা এরকম উৎপাত বেশীর ভাগ জায়গায়ই করে। মেয়েদের সয়ে যেতে হয়। অশান্তি করলে নিজেরই কষ্ট। ঐ সংসার ছাড়া কোথাও ত যেতে পারবেনা।"

রামপদ বললেন "ধৈর্য্যও নেই, বুদ্ধিও নেই। তবে

আমি একলা তাকে দোষ দিইনা। অভয়পদর স্বভাবটাও অত্যন্ত খারাপ। যাক্‌গে ওদের কথা, তুই মুরারীকে ডেকে পাঠা, আর চা টা কি দিবি দে।"

কনকলতা উঠে বউদের ডাকতে লাগলেন।

(১৮)

সেই বছর পুজোর সময় রামপদ একেবারে কলকাতার বাস উঠিয়ে গ্রামে চলে এলেন। জিনিষপত্র অনেক এল সঙ্গে। কিছু হেমলতার বাড়ী রইল, কিছু লাইব্রেরীর ঘরটায় বন্ধ করে এলেন। নিজের বড়ঘরখানা তিনি নাতনীকে ছেড়ে দিয়ে এলেন।

আসবার সময় নাতনীরা কাঁদতে লাগল, অপু ফোঁপাতে ফোঁপাতে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। অভয়পদ বিষম গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রইল। কথা তার কিছু বলবার ছিল, কিন্তু কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরল না।

রামপদ নাতনীদের অনেক আদর করে বিদায় নিলেন। বললেন "যখনি ইচ্ছা করবে আমার কাছে চলে আসবে। মাসে একবার করে নিশ্চয় এস, দরকার হলে আমি লোকও পাঠাতে পারি। তোমাদের ছোট ঠাকুরমা অনেকবারই যাবেন, তাঁর সঙ্গেও যেতে পারবে। খোকা, এরা যখনই যেতে চাইবে, তখনই যেতে দেবে। কখনও বাধা দিওনা।"

এতক্ষণে অভয়পদর মুখে কথা ফুটল। বলল "বাবা, আমি অতবড় গণ্ডমুর্খ নই, আপনার কাছে যেতে চাইলে আমি বাধা দেব?"

গ্রামে ফিরে এসে রামপদর মনে হল তিনি যেন আবার মায়ের কোলে ফিরে এলেন। অন্নপূর্ণা মারা যাবার পর কলকাতা বাসটা কোনোদিনই তাঁর আর ভাল লাগেনি, কিন্তু তখন চাকরী করায় দরকার ছিল, ছেলের পড়াশুনো ছিল, কাজেই শহর ছেড়ে তখন চলে যেতে পারেন নি। ঝি-চাকরের সাহায্যে সংসার চলেছে, তাতে সুখ বা আরাম ছিল না তবে অশান্তিও ছিল না। নিজের কাজে কর্ম্মে সম্পূর্ণভাবে ডুবে থেকে তিনি মনের দুঃখ আর শূন্যতা ভুলবার চেষ্টা করতেন, সব সময় সক্ষম হতেন না। নাতনীগুলি হবার পর তাঁর জীবনে আবার একটু আনন্দের রস এসেছিল। বাচ্চাগুলি তাঁকে অত্যন্তই ভালবাসত, তিনিও তাদের বোধ হয় নিজের ছেলের চেয়েও ভালবাসতেন। তাঁর পক্ষে সত্যিই টাকার চেয়ে সুদের মায়া বেশী হয়েছিল।

গ্রামের বাড়ীতে এসে উঠবার পর প্রথম অতিথি তাঁর অবশ্য হয়েছিলেন হেমলতা। তারপরই উমা, উষা, রানির আসবার কথা। কিন্তু তার বদলে এল তাদের মা আর বাবা। অপুর বাবার অবস্থা হঠাৎ এতটা খারাপ হয়ে পড়ল যে সবাই বুঝল যে এযাত্রা তাঁর আর রক্ষা নেই। অপুর কাছে খবর গেল, একবার শেষ দেখা দেখে যাবার জন্য। বিয়ের পর বাপের বাড়ী যাওয়াটা অপুর ঘটেই উঠতনা, খালি বোনদের বিয়ের সময় গিয়েছিল, দুতিনদিনের জন্য। কিন্তু এখন না গিয়ে উপায় নেই, এ কথা অভয়পদ হেন স্বামীও স্বীকার করল। তাকেই নিয়ে যেতে হবে, আর কে আছে? ও রকম জায়গায় মেয়েদের পাঠাবে না অভয়পদ সাফ বলে দিল এবং হেমলতাকে গিয়ে ধরে পড়ল তার বাড়ীতে এসে দিনতিনেক থাকবার জন্যে। হেমলতা সহজেই রাজী হলেন, কারণ তাঁরও ঘরে তখন বউ এসেছে সংসারের কাজ হালকা হয়ে গেছে।

সকালের গাড়ীতে অপুকে নিয়ে অভয়পদ যাত্রা করল। বলে রাখল "দেখ ঐখান দিয়ে যাচ্ছি, একবার বাবাকে দেখে যাব। দুপুরটা ওখানে বিশ্রাম করে, বিকেলের ট্রেনে তোমাদের গ্রামে পৌছে যাব।"

অপু আপত্তি করল না। যদিও শ্বশুরের কাছে মুখ দেখাতে তার আজকাল খুবই লজ্জা করে। শ্বশুরবাড়ী আসার পর কেউ যদি আগাগোড়া ভাল ব্যবহার তার

সঙ্গে করে থাকে ত সে রামপদ। তাঁকেই কিনা সে ঘরছাড়া করল? এ অপযশ কি তার কোনোকালে যাবে? কে বা বিশ্বাস করবে যে অভয়পদর অত্যাচারেই সে অমন বেসামাল হয়ে পড়েছিল?

রামপদ খবর পেয়েছিলেন যে তারা আসছে। কনকলতার কাছেও ছোট দেবরের সঙ্গীন অবস্থার কথা ক্রমাগতই আসছিল। তাঁরাও দুই ভাই বোনে গিয়ে একবার শেষ দেখা দেখে আসবেন ঠিকই করেছিলেন, তবে যাবার সময়টা তখনও ঠিক হয়নি।

অভয়পদরা এসে পৌছলে কনকলতাও এলেন তাদের খাওয়াদাওয়া তদারক করতে। অপু গুরুজনদের প্রণাম করে কাঁদতে আরম্ভ করল। রামপদ বললেন "কনক, ওকে পাশের ঘরে নিয়ে শুইয়ে দাও, একটু শান্ত হোক। এখন অনেক ধকল যাবে ওদের দেহ মনের উপর দিয়ে।"

অপু কনকলতার সঙ্গে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে রইল, তিনি পাশে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। বারবারই বলতে লাগলেন, "মা বাবা কি কারো চিরকাল থাকে বাছা?"

রামপদ অভয়পদকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক' দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ? দিদিমনিদের কি ব্যবস্থা করে এলে?"

অভয়পদ বলল ছোট পিসীমাকে বাড়ীতে বসিয়ে রেখে এসেছি। আমি ত দুদিনের ছুটিই নিয়েছি ওকে রেখে কালই ফিরে যাব ভেবেছি।"

রামপদ বললেন "যা শুনছি তাঁর ত একেবারে শেষ অবস্থা। এসব সময় একটু সময় হাতে রাখা ভাল। কখন কি হয় বলা যায় না। তুমি অপুকে ওখানে রেখে সে ক্ষেত্রে ফিরে যেতে পার না। এ সব সঙ্কট সময়ে পরস্পরের পাশে দাঁড়ান উচিত। না হলে অতি অশোভন হয়।"

অভয়পদ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ তারপর বলল, "দেখি, ওখানে গিয়ে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে আর কি।"

রামপদ বললেন, "ওদের অবস্থা অতি অসচ্ছল। ছেলে দুজনের একজনও মানুষ হয়নি। অনেক খরচের ব্যাপার সামনে, টাকাকড়ি সঙ্গে এনেছ কিছু? জামাইদের মধ্যে তুমি সব চেয়ে বড় আর সঙ্গতিপন্ন, তোমারই কাছে ওরা সাহায্য প্রত্যাশা করবে।"

অভয়পদ বিপন্নমুখে বলল, "বিশেষ কিছু ত আনিনি, শুধু ফিরবার খরচটা এনেছিলাম।

রামপদ বললেন, "তাতে কি হবে? যদি বেয়াইমশাই আজ বা কাল মারা যান, তাহলে সৎকারের খরচ আছে। সেইদিনই অপু কিছু ফিরবেনা, কোনো মেয়েই পারেনা সেটা, দুচারদিন থাকতে চাইবে মা বোনেদের সঙ্গে। চতুর্থীর শ্রাদ্ধ করে আসতে চাইবে। এ সবেরই বেশ খরচ আছে। আমার কাছে এখন বেশী টাকা নেই, আজই চেষ্টা করব আরো কিছু সংগ্রহ করবার। শ' দুই টাকা এখন দিচ্ছি সঙ্গে রাখ। যদি ভগবানের কৃপায় তিনি সেরে যান তাহলে ফিরবার পথে ওটা আমাকে ফেরৎ দিয়ে যেও। আর যদি খরচ হয়ে যায় তাহলে হিসাব নিকাশ পরে করা যাবে।"

অভয়পদ বলল, "আচ্ছা। আপনি কি যাবেন ওখানে যদি তেমন কিছু হয়?"

রামপদ বললেন, "অবশ্যই যাব, কনক আর প্রবীরও যাবে। তুমি গিয়ে তেমন অবস্থা দেখলে আমাকে তখনি খবর দেবে। অতি ছোট পাড়াগাঁ, ওখানে পোষ্ট অফিস নেই, টেলিগ্রাম করা চলবেনা। তুমি এক কাজ কোরো। ষ্টেশনের পাশে কয়েকটা পান, বিড়ি আর চায়ের দোকান আছে। গোটা চার পাঁচ ছোক্‌রা সেখানে বসে, তাদের সকলেরই প্রায় সাইকেল আছে। তারা বারোটা অবধি জেগেই থাকে, বখশিসের লোভে তখনি চলে আসবে। কতটুকুই বা দূর? খবর পেলেই আমি যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ব, ভোরবেলা পৌছে যাব।"

বাড়ীর লোকেরা তার পাশে দাঁড়াবে এতে অভয়পদ খানিকটা ভরসা পেল। বলল "খবর আমি ঠিকই দেব।"

কনকলতা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন "চল চা খাবে চল। সকাল সকাল স্নান করে খেয়ে এরপর

খানিক ঘুমিয়ে নাও। ওখানে গিয়ে কিসের মধ্যে পড়বে তা কে জানে? অপুকে আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

রামপদ বললেন "কেন রে এখনো চা কি করে উঠতে পারল না দাশরথী?"

কনক বললেন "পারবেনা কেন? ও ত করতে যাচ্ছিলই। তা আমাদের ত অনেক লোকের হচ্ছে, হয়ে গেছেই, তাই বউরা এদেরও ডাকছে।" তিনি অপুকে নিয়ে অগ্রসর হলেন, অভয়পদ চলল পিছন পিছন।

স্নানাহারটাও তাড়াতাড়ি সেরে অপু শুয়ে পড়ল। রামপদ ছেলেকে ডেকে বললেন "একটা কথা তোমায় বলে রাখি। পরে হয়ত বলবার সময় পাব না। এ কদিন যদি তোমাদের মধ্যে কিছু মতান্তর ঘটে, সেটা এখনি নিষ্পত্তির চেষ্টায় তর্কাতর্কি কোরোনা বা অপুকে ধমকধামক কোরোনা। ওসব মীমাংসা বাড়ী গিয়ে করতে পারবে। দুঃখ বিপদের দিনে মানুষ আপনার জনের কাছে সহানুভূতি ছাড়া আর কিছু প্রত্যাশা করে না।" অভয়পদ নীরবে শুনে ঘুমুতে চলে গেল।

বিকেলে উঠে তারা চা খেয়ে ষ্টেশনে চলল, বাড়ীর ক'জন ছেলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। জিনিষপত্রের মধ্যে একটা ছোট স্যুটকেশ আর একটা হাতব্যাগ সে ওরা নিজেরাই হাতে করে চলল। একই সঙ্গে এক গাড়ীতে উঠে পড়ল দুজনে। অপুর বাপের বাড়ীর গ্রাম কুমোরপাড়া এতই ছোট যে সেখানে এক মিনিটের বেশী ট্রেন দাঁড়ায় না, দুই কামরায় ছুটোছুটি করবার সময়ই পাওয়া যাবে না।

কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই ট্রেন পৌছে গেল কুমোরপাড়ায়। নিজেদের ব্যাগ স্যুটকেশ হাতে নিয়েই তারা নেমে পড়ল। অপুর দাদা তাদের নিতে এসেছে। অপু জিজ্ঞেস করল "বাবা কেমন আছেন দাদা?"

দাদা বলল "ভাল আর কই? চল, গিয়েই দেখবে।" অভয়পদর দিকে ফিরে বলল "আমাদের এটি একেবারে অজ পাড়াগাঁ। একটা রিকশা পর্য্যন্ত নেই, ট্যাক্সি ত দূরের কথা, গরুর গাড়ীতেই যেতে হবে।"

গরুর গাড়ীতেই উঠে বসতে হল। সত্যিই অজ পাড়াগাঁ। এরকম গ্রাম অভয়পদ এত কাছ থেকে কোনদিন দেখেনি। শ্বশুরবাড়ী সে কোনদিন আসেনি, শালীদের বিয়েতে সে অপুকেই খালি পাঠিয়েছিল, বাচ্চাদেরও যেতে দেয়নি। তার নিজের বিয়েও নিজের বাড়ীতে বসেই হয়েছিল।

কতগুলো আধভাঙা, আধধ্বসেপড়া মাটির কুঁড়েঘরের সমষ্টি। রাস্তা কাঁচা, কচুরীপানায় ঢাকা দুচারটে পুকুর চোখে পড়ে। দোকান বাজারের চিহ্নমাত্র নেই। পাকা বাড়ী একটাও চোখে পড়ে না। লোকজন দু'চারটে চলাফেরা করছে। এক একটা বাড়ীর পিছনে বিশাল আবর্জ্জনার স্তূপ, দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে চারিদিকে। অভয়পদর প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসতে লাগল, এবং তুলনায় তাদের নিজের গ্রাম ত শহর বললেই হয়।

গরুর গাড়ীটা অবশেষে থামল ঐ রকমই জীর্ণ খড়ের চালওয়ালা মাটির বাড়ীর সামনে। চালের দিকে তাকালে মনে হয় জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। গরুরগাড়ী থেকে সবাই নেমে পড়ল। ঘরের ভিতর থেকে অপুর মা দুই বোন আর ছোট ভাই বেরিয়ে এল। অপুর মা তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বড় ভাই ধমকের সুরে বলল "এখনি কান্না কেন? আগে ওদের দেখতে দাও বাবাকে, তারপর একটু সুস্থির হয়ে বসতে দাও।"

সবাই সামনের ঘরে ঢুকল। মিট্‌মিট্‌ করে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। তারই আলোয় দেখা গেল তক্তপোষের উপর ময়লা বিছানায় একজন কঙ্কালসার মানুষ শুয়ে আছে। দেহে প্রাণ আছে বলে মনে হয়না। খুব নীচু গলায় অপুর দাদা বলল "যাও পাশের ঘরে গিয়ে সব বোস।"

পাশের ঘরের মেঝেতে গোটা তিন চার মাদুর পাতা, কোনো আসবাব নেই। কয়েকটা বাক্স রয়েছে, দেয়ালের গায়ে টাঙানো দড়িতে ময়লা কাপড়চোপড় ঝুলছে।

এমন সময় অপুর সেজ জ্যাঠাইমা আর তাঁর মেয়ে লীলাকেও দেখা গেল। অভয়পদর মুখ দেখে লীলা বলল

"চল ভাই তুমি ওঘরে বসবে", বলে তাকে ডেকে নিয়ে গেল নিজেদের ঘরে। এটি মোটের উপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কয়েকটি তক্তপোষের উপর বিছানা করা আছে। চাদরগুলি তেমন কিছু ময়লা নয়। গোটা দুই টুল আর গোটা দুই মোড়াও আছে। অভয়পদকে একটা তক্তপোষে বসিয়ে মেজগিন্নী বললেন, "বোসো বাবা এখানে, ওদের কি আথান্তর দেখছ ত? আজ সকাল থেকেই ছোটকর্ত্তার জ্ঞান নেই। সবাই মিলে খালি কাঁদছে, উনুনে আঁচটা পর্য্যন্ত দেয়নি। মানুষের চামড়া গায়ে থাকলে ত এসব দাঁড়িয়ে দেখা যায়না? আমিই আজ চা করলাম, ভাত ডাল রান্না করে খাওয়ালাম। এখন আবার চা করছি, সব গলা শুকিয়ে বসে আছে।"

অভয়পদ এসব কথার কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। তবু ভদ্রমহিলার কথার বদলে কথা ত বলতে হয়? জিজ্ঞাসা করল, "মেজ জ্যাঠামহাশয় কোথায়?"

মেজ গিন্নী বললেন "গেছেন কব্‌রেজ মশায়ের বাড়ী, যদি হাতে পায়ে ধরে একবার নিয়ে আসতে পারেন।"

অভয়পদর মনটা ক্রমেই বেশী করে মুষড়ে পড়তে লাগল। এরকম দারিদ্র্য সে কল্পনা করেনি। তার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কারো এরকম শোচনীয় অবস্থা নেই। সে নিজে সংসারী মানুষ, তিনটি কিশোরী কন্যার পিতা, কিন্তু বাবা তাকে সংসারের সব অভাব, সব দুঃখ কষ্ট থেকে এমন করে আড়াল করে রেখেছিলেন যে সে এগুলির সামনাসামনি কখনও পড়েনি। কি করে সে এখানে সময় কাটাবে? রাত্রে বা কোথায় শোবে? পুরুষ মানুষ কেউ থাকলে তবু দু চারটে প্রশ্ন করা যায়।

যা হোক এই সময় লীলা এসে তাকে চা দিল এবং কাঁসার রেকাবীতে করে মুড়ির মোওয়া দিল। মেজ গিন্নী একটা কলাই করা জামবাটিতে অনেকখানি চা নিয়ে অপুদের ঘরের দিকে চললেন। এবং মেজকর্ত্তা এসে এই সময় ঘরে ঢুকলেন।

লীলা বলল "কবরেজ মশায়কে নিয়ে এলেনা বাবা?

মেজকর্ত্তা বললেন "পারলাম আর কই আনতে? এই একমাস যাবৎ ত একটা পয়সা ছোঁয়ায়নি কারো হাতে, বিনা পয়সায় কি কাজ হয়?" অভয়পদকে বললেন, "বোসো বাবা, বড় দুর্দ্দিন এদের। অপু এসেছে ত?"

অভয়পদ সংক্ষেপে বলল "হ্যাঁ।"

মেজকর্ত্তা বলে চললেন, "তুমি এলে না বাঁচালে বাবা, আমি ভেবেই পাচ্ছিলাম না আমি একলা মানুষ, এদের কোনদিক সামলাই। বড় ছেলেটা ত ওদের মানুষ হলনা, ওকে দিয়ে কোন কাজই হবেনা।"

অভয়পদ ভাবল "আমাকে দিয়েই বা কি কাজ হবে?" মুখে বলল, "বাবা কাল আসবেন বোধহয়, তিনি এলে সব দিক দিয়ে আপনার সাহায্য করতে পারবেন।"

ছেলেদের মধ্যে মধ্যে দেখা যেতে লাগল, অভয়পদ বেরিয়ে দু চারটে কথা বলল তাদের সঙ্গে।

রান্নাবান্না হয়ে গেছে। মেজ গিন্নী আগে খেতে বসালেন পুরুষদের। রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে সব বসল। দুপুরে শুধু ডাল ভাত হয়েছিল বলে শোনা গিয়েছিল, এবেলা মেজগিন্নী ডাল তরকারী ত করেইছেন, জামাইয়ের খাতিরে একটা মাছের ঝোলও করেছেন। জামাই প্রথম এল শ্বশুরবাড়ী, তাকেও ষোড়শোপাচারে খাওয়ানোর কথা, কিন্তু এই দুর্দ্দিনে সে আর কি করে হয়?

এরপর এবাড়ির ওবাড়ীর মেয়েরা খেতে বসল। খাওয়ার শেষে অপু মায়ের খাবার একটা থালায় করে নিয়ে গেল।

তারপর শোওয়ার পালা। অপু এসে বলল "মেজজ্যাঠাইমা তোমাকে তাঁদের ঘরে শুতে বলেছেন, তাই শোও। আমাদের দিকটায় থাকলে তোমার একেবারে ঘুম হবেনা, খাট বিছানা কিছু নেই। কান্নাকাটিও চলেইছে।"

অভয়পদ বলল "যা তোমরা বল।" শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

মাঝরাত্রে তুমুল আর্ত্তনাদের শব্দে সে চমকে জেগে উঠে বসল। সকলেই উঠে পড়েছে, এবং অপুদের ঘরের

দিকে ছুটে চলেছে। অভয়পদ ঘড়ি দেখল, সাড়ে বারোটা পার হয়ে গেছে। সেও গিয়ে সকলের পিছনে দাঁড়াল। অপুরা তিন বোন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। তাদের মা সদ্যমৃত স্বামীর খাটের উপর মাথা রেখে বোধহয় অজ্ঞানই হয়ে গেছেন। নিকট প্রতিবেশীদের বাড়ী থেকে দু একজন স্ত্রীলোক আর পুরুষও এসে দাঁড়ালেন। অভয়-পদ মেজকর্ত্তার এক ছেলেকে বলল "বাবার কাছে এখনই একটা খবর পাঠান দরকার। আমাকে একটা কাগজ আর কলম এনে দেবেন ?"

ছেলেটি বলল "চিঠি নিয়ে যাবে কে, এত রাত্রে ?"

অভয়পদ বলল "ষ্টেশনের পাশের যে দোকানগুলো আছে, তাদের ছোকরাদের সাইকেল আছে, তারা বখশিশ পেলেই যায় বলে শুনেছি।"

ছেলেটি বলল "ওঃ ওরা যাবে ঠিকই। আচ্ছা চিঠি লিখে দিন।" সে কাগজ কলম এনে দিল।

অভয়পদ সংক্ষেপে খবরটা দিয়ে চিঠি শেষ করল। নিজের মানিব্যাগ থেকে একটা দশটাকার নোট বার করে ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল "এইটা পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন।"

"এই যে যাচ্ছি" বলে বড় একটা টর্চ নিয়ে সে অন্ধকারে মিশে গেল। অভয়পদ বিছানার উপর গিয়ে বসল। বাবা না আসা অবধি বসেই থাকবে, ঘুমবার চেষ্টা করে লাভ নেই, সেটা সম্ভবও হবেনা, দেখতেও ভাল হবেনা।

রামপদ অনেক রাত অবধি জেগেই ছিলেন, নানা ভাবনা ভাবছিলেন। তাঁর চাকর দাশরথীও নিজের খাওয়া-দাওয়া আড্ডা দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য সেরে শুতে বেশ রাত করে। গরমের দিন বারান্দাতেই সে শোয়, ঘরে ঢোকে না। রান্নাঘর তালা বন্ধ করে রাখে।

সে রাত্রেও সবে সে শুয়েছে বলে তার মনে হল। যদিও ঘন্টাখানেক সে এরই মধ্যে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে নিয়েছে হঠাৎ চমকে উঠে বসল, বলল "কে হে তুমি মাঝরাত্রে এসে কানের কাছে ঘন্টি বাজাচ্ছ ?"

একজন লোক সাইকেল থেকে নেমে বলল "আজ্ঞে আমি কুমোরপাড়া থেকে এসেছি, বাবুমশায়ের নামে চিঠি নিয়ে।"

রামপদ ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন, বললেন কই চিঠি ?"

লোকটা চিঠিখানা অগ্রসর করে দিল এবং বলল "কোনো জবাব আছে কি ? অনেক রাত হয়েছে আমি তবে চলি।"

রামপদ তাড়াতাড়ি চার লাইনের চিঠি পড়ে নিয়ে বললেন, "গিয়ে বলবে আমরা শেষরাতের ট্রেনে যাচ্ছি। তোমাদের পথ খরচের জন্যে কিছু দিয়েছেন কি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সে সব প্রথমেই দিয়ে দিয়েছেন" বলে লোকটি সাইকেল চালিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেখা গেল কনকলতা তাঁর ঘরের দিক থেকে লণ্ঠন হাতে করে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, "কি দাদা, কি খবর এল ?"

রামপদ বললেন, "শেষ খবর। একবার ত এখন ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। অভয়পদ রয়েছে বটে ওখানে, কিন্তু সে এমনই অনভিজ্ঞ এসব বিষয়ে যে কোনো সাহায্যই করতে পারবেনা। তুই যাবি ত ?"

"হ্যাঁ দাদা যাব, প্রবীরকেও নিয়ে যাব। ওঁরও যাওয়া উচিত, হাজার হলেও মায়ের পেটের ভাই। কিন্তু যা অসুস্থ ওঁকে নিয়ে যেতে ভরসা হয়না, গিয়েই হয়ত শুয়ে পড়বেন। আমিই যাচ্ছি, গোছগাছ করে নিই গে।"

"গোছগাছের আর আছে কি ? কাল সন্ধ্যাতেই ত ফিরে আসবি ?"

কনকলতা বললেন "নিজের জন্যে কি আর, সে ত একটা শাড়ী গামছা হলেই হয়। ওদের জন্যে খানিক খাবার-দাবার নিতে হবে ত ? যা হাতাতে ঘর, তুমি জান না। গিয়ে হয়ত দেখবে ঘরে একছটাক আতপ চালও নেই, সব উপোষ করে বসে আছে। মেজকর্ত্তার অবস্থা ওদের চেয়ে ভাল, তবে দুভাইয়ে সদ্ভাব ছিলনা, তারা কতটা কি সাহায্য করবে জানি না। আমার ঘরে যা আছে তাই ত এখন নিয়ে যাই, তারপর গতিক বুঝে আরো কিছু পাঠাব।"

তিনি নিজের ঘরে ফিরে চললেন। শেষরাতে একটা গাড়ী আছে তাতেই যাবেন। রামপদ ঘরে গিয়ে শুলেন অবশ্য ঘুম হবেনা, সেটা জানতেনই।

সময়মত উঠে তাঁরা ষ্টেশনে চললেন, রামপদ, কনকলতা আর প্রবীর। প্রবীরের হাতে মস্ত পোঁটলা। কনক বললেন "এর চেয়ে ছোট করা গেলনা দাদা, অনেকগুলি লোক ত। চাল, ঘি তরকারি, ফল যা ঘরে ছিল সব নিলাম।"

কুমোরপাড়া দেখতে দেখতে পৌঁছে গেল। ভোরের আলো তখন ফুটবার জোগাড় করছে। ট্রেন এসময় আসে কাজেই গরুরগাড়ীও থাকে, তাঁরা একটা গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

বাড়ীর কাছাকাছি এসেই কান্নার শব্দ পেলেন। কনকলতা আর প্রবীর নেমে অপূদের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। মেজকর্ত্তাদের ঘর থেকে অভয়পদ বেরিয়ে এলেন, মেজকর্ত্তাও বেরিয়ে এলেন রামপদকে অভ্যর্থনা করতে।

ঘরে ঢুকে লণ্ঠনের আলোয় অভয়পদর মুখ দেখে রামপদ একটু ব্যস্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, "একি, তোমার অসুখ করেছে নাকি?"

অভয়পদ বলল, খানিকটা অসুস্থ বোধ করছি। আজ চলে গেলে কি অন্যায় হবে?

"অন্যায় হবে না, তবে তোমার স্ত্রী ক্ষুণ্ণ হতে পারে। কিন্তু এখানে অসুখে পড়লে বড় বিপদ হবে। দুপুরে গাড়ী আছে তাইতে চলে যাও। অপূকেও বলে রাখ। শ্মশানযাত্রায় বেরিয়ে সেখান থেকে একেবারে ষ্টেশনে চলে যেও।"

অভয়পদ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বাবাকে তাঁর দু'শো টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল "এর কিছু খরচ হয়নি। আপনি আজ সন্ধ্যায় যখন ফিরবেন, তখন অপূকেও কি নিয়ে যাবেন?"

রামপদ বললেন "সে হয়ত যেতে রাজী হবে না, একেবারে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ করে যেতে চাইবে। বারবার ছুটোছুটি করার চেয়ে সেটা ভাল। যাক আমি রইলাম সন্ধ্যে অবধি। দেখে শুনে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করব। অপূ এখানে থাকলেও আমি লোক পাঠিয়ে প্রতিদিন তার খবর নেব।"

ক্রমশঃ

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

উত্তর বঙ্গে প্রলয়ঙ্করী বন্যার ফলে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ তাহাদের সব কিছু হারাইয়া—অনশন, অর্দ্ধাশনে পথে প্রান্তরে মাঠে ঘাটে মৃত্যুর সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়া মৃত্যুর জন্য দিন গুণিতেছে, ঠিক সেই সময়ে আমরা অদূরে কলিকাতায় বসিয়া পূজার আনন্দ-উৎসবে মত্ত হইয়া আছি। আমরা সত্য বাঙ্গালীরা সামান্যকারণে উত্তেজিত হই, কথায় কথায় 'দাবী-দাবার' মিছিল বাহির করি, সরকারের প্রায় সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে প্রতিবাদ করি, অন্যের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া, দেশের লোকের জন্য আমাদের নেতাদের প্রাণ প্রায় সর্ব্বক্ষণ ফট্ ফট্ করিয়া বিষম শব্দে পথে ঘাটে ফাটিয়া যায়, তাঁহাদের ভাবভঙ্গী কথাবার্ত্তা শ্রবণ করিলে মনে হইবে 'আত্ম' বলিয়া তাঁহাদের কিছু নাই, নিজের যাহা কিছু ছিল, এই সব নেতারা, বিশেষ করিয়া সেই সব নেতা যাঁহাদের চিত্ত বাঁধা হয় মসকো, নয় পিকিং-এ এবং রুশ-চীনের সামান্য নিন্দাও যাঁহাদের পরম পিত্তদাহের কারণ হয়! আর আমাদের নেতাভক্ত দেশের-ভবিষ্যৎ যুবকদের দল, বিশেষ করিয়া কলিকাতার কথাই বলিতেছি, পূজার চাঁদা আদায়ের জন্য দলে দলে বাহির হইয়া, পাড়া-প্রতিবেশী, চেনা-অচেনা সকল মানুষের প্রাণ গত পূজার মাস দুই কেবল অতিকষ্টে নহে, ভীত সন্ত্রস্তও করিয়া তোলে। এক বা দুই নহে, যতজন আসিবে, প্রত্যেককেই চাঁদা প্রদান—'মাষ্ট' এবং এক্ষেত্রে চাঁদার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কত চাঁদা (?) দিতে হইবে, তাহা চাঁদা গ্রহণ বা আদায়কারীর ইচ্ছার অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে! দাতা দান করিয়া ধন্য হউন, গৃহীতা গ্রহণ করিয়া দাতাকে কৃতার্থ করিবেন মাত্র!!

বিগত পূজার সময় একমাস কলকাতা শহরেই কতলক্ষ টাকা চাঁদারূপী চৌথ আদায় হইয়াছে, সঠিক কেহ বলিতে পারিবে না, তবে উৎসব আনন্দ এবং চিত্ত চমৎকারী সমারোহ যাহা এবার দেখা গেল, তাহাতে চাঁদার পরিমাণ কোটি টাকার কম হইবে না। কিন্তু এই পরম উৎসাহে এবং দাতাকে বহুভাবে নিগৃহীত, ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া আদায়ীকৃত চাঁদা হইতে মাত্র কয়েকটি পূজা-কমিটি উত্তর বঙ্গে বন্যাত্রাণ ফাণ্ডে সামান্য পরিমাণে দান করে। শতকরা অন্তত ৮৫টি পূজা-কমিটি রাজ্যপালের বিনীত আবেদনে কোন প্রকার সাড়া দিবার কোন প্রয়োজন বা অনুপ্রেরণা বোধ করে নাই। দেবীর প্রতি ভক্তিতে কি ইহারা নিজেদের ভাই ভগিনীদের বিপদের কথাও ভুলিয়া গেল?

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোক অসম্ভব দুঃখকষ্টে এবং অনশন অভাবের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাইতেছে, আর ঠিক সেই সময় আমরা পরম সভ্য, শিক্ষিত এবং গণতন্ত্রবিলাসী কলিকাতাবাসী বাঙ্গালীরা আনন্দ-উৎসবের বিকট উল্লাসে বাজী ফাটাইয়া এবং সেই সঙ্গে গলা ভাঙ্গা লাউডস্পীকার সাহায্যে রদ্দি মার্কা চতুর্থ

শ্রেণীর হিন্দী-সিনেমা-সঙ্গীতের ফাটা গ্রামাফোন রেকর্ড বাজাইয়া, দেবী পূজার ভক্তিমাহাত্ম্যে প্রচার করিতেছি! ইহাতে কাহারো কিছু বলিবার প্রতিবাদ করিবার নাই! আমাদের অবস্থা কবির ভাষায় বলা যায়—'বাধা দিলে বাধবে লড়াই মরতে হবে॥"

বাঙালীর প্রাণশক্তি এমনিতেই ক্ষীয়মান। অল্প যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা কি এইভাবে অযথা, অন্যায়, অহরহ অপআনন্দ উল্লাসেই ব্যয়িত হইবে? বাঙালীর জীবন-প্রদীপের তৈল প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে, যেমন দেখিতেছি, তাহাতে মনে হইতেছে প্রদীপের সামান্য অবশিষ্ট তৈলটুকু ফুরাইতে আর কালবিলম্ব হইবে না। বাঙলা ও বাঙালীর একদা গৌরব-নগরী কলিকাতা অবাঙালীর পূর্ণবাসভূমে পরিণত হইতেও আর অধিক দিন প্রয়োজন হইবে না।

কলিকাতার পথে ঘাটে জঞ্জালের পাহাড়, নালা নর্দমার বিবিধপ্রকার নোংরার জমাট স্তূপ, শহরের পয়ঃপ্রণালীগুলি প্রায় "মরা" মজা অবস্থায় উপনীত, কিন্তু এ-সবই হয়ত একদিন সাফ করা সম্ভব হইবে, কিন্তু বাঙলা ও বাঙালীর ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবনে যে ময়লার পাহাড় জমিয়াছে, আমাদের জীবনের সর্ব্বস্তরে যে ধস্ নামিয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার কি আর কোন দিন হইবে? ক্ষীণ আলো এবং আশার রেখাও দেখিতে পাই না, সবই যেন ঝাপসা ঠেকিতেছে!

রাষ্ট্রপতির নেপাল সফর

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের রাষ্ট্রপতি 'রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদায়'(?) নেপাল পরিভ্রমণে গমন করেন। সফরান্তে নেপালরাজ এবং আমাদের রাষ্ট্রপতি এক যুক্ত ইস্তাহারে প্রকাশ করেন যে নেপালের সহিত ভারত যে পরম মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ তাহা চিরন্তন এবং পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা এই চির অটুট মৈত্রীবন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিতে পারে! রাষ্ট্রপতির এই ঘোষণাকে আমরা একটা কথার কথা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। এই পৃথিবীতে বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক-জগতে কোন রাষ্ট্রের সহিত আর এক রাষ্ট্রের সম্পর্ক "চিরন্তন বন্ধুত্ব" অথবা 'চিরন্তন বৈরীতা' বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং রাষ্ট্র-বিশেষের স্বার্থের সহিত এ সম্পর্ক গভীরভাবে বিজড়িত। স্বার্থে আঘাত না লাগিলে এক রাষ্ট্র আর এক রাষ্ট্রের সহিত তাহার বন্ধুত্ব বন্ধন এবং প্রীতির নীতি পরিত্যাগ করে না, ইহার বিপরীত ঘটিলেই বন্ধুত্বের মুখোস এবং অগভীর প্রীতির বন্ধন এক নিমেষেই খসিয়া, ছিঁড়িয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা রাশিয়া এবং চীনের কথা বলতে পারি। জবাহরলাল নেহরু নামক মহামানব, স্বাধীনতা (?) লাভের পর চীন বিহারে গমন করেন এবং সেই সময় 'হিন্দী-চীনি ভাই ভাই' ধ্বনিতে ভারত মুখরিত হইয়া উঠে। পঞ্চশীল নীতিতেও নাকি চীন পরম বিশ্বাসী এমন কথাও প্রচারিত হয় ভারতে! নেহরু তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে বাহিরে পঞ্চশীল নীতির প্রতি পরম আস্থা দেখাইয়া চীন ভিতরে ভিতরে গোপনে ভারতকে 'পঞ্চশীলকে' লক্ষ গুণ বৃদ্ধি করিয়া লক্ষ লক্ষ শীলাঘাতে জর্জ্জরিত করিবার পরিকল্পনা করিতেছে, এবং ১৯৬২ সালে চীন এই শীলাঘাতে কাবু করিয়া হিমালয়ের এপারে আসিয়া ভারতের প্রায় ৩৪০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড জবরদখল করিয়া আছে! আর কতকাল কিংবা চিরকালই থাকিবে কি না কেহ বলিতে পারে না, বলিতে সাহস করে না। একমাত্র—'ঢাল নাই তলোয়ার নাই' মোরারজী সর্দারই—বিদেশে গিয়া ভারত ভূমি হইতে চীনকে ঘাড় ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবার বৃথা আস্ফালন করিতে কোন লজ্জা বা দ্বিধা অনুভব করেন নাই।

তারপর দেখুন রাশিয়ার দিকে। নেহরু তথা ক্রুশ্চেভের আমলে প্রায়ই শুনিতাম রাশিয়াই বর্ত্তমান জগতে ভারতের প্রকৃত এবং একমাত্র বন্ধু এবং সকল দুঃখ বিপদে, বিশেষ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ বাধিলে, আর কেউ না আসুক পরম সুহৃদ রাশিয়া বিপদত্রাতারূপে ভারতের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে! এই বিষম মোহ, আশাকরি আমাদের রাষ্ট্রনেতাদের বিশেষ করিয়া কেন্দ্রীয় মালিকদের এবার

কাটিয়াছে! রাশিয়ার বর্ত্তমান নেতাদের বোলচাল এবং নীতিতে ভারতের প্রতি পূর্ব্ব ঘোষিত নীতি আর নাই, আছে কেবলমাত্র ফাঁকা পিঠচাপড়ানী ভাব আর বেকার উপদেশাবলী।

রাষ্ট্রপতির নেপাল সফর সম্পর্কে এত কথা বলিবার একমাত্র কারণ এই যে আমাদের রাষ্ট্রপতি 'রাষ্ট্রীয়-মর্য্যাদায়' অন্য রাষ্ট্র অবশ্যই ভ্রমণ করিতে পারেন, কিন্তু বিদেশ ভ্রমণে গিয়া অর্থহীন মামুলী, মন এবং মানরক্ষার কারণে বড় বড় ছেঁদো আদর্শবাক্য প্রচার না করাই বোধহয় শ্রেয়। বিশেষ করিয়া নেপাল যখন চীনের সহিত নানাভাবে তাহার প্রীতিবন্ধন বৃদ্ধি এবং নীতির অর্থপূর্ণ পরিবর্ত্তন করিতেছে। রাষ্ট্রপতি নিশ্চয়ই জানেন নেপাল, চীনকে যতখানি মর্য্যাদা দেয়, ভয় করে তাহার শতগুণ। ইহার মূল কারণ চীনের প্রচণ্ড এবং ক্রমবর্দ্ধমান সামরিক-শক্তি। ইহাও সত্যকথা যে নেপাল ভারতকে খাতির দেখায় মাত্র ততটুকু, যতটুকু তাহার আর্থিক স্বার্থের কারণে প্রয়োজন।

বর্ত্তমান জগতে সামরিক দিক হইতে প্রবল না হইলে, কোন রাষ্ট্রের কোন প্রকৃত মর্য্যাদা অন্য কোন রাষ্ট্রের নিকট নাই। আদর্শের কথা বলিয়া, মানবিক নীতি প্রচার করিয়া ভারত অন্যকার বহু রাষ্ট্রের নিকট হইতে বহুত বহুত বাহবা পায়, কিন্তু ভারতের মর্য্যাদার আসন কোথাও আজ আর নাই। একথাও বোধহয় সত্য যে ভারত বর্ত্তমান বিশ্বে বন্ধুহীন। বিপদকালে কোন রাষ্ট্রই তাহার পাশে দাঁড়াইবে না. সাহায্য ত দূরের কথা। আমাদের রাষ্ট্রনেতারা 'রাষ্ট্রীয়-মর্য্যাদায়' বিদেশী রাষ্ট্রে ভ্রমণ করিতে পারেন, 'রাষ্ট্রীয়-ভোজে'ও অংশ গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু এই সবের দ্বারা ভারতের প্রকৃত মর্য্যাদা এক পাও অগ্রসর হইবে না।

রাষ্ট্রপতির নেপাল শুভেচ্ছা সফরের প্রথম পুরস্কার

ভারত এবং নেপালের মধ্যে 'চিরন্তন' মৈত্রী-বন্ধন 'চিরন্তনতর' করিয়া রাষ্ট্রপতি দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তনের পর অনতিবিলম্বে নেপাল সরকার ভারতে প্রস্তুত সিগারেট নেপালে বিক্রয় বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রায় পাঁচ কোটি টাকার ভারতীয় সিগারেট প্রতিবৎসর নেপালে রপ্তানী হইত, নেপাল সরকারের আদেশে এবার তাহা বন্ধ হইল। কারণস্বরূপ দেখানো হইয়াছে যে, রাশিয়ার সহায়তায় নির্ম্মিত এবং স্থাপিত নেপালের সিগারেট কারখানায় প্রস্তুত সিগারেটের বাজার বজায় রাখিতেই ভারতীয় সিগারেট আমদানী নেপালে নিষিদ্ধ হইল! খুবই ভাল কথা, কিন্তু এই সঙ্গে অন্য কোন বিদেশী সিগারেট, এমন কি পাকিস্তানের কারখানায় প্রস্তুত সিগারেটও নিষিদ্ধ করা হয় নাই! এ বিষয় ভারতই নেপালের সহিত তাহার 'চিরন্তন' মৈত্রীর প্রথম 'স্বীকৃতি' লাভ করিল! প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে নেপালের বাজারে চীনা মাল বন্যা স্রোতের মত প্রবেশ করিতেছে এবং তাহার বিরাট একটা অংশ চোরাপথে, কিন্তু নেপাল সরকারের জ্ঞাতসারেই ভারতের বাজারে আসিতেছে, যাহার ফলে ভারত প্রভূত পরিমাণে রাজস্ব খোয়াইতেছে! ভারতীয় সিগারেট আমদানী নেপালে কেন নিষিদ্ধ করা হইল, তাহার একটা অত্যন্ত ছেঁদো অজুহাত নেপাল দিয়েছে, কিন্তু এ-প্রয়াস শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার বৃথা প্রচেষ্টা মাত্র। আসল কথা ভারতের প্রতি নেপালের আন্তরিক কোন প্রকার মৈত্রী-ভাব এবং প্রীতিবন্ধন নাই, যতটুকু আছে তাহা নিতান্ত তাহা নিজ স্বার্থের তাগিদেই।"

ভারত সরকার নেপালে আমাদের গরীব প্রজাদের অর্থে ভাল ভাল পাকা সড়ক নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছে, অন্যদিকে চীনও নেপালে 'গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড' নির্ম্মাণ করিয়া নেপাল এবং চীনের সহিত পাকা সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করিতেছেন। চীন নির্ম্মিত এই সড়কের সহিত ভারতের নির্ম্মিত রাস্তার যোগাযোগ (Link) করিতে বা ঘটাইতে সময় লাগিবে খুবই কম। রাস্তা দুটি 'এক' হইয়া গেলে চীন হইতে ভারতে আগামী চীনা অভিযান চালাইতে সময় লাগিবে মাত্র দু'চার দিন! এই সড়ক দিয়া ভাবী এবং বৃহত্তম সামরিক যানবাহনাদি সহজেই চলাচল করিতে পারিবে। এমন অবস্থায় নেপাল চীনা অভিযানে বাধা

দিবে না, দিবার মত ক্ষমতাও তাহার নাই, কিন্তু ভারত 'পঞ্চশীলে বিশ্বাসী' এবং অন্য স্বাধীন রাজ্যের ভেতর দিয়া কিংবা ভিতরে গিয়া আক্রমণকারী শত্রু অভিযান প্রতিরোধ করিবার নীতিতে বিশ্বাস করে না বলিয়া ভারত সীমান্তে বসিয়া চীনা-চড় এবং পাক-পরিহাস পরিপাক করিতে বাধ্য হইবে!

নেপালের সহিত ভারতের গভীর প্রেম এবং চিরন্তন প্রীতির বন্ধন আর এক দিক দিয়া চীন-নেপাল প্রেমকেও গভীরতর করিতেছে। সংবাদে প্রকাশ উত্তরপ্রদেশ-নেপাল সীমান্ত দিয়া অহরহ ভারতীয় দ্রব্যসম্ভার, বিশেষ করিয়া চাউল এবং আটা ময়দা নেপালে পাচার হইয়া তারপর ঐ দ্রব্যাদি নেপাল হইতে চীনে চালান হইতেছে। এইসব মাল নিষিদ্ধ পণ্য, এমন কি কোন ব্যাপারী ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ বা রাজ্যেও কোন প্রকার খাদ্যশস্য পাঠাইতে পারে না, সরকারের হুকুম ছাড়া। বলা বাহুল্য ভারত হইতে নেপালে যে খাদ্য-শস্য পাঠাইতে হইতেছে, তাহা না কি উত্তর প্রদেশ পুলিশের জ্ঞাতসারে অফিসিয়ালী নহে, নন্-অফিসিয়ালী! এবং এই চোরা-কারবারে বেশ কিছু পাকা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করিয়া লইতেছে। ইহাতে দোষ দিবার কিছু নাই। আমাদের পুলিশও 'উপর মহলের' প্রদর্শিত পাকা সড়কে চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে! আশা করি এই প্রকার বহু ক্রিয়াকর্ম্মেই আমাদের 'রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা' বৃদ্ধি পাইতেছে প্রত্যহ!

সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্ম্মঘট—

সরকারী কর্ম্মচারীদের ন্যায্য দাবীদাওয়া অবশ্যই থাকিতে পারে এবং সেই দাবীদাওয়া আদায় করিবার ন্যায়সঙ্গত প্রথাপদ্ধতিও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু দেশের শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া, দেশের মানুষকে অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া সরকারী কর্ম্মচারীদের দাবী আদায়ের জবরদস্তি—যাহাকে বেআইন বলা অন্যায় হয় না—একমাত্র 'গণ'পন্থিয়া এবং অকর্ম্মা ঘোলাজলে মাছ ধরা রাজনৈতিক পার্টিগুলি ছাড়া আর কেহই বোধহয় সমর্থন করিতে পারে না। সরকারী কর্ম্মচারীরা যে বেতন পাইয়া থাকেন, তাহার অর্থ যোগায় দেশের সাধারণ জন, গরীব করদাতারাই, কাজেই সরকারী কর্ম্মচারীরা (এমন কি মন্ত্রী মহাশয়গণও) সাধারণের ভৃত্য ছাড়া আর কিছুই নহেন। কিন্তু ইহাদের ভাবভঙ্গী কার্য্যকলাপে, কথাবার্ত্তায় মনে হইবে ইঁহারা সকলেই আমাদের প্রভু এবং সকলেই একান্ত দয়াপরবশ হইয়া আমাদের কৃতার্থ করিতে সরকারী চাকুরী করিতে আসিয়াছেন। অতি সামান্য ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু এই ব্যতিক্রম সাগরবেলায় এক কণা বালির মতই!

সরকারী ব্যাঙ্কে, পোষ্টাপিসে, দপ্তরখানায়, রেলষ্টেশনে প্রভৃতি যে কোন প্রতিষ্ঠানে কোন জরুরী কাজের জন্য, এমন কি সরকারকে খাজনার টাকা জমা দিবার জন্য কোন সরকারী দপ্তরে গিয়া—মানুষের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, প্রয়োজন এবং গরজের তাগিদ মত সরকারী কর্ম্মচারী, পিওন পেয়াদার হাতে নগদ কিছু গুঁজিয়া দিতে না পারিলে, কাজ হইবে না, হইলেও, এক দিনের এক ঘন্টার কাজ করিতে সময় লাগিবে কম-পক্ষে পনের কুড়ি দিন। একথা সত্য কি মিথ্যা, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। আমরাও ভুক্তভোগী, আমরাও জানি, কেবল জানি নহে, হাড়ে হাড়ে জানি এবং প্রত্যহ জানিতেছি, আরো কতকাল এই ভাবে 'জানিতে' থাকিব, তাহা আমাদের ভাগ্যবিধাতাও বোধহয় বলিতে পারিবেন না!

সরকারী কর্ম্মচারীদের কাজের নমুনা দিতে হইলে অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতকেও ছাড়াইয়া যাইবে, কাজেই এ অসম্ভব প্রয়াস করিয়া লাভ নাই। এমন বহু সরকারী দপ্তরখানা আছে—যেখানে প্রয়োজনের তুলনায় কর্ম্মচারী সংখ্যা বহুগুণ বেশী, কাজেই প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই 'অতি সন্ন্যাসীর' জন্য সরকারী গাজন নষ্ট হইতেছে এবং এই অযথা অপচয়ের মূল্য দিতে হইতেছে দেশের সাধারণ মানুষকে। যে-সরকারী আপিসে লোক দরকার পঞ্চাশ, সেখানে কর্ম্মচারীর সংখ্যা অন্তত একশত, এবং তাহা সত্ত্বেও

দিনকার কাজ দিনে শেষ হয় না, কাইলে কাজ জমিয়া পাহাড় প্রমাণ হইতে থাকে! বর্ত্তমানের সরকারী আপিসে অফিসারদের পূর্ব্বকালের গৌরব নাই, তাঁহারা অধীনস্থ কর্ম্মী-কর্ম্মচারীদের অন্যায়, অপরাধ করিলেও বহুক্ষেত্রে কোন প্রতিবাদ কিংবা কর্ম্মীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ভয় পাইয়া থাকেন এবং ইহার ফলে বেয়াড়া কর্ম্মী-কর্ম্মচারীদের মধ্যে ক্রমশ 'ইন্সাবর্ডিনেশন্' এবং আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অমান্য করিবার প্রবণতা মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। সরকারী দপ্তরে এই অবস্থার আশু প্রতিকার একান্ত আবশ্যক। গত একদিনের ধর্ম্মঘটে যে-সকল সরকারী কর্ম্মচারী—বিবিধ কারণে ধৃত হইয়া হাজতবাস করেন, বিশেষ করিয়া যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী জোরজবরদস্তি করিয়া অন্যদের ধর্ম্মঘট পালনে বাধ্য করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে, এমন একদিন অচিরে আসিবে যখন সরকারী কর্ম্মচারীদের এবং তাঁহাদের ইউনিয়ন মাষ্টার মহাশয়গণই দেশের শাসন বা কুশাসন পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন! কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের কর্ত্তারা হুমকী দিয়া যদি তাহা কাজে পালন না করেন, তাহা হইলে সে হুমকী পরিহাস ছাড়া আর কি মনে হইবে?

সরকারী কর্ম্মচারীরা অপরাধ করিলে, তাঁহারা নিজেরা শাস্তিভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে নিরপরাধ পরিবারবর্গকেও অযথা অতল দুঃখ কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন—একথাটা মনে রাখিয়া কাজ করিলে ফল হয়ত ভালই হইবে।

কংগ্রেসী মোড়ল সম্মেলন!

কিছুদিন পূর্ব্বে গোয়াতে অল্ ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির মিটিং মহা সমারোহে ঢাকঢোল বাজাইয়া সম্পন্ন করা হইল। এই মহা সম্মেলনে উচ্চমার্গবিহারী কংগ্রেসী মোড়লরা আবার নূতন করিয়া গান্ধী নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মার আদর্শে ভারতকে গঠন করিবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবার উদাত্ত 'আহ্বান' জানান। বলা-বাহুল্য মহাত্মার আদর্শমত দেশ গঠনের মূল কাজটা করিবে সাধারণ কংগ্রেস কর্ম্মীরাই, কারণ কংগ্রেসী নেতাদের এ-দিকে সময় কম, দেশ শাসনের বৃহত ব্যাপার লইয়া তাঁহারা সদা ব্যস্ত—এবং এই দেশ-শাসন তথা গঠনের প্রধান অঙ্গই হইল দেশের একশ্রেণীর পাপাচারীকে পানা-শক্তি হইতে মুক্ত করা, কারণ মদ্যপান ত্যাগ করিতে বা করাইতে না পারিলে কোন দেশে যথার্থ গণতন্ত্র স্থাপিত তথা কার্য্যকরি ভাবে চালু হইতে পারে না!

বিশেষ একশ্রেণীর কংগ্রেসী নেতার মদ্যপান নিরোধ ব্যাপারে এত বিষম হাঁকডাক এবং আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলে জগতবাসীর মনে এই ধারণাই হইবে যে কংগ্রেসীরা মহাত্মার অন্যান্য সর্ব্ববিধ আদেশ নির্দ্দেশ এবং আদর্শ বাস্তবে সার্থক করিয়াছেন—যথা কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং সরকারী কোন কর্ম্মচারী মাসে পাঁচশত টাকার বেশী বেতন লইবেন না, তাঁহাদের জীবনধারণের মান হইবে দেশের সাধারণ মানুষের সমান, সর্ব্বপ্রকার বিলাসব্যসন বর্জ্জিত হইবে তাঁহাদের জীবন, তাঁহারা সদা সত্য কথা বলিবেন এবং সর্ব্ববিষয়ে আত্ম-স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জলা দেশ-সেবার আদর্শ মানুষকে দেখাইবেন নিজেদের ক্রিয়াকর্ম্মে এবং ব্যবহারে, খদ্দরকে মিটিং কা কাপড়া না করিয়া নিত্য এবং অবশ্য পরিধেয়রূপে ব্যবহার করিবেন অতি অবশ্যই—এবং এইপ্রকার আরো বহুবিধ মহাত্মা কথিত এবং প্রদর্শিত আদর্শ।

পরহিতগতপ্রাণ কংগ্রেসীনেতারা দেশের শাসনযন্ত্র করতলগত করিয়া—বিগত ২১ বৎসরে সাধারণ জনের সকলপ্রকার দুঃখদুর্দ্দশা এবং অভাব অনটন দূর করিয়া এইবার দেশবাসীর নৈতিক উন্নতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিয়াছেন, এবং সেই কারণেই সর্ব্বপ্রথম তাহাদের মদ্যপান-রূপ পরম পাপ হইতে মুক্তি দিবার জন্য আগামী সাত বৎসরের মধ্যেই দেশকে সম্পূর্ণরূপে মদ্যহীন করিবার সাধু সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু অদ্যাবধি আইন পাশ করিয়া কোন দেশ বা মানুষকে কোথাও পাপমুক্ত করা সম্ভব হয় নাই। আইন করিয়া

মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদী করা যায় না, চোরকেও সাধু করা যায় না, বরং ইহার উল্টাটাই বেশী দেখা যায়।

কংগ্রেসীনেতারা এখনো বোধহয় মনে করেন যে দেশ ১৯৪৮।৪৯ সালেই বসিয়া আছে এবং একমাত্র কংগ্রেসই দেশকে যখন যেমন ইচ্ছা এবং যে-দিকে ইচ্ছা চালাইবার 'মনোপলি' শক্তি রাখেন। একদা কংগ্রেসের হয়ত এই শক্তি ছিল, কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি একুশ বৎসরের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং বিবিধপ্রকার অন্যায় অবৈধ আচরণের ফলে বর্ত্তমানে কংগ্রেস সাধারণ একটা রাজনৈতিক দল ছাড়া আর কিছুই নহে এবং যে দলের প্রতি বর্ত্তমানে দেশবাসীর কোনপ্রকার সামান্য শ্রদ্ধাও নাই! গত নির্ব্বাচনে শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে আমাদের মনে হইয়াছিল, কংগ্রেস নেতাদের কিছু চেতনা এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের প্রায়-জড় মনে কিছু শুভবুদ্ধিরও উদয় হইবে কিন্তু অবস্থা দেখিয়া আমরা কংগ্রেস সম্পর্কে প্রায় আশাহীন হইয়াছি।

একথাও বলা প্রয়োজন যে দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কেও আমাদের মত একই প্রকার। তবুও বলা যায়—গতকালে কংগ্রেসের ছিল বহু শক্তি এবং বহুতর আদর্শ এবং কংগ্রেসী নেতাদের অন্তত কয়েকজনের মধ্যে আদর্শনিষ্ঠাও ছিল কম নহে. কিন্তু বর্ত্তমানে দেশে যে-সকল অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হইয়াছে বর্ষার পরে পথে প্রান্তরে আগাছার মত—সেই সব দলগুলির কোনপ্রকার 'বংশ'-পরিচয় নাই, নাই সেই সঙ্গে মান মর্য্যাদার কোন বালাই, এই দলগুলির বর্ত্তমানে একমাত্র উদ্দেশ্য .যে-কোন প্রকারে দলীয় এবং সেই সঙ্গে নেতাদের স্বার্থসিদ্ধি! ভবিষ্যত বলিতেও ইহাদের কিছুই নাই, থাকিতেও পারে না! দেশকে যেমন এই দলগুলি নিজেদের কাজ গুছাইবার একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই মনে করে না, তেমনি দেশে এবং দেশের মানুষও এই দলগুলিকে রাজনৈতিক স্ক্যাভেঞ্জার (Scavenger) গাড়ী ছাড়া আর কিছুই ভাবে না। মশা, মাছি, ছুঁচো, ইঁদুর প্রভৃতি জীবদের অত্যাচার যেমন আমাদের বাধ্য হইয়া গা-সহা করিতে হয়, বর্ত্তমানে রাজনৈতিক দলগুলিকেও বিশেষ করিয়া এই পোড়া রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে, মানুষকে এখনও আর কতকাল সহ্য করিতে হইবে, একমাত্র দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা জনগণই তাহা বলিতে, স্থির করিতে পারে। আগামী নির্ব্বাচনে যে-দলই ক্ষমতা অধিকার করুক আমাদের পশ্চিবঙ্গের ভাগ্যের কোন পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবুও আশা করিব এ-রাজ্যের ভোটদাতারা নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োগ করিয়া নিজেদের ভোট প্রয়োগ করিবেন। সব দলই যখন সমান—সে-ক্ষেত্রে 'মন্দের ভাল কে' নির্ব্বাচন করা শ্রেয়। সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় কাজ হইবে ভোট না দিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন চালু রাখা।

———

'প্রকাণ্ড' জ্ঞানীদের মধ্যে একজনের সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান!

মদ্যপান নিরোধ সময় সীমা বাঁধিয়া দিবার প্রস্তাব সম্পর্কে তামিলনাদের জনৈক এ-আই-সি-সি সদস্য মন্তব্য করিয়াছেন "সাত হাজার বছরেও ভারতে সম্পূর্ণ মাদকদ্রব্য বর্জ্জন করা সম্ভব হইবে না!" এই সদস্য মহাশয়ের মন্তব্যে এ-আই-সি-সি মহলে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহা প্রকাশ পায় নাই, বিশেষ পাঁড় অ-মদ্যপ শ্রীমোরারজী দেশাইএর প্রতি মন্তব্য জানিতে পারিলে দেশবাসী কৃতার্থ হইত। এই পরম উদ্ধত এবং আত্মবিদ্যাবুদ্ধিতে অতি-বিশ্বাসী ব্যক্তিটির বোলচাল গত কিছুকাল হইতে কিঞ্চিৎ স্তিমিত মনে হইতেছে, খুব সম্ভবত তিনি আমাদের পরীক্ষা করিতেছেন, হাত সামান্য ঢিলা করিয়া, কিন্তু যখনই দেখিবেন দেশের লোক সকল বিষয়ে ভুল করিতেছে এবং ভাবিতেছে মোরারজী দেশাই নিদ্রিত, সেই মুহূর্ত্তেই এই কেশরহীন পুরুষসিংহ পরম প্রাজ্ঞ কংগ্রেসীনেতা কঠোর-হস্তে শাসন-রথের সারথীর পদ গ্রহণ করিবেন চাবুক হাতে লইয়া এবং দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিবেন [illegible]

বেশ ভালভাবেই বাঁচিয়া আছেন এবং প্রয়োজনমত দেশবাসীর অশক্ত পৃষ্ঠে হান্টার চালাইবার ক্ষমতাও তাঁহার লোপ পায় নাই! তিনি হয়ত ইহাও দেখাইয়া দিবেন—মদ্য বর্জ্জন করাইতে তাঁহার মত প্রায় সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্ব-বিদ্যাধর ব্যক্তির পক্ষে—সাত বৎসর নহে, সাত দিনই যথেষ্ট সময়! আমরা মোরারজী সাহেবের নূতন দৃপ্ত ঘোষণার সঙ্গে, দেশের মদের ভাঁটী এবং দোকানগুলিকে রামায়ণবর্ণিত মহাবীরের মত তিনি পিঠে লইয়া সমুদ্র-পারের কোন নির্জ্জন দ্বীপে একলম্ফে মহাপ্রয়াণ করিবেন! অহো! সে কি অপূর্ব্ব রামায়ণী দৃশ্য এবং কাণ্ডের পুনরভিনয় হইবে কলিযুগে!

দেখা যাইতেছে—বিপদকালে মহানেতাদের বোকামীও 'মহাবোকামীর' রূপ পরিগ্রহ করে!

বাঙ্গলা দেশ, বাঙ্গালী ও বন্যাত্রাণ—

উত্তরবঙ্গের মহাবন্যার ফলে অগণিত ব্যক্তি হারাইয়াছে প্রাণ, অগুন্তি মানুষ সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া হইয়াছে পথের ভিখারী। লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধবনিতা আজ কোনরকমে দেহে প্রাণটুকুমাত্র ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে। তাহাদের আশ্রয় নাই, আহার নাই, রোগে ঔষধ নাই, শীতে দেহ-রক্ষা করিবার মত সামান্য বসনও অনেকেরই নাই। বন্যার প্রলয়লীলার সংবাদ বাহির হইবার পর কলিকাতার জনগণমধ্যে সামান্য সাড়া জাগিয়াছিল দুর্গতের দুঃখত্রাণে কিন্তু যে সকল রাজনৈতিক দল এবং দল-নেতারা সাধারণ মানুষের দুঃখ-অভাবের কারণে সবাই চোখের জল ফেলেন, তাঁহারা সরকারী সাহায্যের অপ্রতুলতার বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনার বুলি এবং রাজ্যপাল শ্রীধর্ম্মবীরের শত-মুখে নিন্দা প্রচার ছাড়া আর কাজের কাজ কি করিয়াছেন বা করিতেছেন? বন্যার্ত্তদের সাহায্য করিবার অছিলায় গিয়া নির্ব্বাচনী প্রচারের সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত হওয়াটাই তাঁহাদের প্রধান অভিযোগ এবং পরম আপশোষের কারণ! কোন দলকেই দেখিলাম না বন্যার্ত্তদের জন্য অর্থ সংগ্র বাহির হইতে, এমন কি গণপতিরাও—বাক্যেই জনগণে প্রতি তাঁহাদের দরদের দায় সারিলেন! রাজ্যপ অবাঙ্গালী ধর্ম্মবীর বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর প্রতি যে দর যে কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় দিয়াছেন এবং এখনও দিতেছে কোন দলীয়নেতা তাহার জন্য সামান্য একটা প্রশংসাবাণী তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বাহির করিতে কুণ্ঠা বোধ করিলেন—নিজেরা কিছু করিব না, অপরে কিছু করিলে, তাহাে ত্রুটি কি হইল ইহাই ফলাও করিয়া প্রচার করা এ ভক্তদের নিকট হইতে সহজ বাহবা লাভই বোধহয় এ শ্রেণী দেশদরদী নেতাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য!

বামপন্থী নেতাদের এবং তাঁহাদের অতিভক্ত চেলাদে বিচিত্র ক্রিয়াকর্ম্মবিষয়ে নূতন বলিবার বিশেষ কিছু নাই সর্ব্ববিষয়ে একটা হৈ-হল্লার সৃষ্টি করিয়াই ইহারা দে-সেবার চরম উৎকর্ষসাধন তথা প্রদর্শন করিতে অতি উৎসাহী। কিছুদিন পূর্ব্বে বিশ্বব্যাঙ্ক-প্রেসিডেণ্ট মি ম্যাক্‌নামারা কলিকাতায় আসেন, বিলাসভ্রমণে নহে কলিকাতার বর্ত্তমান দুর্দ্দশা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া কলিকাতাকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতে পারে, তাহার একটা মোটামুটি অঙ্ক স্থির করিবার জন্যই। মিঃ ম্যাক্‌নামারার ভীষণ অপরাধ তিনি মার্কিণী নাগরিক এবং অতীতকালে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা-সচিব ছিলেন, কিন্তু সে যাহাই হউক এই ভদ্রলোক কলিকাতায় আসেন তাঁহার নিজের গরজে নহে, গরজটা একান্তভাবে আমাদেরই, কিন্তু সব কিছু জানিয়া এবং বুঝিয়াও, কলিকাতার বামপন্থীনেতারা কিছু-সংখ্যক ছাত্রকে (?) মিঃ ম্যাক্‌নামারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাইবার জন্য প্ররোচিত করিলেন কেন? এবং যাহার ফলে কিছু ট্রামগাড়ী এবং ষ্টেট্‌বাস পুড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অন্তবহুজনের, বিশেষ করিয়া কলেজ স্কোয়ার অঞ্চলে বহু দরিদ্র উদ্বাস্তু হকারের পণ্যসামগ্রী পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল! এই বিক্ষোভের ফলে মিঃ ম্যাক্‌নামারার কিংবা বিশ্বব্যাঙ্কের কি ক্ষতি হইল, সামান্য বুদ্ধি আমরা তাহা

বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতা আজ মরিতে বসিয়াছে এবং অচিরে এই একদা-মহানগরীর বিবিধ সমস্যার সমাধান না হইলে, কেবল কলিকাতা নহে, হয়ত বাঙালীরও সব কিছু লোপ পাইবে। অবশ্য একথা সত্য যে বর্ত্তমানে বাঙলা ও বাঙালীর শ্রেয়, মহৎ যাহা কিছু ছিল, গিয়াছে প্রায় সবই, অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহা অতি সামান্য! আমরা জানি মিঃ ম্যাকনামারার প্রতি এই অশিষ্ট, অহেতুক এবং অন্যায় আচরণের সহিত শতকরা নব্বুই জন বাঙালীর কোন যোগ এবং সমর্থন নাই, কিন্তু তাহা সত্বেও ইহার লজ্জা এবং কলঙ্ক (শাস্তিও হয়ত হইবে) বাঙালীকেই ভোগ করিতে হইবে।

বিগত কালে কলিকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দ্বিতীয় মহানগরী ছিল—লণ্ডনের পরই ছিল কলিকাতার স্থান। বর্ত্তমানে কলিকাতার স্থান (আয়তন এবং লোক সংখ্যার দিক হইতে) বোধ হয় লণ্ডন, নিউইয়র্ক এবং টোকিওর পরেই, অর্থাৎ কলিকাতা পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম নগরী। তবে জঞ্জাল-নগরী হিসাবে কলিকাতা বোধহয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। ১৯৬২ সালে জবাহরলাল বলেন যে "কলিকাতা ভারতের বৃহত্তম শহর এবং কলিকাতার সমস্যা একটা জাতীয় সমস্যা, ইহা কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গেরই নহে, এবং এই হিসাবেই কলিকাতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিয়া আমাদের কলিকাতার সকল সমস্যার আশু সমাধান প্রচেষ্টা করিতে হইবে। কলিকাতা যদি ধ্বংস হইয়া যায়, তাহা হইবে একটা বিরাট জাতীয় শোকাবহ ঘটনা।" কিন্তু ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী এবং জাতীয় নেতার কলিকাতার প্রতি গভীর এই দরদ, আজ পর্য্যন্ত বাক্যেই রহিয়া গিয়াছে। নেহরুর আমলে কিছু হয় নাই। নেহরুর পরেও আজ যে সকল চতুর্থ শ্রেণীর কেন্দ্রীয় নেতা দেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহাদের ত কলিকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গ-রূপ কলোনীর প্রতি দৃষ্টি দিবার সময়ও নাই, ক্ষমতাও নাই, বাঙালীর প্রতি বর্ত্তমান ভারত-কর্ত্তাদের কথা না বলাই ভাল। অথচ এই কলিকাতা বন্দর হইতে বৎসরে ভারতের শতকরা ৪২ ভাগ রফতানী হয়, আমদানীর পরিমাণ ভারতের শতকরা ২৫ ভাগ। ভারতের মোট শিল্পজাত সামগ্রীর শতকরা ১৫।২০ শতাংশ উৎপন্ন হয় কলিকাতা এবং কলিকাতার সন্নিকট কলকারখানা হইতেই। ভারতের মোট ব্যাঙ্ক ক্লিয়ারেন্সের (Bank Clearance) শতকরা ৩০ ভাগ হয় এই মরণোন্মুখ কলিকাতাতেই। কলিকাতা হইতে আয়কর বাবদ আয়কর এবং চা-পাট হইতে বিদেশী মুদ্রার অর্জ্জন ভারতের মোট অর্জ্জনের প্রায় ৬০ শতাংশ হইলেও কলিকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ ইহার একটা নামমাত্র অংশ কেন্দ্র হইতে দয়ার দান হিসাবে পাইয়া থাকে। প্রাপ্য অপেক্ষা বহুগুণ বেশী কেন্দ্র মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, গুজরাট, মহীশূর রাজ্যগুলিকে দিয়া থাকেন। কেন্দ্র কর্ত্তৃক নিয়োজিত অর্থ-কমিশন বরাবর পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচার করিয়া আসিতেছে, এ-বিষয় বোম্বাই তথা মহারাষ্ট্র আমাদের অপেক্ষা বহুগুণ ভাগ্যবান। অধিক বলিয়া লাভ নাই, তাহা হইবে অরণ্যে রোদন মাত্র। কিন্তু বামপন্থী নেতাদের পশ্চিমবঙ্গের জীবন-মরণ সমস্যা এবং তাহার সমাধানের প্রতি দৃষ্টি দিবার সময় নাই, কোন প্রয়োজনও তাহারা এ-বিষয়ে মনে করেন না!

বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্টের প্রতি বিক্ষোভ প্রদর্শন করাইতে বামপন্থী নেতারা নিজেরা আড়ালে থাকিয়া একদল অপরিণতবয়স্ক এবং অল্পবুদ্ধি ছাত্রকে লেলাইয়া দিতে কোন দ্বিধা সঙ্কোচ বোধ করিলেন না, ইহার দ্বারা তাঁহারা নাকি মার্কিণ ভিয়েৎনাম নীতির সজোরে প্রতিবাদ জানাইলেন দেশের স্বার্থকে জবাই করিয়া। এই অযথা হল্লা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নেতারা নাকি ডিমোক্র্যাসির সমর্থক, তাই জনগণের গণতন্ত্র বিরোধী কোন কার্যকলাপ সমর্থন করেন না, কিন্তু ভাবিতে অবাক লাগে, চেকোস্লোভিয়ার জনগণের উপর যখন নিষ্ঠুর রুশী ঘুসা পড়িল, এই গণতন্ত্র ধ্বজাধারী গণদেবতারা তখন সোভিয়েটের অন্যায় জবরদস্তির বিরুদ্ধে একটি কথা বলারও অবকাশ

পাইলেন না! চেকোস্লোভাকিয়ার উপর হামলা চালাইয়া সোভিয়েট রাশিয়া প্রমাণ করিল, চীনের সহিত তাহাদের তফাৎ কিছুই নাই। চীনকে তবু বুঝা যায়, কারণ চীনাদের মুখে কোন প্রকার অথবা নীতিবাক্য শোনা যায় না, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার নেতারা বাক্যে যাহা বলেন, নিজের স্বার্থের প্রয়োজনে কাজে তাহার উল্টাই করেন এবং অযথা ফাঁকা নীতির বুলী ছাড়িয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে কোনপ্রকার দ্বিধা বোধও করেন না! বাজপাখীকে পায়রার রূপ দিয়া নিরীহ পক্ষী বধের টেক্‌নিক্ এই রুশী নেতারা ভালই শিখিয়াছেন! কিন্তু আমাদের এই পোড়া দেশের বামপন্থীনেতারা দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া আর কতকাল তাঁহাদের আদর্শ 'পিতৃভূমি' রাশিয়া এবং 'মাতৃভূমি' চীনের প্রতি এত শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইবেন?

আমার কথা, দেশের জনগণের মধ্যে কিছু বাস্তব চেতনার উদ্রেক হইয়াছে এবং সামান্য হইলেও এই শুভ চেতনার কিছু বাস্তব পরিচয় আগামী নির্বাচনে আমরা দেখিতে পাইব এমন একটা অসম্ভব আশাও আমাদের মনে জাগিতেছে।

প্রেম

(গল্প)

সমর বসু

অফিসে ঢুকেই দেখি দক্ষিণদিকের নীলপর্দায় ঢাকা জানালার ধারে ব'সে গালে হাত দিয়ে তনিমা কি যেন ভাবছে। অন্যদিন এ-সময় একমনে কাজ করে। সবার আগে আসে তনিমা। এসেই কাজে ব'সে যায়। আজ কিন্তু কাজ না ক'রে গম্ভীরভাবে কী যেন ভাবছে!

অফিসে যে ক'জন মেয়ে আছে তার মধ্যে তনিমাকেই আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে। কেননা তনিমা আরসব মেয়েদের মত সযত্নলালিত আবরণের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখেনা। অন্যান্য ছেলে-বন্ধুদের মত তনিমাও খোলা মন নিয়ে আমাদের সকলকার সঙ্গে গাল-গল্প করে। সংসারের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের কথা জানায়।

এ-অফিসে ঢোকবার অনেক আগে থেকেই তনিমাকে আমি চিনতাম। ওর সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। আমি যে-বছর চাকরিতে ঢুকি, সেই বছরই বোধহয় তনিমা ইন্টারমিডিয়েট পাশ ক'রে আমাদের কলেজে বি. এ. পড়তে আসে। অধ্যাপক দাশগুপ্তের বাড়িতেই ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

সরকারী অফিসে চাকরি পেয়ে যাওয়ার শুভখবরটা জানিয়ে মাষ্টারমশাইকে প্রণাম ক'রে আমি যখন বাড়ি ফিরবো ব'লে উঠে প'ড়েছি, ঠিক সেই সময় তনিমা এল।

মাষ্টারমশাই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তনিমা জানল,—আমি তার মাষ্টারমশায়ের একজন প্রিয় প্রাক্তন ছাত্র; আর আমি জানলাম,—তনিমা মাষ্টারমশায়ের অসংখ্য ছাত্রীর মধ্যে যে-কোনও একজন নয়, বিশেষ একজন।

আমার সেই প্রথমদিনের জানা যে, কত সত্য পরে তা' প্রমাণিত হ'য়েছিল।

বি. এ পরীক্ষা দেবার আগেই তনিমার বিয়ে হল।

ক্ষণকালের ছাত্রী, চিরকালের ঘরনী হ'য়ে এল অধ্যাপকের ঘরে।

সে-সব দিনের কথা এখনও মাঝে মাঝে আলোচনা হয়। অন্য কারও সঙ্গে নয়, শুধু আমার সঙ্গে।

ওদের বিয়েটা আমি ঠিক সহজ মনে মেনে নিতে পারিনি। না-পারার কারণও ছিল। প্রথম কারণ ওদের বয়সের ব্যবধান। দ্বিতীয় কারণ, আমার যতদূর মনে পড়ে সে-সময় মাষ্টারমশায়ের কি একটা অসুখ ছিল, ডাক্তারের বোধহয় উপদেশ ছিল যেন তিনি বিয়ে না করেন।

তা সত্ত্বেও তনিমা কেন ওঁকে বিয়ে করল, সে-কথাও একদিন ওকে জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম।

তনিমা বলেছিল,—কে তাহলে ওঁকে দেখত? আত্মীয়-স্বজন কেউতো কোনও খবরই নিতনা। তাই আমি ঠিক করলাম, সারাজীবন ওঁর সাঙ্গিনী হয়ে ওঁর সাধনাকে সার্থক ক'রে তুলবো। একটু সেবা যত্ন, ঠিক সময় আহার, বিশ্রাম পেলে উনি নিশ্চয়ই সুস্থ হ'য়ে উঠবেন। বিয়ে না ক'রে চব্বিশ ঘণ্টা ওঁর সঙ্গে ঐ ঘরে

[illegible]

করতেন। ওঁর জন্যে যে-কোনও ত্যাগ-স্বীকার করবার মত মনের জোর সেদিন আমার ছিল। তখন আমার মনে হত, ওঁর বিপুল সার্থকতার আড়ালে আমি যদি কোথাও হারিয়েও যাই, সে-হারিয়ে যাওয়াতেও আনন্দ আছে, সুখ আছে, তৃপ্তি আছে। তাই ওঁকে আমি বিয়ে করি।

তারপর মাষ্টারমশাই ক্রমশঃ আরও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলেজ থেকে ছুটি নিতে হল। দীর্ঘদিনের অবকাশ। কিন্তু তাতেও রোগের উপশম হ'লনা।

কলেজের চাকরী গেল।

তখন তনিমাকে বেরুতে হল পথে। চাকরীর সন্ধানে। নইলে দুজনের গ্রাসাচ্ছাদন চলবে কি করে।

প্রায় বছর সাতেক হল এই অফিসেই চাকরী করছে তনিমা।

গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় ওর মনের মধ্যে এখন আর শান্তি নেই। মুখে-চোখে যে-অবসাদের ছায়া, সেটা শুধু বয়সের ছাপ নয়। মনের মধ্যে প্রতি নিয়ত যে লড়াই চলছে, তারই করুণ অভিব্যক্তি।

আমি কিছুটা জানি তাই অনুমান করতে পারি, মনের দিক থেকে তনিমা ঠিক সুস্থ নয়। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তনিমাই বলেছিল—আর পারছিনা।

আমি কৌতূহলী হ'য়ে তাকালাম ওর দিকে।

তনিমা বলল, সংসারের একদিকটা নিয়েই এতদিনে ভুলেছিলাম, অন্তদিকটার কোনও খবরও রাখতাম না। তাই এই দুঃসহ ক্লান্তি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কি হয়েছে, মাষ্টারমশাই কেমন আছেন?

—কতদিন যাননি আপনি!

—তা প্রায় বছরখানেক হল।

তনিমা ম্লান হেসে বলল, ঘর নয় তো যেন পিঁজরা-পোল, কাউকে যেতে বলতেও ইচ্ছে করেনা।

—বলতে হবে কেন! আমার নিজের থেকেই যাওয়া উচিত। ও-ঘরের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের।

তনিমা অবসন্ন চোখে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আমি বুঝতে পারলাম,—রাজ্যের আবর্জনায় ঠাসা ছোট্ট ঘরখানার কথাই ভাবছে তনিমা। ঘরজোড়া তক্তপোষ, তক্তপোষ জোড়া বিছানা। ছেঁড়া তোষক, ময়লা চাদর, তেলচিটচিটে বালিশ। সেই বিছানায় শুয়ে আছেন তনিমার রুগ্ন স্বামী। ভূতপূর্ব অধ্যাপক, শ্রীঅমিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত।

কাঠের আনলায় ছেঁড়া ছেঁড়া জামাকাপড়ের স্তূপ। দড়ির আনলায় ঝুলছে তনিমার শাড়ি-শায়া ব্লাউজ-বডিস্। ঘরের বদ্ধবাতাস গরম বলেই কাপড়-জামা-গুলো শুকিয়ে যাবে। না গেলে সারারাত ঐখানেই টাঙানো থাকবে। যেতে আসতে গায়ে লাগলে গুটিয়ে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হবে।

শার্সীভাঙা আলমারীর মধ্যে ধুলোর পর্দা-ঢাকা রাশি রাশি মোটামোটা বই। ভাঙা ট্রাঙ্ক! এককোণে ছোট্ট একটা টিপয়, তার ওপর ছোট বড় নানারকমের ওষুধের শিশি। তার পাশে টিকটিক করছে একটা পুরোণ আমলের বিবর্ণ-ডায়াল টাইম্‌পিস।

মাথার কাছের জানালাটা সবসময় বন্ধ। তাই ভ্যাপসা গন্ধটা ঘরের মধ্যেই পাক খায়। বেরুবার পথ খুঁজে পায় না। বাইরের থেকে ঘরের মধ্যে এলেই গা গুলিয়ে ওঠে।

অথচ এই ঘর, এই পরিবেশ একদিন মুগ্ধ করেছিল তনিমাকে।

তনিমা বলত,—ওঁকে এইখানেই মানায়। রাজার প্রাসাদে নয়, দরিদ্রের কুটিরে নয়; ধ্যানমৌন এই তপোবনে।

অনেকক্ষণ ওকে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে দেখে

জিজ্ঞেস করলাম, কই বললেনা তো, মাষ্টারমশাই কেমন আছেন!

তনিমা ম্লান হেসে বলল,—ওঁর থাকার আর ভাল-মন্দ কি! বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

নির্ব্বাক-বিস্ময়ে আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। যে-কথাটা বললাম না, বা বলতে পারলামনা, সেই কথাগুলোই আমার সমস্ত চেতনায় ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠল।

তনিমা সুখী নয়; স্বামীর কাছ থেকে যা পেয়েছে তাতে ওর মন ভ'রেনি। এবং আর কিছু পাবার আশা নেই বলেই তনিমার এই গভীর হতাশা।

তনিমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম না। এমন কোনও কথাও আমি বলতে পারলাম না যা শুনে সাময়িকভাবেও ওর ভারাক্রান্ত মনটা হাল্কা হ'তে পারে। আমি জানি ওর ব্যথা যেখানে, সেখানে আমার কিছু করার নেই।

তনিমা আমার সহকর্ম্মীবন্ধু। কিন্তু বন্ধুনী নয়; আমার শিক্ষকের স্ত্রী। স্বামী-সুখবঞ্চিতা তরুণীর উপর যে-কোনও পুরুষের যে সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবে জাগে, তনিমার জন্তে সে-সহানুভূতি আমার জাগেনি। আমি তাই আর কোনও কথা না ব'লে ওর পাশ থেকে নিঃশব্দে উঠে এসেছিলাম।

সেদিনের মত আজও তনিমা গালে হাত দিয়ে ভাবছে। দক্ষিণের জানালা দিয়ে হু হু করে হাওয়া আসছে। রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে গেল। টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ। তনিমা তবুও নির্ব্বিকার।

সই ক'রেই তনিমার পাশে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। কিছুমাত্র ভূমিকা না ক'রেই জিজ্ঞেস করলাম,—মাষ্টারমশায় কেমন আছেন? তোমাকে আজ ভারী ক্লান্ত লাগছে। রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি!

আমার কথার জবাব না দিয়ে তনিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—সারাজীবন বঞ্চনা, অবজ্ঞা, অবহেলা পাবার জন্তেই কী আমি ওঁকে বিয়ে করেছিলাম!

আমি অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়েই রইলাম। কোনও মন্তব্য করলাম না।

তনিমা বলতে লাগল, যার জন্তে আমি উদয়াস্ত পরিশ্রম করছি, তার কাছ থেকে তো কিছুই পাওয়া যাবে না কোনও দিন। ডাক্তারের কঠোর নির্দ্দেশ। শুধু কি তাই, এখন যদি আপনি ওঁকে দেখেন, দেখবেন কী বীভৎস হয়ে গেছেন। চোখ দুটো সাপের মত ক্রুর! ঘাড় কাত ক'রে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। টাইমপিস্‌টার সঙ্গে সময় মিলিয়ে নিয়ে ঘড়্‌ঘড়ে গলায় জিজ্ঞেস করেন,—ফিরতে এত দেরি হল কেন! ঝক্‌ঝকে শাড়ী, চক্‌চকে শরীর, চোখে কাজল,—কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল।—এ-সব কথা শুনেও আমি কিছু বলিনা। চুপ করে থাকি! মুখ বুজে সব সহ্য করি। কোনওদিন এতটুকু প্রতিবাদও করিনি। আর তাইতেই বোধহয় সাহস পেয়ে গেছলেন। তাই আজকে এমনভাবে আমায় অপমান করলেন।

কান্নায় টলটল্ ক'রে উঠল চোখ দুটো!—তবুও থামলনা তনিমা! বাষ্প-রুদ্ধ গলায় বলল, আজ আমাকে কি বলেছে জানেন,—পাশের বাড়ির চাকরটাকে যখন তখন ডাকা হয় কেন! ওই বকে যাওয়া ছোঁড়ার সঙ্গে কি অত ফিস্ ফিস্ কথা! বলতে বলতে তনিমা তার মুক্তোর মত দাঁত দিয়ে বিবর্ণ ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরল।

পাশের ফ্ল্যাটের চাকর রামলালই তনিমার ফাই-ফরমাস খাটে। ওর ভরসাতেই রুগ্নস্বামীকে ঘরে একলা রেখে অফিস আসতে পারে। নইলে কে-ই বা তাঁকে দেখত। এ-সব খবর আমার কিছুই অজানা নয়। তাই তনিমাকে আশ্বস্ত করে বললাম,—অসুখে ভুগে ভুগে ওঁর মনটা ঐ রকম হয়ে গেছে,—তার জন্তে তুমি কিন্তু রাগ করে কিছু করে বসোনা যেন!

—না, আমরা যে পৃথিবীর জাত। আমাদের সব সইতে হবে। কিন্তু আমি আর পারছি না।

—কি করবে তাহলে?—আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—স্বামীকে অস্বীকার করব। দৃঢ় গলায় উত্তর দিল তনিমা।

আমি বুঝতে পারলাম অনেক ভেবেই তবে তনিমা তার মনস্থির করেছে। তবুও আমি বিস্ময়প্রকাশ করে বললাম,—সে কি! তোমার স্বামী রুগ্ন, তুমি জান ত্রি-সংসারে তাঁর তেমন কোনও আত্মীয় নেই যে তাঁকে দেখবে। তুমি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। তুমি স্বেচ্ছায় তাঁর সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছ; তাহলে এ-কথা আজ তুমি কি করে বলছ, যে, তুমি তাকে অস্বীকার করবে!

—হ্যাঁ, এ-ছাড়া আমার অন্য কোনও রাস্তা নেই।

আমি ধীরভাবে বললাম,—মাষ্টারমশাই যদি তাঁর ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, যে, তোমার মধ্যে যে চিরকালের মেয়েটা রয়েছে, তুমি কি তার মত নিয়েছ?

একটুও ইতঃস্তত না করে তনিমা বলল, মাষ্টার-মশায়ের প্রশ্নের উত্তরে তাঁর ছাত্রী বলবে,—চিরকালের যে মেয়েটা আমার মধ্যে রয়েছে আপনি কি তার কোনও সন্ধান দিয়েছেন! সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে, সে-খবরও কি কোনও দিন নিয়েছেন?

—তখন মাষ্টারমশাই হয়তো বলবেন,—তুমি তো জান যে, তুমি আর কুমারী নও। তাহলে তোমাকে নিয়ে তুমি থাকবে কি করে।

—পৃথিবীটা আপনার এই ছোট্ট ঘরটার মত নয়।—দাঁতে দাঁত চেপে ছাত্রী তার উত্তর দেবে। এই ঘরে দমবন্ধ হয়ে আমি মরতে পারবো না। না, না, কিছুতেই না।

—তা হলে তুমি কি করতে চাও তনিমা। আমি অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করলাম।

—আমি ওকে ডিভোর্স করে অন্য কাউকে বিয়ে করতে চাই। মৃত্যুর সাধনায় আমি ওঁর সঙ্গী হতে পারবোনা। আমি জীবনকে ভালবাসি, বোধহয় একটু বেশী ভালবাসি। আজই আমি ওঁকে সব কথা জানাবো।

—উনি তো আর বেশীদিন বাঁচবেন না,—(বলার ইচ্ছা না থাকলেও কথাগুলো বলে ফেললাম)—তারপর যা খুশি ক'রো। এত তাড়াতাড়ি কিসের?

তনিমা চুপ করে রইল।

—আজ আমি তোমাদের বাসায় যাবো।—বলতে বলতে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

—কখন? তনিমা যেন একটু খুশী হয়েই জিজ্ঞেস করল।

—ছুটির পর। তোমার সঙ্গেই। বলেই আমি নিজের সেক্‌শনে চলে এলাম।

বাসায় এসে আমরা দুজনেই অবাক হয়ে দেখলাম—ঘরের দরজা খোলা অথচ বিছানায় মাষ্টারমশাই নেই।

তনিমা তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেল। তারপর তর তর করে নেমে গেল নিচে। সিঁড়ির মুখে রামলালের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে আর্তস্বরে জিজ্ঞেস করল, এই বাঁদর, বাবু কোথায়?

জানিনাতো!

—জানিসনাতো দেখছিস কি? আছিস কিসের জন্যে?

হাঁপাতে হাঁপাতে আবার ওপরে উঠে এল তনিমা!

—উনিতো বাইরে কোথাও বেরোন না। আর সে-শক্তিও তাঁর নেই। তাহলে ঐ শরীর নিয়ে গেলেন কোথায়!

গভীর হতাশায় তনিমা একেবারে ভেঙে পড়ল।

আমিও বোকার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করব ভেবেই পেলাম না।

আমাদের মনের উদ্বেগে ঘরের স্তব্ধ আকাশ থমথম করতে লাগল।

শূন্য শয্যার দিকে চেয়ে তনিমা স্থির হয়ে বসে রইল।

—বাঃ, বেশ চমৎকার লেখা হয়েছে। বলতে বলতে ওপাশের বারান্দা থেকে ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন মাষ্টার-মশাই। হাতে একটা পত্রিকা।

আমরা দুজনেই চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকালাম।

আমাকে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন,—এই যে তুমিও এসে পড়েছ ; তোমরা কেউ পারলে না। অথচ তনু, তোমাদের চেয়ে কত জুনিয়র, কি সুন্দর একটা প্রবন্ধ লিখেছে। এই নাও দেখ। আমার শিক্ষা এতদিনে সার্থক হল।

আমার হাতে পত্রিকাটা দিয়ে আকুল আগ্রহ নিয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলেন মাষ্টারমশাই।

—কিন্তু আপনি ঐ বারান্দায় গেলেন কি করে? আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—তনুর লেখাটা পড়তে পড়তে কেমন যেন উৎসাহিত বোধ করলাম। পত্রিকাটা হাতে নিয়েই উঠে দাঁড়ালাম। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ঐ দিকে চলে গেলাম। অবশ্য ওদিকটা আমাদের একেবারে নয়। কতদিন পরে বাইরের আলো দেখলাম। মন ভরে গেল। তনুর লেখাটা যেন সঞ্জীবনীসুধা।

তনিমা মুগ্ধ বিস্ময়ে পত্রিকাটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বলল, কখন এল ওটা।

—এই কিছুক্ষণ আগে। পিয়ন দিয়ে গেল। বেশ সুন্দর লিখেছ। এমন সুন্দর তোমার হাত, তা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলে কেন?

মাষ্টারমশায়ের চোখ দুটোতে নতুন জীবনের আশ্বাস যেন ঝলমল করে উঠল।

লেখাটা বার করে আমি তনিমার মুখের দিকে তাকালাম। দেখলাম সেখানেও সেই দীপ্তি।

মৃদু হেসে তনিমা আমায় বলল, আপনি ওঁর সঙ্গে গল্প করুন, আমি এক্ষুনি চা করে নিয়ে আসছি।

মাষ্টারমশাই বললেন, শুধু চা কেন। ষ্টোভটা জ্বেলে দুখানা পরোটা করে দাওনা।

একটু থেমে বললেন, আমাকেও একখানা দিও। আমিই হলাম তোমার লেখার প্রথম পাঠক।

তনিমা ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল মাষ্টারমশাই তার দিকে চেয়ে হাসছেন।

তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা মাথায় তুলে দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল তনিমা।

শুভরাত্রি

করুণাময় বসু

সময়ের বালুতটে আজিকার রাত্রি-নদীটুক
তরঙ্গিয়া বয়ে যায় ভীরুক্লান্ত নিঃশব্দ কৌতুক
স্মৃতির উপল প্রান্তে; জীবনের যতো কথাগুলি
নক্ষত্র-কুসুমহারে স্মরণীয় করেছে গোধূলি
আজি এই বসন্ত-বাসর। লঘুপক্ষ মেঘ-পাখি
উড়ে যায় দূরদেশে যেন কোন পথিক বিবাগী,-
ঠোঁটে করি এলোমেলো ছিন্ন কথা, অসমাপ্ত সুর,
একখানি ভালোবাসা। এই সন্ধ্যা বর্ণাভ বিধুর
কখন দেখেছি কবে যেন দূর সোনালি স্বপন,-
মৃত্যুশেষে ফিরে পাওয়া জন্মান্তের বিস্মৃতচুম্বন।
তুমি আছো আমি আছি, আছে শুধু মুহূর্ত সঞ্চয়,
মোর কাছে বসিবে কি, হাতে কিছু আছে তো সময়?
রূপালি মদির স্বপ্ন, আকাশের নীলাঞ্জন রেখা
চক্ষে যদি মোহ আনে, পূর্ণিমার স্বর্ণবর্ণ লেখা
কিশোর বসন্ত কচি অরণ্যের পুষ্পিত প্রচ্ছায়ে
রহস্যের লিপি আঁকে, আসিবে কি তুমি পায়ে পায়ে?
রাত্রিটুকু বয়ে যায় ক্ষীণস্রোতা নদীটির মতো,
প্রচ্ছন্ন প্রেমের ভারে ওষ্ঠ তব করিবে কি নত?

লণ্ডন

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিদায় মধুর পল্লী। পথপ্রান্তে কেন আর গোলাপের দল,
বায়ুভরে দুলি' দুলি' নিষেধ-সঙ্কেতে চাও পথিকে রাখিতে!
দীর্ঘদিন তন্দ্রাবেশে কাটায়েছি একা একা তোমার প্রান্তরে,
দীর্ঘদিন সঙ্গিহীন ভুঞ্জিয়াছি প্রকৃতির নীরব মাধুরী।
এবার উদ্দামগতি, প্রাণোল্লাস, দীপমালা, সৌধ সারি সারি।
এবার লণ্ডন। আমি সুপ্তোত্থিত যেন এক উন্মত প্রহরী।
গর্জ্জনে চমকি কভু, কভু শুনি কোলাহল কর্কশ মধুর।
সহস্রের পদধ্বনি—শুনি আর চলি কোন্ স্বপ্নাবেশ-ভরে।
শ্যামলিমা-ক্লান্ত চোখে অপরূপ লাগে এই পাষাণ-প্রাচীর,
ধুলি-ধূসরিত পথ! নিঃসঙ্গ বিবশ মন আপনা হারায়
অনন্ত জনতা-মাঝে। স্নান করি সুধাময় শত কণ্ঠস্বরে,
যাত্রা করি অগণিত পান্থ সনে। ওঠে পড়ে অসংখ্য চরণ।
প্রীতির উচ্ছ্বাসে আজ আত্মহারা, দিশাহারা পরাণ আমার,
লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের শোণিতস্পন্দন জাগে আমার হৃদয়ে।
প্রতিটি নূতন মুখে, প্রতি মূরতিতে যেন অমিয়-উৎসার।
জনস্রোত চলিয়াছে নিরন্তর পথে পথে। ওগো ফুলদল,
প্রাণদীপ্ত এই মুখ, এ লাবণ্য কোথা পাবে? কোথা বা

তুলনা

এ মূর্ত্ত সত্যের, এই স্বর্গীয় মহিমময় মর্ত্ত্য মাধুরীর?
বনের মর্ম্মর চেয়ে মানুষের কলধ্বনি কত না মধুর!
জীবন-কানন-কোণে অজানা পাতাটি যেই গাহে মৃদু গান,
সেও কত আছে সুখে! থামাও প্রকৃতি তব নিভৃত গুঞ্জন।
বাতাসের সাথে প্রেম হয় কি, পাতার সাথে চলে আলাপন?
তরুশাখা, তব ছায়া মানুষের দুঃখতাপ পারে না জুড়াতে।
তার চেয়ে, এ লণ্ডনে, ঘরে শুয়ে জগতের মর্ম্মকথা গাঁথি।

* ৺মনোমোহন ঘোষের 'London' কবিতার অনুবাদ॥

কবি ও বিজ্ঞানী

শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়

সর্বদাই মনে জাগে ভয়
এ বিশ্বের বিপুল বিস্ময়
অতল সমুদ্র থেকে আকাশের অগণিত তারা
আমাকে বিহ্বল করে ; সুবিস্তীর্ণ ওই যে সাহারা
ধূসর নয়ন মেলে চেয়ে আছে অনিমেষ চোখে
কত ব্যথা দীর্ঘশ্বাস মুহ্যমান করে তারে শোকে
আমরা কি জানি কেউ ? অভ্রভেদী গিরি হিমালয়
সমুন্নত শির তুলে একা একা কেন জেগে রয়
কিছুই জানি না। হৃদয়ের কত না সন্তাপ
সূর্য্যেরে দহন ক'রে জগতে ছড়িয়ে দেয় তাপ
সূর্য্য শুধু একা জানে—আমাদের মিছে পণ্ডশ্রম
সব জানিবার গর্বে বারবার করি তাই ভ্রম
মোরা অর্বাচীন। অবিরাম বর্ষণের শেষে
বিশাল পরিধি ঘিরে রামধনু জাগে কি আবেশে
বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তার দিতে পারে হয়তো বিজ্ঞানী
কবির কবিত্ব নিয়ে আমি তবু জানি
এই ব্যাখ্যা ঠিক সত্য নয়। হৃদয়ের সুনিবিড় কোণে
সৌন্দর্য্য-চেতনা থাকে একান্ত গোপনে।
বিজ্ঞানের চুল-চেরা বিতর্ক বিচার
সৌন্দর্য্যে আঘাত হানে : মনের বিকার
সুকুমার অনুভূতি নাশে একে একে
বস্তুবাদী মন তাই বারবার দেখে
মানুষের দেহখানি অস্থি মজ্জাময়
মাংস চর্ম স্বেদ অশ্রু আর কিছু নয়
রামধনু—জলকণা, অগ্নিপিণ্ড রবি

কবি জানে নহে তাহা : প্রকৃতির ছবি
গিরি-নদী চন্দ্র সূর্য্যে নিয়ত বাঙ্ময়
বৃক্ষ লতা পুষ্প যেন কানে কানে কয়,
"বিজ্ঞান চাহিনা মোরা সৌন্দর্য্য-রসিক
আমাদের পরিচয় তুমি জানো ঠিক।
বিজ্ঞান খণ্ডিত করে শাশ্বত মহিমা
উদ্ধত স্পর্দ্ধায় তাই দিতে চায় সীমা
বিধাতার সৃষ্টিতত্ত্বে। হে কবি তোমার
যাওয়া-আসা ভিন্নপথে ; নত আঁখিভার
বিনীত সলজ্জ ভাব বড় ভালো লাগে
হৃদয়-ভাণ্ডার ভ'রে রাখি অনুরাগে।
তোমাকে আপন জানি—আর কারে নয়
আত্মার আত্মীয় তুমি ; গাহি তব জয়।

সূর্য্যমন্দির

অলক গোস্বামী

সূর্য্যের প্রত্যাশী তুমি? তবে চলে এসো কোনারকে
সম্মুখে সমুদ্র নীল-মন্দির-সুবর্ণ সৈকতে
বন্য ঝাউয়ের গান। স্বাগত জানাও সূর্য্যকে।
আত্মপাপ ধুয়ে যাবে, চন্দ্রভাগা-স্রোতোস্বতী স্রোতে।
হৃদয় দগ্ধ পাপে? তবে এসো একাম্রবনে
শাম্বের প্রতিজ্ঞা নিয়ে চেষ্টা করো রোগমুক্ত হ'তে—
আত্মাকে উদার করো নীল নীল সাগরের গানে
সূর্য্যের প্রলেপ দেবে শান্তি এ হৃদয়ের ক্ষতে।
এখানে মন্দির আছে আপাততঃ সূর্য্যহীন হয়ে,
কেন না স্থানচ্যুত সূর্য্য এ প্রস্তর দেউলে—
শাম্বের বন্দনাগান উপস্থিত দীর্ঘশ্বাস নিয়ে
আত্মহননে মত্ত অর্কক্ষেত্র সমুদ্রের জলে।

এবং

জ্যোতির্ময়ী দেবী

পণ্ডিতেরা বলেছেন "শ্রম না করিলে"—ইত্যাদি অনেক
ভালো কথা
অতএব কর শুধু শ্রম।
পড়াশোনা বুদ্ধিশুদ্ধি লেখাটেখা যাই কর সব বাচালতা
অনেকটাই ভ্রম।
ফলশ্রুতি একভাগ মাত্র প্রতিভার
বাকি সব শ্রমেরই ব্যাপার।
মনের দোয়াতখানা এবং কলম ভর যদি শ্রমের মসীতে,
খ্যাতদের তরণীতে পাইবে বসিতে।
হের চারিদিকে কত বিপুল ওজন আর বৃহৎ আকার
কত কর্ম কত কর্মী মাথা ভরা ঘাম।
শ্রম তার গায়ে লিখে রাখিতেছে নাম।

মনেরে শুধালো শ্রম "দেখি কি আনিলে?"
পড়নিকি শিশুকালে "শ্রম না করিলে"··?
মূঢ় নেত্রে চাহিল সে,—করে নাই শ্রম
—এবং কিছু হয়নি নিখিলে।

ফলিত-অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা

রবীন্দ্রনারায়ণ দে

জাতিগত ভাবে যে সব বিষয় সম্বন্ধে আমাদের প্রবণতা কম—অর্থনীতি, বিশেষ করে ফলিত অর্থনীতির মত নীরস বিষয় তাদের একটি।

তাই দেখা যায় ভারতবর্ষে অর্থনীতির বিষয় মৌলিক চিন্তার গবেষকের সংখ্যা কম। মুষ্টিমেয় যারা আছেন তাঁরা বৈদেশিক অর্থনীতির চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে দেশের ব্যবহারিক জীবনের বৃহত্তর স্বার্থে রূপায়িত করার জন্যে এগিয়ে আসেন নি। দেশ এবং জনসাধারণও তার ব্যবস্থা করেন নি।

দেশের সমাজব্যবস্থার ওপর অর্থনীতির কাঠামো গড়ে ওঠে, না অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে তার মীমাংসা করা কঠিন।

আসলে অর্থনীতির নিজস্ব একটা ধারা আছে, যা দেশের রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হলেও স্বতন্ত্র।

আজ অর্থনীতি সম্বন্ধে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এমন খুব কম দূরদ্রষ্টা আছেন যিনি দেশের অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্টকর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দেশের কর্ম্মসূচীর মধ্যে তুলে ধরতে সক্ষম। অস্পষ্টভাবে অনেকেই অনেক দ্ব্যর্থ্যক মত প্রকাশ করেছেন কিন্তু দেশের প্রকৃত অর্থ-নৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে তাতে কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে নি।

অর্থনীতি সম্বন্ধে এই পরাঙ্মুখতার জন্যে ফলিত অর্থনীতি দেশের মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর কুক্ষিগত হয়ে আছে এবং স্বাভাবিকভাবেই তা বোধহয় কোন সুস্থ পথ ধরে অগ্রসর হয় নি।

দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামো আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও আসলে তার গলদ কোথায়, কি তার সম্ভাব্য সমাধানের পথ, সে নির্দেশ কেউ সঠিকভাবে দিতে সক্ষম নয় বলেই অনেকে দেশের সমাজ ব্যবস্থার ওপরেই দোষারোপ করে দায়িত্ব এড়াবার বা সহজ সমাধানের চেষ্টা করছেন।

আজকের পৃথিবীর সর্ব্বাধিক আলোচ্য বিষয় হল অর্থনীতি, যা বাধা বিপত্তি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু যার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম থেকে রেহাই সহজে পাওয়া যায় না।

দেশের কর্ম্মক্ষমতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগানর দায়িত্ব সমাজব্যবস্থার ওপর থাকলেও তার গতি এবং উৎপাদনের শক্তিতে আন্তর্জ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করার ভার অর্থনীতিবিদের।

আজ বিশেষভাবে স্মরণ রাখার প্রয়োজন যে সমাজ-ব্যবস্থার যে কোন রূপই দেখা দিক—

একজন শ্রমিক ও কৃষক থেকে আরম্ভ করে একজন কর্ম্মকুশল ইঞ্জিনীয়ার ও অভিজ্ঞ পরিচালককে স্বতঃপ্রবৃত্ত করার জটিল দায়িত্ব অর্থনীতিবিদের। কোন দেশের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থা যদি এর কোন একটা দিক উপেক্ষা করেন, দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অর্থনীতির বিষয় নিষ্ক্রিয় ভাব ভারতের ইতিহাসে নতুন দৃষ্টান্ত নয় এবং নিষ্ক্রিয়তাই আজ বিশেষ করে সরকারি প্রচেষ্টাগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বার্থক রূপ দিতে সক্ষম হচ্ছে না।

কোন্ সুস্পষ্ট কারণের জন্যে কোন্ প্রকল্প ব্যর্থ হচ্ছে, অর্থব্যয় নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করছে তা আজও বহু প্রশ্ন-জালের অন্তরালে।

এখন বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শিল্পের পর্য্যায়ক্রমে Quality Controlএর মাধ্যমে উৎকর্ষ স্থিরীকরণ এবং মূল্যবান অতি উন্নত দেশগুলির সঙ্গে প্রতিযোগী হয়ে এখনও আন্তর্জ্জাতিক পর্য্যায়ে বোধহয় উন্নতি হয় নি।

State Trading Corporation, Export Promotion Council ইত্যাদি সংস্থাগুলি বর্তমানে যে ভূমিকা গ্রহণ করছেন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভেই যদি এই প্রচেষ্টা কার্য্যকরী করা হত তবে আজ শিল্পে হয়ত এই অকস্মাৎ মন্দার কারণ ঘটত না।

Middle East, Malayasia, U. S. S. R, East Africa, Korea Sudan, Poland, Burma ইত্যাদি দেশগুলির কাছ থেকে রপ্তানি বাণিজ্যে যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে তার একদিকে যেমন উজ্জ্বল সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে অপরদিকে তেমনি Japan, Hungary ইত্যাদি শিল্পে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এই লক্ষ্যে পৌছতে গেলে অনেক কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, অনেক একাগ্রতা, প্রাথমিক অবস্থায় অনেক ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। কিন্তু জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দেশের সকল শক্তি ও প্রচেষ্টা অনেক পূর্বেই ঐ বিষয়ে কেন্দ্রিভূত হওয়া উচিত ছিল।

বিদেশের ফলিত-অর্থনীতি অনুসরণ করে এবং বিদেশের মাপ-কাঠিতে বিচার করে দেশের অর্থনীতির কাঠামো তৈরি করা সম্ভব নয়। তার জন্যে দেশের যথাযথ আপেক্ষিক পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রয়োজন, কিন্তু সেই বিশেষ পদ্ধতি আমাদের দেশে এখনও প্রস্তুত হয়নি।

তাই কটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে দেশে যে শিল্প ও বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল তাদের ভবিষ্যৎ কোন সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পায়নি।

এবং এই শিল্প-জাগরণের প্রথম পর্য্যায়ে ঐ Trade Cycle এর দৃষ্টান্ত থেকে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান আহরণ করে কোন অর্থনীতিবিদ দেশের ভবিষ্যৎ কর্ম-সূচীকে নিয়ন্ত্রিত করেন নি।

দেশের বাণিজ্য সম্প্রসারণ নীতি, বিনিয়োগ ক্ষমতা, রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ, খাদ্য উৎপাদনের নির্ভুল লক্ষ্য ও নিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে দেশের জনসংখ্যা নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দেশের রাজনৈতিক এবং সমাজ-ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন মতের টানাপোড়েনে উপেক্ষা করার মত দেশের ক্রমবর্ধমান বিরাট জনসংখ্যার সমস্যা একটা সামান্য জিনিস নয়।

এই সঙ্কটজনক মুহূর্তে যদি দেশের ভারপ্রাপ্ত শীর্ষ-স্থানীয়রা কোন বিষয় কার এক্তিয়ারভুক্ত এবং কোন বিষয় কার হস্তক্ষেপ করার কতটুকু অধিকার আছে—এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেই সময় কাটান তবে এই সব জটিল সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

অর্থনীতিতে মৌলিক চিন্তার উদ্ভাবক এবং বিশেষজ্ঞ এমন অনেকেই আছেন যারা হয়ত আজও লোকচক্ষুর অন্তরালে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গতানুগতিক পথে যাঁদের চিন্তাপ্রবাহ অনেকটা Stereotyped ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে—তাঁরাও যে ব্যবহারিকজগতে ফলিত-অর্থনীতির বিষয় নিজেদের চিন্তাধারাকে নিয়োজিত করতে পারেন, এই আত্মবিশ্বাস যাঁদের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় আছে তাঁদের আজ নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত নয়।

নির্ভুল বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে অর্থনৈতিক কাঠামো গঠনের পথে সর্বাগ্রে তাঁদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার জন্যে এগিয়ে আসা উচিত।

———

(২৪৮ পাতার পর)

অতুল্য ঘোষের ভবিষ্যত বাণী

শুনা যায় বাংলার কংগ্রেস-নেতা অতুল্য ঘোষ মহাশয় একটা বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে যদি ইউ, এফ, সম্মিলিতদল পুনরায় নির্ব্বাচনে জয়যুক্ত হইতে পারে তাহা হইলে এদেশে অর্থাৎ বাংলা দেশে আর শান্তি অথবা নিরাপত্তা বলিয়া কিছু থাকিবে না। যাহাদিগের সম্পত্তি আছে তাহারা যে সম্পত্তি হারাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কথাগুলি অবশ্য নির্ব্বাচন সংক্রান্ত আবেদন হিসাবেই বলা হইয়াছে। আশা যে ঐরূপ বিপদ ডাকিয়া আনিবার জন্ম কেহ যেন ইউ, এফ, দলের কোন প্রার্থীকে ভোট দান না করেন। আমরা অবশ্য এই ভবিষ্যত বাণীর অন্তঃস্থিত লুকান কথা যাহা তাহাতে সায় দিতে পারি না। অর্থাৎ ইউ, এফ, শাসককর্ত্তা হইলে শান্তি ও সম্পত্তি নষ্ট হইবে তাহা না হয় মানিয়া লইলাম; কিন্তু কংগ্রেস রাজ হইলে শান্তি ও সম্পত্তি পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকিবে, সে কথা লুকানভাবে বলা হইলেও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ ১৯৪৭ খৃঃ অঃ হইতে যতবার যতভাবে শান্তিভঙ্গ হইয়াছে; দাঙ্গাহাঙ্গামা, গুলিবর্ষণ, লুঠতরাজ ও খুনখারাবি প্রভৃতিতে, তাহার মধ্যে কংগ্রেসের শান্তি ও সম্পত্তি রক্ষা ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রমাণ হয় নাই। মানুষের সম্পত্তি কংগ্রেস নানাভাবে গ্রাস করিয়াছে ও দেশ শাসনকার্য্যে অক্ষমতা দেখাইয়া সম্পত্তির মূল্য রক্ষা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। ইউ, এফ, যাহা করিয়াছিল তাহার ভিতর অপরিণত বুদ্ধিজাত উদ্দামতা থাকায় তাহা লোকের চক্ষে অধিক চমকপ্রদ মনে হইয়াছে; কিন্তু কংগ্রেস মুখের কথায় ক্রমাগত জনহিতের আদর্শ প্রচার করিয়া কার্য্যত জনহিতের বিপরীতই করিয়াছে। কংগ্রেসরাজত্বে সত্যবাদী আইনমান্যকারী ব্যক্তিদিগের উপর বহু অন্যায় করা হইয়াছে। মিথ্যাবাদী ট্যাক্স ফাঁকিদার, কালোবাজারের জুয়াচোর, ঠগ দোকানদার, সুদখোর প্রভৃতি সমাজবিরোধী দুরাচারদিগের প্রভাব কংগ্রেসী আমলে খুবই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। ঘুষখোর ও উৎকোচদাতাদিগেরও মরসুম এই সময়েই লক্ষিত হইয়াছে। টাকার ক্রয় ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে হ্রাস করিয়া গুপ্ত রাজস্ব হিসাবে সকলের সঞ্চয় মূল্যহীন করিয়া দিয়াও কংগ্রেস দেশবাসীর বহু ক্ষতি করিয়াছে। অতএব দেখা যায় যে ইউ, এফ, বহুস্থলে হরতাল, ঘেরাও ও হাল্লা করিয়া সমাজের ক্ষতি ও অসুবিধা করিয়া থাকিলেও, কংগ্রেসের রাজকার্য্যের রীতি ও শাসনপদ্ধতি সমাজের উন্নতিকর হইয়াছে প্রমাণ হয় না।

কলিকাতার সংস্কার ও আয়তন বৃদ্ধি

কলিকাতা বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে একতলা, দুইতলা বাড়ী কিম্বা বস্তি ছিল এখন সেই সকল স্থানে ছয় হইতে আঠারতলা বিরাটাকার ইস্পাত ও সিমেণ্ট নির্ম্মিত অট্টালিকা মাথা উঁচাইয়া দেখা দিতেছে। পূর্ব্বে কলিকাতার সীমানা ছিল শ্যামবাজার, খালধার, টালিগঞ্জ এবং বেহালা। এখন কলিকাতা ব্যারাকপুরের দমদমার, রিজেণ্ট পার্কের, যাদবপুরের এবং ডায়মণ্ডহারবার ও বজবজের রাস্তা ধরিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ভাগীরথীর পরপারেও নামে কলকাতা না থাকিলেও ঐ একই জনপ্রবাহ দূর হইতে আরো দূরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। খালের পরপারে বৃহৎ বৃহৎ রাজপথ ধরিয়া শহরের গৃহের সারি বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকেদের মতে এই প্রসার এখনও পূর্ণতা লাভ করে নাই। শ্রীমোরারজি দেশাই সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতার বর্দ্ধিত আকারে গঠন কার্য্যের জন্ম যথা প্রয়োজন অর্থ সাহায্য করিবেন। এই কথা শুনিয়া আমাদের আতঙ্ক হইতেছে যে হয়ত মোরারজি ঐ জন্ম উচ্চসুদে অর্থ-কর্জ্জা করিয়া কলিকাতাবাসীকে বৰ্দ্ধিত হারে ট্যাক্স দিয়া সুদ ও আসল শোধ করিতে বাধ্য করিবেন। কলিকাতার বাসিন্দারা যদি পরমুখাপেক্ষীতা ছাড়িয়া নিজেদের কার্য্য নিজেরাই করিতে শিখেন তাহা হইলে তাঁহারা অল্প ব্যয়েই নিজ নিজ প্রয়োজনমত

গৃহাদি তৈয়ার করাইয়া লইতে সক্ষম হইবেন বলিয়া মনে হয়। যাঁহাদের নিকট টাকা আছে তাঁহারা যদি এই কার্য্যের জন্ম টাকা দিয়া যৌথ কারবার চালু করেন তাহা হইলে বহু সস্তায় রাস্তাঘাট, বাগান, বাজার, দোকানপাট শোভিত শহরের সহিত সংযুক্ত উপকণ্ঠ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন। যে টাকা লাগান হইবে তাহা জমিজায়গায় ও গৃহাদিতে নিবদ্ধ থাকিবে বলিয়া লোকসান হইবার সম্ভবনা বিশেষ থাকিবে না। এই জাতীয় শহর নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে আমেরিকায় যাঁহারা বহুদিন হইতে টাকা লাগাইয়াছেন তাঁহারা নিজ নিজ মূলধন সহজেই দ্বিগুণ চতুর্গুণ করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছেন। কলিকাতায় বহু অবাঙ্গালী বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা এই বিশয়ে ক্ষমতা দেখাইতে পারেন নাই। পরলোকগত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নলিনীরঞ্জন সরকার প্রভৃতি দুইচারজন মাত্র এই দিকে নজর দিয়া লাভবান হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর প্রতিভা এইক্ষেত্রে নিষ্প্রভ কেন জানি না। মনে হয় এইদিকে দৃষ্টি দিলে বাঙ্গালীর নিজের দেশ আর অধিকভাবে পরহস্তগত হইবে না। কিন্তু কাহারও এদিকে বিশেষ আগ্রহ আছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

রাসায়নিক-জীবাণু যুদ্ধ

যে সময় পৃথিবীর সকল মানব আনবিক যুদ্ধ লইয়া মহা আতঙ্কে নিমগ্ন, সেই সময়েই একটা নূতন ভয়াবহ যুদ্ধের অস্ত্রের কথা সকলে জানিতে পারিল ও তাহার ভীষণতা লইয়া নানাস্থানে নানাপ্রকার আলোচনা হইতে আরম্ভ হইল। রাসায়নিক ও জীবাণু যুদ্ধের কথা বহুকাল হইতেই মানুষ চিন্তা করিত। প্রথম মহাযুদ্ধে যে বিষাক্ত বাষ্প ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা রাসায়ণিক যুদ্ধের অন্তর্গত! কিন্তু কথায় যেরূপ মহা মহা রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রের কথা চলিত; বস্তুত সেইরূপ শক্তির অস্ত্র কেহ বিশেষ একটা নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। কিন্তু আজকাল আমেরিকা ও বৃটেণে এবং অন্যান্য দেশেও এমন বিষাক্ত বস্তু ও অতি দ্রুত বর্দ্ধনশীল জীবাণু আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তাহা যুদ্ধে ব্যবহৃত হইলে আণবিক বোমা অপেক্ষাও প্রাণহানিকর হইবে বলিয়া মনে হয়। স্নায়বিক প্রতিক্রিয়াশীল এমন রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তাহা বোমার গুচ্ছের সাহায্যে বিস্তৃত করিলে ৩০০ শত বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া ব্যাপ্ত থাকিবে ও কোনপ্রাণীই দুই মিনিটের পরে সেখানে জীবিত থাকিবে না। বায় সেকেণ্ড কোন প্রাণী সে স্থলে থাকিলে তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইবে। জীবাণু ছড়াইয়া দিয়া প্রথমত সকল খাদ্য বস্তু নষ্ট করিয়া দেওয়া যাইবে ও তৎপরে মানুষও কেহই আর সে অবস্থায় সেখানে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। এই সকল অতি ভয়ানক অস্ত্র ব্যতীত কোন কোন রাসায়ণিক বস্তু যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যাহা প্রাণহানী করিবার শক্তিতে বিশেষ কমে যায় না। যথা নাপাম বোমা আক্রমণে মানুষকে যেভাবে পুড়াইয়া মারা হয় তাহার নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার তুলনা আণবিক বিস্ফোরণের দ্বারা নরহত্যাতেও পাওয়া যায় না। নাপাম দাহনে দহনকারী বস্তু চামড়ার ভিতরে চলিয়া যায় এবং তাহা বহুদিন পর্য্যন্ত দেহের ভিতরে দাহনশক্তি লইয়া জীবন্ত থাকিতে পারে ও থাকে। এই জাতীয় বোমা যুদ্ধে এখন সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইতেছে। বিগত মহাযুদ্ধেও হইয়াছিল। জাপানে সেই বোমাতে আণবিক বোমা অপেক্ষা অধিক লোকের প্রাণ নষ্ট হইয়াছিল।

৺সাতকড়িপতি রায়

সাতকড়িপতি রায় ছিলেন সেই সকল স্বাধীনতা-সংগ্রামের যোদ্ধাদিগের মধ্যে একজন সেনাপতি যিনি নিজের নির্ভিকতা, মানবতা, অক্লান্ত কর্ম্মশক্তি ও দেশ-ভক্তির জন্য সকলের শ্রদ্ধা ও সাহচর্য্য আহরণে সক্ষম হইয়াছিলেন। সদা সর্ব্বদা দেশের মহা মহা নেতাদিগের সান্নিধ্য ও বন্ধুত্ব লাভ করিয়া থাকিলেও তিনি কখনও নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত ছিলেন না। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত অবধি তিনি নিজ আদর্শের পথ ছাড়িয়া ক্ষমতা অথবা যশ অর্জ্জন করিতে অগ্রসর হ'ন নাই। সাতকড়িপতি রায়কে সকলেই শ্রদ্ধা করিতেন কিন্তু

স্বার্থান্বেষী দেশ-নেতাগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন না; কারণ তিনি সঙ্গে থাকিলে বহু বিষয়েই লাভ ও সুবিধার অনুসরণ সহজ হইত না। ইহা হইল তাঁহার রাষ্ট্রক্ষেত্রের কর্মজীবনের কথা। অপরদিকেও তাঁহার প্রতিভা ছিল অনন্য-সাধারণ। তিনি সুলেখক ছিলেন। তাঁহার লিখিত "স্মৃতির টুকরোর" প্রথম পর্য্যায় তিনি শেষ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পর্য্যায় আরম্ভ করিবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করিলেন। দেশের রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া ইহাতে একটা মহা ক্ষতি হইল; কারণ তিনি যাহা লিখিতেছিলেন তাহার প্রমাণসিদ্ধরূপ পরবর্ত্তী যুগের ঐতিহাসিকদিগের নিকট বহুমূল্যবান বলিয়া ধার্য্য হইত। ভারতের এই শতাব্দীর যে স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস তাহার বহু ভিতরের কথা তিনি প্রকাশ করিতেছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুতে সেই কার্য্য আর পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইল না। সাতকড়িপতি রায়ের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা ছিল অনেক। তাঁহার চিন্তাশক্তি ও অবস্থা বিশ্লেষণ তৎপরতা শেষ বয়স অবধি এতই গতিশীল ছিল, যে তাঁহার সহিত পরামর্শ করা অনেকেই লাভজনক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি এই কারণে কর্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াও সর্ব্বদাই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন! কৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান মূল্যবান ছিল। তিনি নাটকাদি রচনা করিয়াছিলেন ও সেই নাটকগুলি অভিনীতও হইয়াছিল। একাধারে নানান গুণের আধার এই সত্যবাদী ধর্ম্মবিশ্বাসী দেশসেবকের মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূরণ করা সম্ভব হইবে না।

৺ব্রহ্মকুমারী রায়

দীর্ঘ ৮৩ বৎসর কলিকাতার সমাজে সুরুচি ও সুকৃষ্টির পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বহু সৎকার্য্যের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া ও দেশের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা আপ্রাণ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়া ব্রহ্মকুমারী রায় সম্প্রতি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অনন্তলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি ১২৯২ বঙ্গাব্দে কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ৺বিহারীলাল সেন ব্রহ্মকুমারীর দুই বৎসর বয়সে বিপত্নীক হ'ন। মাতৃহারা শিশুকে তিনি ছয় বৎসর বয়সে বাঁকিপুরে ৺প্রকাশচন্দ্র রায়ের গৃহে শিক্ষার জন্য রাখিয়া আসেন। ব্রহ্মকুমারী প্রকাশচন্দ্রের পরিবারেই বড় হ'ন ও পরে ঐ পরিবারেই ৺সাধনচন্দ্র রায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

ব্রহ্মকুমারী পরের দুঃখ দেখিলে সর্ব্বদাই কাতর হইয়া উঠিতেন ও সেই দুঃখ দূর করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। ১৯৪৩ খৃঃ অব্দে যখন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ হারায়, তখন তিনি বহুস্থলে অন্নছত্রাদি খুলিয়া সেই অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তিদের রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে রোগ শয্যায় বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন সেই অবস্থায় শ্রীমতী অরুণা আসফ্ আলী তাঁহাকে দেখিতে আসেন। তিনি জলপাইগুড়ি গিয়াছিলেন শুনিয়া ব্রহ্মকুমারী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণা জলপাইগুড়িতে কি দেখলে জানতে ইচ্ছা হয়। ওরা কি তোমাদের রিলিফের জিনিষপত্র নিয়ে যাবার কোন সুযোগ সুবিধে দিল? ওরা যে রকম—ওরা কি তা দেবে?" অসহ্য রোগযন্ত্রণা তবুও তিনি পরের কষ্টের কথাই ভাবিতেছিলেন।

সদা হাস্যময়ী ব্রহ্মকুমারী পরের দুঃখে যেমন কাতর হইতেন, তেমনি সকলের আনন্দে পূর্ণভাবে যোগদান করিতেও প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহার সরল সত্যনিষ্ঠা ও সুনীতিবোধ সকলকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশের নারী প্রগতির বিশেষ ক্ষতি হইল। তাঁহার ন্যায় পথপ্রদর্শক সহজে পাওয়া যাইবে না। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তীকে আমরা আমাদের সহানুভূতি জানাইতেছি।

মূলে ভুল

(উপন্যাস)

পুষ্প দেবী

এবার কলকাতায় ফিরে এসে অবধি গদাই বলতে সুরু করলো, বাবাকে আর কাশীতে রাখা যাবেনা শরীরটা ভেঙে যাচ্ছে। আমি ত আর প্রাকটিস ছেড়ে কাশীতে থাকতে পারবো না। অনু মনে মনে ভাবে কাশীর খরচ বেঁচে গেলে হয়ত বাবাকে আর টিউসানি করতে হবে না। মুখে কোন কথাই বলে না কারণ এতদিনে এটুকু সে বুঝেছে যে তার কথার কানাকড়িও মূল্য নেই গদায়ের কাছে।

এদিকে প্রভার মনে সাধ নাতির পৈতে দেবে। কত দিনের সাধ তার ছেলের। অনুর ছেলে সে সাধ পূর্ণ করেছে। সদাশিববাবুর সঙ্গে যত পরামর্শ না হচ্ছে তত হচ্ছে নিরুপমার সঙ্গে। সদাশিববাবু সাধ-আহ্লাদ জিনিষটা অত বোঝেন না, তাঁদের বাড়ী ব্যয়কুণ্ঠ ধাতের ছিল। কিন্তু প্রভা কিছুতেই নিজের মনকে বোঝাতে পারছেন না যে কি করে খোকনের পৈতের ঘটাঘটি না করে করতে পারেন। নিরুপমা বলেছে দাও মা ঘটা করে পৈতে। সারাজীবনই টাকার টান তোমাদের চলছেই, আর কত বা হবে। আমি ঘটা করে তত্ব করব। পৈতে হবার কথা গদাইদের বাড়ীতে। তত্ব করে মামার বাড়ী থেকে। তুমি পৈতে দাও, তত্ত্ব আমি করি। তাহলেই আর অনুর মনে কোন কষ্ট হবে না। নিরুপমা জানে না কত ধানে কত চাল। সত্য কথা, টাকার সম্বন্ধে বেশ কিছু ধারণা তার সঠিক নেই। কারণ দমকা খরচা হলে দেবে ঢেউ। সময় অসময় বলে সঞ্চয়ের বালাই নেই। সে রেখে গেছেন সাত পুরুষ ধরে। প্রভা ভাবেন, সত্যি সত্যি অনুরও ত এই সৌভাগ্য হবার কথা। কিন্তু প্রারব্ধ! বারে বারে পুরুষাকারের সঙ্গে ভাগ্যের লড়ায়ে প্রভা হেরে যাচ্ছেন তবু হার মানতে রাজি নন প্রভা।

প্রভা লক্ষ্য করেছেন অনু আর নিরুর ভাগ্যের খেলা। প্রকৃতপক্ষে যদি গদায়ের কথা সত্য হয় তাহলে দীপকদের চেয়ে আর্থিক অবস্থা গদায়ের সাত গুণ বেশী। কিন্তু সে কেমন টাকা যা শুধু অহঙ্কার দেখানোর জন্যই হয়েছিল। আর হয়েছিল ছেলেদের বদখেয়ালির জন্য। অবাক হয়েছিল প্রভা যখন শুনলো সে বাপের কাশীবাসের খরচ বন্ধ করলো মাণিকচাঁদ। প্রসন্নবাবু ত সে রক আত্মভোলা ঋষিতুল্য মানুষ নন যে অভিমানে টাক গ্রহণ করবেন না আর। সেই কটুভাষী পাকা ব্যবসাদা নীরবে বেয়াযের টাকা গ্রহণ করে কাশীবাস করলেনই কেন? নিজের দাবীতে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়ানো সৎসাহস তাঁর ছিল না কেন? ঐ ক্লীবত্বই গদাই পেয়েছে তাই দাদার কাছে মার খেয়ে পালিয়ে এসেছি কোঁ বলতে তার বাধলো না। প্রভা অন্ত খুঁজে পায় গদায়ের মনের। যাই হোক ক্রমশঃ খোকনের পৈতে ব্যবস্থা হল। গদাই কাশী গেল প্রসন্নবাবুর মত আনতে দেখা গেল এবার উদার মনে মত দিলেন, প্রসন্নব বললেন, দেখ, গদাই সদাশিববাবু পৈতে দিলেই ত অ

সে সদাশিববাবুর নাতি হয়ে যাবে না। সে প্রসন্নবাবুর নাতিই থাকবে। কি সলা-পরামর্শ সেখানে হল জানিনা কিন্তু বাজ পড়লো যথা দিনে। পৈতে আরম্ভ হয়েছে, নারায়ণ শিলা এনে প্রভার বাপের বাড়ীর পুরোহিত পুজো আরম্ভ করেছেন এমন সময় সদর্পে বিপদতারিণীর প্রবেশ। দু ভাইবোনে কি যেন কথাবার্ত্তা হল। গদাই প্রভাকে বললো আপনাদের পুরোহিতকে উঠে যেতে বলুন, 'দদির পুরোহিত পুজো কর্বে। প্রভা ত ভয়েই সারা, এ কী বলে গদাই? একটা শুভ কাজে যদি নারায়ণ নিয়ে উঠে যান পুরোহিত অমঙ্গল হবে যে? কেন? কেন এমন হল?

প্রভা ত গদায়ের মত নিয়েই হরিচরণকে আনিয়েছিল। হরিচরণ ত সাধারণ পুরোহিত নন, ওঁর বাবার পাণ্ডিত্য সারা বাংলা দেশ জুড়ে। অমন নিলোভ অমন তেজস্বী অতবড় শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ সহজপ্রাপ্য নয়। হরিচরণরা সাত ভাই, কিন্তু হলে কি হবে বাপের ধারা ঐ হরিচরণই পেয়েছে। অসাধারণ মেধা, অসাধারণ তেজস্বী নির্লোভও ও বাপের মত। হরিচরণ যখন এম এ পরীক্ষা দিতে যায়, মা বললেন তোদের সাতগুষ্টি সংস্কৃত পড়ে এলো আর তুই নাকি ইংরেজি নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছিস্। আবার কি? মার কথা শিরোধার্য্য করে হরিচরণ 'সংস্কৃত' নিয়ে পরীক্ষা দিয়েও প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। আজ হরিচরণ বিখ্যাত অধ্যাপক হয়েও প্রভার নাতির উপনয়ন বলেই এসেছে। হরিচরণের বাবা প্রভার ভাইদের অধ্যাপক ছিলেন। তাছাড়া হরিচরণের স্বভাববৈশিষ্ট্যে প্রভা তাকে বড় ভালোবাসত। কিন্তু হরিচরণ যত শ্রদ্ধাই প্রভাকে করুক না কেন, পূজার আসন থেকে গদাই উঠিয়ে দিলে, সেই অসম্মান সইবার পাত্র সে নয়। ব্রহ্মতেজে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো হরিচরণ। প্রভা তার হাত দুটো ধরে তাকে টেনে নিয়ে এলো নিজের ঘরে। বললো অনুর কথা ভাবো ভাই! শুধু গদায়ের ছেলে ত নয় খোকা। তুমি অনুর নিজের মামার চেয়ে বেশী—গদাই না জানলেও তুমি তা জানো ভাই। নারায়ণ তুলে নিয়ে তুমি যেও না। ওধারে বিপদতারিণীর আনা পুরোহিত পুজো আরম্ভ করলেন। এদিকে সেই জ্বলন্ত আগুনের সব তাপ নিজের বুকে নিয়ে প্রভা হরিচরণকে আগলে বসে রইলেন। কত সাধের নাতির পৈতে তাও তাঁর দেখা হল না। শুধু একবার দেখলেন নতমুখী অনুর দু'চোখে টলমল করছে দু ফোঁটা জল।

তার মধ্যে বেণুর সাধ কম নয়। সে নাকি কবে কার কাছে শুনেছে নতুন রূপোর রেকাবী করে পৈতের কে ভিক্ষে দিয়েছে। অনেক বায়না করে প্রভার কাছ থেকে রূপোর রেকাবী সে করিয়েছিলো। খোকাকে ভিক্ষে দেবে তাতে করে। হা অদৃষ্ট, সেই রেকাবী তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাতে চাল টাকা দিয়ে ভিক্ষে দিয়েছে বিপদবালা। তাদের ছেলে খোকা—হোকনা পৈতৃক ভিটে থেকে বিতাড়িত। হোকনা মামার বাড়ীতে আশ্রিত প্রতিপালিত। তবু সে গদায়ের ছেলে এই দাবীতে প্রভা ও সদাশিববাবুকে নানাভাবে অসম্মান করেই বিপদতারিণী ও গদাই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করলো। প্রভার হীরের বোতাম দেখে মুখ বেঁকিয়ে বিপদতারিণী বললো, একি সোনার হার দেয়নি মামার বাড়ী থেকে? গদাইও বললো আমি ত বলেছিলুম সোনার হার দিতে হয়। প্রভা বিস্ময়ে নির্ব্বাক। ভাবলো একবারও কি বিপদতারিণীর মনে পড়ছে না এসব খরচই গদাইদের করার কথা সদাশিববাবুর নয়। কিন্তু গদাই ও বিপদতারিণী এসব মোহমুক্ত।

প্রভার মনে পড়লো গদায়ের দাদার ছেলের পৈতের কথা। তার পৈতে প্রসন্নবাবুর বাড়ী থেকেই হয়েছিল কিন্তু তত্ত্ব যা এসেছিল তার মামারবাড়ী থেকে সে নাকি বিরাট ব্যাপার। প্রভা বলেছিল অনুকে, তোর সেজ-জার বাপ কি করে অত দিলো রে? অনু বললো কি-জানি মা—ঠাকুরঝি ত বলছিলো, হ্যাঁ বৌএর বাপ কত দিয়েছে তা আর জানতে বাকি নেই। আমার বাপের টাকাই চুরি করে তত্ত্ব করেছে। লজ্জায় প্রভা নির্ব্বাক হয়ে যান।

খোকার পৈতের ঘটা হল খুব কিন্তু গদাই ও বিপদতারিণীর কাছে চোরের মার খেলো প্রভা ও সদাশিববাবু। আর সবচেয়ে মজা হল কাশীতে নাতির পৈতের মিষ্টি বিলোনোর জন্য হঠাৎ সব মিষ্টি পুঁটলী বেঁধে কাশী পাঠানোর ব্যবস্থা করলো গদাই। এখানে বিভ্রাটের একশেষ। সদাশিববাবুর কাছ থেকে টাকাটা চেয়ে নিয়ে লোক দিয়ে মিষ্টি কাশীতে পাঠানো হয়ে গেল। প্রভার মনের কোন সাধই মিটলো না। সদাশিববাবু শুধু একবার বললেন, এতো সহজে মনে কষ্ট পেওনা।

কিন্তু মনোকষ্টের তখন সবই বাকি তা কি কেউ জানতো? অম্বুর মনে কষ্টটা বরাবরই ছিল। মাঝে অম্বু প্রভাকে একবার বলেছিল, মা আমার বাড়ীতে পুজো কি হরিচরণ মামা করবেন না! বড় ইচ্ছে করে ওঁকে দিয়ে পুজো করাতে। প্রভা উদাসীনভাবে বলেছিল, কি দরকার? করবে না হয়ত নয় কিন্তু আবার ঝঞ্ঝাট বাড়াতে সাহস হয় না।

এবার সুরু হল প্রসন্নবাবুকে আনার ব্যবস্থা—। গদাই বললো বাবাকে ত আর এবাড়াতে আনা যাবে না, বাবা চেম্বারে উঠবেন। প্রভার ত চক্ষুস্থির। ঐটুকু চেম্বার তার মধ্যে দুটো ঘর ত সাবলেট করা। একখানি ঘরে প্রসন্নবাবুর মত শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষ থাকবেনই বা কি করে? যাইহোক গদাই যখন যা ইচ্ছে করে করবেই। প্রসন্নবাবুর আসার সাজ সাজ রব পড়ে গেল। কথা হল ছেলেমেয়েরা এখানে থাকবে, শুধু অম্বু শ্বশুর সেবার জন্য থাকবে চেম্বারে।

ষ্টেশনে যাবার হুকুম হল সদাশিববাবুর। কিন্তু কদিন ধরে তাঁর জ্বর চলছে। প্রভা বিপদে পড়লেন। এধারে পরিকল্পনা—অনুযায়ী অম্বুকে চেম্বারে পৌঁছিয়ে সদাশিববাবুকে ষ্টেশনে যেতে হবে। গদায়ের কোন কথা অমান্য করার ভরসা হয়না প্রভার। মেয়েটার খোয়ারের শেষ থাকবে না শেষকালে। কাজেই একশো দুই জ্বর নিয়ে সদাশিববাবু অম্বুকে নিয়ে রওনা হলেন। অম্বুকে চেম্বারে রেখে ষ্টেশনে গেলেন সদাশিববাবু।

কিন্তু সদাশিববাবুর সঙ্গে একটা কথাও বললেন না প্রসন্নবাবু। বিপদবাজার দশ ছেলে এডিকংদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আর সেই যে জামাইকে মেয়ের অসুখে প্রসন্নবাবু যেয়ে উঠতে পারেন নি কিন্তু ঘটা করে জামায়ের আবার বিয়ে দিয়েছিলেন সেই হট ফেভারিট জামাইকে নিয়ে গদায়ের চেম্বারে তিনি গিয়ে উঠলেন। হতভাগ্য সদাশিববাবু আড়াল থেকে চেম্বারে ভাড়া শুনে আর বিনামাইনের দাসী অম্বুকে বহাল করেই ফিরে এলেন। কিন্তু তারপর?

তারপর একমাত্র বাচ্চা চাকর রামু শুধু বারেবারে টিফিন-ক্যারিয়ার করে ভাত তরকারি বয়েই ছুটি পেলো না। নানান হৈ হুজ্জুত তুললো—গদাই। যেমন প্রসন্নবাবুর আতপ চালের সঙ্গে সেদ্ধ চালের ভাত যদি গদাই অম্বুর জন্যে যায় সে ভাত প্রসন্নবাবু খাবেন না। আবার যদি মাছ পাঠায় তাহলে ত রক্ষেই নেই। আবার ভাজা খাবার আলাদা করে পাঠাতে হবে। আবার বালিগঞ্জ থেকে শ্যামবাজার যেতে লুচি ঠাণ্ডা হবার অপরাধেও অপরাধী হল প্রভা। বেচারা অম্বু সে শত কাজ থাকলেও রামুকে একটা কাজ বলে না। জানে প্রভার মুহূর্ত্ত বিশ্রাম নেই সেখানে। কিন্তু চাকর চাকরই, সে এই যাতায়াতের সুযোগ নিয়ে পথেই দিন কাটাতে লাগলো।

শত হোক প্রভার হাত ত দুখানাই। ফলে শিশু বেণুর কাজের আর অন্ত রইল না। প্রভার শিক্ষায় মেয়েরা খুবই কর্ম্মঠ তবু শিশু বেণুর উদয়াস্ত খাটুনি দেখে প্রভাও মাঝে মাঝে ভাবতেন একি করছি গদায়ের খেয়ালের জন্য, মেয়েটাকে কি মেরে ফেলবো? অম্বুর ছেলেমেয়ের সব কাজতো সে করতই তাছাড়া ঝাঁড় পোঁছ বিছানা করা চা করা লুচি রুটি বেলে দেওয়া কোন কাজই বাদ যেত না তার।

গদাই ফেরার পর অম্বুর আর একটি ছেলে হয়েছিল। কিন্তু অনাদর অযত্নে সে কঠিন আমাশয়ে মৃতপ্রায় হয়েছিল। গদায়ের সব খেয়াল মেটাতে অম্বুর তাকে দেখার অবসর ছিল না, প্রভার গলায় মস্ত সংসার।

তাছাড়া মামলামকর্দ্দমার তদ্বিরের জন্যও তাঁকে ছুটতে হচ্ছে কখন বা শ্বশুরের বন্ধুর কাছে কখন বা বাপের বন্ধুর কাছে কখন বা স্বামীর ছাত্রর কাছে। সদাশিববাবু ব্যস্ত সাত জায়গায় টিউশানি করতে আর অনু ব্যস্ত মামলার কাগজপত্তর সব গুছিয়ে রাখতে, তার সঙ্গে প্রসন্নবাবুর সেবা। কাজেই শিশুপুত্র বাসুদেব সম্পূর্ণ বেণুর ঘাড়েই পড়লো। বেণুর খাটুনির শেষ নেই। ঐ সঙ্গে বড় মেয়ে নিরুপমার আবার একটি মেয়ে হল, চাঁদের মত ঘর আলোকরা তার রূপ। কিন্তু বাসুদেবের মুখে যেন দেবশিশুর অম্লান বুদ্ধিদীপ্তি। বাসু দিনেদিনে প্রভার গলার হার হল। আর শিশুবয়স থেকে অপূর্ব্ব মেধা মাঝে মাঝে অবাক করে দিত—প্রভাকে। প্রভা নিজে হাতে তার শিক্ষার ভার হাতে তুলে নিলো। শিশুবয়স থেকে পুরাণের রামায়ণ মহাভারতের সব গল্প দিদিমার মুখে শুনে তার কণ্ঠস্থ ছিল। কবিতা আবৃত্তিতে তার ছিল অসাধারণ দখল। প্রভা তাকে ডাকতো পণ্ডিতদাদু বলে। ঐ সময় অনুর বড়ছেলের টাইফয়েড হল। প্রভা তাকে নিয়ে আলাদা রইল কারণ রোগটা ছোঁয়াচে। এধারে গদায়ের হুকুম চট্ করে ওষুধ দেওয়া হবে না, অন্য ডাক্তার তো নয়ই। রাতের পর রাত জাগছে প্রভা। গদাইএর তার দিকে খেয়ালই নেই। মাঝে মাঝে প্রভার মনে হত গদাই কি চিরকালই এক-ভাবে থাকবে? ছেলেমানুষী কি কোনদিনই তার সারবে না? সাংঘাতিক একগুঁয়ে একবগ্‌গা মানুষ, না দেখবে নিজে না দেখাবে অন্য ডাক্তার। মাঝে মাঝে প্রভার মনে হয় সে যেন পাগল হয়ে যাবে। বাসুদেবের জামা-কাপড় কিনতে যাতে মার কষ্ট না হয় সেজন্য নিরুপমা তার মেয়েটিকে ছেলের পোষাক পরাত আর সেই জামার অংশ পেয়ে বাসুদেব বড় হয়ে উঠলো। এই তিনটি শিশুর সেবা তার সংগে মার সংসারের কাজের সাহায্য আর রুগ্ন উদাসীন বাপের সেবায় বেণু তার সর্ব্বশক্তি নিয়োজিত করলো। তবুও গদায়ের চাহিদা যেন মেটেনা তার সদাই অসন্তোষ।

সদাশিববাবু ভাবেন, প্রভার একি অন্ধমায়া গদায়ের ওপর। যা অবস্থা হয়েছে, বিয়ে ত দেওয়া অনুর যাবেই না অন্তত নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য পড়াশোনার অবসরটুকুও ত তাকে দেওয়া উচিত ছিল।

গদায়ের আইন সম্পূর্ণ পৃথক। নিজের বাবা মার বেলা অন্য ব্যবস্থা। প্রভা ও সদাশিববাবুর বেলা অন্য ব্যবস্থা। যদি একান্ত না পেরে অনু কখনো কিছু বলতো, গদাই বলতো দেখো এখন আমি একচক্ষু হরিণের মত শুধু আমার বাবামার কথাই ভাবছি। তারপর তোমার বাবা মা যখন বুড়ো হবেন তখন দেখো ঠিক এমনি করেই তাঁদের জন্য করব। কিন্তু যেদিন অকালে অনু মৃত্যুবরণ করলো সেদিন ৬৫ বছরের সদাশিববাবু আর ৬০ বছরের প্রভার দিকেও সেই হরিণচক্ষু আর খুললো না। সেই একচক্ষু হরিণের কথা আজো প্রভা ভুলতে পারেনি।

যাক যেকথা বলছিলুম—শুধু প্রভা আর বেণুর হয়েই শাস্তি শেষ হলনা। সবচেয়ে বেশী শাস্তি পেয়েছিল অনু। যখনই রামু চাকর ফিরে আসে গদায়ের চেম্বার থেকে, প্রভা জিগেস করে দিদি কি করছিলরে? না দিদি? দিদি ত ভিজেকাপড় পরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে-ছিল। যতবারই জিগেস করা যায় সেই একই উত্তর দেয় রামু। আবার দু দুদিন সদাশিববাবুও সেই এক অবস্থাতেই অনুকে দেখলেন—প্রসন্নবাবুকে দেখতে গিয়ে। ডিসেম্বর মাসের শীত, অনু ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে ভিজে কাপড়ে। দেখে সদাশিববাবু জিগেস করলেন, হ্যাঁরে ভিজে কাপড়টা ছেড়ে আয়না। অনু উত্তর দেবার আগেই হাঁক পাড়েন প্রসন্নবাবু, অবৌমা, মিকচারটা দিয়ে যাও না। আর মশাই এ ছত্রিশজাতের এটো-কাটার মধ্যে বৌমা ভিজেকাপড়ে শুদ্ধাচারে থাকেন বলেই যা জলটুকু খেতে পাই নইলে তাও জুটতো না। সদাশিববাবুর কাছে এতক্ষণে সব প্রাঞ্জল হয়ে গেল। আজকে আর গোপন করলেন না প্রভার কাছে ঘটনাটা। বললেন, জানো ওখানে প্রসন্নবাবু থাকলে মেয়েটাকে বাঁচানো যাবে না। প্রভা বলে ওদের আচারবিচার-এর মাথামুণ্ডু কিছু নেই, সব লোকদেখানো সব লোক-

ঠকানো। এই ত রামু হাতে করে ভাত বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ট্রামে বাসে করে শুদ্দুর তো শুদ্দুর কত মুদ্দফরাসের ছোঁয়া কে জানে তা সোনা হেন মুখ করে খাচ্ছেন প্রসন্নবাবু অথচ ঘরে শুদ্দুর ঢুকলেই জাত যাবে। শুধু মেয়েটাকে কষ্ট দেবার ফিকির। তোমার মনে নেই—সেবার খোকনের পৈতের পর দীঘে বেড়াতে গেল না গদাই? সেখানে নাকি খোকনকে মুর্গি খাইয়েছে। অনু ত অত বোঝেনা সরলমানুষ। বললে, একটা বছর ত নিয়ম পালন করা উচিত মা কিন্তু তোমার জামাই বললে বিদেশে নিয়ম নাস্তি। প্রভা যতই ভাবে গদায়ের মনের তল পায় না। যাকগে অত ভাবার অবসর নেই এই দারুণ শীতে যদি মেয়েটার নিমোনিয়া হয়? প্রভা চঞ্চল হয়ে বললো, যা করে পারো প্রসন্নবাবুকে এখানে নিয়ে এসো। সদাশিববাবু বললেন, দেখো প্রভা গদাইকে আমি বড় ভয় করি। কোন কথার সহজ মানে ও নেয় না। ঐযে হরেন চাটুজ্জে জজ্ আমার হাতে গড়া ছেলে, আজো আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে, আমার সামনে চেয়ারে বসে না। আমার খাতিরে বিনা পয়সায় গদায়ের জন্যে কি খাটুনিটা না খাটলো। গদাই বললো কিনা শ্বশুরমশাইকে নিয়ে গিয়ে আমার সব মার্ডার হয়ে গেল। সব সময় গুজ্ গুজ্ ফিস ফিস এক এক জায়গায় একরকম কথা—ওসব আমি বুঝি না—ওর ভাষা বোঝার সাধ্যি আমার নেই। আমি যা বলবো তার উল্টো মানে করবে ও। ওর বাপের আনার ব্যাপারে আমি কথা বলতে পারব না। ভদ্রলোক যেমনই হোক না কেন বৃদ্ধবয়সে বিপন্ন হয়েছেন, এখানে আনায় আমার কোন অমত নেই—কিন্তু শেষে যা গদায়ের স্বভাব ও ঠিক উল্টো চাপ দেবে তখন অনু ত অনু তুমিও হয়ত ভাববে, আমি বুঝি কি উল্টো কথা বলেছি। অনেক করেছি আমি অনুমার মুখ চেয়ে। জীবনে যে অসম্মান কারুর কাছ থেকে পাইনি, গদায়ের কাছে তা নিত্যপ্রাপ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আর আমায় এসব ব্যাপারে জড়িও না। সদাশিববাবুর কাছ থেকে এমন সাফ জবাব পেতে অভ্যস্ত ছিলেন না প্রভা, সহজেই তাঁর চোখে জল এসে গেলো। কোন কথা বললেন না তিনি। দুপুরে পাশের বাড়ীর নেড়াকে নিয়ে বেণুর হাত ধরে চেম্বারে গেলেন গদায়ের। গিয়ে দেখেন গদাই পাশের ঘরে মাদুর পেতে ঘুমুচ্ছে, অনু প্রসন্নবাবুর পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছে।

প্রভাকে দেখে প্রসন্নবাবু কেন জানিনা খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। এতটা প্রভা আশা করে নি। বললেন প্রসন্নবাবু, জানেন বেয়ান, সেজোবৌমাকে এত সুন্দর সেবা করতে শেখালেন কি করে বলুন ত? প্রভা বললো, একি আবার শিখতে হয়। ভালোবাসলে সেবা আপনি আসে। প্রভার বুক ধুকপুক কাঁপছে। গদাই না ফাঁকড়া তোলে। চটপট করে প্রসন্নবাবুকে বলে, চলুন দেখি আপনি বালিগঞ্জে। দেখুন কত চটপট সেরে উঠবেন। আপনার মত জ্ঞানী লোক, আপনি কেন ভাববেন এরবাড়ী ওরবাড়ী? আমরা তো প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি, ট্রেন আসলেই উঠে পড়বো। আমি পায়ে ধরে আপনাকে নিতে এসেছি—চলুন বালিগঞ্জে। যাবেন কথা দিন আমায়। প্রসন্নবাবু যেন অবাক চোখে তাকান। মৃত্যুপথযাত্রীকে এত সম্মান দেওয়া এভাবে রোগীর ঝঞ্ঝাট নিজের ওপর টেনে নেওয়া তিনি বোধহয় কখন দেখেন নি। হঠাৎ অশ্রুসজল চোখে বলেন, যাবো, বেয়ান যাবো—দেখছি ত কি ঝকমারি আপনার হচ্ছে কিন্তু জানেন ছেলেটার আবার কী যে মান মান বাতিক ওই মানতে চায় না। কিন্তু আমি বলি কক্ষনো ভুলিসনি, উনি শুধু তোর শ্বশুরই নন দুর্দিনে আশ্রয়দাতা অন্নদাতা। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যাইহোক আপনি যখন এত করে বলছেন, বালিগঞ্জে আমি ঠিক যাবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এরপর গদাই এসে প্রভাকে দেখে পাশের ঘরে চলে গেল। প্রভা ফেরার আগে গদাইকে বললো, বেয়াইমশাই বালিগঞ্জে যেতে রাজী হয়েছেন তুমি সেইমত ব্যবস্থা করো।

কিন্তু ব্যবস্থা অত সহজে হলনা। সামনের গো দিয়ে তোলান চলবে না, প্রসন্নবাবুকে বলে—পুরে

ঝরঝরে বাড়ীর পাশের দেয়াল ভেঙে আলাদা দরজা বসানো হয়। আর নিচের ঘরে প্রসন্নবাবু থাকায় সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে প্রভার বুক ধড়ফড়ানি রোগ জন্মে গেল। প্রসন্নবাবু এখানে এসে কিন্তু প্রসন্নমনেই রইলেন। কিন্তু অপ্রসন্ন হল গদাই। হঠাৎ এসে বলে, একটা ঘর ঠিক করে এলুম বাবার জন্তে। অতীন মাষ্টারের বাথরুমটা ঐটে পঞ্চাশটাকার ভাড়া নোব ঠিক করে এলুম। প্রভা বলে সেবা করবে কে? গদাই বলে কেন অনুও যাবে। অনুকে অবিশ্যি ওদের উঠোনের ওধারে লোকজনদের ঘরের একটা ঘরে থাকতে হবে। বিষ্টি হলে যা একটু অসুবিধে। ঘরগুলো টিনের চাল হলেও মেজে পাকা। এত সুবিধের খবর শুনেও প্রভা উল্লসিত হতে পারেন না। দুপুরে প্রসন্নবাবুকে বলেন এ খবর। প্রসন্নবাবু কেন জানি না ঈষৎ সান্ত্বনার সুরে বলেন, কেন আপনি অত ভয় পাচ্ছেন বেয়ান—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি মৃত্যুর আগে এবাড়ী ছেড়ে যাবো না। এর মধ্যে গদায়ের দেনার দায়ে বাড়ী বন্ধক দেওয়া হল।

কিন্তু এতেই যে উৎপাত শেষ হল তা নয়। একদিন অনুকে রাঁধতে দেখে বিপদতারিণী বললো, বাঃ বাঃ বেশত মেয়ের গলায় হেঁসেল তুলে দিয়েছেন। আমাদের বাড়ী থাকতে একদিনও অনুকে রাঁধতে হয়নি। প্রভা বলতে পারেন না যে রাঁধতে হয়ত হয়নি সত্যি কিন্তু বাসন মাজতে হয়েছে—শুধু বাসন মাজাই নয় ড্রাইভারের এঁটোও মাজা। কারণ তারা পুরুষমানুষ কাজেই মদনমোহন তলায় গাঙ্গুলি বাড়ীর বৌরা তাদের বাসন মাজতে বাধ্য।

একবার বেণু যখন ছোট—অনুর খোকার না অনুর সাহায্যর আশায় প্রভা বেণুকে অনুর বাড়ীতে রেখেছিল। তখন ব্লাকআউটের দিন। চাকরবাকর সব পালিয়েছে। হঠাৎ সাইরেন বেজে উঠলো। অনুর জায়ের মেয়েদের সঙ্গে বেণুও বারান্দায় খেতে বসেছে। প্রভার আর্থিক সম্পদে দরিদ্র থাকলেও মেয়েরা তার বড় আদরের ধন। তার ওপর বড়মেয়ে নিরুপমার বাড়ীতে তাদের আদর যত্নের অন্ত ছিল না। সেইখানে মেজদির বাড়ীতে শালপাতায় করে ভাত খেতে বসে একেই বেণুর অনাদর ও অবজ্ঞার কথা মনে করে চোখে জল এসে যাচ্ছিল। এমন সময় বিপদতারিণী তার স্বভাবসিদ্ধ রূঢ়কণ্ঠে বলে উঠলো, কি ভাত নিয়ে ন্যাকর-চ্যাকর করছ বেণু খেয়ে ফেলো না চট্ করে। ব্যস আর যায় কোথা, বেণু উঠে দাঁড়ালো ভাত ফেলে—শত হোক ছোটমেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো, রূপোর বাসন নেই শ্বেত পাথরের থালা নেই আবার বকছে?" থমকে গেল বিপদ, মেয়েদের এ চেহারা দেখতে তারা অভ্যস্ত নয়।

বেণুর কান্না শুনে ছুটে এলো অনু। বলাবাহুল্য এরপর অনুর খোয়ারের শেষ রইল না। বাপমা যে আদর দিয়ে দিয়ে মেয়েগুলির পরকাল ঝরঝরে করে দিয়েছেন তাতে বিন্দুমাত্র সংশয় রইল না গাঙ্গুলী বাড়ীর।

সেই বেণু বড় হয়েও কম গোলমাল করে ফেলত না। গদাই সবসময় ধার বলে সদাশিববাবুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে কোতো নবাবী করে বেড়াত। যেমন পুজোয় সময় তার ভায়ের মেয়েজামাই নাতিনাতনীকে কাপড় দিতো বেশ মূল্যবান কাপড়। কারণ গদায়ের শাস্ত্রে মানুষের স্নেহ ভালোবাসার বিন্দুমাত্র মূল্য ছিল না। যাকিছু মূল্য তা আর্থিক মূল্য। একবার পুজোর কাপড় কিনতে গেছে গদাই। সঙ্গে ছিল বেণু—বেণুকে পুজোয় একটা রিবনও কোনদিন কিনে দেয়নি গদাই কিন্তু নিরুপমার মেয়েকে একটা সাড়ী দিতো। কারণ দীপক-দের বাড়ীতে জাঁক দেখানো দরকার। একই সঙ্গে নিজের ভায়ের মেয়ের দামী কাপড়। আর নিরুপমার মেয়ের জন্য সস্তা চটকদার কাপড় কিনলো গদাই। কিশোরীবেণু তার এই তারতম্য না বুঝে বললো, কেন মেজদা ওরই জোড়ার কাপড়টা নাও না খুকুর জন্তে। ব্যস আর যায় কোথা! গদাই বললো, দেখা যাবে নিজের

বিয়ে হলে কত দামী কাপড় কিনে দাও খুকুকে। ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে বেণু জলভরাচোখে থেমে যায়। ভগবান বেণুর সে ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ করেছিলেন বেণুর স্বামী নিজের ভাইবোনদের সঙ্গে বেণুর বোনদের বছরে এই একবার কাপড় দিতে এমন কার্পণ্য দেখায় নি। যতই হোক গাঙ্গুলি বাড়ীর মরদের বাচ্চা ত সে নয়।

বেণুর ওপর একটা অহেতুক রাগ গদায়ের ছিল। এখন মনে হয় সেটা বোধহয় অনুর বেণুর প্রতি অকৃপণ ভালোবাসার প্রতিই গদায়ের বিতৃষ্ণা। নিরু ও অনু মাত্র দুবছরের ছোট বড়। মার কোলে আটবছর ধরে অনু কোলেরই ছিল। আটবছর বাদে প্রভার সাতাশ বছর বয়সে বেণু যখন কোলে এলো প্রভা তাকে প্রসন্ন-মনে কোলে তুলে নিলেন না। বললেন, এই শেষ বয়সে আর ছেলে মানুষ করার শক্তি নেই বাবা। তাছাড়া তার আগেই কঠিন টাইফয়েডে তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল।

অসুস্থ সদাশিববাবুর পরিচর্য্যা গৃহস্থালী ও অনু নিরুর জীবন রক্ষাই তাঁর কাছে কঠিন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল, অবার দায়িত্ব বাড়ায় ভয় পেলেন তিনি। যদি বা হল, ছেলে হলনা কেন? তবু শেষ বয়েসে দেখতো? এযে আবার কঠিন বোঝা। প্রভার দায়িত্বপুর্ণ সংগ্রামী-মন আশঙ্কিত হল। পারব কি একে মানুষ করতে?

সেই অবহেলা ও অনাদরের মধ্য থেকে তাকে সাগ্রহে দুটি বোন তুলে নিলো। ওমা কি সুন্দর বোনটি হয়েছে তাদের? রং যেন শাঁখের মত ধবধবে। মোমের পুতুলের মত গড়ন। আর কি সুন্দর চোখ যেন দেবশিশুর মত। রইল তাদের পুতুলখেলা, রইল তাদের হাঁড়িকুড়ি এই জ্যান্ত পুতুল নিয়ে মেতে উঠলো তারা। মেতে ওঠা বললে ভুল হবে। প্রভার সুন্দর মন গঠনের ফলে তারা বরাবরই বাপ মার সুখের সুখী দুখের দুখী হয়েছিল। নিজেদের পুতুলখেলার স্পৃহা মেটানর জন্য নয়। মায়ের কষ্ট উপশমের আশায় ও বোনটির প্রতি মমতা-পরায়ণতার ফলে সে দুটি কিশোরী মা তাদের সর্ব্ব-শক্তি নিয়োজিত করেছিল।

যে মা তাঁর অত আর্থিক অভাব সত্বেও প্রতিটি জামা ইস্ত্রি করে পরিয়েছেন সেই মা যে আজ পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া জামা পরিয়ে বেনুকে মানুষ করছেন এটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। ফলে বেনুই মানুষ হল অত্যধিক আদরের মধ্যে। পূর্ব্বেই বলেছি সদাশিব বাবু চিরকালই একটু শিশু প্রকৃতির। প্রথম যখন নিরু অনুর জন্ম হলো তখনও বোধ হয় তার পিতৃত্ব তেমন করে জাগ্রত হয়নি। প্রভা আগাগোড়া মাতৃত্ব দিয়েই গড়া। তাঁর কাছে বড়রাও যেমন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্নেহ পেতো ছোটরাও পেত তেমনি মমতার সঙ্গে স্নেহ। মাতৃত্ব ছিল তাঁর সহজাত। যখন তিনি বালিকা বধূ তখন তাঁকে দেখে তাঁর শ্বশুরের একবন্ধু বলেছিলেন এযে সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী—। সেই জগদ্ধাত্রী কথাটাই যেন তাঁকে দেখলে সর্ব্বাগ্রে মনে হত।

সদাশিববাবুর মনে পিতৃত্বের জোয়ার এল বেনুর আগমনে। অনু নিরুর বেলা কন্যার আগমনে সদাশিব বাবুর মা যা না অবহেলা অবজ্ঞা করে অনাদর দেখিয়েছিলেন বেনুর বেলা পূর্ণোদ্যমে উল্লাস প্রকাশ করে সদাশিববাবু তাঁর অনেক সখ মেটালেন। সোনার বালা এলো বেনুর জন্যে, এলো সাটিনের মূল্যবান বিছানা, এলো রূপোর ঝিনুক-বাটি কাজললতা। এর মধ্যে নিরুপমা অনুপমার হাত ছিল কিনা প্রভা ভেবে দেখেন নি। সদাশিববাবুর খেয়াল দেখে অকারণ অপব্যয়এর আশংকায় ভৎসনা করেছিলেন। এইটেই ছিল প্রভার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। মনে মনে তিনি সকলকেই ভয় করতেন কারণ অন্তরের ভালোবাসাটা ছিল খাঁটি। কিন্তু মুখে দুর্ব্বলতা প্রকাশ তাঁর স্বভাবে ছিল না। অত্যন্ত মন প্রধান মানুষ ছিলেন তিনি। পিতৃ হৃদয়ের অগাধ ভালোবাসার মধ্যে মানুষ হয়ে তাঁর মন আরো মমতা-কোমল হয়ে উঠলো। কারুকে প্রণাম করতে তাঁর চোখে জল এসে যায়, জল এসে যায় আনন্দে। স্বভাব-মাধুর্য্যে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষের হৃদয় জয় করে নিতেন। সদাশিববাবুর মা কাদম্বিনী পুত্রবধূর

এই মনকে চিনলেন না। পরভোলানি ঘর জ্বালানি আখ্যায় শ্লেষ করলেন। পানসে চোখ বলে বিদ্রূপ করলেন। ভালোবাসাকে আদিখ্যেতা বলে হাসলেন। আগ্নেয়গিরির মত মনে মনে জ্বলে উঠলেন প্রভা। সেই আগুন তাঁর বহিঃপ্রকাশকে চিরদিনের মত রুদ্ধ করে দিলো। গুরুজনকে অসম্মান করতে শেখেন নি প্রভা। সেই সম্মানের জন্য নিজেকে কঠিন আবরণে আবৃত করলেন। আনন্দময়ী মূর্তি হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্যে—। কিন্তু উদাসীন সদাশিববাবু তার এ পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন না ভাবলেন যাহোক মা ত শান্ত হয়েছেন।

এরপর উদ্যত বজ্র ও শাণিত তরবারি নিয়ে অবতীর্ণ হল প্রভার জীবনে গদাই। মন বলে বস্তু নেই সম্পূর্ণ বস্তু তান্ত্রিক মানুষ। গীতায় তামসিক গুণের বর্ণনা বারে বারে মনে পড়ে প্রভার। যেমন হাঁসখালির জমিদারীর ব্যাপার। সব সম্পত্তি ও কারবার থেকে গদাই বঞ্চিত হবার পর প্রসন্নবাবু তাকে পৈত্রিক বাড়ীর কিছু অংশ আর হাঁসখালির কিছু জমি দিয়েছিলেন। সেই জমি দখল করারও কী কম ঝঞ্ঝাট—। সব বিষয়েই গদায়ের যতবা আলস্য ততবা ভয়। কিছুতেই জমী দখল করতে যাবে না সে। তখন কী অসুখ সদাশিববাবুর! রোজ রাতে একটা হাঁপানির মত হয়। তার সঙ্গে না সর্দ্দি না কাসি। কাজেই কার্ডিয়াক এ্যাজমা হয়ারই সম্ভাবনা। দিনে তার ওপর যথারীতি অধ্যাপনা চলছে। এই অবস্থায় তিনি সঙ্গে যাচ্ছেন। যাচ্ছেন রামবাবুর মানুষ করা ছেলে মুক্তিপদ, যাচ্ছে নিরুর স্বামী দীপক। কিন্তু কিছুতেই যাবে না গদাই। বলে আপনি জানেন না ওরা মেরে লাশ করে পুঁতে দেবে। নিরুপায় প্রভা গদায়ের ক্লীবত্ব দেখে কঠিন হয়ে উঠে বলে, তবুও তোমাদের যেতে হবে। তোমরা পুরুষ না? খাটের তলায় লুকনোর চেয়ে খাটে করে ফিরে আসা ভালো। মুক্তিপদ তখন ইন্‌সপেক্টারের কাজ করত। তার বন্দুক অনায়াসে জয়ী হল। বিনা দাঙ্গায় জমী দখল হোল। কিন্তু কিছু করেই গদাইকে খুসী করা যায় না। গদাই যাবে না দেখবে না দেখে এক নায়েব রাখতে হল। আবার কিছু খরচ বাড়লো উপায় কি?

গদায়ের ত মুখেন মারিতং জগৎ। কিন্তু কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। সত্যি প্রভা অবাক হয়ে ভাবে, এত ঘুমুতেও মানুষ পারে। সারারাত ঘুমিয়ে তার আশ মেটে না। সকালে হাসপাতাল থেকে ফিরে সারা দুপুর টানা নিদ্রা। আবার বিকেলে চেম্বার নামক ক্লাব থেকে ফিরে সন্ধ্যার গজালি সেরে ঘুম। ধার বলে সদম্ভে টাকা নিয়ে চলেছে গদাই কিন্তু একবারও ভাবেনা এতধার পাবেন কোথায় সদাশিববাবু? বাড়ী বন্ধক দিয়েত মকর্দ্দমা চললো, চললো প্রসন্নবাবুর কাশীবাস চিকিৎসা আবার সেই ধারেই রাখা হল নায়েব। বাপ মার অবস্থা বুঝে অনুর চোখের জল বাধা মানে না। ধুতিতে পাড় বসিয়ে মা পরছে। বেণুর একটা মাস্টার নেই। রীতিমত ঝিগিরিতে বাহাল হয়েছে বেণু। সাধ্যমত অনু মার সাহায্য করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু সাহায্য করা কঠিন। শ্বশুরবাড়ীর আইনমত বেলা আটটায় উঠবে গদাই, তার আগে অনু উঠলে বিভ্রাট। আটটার সময় অনু যখন রান্নাঘরে যায় দেখে মার রান্না সারা। বলে, কেন অত সাত তাড়াতাড়ি করো মা, আমি উঠে করতুম। প্রভা বলেন ন'টায় তোমাদের বাবা খাবেন তাছাড়া এতো আমার চিরকালের অভ্যেস রে। অনু বলে তখন ত এত রান্না হত না তোমাদের। বেনু বেচারী সকাল থেকে খোকাখুকুকে সামলাচ্ছে। নতুন জামায়ের হত চালচলন গদায়ের, পাছে তার সম্মানহানি হয়। শিশু বাসুদেব বেলা আটটা অবধি না খেয়ে থাকবে এই অদ্ভুত খেয়ালটা গদায়ের মানতে পারেন না প্রভা। সামনে দাঁড়িয়ে দোয়ান গরুর দুধ জ্বাল দিয়ে বোতলে ভরে বেনুকে বলেন, ছাতের দিকে জানালা দিয়ে বোতলটা অনুকে দে। নইলে বাসুদেবকে ডেকে দে।

একদিন অনু সকাল সকাল উঠে রান্না করতে বসেছিল,

গদাই তাই নিয়ে হৈ চৈ আরম্ভ করলো। বললো, আমার যখন আলাদা সংসার হবে তখন সকালে ঢালাও লুচি, তরকারি হবে যার যত খুশী খাও। ভাত হবে বেলায় অর্থাৎ গদাই ছুটোয় হাসপাতাল থেকে গিয়ে গরম ভাত খাবে। এই কথাসর্ব্বস্ব মানুষটিকে বড় ভয় করেন প্রভা। অনুকে বলেন, কেন যে ছুটে আসিস রে, আমার কোন কষ্ট হয় না এটুকু কাজ করতে। ফল কি কোনদিন গাছের কাছে ভারি হয়? তবে তোদের ছেলে-মেয়েরা বড় হলে সকাল সকাল রান্না তো তোকে করতেই হবে। নতমুখী অনু বলে "ও বলে সব্বাই সকালে লুচি খেয়ে যাবে ওদের বাড়ীর ঐ নাকি নিয়ম ফিরে এসে চারটেয় ভাত খেত ওরা। যেমন মুখ্যুর বাড়ী তেমনি মুখ্যুর মত নিয়ম। পৃথিবীশুদ্ধ ছেলেমেয়ে বাড়ীর কর্ত্তারা স্নান করে দশটায় ঝোলভাত খেয়ে অফিস ইস্কুল করছে শুধু কারবারী মানুষরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি নয়। যেমন কোথায় কারবার কোথায় ব্যবসা তার ঠিক নেই। গদাই গণেশ আর বিশ্বকর্ম্মা পুজো নিয়মিত করে যাচ্ছে। ওদের বাড়ীর কোন ঐতিহ্য ভুলতে রাজী নয় ও। কিন্তু প্রভা হেসে ভাবে, ওদের বাড়ীর আছে কি? সদাশিব আর প্রভা যদি বুক দিয়ে আগলে ওদের না দাঁড়াতো ওরা কোথায় ধুলোর মত নিঃশেষে গুঁড়িয়ে মিশে যেত। যাকগে, বুঝুক বা না বুঝুক ওদের বাঁচাতে হবেই।

ইতিমধ্যে একদিন নায়েব এলো। হাঁসখালি থেকে কিছু মাছ নিয়ে। বিলের মাছ। গদাই বাড়ী ছিলনা। গোটা কুড়ি চারা পোনা একপো দেড়পো হবে। অনু মহাখুশী। ম্লানমুখী অনুর আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে প্রভা সেই মাছ কেটে কুটে রান্না করলেন। কিন্তু গদাই এসে মহা হম্বিতম্বি আরম্ভ করলো। কেন ও মাছ নেওয়া হল? এসব মুক্তিপদর ফন্দি, ঘুস দিয়ে মুখ বন্ধ করা—ইত্যাদি। অনুকে উপলক্ষ্য করে প্রভাকে কোন কথা শোনাতে কসুর করল না সে। প্রভাকে একটা কথা শিখিয়েছিল গদাই উপলক্ষ্য করে পাঁচালি গাওয়া। যাকে আমরা বলি ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো। অনেক দুঃখজনক বেদনাদায়ক কথার অবতরণা করল। শেষে থামতেই চায়না রামবাবুর স্নেহের পাত্র মুক্তিপদর সম্বন্ধে যখন কঠিন কথা উঠলো তখন প্রভার পক্ষে আর সহ্য করা সম্ভব হল না। প্রভা বললো "সে বেচারার লাভ কি? আমাদের ভালোর জন্যেই তার খেটে মরা—" ব্যস আর যায় কোথা?

অনু বেচারী মুক্তিপদর বিষয় মাকে বোঝাতে যেতেই গদাই আরো ক্ষেপে উঠলো বললো, চুপ কর অনু আমরা যাই বলতে যাবো দোষী হব।

কথাটি সামান্য কিন্তু এই সামান্য কথা বজ্রের মত আঘাত করলো প্রভার বুকে। গদাই অনুর আমরা আর প্রভার যে পৃথক এই কথা প্রভার পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। গদাই অনুকে যদি নিরুপমা বেনুর মতই প্রভার নিজস্ব বলে না জানবেন প্রভা, তাহলে এত কষ্ট করে যথাসর্ব্বস্ব শেষ বাড়ীটি পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়ে এই আপ্রাণ চেষ্টা কেন করবেন তাঁদের বাঁচানোর জন্য। যখন এক কাপড়ে নিঃস্ব হয়ে গদাই অনু তিনটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে এসে দাঁড়িয়েছিল তখন সদাশিববাবু ভয় পেয়েছিলেন তাদের ভার নিতে। বন্ধুবান্ধবরা বারণ করেছিলেন ওদের আশ্রয় দিতে কারণ তাঁরা জানতেন প্রভা সদাশিববাবুর সামর্থ্য কতদূর। পিতৃবন্ধু বনবিহারীবাবু বলেছিলেন, কেন গদাই বাড়ী ছেড়ে এলো?

প্রভা বলেছিল যখন এসেছেই তখন আর সেকথা ভেবে কি লাভ কাকা? এখন কি করা যায় তাই ভাবতে হবে। এর পরও বিভ্রাট কম নয়। ভাগে সে বাড়ী গদাই পেয়েছে তা সে মেরামত করতে পার্টিশান করতে ভয় পায়, পাছে সে পাড়ায় গেলে মার খায়। অথচ টাকার একান্ত প্রয়োজন। কলকাতার মধ্যে অত বড় বাড়ী ফেলে রেখে তার ট্যেক্স গোনা অনর্থক। গদাই তা না না না করে দিন কাটায়। প্রভা এবার নিজের এক পিতৃবন্ধুর কাছে টাকা ধার করে বাড়ী মেরামতির-কাজ আরম্ভ করল। কিন্তু গদায়ের কাজ করা সহজ নয়। সবেতেই তার চিন্তা। চিন্তার ফলে

কাজ আর হয়ে ওঠে না। চিরকালের পুরণো কাসেম মিস্ত্রিকে তার তাকে অবিশ্বাসের শেষ নেই।

গদায়ের হুকুম হল রোজ গিয়ে সিমেন্ট বালি মিশিয়ে দিয়ে আসতে হবে। কাজটি সোজা নয়। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হয় দুত্তোর আর পারি না। কিন্তু অনু—অনুরাগী তার জীবনে যে গাধাবোটের সঙ্গে তাকে জুড়ে দিয়েছে প্রভা সে গাধাবোটকে খানিক টেনে দিয়ে যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। কিন্তু প্রভা বড় ক্লান্ত আর যেন পারে না।

তারপর সেই পুরনো ভাঙা কার্ণিচারের বোঝা এনে সদাশিববাবুর দুটো ঘর বন্ধ হল। প্রায়ই সদাশিববাবু বলতেন, কী যে অনুকে রক্ষা করার নেশায় তোমায় পেয়েছে প্রভা—ঐঘর দুটো ভাড়া দিলে বছরে অমন অনেক কার্ণিচার পাওয়া যায়। গদায়ের কার্ণিচার ব্যবহার করবার প্রভার একান্ত অনিচ্ছা। তবুও সদাশিববাবুকে ঠাণ্ডা করার জন্যে প্রভা ঘর দুটো খালি করে সারা বাড়ীময় কার্ণিচার সাজিয়ে রাখলেন। যেন ঐ কার্ণিচারে প্রভারই বড় উপকার হয়েছে। আর সব চেয়ে শিশু সরলপ্রকৃতির সদাশিববাবুকে খুসী করবার জন্যে তাঁকে একটা পৃথক আলমারা দিলেন। প্রভা জানতেন সদাশিববাবুর এই দুর্ব্বলতা তিনি তাঁর সব জিনিষ এলোমেলো করে ফেলতেন বলে প্রভা তাঁর জামাকাপড় নিজের হেপাজতে রাখতেন। কিন্তু এখন তাঁকে একটা আলমারী ও জামা কাপড় দেওয়ায় তিনি তার ওপর প্রভার নির্ভরতা দেখে সন্তুষ্ট হয়ে ভাঙাচোরা আবর্জ্জনা কাগজপত্রে নির্ভাবনায় আলমারিটি ভরিয়ে ফেলে সদর্পে আইনজারি করলেন ওটা যেন কেউ না ঘাঁটাঘাটি করে অর্থাৎ প্রভা যেন খুলে না ওঁর কার্য্য-কলাপ দেখে বিরক্ত হন। সদাশিববাবু ত' শান্ত হলেন কিন্তু কাসেম মিস্ত্রির ওপর সামান্য একটা ছুতো দেখিয়ে গদাই খড়্গহস্ত হল। কাসেম মিস্ত্রি দীর্ঘকাল ধরে সদাশিববাবুর কাজ করছে। অপুত্রক সদাশিববাবু তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে চিরদিন কাজ করিয়েছেন। কাসেম কখনও সে বিশ্বাসের অপব্যবহার করেনি। টাকা না থাকুক দেশে বিদেশে ভাঙাচোরা খানকতক বাড়ী ছিল সদাশিববাবুর। পৈত্রিক বাড়ীগুলি থেকে আয়ের চেয়ে ব্যয়ই হয়ত বেশী হত। তবুও প্রাণ ধরে বাড়িগুলি তিনি বিক্রি করতে পারেন নি। কারণ বাড়ীগুলি পৈত্রিক, পিতৃদেবের স্মৃতিবিজড়িত। ঐ পূত পবিত্র গৃহমন্দির সাধারণ অর্থের বিনিময়ে অন্যের হাতে তুলে দিতে তাঁর প্রাণ সরতো না। কাজেই সংসার খরচের সঙ্গে মাসে মাসে বাড়ী মেরামতির খরচ দিতে প্রভার প্রাণান্ত হত। সেই সময় ঐ কাসেম মিস্ত্রী সেই দেশ বিদেশে গিয়ে বাড়ী মেরামত বা ভাড়াটাকে শাস্ত করার দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়ে প্রভা ও সদাশিববাবুকে অনেক হাঙ্গাম থেকে রক্ষা করেছিল। এখন অবশ্য বাড়ীগুলি নেই। তবুও কাসেম মিস্ত্রি সদাশিববাবুর সংসারের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। কাজেই গদায়ের বাড়ী মেরামতের সময়ও সেই কাসেম মিস্ত্রির ডাক পড়লো। কিন্তু গদাই প্রথমেই কাসেমের ওপর অবিশ্বাসের ভাব প্রকাশ করলো।

এইখানেই প্রভার সঙ্গে গদায়ের মনের অমিল। প্রভা চিরকাল মানুষকে ভালো বলে মনে করে কম ঠকেননি তবুও মানুষকে ভালো ভাবার তাঁর অন্ত নেই। আত্ম-বিচার করার ফলে তিনি সর্ব্বত্র বলে বেড়ান "দোষ আমারই হয়েছিল, আমি বড্ড রাগী, আমারই হয়ত অসহ্য, আমার ছেলেমেয়ে তাই হয়ত আমি ভালো ভাবছি" ফলে স্বাবধাবাদী লোকেরা এর সুযোগ নিতে ছাড়ে না। কিন্তু অদ্ভুত মনোভঙ্গী তাঁকে কেউ খারাপ বললে তাঁর দুঃখ নেই কিন্তু অপরকে কেউ খারাপ বললে সইতে পারেন না সজোরে প্রতিবাদ করেন। তার মতে বিশ্বাস করে ঠকিলেও জানি জেতার চেয়ে সে ভালো।

এই মাল আনতেও কম বিভ্রাট ঘটলো না। বিরাট বিরাট বেঢপ গড়নের কার্ণিচার দরজা দিয়ে বেরোয় না। সব খুলে খুলে টুকরো টুকরো করে আনতে হল। প্রভার

জেদে ও কাসেম মিস্ত্রির আনুগত্যের ফলে সব জিনিষ এসে সদাশিববাবুর বাড়ী পৌঁছাল বটে তবে তাঁর কাসেম মিস্ত্রির দারুণ জখম হল হাত। প্রভা অভ্যস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন ব্যাকুল হয়ে কিন্তু রক্ত বন্ধ হল না। তখন তিনি গদাইকে বললেন, এখন ফার্ণিচার কী দেখছো গদাই আগে কাসেমের হাতটার ব্যবস্থা করো। এতে গদাই, অপমানিত বোধ করল। বললো, আমি কি কম্পাউণ্ডার, আমি কনসালটিং ফিজিসিয়ান ওসব আমরা করিনা।

কনসালটিং কথাটার অর্থ কাসেমের পক্ষে বোধগম্য হল কিনা কে জানে? সে কিন্তু ইনসাল্ট মনে করে সত্যিই ক্ষেপে উঠলো। সে বললো "আমিও মুটে নই জামাইবাবু, যার কথার মান রাখতে আমি জান দিতে পারি তাই এ ভূতের বোঝা বয়ে মরেছি।" বিব্রত সদাশিববাবু কোনরকমে দুজনকে ঠাণ্ডা করেন। সেদিনের কথা চিরকাল মনে থাকবে। কেউ যে নিঃস্বার্থ ভেবে ভালবেসে কারুর জন্য কিছু করে একথা গদাই মানতে পারে না। আর প্রভার মনোভাব ঠিক তার বিপরীত, তার মতে কেউ কিছু করলে চিরদিনই তার কাছে ঋণী হয়ে থাকতে হবে। টাকা দিয়ে মানুষের ঋণ শোধ হয় না।

বাড়ী মেরামত করতে গিয়েও কম বিপদে পড়লেন না প্রভা। প্রতিদিন গাড়ী ভাড়া করে মদনমোহন তলায় যেতে হয়। কলেজ কামাই করে সদাশিববাবুকে যেতে হয় সঙ্গে। অথচ সে যে কী পাড়া। পাড়ার কারুর যেন ভদ্রতা বলে কোন বালাই নেই। পাড়াশুদ্ধ লোক উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে সুরু করলো। তারপরে গাবু বলে একটা মাতাল মাইডিয়ার লেখা একটা মাথার বালিশ নিয়ে বাড়ীর রকে টলতে টলতে এসে শুয়ে পড়লো। কাজ দেখার পর যখন প্রভা ও সদাশিববাবু ফিরছেন কাসিম একটা তারের পাপোষ গাড়ীতে তুলে দিয়ে বললো এটা জামাইবাবুর চেম্বারে পাঠিয়ে দেবেন মা এখানে থাকলে হারিয়ে যাবে। গাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলো, গদায়ের শাশুড়ী কিছু ত পেল না, শেষে একটা পাপোষ নিয়ে পালাচ্ছে। প্রভার মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, মনে হয় ভগবান আরো কী কপালে বাকি আছে। যাক ওসব কথা, প্রসন্নবাবুকে নিয়েও কম বিপদ হল না প্রভার। সেই যে কথা আছে না রাজা যত বলে পরিষদ-দলে বলে তার শত গুণ। যদি প্রসন্নবাবুকে বেডপ্যান দিতে হয় সেখানে শুধু অনু খোকাখুকু থাকলেই চলবে না। শিশু বাসুদেবকেও হাজির থাকতে হবে। গদাই থাকবে না কারণ তার হাসপাতাল করে ক্লান্তি উপবাসের জন্য নিদ্রার প্রয়োজন। গদায়ের প্রতিনিধিরা হাজির থাকলেই পিতৃভক্তির যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হবে।

আবার একদিনের ঘটনা মনে পড়ে প্রভার। সকাল থেকে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়নি প্রসন্নবাবুর। তিনি ঝোঁক ধরলেন গদাই ছাড়া কারুর হাতে ডুস নেবেন না এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে কোন আহার গ্রহণ করবেন না। বাড়ীশুদ্ধ এমন কি প্রভাও তাঁকে বললেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য, তাছাড়া বিপদে নিয়ম নাস্তি। যদি অনু না পারে আমি আপনাকে ডুস দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু প্রসন্নবাবু রাজী হলেন না। গদাই হাসপাতাল থেকে ফিরে সব শুনেও নিশ্চিন্ত মনে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। বাড়ীশুদ্ধ সবাই খেলো, খেলেন না শুধু প্রসন্নবাবু। বিকেলে উঠে কাগজ নিয়ে বসলো গদাই। অনু চায়ের বাটি নিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে আর একবার কথাটা পেশ করলো। কিন্তু গদাই কথাটা যেন শুনেও শুনলো না। তারপর যথারীতি পোষাক পরে চেম্বারে বেরনর আগে প্রসন্নবাবুর নাড়ীটা দেখে বললো! আমি ফিরে এসে ডুস দোব। দিন কেটে রাত্রি এলো রাত আটটায় ফিরে বাসুদেবকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠলো গদাই। আবার অনু গিয়ে বললো জানো বাবা সারাদিন খাননি হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গলো গদায়ের, বললো খাননি কেন খেতে দাও। অনু বললো ডুস না নিয়ে খেতে চাইছে না। গদাই বললো, বলগে আমি খেতে বলছি। সে অন্তিমশয্যায় বৃদ্ধ রাতনটায় একপেট লুচি খেয়ে রা

দশটায় ডুস নিলেন। ঐ ডুসটা একটু আগে দিলে কত স্বোয়াস্তিতে থেতে পারতেন ভদ্রলোক কিন্তু সেকথা কে বলবে? সব খেয়াল গদায়ের।

এই প্রসঙ্গে অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ে যায় প্রভার, তখন অনু শ্বশুরবাড়ীতে। একবার এসে বললো, জানো মা আমার শ্বশুরের পায়ে কী একটা ব্যথা হয়েছিল। তোমার জামাই ওষুধ দিতে, আমার শ্বশুর জিগেস করলেন আচ্ছা পায়ে হাত বুলুলে কী হয়? তোমার জামাই বললো, সর্ব্বনাশ পায়ে হাত দিতে দেবেন না। ওমা তারপর ঘরে এসে কি হাসি। বললো দেখো তোমায় কী রকম বাঁচিয়ে দিলুম—নইলে সারারাত বসে পায়ে হাত বুলুতে হত। আজো প্রভার মনে আছে কথাটা। বলতে বলতে কিশোরী অনু মায়ের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিছলো—বুঝেছিল কাজটা সমর্থন যোগ্য নয়।

যতই অবুঝ অত্যাচারী আরামী বাপ হোক না কেন, যন্ত্রণার সময় যদি যন্ত্রণা নিবারণে সন্তানের আগ্রহের বদলে কূটবুদ্ধি দেখা দেয় সেটা অত্যন্ত মর্ম্ম-পীড়াদায়ক।

এরমধ্যে আবার এক বিপত্তি, চেম্বার থেকে এখানে প্রসন্নবাবুকে এনেও প্রভা নিস্তার পেলেন না। তাঁর নানা শুচীবাই, ঘরে শূদ্র ঢুকবে না। অনুকে একহাতে পিকদানী জলের পাত্র গামছা মাজন দিয়ে যেভাবে প্রসন্নবাবুর মুখ ধোয়াবে তা যে কোন সার্কাসের ক্ষিপ্রতা ও কৌশলের পক্ষে অনুকরণীয়। বাধ্য হয়ে প্রভা প্রসন্নবাবুর জন্য নার্স রাখলেন। উদয়াস্ত এভাবে খেটে মেয়েটা কি মরে যাবে? কিন্তু নার্সের সাধ্য নেই প্রসন্নবাবুর কাজ করে। মুখের ভেতর যায় হাত দিয়ে কুলকুচো বের করে দিতে হবে, তার সমস্ত কাজ একা করা অনুর পক্ষে সম্ভব হলেও নার্সের পক্ষে নয়। দিনে তিলমাত্র অনুর বিশ্রাম নেই। প্রভা আশা করলেন এই ব্যয়সাধ্য নার্স রাখায় যদি রাতটুকু অনু বিশ্রাম পায়। কিন্তু গদায়ের ইচ্ছা নয় যে রাত্রে গদাই বাপের কাছে থাকে। সারাদুপুর ঘুমিয়েও গদায়ের ঘুমের তৃষ্ণা মেটেনা। প্রসন্নবাবু তাঁর স্বভাবমত নার্স থাকলেও তার কিছু প্রয়োজন হলে নার্সকে দিয়ে গদাইকে ডাকান, কাজেই গদাই চায় যে সে ঘরে অনু থাকে। কাজেই অনুকে সে ঘরে শোবার কথা হল এই সময়। প্রভার স্বপক্ষে শিশু বাসুদেব এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ দোতলা থেকে একতলায় ঐঘরে থাকতে সে রাজী নয়। ভীষণ কান্নাকাটি আরম্ভ করল। প্রভা বাসুদেবের দোহাই দিয়ে অনুকে ওপরে শুতে বললেন।

এবারও গদায়ের কুটবুদ্ধি জয়ী হল। গদাই হুকুম দিলো যতই বাসুদেব কাঁদুক প্রভা যেন তাকে দোতলা থেকে সিঁড়িতে বের করে দরজা বন্ধ করে দেন। আজো শিশু বাসুদেবের সেই দরজার বাইরে থেকে মাথা খুঁড়ে তাকে ডাকা আর কান্নার সঙ্গে আর্ত্তনাদ প্রভাকে পাগল করে দেয়। এপাশে দিদিমা আর ওপাশে বাসুদেব দুজনে দুজনের প্রতীক্ষায় কেঁদে সারা রাত জেগে কাটান কিন্তু মাঝে গদায়ের নিষেধের প্রাচীর লঙ্ঘন করার সাহস কারুর নেই।

আবার প্রসন্নবাবু যে এবাড়ীতে অনুগৃহীত নন অত্যন্ত মাননীয় অতিথি এই বিষয় সকলকে সচেতন রাখার জন্য তার আহার্য্য সব সময় দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য করা হল। যদি বিকেলে গদাইকে জিগেস করা হয়, আজকে উনি কি খাবেন, অত্যন্ত চিন্তিত মুখে গদাই বলবে ফিরে এসে বলবো—। তার অর্থ তাঁর রাত্রের আহারের আয়োজন নিয়ে তোলা উনুনে কয়লা দিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। গদাই এসে গজলায় বসবে—। মানে একটি চাটুকারপরিবৃত সভায়। তারপর বার বার জিগেসের পর বলবে নিমকী আর হালুয়া করে দাওনা নইলে গজা আর কচুরী—। প্রভা ভেবে পায় না যে যেরুগী নিমকী আর হালুয়া ভগবানের দয়ায় আজো হজম করছে, তার খাবারটা আগে বলে প্রভা আর অনুকে এই অকারণ পরিশ্রম থেকে বাঁচানয় গদায়ের কি ক্ষতি?

প্রভার হয়েছে দুদিকে জালা। অবুঝ সদাশিববাবু অকারণ বোঝার ভারে ভারাক্রান্ত। সে মানুষটি শিশুর মত প্রভার আওতায় বীরবিক্রমে বেড়িয়ে বেড়িয়েছেন আজ খানিক স্বাধীনতা পেলেও সে স্বাধীনতায় অসুবিধা প্রতি পদে। প্রভা যেন পাগলের মত নিজের বইবার অতিরিক্ত ভার ঘাড়ে তুলে নিয়ে ছুটছে, মুখ থুবড়ে পড়তে আর দেরী নেই। তাঁর আশঙ্কা শীঘ্রই সত্য হল কঠিন হৃদরোগে শয্যাশায়ী হল প্রভা—। যথারীতি চিকিৎসার ভার তুলে দেওয়া হল গদায়ের হাতে কিন্তু গদায়ের মনোবৃত্তি অন্যরকম। বিনা পয়সার ডাক্তার পেয়ে শুয়ে শুয়ে খুব ডাক্তার দেখান হচ্ছে না? গদায়ের বিরক্তির সীমা রইল না। বেচারা অনু সে তার মাকে কম চেনেনা। বুঝলো মার শক্তি নিঃশেষ হয়েছে সহজে শোবার পাত্র তাদের মা নয়।

ক্রমশঃ

সাগর তীর্থ

মাধব পাল

পুণ্যসলিলা গঙ্গা বা ভাগীরথী নদী যেখানে সাগরে মিশেছে সেই স্থানই সাগরসঙ্গম। সঙ্গমস্থলের অদূরেই পবিত্র সাগরদ্বীপ। বহু পুরাতন পবিত্র স্থান সাগর-তীর্থ।

পৌরাণিক মতে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দেহনিঃসৃত স্বেদ হতেই গঙ্গার উৎপত্তি। দেবাদিদেব শিবের পঞ্চমুখের সুললিত গীত শুনে মুগ্ধ বিষ্ণুর দেহ থেকে ঘর্ম্ম নির্গত হতে থাকে। পিতামহ ব্রহ্মা সেই স্বেদমাহাত্ম্য অনুধাবন করেই তাহা নিজ কমণ্ডলুতে সঞ্চয় করে রাখেন। ঐ কমণ্ডলু-আশ্রিত বিষ্ণু-স্বেদই গঙ্গা।

সেই গঙ্গাকেই বহু আরাধনায় কমণ্ডলু থেকে মর্ত্যে নিয়ে এসেছিলেন সগরবংশধর রাজকুমার ভগীরথ। সূর্য্য-বংশের রাজা সগর অপুত্রক থাকায় শিবের আরাধনা করেন। সেই সাধনার ফলে রাজা সগর ষাট হাজার পুত্রের জনক হ'ন। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো রাজা সগরের অশ্বমেধ যজ্ঞ নিয়ে। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞপণ্ড করার জন্য সেই যজ্ঞাশ্ব চুরি করে নিয়ে লুকিয়ে রাখেন সমুদ্র উপকূলে মহামুনি কপিলের আশ্রমে।

সাংখ্যদর্শনের উদ্‌গাতা মহামুনি কপিল। সাগরকূলে অতি নির্জনস্থানে তাঁর সাধনধাম তাঁর আশ্রম। ধ্যানমগ্ন থাকায় ঋষি কপিল জানতেও পারলেন না ইন্দ্রের কূট-কর্ম্মের কথা। কিন্তু সগররাজার ষাটহাজার পুত্র যখন অশ্ব-সন্ধানে তাঁর আশ্রমে চড়াও হলো, সরলস্বভাব মহামুনি তখন হলেন ক্রুদ্ধ। তাঁর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে ভস্ম হলো রাজা সগরের ষাট হাজার পুত্র। তাদের উদ্ধারের উপায় সন্ধানে মুনির শরণাপন্ন হলেন সগরপুত্র অসমঞ্জের ছেলে অংশুমান। নির্দ্দেশ দিলেন মহামুনি কপিল—

মর্ত্ত্য লোকে বহে যদি প্রবাহ গঙ্গার
তবে সে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার।

কোথায় সে গঙ্গা? কি ভাবে তাঁকে পাওয়া যাবে? দেবতাদের নিকট সেই সাধনা করতেই কেটে গেল দুই পুরুষের জীবন। অংশুমান ও তার পুত্র রাজা দিলীপ গঙ্গাপ্রাপ্তির সাধনাতেই মারা গেলেন। তারপর চললেন দিলীপ পুত্র ভগীরথ। বিষ্ণুর দেহনিঃসৃত স্বেদ গঙ্গা। সেই বিষ্ণুরই আরাধনা করলেন তিনি। সন্তুষ্ট হয়ে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে অনুরোধ করলেন ভগীরথের নিকট গঙ্গাকে মুক্ত করে দিতে। বিষ্ণুর অনুরোধে ব্রহ্মা গঙ্গাকে মুক্ত করে দিলেন। ভগীরথ নিয়ে চললেন গঙ্গাকে সগরপুত্রদের উদ্ধারের জন্য।

আগে আগে ভগীরথ শঙ্খ নিনাদে গঙ্গার পথ নির্দ্দেশ করে চললেন। পিছনে প্রবাহিতা হয়ে চললেন গঙ্গা। এই প্রবাহের পথও সহজ নয়। নয় সামান্য দূর। পুরাণের সাথে মিলিয়ে গঙ্গোত্রী থেকে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গার এই সুদীর্ঘ প্রবাহ পথ দেখলে বুঝতে পারা যায়, গঙ্গা-প্রবাহের বন্ধুরতা। গঙ্গার এই প্রবাহ পথের বন্ধুরতার পুরাণের কাহিনীগুলিই প্রমাণ। প্রথমে প্রবাহিনী গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে আটকে যান। হারিয়ে ফেলেন পথ। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত এসে মুক্ত করে তাঁর সেই পথ। তারপর কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রম করেই মর্ত্যধামে নামার সময় ঘটে আর এক বিপত্তি। গঙ্গার পতন বেগ ধরাধাম সহ্য করতে পারবে না বলে দেবাদিদেবকে মাথা পেতে দিতে হয় নিজ মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করার জন্য। সেখানেও শিবের জটাজালে আটকে যান গঙ্গা।

এই ঘটনাতেই শিবপত্নী অন্নপূর্ণার আক্ষেপ মূর্ত হয়ে উঠে ভারতচন্দ্রের ভাষায়—

গঙ্গানামে সতা তার তরঙ্গ এমনি
জীবনস্বরূপা সে স্বামীর শিরমণি।

কিন্তু ভগীরথের আকুলতায় শিব জটা চিরে মুক্ত করে দেন গঙ্গাকে। হরিদ্বারে গঙ্গার তাই শিব জটা হতে মর্ত্যে আগমন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের দার্শনিক প্রশ্নের উত্তরে তাই গঙ্গার কুল কুল ধ্বনিতে জেগেছিল—আসিতেছি মহাদেবের জটা হতে। এর পরেও বারাণসীতে আটকে পড়েছিলেন গঙ্গা। জহ্নুমুনির আশ্রম প্লাবিত হওয়ায় উদরসাৎ করেন গঙ্গাকে। ভগীরথের প্রার্থনার শেষে জহ্নু মুনি আপন জানু চিরে মুক্ত করে দেন গঙ্গাকে। তাই তো গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী। অবশেষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বঙ্গদেশের মাটীকে পবিত্র করে, মহামুনি কপিলের আশ্রমকে ধন্য করে সাগরে এসে মিলিয়ে গেলেন গঙ্গা। অভিশাপ মুক্ত হলো সগরসন্তানগণ। চলে গেলেন স্বর্গধামে।

সাগর তীর্থের মাহাত্ম্যও তাই—

গঙ্গাসাগরেতে যেবা করে স্নান।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হয়ে স্বর্গে পায় স্থান॥

সাগরতীর্থের প্রাচীনতার ন্যায় তার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকতাও প্রাচীন। মহাভারতের বনপর্ব্বে গঙ্গা-সাগরকে মহাতীর্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চতুর্থ খৃষ্টাব্দে গুপ্তযুগের আগেই গঙ্গাসাগর তীর্থরূপে ছিল বলে জানা যায়। গ্রীক্ লেখকদের বর্ণনায় পূর্ব্বভারতে গঙ্গারিডি রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের মতে উহা সংস্কৃত গঙ্গারাষ্ট্র বা 'গঙ্গারাঢ়ের' গ্রীক্ ভাষার বিকৃতি। ভ্রমণকারী টলেমি বলেছেন, গঙ্গার সাগরসঙ্গম জুড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় গঙ্গারিডীরা বাস করতো। তাদের রাজধানীর নাম ছিল গঙ্গানগর। টলেমির ভৌগোলিক নির্দ্দেশ অনুযায়ী বর্ত্তমান সাগরসঙ্গমেই গঙ্গানগরের অস্তিত্ব ছিল। কাল-ক্রমে গঙ্গাসাগর সঙ্গম ও সাগরতীর্থের অনেক ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন হয়েছে।

আগে এই সাগরসঙ্গমে তীর্থযাত্রা ভয়ানক কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল ছিল। স্থলপথে মোটেই ভাল রাস্তা ছিল না। জলপথে ছিল মগ ফিরিঙ্গী প্রভৃতি জল-দস্যুদের অত্যাচার। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র প্রারম্ভ বর্ণনায় তার স্পষ্ট আভাস আছে। আর সাগর সঙ্গমে পুণ্য স্নানের সময়টাও হলো দুর্দান্ত শীতের প্রকোপযুক্ত 'মকর সংক্রান্তি'তে। সূর্যের মকর ক্রান্তিতে গমনের ফলেই পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলসহ সমস্ত উত্তর গোলার্দ্ধে তখন দারুণ শীতের সময়। তাই যাত্রীরা অতিকষ্টে জীবনে মাত্র একবার গিয়ে সাগর-তীর্থে পুণ্যস্নান করে আসতে পারলে নিজেদের ধন্য মনে করতো। প্রবাদেও আছে—

সবতীর্থ বারবার
গঙ্গাসাগর একবার।

মৃত বৎসাদের মানত রক্ষার স্থান ছিল এই গঙ্গাসাগর। যে রমণীর সন্তান হয়ে বাঁচতোনা সেও মানত্ করতো সাগরসঙ্গমে মা গঙ্গার বুকে তুলে দেবে তার জীবন্ত সন্তান। রবীন্দ্রনাথের "দেবতার গ্রাস" এই কুপ্রথার পটভূমিতে এক করুণ আলেখ্য। আগে চাকদহের নিকট গঙ্গাতেও নাকি এইরকম সন্তান বিসর্জ্জনের প্রচলন ছিল। অনেকে মানত্ রক্ষার্থে প্রথম সন্তানকে নিয়ে গঙ্গাবক্ষে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে কোলের সন্তানকে গঙ্গায় ছেড়ে দিয়েই আবার টুপ করে তুলে নিতো। এইভাবে তারা মানত্ রক্ষা করতো। হাত ফসকে গঙ্গায় তলিয়েও যেতো কোন সন্তান।

এই অমানুষিক সংস্কারের সঙ্গে হয়ত যুক্ত ছিল স্বয়ং গঙ্গা দেবীরই দৃষ্টান্ত। তিনি যখন হস্তিনাপতি মহারাজ শান্তনুর সাথে পরিণয়ে আবদ্ধা হ'ন, তখন মহারাজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলেন যে তাঁর কাজে কখনও বাধা দিতে পারবেন না। এর মূলে ছিল স্বর্গ হতে শাপভ্রষ্ট অষ্টবসুর মুক্তিবিধান। বসুগণ একে একে গঙ্গাগর্ভে জন্মলাভ করতেন, আর গঙ্গাদেবী সদ্যপ্রসূত সন্তানকে নিয়ে নদীতে বিসর্জ্জন দিতেন। শেষে অষ্টমবসুর বেলায় মহারাজ শান্তনু বাধা দিতেই পুত্রকে রেখে গঙ্গা দেবী অন্তর্হিতা হন।

'তাদেরই পুত্র অমর ভীষ্ম কৃষ্ণ প্রণমে যায়।'

এই সন্তান বিসর্জনের অমানুষিকতা দেখে অনেক

'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'

'প্রবাসী' চিরকালই দেশের কথা ও পল্লীর কথা বলিয়া আসিয়াছে। বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সকল সমস্যা-সমাধানের নির্দেশক এই প্রবাসী। নিরপেক্ষ সমালোচনা সেদিন একমাত্র 'প্রবাসী'ই করিয়াছে। সত্যরক্ষার্থে কঠিন মন্তব্য করিতেও সে পশ্চাদপদ হয় নাই। এজন্য রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধীকেও কঠোর সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবাসী চিরকাল ঘৃণা করিয়া আসিয়াছে।

রাজনৈতিক ফাঁদে বাঙালীর দুর্গতি আজ নূতন নয়। সেই কতবছর আগে 'প্রবাসী'ই বলিয়াছে:

"বাঙালী হিন্দুরা যেন জার্মেনীর ইহুদী। জার্ম্যান ইহুদীরা ও তাহাদের বাপ পিতামহ, প্রপিতামহ জার্মানীর মানুষ। কিন্তু জার্মেনী তাহাদিগকে নিজের বলিয়া স্বীকার ত করিলই না, অধিকন্তু তাহাদের উপর অত্যাচার করিল, তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিল। বাঙালী হিন্দুরা বাঙলাদেশ হইতে তাড়িত এখনও হয় নাই বটে, ভারতবর্ষ হইতেও তাড়িত হয় নাই বটে; কিন্তু বাংলাদেশে তাহারা সরকারী ব্যবহার এরূপ পাইতেছে, যেন তাহারা বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই। বঙ্গের বাহিরেও তাহাদের সেই দশা। বিহারপ্রদেশে, যুক্তপ্রদেশে, আসামে, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য উৎপীড়িত; তাহারা যদি চাকরী পায় সেটা তাহাদের উপর দয়া; যদি কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কিছু উপার্জন করিতে পারে সেটাও অন্যদের দয়া; বৈজ্ঞানিক সরকারী পরিভাষা হইবে, সেখানে বঙ্গের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিনিধি কেহই নাই। তাহারা যেন বঙ্গের কেউ নয়, বঙ্গের জন্য কখনও কিছু করে নাই, ভারতবর্ষেরও কেউ নয়, ভারতবর্ষের জন্যও কখনও কিছু করে নাই। সুতরাং যেমন, যদি জার্মান ইহুদীদিগকে কেহ বলিত, 'ওহে, দেশের জন্য কিছু কর,' তাহা হইলে তাহারা বলিতে পারিত, "আমাদের দেশ কোথায়?" সেইরূপ যদি কেহ বাঙালী হিন্দুদিগকে বলে, "দেশের জীবন-মরণ সমস্যা উপস্থিত, দেশের জন্য কিছু কর," তাহারাও বলিতে পারে, "কোথায় আমাদের দেশ।" প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৭।"

এই দূরদৃষ্টি ছিল বলিয়াই 'প্রবাসী' আজও 'প্রবাসী'। বিদগ্ধ-সমাজে আজও প্রবাসী আদরণীয়। যদিও কালের প্রভাবে আজ মানুষের রুচি নিম্নগামী। রবীন্দ্রনাথের দেশে এ-অধোগতি লজ্জার কথা!

বিদেশীই বিচলিত হতেন। বিশেষতঃ উইলিয়াম কেরী। তিনি হয়ত স্বচক্ষে দেখেছিলেন কোথাও সন্তান বিসর্জন দিতে। তাই তিনি এই কুসংস্কারপূর্ণ ভীষণ প্রথা নিবারণের জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণরের কাছে সুপারিশ করেছিলেন এই প্রথা সম্পূর্ণ বন্ধ করবার জন্য। ১৮০২ খৃঃ অব্দে বড় লাট লর্ড ওয়েলেসলী আইন করে এই প্রথা বন্ধ করেন।

লর্ড ওয়েলেসলী শুধু আইন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। গঙ্গার ধারে পুলিশ মোতায়েন করেছিলেন কেউ যাতে সন্তান বিসর্জন না দিতে পারে। সৈন্য পাঠিয়ে দিতেন সাগরতীর্থের মেলায় সন্তান বিসর্জনে বাধা দিতে।

আজকাল সে রকম কোন কুসংস্কার নেই। আছে মহাগৌরবে সাগরতীর্থ সাগরদ্বীপ, ঐ দ্বীপে আছে কপিল মুনির মন্দির, জগন্নাথ বলরাম, অষ্টভূজা দুর্গা, গঙ্গা দেবী, দ্বারকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, যজ্ঞেশ্বর শিব ও সগর রাজার মন্দির। তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতেরও আজকাল সুবিধা হয়েছে। কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড হারবার, তারপর সেখান থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত আছে বাস যাতায়াতের রাস্তা। কাকদ্বীপ থেকে নৌকা বা লঞ্চে সাগরদ্বীপ। তাছাড়াও কলকাতা থেকে আছে সাগরদ্বীপ পর্যন্ত ষ্টীমার-সার্ভিস। রাস্তাঘাটের নিরাপত্তার জন্য যাত্রীবাহী নৌকারও হয়েছে সহজ গতি।

বারবার উন্নতির চেষ্টাও হয়েছে এই সাগরতীর্থ সাগরদ্বীপের। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'হরকরা' পত্রিকার সংবাদ মতে কপিল মুনির মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় ৪৩৭ খৃষ্টাব্দে। জয়পুরের রাজবংশের গুরুসম্প্রদায় কর্তৃক প্রথম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ গুরুদেবেরই এক শাখাবংশ মন্দিরের পূজা পরিচালনা করতেন। আগে যাত্রী সমাগমও হতো সুদূর লাহোর দিল্লী অযোধ্যা বোম্বাই নেপাল এমনকি ব্রহ্মদেশ থেকে পর্যন্ত। পাঁচ লক্ষেরও অধিক লোকসমাগম হতো।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে কলকাতায় গঠিত হয়েছিল—'সাগর আইল্যাণ্ড সোসাইটি'। উদ্দেশ্য সাগরতীর্থ তথা সাগর দ্বীপের উন্নতিসাধন। ঐ সোসাইটির সভ্য হয়েছিলেন রাজা গোপীমোহন দেব, হরিমোহন দেব, রামদুলাল দে ফুলার্তন সাহেব ও আরো অনেকে। তুলার চাষ করা ও স্বাস্থ্যকর বসতিস্থান গড়ে তোলার জন্য সোসাইটির এক পরিকল্পনা ছিল। শুনা যায় বর্তমানেও সাগরদ্বীপে স্বাস্থ্য নিবাস গড়ে তোলার পরিকল্পনা আছে।

বীর অভিমন্যু

(গল্প)

স্নেহেন্দু মাইতি

বিনয় জেলে উঠানে বসে জাল সারছিল। দাওয়ায় বসে বুড়ী ঠাকুরমা নাতনীকে গল্প বলছে। গল্পটা বীর অভিমন্যুর। একটানা বলে চলেছে ঠাকুরমা। বিনয় টুকটুক্ করে ফাঁস দিচ্ছে আর গল্প শুনছে। ফাঁস দেওয়ার তালে তালে নড়ছে। বুড়ো মুর্খ বিনয় জেলে। কখনো এমনি সুন্দর গল্প শোনে নি। গল্প শুনছে আর ফাঁস দিচ্ছে। সমান মনোযোগে।

গল্প শুনতে শুনতে একসময় ফাঁস দেওয়া বন্ধ করে ফেলল। আশ্চর্য কথা বলে চলেছে বুড়ি ঠাকুরমা। বুড়ি ঠাকুরমা বলছে সাতসাতটা রথী যুদ্ধ করল বালক অভিমন্যুর সংগে। সাতটা মস্ত সেনাপতি। এ অন্যায় যুদ্ধ। কিন্তু তবুও ভয় পেল না অভিমন্যু। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগল বীরবিক্রমে। যুদ্ধ করতে করতে সে প্রাণ দিলে। স্বর্গ থেকে রথ এল অভিমন্যুকে নিতে।

বিনয় জেলে কাহিনীটা শুনল। তার মাথায় ঘুরতে লাগল সাতরথী আর অন্যায় যুদ্ধ। আশ্চর্য মিল। তার ছেলে যতীনের মরার সঙ্গে অভিমন্যুর মরার কোন পার্থক্য নেই।

বিনয় জেলে আবার ফাঁস দিতে লাগল। কিন্তু ধীরে ধীরে। আগের মত তাড়াতাড়ি নয়। আর ফাঁস দিতে দিতে ভাবতে লাগল, কেমন করে তার ছেলে অভিমন্যুর মতই মরল।

যতীন তার ছেলে। বয়েস আর কত! মাত্র বিশ বছরের জোয়ান ছেলে যতীন। বিনয়ের ঐ ছিল এক-মাত্র সম্বল। যতীনের মা যখন মারা গেল তখন যতীনের বয়স মাত্র দশ। কিন্তু বিনয় আর বিয়ে করে নি। তাদের জাতে এমনটা বড় একটা হয় না। কিন্তু বিনয়ের কেমন যেন ভাল লাগছিল না বিয়ে করতে। যতীনকে আঁকড়ে নিয়েই সে পড়ে রইল।

যতীন একেবারে গোরা রং-এর। পাকা মৃগেল মাছের মত। বিনয়ের মত ঝিম কালো নয়। যতীন যখন কাজ করত, সারাগায়ের পেশীগুলো কিলবিল করে উঠত। পুকুর দেখেই বলে দিত মাছ আছে কিনা। একগলা জলে দাঁড়িয়ে মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে জাল ছুঁড়ে দিত। নদীতেও জাল দিতে পারত চমৎকার। একেবারে পাকা মাছমারা হয়েছিল যতীন।

সেটা জ্যৈষ্ঠ মাস। সবে ইলিশের মরশুম আরম্ভ হয়েছে। বিনয়, যতীন আর বিনয়ের ভাইপো হরিশ তাদের নৌকা নিয়ে রূপনারায়ণে যাচ্ছিল। সরু খাল দিয়ে নিয়ে যেতে হবে নৌকা। ভাঁটায় ওরা নৌকা ছেড়ে দিয়েছিল। মামুদপুরে সন্ধ্যে হতে নঙর করেছিল। জল তখন অনেক কমে গিয়েছিল। মাঝরাতে জোয়ারের জল আসবে। উজান ঠেলে চালাতে হবে নৌকা।

তাড়াতাড়ি ওরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। যেখানে ওরা নঙর করেছিল, ছোট ছোট বাড়ি ঘর সেখান থেকে বেশ একটু দূরে। খালের দু'ধারে বিরাট মাঠ। একরকম দৃষ্টি চলে না।

রাতটা বেশ মনে পড়ছে বিনয়ের। আকাশে এক-ফালি চাঁদ। বোয়াল মাছের পেটের মত সাদা চকচকে। মাছের চকচকে চোখের মত আকাশে তারারা চেয়েছিল পৃথিবীর দিকে।

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের একান্ত প্রয়োজন লিলি ব্র্যাণ্ড বার্লি

কালঘুম, একেবারে কালঘুমে ধরেছিল বিনয়কে। নয়ত এমন বেঘোরে হারাতে হত না যতীনকে। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিল বিনয় আর হরিশ। কিন্তু যতীন ঘুমায় নি। আর ঘুমায়নি বলেই তো সর্ব্বনাশটা হয়ে গেল। একেবারে চরম সর্ব্বনাশ। কল্পনাও করা যায় না।

ভীষণ একটা ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আঁধার চিরে যতীনের ডাক ঠিক বিনয়ের কানে পৌঁছেছিল। মাছরাঙা পাখীর মাছ ধরার ডাক যেমন তীব্র আবেগে, ঠিক তেমনি জোরে। কি ভীষণ সে ডাক। উঠে পড়েছিল বিনয় একলাফে। পাশেই হরিশ। একটা ধাক্কা দিতেই সে উঠে পড়ল। যতীন নৌকাতে নেই। তাড়াতাড়ি হাতে একটা লগি তুলে নিয়ে হরিশকে বলেছিল, 'লে, লগি লে। চল।'

বলেই একলাফে নৌকা থেকে ডাঙায় উঠেছিল। তারপরে চারদিকে চেয়ে ডেকেছিল, 'যতু রে—' কেউ সাড়া দেয় নি। শীতের গঙ্গার মত চতুর্দ্দিকে শান্ত নিস্তব্ধতা। হরিশও ডেকেছিল, 'অ যতু দা গো—' তবু কোন সাড়া নেই।

ডাকতে ডাকতে খুঁজতে খুঁজতে মাঠে, বেশ একটু দূরে পাওয়া গেল যতীনকে। মাথা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আশে পাশে জনমানব কেউ নেই।

বিনয় একবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল যতীনের উপরে। মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে বলেছিল, 'বাবা যতু রে—' কোন সাড়া নেই। আবার চীৎকার করে বলেছিল, 'কে তোর এমনি সব্বনাশ করলে রে—? তবু কোন সাড়া নেই।

আর যাওয়া হয়নি নদীতে। যতীনকে নিয়ে ফিরেছিল বিনয়। অনেক কষ্টে জ্ঞান ফিরিয়েছিল যতীনের। যতীন একটু একটু করে যে কাহিনী শুনিয়েছিল তাতে আজো কেঁদে কেঁদে সারা হয় বিনয়।

ধীরে ধীরে বলেছিল যতীন। খুব ধীরে ধীরে। কদিন ধরে ওর পেট একটু খারাপ যাচ্ছিল। নৌকা থেকে ও মাঠে গেল। নিস্তব্ধ খোলা মাঠ। যতীনের মন্দ লাগে না। একগুঁয়ে বেপরোয়া যতীন একটু দূরেই চলে গিয়েছিল। এমনি সময়ে একটা চীৎকার শুনল। একটা মেয়ের যেন ডাক, 'কে আছ বাঁচাও, গো—আমার সর্ব্বনাশ হোল গো—'

সংগে সংগে যতীনের গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠেছিল। জোয়ান মাছমারার গায়ের রক্ত। একটা মেয়ের উপরে অত্যাচার! দু'বার ডেকেছিল, 'বাবা' আর 'হরিশ' বলে। তার পরে জ্ঞান হারিয়ে ছুটেছিল মেয়েটার ডাক লক্ষ্য করে। ইলিশ মাছের মত একগুঁয়ে হয়ে ছুটেছিল। কাছে গিয়ে দেখতে পেয়েছিল যতীন, 'ভাগ ভাগ শালারা'।

লোকগুলো হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। মেয়েটা ছাড়া পেয়ে জড়িয়ে ধরেছিল যতীনকে। বলেছিল, 'দাদা গো আমাকে বাঁচাও।' লোকগুলো হতভম্ব হয়ে একটুখানি থেমেছিল মাত্র। তারপর জনকয়েক ওর উপরে বানের জলের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কয়েকজন মেয়েটার মুখে কাপড় দিয়ে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে উধাও। যতীন চীৎকার করে ডেকেছিল, 'বাবা গো—হরিশ রে'। ব্যস্ তারপরে আর ডাকতে হয় নি। খালি হাতে ওদের সঙ্গে লড়তে লড়তে চতুর্দিকে আঁধার ঘনিয়েছে। চোখের সামনে ধোঁয়াটে হতে হ অন্ধকার।

শত চেষ্টা করেও বিনয় যতীনকে বাঁচাতে পারে বাড়ির ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে ডাক্তার ডেকেছে। এ দিন রাতের বেলা বিষ-খাওয়া মাছের মত কি মাথা নেড়ে নীরব হয়ে গেল। হাউ হাউ করে বলেছিল বিনয়, 'আমি কাকে নিয়ে বাঁচব রে—'

'তুমি এত কাঁদছ কেন গো'? ছোট নাত বিনয়কে জিগ্যেস করে। ফ্যাল ফ্যাল করে বি জেলে তাকালো ছোট মেয়েটার দিকে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'ই কিছু নয়।' টপ্ ট করে বিনয় জেলে আবার জালের ফাঁস দিতে লাগল।

ফাঁস দিতে দিতে চোখ তার ঝাপসা হয়ে আসছি যতীন তার অভিমন্যু। সাতটা লোকের সাথে এক লড়েছে। অন্যায়ের বিপক্ষে লড়েছে। অভিমন্যুর স তার যতীনের তফাৎ নেই। বুড়ো বিনয় জেলে গের বাড়ি জাল সারতে সারতে এক চমৎকার দৃশ্য দেখ লাগল। একটা কুঁড়েঘরের উঠানে সে বসে। কো উপরে মাথা রেখে একটা বিশ বছরের ছেলে। থেকে রথ নেমে এল। রথের সে কি কারুকা সন্ সন্ করে রথটা উঠে যাচ্ছে তার যতীনকে নিয়ে অনেক, অনেক উপরে।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::
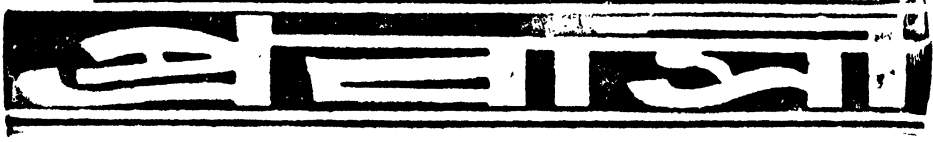
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৭৫

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস

এই মাসে সুভাষচন্দ্র বোসের জন্মদিন এবং ভারতের সর্বত্র বহু কোটি সুভাষ ভক্তগণ তাঁহার জন্মদিনে সভা সমিতি শোভাযাত্রা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া ঐ জাতীয় মহানেতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন। সুভাষচন্দ্র এক অনন্যসাধারণ পরম শক্তিশালী পুরুষ। তাঁহার চরিত্র ও কর্মের ইতিহাস অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে তিনি আদর্শবাদী, সত্যনিষ্ঠ, নির্ভীক, বিদ্বান, মহাপরিশ্রমী, অসাধারণ নেতৃত্বগুণসম্পন্ন, বহু নরনারীকে সংযম, নিয়ম ও সুনীতি-অনুপ্রাণিতভাবে সংগঠিত করিতে সক্ষম ও অসীম ক্ষমতাশালী যোদ্ধা। ভারতে যদি তিনি উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে প্রথমতঃ ভারত ও পাকিস্থান নামক দুই দেশের সৃষ্টি করিতে বৃটিশ কখন সক্ষম হইত না। দ্বিতীয়তঃ ভারতের ভিতরেও ভাষা, ধর্ম, জাতি লইয়া ঝগড়া বিবাদ হইতে পারিত না। এক জাতি ও এক রাষ্ট্র হইলে দেশবাসীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি আরও সহজ হইত এবং ইউরোপ-আমেরিকার নিকট ঋণ করিয়া ভারতের অবস্থা আজিকার মত হেয় হইত না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস এখনও জীবিত আছেন বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। তিনি জীবিত না থাকিলেও তাঁহার আদর্শ ও নেতৃত্ব অমর হইতে পারে। তাহা যদি জাতির অভিপ্সীত হয় তাহা হইলে এ দেশের বহু নরনারীকে নিজেদের জীবনের ধারা পরিবর্তন করিতে হইবে। বর্তমানে ভারতে যে নীচ আদর্শহীনতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ও ভারতীয় মানব যে ভাবে শুধু নিজ নিজ স্বার্থের অনুসরণে নিযুক্ত দেখা যাইতেছে; সেই অবস্থা না বদলাইতে পারিলে নেতাজী পিত্তলকাংস-নির্মিত ঘোটকের উপরেই স্থাপিত থাকিবেন; ভারতের মানব হৃদয়ে তাঁহার প্রতিষ্ঠা নিছক কষ্ট কল্পনাতেই নিহিত বলিতে হইবে।

বাম-দক্ষিণ পন্থা ও জীবন সমস্যা

আমাদের দেশের যে সকল ব্যক্তি দেশবাসীকে পথ দেখাইবার জন্য উৎসুক ; বা যাঁহারা দেশটাকে চালাইয়া লইতে পারেন বলিয়া নিজেদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া নেতৃত্বের আসরে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ; তাঁহাদের মধ্যে অদ্যাবধি তাঁহারা কি করিয়া দেশ চালাইবেন তাহা দেশবাসীকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ছকিয়া দেখাইতে সক্ষম হন নাই। সব ব্যবস্থা হইয়া যাইবে এবং দেশবাসী ঐ নেতাদিগকে রাজাসনে বসাইলেই আর কাহারও কোন অভাব বা দুঃখ থাকিবে না। ইহা বলাও সহজ এবং বিশ্বাস করাও আরম্ভে কঠিন নহে। কিন্তু, বুদ্ধিমান লোকে প্রথম হইতেই সকল কথা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া ও বিচার করিয়া কোন ব্যবস্থার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। এবং যথাযথভাবে বিলিব্যবস্থা না বুঝাইয়া দিলে কাহারও সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হন না। এই অবস্থায় যদি দেশের জনপ্রতিনিধিগণ শুধু আবোল তাবোল বক্তৃতা করিয়া শাসন কার্য্য করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন এবং বাস্তবকার্য্যক্ষেত্রে কি করিবেন সে কথা পরিষ্কার বলিতে না পারেন তাহা হইলে দেশবাসী কাহাকেও নির্ব্বাচন করিলে তাহা অন্ধকারে প্রস্তর নিক্ষেপ করা অথবা অজানার জলস্রোতে ঝাঁপ দিয়া পড়ার মতই হইবে। দক্ষিণপন্থা যাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহারা যে সকল পরিকল্পনায় মত্ত হইয়া থাকেন সেই সকল পরিকল্পনা প্রথমতঃ দেশবাসীকে বহু সংখ্যায় উপার্জ্জন করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে সাহায্য করে না। ইহার প্রমাণ বিগত ২০ বৎসরের ভারতের অর্থনৈতিক গতিবিধির মধ্যেই পাওয়া যাইবে। আমাদের যাঁহারা পথ দেখাইয়াছিলেন, এই সময়ে, তাঁহারা প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়া আমাদিগকে ঋণভারে জর্জ্জরিত করিয়াছেন মাত্র। ঐ অনুপাতে আমাদিগের কোন উপার্জ্জন ক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা অন্ন লাভ হয় নাই। যন্ত্র বিক্রয় ও যন্ত্রবিদদিগের বেতন বা দক্ষিণার ভিতর দিয়া বিদেশীগণ অধিক লাভবান হইয়াছে এবং ভারতবাসীর মধ্যে বিত্তবান লোকেদেরই ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্যে বেকার অবস্থা ও অভাব আরও প্রকট রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার কারণ জাতীয়ভাবে আমরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভুল পথে চালিত হইয়াছি। বামপন্থি যাঁহারা তাঁহারা কখন কখন কার্য্যভার পাইয়া থাকিলেও কোন নূতন পথে চলিয়া সকলের উপার্জ্জন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন নাই। শুধু শ্রেণী বিভাগ লইয়া ঝগড়াঝাঁটি বাড়াইয়া বেকার অবস্থা আরও চরমে তুলিয়াছেন। বাংলায় আজ যে বেকার ব্যক্তিদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার একটা বড় কারণ বামপন্থীদিগের গঠনমূলক কর্ম্মক্ষমতার অভাব ও যেটুকু উপার্জ্জন ব্যবস্থা আছে তাহাও নষ্ট করিবার আগ্রহ। এই আগ্রহ আবার নিজস্ব নহে। বিদেশী শত্রু দিগের প্ররোচনায় এই কার্য্য অনেক স্থলে করা হইয়াছে। ২০ বৎসর শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধবাদ করিয়া বামপন্থীরা কোন সময় কার্য্যকরী ভিন্নপথ দেখাইতে চেষ্টাও করেন নাই এবং করিয়া থাকিলেও সেই সকল মতামত বহুলাংশে উদ্ভট কল্পনাজাত বলিয়া দেখা গিয়াছে। আমরা সাম্রাজ্যবাদ মানবতা খর্ব্বকর মনে করি এবং ব্যক্তিগত মূলধনবাদের সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করিনা। কিন্তু আমরা একথাতেও বিশ্বাস করিনা যে মূলধন সমষ্টিগত করিয়া দিলেই মানব জীবন পূর্ণ ও আনন্দময় হইয়া উঠিবে। কারণ কম্যুনিষ্ট দেশগুলির অর্থনীতি অনুশীলন করিলেই দেখা যাইবে যে সকল দেশ একভাবে চালিত হইতেছে না। কোন কোন কম্যুনিষ্ট দেশে ব্যক্তির অধিকার অনেকদূর অবধি গ্রাহ্য করা হয় এবং কোথাও কোথাও ব্যক্তিকে পূর্ণতর অথবা পূর্ণতমভাবে সমাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। মানুষ যদি সর্ব্বক্ষেত্রে নিজের ব্যক্তিত্ব ছাড়িয়া দিয়া ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রীয় গোষ্ঠীর দাসত্ব মানিয়া লয় তাহা হইলে তাহার মানবতা খর্ব্ব হয় কিনা একথা বুঝিতে কাহারও অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না। আমাদের দেশেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অধিকার ও অনধিকার বিচার করিয়া আমরা জাতিভেদ আচার, অনাচার, জলচল, জল-অচল প্রভৃতি বহুপ্রকার

মানবতা খর্ব্বকর ব্যবস্থা করিয়াছি এবং তাহার ফলে আমাদের বিশেষ সামাজিক উন্নতি হয় নাই। কম্যুনিজম মতবাদের দোহাই দিয়া মানুষকে স্বাধীনভাবে নিজ ইচ্ছা বর্জ্জন করিয়া গোষ্ঠীর নেতাদিগের মতে যন্ত্রের মত চালাইয়া যে অবস্থার সৃষ্টি হইতেছে তাহার ফলও কখন ভাল হইতে পারে না। শ্রেণী বিভেদ না থাকিলেই সাম্য ও স্বাধীনতা গড়িয়া উঠিবে এমন কোন কথা নাই। আদেশকর্ত্তা ও আদেশ পালনকারীর বিভেদের ভিতর দিয়াও মানব দাসত্ব পূর্ণরূপে জাগিয়া উঠিতে পারে। সমষ্টিবাদ সর্ব্বদাই রাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের প্রভুত্বের উপর নির্ভর করে এবং ঐ দলপতিগণ ও তাহাদিগের দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারীগণ জনসাধারণকে এমন করিয়া হুকুমের চাকর করিয়া রাখে যাহাতে ব্যক্তি স্বাধীনতার আর কোন চিহ্ন কোথাও দেখা যায় না। কোন বিষয়েই ব্যক্তির কোন নিজস্ব অধিকার অথবা নিজ ইচ্ছায় চলিবার ক্ষমতা থাকেনা। শুধু নির্দ্দেশ, নিয়ম ও অপরের কথায় ওঠা বসা। ইহা ব্যতীত ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করিবারও কোন সুযোগ বা সুবিধা সমষ্টিবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। যদি কোন কোন সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তির অধিকার বা স্বাধীনতা কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে সেই সকল রাষ্ট্রকে পূর্ণ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। তাঁহারা অভ্রান্ত কম্যুনিষ্ট মতবাদের সংস্কার-চেষ্টা-দোষ-দুষ্ট বলিয়া এক প্রকার জাতিচ্যুত ভাবেই কম্যুনিষ্ট জগতের এক কোণে পড়িয়া আছেন বলা যায়। সনাতন ও শুদ্ধ কম্যুনিষ্ট যাঁহারা তাঁহাদের দলপতিদিগের প্রভুত্ব অপ্রতিহত। অতিশুদ্ধ কম্যুনিজম যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে ব্যক্তি সমষ্টিবাদী সমাজের বিরাট দেহের অতিক্ষুদ্র অবয়ব মাত্র। তাহার কোন নিজের ইচ্ছার বলিয়া কিছু নাই। যে কয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশে কম্যুনিজম বিশুদ্ধ রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন আকারে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সকল দেশে ব্যক্তি কিছুটা নিজইচ্ছায় চলিতে সক্ষম। সেই সকল দেশে মানুষ অনেকটা মনুষ্যত্ব বজায় রাখিয়া চলিতে পারে। কিন্তু আমাদিগের দেশে যে ধরণের সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলিত তাহাতে দল ও দলপতিদিগের প্রভুত্বই রাষ্ট্রের প্রধান ও প্রবলতম শক্তি হইবে বলিয়া মনে হয়। ইহার ফল অনেকটা সেই রকমই হইবে যেরূপ একছত্র অধিপতির একাধিপত্য চালিত রাষ্ট্রে হইয়া থাকে। অর্থাৎ শাসকদিগের অধিকারই রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হইবে; প্রজা বা জনসাধারণের সুখ, সুবিধা আসিবে সর্ব্বশেষে। আমরা ভারতবাসীরা বহুদীর্ঘকাল ধরিয়া সভ্যতা ও কৃষ্টির একটা বিশেষ পথ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছি। প্রভুত্ব মানিয়া চলা, স্বাধীনভাবে চলা, সংঘের নিকট আত্মসমর্পন করা, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া; সকল কিছুই আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু কোন বিষয়েই আমাদিগের কোন মোহ নাই। আমরা জানি যে মানবজীবনের উদ্দেশ্য অর্থনীতির ভিতর পূর্ণরূপে রক্ষিত নহে। আমরা জানি যে ব্যক্তির স্বাধীন প্রচেষ্টার ভিতর দিয়াই সে উদ্দেশ্য সফল ও সুসিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং মানব জীবনের প্রধান সমস্যা শ্রেণী বিভাগ জাত কলহ; একথা আমরা মানিতে পারি না। ব্যক্তির প্রধান কার্য্য ও জীবনের লক্ষ্য সমাজের নেতাদিগের কথায় ওঠা ও বসা; ইহাও আমরা মানি না। সুতরাং যে সকল রাষ্ট্রক্ষেত্রের গুরু ও পাণ্ডাগণ আমাদিগকে রাষ্ট্রগত প্রাণ রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষুদ্র অঙ্গে পরিণত হইতে শিখাইতেছেন তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। ব্যক্তির মধ্যেই মানবাত্মা বিরাজ করে ও ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব আর থাকে না এই বিশ্বাসেই আমরা চলি। রাষ্ট্রগঠন ব্যক্তিদিগের জীবন সুখময়, নিরাপদ ও উন্নতিশীল করিবার জন্যই। সুতরাং রাষ্ট্রের খাতিরে ব্যক্তির জীবন কষ্টে, বিপদে ও ব্যর্থতায় ডুবাইয়া দিবার কোন প্রয়োজন আমরা বোধকরি না। রাষ্ট্রক্ষেত্রে যাঁহারাই আমাদিগের প্রতিনিধি হইতে চাহিবেন তাঁহাদিগকে আগেই আমাদিগকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইতে হইবে যে তাঁহারা আমাদিগকে কি ভাবে ও কি উপায়ে উন্নততর জীবনযাত্রার পথে লইয়া যাইবেন। অন্য লোকে নিষ্কর্ম্মা; শোষণপ্রবণ ও হীনচরিত্র বলিলেই কেহ নিজেকে কর্ম্মী, জনসেবক ও উন্নতমনা প্রমাণ

করিলেও নিজের মহত্ত্ব প্রমাণ হয় না। সুতরাং নির্ব্বাচনের প্রার্থীকে দেখাইতে হইবে যে তিনি বা তাঁহারা ঠিক কেমন করিয়া আমাদিগের উপকার করিবেন। অর্থনীতির কথাই হউক কিম্বা কৃষ্টি, শিক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা ও সামরিক প্রস্তুতিই হউক; আমরা প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহাদিগের পূর্ণ বোধের পরিচয় পাইতে চাহি। ধর্মকথা নীতিকথা ও আদর্শের কথা শুনিয়া কাহাকেও রাজাসনে বসাইতে চাহি না। প্রথমত আসিতেছে উপার্জ্জনের কথা। সকল পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া একটা একটা উপার্জ্জনের ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে সাম্য, মুক্তি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন অর্থ হয় না। এই উপার্জ্জনের ব্যবস্থা কেমন করিয়া হইবে? যদি সকলেই সমাজতান্ত্রিক কারবারে চাকুরে হইবেন স্থির হয় তাহা হইলে সমাজ কোথায় কি কি ব্যবসা বাণিজ্য ও কারবার প্রতিষ্ঠিত করিবে তাহা পরিষ্কার জানা দরকার। সকল পানওয়ালা, ধোপা, নাপিত, রাজমিস্ত্রি, কর্ম্মকার, মুচি, ছুতার, ঝালাইকর, গাড়ীওয়ালা, ট্যাক্সি চালক, ফেরিওয়ালা, খুদেওয়ালা প্রভৃতি উপার্জ্জনকারী ব্যক্তি সমাজের চাকুরি করিবেন কি? না তাঁহাদিগের স্বাধীন ব্যবসা উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদিগকে পথে বসাইবার ব্যবস্থা হইবে। এখন যাহারা "টিউসনী" করে, ওকালতি করে, চিকিৎসাকার্যে কিম্বা অপর কোন স্বাধীন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া উপার্জ্জন করে, তাহারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কি ভাবে ঐ সকল কার্য্য চালাইবে? না চালাইলে তাহারা কি ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করিবে? বহু প্রশ্নের মধ্যে এইগুলি মাত্র কয়েকটি।

দ্বিতীয়ত কথা উঠিতেছে খাজনা, মাশুল, রাজস্বের কথা। এখন যেভাবে ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে টাকায় ছয় আনা হইতে সাড়ে পনের আনা অবধি মানুষ রাষ্ট্রকে দিতে বাধ্য হইতেছে; দক্ষিণপন্থীরা জয়লাভ করিলে তাহা অপেক্ষা ব্যক্তির পক্ষে অধিক লাভজনক ব্যবস্থা হইবে কি? না মিথ্যা সমাজবাদের দোহাই দিয়া ব্যক্তির উপার্জ্জনে আরও অধিক করিয়া ভাগ বসান হইবে? বামপন্থী জয়লাভ করিলেই বা কি হইবে? ট্যাক্স বৃদ্ধি হইবে না তাহার বোঝা হালকা করা হইবে?

তৃতীয় কথা শিক্ষা, দেশের গঠন, চিকিৎসা, জল সরবরাহ, খাদ্যবস্ত্র বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থার কথা। শিক্ষা মূর্খলোকের হস্তে তুলিয়া দেওয়া হইবে, না প্রকৃত উচ্চশিক্ষিতদিগের ব্যবস্থায় চালিত হইবে। পাঠ্যপুস্তকাদি রাষ্ট্রক্ষেত্রের মোড়লদিগের ইচ্ছামত ও তাঁহাদিগের পেটোয়া লোকেদের লাভের জন্য নির্দ্ধারিত হইবে; অথবা ছাত্রদিগের মানসিক উন্নতির জন্য পৃথিবীর বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার হইতে গৃহীত হইবে? ভাষা প্রভৃতি লইয়া ছাত্রদিগকে বিপর্য্যস্ত করা হইবে অথবা গুণী ও পণ্ডিতজনের কথামত সেই সকল বিষয় স্থির করা হইবে? তথাকথিত হিন্দী রাষ্ট্রভাষা কোথায় কতটা ছাত্রদিগের স্কন্ধে আরোপ করা হইবে? চীন কিম্বা পাকিস্থানের সহিত আদর্শগত "দোস্তি"র খাতিরে ছাত্রদিগের মস্তক চর্ব্বণ করা কতদূর পর্য্যন্ত রাষ্ট্র অনুমোদিত হইবে?

দেশ গঠনের কথায় প্রধান কথা হইল সকল গ্রামের মধ্যে একটা উত্তম সংযোগের ব্যবস্থা করা। ভারতবর্ষে যত দৈর্ঘ্যের রাজপথ নির্ম্মাণ প্রয়োজন তাহার অর্দ্ধেকও এখনও নির্ম্মাণ করা হয় নাই। এই রাজপথ নির্ম্মাণ ও তৎসঙ্গে গৃহ নির্ম্মাণ জলাশয় সংস্কার, কূপ খনন, ডাঙ্গা জমিতে আবাদের ব্যবস্থা, বৃক্ষরোপণ, মৎস্যের চাষ, দুগ্ধ ও হাঁস মুরগি সরবরাহ, শাকসব্জির চাষ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা প্রভৃতির আয়োজন, সকল কিছু করিতে হইলে তাহা কি ভাবে, কি সময়ে, কি খরচে করা হইবে, তাহা জানিবার ইচ্ছা ভোটদাতার পক্ষে স্বাভাবিক। সেই খরচের টাকা কেমন করিয়া সংগৃহীত হইবে তাহাও জানা প্রয়োজন। গ্রামবাসীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবার, যথা তাঁত চালান, সুতা কাটা, গেঞ্জি মোজার কল, তেলের ঘানি, আটার জাঁতা; শাক, সব্জি, মাছ, ডিম প্রভৃতি শহরে চালান দেওয়া অথবা লোহালক্কড়, কয়লা, কেরোসিন, মনিহারী দ্রব্য বিক্রয়, ঔষধের ডিসপেনসারি ইত্যাদিতে নিযুক্ত হইতে পারেন। ইহার জন্য মূলধন কিছু থাকিলে

কিছুটা ব্যাঙ্ক-কোঅপারেটিভ প্রভৃতি হইতে লওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। এই সকলের ব্যবস্থা কি প্রকার করা হইবে? বামপন্থী কি বলে ও দক্ষিণই বা কি করিতে চাহে? গৃহ নির্মাণ, বড় বড় খেত-খামারের জন্য ট্রাক্টর্ বা অপর যন্ত্রাদি সংগ্রহ কেমন করিয়া করা হইবে? যদি সামাজিক ও সমষ্টিগতভাবে করা হয় তাহা কি প্রকার হইবে? যদি ব্যক্তিগত অধিকারে তাহা থাকে তাহাতে রাষ্ট্র কি সাহায্য করিবে—যদি করে?

বেতন ও মজুরীর হার বাড়িবে কি?

দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রনীতির প্রচারকগণ বলেন যে তাঁহারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার শক্তি প্রয়োগে মানুষের উপার্জ্জনের ও জীবন যাত্রার পদ্ধতির মান ক্রমঃউন্নতিশীল করিয়া ভারতের জনসাধারণকে অদুর ভবিষ্যতে সমৃদ্ধির উচ্চতর শিখরে তুলিয়া দিবেন। কার্য্যত দেখা যাইতেছে যে ভারতের জাতীয় ঋণের বোঝা পূর্ব্বের তুলনায় যাহা বাড়িয়াছে তাহার সুদ ও আসল শোধ করিতে হইলে বাৎসরিক ৩/৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। এই টাকা যদি ভারতের জাতীয় আয়ের টাকা হইতেই লইতে হয় তাহা হইলে তাহা হিসাবে মাথা-পিছু বাৎসরিক ৭৫/৮০ টাকা দাঁড়ায়। এক পরিবারে যদি একজন উপার্জ্জক থাকে ও পোষ্য থাকে তিনজন তাহা হইলে এই খরচের পরিমাণ হয় প্রায় বাৎসরিক ৩০০৲ টাকা অর্থাৎ পরিবার প্রতি মাসে ২৫৲ টাকা। আমাদের জনসাধারণের এখন মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ৩০০৲ টাকা অপেক্ষা কম। অর্থাৎ চারজনের পরিবার মোট বাৎসরিক ১২০০ টাকা আয় প্রাপ্ত হয়। ইহার মানে মাসে একশত টাকা। এই টাকায় চারজনের ভরণ-পোষণ কি করিয়া হয় তাহা আমরা জানি না। কিন্তু বলিতে পারা যায় যে অতিকষ্টেই একশত টাকায় চারজনের খাওয়া পরা চলিতে পারে। ইহা হইতে যদি মাসিক ২৫৲ টাকা ঋণের জন্য ব্যয় করিতে হয় তাহা হইলে কষ্টটা অতি নিদারুণ হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং সর্ব্বক্ষেত্রেই বেতন ও মজুরীর হার বাড়াইবার জন্য মহা গোলযোগ হইতে থাকে এবং তাহার কারণ বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। দক্ষিণপন্থীগণ বেতন ও মজুরীর হার বিশেষ বাড়াইতে পারেন নাই। চাকুরীর সংখ্যাও জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে বাড়ে নাই। ভারতে কয়েক কোটি ব্যক্তি পূর্ণ বেকার ও আরও কয়েক কোটি বৎসরে কয়েক মাস বেকার থাকেন। দক্ষিণপন্থীদিগের চেষ্টায় যে সকল কাজ কারবার সৃষ্টি হয়, ঋণ কর্জ্জা করিয়া তাহাতে ব্যয়ের তুলনায় উপার্জ্জন বৃদ্ধির ব্যবস্থা উপযুক্ত পরিমাণে হয় না। সমাজতান্ত্রিক কারবারগুলির অধিকাংশই মহা লোকসানের কারবার। বেতন বৃদ্ধি করিতে হইলে লোকসান বন্ধ করিয়া কারবারে লাভ হওয়া প্রয়োজন। সেইরূপ অবস্থা আসিতেছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ দক্ষিণপন্থীদিগের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালনার আগ্রহ ক্রমে বাড়িয়া চলিতেছে মনে হয় অর্থাৎ ঋণ আরও বাড়িবে এবং দেশবাসীরা আরও গভীরভাবে দুর্দ্দশার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবেন বলিয়া মনে হইতেছে। বেতন ও মজুরীর হার বাড়াইতে সরকারী কারবারগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা অনিচ্ছুক; কেননা সেই কারবারগুলি অর্থনৈতিকভাবে ন্যায্য বেতন ও মজুরী দিতে অসমর্থ। লাভের কারবার অধিকাংশই ব্যক্তিগত অধিকারের কারবার। এই সকল কারবারের মালিকগণ বাধ্য না হইলে বেতন ও মজুরীর হার বৃদ্ধি করিতে রাজী হয়েন না এবং সরকারী কারখানার তুলনামূলক "রেট" দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে বাজারের হার কি প্রকার। সুতরাং দক্ষিণপন্থীগণ নিজেদের অসমর্থতার জন্যই বেতনভোগী ও মজুরদিগের অবস্থা যাহা হওয়া উচিত তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়া রাখিতেছেন। যদি রাষ্ট্রনেতাগণ কারবার পরিচালনার কার্য্যে সুদক্ষ হইতেন তাহা হইলে গরীব কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবিদিগের অবস্থা আরও উত্তম হইত। ইহার কারণ দুইটি। এক নিজেদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য নিজেদের কারবারে লোকসান করিয়া সমাজতন্ত্রী মালিকগণ বেতন ও মজুরী

অন্ধ রাখিয়া চলেন ও দ্বিতীয়ত তাঁহারা নিজেদের কারবারে লাভ করিবার জন্য ব্যক্তিগত মালিকদিগের কার্য্যে নানাপ্রকার বাধার সৃষ্টি করিয়া বাজারের অবস্থা খারাপ করিয়া দিয়া ব্যক্তিগত কারবারেও বেতন ও মজুরী বৃদ্ধি বন্ধ করিবার কারণ হইয়া দাঁড়ান। দুই নৌকায় পা দিয়া দক্ষিণপন্থীগণ ডুবিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এবং দেশকেও ডুবাইতেছেন। বামপন্থীগণ কি করিবেন তাহা নিজেরাও বুঝেন না এবং প্রেরণা সন্ধানে চীন, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে যাইলে রাষ্ট্র করায়ত্ত করিবার বিভিন্ন পন্থাই ইহারা শুধু দেখিয়া আইসেন। অর্থাৎ বিপ্লব, বিদ্রোহ অথবা প্রবল আলোড়নের দ্বারা রাষ্ট্রযন্ত্র অচল করিয়া দিয়া রাষ্ট্র দখল করিবার ব্যবস্থাই তাঁহারা শিখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। সাধারণতন্ত্র অনুগত শাসন পদ্ধতির ভার লইয়া ভাঙা ভুলিয়া গড়ার কার্য্য করিতে তাঁহারা অপরাগ। এই জন্যই বাম পন্থার পরিচয় লাভ হয় আলোড়নের ভিতর দিয়াই। হরতাল, বন্ধ ও ঘেরাও বাম পন্থার নিদর্শন। বামপন্থীদিগের আগ্রহ যখন সমাজের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম, নীতি, নিয়ম, পদ্ধতি, সকল কিছুই ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন চৈনিক অথবা রুশিয়ান ছাঁচে ঢালিয়া গড়িবার; তখন তাঁহাদিগের পক্ষে সাধারণতন্ত্রের অভিনয় করা নীতিবিরুদ্ধ; অর্থাৎ প্রবঞ্চনার কার্য্য। এইজন্য সাধারণতন্ত্রে বামপন্থী বলিয়া কম্যুনিষ্ট মতবাদ চালান যায় না। যায় শ্রমিকের অধিকার আরও প্রবলভাবে ব্যক্ত করা ও ধনবাদকে আরও দাবাইয়া রাখার ব্যবস্থা করা। তাহার নাম কম্যুনিজম নহে। নাম হইল শ্রমিকদলের শাসন অর্থাৎ "লেবার পার্টি রুল"। ইংলণ্ডে ইহা আরম্ভ হয় ফেবিয়ান সোসাইটির দ্বারা। আমরা যদি ফেবিয়ান হইতে চাহি তাহা হইলে আমাদিগের চীনে যাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। যাইতে হয় ইউরোপ আমেরিকার সেই সকল দেশে যেখানে মানব অধিকার পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও মানুষ যেখানে উচ্চ বেতনে উচ্চহারের মজুরী পাইয়া সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বিপ্লব অথবা বিদ্রোহ উপার্জ্জন বৃদ্ধির উপায় বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ সমাজে যদি একটা প্রবল তোলপাড় ও শান্তিভঙ্গকারী দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ হয় তাহা হইলে উপার্জ্জন বৃদ্ধি ত হইবেই না বরঞ্চ উপার্জ্জন বন্ধ হইয়া যাইবারই সম্ভাবনা হইবে। সুতরাং প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করাইয়া রাজশক্তি হাতে লইয়া বিপ্লব আরম্ভ করার কল্পনা গরীবের উপার্জ্জন বাড়াইবার চেষ্টা নহে। উহা বৃহত্তরভাবে রাজশক্তি অপরের হস্তে তুলিয়া দিবার চেষ্টা। যাঁহাদের বিশ্বাস বিপ্লব ব্যতীত অপর উপায়ে সমাজের কোন উন্নতি করা সম্ভব নহে; তাঁহাদিগের পক্ষে কষ্ট করিয়া নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ারও কোন অর্থ হয় না। কারণ বিপ্লব করিবার শক্তি ও ব্যবস্থা থাকিলে তাহা যে কোন সময়েই করা যায়। বিপ্লব না ঘটাইয়া নির্ব্বাচনে বা শ্রমিক আন্দোলনে নিযুক্ত হইলে প্রমাণ হয় যে বিপ্লব ঘটাইবার শক্তি নাই। বামপন্থীদিগের বিপ্লবের আস্ফালন মনে হয় অনেকটা ফাঁকা আওয়াজ।

পরলোকে প্রতিমা দেবী

প্রতিমা দেবীর মৃত্যুতে আমরা এমন একজন মহাগুণবতী মহিলাকে হারাইলাম যাঁহার সমকক্ষ অপর কেহ শীঘ্র বাংলাদেশে জন্মলাভ করিবেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার নিজ গুণাবলী ছিল বিচিত্র ও বহুবিধ। ইহার সহিত তিনি যে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্রবধূ বলিয়া কবির সহিত বহুবার বিশ্বের নানাস্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বহু মহাপুরুষদের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন তাহারও একটা বিশেষ মূল্য ছিল। প্রতিমা দেবী সুলেখিকা ছিলেন। তিনি চিত্রকলায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং চিত্রবিদ্যায় অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু কারুশিল্পে সুদক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। চামড়ার উপর কারুকার্য্য করা, বই বাঁধান, চীনামাটির বাসন তৈয়ার, নক্সা করা পর্দ্দা মাদুর ও ও শতরঞ্চ বোনা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কার্য্যে তাঁহার দক্ষতা প্রায় চল্লিশ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল ও তিনি বহু লোককে এই সকল শিল্পকার্য্য শিখাইয়া ছিলেন। আসবাবের নকসার পরিকল্পনা গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতিতেও তাঁহার প্রতিভার ও প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া মহাকবির সেই কৃষ্টি-কেন্দ্রকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে শান্তিনিকেতন দীপ্তিহীন হইয়া যাইবে। রবীন্দ্র-প্রতিভার আলোকে প্রতিমা দেবীর জীবন আলোকিত ও উদ্ভাসিত ছিল। এখন আর কেহ রহিলেন না যাঁহার মধ্যে সেই আলোক তেমন করিয়া প্রদীপ্ত থাকিবে।

কমনওয়েল্‌থ্‌ থাকিবে কি না?

বৃটিশ কমনওয়েল্‌থ্‌ বা পুরাতন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত জাতিগুলির যে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া চলিবার মিলিত প্রচেষ্টার ব্যবস্থা ও যাহার জন্য ঐ সকল জাতির প্রধান মন্ত্রীগণ লণ্ডনে আলোচনা সভা করিয়া থাকেন; সেই জাতি সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি এবং সেই উদ্দেশ্য সকলে মানিয়া চলে কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্নই ঐ সম্পর্কে মানুষের মনে উদিত হইয়া থাকে। প্রধানত দেখা যায় এই জাতিগুলির স্বাভাবিক ভাবে বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়া চলিবার কারণ বিশেষ নাই। কতকগুলি জাতি শ্বেতকায়; কতকগুলি রৌদ্রপক্ব বাদামী বর্ণ ও বাকিগুলি কৃষ্ণকায়। কাহারও মাতৃভাষা ইংরেজী, ফরাসী অথবা ওলন্দাজ ঘেঁষা; কাহারও ভারতীয় গোষ্ঠীর ও কাহারও আফ্রিকার অথবা মালয়েশিয়া কিম্বা পলিনেশিয়ার। ঐ সকল জাতি পূর্ব্বে ইংরেজের অধীনে থাকায় উঁহাদিগের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজী ভাষা জানেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রেও জাতিগুলির কিছু কিছু সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতে আছে। সুতরাং জনসাধারণের মিলনের কারণ না থাকিলেও শিক্ষিত লোকের ও ব্যবসাদারদিগের মিলন কিছু কিছু ঘটিতে পারে বলা যায়। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গঠিত হওয়া সর্ব্বদাই লাভজনক; কারণ পৃথিবীর জাতিগুলি নানা ভাবে কলহ করিতে সদা উদ্যত; বন্ধুত্ব করিতে সেরূপ উৎসাহ তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। সেই জন্য আন্তর্জাতিক মিলনরক্ষা যত প্রকার ব্যবস্থা সম্ভব তাহা করিতে পারিলেই মঙ্গল কিন্তু শ্বেতকায় জাতিগুলির যে ছুঁৎ বিচার তাহার ধাক্কায় শ্বেত ও কৃষ্ণে সদ্ভাব রক্ষা বড়ই কঠিন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়া বর্ণের জন্য পৃথিবীর সকল জাতিকে শত্রু করিয়া লইতে প্রস্তুত। বৃটেন ও অন্যান্য শ্বেতকায় জাতিও অল্প বিস্তর কৃষ্ণকায় বিদ্বেষ আক্রান্ত। এই এক কারণেই কমনওয়েল্‌থ্‌ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ধর্ম্মবিদ্বেষ বর্ণবিদ্বেষ ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা; এই তিন কারণেই মিলন না থাকিতে পারে। কমনওয়েল্‌থ ভবিষ্যতে কোন পথ দিয়া কোথায় পৌঁছাইবে তাহা এখনই বলা সম্ভব নহে।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সঙ্গীতনায়ক ৺গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ছিলেন ও কলিকাতার সঙ্গীত-শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনাম খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সকলের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকেই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি নিজেও লিখিতেন এবং পিতার প্রসিদ্ধ পুস্তকাবলীর নূতন নূতন সংস্করণ প্রকাশ করাতেও আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা একজন বিশেষ ক্ষমতাবান সঙ্গীত-শিক্ষক ও সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞানীকে হারাইলাম।

পত্রিকার নেশা ও সত্যের উপলব্ধি

শ্বেতকায়গণ কোন কিছু দ্বারা আকৃষ্ট হইলে অথবা কোন নূতন মোহে মুগ্ধ হইলে জগতের চক্ষে সেই মোহ বা আকর্ষণকারী বস্তুর একটা বৈশিষ্ট্য বা ইজ্জত প্রাপ্তি ঘটে। শ্বেতকায়দিগের দোষগুলিও অনুকরণীয় বলিয়া সকলে মানিয়া লন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে শ্বেতাঙ্গ-

দিগের অনুকরণে বহু কুপ্রবৃত্তি ও বদঅভ্যাস আধুনিকতার নিদর্শন হিসাবে গ্রাহ্য ও প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গগণ এখন অনুন্নত জাতিগুলির চরিত্রের খারাপ দিক হইতে অনুকরণীয় দোষ খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিজেদের জীবনে সেই দোষগুলি গ্রহণ করিয়া ভোগ ও অনুভূতির নূতন স্বাদ ও অভিজ্ঞতা আহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। যথা প্রায়ই দেখা যাইতেছে যে শ্বেতকায় তরুণ তরুণীগণ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ভব্যতা পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার অনুকরণে অধৌত বস্ত্রে অর্দ্ধসজ্জিত হইয়া অপরিষ্কার দাড়ি-গোঁফ-চুল বহন করিয়া ভারতের সহরে সহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা না কি মুক্তির ও মোক্ষের আস্বাদ পাইতে ব্যগ্র এবং সেই জন্যই ইহারা সভ্যতার অবশ্য কর্ত্তব্য আচার ব্যবহার ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে এই সকল মুক্তিলোলুপ যুবক যুবতীগণ প্রাচ্যের নেশাগুলি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। গঞ্জিকার ধূম্রপান করিলে না কি মানুষের আত্মা অন্য এক উচ্চতর স্তরে উঠিয়া যায়। এই জন্য গঞ্জিকার আদর বাড়িয়াছে এবং বহু শ্বেতকায় যুবক যুবতীগণ আজকাল ঐ নেশা আয়ত্ত করিতে ব্যস্ত হইয়াছে। অনেকেই নিয়মিত গঞ্জিকার ধূম্রপান করিয়া থাকেন এবং এই জাতীয় লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকার মারিহুয়ানা, মিশরের ও আরবের হাশিশ এবং ভারতবর্ষের গঞ্জিকা ও চরস ইত্যাদি বহু নামে গঞ্জিকা ব্যবহার হয় বলিয়া শুনা যায় এবং ঐ পাতার মাদকতা নানা ভাবে আহরণ করা হইয়া থাকে। ভাঙ বা সিদ্ধি সরবত করিয়া পান করা হয় এবং গঞ্জিকা তামাকের মত কলিকায় জ্বালাইয়া তাহার ধূম্রপান করা হইয়া থাকে। এই নেশা হইতে মানুষ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ত্যাগ করিয়া সন্দেহ ও ভীতি বর্জ্জন করিয়া অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হয়। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাহার মনে প্রাণে যে উৎকট আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয় তাহা অনেকে দেবভাব বলিয়া ভাবিতে আনন্দ পান। শ্মশানে মৃতদেহ পরিবেষ্টিত হইয়াও মানুষে অন্ধকারে বসিয়া গঞ্জিকা সেবন করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে ও সেই অবস্থায় তাহার মনের ভাব যাহা হয় তাহা আধিদৈবিক বলিয়া ধরা হয়। এই কারণেই গঞ্জিকার একটা অলৌকিক ও দৈব গুণ আছে বলিয়া নেশাখোর লোকে বিশ্বাস করে। কোন এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে গঞ্জিকা সেবন, অর্থাৎ ধূম্রপান করিলে মনে হয় দেহমন ক্রমশ: ঊর্দ্ধ হইতে আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইতেছে। এই যে বোধ করা হয় তাহাকেই নেশাখোরগণ একটা আধ্যাত্মিক অর্থদান করিয়া গঞ্জিকার মাহাত্ম্য প্রচার করে। পূর্ব্বযুগে যুদ্ধ প্রারম্ভে সৈন্যগণ সিদ্ধি অথবা গঞ্জিকা ব্যবহারে অসমসাহস প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইত। সিদ্ধির সহিত সিদ্ধিলাভের কোন ঘনিষ্ঠতা আছে কি না তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। মনে হয় ঐ নেশাগ্রস্ত অবস্থাকে অনন্তের সহিত নিকট আত্মীয়তা বলিয়া ভুল করা নেশাখোরদিগের পক্ষে স্বাভাবিক। এবং ইয়োরোপ-আমেরিকার অর্দ্ধবুদ্ধি ও অপরিণত বয়স্ক লোকেদের পক্ষেও ঐরূপচিন্তা করা সম্ভব হইতে পারে। ভারতে বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে যাহার অন্তর্গত ব্যক্তিদিগের আচার ব্যবহার সাধারণ জীবনযাত্রা পদ্ধতির অনুসরণকারী ধর্ম্মঅনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ উলঙ্গ হইয়া বসবাস করেন. কেহ ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বা লৌহ শলাকার উপর অবস্থিত থাকেন, কেহ বা অপরিষ্কার ও অস্নাত অবস্থায় দিন কাটান। ইয়োরোপ আমেরিকার মানুষও তাহাদিগের অভিন্ন মানবতার প্রমাণ দিয়াছে উন্নতি চিন্তা করিবার সহজ উপায় হিসাবে উলঙ্গতা ও অপরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করিয়া বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ বিস্মিত করিয়া। আমরা আজ যে ভারতের পথে পথে শ্বেতকায় নরনারীগণকে অর্দ্ধআবৃত দেহে বিচরণ করিতে দেখিতেছি এবং শুনিতেছি যে তাহারা গঞ্জিকার ধুমপান করিয়া মুক্তি ও মোক্ষলাভ চেষ্টা করিতেছে; তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। ইহার কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিফলতা। পাশ্চাত্যের বাস্তববাদ মানুষকে শুধু ধ্বংস ও মৃত্যুর বিভীষিকা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছে। মানব জীবনের পূর্ণতার

(শেষাংশ ৪৬৮ পৃষ্ঠায়)

পত্রধারা

পরিমল গোস্বামী

চিঠি ব্যক্তিগত হলেও তার মধ্যে এমন অনেক অংশ থাকে যা সবার জন্য। এমন সব অংশ বেছে নিয়ে বিদেশ থেকে আমাকে লেখা এই পত্রাংশগুলি এখানে সঙ্কলিত হল। পত্রলেখক বা লেখিকাদের পরিচয় পত্রের মধ্যেই যেটুকু তার বেশি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করেছি। এঁদের মধ্যে সরোজ আচার্য সম্প্রতি পরলোক-গমন করাতে তাঁর চিঠিগুলিই প্রথমে দেওয়া হল।

হাইডেলবার্গ, ওয়েষ্ট জার্মানি

৮-১২-৫৯

...আমরা মার্কিন টুরিষ্টদেরও লজ্জা দিচ্ছি। প্লেন থেকে কোলয়েন-এ (কোয়েল্‌ন্‌) নেমেই এক দৌড়ে বন্‌। তারপর রাজকীয় রাত্রিবাস শেষে ভোরে উঠেই রওনা ভিজবাডেনে—রাইন নদীর (এদের উচ্চারণে রিয়েহ্‌ন্‌) পাড় দিয়ে ডিলুক্স বাসে। ভিজবাডেনে অষ্টাদশ শতাব্দীর মার্বেল মোড়া হোটেল—রোদে লাঞ্চ, সন্ধ্যায় 'কুর' হোটেলে ককটেল, ডিনার এবং তারপর কাসিনোয় জুয়া খেলা দর্শন, তবে দর্শনই মাত্র। হোটেলে ফিরে দেখি বেডসাইড টেবলে একখণ্ড 'দি হোলি বাইব্‌ল' জার্মান ভাষায়। কাসিনো থেকে ফিরে বোধ হয় লোকে সর্ব্বরিক্ত মনোভাব নিয়ে ধর্মের আশ্রয় চায়। তারপর ভোর না হতেই আবার খাওয়া এবং বাসে দৌড়, পথে বিখ্যাত রসায়ন শিল্প নগরী BASF. পরিদর্শন, অপূর্ব্ব অদ্ভুত এর কাণ্ডকারখানা। BASF-এ লাঞ্চ সেরে এক দৌড়ে হাই-ডেলবার্গে পৌঁছুতে সন্ধ্যা পার হল। অতএব আবার খাওয়ার পর্ব্ব এবং পরদিন দৌড়ের জন্য অপেক্ষা।

আমরা অল্পবিস্তর ভোজনবিলাসী হলেও ভোজন সর্ব্বস্ব নই, তাই সবারই প্রাণান্তকর অভিজ্ঞতা। রাইনের তীরে তীরে এই সব প্রাচীন হোটেলগুলো পয়লা নম্বর আমিরী স্টাইলের। চার্জ, দিন চল্লিশ টাকার কম নয়। ...ঘরে যেমন প্রচণ্ড গরম, বাইরে তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা। ব্রেক-ফাস্টের আগে স্নান সেরে যেটুকু সময় পাই পথে পথে ঘুরি। দোকানে দু'একজন জার্মান জিজ্ঞাসা করেছে আমার শীত লাগে না নাকি? আমি বলেছি শীতের দেশের লোকদেরই শীত বেশি লাগে।

ঘরে তো পাঞ্জাবী পাজামা পরে বিনা মোজায় থাকতে হয়, লেপও দরকার হয় না। অবশ্য এরই মধ্যে কেউ কেউ ডবল মোজা, চার প্রস্থ-গরম জামা, দস্তানা, ড্রয়ার্স চড়িয়ে থাকেন। এখন ক্রিসমাসের সময়, এই সব আমিরী শহরে দোকানপাটের অপূর্ব্ব শোভা। রেডিও রেকর্ড প্লেয়ার প্রভৃতি অনেক লোভনীয় জিনিষের দাম কলকাতার তুলনায় শস্তা। ক্যামেরা কিন্তু পকেট আন্দাজে শস্তা নয়। কন্‌টা-ফ্লেকসের দাম ৪৯৮ মার্ক, প্রায় সাড়ে পাঁচশ টাকা। ...দেশ দেখা বা জানা এ ভাবে হয় না। বিস্তর হোটেল এবং খানা-পিনার কায়দা মাত্র দেখা হল। উপায় নেই।

সরোজ আচার্য

Mandeville Hotel
London W.I.
4.11.64

চিঠি লেখার সময় করে ওঠাই কঠিন। 'ম্যারাথন' ভ্রমণ। লণ্ডন, ব্রিটেন প্রস্টারশিয়রের গ্রামাঞ্চল, এডিনবরো, গ্ল্যাসগো ইত্যাদি—এক হোটেল থেকে আর এক হোটেল, সারারাত ট্রেনে, সারাদিন মোটরে, উপরন্তু মাইলের পর মাইল কারখানা, জাহাজঘাটা, বোধনা-নিকেতন, মাতৃসদন, শিল্প-পত্তন পরিদর্শন। তার উপর প্রায়ই সন্ধ্যা থেকে দশটা এগারটা পর্যন্ত ফর্মাল ডিনার পার্টি। ···সবটাই প্রাণান্তকর। ইংরেজকে আমরা যখন নিমন্ত্রণ করি তখন তার খাওয়া থাকার অভ্যস্ত রীতি অনুযায়ী সাধ্যমত অতিথি-সেবার ব্যবস্থাই করা হয়। এদের উল্টো। এরা ধরে নেয়, এদের মত পোশাক, এদের মত খাওয়া দাওয়া চলাফেরা বিদেশী অতিথিকে মেনে নিতে হবে।

যাহোক··· কোনরকমে চালিয়ে নিয়েছি। এখন পালা শেষের দুদিন ঠাসা প্রোগ্রাম—লাঞ্চ, রিসেপশন, দর্শন ইত্যাদি। এটা শেষ হলেই মস্কো যাত্রা, দেশের পথে। মস্কো থেকে ঠিক কোনও রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণ পাইনি, তবে সাতদিনের জন্ত ভিসা পেয়েছি। ···মোটের উপর এই ছুটকো ভ্রমণটুকুই আনন্দের।

গরিবলোকের পক্ষে টেলিভিসন, থিয়েটার, সিনেমা, স্কুল এবং পার্লামেন্টের যাবতীয় আমোদ এবং শিক্ষার বাহন। গরিবলোক মানে অবশ্য এদেশের গরিবলোক। কারণ টেলিভিসনের ভাড়া সপ্তাহ-প্রতি সাড়ে আট শিলিং। নগদ দাম ষাট সত্তর পাউণ্ড।

এদেশের গরিবলোক কিংবদন্তী আনন্দে উৎসাহী। খাবারদাবার শস্তা, কিন্তু অন্ত জিনিস শস্তা মনে হয় না। ···গরিবলোকেরা খেটেখুটে খেয়ে পরে থাকতে পায়, আমাদের দেশের চেয়ে ভালই পায়, কিন্তু তা বলে অর্থকষ্ট যে এদের নেই সে কথা ঠিক নয়।

সরোজ আচার্য

Sylvania Hotel
Philadelphia
20.10.66·

···বিদেশ, বিদেশী কায়দায় দৌড়ঝাঁপ, অনভ্যস্ত পোশাকের বোঝা সব মিলিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাস। তবু থামবার উপায় নেই। ওয়াশিংটনে সাত দিন নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি, দর্শন—সব সেরে কাল এসেছি ফিলাডেলফিয়াতে। আজ সারাদিন কেটেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে পাঁচ দিন স্থিতি। এর পর মোটরেই বোষ্টন, বাফ্যালো, নায়াগারা প্রপাত, নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত। শিকাগোয় পৌঁছব ৪ নবেম্বর নাগাদ। ···আজ আমাকে এখানে ইউনিভার্সিটিতে সকাল দশটা থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত দেখাসাক্ষাৎ, সেমিনার ও লাঞ্চ ইত্যাদিতে লেগে থাকতে হয়েছে। এখানকার ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে খুবই মন দিয়ে পড়ে, নোট নেয়, জিজ্ঞাসাবাদ করে। তবে ছোট ছোট ক্লাস, পরিপাটি বসবার ব্যবস্থা। ক্লাসে সিগারেট খাওয়া চলে, এ-কথা সত্যি নয়। বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে NO SMOKING—তবে সেমিনারে সিগারেট খাওয়া যায়। আজ ছাত্ররাও খাচ্ছিল, কিন্তু আমি এ ক্ষেত্রে তিনচার ঘণ্টা আদর্শ বালক ছিলাম।

এ দেশের খবরের কাগজ প্রাচুর্যের গন্ধমাদন পর্বত। দিন ১০০ পৃষ্ঠা, রবিবার ২০০। কেউ পড়ে কিনা সন্দেহ; প্রথম পাতাখানার উপরেই চোখ বুলয়। লণ্ডনে প্রায় সবাইকেই কাগজের ভাঁজ খুলতে দেখেছি, এদের কদাচিৎ। দশ থেকে কুড়িপাতা ছোট ছোট টাইপে ঠাসা শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন। আর পুরো পাতা বিজ্ঞাপন সব—জামা, কাপড়, ফুল, আসবাবপত্র, গহনা এবং খাদ্য বস্তুর। মোটর গাড়ির বিজ্ঞাপন তো আরও বেশী। ঘণ্টায় পাঁচ সেণ্ট হিসাবে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। আমরা ওয়াশিংটন থেকে এসেছি ভাড়াকরা টকটকে লাল ফোর্ড করনে। এই গাড়িই বদলাতে বদলাতে আমরা অর্ধেক দেশ ঘুরব। তার পর সিকি ভাগ ট্রেনে, বাকিটা প্লেনে। আমার জন্ত একটু বিশিষ্ট ব্যবস্থা। ষ্টেট ডিপার্টমেন্টের,

একজন মাঝারি কর্মচারী আগাগোড়া আমার সঙ্গী ও প্রদর্শক। তিনি গাড়ি চালাচ্ছেন। তিনি মহা খুশী সরকারী খরচে দেশ পরিক্রমা, উপরন্তু দুমাস ডিউটি লীভ। সাত্ত্বিক লোক, সিগারেট বা সুরা কিছুই চালান না। আন্তর্জাতিক বিবাহ বিশারদ, খারাপ অর্থে নয় অবশ্য। দুটি বউ গত হওয়ার পর এখন তৃতীয় পক্ষ। প্রথম পক্ষ মার্কিন, দ্বিতীয় পক্ষ কিউবান, বর্তমান স্ত্রী ব্রাজিলিয়ান। ভদ্রলোক চারপাঁচটি ভাষা জানেন। আশা করি এর সঙ্গে ভাবী চতুর্থ পক্ষের সম্পর্ক নেই।

খাওয়ার জিনিস এখানে রকমারি এবং সস্তাও। নিরামিষ খাদ্যও অনেক রকম। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ বাহাদুরি বোধ হয় প্যাকেজিং, চমৎকার কার্ডবোর্ডের বাক্সে আধ পাইন্ট দুধ, ঢাকনা দেওয়া কার্ডবোর্ডের গ্লাসে গরম চা ইত্যাদি ঘরে এনে খাওয়া যায়। এ দেশে হালচাল সম্পর্কে যে সব রসাল তথ্য কাগজে বার হয় তার অনেকখানি অতিরঞ্জন। শতকরা দশ জন হয় তো বেয়াড়া, অন্যদের পোশাক চাল-চলন বেশ ভদ্র মনে হয়।

সরোজ আচার্য

আলবুকের্কে. নিউ মেক্সিকো

২৫-১১-৬৬

…আমার ভ্রমণের এই পর্বে খুব তাড়াতাড়ি মোটরে পাড়ি দিতে হচ্ছে, কখন কখন দুদিনে দুশ মাইল—গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন থেকে আলবুকের্কেতে। খাই কি? রুটি, দুধ, আপেল চকোলেট এই সবই খাচ্ছি। ফ্রায়েড চিকেন পাওয়া যায়, কিন্তু দুবেলা পর পর খেলে অরুচি…দক্ষিণে এসে অবশ্য প্রায় রোজই মেক্সিকান খাদ্য খাচ্ছি। সুস্বাদু, টক, ঝাল ঝোল আছে, ভাতও সেই সঙ্গে। তবে দৈনিক প্রোগ্রামের পাল্লায় কখন কোথায় যে লাঞ্চ ডিনার, তার ঠিক থাকেনা। কোন কোন দিন ওমলেট চকোলেট খেয়েই দিন কাটাই। একমাত্র স্বস্তি যে সকালের ব্রেকফাস্টটা আমাদের রুচি মতই মেলে—টোস্ট, পরিজ, ফলের রস, ডিম ইত্যাদি।

দৈনিক কাগজ এদের প্রত্যেক শহরেই। তিন লাখ লোকের শহরেও দুখানা দৈনিক, এক এক খানা পঞ্চাশ পাতার কম নয়। পোশাক, আসবাবপত্র, গাড়ি, হীরাজহরত ইত্যাদির বিজ্ঞাপনে অর্ধেক ঠাসা। গহনা, মনিমুক্তা, হীরার আংটিও নগদ দামে নয়, সপ্তাহে দুচার ডলার কিস্তিতে কেনবার আমন্ত্রণ। আপনার ধার চাই?—শীতের জামাকাপড় কেনার জন্য? কিংবা মোটর গাড়ির অথবা বাড়ির অথবা আসবাবপত্রের জন্য? অথবা হলিডে-ভ্রমণের জন্য? ব্যাঙ্ক দরজা খুলে সাধাসাধি করছে, আসুন, ধার নিন। ক্রেডিট কার্ড পকেটে নিয়ে সারা দেশ ঘোরা যায়, স্বচক্ষে দেখেছি।

বারনার্ড শ লিখেছিলেন Breakages Limited এর কথা, এখানে অন্তত দুজায়গায় মস্ত বড় দুটি Wrecker Service—মোটর গাড়ি বাতিল করে ফেলবেন কোথায়? পথে ফেলে রাখলে মোটা জরিমানার ভয়, অতএব service wreckage এর শরণ নিন, তারা অল্প দামে বাতিল মোটর কিনে নিয়ে ইস্পাতের কারখানায় বেচে দেয়। তবু পথের ধারে ধারে মোটরের মহাশ্মশান। সমস্যা এদেরও আছে, প্রাচুর্যেরও খেসারত দিতে হয়। প্রথমত খুনজখমের বাড়াবাড়ি, অবশ্য শহরেই প্রায় সব। দ্বিতীয়ত বিষাক্ত বাতাস। ছোট শহরেও দেখেছি, ও শুনেছি, বাতাসে নানা রকম গ্যাস ইত্যাদির প্রকোপ প্রবল। Teenager দের দৌরাত্ম্য কেবল বড় বড় শহরেই. এদের ও ছাত্রদের সম্পর্কে, যেখানে গিয়েছি খোঁজ খবর নিয়েছি, কিছু কিছু তথ্য যোগাড় করেছি। পরে গুছিয়ে লেখার ইচ্ছা আছে। কোন কোন স্টেটের মধ্যবিত্ত মহলে ধর্মপ্রবণতা এখনও জোরালো। নৈতিক নিষ্ঠা, সেবা ইত্যাদি একেবারে ভণ্ডামি নয়। তবে ভোগ সুখের উপকরণে বাহুল্য সর্বত্র। সব স্তরেই যন্ত্রের ব্যবহারে এদের আগ্রহ অন্তহীন। আমার মনে হয় প্যাকেজিং পোর্টেবিলিটি, মিনিয়েচ্যরাইজেশন এদের টেকনিক্যাল কালচারের মোক্ষম কৃতিত্ব। ইন্‌সট্যাণ্ট কফির মত instant lawn (বাগান সাজানোর ঘাসের জমি) instant lily pool ও পাওয়া যায়। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় ছিলাম এক রাত ও এক সকাল। কোন কর্মী নেই,

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কয়েকটি আছে, যত খুশি চা, কফি, পেপসি-কোলা বোতাম টিপলেই পাওয়া যায়। অনেক প্রতিষ্ঠানের দরজা আপনাথেকেই খোলে, বন্ধ হয় চৌকাঠের কাছে দাঁড়ালেই—ফোটো-ইলেকট্রিক সিস্টেম। কাগজের গেলাসে ঢাকনি আঁটা গরম চা স্বচ্ছন্দে সঙ্গে নেওয়া যায়। কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে মনের মত পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচনের পদ্ধতিও কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। বই পড়ার দ্রুতত্ব বৃদ্ধির উপায় শেখানোর প্রতিষ্ঠানও চালু হয়েছে। লাইব্রেরি সমূহে শেষ পর্য্যন্ত বইই থাকে কিনা সন্দেহ, মাইক্রো-ফিলম এবং অটোমেশনের জন্য বড় বড় লাইব্রেরিতে লক্ষ লক্ষ ডলার বরাদ্দ হয়েছে।

এত যাদের কলাকৌশল, সাধারণ লোকের চিকিৎসা ব্যবস্থা যাতে সহজলভ্য হয় সেদিকে কিন্তু কুণ্ঠা ও কৃপণতার অন্ত নেই। চিকিৎসার খরচ সাঙ্ঘাতিক, সকলেই বলে ডাক্তাররা এখানে ডাকাত। হাসপাতালে দাতব্য চিকিৎসা একেবারে নিঃস্ব ছাড়া আর কারও জন্য নয়। লেখাপড়ার খরচও বেশী, তবে ইদানিং স্কুলের লেখাপড়া প্রায় অবৈতনিক কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শতকরা ৪৫ জন স্কলারশিপ পায়। বেকারদের ভাতা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তা নিয়ে নানা রকম অসন্তোষ আছে। ৬৫ বছরের উপরে যাদের বয়স, তাদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্প্রতি চালু হয়েছে। চাষবাস ক্রমশ বড় বড় কম্পানির দখলে চলে যাচ্ছে। ছোট গেরস্ত চাষী পরিবারের সংখ্যা কমছে।

সরোজ আচার্য

সান হুয়ান
পিউয়েরটো রিকো (পোর্টো রিকো)
৪-১২-৬৬

ইতিহাস-বিধাতৃ এই অ্যামেরিকানদের উপর সদয় সেই অষ্টাদশ শতক থেকে। সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ধরে মোটরে ছয় শ মাইল আসতে আসতে। স্পেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেনের সাম্রাজ্যিক ক্ষমতা ভেঙেছে, আর তার টুকরো সব জোড়া দিয়ে গড়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সান ফ্রান্সিস্কো থেকে লস এঞ্জেলিজ, সারা পথ ধরে ছোট ছোট শহর, গ্রাম, গীর্জা, এখনও পুরানো স্পেনীয় ধাঁচে। নামধাম প্রাচীন ভজনালয়, আঙিনায় লতাপাতা ফুল আমাদের দেশের ধর্ম্ম সংস্কৃতির মতই বিনম্র। স্পেনীয় নিষ্ঠুরতার দাগ কেবল ইণ্ডিয়ানদের জীবনে ও মনে। রাজ্য হাত বদল, হারজিত আরও হয়েছে। যা ছিল স্পেনের এবং তারপর ফ্রান্সের ১৯ শতকের গোড়ায় তাই আবার অ্যামেরিকার। প্রশান্ত মহাসাগর তীর ছেড়ে মিসিসিপির মোহানায় নিউ অরলিয়েন্সে এসে সেটা ভালমত বোঝা গেল। নিউ অরলিয়েন্স লুইজিয়ানা নেপোলিয়ন অ্যামেরিকাকে বেচে দেন মাত্র কয়েক লক্ষ ডলার মূল্যে।

এই শহরে এখনও পুরানো ফরাসী পাড়া, পাথুরে রাস্তা, ছোট ছোট দোতলা বাড়ি ঝুল-বারান্দা, ঘোড়ায় টানা গাড়ি, ফরাসী ধাঁচে খোলা বাজার এবং অবশ্যই ফরাসী কায়দায় আমোদ প্রমোদের উদ্দামতা। যদিও শুনি মার্কিনরা পুরানো জিনিষ রাখে না, এ সব অঞ্চলে পুরানো পাড়া সব এরা সযত্নে অবিকল বজায় রেখেছে। ফিলাডেলফিয়ায় ব্রিটিশ কলোনিয়াল স্টাইলের বাড়ি ঘর রাস্তা নিউ মেক্সিকোর সান্টা ফে শহরের আগাগোড়া স্প্যানিশ মেক্সিকান গড়ন, নিউ অরলিয়েন্সের ফরাসী ও স্প্যানিকা ধাঁচ—সবই নব্য মার্কিন নগর শিল্পের পাশাপাশি অবস্থান করছে।

নিউ অরলিয়েন্সের শীতের ধারালো হাওয়া, কিন্তু গাছ পালা সবুজ, পাতা ঝরার তাগিদ নেই, বরফ পড়ে না। সেখান থেকে আকাশ পথে হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে, কিউবার পাশ কাটিয়ে, জ্যামেইকার মনটেগো বে-তে ঘণ্টা খানেক থামতেই মনে হল দেশের কাছে এসে পড়েছি। সান হুয়ান মধ্য রাত্রে পৌঁছে ভাপসা গরম, পথঘাটে বদ্ধজলের পচা গন্ধ—মার্কিন পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে বিচ্ছেদটা স্পষ্টতর করল। সান হুয়ানে অনেক দিন পর ঠাণ্ডা জলে ধারা স্নান। জানা ছিল না এই সময়টায় মার্কিন শীত কাতরদের ভিড় এখানে। সে কি ভিড়! আর কি উজ্জ্বল উচ্ছল

বিলাসব্যসন! দোষ ধরি না, এরা যেমন পরিশ্রম করে তেমনি উপভোগেও এদের অমিত উৎসাহ। খাশ পোর্টো-রিকা বাসীরা স্প্যানিশ, ক্যাথলিক, তামাটে বাদামি রং। বেশ সাদাসিদে, ফুর্তিবাজ। অনেকের গলাতেই সরু সোনার হারে ক্রস চিহ্ন। শাদা মানুষদের চেয়ে এরা আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় অনেক বেশী অন্তরঙ্গ। সান হুয়ানের জৌলুস মাকিন ট্যুরিষ্টদের পয়সায়। রৌদ্রস্নান, নৌকা ও মোটর বিহারের কি ঘটা। দেশটা আমাদের মতই, তবে আরও সবুজ, আখ, আম, আনারস, কমলালেবুর ক্ষেত ও বাগান। জবা, যুঁই, ঝুমকোলতা, কাঠালী চাঁপা, পান্তাবাহার, তাল, খেজুর নারকেল গাছের ছড়াছড়ি।

গ্রামের পথে টাট্টু, ঘোড়ার পিঠে সওয়ার—সব উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চলের মত। ছোট ছোট শহরে ছোটো পালিশ-বাচ্চারা কলকাতার মতই। ডাব কেটে বিক্রির কায়দাও। শহরের বাইরে গরিব পাড়ায় আবর্জনা স্তূপও সেই রকম। তবে এদের বাড়ি ঘর সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। লেখাপড়ায় এগিয়েছে অনেক দূর, শতকরা ৯০ জন সাক্ষর। বিশ্ববিদ্যালয়টিও চমৎকার। শিক্ষণ বিভাগের সহ-অধিকর্তা একজন ভারতীয়-গুজরাটী। জিজ্ঞাসায় জানা গেল পঙ্কজ এঁর বাড়িতে অতিথি হয়েছিল। নাম ঈশ্বর বাংডিওয়ালা। বাড়ি সুরাটে। আজ যাব ফ্লোরিডায়।

সরোজ আচার্য

77 Blenheim Crescent
London W 11
29-11-1951

…এরা অল্প একটু শীতেই কাতর হয়ে পড়ে। রোজই ব্রেকফাষ্টের সময় শুনতে হয় Cold today isn't it? বলতেই হয় Yes, very,…ডাক্তার ফ্রী। ওষুধের জন্যও ভাবতে হয় না। টেলিফোন করলেই ডাক্তার, এবং প্রেসক্রিপশন। ওষুধ বিনামূল্যে। তবে কোনো কোনো ওষুধ ও পথ্য ফ্রী নয়। মিল্ক অভ ম্যাগনেশিয়া, হরলিক্স, ফ্রী নয়। অথচ কডলিভার অয়েল ক্যাপসুল, হ্যালিবাট অয়েল, পেনিসিলিন—ফ্রী।

…ব্রাইটনে ডাক্তার স্যাক্সটনের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা আছে।…এখানে আসবার পরেই এক হোটেলে একটা খুন হয়। খবরের কাগজে দেখলাম, আততায়ী মেয়েটিকে খুন করে পালিয়ে গেছে। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভরা এসে তদন্ত করছে।

এখানে কৃষ্ণ মেনন, পানিকর, রজনী পাম দত্ত, প্যালাকার, ডীন অভ ক্যাণ্টারবেরি, হ্যারি পলিট ইত্যাদির বক্তৃতা শুনেছি। সাধারণতঃ ছ পেনি লাগে। কিন্তু পানিকরের বক্তৃতায় পয়সা তো লাগেই নি উপরন্তু চা এবং স্যানড্বুইচ খাইয়েছে। শুক্রবারে আবার যাব চা খেতে। ইনি চীনের অ্যামব্যাসাডর।

হিমানীশ গোস্বামী

77 Blenheim Crescent
London, W 11
3-2-52

…কাল ব্রাইটনে ডাক্তার স্যাক্সটনের বাড়ী গিয়েছিলাম। ষাট মাইল পথ—দেড়ঘণ্টায় পৌঁছে গেলাম। ডাক্তার আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তাঁর ছোট ছেলে ক্রিস্টোফারের সঙ্গে। স্ত্রী এবং মেয়ে রোজালিন বাইরে ছিলেন। রাত ৯টায় ডিনার খেয়ে স্যাক্সটনের সঙ্গে গাড়িতে করে গেলাম এখানকার দ্রষ্টব্যের অন্যতম জর্জ ফিফোর্থের স্থানীয় বাড়িতে। এ বাড়ি তিনি ১৭৮৭ সনে পাঁচ লক্ষ পাউণ্ড খরচে নিজে করিয়েছিলেন। বাড়িটি এখনও ভাল অবস্থায় আছে। জিনিষপত্রও ভালভাবে রক্ষিত আছে। এখন এটি অনেকটা মিউজীয়ামের মতো। সেই আমলের ছবি, চেয়ার টেবিল, পিয়ানো এবং অন্যান্য আসবাবপত্র, সেই সময়ে প্রকাশিত বই সমস্ত সাজানো আছে। গালিভার্স ট্র্যাভেলস্-এর প্রথম সংস্করণ, গোল্ডস্মিথের রচনাবলী, জেন্টলম্যানস ম্যাগাজিন, (১৭৩১ সনে এডওয়ার্ড কেভ কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত, ১৭৩৮ সনে স্যামুয়েল জনসন টাকে যোগ দেন) ইত্যাদি অনেক বইএর প্রথম সংস্করণ

আছে। ভারতবর্ষ বিষয়ক বইও আছে কয়েকখানা। একখানা ভারতবর্ষের ইতিহাস আছে। উড়ন্তপাখী শিকার বিষয়ে একখানা বই আছে। বেশ মোটা বই।

চতুর্থ জর্জের বিছানা, বাড়ির গুপ্ত দরজা, ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদিতে খুব জমজমাট। বাড়িটি ব্রিটিশ চাইনীজ, ইণ্ডিয়ান ও জাপানীজ ষ্টাইলের সংমিশ্রণ। মিউজীয়ামের কিউরেটর মিষ্টার মাস্‌গ্রেভ এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। তাঁরাই এত রাত্রে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। ঘরে অনেক ছবি আছে সোনার উপর এনগ্রেভ করে আঁকা। সোনার থালা বাটি ইত্যাদি দেখলাম। চুরি নিবারণের জন্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে, সোনার পাত্রের দিকে হাত এগিয়ে এলেই ঘণ্টা বেজে ওঠে। একদিন ঘণ্টা বেজে উঠেছিল—ছুটে এসে দেখা গেল চোর মানুষ নয়, বিড়াল।

দুপুরে আহারান্তে ডাক্তার স্যাক্সটন ও তাঁর কন্যার সঙ্গে তাঁদের গাড়িতে বেড়াতে বেরোলাম। তারপর এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলাম। তারপর Peace appeal-এর ফর্ম নিয়ে আমরা আধঘণ্টা স্বাক্ষর সংগ্রহে বেরোলাম। একজন বললেন শান্তি তো সবাই চায় সুতরাং পৃথকভাবে চাইবার অর্থ হয় না। আর একজন বললেন আমি সেনাবাহিনীর লোক, আমি শান্তি চাই না। জনকয়েক সই করলেন, কেউ কেউ চার পেনি থেকে এক শিলিং চাঁদ দিলেন।

স্যাক্সটনের বাড়িতে তোমার তোলা দু একখানা ফোটোগ্রাফ আছে, পিসেমশাইয়ের [সরোজ আচার্যের] ফোটোগ্রাফ আছে অ্যালবামে। দেওয়ালে যামিনী রায়ের পেনটিং টাঙানো আছে।

হিমানীশ গোস্বামী

77 Blenheim Crecent
London W 11
25-2-52

…এদেশের সাধারণ মানুষদের রুচি, আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের রুচির চাইতে বেশ খারাপ।…এখানে এত ভাল্‌গার ছবি দেখায়, যা আমাদের দেশে দেখালে দর্শকেরা সিনেমা হল পুড়িয়ে দেবে। হাসির ছবি—জোর করে হাসানোর অপচেষ্টা।

ক্রাইম সিনেমাগুলো মজার। ছবিতে সবসময় ধরে গুলি চলে, ছবি শেষ করার মিনিটদুই গুলি চালানো বন্ধ থাকে। ছোটদের ছবিও ভাল লাগেনি। অধিকাংশ সিরিয়াল ছবি। দু এক কিস্তি দেখেছি। ষোল সপ্তাহে একটা ছবি শেষ। অ্যাটম ম্যান vs সুপারম্যান নামক ছবির একটা অংশে দেখা গেল অ্যাটম ম্যান সমস্ত সভ্যতা ধ্বংস করার জন্য অ্যাটমের সাহায্যে বাড়িঘর পোড়াচ্ছে, আর সুপারম্যান তা ব্যর্থ করছে। সুপারম্যান আকাশে উড়তে পারে, গাছ টেনে ওপড়াতে পারে। বাস মোটর গাড়ী ইত্যাদি দু আঙুলে তুলে আকাশে উড়ে বেড়ায়।

পথে দেখেছি ছেলেরা তীর, ধনুক, খেলনা বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মেক্সিকানদের মতো পোষাকে। মারামারি করে, এয়ারপ্লেন নিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে। খেলনা বিক্রির দোকানেও সৈন্যসামন্ত, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ প্রভৃতিতে বোঝাই। অর্থাৎ বর্তমান সরকার যুদ্ধসমর্থক, ব্যবসায়ীরা তার পুরো সুযোগ নিচ্ছে।

হিমানীশ গোস্বামী

15 Lindfield Gardens
London N. W. 3
2-12-52

…এমন ঘন নিকেষ্ট কুয়াশা সম্ভবত এর আগে আর হয়নি এখানে। প্রায় চারদিন লণ্ডনের শ্বাসরোধকারী অবস্থা। তবু ব্রাইটনে দুদিন বাস করে এর হাত থেকে কিছু নিষ্কৃতি পেয়েছি। যারা লণ্ডনেই ছিল তাদেরই হয়েছিল মুশকিল। প্রায় হাতের কাছের জিনিষ চেনা যায় না এমন অবস্থা। সবই অনুমান করে চালাতে হচ্ছিল। এমন অবস্থাতেও অবশ্য অফিস আদালত সবই খোলা ছিল, কিন্তু উপস্থিতির সংখ্যা কোথাও শতকরা চল্লিশের বেশি না। সিনেমা-থিয়েটার সবই বন্ধ ছিল। পথ চলতি গাড়ির আওয়াজ

কদাচিৎ। কেবল আণ্ডারগ্রাউণ্ড খোলা। কিন্তু সেখানেও যাত্রীর সংখ্যা কম। কিছু কিছু বাস্ চলেছিল বা চলার চেষ্টা করেছিল প্রথম দিকে। সামনে একজন লোক, কণ্ডাকটর জাতীয় কেউ, বাসের আগে আগে জলন্ত মশাল নিয়ে চলছিল। কয়েক গজ দূর থেকে ঐ জিনিষটাই শুধু দেখা যেত। কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবকও এসময় পথচারীদের সাহায্য করেছে। আবার দুর্বৃত্তরাও এই সুযোগে পথচারীর টাকাপয়সা কেড়ে নিয়েছে।

লণ্ডনে গরু বাছুর প্রদর্শনী হয়ে গেল এ সময়। কুয়াশার জন্য অনেক গরু মারা পড়েছে। আর যেসব বৃদ্ধ শ্বাসরোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন, তাঁদেরও অনেকে মারা গেছেন এই ভয়ঙ্কর কুয়াশায়।

হিমানীশ গোস্বামী

15 Lindfiled Gardens
London N. W. 3
3-6-53

…কাল করোনেশন হয়ে গেল—বিরাট হৈ চৈ-এর ব্যাপার। গত সাতদিন ধরে বাকিংহাম প্যালেসের সামনে ভয়ানক ভিড়। পরশু থেকে দলে দলে লোক কম্বল নিয়ে প্রসেশনের পথে শুয়ে বসে দিন রাত কাটিয়েছে—বৃষ্টিকেও অগ্রাহ্য করে। সময় কাটাবার জন্য এবং দুঃখ ভোলার জন্য চীৎকার করে গানও গেয়েছে। বেলা দুটোর সময় শোভাযাত্রা দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বৃষ্টির জন্য যাওয়া হল না। …এভারেস্ট বিজয়ের খবর আজ ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান ছেপেছে—দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়। প্রথম পৃষ্ঠায় করোনেশন।

হিমানীশ গোস্বামী

15, Lindfield Gardens
London N.W 3
June 14, 1953

…স্টালিনের অসুখের সংবাদ লণ্ডনের কোন সকালের কাগজে ছাপা হয়নি, খবর প্রথম পাওয়া গেল সান্ধ্য কাগজে। তারপর খবর জানবার জন্য সবাই ব্যস্ত। রাশিয়ায় কি ঘটেছে তা জানবার জন্য তখন সবাই সান্ধ্য কাগজের প্রতীক্ষায় রইল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এখানে সান্ধ্য কাগজগুলি ছাপা হয়, বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটুক আর না ঘটুক। তা ছাড়া ফুটবল, ক্রিকেট, শেয়ার বাজার, ঘোড়দৌড় ইত্যাদির জন্যও এই সান্ধ্য কাগজ চাই। গাড়ীতে দেখা যাবে প্রায় সমস্ত যাত্রী একটা না একটা সান্ধ্য কাগজ পড়ছে।

এ কাগজ অবশ্য সন্ধ্যা বেলা বেরোয় না। আসলে বেলা দশটা থেকে এই সব কাগজ ছাপা আরম্ভ হয়, ছাপবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে করে সমস্ত লণ্ডন শহরে কাগজগুলি পৌছে দেওয়া হয়। অনেক সময় কিছু ঘটবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তা ছবিসমেত ছাপা হয়ে যায়। কোনো বাড়িতে হয় তো তিনটেয় আগুন লেগে বাড়িটা পুড়ে গেছে, বাড়ির বাসিন্দা সে সময় সিনেমায় গেছেন, পাঁচটায় সময় বেরিয়েই তিনি কাগজে দেখলেন তাঁর পোড়া বাড়ির ছবি, আগুন লাগার কারণ এবং কত ক্ষতি হল তার হিসাব।

ষষ্ঠ জর্জের শোক শোভাযাত্রা দেখতে বহু লোক ভোর বেলা থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সাড়ে দশটার কাগজে তারা তাদের ছবি দেখতে পেয়েছিল। ঐ সময়ের মধ্যে ছবি তোলা, ডেভেলপ করা, এনলার্জ করা এবং ব্লক তৈরী করে ছাপা শেষ!

একবার এখানে আমার ডেইলি এক্সপ্রেস কাগজের অফিস দেখবার সুযোগ হয়েছিল। এখানা সান্ধ্য কাগজ নয়, তবে এই প্রেস থেকে একখানা সান্ধ্য কাগজ বেরোয়। প্রেসটি ইউরোপের মধ্যে সবচাইতে আধুনিক। কাগজের বিক্রি শুনলে তাক্ লেগে যাবার কথা—প্রতিদিন প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ। এই একখানা কাগজের এত বিক্রি! ডেইলি মিররের বিক্রিও ঐ রকম। সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় 'নিউজ অভ দি ওয়ার্লড'। এখানা শুধু রবিবারের কাগজ। বিক্রি সংখ্যা ৮৫ লক্ষ।

এই প্রেসের রেফারেন্স বিভাগ দেখবার মতো। এবং একটি ফোটোগ্রাফিক বিভাগও আছে। ছবির সংখ্যা ৪০

নক। যে কোনো ব্যক্তির ছবি চাইলেই পাওয়া যায়। আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বিশেষ কোন ব্যক্তির ছবি দেখতে চাই কিনা। বললাম কুইন অ্যানের ছবি দেখব। এক মিনিটের মধ্যে ছবি দেখতে পেলাম। একখানা নয়, তিনখানা! আর একজন বললেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি দেখব। ছ'সাত রকমের ছবি দেখান হল।

সান্ধ্য কাগজে লণ্ডনের খবরই বেশি থাকে, ফলে মজার মজার খবর সংগ্রহ করতে হয়। একখানা বাস্ ভুল করে অন্য পথে গিয়েছিল, এ নিয়ে আমাদের কাগজে বড় হেড লাইন ছাপা হয় না। কিন্তু সেদিন ইভনিং স্ট্যাণ্ডার্ডে বিরাট হেডলাইন দিয়ে এই খবরটি ছাপা হয়েছিল।

হিমানীশ গোস্বামী

Wahringer Strasse 26/5

IX Vienna Austria

5-11-53

...প্রোফেসর Sauerbruch-এর জীবনচরিত্রের মত ভিয়েনার পৃথিবীবিখ্যাত শস্ত্র চিকিৎসক Prof. Adolf Lorenz-এর একটি আত্মজীবনী বাহির হইয়াছে। আপনি জার্মান পড়িতে পারিলে এক কপি পাঠাইতে পারি। সাউএরব্রুকের জীবনী আপনি অনুবাদ পড়িয়াছেন, আমি মূল সংস্করণে পড়িয়াছি। ওঁর লেখা পড়ি আর ভাবি আমাদের দেশের বড় বড় ডাক্তাররা একটি কালির আঁচড়ও কোথাও রাখিয়া যাইতেছেন না।

অশোক বাগচী

হ্বারিংগের ষ্ট্রাসে ২৬ ৫

ভিয়েনা—৯

৩০-১১-৫৩

...আগামী বুধবার [২-১২-৫৩] সস্ত্রীক কবি নজরুল ইসলাম আসছেন চিকিৎসার জন্য। আমাকেই সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে। লণ্ডন থেকে নজরুল সমিতির সম্পাদক তার করে জানিয়েছেন। আরোগ্যের কোনো আশা নেই। আমি ও আমার 'দল' উভয়েই ওঁর সমস্ত এক্স-রে ইত্যাদি দেখেছি। ওঁর মস্তিষ্কটি শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে। ভিয়েনার নিউরোলজিস্ট ফ্রয়েড-শিষ্য প্রোফেসর হফ্ একবার ওঁকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন, সেই জন্যই ভারতে ফেরবার পথে কবিকে ভিয়েনা ঘুরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।...

অশোক বাগচী

ভিয়েনা

১২-১২-৫৩

...কবি নজরুল এখানে এসেছেন। আরও অনেক প্রকার পরীক্ষা ওঁর উপরে করা হয়েছে। রোগ সারবার আশা নেই। আপনার কথামত একটি ছোট লেখা [নজরুল সম্পর্কে] পাঠালাম।...

অশোক বাগচী

Wahringer Strasse 24-5
Vienna IX
Austria
21-1-54

...নজরুল সম্বন্ধে লেখাটির জন্য বহু প্রশ্ন আমি পাইয়াছি। নজরুল প্রসঙ্গ নিশ্চয়ই এতদিন ধামাচাপা পড়িয়া গিয়াছে!

এখানে কয়েকদিন খুব তুষারপাত হইয়া গেল। এখন অবিরল ধারায় বৃষ্টি হইতেছে। এবারের ইউরোপীয় শীত বোধ হয় খুব মৃদু হইবে।

আমরা ২৩শে জানুয়ারি এখানে নেতাজী জন্মদিবস উদ্‌যাপন করিব। নেতাজীর পত্নী এবং কন্যার উপস্থিতি আশা করিতেছি।...২৬শে জানুয়ারিতেও আমরা গণতন্ত্র দিবস উৎসব করিব।

অশোক বাগচী

ভিয়েনা

২৯-১-৫৪

...মাসিক বসুমতীতে আপনার "জাগিল কি ঘুমালো সে" [জীবন কি, ও মৃত্যু কি, নিয়ে জল্পনা] লেখাটি অতি

উপায়েই হয়েছে। তবে এটা সত্যি যে কথা ঐ স্টাওয়ার্ডের লেখার সম্বন্ধে আমাদের পাঠক সমাজে অত্যন্ত কম। ...এখানে অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে, তাপমাত্রা মাইনাস ২০° থেকে মাইনাস ২৫° সেনটিগ্রেড। আমি তো হাসপাতাল থেকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়েছি। এখানে একটি বাংলাচিত্রের পরিচালক আসছেন চিকিৎসার জন্য। আমরা খুব সমারোহ করে 'রিপাবলিক ডে' এবং নেতাজী জন্মতিথি পালন করলাম।

অশোক বাগচী

London W.C.I
1-3-54

...মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজেই ঘুরতে হবে।...

বার্মিংহাম শহরে একটা শেক্স্‌পীয়র লাইব্রেরি দেখলাম, সেখানে ৬৫টি ভাষায় পুস্তক আছে শেক্স্‌পীয়র সম্বন্ধে। ভারতীয় ভাষার মধ্যে বাংলা. হিন্দী, কন্নড়ী, তামিল, সিন্ধি, তেলুগু, ও উর্দু ভাষায় লেখা বই আছে। বাংলা বইয়ের সংখ্যা চার। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এ রকম সংগ্রহ হওয়া প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বহু ভাষায় লেখা বেরিয়েছে, সেগুলো চেষ্টা করে সংগ্রহ করা উচিত। শেক্স্‌পীয়র লাইব্রেরিতে শুধু যে বইই আছে তা নয়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ ইত্যাদিও সংগ্রহ হয়েছে। শুধু পুস্তকের সংখ্যাই ৩৫,০০০। এই লাইব্রেরি শুধু গবেষক ও অধ্যাপকদের পক্ষেই উপযোগী তা সত্বেও প্রায় ১৫০০ লোক একবছরে এই লাইব্রেরি ব্যবহার কোরেছে!

পঙ্কজকুমার রায়

লণ্ডন
১৫-৬-৫৪

সাত আট বছর পরে এদের মধ্যে ফিরে এসে একটা বেশ পরিবর্তন অনুভব কোরছি। এর আগের বার যখন এসেছিলাম, তখনও এদের কাছে ভাল ব্যবহার পেয়েছি—কিন্তু এবার যেন তার মধ্যে একটু তফাৎ। এরা সকলেই জানতে চায় আমরা কি অনুভব করছি এদের কাজকর্ম এবং বিশেষ করে শিক্ষার প্রগতি সম্বন্ধে। "তোমাদের কাছ থেকে অমুক জিনিষটা আমাদের শিখবার আছে"—একথা শুনে খুশি হয় না এমন ইংরেজ দেখলাম না। না শুনলে নিরাশ হয়। আমাদের রিপোর্টের অন্তত একটা প্যারাগ্রাফে বলতে হবে কি পেলাম এখান থেকে। এরা কোন রকম সমালোচনা চায় না। সেদিনের একটা ঘটনা থেকে বোঝা যাবে। এখানে যারা advanced work-এর জন্য এসেছে তাদের কাজের আলোচনার জন্য একটা সেমিনার আছে। এখানে নিজের নিজের কাজ সম্বন্ধে বলতে হয় দু একবার। সেখানে আলোচনাও হয়। একজন দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষক (ইনি কেপ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার) গত বুধবারে বলছিলেন এই সেমিনারে। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল Social Studies। তিনি কি দেখেছেন এবং পেয়েছেন। আরও অনেক কথার মধ্যে তিনি বললেন ইংরেজ শিক্ষক পরিবর্তন চায় না—এটা সমাজ ব্যবস্থার বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষামন্দিরের বাইরে যেন নোটিস রয়েছে DND (Do not disturb)। তাঁর কথাতেই বলছি "it may be all right for tombstones but not for people who want to shape destinies of nations-" এরকম ধরনের আরও অনেক মন্তব্য করলেন। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা মিস্টার হ্যারিসন এখানে উপস্থিত ছিলেন—তাঁর সঙ্গে বক্তার লড়াই শুরু হোলো। কিন্তু মিঃ হ্যারিসন বিতর্কের প্রথম ধাপেই ভুল করলেন উত্তেজিত হয়ে। অতিথিদের (বক্তা) অতি শান্তভাবে তাঁর আপত্তি খণ্ডন করে নিজের মত প্রতিষ্ঠা কোরলেন। ইংরেজ শিক্ষাবিৎ নিজের ত্রুটি দেখেন না, এবং মনে করেন যে তিনি যা কোরলেন বা ভাবলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে তাই হলো প্রগতির চরম নিদর্শন। এই বিতর্কের ফল হলো হ্যারিসন বক্তাকে ক্ষমা করতে পারলেন না। আগামী কাল চায়ের পার্টিতে শান্তি স্থাপন হবে আমরা আশা কোরছি।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এরা আমাদের সাহায্য করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও শুনতে চায় যে আমরা প্রথমে শিষ্য হতে রাজি আছি। অনেক আলোচনার মধ্যেই, 'ভারতবর্ষে এখন দরকার'—ইত্যাদি কথা মিলবে এবং ইংরেজের মুখ থেকে শুনে উত্তেজিত হলে চলবে না। এদের সঙ্গে শান্তমনে মিশতে পারলে শেখবার অনেক কিছু আছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মনটাকে শক্ত কোরতে হয়, English tradition-এর স্তোত্র শুনে বিরক্ত হবার উপায় নেই।

আমার ধারণা হয়েছে যে আমাদের দেশ থেকে ছেলে-মেয়েদের এখানে ডিগ্রী নেবার জন্য আসা বৃথা—প্র্যাকটিক্যাল কাজ, যেমন এনজিনিয়ারিং অথবা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য আসার মূল্য আছে, কিন্তু এখনও বেশীর ভাগ আসে বি-এ অথবা ঐ রকম কোন ডিগ্রীর জন্য এবং অত্যন্ত অল্প বয়সে। স্বাধীনতা লাভের পর বিলাতে আসার স্বাধীনতা অনেক বেড়ে গেছে, আর আমাদের ইণ্ডিয়া হাউস ট্র্যাভেল-এজেন্টের কাজ কোরছে বলা চলে।

পঙ্কজকুমার রায়

C/o Indian Press Digest
456 Library Annex
University of California U.S.A
১৩ অক্টোবর ১৯৫৭

...আমি এখানকার কাজকর্মের মধ্যে এখনও স্থির হয়ে প্রবেশ করিনি। তবে শিকাগো ও নর্থওয়েস্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে কয়েকটি ক্লাস নিতে হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়াতে পাঁচ ছ মাস থাকবো ও বর্তমান ভারত এবং গান্ধীজীর রাজনীতিক মতবাদ সম্পর্কে ধারাবাহিক কিছু সংবাদ দেব।...

নির্মলকুমার বসু

(ক্রমশঃ)
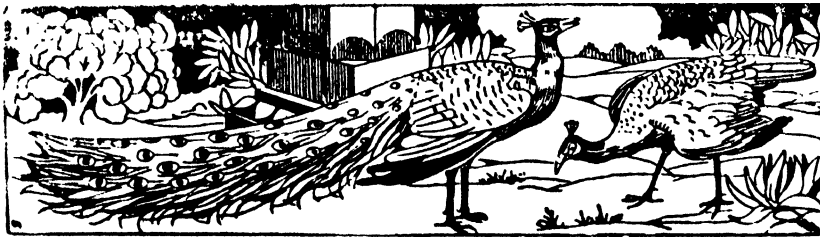
দশমী

(গল্প)

সুবোধ বসু

'হনিমুনটা মন্দ হচ্ছে না।' গাড়ী চালাতে চালাতে চোখের কোণ্ দিয়ে তড়িতের দিকে চেয়ে স্মিতমুখে বললে বিদিশা।

সমর্থনে সামান্য হাসির আওয়াজ এলো তড়িতের বাঁদিকের আসন থেকে।

'চমৎকার দৃশ্য না?'

'ভারি সুন্দর।'

বাঁদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। তারই গা থেকে রাস্তা কাটা হয়েছে। ডানদিকে জল। অনন্ত জল। বাঁধ তো নয়, যেন সমুদ্র! একদিকে তট বেঁকে বেঁকে গিয়েছে। ও-পার দেখাই যায় না! কিন্তু বহু দূরে যেন এক দ্বীপের উপর একটা বাংলোর মত দেখা যাচ্ছে ছোট আর অস্পষ্ট হয়ে। এটাই এদের গন্তব্যস্থল। সেদিকেই গাড়ী এগিয়ে চলেছে।

'রীতিমত একটা বে-অব-বেঙ্গল!' গাড়ীর গতি শ্লথ করে' বললে বিদিশা। বাঁ হাতটা স্থাপন করলে তড়িতের কাঁধে।

'বে-অব-বিহার বল!' কৌতুক করে' বললে তড়িৎ। 'কিন্তু সাবধান। সামনে ব্রিজ!'

'দেখেছি, ভীরু কোথাকার।' হাল্কা গলায় বিদিশার জবাব এলো। 'এপথে প্রথমবার এসেছিলাম বাবার সাথে। তখন জ্যোৎস্না উঠেছে। সারা বাঁধের জল রূপো হয়ে টলটল করছে। আমার হাতে স্টিয়ারিং থাকলে চালিয়ে দিতাম জলের দিকে, এই রকম মনের ভাব ছিল। সে কি দৃশ্য! এ দৃশ্য দেখেই বোধহয় চৈতন্যদেব জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন...'

ব্রিজের উপর এসে গেল গাড়ী। উঁচুনিচু পাহাড়ী রাস্তা হঠাৎ যেন ক্লান্ত হয়ে নেমে এলো সমতলভূমিতে।

পাহাড়ের জায়গায় চষা ক্ষেত এসে গেছে। চাকা পড়ে গেছে ডাইমের দুরটাও। সমতলভূমির রাস্তা শাড়ীর কালোপাড়ের মত সামনে প্রসারিত। খোলা হাওয়াতে উড়ছে বিদিশার চুর্ণ কুন্তল. সামন্তের সিঁদুরের ক্ষীণরেখা ঢেকে দিচ্ছে, চোখে সান্-গ্লাসের ফ্রেমে ও কাচে আছাড় খেয়ে পড়ছে। স্পীডোমিটরের কাঁটাটা চল্লিশে। গন্তব্য-স্থল আর দশ-পনেরো মিনিট মাত্র ইতিমধ্যেই তার আভাস শুরু হয়ে গেছে রাস্তার দু'দিকে। পছন্দমত গাছ দিয়ে অরণ্য তৈরি করা হচ্ছে। সারি সারিতে গাছ বেশ কিছুটা বড় হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। দশ বছর পরে যে পথিক এ-পথে আসবে সে ভাবতেই পারবে না এই বন আপনা-থেকে গড়ে-ওঠা নয়।

'এসে পড়েছি'. বিদিশা বললে। 'ঐ তো মোড়টা! সিধে রাস্তা চলে গেছে কোদার্মায়। আমরা ডাইনে...' ডানদিকে স্টিয়ারিং ঘুচ্ড়ে খুকির মত সহর্ষ কণ্ঠে বললে বিদিশা। সবই তার চেনা। আগে একাধিকবার এখানে এসেছে। তড়িতই কখনও আসে'নি।

বাঁদিকে সৈনিকস্কুলের ক্যাম্পাস্। তার ও'দিকে ড্যাম সংক্রান্ত অফিস ও তার কর্মচারিদের কলোনী। সমতল রাস্তা থেকে আরও একটা টার-ম্যাকাডেমের রাস্তা উঠে

গেছে সামনের উঁচু টিলায়। এই পাহাড়ী সড়কে গাড়ী চড়িয়ে দিলে বিদিশা। মজা করে বললে, 'দার্জিলিঙে চড়ছ!' দেখতে দেখতে কয়েকটা বাঁক ফিরে গাড়ী তিলাইয়ার গেষ্ট-হাউসের সদর দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেল।

অল্প শুনেছিল তড়িৎ দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশনের তিলাইয়া বাঁধের এই পান্থনিবাসটি সম্বন্ধে। এর প্রায় তিনদিক ঘিরে বাধা-পাওয়া বরাকর নদীর অনন্ত জলরাশি। তার মাঝে মাঝে অরণ্যপূর্ণ দ্বীপ। আর যেখানে দাঁড়িয়ে আছে এই অতিথিশালা সেটা একটা অন্তরীপ ছাড়া কিছু নয়। যে বন তারা রাস্তায় দেখে এসে ছিল, সেই সযত্নলালিত অরণ্যটিও সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে এসে কয়েক ধাপ নিচে মাত্র দাঁড়িয়ে আছে।

'জলদী করো। আগে বুকিং ঠিক আছে কিনা দেখা যাক। চারদিনের বুকিং···'তড়িতের হাতে এক ঝাঁকুনি দিয়ে প্রকাণ্ড চওড়া হয়ে-ওঠা রাস্তাটার ও-প্রান্তের জলবিস্তারের প্রতি তার মুগ্ধদৃষ্টি ভেঙে দিয়ে তাড়া লাগাল বিদিশা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দু'জনে অফিস-ঘরের দিকে।

পুজোর ছুটি। অতিথিতে ঠাসা তিলাইয়ার অতিথিশালা। আর রোজ সকাল-বিকেলে গাড়ী বা বাস্-এ করে' সারাদিন বা একবেলার জন্য কত যে ভিজিটর্ আসছে এই রম্যস্থানটিতে বেড়াতে তার সীমা নেই। লেক দেখা-যাওয়া সামনের ঠেলে বেরিয়ে-আসা বারান্দাটার বসে তারা ঠাণ্ডা বা গরম পানীয় বা খাদ্যের অর্ডার দিচ্ছে লাগোয়া ডাইনিংহলের বেয়ারাদের; কখনও বা ডাইনিংহলে পান্থনিবাসের বাসিন্দাদের সঙ্গে বসে লাঞ্চ করছে।

মিসেস ঘটক আর মিসেস সরকার দু'জনই এসেছেন কলকাতা থেকে সপরিবারে। অর্থাৎ স্বামী বা স্বামী ছাড়াও এক আধটি ছেলেমেয়ে সঙ্গে আছে। দুজনেই পুরনো বন্ধু, পঞ্চাশের উপর। একই জায়গায় থাকায় গল্প করার সুবিধে হয়েছে। প্রায়ই তাদের ডাইনিং হলে চা বা কফি নিয়ে বসে থাকতে দেখা যাবে। স্বামীরা বা ছেলেমেয়েরা চারদিকে হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে। তারা সে দলে যোগ দিতে অনিচ্ছুক।

'দেখ ও দিকে একবার চেয়ে।' ঘটক-গিন্নী চোখের ইঙ্গিতে সামনের খোলা বারান্দাটা দেখিয়ে বললেন। 'নতুন বিয়ে সবারই হয়, কিন্তু এমন আদিখ্যেতা ক'টা দেখেছ? গরম কফি খাচ্ছে 'স্ট্র' দিয়ে! প্রাণের পুলক একেবারে উপ্‌চে পড়ছে! কাগজের নল যে গরমে চুপ্‌সে যাবে, সে খেয়াল পর্য্যন্ত নেই···'

'ওদের ভাই সবই আলাদা; সরকার-গৃহিণী বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন। 'দু' দিন হবে এসেছে, অথচ একবারও ডাইনিং-রুমে খেতে আসেনি—না লাঞ্চে, না ডিনারে। বেয়ারা বললে, ওদের খানা ঘরে দিয়ে আসতে হয়, অফিসে ব্যবস্থা করেছে···

'ব্যবস্থা আর কি; মিসেস্ ঘটক দাঁতে একটা নোন্‌তা বিস্কুট চূর্ণ করে বললেন। বেশী করে' বক্‌শিষ দেয় ব্যাটাদের। অস্বাভাবিকের হাঁড়ি! নইলে বেড়াতে এসেছিস, ডাইনিং হলে আসবি, পাঁচটা লোকের সঙ্গে চেনা হবে, গল্প হবে···।

মিসেস সরকার হাসলেন। বললেন,, 'ওদের এখন অন্য সঙ্গীর দরকার নেই। দুজনেই সম্পূর্ণ। প্রথম প্রথম এমনটা হয়···'

'কিন্তু এত ঢলাঢলি হয় না।' মিসেস ঘটক প্রতিবাদ করলেন। 'সকাল বেলা আমাদেরই সঙ্গে একই মোটর-বোটে গিয়েছিল দ্বীপটায়। আরও যাত্রী ছিল। একই সঙ্গে সবাই ঘুরেছি বা কাছাকাছি থেকেছি। এরা দুজন দ্বীপে পদার্পণ করা মাত্র গাছ আর ঝোপের আড়ালে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রেম-নিকুঞ্জের অভাব নেই সেখানে। দেখা পেলাম আবার সেই ফেরবার সময়। মোটর-বোট সিটি দিচ্ছে, ফিরে এসো। বার বার সিটি দিচ্ছে। আমরাও ছুটেছি বনের পথে ফিরে যাবার জন্য।

অন্য যাত্রীরাও ছুটে এসেছে দেখা গেল। হঠাৎ পথে সেই যে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে গিয়ে পার্কের মত জায়গাটা, একেবারে জলের ধারে। দেখি, দুজনে একই দোলনায় বসে ধীরে ধীরে দুলছে। সিটির আওয়াজ যেন কানেই যায় নি। সঙ্গে ছেলে মেয়েরা ছিল, লজ্জায় মরি। ব্যাটাছেলের না হয় লজ্জা-সরম নেই, কিন্তু তুই তো মেয়েছেলে! না হয় মোটরই চালাস আর ফর্ ফর্ করে ইংরেজি বকিস···'আরও দুটো নিম্‌কি বিস্কুট তুলে নিয়ে দাঁতে গুঁড়ো করলেন।

মিসেস সরকার ঘটক-গিন্নীর চেয়ে অনেকটা ঠাণ্ডা স্বভাবের। কিন্তু গল্প শোনাবার আগ্রহ তাঁরও কিছু কম নয়। মিসেস্ ঘটকের কাছে আরও একটু ঘেঁষে বসে গলার স্বর আরও একপর্দা নিচু করে তিনি বললেন' 'কাল সন্ধ্যার পর কর্তার শখ হলো, সামনের থাক-ওয়ালা বাগানে বেড়িয়ে আসবেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে আমার ভয় করে, পাশেই খাদ, গড়িয়ে পড়লে একেবারে জলে গিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু উপায় কি। কোনও রকমে দুটো তলা নেমে গেলাম। তারপর আরও একটা তলা। তাতেও নাকি হবে না। আরও একটা চাই। কত থাক নেমে যে জলেতে এসে পড়েছে বাগানটা, ভগবান জানেন। আমি তো এর আগে দুথাকের বেশি নামিনি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি চার নম্বর থামের আধাআধি—হঠাৎ পাশের ঝোপের ধারে গলার আওয়াজ শুনে সেদিকে চমকে তাকালাম। একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে স্বামীটি। সোহাগিনী স্ত্রী কাৎ হয়ে কোলের উপর মাথা রাখবার উপক্রম করছে, কিন্তু স্বামী সঙ্কোচ করে বলছে, "না না, এ ঠিক হবে না। কেউ দেখে ফেলবে" বা ওই রকম কিছু। 'দেখুক গিয়ে। বয়ে গেল। আমরা কাকে কেয়ার করি।" বলে নতুন বউটি গড়িয়ে পড়ল ঘাসে ঠ্যাঙের ওপর মাথা রেখে। বললে, "আগে তো খুব গাইতে। এখন কি হয়েছে? সেই গানটা গাও তো: জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।······আমরা তো পেছন ফিরে পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে ছুট। হেসে কর্তা বললেন, "নবদিবা-দিবুদের ডিস্টার্ব করতে নেই। হনিমুন বেশি দিন চলে না। যতদিন চলে, উপভোগ করতে দাও।···'

'আগে খুব গাইতে! এখন কি হয়েছে? হনিমুনের অন্যতম শরিকের নিজস্ব উক্তি সযত্নে উদ্ধৃত করে মিসেস ঘটক মন্তব্য করলেন, 'তবে প্রেমের বিয়ে! আগে থেকেই ঢলাঢলি ছিল।" একটা জাহাজের ভাব আছে তিলায়ার এই গেষ্ট-হাউসের। এর সামনের চওড়া হয়ে-ওঠা রাস্তাটা ডেক আর কামরাগুলো ঠিক যেন ক্যাবিন! ক্যাবিনের মত অপরিসর না হলেও খুব বড় নয় বেড-রুম। দুটো করে চৌকো ধরনের জানালা দিয়ে তাকালে ড্যামের জল দেখা যায়। দুটো সিঙ্গল খাটের মাঝে তেপায়াতে টেবিল-বাতি ভেতরের বারান্দার ধারের দেওয়ালের মাঝামাঝি কাপড় রাখবার আলমারি দেওয়ালের গায়েই বসানো। তার ওদিকে অন্য দিকের দেওয়ালের সাথে ড্রেসিং-টেবিল। কামরায় ঢোকবার দরজা ভেতরের খাস-বারান্দা ও বাইরের খাস-বারান্দা দুদিক থেকেই। এদিকের দেওয়ালের ধারে দুটো জাপানী ধরনের চেয়ার। তারপর লাগোয়া বাথরুমে যাবার দরজা। অল্প জায়গার মধ্যে সব গুছিয়ে সাজানো, যেমন জাহাজের কামরায় হয়। এরই মধ্যে আবার একটা তাপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের জানালাও রয়েছে।

রাত দশটা বেজে গিয়েছে। ডিনারের পরেই যে যার ঘরে চলে যায়। ক্রমে চুপ চাপ হয়ে ওঠে সব। রাত দশটায় নিশুতি রাত। কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত নিচের কলোনীর বারোয়ারী দুর্গা পুজার মণ্ডপে হিন্দী চলচ্চিত্রের গান বেজেছে; মাইকের স্বর তার উগ্রতা হারিয়ে বেশ মিষ্টি হয়েই পৌঁছচ্ছিল উপরের গেষ্ট হাউসে। এখন তাও থেমে গেছে। কোথাও কোনও সাড়া নেই।

'এ কি!'

'না, আমি ওখানে শোবনা। আমি এখানেই শোব।'

'না না, এ ঠিক নয়···'

'তুমি চুপ করো তো। খুব ঠিক আছে।'

প্রায় আধঘণ্টা আগে জ্যোৎস্না-ভরা রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এসেছে বিদিশা আর তড়িৎ। বিদিশা বলে,

খাওয়া হজমের প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার জন্ত আজ সে মৃগ-উদ্যানে যেতে চেয়েছিল। অত রাতে হরিণের বাগানে ঢুকতে আপত্তি করে তড়িৎ। তাই সদর রাস্তা দিয়ে লালিত-অরণ্য বাঁ দিকে রেখে, গাছের ছায়া-আঁকা জ্যোৎস্নায় পা ডুবিয়ে তারা টিলার নিচ পর্য্যন্ত চলে গিয়েছিল। ফিরে আসে ক্লান্ত হয়ে। ইতিপূর্ব্বেই পরিচারক বিছানা পেতে দুখাটেরই নেটের মশারি ফেলে ভাল করে গুঁজে রেখে গেছে। প্রকাণ্ড ফ্লাস্কে খাওয়ার জল রেখে গেছে রাতের জন্ত। বাথরুমে নিজ নিজ কাপড় বদলে রাতের কাপড় পরে নিজ নিজ বিছানাতে চলে গিয়েছে দুজনে। টেবিল-ল্যাম্পের আলোতে কিছুক্ষণ দুজনেই পড়েছে বই। আলাদা খাট থেকে টুকরো টুকরো কথার আদান-প্রদান হয়েছে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে। ক্রমে অসংলগ্ন হয়ে উঠেছে তড়িতের কথা। তখন মশারির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে আলো বন্ধ করে দিয়েছে বিদিশা।

'আর কিছু না হোক,' দ্বিধা করে বললে তড়িৎ, 'অসুখটা থেকে সাবধান হ'তে হবে।'

'কিচ্ছু সাবধান হ'তে হবে না।' তড়িতের বালিশের একপ্রান্তে মাথা রেখে বিদিশা ধমকের ভঙ্গিতে বললে। 'এ কি বাতিক! অসুখ আর ছোঁয়াচ, ছোঁয়াচ আর অসুখ! এখানেও নিজেকে আর আমাকেও প্রায় হাস্য-কর করে তোলবার জোগাড় করেছো। সবাই ডাইনিং রুমে বসে খায়। অনেক লোকের মধ্যে বসে খাওয়ার মধ্যে আনন্দ আছে, যার জন্ত মানুষ ছুটে যায় হোটেলে-রেস্তরাঁতে খেতে। নিমন্ত্রণে যেতে আনন্দ পায়। তুমি যাবে না। ওখানের প্লেটে-বাসনে খেলে অন্তদের ছোঁয়াচ লাগবে! ঘরে এনে খাওয়ার তোমার নিজের প্লেটে খাওয়া চাই। গরম কফি কেউ স্ট্র দিয়ে খায়? তাও তোমার জন্ত আমাকে খেতে হয়েছে প্রকাশ্ত জায়গায়। এই বাতিক দিয়ে আমার জীবনই তো নষ্ট করে' দিয়েছ। কিন্তু দোহাই তোমার, এই অমূল্য সামান্ত ক'দিনের হলি-ডে, এই ভঙ্গুর মহার্ঘ্য আনন্দটুকু চূর্ণ করে' দিও না...'

'আচ্ছা তুমি শোও, আমি বসে বসে তোমার সঙ্গে গল্প করি।' তড়িৎ বিছানায় উঠে বসে বললে। বিদিশার একটা হাত ধরে নিলে নিজের মুঠোর মধ্যে ক্ষতিপূরণ হিসাবে।

'ছেড়ে দাও।' বলে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিলে হাত বিদিশা। মশারি প্রায় টেনে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। মেঝের উপর একটা আওয়াজ হলো জোরে। অতি কষ্টে টেবিল-ল্যাম্প ও তেপায়টা বেঁচে গেল।

রোজই নতুন নতুন লোক আসছে তিলায়ার গেষ্ট-হাউসে বা তার আশেপাশের উপবনগুলিতে দিন কাটাতে। গেষ্ট হাউসের বাসিন্দাও কিছু কিছু বদলাচ্ছে, তবে পুরাণো বাসিন্দারা অধিকাংশই আছেন। সারাটা পুজো কাটাবার জন্তই তারা এখানে এসেছেন; যত দিন থাকা যায়, থেকে যাবেন। মিসেস ঘটক ও মিসেস সরকার তো আছেনই আবার আজ লাঞ্চের পরে তাদের আরেক পরিচিত এসেছেন বিমলাদি। বিমলাদি এদের দুজনের চেয়েই বয়সে বড় আর আরও অনেকটা ভারিক্কি। তাঁর চোখে রিমলেস চশমা, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও ভর্ৎসনাপ্রবণ নাকের মূল কুঁচকানো ও মুখ বিরক্তিরেখাঙ্কিত। হাতের কানের ও গলার গয়নায় এবং হাবভাবভঙ্গিতে তাঁর ধনী স্বামী সর্ব্বক্ষণ প্রতিফলিত হয়ে থাকেন।

তিন পরিবার একই টেবিলে বসে বৈকালিক চা শেষ করেছেন। স্বামীরা ও ছেলেমেয়েরা নানা উপলক্ষ্য করে' ইতিমধ্যেই খানা-কামরা ত্যাগ করেছেন। কিন্তু গিন্নী-দের গল্প থামছেই না। দেখা হলে সব সময়েই এদের অনেক কথা বলার থাকে।

কলিকাতার সর্ব্বশেষ খবর জানালেন বিমলাদি, যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে। দুইলখী তিলায়ার অত্যা-বশুক খবর জানালেন। খাওয়ার নিন্দা করলেন, পরি-চালকদের সমালোচনা করলেন, দেশী ও বিদেশী অতিথি-

দের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করলেন। সব শেষে টিকা-টিপ্পনীসহ বর্ণনা করলেন নবদম্পতির কথা।

'কোথায় বসেছিল তারা?' প্রশ্ন করলেন বিমলাদি।

'ও বাবা! তারা কখনও পাঁচজনের সঙ্গে বসে খায়?' সরকারগৃহিণী রগড়ের স্বরে বললেন। 'তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজেদের কামরার নিভৃতে তাদের খানা পাঠাতে হবে…'

'কিন্তু বেহায়াপনাগুলো', ঘটকী সশ্লেষে মন্তব্য করলেন, 'সবার চোখের সামনে মেলে ধরতে সংকোচ নেই। হাত ধরাধরি করে' বাগানে বেড়াচ্ছে; কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন কুঞ্জবনে, পাশাপাশি বসে দোলনা দুলছেন—বাবা! লজ্জায় মরে যাই।…বাসিন্দাদের এমন কেউ নেই যার সঙ্গে আলাপ হয়নি, মায় মেমসাহেবদের সঙ্গেও। শুধু দেমাক এদের সঙ্গেই আলাপ করিনি। তোর বয়সে তোর চেয়ে আমাদেরও কিছু কম রূপ ছিলনা, কিন্তু তোর আদ্দেকও দেমাক করিনি…'

'কি নাম?' বিমলাদি ভারিকি চালে প্রশ্ন করলেন।

'কে জানে নাম।' তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে' জবাব দিলেন ঘটকগিন্নী। 'ঘরের দরজার গায়ে কার্ডে দেখেছি মি: অ্যাণ্ড মিসেস্ কি চ্যাটার্জি…আমার কোনও কৌতূহল নেই!'

দুপুরের খাওয়ার পরই বেরিয়ে পড়েছিল বিদিশা আর তড়িৎ। গাড়ী নেওয়াতে তড়িৎ ভেবেছিল অনেক দূর যেতে হবে, কিন্তু কোনও প্রশ্ন করেনি। ছুটি যেমন ইচ্ছা উপভোগ করবার চূড়ান্ত অধিকার বিদিশার, তড়িৎ নীরব অভিনেতা মাত্র। কিন্তু গাড়ী যখন মোটর-বোটের ঘাটে নামবার সিঁড়িগুলির ধারে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল, তখন সেও প্রশ্ন না করে' পারে নি, 'কোথা যাচ্ছি?'

'জলে নেমে সাঁতার দেব।' গাড়ীর এঞ্জিন বন্ধ করে বললে বিদিশা। 'আর যদি ভয় পাও তো মোটর-বোট আছে।…'

'আবার দ্বীপে গিয়ে কি করবে?'

'অরণ্যে রোদন করব।'

গাড়ীর দরজা দুম্ করে' বন্ধ করে তাতে চাবি লাগিয়ে দিলে বিদিশা। হাতের বড় প্লাস্টিকের ঝুড়িটা তড়িতের হাতে তুলে দিলে। ছেলেদের 'না' বলবার সুযোগ দিতে নেই। সিদ্ধান্ত পাকা করে' তাদের হুকুম করতে হয়। ওরা তো সব কিছুতেই না বলবার জন্য হাঁ করে আছে। কি করবে? ঘনগাছের অরণ্যের মধ্যে সবুজ ঘাসের চাদরে শুয়ে থাকবে ছায়া গায়ে মেখে। ফুল তুলে মালা গাঁথবে। পরবে নিজে। পরিয়ে দেব তড়িতের গলায়। দোলনা দুলিয়ে দুজনায় চলে যাবে ড্যামের জলের উপর অবধি। আজ বিজয়া দশমী। শারদীয় উৎসবের শেষ দিন। তাদের হনি-ডেরও।

দিনান্তে উদ্ভাসিত মুখে ফিরে এলো বিদিশা দ্বীপ-বিহার থেকে। গেষ্ট-হাউসের সামনের পার্কিং-এর জায়গায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে তড়িৎসহ প্রায় দৌড়ের ভঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে চলে এলো। ডানদিকে প্রথমে কেয়ার-টেকারের অফিস, তারপর বসা-কামরার দরজা। সেখান দিয়ে মিসেস ঘটকের দল বাইরে বের হবার উপক্রম করেছিলেন, ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে একহাত ভেতরে ঢুকে গেলেন। ইসারা ছুটে গেল বিমলাদির দিকে। এগিয়ে এলেন বিমলাদি। রিম্‌লেশ চশমার কাচের দূরবীণ চালিয়ে দিলেন লক্ষ্যবস্তুর প্রতি। প্রায় আবিষ্কারের আনন্দোক্তি করে' উঠলেন।

'বুড়ী!'

ইতিমধ্যেই অন্তত সাত হাত এগিয়ে গিয়েছিল বিদিশা, কিন্তু বিমলাদির ডাক সাত কার্ল্ দূরেও শোনা যেত।

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে দেখলে বিদিশা। এক-সেকেণ্ড দ্বিধা করলে। তারপর তড়িতকে বললে, 'তুমি এগোও। আমি আসছি।'

বিদিশাকে যেতে হলো না। বিমলাদিই এগিয়ে এসেছেন।

'তোরা কবে এসেছিস?'

'ক'দিন আগে।'

'বাবা মাও সঙ্গে এসেছেন?'

'না।'

'সঙ্গে ওটা কে?'

'আমার স্বামী। আচ্ছা যাই। পরে দেখা হবে।'

আর বাক্যব্যয় না করে' বিমলাদির দিকে পেছন ফিরিয়ে গটগট করে' হেঁটে চলে গেল বিদিশা।

এই সামান্য ঘটনাটুকুর দরুণ সপারিষদ বিমলাদিকে আবার খানা-কামরায় ফিরে যেতে হলো। খাওয়ার সময় ছাড়া এঘরটাই সবচেয়ে নির্জ্জন। লম্বা টেবিলগুলির একপ্রান্তে আসীন হয়ে তিনি দুইবন্ধুকে বিদিশা-সংবাদ জানালেন অতিশয় তৃপ্তিসহকারে। বিদিশার পিসিমাতার বৌদি। ওদের সব খবরই তিনি জানেন।

এম, এস সি পড়বার জন্য বিদিশা যখন সায়াল্স কলেজের ল্যাবোরেটরিতে যাতায়াত করছে তখন থেকেই তড়িৎ চ্যাটার্জ্জির সঙ্গে তার চেনা। তড়িৎ সেখানে রিসার্চ করছে। এই পরিচয় যা তা কতটা অন্তরঙ্গতায় পৌচেছে সে সম্বন্ধে বাড়ীর লোকেরা কিছুমাত্র অবগত ছিল না। টের পেল যেদিন তড়িৎ এসে বিদিশার বাবা অবনীশ মিত্রের কাছে তার একমাত্র কন্যার পাণিপ্রার্থনা করলে।

অবনীশ ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী। কারখানা, মিল, বাস্-সার্ভিস, ষ্টিমার-সার্ভিস, কনট্রাকটরী কত কি ব্যবসা তার ঠিক নেই। রাজনৈতিক দলগুলি তাঁকে নিয়ে টানাটানি করে। বড় বড় সভাসমিতি তাঁকে সভাপতি বা পৃষ্ঠ-পোষক করতে পারলে বর্ত্তে যায়। ইচ্ছা করলে মন্ত্রী হয়ে বসা তাঁর কাছে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু পাকা ব্যবসায়ী তিনি। সবাইকে সন্তুষ্ট রাখেন, কিন্তু কোথাও জড়িয়ে পড়েন না।

এই সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবকের প্রস্তাব শুনে তিনি সবই বুঝে নিলেন, কিন্তু বিস্ময়ের ভাব পর্য্যন্ত তাঁর মুখে প্রকাশ পেলনা। মামুলি গলায় তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কি কর?'

'একটা কলেজে সম্প্রতি পড়াতে আরম্ভ করেছি।'

'লেকচারার?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'কত মাইনে দিচ্ছে?'

'সওয়া তিনশো।'

'বাড়ীর অবস্থা?'

'প্রায় নির্ব্বান্ধব ও দরিদ্র।'

'জাত নিয়ে আপত্তি উঠবে না?'

'না।'

একসেকেণ্ড নীরব রইলেন অবনীশ।

'আমার মেয়ে প্রতিমাসে শাড়ীতে প্রসাধনে পেট্রোলে কত টাকা ব্যয় করে ধারণা করতে পার?'

'আজ্ঞে বিদিশা বলছে, এতেই সে কুলিয়ে নেবে।'

'বিদিশা এখন যা বলছে, ক'বছর পরেও কি সে তা বলতে পারবে?' চোখ তুলে একবার তড়িতের মুখের দিকে তাকালেন অবনীশ। 'রোমান্সের আয়ু স্বল্পকালের ক'দিন পরেই তার বুক চিরে কুৎসিত বাস্তব দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়ায়। তুমি পণ্ডিত লোক। তোমাকেই প্রশ্ন করি আজন্ম ঐশ্বর্য্যে লালিত মেয়ে সওয়া তিনশোর মধ্যে নিজেকে আঁটিয়ে নিতে পারবে কি? সুখী হতে পারবে কি? তুমিই জবাব দাও...'

'তার কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক...' যুক্তির সারবত্ব স্বীকার করে নিলে তড়িৎ বিনা প্রতিবাদে।

'কিন্তু সে জেদ করছে, কেমন?'

'আজ্ঞে হাঁ।' তড়িৎ নিজের বক্তব্যটা উচ্চারিত হতে দেখে প্রায় স্বস্তি বোধ করলে।

'তুমি পুরুষ। তোমার দায়িত্বজ্ঞান আছে। কর্ত্ত

হও, দূরে সরে যাও। এ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিওনা। তাতে দুজনেরই সর্বনাশ হবে…'

চলে গেলো অধ্যাপক তড়িৎ। বিদিশার বাবা ও মা মেয়ের যোগ্য পাত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন কাল-বিলম্ব না করে। কতগুলো পার্টিবর আগে থেকেই আঁচ করা ছিল। দুএক মাসের মধ্যেই বিখ্যাত ধনী-বনেদী বংশ অ্যাটর্নী শম্ভু ঘোষের অ্যাটর্নী ছেলে হরিদাসের সঙ্গে বিদিশার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হলো।

এতদিন চুপ করেই ছিল বিদিশা। এবার সে বিগড়ে গেল। প্রকাশ্যে সে জানাল, সে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে তড়িতকে বিয়ে করবে রেজেষ্টারি করে। তার ইচ্ছার ওপর এত বড় অত্যাচার সে সহ্য করবে না। আত্মীয়বন্ধুরা বোঝালে, মা বোঝালেন, তারপর এমন জবরদস্ত বাবা পর্য্যন্ত বোঝালেন। অনুরোধ করলেন। কাঁদলেন। কিছুতেই কিছু হলো না। মেয়ের এক কথা, তড়িতকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না। বাপেরও জেদ চড়ে গিয়েছে। এবার ভয় দেখানো শুরু হলো মেয়েকে। ফল হল বিপরীত। মেয়ে আরও খেপে গেল। পুলিশ কমিশনারের কাছে চিঠি গেল। আমি সাবালিকা। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নেবার জন্য আমাকে জোর করে আটকে রাখা হচ্ছে। সে এক কেলেংকারি কাণ্ড। বাপ পর্য্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন।

বাঁচালে ভাগ্য। শোনা গেল তড়িতের টি, বি, হয়েছে। কলেজ থেকে চিকিৎসার জন্য মাদ্রাজের কাছে কোন্ স্যানিটোরিয়মে পাঠান হবে তাঁকে।

'এর পরের সব ধাপগুলি আমার জানা নেই; অবশেষে রিমলেস্ কাচের উপর দিয়ে দুই শ্রোতাকে লক্ষ্য করে বিমলাদি বললেন, 'কিন্তু মোদ্দা কথা এই যে, একদিন বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে গেলাম অবনীশ মিত্তিরের মেয়ের বিয়েতে। মেয়ে বাপ-মায়ের পছন্দকরা পাত্রকে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছে। আর তাকে নাকি রাজি করে গেছে মাদ্রাজের স্যানিটোরিয়মে যাবার আগে স্বয়ং তড়িৎ।…বিয়ে হয়ে গেল। দারুণ আড়ম্বর। দুপক্ষেই টাকার কুমীর। তোলপাড় তার সঙ্গে মানানসই। লোকে বললে রাজযোটক!…এর পর দু'মাসও গেল না। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী ছেড়ে চলে এল, কিছুতেই তাকে আর ফেরৎ পাঠান গেল না। মা বাবা স্বামী শ্বশুর শাশুড়ী হদ্দ হলো। মেয়ের শুধু এক কথা: 'আমার মন দ্বিচারিণী হতে পারবে না। যা সম্ভব নয়, তার চেষ্টা করে' কাউকেই আমি প্রবঞ্চিত করতে চাইনে।' ছেড়ে দিলে সবাই। বাপ বললেন, 'মেয়েতো বিধবাও হয়। মনে করব আমার মেয়েও তাই হয়েছে।' এই তো বিদিশার কাহিনী। শুনেছিলেম বটে, তড়িৎকে যক্ষ্মা হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে; আবার সে কলেজের কাজে যোগ দিয়েছে; কিন্তু দুজনে যে এমন কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে নিজের চোখে না দেখলে তা প্রত্যয় হতো না…।

বক্তব্য সমাপ্ত করে উত্তেজনাবশে প্রায় হাঁপাতে লাগলেন বিমলাদি। মিসেস সরকার মুচকি হাসতে লাগলেন রস-তৃপ্ত মুখে। ঘটকী নাক কুঁচকে বললেন, 'তাই বলো। বিয়ে-করা স্বামীর সঙ্গে কেউ কখনও এমন চলাচলি করে। আমার তো আগেই কেমন কেমন মনে হচ্ছিল… কি ঘেন্না বাবা!

উৎরাইয়ের পথে প্রায় নিঃশব্দে নিচের সমতল রাস্তায় নেমে এলো গাড়ী। কিছুক্ষণ হলো সন্ধ্যা অতিক্রম হয়েছে। দশমীর চাঁদ উঠেছে আকাশে। ড্যামের ধারে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজছে। সারা কলোনীর লোকই জড়ো হয়েছে গিয়ে সেখানে। রাস্তায় জনমানব নেই। পোষ্টাপিস ও সৈনিকস্কুল পেছনে রেখে ধীরে এগিয়ে চললে গাড়ী। যেন দৌড়বার উৎসাহ নেই, ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

মেইন রোডের সংগমে এসে বাঁ দিকে মোড় নিলে গাড়ী। দুদিকের নবজাত বন আবার কাছে এসে হাজির হলো। এঞ্জিনের সামান্য চাপা আওয়াজ ছাড়া কোথাও শব্দ নেই।

'কোথায় যাচ্ছি!'

বিদিশাকে একটা মাত্র প্রশ্ন না করেই তড়িৎ এতক্ষণ তার প্রত্যেকটা নির্দেশ পালন করেছে। আরও একটা রাত তিলাইয়ায় কাটাবার কথা ছিল। বিমলাদির সঙ্গে দেখা হবার পর বিদিশা ফিরে এসে বললে, 'চলো। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। এখানে আর নয়।' তড়িৎ তাকে জেরা করে নি, কোনও আপত্তি করেনি, সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেছে। বিদিশার আহ্বানেই সে বের হয়েছে। তার নির্দেশেই ফিরে যাবে। এতে তড়িতের নিজস্ব কোনও মতামত নেই যাত্রা লজ্ঘন না হওয়া পর্য্যন্ত বিদিশার কোন আচরণেরই সে প্রতিবাদ করে নি। মন কি বিদিশার এমন দুঃসাহসিক নিমন্ত্রণটাও সে বন্ধু র সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। যা একটু ছলনা ছিল, তা উপেক্ষা করে নিতে পেরেছে দু'এক শো মাইল চলার পরেই। বঞ্চিতার প্রতি বেশি নির্দয়তা দেখাতে যাবা হয়েছে। শত হোক, তড়িতের নিজের মনটারও তা একেবারে টুঁটি টিপে দেওয়া সম্ভব নয়। অস্তসূর্য্য মরতে মরতেও দিগন্ত রাঙিয়ে যায়।

'এটা আমার সুদুর্লভ হলি-ডে। পিউরিটান্ হয়ে একে নষ্ট করে দিও না।' বিদিশা প্রায় আবেদন করে বলেছিল। নষ্ট না করতেই চেষ্টা করেছে তড়িৎ।

'কোথায় যাচ্ছি?' আবার সে প্রশ্ন করলে।

'নিরুদ্দেশে।' সামনের রাস্তায় নজর রেখে অস্পষ্ট জবাব দিলে বিদিশা।

আবার চুপ। নিঃশব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে জ্যোৎস্না শস্যভরা প্রান্তরে, অরণ্যে অরণ্যে। নিঃশব্দে গড়িয়ে যাচ্ছে গাড়ী সমতল পথে।

"রাত্রে থাকবার একটা জায়গা চাই কেমন?' অন্য-মনস্কভাবে বললে বিদিশা। 'বারহীতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পেরিয়ে চলে যাই ন্যাশন্যাল পার্কে! রাজদেরওয়ার ইন্‌স্-পেকসন বাংলোয় জায়গা যদি নাই পাই, বুনো জন্তু জানোয়ারের মাঝখানেই রাত কাটিয়ে দেব। তারা কেউই মানুষের মত এত হিংস্র নয়...কিন্তু তারপর? কাল কোথায় যাব?...পরশু কোথায় যাব?

'হলিডে লোকের চিরস্থায়ী হয় না।' তড়িৎ পাশে তাকিয়ে গাড়ীচালনারত বিদিশাকে ভাল করে' লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলে। কেমন যেন উদাসীন হয়ে উঠেছে সে, অনেক দূর থেকে কথা বলছে।

'লোকে উৎসব শেষে আপন ঘরে ফিরে যায়।' দূরাগত জবাব এলো। 'কিন্তু আমার ঘর কোথায়? যে ঘরে আমি যেতে চাই সে ঘর তুমি ভেঙে দিয়েছ। আবার ভাঙা ঘরেও ঢুকতে দেবে না। আমি কোথা যাই বল?...

গাড়ী ব্রিজের উপরে এসে পড়েছে। নদীর জল চক চক করছে। পাশে এসে হাজির হয়েছে পাহাড়। বাঁ দিকে আত্মপ্রকাশ করেছে বাঁধের অন্তহীন জলরাশি। পাহাড়ী চড়াই পথ শুরু হয়েছে। মোটরের এঞ্জিন বল-সংগ্রহের আওয়াজ করছে।

'কলকাতায় ফিরে আমি কিন্তু তোমার ফ্ল্যাটেই উঠব।' মোটরের গীয়র বদল করে' বিদিশা বললে হঠাৎ। 'তোমার তো দুটো রুম আছেই...

চোখ মেলে তার দিকে তাকালে তড়িৎ। বেশ স্থির সিদ্ধান্তের কথা। বিদিশার বাড়ীর লোক জানে, সর্বদা তড়িতের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় তার, বেশি ঘাঁটায় না পাছে নাটকীয় কিছু করে কেলেঙ্কারি ঘটায় বিদিশা। এতটা তারাও সহ্য করতে পারবে কি?

'আমার ফ্ল্যাট তো খোলাই আছে,' তড়িৎ শান্ত ভাবে বললে। 'কিন্তু তার ফলাফল সইতে পারবে কি? বিমলাদির চোখের দৃষ্টি সইতে না পেরে তিলাইয়ার গেষ্ট-হাউস ছেড়ে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছ, তখন কত চোখের...'

'পালিয়ে যাচ্ছি বিমলাদির ভয়ে নয়। কাউকে আমি ভয় করিনে,' রুষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল বিদিশা। 'আমাদের অবশিষ্ট রাতটিকে ওরা অসুন্দর করে তুলবে, এই আশঙ্কায় সেই রাতটাকে বাঁচাতে চলেছি। আর তোমার ফ্ল্যাটেই উঠি আর বাবার বাড়ীতেই ফিরে যাই, বিমলাদের জিহ্বা কি চুপ থাকবে? যতটা পারে নোংরা ঘাঁটবে মহা তৃপ্তির সঙ্গে। তোমার প্ল্যাটনিক লভ, আর সম্ভ্রান্ত আত্ম-সংযমের কানাকড়ির মূল্যও দেবে না বিমলাদি অ্যাণ্ড কোম্পানী। তার চেয়ে নিজেকে সুখী করা অনেক অনেক অভিপ্রেত...'

'সব দোষ তোমার,' পাহাড়ী পথে বাঁক ফিরে পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই বিদিশা বলে গেল,' বেশি বিবেকী, বেশি যুক্তিবাদী হয়ে তুমি সব নষ্ট করে দিয়েছ। তুমি তো জানতে তুমি আমার কাছে কতখানি। বাবা বললেন, আমার মেয়ে প্রসাধনে গয়নায়, মোটরের পেট্রোলে এত শ টাকা খরচ করে, তুমি পারবে সেই খরচ বইতে? মাথা নেড়ে সেই যুক্তি মেনে নিলে। কেন বললে না, মেয়ের সুখের জন্য এতই যদি আপনার চিন্তা, তবে সে খরচটা তাকে আপনিই তো মাসে মাসে জোগাতে পারেন! এই পাল্টা-জবাব তোমার মাথায়ই এলোনা, পরম বিবেচক হয়ে, তুমি নিজেকে স্যাক্রিফাইস করে' এলে...'

'ব্যাধিটা তো আমার বোকামি নয়, বিদিশা।' তড়িৎ ক্লেশের সঙ্গে অনুচ্চ স্বরে বললে।

'অসুখ তো সেরে গেছে। তবে নতুন করে' শুরু করতে দোষ কি?' বিদিশা সামনের দিকে চেয়ে থেকেই বললে। 'অনেক জট পাকিয়ে গেছে। আইনের জট, সামাজিক জট। কিন্তু এ জট একেবারে ছাড়ান যায় না, এমন নয়। সে সাহস আমার আছে।...'

'আমার নেই।' তড়িৎ বললে।

'জানি।' গাড়ীটা বেসামাল হয়ে তখুনি আবার স্থির হলো।

'সবটা জান না।' তড়িৎ ধীরে বললে। 'স্যানেটোরিয়ম থেকে ছেড়ে দেবার সময় ডাক্তার মেয়াদতকরা জীবনের মেয়াদের একটা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন—এই ধর বছর পাঁচ। তার চেয়ে বেশি গেলে মিরাকল্। আর এ ও যদি নিয়ম মেনে চলো।...এই মেয়াদ থেকে প্রায় একটা বছর তো কেটেই গেছে...'

সহসা পথের এক প্রান্তে কম্পমান গাড়ীটাকে দাঁড় করিয়ে দিলে বিদিশা। নীচে বাঁধের জল। ডাইনে পাহাড়ের দেওয়াল। নির্জ্জন চারদিক। কোনও গাড়ীর হেড-লাইটের আলো পর্য্যন্ত চোখে পড়ে না আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তায়।

'এ কথা এত দিন আমাকে বলো নি কেন?'

'বললে কি কাছে আসতে না?'

'জানি নে।' ছুটো কাটা কথার তীক্ষ্ণ জবাব।

গাড়ী আবার গর্জন করে উঠল। ধাবমান হলো গিরি ও সলিলের মধ্য দিয়ে ক্রমোচ্চ পথে। ক্রমেই গতিবেগ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

'পাঁচ বছর! সে তো অনেক দিন!' যেন এক বিভ্রান্ত বিদিশার কণ্ঠ থেকে নতুন সুর বের হয়ে এলো। 'সময়ের মাপ করতে হয় উপভোগের তীব্রতার হিসাব করে'। দিন ঘণ্টা মাস গুণে এর হিসেব হয় না। একটা মুহূর্ত্তকে পর্য্যন্ত চিরন্তন করা যায় যদি উপভোগ করতে জান।...কী সুন্দর পৃথিবী! পাহাড়, চাঁদ, আকাশ আর অনন্ত বিস্তৃতি মিলে কি অসীম সৌন্দর্য্য। কী রূপ এই জ্যোৎস্নামাখা চাঁদ-ধরা জলের, এই সীমাহীন জলের! যা দেখে শ্রীচৈতন্য একদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই সুন্দর মুহূর্ত্তে তুমি আজ আমার পাশে। ইচ্ছে হয়, চিরকালের জন্য ধরে রাখি এই মুহূর্ত্তটিকে।...কত ভালোবাসি তোমাকে তড়িৎ! কত ভালোবাসি! সব কিছু ছাড়তে পারি, তোমাকে ছাড়তে পারিনে। আজ কোনও বাধা রেখো না। ধরা দাও, চিরকালের জন্য ধরা দাও...'

সহসা স্টিয়ারিং হুইল ত্যাগ করে' বিদিশা দুই ব্যগ্র বাহুর বন্ধনে জড়িয়ে ধরলে তড়িৎকে। চকিতে নিজের মাথাটা গুঁজে দিলে তড়িতের বুকে। একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ীটা বেঁকে গেল। 'সর্বনাশ!' বলে একটা চাপা চিৎকার উঠল তড়িতের কণ্ঠের। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণবিমুক্ত যন্ত্রদানব উদ্দামবেগে ঝাঁপ দিলে নিচে বরাকর নদের তিলাইয়া বাঁধের সীমাচিহ্নহীন জলবিস্তারের দিকে। প্রথমে পাহাড় ধ্বসে পরবার মত একটা আওয়াজ। পরে সামান্য জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। তারপর মৌন প্রকৃতি আবার নিস্তব্ধ হলো।

কেউ কেউ দূর দূরান্তরের উপত্যকা থেকে দেখেছিল এই দৃশ্য। চোখে আগুন জ্বেলে কি যেন ছুটে এসে পড়ল বাঁধের জলে। কেউ ভাবলে দশমীর প্রতিমা বিসর্জন অথবা, উল্কা, কেউ ভাবলে ফ্লাইং স্যসার,' কেউ বা অন্য কোনও অস্বাভাবিক নিসর্গ ঘটনা ভাবলে। প্রকৃত ঘটনা আবিষ্কার হলো পর দিন দুপুরেরও পরে।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন

(১৮৬৫-১৯১০)

রণজিৎকুমার সেন

রজনীকান্ত যে-কালে আবির্ভূত হন, সেই কালটি অবিভক্ত বিশাল বঙ্গের রেনেসাঁস-উৎসের ঐতিহাসিক কাল! সেই কালের আগে পরে অর্থাৎ ১৮৬১ থেকে ১৮৭১ এই দশ বছরের মধ্যে আবির্ভূত হন রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত (১৮৬৫) ও অতুলপ্রসাদ। ভাবী বাঙলার রেনেসাঁসের জন্মদাতা ছিলেন এই মনীষীবৃন্দই। তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্র ভিন্ন বাকী পঞ্চ মনীষীই ছিলেন সঙ্গীতসাধক। রবীন্দ্রনাথ যে-সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন, বাংলার নবজাগরণকে তা নানাভাবে উদ্দীপিত করে। বিবেকানন্দের সাধন-সঙ্গীতও বাংলার ভাবময়প্রাণের এক অনন্ত সম্পদ হয়ে আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীতে নিজেকে ন'নাভাবে দান করেও পরবর্তী জীবনে অসামান্য নাট্যসাহিত্যের অবদানে বাংলার নাট্যবিভাগকে সঞ্জীবিত করে গিয়েছেন। তাঁদের তুলনায় রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের সংখ্যাগত অবদান সংক্ষিপ্ত হলেও বিষয়ের গভীরতায় ও ধ্যানের মাধুর্যে তা অনন্তকীর্তিময়, সন্দেহ নেই।

রজনীকান্ত ছিলেন ক্ষণজন্মা কবি। তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের সীমিত জীবনে ক্ষীণকায় মাত্র আটখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ আটমাস কাটে তাঁর হাসপাতালে। এখানে তিনি যে 'হাসপাতালের রোজনামচা' লেখেন, তার মধ্যে অনন্ত শক্তির প্রতি আত্মনিবেদনই মুখ্য রূপ পায়। যেমন: 'সে আমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, সে তো বাপ, আমি হাজার হলেও তো পুত্র। আমাকে কি ফেলতে পারে? তাই এই শাস্তি, এই বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়লা মাটি আঘাতের চোটে পড়ে গিয়ে খাঁটি জিনিষটি হব; তখন আমাকে কোলে নেবে।...' এই ভগবৎবিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের মানসিকতা যে রোগজর্জ্জরতাজনিত, এ কথা মনে করা ভুল হবে। একটি অধ্যাত্মচেতনা রজনীকান্তের মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল। উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। প্রথম জীবন থেকেই তিনি ছিলেন শান্তরসের মানুষ। শান্ত পরিবেশে বন্ধুজনসমাগমে তিনি আড্ডা জমাতে ভালোবাসতেন, বন্ধুকৃত্য ক'রে আনন্দ পেতেন, তেম্‌নি অভিনয় গুণেরও অভাব ছিলনা তাঁর মধ্যে।

তবু একথা সত্য যে, রজনীকান্তের জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। যে নাটকীয় উপাদান থাকলে নানা বিচিত্র ঘটনার সৃষ্টি হয়, এমন নাটকীয়তা তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে কখনও ঘটেনি। নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবন কখনও আশাভঙ্গে কাতর হয়েছে, কখনও শোকে ভেঙ্গে পড়েছে, আবার কখনও বা কর্তব্যের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। পাবনাজেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে ১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন কর্মজীবনে সাব-জজ, শিক্ষাজীবনে ফারসী ও সংস্কৃতের ছাত্র। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁর মন আচ্ছন্ন ছিল। ব্রজবুলিতে তিনি 'পদচিন্তামণিমালা' ও 'অভয়াবিহার' কাব্য রচনা করেছিলেন। উভয় কাব্যেই ভক্তিবাদের প্রাধান্য ছিল। রজনীকান্তের ভক্তিবাদ জন্মসূত্রে তাঁর পিতার কাছ থেকেই পাওয়া। মাত্র পনেরো বছর বয়সে রজনীকান্ত যে কবিতা রচনা করেন, তাতেই প্রথম তাঁর ভক্তিবিনম্র চিত্তের পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, আর তার পরিণতি লাভ করে 'আনন্দময়ী' কাব্যে—যা তাঁর মৃত্যুর পর ১৯১০ সালের ৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়।

আইন পাশ ক'রে রজনীকান্ত রাজসাহীতে যান আইনব্যবসায় জন্ত। কিন্তু একাজে তিনি মানসিক প্রেরণা পাননি—যেমন পাননি শিলাইদহের জমিদারী কাজে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর যেমন অন্ততম প্রেরণাস্থল ছিল কাব্যজগৎ, রজনীকান্তেরও তাই। রামপ্রসাদও জমিদারী হিসেবের খাতা লিখতে গিয়ে কর্ম্মোন্নতির পথে এগোতে পারেন নি, হিসেবের খাতায় লিখতেন তিনি মাতৃসঙ্গীত। সেই ধারাটি রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে রজনীকান্তে এসে পৌছেছিল। এ সম্পর্কে দীঘাপাতিয়ার শরৎকুমার রায়কে প্রসঙ্গত তিনি লেখেন: 'কুমার, আমি আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব বসায় করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্জ্ঞেয় অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালো-বাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল। সুতরাং আইনের ব্যবসায় আমাকে সাময়িক উদরান্ন দিয়াছে, কিন্তু সঞ্চয়ের জন্য অর্থ দেয় নাই।'

আইন ব্যবসার জন্য রাজসাহী গিয়ে তিনি অর্থকরী ব্যাপারে লাভবান না হলেও প্রাণের ক্ষেত্রে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সংযোগ ঘটে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারই উদ্যোগী হয়ে রজনীকান্তের গানগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সম্পাদনাতেই ১৯০২ সালের আগষ্ট মাসে রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ 'বাণী' প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কল্যাণী' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কান্তকবির পরিচয়ের মূলেও ছিলেন অক্ষয়কুমার। তিনিই তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান; ঐতিহাসিক হলেও সঙ্গীত যে অক্ষয়কুমারকে কতদূর আকর্ষণ করতো, এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের গৃহেই সঙ্গীতের আসর বসতো, সেই আসরের অন্ততম গীতিকার ও গায়ক ছিলেন রজনীকান্ত। লর্ড কার্জ্জনের অবিমৃষ্যকারিতায় সারা বাংলায় তখন আগুন জলে উঠেছে। স্বাদেশিকতার ব্রতে দীক্ষা নিয়েছে তখন বাঙালী। একদিকে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, দেশবন্ধু প্রভৃতির ওজস্বিনী ভাষণ, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্র-লাল রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির দেশাত্মবোধক সঙ্গীত জাতিকে সেদিন উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোধা। সেই স্বদেশী যুগে রজনীকান্তও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গাইলেন—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।…'

গাইলেন—

'জয় জয় জনমভূমি, জননি!
যাঁর স্তন্য সুধাময় শোণিত ধমনী,
কীর্তি গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ এই সুবিপুল ধরণী!…'

ইংরেজ সেদিন এদেশের মর্ম্মে বুলেট বিদ্ধ করে যে পৈশাচিকতার পরিচয় দিয়েছিল, তার পরিচয় গাঁথা আছে ইতিহাসের পাতায়। 'বন্দেমাতরম' শব্দটি পর্যন্ত সেদিন নিষিদ্ধ ছিল ইংরেজসরকারের হুকুমনামায়। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন:

'. The cry of Bande-Mataram, as I have already observed, was forbidden in the public streets, and public-meetings in public-place were prohibited.'

নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গে তখন স্যার বামফিল্ড ফুলারের অপ্রতিহত প্রতাপ। তাঁর আদেশে মাতৃনাম পর্যন্ত উচ্চারণে বিপদ ঘটতে শুরু হলো সেখানে। চারণকবি মুকুন্দদাসকে কারারুদ্ধ করা হলো। মুকুন্দদাস গাইলেন—

'ফুলার, আর কি দেখাও ভয়;
দেহ তোমার বন্দী বটে, মন সে স্বাধীন রয়।…'

রজনীকান্ত কবিতা রচনা করলেন—

'ফুলার কল্লে হুকুম জারি,—
মা বলে যে ডাকবে রে তার শাস্তি হবে ভারি।
মা ব'লে ভাই ডাকলে মাকে ধরবে টিপে গলা;

তবে কি ভাই বাংলা হতে উঠবে রে মা বলা ?
যে দিয়েছে এমন হুকুম, মা কি রে নাই তারি ?
তার মাকে কি ডাকে না সে ? দোষ শুধু
বাঙ্গালারি।'

তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি সম্পর্কে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মন্তব্য করেন : "কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুলবাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদু-কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দেব-বাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মতো সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে, নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু পুরুষের অশ্রু—বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশীযুগের বাংলাসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোনো গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্ত-কণ্ঠে নির্দেশ করি।"

সমাজপতির মন্তব্যের পর আর কোন মন্তব্যের অবকাশ থাকে না। বাংলাদেশ এইভাবেই সেদিন রজনীকান্তকে গ্রহণ করেছিল। যদিও তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় একমাত্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভিন্ন তাঁকে তুলে ধরবার দ্বিতীয় লোকের অভাব ছিল, তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশ যে কান্ত কবিকে সাগ্রহে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল, এ কথা ভাবতেও বিস্ময় ও আনন্দ বোধ হয়। দীর্ঘ জীবন লাভ না ক'রেও তিনি সঙ্গীতে যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তা সংখ্যার পরিমাপে না হ'লেও ভাবের গভীরতায় অনেককেই অতিক্রম ক'রে গিয়েছে।

তাঁর দেশাত্মবোধের এই জনপ্রিয়তা জাতির আত্মিক তাগিদ ও প্রয়োজনেই ঘটেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু মূলতঃ তাঁর সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্র ছিল অধ্যাত্মবাদে। তিনি তাঁর শেষ কাব্য 'আনন্দময়ী' রচনা করেছিলেন শাক্তপদাবলীর উপাদানে। ঈশ্বরকে কন্যারূপে ভজন-পূজনের দৃষ্টান্তে এই কাব্য উজ্জ্বল। যে বাৎসল্য রসে পৃথিবী স্থিতিশীল রয়েছে, তার সার্থকতম অভিব্যক্তি ঘটেছে এই কাব্যে। যদিও গ্রন্থাকারে এ কাব্য কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবিমাত্রকেই দেখা যায়, তাঁর কাব্যে বিষয়-বৈচিত্র্য ঘটলেও প্রাণের মূল সুরটি একটি বীণাতন্ত্রে অনুরণিত হ'য়ে উঠে—যা তাঁর প্রাণন-অভিজ্ঞতা বা ধ্যান। রজনী-কান্তের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে ভক্তিবাদ—যা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এখানেই তাঁর পূর্ণতা ও সিদ্ধি। এই ভক্তিবাদ তাঁর কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, জীবনে মননে ও নানা রচনায় তা পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল—যেমন গিয়েছিল রবীন্দ্র জীবনে। মূলতঃ ভক্তিবাদেরই দেশ ভারতবর্ষ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা একদা এই ভক্তিবাদ বা অধ্যাত্মচেতনাকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে ওঠে। তার উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে ভারতীয় সাধকসম্প্রদায়ের সাধনায়, বৈষ্ণবকাব্যে, শাক্তপদাবলীতে, বাউলে ও কীর্তনে। গম্ভীরা ও লোক-সঙ্গীতেরও বেশীর ভাগ ভক্তিবাদে আচ্ছন্ন। সেই ধারারই উত্তরাধিকারসূত্রে রজনীকান্তের আধ্যাত্ম-চেতনা গ'ড়ে উঠেছিল। জন্মসূত্রেও তিনি তা অর্জন করেছিলেন সন্দেহ নেই। কারণ তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদের মধ্যে এই ভক্তিবাদের যথেষ্টই প্রাবল্য ছিল। জীবনের অক্ষমতা, অতৃপ্তি, অনুশোচনা, আকাঙ্ক্ষা—মূলতঃ এই বিষয়গুলি থেকেই ঈশ্বর বা পরম শক্তির কাছে মানুষের প্রার্থনা জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। কবির জীবনে সেই প্রার্থনা বেদনাময় অভিব্যক্তি সুষমাসুন্দর হ'য়ে ফুটে ওঠে তাঁর কাব্যে। যখন পড়ি—

পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা ক'রে রয় ?

তখন স্বভাবতঃই রজনীকান্তের সেই অনুশোচনা, বেদনাবিধুরতা ও প্রার্থনাকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। উপলব্ধি করতে পারি বিশ্বদেবতায় অসীম অনন্ত এই সৃষ্টি কী মধুময় সুন্দর ! কবি গাইলেন—

যেদিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন বাক্য মাথায় করিয়া রাখি ;
কে যেন সেদিন আঁখি-তারকায়
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর, তব সুন্দর সব
যেদিকে ফিরাই আঁখি।'...

অথবা—

'তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময় ;
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়।'

বিজ্ঞান বলে—প্রকৃতি বিজ্ঞানের দ্বারাই এ বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, এর অন্তরালে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। যদিও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো কোনো কোনো বিজ্ঞানী এই চরম মতবাদ গ্রহণ করেননি, তবু সাধারণ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানভিত্তিক মতবাদই চূড়ান্ত। অথচ বিজ্ঞানও যাঁর আবিষ্কারে ও মহিমাপ্রকাশে অক্ষম, সেই অসীম রহস্যময় বিশ্ববিধাতাকে উদ্দেশ ক'রে রজনীকান্ত বললেন—

'অসীম রহস্যময়! হে অগম্য! হে নির্বেদ ;
শাস্ত্র যুক্তি করিবে কি তোমার রহস্যভেদ ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ন্যায়, তন্ত্র।
বিজ্ঞান পারেনি প্রভু করিতে সংশয়োচ্ছেদ।'

ঈশ্বরের প্রতি এই অবিচল ও স্থির বিশ্বাসই রজনীকান্তকে আজীবন পরিচালনা ও পরিশুদ্ধ করেছে। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও পরম দয়ালের কাছে তিনি খ্যাতি, অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সবই সমর্পণ করে বলেছেন :

আমায় সকল রকমে কাঙাল ক'রেছ
গর্ব করিতে চুর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সকলি করেছ দূর।'

বলেছেন :

'আমার দয়াল ওই বসে আছে নিরজনে।
আমারে দিও না বাধা, ভেসে যাই একমনে।'

এখানে বাংলার চিরন্তন বাউলের সুরটিই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। হাসপাতালে কবিকে দেখে আসার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে চিঠি দেন, তাতে লেখেন : 'সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই।'—এই কয়েকটি কথার মধ্যেই রজনীকান্ত স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছেন। যে জ্যোতির্ময় পুরুষের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশা কবিকে ক্রমেই উন্মুখ ক'রে তুলেছিল। অবশেষে তা কার্যে পরিণত হলো। কবির মধ্যে মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ লক্ষ্য করে ভক্তিবাদের অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন যে বিমোহিত হয়েছিলেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে !

এই পরিশুদ্ধ ভক্তিবাদের পাশাপাশি হাসির গানও রজনীকান্তকে জীবনে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তাঁর হাসির কবিতা ও গানের সংখ্যা একেবারে কম নয়। তা বিশুদ্ধ হাসির হয়েও অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও ধিক্কারে পূর্ণ ছিল। অনেক সময় তা সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে শাণিত কুঠারের মতই কাজ করেছে ; কোথাও আবার তীব্র শ্লেষ হয়েও দেখা দিয়েছে। যেমন—

'ধার্মিক বটে সেই, যে দিনরাত ফোঁটা তিলক কাটে ;
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাটে,
সেই মহাশয়, সংগোপনে মদটা আস্টা টানে ;
নিষ্ঠাবান, যে কুক্কুট-মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
রসিক সেই, যার ষাট বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ ;
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ।...'

বন্ধুজন সান্নিধ্যে যে সরসতা কবিকে অভিসিঞ্চিত করতো, সেই সরসতাই অন্যত্র কবির পরিহাস-নিপুণ মনে কৌতুক রসসৃষ্টির উন্মাদনা এনে দিত। উপরের কাব্যাংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' নিবন্ধটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঈশ্বর গুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে যে ব্যঙ্গকাব্যের সৃষ্টি হয়, বাংলা-সাহিত্যের তা একটি বিশেষতম দিক।

এই দিকটিকে রবীন্দ্রনাথও কম লালন করেননি। সঙ্গীতে তা সার্থকতা পেয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালে এসে। রজনীকান্তের জীবনীকারের মতে দ্বিজেন্দ্রলালই এক্ষেত্রে কান্ত-

কবির উৎস। রাজসাহীতে থাকাকালে দ্বিজেন্দ্রলালের দেখাদেখিই রজনীকান্ত হাসির গান ও কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। কথিত আছে যে, রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কৌতুকের ক্ষেত্রে কান্তকবি দ্বিজেন্দ্রলালকে 'গুরুদেব' বলে গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল গুরুপদে অভিষিক্ত হবার অবশ্যই অধিকারী ছিলেন। কারণ, সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর যে কবির প্রভাব অনেক কবির উপরেই পড়েছিল, তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অন্যতম। তাঁর ঢংটি পর্যন্ত আয়ত্ত করতে কুণ্ঠিত হননি রজনীকান্ত, বরং নিজের রচনায় দ্বিজেন্দ্র-অনুসারী ইঙ্গ-বঙ্গ ঢং এনে রজনীকান্ত গৌরববোধই করেছেন। তবে তাঁর এই অনুকরণপ্রিয়তা একমাত্র হাসির গানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র যেখানে কান্তকবি স্বাধীন বিচরণ করেছেন, সেখানে পরোক্ষে রবীন্দ্রপ্রভাব যে একেবারেই ছিল না, একথা জোর করে বলা চলে না। রামপ্রসাদ ও বিবেকানন্দের ছায়াপাত ঘটাও সেখানে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। তবু রজনীকান্ত তাঁর নিজস্ব ধারায় যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তা সোনার চেয়েও দামী, এ কথা ইতিহাস অকপটে স্বীকার করবে।

তিনি যে নীতিমূলক কাব্যসৃষ্টি ক'রে 'অমৃত' রচনা করেছিলেন, কোনো কোনো সমালোচক তাকে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' অনুসারী রচনা বলে রায় দিলেও 'অমৃত'র মধ্যে রজনীকান্তের নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া দুর্লভ নয়। বাংলার বাল্য ও কিশোর-জীবন গঠনে তা যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। গ্রন্থের নিবেদনে রজনীকান্ত লিখেছেন : যে সকল নীতিবাক্য সার্বজনীন ও সার্বকালিক, যাহা জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নহে, যাহা অমর সত্যরূপে চিরদিন মানবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ও অনন্তকাল করিবে, এই নীতিবাক্য-গুলিতে সেই সকল সত্যের অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থের নাম 'অমৃত' রাখা হইল ; অমৃতের ন্যায় স্বাদু হইয়াছে, এরূপ অর্থ করিলে সঙ্গত অর্থ করা হইবে না।" কিন্তু সেরূপ অর্থ করলেও যে অসঙ্গত হবে না, একথা সকল শ্রেণীর পাঠকের পূর্বে যে দু'জন মনীষী বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন দীনেশচন্দ্র সেন ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁদের প্রতি তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি কবি। মৃত্যুর পূর্বে গ্রন্থখানি হাসপাতালের রোগশয্যায় তিনি উৎসর্গ করেন কুমার শরৎচন্দ্র রায়বাহাদুরকে ; উৎসর্গপত্রে তিনি লেখেন—

'নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা ;
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন ও প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হ'তে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে ক'রেছে তুমি ছাড়া ? আর কেবা পারে ?
কি দিব কাঙ্গাল আমি ; রোগশয্যোপরি;
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মাল্য, বহু কষ্ট করি ;
ধর দীন-উপহার ; এই মোর শেষ ;
কুমার ! করুণানিধে ! দেখো, র'ল দেশ।'

কিন্তু শেষের মধ্যেও অশেষ আছে, লীলাময় কবিকে মরণে টেনে নিয়ে জীবনে অশেষ করেছেন। ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র, ইংরেজি ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কবি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এখনও যেন আমরা কবির কণ্ঠে শুনতে পাই—

'আমার হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো সখা,
আমি যে গো পথ চিনি না।'

শুনতে পাই—

'কেন বঞ্চিত হবো চরণে ?
আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে।'

জীবনে না হ'লেও মরণে তিনি সেই প্রেম-অমৃত চির-তৃষাহারীর সঙ্গে যে একাত্মতা লাভ করেছেন, তাতে সন্দেহ কি !!

তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

(১৯)

বিকেলের পড়ন্ত রোদটা অপুর শোবার ঘরে এসে পড়ে বলে ও'দিককার জানালাগুলো বন্ধ রাখতে হয়, কাজেই ঘরটা খানিকক্ষণ বেশ অন্ধকার হয়ে থাকে। তাই অপু আয়াকে দিয়ে বসবার ঘরের মেঝেতে থান দুই তিন মাদুর পাতিয়ে রেখেছে। পুজোও প্রায় এসে পড়ল, এখনও কাপড়চোপড় কিছু কেনা হয়নি। আজ বাড়ীর বহু পুরাতন কাপড়ওয়ালী ননীবালার আসার কথা, তার কাছ থেকেই পুজার কাপড় রাখা হয় বরাবর। আগে অপুই পছন্দ মত শাড়ী রাখত সকলের জন্যে। এখন মেয়েরা মায়ের পছন্দ করা শাড়ী নিতে চায়না, তাদের সব রুচি বদলে গেছে। বাজারে কত রংএর কত ঢংএর শাড়ী, তারা সেইদিকেই ভিড়তে ভালবাসে। কিন্তু পুজোর কাপড়ের টাকাটা দেন রামপদ। তিনি নাতনীদের অনুরোধ করে রেখেছেন, অন্য সময় যে রকম, যা খুশি শাড়ী কেন, কিন্তু পুজোর সময় বাংলাদেশে তৈরি শাড়ী কিন। পুজোর মণ্ডপে আর কিছু মানায়না। আর ১১টা মাস যখন হাতেই আছে তখন মেয়েরা এতে সহজেই রাজী। মাও এই ব্যবস্থাতে খুব রাজী, কারণ পুজোর বাজার ভীড়ে' দোকানে দোকানে ঘুরে কাপড় কিনতে তার একেবারেই ভাল লাগেনা। অপুর বয়স বেড়েছে আরো পাঁচ বছর, চেহারা ধরণ ধারণও কিছুটা বদলেছে। আরো মোটা হয়েছে, মাথায় চুল সামনে পাতলা হয়ে এসেছে, রংটাও তামাটে হয়ে এসেছে। আগে হাসিখুশি ছিল, এখন খানিকটা গম্ভীর আর ভারিকি হয়ে গেছে। সাজসজ্জার দিকের ঝোঁকটা কমে গেছে, তবে খাওয়ার শখটা আগেরই মতন আছে। এ সংসারে সুখের চেয়ে দুঃখের অংশ কিছু যে কম নয়, এই ধারণাটা ক্রমেই তার মনে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে। তাও সুখ যেটুকু পাওয়া যায়, তা বিনামূল্যে নয়, অনেক সময় যা পাওনা হয়, দিতে হয় তার চেয়ে বেশী।

অপুর বাবা মারা যাবার পর মাও মারা গেছেন বছর দুই পরেই। বোন তিনজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে, দাদা শহর ছেড়ে গ্রামে থাকতে রাজী নয়। সুতরাং অপুর সব ছোটভাইও গ্রাম ছেড়ে দাদার কাছে চলে গেছে, একলা ত সে গ্রামের বাড়ীতে থাকতে পারে না। সে বাড়ীও আর 'বাড়ী নেই, প্রায় মাটির ঢিপিতে পরিণত হয়েছে। অপুর বাপের বাড়ী বলতে আর কিছু নেই। তবে বোনেরা সর্ব্বদাই চিঠিপত্র লেখে, অপুও লেখে পুজোতে বোনদের জন্যে শাড়ী পাঠায়, তাদের ছেলেপিলের জন্যে খেলনা, কাপড়, মিষ্টি পাঠায়। ভাইদের জন্যে ভাইফোঁটায় কাপড় পাঠায়, কখনও সখনও যদি তারা কলকাতায় আসে ত নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়।

এতটা যে করতে পারে তাতেই বোঝা যায় যে অপুদের সাংসারিক ব্যবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছে। আগেরই মত সব ব্যবস্থা চলছে, তবে অভয়পদর ঘাড়ের বোঝা একটু ভারি হয়েছে। সেই এখন বাড়ীর পুরোপুরি কর্ত্তা, অভাব অভিযোগ যখন যা আসে তাকেই তা মিটতে হয়, কারো কাছে আবেদন করা চলে না। রামপদ গ্রামে থাকেন, তাঁর পেনসনের টাকা প্রভৃতি সব সেখানে যায়। কলকাতার বাড়ীভাড়ার টাকা প্রথমতঃ তাঁর কাছে যায়। তিনি হিসাব করে তার বেশ খানিকটা ভাগই ছেলের

কাছে পাঠিয়ে দেন তবে সবটা নয়। এ ছাড়া তাঁর ব্যাঙ্কে রাখা টাকায় সুদ আছে, বই প্রভৃতিও লেখার থেকে আয় আছে। অভয়পদকে যা পাঠান তা ছাড়াও অপুকে পঞ্চাশ টাকা করে হাত খরচ পাঠান। এটার কোনো হিসাব চাইতে অভয়পদকে বারণ করা আছে। বলাবাহুল্য এ সব ব্যবস্থার কোনোটাই অভয়পদর মনঃপুত নয়। আর ত বাড়ীতে কেউ নেই তাই স্ত্রীর কাছেই মাঝে মাঝে অভিযোগের সুরে বলে "বাবা বুড়ো বয়সে কার জন্যে আবার এত টাকা জমাচ্ছেন ?"

অপু সোজাসুজি কথা বলতে আজকাল ভয় পায়না। মনটা অনেক শক্ত হয়ে গেছে। সে বলে "তাঁর নিজের রোজগারের টাকা তিনি যেমন খুশি খরচ করবেন, জমাবেন। তোমার ত কিছু অভাব হচ্ছে না, তোমাকে ত কিছু কম দিচ্ছেন না ?"

অভয়পদ বলে "আরো বেশী দিলেও ক্ষতি ছিলনা। মেয়েদের পড়াশুনোর খরচ বাড়ছে বই কমছে না।"

অপু বলে, "হয়ত ওদের জন্যেই জমাচ্ছেন। মেয়ে-ছেলে যতই লেখাপড়া শিখুক খরচ করে বিয়ে ত দিতে হবে ? তোমাদের যেমন ঘর তেমন ঘর বর দেখে ত দিতে হবে ? সে বড় চারটিখানি টাকার কথা নয়।"

অভয়পদ বলে, "সে আর বলতে। ঐ দেখনা উষাকে দেখে মহেশবাবুরা পছন্দ করল, কিন্তু সম্বন্ধ আনবার সময়েই বলে দিল দু'টি হাজার টাকা নগদ দিতে হবে, নইলে বিয়ের, বৌভাতের খরচ পোষাবে না। নগদ নেবেন বলে আর কিছু যে বাদ দেবেন তাও নয়, সেদিকে ঠিক আছেন।"

অপু বলল "শহুরে লোকের বড় খাঁই। গলা কাটবার জন্যে যেন ছুরি শান দিয়ে বসে আছে। নিজেদের দরকার থাক বা নাই থাক। এরচেয়ে পাড়াগাঁয়ের মানুষ ভাল তাদের লোভ নেই অত। এই ত শান্তি স্বর্ণ দুজনের বিয়েই পাড়াগাঁয়ে হয়েছে, তারা কারো চেয়ে খারাপ আছে ? তোমরা যে পাড়াগাঁয়ের নাম শুনলেই চটে যাও।"

শ্বশুরশাশুড়ী মারা যাবার পর পাড়াগাঁ সম্বন্ধে অভয়পদর মনে আর তত বিদ্বেষ ছিলনা, তবু গম্ভীর মুখেই বলল, "কারণ আছে বলেই চটি। আর শান্তি স্বর্ণর নামেই পাড়াগাঁয়ে বিয়ে হয়েছে, বেশীরভাগ সময়ই ত তারা এখানে থাকে। তাছাড়া, পরিবারগুলো ভাল, বেশ শিক্ষিত আর ভদ্র।"

আগে হলে এই থেকেই ঝগড়ার সূত্রপাত হত, এখন অপু সময়মত থেমে যায়, কাজেই ব্যাপারটা বেশী দূর এগোয়না।

আজ সূর্য্য বেশ হেলে পড়েছে পশ্চিমে, অপু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে মেয়েরা ফিরল কিনা, কাপড়ওয়ালী এখনই এসে হাজির হবে। মেয়েদের শাড়ী বাছতে ঢের সময় লাগে। দুতিন পোঁটলা কাপড় তারা যে কতবার ওলোট-পালোট করে তার ঠিক নেই। অপুও শাড়ী কেনে নিজের জন্যে, তবে তার অত সময় লাগেনা। তিনমেয়েই এখন শাড়ী পরে, কাজেই অপু এখন আর রঙীন শাড়ী পরেনা। খুব বাহারের চওড়াপেড়ে শাদা শাড়ীই কেনে।

হেমলতাও আগে খবর পেলে, এবাড়ী এসে শাড়ী কেনেন। একসঙ্গে বেড়ানও হয়, কাজও হয়। পুজোর দারুন ভীড়ে দোকানে দোকানে ঘুরতে তাঁর ভাল লাগেনা।

কাপড়ওয়ালী ননীবালাই আগে এসে গেল। সঙ্গে একটা ছোক্‌রা। এত বিশাল পোঁটলা এনেছে যে নিজে একলা বয়ে আনতে পারেনি। অপু তাকে যথাস্থানে নিয়ে গিয়ে বসাল। বলল "বোসো গো, মেয়েরা এখনই এসে যাবে।"

ননীবালা মোটা দেহ নিয়ে ধপ্ করে বসে পড়ল। অপুকে বলল "জল দাও ত এক গেলাশ বৌদি। এতটা হেঁটে আসতে গলা একেবারে শুকিয়ে গেছে। পিসীমা আসবেন না ?"

অপু বলল "আসবেন বোধহয়, খবর ত দিয়েছি। ও জাহ্নবী এখানে এক গেলাশ জল দিয়ে যা।"

জাহ্নবী এখনও এ বাড়ীতে টিঁকে আছে। মেয়ে তিনটিকে মানুষ করেছে, তাদের উপরে মায়া পড়ে গেছে, ছেড়ে যেতে মন সরেনা। গ্রামের বাড়ীতে তার নিকট

আত্মীয় কেউ নেই, নিজের ছেলেপিলেও হয়নি। শহরে এতকাল থেকে থেকে অভ্যাসগুলো সব শহুরে হয়ে গেছে, গ্রামে মন টেঁকেনা। অপুরও তাকে ছাড়াবার ইচ্ছে একেবারে নেই, সেই উষা হওয়ার সময় থেকে আদুরী আছে, অপুর সব সুখ দুঃখের সাথী। শুধু আয়া ত ছিলনা, সঙ্গিনীর স্থানও সে পূর্ণ করেছিল। এখন বুড়ী হয়ে গেছে, খানিকটা অথর্ব্বও হয়ে গেছে, তবু অপু এবং মেয়েদের জেদে অভয়পদ তাকে বিদায় করতে পারেনি। তাঁকে খুব বেশী কাজ এখন আর করতে হয়না। মেয়েদের কাপড় কাচে, দুবরের বিছানা করে আর তোলে আর মর্জ্জি হলে ঘরগুলো একটু গোছায়। বাড়তি কাজের জন্য একটা ঠিকা ঝি রাখতে হয়েছে, তা সে আসতে এত দেরি করে এবং এত তাড়াতাড়ি পালায় যে অভয়পদ প্রায় তাকে দেখতেই পায়না।

আদুরী জল এনে দিল ননীবালাকে। সব জল এক-চুমুকে খেয়ে সে গেলাশটা নামিয়ে রাখল। আঁচলের খুঁটে পান জরদা বেঁধে নিয়ে এসেছিল, তাই মুখে ফেলে চিবতে চিবতে বলল "বাঁচলাম বাবা। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি, বেঢপ মোটাও হয়েছি, এখন আর এত হাঁটাহাঁটি করতে পারি না। কিন্তু পেটের দায় বড় দায়, কাজ না করলে খাওয়াবে কে ?"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর কলহাস্য শোনা গেল। অপু বলল "যাক এসে গেছে ওরা। মুখহাত ধুয়ে চা খেয়ে নিক তারপরেই এসে কাপড় বাছবে।"

উষা, উমা, রাণি, তিনটিই সুন্দরী, সুসজ্জিতা, দেখলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। উষার রংটা ছোট দুইবোনের চেয়ে একটু চাপা, তাই বলে কালো তাকে কেউ বলবেনা। বেশ মাজাঘষা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রং। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এ শ্যাম তপ্ত কাঞ্চনের শ্যাম। উষার চুলের বাহার খুব। হেমলতা বলেন উষা তার ঠাকুরমার চুলের ধাত পেয়েছে। অবশ্য তাঁর মত গোড়ালী ছোঁওয়া বাড় নয়। উষার চোখ বেশ বড়, নাক নীচু কিন্তু সুগঠিত মুখের কাট সুন্দর। ঠাকুরদাদার বড় প্রিয় সে, তিনি তার মধ্যে অন্নপূর্ণা আর বিন্ধ্যবাসিনী দু জনেরই ছায়া দেখতে পেতেন।

উমা একটু ছোটখাট, কিন্তু ভারি চঞ্চল। বিদ্যুতের মত ঝিলিক মেরে বেড়ায় সারা বাড়ীময়। তার ছোটবোন রাণি লম্বায়-চওড়ায় উমাকে হার মানায়। নূতন মানুষ অনেকে উমাকেই ছোট আর রাণিকে বড় বলে। রাণিও দেখতে সুন্দর ফুটন্ত গোলাপের মত। উমার মত অত চঞ্চল নয়, আবার উষার মত গম্ভীর প্রকৃতিও নয়। যথা-স্থানে হাসতে গল্প জমাতে খুব পারে।

কাপড়ওয়ালী এসে গেছে শুনে তারা তাড়াতাড়ি জামা-কাপড় বদলিয়ে চা খেয়ে নিয়ে বসবার ঘরে এসে উপস্থিত হল। আদুরীও এসে বসল, তার নিজের সাজগোজ করবার বয়স বহুকাল গিয়েছে তবু নানারকম শাড়ী দেখতে তার খুব ভাল লাগে, মেয়েদের অনেক উপদেশ দেয় শাড়ী নির্ব্বাচন সম্বন্ধে। সেগুলি বেশীর ভাগই অরণ্যে রোদন হয়।

ননীবালা মেয়েদের দেখে একগাল অপ্যায়নের হাসি হেসে বলল "এসো গো দিদিমণিরা। এবারে আর বলতে পারবেনা যে কম কাপড় এনেছি। মুটে ভাড়া দিয়ে একেবারে গন্ধমাদন তুলে এনেছি। সে কাপড়ের স্তুপ খুলে ভাগে ভাগে সাজাতে লাগল, মাদুরের উপর।

অপু ঘরে ঢুকে বলল "কতকগুলো সাদা শাড়ী একপাশে রাখ ত বাছা, আমি দেখেশুনে যা নেবার নিয়ে নি। তারপর মেয়েরা ঘণ্টাদুই ধরে সব হাঁটকাক। ওদের ত সহজে হবেনা।"

কাপড়ওয়ালী তাই করল। অপু নিজের জন্যে গোলাপী আর জরি মেশান চওড়া পাড়ের শাড়ী একখানা রাখল আর দুইবোনের জন্য দুখানা লাল আর সবুজ চওড়া পাড়ের শাড়ী। ওরা আবার জরিটরি পছন্দ করেনা। পাড়াগাঁয়ে কাচাবার ব্যবস্থা ভাল নেই, বড় তাড়াতাড়ি শাড়ী নষ্ট হয়ে যায়। আদুরীর জন্যেও একখান সরু কাল-পাড়ের শাড়ী রাখা হল।

মেয়েরা এসে কাপড়গুলি এবার দেখতে আরম্ভ করল। উষা বলল "এবার পুজোতে ত দাদুর কাছে থাকব। গ্রামের পরিবেশে খুব ভাল মানায় এমন রংএর শাড়ী নেব।"

অপু বলল, "তোমাদের সব অদ্ভুত কথা বাছা। গ্রামে

কি মানুষে হাতী ঘোড়া পরে কিছু? এই সব শাড়ীই কেনে যার যেমন যোগ্যতা।"

উমা বলল "কেনে হয়ত, কিন্তু সব জিনিষ কি সব জায়গায় মানায়? এই ধর আমি যদি লালপেড়ে গরদের শাড়ী পরে আধুনিক নাচের পার্টিতে যাই, তাহলে কি মানাবে? না ফিরফিরে হাওয়ায় ওড়া জর্জেট পরে চণ্ডী-মণ্ডপে যাই সেটাই মানবে? যেখানকার যা।

তার মা এর উত্তরে কিছু বললেন না। হেমলতা এইসময় ছোট একটি নাতনী নিয়ে এসে হাজির হওয়াতে সকলের মন তাঁরই দিকে চলে গেল। হেমলতা দেখতে প্রায় আগের মতই আছেন, চুলগুলো কিছু পেকেছে। নাতনীটি তাঁর বড় ছেলের মেয়ে, বছর চার পাঁচের হবে, দেখলে ছোট-বেলার রঙনের কথা মনে পড়ে।

ননীবালা তাঁকে মহোৎসাহে অভ্যর্থনা করল। "এস পিসীমা এস, তোমার জন্যে সবুজ আর জরিমেশান তাবিজ পাড়ের শাড়ী এনেছি, যেমন বলেছিলে গত বছর। আর এই ছোট্ট দিদিমণিটি কে? নাতনী বুঝি? ভালই হল আমার আর একটি খদ্দের বাড়ল।"

হেমলতা বললেন "তাহলে ত বাপু এখনও পাঁচ ছ' বছর বসে থাকতে হচ্ছে মুখ ধুয়ে, এখন ত সবে পাঁচ বছর বয়স।"

উমা বলল "সে কি ছোট ঠাকুরমা, তুমি ওকে ১১ বছর বয়সেই শাড়ী পরিয়ে দেবে নাকি? নাতনী শুনছে আর কি তোমার কথা! আমরাই বলে চোদ্দ-পনেরো বছরের আগে শাড়ী ধরিনি। তাও দিতাম দাদুকে খুসি করার জন্যে।"

অপু বলল "ভাগ্যে তোমাদের একটি খাঁটি বাঙ্গালী দাদু ছিলেন তাই রক্ষে। ওঁর কথা ত ফেলতে পারনা, আমাদের ত তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেও। নইলে বোধহয় ঐ একতলার ফিরিঙ্গি ছুঁড়ীগুলোর মত কোট প্যান্ট পরে বেড়াতে। আহা, যা দেখায় বাছাদের!

ননীবালা গালে হাত দিয়ে বলল "সে কি গা? মেয়ে-ছেলে কোট প্যান্ট পরে কি?"

রীণি বিজ্ঞের মত বলল "স্থাখ ননীমাসী, তুমি মায়ের চেয়েও সেকেলে। ওগুলোকে কোট প্যান্ট বলে না, ওগুলোর নাম "ব্লু জিন্‌স্‌।"

আদুরী বলল "নাম যাই বল, আসলে কোট প্যান্টই ত? ধুম্‌সো ধুম্‌সো মেয়েগুলোকে যা দেখায়, তাকান যায় না একেবারে তাদের দিকে।"

উমা বলল "বাবাঃ, আড়াল থেকে যদি কেউ আমাদের কথা শোনে ত ভাববে যে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে রয়েছি সব।"

উমা হঠাৎ বলল "স্থাখ, এই শাড়ীটা চমৎকার না?"

সব ক'জন ঝুঁকে পড়ল শাড়ীটার উপর। হাল্কা বাসন্তী রং, বড় বড় জরির কল্কা বসান পাড়। রীণি বলল "বেশ সুন্দর, এর সঙ্গে কপালে মস্ত বড় একটা কুঙ্কুমের টিপ পোরো চমৎকার দেখাবে।"

হেমলতা বললেন "এবার ত শুনছি পাকাপাকি সিঁদুর টিপেরই ব্যবস্থা হচ্ছে? সম্বন্ধ আসছে নাকি? শাড়ীটাড় এখন থেকে গোছাতে থাক, নইলে বড় তাড়াহুড়ো করতে হয়। বেশ জমকালো দেখে জিনিষ কিনবে, যেন দুদিনে হাওয়ায় না উড়ে যায়।"

অপু বলল "সম্বন্ধ এলেই ত হল না? বাবারও পছন্দ হচ্ছে না, ওঁরও না। ছেলে ভাল হয়ত বংশ খারাপ, বংশ ভাল হয়ত ছেলে হাবা। তার উপর পণ দেবার মত কারো নেই। বলেন সব ত ঐ মেয়েরাই পাবে, আগেভাগে টাকা ধরে দিতে যাব কেন? আমরা কারো কাছে টাকা নিইনি, দিতেও যাবনা কাউকে।"

হেমলতা বললেন "তা ঠিক কথাই ত বলেছে বাপু। আমার দাদার মত পাত্র ত আজকালকার দিনে ত্রিভুবনে খুঁজে পাবেনা, তিনি কি একটাও পয়সা নিয়েছিলেন? আমার বাবাও নেননি, খোকার বিয়েতে আমরাও নিইনি।"

ননীবালা বলল "আজকালকার দিনে মা সবাই টাকাই খোঁজে, টাকা ছাড়া আর কেউ কিছু চেনেনা। তেমনি সব বিয়েও হচ্ছে ছিরির। আমাদের ছোটবেলায় কেউ কখনও ভাবতে পেয়েছে যে হিন্দুর বিয়ে ভাঙ্গা যায়?

এখন ত সব গণ্ডায় গণ্ডায় আদালতে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বিয়ে ভাঙবার জন্যে।"

নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে হেমলতা বললেন "তা বাপু এর কি সবটাই খারাপ? মেয়েগুলোকে যা ছেঁচানি খেতে হয় এক এক জায়গায়, তার চেয়ে বিয়ে ভেঙে যাওয়া ভাল। মেয়ে বলে তারা কি আর মানুষ না?"

রৌণি বলল "থ্রি চিয়ার্স ফর ছোট ঠাকুরমা, দেখতে কেমন আধুনিক!

ননীবালা বলল "দেখ দিদিমণিরা, আমি বুড়ো মানুষ, এই এত বড় মোট নিয়ে ফিরে যেতে হবে কত দূর! সন্ধ্যার পর চোখে বড় কম দেখি! তোমরা একটু তাড়াতাড়ি করে শাড়ীগুলি বেছে নাও না।"

আবার সকলে শাড়ীর উপর ঝুঁকে পড়ল। হেমলতা নিজের পছন্দমত কাপড় সরিয়ে রাখতেই তাঁর নাতনী কেঁদে উঠল "আমি শাড়ী নেব।"

হেমলতা বললেন "আরে ছিঃ, তুমি কেন এ সব সুতি শাড়ী নিতে যাবে? ও ত বুড়ীরা পরে। তোমার জন্যে আলমারীতে টুকটুকে সিল্কের শাড়ী আছে, তাতে জরীর পাড়। সে কেমন সুন্দর দেখতে।"

রৌণি বলল "এই বার ছোট ঠাকুরমা আমাদের সবাইকে বুড়ী বানিয়ে দিলেন। তা বুড়ীই সই এখন শাড়ী বেছে নাও, না হলে ননীমাসী তার পুঁটুলি নিয়ে দৌড় মারবে। আমি এই নীলাম্বরী শাড়ীটি নিলাম।"

উমা বেছে নিল ময়ূরকণ্ঠী শাড়ী। সবাই এবার টাকা আনতে উঠে পড়ল। ননীবালা সব চারদিকে ছড়ান কাপড় গুছিয়ে নিয়ে আবার পোঁটলা বাঁধতে বসল। তারপর টাকা কড়ি সব বুঝে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আজ চল্লাম বৌদিমনি। কিন্তু যদি সম্বন্ধ ঠিক হয়, তখন আমাকে ডাক দিতে ভুলোনা। সুতি কাপড় সব আমি দেব। কমতো লাগবেনা, ভত্ত তালাশ নিয়ে? যে রকম শাড়ী বলবে সেরকম এনে দেব তুমি দেখ। একখানিও দোকানে গিয়ে কিনবে না। তোমাদের খেয়েই ত বেঁচে আছি, তোমরা মুখ ফেরালে আর আমাদের উপায় নেই। সেই তোমার বিয়ের সময় থেকে কাপড় দিচ্ছি।"

অপু বলল "হাঁ নিশ্চয় খবর দেব।" ননীবালা অতঃপর বিদায় হল ছোকরার পিঠে বোঁচকা চাপিয়ে। আত্তরী মাদুর তুলে ফেলে নিজের কাজে চলে গেল, মেয়েরাও কাপড় নিয়ে নিজেদের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

হেমলতা সোফায় উঠে বসে বললেন, "একটা সম্বন্ধের কথা ত শুনেছিলাম, আরো এসেছে নাকি?"

অপু বলল "আর এক জনের কথা আপনার ভাইপো বলেছিলেন। ওঁদেরই কলেজে কাজ করে, মাইনে অবশ্য এখনই বেশী নয়, পরে বাড়বার কথা আছে। দেশে বিষয় সম্পত্তি আছে। উনি ত বলেন ছেলে ভাল, বাবাকে লিখবেন আজ। তিনি যদি মত করেন ত মেয়ে দেখানর কথা উঠবে। ছেলে নাকি মেয়েকে এরই মধ্যে কোথায় দেখেছে, তারে খুব পছন্দ হয়েছে।"

হেমলতা বললেন "তা আর না হবে কেন? আমাদের মেয়ে কি অপছন্দের মত? যেমন মেয়ে তেমন ঘর! আমাদেরই এখন পছন্দ হলে হয়।"

অপু বলল "সেইত মুস্কিল। এখন নানা জনের নানা রকম পছন্দ, অথচ সকলের পছন্দ না হলে বিয়ে হবেনা। উনি ত প্রায় রাজি হয়েই আছেন, বলছেন এদের টাকার খাই নেই।"

হেমলতা বললেন" সেইটাইত সব চেয়ে বড় কথা নয়? ছেলে কেমন সেটাই ত আগে দেখতে হবে? চেহারা কেমন, স্বাস্থ্য কেমন, স্বভাব চরিত্র কেমন সবই জানতে হবে। পরিবার কেমন তাঁর খোঁজ নিতে হবে। থাকতে হবে ত তাদেরই মধ্যে? তোমার মেয়েরা আবার আর পাঁচটা মেয়ের মত ত নয়? স্বাধীনভাবে মানুষ, নিজস্ব মতামত আছে। তাদেরও পছন্দ হওয়া চাই।"

অপু বলল "সে ত বটেই। ঐ আর এক ফ্যাসাদ, মেয়েরা সব স্বয়ংবরা হবেন, অথচ বর জুটিয়ে আনবে অন্য লোকে।"

অভয়পদ মেয়েদের বিয়ে দিতে বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মেয়েরা যে দারুন রকম অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছিল তা নয়। সবার বড় উমার বয়স কুড়ি, আর সবার ছোট রৌণির বয়স ষোলো। বি,এ পাশ না করে

মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হবেনা, এ একরকম ঠিকই ছিল, কাজেই তাড়াহুড়োর কোনো দরকার ছিল না। অভয়পদ নিজে এখনও যুবক আছে বললেই চলে, অপুকেই বরং বেশী ভারিক্কি মনে হয়। খাটবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা কিছুই তার কমেনি, সংসারও মোটামুটি ভাল ভাবেই চলছে। কাজেই এত তাড়া কেন তা আর কেউ বিশেষ বুঝতে পারত না। অপু শুধু বুঝত।

রামপদ ক্রমেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ছেন। বিষয় সম্পত্তি টাকা কড়ি প্রধানত তাঁরই। তিনি নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করেন, এ বিষয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতেও তিনি প্রস্তুত নন। ইচ্ছা হলে বোনদের সঙ্গে কখন কখনও কিছু বলেন। অভয়পদ নিজে যা রোজকার করে তার থেকে বিশেষ কিছু বাঁচাতে পারে না, খরচ তার অত্যন্ত বেশী। অপু কিছু হিসাব করে চলতে পারেনা, সে শিক্ষা তার নেই। মেয়েগুলির যখন যা খেয়াল হয়, মাকে দিয়ে তা করিয়েই ছাড়ে। বাপ বকাবকি করলেও তারা শোনেনা। অপুর সঙ্গে যতই ঝগড়াঝাঁটি করুক, মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ করে উমা আর রানীর সঙ্গে অভয়পদ কিছুতেই পেরে উঠেনা। কাজেই কুড়ি বাইশ বছর চাকরি করেও সে বিশেষ কিছু সঞ্চয় করেনি। অবশ্য কিছু জীবনবীমা আছে প্রভিডেণ্ট্ ফণ্ড আছে, কিন্তু সে সব ত শেষ বয়সের অবলম্বন, এখন বর্ত্তমানে যে শুভ দিনগুলি এগিয়ে আসছে তার ব্যবস্থা কি ভাবে করা যাবে? অপুর অনেক গহনাগাঁটি আছে, তবে সে তার থেকে কিছু দিতে রাজী হবে কিনা কে জানে? গহনাগুলি তার প্রাণের থেকেও প্রিয়। আর গহনা হল স্ত্রীধন, তার উপর কোন হাত নেই অভয়পদর।

এক উদ্ধার করতে পারেন বাবা। তাঁর হাতে বেশ জমান টাকা আছে, একথা অভয়পদ জানে। তিনি দীর্ঘ জীবনে কম রোজকার করেননি। নিজে চিরকাল বাস করেছেন অতি সাদাসিদে ভাবে, ছেলেও মাত্র একটি। আত্মীয় স্বজনদের অতিদরাজ হাতে সাহায্য করেও তিনি প্রচুর সঞ্চয় করেছিলেন। দুখানা বাড়ী করতে অনেকটা খরচ হয়েছে কিন্তু শহরের বাড়ী থেকে যথেষ্ট আদায় হচ্ছে। অন্য আয়ও তার আছে। গ্রামে থাকেন, কোনো খরচই প্রায় সেখানে তাঁকে করতে হয়না। টাকা জমানই হয় নিশ্চয়। এতদিনে বেশ অনেক টাকাই জমেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশদভাবে কিছুই সে জানেনা। রামপদকে সে এখনও ভয় করে চলে, টাকা পয়সার কথা তাঁর কাছে তুলতেই সাহস করেনা। পিসীমারা জানেন হয়ত সব, কিন্তু তাঁদের কাছে এ সব প্রশ্ন করতে সঙ্কোচ হয়। আর কারো জানার কথা নয়।

উষার যদি একটা সুবিধা মত সম্বন্ধ আসে, তাহলে না হয় রামপদর সামনে একথা তোলা যায়। তখন যা হোক একটা উত্তর তিনি দেবেনই। মুস্কিল যে রামপদর সঙ্গে অভয়পদর মতামত বা পছন্দ একেবারেই মেলেনা। সে প্রথমে দেখে বরের সাংসারিক অবস্থা কেমন, তাদের টাকার খাঁই আছে কিনা। রামপদ প্রথমেই ছেলের স্বভাবচরিত্র আর বিদ্যাবুদ্ধির খোঁজ নেন, সেখানে খুঁৎ বেরলে আর সে সম্বন্ধের কথা কানেই নেন না। তা ছাড়া মেয়ের বিয়েতে পণ দেওয়ারও তিনি একান্ত বিরোধী। বলেন "যা দেব তা মেয়েকেই দেব।"

আজ অভয়পদ কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখল অপু আলমারী খুলে কাপড় গোছাচ্ছে। বলল "সন্ধ্যেবেলা এত শাড়ী ছড়িয়ে কি করছ? কোথাও যাচ্ছ নাকি?" অপু বলল "যাব আবার কোথায়? আজ কাপড়ওয়ালী এল, সবাই পুজোর শাড়ী নিলাম তাই একটু গুছিয়ে রাখছি।"

অভয়পদ বলল "এই এক আচ্ছা নিয়ম। হাজারখানা শাড়ী থাকলেও পুজোর সময় একখানা নুতন শাড়ী কিনতে হবে।"

অপু বলল "মাঝে মাঝে আনন্দ করতে ত সব মানুষ চায়, তোমারই এক অনাসৃষ্টি স্বভাব। মাঝে মাঝে মানুষ ত রোজকার ডাল ভাতের বদলে ভালটা মন্দটা রান্না করেও খায়?"

অভয়পদ বলল "তোমরা খালি আনন্দটাই বোঝ, যাকে আসল ঠেলাটা সামলাতে হয়, তার কিছু আনন্দ হয় না।"

অপু বলল "আসল ঠেলা কোনটা? টাকা দেওয়া?

তা পুজোতে কাপড় চোপড়ের খরচ ত বাবাই দেন, তোমার নিরানন্দ হবার কি হয়েছে ?"

অভয়পদ বলল "সামনে ত মেয়ের বিয়ের ধাক্কা আসছে। সে বিষয়ে ভাব কিছু ? না শাড়ীর আনন্দেই মসগুল। তাতে বাবা কি দেবেন না দেবেন একটু জানতে পারলে মাথাটা ঠাণ্ডা হত। যা আসে সবইত উড়ে যায়, একটা পয়সা ত রাখতে পারিনা।"

অপু বলল "তার আর আমি কি করব ? আমি কি একলা দশ হাতে খেয়ে পরে সব উড়িয়ে দিচ্ছি ? নিত্যি ত হিসাব দেখছ, কোন খরচা কমাব বল ?"

সেটা অভয়পদও ভেবে পায়না। অথচ তার মনে হয় খরচ কমান উচিত। সে নিজে যা রোজগার করে বাপের কাছ থেকে তার বেশী পায়, তবু তার টানাটানি কেন ? তার সতীর্থরাও নিজেদের উপার্জ্জনে বেশ সংসার চালিয়ে যায়, তারা ত কেউ না খেয়ে নেই ? কিন্তু অপুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্কাতর্কি করে লাভ নেই। আর সত্যিই সব দোষ তার নয়। মেয়েগুলি অতি বেহিসাবি খরচ করে এবং তারা কারো কথা শোনে না।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল, "উবা উমারা তবে এবার গ্রামেই চলল পুজো দেখতে ?"

অপু বলল "হ্যাঁ, দাদু নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছেন আর না গিয়ে রক্ষে আছে ? ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়বে ছোট পিসিমার সঙ্গে আর ফিরবে একেবারে কালীপূজোর পরে।"

"কালীপূজোর পরেই ত ভাই ফোঁটা, সেটা কি আর পার না করে আসবে ? বিশেষ ভাই সম্পর্কের দু একটা রয়েওছে যখন ওখানে।"

অপু বলল "তা থেকে যেতে পারে আরো দু একটা দিন। বাবাই পৌঁছে দেবেন তারপর। এবারে স্বর্ণ আর শান্তিও যাচ্ছে বাপের বাড়ী শুনলাম ছোট পিসিমার কাছে।"

অভয়পদ বলল, "নিজের বোন ত নেইই, ধারে কাছে যদি এক আধটা মাসতুতো পিসতুতো বোনও থাকত ত কিছু পাওনা হোত।"

অপু বলল "পেতে হলে দিতেও হয় যে আবার। দেখনা তোমার বাবা এখনও পিসিমাদের শাড়ী দিচ্ছেন ?"

অভয়পদ বলল "বাবা খালি দেবার ছুতো খুঁজে বেড়ান। কত টাকা যে এই করে ওড়ান। গুছিয়ে রাখলে এতদিনে কত জমত। আমার তিনটে কন্যাদায় উদ্ধার হয়ে যেত।"

অপু বলল "আছ ভাল তুমি। নিজে হয়েছ মেয়ের বাপ, আর অন্য লোকে আসবে তোমার কন্যাদায় উদ্ধার করতে। তবু ত মাসে মাসে এত দিচ্ছেন।"

অভয়পদ বলল "তোমার খালি বাবার দিকে টেনে কথা বলা। প্রশ্রয় দেন কিনা ? মেয়েগুলির জননী ত বটে, তোমার কি কিছু কর্ত্তব্য নেই তাদের সম্বন্ধে ?"

অপু বলল "আমার কর্ত্তব্য আমি বুঝব, আগে তোমার মেয়ের সম্বন্ধ ঠিক হোক ত ? বাবা আগে মত করবেন তবে না ? আজ চিঠি লিখছ ত ?"

অভয়পদ বলল "চিঠি ত লিখেছি। আমার ত ছেলেটিকে ভালই লাগল, দেখতে ভাল, স্বাস্থ্যও ভাল। পরিবারটার সব খবর নিতে হবে। সাধারণ লোকে ভাল সম্বন্ধই বলবে এটাকে, কিন্তু আমার বাবা যে সাধারণ নন। তিনি কলি-যুগে বসে সত্যযুগের মানুষ চান। সে কি আর সহজে জোটে ? সিগারেট আজ কাল সব ছেলেই খায়। পান দোষও কারো কারো আছে। এসব কেউ আজকাল গ্রাহ্যই করে না। চারিত্রিক দোষ থাকলেও বলে আজকাল চোখ বুজে থাকে, বলে ও সব সেরে যাবে সংসারের ভার ঘাড়ে পড়লেই। কিন্তু বাবার কানে যাক দেখি এসব কথা, তখনি লাঠি হাতে তাড়া করে আসবেন।"

অপু বলল "কি যে বল, ঐ সব মাতাল দাঁতালের হাতে মেয়ে দিতে পার নাকি তুমি ? টাকা হলেই কি সব হল ?"

অভয়পদ বলল "টাকা না হলে যে সংসার চলে না, সে কথা তুমি ভাল করেই জান। তাই বলে আমি বলছিনা যে জেনেশুনে আমি পাঁড় মাতাল বা দুশ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব।"

অপু বলল "যা মর্জ্জি তোমাদের। তবে আমি জানি যে স্বভাব চরিত্র ভাল নয়, এমন ছেলে হাজার বড়লোক

হলেও তার সঙ্গে বাবা উষার বিয়ে দেবেন না, আর তোমার মেয়েও ঐ রকম ছেলে বিয়ে করবেনা। সে ত দাদুর কথায় ওঠে বসে।"

অভয়পদ অসহিষ্ণুভাবে বলল "তা নিজের বর নিজেই খুঁজে আনুক না মেয়ে। তা হলে ত আমি বেঁচে যাই। প্রেম করে যারা বিয়ে করতে আসে তারা অন্তত: পয়সা চায়না।"

অপু বলল "চল এখন চা খাবে চল, ওসব ভাবনা ত রয়েইছে। দেখ আগে বাবা কি বলেন এ ছেলেটির বিষয়।"

উষা উমাদের আর ছুটি হতে মাত্র তিন দিন বাকি। যে দিন ছুটি সেই দিনই তারা বেরিয়ে পড়বে, ভোররাত্রে পৌঁছে যাবে। হেমলতার সঙ্গে তার নাতনীটি যাবে সে ঠাকুরমাকে ছেড়ে এক মিনিটও থাকতে রাজী নয়। তাঁর বড় ছেলে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে। পুজোর সময়টা ছেলে, মেয়ে, বৌ কেউই কলকাতার বাইরে থাকতে চায় না।

গোছানোর হুড়োহুড়ি এখন থেকে লেগে গেছে। তরুণী মহিলারা পনেরো কুড়ি দিনের জন্যে বেরুচ্ছেন, কাজেই বিরাট ব্যাপার একটা হবেই। উষা এবং উমাও কিছু পরিমাণে নিজেদের কাজ নিজেরা করে নিতে পারে। রাণির কাজ করা একেবারে অভ্যাস নেই কাজেই অপু ও আদুরীকে তার হয়ে কাজ করতে হয়। সে কাজ করারও ঝন্‌ঝাট্ কম নয়। কি যে নেবে, কথানা নেবে, কিছুই রাণি চট করে ঠিক করতে পারে না, অথচ অন্যরা যা বল্‌বে তা তার পছন্দ হবে না। অপু শেষে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। উষা তখন এগিয়ে এসে বলল "দাও মা আমি ওর সুটকেশ্ গুছিয়ে দিচ্ছি। মেয়ের যদি একটাও পরিষ্কার ধারণা আছে কোনো বিষয়ে। এই দ্যাখ, থাকবি ত পনেরো ষোল দিন, তা পনেরো ষোলো খানা শাড়ীই নে। ওখানে ভাল ধোপা আছে, ছোট ঠাকুরমা বলেছেন, কোনো অসুবিধা হবে না। সব রঙীন শাড়ীই তোর, খুব বেশী বাছতে হবে না। খুব পাতলা কাপড় নিস্‌নে, ওসব ওখানে ভাল দেখাবে না। সিল্কের শাড়ীও যা নিবি, তা মোটা সিল্ক। আর বাপু জামাগুলোও একটু বেছে নাও। সব ক'টাই হাত কাটা নিও না, দাদু ওসব পছন্দ করেন না। আস্তিনওয়ালা যে কটা আছে নাও, বাকি হাত কাটাই নাও। পাতলা দেখে গোটা দুই কোট নাও, ওখানে চট্ করে ঠাণ্ডা পড়ে যাবে এবং ব্লাউজের হাতার অভাবও কিছু মিটবে। এমন কিছু নিওনা যা দেখে গ্রামের লোক হাঁ হয়ে যায়। আমাদের নামে কেউ কিছু বললে দাদু বড় কষ্ট পান মনে। শাল গায়ে দেবার মত নৈতিক সাহস যদি সঞ্চয় করতে পার ত এক একখানা নিও, মায়ের কাছে অনেকগুলো আছে।"

আদুরী সেখানে বসে বসে মেয়েদের গোছান দেখছিল। এই সময় সে বলে উঠল "দেখেছ বৌদিমণি, আমার বড় বুড় এরই মধ্যে কেমন কাজের হয়ে উঠেছে? অথচ কেমন করে শিখল বলত? কখনও ত কোন কাজ হাতে করে করেনি?

উমা বল্‌ল "আরে দিদি হল গিয়ে না পড়ে পণ্ডিতের দলের মানুষ। ওরা সব রকম জ্ঞান নিয়েই জন্মায়।"

রাণি বলল "তুই বড় হিংসুটি ছোড়দি। বড়দিকে কেউ যদি প্রশংসা করে অমনি তোর গায়ে জ্বালা ধরে যায়; কৈ সবাই যে বলে তুই ভুবনমোহিনী সুন্দরী, নাচতে জানিস গাইতে জানিস, ছবি আঁকতে পারিস তাতে ত বড়দি রাগ করেনা?"

অপু বলল "নাও এখন তুজনে ঝগড়া কর, জিনিষ গোছান মাথায় উঠুক। ঐ ছোট পিসিমা এলেন বোধহয়।"

হেমলতা এ কদিন প্রায় রোজই আসছিলেন। মেয়েরা একটু বেশী দিনের জন্য যাচ্ছে, তাই কি কি নিয়ে যাবে, কেমন ভাবে চলবে ফিরবে সব নিয়ে তাদের সঙ্গে আর অপুর সঙ্গে আলোচনা করতেন। মেয়েরা মায়ের কথা যত সহজে উড়িয়ে দিত ছোট ঠাকুরমার কথা তত সহজে ওড়ান চলত না। আজ ঠিক এই সময় এসে পড়াতে রাণি আর উমার ঝগড়াটা আর বেশি জুৎ করতে পারল না। তিনি মেয়েদের ঘরে ঢুকেই বললেন "কি গো নাতনীরা বাক্স প্যাটরা গোছাচ্ছ নাকি? হয়ে গেল সব?"

রাণি বলল "হল আর কই? বড়দি নিজেরটা গুছিয়েছে আর আমারটাও খানিক গুছিয়েছে আর ছোড়দি সকলের সমালোচনা করছে।"

ঊষা জোরে জোরে শিষ্ দিতে দিতে লাইব্রেরীর ঘরে ঢুকে গেল। একটু পরেই সেখানে একটা ইংরাজী লঘু সঙ্গীতের রেকর্ড বাজাতে আরম্ভ করল। হেমলতা হেসে বললেন "তোমার এ মেয়ের বাপু সাহেবের সঙ্গে বিয়ে দিও। দিশী কোন মানুষকে ওর পছন্দ হবে না।"

ঊষা বলল, দিশী কোনো ছেলেরও ঐ রকম ফিরিঙ্গী মেয়ে পছন্দ হবে না।"

হেমলতা বললেন, "তা বলা যায় না বাপু। মেম বিয়েও ত কত ছেলে করছে।"

ঊষা বলল, "সে মেমরা বা থাকছে ক'দিন? জিনিষটার নূতনত্ব কেটে গেলেই লম্বা দেয় নিজের দেশে।"

রীণি বলল, "আরে ওখানে গিয়ে সবাই যে নিজেদের পরিচয় দেয় রাজা মহারাজা বলে। তারপর মেমসাহেবকে এনে যেই কলাপাতায় ভাত আর শাক চচ্চড়ি খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়, তখনি তার চোখ চড়কগাছ হয়ে যায়।"

অপু অন্য কথা পাড়ল, "আচ্ছা ওদের সঙ্গে বিছানা-পত্তর কি দেব বলুন ত ছোট পিসিমা?"

হেমলতা বললেন "পাতবার বিছানা দিতে হবে না। ওসব দিদির কাছে অনেক মজুত আছে। মেয়ে জামাই আত্মীয় কুটুম্ব সারাক্ষণই আসছে যাচ্ছে ত? মশারীও জুটে যাবে। তবে গায়ে দেবার কম্বল দিয়ে দিও। ওখানের ওরা ভারি ভারি লেপ গায়ে দেয়, অল্প শীতের সময় বালাপোষ, কাঁথায় চালায়। সে তোমার মেয়েদের পোষাবেনা, ওদের কম্বল দিও, আর মোটা বেড্কভার দিও।"

অপু বলল "আর বালিশ?"

হেমলতা বললেন "ওসব কিছু লাগবে না। থালা-টালা কিছু লাগবে না। তবে পেয়ালা পীরিচ দু চারটে দিতে পার, কে জানে ওদের যথেষ্ট আছে কিনা। এমনিতে ওরা সকলেই যে চা খায় তা না, তবে বাইরের কারো জন্যে করা হচ্ছে দেখলেই ছেলে পিলে সবাই এসে জোটে।"

অপু বলল "আমরা ত ছেলেবেলা চা চোখেও দেখিনি। জ্যাঠাইমার বাড়ীতেও যখন গিয়েছি, তখনওত জল খাবারের সঙ্গে চা দিত না। আমি ত বিয়ের পরে এখানে এসে চা ধরেছি।

হেমলতা বললেন "দিদির বাড়ীতেও ত জামাই আসবার পর চায়ের চলন হয়েছে। তাও বুড়ো-বুড়ীরা কেউ খায়না। ভাল কথা, একটা বড় বালতি আর মগ দিও, এদের ত হবে সব তোলা জলের কারবার। আর আমি কি এদের তুলে নিয়ে যাব, না অতঃপর পৌঁছে দেবে ষ্টেশনে?

অপু বলল "উনিই নিয়ে যাবেন, আপনি আবার এতদূর উল্টোপথে কি করতে আসবেন?

হেমলতা বললেন "তা বেশ, আর দেখ ওদের সকলের হাতে বালা বা চুড়ি দুগাছা করে পরিয়ে দিও, খালি হাতে না যায়। ওখানকার বুড়ীদের কাণ্ডত জান, হয়ত কপালে হাত দিয়ে কাঁদতেই বসে যাবে, "ওমা এই বয়সে এত সুন্দর মেয়ের এ কি হল!" বলে। দিদি এ সব শুনলে ভয়ানক রাগ করে।"

তিন নাতনীই হাসতে আরম্ভ করল। রীনি বলল "আমি এক জোড়া অনন্ত পরে যাব, মায়ের গহনার বাক্সে আছে আমি দেখেছি।"

হেমলতা যাবার জন্যেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন "তা হলে তার সঙ্গে নোলোক মাকড়ীও পোরো, তা না হলে মানাবে কেন?" বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

মাঝের একটা দিন ফুস্ করে কোথায় যেন কেটে গেল। ট্রেন বেশ রাত্রে কাজেই তাড়াহুড়ো কিছু করতে হল না। ধীরে সুস্থে খেয়ে-দেয়ে রেকর্ড বাজিয়ে, গান গেয়ে তবে তারা বেরল। অপু বলল "সব ত চললে বাড়ী আঁধার করে, মা টা যে একলা পড়ে রইল, তা একবারও ভাবছে না।

ঊষা বলল "আমরা রোজ বড় বড় চিঠি লিখব।" রীণি বলল "তুমি আহ্লীকে নিয়ে কবে ঠাকুর দেখে বেড়িও এখন।"

ঊষা বলল "হ্যাঁ মা আবার বেরবেন, বছরে ক'বার যে সিঁড়িতে পা ফেলেন, তা এক আঙুলে গোণা যায়।"

অতঃপর কোথাও যাবার নামে চিরকালই অতিমাত্রায় ব্যস্ত, সে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সি আনতে পাঠিয়ে হৈ চৈ করে জিনিষপত্র তোলাতে আরম্ভ করল। মেয়েদের

বোঝাল "আননাত পুজোর সময় কি রকম ভীড়, বেশী দেরি করে গেলে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।" কাজেই ভীড় ভাল করে জমবার আগেই তারা ষ্টেশনে এসে উপস্থিত হল। একটা কামরায় তেমন লোক নেই দেখে অভয়পদ সেটাতেই জিনিসপত্র তোলাতে লাগল। হেমলতাও বোধ হয় পুজোর ভীড়ের কথা ভেবেই একটু আগে বেরিয়েছিলেন, তিনিও দেখতে দেখতে এসে গেলেন। তাঁর নাতনীটি তখন ঘুমে অচেতন, তার বাবা তাকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে। অভয়পদকে দেখতে পেয়েই হেমলতা এসে গাড়ীতে উঠে পড়লেন এবং বিছানার পোঁটলা খুলে তাড়াতাড়ি করে নাতনীর জন্য একটা বিছানা পেতে শুইয়ে দিলেন। সে ঘুমতেই লাগল। হেমলতা বললেন "ঠাকরুণের ঘুমের ব্যাঘাত কোনো অবস্থাতেই হয় না, নাগরদোলায় চড়িয়ে দিলেও সে ঘুমতেই থাকবে।" বড় নাতনীদের দিকে ফিরে বললেন "তোমরাও বিছানা করে নাও না, একটু হাত পা ছড়াবে ত? এখনও বেশী ভীড় হয়নি।"

উষা বলল, "ট্রেণে আমার কোনোদিনই ঘুম হয় না। দুটো ম্যাগাজিন এনেছি, পড়ব আর কফি খাব। এক ফ্ল্যাস্ক্ ভর্ত্তি কফি করে এনেছি।"

উমা বলল "আমার এই হাজার লোক বসা গদিতে শুতে ভয়ানক ঘেন্না করে। কেউ ডেটল্ দিয়ে মুছে দিলে শুতে পারি।"

রাণি বলল "কার গরজ পড়েছে? তুমি এরপর থেকে নিজের জন্যে একটা special train কোরো। ক' ঘণ্টার বা মামলা? বসে বসেই বেশ কেটে যাবে।"

কামরায় অবশ্য আরো কিছু লোক উঠল। তবে প্রচণ্ড ঠাশাঠেশি কিছু হল না। ট্রেণ আর অল্প পরেই ছেড়েও দিল।" "মাকে চিঠি লিখ রোজ" বলে অভয়পদ মেয়েদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল। হেমলতা বললেন, "যদি ক্ষিদে-টিদে পায় ত বোলো। সঙ্গে খাবার আছে।"

উমা বলল "ছোটঠাকুরমা বুঝি খাবার ছাড়া এক পাও হাঁটে না?"

হেমলতা বললেন "তা ভাই বামুনের কন্যে ত, খিদেটা একটু বেশী। আর নিজে খেলে ভাই বোনেদের জন্যেও কিছু নিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। গ্রামে ত সবরকম জিনিষ পাওয়া যায় না?"

রাত্রি বাড়তে লাগল, ট্রেণও গজেন্দ্রগমনে চলতে লাগল। সব ষ্টেশন মাড়িয়ে যাচ্ছে, যাত্রী ক্রমাগত উঠছে আর নামছে। শেষরাত্রি এসে পড়ল। পূবের আকাশ স্বচ্ছ হয়ে উঠতে না উঠতে তারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গেল। প্ল্যাটফর্ম্মে সকলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন রামপদ স্বয়ং দেখা গেল। বাড়ীর অন্য ছেলেরাও এসেছে।

ক্রমশঃ

সমিতির উদ্ভব ও প্রসার

কালীচরণ ঘোষ

যখন থেকে ইংরেজ প্রথম বাঙ্গলা বিভাগের মতলব করেছে (১৯০৩) তার পূর্ব্ব থেকেই শক্তিশালী "আখড়া" প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল, তবে এদের অনেকেরই বৈপ্লবিক (সশস্ত্র) কার্য্যক্রম ছিল না। হাওয়া যখন বইতে আরম্ভ করেছে, তখন অন্যান্য কারণের সঙ্গে কলকাতার সার্কাস এক প্রবল উৎসাহ বাঙ্গালী ছেলেদের মনে জুগিয়েছে। বিশেষ করে যখন "বোসের সার্কাসে" অ-বাঙ্গালী অপরাপর অংশভাগীদের সঙ্গে বাঙ্গালী ছেলেরা অদ্ভুত ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়েছিল তখন একটা নূতন সাড়া পড়ে যায়। ইংরেজ বা অন্য ইউরোপীয়রা ত পারবেই, তারা আমাদের চেয়ে সব দিকদিয়ে "বড়" 'আর জাপানী যারা সাদা রুশকে পরাজিত করেছে, তারা ইংরেজের সমকক্ষ ত হবেই, সুতরাং এটা সাধারণ বাঙ্গালী ছেলেদের কাছে একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলে পরিগণিত হ'য়ে উঠেছিল।

বোসের সার্কাসের কথা ভুলে যাওয়া অন্যায় হবে। এম, এল [মতিলাল] বসু ২৪ পরগণার হরিনাভির লোক। কলকাতায় যখন সার্কাস চলতে থাকে তখন তিনি গ্রামে যেতেন এবং স্বাস্থ্যবান্ যুবক দেখলে শক্তির চর্চ্চা করবার পরামর্শ দিতেন। প্রকৃত পক্ষে বিপ্লব সংক্রান্ত "গ্রুপ" গড়ে উঠবার আগেই চাংড়িপোতায় হরিকুমার চক্রবর্ত্তী, নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ভূষণ মিত্র, প্রমুখ যুবকরা কুস্তির (বিশেষ করে মাটির কুস্তি) আখড়া গড়ে তোলেন। প্যারালাল বার (Parallelbar), স্যাণ্ডো প্রণালীর ব্যায়াম প্রভৃতি চলতে থাকে। তারপর হাওয়া বদলের সঙ্গে সেই আখড়া—নামহীন—লাঠি, ছোরা, তলোয়ার খেলা বক্সিং আক্রমণ ও প্রতিরোধাত্মক কলা কৌশল শেখাতে আরম্ভ করে। যারা হরিকুমার নরেন্দ্রনাথের সঙ্গী হিসাবে সে যুগে এসে আখড়ায় যোগ দিয়েছিল তাদের অধিকাংশই বিচারে বা বিনা বিচারে স্বল্প বা দীর্ঘ কারাদণ্ড যথাকালে ভোগ করেছে। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের বিবর্ত্তন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলে সে সময়ের বৈপ্লবিক হাওয়ার দিক নির্ণয় করা সহজ হয়ে পড়ে।

নিতান্ত অবান্তর হবে না বলে দাঙ্গাবাজির জন্য প্রস্তুতর অন্যান্য কারণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

ইংরেজের শাসনের নামে শোষণ, এবং আনুষঙ্গিক অত্যাচার ছিল এবং মডারেটদের কৃপায় বক্তৃতাবাজরা খানিকটা মনের ঝাল মিটিয়ে নিলেও অত্যাচারের তীব্রতা কতকটা গা-সওয়া হয়ে আসছিল। কিন্তু 'যুগধর্ম্ম' এখন এসে একটা ওলট-পালট সৃষ্টি করলে।

সাক্ষাৎ যে-সকল ব্যাপার এসে সাধারণ মানুষকে 'দেশপ্রেমিক 'করে তুল্লে সেগুলো ইংরেজ শাসনের যে সব বড় বড় পাপ আলোচিত হতো তার তুলনায় কামানের গ্রাসের কাছে মশকদংশন বলে মনে হবে। সর্ব্বপ্রথম যেটা নিয়ে ছোকরার দল খেপলো, সেটা হচ্ছে, পথে ঘাটে বাঙ্গালীর লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন, অপমান, প্রহার। এক কথায় শ্বেতচর্ম্ম ও "রাজার জাতের"

ঔদ্ধত্য। উচ্চস্তরে ত ছিলই; মান হারাবার ভয়ে সেখানে অপমান বেমালুম হজম করা ছিল একটা আর্ট (বাহাদুরি) এবং বিশেষ আলোচিত হতো না, কিন্তু বাঙ্গলা সহরের রাস্তা ঘাটে 'ফিরিঙ্গি'র অত্যাচার বাঙ্গালীকে খেপিয়ে তুলেছিল। তালিকার মধ্যে এই ঘটনাপ্রবাহকে একটু উচ্চস্থান দিতে হয়। এর ইঙ্গিত কতকটা দেওয়া হয়েছে।

আড়কাঠি কর্তৃক ছেলেপুলে, নিরক্ষর গ্রামবাসী চাষী প্রভৃতিকে ভুলিয়ে নিয়ে কণ্ট্রাক্ট (চুক্তি) সহি করিয়ে কুলি করে চা বাগানে বা ইংরেজের চাষের উপনিবেশ ফিজি ট্রিনিডাড মরিসস সুরিনাম বৃটিশ ও ডারগিয়ানা প্রভৃতি আফ্রিকার দূরদূরাঞ্চলে চালান করা, তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার সাজা শাস্তি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন বা চুক্তি বহির্ভূত) -র কাহিনী প্রকাশ পেতে লাগলো। চা বাগানে এবং সাহেবের অফিসে পাখা কুলির প্লীহা বড় হয়ে ফিরিঙ্গির কোমল সবুট পদাঘাতে ফেটে যাওয়া এপিডেমিক (ব্যাপক) হয়ে উঠলো। সঙ্গে বেরুতে লাগলো জন্তু ভ্রমে মানুষ শিকার কুলি রমণীর ওপর ধর্ষণের করুণ কাহিনী।

এর তীব্রতা বৃদ্ধি করলে শ্বেতাঙ্গ বিচারপতিরা। এ সকল ক্ষেত্রে আসামী বে-কসুর খালাস পেয়েছে, বিবৃদ্ধ প্লীহার অকারণে ফেটে যাওয়ার জন্য মৃতের আত্মীয়রা বড়জোর বিশ পঁচিশ টাকা খেসারৎ পেয়েছে। কালায় ধলায় বিরোধ ক্ষেত্রে সাদা হাকিমের কাছে রায় যে কি হবে সেটা সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিন্ত ছিল, অর্থাৎ ইংরেজ জাতির ওপর বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবার কারণ সকলক্ষেত্রেই বর্তমান থাকতো। এই সকল খবর নিয়ে ছোট ছোট বৈঠক (যারা বিদ্রোহ ঘটাবার মালিক) আলোচনা করেছে এবং সাধারণ লোকের মনে বিষ ছড়িয়েছে। কালের ধর্ম!

শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন কাজ পায় না তখন "poor while" গরীব শ্বেতাঙ্গদের রেল, পুলিশ, ডাক, বন্দর প্রভৃতি বিশেষ অর্থকরী পদে প্রবেশ ব্যবস্থা চলছিল। আগে থেকেই ত চলে আসছিল, কিন্তু এই সব জায়গায় বাঙ্গালীরা লাঞ্ছিত হ'তে লাগলো বেশী করে—সত্যিই ঘটনা সংখ্যা বাড়লো কি না তার পরিসংখ্যান কেউ রাখে নি, কিন্তু আগে যেখানে উপেক্ষায় চলে যেত, এখন সেগুলো ডালপালা নিয়ে লোকের চোখে ধরা পড়তে লাগলো।

ইংরেজ কায়েমী হয়ে বসা থেকে ভারতীয় (অ-বাঙ্গালী বেশী) আয়া রাখা চলেছে। এই সময় হঠাৎ বাঙ্গালীর ঘুম ভাঙ্গলো (কে ভাঙ্গালো গবেষণার বিষয়) যে এরা যে-জাত সৃষ্টির সহায়তা করছে তারা দো-আঁশলা ফিরিঙ্গির দল—আসল ইংরেজ থেকে এদের বিক্রম অনেক তীব্র, প্রমাণ স্বরূপ মনে হ'লো সূর্য্যের চেয়ে বালির তাপ সহ্য করা বেশী কষ্টকর। যেমন ফিরিঙ্গিদের নিজ 'মাতৃগোষ্ঠীর' লোকদের ওপর বিশেষ বিরূপতা—ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের মত বাঙ্গালীরও রাগ পড়লো গিয়ে ইংরেজের চেয়ে ওদের ওপর বেশী করে। আর ওদেরই ত বেশী করে পাওয়া যেত রেল ষ্টেশনে। রাস্তায় পুলিশ সার্জেন্ট, কারখানায় ফোরম্যান প্রভৃতি হিসাবে। কাজেই এদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্র ছিল বড়, ঠকাঠকি যেখানে উপেক্ষণীয় ছিল সেখানে হ'লো প্রলয়ঙ্কর ঘটনা।

এ উদাহরণ আর বাড়িয়ে লাভ নেই। জাতি বৈরতা সেই "ন্যাশনাল" অর্থাৎ রাজনারায়ণ-শিবনাথ-নবগোপালের আমল থেকে চলছিল, আজ তা হাঙ্গামায় পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো অনুকূল বাতাস পেয়ে।

হিসাব মত এই আচরণের প্রতিবাদে বা প্রতিকার-কল্পে অনেকগুলি "সমিতি" গড়ে উঠেছিল এবং তার মধ্যে বিবেকানন্দের দান অপরিসীম। তাঁর আহ্বানে বাঙ্গালী যেন সম্বিত ফিরে পেল। হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন "দুর্বলতা পরিহার কর" প্রার্থনা করতে বলেছেন "মা আমাকে শক্তি দাও, আমাকে মানুষ কর।"

এই সব জাগ্রত জাতির কাছে এতকালের উপেক্ষিত অত্যাচার বিরাট আকার ধারণ করলো। আর সেই

সময় শাসনক্ষেত্রে কার্জনের আচরণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঘৃতসিঞ্চন করেছিল। সে কথা আগেই বলা হয়ে গেছে।

আবার বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের কথায় আসা দরকার। যতদূর বলা হয়েছে তা থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে অনুশীলন সমিতি ঐ সময় একাই সবাইকে চাপা দিয়ে ফেলেছিল। যারা স্বল্পকাল পরেই 'যুগান্তর' বলে পরিচয় লাভ করে, তারা সকলেই এই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে বলে রাখা চলে যে 'যুগান্তর' স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হবার পরে মফঃস্বলের অপরাপর প্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটি এই দুই দলের সঙ্গে যুক্ত হয়।

যুগান্তর দল (পুলিশের খাতায় "পার্টি") নিতান্ত স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয় নি। যখন অবস্থা বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছে, তখন কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সংস্থায় ছিলেন সভাপতি পি. মিত্র, সহঃ সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাশ, কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় পরে বারীন ও তার সঙ্গীরা অনুশীলন সমিতির সভ্য বলেই পরিচিত। কিন্তু কার্য্যক্রম নিয়ে প্রথমে একটু মতান্তর দেখা যায়। পি, মিত্র চাইছিলেন শরীরচর্চ্চার ওপর ভিৎ করে, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রসারের কথা। বারীন প্রভৃতি একটা দল চাইলে আর যাহাই হ'ক বিপ্লবের চিন্তাধারা দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে কারণ বহু সহস্র শ্রোতা বা চিন্তাশীলের মধ্যে কয়েকজনকেই মাত্র এ বিপদসঙ্কুল পথে পাওয়া সম্ভব হবে। অরবিন্দ অনেক আগেই বলেছিলেন, সবাই আসবে তা নয় কিন্তু জনগণের একটা বিরাট অংশ বিপ্লবের চিন্তায় নিযুক্ত না হ'লে কয়েকজনের চেষ্টায় ত্যাগে, নির্য্যাতনে একটা বড় কিছু করা সম্ভব হবে না।

সভাপতি বা পরিচালক মহাশয় এতটা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। সন্ধ্যা বেরিয়েছে ১৯০৪ সালে। ১৯০৫ মার্চ্চ পর্য্যন্ত লেখার ইংরেজের ভাবে সমসুযোগ ভোগ করবার কথা ছিল। 'যুগান্তর' প্রকাশিত হ'লো মার্চ্চ ১৯০৬ আর 'বন্দে মাতরম্' নভেম্বর মাসে।

এখন চললো "সন্ধ্যা-যুগান্তর-বন্দে মাতরম্" পত্রিকার যুগ। মূল পরিচালক সমিতি বাইরের ঠাট বজায় রাখলেও পত্রিকাগুলির লেখা যে পথের সন্ধান দিচ্ছিল, তাতে মতান্তরের পথ পরিষ্কার হয়ে উঠছিল। তখনও অনুশীলন ও যুগান্তর এক দল, তবে যুগান্তর পত্রিকা, তার প্রতিষ্ঠান ও কর্ম্মধারায় যারা বিশ্বাসী তারা একটু আলাদা হয়ে পড়াই সম্ভব। 'যুগান্তর পার্টি' পরে যেটা হ'য়েছিল, তখনও স্বতন্ত্র সত্তা লাভ করে নি।

উগ্র মতামত যারা পোষণ করতো তারা ধীরে ধীরে অরবিন্দর পরামর্শ, সাহচর্য্য খুঁজতে সুরু করে দেওয়ায় মূল সংস্থায় একটা চিড় খেয়ে গেল। মিত্র মহাশয় দেখলেন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একক কর্ত্তৃত্ব তাঁর হাত থেকে সরে যাচ্ছে। অতটা মারমুখী হয়ে ওঠার মত মন গড়ে তুলতে না পারায় তিনি পরিচালক থাকলেও তাঁর অনুশীলনের আদি সভ্যদের কাছেও একটু পিছনে সরে গেলেন।

তার পর হ'লো কার্য্যধারা নিয়ে মতভেদ। তখন দলের যুবকদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হ'য়েছে। যারা অরবিন্দ-ভক্ত তারা কোনো বড় বাধা পেল না। তিনি প্রকাশ্য উৎসাহ না দিলেও পরের অর্থ লুণ্ঠনের ব্যাপারে তাঁর মতের যে প্রতিবন্ধকতা নেই, সেটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের স্পর্শ অনেক "সাধু"কে দলে টেনে এনেছিল, আবার সংগ্রাম শেষে অনেকে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

. এখন অনুশীলনের যুবকদল মনে করতে আরম্ভ করে যে তাদের ওপর ভীরুতার অপবাদ এসে পড়ছে। সুতরাং তারাও কতকটা এগিয়ে পড়তে লাগলো। বিশেষ করে ঢাকা অনুশীলন সমিতির পক্ষে আর

অলস হ'য়ে বসে থাকা চলছিল না। তাদের বিবিধ ব্যায়ামের প্রয়োগ-ক্ষেত্র চাই। কিছু কিছু গোলো-যোগের খবর কলকাতায় আসতে লাগলো। এই সময় কলকাতায় অনুশীলন সমিতি নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়েছে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ঢাকা সমিতি সম্বন্ধে সমকালীন পুলিশ রিপোর্ট (Mr, Daly) বলে :

"The Dacca Samiti more rapid in its advance, more businesslike in its organisation and more daring in its deeds, perhaps owing to the fact that young Bengali in Eastern Bengal is ahead of young Bengali of West province in natural audacity and physical courage."

সংক্ষেপেতঃ দাঁড়াচ্ছে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রসার হ'য়েছে দ্রুত ; প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতায় বিশেষত্ব এবং কার্যক্ষেত্রে দুর্দ্দান্ত সাহস বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ হিসাবে মনে হয় পূর্ব্ব বঙ্গের সাধারণ বাঙালী ছেলে পশ্চিমের চেয়ে দুঃসাহসিকতায় ও দৈহিক শক্তিতে অনেক এগিয়ে আছে।

এই প্রকৃতিদত্ত ও অর্জ্জিত শক্তি আর যেন বাধা মানতে চাইছিল না। এবং এই কারণেই ঢাকা অনুশীলন সমিতি কার্যক্ষেত্রে অনেকটা অগ্রসর হয়ে পড়ে। এাদকে "যুগান্তর" পত্রিকা ঘিরে পরোক্ষে অরবিন্দ এবং প্রত্যক্ষে যে দল গড়ে উঠলো সেটা বড় পরিচয় পেলে কতকগুলি সাহসিকতাপূর্ণ বিপজ্জনক নাম-করা কাজের মধ্য দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে আলীপুর বোমার মামলা এবং তার মধ্যে নরেন গোঁসাই নিপাতপর্ব্ব যুগান্তরের প্রতিষ্ঠা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে।

একেবারে খুনখারাপি আরম্ভ হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পি. মিত্র সকল দলের প্রতিষ্ঠানের শিরোমণি ছিলেন। দলবৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যখন কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে আর পূর্ব যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হচ্ছিল না, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে ছোট বড় বিপ্লবকে গড়ে উঠেছে, তখন এ সকলের একসূত্রতা মিত্র মহাশয়ে নাম বজায় রেখেছিল, যদিও তিনি এ সময় প্রায় নির্লি হয়ে পড়েছিলেন।

ক্রমে গভর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতি নতুন আকার ধার করলো এবং সমিতিগুলি সন্দেহের চোখে দেখা হ'ে লাগলো। সভ্যদের পিছনে গুপ্তচর নিয়োজিত হওয়া তারা বিব্রত হয়ে পড়লো তখন অনুশীলন ও যুগান্তর তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি দুটি বড় রকম বিভাগে মধ্যে অবস্থিত হলেও একই উদ্দেশ্যে গঠিত বলে পরস্পরে মধ্যে কিছু রেষারেষি থাকলেও একেবারে সম্প্রীতিহী হয় নি। অন্ততঃ পুলিশকে ধোঁকা দেবার জন্য পরস্পরে সাহায্য করেছে।

একটা কথা চলিত আছে যে মিত্র মহাশয় কোে সময়ে কোনোভাবে পরের অর্থ লুণ্ঠন সমর্থন করতেন না একথা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ না করলেও সত্যের অপলাপ হ না। হরিকুমার চক্রবর্ত্তী একজন বিশিষ্ট বিপ্লবী এ অনুশীলন সমিতির খুব গোড়ারদিকের সভ্য। উড়িষ দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য্যে বিশেষ হৃদয়বত্তা ও দক্ষতার পরিচ দিয়ে মিত্র মহাশয়ের স্নেহ ও ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা লা করেন। তাঁর কাছে শোনা,—মিত্র মহাশয় বলতেন সমিতির সভ্যরা ব্যায়াম, লাঠি, ছোরা, তরবারি চালনা বেশ পারদর্শিতা লাভ করছে, কিছু কিছু সাহসের পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু তার বেশী আরও কিছু প্রয়োজন। তি সে সময় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং উপযুক্ত জ্ঞানঅর্জ্জন ক বোমা তৈরীর কথা চিন্তা করেছিলেন। এ বিষ হরিকুমারের ওপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মিত্র মহাশয়ে নির্দ্দেশে উপযুক্ত গোপনীয় স্থান অনুসন্ধানে বেরুতে হ ছিল। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে করে তিনি চক্রধ পুরের কিছু দূরে স্থান নির্ব্বাচন করে মিত্র মহাশয় জানালে তিনি অর্থ সাহায্য করতে থাকেন। কাজও এগিয়েছিল। রাসায়নিক মালমশলা নিয়ে সেখা জমা করা চলছে ; মিত্র মহাশয় বেশ আনন্দ প্রকা

করছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন প্রচুর জঙ্গলের মধ্যে ভদ্রযুবকরা যাতায়াত করছে সেটা কাষ্ঠসংগ্রহকারী স্থানীয় লোকের নজরে পড়ে এবং ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়বার উপক্রম হলে, সেখানকার পাট তুলে দিতে হয়।

মিত্র মহাশয়ের আরও এক পরিকল্পনা ছিল। কোনো দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতদলের মাতব্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করার কথা ভেবেছিলেন। তাঁর মতে কেবল অর্থ লুণ্ঠনের জন্য ডাকাতি হয় বটে, কিন্তু দুঃসাহসিককাজে লিপ্ত হবার নেশা তাদের ঠেলে নিয়ে যায়। মিত্র স্থির করেন এদের কাকে কাকেও ডেকে বলবেন যাতে ডাকাতির নৃশংসতা বাদ দিয়ে যথাসম্ভব উৎপীড়ন ছেড়ে তারা ডাকাতি করতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের মঙ্গলের কথা স্মরণ রাখতে হবে,—অর্থাৎ যা তা ডাকাতি না-করে সরকারী অর্থ লুঠ করতে হবে। লাভের অংশ বেশীর ভাগ তারাই পাবে। হাতিয়ার সংগ্রহ করে তাদের দেওয়া হবে, সঙ্গে থাকবে তাঁর নির্ব্বাচিত ছেলে দুচার জন। এইভাবে ছেলেদের কেবল দুঃসাহসিক মনোভাব গড়ে উঠবে তাই নয়, তারা গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করবার মত কৌশল শিখে নিতে পারবে।

দেশবাসীর বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত ঘরে ডাকাতিতে তাঁর আপত্তি ছিল। এই নিয়ে দলের অত্যুৎসাহী যুবকদের সঙ্গে তাঁকে অনেক বোঝাপড়া করতে হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি এ মতেরও কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে মনে হয়। যখন (হুগলি জেলায়) বিঘাটিগ্রামে ডাকাতি হয় এবং সমিতির ছেলেদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে, এ কথা জানতে পারেন, তখন তিনি বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। বিশস্ত বন্ধু প্রকাশ্য রাজনীতিক্ষেত্রে সহকর্ম্মী অরবিন্দর অন্তরঙ্গ, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ম্মসচিব অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় (স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী)কে তাঁর আনন্দ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন "যাক, ছেলেরা তাহলে একটা সাহসের পরিচয় দিয়েছে।" স্বামিজীকে প্রশ্ন করে জানা গেল যে পি মিত্র শেষেরদিকে বহুলাংশে সন্ত্রাসের পথ সমর্থন করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় এই ডাকাতি সম্প্র্কে তাঁর ২০৯, লোয়ার সার্কুলার রোড বাড়ী খানা-তল্লাসী হয়েছিল।

আলিপুর বোমার মামলা তদানীন্তন বৈপ্লবিক সংস্থাগুলির মধ্যে একটা ছেদ সৃষ্টি করে এ কথা বলা হয়েছে। অনেক সময় নেতৃত্বের বিরোধ প্রধানতঃ দুইদলকে বিভক্ত করে রেখেছিল। মাঝে মাঝে মিলনের চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সফল হয় নি। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যখন বিপ্লবীরা বুঝলে ইংরেজের লিপ্ত হয়ে পড়বার সম্ভাবনা এবং সে সুযোগ গ্রহণ করা উচিত, তখন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিলনের আবার একবার চেষ্টা হয়। বরাবরই একটা চেষ্টা হয়েছে, সে কথা যথাস্থানে বিবৃত করতে হবে।

বাংলায় যে সকল গুপ্তদল গঠিত হয়েছিল, তাদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হবার জন্য নানা ধর্ম্মীয় প্রক্রিয়ার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করতে হ'তো। এটা চিরাচরিত রীতি, যেন আনন্দমঠের সন্তানদের কাল থেকে চলে আসছিল। ঠাকুরবাড়ীতে রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর যে গোপন দল (হাঞ্চু পামু হাফ) গঠন করেন সেখানে টেবিলের দুই পাশে দুই মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিল। মড়ার মাথাটি মৃত ভারতের সাঙ্কেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার এই অর্থ যে মৃত ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এ ব্যাপারে ইহাই মূল কল্পনা।" (প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়: বিপ্লবী যুগের কথা, পৃঃ ২)। শিবনাথ শাস্ত্রীর দল (বিপিনচন্দ্র পাল, কালীশঙ্কর সুকুল, সুন্দরীমোহন দাস, তারাকিশোর চৌধুরী প্রভৃতি) বক্ষঃরক্তে প্রতিজ্ঞাপত্র সিক্ত করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলেন।

অনুশীলন সমিতির নানা প্রতিজ্ঞা ও প্রক্রিয়া ছিল। আদ্য, মধ্য, অন্ত্য ও বিশেষ—এই চার দফা প্রতিজ্ঞা

গ্রহণ করতে হ'তো। নানাস্তরের ভক্তদের জন্ম এই সকল ব্যবস্থা ছিল। "বিশেষ প্রতিজ্ঞা" পর্য্যন্ত খুব কম লোককেই দেওয়া হয়েছে। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হতো কোনো দেবদেবীর সামনে উপস্থিত হয়ে। আদিকাণ্ড হয় কলকাতায় পুলিন দাসের দীক্ষা গ্রহণের সময়। এ বিষয় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁর "জেলে ত্রিশ বছর" পুস্তকে (পৃঃ ১৫) লিখেছেন, "পুলিনবাবু পি, মিত্রের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীক্ষাগ্রহণ প্রণালী এইরূপ ছিল। পূর্ব্বদিন এক বেলা হবিষান্ন ভোজন করিয়া সংযমী হইয়া, পরদিন প্রাতে স্নান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। দেবীর সম্মুখে ধূপ-দীপ, নৈবেদ্য সাজাইয়া, বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া যজ্ঞ করিতে হইত। পরে প্রত্যালীঢ় আসনে বসিয়া (বাঁম হাঁটু গাড়িয়া শিকারোদ্যত সিংহের প্রতীক) মস্তকে গীতা স্থাপন করা হইত। গুরু-শিষ্যের মস্তকে অসি রাখিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন। শিষ্য যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে দুই হাতে প্রতিজ্ঞা-পত্র ধরিয়া পাঠ করিতেন।"

অনুশীলন সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রের মধ্যে চরিত্র শক্তির ওপর বেশ জোর দেওয়া হতো। সঙ্গে ছিল নিয়মানু-বর্ত্তিতা, শৃঙ্খলাপালন আর বিশেষ করে গোপনীয়তা রক্ষা। বিশ্বাসভঙ্গে প্রাণহানি ছিল প্রধান দণ্ড। এ-কথা রিক্রুট (নূতন সভ্য)-দের বিশেষ করে জানিয়ে দেওয়া হ'তো। এই অপরাধের সন্দেহে পূর্ব্ববঙ্গের অনু-শীলন সমিতির অনেক কর্মীকে চিরতরে বিদায় দেওয়া হয়েছে।

যুগান্তর দল সংবিধান প্রভৃতি নিয়ে আবির্ভূত হয় নি; কার্য্যকারণ পরম্পরায় অনুশীলন থেকে একটু তফাৎ হ'য়ে পড়ে। কোনো কোনো সহযোগী দলের মধ্যে শপথগ্রহণের রীতি কিছুটা প্রচলিত থাকলেও মূল যুগান্তর-দলের সভ্যদের বাঁধাবাঁধি কোনো শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান ছিল না। যাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে, স্থানীয় নেতারা তাদের ওপর ক্রমে ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছেন এবং ক্রমে কর্মীরা যোগ্য স্থান পেয়ে কাজের ধারা নিয়ন্ত্রিত করেছে। এদের মধ্যে বিশ্বাস-ঘাতকতার দণ্ড অনুশীলন সমিতির মত অত নির্মম ও ব্যাপক ছিল না; নিহত কর্মীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বলা চলে।

আজ নিঃসঙ্কোচে বলা যায় এই সকল বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানই বাঙ্গলার বিপ্লব কেন সকল দেশের সকল রকম কল্যাণকর, বিশেষতঃ রাজনৈতিক আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট কাজের কর্মী জুটিয়েছে। 'স্বদেশী' আন্দোলন-সংক্রান্ত বিদেশী পণ্য বর্জ্জন, বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়, এ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি শিল্প-প্রদর্শনী জাতীয় শিক্ষা প্রসার প্রচেষ্টা "ভলন্টিয়ার" দল গঠন প্রভৃতি নানা ব্যাপারের ভার এদের ওপর দিয়ে নেতারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতেন। জনপ্রিয় হবার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, তবে সমাজের নানা ক্ষেত্রে সেবাদান মন্ত্র স্বামিজীর নির্দ্দেশমত পালন করা ধর্ম্ম বলে গৃহীত হয়েছে। বিশেষতঃ গ্রামের মধ্যে শক্তিমানের সাহায্যপ্রার্থী এদের দিকে চেয়ে থাকতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ধর্ম্মদল নির্ব্বিশেষে বিপন্নকে উদ্ধার করে, "যোগে যাগে" বহু লোকের সমাবেশে স্বার্থহীন ক্লেশকর সেবাদানে এদের জুড়ি পাওয়া যেত না। ১৯০৮ [২রা ফেব্রুয়ারী] সালে অর্দ্ধোদয় যোগ একটা বিরাট ব্যাপার ঘটেছিল। পুণ্য-লোভী গঙ্গাস্নানার্থীর ভীড় ঘাটে ঘাটে এক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। স্বেচ্ছাসেবকদের কর্ম্মকুশলতা ক্লেশ সহন-শীলতা ও আন্তরিকতা সেবার একটা আদর্শ সৃষ্টি করেছিল। এ সম্বন্ধে [আদি ও অকৃত্রিম] যুগান্তর পত্রিকা ৩রা ফাল্গুন ১৩১৪ [১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৮] লিখেছিল, "বাঙ্গালীর ছেলেরা মান অভিমান লোকলজ্জা বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে যাত্রীগণের সেবা করিতেছে দেখিয়া প্রাণে বড় আনন্দ হ'ল। এমনটি আর দেখি নাই। বাঙ্গলার বক্ষে কত অর্দ্ধোদয় কত সূর্য্যগ্রহণ, কত চন্দ্রগ্রহণ কত বারুণী ভৃতীয়ায় কত মহাষ্টমী চলিয়া গেল, কত লক্ষ

লক্ষ যাত্রী এই মহানগরীর জনকোলাহল বাড়াইয়া চলিয়া গেল, কত নিঃসহায় রমণী, কত পীড়িত যাত্রী কত অনাহারে শিশুসন্তান কত বিপদে পড়িয়াছে, এত দিন ভ্রাতৃস্নেহে, পুত্রস্নেহে, সেই নিঃসহায় যাত্রীকুলকে কেহ ত আর আলিঙ্গন করে নাই। কলেরায়, বসন্তে, কত যাত্রী রাস্তা ঘাটে পড়িয়া বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাইয়াছে, কেহ ত তাহাদের খোঁজখবর নেয় নাই। হাঁসপাতালের নিষ্ঠুর চিকিৎসকেরা পরীক্ষার্থে মড়া পাইবে বলিয়া কত উল্লসিত হইয়া থাকিত। চোর বদমায়েসের পর্ব্ব বসিত। পুলিসের জুলুমের মাত্রা বাড়িত। কিন্তু এ কি একেবারে যুগ পরিবর্ত্তন!" যাত্রীদের আরও নানা অসুবিধা বিপদের কথা বলে পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় বলে চলেছেন, "আজ দেখিলাম শত শত যুবক দিন নাই, রাত নাই, এই লক্ষ লক্ষ বিদেশী যাত্রীগণের সেবা করিয়া আনন্দিত হইতেছে।......কেহ বসিয়া নাই। স্বেচ্ছাসেবক ডাক্তাররা রোগীর ঘরে ঘরে ঔষধ পথ্য লইয়া দিন রাত বসিয়া। কর্ম্মক্লান্ত স্বেচ্ছাসেবকরা বিশ্রাম আশা পরিহার করিয়া মৃত গঙ্গাযাত্রীর তীর্থ রজঃ পূর্ণ পবিত্র দেহ শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। এই দৃশ্য, এই হৃদয়-বিলানো দৃশ্য কত সুন্দর।"

সেবা সহানুভূতি নানাপ্রকার সাহায্য দ্বারা এরা গ্রামের মধ্যে বহু শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিল। কেবল তাদের আদর্শ যে যুবচিত্ত বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল তা নয়, তাদের সঙ্গ পাবার জন্য, তাদের আদেশ পালন করবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করবার একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যেত। ক্রমে ক্রমে, হয়ত অজ্ঞাতসারে গ্রাম্য-নেতাদের সঙ্গে বিপ্লব দলে যোগ দিয়ে বিপদ আপদের অংশভাগী হয়েছে।

ক্রমে বিপ্লবী কেন্দ্রের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক দল গড়ে উঠেছিল। গভর্ণমেন্ট এদের কার্য্যকলাপের ওপর খর দৃষ্টি রাখতে আরম্ভ করে। সরকারী রিপোর্ট (The Administration of Bengal under Sir Andrew Fraser, 1903-8 p. 15-6) এই সকল আখড়া সমিতি ও ক্লাব সম্বন্ধে বলছে, "In these clubs young men and boys went through a course of physical training, drill and discipline and set to work to train themselves in lathi exercise and wrestling. The members of these clubs were called National Volunteers, and the idea seems to have been that they would form a trained body able to resist force with force. and available for purposes of offence and defence." মোট কথা এ সকল ছেলেরা লাঠি খেলা কুস্তি প্রভৃতি চর্চ্চায় লেগে গিয়েছিল এবং মনে হয়েছে প্রয়োজন হলে তারা মারামারি করতে পারবে, শক্তির পরীক্ষা দিতে পারবে।

এদের ভয়ে গভর্ণমেণ্ট ত বিব্রত হলই, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গীরা চীৎকার আরম্ভ করে দিলে যাতে গভর্ণমেণ্ট এদের দমন করে। ইংলিশম্যান পত্রিকায় [১৫ই আগষ্ট ১৯০৭] পূর্ব্ব বঙ্গ থেকে এক পত্রপ্রেরক লিখলেন যে এই ন্যাশনাল ভলন্টিয়ার্সরা পথে পথে 'বন্দে মাতরম্' বলে চীৎকার করে বেড়ায়, পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাবার অজুহাতের বা শক্তির অন্ত এদের নেই, বিশেষ করে অপর পক্ষ যদি শ্বেতচর্ম্মধারী হয়। এদের উপদ্রবে (মফঃস্বল) সহরে রাস্তায় বেরুবার সম্ভাবনা নেই, (কখন কি ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে)। অ-ভারতীয়দের পক্ষে এরা দস্তুরমত উপদ্রবের কারণস্বরূপ হয়ে পড়েছে।

গভর্ণমেণ্ট ছুতো খুঁজছিল। যখন তখন আখড়ায় হানা দেওয়া, সভ্যদের থানায় ডেকে ভীতিপ্রদর্শন আর অভিভাবকদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে। (বেশীর ভাগ আখড়া ঝামেলা এড়াবার জন্যে ভিন্নমূর্ত্তি ধারণ করেছে, অনেকগুলি একেবারে বন্ধ হ'য়ে গেছে আর বিশেষ কয়টি সরকারী হুকুমে বন্ধ হয়ে গেছে)।

বঙ্গ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে আখড়াগুলিতে বৈপ্লবিক যে তোড়জোড় চলতে থাকে তার ফলে গভর্ণমেণ্ট সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল কি ভাবে সমিতিগুলির ধ্বংসসাধন করতে পারবে। অপেক্ষা করে ৫ই জানুয়ারী ১৯০৯

অনুশীলন সমিতি, ঢাকা,

স্বদেশবান্ধব সমিতি, বরিশাল ;

ব্রতী সমিতি, ফরিদপুর ;

সুহৃদ সমিতি, ময়মনসিংহ,

সাধনা সমাজ, ময়মনসিংহ

এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে

সারথি যুবক সমিতি

আকুলা (খুলনা) সমিতি

বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় এবং বাহ্যত এ সকলের বিলোপসাধন ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের প্রস্তুতি আরও গোপনীয়ভাবে চলতে থাকে। সমসাময়িক ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বৈপ্লবিক জাগরণের কিছুটা পরিচয় দেওয়া হ'লো। এ কথা মনে রাখতে হবে তার আগে থেকে যে জাতীয় ভাব গড়ে উঠছিল বাঙ্গলা দেশে মাত্র দুতিন জন, বিশেষ করে অরবিন্দ বিপ্লব ও পূর্ণ স্বাধীনতার ভেরী নিনাদে সকলকে সচকিত ক'রে তুলেছিলেন।
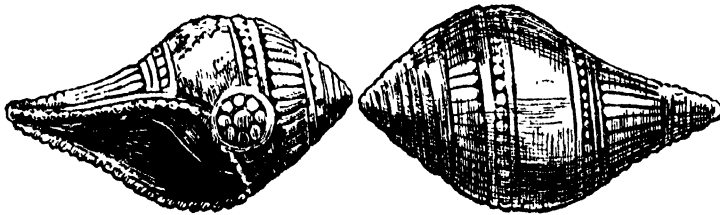
বা ও বাপু

কানাইলাল দত্ত

প্রকৃত প্রস্তাবে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের উচ্চনীচ শিক্ষিত অশিক্ষিত কোটি কোটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে শ্রদ্ধা ও প্রীতির স্বতোৎসারিত সুষমার দ্বারা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী হইয়াছেন মহাত্মা গান্ধীজি ও বাপু; কস্তুরবাঈ হইয়াছেন কস্তুরবা অথবা কেবলমাত্র বা আমাদের দেশে এমন নজীর বিরল। স্মরণকালের মধ্যে আর একটি দম্পতিকে আমরা ভালবাসা ও ভক্তির আবেগে নূতনতর সম্বোধনে পূজা করিয়াছ। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব হইয়াছেন ঠাকুর পরমহংস; মাতা সারদামনি হইয়াছেন শ্রীশ্রীমা। ঠাকুর ও শ্রীমা এবং বাপু ও বা এই দম্পতিদ্বয়ের জগৎ পৃথক। তথাপি ঘটনাটির মধ্যে যে ঐক্য রহিয়াছে তাহার ভিত্তি বোধ হয় এক। গান্ধীজি যদি ধর্ম্মানুযায়ী সাধুসন্তের ন্যায় জীবনযাপন না করিতেন, কস্তুরবা যদি নীরবে গান্ধীজির সাধনা ও কর্ম্মের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য আপনাকে তিল তিল করিয়া নিঃশেষে উৎসর্গ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা জনতার হৃদয়-তন্ত্রীতে এমন সার্ব্বজনীনভাবে আঘাত করিতে সমর্থ হইতেন বলিয়া মনে হয়না।

বা অর্থাৎ মাতা। যুগল জীবনের প্রারম্ভকালে গান্ধীজি স্ত্রীকে কস্তুরবাঈ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শেষের দিকে শুধু মাত্র 'বা' বলিতেন। কস্তুরবাঈও পূর্ব্বে অনেক স্থলে গান্ধীজিকে বুঝাইতে গিয়া 'ছেলেদের বাবা' বলিয়াছেন। পরবর্তীকালে তিনিও বাপু বলিতেন। বাপু মানে পিতা। এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। ইহা সচরাচর ও সহজে ঘটে না।

পোরবন্দরে মোহনদাস আর কস্তুরবাঈয়ের বাড়ী ছিল পাশাপাশি। কস্তুরবাঈয়ের পিতা গোলকদাস মাকানজি ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। মোহনদাস গান্ধীর পিতৃদেবের সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্যবসা না থাকিলেও অর্থাদি একেবারে কম ছিল না। তাহা যদি না হইত তবে তাহার মৃত্যুর পরেও এই পরিবার গান্ধীজিকে বিলাত পাঠাইয়া ব্যারিষ্টার করিয়া আনিবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইত না। সে সময়ের প্রচলিত রীতি অনুসারে খুব অল্প বয়সে ইঁহাদের বিবাহ হয়। উভয়ে সম বয়সী ছিলেন। গান্ধীজি তখন স্কুলের ছাত্র। বিবাহের পূর্ব্বে উভয়ের সঙ্গে পরিচয় ছিল; শিশুকালে তাঁহারা একত্রে খেলাধুলাও করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। দীর্ঘ ৬০ বৎসর ইঁহারা দাম্পত্য-জীবন যাপন করেন। ১৯৪৪ সনে ইংরেজ সরকারের বন্দী অবস্থায় কস্তুর-বা পরলোক গমন করেন। গান্ধীজিও তখন বন্দী। তাঁহার কোলে মাথা রাখিয়া তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ভারতীয় হিন্দু নারীর ইহা অপেক্ষা অধিক কামনীয় কিছু নাই। কস্তুর-বার শেষকৃত্য (২২-২-১৯৪৪) সমাপ্ত করিয়া আসিয়া গান্ধীজি কতকটা স্বগতোক্তির ন্যায় বলেন: বা ছাড়া আমি জীবন কল্পনা করিতে পারি না।... তাঁহার পরলোকগমনের ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইল তাহা পূর্ণ হইবার নহে।...ষাট বৎসর আমরা একত্রে জীবন যাপন করিয়াছি আমার কোলে শুইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ইহা অপেক্ষা সুন্দর আর কি হইতে পারিত!" সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব কোলাহলের কর্ম্মতরঙ্গসঙ্কুল জীবনে দীর্ঘ ৬০ বৎসর কস্তুরবা গান্ধীজির সহিত প্রায় ছায়ার মত ফিরিয়াছেন। বস্তুতঃ বিলাতে ব্যারিষ্টারি পড়া এবং প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকা যাত্রার সময় ভিন্ন তাঁহাদিগকে দীর্ঘ বিচ্ছেদ ভোগ করিতে হয় নাই।

কস্তুরবার মৃত্যুর পর তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়াভেল গান্ধীজিকে একটি শোকবার্তা পাঠান। তাহার উত্তরে তিনি লেখেন—I feel the loss more than I had thought I should…… We were a couple outside the ordinary…We ceased to be two different entities……The result was that she became truly my better, half কস্তুবার মৃত্যুতে যতটা দুঃখ বোধ হইবে গান্ধীজি অনুমান করিয়াছিলেন, বস্তুত: তদ্পেক্ষা বেশি শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। নিজেদের তিনি অসাধারণ দম্পতি বলিয়াছেন এবং তাহার ফলে কস্তুরবা শ্রেষ্ঠ স্ত্রী হন। কস্তুরবা মৃত্যুর পূর্ব্বে বেশ কিছুদিন রোগ ভোগ করেন। রোগশয্যায় গান্ধীজি প্রায় সর্ব্বক্ষণ উপস্থিত থাকিতেন। মৃত্যু যখন অবধারিত মনে হইয়াছিল তখন কলকাতা হইতে বিমানে করিয়া আনা সে সময়কার দুর্মূল্য ঔষধ পেনিসিলিনও তিনি দিতে নিষেধ করেন। তিনি তাঁহাকে শান্তিতে চির-নিদ্রায় নিদ্রিত হইবার সুযোগ দিবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কস্তুরবার প্রতি গান্ধীজির প্রেম কত গভীর তাহা সর্ব্বদা অনুমান করা যায় না। আগা খাঁ প্রাসাদে বন্দী জীবন যাপনকালে যে তুলসী গাছটির সামনে বসিয়া কস্তুরবা নিত্য প্রার্থনা করিতেন, মুক্তি পাইয়া প্রাসাদ ছাড়িয়া আসিবার সময় গান্ধীজি সেটি সঙ্গে করিয়া আনেন। প্রাসাদ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে কস্তুরবা ও মহাদেব দেশাইয়ের শেষ চিহ্ন যেখানে রাখা হইয়াছিল সেখানে প্রার্থনা করেন ও পুষ্পার্ঘ্য দেন। এই তুলসী গাছটি পরে সেবাগ্রামে কস্তুরবার কুটীরের সামনে তিনি নিজহাতে রোপণ করেন।

কস্তুরবা নিরক্ষর মহিলা ছিলেন। তৎকালে ঐ অঞ্চলে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। পরে অবশ্য তিনি গান্ধীজির চেষ্টায় গুজরাটি কিছু কিছু লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন। অনেকবার গান্ধীজি কস্তুরবাকে লেখাপড়া শিখাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, কিন্তু কোনবারই তাহা তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই। বিবাহের পর প্রথম সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে কেহই উৎসাহী হন নাই। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিবার পর গান্ধীজি আর একবার চেষ্টা করিলেন। ব্যারিষ্টারের স্ত্রী লেখা পড়া না জানিলে মান সম্মান থাকে না, সুতরাং গান্ধীজি কস্তুরবাকে লেখাপড়া শিখাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ফলোদয় হইল না। প্রবীণ বয়সে কারাগারেও একবার গান্ধীজি কস্তুরবাকে ভারতবর্ষের ভুগোল শিখাইতে চেষ্টা করেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও কস্তুরবা পাঞ্জাবের নদী-গুলির নাম মনে রাখিতে পারেন নাই। কলিকাতাকে পাঞ্জাবের রাজধানী বলিতে তিনি দ্বিধা করিতেন না দেখিয়া এই প্রচেষ্টা বোধহয় পরিত্যক্ত হয়। কেতাবী বিদ্যা কম থাকিলেও কস্তুরবা একজন যথার্থ শিক্ষিতা নারী ছিলেন। কস্তুরবার লেখপড়ার জ্ঞান কম থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজি তাঁহাকে একদা শিক্ষিকার কার্যে নিযুক্ত করেন। চম্পারণে গ্রামোন্নয়নের কাজে গান্ধীজি ব্যাপৃত হইয়া কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সকল বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষক নিয়োগ করিবার যে নীতি নির্ধারণ করেন তাহা আজিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি ঠিক করেন: "শিক্ষকের লেখাপড়ার বিদ্যা কম থাকে তো থাকুক, কিন্তু চরিত্রবান হওয়া চাই। গান্ধীজির অহ্বানে কস্তুরবা এই স্থলে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিলেন অবন্তিকা বাঈ, আনন্দী বাঈ দুর্গাবেন ও মণিবেন।

তের বৎসর বয়সে গান্ধী ও কস্তুরবার বিবাহ হয়। গান্ধীজি লিখিতেছেন "আমরা উভয়ে এক বয়সের ছিলাম। তথাপি স্বামীর প্রভুত্ব আরম্ভ করিতে আমার বিলম্ব হইল না।" কিন্তু সরল স্বাধীন চিত্ত ও দৃঢ় সংকল্পের কস্তুরবার নিকট এই গান্ধীজির প্রভুত্ব ফলাইবার চেষ্টা তেমনি সার্থক হয় নাই। নানা অশান্তি হইয়াছে, কলহ হইয়াছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া আনন্দের পরিবেশ ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। গান্ধীজি বলিয়াছেন "পত্নীই তাঁহার অদ্ভুত সহ্যশক্তি দ্বারা জয়লাভ করিতেন। এই সহনশীলতার সঙ্গে বিনম্র সেবা ভারতীয় হিন্দুনারীকে বিশেষ গৌরবের অধিকারী করিয়াছে।

আজিকার শিক্ষিতা নারী এই কথায় 'তীব্র

প্রতিবাদ' নিশ্চয়ই করিবেন। তাহাদের উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে গান্ধীজির আর একটি উক্তি নিবেদন করিব—"আজ আমি মোহান্ধ পতি নই [পত্নীর] শিক্ষকও নই। আজ ইচ্ছা করিলে কস্তুরবা আমাকে ধমকাইতে পারেন। আজ আমরা পরীক্ষিত মিত্র।" সহনশীলতা এবং সেবার পথ দিয়াই ধমকাইবার এই অধিকার এবং মিত্র হইবার গুণ অর্জ্জন করিতে হয়। আর কোন পথ আছে বলিয়া জানা যায় নাই।

গান্ধীজির নারী ও সামাজিক অবিচার সম্পর্কিত লেখাগুলি পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ই কস্তুরবার কথা আমাদের মনে পড়ে। ওগুলি লিখিবার সময়ও যে গান্ধীজি কস্তুরবার দ্বারা প্রভাবিত হন নাই তাহা হইতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন বৈষ্ণব কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

'সত্য করি কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি।

এখানেত তেমনি যখন পড়ি গান্ধীজি লিখিতেছেন "পুরুষ সর্ব্বদাই ক্ষমতালিপ্সু।" তখন কি তাহার কস্তুরবার প্রতি অবিচারের কথাটা মনে হইয়াছিল; ইহার উৎসও তিনি খোঁজ করিয়া বাহির করিয়াছেন। বয়স উভয়ের সমান। পরস্পরকে পরস্পরের প্রয়োজন। অথচ একমাত্র পুরুষে কেন কর্তৃত্ব করিবে? গান্ধীজি বলিলেন, সম্পত্তির উপর পুরুষের পূর্ণ অধিকার এই ক্ষমতা দান করে। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই বিভেদ লুপ্ত হইয়া নারী পুরুষ উভয়ের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

গান্ধীজি যখন লেখেন—"আমাদের কৃষ্টিতে যাহা ভাল তাহা রক্ষা করিয়া, তাঁহারা (নারী) আত্মশক্তির বলে সমাজকে সংযত, পবিত্র করিয়া সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবেন। ইহা সীতা দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তীগণের কাজ, বিলাসমগ্না, পৌরুষধর্ম্মী এবং তথাকথিত প্রগতিশীল নারীর নহে।"

(নারী ও সামাজিক অবিচার—অনুবাদ)

এই সকল লিখিবার সময় কস্তুরবার কথা গান্ধীজির নিশ্চয়ই মনে পড়িয়াছিল। নারীর উপর চিরকাল তিনি গভীর আস্থা রাখিতেন। কিন্তু গান্ধীজির আশার স্থল নারীর মূর্তিমতী আদর্শ হইয়া উঠেন। কস্তুরবা অলঙ্কার নারীর সর্ব্বাধিক প্রিয় বস্তু বলিয়া কথিত। একান্ত বালিকা না হোক, কিশোরীবয়সে কস্তুরবা তাহা স্বামীর উচ্চশিক্ষার জন্য দিয়া দিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়ে ভারতীয়েরা গান্ধীজিকে প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ নানাবিধ মূল্যবান উপহার দেন। ইহার মধ্যে কস্তুরবাকে দেওয়া ৫০ গিনির একছড়া সোনার হার ছিল। গান্ধীজির উপহারপ্রাপ্ত সমগ্র সামগ্রী সেখানকার জনহিত কর্ম্মে দান করিয়া আসেন। গোল বাধিল কস্তুরবার হারটি লইয়া। গান্ধীজি জোর করিলেন না। অনেক বুঝাইলেন। শেষে এমনও বলিলেন—"এ হার তোমার সেবার জন্য না আমার সেবার জন্য দিয়াছে?" কস্তুরবা দমিবার পাত্র নন, উত্তর করিলেন আচ্ছা, তাহাই হইল। তোমার সেবা তো আমারও সেবা। আমাকে যে রাতদিন খাটাইয়াছ, যাহাকে ইচ্ছা বাড়িতে রাখিয়াছ। আর আমাকে দিয়া দাসীগিরি করাইয়াছ তাহার কি?" কস্তুরবা অবশ্য শেষ পর্যন্ত গান্ধীজির ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং হারটি ফিরাইয়াই দেন। ইহা কস্তুরবা চরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। ল্যুই ফিশার বলিয়াছেন—

She had rid herself of antitouchable prejudices; was a regnler spinner and a sincere but not uncritical Gandhian.

কস্তুরবা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করিয়াছিলেন, নিয়মিত চরকায় সূতা কাটিতেন। তিনি নিষ্ঠাবতী গান্ধীবাদী হইলেও সমালোচনা করিতে ইতস্তত করিতেন না। কিন্তু প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নীরবে নত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও দ্বিধা করেন। ঐ গুণের জন্য ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কস্তুরবাকে এই ক্ষেত্রে গান্ধীজি অপেক্ষাও বড় বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ইহার একটি ঘটনা এই।

গান্ধী সেবা সংঘের সম্মেলন উপলক্ষে গান্ধীজি সপরিবারে উড়িষ্যায় যান। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের আকর্ষণ খুবই প্রবল। কিন্তু এই

মন্দিরে হরিজনদের প্রবেশ অধিকার নাই জানিয়া গান্ধীজি সেখানে যাইতে অস্বীকার করেন এবং তাঁহার অনুগামীদেরও যাইতে নিষেধ করেন। কস্তুরবা এবং দুর্গাবেন গান্ধীজির নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিয়াই হোক বা না জানিয়াই হোক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজা দেন। এই সংবাদে গান্ধীজি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হন। প্রিয়জনদের পর্যন্ত স্বমতে আনিতে ব্যর্থ হইয়াছেন দেখিয়াই তাঁহার দুঃখ। গান্ধীজির হৃদয়বেদনা অনুভব করিতে কস্তুরবার মুহূর্ত্তমাত্র সময় লাগে নাই। তিনি অকপটে গান্ধীজির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিলেন। এমন সহজ হওয়া মোটেই সহজ কথা নহে।

কস্তুরবার জীবনের উপর দিয়া অনেক বিপর্যয় গিয়াছে। কিন্তু তিনি কখন বিচলিত হন নাই। কি পারিবারিক জীবনে কি তাহার বাহিরে সর্ব্বত্রই তিনি গান্ধীজির মতই ও শান্ত নিরুদ্বেগ এবং নীরব কর্ম্মসাধক। অপরদিকে গান্ধীজির খ্যাতি যত বাড়িয়াছে কস্তুরবার উপর চাপও তত বেশি পড়িয়াছে। গান্ধীজি সারাজীবনে বহুবিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছেন। জীবনযাত্রা সরল করিবার পরীক্ষা, প্রাকৃতিক চিকিৎসার পরীক্ষা, খাদ্য পানীয়ের পরীক্ষা, অনাসক্তির পরীক্ষা ইত্যাদি বহু বিচিত্র পরীক্ষা তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া করিয়াছেন। তাঁহার প্রভূত সদ্বিবেচনা ও সহানুভূতি সত্ত্বেও কস্তুরবাকে অমানুষিক শ্রম করিতে হইয়াছে। শ্রমের কথায় পরে আসিতেছি। প্রথমে গান্ধীজির বিবেচনার একটা গল্প বলি। সবরমতি আশ্রম। একদিন ঠিক দুপুর বেলায় একটি অতিথি আসিয়াছেন। কস্তুরবা সবে হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর একটু বিশ্রাম করিতে গিয়াছেন। কিন্তু অতিথিকে সৎকার করিতে হইবে, কিছু আহার্য চাই। গান্ধীজি পা টিপিয়া টিপিয়া নিজেই রান্নাঘরে আসিলেন। জনৈক সাহায্যকারীকে বলিলেন কস্তুরবার বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটাইয়া একজনের আহার্য সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিলে তিনি তাহাকে পুরস্কৃত করিবেন। এই সদ্বিবেচনা বোধহয় গান্ধীজিরই সাজে।

কস্তুরবার পিতৃদেব ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। বাপের বাড়ী শ্বশুর বাড়ী সর্ব্বত্রই রান্নাঘরটা বাড়ীর গৃহিণীদের হাতে থাকিলেও অন্য কোন কাজ তাহাদের সাধারণতঃ করিতে হইত না। গান্ধীজির আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যে সকল কার্য প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়াছেন তাহার অন্যতম হইল 'শরীর শ্রম' ও অস্বাদ। কস্তুরবাকে যাঁতা ঘুরাইয়া গম পেশাই করিতে দেখি। রান্না-বান্না তো ছিলই। বাসনপত্র মাজা এমন কি পায়খানা প্রস্রাব পরিষ্কার করিতেও হইত। সকল কর্ম্মের শেষ গুরুত্বের ধাক্কাটি গিয়া পড়িত কস্তুরবার উপর। দক্ষিণ আফ্রিকায় (১৮৯৮) একটি মুসলমান কর্ম্মচারীর মূত্রাধার পরিষ্কার করা লইয়া গান্ধীজি কস্তুরবার মধ্যে দারুন কলহ আত্মপ্রকাশ করে। গান্ধীজি বলিলেন—'এমন ঝকমারি আমার বাড়ীতে চলিবে না। কস্তুরবা উত্তর দিলেন: "তবে তোমার ঘর তোমারি থাকুক, আমি চলিয়া যাই।" গান্ধীজি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য প্রকৃতই উদ্যোগী হইলেন দেখিয়া কস্তুরবা শান্ত স্বরে বলিলেন "তোমার তো লজ্জা নাই, আমার আছে। একটু লজ্জিত হও।...আমি মেয়েমানুষ বলিয়া তোমার লাথি খাইয়া থাকিতে হইবে। এখন তোমার লজ্জা হোক। দরজা বন্ধ কর। কেহ দেখে তো কাহারো পক্ষেই তাহা গৌরবের হইবে না।" গান্ধীজির চেতনা ফিরিয়া আসিল। এই রকম আরও কিছু ঘটনা আছে, সে সব বহুবিদিত বলিয়া উল্লেখ করিলাম না।

লজ্জাশীলা সম্ভ্রমময়ী এই মহিয়সী নারী নীরবে তিল তিল করিয়া আপনাকে গান্ধীজির বিকাশের জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন। আশ্রমের বৃহৎ পরিবারের প্রতিটি মানুষকে অসীম স্নেহে ও যত্নে মাতার ন্যায় সর্ব্বদা রক্ষা করিয়াছেন। তাই তিনি সকলের বা, মাতা। গান্ধীপত্নী বলিয়া যে তাহার এ সম্মান ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি গান্ধীজি অপেক্ষা মহত্তর ছিলেন। সূর্যের আলোর দ্যুতিতে চন্দ্রালোক যেমন নিষ্প্রভ হইয়া যায়, তেমনি গান্ধীসূর্যের কিরণে আড়ালে

কস্তুরবা চাঁদখানা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। গান্ধীজির অনশন তাঁহারই মত বিখ্যাত। মেয়াদী অনশন বা আমরণ অনশন—সর্ব্বদাই কস্তুরবাকে দেখি গান্ধীজির পাশে। প্রিয়তম মানুষটি নিজেকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পদতলে সমর্পণ করিতেছেন—কস্তুরবাকে নিরুপায়ভাবে তাহা প্রত্যক্ষ করিতে হইতেছে। এ যে কি অপরিসীম মর্ম্মযাতনা তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। অবিচলিত নিষ্ঠাবতী কস্তুরবা এই সময় সব কিছু শ্রীভগবানের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া যন্ত্রের মত সকল কাজ করিতেন। এমন দিন গিয়াছে ডাক্তাররা প্রতিমুহূর্ত্তে মহাগুরু নিপাত আশঙ্কা করিয়া কাল গুনিতেছেন—সারা দেশ উতরোল কস্তুরবা ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই, চোখের জলে বুক ভাসান নাই। গান্ধীজির পাশে বসিয়া আছেন। নির্দ্দিষ্ট সময় তাহার তুলসী গাছটির সামনে বসিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। অচিন্তনীয় এই ধৈর্য্য।

আবার যখন গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন তখন সেখানে যত খ্যাতিমান প্রিয় লোক থাকুন না লেবুর রসের প্রথম গ্লাসটি গ্রহণ করিয়াছেন কস্তুরবার হাত হইতে। ইহাকেও এক অসাধারণ ঘটনা বলিয়া আমি মনে করি। গান্ধীজি অনৈকা মহিলাকে এক চিঠিতে লেখেন :

But for her (Kasturba' unfailing cooperation I might have been in the abyss···She helped me to keep wide awake and true to my vows. She stood by me in all my political fights and never hesitated to take the plunge······to my mind she was a model of true education.

মমার্থ : সতত কস্তুরবার সহযোগিতা না পাইলে আমাকে অতলে তলাইয়া যাইতে হইত। তিনি আমাকে আমার আদর্শ পালনে অতন্দ্র থাকিতে সাহায্য করেন। সকল রাজনৈতিক সংগ্রামে তিনি আমার পাশে পাশে ছিলেন—আমার নিকট তিনি শিক্ষার একটি যথার্থ আদর্শ। কস্তুরবার প্রতি গান্ধীজি বহুক্ষেত্রে এমন অনেক শ্রদ্ধাশীল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন। বাক্যগুলি পড়িলেই বুঝা যায় প্রীতি ও শ্রদ্ধার রসে সম্পূর্ণরূপে জারিত না হইলে কোন লেখনি হইতে এমন কথা বাহির হইতে পারে না। আর একটি সুন্দরতর কথা পাই লর্ডওয়াভেলের নিকট লিখিত পূর্ব্বোক্ত চিঠিতে।

"She was a woman always of a very strong will, which in our early days I used to mistake for obstinacy. But that strong will enabled her to become, quite unwillingly my teacher in the art and practice of non-violent non cooperation,"

তাহার ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় ছিল। প্রথম বয়সে আমরা ইহাকে একগুঁয়েমী বলিয়া ভুল করিতাম। অজ্ঞাতসারে তাঁহার সেই দৃঢ় ইচ্ছার বলে তিনি আমার অহিংসা অসহযোগের নীতি ও প্রয়োগের বিষয়ে আমার শিক্ষক হইয়া উঠেন।

ভালবাসার গভীরতা ছাড়া দাম্পত্য-জীবনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা সঞ্চার করে বলিয়া মনে হয় না। গান্ধীচিত্তের প্রেম কত অতলস্পর্শী ছিল তাহা বুঝিবা যথার্থভাবে অনুমান করা যায় না। গান্ধীজি নিজে অসুস্থ। হপীং কাসিতে কষ্ট পাইতেছেন, খুবই কষ্ট। নিজের কষ্টের কথা কিছু তেমন না বলিয়া কহিলেন—It reminds me of Ba's last illness, এই কষ্ট আমাকে কস্তুরবার শেষ রোগের কথা মনে করাইয়া দিতেছে। রোগযন্ত্রণার মধ্যে তিনি কস্তুরবাকে স্বপ্ন দেখিতেছেন। I had a dream, I saw her [Kasturbai standing there, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম কস্তুরবা ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন।

কস্তুরবার মৃত্যুরদিনটি গান্ধীজির উপবাসের দিন

ছিল। শিশুদের মধ্যে ফল বিতরণ করিতেন। গান্ধীজি স্বগর্বে বলিতেন—Ba delighted more in feeding than in eating, কস্তুরবা খাওয়া অপেক্ষা খাওয়ানোতেই বেশি আনন্দ পাইতেন। ভারতীয় নারীর হৃদয়ের ধর্ম্ম খাওয়ানো, খাওয়া নহে। তক মাকে আমরা দেখিয়াছি প্রস্তুত খাদ্যের সামান্য একটু তলানি যাহা পড়িয়াআছে তাহার দ্বারাই পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিতেছেন।

তথাকথিত শিক্ষাহীন একটি নারী গান্ধীজির সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়াছেন, বিলাত গিয়াছেন। ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের তো কথাই নাই। দেশ বিদেশের অতিথি অভ্যাগতকে তিনি গান্ধী আশ্রমে আপ্যায়িত করিয়াছেন। ভোজসভায় কস্তুরবা গান্ধীজির পাশেই বসতেন। দেশ বিদেশের অতিথি প্রায়ই সেখানে থাকিতেন। তাহার মধ্যেই কস্তুরবা গান্ধীজিকে হাত পাখা দিয়া ধীরে ধীরে হাওয়া করিতেন। সমগ্র কাজটিকে কস্তুরবা গান্ধী-সেবার অঙ্গ মনে করিতেন। গান্ধীজিও সর্ব্বত্র কস্তুর বাঈ এর সান্নিধ্য কামনা করিতেন। কস্তুরবা অনুপস্থিত থাকিলে বা আসিতে বিলম্ব করিলে গান্ধীজি খোঁজ করিতেন।

গান্ধীজির উপর কস্তুরবার অসামান্য নির্ভরতা ছিল। ডারবানে অসুস্থ কস্তুরবাকে মাংসের জুস্ দিবার জন্য ডাক্তাররা নির্দেশ দেন। ডাক্তাররা এমনও বলেন যে উহা খাইতে না দিলে কস্তুরবার প্রাণরক্ষা সম্ভব নাও হইতে পারে। গান্ধীজি ইহাতে চিন্তিত হইলেন। কিন্তু কস্তুরবা সকল চিন্তা দূর করিয়া পরম নির্ভয়ে বলিলেন: "আমার দ্বারা মাংসের জুস খাওয়া চলিবে না। মানবজন্ম বারেবারে হয় না। তোমার (গান্ধীজি) কোলে আমি মরিয়া যাই ভাল, কিন্তু আমার দেহ যেন অপবিত্র করা না হয়।"

মানবজন্ম বারবার হয় না—এ বিশ্বাস কস্তুরবা কোথা হইতে পাইলেন? গান্ধীজির প্রভাব ছাড়া তাঁহার এ বোধ কি এত সহজে হইত!

এই সময় এক স্বামীজি কোথা হইতে আসিয়া কস্তুরবাকে মাংসের জুস খাইবার প্রয়োজনীয়তা এবং ঔচিত্য সম্পর্কে জ্ঞান দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিরক্ত হইয়া কস্তুরবা যে জবাবটি দিয়াছিলেন গান্ধী ও কস্তুরবাকে বুঝিবার পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয়। জবাবটি হইল:" "স্বামীজি আপনি যাহাই বলুন, আমার মাংস খাইয়া ভাল হওয়ার দরকার নাই। আপনার পায়ে পড়ি আমার মাথা ঘরাইয়া (বক বক করিয়া) দিবেন না। আর যদি কথা বলিতে হয়, তবে ছেলেদের বাপের সহিত পরে বলিবেন।" গান্ধীজির বিচারের উপর সব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এমন নির্ভরতা সুলভ নহে।

গান্ধীজি কস্তুরবা সম্পর্কে এমন শত সহস্র কথা ও কাহিনী বিবৃত করা যায়। আজ আর একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করিয়া এ তর্পণ শেষ করিব। গান্ধীজি চিকিৎসা-বিশেষতঃ প্রাকৃতিক চিকিৎসা করিতে বড় ভালবাসিতেন। একবার কস্তুরবাঈয়ের কঠিন পীড়ায় গান্ধীজি তাঁহার ভাল চিকিৎসার বিদ্যা প্রয়োগ করিতে থাকেন। কোন ফলোদয় হইতেছে না দেখিয়া তিনি কস্তুরবা-কে নুন এবং ডাল খাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু কস্তুরবা বলিলেন ডাল ও নুন ছাড়িয়া বাঁচিব কি করিয়া। গান্ধীজি অমনি বই আনিয়া তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন মানবদেহের জন্য নুনের কোন প্রয়োজন নাই, দুর্বল শরীরে ডাল খাইতে নাই। কস্তুরবা উহা শুনিতে চাইলেন না। আলোচনার মধ্যে তিনি বলিয়া ফেলিলেন— "তোমাকে (গান্ধীজি) যদি কেহ নুন ও ডাল ছাড়িতে বলে তবে তুমিও ছাড়িবে না।" গান্ধীজি সেই মুহূর্ত্ত হইতে নুন ও ডাল খাওয়া এক বৎসরের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কস্তুরবা সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন; তাঁহার অনুশোচনা হইল: তিনি বলিলেন:

"আমাকে মার্জনা কর, তোমার স্বভাব জানিয়াও কেন আমি এমন কথা বলিতে গেলাম!" অনুনয় ও মিনতি সত্ত্বেও গান্ধীজি প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন না। কস্তুরবা রুগ্না, গান্ধীজিকে টলাইতে পারিলেন না।

সুস্থ থাকিলেও গান্ধীজির প্রতিজ্ঞার ইতরবিশেষ হইত না। চোখের জলের সহিত গভীর দীর্ঘশ্বাস মিশিয়া কস্তুরবার কণ্ঠ হইতে গান্ধী চরিত্রের সার কথাটি উচ্চারিত হইল: "তুমি বড় জেদী, কাহারো কথা শোন না।"—সত্যিই কস্তুরবা যথার্থই চিনিয়াছিলেন একলা চলার মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবর্ষের নিঃসঙ্গ পথিক গান্ধীজিকে।

গান্ধী মহাজীবনের অনেক ভাষ্য রচিত হইবে, কস্তুরবারও কথা বহুজনে কীর্তন করিবেন, কিন্তু গান্ধী কথায় কস্তুরবা ও বা'র চোখে গান্ধীকে দেখা এই দেবদুর্লভ চরিত্র দুইটিকে যথার্থভাবে জানিবার বুঝিবার এবং এমন কি উপলব্ধি করিবার পক্ষে অপরিহার্য।

স্মৃতির টুকরো

(২য় পর্ব্ব)

সাতকড়িপতি রায়

১৯৪৭ সাল থেকে কংগ্রেসের মধ্যে ঝগড়ার বিরাম নাই। তাই আমার মনে হয় নেহেরুজী ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রের ভ্রান্ত পথ গ্রহণ করে তাঁর ১৭ বৎসরের কর্ত্তৃত্বে ভারতের যে মহান্ ক্ষতি করেছেন, ইংরাজ ১৫০।২০০ বৎসরে তাহা করিতে পারে নাই।

নেহেরুজী এক পঞ্চশীলের মোহে পড়িয়া দেশের রকারকে যে ভ্রান্তপথে চালাইয়া গিয়াছেন যাহাতে রাধীনতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। অন্য কোনও স্বাধীন দেশে এরূপ কেহ করিলে তার বিচার হইয়া শাস্তি হইত। কিন্তু ভারতবাসী হাজার বৎসরের পরাধীনতায় দেশের কিসে সত্যকার মঙ্গল হবে সে চিন্তা করবারও শক্তি হারাইয়াছে, তাই নেহেরুজী আজিও দেশের শ্রেষ্ঠ নেতার স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বি,পি,সি,সি,র সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, আপনারা কংগ্রেসকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। দেশের সাধারণ অধিবাসীর সহিত কংগ্রেসের আর ত কোনও সম্পর্ক নাই। কেবল নির্ব্বাচন-পর্ব্বের সময় ভোট দেওয়াইবার সময় কংগ্রেসের পয়সা দিয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ভোটের কথা বলিতে যায়। তিনি বলিলেন, বেশ ত কাজ করিবার জন্য আপনি গ্রামে গ্রামে লোক নিযুক্ত করুন, আমি তাদের মাসহারা দেবো। কিন্তু

বললাম, ঐরূপ ভাড়া করা লোকের কথা গ্রামবাসী শুনবে কেন? বলবে এরা কংগ্রেসের দালাল। তিনি বললেন, সাতকড়িবাবু, এটা পাউণ্ড শিলিংএর দিন, বিনা পয়সায় কে কাজ করবে। আমি বললাম গ্রামে এখনও ত্যাগী সেবক পাওয়া যাবে। কিন্তু তারা এই অর্থলোভী প্রতিষ্ঠা-লোভী নেতাদের অধীনে কাজ করবে কেন? তারা চায় দেশবন্ধুর মত সুভাষের মত সর্ব্বত্যাগী নেতা। তারা দেখতে চায় তাদের সামনে ত্যাগের আদর্শ, সেবার আদর্শ, এই কথা বলে চলে আসি। কিন্তু কোনও ফলোদয় হয় নাই।

৬

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হইলে একদিন হঠাৎ মেদিনীপুর জেলার পরিণত বয়সের যুবকগণ যাহারা ইংরাজের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ করিয়াছে, কখনও অহিংস অসহযোগ করে, কখনও রিভলবার নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট নিধন করে, যারা মেদিনীপুর থেকে ইংরাজ কর্ত্তৃক একদিন নির্ব্বাসিত হয়েছিল, সব আমার নিকট আসিয়া হাজির হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাদের উদ্দেশ্য কি? তাহারা বলিল স্বাধীনতার যুদ্ধে তারা বাংলায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু আজ তাদের দেশের শাসন কার্য্যে স্থান নাই। আজ কংগ্রেসের ভিতর যত সুবিধাবাদীর দল দেশ শাসন করিবে? প্রফুল্ল ঘোষের দল অভয় আশ্রম করে খাদি তৈরী করে মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় হয়ে পূর্ব্ববঙ্গে না থেকে এখানে কর্ত্তৃত্ব করবে? আপনি নেতা হয়ে দাঁড়ান, আমরা একটা রাজনৈতিক দল গঠন করব। তার নাম হবে মেদনীপুর সম্মিলনী। তাহাদের আমি বুঝাইলাম বরাবর ত্যাগের আগুন জালিয়ে তোমরা কাজ করেছ, আজ শাসনক্ষমতা গ্রহণ করবার জন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ইলেক্‌সানে নামবে? আমি তাতে নেই। যদি সত্যি দেশের সেবা করতে চাও, মেদিনীপুর সম্মিলনী কর মেদিনীপুরবাসীর সেবার জন্য। যদি এই প্রতিষ্ঠান সেবা-প্রতিষ্ঠান হয়, তাহলে আমি এই ৬৭।৬৮ বৎসর বয়সেও তোমাদের পুরোভাগে দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছি। তাহারা রাজী হইল। মেদিনীপুর সম্মিলনী গঠিত হইল। প্রথম ৬।৭ বৎসর এই সম্মিলনী মেদিনীপুরবাসীর যেভাবে সেবা করিয়াছে, তাহাতে শাসন কর্ত্তারাও আশ্চর্য্য হইয়াছেন। বন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া যে কোনও ব্যক্তি অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, সম্মিলনীর নজরে আসিলেই তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। রোগীর চিকিৎসা, বেকারের কাজ যোগাড় করা, কলেজে ছেলেদের ভর্ত্তি করা এবং তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা, এইরূপ মেদিনীপুরবাসীগণের বহু জনহিতকর কার্য্য এই প্রতিষ্ঠান করিয়াছে। যখন মেদনীপুরের একাংশ উড়িষ্যায় বালেশ্বর জিলায় সামিল করিবার চেষ্টা হইয়াছে, মেদিনীপুর সম্মিলনী তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছে। এই সম্মিলনী যখন বেশ ফলপ্রসূ হইল, যুবকগণ বুঝিল ইহাকে সেবা প্রতিষ্ঠানে-প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারা দেশের সেবা করিবার বহু সুযোগ পাইয়াছে, তখন ইহাকে ১৮৬০ সালের ২১ নং আইনে রেজেষ্ট্রী করিল এবং আমাকে আজীবন ইহার সভাপতি করিয়াছিল।

তাহা হইলে কি হয়, যেমন প্রকৃতির নিয়মে সমস্ত বিষয়ের উত্থান ও পতন আছে, এই মেদিনীপুর সম্মিলনীরও সে গতি হইয়াছে। ১৯৫৩ ও ১৯৫৮ সালের দুইটী নির্ব্বাচনের লোভ হইতে সকলকে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছি; কিন্তু ঐ সব যুবক পরে প্রৌঢ় হইয়াছে, আজীবন সেবা করিয়া প্রৌঢ় বয়সে কর্ত্তৃত্বের অভিলাষ জাগিয়াছে। সুতরাং নির্ব্বাচনের দিকে ঝুঁকিয়াছে। তাহাতেই এই সম্মিলনী আর অগ্রসর হয় নাই। সম্মিলনী আজও বর্ত্তমান আছে। বৎসরে একবার মিলনও হয়। কিন্তু সে সেবা আর হয় না। বহু খ্যাতনামা মেদিনীপুরের কলিকাতা অধিবাসী ইহার সদস্য। চেষ্টা করিলে নূতন যুবকের দল দিয়া ইহার সেবাকার্য্য হয়ত করাইতে পারা যায়। কিন্তু ইহার কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সে মানসিক অবস্থা আর নাই। দেশেরও যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক মানুষের অন্নচিন্তাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

৭

স্বাধীনোত্তর সময়ের সব থেকে মর্ম্মান্তিক ঘটনা মহাত্মা গান্ধীর আততায়ীর হাতে জীবনাবসান। ইহা যেমন মর্ম্মান্তিক তেমনি আকস্মিক। ভারতবিভাগে তিনি মুহ্যমান হইয়াছিলেন। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতের মধ্যে একদল লোক অন্ধভাবে বিশ্বাস করতেন গান্ধিজী মুসমানকে হিন্দুর চেয়ে বেশী আপনজন মনে করেন। তাই এই বিভাগের পরেও পাকিস্থানকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেওয়ালেন, নইলে সত্যাগ্রহ করবেন। অর্থাৎ অনশনের ভয় দেখিয়ে। তাঁদেরই বোধ হয় মনে হ'ল উনি আর বেশীদিন বেঁচে থাকলে হিন্দুর বা ভারতের যে অংশ পাকিস্থান হ'লনা সেই অংশের আরও ক্ষতি হবে, অতএব তাঁকে সরিয়ে দাও। এইদেশ-বিভাগে আমিও খুবই মর্ম্মাহত হয়েছিলাম, বিশেষ যখন মহাত্মাজী সেটা মেনে নিলেন। কিন্তু ভাবতেও পারিনি ঐরূপ নেতাকে কেউ গুলি করে হত্যা করতে পারে। কিন্তু তাও সম্ভব হ'ল। এই নিকৃষ্ট বৃত্তি যে সকল মানুষের মনকে কলুষিত করে, তাদের কি বলব জানি না। ভারতের যে শাশ্বতঃ ধর্ম্ম বা সংস্কৃতি ছিল, তার মধ্যে গুপ্ত হত্যার স্থান ছিল বলিয়া মনে হয় না। গুপ্ত-হত্যা ভারতের পাঠান ও মোগলরাই নিয়ে আসে। ওটা কি আরবীয় সংস্কৃতির অঙ্গ? কারণ পাঠান ও মোগল যখন ভারতে আসে তখন তারা পূর্ণ মুসলিম্ ধর্ম্মাবলম্বী অর্থাৎ আরবীয় সংস্কৃতি ভাবাপন্ন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পাঠান ও মোগল বাদসাদের হারেমে অনবরত গুপ্ত হত্যা চলত। যাহাই হউক, এই গুপ্ত-হত্যার প্রবৃত্তি বাংলার বিপ্লবী দলও ইংরাজের বিরুদ্ধে গ্রহণ করিয়াছিল। মানুষ যখন উত্তেজিত হয় তখন সদাসদ্ চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় না। তাই ক্ষুদিরাম কিংসফোর্ড বিবেচনা করিয়া দুইটি ইংরাজ মহিলাকে বোমার আঘাতে হত্যা করে আর একজন বিপ্লবী টেগার্ড বিবেচনায় আর একজন নিরীহ ইংরাজকে হত্যা করে। এ ঘটনাগুলি ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের ইতিহাসে কলঙ্ক বলিয়া আমি মনে করি। ইহা ছাড়া আসল মানুষকে গুপ্ত হত্যা করাও কম হয় নাই। মেদিনীপুরে, ত্রিপুরায়, ময়মনসিংএ, দার্জ্জিলিংএ, কলিকাতায় এবং আরও অন্যান্য স্থানে গুপ্ত হত্যা ও হত্যার চেষ্টা হইয়াছে। এমন কি গভর্ণর ও ভাইসরয়ও বাদ যায় নাই। ভীতিপ্রদর্শনই এই সকল হত্যার উদ্দেশ্য। কিন্তু সে ত ছিল দেশকে স্বাধীন করবার অন্য হত্যা। আর মহাত্মাকে গুলি করে হত্যা, ইহা বিকৃত মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিসের দ্বারা সম্ভব? হত্যাকারী ধরাও পড়েছিল এবং ফাঁসও হয়েছে। কিন্তু যে অমূল্য জীবন হত্যা করে নষ্ট করল, তাকি আর কখনও ফিরে আসবে? আর গদীআসীন নেহেরু প্যাটেল এই জীবন-রক্ষার কোন ব্যবস্থা করে নাই। তাঁরা কিইবা করিতে পারিতেন? বড় জোর প্লেন ড্রেসে পুলিশ রাখতে পারিতেন বা গোয়েন্দা পুলিশ দ্বারা পূর্ব্বাহ্ন জানিতে পারলে সাবধান করিতে পারিতেন। ভারতের দুর্ভাগ্য যে, এরূপ পাগলও এদেশে জন্মিয়াছিল। এখন ভাবি তিনি বাঁচিয়া থাকিলে নেহেরু প্যাটেলকে কি এইরূপ কেন্দ্রীভূত শাসনযন্ত্র করিতে দিতেন? না পরানুকরণ বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেশের এই দুর্দ্দশা আনিতে দিতেন?

বিধাতার অমোঘ নিয়মে যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতেছে। আমরা ভারতবাসী পরাধীনতার যে দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াছি, স্বাধীন হইয়া তাহার কোনও লাঘব হয় নাই। বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা কি নেতৃত্বের অপরিণামদর্শিতার ফল নহে? আর সে নেতৃত্ব এক নাগাড়ে করিয়াছেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। যদি পণ্ডিতজী পরানুকরণ পরিত্যাগ করতঃ ভারতের ঐতিহ্যের দিকে তাকাইতেন, ইহার আধ্যাত্মিকতা, ইহার সংস্কৃতি, ইহার মুনিঋষিদের দূরদর্শিতা, ইহার সমাজের গঠন-প্রণালী, তাহার উপকারিতা অনুধাবন করিতেন, তবে

আজ ভারতবর্ষ গড়িয়া উঠিত। কেহ ঠেকাইতে পারিতনা। তাঁহার পার্শ্বচরগণও আজও তাঁহার বুলি কপচাইতেছে। আর পরস্পর ঝগড়া করিতেছে। দেশের সেবা এখন মাথায় উঠিয়াছে।

৮

১৯৫৪ সাল। অন্ধ্রদেশের এক ব্যক্তি মাদ্রাজ হইতে অন্ধ্রকে পৃথক করিবার জন্য অনশন করিয়া মৃত্যুবরণ করিল আর তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অরাজকতা আসিল। নেহেরু সাহেবের টনক নড়িল, অন্ধ্রদেশ কেবল পৃথক হইল না, একটি কমিটি বসিল ভাষার ভিত্তিতে দেশ ভাগ করিবার জন্য। ইহার কথা বলিবার পূর্ব্বে একটু পুরাতন ইতিহাস বলিতে চাহি। ১৯২৯ সালে যখন নূতন ভাবে কংগ্রেস গঠিত হইল, তখন কংগ্রেস প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে হইয়াছিল। বাংলার কথাই বলি। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা আসাম প্রদেশের অন্তর্গত হইয়া ইংরাজ শাসনাধীনে ছিল। সিংভূম, মানভূমজেলা বিহার প্রদেশের অন্তর্গত হইয়া ইংরাজ শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু এই জেলাগুলি বাঙালীঅধ্যুষিত বলিয়া ১৯২৯ সালের বাংলা কংগ্রেস প্রদেশের অন্তঃর্গত হইয়াছিল। যখন ১৯১১ সালে কার্জ্জন সাহেবের বাংলা বিভাগ রদ হইয়া এক হইল, তখনই ইংরাজ চাতুরী করিয়া বাংলার হিন্দুর সংখ্যা কম করিবার জন্য গোয়ালপাড়া, শ্রীহট্ট ও কাছাড় আসাম এবং মানভূম ও সিংভূম বিহারে রাখিয়াছিল। তখনকার কংগ্রেস স্বীকার করিয়াছিল দেশ স্বাধীন হইলে ঐ সব প্রদেশ বাংলার অন্তঃর্গত হইবে। তাই ১৯২১ সালের বাংলা কংগ্রেস প্রদেশের ঐ জেলাগুলি অন্তঃর্গত হইয়াছিল। আর তখনই মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরল প্রভৃতি পৃথক পৃথক কংগ্রেস প্রদেশ হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ ছাড়িয়া যাইবার পর কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ শাসনদণ্ড হাতে পাইয়া তাহা ভুলিয়াছিলেন। অন্ধ্রপ্রদেশের অনশন মৃত্যু তাহা মনে করাইয়া দিল, তাই ঐ কমিটির উদ্ভব।

পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাদের দাবী পেশ করিয়াছিল। পাইকপাড়ার জমিদার বংশের শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ তখন কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষগণের একজন। তিনি শিক্ষিত এবং জমিদারবংশের হইলেও খুবই হৃদ্যতা-পূর্ণ ব্যক্তি। তিনি কংগ্রেসের memorandum এর খসড়া করেন। তাইতে তিনি সিংভূম, মানভূম সাঁওতাল-পরগণার খানিকটা পূর্ণিয়াজেলার খানিকটা, গোয়ালপাড়া ও কাছাড়জেলা দাবী করিয়া যে সকল অকাট্য প্রমাণ দিয়েছিলেন তাহা বিবেচিত হইলে ঐ সমস্ত বাঙালীদ্বারা অধ্যুষিত স্থান পশ্চিম বাংলার অন্তঃর্গত না হইয়া যায় না। সেই সময় শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মহাশয় আমার নিকট আসিয়া প্রস্তাব করেন যে, পশ্চিম বাংলাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবার জন্য এই সময় সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আমি তাঁর যুক্তি অনুমোদন করি। তখন আমাকে সভাপতি ও জ্ঞানাঞ্জনকে সম্পাদক করে একটি কমিটি গঠিত হয়। তার নাম প্রথম পশ্চিম বঙ্গ পুনর্গঠন পরিষদ হয়। কিন্তু তাহাতে রাজনৈতিক দলের সভ্যগণও আসায় তাহার নাম কিছু পরিবর্ত্তনকরতঃ পশ্চিম বঙ্গ পুনর্গঠন সংযুক্ত পরিষদ নাম হয়। তাহাতে কংগ্রেসের হিন্দুমহাসভার, আর সি পি আইএর সৌম্যেন্দ্র ঠাকুর জনসংঘের দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি যোগদান করেন। কিন্তু অধিকাংশ সভ্য কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত ছিলেন না। যেমন আশুতোষ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল খগেন সেন ইত্যাদি। বিপ্লবীদলেরও অনেকে ছিলেন। উত্তর-পাড়ার অমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যোগ দিয়েছিলেন। ইহার আপিস প্রথম জ্ঞানাঞ্জনের রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে কর্মীদের একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল সেইখানে। পরে তাহা শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী ব্যবসাদার তাঁর আপিসে। এই প্রতিষ্ঠান থেকেও একটি খুব যুক্তিপূর্ণ মেমোর‍্যাণ্ডাম্

দেওয়া হয়। কিন্তু পরে বুঝিতে পারিলাম ঐ যে ভাষা ভিত্তিতে প্রদেশ নির্ণয়ের কমিটি হইয়াছিল, ওটা কিছুই নয়। ওর মেম্বারগণ সব নেহেরু সাহেবের তাঁবেদার। তিনিই শেষ মালিক।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে কলিকাতায় ৪৫টি বাঙালী বা বাংলা ভাষাভাষীদের সম্মেলন করা হয়। তাহাতে সিংভূম, মানভূম, পুর্নিয়া, সাঁওতালপরগণা, গোয়ালপাড়া, কাছাড় ও ত্রিপুরা থেকে সমস্ত প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণকে ঐ সমস্ত সম্মিলনের সভাপতি করা হয়। সমস্ত সম্মিলনেই আমাদের মেমোরেণ্ডাম্ গৃহীত হয়। শেষ মানভূম থেকে লোকসেবক সংঘের সভাপতি শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে একহাজার প্রতিনিধির একদল পদব্রজে কলিকাতা আসিয়া কারাবরণ করেন। সিংভূম থেকেও প্রায় ৩০০ দলের এক প্রতিনিধি আসেন। আর সব প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হইল। কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্য বাংলার অংশ বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত হইল না। কেবল মানভূমের পুরুলিয়া লইয়া সদর মহকুমাটি আসিল এবং পূর্ণিয়া জেলার সামান্য অংশ। তা থেকেও দয়ার্দ্র ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় জামসেদ-পুরের টাটার সুবিধার জন্য খানিকটা ছেড়ে দিলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে যখনই এই সব কথা বলিয়াছি, বাঙালী অধ্যুষিত অংশ পশ্চিম বাংলায় আনার জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছি, তখনই তিনি বলিয়াছেন ইহা প্রাদেশিকতা। আমি কেবল ভাবিয়াছি এইসব শিক্ষিত পুরুষের চিন্তার ধারা এমন বিকৃত কেন? ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠিত হইতেছে এবং প্রদেশের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য ইহা অপরিহার্য্য। সুতরাং যে সকল স্থান বাঙালী অধ্যুষিত, কিন্তু ইংরাজ কৌশলে তাহাদের অন্য প্রদেশভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহা পশ্চিম বাংলার মধ্যে আনিবার চেষ্টা প্রাদেশিকতা আখ্যা দিতে এইসব শিক্ষিতব্যক্তি দ্বিধা করেন নি। ঐ কমিটি যে রিপোর্ট দিলেন তাতে অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ ভাষার ভিত্তিতে হইয়া গেল। কেবল সিংভূম জেলায়, মানভূমের ধানবাদ অঞ্চল, সাঁওতাল পরগণায় বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চলের দুর্ভাগা বাঙালীরা বিহারে রহিয়া গেল এবং গোয়ালপাড়া ও কাছাড় জেলার অভাগা বাঙালীরা আসামে রয়ে গেল আর মহারাষ্ট্রের মারহাট্টাগণকে গুজরাটের ভাটিয়াদের সঙ্গে একত্রে রাখা হইল। কেন? নেহেরুজীর খেয়াল ছাড়া কিছুই নয়।

যখন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি শেষ নির্দ্দেশ দিবে এবং সেটা নেহেরুজীর সরকার গ্রহণ করবে বলে জানলাম। তখন ঐ পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সমিতির তরফ থেকে আমি এক ডেপুটেশন্ নিয়ে দিল্লী গেলাম। সেখানে আবুলকালাম আজাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। নেহেরুজী ও ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কাজের অজুহাতে সময় নাই বলে সাক্ষাৎ করলেন না। কংগ্রেস সভাপতি ধেবরজী যিনি হরিজন কলোনীতে থাকতেন, দেখা করলেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। আমরা ফিরে এলাম। বুঝলাম কিছু হবে না। ডাক্তার রায়কে বললাম, আপনাদের কংগ্রেস ত এই সবই দাবি করেছিল, তবে আপনি ওয়ার্কিং কমিটিতে গিয়ে দাবি করুন না। তিনি বললেন ওরা কিছুই দেবে না। আমি দাবি করে কি করব। তখন আমি বলেছিলাম ডাক্তারবাবু, আপনি যদি সত্যই ইহা চাইতেন, তাহলে নেহেরুজী না দিয়ে পারতেন না। আপনি যদি বলতেন হয় এই বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল পশ্চিম বাংলাকে দাও, যেমন তাকে ভাগ করে দুইএর তিন অংশ বাঙালীকে পাকিস্থানী করেছ। যদি এই ন্যায্য অংশ না দাও তবে আমরা গভর্ণমেণ্ট ছেড়ে দিচ্ছি, তোমরা প্রেসিডেণ্ট রুল চালিয়ে বাংলা শাসন কর। দেখতেন নেহেরুজী কেঁচো হ'য়ে দিতে বাধ্য হত। ডাক্তার রায় বলিলেন, আমি ওসব পারবো না। বুঝিলাম ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার বলিয়া যে প্রতিষ্ঠা তাঁহার হইয়াছে, তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট নন, একজন প্রধান শাসন কর্ত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠা চাহেন। হায়, মানুষের আকাঙ্খার শেষ নাই। ইহা পরে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলাম তাহা পরে বলিতেছি। সুতরাং নেহেরু সাহেবের খেয়াল অনুসারে কাজ হইল। আজ বিহারের

দুর্ভাগা বাঙালীকে বাংলা ভুলিয়া হিন্দী শিখিয়া, হিন্দুস্থানী হইতে হইয়াছে আর কাছাড় গোয়ালপাড়ার বাঙালীকে দুইবার খেদাইয়া দিবার অমানুষিক অত্যাচার সহিতে হইয়াছে, এবার অসমিয়া ভাষা শিখিয়া অসমিয়া হইতে হইবে। বাঙালীত্ব ঘুচিয়া যাইবে।

ইহার পর সামান্য দিন বাদে নেহরুজী ডাক্তার রায় ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীকৃষ্ণ সিংহের এক joint statement বাহির হল। পশ্চিম বাংলা বিহারের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি প্রদেশ হইবে। আমরা আশ্চর্য্য না হইয়া পারি নাই। ডাক্তার রায় দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। শুনিলাম শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায় একজন বাংলার মন্ত্রী বিধানবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তাহলে তাঁদের মন্ত্রীত্ব চলে যাচ্ছে কি? ডাক্তার রায় তাঁদের অভয় দিয়ে বলেছিলেন তিনিই কর্ত্তা হবেন তাঁদের ভয় কি? আমাদের পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন সমিতির সভায় স্থির হ'ল যে, একটি ডেপুটেশন নিয়ে আমাকে ডাক্তার রায়ের সঙ্গে দেখা করে আলোচনা করতে হবে। ডেপুটেশনে কে কে ছিলেন ঠিক মনে নাই। শ্রীনিহারেন্দু দত্ত মজুমদার, শ্রীখগেন সেন, শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী, সম্ভব শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, আর নাম মনে পড়ছেনা। ডাক্তার রায়ের সঙ্গে সময় ঠিক করে রাইটার্স বিল্ডিংএ গেলাম।

আমিই কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলাম। প্রথম জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নেহরুজী ও শ্রীকৃষ্ণজীর সহিত আপনার যে অভিপ্রায় কাগজে ছাপিয়েছে উহা কি সত্য? তিনি বললেন, হাঁ সত্য। আমিই জেদ করিয়া বিহারের সহিত মিলিতে চাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কেন চান্? বলিলেন, বাঙালী যুবকগণ অনেক কাজ পাইবে। সিংভূম, মানভূম জেলায়, সাঁওতাল পরগণায় বহু খনি আছে বলিয়াই ত উহা আমাদের দিল না। কিন্তু বিহারের সঙ্গে মিশে গেলে ও সবই আমাদের হয়ে যাবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বিহারীরা কি এত উদার যে আমাদের দেশটাকে তাদের সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তাদের দেশটায় আমাদের সব অধিকার দিবে? ডাক্তার রায় বলিলেন কেন দিবে না? তখন ত আমরা সবাই এক প্রদেশের অধিবাসী হইব। আমি বলিলাম ভারতের constitution অনুযায়ী আমরা ত সকলেই ভারতের অধিবাসী, দৃশ্যত এখনও ত আমাদের বিহারে বিহারীদের ন্যায় সব অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখা যাচ্ছে? আমাদের যে সকল বাঙালী অধ্যুষিত স্থান কলমের এক খোঁচায় বিহারের অন্তঃর্গত হয়ে গেল সেখানকার বাঙালীরাই কি বিহারীদের মত সব সুবিধা পাচ্ছে? তারা কি কোন্ ঠাসা হয়ে যায়নি? আপনিই বলুন না? তখন বললেন, শ্রীকৃষ্ণ সিং এখন বিহারের কর্ত্তা বলে এটা হচ্ছে। দুইটা রাজ্য এক হলে আমি কর্ত্তা হব, আমার কাছে কোন পক্ষপাতিত্ব হবেনা। আমি একটু আশ্চর্য্য হলাম। আমি বললাম বিহারে প্রায় ৩১৫ সিটে ৩১৫ জন বিহারী MLA হবে। আর বাংলায় ২৫৮টা সিটে ২৫৮ জন বাঙালী MLA হবে। এর মধ্যে অন্য রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে কংগ্রেস MLA-রাই ত নেতা ঠিক করবে। তাহলে কি বাঙালী কংগ্রেস MLA এর সংখ্যা বিহারী কংগ্রেস MLAএর সংখ্যা থেকে বেশী হবে আশা করেন? তিনি বললেন, না, না, সে আশা করবো কেন? তবে আমি থাকতে কোনও বিহারী কি আমাকে দলের নেতা না করে শ্রীকৃষ্ণ সিংকে করবে? তা করবে না। আমি ডাক্তার রায়ের এ গর্ব্বিত উক্তি দেখে আশ্চর্য্য হলাম। বুঝলাম তিনি তাঁর কর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা চাহেন বল্‌লাম ধরে নিলাম আপনি নিশ্চয় নেতা হবেন। কিন্তু স্যার আপনি ত চিরস্থায়ী নন। তখন বাংলার কি অবস্থা হবে? বলতে যাচ্ছিলাম, আপনার জীবনান্ত কালই হতে পারে। কিন্তু সেটা মুখ থেকে বেরুল না। ডাক্তার রায় আমাকে ডিওডনেল আল্‌সার থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তখন কি হবে তা আমি কেমন করে বলব? আমি বললাম, এটা কি নেতার উপযুক্ত কথা হল স্যার? ভবিষ্যৎ বিবেচনা করবেন না? আপনি এ সংকল্প পরিত্যাগ করুন। তিনি বললেন, আমি অনেক

এগিয়েছি, ওদের কাছে commit করেছি, সুতরাং পশ্চাদ-পদ হওয়া চলবেনা। তখন আমি বললাম, পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন পরিষদ-এর পক্ষ থেকে আমি বলছি এই পরিষদ আপনার এ অন্যায় সংকল্প যাতে সিদ্ধ না হয়, তার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে। তাঁর সঙ্গে প্রায় দু ঘণ্টা আলোচনা হয়েছিল। চুম্বকে যতটা মনে আছে লিখলাম।

তারপর সুরু হল এই বিহারের সহিত মিলনের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য। ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলোচনায় বুঝেছিলাম পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর প্রস্তাবনায় শ্রীকৃষ্ণ সিং ও ডাক্তার রায় মত দিয়েছেন, বুঝেছিলাম দুইটি প্রদেশবাসীদের অধিকাংশের মতের বিরুদ্ধে বম্বে প্রেসিডেন্সীকে ভাগ করতে না দিয়ে সেখানে চিরতরে বিবাদের সৃষ্টি করে তাদের দুর্ব্বল করে রেখেছেন। এখানেও যদি একবার ডাক্তার রায় ও শ্রীকৃষ্ণ সিং এর মধ্যে বিবাদ সুরু করে দিতে পারেন (এবং দুটি প্রদেশ এক করা মাত্র তাহা হতে বাধ্য) তাহলে দিল্লীতে বসে একচ্ছত্র রাজত্ব চলবে। মাদ্রাজেও তাই চেয়েছিলেন, কিন্তু অনশনে মৃত্যুর পর অরাজকতা তা হতে দেয় নাই। এ গভীর চক্রান্ত না ডাক্তার, না শ্রীকৃষ্ণ সিং কেহই বুঝতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠন পরিষদ জেলায় জেলায় সভা করে, ইহার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাশ করিয়ে দিল্লী, পাটনা ও কলিকাতা পাঠাতে সুরু করল। কলিকাতার পার্কে পার্কে সভা করে প্রস্তাব গৃহীত হতে লাগল। বক্তা সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার প্রভৃতি সমস্ত কলকাতা তোলপাড় হতে লাগল। এমন সময় ডাক্তার রায় ঐ সংযুক্তির অনুকূলে প্রস্তাব পাশ করাবার জন্য কোনও পার্কে সভা করতে সাহস করলেন না। কবিগুরু শ্রীরবি ঠাকুরের বাড়ীতে এক সভা ডেকেছিলেন। শুনেছি (সত্যি মিথ্যা জানিনা) তিনি যখন গাড়ী থেকে নেমে সেখানে যাচ্ছিলেন কোনও এক অসভ্য ব্যক্তি তাঁর মাথায় চাঁটি মেরেছিল। সেখানে কিন্তু সভায় কোনও প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

বিধানবাবুর ভক্ত বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মহাশয় আমাদের ৫।৭ জনকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করে দিলেন। কারণ আমরা বিধান বাবুর এই সংযুক্তির বিরুদ্ধে প্রচার করছি। এই সময় একটা সুযোগ এসে গেল। কলিকাতার M.P-এর একটি আসনের নির্ব্বাচন হবে। উত্তর কলিকাতায় এই এই আসন। আর মেদিনীপুর জেলায় ভগবানপুর থানায় একটি M.L.A এর আসনের নির্ব্বাচন হবে। আমরা এই দুই আসনে বিহারের সঙ্গে বাংলার সংযুক্তির issue নিয়ে দুই ব্যক্তিকে মনোনীত করলাম। M.P-এর আসনে কাশীকান্ত মৈত্র। তিনি তখন কোনও দলভুক্ত ছিলেন না। অনেক পরে কমিউনিস্ট দলভুক্ত হইয়াছিলেন। আর মেদিনীপুরে হাইকোর্টের এ্যাড্-ভোকেট একজন, নাম ভুলে গেছি, পদবী পন্ডা। বিধান বাবু MPর আসনে শ্রীবিমল সিংহ মহাশয়কে মনোনীত করেন। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। তিনি বললেন সংযুক্তির ব্যাপারে সমস্ত অধিবাসী কংগ্রেসের উপর খড়্গহস্ত। নিশ্চিত পরাজয় জেনে তিনি রাজী হলেন না। তাঁকে ডাক্তার রায় এমন পর্য্যন্ত বলেছিলেন, তাহলে সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি স্থান পাবেন না। তাতেও তাঁকে রাজী করাতে না পেরে শেষে শ্রীযুক্ত অশোক সেন মহাশয়কে রাজী করিয়া মনোনীত করলেন। আর মেদিনীপুর ঐ আসনে শ্রীনিকুঞ্জ মাইতি মহাশয় অসুস্থ থাকায় তাঁর কন্যা শ্রীমতী আভা মাইতি দাঁড়ালেন। উভয়েই হেরে গেলেন। আমাদের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের জিত হ'ল, ডাক্তার রায় দেখলেন সাধারণ মানুষের মনের ভাব যখন এত বিপরীত তখন আর ইহা লইয়া অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তিনি প্রচার করলেন যদিও এই সংযুক্তি দ্বারা পশ্চিম বাংলা লাভবান হইত, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে পশ্চিম বাংলার অধিবাসীগণ ইহা চাহে না। সুতরাং আমার এই প্রস্তাব আমি উঠাইয়া লইলাম। নেহরুজী মর্ম্মাহত হইয়া ডাক্তার রায়কে জানাইলেন। কিন্তু ডাঃ রায় কি করিবেন? তিনি কি নিজের সমস্ত প্রভাব জলাঞ্জলি দিয়া নেহরুকে সন্তুষ্ট

করিবেন? আর ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণ সিংহ তিনি ত ক্ষেপিয়া গিয়া ডাক্তার রায়কে tralior প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত করিলেন। আমাদের পরিষদ শ্রীকৃষ্ণ সিংহের এই আচরণে প্রতিবাদ করিয়া ডাক্তার রায় যে তাঁর ভ্রম সংশোধন করিতে পারিয়াছেন তার জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ডাক্তার রায়ের সহিত আমার বিবাদ এইখানেই শেষ হয়। একদিন তাঁকে phone করিলে তিনি সন্ধ্যার পর রাইটার্স বিল্ডিং-এ আমায় ডাকেন। দুঘণ্টা ধরে মৈত্রীসুলভ আলাপের পর নিজ গাড়ী দিয়া আমায় বাড়ী পৌঁছাইয়া দেন। তাহার পরেও আবার তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হইয়াছে। কিন্তু বন্ধুত্বের হানি হয় নাই। সে কথা পরে বলিব। নেহরু সাহেবের কিন্তু বম্বে প্রেসিডেন্সির কীর্ত্তি অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। মারাহাট্টা ও ভাটিয়া উভয়েই চাহিল পৃথক প্রদেশ। সুতরাং উভয়ে মিলিয়া অরাজকতার এরূপ সৃষ্টি করিল যে, অবশেষে পণ্ডিতজী উহাদের পৃথক করিতে বাধ্য হইলেন। বম্বে মহারাষ্ট্রের মধ্যে থাকিল, গুজরাটের রাজধানী আহম্মদাবাদ হইল। এ ইতিহাস সকলেই জানেন।

পশ্চিমবঙ্গ পুনর্গঠনের পক্ষে আমি তখন নেহেরুজীকে লিখি যদি আপনার প্ল্যান্ বাংলা বিহার সংযুক্তিতে কার্য্যকরী হইলনা, যদি মহারাষ্ট্র-ভাটিয়া পৃথক হইল, তবে কেন বাঙালী অধ্যুষিত সিংভূম ধানবাদ, সাঁওতাল পরগণা বিহার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পশ্চিম বাংলাকে দেওয়া হইবেনা? জবাব তিনি দিয়াছিলেন তিন কথায়। ইহা লইয়া আর আন্দোলন করিবেন না। আসল কথা মহারাষ্ট্র ও গুজরাট-কংগ্রেস দলই পৃথক হইবার আন্দোলন করিয়াছিল। কিন্তু বাংলার বশম্বদ কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষ, ডাক্তার বিধান রায় তাহাতে রাজী হন নাই। তাই আজ ঐ অঞ্চলের বাঙালীদের হিন্দীর মাধ্যমে লেখাপড়া শিখিতে হইতেছে। কিছুদিন বাদে অর্থাৎ এক পুরুষ বাদে তারা পুরো হিন্দুস্থানী হইয়া যাইবে। আর যতদিন না তা হইবে, ততদিন তাহাদিগকে দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। ইহাও কি বাঙালীর ordial?

৯

ভারত ইউনিয়নের সর্ব্বাধিনায়ক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহিত আর এক বিষয়ে আমার বরাবর বাদানুবাদ চলিয়াছিল। আজ সে বিষয়ে কিছু লিখিব। পূর্ব্বে ১৯২১।২২ সালে যখন আমি গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস গড়িতেছিলাম তখন একদিন দেশবন্ধু আমায় বলিলেন, সাতকড়ি, তুমি ত মফঃস্বলে ঘুরে বেড়াচ্ছ। সেখানে মানুষ কেমন দেখলে? আমি বললাম, স্যার মানুষ দেখে কেবল দুঃখু হয়। প্রায় সকলেই মনুষ্যত্বহীন মূক্ পশুর ন্যায় হয়ে গেছে। কোনও কাজেই আগ্রহ নাই। তবে সহরের মানুষের চেয়ে ভাল। সহরের মানুষও মনুষ্যত্ব-হীন হয়েছে। তবে মফঃস্বলের মত মূক্ নয়। পশুর মধ্যে যেমন চতুর পশু রয়েছে বাঘ, কুকুর, শেয়াল। সহরের মানুষকে সেইরূপ বলা যেতে পারে। আরও পশুর মধ্যে যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি নিরীহ জানোয়ার রয়েছে, মফঃস্বলের মানুষকে তাই বলতে পারেন। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি। মফঃস্বলের মানুষকে কথা বললে সে সেটা মন দিয়ে শোনে। বুঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু সহরে যারা আপনাদের বক্তৃতা শোনে, তারা এক কান দিয়ে শোনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। তিনি বলেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, যে শিক্ষার মধ্যে চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা নাই, সে শিক্ষা শিক্ষানামের উপযুক্ত নয়। ইংরেজ প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপ্রণালী ঠিক তাই। আমাদের হাতে দেশের শাসনকার্য্য এলে এই প্রণালীকে ঢেলে

সাজতে হবে। বাল্যকাল থেকেই যে সব বিষয় অনুশীলন করলে চরিত্র গঠিত হবে, সেই সব বিষয়ের অনুশীলনের ব্যবস্থা এই শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে দিতে হবে। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে basic education (নয়া তালিম) খুলিয়া চরিত্র গঠনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যেমন খদ্দর চালাইবার চেষ্টায় তিনি আশানুরূপ কৃতকার্য্য হন নাই, এই basic education সম্বন্ধেও তাই।

দেশ কংগ্রেসের হাতে আসিবার পর যখন নূতন constitution প্রস্তুত হইল, আশা করিয়াছিলাম উহার মধ্যে শিক্ষা-বিভাগের আমূল পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু তাহাতে হতাশ হইলাম। বরং উচ্চশিক্ষা বিষয়ে কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত হইল। এই constitution দেখিয়া আমি চেষ্টা করিয়া নেহেরুজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ বিষয়ে আলোচনা করিবার চেষ্টা করি। বোধ হয় ১৯৫৩ সাল। আমি বলিয়াছিলাম, পণ্ডিতজী, শিক্ষার মধ্য দিয়া বাল্যকাল হইতে অনুশীলন দ্বারা চরিত্র গঠন করিবার ব্যবস্থা না করিলে, মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। তাই দেশে সত্যিকার মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আপনাকে তৎপর হতে হবে। তিনি বললেন, আমি এখন প্রথম Economic গঠন কাজে ব্যাপৃত হচ্ছি, শিক্ষা এখন থাক। আমি বলেছিলাম Economic construction কে করবে? মানুষ ত? কিন্তু মানুষ কই? সবাই ত অমানুষ। আপনি একা কি Economic construction করবেন তিনি হেসে বললেন, দেখাই যাক না প্রথম five yaer plan টা successful হয় কিনা। চলে এসেছিলাম। মনে মনে বুঝেছিলাম দেশের সত্যিকার গঠন বহুদূরে।

১৯৫৮ সালের শেষ কি ১৯৫৯ সালের প্রথম মনে নাই। আর একবার ঐ শিক্ষা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করে বলেছিলাম প্রথম five years plan অর্দ্ধেকও সফল হয়নি ইহা স্বীকার করেন ত? স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলাম ইহার কারণ দেশে মানুষ নাই। যাকে যে কাজের ভার দিয়েছেন, সে মনুষ্যত্বের অভাবের জন্য সেটা নষ্ট করেছে। আগে সৎগুণাবলী অর্জন করিবার ব্যবস্থা করুন, যেমন সত্যবাদী সেবাপরায়ণ, ত্যাগী, সংযমী, দ্বেষহীন, ঈশ্বরে বিশ্বাসী দেশপ্রেমিক মানুষ যাতে সৃষ্টি হয়, তার চেষ্টা করুন। সেটা বাল্যকাল থেকে অনুশীলন ছাড়া হবেনা। সে অনুশীলন শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়ে হবে। যদি একটা generation তৈরী হয়, তারা উপরের ব্যক্তিগণকে টেনে নামাবে এবং নীচের সবাইকে ঠেলে তুলবে। দোহাই আপনার, এটা সর্ব্বাগ্রে করুন। যখন চলিয়া আসি তখন মনে হইয়াছিল, কিছু impress হইয়াছেন।

তাহার পর হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তিনি এ সম্বন্ধে কিছু করিয়াছেন বলিয়া কোনও নিশানা পাই নাই। বিশেষ ১৯৬০ সাল থেকে আমি বুঝেছিলাম নেহেরুজীর Socialism এবং কমিউনিষ্টদের Communism প্রায় একই জিনিষ। আর তাঁর বিরুদ্ধে Light of India কাগজে ঐ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করি। তিনি কংগ্রেসের সহচরদের বলিতেন ভারতে——— Socialistic form of Society গড়ে তুলবেন। সকলেই ভাবত—মূর্খের মতই ভাবত—নেহেরু সাহেবের সমাজ সম্বন্ধে একটা নূতন কোনও ধারণা আছে সেটা ক্রমশঃ প্রকাশ করবেন। তারপর তিনি আইন করে Life Insuranceএর ব্যবসা ব্যক্তি বা কোম্পানীর হাত থেকে কেড়ে নিলেন। ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে বললেন Socialistic form of Society কি বস্তু। বললেন, Bank সমস্ত সরকারের কুক্ষিগত হবে। ধান ভানা কলগুলিও সব সরকারের কুক্ষিগত করা হবে। সবই আইন করে করা হবে। কেড়ে নেওয়া হবেনা, দাম দিয়ে লওয়া হবে। তখন Socialistic form of Society অর্থ সকলে বুঝিল। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে পার্থক্যও বুঝিল, বুঝিয়া রাজাগোপাল আচারীর দল কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গেল। এবং নূতন দল গঠন করিল। নেহেরুজী U.N.O.তে বক্তৃতা

দিয়া বলিয়াছিলেন, যুদ্ধ দ্বারা পৃথিবীর কোনও প্রশ্নের সমাধান হতে পারে না। সবই আলোচনার মধ্য দিয়ে হবে। সুতরাং তরবারি ভেঙে তাই দিয়ে লাঙলের ফলা করা উচিত। তিনি তখন পঞ্চশীলে এত মশগুল্ যে কোথাও যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখলেন না। তাঁর মত পদস্থ ব্যক্তি যে এরূপ হাস্যকর উক্তি করতে পারে ইহা আমাদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। তাই তিনি ভারতের সর্ব্বাধিনায়ক হইয়া ভারতের প্রতিরক্ষার কোনও প্রয়োজন বোধ করেন নাই। যখন তার কিছুদিন বাদে কমিউনিষ্ট চীন ভারত আক্রমণ করিল, তিনি চীনকে তাড়াইয়া দিবার হুকুম দিয়া সিলোনে বেড়াইতে গেলেন। প্রতিরক্ষার অবস্থা এমন ছিল যে, চীনের সাধারণ সৈন্যদল হু হু করিয়া সমস্ত north eastern frontiers province সামান্য কয়দিনের মধ্যে দখল করিয়া লইল। যে কয়জন সৈন্য ঐ অঞ্চলে ছিল, তাহারা নিজেদের জীবন দিল। এত বড় অপমান পৃথিবীর আর কোনও দেশে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যিনি দেশটাকে এরূপ অরক্ষিত রাখিয়াছিলেন, লড়াই করিয়া U.N.O.তে তরবারি ভাঙ্গবার কথা বলিয়া আসিলেন। তিনি সৈন্য-বিভাগের কর্ত্তৃত্বের উপর দোষ চাপাইয়া নির্বিঘ্ন ভারতের সর্বাধিনায়ক রহিয়া গেলেন।

ভাগ্যিস্ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট চীনকে স্পষ্টভাবে বলিলেন যে, ভারত হইতে সরিয়া না গেলে চীন আক্রমিত হইবে। তাই সাধারণ চীন সৈন্য যেমন হৈ হৈ করিয়া আসিল তেমনি হৈ হৈ করিয়া চলিয়া গেল। যত স্বাধীন দেশ ভারতের এই অপমানে মনে মনে হাসিল। কিন্তু কৈ পণ্ডিতজীর একটুকু লজ্জা বোধ হয় নাই? কেন হইবে? কাহার কাছে হইবে? ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের বিকাশ থাকিত, তাহা হইলে তাহারা অন্ততঃ এই মানুষটিকে কর্ত্তৃত্বের আসনে রাখিত না। ভারতে মানুষ থাকিলে এই ব্যক্তির বিচার করিয়া শাস্তির বিধান করিত। কেবল ভারতের সৈন্যবিভাগই অপমান বোধ করিয়াছিল। তাহাদের মুখে কালিমা লেপন হইয়াছিল। তাহারা পণ্ডিতজীর মৃত্যুর পর আয়ুব খাঁর আক্রমণে নিজেদের বীরত্ব দেখাইয়া সেই অপমানের কথঞ্চিৎ প্রতিশোধ লইয়াছিল।

আমি এত কথা নেহরুজীর বিরুদ্ধে লিখিলাম। সকলেই মনে করিবেন আমি তাঁকে দেশ-প্রেমিক নয় বলিয়া মনে করি। তাহা সত্য নহে। তাঁর দেশ প্রেম সোস্যালিষ্টের দেশপ্রেম। ইউরোপীয়ানের patriotism ভ্রান্ত দেশপ্রেম। তাই ভারতকে সোস্যালিষ্ট দেশে পরিণত করিতে চাহিয়া দুর্ভিক্ষে পূর্ণ করিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন। ভারতের দেশপ্রেম কেবল ভারতবাসীকে ভালবাসেনা, ভারতের মাটিকে, ভারতের গাছপালাকে, ভারতের পাহাড় পর্ব্বতকে, ভারতের নদ-নদীকে ভালবাসে। ভারতমাতার প্রকৃতরূপের পূজা করে। সে দেশপ্রেম যার আছে, সে কখনও দেশকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে না। তার পূর্ব্বে মৃত্যু বরণ করে।

১৯৬৪ সালের মে মাসের ২৭ তারিখে নেহরুজী তিরোধান করেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁর স্থান গ্রহণ করিয়া অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ১৯৬৫ সালে দুর্গাপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় তাঁর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, আবার তাঁকে শিক্ষাপ্রণালীর মধ্য দিয়া সদ্‌গুণাবলীর অনুশীলনের কথা বলি। তিনি আমার সহিত একমত হয়েন। কিন্তু শিক্ষক পাওয়া যাইবে কিনা সেই প্রশ্নই তাঁর মনে উদয় হয়। তিনি আমাকে দিল্লীতে পত্র লিখিতে বলায় আমি পত্র লিখি। সেই পত্রের উত্তরে চাগলা সাহেব যিনি তখন কেন্দ্রে education মন্ত্রী তিনি জবাবে বলেন, আমি যাহা চাহিতেছি, সে সম্বন্ধে শ্রীপ্রকাশ কমিশন বিশদ রিপোর্ট দিয়াছেন, সে রিপোর্ট কেন্দ্র কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে এবং প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী ও সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলরকে রিপোর্ট পাঠান হয়েছে "with request to implement that report" আর তার সহিত এক কপি রিপোর্টও পাঠিয়েছিলেন। সেই রিপোর্ট দেখে বুঝলাম নেহরুজী ১৯৫৯

সালে ঐ কমিটি গঠন করেছিলেন। শ্রীপ্রকাশ বম্বের গভর্ণর, Chairman G, C, Chatterjee র অস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলর ও A A Faizi কাশ্মীরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলরদ্বয়কে মেম্বর ও শ্রীকৃপালনিকে Secretary ও মেম্বর করে কমিটি করে তার কাছে নিম্নলিখিত বিষয় জানতে চেয়েছিলেন।

১। To examine the desirability and feasibility of making provision for the teaching of moral and spiritual values educational institution,

২। If it is Desirable & feasible to make such provision (a) to define broadly the content of instruction at various stages of education (b) to consider its place in normal curriculum.

তাঁদের unanimous report পড়লাম। তাঁরা লিখেছেন not only desirable & feasible but it is now imparative and should have been done when independence was attained তারপর শিক্ষার ক্রমও তাঁরা দিয়েছিলেন একেবারে primary stage থেকে। হায়, নেহেরু সাহেব, আমি যখন বলেছিলাম, তখন থেকে যদি introduce হ'ত, আজ ছাত্রদের মধ্যে এই বিশৃঙ্খলা দেখা দিতনা। যাই হ'ক নেহেরুজী দেহরক্ষা করেছেন, এখনও যদি কার্যকরী হয়ত ভাল। কিন্তু গভীর দুঃখের বিষয় অদ্যাবধি পশ্চিম বাংলায় ইহার কিছুই হয় নাই। চাগলা সাহেবের last sentence হচ্ছে "It is by and large implemented"

ক্রমশঃ

অগ্নিযুগের চন্দননগর

শ্রীদ্রষ্টা

১৯০৫ সালের বাংলা দেশ। লর্ড কার্জ্জন ঘোষণা করলেন বাংলাকে ভাগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা বাঙালী মেনে নিতে পারে না তাই দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল বঙ্গভঙ্গ বিরোধি আন্দোলন। পুলিশবিভাগ তাঁদের শক্তিবৃদ্ধি করলেন আর আন্দোলনের সঙ্গে ভালরকম যাতে বোঝাপড়া করা যায় তার জন্য গড়ে তোলা হল গোয়েন্দা-বিভাগ। জাতীয় কংগ্রেস খুব দেরীতে হলেও চরমপন্থী-দের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে এক প্রস্তাব নিলেন যাতে সিদ্ধান্ত স্থির করা হল যে স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার। এই ধরণের পরিবেশে চন্দননগর সহরের সকলেই সমানভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। এখানকার অনেকেই জাতীয়তাবোধের প্রসারের জন্য অনেক আগে থাকতেই কাজ করে যাচ্ছিলেন। এই নব আন্দোলনকে একটা বিপ্লব আন্দোলনে পরিণত করার ইচ্ছাও তাঁদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল।

এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল বিলাতি বর্জ্জন আন্দোলন, যাতে আরও বেশী সংখ্যক যুবককে আকর্ষণ করা সহজ হয়ে উঠল। বিপ্লব ও রাজদ্রোহীতায় বিশ্বাসী স্থানীয় নেতৃস্থানীয় সংগ্রামীরা সহরের বিভিন্ন এলাকায় গড়ে তুললেন গোপন অস্ত্র সংগ্রহ ও মজুত করার কেন্দ্র। যার মধ্যে উত্তর অঞ্চলের মতিলাল রায়ের বাড়ী ও গোন্দলপাড়ায় নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানকার ফরাসী সরকারের রাজনৈতিক কর্ম্মীদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, এছাড়া অস্ত্রাদির সন্ধান করার আইন এখানে প্রয়োগ করা হয়নি। নিরুপদ্রব রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিতে বাইরের অনেক বিপ্লবকার্য্যের নেতাদের যাতায়াত চলতে থাকল। আর তাঁদের সংসর্গে চন্দননগরের কর্ম্মীরা বাহিরে গিয়ে বিপ্লবকর্ম্ম চালনার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। শুধু বিপ্লবকর্ম্মের গোপন কেন্দ্রস্থাপন নয় "যুগান্তর," "বন্দেমাতরম" প্রভৃতি পত্রিকাতেও এই সহরের অনেকেই উদ্দেশ্যনামায় প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।

স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন, এই দুই আন্দোলনকে সামনে রেখে যাঁরা গুপ্তসমিতির গঠন ও প্রসারে বেশি সহয়তা করেন তাঁদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল রায়, চারুচন্দ্র রায়, মনীন্দ্রনাথ নায়েক, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, বসন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই শুধু যে নিজেদের মধ্যে সংগঠন কাজ চালাতেন তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা ও বাংলার অন্যান্য বিপ্লবকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন কাজে বিশেষ সহায়তা করতেন। আবার চন্দননগরের শাসন-ব্যবস্থার পক্ষ থেকে কোন বাধার আশঙ্কা না থাকায় বাইরের বিপ্লবীরাও যখন তখন বিপদে পড়লে এখানে আশ্রয় নিতেন। কলকাতার মুরারীপুকুরে বোমা প্রস্তুতের আড্ডাটি প্রধানতঃ উপেন্দ্র-নাথ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের উদ্যোগে গড়ে উঠে। আবার মতিলাল রায়ের অস্ত্রাদি রাখার জায়গায় কলকাতার ডক এলাকা থেকে রডাকোম্পানীর লুট করা পিস্তল ও রাইফেল এনে জমা হয় এই মতিলাল রায়ের বাসস্থানেই। সুদূর মেদিনীপুর জেলা থেকে সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও হেমচন্দ্র দাস মতিলাল রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ চালাতেন। উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়েরও চন্দননগরের সকল বিপ্লবকর্ম্মীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

এরই ফলে সহরের দক্ষিণে এবং উত্তরে বোমা তৈরীর কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

একদিকে যেমন বিপ্লবকার্য্য গোপনে চলতে থাকে তেমনি আবার বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী পত্রিকায় শাসক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে লাগল। এর ফলে "যুগান্তর" সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং বিপিন পাল এই দুজনকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হল। "সন্ধ্যা" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের দরুন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কেও গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারের আগেই কারাগারে তিনি মারা যান।

১৯০৭ সালে নভেম্বর মাসে রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা নিষিদ্ধ করে এক আইন পাশ করাইয়া সভা সমিতি করার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হল। একে বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কারাদণ্ড তাতে আবার সভা সমিতির কাজে বাধাদান আর তার উপরে কর্মীদের উপর পীড়ন, এতে সমগ্র বাঙ্গালীসম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্ষিপ্ত উত্তেজিত যুবসমাজ আর কালক্ষেপ করতে প্রস্তুত ছিল না। উপযুক্ত নেতাদের পরিচালনায় যুবকেরা রক্তবিপ্লবের পথে এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হলেন। ফলে দেশের সর্ব্বত্র সুরু হল ইংরাজ জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট লাট প্রভৃতির নিধনের কাজ। বিভক্ত বাংলার দুইটি পৃথক ছোটলাট ফুলার ও ফ্রেজার সাহেবের প্রাণনাশের চেষ্টা চলতে থাকল। চন্দননগরের কর্মীদের সহায়তায় মানকুণ্ডু ষ্টেশনের কাছে ছোটলাটের ট্রেণ ধ্বংস করার চেষ্টা চলে। একবার ব্যর্থ হয়ে আর একবার চেষ্টা করা হয় নারায়ণগড় ষ্টেশনের কাছে। এসব চেষ্টার মধ্যে মুরারীপুকুর বাগানের অগ্নি কর্মীদের সঙ্গে চন্দননগরের অনেক বিপ্লবী অংশ গ্রহণ করেন।

এইরকম উত্তেজিত আবহাওয়ার মধ্যে বাংলা দেশের ১৯০৭ সাল শেষ হল। ১৯০৮ সালের গোড়া থেকে যখন ইংরাজ সরকারের বিপ্লব দমনের কাজে আরও কঠোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগরের ফরাসী সরকার ইংরাজের প্রভাবে কঠোর হতে সুরু করলেন, চন্দন-নগরের মেয়র তার্দিভ্যাল সাহেব স্বদেশী সভার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দিলেন। এই সময় আবার অস্ত্ররাখা নিষিদ্ধ করে এক নতুন আইন পাশ করলেন। ফলে গোপনে অস্ত্র রাখার সুযোগ নষ্ট হল। এর ফলে চন্দননগরের বিপ্লবীরা খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাই তাঁরা ফরাসী মেয়রের প্রাণনাশের চেষ্টা করতে লাগলেন। কয়েকদিন ধরে হোটেলে ও অন্যত্র যখন মেয়রকে নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল না তখন ১১ই এপ্রিল [১৯০৮] মেয়রের বৈঠকখানায় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হল। এই বোমা নিক্ষেপ চন্দননগরে প্রথম বিপ্লবাত্মক ঘটনা।

এইসময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কঠোর সাজা দেওয়ায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেব সকল বিপ্লবীর লক্ষ্যস্থল হয়ে পড়লেন। কিভাবে কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যা করা যায় তাই নিয়ে বিপ্লবীদের মধ্যে অনেক রকম পরিকল্পনা চলতে থাকে। এর জন্য কর্মী সংগ্রহ কাজ চলতে থাকে। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ চন্দননগরে ফিরে এসে উপযুক্ত যুবকের সন্ধান করতে থাকেন। অবশেষে উল্লাসকর দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর পরামর্শমত কর্মী নির্ব্বাচিত করা হয়। ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড সাহেবকে নিরাপদ স্থানে পাঠাবার জন্য মজঃফরপুরের জেলা-শাসকের পদে বদলী করা হয়। তাই দূরে গিয়ে তাঁকে হত্যা করাও খুবই কঠিন কাজ ছিল। পুস্তকের মধ্যে বোমা রেখে সেই পুস্তক পার্শেল যোগে পাঠিয়েও ব্যর্থ হতে হল কারণ কিংসফোর্ড সাহেব বইটি খুলে দেখতে চেষ্টা করেন নি। এই সময় মুরারীপুকুর বাগানে বর্ধমান জেলার একজন কর্মী বেশ কৌশলের সঙ্গে বারীন্দ্রকুমার বেশ বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। ফলে কর্মীদের গোপন আলোচনা ইনি আড়াল থেকে শুনতে পান এবং প্রকৃত কাজ আরম্ভ হওয়ার আগেই মজঃফরপুরের পুলিশ সব সংবাদ পেয়ে যান। এ খবর বিপ্লবীদের কাছে এসে যাওয়ায় চন্দননগরের শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ এবং অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ পরপর প্রত্যেকে রজনী সরকারের নামে এই বিশ্বাস

ঘাতকের প্রাণনাশের চেষ্টা করেন কিন্তু সকলেই ব্যর্থ হন। অবস্থা দেখে সকলেই আশঙ্কা করেন যে গোড়া থেকে ষড়যন্ত্র বেফাঁস হয়ে যাবে। এই অবস্থাতেও কিন্তু বিপ্লবীরা দমে গেলেন না। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীকে এই কিংসফোর্ড সাহেবের হত্যার কাজে নিয়োগ করা হল। মুরারীপুকুরে প্রস্তুত বোমা দিয়ে চন্দননগরের সরবরাহ করা পিস্তল দিয়ে উপযুক্ত অর্থ ও উপদেশ দিয়ে তাঁদের মজঃফরপুর পাঠান হয়।

এই সব ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চন্দননগরের বীর বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের বিষয় কিছু বলে রাখা দরকার। বালক কানাই স্বাধীনতা আন্দোলনের একেবারে প্রথম-দিকে মহারাষ্ট্রে বাস করত। ঠিক সে সময় বোম্বাই সহরে প্লেগ দমন উপলক্ষ্যে সহরবাসীর উপর অত্যাচার হয়। সেই সময় বালক বয়সে সেই অত্যাচার প্রত্যক্ষ করে কানাইলালের মনে বিদেশী শাসকদের প্রতি একটি স্থায়ী ঘৃণার ভাব সৃষ্টি হয়। পরবর্ত্তী জীবনে তার মন ঠিক এমনি প্রভাবেই প্রভাবিত হয়েছিল। চারুচন্দ্র রায়ের ছাত্র হিসাবে সে খুব সহজেই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে। স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেও সে নিয়মিত স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে, এইভাবে ধীরে ধীরে বিপ্লবীদের গুপ্তসমিতির কাজের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকে। মুরারীপুকুর বাগানে যখন কিংসফোর্ড সাহেবকে হত্যার জন্য প্রস্তুতি চলছিল তখন কানাইলাল সবে চন্দননগর বিদ্যালয় ও মহসীন কলেজের পড়া শেষ করে শেষোক্ত কলেজ থেকে এফ এ পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার শেষেই সে গোপীমোহন দত্ত লেনের বাড়ীতে যায়। কারণ পড়ার শেষে তার বিপ্লব কার্য্যে আরও বেশী করে আত্মনিয়োগ করা সহজ ছিল। এখানে কানাইলাল চন্দননগরের মতিলাল রায়, উপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাছে যে শিক্ষা সে পেয়েছিল তারই প্রত্যক্ষ পরীক্ষা, প্রয়োগ নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। বিস্ফোরণ করমুলা, বোমা প্রস্তুত প্রণালী, Modern art of war প্রভৃতি হাতে লেখা কাগজ বা কোন কোন প্রকাশিত পুস্তক নিয়েই তাকে গবেষণা করতে দেখা যেত। মুরারী পুকুর থেকে বারীন্দ্রকুমারের নির্দ্দেশও তাকে গ্রহণ করতে হত।

মজঃফরপুরে যেমন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল যাওয়ার আগেই বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় বিপ্লবীদের সমস্ত কার্য্যকলাপ ইংরেজ সরকারের গোচরে আসে, তেমনি গোন্দলপাড়া বান্ধব সম্মিলনীর যে অন্যান্য বিপ্লব-কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ ছিল সে খবরও আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক গোপনে খবর সরবরাহ করেন। ফলে উদ্যোক্তা হিসাবে গোন্দলপাড়ার উপেন্দ্রনাথ, নরেন্দ্র-নাথকে কলকাতায় গিয়ে থাকতে হয়। মুরারীপুকুর বাগানের মূল ঘাঁটি ছাড়াও অরবিন্দের বাসস্থান নবকৃষ্ণ-স্ট্রীটের বাড়ী ও গোপীমোহন দত্ত লেনের আর একটি বাড়ী হইতেও কাজ চালান হত।

এত রকম বিপদ মাথায় নিয়েও পূর্ব্বের ব্যবস্থামত প্রধানতঃ উপেন্দ্রনাথ ও বারীন্দ্রকুমারের নির্দ্দেশে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরামকে মজঃফরপুর যেতে হল। একে অপরকে ছদ্মনামে চিনত এমনভাবেই উভয়কে সেখানে পাঠান হল। ১৯০৮ সালের ৩০ শে এপ্রিল রাত ৮ টায় কিংস-ফোর্ড সাহেবকে উদ্দেশ করে তার বাংলোর সামনে ফটকের কাছে বোমা ফেলা হয় একটা ঘোড়ার গাড়ীকে লক্ষ্য করে। গাড়ীতে কিংসফোর্ড সাহেব ছিলেন না, তাঁর পরিবর্ত্তে ছিলেন মিঃ কেনেডির পত্নী ও কন্যা। এঁরা উভয়েই বোমার আঘাতে মারা যান। বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এঁরা উভয়ে পৃথক হয়ে পালাতে থাকেন। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের পর ক্ষুদিরাম পরদিন গ্রেপ্তার হন। কিন্তু পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সেই একই দিনে অর্থাৎ ১লা মে তারিখে নিজের রিভলভারের গুলিতে প্রফুল্ল আত্মহত্যা করেন।

মজঃফরপুরের এই ঘটনার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষ বিভিন্ন জায়গায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী চালাতে লাগলেন। মূলকেন্দ্র মুরারী-পুকুর বাগানে গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী চলল। এখানে যাঁরা গ্রেপ্তার হলেন তাঁদের মধ্যে—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ,

উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ। এছাড়া রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের বাড়ী থেকে শ্রীঅরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হল ও গোপীমোহন দত্ত লেনে কানাইলালকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তল্লাসী চালনার সময় মুরারীপুকুর বাগানে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর দুখানি চিঠি পুলিশ হস্তগত করে। খবর পেয়ে কিছুদিনের জন্ত আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে রাসবিহারী ডেরাডুনে যেয়ে বাস করতে থাকেন এবং বিপ্লবকার্য্যে যেন কোন আগ্রহ নেই এই-ভাব দেখিয়ে প্রায় তিন বছর সেখানে থাকেন এবং বিভিন্ন ধরনের চাকুরীও গ্রহণ করেন। চন্দননগরে চারুচন্দ্র রায়কে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু অপরাধের প্রমাণ না থাকায় তিনি মুক্তি পান।

মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু যে ক্ষুদিরামের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন এখবর পুলিশের জানা ছিল। এছাড়া তিনি বারীন্দ্র ও অরবিন্দের সম্পর্কে মামা হতেন। বিনা অনুমতিতে অস্ত্র রাখার জন্য তাঁহাকে মেদিনীপুর জেলে দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগের আদেশ দেওয়া হয়। পরে আলিপুর বোমার মামলা যা মুরারীপুকুর বাগানের অস্ত্র পাতি নিয়ে সৃষ্টি করা হয় সেই মামলার সঙ্গে যোগাযোগ আছে দেখে সেই মামলাতেও তাঁকে আলিপুর জেলে আনা হয়। মোট ৩৫ জনকে এই মামলার আসামী করা হয় এবং যাতে আরও বেশী বিপ্লবী ধরা পড়েন সেদিক থেকেও চেষ্টা চলতে থাকে। অনেক বিপ্লবী ধরা পড়লেও চন্দন-নগরের বসন্তকুমার, নরেন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র, মতিলাল রায় এঁরা ধরা পড়েন নি। বসন্তকুমারের কলকাতার বাসায় নরেন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র জেলের সঙ্গে খবর দেওয়া-নেওয়ার জন্ত এক গোপন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বন্দীরা মুড়ি খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মুড়ির ঠোঙ্গার কাগজে code এর মারফৎ তাঁদের কাছে বাইরের খবর দেওয়া হত। বসন্তকুমার উপেন্দ্রনাথের আত্মীয় (cousin) বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় তাঁর জেলে গিয়ে দেখা করার সুবিধা হয়।

এদিকে আলিপুরে বোমার মামলার বিচার চলতে থাকল আর সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন বিপদ দেখা দিল। বিপ্লবীদের মধ্যে আলিপুর জেলের বন্দী নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজসাক্ষীরূপে বিপ্লবী সহকর্মিদের কাজ কর্ম বিষয়ে খবরাখবর সরকারকে দিতে আরম্ভ করলেন। এর ফলে বিপ্লবীদের বিপদ আরও মারাত্মক হয়ে উঠল। তাই সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম চিন্তা করলেন যে যদি গোস্বামীকে জগত থেকে সরিয়ে না ফেলা যায় তবে অজস্র কর্মীর কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ড নিশ্চিত। সত্যেন্দ্র-নাথের এই মতলব যেমন বাহিরের বিপ্লবীদের কাছে এল তেমনি বাহিরে থেকে চেষ্টা চলতে লাগল কি করে এঁদের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনকে জেল থেকে গোপনে মুক্ত করে আনা যায়।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের আবহাওয়া খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠল। এতগুলি নেতার গ্রেপ্তারে যুবসম্প্রদায় আরও যেন দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে এগিয়ে এল। কিন্তু যেভাবে আলিপুরের বোমার মামলা চলতে থাকল তাতে আরও অনেক বিপ্লবীর গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় রয়ে গেল। এরমধ্যে নরেন্দ্র গোস্বামী রাজসাক্ষী হওয়ায় এই বিপদ আরও কঠিন ভাবে দেখা দিতে লাগল। তাই মামলা চলতে থাকা অবস্থায় যত শীঘ্রই গোস্বামীকে হত্যা করার চিন্তা প্রথম সত্যেন্দ্রনাথ বসু করেন এবং সাঙ্কেতিক প্রথায় তাঁর এই ইচ্ছা চন্দননগর ও কলকাতার বিভিন্ন গোপন কেন্দ্রে এসে গেল। আর এই হত্যার কাজ সফল করার জন্ত জেলখানার মধ্যে রিভলভার পাঠানর দাবীও জানান হল।

আবার একই বিপ্লবীদল অপর একটি মতলব স্থির করেন তা হচ্ছে যে জেলখানার ফটকের নকল চাবী প্রস্তুত করে উপযুক্ত সময়ে বিপ্লবীদের মুক্ত করে সুদূর উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রেরণ করা। এর জন্ত জেলখানার ফটকের তালার মোমের ছাঁচ প্রস্তুত করা এবং জেলের চিকিৎসক এই কাজে বিপ্লবীদের সহায়তা করেন। এক-দিকে যেমন জেলের তালার চাবি প্রস্তুত করার কাজ চলতে থাকে অপরদিকে তেমনি সত্যেন্দ্রনাথ হাসপাতাল হইতে জেলের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ ও হেমচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে নরেন্দ্রনাথকে হত্যার ষড়যন্ত্র

বিষয়ে পরামর্শ চালান। এই সময় বিপ্লবীদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ও সংবাদ আদান-প্রদান করার দায়িত্ব পালন করেন চন্দননগরের তিনজন বিপ্লবীর উপর। এঁরা হলেন শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ওদিকে জেলের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীর কাছে তিনি নিজেও রাজসাক্ষী হবেন বলে তাঁর সঙ্গে হাঁসপাতালে অনেক পরামর্শ করতে থাকেন।

জেলের মধ্যে সকল বিপ্লবীরাও ষড়যন্ত্রের বিষয় জানতেন না। উদ্যোক্তারা ইচ্ছা করেই সবাইকে এ বিষয়ে জানান নি। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধু হেমচন্দ্র দাসকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, যেমন করে হোক নরেন গোস্বামীকে হত্যার জন্ম রিভলবার তাড়াতাড়ি খুব প্রয়োজন। সত্যেন্দ্রনাথের সুবিধা ছিল যে নরেন্দ্রনাথ তাঁকে অনেক কিছু বিশ্বাস করে বলতে বা পরামর্শ করতে হাসপাতালে আসতেন। এমন কি সত্যেন্দ্রনাথ যে সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিতে প্রস্তুত একথা নরেন্দ্রর মারফৎ পুলিশের কাছে জানান হয়। নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপে সত্যেন্দ্রনাথ একদিন জানতে পারলেন যে ১লা সেপ্টেম্বর এর শুনানীতে গোস্বামী যে জবানবন্দী প্রদান করিবে তারফলে বিপ্লবীদের আরও অনেক নাম ও কাজকর্ম প্রকাশ হইবে। এর পরিণাম সত্যেন্দ্রনাথের বেশ ভালই জানা ছিল। তাই তিনি স্থির করলেন যে নরেন্দ্রনাথের হত্যার ব্যবস্থা ঐ তারিখের আগেই করা দরকার।

পলায়ন করার ব্যবস্থামত একটি পিস্তল হেমচন্দ্র দাস পেয়ে যান এবং সেই পিস্তলটি তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে দিয়ে দেন। এছাড়া চন্দননগরের মতিলাল রায়ের ব্যবস্থাপনায় জেলের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র ও বসন্তকুমার দুজনে দুটি রিভলভার সরবরাহ করেন। এবং জেলের মধ্যে বন্দীদের খাবারের ঠোঙা দেবার সুযোগে হেমচন্দ্র দাস ও উপেন্দ্র নাথ অস্ত্র দুটি গ্রহণ করেন। জেলের ফটকে প্রহরীরা খুব সজাগ না থাকায় জামার ভিতরে লুকিয়ে পিস্তল আদান-প্রদান হয়। কাঁঠালের মধ্যে পিস্তল লুকিয়ে দেওয়াটা একটি মিথ্যা রটনা এবং সম্ভবতঃ সরকারের কর্মচারীদের দায়িত্ব কমানোর উদ্দেশ্যে এই কাহিনী প্রচারিত হয়ে থাকতে পারে। শেষে সরবরাহ করা দুটির মধ্যে একটি সত্যেন্দ্রনাথের অনুমতি মত কানাইলালের হাতে আসে।

গোস্বামীকে হত্যার কাজে কানাইলাল কিভাবে সাহায্য করেছিল সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার। প্রথমতঃ নানা রকমের সাঙ্কেতিক প্রথায় খবর আদান-প্রদান এবং মাঝে মাঝে হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথ এঁদের হাঁসপাতালে সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ দেখে সে বেশ বুঝতে পেরেছিল যে জেলের মধ্যেই হয়ত খুব একটা গুরুতর কিছু ঘটবে। কানাইলাল নিজে যখন সত্যেন্দ্রনাথকে একটা কাপড়ে মোড়া রিভলভার দিতে যায় তখনই সে অনেক অনুনয় করার পর জানতে পারে যে ওটা একটা রিভলভার। তারপর পরস্পর খবর জেনেও সে বেশ বুঝতে পারে সে গোস্বামীকে হত্যা না করলে আরও অনেকের বিপদ বাড়বে। এই অবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথকে গোঁসাই হত্যার ব্যাপারে সাহায্য করবে বলে জানায়। যুবকের এই ব্যাপারে অদম্য আগ্রহ দেখে সত্যেন্দ্রনাথও রাজী হয়। এদিকে জেলের অন্য সব বিপ্লবীরা এবিষয়ে কিছুই খবর রাখতেন না। তাঁরা শুধু সত্যেন্দ্রনাথকে পর পর দুটি রিভলভার সরবরাহ করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

প্রথমদিকে যাতে গোঁসাই হাঁসপাতাল যাওয়ার পথে লুকিয়ে থেকে বিপ্লবীদের সনাক্ত করতে পারে সেই জন্য তাঁদের হাঁসপাতালে যেতে দেওয়া হত। পরে প্রথমে বিপ্লবীরা সাবধান হয়ে যাতায়াত কমিয়ে দেন। শ্রীশ ঘোষ একবার সত্যেন্দ্রনাথকে দেখতে যাওয়ায় পর বিশেষ আদেশ জারী করে কর্তৃপক্ষ সকল বন্দীদেরই বিনা অনুমতিতে হাঁসপাতালে যাওয়া বন্ধ করেন। কোন অসুস্থতা না দেখাতে পারলে হাঁসপাতালে যাওয়া চলে না দেখে কানাইলাল পেটের যন্ত্রণায় কষ্ট হচ্ছে এই বলে হাঁসপাতালে যাওয়া আসা আরম্ভ করল। ৩১শে আগষ্ট রাত্রে পেটের যন্ত্রণা খুবই অসহ্য বলে হাঁসপাতালে গিয়ে চিকিৎসার জন্য সে সত্যেন্দ্রনাথের পাশে একটা

Bed নিয়ে থেকে যায়। পরদিন ১লা সেপ্টেম্বর সকাল ৭টার সময় কানাইলাল দেখে সে সত্যেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে সঙ্গে করে একটা বেঞ্চে এসে বসেছেন। কানাই একটু ক্ষণের জন্ম অন্য দিক চলে যায়। এদিকে সেই দিনই আলিপুর কোর্টে যেভাবে সরকার পক্ষের সাক্ষী হিসাবে গোস্বামী যা বলবে সেও বিপ্লবীদের বিষয় খুব মারাত্মক হত। তাই সত্যেন্দ্রনাথ আগের দিন রাত্রে সকল না হওয়া পর্যন্ত গোস্বামীকে নিয়ে মামলায় কিভাবে সরকারী পক্ষ সমর্থন করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করা হয়। এই ধরণের মামলার লিখিত জবানবন্দী তৈরী করার অছিলায় গোঁসাইকে ডেকে বসান, এভাবে আগেও কয়েকবার দুজনে বসেন। এখানে কানাইলালের মনোভাব সম্পর্কে একটি কথা বলা দরকার। জেলে যখন রিভলভার এসে গেছে তখনও গোঁসাইকে হত্যা না করে পলায়ন করার যে মতলব বারীন্দ্রকুমার স্থির করছিলেন সে ব্যবস্থা কানাইলালকে উত্তেজিত করে এবং সে বসন্তকুমারের সঙ্গে দেখা করার সময় বারীন্দ্রকুমার অন্যান্য কয়েকজন নেতার বিষয়ে কঠোর সমালোচনা করে।

গোঁসাই হত্যার দিন সকালবেলায় যখন সত্যেন্দ্র ও গোঁসাই পাশাপাশি বসেছিলেন তখন তাঁদের কথা-বার্তা বলার সুবিধা দেওয়ার জন্ম ইয়োরোপীয় রক্ষী অন্যত্র চলে যায় আর কানাইলালও হাঁসপাতালের ভিতরে অন্যদিকে চলে যায়। সম্ভবতঃ আগের রাত্রে সত্যেন্দ্রনাথের পাশের শয্যায় থাকায় সে কিছু পরামর্শ করে থাকতে পারে। তবে অপর বন্দী নেতারা এ বিষয়ে খুব খবর জানতেন বলে অনুমান করা যায় না। পরে হত্যার ঘটনা দেখে বেশ জানা যায় যে কানাইলাল গোঁসাই হত্যার কাজে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে তার হাতের সঙ্গে দড়ি দিয়ে রিভলভার বেঁধে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ মামলায় রাজসাক্ষী হিসাবে কিভাবে কি চূড়ান্ত জবানবন্দী দেবেন তার কিছু লেখার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছেন এই ভাবে গোঁসাইয়ের খুব কাছে ঘেঁসে এই বেঞ্চে বসে কথাবার্তা সুরু করলেন। এই অবস্থায় ইয়োরোপীয় রক্ষী ও কানাইলাল উভয়েই একটু দূরে সরে গেলেন। অল্প সময়ের জন্ম কথা বলার পর সত্যেন্দ্রনাথ পকেটে হাত রেখে রিভলভারের গুলি ছাড়েন এবং এই গুলি গোঁসাইয়ের উরুতে লাগে। গোঁসাই চিৎকার করিয়া দৌড়াইতে থাকেন। রিভলভারের গুলির শব্দ ও চিৎকার শুনিয়া কানাইলাল সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। রক্ষীও তাড়াতাড়ি এসে সত্যেন্দ্রনাথের রিভলভার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু রিভলভারটি কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকায় নেওয়া সম্ভব হয় না। গোঁসাই খোঁড়াতে থাকে এবং সেই অবস্থায় পালাতে থাকে। সেই অবস্থায় কানাইলালও গোঁসাইকে অনুসরণ করতে যায়। হাসপাতালের গেটের দিকে দুজনেই ছুটে গিয়ে গোঁসাইকে গুলি করতে থাকে। ভয়ে কেউ কাছে আসতে সাহস পায় না। হাসপাতালের গেটের প্রহরীকে ভয় দেখিয়ে কানাইলাল ফটক খুলে দিতে বাধ্য করে এবং গোঁসাইকে গেটের বাইরে এসেও পর পর গুলি করতে থাকে। এইভাবে গোঁসাই মারা যায়।

গোঁসাইয়ের হত্যার বিষয় নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের বিরুদ্ধে এক মামলা রুজু করা হয়। বিচারে উভয়েরই ফাঁসীর হুকুম হয়। কানাইলালকে তার দাদা ও বিপ্লবীরা আপীল করার জন্ম বলেন। কিন্তু তার ছিল এক উত্তর—"There shall be no appeal"। একজন অল্পবয়সী যুবকের মুখে এই যে আত্মতৃপ্তির ভাব এ দেশবাসীকে স্পর্শ না করে পারে না। ফাঁসীর হুকুমে সে বেশ খুসী ও নিশ্চিন্ত-ছিল। তার দেহের ওজন বেড়ে যায় এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। বিপ্লবকার্য্যে সে যে একজন বিশ্বাসঘাতককে জগত থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে এতেই সে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করেছিল। গোঁসাই যেভাবে সাক্ষী দেবার ব্যবস্থা করেছিল তাতে বিপ্লবী দলের সকলেই ভেবে নিয়েছিলেন যে আরও অনেক বিপ্লবী ধরা পড়ে যাবেন ফলে হয়ত আন্দোলন একেবারে শুদ্ধ হয়ে যাবে। আলিপুরের এই মুরারীপুকুর বোমার মামলা চলার সময় নিজেদের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ করে আনেন। কারণ

তা না হলে আরও অনেকেই গ্রেপ্তার হতেন। কানাইলালের সুযোগ্য শিক্ষক সুপণ্ডিত চারুচন্দ্র রায় কানাইকে তাঁর উপযুক্ত ছাত্র বলে ঘোষণা করতেন। কানাই যখন আপীল করতে অসম্মত হয় তখন চারুচন্দ্রকে এ-বিষয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, কানাই আমার শিক্ষক-জীবনের সার্থক সৃষ্টি। সে যে আপীল করবে না বলেছে ঠিকই করেছে কারণ এমন না হলে দেশবাসীর মনে চেতনা আসবে না। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, কানাইয়ের দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি এশুধু তার পরিচালনায় থেকে সম্ভব হয়েছিল। চারুচন্দ্র কানাইয়ের এই দৃঢ়তার বিষয় দেখে তিনি নিজে যে কতখানি তৃপ্ত হয়েছিলেন তা শুধু তাঁর নিজের কথায় জানা যায়। তিনি কানাইয়ের বিষয়ে তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন—কানাই যা স্থির করেছে সে ঠিকই করেছে, যদি বাঘের বাচ্চারে বাঘ না করিনু তবে কি করিনু তারে। কানাইলালের জীবন শেষ হল কিন্তু তার এই প্রাণদণ্ড গ্রহণ করা সার্থক নিশ্চয়ই। এই জন্যই Pioneer কাগজে লেখা হয়েছিল যে নরেন গোঁসাইয়ের হত্যা শুধু হত্যা নয় তার সঙ্গে আছে কানাইলালের আত্মত্যাগ। কানাইয়ের এই আত্মত্যাগ পরিবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামেও ব্যর্থ হয়নি। এমনকি সমগ্র বাঙালী সম্প্রদায়কে শীর্ষস্থান দিয়েছিল। ১০ই নভেম্বর কানাইলালের ফাঁসী হয়। কানাইয়ের অন্তিম কার্য্যের জন্য বিরাট শোকযাত্রা হয় তাতে জনসাধারণের উত্তেজনা দেখে সরকার পক্ষ বেশ ভীত হয়ে পড়েন। ফলে ২১শে নভেম্বর সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি হওয়ার পর শবদাহ জেলখানার মধ্যেই করার ব্যবস্থা হয়।

আলিপুর বোমার মামলায় বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ ও আরও ১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। অরবিন্দ প্রথমতঃ গ্রেপ্তার হন কিন্তু প্রত্যক্ষ গুপ্তসমিতির কাজে যুক্ত থাকার কোনও প্রমাণ না থাকায় তিনি মুক্ত হন। বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাস করের ফাঁসীর আদেশ হয় কিন্তু আপীলে তাঁদের দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। আরও কিছু সংখ্যা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। চন্দননগরের অনেক বিপ্লবীগণ অভিযুক্ত হয়েও পরে মুক্ত হন। পরবর্ত্তী রক্তবিপ্লবের পর্য্যায়ে প্রতি ক্ষেত্রেই চন্দননগরের বিপ্লবীদের কার্য্যকলাপ আরও বড় আকারে আরম্ভ হয়। এর মধ্যে রাসবিহারী বসু, মতিলাল রায়, মনীন্দ্রনাথ নায়েক, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, ডাঃ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আলিপুর বোমার মামলা থেকে যে সামান্য কিছু কর্ম্মী পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন তাঁরা আবার নূতন দল গঠন করতে থাকেন। পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে একটি বিশেষ লক্ষ্যণীয় অবস্থা দেখা যায় সে অবস্থায় প্রায় বেশীর ভাগ পরিবারই বিপ্লবীদের কাজে স্বেচ্ছায় সহায়তা করেন। এমন কি কিছুসংখ্যক ফরাসী সরকারের কর্ম্মচারীরাও অনেক কাজে সহায়তা করেন। কানাইলালের আত্মদান যেন সমগ্র বাংলাদেশে এক নূতন উৎসাহ এনে দেয় তাই তার বাসভূমি চন্দননগর সহরে এর প্রভাব আরও বেশী করে দেখতে পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী পর্য্যায়ের মাত্র ৪ বছরের ইতিহাসে এই সহর যে মর্য্যাদার আসন পায় পরবর্ত্তী আরও ২৪ ২৫ বছরের সংগ্রামেও এই সহরবাসীরা একই রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের যে কোন একটি ক্ষুদ্র সহরের পক্ষে ইহা কল্পনাতীত। আজ স্বাধীনতার দিনে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এই সহরের স্বাধীনতাকামী মানুষের সংগ্রাম ও তার সঙ্গে ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মদান।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষা লইয়া ছেলেখেলা ?

এ-দেশে শিক্ষার নিত্য নব পরিকল্পনা এবং ঘন ঘন বিচিত্র পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া পত্রিকান্তরে মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে যে—"শিক্ষাটা কি আমাদের দেশে দিন দিন ছেলেখেলা হইয়া দাঁড়াইতেছে? অন্তত শিক্ষা-ব্যবস্থার নিয়ামক যাঁহারা তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া তো ইহাই মনে হয়। সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁহাদের মতি স্থির নাই..."

এবং এইসব অস্থিরমতি অতি পণ্ডিত শিক্ষা-নিয়ামকদের বিচার বিবেচনা এবং অতিবিচিত্র কার্য্যকলাপ এবং অহরহ পরিবর্ত্তনশীল ফতোয়া প্রচারের ফলে দেশের শিক্ষার প্রতিটি স্তরে এক অতি ভয়ানক ক্ষতিকর অনিশ্চিত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এবং এই অনিশ্চয়তার কারণেই বর্ত্তমান শিক্ষা ক্ষেত্রে বিষম অশান্তি ও প্রচণ্ড বিক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। স্কুলে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বত্রই ছাত্রসমাজে দেখা যাইতেছে উৎসাহের অভাবের সঙ্গে পরম একটা হতাশার ভাব। দেশ বিদেশের জ্ঞানী এবং গুণীদের লইয়া ঘন ঘন বিপুল অর্থব্যয়ে নানাপ্রকার নানারঙের বিবিধ শিক্ষা-কমিশন গঠন করিয়াও আজ পর্য্যন্ত শিক্ষা বিষয়ক একান্ত প্রাথমিক সমস্যাগুলির কোন সমাধান হইল না। এখনও ঘন ঘন বিতর্ক চলিতেছে ছাত্র স্কুলে পড়িবে কয় বৎসর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী থাকিবে কয়টা, কলেজী শিক্ষার সময় এবং ধারা কি হইবে—এই সকল প্রশ্নের জবাব আজ পর্য্যন্ত কেহই দিলেন না, চূড়ান্ত মীমাংসা হওয়া ত দূরের কথা।

ভারতবর্ষের সকল রাজ্যের শিক্ষার অবস্থা এবং সমস্যা আজ একই প্রকার, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এ-বিষয়ে একই প্রকার শিক্ষা-সমস্যায় জর্জ্জরিত, আক্রান্ত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে—

শিক্ষার অনিশ্চয়তার ছোঁয়াচ পশ্চিমবঙ্গেও লাগিয়াছে। কিছুদিন আগে মনে হইয়াছিল এ রাজ্যের তাবৎ স্কুলই বোধহয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে কোনও স্কুলেই এগারটির কম ক্লাস থাকিবে না, স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাও অচিরে উঠিয়া যাইবে, স্কুলে পড়াশুনার শেষ পরীক্ষা হইয়া দাঁড়াইবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। আসলে কিন্তু অত সব কিছুই হয় নাই। বিস্তর বিদ্যালয় অবশ্য উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে কিন্তু যাহারা হয় নাই তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। তাহাদের রূপান্তর যে কবে হইবে সে কথা কেহই বলিতে পারে না। কেননা, ইতিমধ্যে স্থির হইয়াছে আপাতত পুরাতনপন্থী বিদ্যালয়গুলিকে নূতন সাজে আর সাজানো হইবে না—অর্থাৎ দুই জাতের স্কুলই পাশাপাশি চালু থাকিবে, দুই ধরণের পরীক্ষাই পাশা-

পাশি চলিবে। স্কুলের শিক্ষার এই যে দ্বৈতবাদ তাহাতে শিক্ষা-শিক্ষণের মান বাড়ে নাই, ছাত্র-ছাত্রীদের কোনও উপকার হয় নাই। হয়রানির একশেষ হইতেছে অভিভাবককুলের। ঘন ঘন রদ-বদলের ফলে তাঁহারা দিশাহারা।

এ-রাজ্যে বিদ্যালয়ে নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতেই পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকের বিস্তর বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। বহু শিক্ষাবিদের মত এই যে, নবপ্রবর্ত্তিত পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকের আমূল সংস্কার একান্ত আবশ্যক। অনেকের মতে অদ্যকার ছাত্রদের, স্কুলের ছাত্রদের কথাই বলা হইতেছে, যে প্রকার বিষম পাঠ্যক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সে-ভার বহন করিবার মত শক্তি তাহাদের নাই অতএব এ-ভার লাঘব করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু লঘুগুরু—এই দুইটি বাক্যের বিচার বিবেচনা কি ভাবে, কে করিবে। লঘু এবং গুরু আপেক্ষিক শব্দ বা কথা। ইহাদের পরিমাপ কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের সংখ্যা বা সিলেবাসের বহর দেখিয়া করা যায় না। একথা অস্বীকার করা যায় না যে—

"বর্তমান জগতের প্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে গেলে যেটুকু জ্ঞান অর্জ্জন করার দরকার সেটুকু এ দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের করিতেই হইবে। নহিলে গোটা দেশটাই পিছাইয়া পড়িবে। বাংলা দেশও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের বড়ই কষ্ট হইতেছে এই অজুহাতে শিক্ষার মান এমনভাবে নিচু করা সঙ্গত নয় যাহার ফলে শিক্ষার্থীরা তাহাদের সমবয়স্ক অন্যান্য রাজ্য বা দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় অপকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়।"

সংবাদে প্রকাশ, এ-রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষৎ পাঠ্যক্রম সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। এ-নববিধান নাকি পরবর্ত্তী শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ আগামী সেশন হইতেই কার্য্যকর হইবে। কিন্তু আগামী সংস্কারের প্রকৃতি বা ধর্ম কি হইবে, এখনো প্রকাশ পায় নাই।

এবং—"ঠিক ধরা যাইতেছে না। পাঠ্যক্রম যেখানে অহেতুক ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া বাড়ানো হইয়াছে সেখানে তাহাকে ছাঁটিয়া ছোট করিলে কোনও লোকসানই হইবে না বরঞ্চ লাভই হইবে। কিন্তু সংস্কারের দোহাই দিয়া যদি পাঠ্যক্রমকে সনাতনী ছাঁদে ঢালা হয় তাহা হইলে হিতের বদলে অহিত হইবে। আমাদের দেশে পাঠক্রমের প্রধান দোষ হইল তাহার প্রাচীনপন্থী রূপ, অনেকক্ষেত্রের সমকালীন চিন্তাধারা তাহাতে প্রতিফলিত হয় নাই। ফলে অন্যান্য দেশের শিক্ষার মানের সঙ্গে আমাদের দেশের শিক্ষার মানের একটা ঘোর পার্থক্য থাকিয়া যাইতেছে। পাঠক্রমের আধুনিকীকরণ না হইলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে আমাদের প্রগতি ব্যাহত হইবে। আর সে আধুনিকীকরণের সূত্রপাত হওয়া উচিত স্কুল হইতেই, নহিলে যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষার সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে।"

আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদ ছাত্র-ছাত্রীদের গুরু-ভার কমাইবার সাধু উদ্দেশ্যে পাঠ্যক্রমের সংস্কার অর্থাৎ হেরফের করিতেছেন—হয়ত ইতিমধ্যে এ-কার্য্য শেষ হইয়াছে—এ-সংবাদে অনেকেই অস্বস্তি বোধ করিবেন। এ-বিষয় পত্রিকান্তরের মন্তব্য দিয়া এবারের মত আমাদের এ-বক্তব্যে ছেদ টানিব। মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ তাঁহাদের নব-উদ্যমের ফলে হয়ত কিছু মূল্যহীন কিংবা সস্তা হাত-তালি অর্জ্জন করিবেন, কিন্তু—

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। পাঠক্রমের নব রূপায়ণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহাকে আধুনিক চিন্তাধারার ধারক ও বাহক করিয়া তোলা। ভার হ্রাসের কথাটা গৌণ। তাছাড়া ব্যাপারটা এমন সময়ে করা হইতেছে তাহাতে সন্দেহ হয় আসলে ওই সমস্যার উপর পর্ষদ তেমন কোনও গুরুত্ব দেন নাই। নহিলে ঠিক যখন নূতন শিক্ষাবর্ষ শুরু হইতে চলিয়াছে তখনই তাঁহারা হেরফেরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন কেন? নূতন পাঠ-ক্রম অনুসারে বই লিখিতে ও প্রকাশ করিতে সময়

লাগিবে অথচ আর তিন সপ্তাহ পরেই নূতন ক্লাস আরম্ভ হইবে। একেই তো পড়াশুনা হওয়া আজকাল কঠিন তাহার উপর যদি পাঠ্যপুস্তক বাজারে না মেলে তাহা হইলে তো লেখাপড়া শিকায় উঠিবে। পর্ষদের এত তাড়াহুড়া যে কিসের সেটা বুঝিয়া ওঠা দায়।

কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান কি?

পাঠ্যক্রম যতই শোভন সুন্দর হউক না কেন—ছাত্রসমাজ যদি লিখন-পঠনে যথোচিত মনোনিবেশ না করে, কিংবা তাহাদের ইহা করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে সকল শ্রম, সকল ব্যয় এবং সকলের সকল শুভ-প্রয়াস কেবল ব্যর্থতাই অর্জ্জন করিবে। বিগত কিছুকাল হইতে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কারণে অকারণে যে প্রকার ছাত্র-বিক্ষোভের বন্যা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রতিরোধ এখন না হইলে, বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা করিবার মত কোন কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।

দেশের 'ছাত্রবিদ' পণ্ডিতের দল ছাত্র-বিক্ষোভের সমাধান কিসে কোন মহৌষধ প্রয়োগে ইহা দমন করা যাইবে, তাহা লইয়া তাঁহাদের গভীর চিন্তাপ্রসূত নানা প্রক্রিয়ার কথা ব্যক্ত করিতেছেন, কিন্তু একটা সহজ কথা কেহই বোধহয় স্পষ্ট করিয়া বলা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই! কোন্ কিংবা কোন্ কোন্ বিশেষ 'ক্ষোভের' জন্য ছাত্রমহল আজ অত বিক্ষুব্ধ—তাহা নির্দ্ধারণ করাই বোধহয় এ-সমস্যা সমাধানের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, সেই রোগের মূলে আঘাত করিতে হইবে। সাময়িক 'অ্যাস্‌পিরিণ' প্রয়োগে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে সাময়িক ফললাভ হইবে। কিন্তু অনতিবিলম্বে দ্বিগুণ বেগে এবং প্রবলতর ভাবে আবার রোগ প্রকট হইতে বাধ্য।

বর্ত্তমানের ছাত্র-বিক্ষোভ-রূপ যে-রোগ দেখা দিয়াছে তাহা অকারণ বলিয়া এক কথায় বাতিল করিয়া দেওয়া যায় না, কঠোর শাসনের বেত্রাঘাতেও ইহা প্রশমিত হইবে না। ছাত্রগণ হঠাৎ কেন এমন বেপরোয়া হইয়া আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া, একদা অতিশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক—শিক্ষক মহাশয়দের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা অশিষ্টাচার প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা কি অকারণ—? এ-প্রশ্নের যথাযথ জবাব হয়ত দিতে পারিবেন শিক্ষক-অধ্যাপক মহাশয়গণ এবং ছাত্রদের অভিভাবকবৃন্দ। একথা আমরা বিশ্বাস করি যে, একপক্ষ যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য ঠিকমত পালন করেন, অন্যপক্ষও সাধারণত তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিবে, সাময়িক ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহা একান্তভাবে ক্ষণস্থায়ী। একথা সকলেই জানেন যে, শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে হইলে তাহার জন্য মূল্য দিতে হয়, পদাধিকার বলে আর সবই হয়ত পাওয়া যায়—কিন্তু মানুষের শ্রদ্ধা প্রীতি কখনও নয়।

ছাত্রসমাজের প্রতি দীর্ঘদিনের অবহেলাই বোধহয় অদ্যকার ছাত্র-বিক্ষোভের একটা মূল কারণ। শিক্ষার ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম, হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী ইচ্ছা সত্বেও স্কুল কলেজে প্রবেশ করিতে পারে না, যাহারা এ-সুযোগ পায়, অর্থাভাবে বহুক্ষেত্রে তাহারাও পাঠ্যপুস্তক ক্রয় করিতে পারে না। ইহার উপর আছে বিবিধপ্রকার অভাব অনটনের নিদারুণ জ্বালা। মধ্যবিত্ত-সমাজের অভিভাবক একটি পুত্র বা কন্যাকে হয়ত উচ্চশিক্ষার সামান্য ব্যবস্থা কোন প্রকারে করিয়া দিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু আরো দু-তিনটি সন্তানকে বঞ্চিত করিয়া এ-ব্যবস্থা করিতে হয়। এই সঙ্গীন অবস্থা আজ হাজার হাজার অভিভাবকের। যে-সকল স্কুল এবং কলেজের খ্যাতি আছে, সেইসব স্কুল কলেজে পয়সাওয়ালা লোকের সন্তানেরাই স্থান পায়, আর পায় সেইসব দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রী, যাহারা পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে—কিন্তু হাজারে ইহাদের সংখ্যা কত? বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায়

দেশের সাধারণ লোকের সঙ্গে ছাত্র-সমাজও সর্ব্বপ্রকারে বঞ্চিত এবং অবহেলিত হইতেছে একথা অস্বীকার করা যায় কি? পেটে ভাত নাই, পরণে ছিন্ন মলিন বসন, ছাত্র অথচ বইখাতা প্রায় নাই বলিলেই চলে, দেহের খোরাকের সঙ্গে মনের খোরাকও আমাদের ছাত্রসমাজের শতকরা চার পাঁচজনের ভাগ্যেও জোটে কিনা সন্দেহ, অথচ এই বঞ্চিতেরই দল প্রতিনিয়ত চোখের সামনে দেখিতেছে—হঠাৎ-বিত্তবান এক সমাজের মানুষের পরম বৈভব। সকল বিষয়েই তাহাদের ছড়াছড়ি, কোনদিকেই কোন অভাব অনটনের দায় তাহাদের পোহাইতে হয় না। সর্ব্বভাবে আশা ভঙ্গ হওয়ার বিষময় ফল আজ ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আশাহত ছাত্র-সমাজ তাই আজ বিক্ষুব্ধ—সব কিছু তছনছ করিয়া দিয়া তাহারা অপরাধী সমাজের উপর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা পাইতেছে। কেবল মাত্র উপদেশ বিতরণ করিয়া এবং ছাত্র তথা দেশের যুবসমাজকে "দেশের জন্য, জাতির জন্য কষ্ট স্বীকার ও আত্মত্যাগের 'আহ্বান" জানাইলে তাহা বিফল হইতে বাধ্য। আত্মত্যাগ এবং কষ্ট স্বীকারের "আহ্বান'কারীরা, নিজেরা কতটা কি করিয়াছেন বা করিতেছেন এই বিষয়ে তাহার বাস্তব পরিচয় দিলে হয়ত কাজ কিছুটা হইতে পারে। ছাত্র-সমাজের চিত্ত হইতে ক্ষোভ বিদূরীত করিতে হইলে, তাহাদের প্রাথমিক অভাব অভিযোগের প্রতিকার সর্ব্ব-প্রথম করা দরকার, যেমন—

১—প্রত্যহ অন্তত পেট ভরিয়া একবার আহারের ব্যবস্থা

২—মোটামুটি জামাকাপড়ের সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা মিটান—

৩—বসবাসের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান—

৪—স্কুলে সকল ছাত্রছাত্রীকে ভর্ত্তি হইবার অবকাশ-দান। কলেজ সম্পর্কেও একই কথা

৫—প্রয়োজন এবং চাহিদা মিটাইতে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি। ইহার জন্য বড় বড় পাকা বাড়ীর প্রয়োজন নাই, দরিদ্র দেশের জন্য মেটে বাড়ীতে খড়ের চাল হইলে ক্ষতি কি?

৬—কলিকাতার মত সহরে কয়েকটি পার্কে এ-ব্যবস্থার প্রচলন করা অসম্ভব নহে। গড়ের মাঠে আরো বহু সংখ্যক ছোট ছোট খেলার মাঠের জন্য এখনো প্রচুর স্থান আছে। ইহা হইলে খেলাও পড়াশুনার মত বাধ্যতামূলক করা যাইতে পারে। ফলে সহরে 'রকবাজী' এবং ফুটপাতে ছেলেদের অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম বন্ধ করা সম্ভব। সুষ্ঠুভাবে অবকাশ যাপনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা এবং আয়োজন থাকিলে কোন ছাত্রই বোধহয় অকারণ বিক্ষোভ কিংবা হল্লাবাজীর পথে যাইবে না।

মোটের উপর ছাত্র তথা যুবসমাজের মন হইতে হতাশার ভাব দূর করার সঙ্গে সঙ্গে, তাহারা যে সমাজ, বিশেষ করিয়া কর্ত্তাব্যক্তিদের দ্বারা অবহেলিত এই ভাবও তাহাদের মন হইতে বিদূরিত করা প্রয়োজন। ছাত্র-সমাজকে অহরহ তাহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করা এবং নিশ্চিন্ত—আরামে—অবস্থিত—উচ্চমার্গ—বসবাসকারী মহাশয় ব্যক্তিদের উপদেশবাণী এবং পরামর্শদান হইতেও বিরত থাকিতে হইবে। অন্যকে বিশেষ করিয়া ছাত্রছাত্রীদের উপদেশ দিবার অধিকার আছে তাঁহাদেরই যাঁহারা ছাত্র-সমাজের সামনে নিজেদেরকে বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে দাঁড় করাইতে পারেন। লক্ষ লক্ষ বেকার এবং অসার উপদেশাবলী অপেক্ষা একটি মাত্র উজ্জ্বল আদর্শ-দৃষ্টান্ত অপরিণত বুদ্ধি ছাত্র তথা যুবজনের চিত্তে গভীর রেখাপাত করিয়া থাকে।

শতকরা দশ পনেরোজন ছাত্রের বিক্ষোভকে সমস্ত ছাত্রসমাজের বলিয়া বিবেচনা করা অনুচিত। মাত্র কিছুসংখ্যক ছাত্রের হৈ-হল্লা এবং বে-আইনী বিক্ষোভ প্রকাশের অপরাধকে সমগ্র ছাত্র তথা যুবসমাজের উপর চাপাইয়া দেওয়া অসঙ্গত এবং এইরূপ করা হইলে ছাত্র-সমাজের প্রতি অবিচার করা হইবে। এ-বিষয় শিক্ষা এবং সমাজবিদ পণ্ডিতেরা বিচার বিবেচনা করিয়া সমস্যা

সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন। আমরা এ-বিষয়ে সামান্য প্রাথমিক আলোচনার সঙ্গে আমাদের সামান্যবুদ্ধিমত—সমস্যা সমাধানের সামান্য প্রচেষ্টাই করিলাম। বর্ত্তমান নিবন্ধে আমাদের শেষকথা এই যে—ছাত্রদের প্রকৃত স্নেহ-মমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া বিচারের ব্যবস্থা করিলে, তাহা যে কেবল বেকার হইবে তাহাই নহে, ছাত্র সমাজকে ভবিষ্যতে বৃহত্তর বিক্ষোভ এবং হতাশার পথেই ঠেলিয়া দিবে।

শিক্ষক মহাশয়গণও ভাবিয়া দেখিবেন তাঁহারা নিজেদের এবং সেই সঙ্গে ছাত্রদের প্রতি কতটুকু কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। একথা আজ সর্ব্বজনবিদিত যে খুব কম-সংখ্যক শিক্ষকই আজ নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবহিত আছেন। যাঁহারা শিক্ষাদান বৃত্তি গ্রহণ করেন, তাঁহাদের ঘর সংসার, পরিবার প্রতিপালন দায়িত্ব আছে—কিন্তু তাহাহইলে ইহা সমর্থন করা যায়না শিক্ষকের দল দাবী আদায়ের জন্য কলকারখানার শ্রমিকদের মত পথে নামিয়া ঝাণ্ডা হাতে লইয়া স্লোগান দিতে দিতে রাজভবন কিংবা মহাকরণের দিকে শোভাযাত্রা করিবেন। আমাদের দেশে শিক্ষাদান ব্রত—কষ্টকর বৃত্তি এবং এ-বৃত্তি যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহাদের খানিকটা আত্মত্যাগ করিতেই হইবে। শিক্ষকদের জন্য সরকারকে এমন ব্যবস্থা অবশ্যই করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের খাওয়াপরা এবং পরিবার প্রতিপালনের খরচা মোটামুটি চলিয়া যায়। অর্থ উপার্জ্জন করাই যদি একমাত্র কাম্য এবং উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে কাহারো শিক্ষকতাবৃত্তি গ্রহণ না করাই ভাল। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতার পথেঘাটে শিক্ষকদের দাবী আদায়ের যে পদ্ধতি এবং আচরণ দেখা যায়, তাহা আর যাহাই হউক, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পক্ষে শোভা পায় না। শিক্ষকদের এই দৃষ্টান্ত, ছাত্রদের মনে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাহা শিক্ষকমহাশয়গণ নিজেদের জিজ্ঞাসা করিলে—যথাযথ জবাব পাইবেন।

ছাত্র-আদালত—

দক্ষিণ ভারতে একজন শিক্ষাবিদ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় 'ছাত্র-আদালত' স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবিত এই ছাত্র-আদালতে বিচারক হিসাবে বসিবেন নির্ব্বাচিত ছাত্রগণ। দেশে যখন চারিদিকে বিবিধ কারণে ছাত্রবিক্ষোভের অতি প্রাবল্য দেখা দিয়াছে—সেই সময় এই ছাত্র-আদালতের প্রস্তাব অতি সমীচীন এবং যথাযথ বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বহুকাল পূর্ব্বে আমরা যখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলাম, সেই সময়ের 'বিচার সভার' কথা 'বলা যায়' এই বিচার-সভা রবীন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট ছিল। এই বিচারসভায় চার পাঁচজন ছাত্র (ছাত্রদেরই নির্ব্বাচিত) বিচারকের আসনে বসিতেন। অপরাধী ছাত্রদের এই বিচার সভায়, 'সামন্‌স' পাইলে হাজির হওয়া আবশ্যক বলিয়া গৃহীত হইত। ছাত্র-বিচারকগণ বিচার করিয়া অভিযুক্ত ছাত্রকে যে-দণ্ড দান করিত, সে-দণ্ডভোগ এড়াইয়া যাওয়া কোন অপরাধী ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল না। বলা বাহুল্য বিচার সভার বিচারফলের উপর শিক্ষকদের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা চলিত না। এই বিচারসভায় ছাত্রদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কেও আলোচনা হইত এবং প্রয়োজন বোধে বিচার-সভার নিজ বক্তব্য অধ্যক্ষ সভাতেও প্রেরিত হইত সুবিবেচনা এবং কার্য্যকর পন্থা গ্রহণের জন্য। বলিতে আনন্দ হয়, ঐকালে শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের মধ্যে বর্ত্তমানের ছাত্র-বিক্ষোভ বলিয়া কিছু ছিল না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এমন এক শ্রেণীর ছাত্র ছিল যাহাদের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সময় সময় অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িত, এবং ছাত্রদের সম্পর্কে এই ব্যবস্থা ছাত্রদেরই নির্ব্বাচিত ছাত্রগণই করিত।

বর্ত্তমানের এই সঙ্কটময় সময়ে প্রত্যেক কলেজে, স্কুলে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-আদালত স্থাপিত হইলে ছাত্রদের বহু সমস্যা বহু অভাব,অভিযোগ ছাত্রেরা নিজেরাই সমাধান করিতে পারিবেন। ছাত্রদের শুভবুদ্ধির উদ্রেকের

জন্ম উপর এবং বাহির মহল হইতে কেবল কালতু আহ্বান জানাইলে তাহা বেকার হইবে। একথা আমরা বিশ্বাস করি যে ছাত্র-সমাজের বিক্ষোভের মূলে, তাহাদের বহু অভাব অভিযোগ আছে এবং প্রকৃত মমতার সহিত ছাত্র মন হইতে ক্ষোভের কারণ দূর করিতে পারিলে, ছাত্র-বিক্ষোভও বহু বহু পরিমাণে প্রশমিত হইতে বাধ্য। একথাও সত্য যে অতি সংখ্যালঘু ছাত্রদের মধ্যেই বিক্ষোভের আধিক্য দেখা যায়। শতকরা অন্তত আশীপঁচাশী ভাগ ছাত্র নিজেদের পড়াশুনা লইয়াই থাকিতে চায় কিন্তু সংখ্যালঘু উগ্র ছাত্রদের বিক্ষোভের ফলে তাহারা এক পাশে সরিয়া যায় দাঙ্গা হাঙ্গামার তাপ এড়াইবার জন্ম। ফলে তাহাদের পঠন-পাঠনেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

প্রসঙ্গত বিক্ষোভকারী ছাত্রদের এবার একটা কথা মনে করার সময় হইয়াছে। ছাত্রদের বিক্ষোভের ফলে সাধারণ নাগরিক জীবন যথেষ্ট বিঘ্নিত হইতেছে। গোড়ার দিকে সাধারণ মানুষ ছেলেদের কারণ-অকারণে দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং অন্যায়ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনকে খানিকটা অবহেলা, অনেকে আবার নানাকারণে সরকার বিরোধী মনোভাবের জন্ম ইহাকে খানিকটা পরোক্ষ উৎসাহ দানও করিয়া থাকিতে পারেন কিন্তু ক্রমশ যখন এই বিক্ষোভ সীমা ছাড়াইয়া গেল তখন সাধারণ মানুষও তিক্ত-বিরক্ত হইয়া ছাত্রদের, অথবা অকারণ কিংবা সামান্ত কারণে সারা শহরের নাগরিক জীবন বিক্ষোভের ফলে বিপর্য্যস্ত করাটাকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন। ছাত্র-সমাজের একাংশও বিক্ষোভের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে এমন ঘটনার কথা সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে। আশঙ্কা হয়, অশান্ত ছাত্ররা এবার যদি নিজেদের সংযত না করেন, তাঁহাদের 'গৃহ-যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে।

যে বিশেষ পার্টি দুটি শতকরা প্রায় ৯৯টি ছাত্র-বিক্ষোভের মূল প্ররোচক, সেই দলের গণপতিরা বর্ত্তমান অবস্থার গতি দেখিয়া আবার কি মতলব ভাঁজিয়া, ছাত্রদের ভবিষ্যত চিন্তা না করিয়া, তাহাদের পুরাপুরি দলীয় বাহিনীর অ্যাডভ্যান্স্ গার্ড তথা আগভুম হিসাবে দলীয় স্বার্থে নিয়োগ করিবেন বলা শক্ত। সামান্ত আশার কথা এই যে, কম্যুপার্টি এখন প্রায় চারটি দলে বিভক্ত হইয়াছে এবং তাহাদের এই পার্টি-কোঁদলের ফলে, কম্যুদল হইতে বহু বুদ্ধিমান এবং দেশকল্যাণকামী ভদ্র ছাত্র দলত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় ছাত্রদের মধ্যে—যদি দেশনেতা এবং ছাত্রদরদী শিক্ষক-সম্প্রদায় ঠিক পথে ঠিক ভাবে প্রচার চালাইতে পারেন, হয়ত কাজের কাজ কিছু হইবে।

উপযুক্ত, বিধিসঙ্গত এবং ঠিকভাবে নির্ব্বাচিত ছাত্র-আদালতের বিচারকগণও "ছাত্রদের ভ্রান্তপথ পরিত্যাগ করাইতে অনেক কিছু করিতে পারেন। এই আদালতের বিচারক নির্ব্বাচন বা নিয়োগ ছাত্রসমাজই করিবেন আশা করা যায়, প্রকৃত ছাত্র এবং প্রকৃত ছাত্র নেতারাই বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করিবেন। এই বিষয়ে ছাত্রদের রাজনৈতিক মতবাদের কোন স্থান থাকিবে না, এবং উগ্র ছাত্রনেতা বিচারক পদে বসিলে তিনি নিরপেক্ষভাবে বিচার কার্য পরিচালনা করিবেন, এই আশা অবশ্যই করা যায়।

দেশের পক্ষে 'আত্মহননকর' !!

ভারতের প্রথম প্ল্যানিং মাষ্টার জেনারেল এবং প্রথিতযশা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, "চতুর্থ পরিকল্পনার ভবিষ্যত সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত! পরিচালিত উন্নয়ন কর্ম্মসূচীগুলি বাতিল করিয়া দিলে তাহা ভারতের পক্ষে আত্মহননকর হইবে।" শ্রীঅশোক মেঠা, চতুর্থ পরিকল্পনার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে না—নেতাদের এই মনোভাব দেখিয়া অবাক হইয়াছেন! শ্রী মেঠা অযথা দুঃখ বোধ করিতেছেন। প্রথম তিনিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার

সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে তিনি ভারতকে 'আত্মহত্যারূপ' মহাপাপ হইতে দয়া করিয়া অব্যাহতি দান করিয়া গিয়াছেন বিদেশ হইতে প্রাপ্ত ভিক্ষার দানের কিম্বা ঋণের হাজার হাজার কোটি টাকা নিজের খেয়ালখুসীমত, 'ভারত-মহারত্ন' জবাহরলালের প্রীতি-সাধনার্থে নব-ভারতের প্রচণ্ডাশোক শ্রী মেঠা যে-ভাবে তলহীন দরিয়ায় নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দান মিটাইতে আমাদের নাতি-প্রনাতি এবং তস্য নাতিদেরও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকের জীবন যাপন করিতে হইবে নাসিকান্ত জীবন অবস্থায়। মেঠা সাহেব শেষ মার দিয়া গিয়াছেন তাঁহার সমকালীন অর্থমন্ত্রীর ভারতের মুদ্রামান অবনমিত করান দিয়া; যাহার ফলে দেশের রফতানী যোগ্য, পণ্য বিদেশের বাজারে কাটতি বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন আশাতীত রকম কমিয়া গিয়াছে!

ভারতের 'হননক্রিয়া' সমাজবাদী নেহরুর মানসপুত্র টার্ণ-কোট অশোক মেঠা নিখুঁতভাবে করিয়া গিয়াছেন, কাজেই যে মহাহননক্রিয়া সমাধা হইয়া গিয়াছে তাহার অযথা পুনরাবৃত্তির অবকাশ নাই।

পরিকল্পনার নাটের গুরু অশোক মেঠার মুখে নূতন করিয়া আবার পরিকল্পনার গুণবর্ণনার কথা আমাদের কাছে হয়ত নূতন বিপদের সূচনা করিতেছে। গোপন কারণে হঠাৎ মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া তিনি এখন হয়ত পস্তাইতেছেন এবং কামরাজী বলা জগজীবন রামের মত দিল্লীর কেন্দ্রীয় মিউজিক্যাল চেয়ারে বসিবার সুযোগ সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন, কপালের কথা বলা যায় না, নেহরু কন্যার কৃপাদৃষ্টিতে পড়িয়া আবার কোন ফাঁকে তিনি কেন্দ্রীয় মিউজিক্যাল চেয়ারে হঠাৎ বসিয়া পড়িবেন এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকে ভরাডুবি হইতে উদ্ধার চেষ্টা করিয়া দেশকে অগাধ জলে চিরতরে নিমজ্জিত করিবার নিখুঁত শেষ-পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপদান করিয়া নিজের জীবন সার্থক করিবেন। আমরা পরিকল্পনার বিরোধী নহি, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের নিম্নতম ব্যবস্থা না করিয়া, পরে হইলেও চলিবে এমন সকল রাজকীয় পরিকল্পনা আপাতত অপেক্ষা করিতে পারে।

পরিকল্পক মহাশয়ের দল নিজেদের ভরা পেট দিয়া দেশের মানুষের পেটের অবস্থার কথা বিচার করেন—বিপদের কথা এইখানেই। এখন প্রয়োজন অযথা অবান্তর সর্ব্বাধিক 'পরিকল্পনা নিরোধক' একটিপরিকল্পনার প্রচণ্ডাশোক মেঠা এইরকম একটি পরিকল্পনার দায়িত্ব-গ্রহণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে পারেন।

অব্যক্ত

(গল্প)

আরতি বসু

বসন্ত সন্ধ্যার হাওয়ায় ওড়া শাড়ীর আঁচলটাকে ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিলেন সুপ্রিয়া দেবী। আজকের সন্ধ্যার এই মুহূর্ত্তটা বিগত জীবনের একটা হারিয়ে যাওয়া অধ্যায়কে এইমাত্র মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

এই একটু আগে একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেল যার জন্যে নিজেকেই তিনি দায়ী করতে চান অথচ তিনি নিরুপায়।

আজ অনেকদিন হয়ে গেল এই মেয়েদের হোষ্টেলের সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট হয়ে এসেছেন সুপ্রিয়া দেবী। বিকেলে কি একটা দরকারে তিনি রীতার ঘরে ঢুকেছিলেন, ঘরে ঢোকামাত্রই ঘটেছিল সেই ঘটনাটা। রীতাকে স্তম্ভিত ক'রে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে দিয়েছিলেন চিঠিটাকে; যাতে লেখা ছিল আকুল করা প্রাণের দুটো কথা—যে কথা শেষ হতে চায়নি কিন্তু শেষ ক'রে দিয়েছিলেন সুপ্রিয়া দেবী নিজে।

ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তিনি। কেন এমন করলেন সুপ্রিয়া দেবী, কেন এ কাজ করতে গেলেন? রীতার সারাজীবনের কত না বলা বাণী যে তাঁর জন্যেই শুধু অব্যক্ত রয়ে গেল। এ অপরাধের জন্য তিনিই দায়ী। আজকের শুভক্ষণে যে কথা রীতার প্রাণটা সুস্মিতকে বলতে চেয়েছিল তা হয়তো আর সারা জীবনেও বলা হবেনা। চিঠির লাইনদুটো মনে পড়ে গেল তাঁর।

—জান সুস্মিত, যে কথাটা কতদিন কত মুহূর্ত্ত কেটে গেলেও তোমাকে কিছুতেই জানাতে পারিনি আজ সকাল থেকে সেই কথাটা বলবার জন্যে প্রাণ যেন আমার হাঁপিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে আজ আমি তোমাকে সব জানিয়ে দিতে পারব।

হঠাৎ ঘরে ঢুকে শুধু এইটুকুই চোখে পড়েছিল তাঁর আর তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন চিঠিটাকে।

অন্যায় করেছেন সুপ্রিয়া দেবী। সেই অন্যায়ের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছেন এখন। রীতার সারাজীবনের প্রাণ ভরা অঞ্জলিকে এইভাবে রাস্তার ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলবার কোন অধিকারই তাঁর নেই।

হু হু ক'রে একঝলক হাওয়া এসে যেন তাঁর সমস্ত অতীতটাকে একনিমেষেই ওলোট-পালট করে দিয়ে গেল। আত্মহারা হয়ে তিনি দেখতে লাগলেন; রীতাকে নয়, রীতার জায়গায় এসে দাঁড়াল আর একটি মেয়ে, যার কোন আশ্রয় ছিলনা, সঙ্গী ছিলনা। সেদিন সেই বিগত অতীতে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিল প্রিয়া। আজও সে নিঃসঙ্গই আছে; অন্য সঙ্গী তার জীবনে আসা সম্ভব নয় যে! শুধু কতকগুলো অপরিণত তরুণ মনের সেবায় নিজেকে নিযুক্ত করে নিজেকে ভুলে আছে এইমাত্র, সেদিনের প্রিয়া আর বেঁচে নেই। সুপ্রিয়া দেবী আজ একেবারে নতুন মানুষ হয়ে গিয়েছেন।

সব কিছুই স্পষ্ট মনে আছে তাঁর। সারাদিনের শেষে সেই পরম আকাঙ্খিত রাত্রির কথা। তখন অর্চনদের বাড়ীতে ভাড়া ছিল ওরা। প্রিয়া আর তার বিধবা মা সুচিত্রা দেবী। তারপর যেদিন অতর্কিতে অসময়ে ওকে ছেড়ে চলে গেলেন তিনি সেদিন যেন প্রিয়ার জীবনে অমাবস্যার অন্ধকার নেমে এল। সারাজীবনটা ওর সামনে ভয়াবহ মরুভূমি হয়ে উঠল। তবুও আশা ছাড়লেনা প্রিয়া। আশার বুক বেঁধে জীবনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে বেঁচে রইল ও।

ভোর চারটেয় বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেত ও। পায়ে হেঁটে গিয়ে অনেক দূরের কোন একটা স্কুলে পড়িয়ে আসত রোজ।

অনেক বেলায় বাড়ী ফিরত। সামান্য খাওয়া সেরে আবার বিকেলের দিকে ট্যুইশনি। সূর্য্য তখন প্রায় পশ্চিমে হেলে পড়েছে। ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত নটা বেজে যেত।

এইভাবে জীবন দিয়ে প্রিয়া অর্চনের মা বাবার ঋণ শোধ করে চলেছিল প্রতিদিন। তাঁরা টাকা নিয়ে তবেই আশ্রয় দিয়েছিলেন ওকে, নইলে কি হত প্রিয়ার কে জানে!

শুধু রাতটুকুর আশাতেই ও যেন ওর ক্লান্ত দেহটাকে কোন রকমে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল।

রাত একটায় বাড়ী ফিরত অর্চন। এ বাড়ীর একমাত্র ছেলে, মা বাবার অত্যধিক আদরে অমানুষ হয়ে যাওয়া উচ্ছৃঙ্খল একটা প্রাণ। সারাদিন সে কোথায় থাকত কি করতো কিছুই জানত না প্রিয়া; জানবার কৌতুহলও ছিলনা। ও শুধু ওর আকাঙ্খিত ক্ষণটুকুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকত।

একতলায় আলো ছিলনা ওদের। তারপর এমন কোন লোক ছিলনা যে এতরাতে অর্চনকে দরজা খুলে দেয়। বৃদ্ধ বাবা মা'র পক্ষে এতরাত পর্য্যন্ত দরজা খুলে জেগে বসে থাকা সম্ভবও ছিলনা। তাই প্রতিদিনের এই চরম দায়িত্বটা পরম আনন্দের সঙ্গেই নিতে হয়েছিল প্রিয়াকে।

সারাদিন অর্চনের সঙ্গে প্রায় দেখাই হোতনা প্রিয়ার। কিন্তু রাতের নির্জ্জনে যখন সবাই ঘুমের কোলে লুটিয়ে পড়েছে তখনও তন্দ্রাভাঙ্গা চোখদুটো কি যেন পরম প্রাপ্তির আকাঙ্খায় একাগ্র হয়ে কার পদধ্বনির আশা করত। তারপর একসময় অর্চনের হাতে কড়ানাড়ার শব্দ বাজত। আকুল হয়ে উঠত প্রিয়া। কেউ জানতনা সে কথা কিন্তু নিজের মনের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে প্রতিদিন লজ্জার আবিরে লাল হয়ে উঠত মন। ছুটে আসত প্রিয়া, হাতে প্রদীপ নিয়ে। নইলে অন্ধকারে অর্চন পড়ে যাবে যে! দরজা খুলে দিয়ে আলো হাতে একটু সরে দাঁড়াতো প্রিয়া। সেই প্রদীপের আলোয় অর্চনের ঘুম পাওয়া চোখদুটোকে খুব ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মনে হোত। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসত অর্চন। প্রিয়া চলে আসত নিজের ঘরে। দায়িত্ব তার শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার আগামী রাত্রির জন্য অপেক্ষা করা। সারাদিন দেখা হওয়ার আর কোন উপায় ছিলনা; কারণ অর্চনের ঘুম ভাঙবার আগেই প্রিয়াকে স্কুলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যেতে হোত। যখন ফিরত তখন অর্চন বেরিয়ে গিয়েছে। তার পর অর্চনের ফেরার জন্যে রাত জেগে প্রতিদিন এই অপেক্ষা করা। সারা-দিন ঐ একবারই এই ক্লান্ত ঘুমবিহ্বল প্রাণটার সঙ্গে মনে মনে চুপি চুপি বোঝাপড়া করা। যার সংবাদ অর্চন জানত না। জানা সম্ভবও নয়। মুখ ফুটে কোন কিছু প্রকাশ করার মেয়ে তো প্রিয়া ছিলনা। তাছাড়া এ কামনাকে বুঝি মনেই শুধু প্রশ্রয় দেওয়া চলে।

অর্চনের কোনই দোষ ছিলনা। কোনদিন প্রিয়াকে ভাল করে দেখবার সুযোগই পায়নি।

ভালবাসা তো দূরের কথা। রাতের নির্জনে প্রদীপ হাতে দরজাটুকুকে পার করতে এসে কোন না বলা কথা যে তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে তা কেমন করে জানা সম্ভব ওর।

এমনি করেই প্রতিরাত্রে ছুটো প্রাণ কাছাকাছি এসেও দূরে চলে যেত, কতকথা বলতে চাইত একটা প্রাণ অথচ তার জন্যে প্রস্তুত থাকতনা আর একটা মন।

নিরাপদে অর্চনকে ঘরে পাঠিয়ে অস্থির হয়ে উঠত প্রিয়া। ইচ্ছে হ'ত ঢাকা-দেওয়া খাবারটা অর্চনের কাছে এগিয়ে দেয়। পরিষ্কার জল দিয়ে হাওয়া করে পরম যত্নে খাওয়ায় অর্চনকে।

কিন্তু উপায় ছিলনা। এ দায়িত্ব তো বাড়ীর গিন্নী তাকে দেননি, তাই নিঃশব্দে কান পেতে ও অর্চনের খাওয়ার শব্দ অনুভব করত।

অর্চনের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছিল, ওর মার কাছ থেকেই সমস্ত শুনেছিল প্রিয়া। মা ওকে সহ্য করতে পারতেন না, বাবা ত্যজ্যপুত্র করবেন বলে ভয় দেখাতেন। শুধু প্রিয়াই ছিল একমাত্র মানুষ যে অর্চনের উপরে কিছুতেই বিরূপ হতে পারতনা।

সারাদিন তাকে অর্চনের নিন্দা শুনতে হোত তবুও আশা করে আলো হাতে ছুটে আসত; রাত্রি বেলায় অসামাল দেহ যেন অন্ধকারে পড়ে না যায়।

কখনও কখনও প্রায় উন্মত্ত হয়ে বাড়ী ফিরত অর্চন। কিন্তু আশ্চর্য্য, ওকে এতটুকুও ভয় করত না প্রিয়ার। মনে হোতনা এই নির্জন রাত্রির ভয়ংকরতায় একটা অমানুষ বন্য মাতালের দ্বারা তার যে কোন মুহূর্ত্তে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বরং ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে প্রদীপের আলোয় ওর চলতি পথটাকে আলোময় করে তুলতে ওর ভালো লাগতো।

অতিরিক্ত মদ্যপানে অর্চনের লিভারটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার ওকে হাসপাতালে যাওয়ার নির্দ্দেশ দিয়ে গেলেন। কলকাতার বাইরে কোথায় যেন ওদের এক ডাক্তার আত্মীয়ের নার্সিং-হোম ছিল। সেখানেই চলে যাবার মনস্থির করলে অর্চন।

যাবার আগের দিন আর কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেনা প্রিয়া। দুপুর বেলায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লে ও আকুল হয়ে অর্চনের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। অর্চনকে দেখেই যেন চমকে উঠল প্রিয়া। এ কি এ তো সে অর্চন নয়। রাতের বেলায় প্রদীপের ম্লান আলোতে যে মানুষটাকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আর জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ মনে হত সেই নির্বিকার নিরাসক্তি তো ওর সারাদেহের কোথাও নেই। বরং পরম এক আসক্তির ভারে বেঁচে থাকার একান্ত মায়ায় ও যেন কিছুতেই এই জীবনটাকে ছেড়ে চলে যেতে পারছেনা। ওপার থেকে ডাক এসেছে, এই ডাকে বুঝি সাড়া দিতে হবে অর্চনকে। অর্চনের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটা আসন্ন অনিষ্ট কামনায় ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে প্রিয়া। তাকিয়ে তাকিয়েও যেন আশ মিটছেনা ওর। দিনের আলোয় এমন করে অর্চনকে দেখার সুযোগ জীবনে বুঝি আর কোনদিন আসেনি। অথচ সকালের মায়ায় এই তো ওকে প্রথম আর শেষ দেখা। কালই তো এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে অর্চন, কবে ফিরবে কে জানে, হয়তো ফিরবেনা, জানবেনা প্রতিরাতে তেমনি করেই ওর পদধ্বনি শোনবার আশায় প্রদীপ হাতে বসে আছে একটা অতৃপ্ত আত্মা। যে কোনদিন মুখ ফুটে কিছু জানালনা কখনো, ভাগ্যের পরিহাসে নীরবেই নিজের বঞ্চিত জীবনের ভার বয়ে গেল। তার জন্যে কোন অভিযোগ নেই প্রিয়ার। কিন্তু অর্চন যদি আর না বাঁচে। আরও একটু এগিয়ে এল প্রিয়া, ধীর পদক্ষেপে অর্চনের মাথার কাছে এসে দাঁড়াল, মাথায় হাত দিয়ে আস্তে ডাকল—অর্চনবাবু! আচমকা একটা স্পর্শে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অর্চনের। অস্ফুটে উচ্চারণ করলে—কে? আর্ত্ত বঞ্চিত একটা প্রাণ যেন আর্ত্তনাদ করে উঠল—'আমি প্রিয়া।'

রোগের যন্ত্রণাটা আবার বুঝি বাড়ল। শীর্ণ দেখাল অর্চনকে। করুণ কণ্ঠে বললে—কিছু বলবেন? প্রিয়া মাথা নীচু করে রইল। আস্তে আস্তে জানাল ওর সারাজীবনের একমাত্র না বলা কথা। বললে যদি কোন দিন আপনার প্রয়োজন হয় আমাকে জানাবেন তো?

এ কথা শুনে একটু ম্লান হাসি হাসলে অর্চন। বললে —একটা ওপারের যাত্রীর জীবনে আর কি কোন প্রয়োজন আসবে কোনদিন?

হঠাৎ ধৈর্য্য হারিয়ে ফেললে প্রিয়া। অর্চনের পায়ে মাথা রেখে হু হু করে কেঁদে উঠল ও।

হঠাৎ-ঘটা এই ঘটনায় বিব্রত হয়ে উঠল অর্চন। উঠতে চেষ্টা করলে, পারলে না। বিচলিত কণ্ঠে বলে উঠলো—ছি ছি, এ কি করছেন আপনি, একটা বিদায়ী প্রাণকে কেন এমন করে মায়ায় জড়ালেন বলুন তো?

অশ্রুসিক্তা প্রিয়া বললে—জানিনা, জানিনা, আমি কিছু জানিনা, কিন্তু কেন আপনি এমন করে জীবনটাকে নষ্ট করে ফেললেন, কেন কেন?

অর্চনের চোখটা এবার বুঝি সিক্ত হয়ে উঠলো। বললে, আমার জীবনে যে বাঁচায় দরকার আছে এ কথা এতদিন কেন বলনি প্রিয়া, কেন এতদিন চুপ করে ছিলে?

মুখ তুলে ওর অর্চনকে ভাল করে দেখলে প্রিয়া। বললে—আমার বলার মুখ যদি নাই থাকে, আপনার তো চোখ আর মন দুটোই ছিল, কেন চিনে নেননি আপনার প্রিয়াকে?

এইটুকু বলেই চুপ করে ছিল প্রিয়া। বলতে পারেনি এবার ডেকে নিন আমাকে, প্রিয়া আপনার পথ চেয়েই বসে আছে সারাজীবন। জীবন ভোর আপনার জন্যেই কাঁদবে সে।

তারপর যথাসময়ে চলে গিয়েছিল অর্চন। আরও কয়েক বছর পরে এই হস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে ওখান থেকে চির জীবনের মত চলে এসেছিল প্রিয়া। অর্চনের সঙ্গে আর দেখা হয়নি কোনদিন। কেমন আছে, এমন কি বেঁচে আছে কিনা তাও জানেনা প্রিয়া।

রাত্রি হয়ে গেছে। বারান্দা থেকে ঘরে এসে দাঁড়ালেন সুপ্রিয়া দেবী। এক্ষুণি নীচে নেমে রীতার ঘরে যাবেন তিনি। বলবেন সুমিতকে আর একটা চিঠি লিখে তোমার সব কথা জানিয়ে দাও রীতা। নয়তো না বলা বাণী তোমার চিরকাল অনুক্তই রয়ে যাবে!

সম্মোহন

শঙ্কর চক্রবর্তী

মিছে কোন তর্কে কিংবা মীমাংসায় যাবো না এখন
উপস্থিত হৃদয়ের কাছে থাকবো পারি যতদিন
জাগতিক আলোড়ন যুদ্ধ মৃত্যু থেকে উদাসীন—
আশ্চর্য নির্লিপ্ত এক সুশাসিত নৈর্ব্যক্তিক মন !

কেননা এখানে শুধু বেঁচে থাকা ক্ষুব্ধ আলোড়ন
বাহ্যিক বিচার হিংসা—মানবতা নিতান্ত সঙ্গীন—
হয়তো বা পরিত্যজ্য বহু ব্যবহারে সে মলিন
বুদ্ধির বিপাকে দীর্ণ হারিয়েছে তার সম্মোহন !

তবুও নদীরা ঠিক বয়ে যায় অরণ্য শ্যামল
পাখিরা আকাশে ওড়ে, মেঘমুক্ত অপার নীলিমা
প্রান্তরের শূন্যতায় প্রেম হয় জ্যোৎস্নার মমতা—
চাতক পাখিরা খোঁজে পায় তৃষ্ণা মেটাবার জল !
এই শান্তি পরিতৃপ্তি হিরণ্ময় দীপ্ত অরুণিমা—
আমার হৃদয়ে আজ উন্মোচিত মুক্তির বারতা।

মন

শ্রীবাণীকুমার দেব

আমি তোমায় অনুভব করি
অনুভব করি আমার সমগ্র সত্তায়
অনুভব করি আমার শিরায় শিরায়
তুমি কে ?

আমি তোমায় খুঁজে ফিরি দিগন্তের কিনারায়
খুঁজে ফিরি সমুদ্রের নীল নিশানায়
আমার আকাশ—জিজ্ঞাসা তুমি
তুমি কে ?

যখন তুমি হারিয়ে যাও তখন ?
তখন মনে হয় যেন হারিয়ে গেছে এই সুন্দর পৃথিবীটা
হারিয়ে গেছে যেন সব কিছু কোন এক অতলান্ত
গহীন গহ্বরে
আমি আতঙ্কে শিউরে উঠি।

শিউরে উঠি পৃথ্বীর সেই ভয়ালরূপ দেখে
অট্টহাস্যে হেসে উঠে চারিদিক
চমকাই আমি ! হঠাৎ প্রশ্ন করি,—'কে-কে-তুমি
দূর হতে ক্ষীণ কণ্ঠে ভেসে আসে স্বর—'আমি মন

আহ্বান

শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক আলিপুর জেলে রচিত ইংরেজী কবিতা হইতে)

শ্রীজিৎ ভট্টাচার্য (পণ্ডিচেরী)

পার্ব্বত্য অসমতল গিরিশৃঙ্গপরে
শৈত্যবায়ু, শৈত্য আবহাওয়া আবরিত
চারিধারে মোর—চলিতেছি সেই পথে
কে আসিবে মোর পাশে ? কে উঠিবে সাথে ?
যে গতি দুর্গম অতি ঝর্ণা কূলে কূলে
বিমথি তুষারপুঞ্জ কঠিন প্রয়াসে ?

নগরের সীমানায় গণ্ডীবদ্ধ নয়
সঙ্কুচিত নহে তাহা দুয়ার প্রাচীরে
যেথা বাস করি আমি। মেঘমালাবৃত
অনন্ত নীলিমা ঊর্দ্ধে বিরাজিত যেথা
বিরোধী পবনবৃন্দ রণিছে সেথায়।

সে এক নৈঃসঙ্গ সহ আছি ক্রীড়ারত
বিহরি আপনক্ষেত্রে চিরশান্তমতি
দুর্যোগ সুযোগে মোর হয় পরিণত
কে হবে উদার হৃদি ? কে বা মুক্ত হবে ?
ঊর্দ্ধলোকাবতরণে—বায়ু শুচিতায়।

তুফান ঈশ্বর আমি, আমিই গিরীশ
পরম গৌরবময় মুক্ত আত্মা আমি।
বীর কুলোদ্ভব বীর, মহাশক্তিমান
সুদৃঢ় নিশ্চয় হবে, সে লবে রাজ্যের
এই অংশ মোর, সে চলিবে সাথে সাথে।

আলো-ছায়া

রেবা ভবানী

সে এক বিচিত্র পৃথিবী
ভাষা নেই, হাসি নেই, সুর নেই,
নেই কোন ছন্দের ব্যঞ্জনা!
অভিশপ্ত কামনার দুর্ব্বাশার অগ্নিরোষ
ধিকি ধিকি জলে শুধু! নষ্ট নীড়,
ব্যর্থ প্রেম, দিবানিশি অস্থির যন্ত্রণা!
বার বার মনে হয়, মনে হয়
চলে যাই বহু দূরে—'
যেথা আছে মাটি-ছোঁয়া পৃথিবীতে
গাছে-ঢাকা, খড়ে ছাওয়া
স্নিগ্ধ-কুটীর। রোদ-গলা আকাশের
কোল ঘেঁষে উড়ে যায় চিল যেথা;
(যেথা) পাখী-ডাকা সকালে মাঠে-বাটে
ঝরে পড়ে রূপালী শিশির।
যেথা নিবিড় সাঁঝের ভালে
ঝিকিমিকি তারাদের হাসি ঝিলমিল।
আঁধার রাতের নীড়ে অশথের ডালে ডালে
দীপ-জ্বালা জোনাকীর ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ফেরা-
(যেথা) খোড়ো-ঘরে গাঢ়-ঘুম
উষ্ণতার ছোঁয়া লেগে শান্তিতে সুস্থির।।
তবু কোথা টান পড়ে;
ব্যর্থ হয় সৌম্য সুর, সবুজের ডাক।
মুছে যায় শান্তির সোনালী-প্রভাত।
বিচিত্র সে পৃথিবীর নিরন্তর বেদনার
সুর-হারা, ছন্দ-ভাঙা গান
অনুক্ষণ মনে বাজে।
স্বপ্ন অবসান।।

রামমোহনের অন্তর্জীবন

ননীভূষণ দাসগুপ্ত

[রামমোহন একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন, এইরূপ একটা ভুল ধারণা আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও প্রচলিত রহিয়াছে। এই ভুল ধারণার অবসান হওয়া আমাদের জাতীয় স্বার্থের জন্যই প্রয়োজন। রামমোহন নবভারতের ভবিষ্যতের অভিমুখে যাত্রাপথের যে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, আমরা তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। ধর্ম্মের আচার-ব্যবহারকেই আমরা ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি। আচার ব্যবহার ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম আরও গভীরের বিষয়। ধর্ম্মবোধ যতদিন মানুষের মনে সহজাত প্রবৃত্তির মতো প্রকাশ না পাইতেছে। ততদিন সমাজের কল্যাণ সম্ভাবিত হইতে পারে না। "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকার ১ ও ১৬ ভাদ্র ১৩৭৫ সংখ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রদত্ত আচার্যের উপাসনান্তিক এই ভাষণটি মুদ্রিত হইয়াছে।]

রামমোহনের পাণ্ডিত্য, তাঁর অসাধারণ কর্ম্ম-কুশলতা, কর্ম্মে অসামান্য সাফল্য নিয়ে রামমোহন-সভা-সমিতিতে অনেক কিছু বলা হয়ে থাকে। কিন্তু রামমোহনের যে অন্তর্জীবন এই সমুদয়ের উৎস-স্থল ছিল, তার কথা প্রায় কেউই বলেন না। তাঁর এই অন্তর্জীবন সম্পর্কেই আমি কিছু বলতে চাই।

আমাদের ছেলেবেলায় একটি ইংরেজী বই এদেশে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বইটি John Aukenএর লেখা Evening at Home। লেখক চিন্তাশীল ব্যক্তি। তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল: জগতে যত অনৈক্য যত বৈষম্য, যত হানাহানি, সব কিছুর মূলে রয়েছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে মানুষের মন থেকে উৎপাটিত কর, দেখবে সব বিরোধ অন্তর্হিত হবে। এই যে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে দ্বন্দ্ব-বিরোধ, তা রামমোহনকেও পীড়িত করেছে, কিন্তু তিনি বলেছেন একেবারে উলটো কথা,—ধর্ম্মকে ঈশ্বরকে জীবনে গ্রহণ কর, প্রতিষ্ঠিত কর। একমাত্র তাহলেই সমস্ত দ্বন্দ্ব-বিরোধের অবসান ঘটবে; অপর কোনও পথ নেই উপায় নেই এই ক্রমবর্ধমান বিনষ্টি থেকে মুক্তির। তাঁর কথা: Religion, and religion alone can obliterate all differences.

প্রচলিত বহু ধর্ম্ম-পথের পাশে রামমোহন আর একটি ধর্ম্ম-পথকে দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন নি। তিনি যা একান্তভাবে চেয়েছিলেন তা হল বিভিন্ন ধর্ম্মের মানুষ তার নিজস্ব ধর্ম্ম-সাধনার মধ্যে থেকেই ঈশ্বর যে এক, ধর্ম্ম যে এক, এই বোধকে আপন আপন অন্তরে জাগ্রত করে তুলবে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত উপাসনা-মন্দিরের ট্রাষ্ট-ডীড এই আশা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই রচিত। রামমোহনের স্বপ্ন ছিল, তাঁর পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দিরে হিন্দু আসবে, মুসলমান আসবে, খ্রীষ্টান আসবে; আরও যত ধর্ম্মমতের মানুষ আছে, তারাও আসবে; একত্র হয়ে পাশাপাশি থেকে এক ঈশ্বরের উপাসনা করবে। রামমোহনের আশা ও বিশ্বাস ছিল, এইরূপ মিলিত উপাসনার মাধ্যমে মানুষে

মানুষে পারস্পরিক বিরোধের ভাবগুলি ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকবে, পারস্পরিক ঐক্যের দিকটি বলিষ্ঠতা লাভ করবে। এবং একদা 'উপজাতি'র স্থলে সমগ্র ভারতে এক মহান ভারতীয় জাতির উদ্ভব হবে।

একটি বিশেষ লক্ষণীয় কথা এই যে, কোন বিশেষ শাস্ত্রকেই রামমোহন আলাদা ভাবে চিহ্নিতের সম্মান দেন নি। বহু ধর্মশাস্ত্র নিয়ে শুধু উপর উপর নয়, গভীর ভাবে আলোচনা করেছেন রামমোহন, সে-সকলের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করেছেন; যেমন হিন্দুর বেদ-বেদান্ত, তেমনই খ্রীষ্টীয় সাধকদের বাইবেল-আদিতে তাঁর প্রবেশ এমনই গভীর ছিল যে বেদ-বেদান্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে হিন্দুপণ্ডিত ও বাইবেলের মর্মকথা নিয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে তিনি সমানে সমানে তত্ত্বালোচনা করেছেন, বহু বিষয়ে তাঁদের বক্তব্যের যাথার্থ্য নিয়ে তাঁদের চ্যালেঞ্জ করেছেন। শুধু যে ঐ সকল শাস্ত্রে তাঁর অসামান্য দখল ছিল তাই নয়, সে-সকলের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল অপরিমেয়। কিন্তু তবুও আপনি যে উপাসনা-মন্দিরটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন, তার ভিত্তিতে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থই তিনি রাখলেন না। বস্তুতঃ কোনও শাস্ত্র-গ্রন্থের উল্লেখমাত্রও রামমোহন এই এই সূত্রে করেন নি।

রামমোহন দেখেছিলেন, ধনের যেমন একটা ঔদ্ধত্য আছে, জাতের যেমন একটা দম্ভ আছে, তেমনই বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রেরও ঔদ্ধত্য আছে, দম্ভ আছে। তিনি স্থির জেনেছিলেন, এই ঔদ্ধত্য, এই দম্ভ মানুষে মানুষে মিলনের পক্ষে অন্তরায় হবে। তাই তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন, কোনো শাস্ত্রগ্রন্থের ওপর চোখ ও মন রেখে নয়, আপন অন্তর ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর এক, ধর্ম এক, মানুষ এক' এই বোধকে জাগ্রত করেই, মানুষ তাঁর প্রতিষ্ঠিত উপাসনা-মন্দিরে সমবেত হবে। রামমোহন বিভিন্ন শাস্ত্রকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিলেন, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি মূল্য দিতেন আপন আপন পরিমার্জিত বিকশিত অন্তর-মানসে পরমেশ্বরের অস্তিত্বের ও তাঁর বিভিন্ন স্বরূপের যে প্রতীতি জন্মে, তাকে।

রামমোহন সম্পর্কে এই সূত্রে আমি আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সত্যের দুটো দিক আছে। এক দিকের কথা,—মানুষ সত্যকে আবিষ্কার করে, তার স্বরূপ নির্ণয় করে, তার সম্পর্কে বিচার বিতর্ক করে। অপর দিকটি সত্য জানবার পর তার কাছে মানুষের নতিস্বীকারের দিক। সত্য শুধু চিন্তন-মনন কি শাস্ত্রচর্চ্চার দ্বারা আপনি জানবার বা অপরের কাছে প্রচার করবার বস্তু নয়। সত্য সম্পর্কে আমাদের একটা দায় আছে,—যা সত্য বলে জেনেছি, তা সর্ব্বথা সর্ব্বদা পালন করবার দায়। এই যে সত্য সম্পর্কে দায়, রামমোহন তা নিঃশর্তে মেনে নিয়েছিলেন। সত্যকে তিনি শুধু ধ্যান ধারণার বস্তু করে কোনও উর্দ্ধ লোকে রাখেন নি, তাকে মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, তার হাতে আপনাকে সমর্পণ করেছিলেন। ঈশ্বর এক বলে, ধর্ম এক বলে অনেকে জেনেছেন, সর্ব্ব মানবের মধ্যে ঐক্যের ধারণাও অনেকের ছিল, কিন্তু এই জানার সম্পর্কে যে একটা দায়বদ্ধতা আছে সে-বোধ তাঁদের চিন্তায় জাগে নি। রামমোহন সেখানে থামতে পারেন নি, সেখানে থেমে থাকার কথা সম্ভবতঃ ভাবেনও নি। ঐ পরম সত্য অন্তরে লাভ করবার পর তিনি আপনার সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন সর্ব্ব জাতির সর্ব্ব শ্রেণীর সকল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের নামে, ধর্ম্মের নামে ঐক্যের বোধ জাগাতে।

আমাদের শিক্ষাদর্শ

স্বামী তেজসানন্দ

[পৃথিবীর সব দেশেই, ভারতে তো বটেই ছাত্র-সমাজে গুরুতর অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ এবং শিক্ষক ও রাজনৈতিক দলগুলির কার্যকলাপ বচন বাচন প্রভৃতি সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অহিতকর হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে শুভচিন্তা অধ্যয়ন ও সমাজ-কল্যাণকর ক্রিয়াদির প্রচেষ্টা ছাত্র-সমাজ হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। স্বামী তেজসানন্দ সুদীর্ঘকাল ছাত্রদের সঙ্গে এবং

শিক্ষণ-কার্যে ব্যাপৃত আছেন। "উদ্বোধন" পত্রিকার পৌষ ১৩৭৫ সংখ্যায় তাঁহার লিখিত এই প্রবন্ধটি ছাত্রদের সমস্যা-সমাধানের একটি ইঙ্গিত দিতেছে।]

সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি প্রচণ্ড অসন্তোষবহ্নি বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই অসন্তোষ-বহ্নি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে খুবই ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, যাহার ফলে দেশের শান্তিপূর্ণ সামগ্রিক উন্নতি গুরুতরভাবে ব্যাহত হইতেছে। বলা বাহুল্য, যে শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত, তাহারাই এই সকল আত্মঘাতী ঘটনা-পরম্পরার আবর্তে পড়িয়া প্রকৃত আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছে এবং তাহাদের নিজেদের ব্যক্তিগত কল্যাণ তথা দেশের সমষ্টিগত কল্যাণের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে।

ইহা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতালাভের পর হইতে সুদীর্ঘ একুশ বৎসরের মধ্যে ভারতের কর্ণধারগণের কতিপয় উন্নয়নমূলক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে দেশ বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। শিক্ষাজগতে যে তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, ইহার প্রকৃত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে না পারিলে দেশের ভবিষ্যৎ যে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সাময়িকভাবে কতিপয় প্রতিকারমূলক নিয়মকানুন করিয়া এই ব্যাধির প্রকোপ হইতে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব নহে।

এই অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, রাজনীতিক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে শিক্ষাজগতে বিষময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সর্ব্বোপরি যাঁহাদের উপর বিদ্যার্থিগণের প্রকৃত শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্র গঠনের দায়িত্ব নির্ভর করে, সেই শিক্ষকগণের কাহারও কাহারও অশোভন আচরণ ছাত্রসমাজের নিকট প্রকট হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।"—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করিয়া থাকেন, প্রাকৃত লোকসকলও তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে। খুবই দুঃখের বিষয়,—যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদেরও সন্তান-সন্ততি দলবদ্ধ হইয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এই কণ্টকাকীর্ণ বিপদসঙ্কুল পথে পদক্ষেপ করিতে শুরু করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৫-৪৯), মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩), ১৯৫৮ সালের ৬ই নভেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে তদানীন্তন রেক্টর ডঃ ত্রিগুণা সেন (বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী) কর্তৃক আহূত শিক্ষাবিদগণের সম্মেলন, ১৯৬১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা গঠিত কমিটি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ সম্মেলন এই শিক্ষাসংস্কারসাধনের ও বহুমুখী সমস্যাসমাধানের জন্য বিশদভাবে আলোচন করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তাঁহারা ইহাও দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন যে, ছাত্র ও শিক্ষকগণকে রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকিতে হইবে। ভারতসরকারের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালী স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন—এই শিক্ষাসংকট পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একদিকে যেমন পিতামাতা তাঁহাদের সন্তানগণকে সংযত জীবন যাপন করাইতে অসমর্থ, অপরদিকে শিক্ষকগণও তাঁহাদের সমুন্নত চরিত্র ও সুসংযত জীবন দিয়া ছাত্রগণের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে অপারগ। অধিকন্তু, শিক্ষকগণের অনেকের অবাঞ্ছিত আচরণ প্রকারান্তরে ছাত্রগণকেও ঐভাবে প্রণোদিত করিতেছে। আর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তথাকথিত রাজনৈতিক দল স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে! যে-সকল শিক্ষাবিদ্ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন যে, শিক্ষকগণ কোন রাজনীতিসংস্থার সভ্য হইতে পারিবেন না এবং বিদ্যায়তনের বিদ্যার্থিবৃন্দের নিকট প্ররোচনামূলক কোন রাজনীতিবিষয়ক আলোচনাও করিবেন না। বরং তাঁহারা ছাত্রগণকে বিপথগামী হইতে দেখিলে ব্যক্তিগতভাবে ও সমবেতভাবে তাহার প্রতিবিধান করিতে সচেষ্ট হইবেন। কারণ, ছাত্রদের কল্যাণ তাঁহাদেরই শিক্ষা ও আচরণের উপর নির্ভর করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সমাবর্ত্তন-উৎসব উপলক্ষে

জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ও সুস্পষ্টভাবে ঠিক এই কথাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়াছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তির সময়োপযোগী সাবধান-বাণী ও নির্দেশসমূহ শিক্ষকমণ্ডলীর হৃদয়ে আশানুরূপ রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাহার ফলও হইয়াছে বিষময়। এই সম্পর্কে পূর্ব্বোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দ্বারা গঠিত কমিটির বিবরণী (Report on the standards of University Education) আংশিকভাবে নিয়ে প্রবৃত্ত হইল। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে সামগ্রিক উন্নতিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। উপরি-উক্ত কমিটির মূল বক্তব্য এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শক্তিশালী জীবন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে পরিণত করিতে হইলে ইহাকে আদর্শ শিক্ষক ও আদর্শ ছাত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে তাহারা দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করিয়া সর্ব্বসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। তবেই বাস্তবিকপক্ষে সমাজকে সজীব ও গতিশীল রাখা সম্ভব হইবে। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া শিক্ষালাভ করিলে তাহারা সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে তাহারা প্রকৃত দায়িত্বশীল নাগরিক হইয়া উঠিতে পারিবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতীয় জীবন যে কিরূপ বিপর্যস্ত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া জন্মভূমির গৌরবপুনরুদ্ধারকল্পে বর্ত্তমান প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল রাখিয়া শিক্ষায়তনগুলিকে গড়িয়া তুলিবার যে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার সারগর্ভ বাণী ও রচনা হইতে কতকটা অনুধাবন করা যাইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন: ভারতীয় আদর্শকে ক্ষুণ্ন না করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণে যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিবে তাহাই বর্ত্তমান ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা-পূরণের সহায়ক হইবে। চাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত্র ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও আত্মপ্রত্যয়। মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতেই বিদ্যমান তাহারই বিকাশসাধনকে বলে শিক্ষা। সুতরাং উপদেষ্টার কর্তব্য কেবল পথ হইতে বাধাবিঘ্নগুলি সরাইয়া দেওয়া। যদি শিক্ষা বলিতে কতকগুলি বিষয় জানা মাত্র বুঝায়, তবে লাইব্রেরীগুলি তো জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধু, অভিধানসমূহই তো ঋষি। সুতরাং আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত যে, আমাদের আধ্যাত্মিক লৌকিক সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব জাতীয়ভাবে ঐ শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। শিক্ষাটি সংস্কারে পরিণত হইয়া ধমনীগত হইলে তবে তাহাকে শিক্ষা বলে। যে বিদ্যার উন্মেষে ইতরসাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করিতে পারা যায় না, যাহাতে মানুষের চরিত্রবল, নিঃস্বার্থপরতা ও সিংহসাহসিকতা বৃদ্ধি পায় না, তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না।

স্বামীজী বলিতেন: যদি জাতীয় জীবনকে অব্যাহত রাখিতে চাও, তবে তোমাদিগকে ধর্ম্মরক্ষায় সচেষ্ট হইতে হইবে। এক হস্তে দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মকে ধরিয়া, অপর হস্ত প্রসারিত করিয়া অন্যান্য জাতির নিকট যাহা শিক্ষা করিবার তাহা শিক্ষা কর। কিন্তু মনে রাখিও, সেইগুলিকে জাতীয় জীবনের মূল আদর্শের অনুগত রাখিতে হইবে—তবেই ভবিষ্যৎ ভারত অপূর্ব্ব মহিমামণ্ডিত হইয়া আবির্ভূত হইবে। আমার বিশ্বাস যে, যদি কেহ হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদদলিত, চিরবুভুক্ষিত ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। তিনি বলিয়াছেন—আমি তোমাদের নিকট গরীব, অজ্ঞ, অত্যাচার-পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি—তোমার এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর—যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

আমাদের বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি কেবল পরীক্ষা-সংসদরূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ভারতের কৃষ্টি বিশেষভাবে প্রকটিত করিতে হইবে এবং যাবতীয় শিক্ষায়তনগুলিই উহার প্রসারণের যন্ত্রস্বরূপ হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শবাদী হইয়াও বাস্তববাদী ছিলেন; তাই তিনি ভারতের লুপ্ত-গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন এবং জাতীয় আদর্শে বিদ্যায়তনগুলি গড়িয়া তুলিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু এখন প্রশ্ন এই—বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও তদন্তর্গত শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহ এই গুরুদায়িত্ব বহন করিতেছে কি? শিক্ষকগণ সবুজপ্রাণ যুবকগণের প্রকৃত শিক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন কি? যাঁহারা সমাজের ও জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া দেশের জনগণের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ব্রতী হইয়াছেন কি?

যে-সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাহির হইবে, তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও অবদান এবং শিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানাদির ক্ষেত্রে ভারত কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিল তাহার সহিত সুপরিচিত থাকিবে। ইহা তখনই সম্ভব যখন তাহাদের শিক্ষিতব্য বিষয়ের মধ্যে এই সকল বিষয় আবশ্যিক পাঠ্যরূপে পরিগণিত হইবে। বস্তুতঃ ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষায় সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হইবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। উন্নতিকামী ভারতে শিক্ষার্থীকে তিনটি জিনিষ বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে: প্রথমতঃ তাহারা যেন দেশবাসীর জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন হয় এবং নিজদিগকে উচ্চশিক্ষিত মনে করিয়া সকলের নিকট হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া না রাখে। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে—চিরাচরিত প্রথায় চালিত মৃতপ্রায় সমাজকে আধুনিক উন্নতিশীল করিয়া তোলা। তৃতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য হইবে—চারিপার্শ্বের সমস্যাসমূহ অনুধাবন ও অনুসন্ধান করিয়া তাহার একটি বাস্তব সমাধান খুঁজিয়া বাহির করা।

ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় একটি সর্ব্বজনীন শিক্ষাকেন্দ্র এবং ইহার জ্ঞানাহরণের ক্ষেত্র সীমিত নহে। জ্ঞানার্জ্জনের প্রয়োজনে পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ—এইরূপ কোন ভেদ থাকিবে না। বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু প্রবর্ত্তন করিবে না যাহাতে সমগ্র জগতের বিদগ্ধ সমাজ ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। পরন্তু বিশ্বের সর্ব্বস্থান হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সকলকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাদর্শও তদীয় আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষারই অনুবর্ত্তী ছিল। নিবেদিতা আজীবন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া এবং দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিতা হইয়া যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, ভারতীয় শিক্ষাবেদীমূলে তাহা সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিয়া উহার সার্থক রূপায়ণ করিয়াছিলেন। নিবেদিতা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Hints on National Education in India'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন: কেবল শুষ্ক পুঁথিগত বিদ্যা ও ঘটনাপুঞ্জ দ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না। শিক্ষা বলিতে প্রাণদ তথা জীবন্ত ভাবরাশিকেই বুঝায়, যাহা বালক-বালিকার মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করে। তিনি আবার বলিতেছেন—যে সত্য লাভ করিলে আমাদের জীবনকে সরস ও আনন্দময় করিয়া তোলা সম্ভব, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সাবলীল চিন্তাশীলতা যে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র হইয়া না দাঁড়ায়, ততদিন আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বার কোন মহৎ কার্য ও উচ্চচিন্তার দিকে উন্মুক্ত হইবে না।

সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার

নারায়ণ চৌধুরী

["বেতার জগৎ" পাক্ষিক পত্রিকার ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৮ সংখ্যায় সাহিত্যে স্বেচ্ছাচার বা অশ্লীলতা সম্পর্কে নারায়ণ চৌধুরী একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সম্প্রতি আদালতে অশ্লীল রচনা প্রকাশের অভিযোগে জনৈক উপন্যাস-লেখক ও পত্রিকা-প্রকাশকের দণ্ড হইয়াছে, অপর একটি রচনার জন্য মামলা চলিতেছে। সাহিত্যে, বিশেষতঃ গল্প উপন্যাসে লেখকের লেখন-স্বাধীনতা কতোটা বিস্তৃত, কুরুচি ও সুরুচির, বাস্তব

ও সৌন্দর্যবোধের মাপকাঠি কি, এই আলোচনা বহুবার হইয়াছে। শুধু সাহিত্য নহে, মানুষের সর্ববিধ প্রয়াসই সমাজ-সচেতন হইতে হয়, তাহা না হইলে সেই প্রয়াসের কোনও মূল্য থাকে না। শুধু মূল্য থাকে না বলা সঙ্গত নহে, অনেক সময় সেই প্রয়াস সমাজের ক্ষতির কারণও হইয়া দাঁড়ায়। Art for art's sake' বা 'শিল্পের জন্যই শিল্প' কথাটা তখনই সত্য হইয়া ওঠে যখন সেই শিল্পসৃষ্টি মানুষের মনকে সুস্থ সতেজ ও প্রাণবান করিবার সহায়তা করে। নারায়ণ চৌধুরীর রচনায় সাহিত্যে অশ্লীলতার সীমারেখার ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।]

বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' যুগে একবার শ্লীল-অশ্লীলের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু গত চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন কল্লোলাশ্রয়ী তরুণ লেখকদের সেই অশ্লীলতার অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। দীর্ঘদিনের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এবং মহৎ লেখকদের সাধনার বলে প্রতি সাহিত্যের অন্তরেই যে সুস্থ বুদ্ধির সংস্কার নিহিত থাকে, সেই সংস্কার সময়কালে মাথা চাড়া দিয়ে অশ্লীলতা-প্রয়াসী ওই-সব নতুনের নেশায় প্রমত্ত তরুণ লেখকদের চেষ্টা প্রতিহত করেছিল। এ ক্ষেত্রে 'প্রবাসী' বা 'শনিবারের চিঠি'র বা সমভাবাপন্ন অন্যান্য পত্র-পত্রিকার নিরোধ-আন্দোলন নিমিত্ত মাত্র, আসলে ওই-সকল পত্রিকার মধ্য দিয়ে বাংলার সম্মিলিত শুভ মানসিকতারই অভিব্যক্তি ঘটেছিল এবং ওই অভিব্যক্তিমুখে উদ্গত প্রবল প্রতিবাদের চাপের কাছে অশ্লীললেখকদের নতি স্বীকার করতে হয়েছিল।

কল্লোল-কালিকলম প্রভৃতি পত্রিকা উঠে যাবার পর তিন যুগ গত হয়েছে। আমরা ভেবেছিলাম অশ্লীলতার সমস্যা বুঝি বাংলা ভাষায় অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের শরীর থেকে বুঝি ওই বিষ একেবারেই নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু তা তো নয়, আবার নতুন করে, অধিকতর প্রবলতার সঙ্গে এই বিষ এখনকার বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে দেখতে পাচ্ছি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বুকের উপর অশ্লীলতার যে নতুন তাণ্ডবের শুরু হয়েছে তা প্রতিটি সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষকেই শঙ্কিত করে তুলেছে। দেশের অগণিত ছাত্র-ছাত্রী তাঁরা এই অবস্থা অনাসক্ত দর্শকের নিস্পৃহ ভঙ্গীতে লক্ষ্য করতে পারেন না, তাঁদের সক্রিয়ভাবে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে। সক্রিয় প্রতিবাদ আরও এজন্য দরকার যে, এখনকার লেখকের মধ্যে জেনে বুঝে যাঁরা লেখায় নগ্নতার চর্চা করছেন তাঁরা অতিশয় সঙ্ঘবদ্ধ, তাঁদের পিছনে ব্যবসায়ী দৈনিক পত্রিকাগুলির সমর্থন আছে, লোভী প্রকাশকেরা নিজ স্বার্থে তাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, সর্বোপরি কিছু খ্যাতনামা প্রবীণবয়সী কিন্তু অতিমাত্রায় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ও ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য বিদেশী ভাবাপন্ন লেখক তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি উন্মার্গগামী তরুণদের অনুকূলে প্রয়োগ করবার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে এসেছেন।

বিষয়টি এখন আর শুধু শ্লীল-অশ্লীলের সমস্যার মধ্যেই নিবদ্ধ নেই তা সম্মিলিত অশুভের সঙ্গে সম্মিলিত শুভের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছে। এখন নগ্ন বিষয়ের বর্ণনাকারী গল্পোপন্যাস-জাতীয় রচনা পাঠের দিকে পাঠক-সম্প্রদায়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের মন অস্বাভাবিক রূপে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন দেহবাদী লেখকেরা পাঠকদের দুর্বলতার খবর রাখেন আর এই দুর্বলতাকেই তাঁরা মুনাফায় কড়িতে রূপান্তরিত করে প্রচুর টাকা ঘরে তুলছেন।

অর্থাৎ এঁরা জ্ঞানপাপী এবং দ্বিবিধ অপরাধে অপরাধী। প্রথমতঃ, অশ্লীলতার চর্চাটাই একটা শুচিতা-সুনীতি-সুরুচিবিরোধী অভিযান: দীর্ঘদিনের অনুশীলনে পুষ্ট সাহিত্যের শুভ সংস্কারের সঞ্চয়কে ধুলায় লুটিয়ে দেবার চেষ্টা। তার সঙ্গে স্থূল বৈশ্য মনোবৃত্তি যুক্ত হয়ে তাকে আরও অসহনীয় করে তুলেছে। এ রকম চেষ্টায় যাঁরা সায় দেন তাঁরা প্রগতিচর্চার নামে নিকৃষ্ট

ধরণের প্রতিক্রিয়াশীলাতরই পোষকতা করেন মাত্র। এই কথাটি এখানে চিহ্নিত হওয়া দরকার যে, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে যাঁরা প্রতিবাদের কণ্ঠ উত্তোলন করেন তাঁরাই যথার্থ প্রগতিশীল; পক্ষান্তরে যাঁরা উনিশ-শতকের একটা বস্তাপচা পুরনো মতকে আঁকড়ে ধরে আজও নিরাবরণ দেহবাদের সপক্ষে সাফাই গাইছেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব অতিশয় প্রকট। আজও যাঁরা পুরাণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি নজীরের যুক্তিতে অশ্লীলতার অনুকূলে সমর্থন খোঁজেন তাঁরা রক্ষণশীল নন তো কে রক্ষণশীল?

একটা ধরতাই বুলি স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রচারের দ্বারা মুখে মুখে চালু হয়েছে যে, সাহিত্যের আবহাওয়াকে যাঁরা শোধিত করবার কথা বলেন অশ্লীলতার কলুষমুক্ত করবার আহ্বান জানান, তাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত, 'পিউরিটান' সাহিত্যের এলাকার মধ্যে তাঁরা সমাজশাসনের নীতি আমদানীর দোষে দোষী। কিন্তু এর চেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট অভিযোগ আর কিছুই হতে পারে না। কেউ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেই তিনি ক্রুর সমাজপতি বনে যান না বা তাঁর ভিতর যে সহজাত সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্যবুদ্ধি আছে তা খারিজ হয়ে যায় না। সাহিত্যবুদ্ধির কথাই যদি ওঠে, সেক্ষেত্রে বলব, পরিমিতিবোধ সৌন্দর্যের এক মূল উপাদান। যে সব লেখক বাস্তবতাচর্চার নাম করে মাত্রাবোধ পদে পদে লঙ্ঘন করেন, প্রতি পাঠকেরই অন্তরে নিহিত ছন্দ ও সুষমার ধারণাকে বিপর্যস্ত করেন, তাঁদের সাহিত্যবুদ্ধি অধিক নির্ভরযোগ্য, না, যাঁরা ওই মাত্রাবোধকেই রচনাদেহে রক্ষিত দেখতে চান তাঁদের সাহিত্যবুদ্ধি অধিক নির্ভর-যোগ্য? শিল্পীর স্বাতন্ত্র্যের কিংবা সাহিত্যবুদ্ধির দোহাই পেড়ে কোনো কথা বললেই তা উচ্চতর জ্ঞানমণ্ডিত কথা হবে এমন অভিমান না থাকাই ভালো।

তাছাড়া, বাস্তবের সত্যটাকেই তো একমাত্র চর্চাযোগ্য বিষয় বলে গণ্য করলে চলবে না, বাস্তবের সৌন্দর্যের কথাও ভাবতে হবে। যেখানে সত্যের সঙ্গে সৌন্দর্যের বিরোধ সেখানে সত্যের রূঢ় অংশ ত্যাগ করতে হবে বইকি। সাহিত্য মূলতঃ সৌন্দর্যের ক্ষেত্র, সত্যের জন্য রয়েছে বিজ্ঞানের এলাকা। বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে সমীকৃত করবার প্রবণতা না বিজ্ঞানের মান বাড়ায়, না সাহিত্যের উপকার করে।

কোনো লেখক যদি বর্তমান সমাজের রূপ সঠিক ভাবে চিত্রায়িত করবার তাগিদে তাঁর গল্পে বা উপন্যাসে রকবাজ ছেলেকে কাহিনীর নায়ক করতে চান তা হলে তার বিরুদ্ধে সাহিত্যগতভাবে কিছুই বলার থাকতে পারে না। নীতিগত আপত্তিও এ ক্ষেত্রে টেকবার নয়, কেন না জীবনে বিষয়-বস্তু অগণন এবং তার যেকোনোটিকে কাহিনীর উপজীব্য রূপে বাছবার স্বাধীনতা লেখকের আছে। কিন্তু যেহেতু রকবাজ ছেলের চরিত্র চিত্রিত হতে যাচ্ছে সেই কারণেই তার ব্যবহৃত সকল মুখের কথা এবং কৃত সকল আচরণকেই হুবহু লেখায় প্রকাশ করতে হবে এটা সাহিত্য-বুদ্ধির কথা নয়, এটা অসাহিত্যিকোচিত মনোভাবের উদাহরণ। এর পিছনে ব্যবসায়িক লোভও থাকতে পারে,আবার অজ্ঞানতাও থাকতে পারে—সাহিত্যিক মাত্রাবোধের অভাবজনিত অজ্ঞানতা। কিন্তু যা-ই থাকুক তা সাহিত্যবোধ থেকে ভিন্নতর কোনো বস্তু। ইন্দ্রিয়াসক্ত নায়কের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা দেখাতে হলে তার সকল লাম্পট্যের বৃত্তান্ত খুঁটিনাটি প্রক্রিয়ার বর্ণনসহ আনুপূর্বিক উপস্থিত করতে হবে সৎসাহিত্যের এটা রীতি নয়। মহৎ লেখকেরা এ জাতীয় বা এ জাতীয় চরিত্রোচিত ঘটনার চিত্রণে কখনও মাত্রাসাম্য হারান না। যা ঘটেছে তার ইঙ্গিত দিয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন, সকলের চোখের সামনে হাটের মাঝখানে তাঁরা নোংরা উপুড় করে ঢেলে দেবার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। কামক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ দীর্ঘায়িত বর্ণনা পোর্নোগ্রাফীর কোঠায় পড়ে, তা সাহিত্যের বিষয় নয়। ইঙ্গিত আর ব্যঞ্জনা সাহিত্যের স্বীকৃত প্রকরণ; পোর্নো-গ্রাফীতেই কেবল আতিশয্যদুষ্ট বর্ণনার 'মর্বিড' উৎসাহ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়।

আজকের দিনের এই 'রকবাজ' সাহিত্যের সঙ্গে কেউ যখন রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ বা যোগাযোগ উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করবার প্রয়াস পান তখন হাসব কি

কাঁদব বুঝতে পারিনে। রবীন্দ্রনাথ হলেন অতুলনীয় সৃষ্টি-শক্তির অধিকারী এক কালোত্তীর্ণ শিল্পী, তাঁর রচনার ধারার সঙ্গে সাহিত্যের বোধবুদ্ধিবিবর্জিত সংযমবন্ধনহীন এই সব বালখিল্য লেখকদের রচনার তুলনায় কবিগুরুর অমর প্রতিভার অপমান করা হয়। ঘরে-বাইরে কিংবা চতুরঙ্গ উপন্যাসে জৈব কামনা-বাসনার ছবি আছে সন্দেহ নেই কিন্তু তার বর্ণালি শ্রেষ্ঠ শিল্পিসুলভ ব্যঞ্জনাধর্মিতার প্রলেপে অনুগ্র, এখনকার কটকটে রঙের কুৎসিত জেল্লা তাতে নেই, থাকা সম্ভবও নয়। সন্দীপের প্রতি পরস্ত্রী বিমলার মোহ নির্জ্ঞান স্তরে সুপ্ত ও প্রায়-অনুচ্চারিত। শচীশের প্রতি দামিনীর জৈব আকর্ষণ প্রবল বোঝা যায় কিন্তু কোথাও রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গ উপন্যাসে অতিবিস্তারের সহায়তায় এই প্রবলতার বার্তা ঘোষণা করেননি। উৎকৃষ্ট পর্যায়ের কবি ও কথাসাহিত্যিকের কাছ থেকে যা প্রত্যাশিত, নিগূঢ় ইঙ্গিত ও সংকেতের সাহায্যে তিনি তাঁর কাজ সেরেছেন। রাত্রির অন্ধকারে দামিনী যেখানে শচীশের পা জড়িয়ে ধরেছে এবং চোখের জল আর রাশ-রাশ কালো চুলের বন্যায় শচীশের পা অভিষিক্ত করে দিয়েছে, সেই অংশটি স্মরণ করা যাক। কী অনন্যসাধারণ শিল্পকুশলতা, ব্যঞ্জনা-শিল্পের কী অনবদ্য প্রকাশ। শচীশের ডায়ারির ভাষায় "তার পর কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম, কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে তো রোঁওয়া আছে এর রোঁওয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মতো জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই—তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ!" একেই বলে শিল্পীর সংযম। যা বলা হয়েছে তা ইঙ্গিতের সাহায্যে বলা হয়েছে অথচ কোনো কথাই অব্যক্ত থাকেনি। জৈব কামনা-বাসনার সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে যা ঘটে তার আভাস দেওয়াই যথেষ্ট, তাকে চটকানোটা মহৎ শিল্পীর রীতি নয়। এ ক্ষেত্রে তথ্যটাই বড়ো কথা, কী কী অবস্থার সমবায়ে কোন্ কোন্ প্রক্রিয়ায় সেই তথ্য সংঘটিত হয়েছে সেটা সত্যিকার সাহিত্যপাঠকের কাছে আদৌ জরুরী সংবাদ নয়। পোর্নোগ্রাফী ও সাহিত্যের এখানেই তফাৎ।

অশ্লীলতার সপক্ষীয়রা সংস্কৃত কাব্যের দেহমিলনের বর্ণনার নজীর উপস্থাপিত করেন কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, সংস্কৃত কাব্যের সম্ভোগচিত্রগুলি শ্রেষ্ঠ ধ্বনির যবনিকায় আবৃত, শ্রবণসুখকর সুললিত রুচিসম্মত শব্দের বর্ণরেখায় অঙ্কিত। এখনকার খিস্তি-খেউড়ের ভাষার সঙ্গে দূরতম কল্পনারও তার সাযুজ্য স্থাপন করা যায় না। কালিদাস, অমরু, ভর্তৃহরি—যাঁদের এঁরা আত্মপক্ষসমর্থনে উদ্ধৃত করেন—ভোগের কবি নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁদের সম্ভোগবর্ণনা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের ঋজু রীতি এবং আত্ম-আরোপিত সংযমের ধারণা অনুযায়ী কঠিন ধ্বনির শাসনে সুরক্ষিত। শব্দব্যবহারে নগ্নতার কিংবা প্রগল্‌ভতার প্রশ্রয় তাঁরা কখনও দেননি। সংস্কৃত কবিদের শব্দসংস্কারই আলাদা। কোনো কোনো বর্ষীয়ান্ লেখক অশ্লীল লেখকদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের বিচারের স্বাধীনতায় বাধা দিতে চাই না, কিন্তু সবিনয়ে তাঁদের এই কথা বলতে চাই যে, সাহিত্যের প্রতি লেখক হিসাবে তাঁদের কল্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষ হিসাবে সমাজের প্রতি তাঁদের যে বৃহত্তর দায়িত্ব আছে সে দায়িত্ব তাঁরা সম্পূর্ণই বিস্মৃত হয়েছেন। দেশের অগণিত সাধারণ শিক্ষিত মানুষ ছাত্র-ছাত্রী আর কিশোর-কিশোরীদের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা তাঁদের মগজে আদৌ প্রবেশ করছে না; শিল্প ও সাহিত্যের অধিকার রক্ষার সংকীর্ণ, প্রায়শঃ-বিপাথবলম্বী চিন্তা, তাঁদের সমস্ত চিত্ত অধিকার করে রয়েছে। তাঁরা লেখক হতে পারেন কিন্তু সুনাগরিক নন। আর খতিয়ে দেখলে, সুনাগরিকতা সুলেখকের গণ্ডীর বহির্ভূত বিষয় নয়। শিল্পীর স্বাধীনতা রক্ষা করবার নামে উন্মার্গগামিতাকে প্রশ্রয় আর উচ্ছৃ-ঙ্খলতাকে রক্ষা করবার চেষ্টা করলে দেশবাসী তাঁদের ক্ষমা করবে না।

প্রশাসন বিপ্লব

[আগরতলা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "ত্রিপুরা" ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ সংখ্যায় এই শীর্ষক

সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতির অভাবের জন্যই স্বাধীনতার সুফল দেশের মানুষ পাইতেছে না। ব্যবসা বাণিজ্য ও কৃষির ক্ষেত্রে দেশ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে; ইহা স্বীকার্য। কিন্তু সেই অগ্রগতির ফললাভে জনগণ কেন বঞ্চিত রহিয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান ও অন্তরায় সমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা আশু হওয়া প্রয়োজন। এই প্রবন্ধে "ত্রিপুরা" সম্পাদক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের আবেদন জানাইয়াছেন। জনগণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন প্রশাসন-কাঠামো না হইলে মঙ্গল সম্ভবপর নহে।]

কান পাতিলেই বিপ্লবের কথা। পথ চলিতে ত রীতিমত ধাক্কাধাক্কি বিপ্লব। কথায় কথায় বিপ্লব; প্রতিটি কাজে বিপ্লব; বিপ্লব ছাড়া চিন্তা নাই। এক কথায় প্রয়োজন অপ্রয়োজন সব কিছুই বর্ত্তমানে বিপ্লবের আওতায় ফেলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। এই কারণেই খড়্গপুর আই, আই, টি'তে ধানভানা শিক্ষণ কেন্দ্র উদ্বোধন করিতে যাইয়া খাদ্য সচিব তাঁহার ভাষণে বলিয়াছেন "বর্ত্তমান যুগটি বিপ্লবের যুগ।" সত্যই ইহা বিপ্লবের যুগ, একেবারে মহা বিপ্লবের যুগও বলা চলে। কারণ আমরা এক সঙ্গে সব কিছুতেই বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন সাধনে ব্রতী হইয়াছি। প্রথমে শিল্প, দ্বিতীয়ে স্বাস্থ্য, ও তৃতীয়ে শিক্ষা; তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়া, অপরিমিত অর্থ ব্যয় ও সময় অতিবাহিত করিয়া আজ আমরা চরম এক বেকার বিপ্লব ও খাদ্য (তথা কৃষি) বিপ্লবের দ্বারস্থ হইয়াছি।

ত্রিপুরা ভারতেরই একটি প্রত্যন্ত রাজ্য। সমগ্র ভারতের সহিত তুলনায় এই রাজ্যটি যেমন ক্ষুদ্র তেমনই অনুন্নত, অনগ্রসর এবং দরিদ্রতম। বিগত তিনটি পরিকল্পনায় যে সকল প্রকল্প রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন, এমন কি অর্থ মঞ্জুরী পর্য্যন্ত ছিল, সেইগুলি আদৌ রূপায়িত না হওয়া এবং যেগুলি রূপায়িত হইয়াছে তাহাও যথাযথ রূপায়িত না হওয়ায় ত্রিপুরাকে ঘোড়া রোগে ধরিয়াছে। ঘোড়া রোগ মানে উন্নততর জীবিকার (আভিজাত্য ও বিলাসিতার) নেশা ধরিয়াছে কিন্তু রোজগারের বেলায় এম্প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লিষ্টিভুক্ত করা এবং ঐ নাম তিন মাস পর পর রিনিউ করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারি নাই। 'সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা'র প্রথম পদক্ষেপ রীতিমত চমকপ্রদ হইয়াছিল নিত্যনূতন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পত্তন, রাজ্যময় হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ডিসপেন্সারী প্রতিষ্ঠার দ্বারা। বড় বড় ইমারত নির্ম্মাণ আর লম্বা চওড়া রাস্তাঘাট সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণেও "সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা" প্রচার পুস্তিকার সৌষ্ঠব বৃদ্ধির সহায়ক হইয়াছে। পরবর্ত্তী তথা বর্ত্তমান অধ্যায় রীতিমত অন্ধকার। মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আবেদনেই এই অন্ধকারের ঘনতার সামান্য আভাস পাওয়া যায়। খাদ্য সংগ্রহ সম্পর্কে আবেদনে মুখ্যমন্ত্রী বলিয়াছেন দশ বছর আগে ত্রিপুরার খাদ্যঘাটতির পরিমাণ ছিল মাত্র পাঁচ হাজার টন, আজ উহা বাহাত্তর হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছিয়াছে। ত্রিপুরার উৎপাদন কমে নাই, অথচ ঘাটতি বৃদ্ধি অসাধারণ। অনুসন্ধান তথ্য গবেষণা করিলে দেখা যাইবে ত্রিপুরা সব কিছুতেই কেন্দ্রের গলগ্রহ বা পরগাছার মত বাঁচিয়া আছে। বড় বা বৃহদাকারের শিল্পসংস্থা গড়িয়া উঠিবার মত দৌলত হয়ত ত্রিপুরার নাই; কিন্তু মাঝারি ধরণের শিল্প-সংস্থাও (যেগুলি কয়েক বছর আগে অনুমোদন লাভ করিয়াছিল) ত গড়িয়া উঠে নাই। অন্যদিকে কৃষি-নির্ভর ত্রিপুরায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার কোন পাঠই প্রবর্ত্তন করা হয় নাই। শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও কৃষি শিক্ষার উপর যদি যথা সময়ে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হইত তবে বোধ হয় বেকার বিপ্লব অনেকটা সহজ হইত। পরিষ্কার দেখা যাইতেছে একটি বিপ্লবের অভাবে সমস্ত বিপ্লব মার খাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। এই বিপ্লবটির নাম হওয়া উচিত প্রশাসন-বিপ্লব। প্রশাসনে কোন বিপ্লব নাই একথা বলা চলে না। এখানে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির বিপ্লব কায়েম হইয়াছে এবং দায়িত্ব পালন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,

দক্ষতা, যোগ্যতা প্রভৃতির পাঠ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের মনে হয় প্রশাসনিক পর্য্যায়ে যদি অধিকার আদায় বিপ্লবের সহিত সমান হারে দায়িত্ব পালন বিপ্লবের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়, অর্থাৎ পুরাপুরি প্রশাসন বিপ্লব দ্বারাই বর্তমান যুগের সমস্ত বিপ্লব সার্থক হইতে পারে।

খাদ্যে ভেজাল

[পৃথিবীর কোন সভ্য দেশেই ভেজাল খাদ্যের ব্যবসায় সরকারী স্বীকৃতি পায় না। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে ভারতে একশ্রেণীর ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দিয়া উহা জনগণের ব্যবহারার্থে বিক্রয় করিতেছে। শুধু খাদ্যদ্রব্যে নয়, ঔষধ এবং অন্যান্য অবশ্য ব্যবহার্য বহুতর দ্রব্যে ভেজাল উত্তোরত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রচলিত আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করিলে ভেজালদাতারা শাস্তি পাইতে পারে; কর্তৃপক্ষের অপ্রকাশ্য মনোভাব এবং কর্ম্মচারীদের অক্ষমতা ও অসাধুতার জন্য ভেজালদ্রব্য ধরা পড়িলেও প্রায়শঃই শাস্তি হয় না। "কম্পাস" পত্রিকায় প্রকাশিত জানুয়ারী ১৯৬৯ সংখ্যায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে এতৎসম্পর্কে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পুনর্মুদ্রণ দেওয়া হইল।]

চক্ষু চিকিৎসকদের সম্মেলনে এক মুখপাত্র বিবৃতি দিলেন সরষের তেলে শিয়ালকাঁটার বীজের ভেজাল অসম্ভব রকম-ভাবে বেড়ে গিয়েছে। এবং তার থেকে বেরিবেরি ও চোখের অসুখ 'গ্লকুমা'র প্রকোপও বেড়ে গিয়েছে। তার পর ঘটনা যেন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল—কাগজে কাগজে সম্পাদকীয় বেরুল; সবচেয়ে ব্যস্ততা দেখা দিল পৌরসভায়; স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বললেন—ভেজাল দ্রব্য দেখার ল্যাবরেটরী স্টাফ যথেষ্ট পারদর্শী, স্বাস্থ্য স্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান রায় দিলেন—তেলের ভেজালের জন্য যেটা হচ্ছে সেটা বেরিবেরি নয়, এক ধরণের 'ড্রপসি'। আর একজন কাউন্সিলার বাজীমাৎ করার জন্য রায় দিলেন— পৌরসভার খাদ্য পরিদর্শকের সংখ্যা ৪৭ থেকে ১০০ জন করা হোক। (ঘাটতি বাজেটের টাকা কোথা থেকে আসবে সেকথা তিনি বলেন নি।)

তেলে ভেজাল দেবার সংবাদ বেরবার পর প্রায় তিন সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ভেজাল-দারদের ধরা হয়েছে বা শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যাতে ভেজাল মেশাতে না পারে তার জন্য কোন নতুন নিয়ম কোন গণসংগ্রাম গঠন করার খবর আমরা পাইনি।

খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমান যে সমস্ত সরকারী আইন রয়েছে তাতে খাদ্যে ভেজাল মেশান বন্ধ করে না বরং ভেজাল মেশাতে উৎসাহিত করবে। দু'একটা উদাহরণ দিলেই এটা পরিষ্কার হবে। ১৯৫৫ সালের পূর্ব্বে খাদ্যে ভেজাল সম্বন্ধে যে আইন ছিল তাতে রয়েছে সাগু হচ্ছে 'সাগু ফল থেকে পাওয়া দানা'। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভারতের এক ধুরন্ধর ব্যবসাদার, যিনি তখনকার দিনের কোন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আত্মীয় ছিলেন, সাগুদানা নামে তাপিওকা ফলের দানা বাজারে সাগু বলে বিক্রী করছিলেন। কলকাতার পৌরসভার ল্যাবরেটরী এই ভেজাল ধরে সেই ব্যবসায়ীর শাস্তির জন্য মামলা রুজু করেন। সেই মামলা সুপ্রীম কোর্ট পর্য্যন্ত যায়, ব্যবসায়ী দোষী প্রতিপন্ন হন ও তাঁকে জরিমানা দিতে হয়। তার পরেই কিন্তু দেখা গেল সাগু সম্বন্ধে আইন পাল্টেছে, এখন-কার আইনে রয়েছে সাগু হচ্ছে সাগু অথবা তাপিওকা ফল থেকে তৈরী দানা—অর্থাৎ যা ভেজাল ছিল পূর্ব্বে তা আইনত সিদ্ধ হল। এ রকম নিদর্শন আরও অনেক খাদ্য সম্বন্ধে দেওয়া যায়। অনেকেই হয়ত জানেন না, খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল আছে কিনা তা দেখার জন্য পূর্ব্বে যে রাসায়নিক পরীক্ষার বন্দোবস্ত ছিল এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে দেখা যায় কোনো বাইরের জিনিষ (extrenus matter) কিছু মেশানো হয়েছে কিনা এবং সেই সম্বন্ধেও আইন বেশ উদার। সরিষার তেলের বীজ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আইন ছিল--বাইরের জিনিষ শতকরা

পাঁচভাগ পর্য্যন্ত মেশান যাবে। এখন আইন করা হয়েছে বাইরের জিনিষ শতকরা দশভাগ পর্য্যন্ত মেশান চলবে। আইনটি নিশ্চয়ই ক্রেতা সাধারণের জন্য করা হয়নি।

খাদ্যে ভেজাল প্রয়োগে শাস্তির জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে তা এত লঘু যে তা লঙ্ঘন করতে অসৎ ব্যবসায়ীদের পক্ষে একটুও অসুবিধা হয় না। সবচেয়ে বড় সাজা তার লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া ও ১৫০০ টাকা ফাইন বা কারাদণ্ড। লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা যেখানে উপায় করা যায় সেখানে শাস্তির পরিমাণ হাস্যকর। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর বিরুদ্ধে আইনে যে এত ফাঁকি এবং ভেজাল মেশানোর জন্য যে শাস্তি তা এত লঘু তার বড় কারণ খাদ্যে ভেজাল মেশানোর সম্বন্ধে ক্রেতা সাধারণের সচেতনতার অভাব এবং কোন গণ-আন্দোলনের অনুপস্থিতি।

খাদ্যে ভেজাল মেশালে যেখানে মানুষের প্রাণ নিয়ে সমস্যা সেখানে ভেজাল মেশান মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। অত্যন্ত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার। দশ বছর জেল অথবা মৃত্যুদণ্ড, এমন কঠিন ব্যবস্থা থাকলে ভেজাল মেশান কমবে। এ ব্যবস্থা কার্য্যকরী করতে হলে ক্রেতা সাধারণ অর্থাৎ জনসাধারণকেই এই আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় ক্রেতা পরিষদ গঠন (Consumer's Council) গঠন করতে হবে। এই সংগঠনের কাজ হবে জনমত সংগঠিত করা এবং প্রতিটি খাদ্য ব্যবসায়ীর কাছ থেকে খাদ্যের নমুনা নিয়ে সরকারী ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করা। আন্দোলন এত ব্যাপকভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি এ বিষয়ে সচেতন হয় এবং আসন্ন নির্ব্বাচনের পরে নতুন গণনির্ব্বাচিত সরকার এ বিষয়ে আইন প্রণয়নে তৎপর হয়। খাদ্যে ভেজাল মেশান মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ—এই সচেতন মনোভাব গড়ে তোলাই ভেজাল মেশানোর বিরুদ্ধে প্রধান গ্যারান্টি।

দিব্য বাণী

মন যার নহেক সংযত,
অমার্জ্জিত বুদ্ধি যার, শঠতা স্বভাব যার, জানে না যে
হইতে বিনত,
স্বার্থবশে যেই জন দ্বিধাহীন চিত্ত নিয়ে অপরের
বৃত্তিনাশ করে—
সেজন তামস কর্ত্তা—দীর্ঘসূত্রী—কোন কাজ সময়ে সে
করিতে না পারে।

—উদ্বোধন॥

ককেশিয়ান চক সার্কল্

রচনা—বেরটল্ট ব্রেশট

অনুবাদ—অশোক সেন

কথক :

এইবার সবাই শোন বিচারকের কাহিনী—কি ভাবে সে জজ্ হোল, কেমনধারা রায় দিত, কি জাতের বিচারক সে হয়েছিল। সেই ঈষ্টার সানডেতে, অর্থাৎ যেদিন বিদ্রোহের দাবাগ্নি জলে উঠেছিল, গ্র্যাণ্ড ডিউক গদিচ্যুত হয়েছিলেন এবং তাঁর গভর্ণর আবাসউইলি, অর্থাৎ শিশুটির পিতা, বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন, গ্রামের নথিপত্রের-লিপিবদ্ধকার আজডাক্, বনের ভেতর এক পলাতককে দেখতে পেয়ে নিজের কুটিরে এনে তাকে লুকিয়ে ফেলল—তার বিপদ দেখে। বৃদ্ধ ভিক্ষুক তার আশ্রয় থেকে চলে যাবার পর আজডাক্ জানতে পারলে, নিজের অজান্তে সে ছদ্মবেশী বৃদ্ধ কষাই গ্র্যাণ্ড ডিউককেই আশ্রয় দিয়ে সে বাঁচিয়েছিল।

তার মনে হল সে মহা অপরাধ করেছে, একজন পুলিশের লোককে সে গিয়ে বললে তাকে সঙ্গে করে লুকা শহরে নিয়ে যেতে, যাতে সেখানকার আদালতে, তার বিচার হয়।

শহরে সে সময় কোন বিচারক ছিল না, ওখানকার লোকেরা আগের বিচারককে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল, সে সময়ে একমাত্র সৈনিকরাই ছিল সব ক্ষমতার অধিকারী। আজডাকের কথাবার্তায় তাদের খুব মজা লেগেছিল বিচারকের শূন্য আসনে আজডাককেই তারা বসিয়ে দিল। দুবছর জর্জিয়ার লোকেদের উপর বিচার চালালে আজডাক, সে ছিল ঘুসখোর এবং লম্পট তবে পতিত এবং দরিদ্রের প্রতি ছিল তার অগাধ স্নেহ এবং অসীম প্রীতি।

গ্রুসা এবং গভর্ণরের স্ত্রী শিশু মাইকেলের মাতৃত্বের দাবী নিয়ে আজডাকের আদালতে বিচারের আশায় এসে হাজির—আজডাকের তখন শোচনীয় অবস্থা, গ্র্যাণ্ড ডিউক আবার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন, সৈনিকেরা তাকে ফাঁসি দিতে উদ্যত, এমনি সময় গ্র্যাণ্ড ডিউকের দূত এসে হাজির, যে লোক তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিল তাকে তিনি শহরের বিচারপতি নিযুক্ত করেছেন। আজডাক্কে আর পায় কে, আবার সে বিচারক হয়ে বসলো। এবার শুনুন বিচার-কাহিনী—গভর্ণর আবাসউইলির ছেলের ব্যাপারে, শুনুন কে আসলে ছেলেটির মা এবং কিভাবে তা নির্দ্ধারিত হল চক্‌বৃত্তের সাহায্যে।

[লুকার বিচারালয়—বিচারকের আসনটি থাকবে ষ্টেজের মাঝে। গ্রুসা, কুক, সৈনিকের দল, গভর্ণরের স্ত্রী, মাইকেল, আইনজীবিরা সবাই উপস্থিত।]

কুক—তুমি এক হিসাবে ভাগ্যবান। আজডাক্ তো আর সত্যিকারের বিচারক নয়—ও একটা মদ্যপ, কোনো-কিছু বোঝবার ক্ষমতাও ওর নেই। ঝানু চোর-ডাকাতগুলো ওর বিচারে রেহাই পেয়ে গেছে। সব কিছু ও গুলিয়ে ফেলে। বড়লোকেরা ওকে ঘুষ খাইয়েও ঠিকমত তুষ্ট করতে পারে না। আমাদের অবস্থার লোকেরাই বরং বিনা হাঙ্গামায় মুক্তি পায়।

গ্রুসা—আশাকরি ভাগ্য আজ আমার প্রতি সুপ্রসন্ন থাকবে।

কুক্—একটা কথা কিছুতেই বাপু আমার মাথায় ঢুকছে না—এই দুর্দিনে কেন ছেলেটাকে আঁকড়ে রাখতে চাও?

গ্রুসা—ও আমার একান্ত আপন—ওকে আমি মানুষ করেছি।

কুক—কিন্তু একবারও কি ভাবনি ওর মা যখন ফিরে আসবে তখন কি হবে?

গ্রুসা—প্রথমটায় ভাবতাম সে এলে তার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দেব। তারপর আমার বিশ্বাস জন্মাল সে আর কখনও আসবে না।

কুক—আর ধার করা পোষাকেও গা গরম রাখা যায়, কি বল? (গ্রুসা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাবে) তোমার জন্য যে কোন কথা আমি হলফ্ করে বলতে রাজী—তুমি সত্যিকার ভাল মেয়ে। (সৈনিক সিমন সাস-হাভাকে আসতে দেখে) তুমি সিমনের প্রতি খুব অন্যায় করেছ। আমার সঙ্গে তার কথা হয়েছে—সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

গ্রুসা—(তখনও সিমনের উপস্থিতি লক্ষ্য না করে) এখন আমার সিমনের ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করবার সময় নেই।

কুক—সে বুঝতে পেরেছে মাইকেল তোমার ছেলে নয়। কিন্তু তোমার বিয়ের ব্যাপারটা তার বোধগম্য হয় নি।

(গ্রুসা—সিমনকে দেখে মাথা নেড়ে স্বাগত জানাবে।)

সিমন—(গম্ভীরভাবে) ভদ্রমহিলাকে একটা কথা জানাতে চাই—আমি হলফ্ করে বলতে রাজী আছি যে আমিই ছেলেটির বাবা।

গ্রুসা—(মাথা নীচু করে) ধন্যবাদ সিমন।

গভর্ণরের স্ত্রী—(এ্যাডজুট্যান্টের প্রতি) যাক্ তবু ভাল যে একেবারে আজেবাজে লোককে এখানে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। ওদের গায়ে যা গন্ধ—ওধরণের গন্ধ নাকে এলে আমি অসুস্থ বোধ করি।

প্রথম আইনজ্ঞ—মাদাম, একটু সাবধানে এসব কথাগুলো বলবেন।

গভর্ণরের স্ত্রী—কেন আমি খারাপ কথাটা কি বললাম। সাধারণ সহজ মনের লোকগুলোকে তো আমি ভাল-বাসি—শুধু তাদের গায়ের দুর্গন্ধ আমার সহ্য হয় না।

দ্বিতীয় আইনজ্ঞ—আদালতে বিশেষ লোকের ভীড় হবে না। শহরতলীতে দাঙ্গা শুরু হওয়াতে লোকেরা যে যার ঘরে দোর দিয়ে বসে আছে।

গভর্ণরের স্ত্রী—(গ্রুসার দিকে চেয়ে) ওইটে বুঝি সেই স্ত্রীলোকটা?

প্রথম আইনজ্ঞ—দোহাই মাদাম, বিচারের আগে গালমন্দ করবেন না।

কুক্—শাসকের স্ত্রী ভাল করেই জানেন আজডাকের সহানু-ভূতি হচ্ছে গরীবদের দিকে—তা'নাহলে গভর্ণরের স্ত্রী তোমার চুলের মুঠি ধরে ছিঁড়ে ফেলতেন।

[আজডাক কিছু সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঢুকবে—সে সোজা গিয়ে বিচারকের আসনে গিয়ে বসবে। সবাই তাকে বাউ করবে।]

আজডাক—(দাঁড়িয়ে উঠে) আদালতের কাজ শুরু হোল—(বসে পড়বে)।

আইনজ্ঞরা—(এগিয়ে গিয়ে) একটা হাস্যকর কেস, ইওর অনার। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি শিশুকে হরণ করে ধরা পড়েছে—কিন্তু কিছুতেই শিশুকে ফেরৎ দিতে চায় না।

আজডাক—(হাত বাড়িয়ে দেবে, গ্রুসার দিকে লক্ষ্য করে) বেশ আকর্ষণীয় চেহারা তো! (ঐ আইনজ্ঞ তার হাতে টাকা দেবে—টাকাটা পকেটে ভরে বেশ খুশী খুশী

ভাবে বলবে এবং তার পর বলবে) এইবার শুনানী শুধু হোক্—যা বলবে সত্য বলবে। (গ্রুসার প্রতি) বিশেষতঃ তোমার কাছ থেকে আমি শুধুমাত্র নিখাদ সত্যকথা শুনতে চাই।

প্রথম আইনজ্ঞ—মহামহিম ধর্মাবতার! জনপ্রিয় কিংবদন্তি আছে যে রক্ত জলের থেকে ঘন।

আজডাক—(তার কথায় বাধা দিয়ে) আদালত প্রথমে তোমাকে কি ফিজ্ দেওয়া হয়েছে তা জানতে চায়।

প্রথম আইনজ্ঞ—(হতভম্বভাবে) আজ্ঞে, কি বললেন।

আজডাক—(মৃদু হেসে) আদালত আইনজ্ঞের ফিজ্ কত জানতে চায়।

প্রথম আইনজ্ঞ—আদালতের এই অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তরে আমাকে জানাতে হচ্ছে যে আমার ফিজ্ পাঁচশো পিয়াস্তার।

আজডাক—আমার প্রশ্নটা একটু অদ্ভুত, না? ফিজের পরিমাণ থেকে আমি বুঝে নিই উকীল ভাল আইনজ্ঞ কিনা? এবং সেই অনুসারেই তার বক্তব্যের উপর গুরুত্ব দিই।

প্রথম আইনজ্ঞ—(বাউ করে) ধন্যবাদ ধর্মাবতার। ইওর অনার! সমস্তরকম সম্পর্কের ভেতর রক্তের সম্বন্ধটাই হচ্ছে সবচেয়ে জোরদার। মা ও সন্তান—এর থেকে আর বেশী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কি হতে পারে? সেই শিশুকে যদি মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়···

আজডাক—(ওকে কথা শেষ করতে না দিয়ে—গ্রুসার প্রতি) এ উকীলটি যা বললো এবং আরও যে সব কথা সে বলতে পারে তার বিরুদ্ধে তোমার বক্তব্য কি?

গ্রুসা—শিশু আমার।

আজডাক—এই তোমার একমাত্র বক্তব্য? আশাকরি—তুমি একথার প্রমাণ দিতে পারবে? সে যাই হোক, তোমার প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে—আমাকে বুঝিয়ে দেও কেন শিশুটিকে তোমার হাতে দেব।

গ্রুসা—আমিই ওকে পালন করেছি। ওর খিদের সময় খাবার জুগিয়েছি—থাকবার আশ্রয় ঠিক করেছি। ওর জন্য আমাকে বহু বিপদ বরণ করতে হয়েছে—কম অর্থ খরচও করিনি। নিজের দিকে কখনও এতটুকু তাকিয়েও দেখিনি। সবার প্রতি যাতে ও বন্ধুভাবাপন্ন হয় সেই শিক্ষাই ওকে দিয়েছি—নজর রেখেছি প্রথম থেকেই যাতে ও অল্প স্বল্প কাজ করতে শেখে। অবশ্য এখন পর্যন্ত বয়সটা ওর অত্যন্ত অল্প।

প্রথম আইনজ্ঞ—ইওর অনার, একটা ব্যাপার খুব তাৎপর্য-পূর্ণ। এ মহিলা কিন্তু শিশুটির ব্যাপারে রক্তের সম্পর্কের কোন দাবীর কথা তোলেন নি।

আজডাক—নিশ্চিন্ত থাকতে পার—কথাটা আদালতের নজর এড়ায় নি।

প্রথম আইনজ্ঞ—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ইওর অনার। দুঃখে সম্পূর্ণভাবে পিষ্ট এক মহিলাকে—যিনি স্বামীকে পর্যন্ত হারিয়েছেন এবং একমাত্র শিশুকে হারাতে হতে পারে, এই ভয়ে কাতর—তিনি দু'একটা কথা আপনাকে বলতে চান। মহিমময়ী নাটেলা আবাস-উইলি হচ্ছেন———

গভর্ণরের স্ত্রী—(শান্তভাবে) অত্যন্ত মন্দ ভাগ্যের দরুণ আপনাকে অনুরোধ করতে বাধ্য হচ্ছি আমার সন্তানকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে। সন্তানকে হারিয়ে তার কি দুঃসহ জ্বালা, কি ভয়াবহ দুশ্চিন্তা এবং নিদ্রাহীনভাবে প্রতিরাত্রে কি অসহ দাহন সহ্য করতে হয় তা আমার পক্ষে বলা প্রায় অসম্ভব, আমি···

দ্বিতীয় আইনজ্ঞ—(বাক্যবর্ষণে প্রায় ফেটে পড়ার ভাবে) এই মহিয়সী মহিলাকে যে কত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে এবং বিনা কারণে······এঁ···এঁ······এ···। নিজের স্বামীর প্রাসাদে এঁকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। স্বামীর সম্পত্তির আয় থেকে ইনি বঞ্চিত। বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ওঁকে বলে দেওয়া হয়েছে ওঁর স্বামীর সম্পত্তি পাবে তাঁর উত্তরাধিকারী। শিশুটিকে না পেলে কোনদিক থেকেই মহিলা কিছু করে উঠতে পারবেন না। এমন কি উকীলদের পারিশ্রমিক দেবার মত টাকা পর্যন্ত ওঁর নেই।

[প্রথম আইনজ্ঞ আকারে-ইঙ্গিতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকবে দ্বিতীয় আইনজ্ঞকে এই ধরণের কথা বলা থেকে বিরত করতে। তাঁর ভাবভঙ্গী বুঝতে পেরে দ্বিতীয় আইনজ্ঞ ফের বলতে থাকবে] —প্রিয় ইল্‌লো সুবোলাডজে, খোলাখুলি সব কথা জানিয়ে দেওয়ায় আপত্তি করছ কেন। আবাসলইলির সমস্ত সম্পত্তিই যখন এ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত…

প্রথম আইনজ্ঞ—সম্মানিত সানদ্রো ওবোলাডজে! আমরা একমত হয়েছিলাম………(আজডাকের প্রতি) অবশ্য একথাও ঠিক, এই বিচারের উপরই নির্ভর করবে আমাদের মক্কেল বিরাট আবসউইলি—সম্পত্তি বেচে দেবার অধিকার অর্জন করবেন কিনা। কিন্তু একথাও ঠিক, যেভাবে নাটেলা আবাসউইলি মায়ের জীবনের ট্র্যাজেডীর দিকটা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেছেন, সেটাই এ কেসের প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। এমন কি মাইকেল আবাসউইলি যদি এ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নাও হোত, তাহালেও সে আমার মক্কেলের কাছে তাঁর প্রিয় সন্তান হিসাবেই গণ্য হোত।

আজডাক—তোমরা এবার একটু চুপ করো। সম্পত্তির ব্যাপারটা আদালতকে বিচলিত করেছে—এটা সত্যিই মানবিক অনুভূতির প্রমাণ।

দ্বিতীয় আইনজ্ঞ-ধন্যবাদ, ইওর অনার। প্রিয় ইললো সুবোলাডজে, অন্ততঃ আমরা একথা প্রমাণ করতে পারি যে, শিশুকে যে মহিলা নিজের আয়ত্তে রেখেছিল, সে শিশুর আসল মা নয়) অনুমতি দিলে আমি আদালতের কাছে সব কথা খোলাখুলিভাবে বলতে পারি। ধর্মাধিকরণ! ঘটনাপরম্পরায় এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ শিশু মাইকেলকে ফেলে রেখেই মাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। প্রাসাদের রান্নাঘরের পরিচারিকা গ্রুসা সেই ঈষ্টার সানডেতে সেখানে উপস্থিত ছিল—অনেকেই তাকে শিশুটিকে নিয়ে সে সময় ব্যস্ত থাকতে দেখেছিল, এবং…

কুক—তাঁর কর্ত্রী সে সময় ব্যস্ত ছিলেন কোন্ কোন্ পোষাক সঙ্গে নিয়ে তিনি পালাবেন। শিশুটির কথা তাঁর একবারও মনে হয় নি।

দ্বিতীয় আইনজ্ঞ—(নিরাসক্তভাবে) প্রায় বছরখানেক বাদে গ্রুসা একটি পাহাড়ের গ্রামে শিশুটিকে নিয়ে আসে। সেখানে সে বিয়ে করে একজন…

আজডাক—সেই পাহাড়-গ্রামে কি করে গিয়েছিলে?

গ্রুসা—পায়ে হেঁটে, ইওর অনার। আমার শিশুকে সঙ্গে নিয়ে।

সিমন—শিশুটি আমারই সন্তান, ইওর অনার।

কুক—আমিই ওর রক্ষণাবেক্ষণ করতাম, ইওর অনার। আমাকে এজন্য পাঁচ পিয়াস্তার করে দেওয়া হোত।

দ্বিতীয় আইনজ্ঞ—(সিমনকে দেখিয়ে) ধর্মাধিকরণ এই লোকটির সঙ্গে গ্রুসার বিয়ের কথাবার্তা ঠিক আছে। সুতরাং ওর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।

আজডাক—(সিমনের প্রতি) পাহাড়-গ্রামে তোমার সঙ্গেই গ্রুসার বিয়ে হয়েছিল?

সিমন—না, ইওর অনার। ও একজন চাষাকে বিয়ে করেছিল।

আজডাক—কেন?

গ্রুসা—শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই আমার বিয়ে করাটা দরকার হয়ে পড়েছিল। সিমন তখন যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, ইওর অনার।

আজডাক—এখন বুঝি সিমন তোমাকে ফিরে পেতে চায়?

সিমন—প্রমাণ হিসাবে আমি আদালতের কাছে বলতে পারি

গ্রুসা—আমি এখন মুক্ত নই, ইওর অনার।

আজডাক—যাক্‌গে বাজে কথা। সব ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত সহজ হয়ে গেছে। বিচারপর্বটাও সংক্ষেপে সারতে হবে—আর তোমাদের কাছ থেকে গুচ্ছের মিথ্যে কথা শুনতে আমি রাজী নই। (গ্রুসার প্রতি) বিশেষতঃ তোমার কাছ থেকে। তোমরা অনেক গালগল্প বানিয়ে আমাকে ঠকাতে চেষ্টা করেছ! তোমাদের আমি বেশ ভালভাবেই জানি! তোমরা হচ্ছ একদল জোচ্চোর।

গ্রুসা—(হঠাৎ রেগে উঠে) বিচার ব্যাপারটা তুমি সংক্ষেপে সারতে চাও কেন বেশ বুঝতে পেরেছি—স্ব-চক্ষেই আমি তোমাকে ওদের হাত থেকে ঘুষ নিতে দেখেছি।

আজডাক—চোপ্ রাও! তোমার কাছ থেকে আমি কি কিছু নিয়েছি?

গ্রুসা—(কুক তাকে থামাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হবে) আমার আছে কি, যে নেবে?

আজডাক—তা বটে! সত্যি কথাই বলেছ। অন্নহীন-লোকগুলোর থেকে আমি কখনই কিছু পাই না। সবাই তোমাদের মত হলে আমাকেও উপোস করে মরতে হোত। ন্যায়বিচার চাই, অথচ তার জন্য পয়সা খরচ করবে না। কসাইয়ের কাছে মাংস নিতে গেলে পয়সা নিয়ে যাও—কারণ তোমরা জান পয়সা না দিলে মাংস মিলবে না। কিন্তু বিচারকের কাছে আসবার সময় এমন মনোভাব নিয়ে আস যেন ফিউনের‍্যাল সাপার খেতে এসেছ।

গ্রুসা—তোমার বিচার করবার নমুনা আগে থেকেই বুঝতে পারছি। আসলে তুমি চাও আমার কাছ থেকে ছেলেকে নিয়ে ঐ মহিলাকে দিয়ে দিতে। আমার থেকে তোমার যে খুব বেশী আইনজ্ঞান আছে একথা আমি মানি না।

আজডাক—তোমার বেয়াদপীর জন্য কুড়ি পিয়াস্তার ফাইন করলাম।

গ্রুসা—তিরিশ পিয়াস্তার করলেও আমি ভয় পাই না—তোমাকে মুখের উপর বলছি তুমি একটি মোদো-মাতাল এবং ঘুষখোর।

আজডাক—তোমাকে তিরিশ পিয়াস্তার ফাইন করলাম। তোমাদের এই কেসটা আমাকে তিক্ত করে তুলেছে—পনেরো মিনিটের জন্য এটি স্থগিত রইল। কে এক দম্পতি বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছিল তাদের ডাক।

প্রথম আইনজ্ঞ—(গভর্ণরের স্ত্রীর প্রতি) পরের সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই বলতে পারি এ কেসের রায় আমাদের অনুকূলেই হবে।

কুক—(গ্রুসাকে) তুমি যেভাবে বিচারককে চটিয়ে দিলে এরপর ছেলে পাওয়া অসম্ভব।

গভর্ণরের স্ত্রী—সালভা, আমার স্মেলিং সল্টস্!

(বৃদ্ধ দম্পতি ঢুকবে)

আজডাক—তোমরা শুনেছি বিবাহ-বিচ্ছেদ করতে চাও? কতদিন বিয়ে হয়েছে?

বৃদ্ধা—চল্লিশ বছর, ইওর অনার।

আজডাক—তবে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছ কেন?

বৃদ্ধ—আমরা পরস্পরকে পছন্দ করি না।

আজডাক—কবে থেকে?

বৃদ্ধা—প্রথম থেকে, ইওর অনার।

আজডাক—আচ্ছা, পরে তোমাদের আবেদন শুনে রায় দেব। আচ্ছা আগে অন্য কেসটা শেষ করে নি। শিশুটি কোথায়? (গ্রুসাকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করবে) তুমি তো খুব চুলচেরা বিচার পছন্দ কর। আমি বিশ্বাস করি না যে ও তোমার ছেলে। আচ্ছা ধর ও তোমারই সন্তান—তুমি কি চাওনা সুযোগ পেলে ওকে বড়লোক করে দিতে। তোমাকে শুধু বলতে হবে ও তোমার ছেলে নয়। সঙ্গে সঙ্গে ও হয়ে যাবে এক বিরাট প্রাসাদের মালিক—ওর আস্তাবল থাকবে ঘোড়ায় ভর্তি, দরজার সামনে ভিক্ষে করবে অজস্র ভিক্ষুক, ওর অধীনে কত শত শত সৈন্য কাজ করবে, কত আবেদনকারী ওর আদালতঘর ভরে ফেলবে। কি বল, ও ধনী হোক এটা কি চাওনা।

কথক: যে কথাগুলো গ্রুসা এর উত্তরে ভেবেছিল কিন্তু মুখে বলেনি, তা হচ্ছে এই—

যদি সে সোনার জুতোয় দুই পা এঁটে
বুক ফুলিয়ে যায় সে হেঁটে গলায় পেটে গলায় পেটে
জীবনে পাবে কি সুখ?
যতো সে ভেংচি কাটুক
হা হাসে যতোই হাসুক
তবু সে বুক ফুলিয়ে যাচ্ছে হেঁটে।

মানুষের নরম বুকে বয় কবে বয়
পাথরের নির্দয় ওই কঠিন হৃদয়।
বড় হলে এমনি ধারা
কাজ শুধু গরীব মারা।
ভাবে কি এভাবে দিন যাবে কেটে!
ভুখাদের মিছিল গেছে হয়তো ফিরে।
ক্ষুধার ভয় আসছে তেড়ে, (তার) প্রাণ বাঁচবে
এখন কি রে?

বাঁচাবে সোনার জুতো?
আঁধারে খায় সে গুঁতো।
আলো সে হারিয়ে ফেলে' কাঁদা যে বেড়ায় ঘেঁটে।

[উপরের কবিতাটি অনুবাদ করেছেন শ্রীদুর্গাদাস সরকার]

আজডাক—আমার মনে হয় তোমার মনের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত—আদালত তোমাদের কেস শুনেছে, কিন্তু কে আসল মা সে বিষয়ে কোন মতামতে আসতে পারে নি। বিচারক হিসাবে আমাকেই শিশুর একজন মা ঠিক করে দিতে হবে। আমি একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করছি। শা-ওয়া একটি চকখড়ি নিয়ে মেঝের উপর একটি বৃত্ত আঁক। (শা-ওয়া তাই করবে) শিশুকে বৃত্তের মাঝে রাখ (শা-ওয়া মাইকেলকে বৃত্তের মাঝে দাঁড় করাবে—মাইকেল গ্রুসার দিকে চেয়ে হাসবে। গ্রুসা এবং গভর্ণরের স্ত্রীর প্রতি) দুজনকে দুদিক থেকে শিশুর হাত ধরতে হবে (তারা তাই করবে)। সেই হচ্ছে আসল মা যে হাত ধরে টান দিয়ে শিশুকে বৃত্তের বাইরে নিজের দিকে টেনে আনতে পারবে।

দ্বিতীয় আইনজ্ঞ—আদালতের কাছে আমি আপত্তি জানাচ্ছি। এই শিশুর উপর নির্ভর করছে আবাসউইলি সম্পত্তির ভবিষ্যৎ—সুতরাং এ ধরণের সন্দেহজনক দ্বৈরথ-যুদ্ধ হওয়াটা ঠিক নয়। তা ছাড়া আমার মক্কেলের এর সঙ্গে যোঝবার শক্তি নেই—ঐ মহিলা দৈহিক পরিশ্রমেই অভ্যস্ত।

আজডাক—তোমার মক্কেলকে তো বেশ হৃষ্টপুষ্টই মনে হচ্ছে। টানতে শুরু কর। (গভর্ণরের স্ত্রী শিশুকে টেনে তার দিকে নিয়ে আসবে—গ্রুসা হাত ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াবে।) ব্যাপার কি? তুমি টানলেনা কেন? আচ্ছা, আর একবার পরীক্ষা হবে। (দুজনেই আবার দুদিক থেকে শিশুর হাত ধরবে)। টান দেও! (আবার গ্রুসা ছেড়ে দেবে।)

গ্রুসা—(হতাশভাবে) আমি ওকে লালন পালন করেছি। দুদিক থেকে টান পড়লে ওর হাত ভেঙ্গে যাবে—তা আমি পারবো না।

আজডাক—(উঠে দাঁড়িয়ে) আদালতে এই পরীক্ষার দ্বারা আসল মাকে খুঁজে পেয়েছে। গ্রুসা তুমি ছেলে নিয়ে চলে যাও। আমি উপদেশ দিচ্ছি এ শহরে তোমরা থেকো না। (গভর্ণরের স্ত্রীর প্রতি) আপনি এখান থেকে কেটে পড়ুন—নইলে জালিয়াতির অভিযোগে আপনাকে জরিমানা দিতে হবে। ওঁর সমস্ত সম্পত্তি পাবে শহরের লোকেরা। ওঁর জমিতে শিশুদের খেলবার মাঠ তৈরী করা হবে—একটা ঐ জাতীয় মাঠের খুব দরকার। আর সেটার নাম হবে আমার নামে—'আজডাক গার্ডেন'। (গভর্ণরের স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে পড়বে—তার দলের লোকেরা তাকে ধরাধরি করে নিয়ে যাবে।) এবার বিবাহ-বিচ্ছেদের রায়টা লিখে দিই (একটা কাগজে কি লিখে রেখে এগিয়ে আসবে।)

শা-ওয়া—(কাগজটা পড়ে) মহাভুল হয়ে গেছে হুজুর! বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বিবাহ-বিচ্ছেদ না করে আপনি গ্রুসা এবং তার স্বামীর ভেতর বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় লিখে দিয়েছেন।

আজডাক—তাই নাকি! কি লজ্জার কথা, কিন্তু একবার যা লিখে দিয়েছি তা আর বদলানো যায় না। এভাবে ঘনঘন রায় বদলালে দেশে আইন রক্ষা করা কঠিন হবে। (গ্রুসা এবং সিমনকে) তোমাদের কাছে আমার চল্লিশ পিয়াস্তার পাওনা।

সিমন—এতো খুব সস্তা হুজুর—এই নিন (পার্স বের করে টাকা দেবে।)

আজডাক—(টাকাটা পকেটে ভরে) এ টাকাটা আমার কাজে লাগবে।

গ্রুসা—(মাইকেলকে) তাহলে আজ রাত্রেই আমাদের শহর ছেড়ে চলে যেতে হবে মাইকেল। (সিমনের প্রতি) তোমার ওকে পছন্দ হয় না?

সিমন—শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি, খুব পছন্দ হয়।

গ্রুসা—এবার তোমাকে বলছি—ঈষ্টার সানডেতে ওকে এই কথা ভেবেই গ্রহণ করেছিলাম যে ঐ দিনেই তোমার সঙ্গে আমার এন্‌গেজমেণ্ট হয়েছিল। সুতরাং ও হচ্ছে আমাদের প্রেমজাত শিশু।

কথক!

সেই সন্ধ্যার পরে আজডাককে আর কেউ দেখতে পায়নি গ্রু সিনিয়ার লোকেরা তার কথা ভোলেনি বহুদিন পর্যন্ত। কারণ সে সেখানে যতদিন বিচারক ছিল স্বর্ণযুগ এবং ন্যায়বিচারের দিন ফিরে এসেছিল।

আর—

(গান)

তোমরা তোমরা তোমরা যারা
চকঘড়িতে আঁকা বৃত্তের গল্প শুনেছ?
আর্যবাক্য শ্রবণ করে
কেউ নিজেদের দিন কি গুণেছ?
সজ্জনেরাই ফিরে পাবে হারানো ধন কে না জানে—
আসল মাতা যেভাবে পান চুরি করা তার সন্তানে।
যারাই ভালো চালক তারা চালায় গাড়ী অবশেষে
সেচকর্মে কুশলী লোক পাবেই জমি দেশে দেশে,
এসব কথা তোমারা ভুলেছ।

[গান অনুবাদ করেছেন শ্রীদুর্গাদাস সরকার]

—সমাপ্ত—
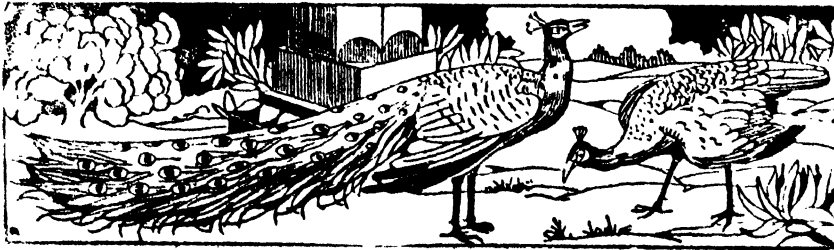
(৩৬৮ পৃষ্ঠার পর)

পরিচয় তাহাতে কেহ পায় নাই। মানুষের দেহই তাহার মনুষ্যত্বের আরম্ভ এবং শেষ; মানুষ বস্তু হইতেই উদ্ভূত ও বস্তুতেই লয় প্রাপ্ত হইবে, সকল সত্য ও সর্ব্বসত্তা বস্তুতেই নিবিষ্ট ইত্যাদি দার্শনিক তথ্য কাহারও মনে বিশ্বাস ও শান্তি জাগাইতে পারে নাই। পাশ্চাত্যের মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার নিজের নিজত্বে শুধু অস্থিমাংসগত কোষপুঞ্জের অস্তিত্বমাত্র দেখিয়াছে ও তাহার প্রাণের আবেগ, আকাঙ্খা ও অনন্তের পিপাসায় কোন হদিস পায় নাই। তৎসঙ্গেই তাহাকে বিজ্ঞানগত প্রাণ আধুনিক চিন্তাশীলগণ ক্রমাগত মানুষের দাবী, অধিকার উন্নতি, আদর্শ, প্রেরণা ইত্যাদি বহু কথা শুনাইয়া তাহার মনে এই সন্দেহ জাগ্রত করিয়াছেন যে শুধু একটা প্রাণহীন বস্তুজাত চলন, গঠন, বর্দ্ধন ও প্রজননশীল বস্তুপিণ্ডের কোন দাবী অধিকার বা প্রেরণা থাকিতে পারে না। থাকিলেও তাহা বস্তুর সহিত বস্তুর সংঘাতের প্রতিক্রিয়ামাত্র; তাহার কোন নীতিগত বা আধ্যাত্মিক অর্থ থাকিতে পারে না। অতএব যদি অন্তরের আবেগ বা কোন কিছু একই ধরণের বিভিন্ন বস্তুপিণ্ডের মধ্যে বিচিত্র ও বিস্ময়কর ভাবধারার উৎসের উৎপত্তি করিতেছে দেখা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ অসম্ভব ভাবব্যঞ্জনার মূল কি শুধু বস্তুতে নিহিত থাকিতে পারে; যদি বলা যায় ঐ সকল ভাব বস্তুপুঞ্জেরই প্রতিক্রিয়া তাহা হইলে যত আন্দোলন, যত আদর্শগত আলোড়ন, সবই বস্তুতন্ত্রগত বলিয়া সেই সকল ক্ষেত্রে নীতি বা অন্যায়ের আলোচনা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। আগুন জ্বলিলে গরম হয়, নিভিয়া যাইলে ঠাণ্ডা হয়। এই ক্ষেত্রে উচ্চতা ও শৈত্যের শুধু পদার্থ বিজ্ঞান সম্মত আলোচনাই হইতে পারে। ইহার ভাল মন্দের দিক তখনই থাকিতে পারে যখন জীবজগতের ঠাণ্ডা গরমের আবশ্যকতা বিচার করা হয়। জীবগণ যদি শৈত্যাধিক্যে প্রাণ হারায় তাহা হইলে আগুন জ্বালাইয়া তাহাদিগকে উষ্ণতাদানে জীবিত থাকিতে দেওয়ার নীতিগত মূল্য দেখা যায় প্রাণ ধারণ ও প্রাণ নাশের নৈতিক প্রয়োজনীয়তা বিচার করিলে। প্রাণ ও আত্মা, প্রাণী জীবন ও পরমাত্মা; এই সকল কথার মূলে রহিয়াছে বস্তুর উর্দ্ধে স্থিত প্রাণের মধ্যে এবং ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমান সত্তা, যাহা প্রাণবান ও সকল প্রাণের মহাউৎস তাহার বোধও প্রাণের অবাস্তব উৎপত্তিজ্ঞান হইতে জাগ্রত হইয়াছে। ইউরোপীয় ও আমেরিকানগণ যদি বিজ্ঞান জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণের অনুশীলন চেষ্টা করে, তাহাতে কাহারও আপত্তি করিবার কিছু নাই। বিমূর্ত্ত কোন প্রাণশক্তির ধ্যান করা যাইতে পারে। চিন্তার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের দ্বারাও পরমাত্মার উপলব্ধি ঘটিতে পারে। কিন্তু গঞ্জিকা সেবনের ফলে যে তুরীয় ভাব জাগিয়া উঠে তাহার কোন জ্ঞানের দিক নাই। সুতরাং আমরা এই পন্থার অনুমোদন করিতে পারি না। উলঙ্গতাও জ্ঞান লাভের উপায় নহে।

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

৺অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্র ৺মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র মোহনলাল কলিকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিষ্টিকাল ইনষ্টিটিউটে উচ্চপদে কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সুলেখক ছিলেন ও সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার খ্যাতি ছিল। সম্প্রতি তিনি অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। এই আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে মোহনলালের পরিবারের ও পরিচিত লোকেদের মনে মহা শোকাবেগের সঞ্চার হইয়াছে। সুস্থ, সবল, কর্ম্মনিরত অবস্থায় হঠাৎ মৃত্যু আজকাল অল্পবয়স্কদিগের মধ্যে প্রায়ই হইতেছে দেখা যায়। ইহার কারণ কি তাহা কেহ বলিতে পারেন না। চিকিৎসকদিগের এই বিষয়ে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আমরা শোকাক্লিষ্ট পরিবারের সকলকে আমাদিগের সমবেদনা জানাইতেছি।

লীণ্ডন বি জনসনের বিদায়

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি লীণ্ডন বি জনসন আর রাষ্ট্রপতি নাই। তিনি ঐপদ হইতে সরিয়া গিয়াছেন ও

বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন রিচার্ড মিলহাউস নিক্‌সন্‌। লীণ্ডন বি জনসন নিজের রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায় সিদ্ধিতে বিফলকাম হইয়াই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি ভিয়েতনামে যে যুদ্ধ চালাইতেছিলেন সে যুদ্ধে তাঁহার জয় হয় নাই। এখন শান্তি স্থাপিত হইলে কেহ বলিবে না যে আমেরিকা জয়যুক্ত হইয়াছে। সুতরাং জনসনের বিদায়কালে তিনি কর্ম্মে বিফলকাম বলিয়াই ধার্য্য হইবেন। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে জয়পরাজয় হইতে পারে কি পারে না তাহার বিচার কেহ করিবে না। রুশিয়া ও চীন ঐ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল কি ছিল না তাহাও কেহ দেখিবে না। আমেরিকা উত্তর ভিয়েতনামে বহু বোমা বর্ষণ করিলেও হো চি মিনের দল যুদ্ধ থামায় নাই। আমেরিকা ইহাতে দুইভাবে বদনামের ভাগী হইয়াছিল। জয়লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া এবং অযথা বোমাবৃষ্টি করিয়া নির্দ্দোষ লোকের প্রাণহানি করিয়াছে এই দুই দফায় বিশ্ববাসী আমেরিকার প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। লীণ্ডন বি জনসন ছিলেন এই দুষ্কর্ম্মের প্রতীক।

সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসীর প্রতিষ্ঠাতা ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় বিগত ১লা জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমানে ঐবংশের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন ও মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স প্রায় আশী বৎসর হইয়াছিল। সুশীলকুমার পূর্ব্বে বাংলার কারাগার বিভাগে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কার্য্য করিতেন ও অবসর গ্রহণের পরে শিবপুর অঞ্চলে নিজবাসগৃহে সপরিবারে বাস করিতেন। তিনি স্বল্পভাষী ও মধুরস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। সুরুচি ও সুকৃষ্টির মূল্যবোধ তাঁহার মধ্যে পূর্ণজাগ্রত ছিল এবং তিনি রসজ্ঞ ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন।

কিনিয়ার এশিয়াবাসী

কিনিয়া যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তখন বহু এশিয়াবাসী ঐ দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্ত বসবাস করিত। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৃটিশ-সাম্রাজ্যের কোন না কোন দেশ হইতে আসিয়াছিল। যথা ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্ম, মালয় প্রভৃতি দেশ। এই সকল দেশ পরে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং কিনিয়াতে এই সকল দেশের লোক যাহারা ছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ স্বাধীন রাষ্ট্রের পাসপোর্ট সংগ্রহ না করিয়া পূর্ব্বের বৃটিশ পাসপোর্ট লইয়াই কিনিয়ায় থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় তাহারা যে ঠিক কোন রাষ্ট্রের লোক তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া কঠিন হইল ও কিনিয়া যখন স্বাধীন হইল এবং সকল ব্যবসাদারদিগকে হয় কিনিয়ার প্রজা হইতে নয়ত কিনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বলিল, তখন অনেকে রাষ্ট্রহীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বৃটিশ পাসপোর্টের শক্তিতে বৃটেনে যাইতে আরম্ভ করিল। নিজ নিজ দেশে যাওয়া তাহাদের মধ্যে সম্ভব হইল না; কারণ সেই সকল দেশ বৃটিশ পাসপোর্টধারীদিগকে প্রবেশাধিকার দিতে আগ্রহ দেখাইল না। বৃটেনও আইন করিয়া এই সকল লোকেদের বৃটেনে আসা কঠিন করিয়া দিল ও বহুলোকে ইচ্ছা ও বৃটিশ পাসপোর্ট থাকা সত্বেও রাষ্ট্রহারাভাবে এক অপরূপ অসহায়তা উপভোগ করিতেছে। ইহারা যে কেন কিনিয়ার রাষ্ট্রগত হইতেছে না তাহাও বোঝা যায় না। অনেক ভারতবাসী কিনিয়াতে আছেন যাঁহারা ভারতের রাষ্ট্র অন্তর্গত না হইয়া বৃটিশ রাষ্ট্রীয় পাসপোর্ট লইয়াই কিনিয়াতে বসবাস ও ব্যবসা করিতেছিলেন। ইঁহারা এখন ভারতের পাসপোর্ট গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন কিনা, আমরা জানি না। অনেকে বলিতেছেন যে ভারত সরকার এই সকল লোকেদের চাহিলেও ভারতীয় নাগরিকতা দিতেছেন না। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে এই নিজদেশবাসীকে ফিরাইয়া লইবার অনিচ্ছার সহিত ভারত সরকারের প্রায় গায়ে পড়িয়া বহু ব্রহ্মদেশ ও সিংহল প্রবাসী ভারতীয়কে ঐ দুই দেশের রাষ্ট্রের সহিত সহযোগিতা দেখাইয়া ভারতে ডাকিয়া আনিবার চেষ্টার বিশেষ অমিল দেখা যাইতেছে। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের ভারতবাসীরা উক্ত দেশদ্বয়ের

নাগরিকতা চাহিয়াও পাইতে সক্ষম হ'ন নাই। তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভারতে পাঠান হইয়াছে। কিনিয়ার ভারতীয়েরা কোন দোষে ঐ অধিকার হারাইয়াছেন?

জগতকান্ত শীল

ক্রীড়া, শরীরচর্চ্চা ও বিশেষ করিয়া মুষ্টিযুদ্ধের ক্ষেত্রে স্বনামধন্য জগকান্ত শীল সম্প্রতি জব্বলপুরে আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি জব্বলপুরে জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মুষ্টিযোদ্ধাদিগের কর্মকর্ত্তা হিসাবে গিয়াছিলেন ও ঐ প্রতিযোগিতার আরম্ভেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জব্বলপুর হইতে তাঁহার নশ্বর দেহ কলিকাতায় লইয়া আসা হয় ও হাওড়া রেলষ্টেশনে তাঁহার অসংখ্য ছাত্র, ভক্ত ও বন্ধুবান্ধবগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পুষ্পাবৃত দেহ যুবকগণ প্রথমে তাঁহার বাসগৃহে লইয়া যায়। পরে তাহারা স্কুল অফ ফিজিকাল কালচার, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব, মোহনবাগান ক্লাব, সিটি অ্যাথেলেটিক ক্লাব, রেঞ্জার্স অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রে ঘুরাইয়া অবশেষে সৎকারার্থে নিমতলা ঘাটে গমন করে। বহু লোক সঙ্গে সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। পুষ্প-অর্ঘ্য আসিয়াছিল নানা স্থান হইতে বহু সংখ্যায়।

জগতকান্ত শীলের ভারতে ক্রীড়াক্ষেত্রে খুব উচ্চস্থান ছিল। তিনি নিজ জীবনে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য যাহা কিছু সময় ব্যয় করিতে হইত তাহা ব্যতীত প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ক্রীড়া ও শরীর চর্চ্চার উন্নতির জন্য কার্য্যকরীভাবে ব্যয় করিতেন। নিজের নাম-যশের অথবা পদোন্নতির চেষ্টায় তিনি কখন ব্যস্ত ছিলেন না। কর্ম্মে অনুরাগই তাঁহার জীবনের মূল প্রেরণা ছিল। তিনি এইভাবে অকালে চলিয়া যাওয়ায় ভারতের শরীর গঠন প্রতিষ্ঠানগুলির একটি অপূরণীয় ক্ষতি হইল।
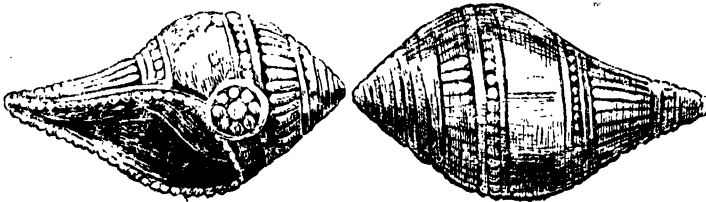
মূলে ভুল

(উপন্যাস)

পুষ্প দেবী

প্রভা খবর না দিলেও ডাঃ মল্লিক ছুটে এলেন, এলো ডাঃ সেনগুপ্ত প্রভার পিতৃবন্ধুর ছেলে। অবস্থা দেখে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠলো। সদাশিব বাবুকে বললো—অসুখ ডায়গোনেসিস ঠিক হয়নি। গদাই ভুল করেছে। এ ওষুধ খাওয়ালে দিদিকে বাঁচানো যাবেনা। অমর বিপন্ন মুখ দেখে প্রভা জেদ ধরলো না গদায়ের ওষুধ ছাড়া অন্য ওষুধ খাবো না। কিন্তু একথা মানতে রাজী নয় মল্লিক, সে সদাশিববাবুকে বললো বেশ আমাদের ওষুধও দিতে হবে না। দিতে হবেনা গদায়ের। আপনি অন্য ডাক্তার আনান। ইতিমধ্যে বেণু আর শিশু নেই, সে কিশোরীর পর্য্যায়ে উঠেছে। সে মহা কান্নাকাটি জুড়ে দিলো মাকে হার্ট-স্পেশালিষ্ট দেখাতে হবে। হার্টের অসুখে যদি হার্ট-স্পেশালিষ্ট না দেখলে হয় তবে হার্ট-স্পেশালিষ্ট আছে কাদের জন্য।

মার অসুখ শুনে নিরুপমা ছুটে এলো। দীপক কিন্তু বেণুর মতেই মত দিলে। বললো, জানো একটা কথা আছে বাড়ীর চিকিৎসা বাড়ীর লোককে করতে নেই। নিরুপমা কিন্তু বেণুকেই বোঝাল, দেখ বাড়ীতে ডাক্তার থাকলে কত সুবিধে। গদায়ের হাতেই মাকে ছেড়ে দে। মাকে কী কেউ ভালোবাসেনা :তুই ছাড়া? কিন্তু প্রভার সেই কিশোরী মা সব কথাই তার প্রবল কান্নার ভাসিয়ে দিলো। ডাঃ সেনগুপ্ত বলে গেছেন প্রভার বিছানা ছাড়া বারণ। বলে গেছেন, খাটের সঙ্গে দিদিকে বেঁধে ফেলো। মাকে খাট ছেড়ে উঠতে দেয় না সে, মার সমস্ত কাজ সে নিজের ছোট দুটি হাতে তুলে নিলো। পণ ধরলো মাকে সে বাঁচাবেই। আজো বেণু সে কথা বলে আর কাঁদো। বলে মাকে একী বাঁচালুম? ছোটদিকে হারিয়ে মার বেঁচে থাকা। কেন এ কাজ করলুম?"

যাক যেকথা বলছিলুম। এর মধ্যে গদাই রাগারাগি কর্ত্তে সুরু করলো হার্টের অসুখ হলে আমরা হাঁটাই তাকে, শেষে যদি পা পড়ে যায়? কথাটা শুনে প্রভা মনে মনে হাসে কারণ চল্লিশ বছরের হাঁটা পা যদি পনের দিন না চললে পড়ে যায় সেও ভালো, তবু হার্টের রুগীকে হাঁটিয়ে হার্টকে চিরদিনের মত বন্ধ ক'রে দেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ। এতদিনে গদাইকে চিনতে সুরু করেছে প্রভা। তার মনের সুবিধাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে দেরী হল না প্রভার।

সদাশিববাবুর সংসারে ধনের প্রাচুর্য্য ছিল না। কিন্তু ছিল প্রভার গতরের। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না প্রভা অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে হাল ধরে সে সংসার চালনা করতেন, আজ বিছানায় শুতেই তাঁকে গদায়ের বোঝা বোধ হল। হঠাৎ গদাই পৃথক সংসার সুরু করলো। এই তার একটা অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি। তার ছেলেরা যদি কোথাও পিকনিকে যায় সে বারে বারে শিখিয়ে দেয় গিয়ে বেমক্কা খাটবিনি। যতটা পারবি খেয়ে নিবি, তুই ত আবার বোকারাম—হয়ত গিয়ে কাঠ কাটতে বসে যাবি।

একদিনের কথা মনে পড়ে প্রভার। ছাতে কাপড়

তুলতে গিয়ে প্রভা দেখেছিল একটি লোক রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেল। প্রভা ছুটে এসে গদাইকে সে কথা বললো। গদাই তখন হাসপাতালে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। গদাই সব শুনে বললো, কে আবার ওসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে? প্রভা বিস্মিত হয়ে বলেছিল ঝঞ্ঝাট আবার কি। তুমি ডাক্তার, জনসেবা তোমার ব্রত। তোমার সামনে মানুষটা পথে পড়ে মরবে? কিন্তু শত চেষ্টাতেও প্রভা গদাইকে তার কাছে নিয়ে যেতে পারেনি। পাশের বাড়ীর নেড়াকে দিয়ে লোকটিকে হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন।

এই সংসার পৃথক করাও কম কথা নয়। একতলায় যে ভাড়ায় সংসার চলছিল কিছুটা, তাদের তুলিয়ে সেখানে জাঁকিয়ে বসলো গদাই ধারে মানে সদাশিববাবুর কাছে ধারে সংসার চললো। খাতায় কলমে ধার দেওয়া যত সহজ টাকা সংগ্রহ তত সহজ নয়। বিপর্য্যস্ত অবস্থা সদাশিববাবুর এরি মধ্যে প্রভা তার বড় মেয়ের মামী-শাশুড়ী বিখ্যাত সমাজসেবিকার মাধ্যমে এক হার্টের ডাক্তারকে দিয়ে লুকিয়ে নিজেকে দেখিয়েছেন। মনে আশা ছিল যদি ডাক্তার গদায়ের সঙ্গে ইনি একমত হন। কিছুতেই মল্লিকের কথা মানবেন না। কিন্তু প্রভার দুরদৃষ্ট, মল্লিকের মতেই মত দিলেন ডাঃ চ্যাটার্জী। বিপদ আরো এলো, যেই শোনে প্রভার জামাই ডাক্তার, সেই বলবে তাঁর সঙ্গে কথা বলবো। বচনসর্ব্বস্ব গদাই তখনই তাকে ভুল বোঝাতে উঠে পড়ে লাগে। তবুও ডাক্তার চ্যাটার্জীর কাছে পরাজিত হ'ল গদাই। কিন্তু লুকিয়ে প্রভা ডাক্তার দেখিয়েছেন এই অপরাধে অপরাধী হয়ে আরো গদায়ের চক্ষুশূল হলেন। বাথরুমে যেতে যে মানুষ হাঁপান সেই মানুষেও আইমক্সারী করলো গদাই যে প্রতিদিন প্রসন্নবাবুকে যেন নিশ্চিত দেখতে যান প্রভা। দুপুর বেলা সদাশিববাবু কলেজ গেলে প্রভা লুকিয়ে প্রসন্নবাবুকে দেখতে যান। অমু মার কষ্ট দেখে কষ্ট পায়। বেণু রেগে বলে, পার্ব্বেনা মা পার্ব্বেনা সন্তুষ্ট করতে, তোমার ঐ হাঁপানোই সার হবে। প্রসন্নবাবুর বিভার অধিবধি নেই। একদিন বলেন, জানেন বেয়ান বিপদতারিনী আর দুর্গা একই। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী প্রভা এহেন সরস খবরে যথোচিত আশ্চর্য্য প্রকাশ করতে পারেন না, প্রসন্নবাবু অপ্রসন্ন হন।

এই সময় আরো একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে প্রভা বিব্রত হয়। গদায়ের যে আলমারিটী সদাশিববাবুকে দিয়ে প্রভা তাঁকে স্বাধীনতার আনন্দে বিভোর রেখেছিল সেই আলমারিটী গদাই চাওয়াতে সদাশিববাবু বিব্রত হয়ে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কারণ সে আলমারি খালি করা ত সহজ ব্যাপার নয়! ছেঁড়া পিন, কুশন, লেন্সভাঙ্গা টর্চ্চ ভাঙ্গা, ফাউনটেন পেন প্রভৃতি অকেজো জিনিসে আলমারিটি পরিপূর্ণ। ফেলে দিলে সদাশিববাবুর ব্যথা বেদনার ও ক্ষতির সীমা পরিসীমা থাকবে না আর রাখলে ঠিক অত বড় একটা সিন্দুকের প্রয়োজন। ভারি বিপদে পড়লেন প্রভা। দুজনেই অবুঝ। শেষে প্রভা বললেন, দু'চার দিন সবুর করো। আমি গোটাকতক প্যাকিং কেশ আনিয়ে তোমার আলমারি খালি করিয়ে দোব। কিন্তু গদাই সবুর সইতে রাজী নয়। কথাটা কেমন করে জানি না প্রসন্নবাবুর কানে উঠলো। তাঁর মত মানুষও বিচলিত হন। তিনি বললেন ছিঃ ছিঃ, একটা আলমারী, ওপরে থাক না? আবার বললেন ভুলো না গদাই, উনি শুধু আমাদের বিপদের দিনে আশ্রয়দাতাই নন অন্নদাতাও।

এরপর প্রসন্নবাবু মারা গেলেন বোধ হয় বছরখানেক বাদে। শেষ অবধি চিকিৎসা গদায়ের হাতেই ছিল। মাঝে মাঝে মোড়ের সদাশিববাবুর বন্ধু যতীনবাবু দেখে যেতেন। শেষে অবস্থা যখন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ালো তখনও গদায়ের খেয়াল নেই। প্রভা ও সদাশিববাবুর ঝোঁকে গদাই বড় ডাক্তার আনতে রাজী হল। সে শুধু রাজী হওয়াই। ডাক্তার আনা আর হয় না। যেদিন মারা যান প্রসন্নবাবু, সেদিন কলেজ যাবার সময় নিত্যকার মত সদাশিববাবু দেখতে গেলেন। গিয়ে তাঁর যেন কেমন ভালো লাগলো না, তিনি ফিরে এসে গদাইকে

বললেন, আজ কিন্তু বেয়াই মশাইকে দেখে আমার ভালো বোধ হচ্ছে না, আর ডাক্তার আনতে দেরী কোর না। ডাক্তার আনতে গেল গদাই কিন্তু ডাক্তার এসে পৌছবার আগেই মৃত্যু ঘটলো প্রসন্নবাবুর। শেষ জল খেলেন বেণুর হাতে। গদাই বাড়ী ঢুকে বললো, ঈস, মোড়ের দোকানটার ডাক্তারকে সিগারেট কিনে দিতে না গেলে ঠিক এসে পৌছুতুম। এই হল পরম পিতৃভক্তির নমুনা। এই প্রসঙ্গে অমূল্যবাবুর কথা মনে পড়ে। ভদ্রলোক সত্যের খাতিরে একটি খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইনি গদায়ের সম্পর্কে মামা হন। একটা কথা আছে না? হেন খৃষ্টান পেন খৃষ্টান লেডি খৃষ্টান পেডি খৃষ্টান। কেউবা মুরগী খাবার জন্ম খৃষ্টান হন, কেউবা চাকরির জন্ম খৃষ্টান হন, কেউবা বিয়ের জন্য খৃষ্টান হন, কেউবা পেটের দায়ে খৃষ্টান হন। ইনি হয়েছিলেন বিয়ে করে। এমনি ভাগ্য ভদ্রলোকের যে স্ত্রী শুধু তাঁর জাত নষ্ট করেই তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। যখন গদাই নিজের বাড়ী ছেড়ে সদাশিববাবুর গৃহবাসী হল তখন গদাই নিজের আত্মীয় বলে এঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা করলো। ভদ্রলোক সরল প্রকৃতির, তিনিও তাঁর চিকিৎসাদির ব্যাপারে গদায়ের উপর নির্ভর করতেন। থাকতেন নিজের এক প্রাক্তন ছাত্রের বাড়ীতে। তাঁর যখন মৃত্যু ঘটলো তখন গদাই সদাশিববাবুর বাড়ী কর্মাটারে ছিল। সকালে প্রভা পেলো ফোনে খবর যে অমূল্য বাবুর অবস্থা খুব খারাপ সদাশিব বাবু বললেন, কি মুসকিলে পড়া গেল বলতো? আমি কি ডাক্তার নিয়ে যাবো? না গদাইকে ট্রাঙ্ককল করে দোব? প্রভা বললো, দেখো গদায়ের কাজ করা অত সহজ নয়। যদি অমূল্য বাবুর জীবন ওর কাছে মূল্যবান হত ও নিজেই কাছাকাছি একজন ডাক্তারকে ঠিক করে দিয়ে যেত। সব ডাক্তারের সঙ্গে তো ওর ঝগড়া। ভদ্রলোক হয়ত এমনিই মারা যাবেন কিন্তু তুমি কেন বুড়ো বয়সে খুনের দায়ে পড়বে? এরকম কথা বলা প্রভার স্বভাব নয় কিন্তু বারে বারে গদায়ের কাছে আঘাত পেয়ে তিনি গদাইকে চিনেছিলেন। দুপুর বেলায় আবার ফোন এলো অমূল্য বাবু মারা গেছেন। ওরা কি করবে? দেহ কি নিয়ে যাবে? আবার সদাশিব বাবু চঞ্চল হয়ে উঠেন। প্রভা তাকে শান্ত করেন, সেই দিনই গদায়ের কর্মাটার থেকে ফেরার কথা। প্রভা বলে দেখো কয়দিন ত গদাইকে নিয়ে ঘর করলুমনা, ও সাংঘাতিক দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষ। ওযে অনুকে বলেছিল আমি এখন একচক্ষু হরিণের মত আমার বাবা মাকে দেখছি, পরে তোমার বাবা মাকে দেখবো। কিন্তু সে চক্ষু ওর আজো খুললো না। ঐ একচক্ষুটি শুধু ওর অপরের কথা ও জীবনে ভাবেনি। আজ প্রভা কাঁদে আর ভাবে, সেই অপরের মধ্যে প্রভার নয়নমণি অনুরাণীও ছিল। হায়রে কপাল। যাক ওসব কথা প্রভা বললেন, দেখো ভদ্রলোক তো বিনা চিকিৎসায় মারাই গেলেন। আর যেন এসব নিয়ে অশান্তি না হয়। গদায়ের খাওয়া হলে তবে অমূল্য বাবুর কথা বলা হবে। নইলে মুখের মাছ না খেতে পেলে গদাই ক্ষেপে যাবে। ওর ত সবই দেখানি। সেবার দেখলে না। পর পর তিনটে অশুচ পড়লো ওদের। যা নিয়ে রাগ করে ওদের পুরণো চাকরটা চলে গেল। সেই সময় ডাঃ রায় বললেন, না তোমার জামায়ের সঙ্গে আজ লাঞ্চ খেয়ে এলুম। ঐছুতোয় কিছু পয়সা বাঁচিয়ে নিলো নিজে বাইরে ঠিকই খায়। কর্মাটার থেকে সন্ধ্যেয় গদাই ফিরলো। তারপর রাতে খেয়ে দেয়ে শুতে যাবে এমন সময় শ্মশান ঘাট থেকে তারা ফোন করলো মুখাগ্নি কি আমরা কর্ব? গদাই বললো নিশ্চয় নিশ্চয়। তার পরদিন বললো, পঁচিশটা টাকা ওদের দিতে গেছলুম ওরা নিলোনা। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানে। শুধু প্রভার মনে হয় মানুষ চিরজীবি নয় সত্যি তবু শেষ সময় যন্ত্রণা নিবারণের জন্মও তো ডাক্তার মানুষে চায়। অপাত্রে নির্ভর করে, অমূল্য বাবু সেটুকু শান্তিও পেলেন না। গদাই বললো, আমি ত জানতুমই উনি মারা যাবেন। মুরগী সম্বন্ধেও ঠিক এমনি ঘটনা ঘটলো। পৃথক সংসার করে অবধি গদাই বাড়ীতে মুরগী আনতে দিতোনা, বলত আঁসটে গন্ধ লাগে। কারণ মুরগীতে খরচা বেশী। অনুর হাঁসের ডিমে এ্যালার্জী হোত তবুও মুরগীর ডিম বেশী দাম বলে আনা যেতনা। হঠাৎ একদিন

বাড়ীতে উড়ে পড়লো। গদাই উল্লসিত হয়ে বললো কোর্মা রাঁধো তোফা খাওয়া যাবে। কথাটা প্রভার কানে উঠলো। পাশে কাদের বাড়ী মুর্গি থাকে সবাই জানে। তাকে না দিয়ে কোন ভদ্র সন্তান যে সে মুর্গি খায় এটী প্রভার পক্ষে অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা।

যা বলছিলুম, এরপর প্রসন্নবাবু মারা গেলেন। প্রসন্ন বাবু মারা যেতে, ধারে অর্থাৎ সদাশিব বাবুর কাছে টাকা-নিয়ে বিরাট ঘটা করলো গদাই। যাতে তার ধনী কার-বারি ভাইদের কাছে কোন কারণেই তার অর্থের অসামর্থ্য প্রকাশ না পায়।

এই প্রসঙ্গে গদায়ের ভায়েদের আর একটি মহানু-ভবতার কথা না লিখলে অত্যন্ত অন্যায় হবে। যখন গদাই পৃথক হয়ে এ বাড়ীতে চলে আসে, অনুর লক্ষাধিক টাকা মূল্যের গয়না ভল্টে মানিকচাঁদ ও গদায়ের একত্র নামে ছিল, ইচ্ছে করলেই মানিক চাঁদ সে গয়না তুলে নিতে পারতো। কিন্তু তা সে নেয়নি। এতে বোঝা যায় এমন কিছু অন্যায় অপরাধ গদাই করেছিল যাতে তাকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত না করে তাদের উপায় ছিল না।

মানিকচাঁদ জানতো সদাশিব বাবুর আর্থিক সঙ্গতি বেশী নেই। কাজেই অনুর গয়নাই গদায়ের মামলা চালানর ভরসা। কিন্তু গদাই গয়নায় না হাত দিয়ে যে শ্বশুরের বাড়ী বন্ধক দিয়ে মামলা চালাবে তা তার কল্প-নাতেও আসেনি। শুধু গয়না কেন? বড় বড় সাহেবা কাঁসা পেতলের বাসন এমন কি রূপোর বাসনকোসন যা প্রভা বারে বারে দিয়েছে তাও গদাই বিক্রি করেনি। তবে তার অপূর্ব্ব কৌশলে রূপান্তরিত করেছে। যেমন বিয়েতে প্রভা যে হীরের বোতাম গদাইকে দিয়েছিল, ঠিক তেমনি কমলহীরের বোতাম দিয়েছিল খোকার পৈতেয়। সেই দুটো বোতাম বদলে অন্য বোতাম কিনে রেখেছিল খুকুর বিয়েতে বরকে দেবার জন্য। থাকলে প্রভার স্মরণ কিন্তু পাছে তার ছেলেমেয়েকে বা পরে জামাই বৌকে বিহ্বল করে তাই এই সতর্কতা। এই ঘটনা অনুকে অত্যন্ত আঘাত দিয়েছিল। অনু মার কাছে এসে বললে "জলের দরে বোতাম দুজোড়া ও বিক্রি কচ্ছে মা, তুমি যদি কিনে রাখো দিদির আর বেণুর ছেলের পৈতেয় দিতে —তোমার হাতের আশীর্ব্বাদি জিনিষ মা এযে অমূল্য।"

বাসুদেবের অত্যন্ত শিশু বয়সে পৈতে হল। বাসুদেবের পৈতের সময় সদাশিববাবুর আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। তাছাড়া অসাধারণ মেধার জন্য বাসুদেব প্রভা ও সদাশিব বাবুর কণ্ঠমণি ছিল। সকাল বেলা বাসুদেব এসে খাবার টেবিলে না বসলে দাদু দিদিমার মন ভরত না, এমনকি প্রভার কঠিন অসুখের মধ্যেও তার পরিবর্ত্তন হয়নি। অনু মাকে গোপনে বলেছিল, জানো ত মা তোমার জামায়ের বাতিক। সকালে তার পুজোর পর সবাই পুজো কর্ব্বে। তারপর সবাই জল খাবে। এই কর্ত্তে কর্ত্তে বাসুটার খেতে খুব দেরি হয়ে যায়। জানো ত ছেলেটা শেষ রাত থেকে উঠে বাগানের সিঁড়িতে বই নিয়ে বসে থাকে। তুমি মা ওকে সকালে ডেকে দুধ খাইয়ে দিও। প্রভাতো এই-ই চায়। সকালে বাসুদেবকে পেয়ে দুজনের আনন্দ আর ধরে না। একদিন বাসুদেব দুধ খেতে বসে হঠাৎ দুধের গেলাসটা হাতে করে নিয়ে চলে গেলো। এই দুধ তৈরীর ভেতর প্রভার একটা আনন্দজনক খেলা ছিল। ছোট বেলায় বাসুদেব দুধ খেতে বড় বায়না কর্ত্ত। তাই প্রভা তার দুধ কোনদিন গোলাপজল কোনদিন ভেনিলা কোনদিন লেমন এসেন্স দিয়ে তৈরি করে দিতেন। আজো বাসুদেব তাঁর কাছে তেমনি শিশু। কিন্তু সেদিন বুকে হাঁপ ধরায় সদাশিব বাবু বলেছিলেন তুমি শোওনা, একটা দিনও কি আমি বাসুদেবের দুধ করে দিতে পার্ব্বনা? তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যে গোলাপ জল দিতে তিনি ভুল করেননি, ভুল করেছিলেন চিনির বদলে ইসব গুল দিয়ে। বাসুদেব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে। পাছে এই কথা বললে প্রভা হায় হায় করে ওঠেন বা সদাশিব বাবু বিব্রত হন সেই কারণে গেলাসটা হাতে করে নিয়ে চলে যায়। অনুকে সব কথা বলায়, অনু যখন মাকে দেখতে এলো বললো মা আজ বাসুদেবের দুধ কে করেছিল তোমার ঝি বুঝি? প্রভা বললেন কেনরে? তারপর সব শুনে বললেন, তুই ভাবতে পারলি অনু যে বাসুদেবের দুধ

আমি ঝিকে দিয়ে করাবো? প্রভার বৈশিষ্ট্য ঐখানেই, সহজেই মনে তিনি আঘাত পান। তাঁর স্নেহের অহঙ্কারের বুঝি সীমা ছিল না তাই বারে বারেই সেখানে আঘাত পেয়েছেন।

যাক যে কথা বলছিলুম বাসুদেবের পৈতেয় প্রভা ঠিক করলেন যে সদাশিববাবুর ফার্ষ্ট হওয়ার যে সোনার মেডেলটি আছে সেইটি তাকে দেবেন। তত্ত্ব-তালাস করার পর হঠাৎ গদাই বললো, সে কি, আমি যে শ্বশুরঠাকরুণ দেবেন বলে ব্ল্যাকমার্কেটে বাসুদেবের জন্য দামী সোনার বিলেতী ঘড়ির অর্ডার দিয়েছি। এর পর না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু সবচেয়ে মজা হল সেই ঘড়িটি গদাই মজাসে নিজে পরে বেড়ালো। সকলকে বললো আমি কিনেছি। আর সস্তার একটা হাতঘড়ি বাসুদেবকে কিনে দিলো—শিশু বাসুদেব সকলকে মনের আনন্দে বলে বেড়ালো, জানিস বাবা আমায় ঘড়ি কিনে দিয়েছে। খোকা খুকুর ভাতের রূপোর বাসনও গদায়ের দানের রূপোর বাসন এইভাবে রূপান্তরিত হয়ে গদায়ের মেয়ের বিয়েতে তার যৌতুকের অসামান্যতা প্রমাণিত করলো। এতে লোকসান যথেষ্ট হল তবু সদাশিববাবুর চিহ্ন ত অপসারিত হল এতেই গদায়ের কৃতিত্ব। আজ সদাশিব বাবু বলেন আমাদের চিহ্ন বলেই কি অনুমাকে ও সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করলো কে জানে?

প্রথম যখন নিচে আলাদা সংসার করলো গদাই প্রভা ওদের নিত্য ব্যবহার্য্য সব বাসনের সঙ্গে চারটে সেট কাঁসার বাসন দিলো—বাসনগুলিতে সদাশিববাবুর আদ্যাক্ষর কোঁদা। সেকালে তাই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু কদিন বাদে প্রভা নিচে গিয়ে দেখে ওরা রেকাবে ভাত খাচ্ছে। নাম লেখা থালাবাটি বদলে খুকুর বিয়ের বাসন কেনা হয়েছে। লোকের কাছে নেব কিন্তু সেটি স্বীকার করব না এইই হল গদায়ের মুলমন্ত্র। প্রসন্নবাবু যখন মারা গেলেন তখনও পিতৃবিয়োগের দুঃখ ভুলে গদাই নিজের যা প্রাপ্য তা বুঝে নিতে ভোলেনি। প্রভার আর্থিক অনটন জেনে নিরুপমার শ্বশুরবাড়ী থেকে যাটে ওঠার পৃথক তত্ত্ব করলো প্রভাকে সবই দিতে হচ্ছে কাজেই প্রভা বললেন বাঁচা গেল ঘাটে ওঠার কাপড় কেনার টাকাগুলো বাঁচলো। কিন্তু অনু কাঁদ কাঁদ মুখে এসে বললো, না মা তোমার জামাই বলছে মা যদি কাপড় চোপড় না দেন লোকে বলবে কি? এই লোক গদাই ছাড়া আর কে ছিল? গদায়ের বাপের বাড়ীর কেউই এখানে উপস্থিত ছিল না।

এরপর বেণুর বিয়ের ঠিক হল। ঐ সময় মধুপুরের বাড়ী বিক্রির নগদ তিরিশ হাজার টাকা সদ্য গদাই পেয়েছে। তাই ভরসা করে প্রভা মেয়ের বিয়ে স্থির করলেন। নিরু ও অনুর বিয়ে দিয়েছেন এগার বারো বছর বয়সে আর বেণু আজ এম এ পড়ছে। কুড়ি বছর বয়স। কিন্তু উপায় কি? কত বিপর্য্যয় না এর মধ্যে দিয়ে গেল। অনুকে না সামলে ত এ কাজে হাত দিতে পারবে না প্রভা।

এবার প্রভা হাত পাতলেন গদায়ের কাছে ধারের কিছু টাকা এবার ফেরৎ চাই। প্রথমেই খোকন এসে ভীষণ চেঁচামেচি কান্নাকাটি সুরু করলো মার গয়না বিক্রি করে বেণুমার বিয়ে হবে এ আমি সইতে পারবো না। খোকন ছেলেটা খুব ভালো, পিতৃমাতৃভক্ত খাটিয়ে সবই ভালো। কিন্তু গদাই যদি তাকে একবার তাতিয়ে ছেড়ে দেয় সে পাগলের মত চেঁচিয়ে মেচিয়ে কেঁদে কেটে অনর্থ কাণ্ড করবে। কারুর সাধ্য নেই যে তাকে বোঝায়।

প্রভাও তাকে সহজ কথা বলতে পারলেন না যে তোমার বাবা যদি আজ নগদ টাকা না বের করে অনুর চুড়ি বিক্রি করে ধার শোধ করে সে ত তোমাদের মামলার জন্যে, বেণুর বিয়ের জন্য ত নয়। নিরুপমার কাছেও খোকাকে পাঠিয়ে ঐ টাকা শোধ চাওয়ার জন্য গদাই নালিশ জানালো—নিরুপমা বিপন্নমুখে বললো কেন গদাই বুঝছে না মা যে তোমরা মরে গেলে সবইত ওরা পাবে। আজ নেহাৎ ঠেকায় না পড়লে কী ওর টাকা তোমরা চাইতে? না শোধ পাবার আশায় বাড়ী বন্ধক দিয়ে সুদ গুণছো?

প্রভা ভাবে বলিহারি খোকার বুদ্ধির আর গদায়ের প্রপাগণ্ডার যার ফলে খোকার মত লেখাপড়া জানা ছেলে বোঝে না যে টাকা শোধ দিতে গদায়ের বুক ফেটে যাচ্ছে। সে টাকা টাকা দিয়ে শোধ দেওয়া যায় না। সেইদিনে ওদের যদি বাড়ীতে আশ্রয় না দিত কোথায় যেত ওরা? কেমন করে লেখাপড়া শিখে মানুষ হত।

উপরন্তু নিরুর কাছে খোকা বলে এলো, জানো যতদিন দিদিমার কাছে মা থেকেছে, না কেঁদে মার দিন যায় নি। নিরুপমা শুনে ত অবাক। তবুও বললো অত ছোট-বেলার কথা তোর মনে আছে? খোকা মাথা নেড়ে কাঁদতে কাঁদতে বললো আমরা ছোট ছিলাম না মাসীমা আমরা জন্ম থেকেই বিজ্ঞ। এমন কথা নিরুপমা জীবনে শোনেনি। তবে অনুর কান্নার কাহিনী প্রভার কাছে নিরুপমা শুনেছিল। বলেছিল এমন মানুষের হাতে দিয়েছি মেয়েটার চোখের জলের বিরাম নেই। এত প্রাণ ঢেলে ওদের জন্য করেছি তবু গদায়ের নিত্যি ঝোঁক আলাদা হব। অনু বলে এই কটা টাকা দিয়ে কি করে যে এতবড় সংসার তুমি চালাচ্ছ তুমিই জানো মা? এই টাকা ধার বলে নিয়ে যদি চলে যাই তোমরা কি না খেয়ে মরবে আমার জন্যে? সে আমি পারবো না। অনুর নিত্য কান্নার এই ছিল ব্যাপার। তাছাড়াও প্রভা ও সদাশিববাবুর প্রতি তার উপেক্ষাব্যঞ্জক উক্তি প্রসন্নবাবু ও সদাশিববাবুর প্রতি তার ব্যবহারের পার্থক্যও অনুর চোখের জলের কারণ হত। গদাই নিজে মুখে বলেছে তাদের খাওয়ার কাছে তাদের মা কখনো উপস্থিত থাকতেন না এবং যে মা বাপকে পরামর্শ দেয় যোদো মাতালের হাতে কর্তৃত্ব তুলে দিতে সেই মায়ের প্রতি ভক্তির সীমা ছিল না কিন্তু সেমিজপরা ও চা খাওয়ার অপরাধে প্রভাকে মা বলতে তার প্রবৃত্তি হত না।

কিন্তু অনু ত জানতো পেটে না ধরলেও অপরের সন্তানকে নিজের সন্তানের সঙ্গে সমান স্নেহ দেবার মত অগাধ বাৎসল্য অনুর মায়ের আছে। নিরু অনুর স্বামীরা পুত্রহীনা প্রভার পুত্রের অধিক। বিশেষ করে গদায়ের বিপদে প্রভা যা করেছে মনুষ্যত্ব থাকলে গদাই তাকে মায়ের মত সম্মানই দিতো। এইসব কথা বলে প্রভার কাছেই অনু কেঁদে ফেলতো। প্রভাই তাকে বুঝুতেন এসব কথা কখন বোল না মুখে। একেই গদাই অবুঝ। তক্ষুণি মনে করবে তুমি বাপের বাড়ী আছ বলে বুঝি বাপের বাড়ীর দিকে টেনে কথা বলছো। তাছাড়া গদাই অকৃতজ্ঞ একথা যদি তোমার ছেলেমেয়েরা বোঝে তাদের গড়ার ভিত্তি আলগা হয়ে যাবে। ওদের মানুষ করে তোলাই তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় সার্থকতা একথা মুহূর্তের জন্য ভুলোনা। তখন প্রভা কি জানতেন সন্তানদের মানুষ করার জন্য অনু মনে মনে লড়ে নিজের জীবনী-শক্তি নিঃশেষ করে চলেছে। গদায়ের হ্যাঁকে হ্যাঁ বলেছে নাকে না বলেছে মায়ের কথার মান রাখতে এমনি করে জীবন বিসর্জ্জন দেবে মেয়েটা, হায়রে প্রভার কপাল।

হ্যাঁ যা বলছিলুম প্রসন্নবাবুর শ্রাদ্ধে একটা অভিনব কাণ্ড করলো গদাই। ডেকরেটার দিয়ে সব বাড়ী সাজিয়ে জ্ঞাতি-ভোজনের দিনে মস্ত একটা পার্টি দিল সে। তার সব চেনা জানা ডাক্তারদের। বললো ভূত-ভোজন করিয়ে লাভটা কি? এদের খাওয়ালে এরা আমায় কল্ দেবে। কল পাবার এই সহজ প্রক্রিয়া দেখে প্রভার এত দুঃখের মাঝেও হাসি পায়।

এরপরের ঘটনা বেণুর বিয়ে। বাড়ীতে বিয়ের আয়োজন শোয়া প্রভা আর শিশু প্রকৃতির সদাশিববাবু। প্রমাদ গণলেন প্রভা। গোঁদলপাড়া থেকে এসে দীপক কতটাই বা কি করবে? কিন্তু ধার শোধের বাবত দশ হাজার টাকা চাওয়াতে কত কাণ্ডই করলো গদাই। তার সঙ্গে কথা বলাই ঝকমারি। নিরুপমার কাছে শুনলো প্রভা হাতে টাকা থাকা সত্ত্বেও গদাই নাকি নিরুপমার ভাগ্নেজামাই এ্যাটর্নী মিলনের কাছ থেকে ছ হাজার টাকা ধার করেছে বেণুর বিয়ের নাম করে। আবার যে চুড়ি বিক্রির কথা নিয়ে খোকনকে দমদেওয়া পুতুলের মত লড়তে ছেড়ে দিয়েছিল সেই চুড়িও নাকি মহাত্মা পরেশ পাল মমতার বিক্রি করতে দেননি। চুড়ি

না নিয়ে নিজে টাকা ধার দিয়েছেন। এইভাবে গদায়ের জানা অজানা সব মহলে শ্যালিকার বিবাহে ডাক্তারের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কাহিনী প্রচারিত হল। ডাক্তার মহল থেকে কথাটা হাইকোর্টের বার-লাইব্রেরী অবধি গেল। দীপক এসে বললো নিরুর কাছে—গদাই একি করছে? সত্যিই কি ছেলেটা পাগল? সবচেয়ে মজার কথা অনুর লক্ষাধিক টাকার গয়না থাকতেও বেণুর বিয়েতে দু আনা সোনার একটা নাকছাবি পর্য্যন্ত দেবার ক্ষমতা অনুর হল না। শুধু একটি বেনারসী দেওয়া গদাই স্যাংশান করলো। যথারীতি বরের হীরের আংটি দিলেন দীপকবাবুর দিদিমা। দীপকবাবুর বাবা দিলেন গলার নেকলেস। আর নিরুপমা নিজের কানের হীরের ঝাড় দিয়ে বোনকে আশীর্ব্বাদ করলো। ঐদিন অনুর মার কোলে মুখ গুঁজে সে কী কান্না। আজো অনুর ছেলে মেয়েরা সগর্ব্বে তার মাকে তার মাথায় করে রাখার ও পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়ার যে কথা সকলের কাছে বলে বেড়ায়, তারা কি জানে ঐ অভিনয় করতে কি মূল্য দিতে হয়েছে তাদের মাকে? সেকালের যে কোন ক্রীতদাসীও অত নির্য্যাতন অত অসম্মান ওভাবে নতমস্তকে বয়েছে কিনা কে জানে?

সেদিনও প্রভা অনুকে কোলের কাছে টেনে নিলেন—বললেন, দেখ অনু তুই কেন এত অবুঝ হবি—?আমি ত অন্ধ, মৃত্যুশয্যায়। এর মধ্যে তোদের ঝড় ঝাপটা থেকে সামলে বেণুর যে আজ বিয়ে হচ্ছে এই-ই কি তোদের আনন্দর পক্ষে যথেষ্ট নয়? সামান্য টাকা আর হীরেকে তুইও যদি বড় করে দেখিস তাহলে আমার শিক্ষার যে দাম থাকে না অনু? নিরুপমার টাকা আছে সে দিয়েছে। তোরা দে সামর্থ্য তোরা উঠে না সামনে দাঁড়ালে শুয়ে শুয়ে এত বড় কাজ আমি তুলবো কি করে? এখন যদি ঐ পাগলকে ক্ষেপিয়ে দিস্ আমার সমস্ত কাজ পণ্ড হবে। আমি বরং বেণুর জন্যে যে কল্কা আংটিটা গড়িয়েছি ঐটে তুই বেণুকে দিস।

শিক্ষাময়ী অনু শিশুবেলার অনুর প্রদীপ্ত মুখে বললো, ছিঃ মা বেণুর বিয়েতে আমি একটা মুক্তোর আংটি দোব। তুমিও কি জানোনা বেণু আমার কত আদরের? তাছাড়া তুমিই ত চিরকাল আমাদের দিয়েছ মা। আমরা আর তোমায় কি দোব? আমার বিয়ের পর এই ত তোমার প্রথম আর শেষ কাজ। বেণুকেও আমি কিছু দিতে পাবো না? ওকি কিছুই বোঝেনা মা? এই ত সেদিন দিদির ভাগ্নেজামাই মিলনের মেয়ের ভাতে তাকে আমার মুক্তোর মালা দিলো, বললো, আমার জন্যে কত করেছে। মিলন এ্যাটর্নী হয়ে ওকে ত কম দেওয়া যায় না। কিন্তু বেণু যে তার শক্তি সামর্থ্য এমনকি ভবিষ্যৎ সব বিসর্জ্জন দিয়ে আমার ছেলে মেয়েদের মানুষ করেছে। ও ভুললেও আমি কি করে ভুলবো। মায়ের কোলের ওপর পড়ে অনুরাণীর সে কী কান্না! প্রভা তাকে শান্ত করে বললেন, এখন কান্নার সময় নয় অনু। তুমি আর গদাই আমার দুটি হাত। এই শক্তি হীনা মায়ের শক্তি হয়ে দাঁড়িয়ে তোমরা দুজনে আমার এই দায় তুলে দাও। এতে দশভরি সোনা বা হীরের নেকলেসের চেয়ে বেণুর ঢের বেশী মঙ্গল হবে। তুই আমার চিরকালের সুখের সুখী দুখের দুখী মেয়ে। তুই অবুঝ হলে আমি যে সব সাহস শক্তি হারিয়ে ফেলবো? আজ কাঁদতে কাঁদতে প্রভা ভাবেন মায়ের সেইকথা শিরোধার্য্য করে অনু মুখ বুজেই আত্মবিসর্জ্জন দিলো—নিজেকে পীড়ন করে একি আদর্শ শেখালেন তাঁর অনুমাকে।

এর আগেই একটি ঘটনা ঘটে গেছে, বেণু কঠিন নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হল। যথারীতি গদাই তাকে দেখলো—কিন্তু অবস্থা দিনে দিনে সঙ্কটময় হয়ে দাঁড়ালো। প্রভা কেঁদে গদাইকে বললো, আর ত এ কষ্ট চোখে দেখা যায় না। যদি নাই বাঁচে তাহলেও কষ্ট উপশমের একটা ওষুধ দাও। গদাই উপেক্ষাসূচক স্বরে বললো, আজকে কি দেখছেন এর দশগুণ কষ্ট বাড়বে—এ হল ড্রাই প্লুরিসী সাংঘাতিক জিনিষ। আজ আর প্রভা গদায়ের রাগের ভয় করলেন না। খবর দিলেন ডাঃ মল্লিককে। ডাঃ মল্লিকের কাছে তার মাটুকু মা মনি মাগো এদের সঙ্গে বেণুর কোন পার্থক্য ছিল না। বিশেষ করে প্রভার কঠিন অসুখে বেণুর সেবা ও সকলের বিরুদ্ধে একা

দাঁড়িয়ে মার জন্ম হার্ট স্পেশালিষ্ট আনানোর সাহস ও কর্তব্যপরায়ণতা মল্লিককে মুগ্ধ করেছিল। মল্লিক বললেন, কালকের দৃশ্য দেখার দরকার কি? আজই ওষুধ দিয়ে কষ্ট শেষ করা যাক। গদাই চেম্বার থেকে ফেরার আগেই। হলও তাই। মল্লিকের কাছে সম্মুখ পরাজয়ে গদাই আরো ক্ষেপে উঠলো। নিরুপমা দূরে থাকতো। অনুপমা সবচেয়ে বেশী সেবা মায়ের করেছিল, রাত নার্স থাকলেও মার সেবার বিশেষ কঠিন কাজ অনুমা নিজে হাতে করত। অনুপমার সেবা লেখায় বুঝনো যাবে না। নিজের কষ্ট শারীরিক পরিশ্রম উপেক্ষা করে সে যে কী আন্তরিক যত্ন নিয়ে মাকে স্নান, মলমূত্র পরিষ্কার ও খাওয়ানো করতো তা কেউ না দেখলে বুঝবে না। প্রভা ট্রেনিং-পাওয়া নার্সদের বলতো, মেজদির কাছ থেকে কাজ শিখে নাও দেখি? গা মুছুলে মাথা ধুইয়ে দিলে মনে হত যেন নিজের স্নানের ঘর থেকে স্নান করে এসেছে। কষ্ট হলে অনুকে ডেকে প্রভা বলতো, আমায় ঘুম পাড়িয়ে দে মা—আমায় ঘুম পাড়িয়ে দে। খাওয়াতে প্রভার বড় ভয় ছিল। খেলেই কষ্ট বাড়বে এই ধারণায় সে খেতে চাইত না। বলতো একটু ইসবগুল খাইয়ে ঘুমের ওষুধ দে। কিন্তু ছোট শিশুর মত মাকে চারবেলা খাওয়ান অনুমা ছাড়া কারুর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তায় একাজ সে লুকিয়ে করতো।

গদাই হাসপাতালে গেলে তবে সে এ কাজে হাত দিতো। প্রভা মরমর হলেও দুপুরে গদায়ের কাছে অনুকে ঘুমোনোর ভান করে শুতে হবে, ওঠার আইন নেই। ভান এই অর্থে লিখছি যে মার অত কষ্ট দেখে অনুপমার পক্ষে তখন ঘুমনো সম্ভব ছিল না। অনুমার মৃত্যুর পর গদাই বার বার বলেছে বাবার অসুখ হলে তাকে আটকে রাখা শক্ত হত। প্রভা মনে মনে ভেবেছে দুর্দ্দিনের আশ্রয়দাতা না হলেও অনুমার এটুকু স্বাধীনতাও ছিল না যে বাপের অসুখে সে এপাড়া ওপাড়া নয়, দেশ বিদেশ নয় একতলা থেকে দোতলায় আসে। অনুর ছেলেমেয়েরা অন্ম সংসার দেখেনি তাই বুঝলো না—কি বন্দীদশায় তার মা জীবন শেষ করে দিলো। চিরকালই গদায়ের চোখে সদাশিববাবু ও তাঁর স্ত্রীর সব কিছু কাজ অন্যায় ও অপরাধ বলে দেখা দিয়েছে। তাঁদের প্রতি তাঁর ব্যঙ্গ ও শ্লেষের অবধি ছিল না। সেই ভয়ে প্রভা বাড়ীর দোতলায় থেকেও নিচের সঙ্গে যোগাযোগ যতদূর সম্ভব কম রাখতো। মনে আছে একদিন কোথা থেকে সদাশিববাবু ও প্রভা ফিরেছেন। প্রভার কাজের বিষয় খোকন কিছু ঠাট্টা করতে যাওয়ায় অনুমা বলেছিল, জানিস, মা সাজলে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। আমাদের জন্যে মা নিজে কাঁচের চুড়ি পরে আমাদের হীরের গয়না দিয়ে বিয়ে দিয়েছে। ধুতিতে পাড় বসিয়ে মা পরেছে। ওরকম করে তোরা বলিস নি। অদৃষ্টের পরিহাস, দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর প্রভা ধীরে ধীরে সেরে উঠলো। বেণুর ওপর কেন জানিনা গদায়ের রাগের অন্ত ছিল না। বেণুর চলা খারাপ—এমনকি বেণুর যে অমন শাঁখের মত ধবধবে রং তাও কোনদিন মুখ ফুটে গদাই বলতে পারেনি। "যে গদাই বাপের সামনে দাঁড়িয়ে বুক চাপড়ে বলেছে, আপনাদের বংশে এমন ছেলে একটা আছে?" সেই গদাই। আমি যখনকার কথা বলছি গদাই সাধারণ বি এ পাশ ছিল। বিলেত যায়নি। কে বলতে পারে? যাদের গদাই ফুঁ-এ ওড়ায় সেই ডাঃ মল্লিক বা ডাঃ সেনগুপ্ত বাপের পয়সায় বিলেত গিয়ে সাতটা মাষ্টার রেখে বারবার ফেল করে পাশ করতে কি পারত না?

বেণু কলেজে ভর্ত্তি হতেই গদাই বললো এবার বেণু সিগারেট খেতে শিখবে। কিন্তু খুকুকে যথাসময়ে কলেজে পড়ালো। তার শরীরে গদায়ের পবিত্র রক্ত আছে, সে সিগারেট খেতে পারে না। বেণুর ওপর যে রাগ তা সংক্রামিত হল বেণুর বরের ওপর। তাকে উল্লেখ করতো ওই ছোঁড়াটা বলে। বেনুর বরের গাড়ী চালাতে দেখে বললো লোকে বাপের গাড়ীতে গাড়ী চালাতে শেখে আর ছোঁড়াটা ড্রাইভারের কোলে বসে গাড়ী চালাচ্ছে।

কিন্তু মজা এই, দীপকের বাবার নিজের গাড়ী ছাড়াও তার দিদিমা তাঁর একমাত্র দৌহিত্রকে পৈতের সময় গাড়ী দিয়েছিলেন। দীপক কিন্তু বাবার গাড়ী বা নিজের গাড়ী কোনটাই ড্রাইভ করত না। সে কিন্তু বেণুর স্বামীর সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হল না।

এই সময় অনুর ডায়বেটিস দেখা দিলো। অসুখটা ধরা পড়তেই গদাই মার মূর্ত্তিতে বললো বাপ ত ডায়বেটিসটি দিয়েছেন, ইনসুলিনের পয়সা ত দেবে না? এই কথাটা মার কাছে বলতে গিয়ে অনু কেঁদে ফেলেছিল। সত্যিই ইনসুলিন দেওয়া হল না, তাকে শুধু ডায়েট কণ্ট্রোল চললো। কিন্তু এতো প্রভার বাড়ী নয় যে সদাশিববাবু যা যা খাবেন না তা বাড়ীতে হবে না। গদায়ের মুখে আলু ছাড়া কিছু রোচে না। গদায়ের অদ্ভুত বাক-পটুতায় গদাই অনুকে বললো কাঁচা পেঁপেও যা কুমড়োও তাই। কেন না গদাই কুমড়োর ছক্কা ভালবাসে এবং কত যে ভালোবাসে বুলুর মৃত্যুর পর ক'দিনের মধ্যে কুমড়োর ছক্কায় কেন ছোলা ভিজে দেওয়া হয়নি এই কথা বোঝা গেল। পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানে, কাঁচা পেপে ডায়বেটিস রোগী খেতে পারে কিন্তু আলু বা কুমড়ো তার পক্ষে বিষবৎ। এমনিতেই বিশ্বকর্ম্মা গণেশ থেকে সুরু করে আলক্ষ্মী বিদায় কোন পুজোই বন্ধ নেই। মাসের মধ্যে পনের দিন অনুর এমনিই উপোস। তার ওপর সাংঘাতিক ডায়েট কণ্ট্রোল। শিক্ষিত সমাজে সবাই জানে বাড়ীতে ডায়বেটিস রোগী থাকলে যারা ডাল ভাত খায় তাদের চেয়ে তার ওপরই খরচ বেশী। এখানে হল বিপরীত। ডায়বেটিসের দোহাই দিয়ে অনুপমার আহার বন্ধ হল। প্রভা একটু ছানা আপেল পাঠাতেন কিন্তু গদাই হুকুম জাহির করলো—অমন যখন তখন খেলে চলবে না। আমার বাড়ীতে রাজার ঐশ্বর্য্য আসলেও একটা দানা মুখে দিতে পারবে না। ডাক্তারের আইন মেনে চলতে হবে। প্রথমে হুকুম হল ফ্যাট কমাও। সেটিতে বেশী দেরী হল না দ্রুত শরীর ক্ষয় হয়ে চললো। পর পর দুবার কার্ব্বংকল হল। হাতে পায়ে কেমন ঝিঁ ঝিঁ ধরা অবশ বোধ হল। অনু প্রাণপণে মাকে সব লুকিয়ে চলে। মা শুনলে অস্থির হয়ে উঠবে। কিন্তু যা যা বলবে গদাই কখনো তা করবে না।

ক্রমশঃ

ট্রেড-ইউনিয়ন দেশে ও বিদেশে : শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ৪।১এ মাধব চ্যাটার্জী লেন, কলি-২০ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ২.৫০, পৃষ্ঠা ১৮৮।

আলোচ্য পুস্তকে বৃটিশ, মার্কিন, সোভিয়েট, অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিক-আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের শ্রমিক-সংবাদ এবং বর্ত্তমান ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ও সংগঠনের এবং অতি সংক্ষেপে আন্তর্জাতিক-ক্ষেত্রে শ্রমিকসংগঠন ও আন্দোলনের পরিচয় ও ইহাতে আছে। পুস্তকের পশ্চিমবঙ্গের ধর্মঘটে ক্ষয়ক্ষতি, পাট-শিল্পে এবং অন্যান্য শিল্পে শ্রমিকসংগঠন, শ্রমিক-আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ও অন্যান্য শ্রমিকনেতাগণের অবদান উল্লিখিত এবং আলোচিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 'শ্রমিক আইন' সম্পর্কীয় অধ্যায়টি সংক্ষিপ্ত হইলেও উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় ট্রেড-ইউনিয়ন সম্পর্কীত পুস্তক নাই বলিলেই চলে অথচ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড-ইউনিয়ন এবং প্রেস স্থাপিত হইবার পূর্ব হইতেই এমন কী উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতের নানাস্থানে শ্রমিকআন্দোলনে এবং শ্রমিকসংস্থা গঠন আরম্ভ হইয়াছে। অবশ্য ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ট্রেড-ইউনিয়ন আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতেই শ্রমিক-সংগঠন জোরদার হয়। বর্তমানে চারিটি সর্বভারতীয় শ্রমিক-সংস্থা আন্দোলন চালাইতেছে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির দ্বারা ইহারা প্রভাবান্বিত বা চালিত। ভারতের শ্রমিক-আন্দোলন বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলন দ্বারা প্রভাবান্বিত বা উহার অংশ হইতে বাধ্য এবং কার্যতঃ তাহাই হইতেছে।

বর্তমান পুস্তকখানি শ্রমিক-কর্মীগণের প্রাথমিক পাঠ্য হিসাবে কার্যকরি হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। লেখক নিজে বহুদিন ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন এবং পরবর্তীকালেও শ্রমিকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ছিল। এজন্য তাঁহার ব্যক্তিগত মূল্যবান অভিজ্ঞতা এই পুস্তক রচনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট পাঠকসমাজে ইহা আদৃত হইবে এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৭৫

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বিক্ষোভ

যে যাহা চায় তাহা না পাইলে মনে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই যে চাওয়া ইহা যে সর্ব্বদাই ব্যক্তিগত প্রাপ্তির কথা তাহা নহে। অনেক ক্ষেত্রেই চাওয়ার সহিত মানুষের ব্যক্তিগত পাওয়ার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। যথা অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা চাহেন যে ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপিত হয়, কিম্বা ইস্রায়েল ও আরবের বিবাদের কোন ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত সমাধান হয়। আরও বহুলোক আছেন যাঁহারা চাহেন যে, পৃথিবীর সকল লোক খৃষ্টান অথবা মুসলমান হইয়া যা'ন; কিম্বা ভারতের সকল লোকে হিন্দীভাষা নিজের জাতীয়ভাষা বলিয়া মানিয়া ল'ন ও ঐ ভাষা কথায় ও লেখায় ব্যবহার করেন। কেহ চাহেন যে ভারতের জনগণ আমেরিকা অথবা চীনের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতে থাকেন, অথবা সর্ব্বদেশে চাষা, মজুর ও সৈন্যদিগের রাজত্ব হয়। অন্যক্ষেত্রে যাইলে দেখা যায় যে, কেহ কবিতাকে ছন্দ ও অর্থের পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চালাইতে চাহেন; কেহবা সুর ও তালকে যথেচ্ছাচার করাইয়া সঙ্গীতে ও বাদ্যে অচলকে সচল করিয়া তুলিতে চাহেন এবং চিত্রে ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে নূতনত্ব সৃজনের পথে অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চাহেন। কেহ বাস্তবতাবাদের দোহাই দিয়া বীভৎস ও কুৎসিতকে সাহিত্যে ও শিল্পে উচ্চতম আসনে বসাইবার চেষ্টা করেন। নিজমত যতই উদ্ভট হউক না কেন; নিজের বলিয়াই তাহার একটা আভিজাত্য থাকিবে ইহা সকলেই চাহেন এবং সেই কারণে অপরের মত বিপরীত হইলে তাহা উদ্ভট মতবাদীর প্রাণে বিক্ষোভ জাগ্রত করে। যেখানে ব্যক্তিগত ভাবে কোন কিছু পাওয়ার কথা উঠে সেই সকল ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, দেনাপাওনার হিসাবে দেনা ক্রমশ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতেছে এবং পাওনা সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলিতেছে। যত কম কাজ করিয়া অথবা যথাসম্ভব কম দিয়া যত অধিক [illegible]

যায়, ততই দেখা যায় বিক্ষুব্ধভাবের চাহিদার রূপ প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

আরো অন্যক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিক্ষোভ মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিতেছে। বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষকের গুণাগুণ, পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্রের সমালোচনা, শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা ব্যতীত অপরাপর সুখ-সুবিধার এবং নানাপ্রকার ওজোর, আপত্তি, বিদ্বেষ, মত জাহির প্রভৃতির কথা। সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, আজকালকার জনমত; তাহা ছাত্রদিগের মত হউক অথবা মজুর, চাকুরে কিম্বা ট্রেন-বাসযাত্রীর মত হউক; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব্ব হইতে স্থির করা কোন মতলব হাসিল করিবার উপায়। এই মতলব অনেকক্ষেত্রেই এমন কারণ ও উদ্দেশ্যে গঠিত যে তাহাকে স্বভাবজাত বলা চলে না। যথা বিদেশের বা স্বদেশের এমন অনেক লোক আছে যাহারা ভারতে নিজশক্তি প্রবলতর করিয়া তুলিতে চাহে। এবং তাহার জন্য নানা গুপ্ত উপায়ে জনমত গঠন করিবার ব্যবস্থা ঐ সকল ব্যক্তিরা করিয়া থাকে। বহু লোকে সকল কথা জানিয়া বুঝিয়া এই কার্য্যে সহায়তা করে আবার কেহ কেহ না বুঝিয়া অপরের প্ররোচনায় হাল্লাহুজুগে যোগদান করে। যুবজন ও ছাত্রদিগের মধ্যে দেখা যায় বিদেশের ছেলেমেয়েদের অনুকরণ করিবার আগ্রহ। বস্ত্রে, কেশকলাপে, বাক্যালাপ ও ব্যবহারে অপর দেশের অল্পবয়স্কদিগের অনুকরণ করা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে অধৌত বস্ত্র, চুড়িদার প্যাণ্ট, দাড়িগোঁফ দীর্ঘকেশ ও নানাপ্রকার ভব্যতার অভাব ও নেশা করিবার আগ্রহ। আমাদের দেশে এখনও বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া গোল হইয়া বসিয়া গঞ্জিকাসেবন আরম্ভ হয় নাই; তবে হইতে বিশেষ বিলম্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। পাশ্চাত্যে কঠিন ছাঁচেঢালা জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও রীতিনীতির অপরিবর্ত্তনীয় চাপের মধ্যে মুক্তির সন্ধানে ধাবমান যুবজনের বিকৃত কার্য্যকলাপের একটা কারণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশের ঢিলা চাল চলনের আবহাওয়ায় তাহার কোন তুলনীয় কারণ দেখা যায় না। শুধু অনুকরণ প্রিয়তাই তাহার কারণ বলা যাইতে পারে। এই সকল বদঅভ্যাসের মূল প্রেরণা পুরাতন সভ্যতার প্রতি অশ্রদ্ধা। তাহার মধ্যে রহিয়াছে এক মহাভুল যে সভ্যতার সংস্কার অসভ্যতার দ্বারা হইতে পারে। অসভ্য ব্যবহার অঙ্গভঙ্গী করিয়া বা মুখ ভ্যাংচাইয়া অশ্রদ্ধা জ্ঞাপনের মতই; তাহার অপর কোন সার্থকতা নাই। সমবেতভাবে হৈ হল্লা করা অথবা সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি সভ্যতা ভব্যতার নিয়ম পদ্ধতি অমান্য করিয়া চলা সমাজকে ও সমাজনেতাদিগকে অসম্মান প্রদর্শন করিবার চেষ্টা মাত্র। ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত আদবকায়দা সত্যসত্যই নূতনরূপ ধারণ করিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ অসভ্যতা কখন সমাজে ব্যবহারের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। মতদ্বৈধের অবসানে অসভ্যতারও শেষ হয় এবং মানুষ পুনরায় পূর্ব্ব প্রচলিত রীতিনীতি সামাজিক ব্যবহারের আদর্শে ফিরিয়া যায়। ইতিহাসে বহুবারই বিক্ষোভ জ্ঞাপনার্থে ও বিদ্রোহের মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য শীলতা বর্জ্জন করিয়া মানুষ যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়াছে; কিন্তু সামাজিক অবস্থা পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে সেই সঙ্গে ব্যবহারে ভব্যতাও ফিরিয়া আসিয়াছে।

বর্ত্তমান জগতে যাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহারা সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আস্থা হারাইয়াই ঐরূপ করিতেছে। পূর্ব্বকালের রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা, শিক্ষক, ব্যবসাদার, ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদের সহিত তুলনায় বর্ত্তমানের মহারথীগণ নগণ্য বিবেচিত হওয়ার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার আজকালকার পেশাদার নেতাগণ নিজেদের স্থানে অপেক্ষাকৃত অধিক গুণবান লোকেদের আসিতে দিতেও প্রস্তুত নহেন বলিয়া তাঁহাদিগের দলগুলি ক্রমশঃ আরোই গুণহীন রূপ ধারণ করিতেছে ও সেই কারণে তাঁহাদিগের অপসারণের জন্য বিক্ষোভ বাড়িয়াই চলিতেছে। আমাদিগের দেশেই পূর্ব্বে যেখানে সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কিম্বা তৎপূর্ব্বে বিবেকানন্দ,

ঈশ্বরচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ছিলেন বর্ত্তমানে তাঁহাদিগের স্থানে যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া পথপ্রদর্শক বলিয়া মানিয়া লইতে সকলে প্রস্তুত নহেন কিন্তু পথ প্রদর্শন করা যেখানে একটা জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় মাত্র দাঁড়াইয়াছে সেখানে পূর্ব্বযুগের আদর্শবাদী নিষ্ঠাবান মহাপুরুষদিগের সহিত আজকাল-কার উপার্জ্জন আহরণকারী অতি সাধারণ রাষ্ট্রনেতা শিক্ষক ও ধর্ম্মপ্রচারকদিগের তুলনা হয় না। এমনকি আজকালকার চিকিৎসক, আইনজ্ঞ ও যন্ত্রবিদগণ পূর্ব্বের লোকেদের তুলনায় সেইরূপ জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইতে সক্ষম হইতেছেন না। ইহার কারণ পূর্ব্বের মানুষ নিজেদের কার্য্য ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়া থাকিতেন এবং আজকালকার লোকেরা সেইরূপ মনেপ্রাণে কোন কাজেই নিযুক্ত থাকেন না।

যাঁহারা বিক্ষুব্ধ ও বিপ্লবাকাঙ্খী তাঁহাদিগেরও নিজেদের মধ্যে মত বিরোধের অভাব নাই। রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীত, শিক্ষা, ধর্ম্ম বা কৃষ্টিগত সকল বিষয়েই নূতন পথের পথিকগণ নানাদিকে চলিতেছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আদর্শ বিচারে কোন একতা আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং যদি পুরাতন পূজারীগণ কর্ম্মে ইস্তফা দিয়া সরিয়া দাঁড়ান তাহা হইলে পৃথিবীব্যাপি এক বিরাট ঐক্যের সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় কলহটা আরও ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইয়া অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। এখন যে অবস্থা তাহাতেই কোথাও দুই তিনজন বিদ্রোহী একত্র হইয়া আলোচনায় বসিলে অচিরাৎ বিভিন্ন মতদ্বৈধের অবতারণা হইতে আরম্ভ করে। কথায় কথা বাড়িয়া মতভেদ আরও গভীর হইয়া যায় এবং শেষ পর্য্যন্ত কোন সমস্যারই সমাধান হইতে পারে না।

তাহা হইলে এই বিক্ষোভ, বিবাদ ও বিশ্বব্যাপী অসন্তোষের শেষ কি করিয়া হইতে পারে? কি উপায় আছে যাহা দ্বারা জনসাধারণ সকল ক্ষেত্রেই উৎকৃষ্টতর ও আরও বহু গুণশালী ব্যক্তিদিগকে সম্মুখে রাখিয়া জীবনপথে চলিতে পারিবেন? একথা ঠিক যে পেশাদারী বন্ধ করিয়া সাধারণের গুণগ্রাহিতার মাপকাঠিতে মাপিয়া মানুষকে নেতৃত্বের আসনে বসাইতে পারিলে সেই নির্ব্বাচন নিঃসন্দেহ, এখনকার বাজারের ওজনের বিচার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে। রাষ্ট্রক্ষেত্রের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন যেভাবে করা হয় তাহাতে আমরা দেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি-বিদদিগকে দেশের কার্য্যে সংগ্রহ করিতে পারি বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষারক্ষেত্রে চাকুরীতে নিযুক্ত হইয়া যাঁহারা আইসেন তাঁহারাও শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন না। কৃষ্টি ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অজানা থাকিয়া যা'ন। সর্ব্বক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ মানবদিগকে সম্মুখে আনিতে পারিলে তবেই তাঁহাদিগের নেতৃত্ব সর্ব্বসাধারণের অনুমোদিত হইবে এবং বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের ডাক আর ধ্বনিত হইবে না। কিন্তু মেকি সরাইয়া তৎস্থলে সাচ্চা যাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবে কে?

বাংলায় কংগ্রেসের পতন

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যার প্রবাসী বাহির হইবার সময়েই পরিষ্কার দেখিতেছি যে, মধ্যকালীন নির্ব্বাচনে বাংলা দেশে কংগ্রেসের পরাজয় একপ্রকার স্থিরনিশ্চয় রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার মূলে কোন আদর্শবাদের কথা নাই। অর্থাৎ বাংলার অধিবাসীগণ যে পূর্ব্বে কংগ্রেসের অহিংসনীতি ও অন্যান্য মতবাদে বিশ্বাস করিতেন এবং এখন সে বিশ্বাস হারাইয়া তাঁহারা যুক্ত-ফ্রণ্টের নানান প্রকার মতামতে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এইরূপ ধারণা পোষণ করিবার কোন কারণ নাই। বাংলার অধিবাসীরা এই কারণেই কংগ্রেসকে সরাইয়া দেশশাসনের ভার অপরের উপর ন্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন যে তাঁহারা নির্ভুল বুঝিয়াছেন যে কংগ্রেসের দ্বারা শাসিত বাংলা ক্রমে ক্রমে সকল দিক দিয়াই অব-নতির পথে গভীর হইতে আরও গভীরে নামিয়া চলিয়াছে ও কংগ্রেসের কোন শক্তি বা ইচ্ছা নাই যাহা এই পতন হইতে বাংলাকে রক্ষা করিতে পারে। বিগত ২০ বৎসরের অধিককাল কংগ্রেস যে সকল গঠনশীল কার্য্যে

হাত লাগাইয়াছে তাহার কোন কিছুর দ্বারাই বাংলার কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় নাই। শুধু ইহাই দেখা গিয়াছে যে ভারতে বাংলার স্থান ক্রমশঃ নীচের দিকেই নামিয়া চলিয়াছে। উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে বাংলা দেশের লোকেদের সরাইয়া ক্রমশঃ অবাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে ও তাহার মূলে রহিয়াছে কংগ্রেস অনুগত অবাঙ্গালী ধনিকগণ। কলিকাতা ও কলিকাতার বাহিরে বহু দফতর ও কারখানাতে বাঙ্গালীর বিতাড়ন কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রবলভাবে চলিয়াছে ও সহস্র সহস্র বাঙ্গালীর চাকুরী গিয়াছে। নূতন কার্য্যে যাহারা বহাল হইয়াছে ও হইতেছে তাহার মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। আর একটা কংগ্রেস বিরুদ্ধতার কারণ হিন্দী ভাষা চালাইবার চেষ্টা। বাংলা দেশের বুকের উপর বসিয়া বাংলা ভাষার প্রসারে বাধা দিবার ব্যবস্থা যাহারা করিতেছে তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই কংগ্রেস সমর্থিত পন্থায় চলিয়া থাকে। রেল ষ্টেশনের বই বিক্রয়ের দোকানগুলিতে যাইলেই বুঝা যাইবে যে বাংলা পত্রিকা পুস্তক প্রভৃতি না রাখিয়া ঐ সকল পুস্তক পত্রিকা বিক্রেতাগণ কেমন করিয়া হিন্দী পুস্তক ও পত্রিকা প্রচার চেষ্টা করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার শতশত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া হিন্দী প্রচার চেষ্টা চালাইতেছেন। এদিকে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা এখনও ভাল হয় নাই। মাতৃভাষায় লেখা পড়া করিতে দেশের অধিকাংশ লোকেই পারে না। এই অবস্থায় হিন্দী প্রচারের জন্য কোথাও এক পয়সা ব্যয় করা উচিত নহে। কংগ্রেস কিন্তু এ কথায় বিশ্বাস করেন বলিয়া মনে হয় না। বাংলার বিভিন্নস্থানে কাজ কারবার, আবাসগৃহ, যানবাহন, অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থা, মালিকানা প্রভৃতি ক্রমশঃ বাঙ্গালীর হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে। ইহার মূলে কংগ্রেসের অবাঙ্গালী পোষণ "পলিসি" অনেকটা আছে নিঃসন্দেহ। চাকুরী চাহিলে না পাওয়া পাইলে, অল্প বেতন লাভ, বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি, দোকানদারের ও উত্তমর্ণের প্রবঞ্চনা, আমলাতন্ত্রের অত্যাচার প্রভৃতি সকল বিষয়েই মানুষ দেখে সেই সকল লোকের প্রাদুর্ভাব যাহাদিগের পশ্চাতে রহিয়াছে কংগ্রেস। এক কথায় বাংলার মানুষ আজ তার সকল অভাব অভিযোগের মূলে কংগ্রেসের বাঙ্গালী বিরুদ্ধতা ও বাঙ্গালীকে রক্ষা করিবার ইচ্ছার অভাব দেখিয়া এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিপক্ষ দলগুলিকে সমর্থন করিয়াছে। এইরূপ যে ঘটিবে তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানা গিয়াছিল, কিন্তু কংগ্রেসের নেতাগণ তাহার কোন প্রতিকার চেষ্টা করেন নাই। নূতন পথে চলিবার ইচ্ছা, নূতন আগ্রহ ও কর্ম্মশক্তির সংগঠন, পুরাতন পাপ বিদায়, সকল দেশবাসীর অভাব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টা ইত্যাদি যাহা যাহা করা প্রয়োজন ছিল, কংগ্রেসের নেতাগণ তাহা কিছুই করেন নাই। এই কারণে মানুষ তাঁহাদিগের উপর আস্থা হারাইয়া অপর উপায় সন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছে।

সকল রাষ্ট্রনৈতিক দলেরই উপরোক্ত দোষগুলি কমবেশী থাকে ও আমাদের দেশেও আছে। কোন দলের মতবাদ কি ও কোন মহান আদর্শ অনুসরণ করিয়া কে চলে তাহা দিয়া দেশবাসী কখনও কোন রাষ্ট্রীয় দলের গুণাগুণ বিচার করিবে না। কাহারও উপর শাসন ভার দেওয়া হইলে দেশবাসী চাহিবেন উপযুক্ত শাসন ব্যবস্থা ও দেশের লোকের অভাব অভিযোগ দূর করিবার আয়োজন। এখন আমরা যাঁহাকেই ভোট দিয়া থাকি তাঁহার উচ্চাঙ্গের চিন্তা ও মতবাদের সহিত আমাদের বিশেষ কোন সংযোগ থাকিতে পারে না। যে দ্বাদশটি দল মিলিত হইয়া যুক্তফ্রণ্ট গঠিত হইয়াছে সেইগুলির রাষ্ট্রীয় আদর্শসংক্রান্ত মতামত বহুক্ষেত্রেই পরস্পরবিরোধী হইলেও তাহারা মিলিতভাবে দেশ শাসন, গঠন ও উন্নয়ন কার্য্য চালাইবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে মার্কস্‌বাদ অথবা বাংলা কংগ্রেসের আদর্শের মিল না থাকিলেও দেশের মূল আবশ্যক কার্য্য করিতে আটকাইবার কথা উঠে না। মূলতঃ আবশ্যক কি তাহা বুঝিতে মার্কসবাদ কিম্বা গান্ধীবাদ না জানিলেও চলে। বাংলার মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা মনের আনন্দ ও আত্মসম্মান রক্ষার ব্যবস্থাই হইল অতি আবশ্যকীয়, যাহা সকলে মতদ্বৈধহীনভাবে বিশ্বাস করেন।

ইহার জন্য যাহা করিতে হইবে ও যে ভাবে করিতে হইবে তাহার মধ্যে পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় অথবা সমাজনীতিগত বড় বড় কথার অবতারণার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বরঞ্চ ইহাই দেখা যায় যে শান্তিপূর্ণভাবে কোন বিক্ষোভ, আন্দোলন, কলহ বিবাদের সৃষ্টি না করিয়া যাহাতে বাংলার সকল অধিবাসীর উন্নতভাবে মানবজীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা যায় তাহাই হইল দেশশাসনের বর্তমান উদ্দেশ্য। যদি কেহ মনে করেন যে বিপ্লব ও প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ভাঙ্গাচোরা একান্ত প্রয়োজন তাহা হইলে সেই সকল ব্যক্তিদিগের কর্ত্তব্য হইবে শাসনের আসরে না নামিয়া বাহির হইতে যুদ্ধবিগ্রহ চালান। মানব-ইতিহাসে বিদ্রোহ ও বিপ্লবেরও স্থান কিরূপভাবে থাকে তাহা আমরা জানি। শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রশাসন কার্য্য চালনা এবং বিদ্রোহ বিপ্লবের সমন্বয়সাধন কখন সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং আবার ঐ কথাই বলিতে হইতেছে যে যুক্তফ্রন্ট রাষ্টকার্য্য হস্তে লইয়া যেন রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার আগ্রহ না দেখান। দেশের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে এমন অধিকভাবে কার্য্য ও ব্যবস্থার অভাব প্রকট হইয়া নানা স্থানে বর্ত্তমান যে সেই সকল ফাঁকা জায়গায় গঠনমূলক কর্ম্মের বীজ বপন করিয়া তৎপরে তাহার সেচন ও বর্দ্ধনের আয়োজন করিতেই বহু মহারথীর সকল শক্তি লাগিয়া যাইবে। ঐ কার্য্য করিয়া তৎপরে বৃহত্তর আবেগের বিকাশ ও অভিব্যক্তির প্রয়োজনের কথা উঠিতে পারে; তৎপূর্ব্বে নহে। যাঁহারা পূর্ব্ব পশ্চাত বিবেচনায় পারগ নহেন তাঁহাদিগকে সমাজের জীবন ক্ষেত্রে না নামাইলে দেশের মঙ্গল হইবে। বিগত নির্ব্বাচনের পরে যুক্তফ্রন্ট এই বিষয়ে যে যে ভুল করিয়াছিলেন এইবারে আশা করি সেই ভুলগুলির পুনরাবৃত্তি হইবে না। কারণ তাহা হইলে দেশবাসীকে বহু পরিশ্রম করিয়া নূতন শাসনকার্য্যের ব্যবস্থা করাইবার কোন সার্থকতা থাকিবে না। নূতন বাংলা সরকার কি ভাবে কোন পথে চলিবেন তাহার উপর দেশের মঙ্গল বিশেষভাবে নির্ভর করিবে। এই কার্য্যে যুক্তফ্রন্টের নেতাদিগের গভীরভাবে চিন্তা করিয়া অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

কর্ম্মশক্তির ব্যবহার

আমরা বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির একটা মহা দোষ হইল তাহার যন্ত্র ব্যবহারে সকল আর্থিক সমস্যার সমাধান চেষ্টা। ক্রমাগত কারখানা বসাইয়া দেশবাসীর অভাব দূর ত হয়ই নাই; শুধু দেশের শ্রমশক্তি, অব্যবহৃত থাকিয়া নষ্ট হইয়াছে, ও বেকার ও অর্দ্ধবেকারদিগের কোন উপার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত হয় নাই। এইভাবে ঋণের টাকায় দেশের উন্নতি অথবা দেশবাসীর উপার্জ্জনহীনতার লাঘব করা, কোনটাই হয় নাই। দেশের সকল মানুষ যদি কারখানা গঠন করিয়া ঐ কারখানার উৎপাদনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মে লাগিবে মনে করা হয়; তাহা হইলে দেখিতে হইবে একএকজন শ্রমিককে কাজে লাগাইতে কত টাকা মূলধন হিসাবে লাগে। কারখানা নানাপ্রকার হয়। কোন কোন কারখানা যন্ত্র প্রধান ও কোন কোন গুলি শ্রমপ্রধান; অর্থাৎ যেগুলিতে বহু টাকার যন্ত্র ব্যবহারে এক একটি শ্রমিক কাজে লাগে সেগুলি যন্ত্র প্রধান ও যেগুলিতে অল্প মূল্যের যন্ত্রে কাজ করা যায় সেগুলি শ্রমপ্রধান। বিশেষভাবে যন্ত্রপ্রধান কারখানায় মাথাপিছু লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্র লাগিতে পারে। যন্ত্র প্রধান কারখানায় এককোটি শ্রমিককে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইলে এক কি দুই লক্ষ কোটি টাকা লাগে। শ্রমপ্রধান কারখানা অধিক করিয়া গঠন করিলে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকার যন্ত্রে এক এক জন শ্রমিক কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ যদি কারখানাতে মোট ৫ কোটি শ্রমিক নিযুক্ত না হইলে দেশ হইতে বেকারসমস্যা দূর করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তিন সাড়েতিন লক্ষ কোটি টাকা না লাগাইলে সে কাজ হইতে পারে না। দেশের নিজের যা টাকা আছে বা থাকিতে পারে তাহাতে এতটা মূলধন সংগ্রহ করিতে প্রায় ১০০ শত বৎসর সময় লাগিবে। ঋণ করিয়া ঐ অর্থ সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব হইবে বলা যাইতে পারে। সুতরাং সে পথে যাইবার চেষ্টা না করাই উচিত। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে এখনকার

পরিস্থিতিতে কেন্দ্র হইতে মূলধন সরবরাহ করিয়া কারখানা গঠন সহজ করা হইবে এরূপ আশা করা যায় না। ব্যক্তিগত ধনিকগণ বাংলাদেশে মূলধন নিয়োগ করিতে বিশেষ উৎসুক নহেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। সুতরাং বাংলার অর্থনীতি কিভাবে চলিলে বাংলার অসংখ্য শিক্ষিত ও নিরক্ষর বেকারদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া উপার্জ্জনের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব হইবে তাহা বলা খুবই কঠিন। অতি অল্প মূলধন লইয়া কি কাজ হইতে পারে? সেই কাজ ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের কাজ অথবা মানুষের বিলাসিতার আকাঙ্খা নিবৃত্তির কাজ? চাকুরিতে কতলোক চেয়ারে বসিয়া কাজ করিতে পারে ও কত লোককে চেয়ারে না বসিয়া হাঁটিয়া চলিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ করিতে দেওয়া যাইতে পারে ইত্যাদি বহুকথা খবর লইয়া বিচার করিয়া বলিতে হইবে। বাংলার শ্রমশক্তি এমনভাবে ব্যবহার করিতে হইবে যে সেই শ্রমেরদ্বারা উৎপাদিত বস্তুসকল সহজে ক্রীত ও ব্যবহৃত হইতে পারে। ভোগ্যবস্তু উৎপাদন হয়না কিন্তু কার্য্যদ্বারা সাধারণের সুখ সুবিধার সৃষ্টি হয় সেই প্রকার কার্য্যেও বহুলোক নিযুক্ত হইতে পারে। যথা শিক্ষকের, ডাক্তারের, আইনজ্ঞের, রেল বাস ট্রাম ট্যাক্সী চালকের এবং সঙ্গীতনৃত্য অভিনয়ক্রিয়াদির অংশ গ্রাহক-দিগের কার্য্য। রন্ধন, গৃহকর্ম্ম, পাহারা দেওয়া, মোটবহন প্রভৃতি কার্য্যও প্রয়োজনীয় এবং শিখিলে উপার্জ্জন করিবার উপায় হইতে পারে। বাংলার মানুষ অতি অল্প উপার্জ্জনে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারে না। এই কারণে এই সকল কার্য্য এমন করিয়া করা প্রয়োজন যাহাতে শ্রমশক্তি পূর্ণ ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহার ফলে উপার্জ্জন অধিক হয়। যথা রন্ধন। এক বাড়ীতে রন্ধন করিলে একজন কর্ম্মীর যাহা বেতন লাভ হয় তাহাতে তাহার প্রয়োজনের অর্থ অর্জ্জিত হইতে পারে না। কিন্তু যদি একটি রন্ধন-শালায় পনের কুড়িটি পরিবারের রান্না হয় তাহা হইলে সেই কার্য্যের জন্য পরিবার পিছু কুড়ি টাকা পাইলে চারিশত টাকা আদায় হইতে পারে। এই টাকায় দুইজন কর্ম্মীর চলিতে পারে। মিলিতভাবে ব্যবস্থা ক'রলে বড় বড় শহরে শতসহস্র লোকের এই উপায়ে দিন গুজরান হইতে পারে। বস্ত্র ধৌত করা, গৃহ পরিষ্কার রাখা, রং বা পালিশ করা ইত্যাদি কার্য্যে ঐ প্রকার মিলিত চেষ্টা করা যাইতে পারে। বড় বড় শহরে বাজার করা আর একটি লাভ-জনক কাজ। যদি দুই চারজন, কর্ম্মী পাড়া হিসাবে সকলের বাজার করিয়া দেন, তাহা হইলে সেই উপায়ে এক এক ব্যক্তির দুই আড়াইশত টাকা মাসিক রোজগার হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। এক হাজার পরিবার রন্ধন, গৃহকর্ম্ম, বাজারকরা, রং পালিশের কার্য্য, কাপড় ধোওয়া এবং মিলিতভাবে গাড়ীরাখা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা এমন কি রোগ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে মনে হয় এক দেড়শত কর্ম্মী নিয়োগ করা যাইতে পারে। একহাজার পরিবারে এই সকল কার্য্যের জন্য মাসিক অন্তত পরিবার প্রতি এক শত টাকা ব্যয় করা হয়। এই টাকা উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া ব্যয় করিলে কাজ উঁচুদরের হইতে পারে এবং কর্ম্মীগণও উপযুক্ত রোজগার করিতে পারেন। এইরূপ ব্যবস্থা আজকাল পাশ্চাত্যের বহু দেশেই হইতেছে এবং ব্যক্তিগত চাকরবাকর নিয়োগ ঐ সকল দেশে প্রায় উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। একঘণ্টা দুইঘণ্টা মাত্র কাজ করিয়া এক এক বাড়ীর সকল কার্য্য উদ্ধার করা হইয়া থাকে। কার্য্যের মজুরী ঘণ্টা পিছু তিন-চারটাকা হইয়া থাকে। অর্থাৎ ছয় সাতটি গৃহে কাজ করিয়া এক একজন কর্ম্মী মাসিক ৫০০।৬০০ শত টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন।

আমরা যদি ধরি যে আমাদের দেশে এক একজন কর্ম্মীকে অন্তত ২৫০৲ টাকা মাসিক আয় করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে সমবেত প্রচেষ্টা ব্যতীত তাহা হইতে পারে না। বাংলাদেশে ছোট বড় শহরে অন্তত পাঁচলক্ষ পরিবারে ঐ জাতীয় কার্য্যের চাহিদা আছে। এই জন্য পঞ্চাশ হাজার লোকের প্রয়োজন। তাঁহারা যদি ২৫০৲ টাকা হারে বেতন পান তাহা হইলে একেকোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা মাসিক প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ পরিবার প্রতি মাসিক পঁচিশ টাকা ব্যয় করিলে গৃহের নানাপ্রকার কার্য্য হইয়া যাইবে। যাঁহারা কথায় সমাজবাদের চূড়ান্ত করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি

কলিকাতাতে এইভাবে গৃহকর্মে সমষ্টিবাদ চালাইতে পারিবেন? সামাজিক রন্ধনশালা, সামাজিক ভৃত্য, বাজার সরকার, রোগসেবা, গাড়ী চালক ইত্যাদি। কথার পরিবর্ত্তে কাজ করিলে ইহা হইতে পারে।

বাংলাদেশে বহু বেকার লোকের বাস। এই অবস্থাতে স্বভাবতই মনে হয় যে ঐ সকল বেকার ব্যক্তি কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যাওয়াই নিজেদের অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিবেন? কিন্তু বস্তুত দেখা যায় যে ঐ সকল বেকার ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছা ও সুবিধা অনুযায়ী কার্য্য না পাইলে বেকার থাকিয়া যাইতে কোন আপত্তি প্রকাশ করেন না। ইচ্ছা ও সুবিধা হইল অধিক পরিশ্রমের কার্য্য না করা। অধিকাংশ বেকারগণ সাদাকাপড় পরিয়া চেয়ারে বসিয়া যাহাহউক কিছু রোজকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করেন। পরিশ্রম করিতে তাঁহারা বিশেষ নারাজ। এই অবস্থায় তাঁহাদিগকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে শিখান অত্যন্তই কঠিন হইবে। কিন্তু বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির মঙ্গলের জন্য সকল মানবের পূর্ণশ্রমশক্তি ব্যবহৃত হওয়া প্রয়োজন। একজন বিশেষ মন্ত্রীর একমাত্র কার্য্য হওয়া প্রয়োজন বেকারত্ব নিবারণ। বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী আসিয়া অল্প বেতনে কাজ করে। ইহারা আসাতে আমাদিগের খাদ্যাভাব আরও তীব্র হইয়া উঠে এবং ইহারা অল্প পয়সায় অল্প কাজ করে বলিয়া ইহাদিগের জীবনযাত্রা পদ্ধতি নীচু স্তরের। ইহারা বাংলাদেশে না থাকিলে তাহা জাতীয় স্বাস্থ্য ও শহরগুলির পরিচ্ছন্নতার দিক হইতে বাঞ্ছনীয়। ইহারা এত অল্প বেতনে কার্য্য করে যে ইহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বাঙ্গালীদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। একমাত্র উপায় ইহাদিগের কার্য্য উন্নততর উপায়ে করাইয়া অধিক বেতন দিয়া বাঙ্গালীদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত রাখা। অল্পকার্য্যের কর্ম্মী নীম্ন স্তরের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহকারী ব্যক্তিরা তাহা হইলে নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবে। নূতন বাংলা সরকার দেশবাসীর গায়ে হাওয়া লাগাইয়া ঘোরার ইচ্ছার সমর্থন করিবেন না বলিয়া মনে হয়। পরিশ্রম করাতে তাঁহারা বিশ্বাস করেন। অন্তত তাহাই বলিয়া থাকেন। কার্য্যক্ষেত্রে কি হয় দেখা যাউক।

সমবায়ের কারবার বাড়ান

উৎপাদনের কার্য্য, ব্যবসা বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা মানবসমাজে নানাভাবে করা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগতভাবে যে যাহার নিজের সুবিধার জন্য নানাপ্রকার কাজকর্ম্ম চালাইতে পারে। বহু ব্যক্তি মিলিতভাবে ব্যক্তিগত অধিকার নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া অংশীদারী বা যৌথ কারবারের প্রতিষ্ঠান হইতে পারে। ব্যক্তিগত অধিকার না রাখিয়া সামাজিক অধিকারের উপরে গঠিত কাজকারবার রাষ্ট্রীয় বা অপর প্রকারে সমষ্টিগত হইতে পারে। যথা মিউনিসিপাল কিম্বা প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান পথঘাট বন্দর লৌহবর্ম্ম প্রভৃতি। সমষ্টিগত অধিকারে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি বহুপ্রকারের হইয়া থাকে। বহুদেশেই ডাক, টেলিফোন, রেডিও, রেলওয়ে প্রভৃতি জাতীয় সম্পত্তি এবং কোথাও কোথাও বাস, ট্রাম, কিছু কিছু বাসগৃহ, হোটেল, হাসপাতাল ইত্যাদিও জাতীয় সম্পত্তি। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অর্থনৈতিক অধিকার ব্যতীতও আর একপ্রকার অধিকার কাজকারবারে দেখা যায়। তাহা সমবায়। এই প্রকারে গঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য যাহারা সেই প্রতিষ্ঠান চালাইবার ব্যবস্থা করে তাহারা নিজেরাই প্রধানত সেই প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা, বিক্রেতা ও অংশীদার হয়। অর্থাৎ বাহিরের ব্যবসাদারকে কোন লাভ করিতে না দিয়া নিজেরাই লাভটি পূর্ণভাবে উপভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া কাজ চালানই সমবায়ের উদ্দেশ্য। মানুষ মানুষকে খাটাইয়া, জিনিষ বেচিয়া অথবা দ্রব্য ক্রয় করিয়া কোনভাবে শোষণ করিবে ইহা যাঁহারা অন্যায় ও ক্ষতিকর মনে করেন তাঁহারাই প্রধানত সমবায়ের পথ ধরিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লণ্ডনে হ্যারডস, সেলফ্রিজেস অথবা প্যারীর গালেরী লাফাইয়েৎ যেরূপ বিরাট বহু শাখা প্রশাখা সম্পন্ন দোকান খুলিয়া রকমারী দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভ করে; সেইরূপই বৃহৎ বৃহৎ দোকান

সমবায়রীতিতে চালান যায়। যথা লণ্ডন কোঅপারেটিভ, আর্মি নেভি ষ্টোরস্ প্রভৃতি কারবার কোটি কোটি মুদ্রার দ্রব্য বিক্রয় করে ও সেই বিক্রয়ের লাভ ক্রেতারাই ফিরিয়া পায়।

আমাদিগের দেশে খাদ্য বস্ত্র প্রভৃতির ব্যক্তিগত লাভের ব্যবসাগুলি ক্রেতাকে শোষণ করিবার ব্যবস্থা কেন্দ্র। প্রথমত একটাকার জিনিষ দুই কিম্বা আরো অধিক টাকার বিক্রয় করা হয়। পরে ভেজাল, সরেসের পরিবর্ত্তে নিরেস, ওজনে বা মাপে ঠকান ও ধারে বেচিয়া সুদ আদায় ও অপরাপর জুয়াচুরী ঐ সঙ্গে চলিয়া থাকে। চাল ডাল প্রভৃতি যাহারা উৎপাদন করে ও পরে যাহারা ক্রয় করিয়া ভোগ করে এই উভয় মূল অর্থনৈতিক অঙ্গের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া মধ্যবর্ত্তী শোষক ব্যবসায়ীগণ নিজেদের লাভ প্রাপ্যের বহু অধিক হারে ক্রেতার নিকট আদায় করিয়া থাকে। যেখানে সমষ্টিগতভাবে খাদ্য ক্রয় বিক্রয় করা হয় সেখানেও ঐ প্রবঞ্চনা সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় না। সুতরাং যদি উৎপাদক ও ক্রেতা মিলিত হইয়া সমবায় পদ্ধতিতে মাঝের আড়তদার, দোকানদার বা অপর ব্যবস্থাপক প্রভৃতিকে কাটিয়া, বাদ দিয়া তাহাদিগের লাভটি নিজেরাই রাখিয়া লইতে পারে তাহা হইলে মনে হয় মানুষ মানুষকে শোষণ করিবেনা এই নীতি সুরক্ষিত হইতে পারে। সমবায় পদ্ধতিতে বস্ত্র, আসবাব, ঔষধ, জুতা, পুস্তক, কাগজ, কলম, পেনসিল, প্রভৃতি সকল বস্তুই উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে মূলধন যাহাদিগের আছে তাহারা দাদন ইত্যাদি দিয়া উৎপাদন কার্য্য সহজ করে। কিন্তু মূলধন সমবায়ের দ্বারাও সংগ্রহ হইতে পারে। উপরন্তু উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য সমবায়ে কোথাও ঘুরিয়া ফিরিতে হয় না। যাহারা উৎপাদনা করাইতেছে তাহারাই যে-স্থলে ক্রেতা, সেক্ষেত্রে বিক্রয় আপনা হইতেই হইয়া যায়। যে সকল বস্তু অধিক মূলধন না হইলে উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা যায় না সেগুলি কিছুকাল সমবায় বর্জ্জিত ভাবে চলিলে পরে উৎপাদন করা যাইতে পারে। আরম্ভে যে সকল কার্য্যে অধিক মূলধন লাগে না সেই-গুলির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। খাদ্যের মধ্যে চাল-ডাল, গম, চিনি, গুড়, মশলা, আলু, পেঁয়াজ, ফল, মৎস্য, মাংস, ডিম দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, প্রভৃতি সকল কিছুই সমবায়ে সরবরাহ হইতে পারে। প্রথমে ক্রয় করিয়া আনিয়া নিজেদের মধ্যে বিক্রয় ব্যবস্থা ও পরে উৎপাদন করিয়া তাহা নিজেদের ব্যবহারে লাগাইবার চেষ্টা হইতে পারে।

সামাজিক বা সমষ্টিগতভাবে যে সকল কারবার চলে তাহা অপেক্ষা সমবায় ক্রেতাদিগের পক্ষে অধিক লাভজনক। ইহার কারণ ক্রেতার নিজের দায়ীত্বে দ্রব্য ক্রয় ব্যবস্থা না হইলে এবং বিক্রেতার ক্রেতা সম্বন্ধে আত্মবৎ ঐক্যবোধ না থাকিলে, শোষণ চেষ্টার কখন নিবৃত্তি হয় না। ইহা ব্যতত সামাজিকভাবে চালিত কারখানা কারবারগুলি সর্ব্বদাই যে সস্তায় মাল প্রস্তুত করে ইহাও বলা যায় না। সুতরাং শুধু ব্যক্তিগত লাভ করা হইবে না ইহার ব্যবস্থা হইলেই ক্রেতা সস্তায় মাল পাইবেন এমন হয় না। সস্তায় মাল ক্রয় শুধু সমবায়েই যথাযথরূপে হইতে পারে।

মন্ত্রীদিগের পক্ষপাতিত্ব দোষ

নির্ব্বাচনের পর শাসনকার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়, তখন সেই সকল কার্য্যের ভার পড়ে মন্ত্রীদিগের উপর। কেহ অর্থমন্ত্রী, কেহ শিক্ষামন্ত্রী, কেহবা শ্রমিক কৃষি অথবা আইন মন্ত্রী হইয়া সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বাস্তব ক্ষেত্রে হয়ত দফতরের আমলাগণই সকল কার্য্য করাইয়া দিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও মন্ত্রীগণ নিজেরাই চিন্তা করিয়া কার্য্য চালাইয়া ল'ন। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রী যদি পূর্ব্বে শিক্ষকতা করিয়া থাকেন, অথবা শ্রমিকমন্ত্রী যদি ট্রেডইউনিয়নের নেতা হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহারা সহজেই ইহার বা উহার দিক টানিয়া চলিতে আরম্ভ করিতে পারেন। এই

এরপর ৫৩৪ পাতায়

পত্রধারা

পরিমল গোস্বামী

চিঠি ব্যক্তিগত হলেও তার মধ্যে এমন অনেক অংশ থাকে যা সবার জন্য। এমনি সব অংশ বেছে নিয়ে বিদেশ থেকে আমাকে লেখা এই পত্রাংশগুলি এখানে সঙ্কলিত হল। পত্রলেখক বা লেখিকাদের পরিচয় পত্রের মধ্যেই যেটুকু তার বেশি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করেছি।

C/o Friends' Neighborhood Guild
703 N 8th Street, Philadelphia 23
16-11-57

স্কুলটা ভাল লাগছে। পড়াবার ধরন একেবারে অন্যরকম। এত বেশী free thinking-এর উপর জোর দেয় যে নোট মুখস্থ করা অভ্যাস নিয়ে আমার বেশ একটু মুশকিল হয়। মনে হচ্ছে স্বাধীন চিন্তাটাও অভ্যাস-সাপেক্ষ। যে এজেন্সিতে আমি আছি এবং কাজ করছি, তারা বেশ ভাল ব্যবস্থা করেছে আমার জন্য। কিন্তু মানুষগুলোকে যেন বুঝতে পারছি না—ঠিক অন্তরঙ্গতার ছোঁয়া পাচ্ছি না। এরা অত সব মনে-করাকরির ধারে পাশে নেই। খুব ভদ্র। হয় তো অল্পদিন আছি বলে তা মনে হচ্ছে। আমার কেমন মনে হয় আমাদের জীবনের মত শান্ত সুষমা আর মাধুর্য এদের জীবনে কম। আর একটা দিকও দেখছি, world citizenship-এর দাম খুব বেশী এদের কারো কারো কাছে। এক ভদ্রলোক ভারতবর্ষে ছিলেন অনেক দিন তিনি গান্ধীজির আদর্শ প্রচার করছেন এখানে। ভারতীয় জীবনের শান্ত সৌন্দর্য তাঁকে এত মুগ্ধ করেছে যে তিনি তাই প্রচার করছেন গভীর বিশ্বাস নিয়ে।…এখানকার ছেলেমেয়েগুলো কেমন 'ওয়াইল্ড'। ওদেরই একটা গ্রুপে কাজ করতে হচ্ছে। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা তার তুলনায় কিছুই না, মাটির মানুষ। এমন কি সেরা দস্যি ছেলেও কিছুই না। খুব বেশী যান্ত্রিক জীবন এখানে। এরা মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে আমাদের কাছে চায় কিছু গভীরতর জীবনানুভূতি। ভারতবর্ষকে সেদিক থেকে শ্রদ্ধা করে এরা। আবার অন্য দিকে যা কিছু আমেরিকার তাই শুধু ভালো—এমন দলও আছে। দেখছি সব।

রেণুকা বিশ্বাস

703 N. 8th Street
Philadelphia 23 USA
2-6-58

…এদের একটা পাহাড়ী জায়গায় গিয়েছিলাম গত মাসে, ওদের ডার্জিলিয়াতে। কয়েকটা জায়গা ঘুরেছি। ওয়াশিংটনেও গিয়েছিলাম। খুব সুন্দর শহর।

এদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বেশ চটপটে' কথা বলে। দুরন্ত এবং এদের অত্যন্ত স্বাধীনতাবোধ

আমি এদের বলি ছেলেমেয়েগুলোকে নাই দিয়ে দিয়ে মাথা খাচ্ছ তোমরা। দুষ্টু ছেলের সংখ্যা বাড়াচ্ছো। এ দেশেও এ সম্বন্ধে ওদের সন্দেহ জেগেছে, হালের অনেকগুলো ঘটনাতে।

আর এ দেশের লোকের একটা অদ্ভুত flexibility দেখি। আমরা কোন নতুন জিনিসকে এদের মত করে চট করে গ্রহণ করতে পারবো না। বিভিন্ন দেশের ভালো জিনিসকে আপনার করে নেবার সে কী প্রচণ্ড আগ্রহ। এদের আমাদের মত ট্র্যাডিশন নেই বলেই হয়ত এমন করে বদলাতে পারে সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি। এ পাড়ার দু একজন শাড়ী কিনে পেটি-কোট তৈরি ক'রে, আমার কাছ থেকে শাড়ী পরা শিখে, শাড়ী পরে পার্টিতে যাচ্ছে, কিন্তু আমাকে এদেশী পোশাক পরাতে এদের মাথা কুটতে হয়েছে।

রেণুকা বিশ্বাস

703 N 8th St.
Phila 23
9-4-59

...দেশে তিব্বত নিয়ে তুমুল কাণ্ড হচ্ছে বুঝতে পারছি। এখানেও খুব হচ্ছে। এরা খুব উৎসুক। দলাই লামাকে আশ্রয় দিতে এখুনি রাজি। দলাই লামার ভাই তো এ দেশেই আছে।...

রেণুকা বিশ্বাস

703 N. 8th St.
Phila-23 Pa
20 1-59

...এদের এখানে শান্তিকামীরা মিছিল করে ওয়াশিংটনের দুয়ারে ধর্না দেয়, প্রতিবাদে—ট্যাক্সের নয়, বোমা বা মিসিল তৈরির।

এখানে ডেমোক্রাসির রাস্তাও কিছু পরিমাণ সরল রেখার মত।, লোকজন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই সব কিছু ও রাস্তা ধরেই করে। যার বাড়ীতে কি রান্না হবে তার জন্যও ছেলেমেয়েদের মত নেয়। বেশ ইনটারেষ্টিং। বাচ্চাদের মধ্যেও একটা স্বাধীন ভাব। খুব চটকটে আর দুরন্ত। সে স্বভাবের ধারাটা বড় হলেও কমে না।

রেণুকা বিশ্বাস

703 N 8th St.
Phila-23, Pa
22-5-59

আগামী ১০ই জুন M. S. W. ডিগ্রী পাচ্ছি, আমার থীসিস অ্যাপ্রুভড হয়ে গেছে। এখানকার তাপমাত্রা ৮০।৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইটের মত, তার উপর humidity খুব বেশী। বুঝতেই পারছেন।

এখানে একটা ট্যাগোর সোসাইটি করেছি আমরা ভারতীয় ও অ্যামেরিকানরা মিলে। আমাকে এরা সেক্রেটারি করেছে। ট্যাগোর সেনটেনারি কমিটির প্রেসিডেন্ট ডক্টর এন, ব্রাউন। আমাদের সোসাইটিরও প্রেসিডেন্ট। রবীন্দ্র সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রচার ও প্রসার এ সোসাইটির কাজ। আবার এ সব কাজে জমে যাচ্ছি।...

রেণুকা বিশ্বাস

N. Y-24
Nov, 29, 1959

...এখানে আজকাল চীনের ভারত সীমান্তে গুলি চালানো ইত্যাদি নিয়ে খুব আন্দোলন হচ্ছে। আমার খালি প্রথম থেকে মনে হচ্ছিল যে, ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এরা এমন না করে বসে যাতে সত্যি করে ব্যাপারটা বড় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের পাকিস্তান সীমান্তে বহুবার হামলা হয়েছে, বহু লোক মরেছে। কে তাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গেছে বলুন! গ্রাম দখল করে বসা, সীমান্তের কাছাকাছি গ্রামে লুঠতরাজও বহুবার হয়েছে। এরা তার সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেনি। কারণ অস্ত্রটা এ দেশের হাত থেকে পাওয়া, তা হলে এ দেশের জনসাধারণ সন্দিহান হয়ে পড়বে। আর যেই না অন্যদিকে গণ্ডগোল, এদের আকাশ ফাটানো চীৎকারে বুঝি মাথা ঠাণ্ডা রাখা দায়।

বিশেষতঃ এ দেশের অস্ত্র ব্যবসায়ীরা অস্ত্র হাতে নিয়ে বসে আছে। যে কোন মুহূর্তে ভারতবর্ষ যদি একটু মুখ ফেরায় এদের দিকে, মুখ ফুটে বলার আগেই 'এড' দেবে—বিনি পয়সায় দিতে রাজি, পয়সা দেবার দরকার নেই। আর নেহাৎ বাড়াবাড়ি করলে না হয় 'লোন'ই দেওয়া যাবে।

শুধু দলে টানার জন্য সব দিক থেকে কি প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। মিষ্টি কথায় ভারত যদি নিরপেক্ষতার বুলি না ছাড়ে তা হলে লোভ দেখিয়ে, ভুল দেখিয়ে, বন্ধুত্বের ভান দেখিয়েও যদি হয় সে চেষ্টা হবে। তাতেও যদি ফল না হয় বিভিন্ন দিক থেকে চাপ দিয়ে। চাপের (pressure বললে ঠিক হয়) কি ভয়ানক প্রতিক্রিয়া এ দেশের ছোটখাটো ব্যাপার থেকে আমি আঁচ করে নিই। পত্রপত্রিকার চাপের range এত বিরাট যে, তার দরুন মানসিক প্রতিক্রিয়া না হয়েই পারে না। আমাদের দেশের কোন কোন পার্টির মনে শুধু প্রতিক্রিয়া একভাবে দেখা দিয়েছে তা নয়, এরা এ সুযোগকে কাজে লাগাবার প্রয়াস পাচ্ছে। পাবলিক যাকে আমরা বলছি তারা যদি এর প্যাঁচে পড়ে যায় তা হলে মনে হচ্ছে মারাত্মক হবে। যে কোন দুর্বল মুহূর্তে যদি আমরা কোন এক দলে ভিড়ে যাই তা হলে তার মত বিরাট ক্ষতি দেশের আর কিছুতে হবে কি না জানি না।

কি ভাবছি জানেন, ঠিক এই মুহূর্তে নেহেরুকে আমাদের সমর্থন দেওয়া দরকার। শুধু তাই নয়, ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার বিদেশী শত্রুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য। একদিকে লোভের হাত থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য, অন্যদিকে চীনের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা ইত্যাদির থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার, দৃঢ়তা দেখানো দরকার।

ব্লকে জুটেছি তো মরেছি। যে কোনো ব্লকে। এটাই বিশেষ করে আমার মনে হচ্ছে। এ দেশে কাগজে যে সমালোচনা আমাদের দেশের সম্পর্কে শুনছি, আজ দুবছর ধরে আমাদের সোস্যালিষ্ট নেতাদের মুখে ঐ একই সুর শুনে একটু বিভ্রান্ত বোধ করছি।

ভাবছি যেমন ঠিকই বলেছেন প্রয়োজন হলে অস্ত্র আমাদের কিনতে হবে, যে-কোন দেশ থেকে সেটা কেনা সম্ভব। কিন্তু মিলিটারি 'এড' নিয়ে দলভুক্ত হবার এজন্য প্রয়োজন হবে না। কথা হতে পারে কত 'এড' তো নিচ্ছি ওতে দলভুক্ত হবার প্রশ্ন উঠছে না, এ বেলা উঠবে কেন। এই 'মিলিটারি এড' আর দলভুক্তির মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ হবে বলে মনে হচ্ছে না আমার।

এরা এটাই চায়।

আমি আমার দেশের এ পরিণতি চাই না। দু'শ বছর তো আমরা ইংরেজের পরাধীন ছিলাম ···আমি রাজনীতিবিদ নই। কিন্তু রাজনীতিতে আগ্রহী, বেশ চিন্তিত হয়েছি দেশের খবরাখবর পড়ে।

এ দেশের লোকের মতামত দু ধারায় বইছে। একদল নেহেরুর বর্তমান পরিস্থিতিজনিত দৃঢ়তায় বিশ্বাসী—যতই তার সমালোচনা করুক অন্য সময়, অন্যদল নেহেরুকে শ্রদ্ধা করলেও তাঁর পশ্চিমী গোষ্ঠীভুক্ত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ। শুধু ক্ষুব্ধ নয়, এখনও সচেষ্ট।

···এখানে Tagore Society করেছি। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রসার করার চেষ্টা করছি। এখানে এসে মনে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বিরাট অংশকে বাদ দেওয়া হয়।···

রেণুকা বিশ্বাস

176 W 87th Street
New York 24
Dec 14, 1960

···এখানে স্কুল শুরু করেছি। আপাতত কাজ করে দুটো বিষয় কোলাম্বিয়াতে পড়ছি।···এখানে খুব বরফ পড়েছে গত রবিবার ও সোমবার। তাপমাত্রা ছিল ১০-১৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট। সঙ্গে উত্তুরে হাওয়া। একেবারে সত্যি হাড় কাঁপিয়ে দেয়। ফুলের পাপড়ির মত বরফের ফুলঝুরি। কি মিষ্টি দেখতে—বেরিয়ে পড়ে-

ছিলাম ওরই মধ্যে। বেশ লাগছিল সত্ত্বেও ইঞ্চি বরফের ভিতর দিয়ে চলা। চলতে গিয়ে ওরই মধ্যে ডুবে যাওয়ার শামিল। ড্রাই স্নো, বেশ। আজ পর্যন্ত যাতায়াতের ব্যবস্থার উন্নতি হয় নি। যা হোক ওর মধ্যেই সব কাজ চলছে। এত শীতের কাঁপুনির মধ্যে এধারে ওধারে হাসি কৌতুকের ছড়াছড়ি। এরা হাসি-খুশি লোক।···কাল ট্যাক্সিতে স্কুল থেকে ফিরছি আরও কয়েকজনের সঙ্গে। ট্যাক্সিওয়ালা বলছিল, ওকে শোফার রাখতে—যখন গাড়ি কিনি তখন। বলছিল ওর বয়স ৫৪ অতএব আমার 'yes man'-এর কোন আপত্তি হবে না। বললাম আচ্ছা, মনে রাখব।

রেণুকা বিশ্বাস

176 W 8th St.

N. Y Jan. 4, 1961

···এদেশে খুব shelter পর্ব চলছে। কথাবার্তা আলোচনা হচ্ছে—প্রতিবেশী আমার বা আর কারও শেল্টারে ঢুকলে কি হবে। খ্রীশ্চান পুরোহিতের একজন বিধান দিয়েছেন use violence অতএব বুঝতেই পারছেন কি ব্যাপার। টেলিভিশনে, রেডিওতে সংবাদ-পত্রে কিছুদিন ধরে পারমাণবিক বোমা ও আশ্রয়স্থল—অনেক সময় ও স্থান অধিকার করে আছে। এ বাড়ির আমরা ও সবের মধ্যে নেই।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয়। তাছাড়া সরল তরল যা কিছু চলতে পারে, শেলটারের বিরুদ্ধে কথা হতে পারে, কিন্তু তার আয়োজন নৈব নৈব চ।

রেণুকা বিশ্বাস

Welmet Camps

Silver Lake Division

Narrowsburg, N. Y.

Aug. 24. 1961

···একটা আশ্চর্য টান দেশের প্রতি। প্রতিটি শব্দ কথা, স্মৃতি, ইতিহাস, ফুল, ফল, গাছপালা, নদী, পর্বত বহু স্বজন সব কিছুর প্রতি একটা অন্তর্বাহী টান। দেশটা যে বেশ কয়েক হাজার মাইল দূরে, তা আমার মোটেই মনে হয় না যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। প্লেনে এসেছি বলে দূরত্ব বোধ আমার আসেনি। হয় তো বা এরই জন্য সম্ভব হয়েছে এ দেশের লোকজন ও সব কিছুর সঙ্গে খাপ খাইতে নিতে।

···ক্যাম্পে ছেলেমেয়েদের সব কিছু দেখা শোনার ভার আছে। ১৮ বয়স বয়সী ছেলেমেয়েদের এরা প্রশ্ন করে, বিদ্রোহ করে, খুব যত্ন ক'রে কাজ ক'র। বেশ মজা লাগে ভাবতে যে, এরা মাত্র ১৮! আমরাও আসর করেছি—আমরা ছিলাম ষোড়শ ও ষোড়শী। আমাদের বর্তমান অষ্টাদশের কথা আমি ঠিক জানি না, সে কি অনেক বদলে গেছে? এ দেশ বিশেষজ্ঞদের দেশ। কিভাবে এরা নতুন নতুন কাজ সৃষ্টি করে তা বড়ই চিত্তাকর্ষক।

···এখানে 'শাঙন' নেমেছে কয়েক দিন ধরে। ক্যাট্‌সকিল মাউণ্টেনে অবস্থিত এ জায়গাটা। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ব্যাঙ আর স্যালামাণ্ডার শিকারে বেরিয়েছে। এদের শহরে মশামাছি মাকড়শা টিকটিকি নেই। তাই এরা ওসব দেখলে ভয় পায়, অথবা ধরে দেখতে চায় কি ধরনের।

এখানে এক ধরনের মাছি আছে, এরা গায়ে বসে রক্ত শোষে, জোঁকের মত কিছুটা। তাড়ানো মুশকিল। যাকে বলে রাম মাছি! এখানে একটা আট বছরের মেয়ে (Newspaper Club-এর) এই নিয়ে গল্প লিখেছে। গল্পটা এই—হাইক-এ গেছি। যাচ্ছি হান্টার্স লজের উদ্দেশে। হুস্! একটা কামড়। বিরাট মাছি। তারপর থেকে যেদিকে তাকাই, মাছি মাছি আর মাছি আর চুলকানি।

বেচারা একটা কামড় খেয়েই মাছি-ফুল দেখেছে! আমার দিদি···লিখেছে সে একটা কাগজ বার করছে, নাম সবিতা।

রেণুকা বিশ্বাস

June 11 1962
176 W 87th street
N Y. 24.

...দেশে ফেরার আগে একটু শান দিয়ে নিচ্ছি সমাজ সেবার। সমাজসেবীদের এখানে জড়ো করেছিলাম—উদ্দেশ্য, দেশে ফিরে গিয়ে যাতে মিলে মিশে কাজ করা যায়। আমাদের সমস্যা সব এত বিরাট যে হাতে হাত আর কাঁধে কাঁধ না মেশালে কাদায় আটকানো এই সমস্যার গরুর গাড়ীকে পাকা রাস্তায় তোলা যাবে না। জগন্নাথের রথ টানতে হাজার লোকের হাত লাগাতে হয়। না হলে তিনি অচল।...ইউরোপের বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থাও দেখব। ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, ইটালী এবং ঈজিপ্ট ঘুরে আসব। লণ্ডন পর্য্যন্ত জাহাজে, রোম থেকে প্লেনে।

রেণুকা বিশ্বাস

St. Paul. France
Sep. 18. 1962

...স্থানটি দক্ষিণ ফ্রান্সের Provence এলাকায়। ছোট্ট গ্রাম, প্রাচীরে ঘেরা পাহাড়ের উপর। এখান থেকে চার পাশে আল্পস দেখা যায়। আর ভূমধ্যসাগর থেকে শীকরবাহী হাওয়া এর মাধুর্য আরও বাড়িয়ে তোলে।

পাথরে গাঁথা মানুষের পদচিহ্নের ইতিহাস যেন অলিগলিগুলো, আর মানুষের জীবন-গাথা ছোট ছোট বাড়ীগুলোতে এমন ছড়ানো যে হঠাৎ মনটাকে কোমল করে দেয়। মনে হয় পশ্চিমী জগতের যত তোড়জোড় পরমাণুকে নিয়ে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের, সেটাই তার একমাত্র পরিচয় নয়। ঠিক আমাদের দেশের গ্রামগুলোতে যেমন হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী জীবনের জয়গাথা, এখানেও এক তাই যেন। এদের গ্রামের rampart এ বসে আল্পস-এর দিকে তাকিয়ে আর ছোট ছোট ছেলেদের খেলা দেখে এ কথাই মনে হচ্ছে।

আজ সকালে এখানে এসেছি। দুদিন হল নিস্-এ ছিলাম। নিস্ ভূমধ্যসাগরের তীরে ফ্রান্সের সুন্দর রিভিয়েরা। সাগরের জলটা অদ্ভুত নীল, আর এখানকার আকাশটা এমন নীল যে কি বলবো। ঝকঝকে রোদ্দুর যত পশ্চিমী চিত্রকরদের এখানে নিয়ে আসে। ভ্যান গগের ছবির নীল। ভদ্রলোক কি সাধে দক্ষিণ ফ্রান্সের অলিগলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর এখানকার রোদে ঝলমল প্রকৃতির রঙকে ছবিতে ফোটাতে চেয়েছিল পাগলের মত!

...লণ্ডনে ছিলাম দশদিন, কোপেনহেগেনেও। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা খুব ভদ্র, সব সময় সাহায্য করতে প্রস্তুত, অবশ্য সাহায্য চাইলে। কিন্তু কেমন যেন খোলস ঢাকা. ঠিক বুঝবার উপায় নেই। ডেনমার্ক আমার খুব ভাল লেগেছে। এদেশের লোকেরা শুধু ভদ্র নয়, অন্তরঙ্গও। আর ওদের জীবনযাত্রায় আশ্চর্য শিল্পবোধ ও পারস্পরিক সহযোগিতার ছাপ। ওদের কো-অপারেটিভ অরগ্যানিজেশন, (হাউসিং ইত্যাদি) দেখেছি কিছু, খুব আদর করে দেখিয়েছে।

সেখান থেকে প্যারিসে এসেছিলাম।...প্যারিসের জীবনে দুটো contrast দেখা যায়। একদিকে অসম্ভব ছুটন্তপনা অন্যদিকে সময় গলানো। অফুরন্ত সময়কে কেন্দ্র করে আড্ডা দেওয়া কাফেগুলো। কাফেতে লোকজন বসে আছে তো বসেই আছে। কেউ তাড়া দিচ্ছে না একবারও। যতক্ষণ বসতে চাও বসো।

...আজ রাত্রে জেনিভা হয়ে লুসানে যাবো। সেখান থেকে ভেনিস, ফ্লোরেন্স, রোম, নেপল্স, তারপর সিসিলিতে, সেখানকার সমাজ সংস্কারক Danilo Dolchiর সেণ্টারে। ডলচিকে ওখানে ওরা সিসিলির গান্ধী নামে আখ্যাত করে।

রেণুকা বিশ্বাস

Tarakmohan Das Ph. D. (London)
Dept. of Horticulture
Purdue University
Lafayette. Indiana. U. S. A.
6. 11. 62

...দেশ হিসাবে অ্যামেরিকা অবশ্য খুবই ভাল, অর্থ ও জিনিষপত্রের এত প্রাচুর্য আর কোথাও দেখলাম না।

এখানে অভাব শুধু ভাল কাজ জানা লোকের—তাই সুযোগ সুবিধা এখানে প্রচুর।

"মানুষ কাজ খুঁজছে—এটাই দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু কাজ মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে, এটা আমাদের চোখে কেমন কেমন ঠেকে। সারা পৃথিবী থেকে এরা টেকনিশিয়ান খুঁজে খুঁজে আনে। আমি ইউনিভারসিটির যে বিভাগে আছি, সেখানে বিভাগীয় অধিকর্তা ছাড়া আর কোন অ্যামেরিকান নেই। আমার সঙ্গে রিসার্চের এবং teaching levelএ দুজন জার্মান আছেন, একজন ক্যানাডিয়ান আছেন, একজন চীনা আছেন। একজন জাপানী ছিলেন, চলে গেছেন সম্প্রতি। দুজন অষ্ট্রেলিয়ান আসছেন, কিন্তু কোন অ্যামেরিকান ছাত্র নেই। একটি বাঙালী (সলিল চ্যাটার্জি) এখানে পিএচ, ডি'র রিসার্চ করছেন। অদূর ভবিষ্যতেও যে কোন অ্যামেরিকান পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনাও নেই। অবশ্য সব বিভাগের অবস্থা এমন নয়। এখানকার ইউনিভারসিটিতে বাঙালী ছাত্রদের বেশ সুনাম আছে, তারা দেশে যাই করুক, এখানে এসে বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে খাটে।··· বিজ্ঞানের আজ এত অজস্র শাখা উপশাখা হয়েছে যে, প্রত্যেকটিতে উপযুক্ত যথেষ্ট লোক পাওয়া সম্ভব নয়, অথচ প্রত্যেকটিতে চাহিদা রয়েছে যথেষ্ট। তাছাড়া ইউনিভারসিটি এডুকেশনের জন্য এমনিতেই চাহিদার তুলনায় খুব কম ছাত্র আসে। যোগ্যতার অভাব, সহজে কাজ পাওয়া যায়, অল্প বয়সে বিবাহ, এই সব কারণে এখানকার অধিকাংশ ছাত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে না। প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে টেলিভিশনে এর জন্য প্রচার করা হয়, আন্দোলন করা হয়, যাতে আরও ছাত্র ভরতি হয়। আমাদের দেশে তো ছাত্রদের ভারে জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখাগুলি ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে আজ। আমাদের চোখে তাই এটা অদ্ভুত ঠেকে। আমরা [স্ত্রী পুত্র সহ] এখানে ভালই আছি।···

তারকমোহন দাস

The Rockefeller Institute
66th and York Avenue
N. Y. 21
জুলাই ২৫শে, ১৯৬০

···মার্কিন মুলুকে অতিথি বিজ্ঞানী হয়ে কাটছে ভাল। কাজের অফুরন্ত সুযোগ ও সুবিধা। আমার কাজের সামনে হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেছে, মস্ত জিনিষের সন্ধান পেয়েছি। আমার ধারণা এই কাজ ভারতীয় বিজ্ঞানের সম্মান বাড়াবে। আরও কিছু সময় লাগবে শেষ পর্যন্ত যেতে। আমার নিজের ইচ্ছা এই ফল কলকাতা থেকে প্রকাশ করি। গত পাঁচ ছয় বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে বসেই এর কল্পনা করেছি। আমাদের facilitiesএর অভাব ছিল, এখানে তার প্রাচুর্য কত। রকেফেলার ইনসটিট্যুট বড় সুন্দর, সায়েন্স আর আর্টের হর গৌরী। অঞ্জলি Slone-Kettering Cancer Institute এর বায়োফিজিকসের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছে। ওর একখানি পেপার ইতিমধ্যে নেচারে বার হয়েছে—রেডিয়েশনের উপর।

শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

Dept. of Plant Pathology
College of Agriculture
Wisconsin University, Madison 6
U. S. A. 17-12-63

গতকাল রূপা কম্পানীর শ্রী মেহরার চিঠিতে জানলাম আমার বইটি [আমার ঘরের আশেপাশে] দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিং দাস পুরস্কার পেয়েছে। আপনার কথাই আমার সর্বপ্রথম মনে হচ্ছে। আপনারই অনুরোধে আমি বইটি লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। আপনার সক্রিয় উৎসাহ ও সাহায্যেই বইটির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হয়েছে। আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সেজন্য।

আমি এখন উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি, উপরের ঠিকানা দেখেই বুঝতে পারছেন। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি অপরূপ। চারিদিকে লেক ও সবুজ

বার্চ, পাইন ও ম্যাপল-এর রাজ্য। ধীরে ধীরে তারা এখন বরফের কম্বলে ঢাকা পড়ছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অ্যামেরিকার পাঁচটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম। আমি এখানে, একটি উদ্ভিদ কোষের মধ্যে ভাইরাস্ প্রবেশ করলে কি কি পরিবর্তন ঘটে তাই জানবার চেষ্টায় আছি। আমার হাতিয়ার হচ্ছে কয়েকটি অতি শক্তিশালী phase ও ইউ, ভি, মাইক্রোস্কোপ ও একটি ভাল 16mm মুভিক্যামেরা, যার গতি ইচ্ছামত বাড়ানো কমানো যায়। কোষের মধ্যে যে ক্রমপরিবর্তন ২-৪ দিন ধরে চলে তা অতি মন্থরগতিতে ক্যামেরা চালিয়ে মুভি ফিলমে ধরা সম্ভব।

তারকমোহন দাস

438 West Johnson St.
Madison-3. Wisconsin
July 12, 1964

…আমাদের এক বন্ধু এখনকার কার্ডিও-ভ্যাস্কুলার বিভাগে গবেষণা করেন। তিনি বলেন অধিকাংশ হৃৎপিণ্ড নিখুঁত নয়, কিছু না কিছু গণ্ডগোল আছে। ভদ্রলোক নিজে সম্প্রতি হার্টে কিছু কষ্ট পাচ্ছেন। তবে তাঁর আশা আছে চার পাঁচ বছরের মধ্যে পুরাতন হৃৎপিণ্ড বাতিল করে নূতন হৃৎপিণ্ড বসাতে পারা যাবে। বর্তমানে মেরামতি কাজ যথেষ্ট করা যাচ্ছে।

আমরা অকটোবরের শেষে এখান থেকে রওনা হব, ইয়োরোপে একমাস থাকব। সামনের মাসে ক্যালিফোর-নিয়ায় যাচ্ছি। উদ্ভিদের কোষের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তার অনেক মুভি ফিলম তুলেছি। এডিনবরোতে ইনটারন্যাশন্যাল বটানিক্যাল কংগ্রেসে এই মুভি দেখানো হবে।…

গত বিশবছরের মধ্যে শিক্ষা ব্যাপারে যে অগ্রগতি ঘটেছে তার আমরা প্রায় কিছুই জানি না। আমাদের দেশে অনেক কিছুই করবার আছে। একটা ছোট, উদাহরণ দিই—অ্যামেরিকা বা ইয়োরোপে 'গৃহশিক্ষক' নামক কোন জীব নেই। গৃহশিক্ষক রাখবার কথা এখানে কেউ কল্পনাও করে না, অথচ আমরা গৃহশিক্ষক রেখেও ছেলেদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারি না।

অনেক দিন বাংলা সাহিত্যের কোন খবর জানি না। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সব বইই আছে, বাংলা ভাষা পড়ানোও হয়! উই-সকনসিনে কেবল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আমাদের বাংলা দেশের সম্ভবত একমাত্র গর্ব করার বিষয় তার সাহিত্য। দুঃখের বিষয় শুধু এই কারণেই অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কষ্ট অনুভব করে, এক ধরনের complex এ ভোগে, ভারতের বাইরেও তার প্রমাণ পেয়েছি।…

তারকমোহন দাস

Madison, Wis.
Sept. 18-1964

…আমরা দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ ধরে অ্যামেরিকার পশ্চিম সমুদ্রকূল বরাবর বেড়িয়ে এলাম। প্রথমে গিয়েছিলাম কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে জীববিজ্ঞানীদের এক সম্মিলনে। পর্বতমালার কোলে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সত্যই দেখবার মত। এখানকার রোমান স্থাপত্যের অনুকরণে পাথর দিয়ে তৈরী বাড়িগুলি, ফুলফল-শোভিত দীর্ঘ লনগুলি ইয়োরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমার single cellএর চলচ্চিত্রগুলি এখানে খুব সুনাম অর্জন করেছে। এখান থেকে আমরা গিয়েছিলাম সল্ট লেক সিটিতে। ছোট সুন্দর শহর, এই হ্রদের কথা আমরা ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলাম। কোটি কোটি বছর ধরে এর বিরাট জলভাগ ধীরে ধীরে শুকিয়ে আসছে, তীরে লবণের স্তূপ। এখানে জলে নুনের পরিমাণ শতকরা ২২ ভাগ। এর জলে মানুষ ডোবে না। জল, পানের উপযুক্ত নয়। পাহাড়ের কোলে এই হ্রদটির চারিদিকে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। এরপর নেভাডায় মরুপ্রায় অঞ্চল দিয়ে আমরা গেলাম ক্যালিফোরনিয়ায়। নেভা-ডার অঞ্চলটি বিচিত্র। এখানকার লোকেরা দিনের বেলায় মরুভূমির আরবদের মত পড়ে পড়ে ঘুমায়।

রাত্রিবেলা হাজার হাজার আলোর রোশনাই জ্বলে ওঠে। সমস্ত রাত জুয়া খেলা চলে, আর নর নারীর উদ্দাম নৃত্যোৎসব। জুয়াখেলা এখানে বেআইনি নয়, এ রাজ্যের এটাই প্রধান ব্যবসা। মিডওয়েষ্ট ও ক্যালিফোরনিয়া থেকে বহু লোক এখানে আসে আমোদ করার জন্য। লাস ভেগাস ও রিনো এখানকার প্রধান কেন্দ্র।

আমরা রাত তিনটের সময় রিনোতে পৌঁছেছিলাম, অথচ রাস্তাঘাটে লোকজন ও যানবাহনের অসম্ভব ভিড়। মধ্য রাত্রে মধ্যদিনের কর্মব্যস্ততা। ক্যালিফোরনিয়ার সানফ্রানসিসকো শহরটি আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের কূলের এই শহরটি, এর আবহাওয়া, লোকজনের ভিড় আমাদের দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রচুর চীনা, এখানকার চায়না টাউনটি দেখবার মত। সানফ্রানসিসকোর বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটি বেশ ভাল লাগল।

লস এঞ্জেলিজ শহরটির কথা আগে অনেক শুনেছি, আসলে শহরটি খুব ভাল নয়। হলিউডেও কিছু দেখবার নেই যা কিছু দেখবার ডিসনেল্যাণ্ডে। লস এঞ্জেলিজে আমাদের দেশের মত বাজার দেখলাম। তিন পাউণ্ড টাটকা আঙুর ২৯ সেণ্ট, কাতলামাছ দু পাউণ্ড ২১ সেণ্ট, একটা তরমুজ ১০ সেণ্ট। ডিমের ডজন ২৫ সেণ্ট, উইসকনসিনের দামের অর্ধেক। কলকাতার দামের চেয়ে শস্তা।

গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেখলাম। অ্যারিজোনার মরুপ্রায় অঞ্চলে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন প্রকৃতির এক বিচিত্র সৃষ্টি। কলোরাডো নদী কোটি কোটি বছর ধরে নরম পাথর কেটে কেটে এই বিচিত্র ক্যানিয়ন (গভীর খাদ) সৃষ্টি করেছে। এর পাথরের অদ্ভুত আকৃতি এবং রং—সত্যই দেখবার মত।

…আপনি লিখেছেন আপনার জন্য একটি নূতন হার্ট কিনে আনার জন্য। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই জন্য একটা করে নূতন হার্ট দরকার।

তারকমোহন দাস

ভ্লাডিভোস্টক-ইউ-এস-এস-আর
২-৯-৬৩

…মস্কোতে ছিলাম দু সপ্তাহ, তারপর ভ্লাডিভোস্টকে। এখানে আপাতত পনেরো মাস থাকছি, তারপর অন্যত্র। …জুন, জুলাই, আগষ্ট, এই তিন মাস এখানে গরম কাল। (স্থানটি কৃষ্ণসাগরের কাছে) পরে শীতকাল। এই সেপটেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকেই শীতের ভাবগতিক জানা যাবে। এখন পর্য্যন্ত ত দিনের বেলা কলকাতার শরৎকালের উত্তাপে খুব বেড়িয়ে নিচ্ছি। রাত্রে ঠাণ্ডা, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাস্তায় থাকা যায়। এর পর ভারী কোট আর ওভারকোট পরে মাইনাস ২০-৩০ ডিগ্রীতে বেড়ানোর উৎসাহ থাকবে বলে মনে হয় না।

রাশিয়ানরা গরমকালে খুব হৈ চৈ করে। স্কুল কলেজ সব তিন মাসের জন্য বন্ধ থাকে। আমি যখন মস্কোতে তখন পার্কে, নদীর ধারে, বটানিক্যাল গার্ডেন, লেনিন পাহাড়ে, ফুটপাথে, ট্রামেবাসে দারুণ ভীড়। সবাই বাড়ির বাইরে।

অবসর কাটানোর ব্যবস্থাও প্রচুর। মস্কোতে তো যে কোন দিকে কিছুদূর গেলেই বিরাট বিরাট পার্ক পাওয়া যায়। সেখানে ছেলে বুড়ো সকলেই নাগরদোলা চড়ে, লেকে নৌকা চালায় সুটিং গ্যালারিতে যায়। প্রত্যেক পার্কে ওপন এয়ার থিয়েটার, সিনেমা, কনসার্ট হল আছে, আর আছে দাবা খেলার ক্লাব। এখানে দাবা খেলার নেশা সকলের। ক্লাবগুলোতে সবসময় ত্রিশ-চল্লিশ লোক দাবা খেলছে।

এখানে ভ্লাডিভোস্টকে অবশ্য অত পার্ক নেই, তবে শহরের তিন দিকে বিরাট সব বার্চ আর পাইন গাছের বন। আর একদিকে ভোলগা নদী। এখন বনে বার্চ গাছের পাতার ছায়া। আর মাস দুয়েক মধ্যে সমস্ত পাতা ঝরে যাবে, আর পাইন গাছের উপর ভারী হয়ে জমবে বরফ।…প্রতি রবিবার ভোলগাতে নৌকা চড়ি। ইণ্ডিয়ান বলে ভাড়া নেয় না কিছুতেই।

অভিজিৎ আচার্য

স্তাভরোপোল
৩০-১১-৬৩

...আমাদের এখানে শীত আগামী ছ মাসের জন্য আরম্ভ হয়ে গেছে। আজ দারুণ তুষার পড়ছে। তাপ-মাত্রা মাইনাস্ ১৫° সেন্টিগ্রেড। ছ তিনটে সোয়েটার, কোট, দশ কিলোগ্রাম ওজনের রাশিয়ান ওভারকোট আর কসাক টুপি পরে নিজেকেই নিজে চিনতে পারছি না। তবে রাস্তায় বেরোলে বেশ ভাল লাগে। হাওয়া না থাকলে শীত লাগে না। সারা গা তুষারে শাদা হয়ে যায়। তুলোর মতো। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলা যায়।...

গতকাল বাসে এককোণে একজন লোককে বই পড়ে খুব হাসতে দেখলাম। আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম, তাকিয়ে দেখি লীককের ছোট গল্পের একটা সঙ্কলন, রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করা। এখানে ড্রাইজার, স্টাইনবেক, লীকক, লণ্ডন, হেমিংওয়ে খুব জনপ্রিয়। কয়েকদিন আগে আমিও হঠাৎ বইয়ের দোকানে লীককের ছোট গল্পের বই পেয়ে গিয়েছিলাম। অনেকদিন পর সেই বাড়িওয়ালা খুনের গল্প পড়ে খুব হেসেছি।

অভিজিৎ আচার্য

Stavropol, U. S. S. R.
22. 5. 64

...আমার স্তাভরোপোলের শিক্ষা শেষ হবে আর মাস পাঁচেকের মধ্যে। তারপর যাবো উরাল পর্বতে, Orks শহরে। এটা বড় শহর। অর্ধেক শহর এশিয়াতে আর অর্ধেক ইউরোপে। ICBM-এর মতো চলাফেরা করা যাবে।

আমি গত পাঁচমাস বাংলায় কথা বলিনি। চিঠি লেখার সময় কেবল বাংলা ভাষার শরণ নিতে হয়, কাজেই হাতের লেখা আর বানান বোধ হয় আগের চেয়েও দুর্বোধ্য।...এখানে ফিল্ম দারুণ শস্তা, ৩৫ কোপেক মাত্র।...

এখন চেখভের মূল ছোট গল্প পড়ছি। গোগোল পড়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু গোগোলের ভাষা পুরানো রাশিয়ান, বোঝা কঠিন।...রাশিয়ান সায়েন্স ফিকশন বেশ উচ্চস্তরের। কয়েকটা পড়ে বেশ ভালো লাগলো। তবে এদের সায়েন্স ফিকশন পাঠকদের যে কিছু পরিমাণ বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান বা উৎসাহ আছে তা ধরে নেওয়া হয়। আমাদের দেশে এই ধরনের অনুমানের কোনো উপায় বা ভিত্তি নেই।

অভিজিৎ আচার্য

ক্রমশঃ

নেমন্তন্ন

(গল্প)
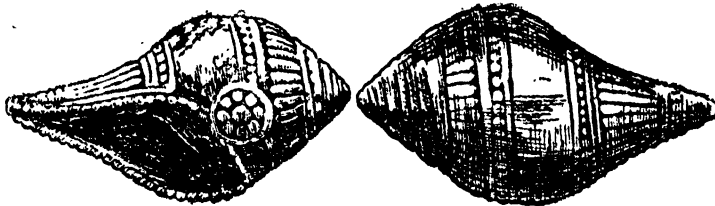
সুনীল মুখোপাধ্যায়

নেমন্তন্ন বলতেই ছেলেবেলায় আমাদের মন নেচে উঠতো—কী আনন্দ, পেট ফাটিয়ে খাব। কিন্তু আজকাল নেমন্তন্নর নাম শুনলে আর সেরকম আনন্দ হয় না বরং শিউরে উঠতে হয়—ভয়ে ভয়ে ক্যালেণ্ডার দেখতে হয় আজ মাসের কত তারিখ। আমার তো রাস্তার ধারের দোকানগুলিতে টাঙানো 'শুভবিবাহ', 'শুভউপনয়ন' মার্কা কার্ডখানি দেখলে গা জ্বলে যায়। দোকানীর উপরও মন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ঐসব কার্ডের যে অত অলঙ্করণ অত রূপবৈচিত্র্য মোটেই আর মনকে আনন্দিত করে না বরং শঙ্কিত করে। আমার কিন্তু এখন ৺গঙ্গা মার্কা কালো বর্ডারের নিরলঙ্কার কার্ডগুলি খুব ভালো লাগে, মনে কেমন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির মহাভাব জাগরিত হয়। ক্যালেণ্ডারের দিকেও তাকাতে হয় না, তারিখটাও ঠিকই মনে থাকে—কেননা যদিও এটি নিরামিষ নেমন্তন্ন তবু তো নিঃশুল্ক! যথাসময়ে নেমন্তন্ন বাড়ীতে মুখে একটা শোকশোক ভাব দিয়ে সজল হৃদয়ে গেলেই হয়—একটু বলা, 'আহা বড় ভাল লোক ছিলেন।' তারপর ভোজের অপেক্ষা। শেষে খাওয়া হয়ে গেলেই বিবেকের তাড়না খেতে হয়—শোকের বাড়ীতে বেহায়ার মত আর ভীড় করা উচিত নয়, সুতরাং সোজা বাড়ী। বাড়ী এসে যাঁর দৌলতে অর্থাৎ যিনি মরে আমার বাড়ীর আজকের খাবারটা বাঁচিয়ে দিলেন তাঁর আত্মার শান্তি কামনা ও শুয়ে পড়াই একমাত্র কাজ।

কিন্তু সারাদিন খেটেখুটে এসে যখন দেখি টেবিল আলো করে শুভউপনয়ন বা শুভবিবাহের বিচিত্র খামখানা হাসছে তখন অশুভ আতঙ্কে মনটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, চোখ ধীরে ধীরে ক্যালেণ্ডারে উঠে যায়, দেখতে হয় খায় করতে হবে কি না। মেজাজ বিগড়ে যায়—ঝাঁঝটা পোয়াতে হয় বাড়ীর লোকদের। কপাল তেমন ভাল হলে অন্তের পৌষমাস আসে আমার সর্বনাশ করে এক একমাসে চার পাঁচখানা বিচিত্র কার্ডের প্রদর্শনী শুরু হয়ে যায় টেবিলের উপর। তার ওপর রাত্রে খেতে বসলে মা এসে পাশে বসলেন এবং বলি বলি করে শেষ পর্য্যন্ত বলেই ফেললেন—"হ্যাঁরে ছকুর মেয়ের বিয়ে, কি দিবি? ওদের সঙ্গে আমাদের যে রকম সম্পর্ক তাতে ঠুক করে একটা সিঁদুর কৌটা বা চকচকে কমদামী একটা শাড়ী দিলে তো হবে না—তুই কি বলিস? বলবার আর কি আছে, মার যা ইচ্ছা তা বুঝতে কারুরই অসুবিধা হয় না। এই বাজারে সংসার চালিয়ে খাঁটি সোনার জিনিষ দিয়ে লৌকিকতা করা যে কী ব্যাপার তা ভুক্তভোগী মধ্যবিত্ত ছাড়া আর কেউ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। উপনয়ন বা অন্নপ্রাশন নয় যে এসব ক্ষেত্রে একটা লিকলিকে কেনা আংটি হলেই চলে যাবে, বিয়ে, সুতরাং নিতান্ত কানের কিছু একটা দিতেই হবে, নিদেনপক্ষে ত্রিশ টাকার ধাক্কা। নির্দিষ্ট আয় অথচ অনির্দিষ্ট ব্যয় তার ওপর আবার বাড়তি খরচের প্রাণান্তকর আত্মীয়তা।

অপেক্ষাকৃত কম ওজনের আত্মীয়দের বাড়ীতে যত ভাল না শাড়ী তার চেয়েও বড় ও ভাল বাক্সখানা বুকে চেপে যেতে হয়। বাক্স যত বড় ও নামী দোকানের, কপালে আদর আপ্যায়ন ত ততখানি বেশি জুটবে।

আগে বাক্সটা কাগজে মুড়ে নিয়ে যেতুম এখন আর তা করিনা। কাদের বাড়ী যাবার আগে সকলেই ভাবি একমাত্র আমার জন্যেই সেখানে সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে—সেই উত্তেজনায় অনেক সময় যাবার সময় বাসে হাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে একটা ট্যাক্সিই ডেকে ফেলি। ট্যাক্সির একটা ধার ঘেঁষে বসে বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে থাকি, —আশ্চর্য, যেদিন ট্যাক্সি চেপে কোথাও যাই জানা শোনা কারো সঙ্গেই দেখা হয় না, আর মাসের শেষে যখন হেঁটেই এসে ট্রেণ ধরি তখন পথে যতসব আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা ও নানারকমের জিজ্ঞাসা। ট্যাক্সি গলির মুখে ঢুকতে চায় না, বুঝিয়ে সুজিয়ে কোনরকমে বিয়ে বাড়ীর সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং নেমে সজোরে ও সশব্দে ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে আওয়াজে জানিয়ে দিলাম যে আমি এসে গেছি, কিন্তু কই কেউ তো সাদরে ছুটে এলো না! তখন নিজেই নিজেকে আপ্যায়িত করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বাড়ীতে ঢুকলাম। বাড়ীর সকলেই দেখি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে বৃহত্তর কাজে, কেউ আমাকে দেখতে পাচ্ছে না। খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে শেষে শাড়ীর বাক্সটাকে আরো উঁচিয়ে ধরে প্রবেশ করলাম যে ঘরে সবে বসেছে। ঐ জন্যে এখন থেকে আমি বাড়ীর লোকদের সম্ভব হলে আগে পাঠিয়ে দিই যাতে আমি গেলে তোমার এত দেরী বলে তারা এগিয়ে আসে এবং অপরিচিতরা যাতে বুঝতে পারে যে আমি এ বাড়ীরই একজন, বাইরের কেউ নই। যাইহোক ঢুকতেই শুকনো আদর জুটল একটু—শাড়ীই হয়ত মুখরক্ষা করল এযাত্রা। তারপরে আবার যে-কে সেই। হয় বোকার মত হাসিমুখে ঘুরে বেড়ানো নয়ত চেয়ার টেনে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকা এবং সারে গিয়ে বসার জন্যে ওৎ পেতে থাকা—খেতেও ইচ্ছা করেনা কিন্তু অনেক খরচপত্র করে আসা; ফিরে যেতেও মন চায়না। চুপ্‌চাপ কাকতু পাটির মত বসে থাকাও যায় না, যেচেই দু'চারজনের সঙ্গে কাষ্ঠ-আলাপ করতে হয়—"উঃ কতদিন পরে দেখা বলতো? এখন কি দেরাদুনেই আছিস্? মা বাবা ভাল আছেন? অথবা "আরে মশাই চিনতে পারছেন? তারপর কি খবর বলুন? আমাদের অফিসে তো খুব ট্রাব্‌ল্‌ চলছে এ্যা? কি মনে হয় যুক্তফ্রণ্ট এবার…।" মন কিন্তু ঝুকিয়ে আছে শেষ ডাকল কিনা দেখবার জন্যে অর্থাৎ হাত মুছতে মুছতে, পান চিবুতে চিবুতে, ঢেকুর তুলতে তুলতে দলে দলে লোক বেরিয়ে আসছে কিনা, কেননা কেউ বলবে না, নিজে গিয়ে সারে বসতে হবে—লজ্জা সঙ্কোচ করতে গেলেই খামোকা রাত হয়ে যাবে। তারপর লুচি-পোলাও মাছ-মাংস, কোরমা-দোরমা, দই-মিষ্টি ঢালাও ব্যবস্থা, কর্তা এসে হাতজোড় করে এমন সবিনয়ে বললেন যেন এইমাত্র নবদ্বীপ থেকে এলেন—তাঁর ক্ষুদ্র সামর্থ্যে এর বেশী কিছু করতে পারেন নি, সবাই যেন ক্ষমা-ঘেন্না করে নেন। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে বারোমাস পেটের রোগে ভুগলেও কিছুটা ভয়ে, কিছুটা লোভে দুষ্পাচ্য সবকিছুই খেলাম; তখনকার মত ভুলেই গেলাম আর যত বাড়ে ইনকামট্যাক্স ততই বেড়ে যায়। যাই হোক উদ্গার তুলতে তুলতে খালি হাতে শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফেরা গেল। কেমন খাওয়ালো জিজ্ঞাসা করল বাড়ীর লোক—তখন আর সবিস্তারে বলবার উৎসাহ নেই। আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবের আন্তরিকতাপূর্ণ যান্ত্রিকতায় মন মরে গেছে—উৎসাহে, আন্তরিকতায় দেউলিয়া হয়ে গেছি।

সত্যি প্রাণ শুকিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। মাপা হাসি, মাপা কথা, মাপা অবস্থিতি সব মিলিয়ে কেবল নিয়মরক্ষা সেই 'শুভউৎসব' আর হয় না। উপহার-উপঢৌকন আর অন্তর থেকে আসে না, অনেক কষ্টে বিব্রত হয়ে নিজেকে ও সংসারকে মেরে কোনরকমে বুক নিঙড়ে উপহারের ডালি সাজাতে হয়। অন্তর দিয়ে যথাসাধ্য যে কিছু দেব তার উপায় নেই, কারো মন উঠবে না বরং অবজ্ঞা ও সমালোচনাই জুটবে। তাই কেনবার সময় নিজের সামর্থ্যের কথা না ভেবে ভাবতে হয় আমার উপহারটি অন্যের পাশে মানাবে তো? এসব যেন অলিখিত ও বর্তমান যুগে সুপ্রচলিত সোসালট্যাক্স বিশেষ। প্রতিমাসেই আতঙ্কে থাকতে হয়—কোন্ আত্মীয় বা বন্ধু আমাকে নেমন্তন্ন করে ধন্য করে দেবেন। এক এক সময়ে তাই মনে হয় যে, অফিসে অফিসে ঐ সোস্যালট্যাক্স এ্যালাউন্স-

এর জন্তে আন্দোলন করা উচিত, প্রতিমাসেই এইসব বাড়তি খরচের ধাক্কা সামলানো দুষ্কর। বিশেষ করে মধ্যবিত্তের সম্ভ্রমবোধ তো বেশি, দু'বেলা খাওয়া হোক আর নাই হোক, বাইরের ঠাট ও মর্যাদা বজায় রাখতেই হবে। নেমন্তন্ন না করলে কি করে অভিমান করে লোকে বলে—'বেশ ফাঁকি দিয়ে কাজটা সেরে নিলে, ঠিক আছে।

ভেবে দেখুন একটি মানুষের জন্মের পূর্ব মুহূর্ত থেকেই উপহার শুরু হচ্ছে। একেবারে গাদোত্রি থেকে ধরুন—কন্তা বা পুত্রবধূর সাধভক্ষণ—খরচটি কম নয়। তারপর তার সন্তান হোলে খালি হাতে মুখ দেখা যাবে না। এরপর হচ্ছে অন্নপ্রাশন, মামারবাড়ী হলে কথাই নেই, নাত্তির প্রাপ্য (ভাগনের ভাগ আর কি) মেটাতে হয়। প্রাণের নাতি সত্যি কথা, কিন্তু প্রাণের 'আগমার্কা' স্নেহ-ভালবাসা দিয়েই চলবে না, প্রাণচ্ছেদী জিনিষপত্র দিতে হবে, না হলে কারুরই আনন্দ প্রস্ফুটিত হবে না। তারপর তার প্রতি বছরে আছে জন্মতিথি। কয়েক বছর কাটতে না কাটতেই আসে ছেলের উপনয়ন। কিছুদিন পরে ছেলে বা মেয়ের বিবাহ—দুর্ভাবনার চূড়ান্ত—সকলদের কথা বাদ দিচ্ছি, আমি বিশেষ করে নির্দিষ্ট আয়ের লোকেদের কথাই বলছি। মাথায় বিপুল দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ কি করে খরচ জুটবে। তারপর আবির্ভাব ঘটবে এদের ছেলেমেয়ের যাদের আবার হবে পরপর অন্নপ্রাশন, জন্মতিথি, উপনয়ন, বিবাহ প্রভৃতি। আজকাল কিছুদিন দেখছি বন্ধু-বান্ধবীরা তাঁদের বিবাহিত জীবনের হালখাতা করছেন, জানি না কী এর উদ্দেশ্য, এক এক সময় মনে হয় বোধ হয় মিলেমিশে ক'বছর কাটছে তারই হিসাব রাখা আর কি। যাই হোক ঐ সব বিবাহ-বার্ষিকীতে খালি হাতে গিয়ে শুধু শুধু খেয়ে আসা যায় না। তাই মনে হয় আমাদের যেমন বারমাসে তের পার্বণ আছে, তেমনি আমাদের সামাজিক জীবনে গড়ে অন্ততঃ তিন বারং ছত্রিশবার সোস্যালট্যাক্স দিতে হয়। আমি তাই সারাবছরে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও মোট ৬ থেকে ৭টি ট্যাক্স বেছে নিয়ে দেই। আর মাসের পনের তারিখের পর কেউ নেমন্তন্ন করতে এলে আমি স্পষ্ট বলে দি, ঐ দিনটিতে আমার অসুখ করবে। আমি নিরুপায়।

কালিদাস সাহিত্যে দার্শনিক ও বৈয়াকরণ উপমা

রঘুনাথ মল্লিক

মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাটকের মধ্যে বহু দার্শনিক ও বৈয়াকরণ উপমা পাওয়া যায় এখানে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি দেখান গেল।

সরযূনদীর উৎপত্তিস্থল যে 'ব্রাহ্মসরঃ' বা 'মানস সরোবর' সে তথ্যটি কালিদাস একটি দার্শনিক উপমা দিয়া বিবৃত করিয়াছেন। 'রঘুবংশে' বলিতেছেন—

"ব্রাহ্মংসরঃ কারণমাপ্তবাচো
বুদ্ধেরিবাব্যক্ত মুদাহরন্তি॥" (রঘু-১৩.৬০)।

আপ্তবাক্ পুরুষেরা বলেন, যেমন প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, তেমনি ব্রাহ্মসর বা মানস সরোবর হইতে সরযূনদীর উৎপত্তি।

রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তাঁহার পারসীকা দেশ জয়ের কাহিনী মহাকবি একটি দার্শনিক উপমা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"পারসীকাংস্ততো জেতুং প্রতস্থে স্থলবর্ত্মণা।
ইন্দ্রিয়াখ্যানেব রিপূং স্তত্ত্বজ্ঞানেব সংযমী॥" (রঘু-৪।৬০

সংযমী পুরুষ যেমন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয় নামক রিপুদিগকে দমন করেন, বীরবর রঘুও তেমনি স্থলপথে চলিয়া পারসীকদিগকে জয় করিতে গেলেন।

মহাকবি এখানে ইন্দ্রিয় নামক রিপু বলিতে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি মানুষের মনের শত্রুদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য,—সাধক লোক যেমন কাম প্রভৃতি শত্রু দমন করার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে থাকেন, রঘুও সেইরূপ পারসিকদিগকে জয় করার জন্য স্থলপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

'কুমার সম্ভবেও' মহাকবি শুদ্ধমনা যোগীপুরুষের যম-নিয়ম দ্বারা সাংসারিক বিষয়াভিলাষ নাশ করাকে উপমান করিয়াছেন—

"দেবোঽপি দৈত্য বিশিখপ্রকরং সচাপং
বাণৈশ্চকর্ত্ত কণশো রণ কেলিকারী।
যোগীব যোগবিশুদ্ধমনা যথাস্বৈঃ
সাংসারিকং বিষয়সঞ্চয়মোঘ বীর্য্যম॥" (কু-১৭ ৪৭)

যোগীপুরুষ যেমন যম নিয়ম প্রভৃতি উপায় দ্বারা মনকে শুদ্ধ করিয়া সাংসারিক অভিলাষ সমূহ বিনষ্ট করিয়া ফেলেন, দেব সেনাপতিও (কার্ত্তিক)—যুদ্ধকে যিনি ক্রীড়ার মত আমোদজনক বলিয়া মনে করেন—বাণ বর্ষণের দ্বারা দৈত্যপতির সমস্ত অস্ত্র, ধনুকটি পর্য্যন্ত চূর্ণ-করিয়া কণায় পরিণত করিয়া দিলেন।

'রঘুবংশের' দ্বাদশ সর্গেও দার্শনিক উপমা পাওয়া যায়।

সম্পাতির মুখ হইতে লঙ্কার অবস্থিতি জানিয়া লইয়া হনুমান শ্রীরামের প্রতি ভক্তির মাহাত্ম্যে লাফ দিয়া মহাসমুদ্র পার হইয়া গেলেন।

হনুমানের এই লাফ দিয়া সমুদ্র পার হওয়ার বিবরণ মহাকবি একটি দার্শনিক উপমা দিয়া বুঝাইতেছেন—

"প্রবৃত্তাবুপলব্ধায়াং তস্যাঃ সম্পাতি দর্শনাৎ।
মারুতিঃ সাগরং তীর্ণঃ সংসারমিব নির্মমঃ॥"
(রঘু-১২।৬০)।

সম্পাতির সঙ্গে দেখা হওয়ায় ও তাঁহার নিকট হইতে সীতার বিষয় জানিতে পারায় পবননন্দন হনুমান্ মমতা-বিহীন মানুষ যেভাবে সংসার বন্ধনচ্ছেদন করিয়া ফেলেন, সেইভাবে সমুদ্র পার হইয়া গেলেন।

মানুষের পূর্ব্বজন্মে কৃতকর্ম্মের সংস্কার ইহজন্মের কাজ-গুলিকে প্রভাবিত করার উপমা পাওয়া যায়।

রাজা দিলীপের 'মন্ত্রগুপ্তি' নীতি সম্বন্ধে মহাকবি বলেন—

"তস্য সংবৃত-মন্ত্রস্য গূঢ়াকারেঙ্গিতস্য চ।
ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাক্তনা ইব॥"
(রঘু-১৷২০)।

মানুষের যেমন এ জন্মের কাজ দেখিয়া তাহার পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কারগুলি বুঝিতে পারা যায়, তেমনি তিনি (রাজা দিলীপ) এত গোপনভাবে কাজ করিতেন, যে, তাঁহার আকার ইঙ্গিতেও তাহা বাহিরে কিছু প্রকাশ পাইত না, কর্ম্ম সিদ্ধ হওয়ার পর লোক তাহা জানিতে পারিত। 'জন্মান্তর' ও 'কর্ম্মফল'—যাহা সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের ভিত্তি—সেই জন্মান্তর তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য মহাকবি কয়েকটি উপমা রচনা করিয়াছেন।

নগাধিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্ব্বতীর অসাধারণ মেধা সম্বন্ধে মহাকবি বলেন—

"তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধীং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥" (কু-১৷৩০)

শরৎকালে যেমন হংসের দল গঙ্গায় আসিয়া থাকে, দীপ্তি যেমন রাত্রে ওষধীলতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে পূর্ব্বজন্মে অধীত বিদ্যার সংস্কারও তেমনি পার্ব্বতীকে সমস্ত পাঠ বোধগম্য করাইয়া দিত উপদেশ দানের (শিক্ষকের) প্রয়োজন হইত না।

ঠিক এই রকমের উপমা 'রঘুবংশে'ও পাওয়া যায়।

'সূর্য্যবংশের শেষ রাজা অগ্নিবর্ণের পিতা সুদর্শন বাল্যকালে যে কি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন বালক ছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য মহাকবি বলিতেছেন—

"স পূর্ব্বজন্মান্তর দৃষ্টপারাং স্মরন্নিবাক্লেশকরো গুরূণাম্
তিস্রস্ত্রিবর্গাধিগমস্য মূলং জগ্রাহবিদ্যাঃ প্রকৃতীশ্চ
পিত্র্যাঃ॥" (রঘু-১৮৷৫০)।

পূর্ব্বজন্মে অধীতবিদ্যা—ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতি—যাহা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবর্গের মূল, তাঁহার এ জন্মে স্মরণপথে আসাতে তিনি শিক্ষকদের শিক্ষা দেওয়ার ক্লেশ উৎপাদন না করিয়া স্বয়ং আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার পিতার প্রজাদের হৃদয় জয় করিলেন।

পূর্ব্বজন্মে সুদর্শন যে সমস্ত বিদ্যা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া শিখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিদ্যার স্মৃতি এজন্মে মনে আসিয়া পড়াতে, তাঁহার মনে হইল এসব বিদ্যা তাঁহার যেন জানা, তাই তিনি অনায়াসে নিজের বুদ্ধিবলে সকল বিদ্যার পারদর্শী হইয়া উঠিলেন, শিক্ষকদের কষ্ট করিয়া শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইল না।

পূর্ব্বজন্মে অধীত বিদ্যার মত, পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত বিবাহ প্রভৃতি কর্ম্মেরও সংস্কার যে মানব মনের অবচিত-নাংশে আসিয়া এজন্মের জীবনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, সে কথা মহাকবি ইন্দুমতীর স্বয়ংবর বিবাহ বর্ণনায় জানাইতে চাহিয়াছেন।

বরকনের শোভাযাত্রা দেখিতে দেখিতে কোনও কোনও নারী বলিতেছেন—

"রতিস্মরৌ নূনমিমাবভূতাং রাজ্ঞাং সহস্রেষু তথাহি
বালা।
গতেয়মাত্মপ্রতিরূপমেব মনোহি জন্মান্তর
সাধীতজ্ঞম্॥" (রঘু-৭৷১৫)।

নিশ্চয়ই এই বরবধূ পূর্ব্বজন্মে মদন ও রতি ছিলেন, আর পূর্ব্বজন্মের প্রণয়ের স্মৃতি মনের মধ্যে থাকিয়া যায় বলিয়া রাজকুমারী তাঁহার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত সহস্র সহস্র রাজার মধ্য হইতে আপনার অনুরূপ বরটিকে বরণ করিতে পারিলেন।

পূর্ব্বজন্মে কৃতকর্ম্মের সংস্কার অনেক সময় মনের অবচেতনাংশে নিহিত থাকে, মনের চেতনাংশে আসে না, তবু সে সংস্কারের নিগূঢ় স্মৃতি যে মানুষের মনে তাহার অজ্ঞাতসারে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে জন্মান্তরের এ দুজ্ঞেয় রহস্য দেখাইবার জন্য মহাকবি শ্রীরামচন্দ্রের 'বামনাশ্রম' দেখিয়া উন্মনা হওয়ার বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন—

"উন্মনাঃ প্রথম জন্ম চেষ্টিতা—
অস্মরন্নপি বভূব রাঘবঃ॥" (রঘু-১১৷২১)।

পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত কোনও কার্য্যের স্মৃতি তাঁহার মনে আসিল না, তবু তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

মিথিলার যাওয়ার পথে 'বামনাশ্রম' দেখিয়া ও মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মুখ হইতে বলি রাজা ও বামনের কাহিনী শুনিতে শুনিতে শ্রীরামের মনে হইল, এই স্থান, এই আশ্রম যেন তাঁহার পরিচিত, বলি-বামনের কাহিনী— এও যেন তাঁহার অজানা নয়, কিন্তু কেন যে তাঁহার এ তপোবন পরিচিত বলিয়া মনে হইতেছে, আর কি করিয়াই বা বলি-বামনের কাহিনী জানা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা তিনি চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারিলেন না, পূর্ব্বজন্মের—বামন অবতারের কোনও স্মৃতিই তাঁহার মনে পড়িল না, অথচ এই সমস্ত ব্যাপার পূর্ব্বজন্মের সংস্কার রূপে তাঁহার মনের অবচেতনাংশে থাকার কালে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল বলিয়া তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে থাকিলেন।

পূর্বজন্মে কৃতকার্যের যেমন কখনও কখনও কোনও স্মৃতি মনে আসে না, অথচ তাহা মনের অবচেতনাংশে থাকিয়া অজ্ঞাতসারে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া মনকে উৎকণ্ঠিত করিয়া তোলে, তেমনই মহাকবি দেখাইতে চাহেন, এই জন্মেরই—পূর্ব্ব কোনও জন্মের নয়— কোনও প্রণয় কাহিনী যাহার সকল স্মৃতি মহর্ষির অভিসম্পাতে মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, তাহারও সূক্ষ্ম প্রভাব অজ্ঞাতসারে মানুষের মনে বিষাদ ও উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করিতে পারে।

প্রাসাদের সঙ্গীতশালা হইতে প্রণয়িনী হংসপদিকার সুমিষ্ট স্বরে গাওয়া ব্যর্থপ্রণয়ের গীত শুনিয়া সকল সুখে সুখী রাজা দুষ্মন্ত, যাঁহার মন হইতে মহর্ষি দুর্ব্বাসার শাপে শকুন্তলার সহিত প্রণয় করার সকল স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে, উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবিতেছেন—

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥ (রঘু ৫ম স)

সকল সুখে সুখী মানুষও যখন কোনও মনোহর বস্তু দর্শন করিয়া বা কোনও মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আকুল চিত্ত হইয়া পড়ে, তখন বুঝিতে হইবে নিশ্চয় তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কোনও প্রণয়ের স্মৃতি মনের অবচেতনাংশে থাকিয়া তাহার অজ্ঞাতসারে মনে পড়াইয়া দেয়, অথচ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে দেয় না।

'দার্শনিক' উপমার মত মহাকবির সাহিত্যের স্থানে স্থানে কয়েকটি 'বৈয়াকরণ' উপমাও পাওয়া যায়।

'রঘুবংশে' ব্যাকরণের 'প্রকৃতি' ও 'প্রত্যয়' ঘটিত উপমা পাওয়া যায়।

মিথিলা রাজবংশের সীতা প্রভৃতি চার রাজকুমারীর সহিত রাজা দশরথের রাম প্রভৃতি চার পুত্রের বিবাহ-উৎসব সমাপন হইয়া যাইলে মহাকবি তাঁহাদের সে মিলনকে 'প্রত্যয়ের' সহিত প্রকৃতির যোগের উপমা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"তা নরাধিপসুতা নৃপাত্মজৈস্তে চ তাভিরগমন কৃতার্থতাম।
সোঽভবদ্বরবধূর সমাগমঃ প্রত্যয় প্রকৃতি যোগসন্নিভঃ॥
(রঘু-১১ ৫৬)

সেই রাজকুমারীরা রাজকুমারদের সহিত ও রাজপুত্রেরা রাজকুমারীদের সহিত মিলিত হইতে পারিয়া সার্থকতা লাভ করিলেন। বরবধূদের এ মিলন প্রত্যয়ের সহিত প্রকৃতির মিলনের মত সার্থক হইল।

মল্লিনাথ বলেন, ইচ্ছার্থে সন্ প্রভৃতি প্রত্যয় যে শব্দের সহিত যুক্ত হয় তাহাদিগকে প্রকৃতি বলে, প্রত্যয় ও প্রকৃতির যোগে শব্দের যেমন একটি অর্থ হয় তেমনি কুলশীল বয়স ও রূপ প্রভৃতিতে সমান রাজকুমারদের সহিত রাজকুমারীদের মিলন তাহাদের জীবনের একাত্মতা সিদ্ধ করিল। তাঁহাদের পৃথক সত্তা যেন আর রহিল না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হইয়া গেলেন।

মহারাজ দিলীপ তাঁহার নব-জাত পুত্রের নামকরণ করার সময় পুত্রটি যাহাতে 'শাস্ত্র' ও 'শস্ত্র' উভয় বিভায় পারদর্শী হইতে পারে, এই আশা করিয়া তিনি গমনার্থক 'লঘ্' ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ রঘু রাখিলেন।

ব্যাকরণের 'লঙ্ঘিবঙ্খিলঙ্ঘি গত্যর্থাঃ' সূত্র অনুসারে 'লঘ' ধাতু যে গমনার্থক তাহা বুঝা যাইতেছে।

মহাকবি ধাতু স্থানে ধাত্বন্তর আদেশকেও উপমান করিয়াছেন।—

রামচন্দ্র রাজ্য-হারা সুগ্রীবের দুঃখদুর্দশার কাহিনী শুনিয়া তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালিকে বধ করিয়া বালির রাজপদে সুগ্রীবকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

মহাকবি বালির স্থানে সুগ্রীবের প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে এক বৈয়াকরণ উপমা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

"স হত্বা বালিনং বীরস্তৎপদে চিরকাঙ্খিতে।
ধাতোঃ স্থানমিবাদেশং সুগ্রীবং সংন্যবেশয়ৎ ॥"
(রঘু-১২।৫৮)।

বীরবর রাম বালিকে বধ করিয়া এক ধাতুর স্থানে অপরধাতুর 'আদেশ' বিধি অনুসারে সন্নিবেশের মত সুগ্রীবকে তাঁহার চিরআকাঙ্খিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন।

মহাকবি এখানে বলিতে চাহেন, যেমন ব্যাকণের 'ইণোগালুঙি' এই সূত্র অনুসারে লুঙ্ বিভক্তিতে 'ই' ধাতুর স্থানে 'গা' আদেশ হয়, যাহার ফলে 'ই' ধাতুর স্থানে অপর একটি একটি শব্দ সন্নিবিষ্ট হয়, তেমনি রাম বালিকে নিহত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বালির স্থলে সুগ্রীবকে বসাইয়া দিলেন।

মহাকবি যেমন এখানে গমনার্থক 'ই' ধাতুর স্থানে 'গা' আদেশ লইয়া উপমা দিলেন, তেমনি, গমনার্থক 'ই' ধাতুর সহিত 'অধি' এই উপসর্গ যুক্ত হইলে ই ধাতুর অধ্যয়ন অর্থ হয়—এই ভাবটিকে উপমান করিয়া মহাকবি অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন—

"রামাদেশাদনুগতা সেনা তস্যার্থসিদ্ধয়ে
পশ্চাদধ্যয়নার্থস্য ধাতোরধিরিবাভবৎ ॥" (রঘু-১৫।৯)

যেমন 'অধি' উপসর্গ 'ই' ধাতুর সহিত যুক্ত হইলে অধ্যয়ন অর্থ সিদ্ধ হয় তেমনি লবণ বধ রূপ কার্য্য সিদ্ধির জন্য একদল সৈন্য রামের আদেশে শত্রুঘ্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

যেমন অধ্যয়ন অর্থ সিদ্ধ করিতে হইলে ব্যাকরণের সূত্র—'ধাতো রিভধ্যয়নে' অনুসারে গমনার্থ 'ই' ধাতুর সহিত 'অধি' এই উপসর্গ যোগ করিতে হয়, তেমনি তপোবনের যজ্ঞ কার্য্যের বিঘ্ননাশ করার জন্য শত্রুঘ্নের দ্বারা লবণ রাক্ষস বধ কার্য সিদ্ধ করিতে হইলে শত্রুঘ্নের সহিত একদল সৈন্য থাকা প্রয়োজন ভাবিয়া রামের আদেশে একদল সৈন্য শত্রুঘ্নের পশ্চাতে যাইতে লাগিল।

কোনও একটি বিশেষ বিধি যে সামান্য বিধিকে ব্যাহত করিতে পারে এই ভাবটিকেও মহাকবি উপমান করিয়াছেন—

"যঃ কশ্চন রঘূণাং হি পরমেকঃ পরন্তপঃ।
অপবাদ ইবোৎসর্গং ব্যাবর্ত্তয়িতুমীশ্বরঃ ॥" (রঘু-১০।৭)

যেমন একটি বিশেষ বিধি সামান্য বিধিকে ব্যাহত করিতে পারে, তেমনি রঘুবংশের যে কোনও সন্তান শত্রুকে ধ্বংস করিতে পারে।

তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

(২১)

পল্লীগ্রামের ষ্টেশন। আগে আগে এখানে মিনিট খানিকের বেশী গাড়ী থামতই না। এখন জায়গাটার মর্য্যাদা কিছু বেড়েছে, মিনিট দুই থামে। ধীরেসুস্থে নামা চলে কিন্তু হুড়মুড় করে নামাটাই যেন পুরণো বাসিন্দাদের নিয়ম দাঁড়িয়ে গেছে। তাই গাড়ীর গতি মন্দ হয়ে আসতেই হেমলতা ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে বললেন, "গাড়ী থামলেই আমি মনুকে নিয়ে নেমে যাব, জিনিষপত্র গুনেগেঁথে নামাস্। কিছু যেন পড়ে না থাকে, ক'টা জিনিষ আছে দু বাড়ীর মিলিয়ে আনিস্ ই ত?"

উষা, উমারাও একটু চুলে চিরুণী চালিয়ে শাড়ীটাড়ি ঝেড়েঝুড়ে, হ্যাণ্ডব্যাগ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

হেমলতা বললেন "তোমরা ত হরিণের মত তিড়িং করে লাফিয়ে নেমে যাবে, শরীরেরও ভার নেই, কাঁধেও বোঝা নেই। আমাকে কিন্তু সবার আগে নামতে দিও বাপু, তারপর সবাই।"

গাড়ী থামবামাত্র নাতনীকে কাঁধে ফেলে তিনি ক্ষিপ্রগতিতে নেমে পড়লেন। উমা বল্ল "ছোট ঠাকুরমা খেলোয়াড়ের দলে এখনও নাম লেখাতে পারেন।"

হেমলতা বললেন "আরে ছোটবেলায় যে আমার নাম ছিল "গেছো মেয়ে।" বোনদের সঙ্গে ঘর বসে পুতুল খেলতে আমার ভালই লাগত না। আমি ভাইদের সঙ্গে ডাণ্ডাগুলি খেলে, গাছে চড়ে আর সাঁতার কেটে বেড়াতাম।"

রীণি বল্ল "সেই জন্যেই ত এখনও এমন তাকৃড়া জোয়ান আছ।"

রামপদ হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, অন্য ছেলেরা চট্‌পট্ গাড়ীতে উঠে জিনিষপত্র নামাতে সাহায্য করতে লাগল। কুলীটুলী এখানে যথাকালে সব সময় পাওয়া যায় না। নিজেরা বা বাড়ীর চাকরবাকরদেরই এ কাজটা করে নিতে হয়। হেমলতার নাতনী মনুর ঘুমটা এতক্ষণে ভাল করেই ভেঙে গিয়েছিল, সে মাথা তুলে চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিল। জায়গাটা তার নিতান্তই অচেনা। বড় দিদিরা এমন কি নিজের ঠাকুরমা পর্য্যন্ত রামপদকে প্রণাম করছে দেখে সেও হাঁকপাক করে কোল থেকে নেমে পড়ে তাঁকে একটা প্রণাম ঠুকে দিল।

রামপদ তার গাল টিপে দিয়ে বললেন "এঁর দেখি সহবৎ শিক্ষা এরই মধ্যে বেশ ভাল হয়েছে।"

হেমলতা বল্লেন "হ্যাঁ সেদিকে ওর ঠিকে ভুল নেই।"

ট্যাক্সি, রিক্‌শ, গরুরগাড়ী সব আগে থাকতে ঠিক করাই ছিল। মেয়েরা ট্যাক্সিতে উঠ্‌ল, রামপদ চড়লেন রিক্‌শাতে এবং ছেলের দল হৈ হৈ করে এগিয়ে চলল, সব জিনিষপত্র গরুর গাড়ীতে তুলে দিয়ে। আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুটে উঠতে লাগল।

ট্যাক্সিকে বলা ছিল খুব আস্তে আস্তে চালাতে, কাজেই সবাই প্রায় একসঙ্গেই এসে উপস্থিত হল। চাকর দাশরথী ঘরের দরজা জানালা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। একটা জোরাল হ্যাসাগ্ লণ্ঠন জালিয়ে রেখেছে, যদিও দিনের আলো এখন বেশ ফুটে উঠেছে।

হেমলতা বললেন "ওমা, দাদা ত দেখি বাড়ীর চেহারা একদম বদলে ফেলেছ।"

রাণি বলল "কই আগে ত বাড়ী পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিলনা?"

উমা বলল "আমরা এখন তিন সুন্দরী এসেছি, এখন পরদা ত একটু চাই? রাস্তা থেকে দেখা গেলে চলবে কেন?"

রামপদ হেসে বললেন, "তা ঠিক। মাঠ, ঘাট, রাস্তা সব জায়গা থেকে তোমাদের দেখা গেলে এখানের অধিবাসীদের কাজকর্ম্ম সংবাদপত্রের ভাষায় বড় "ব্যাহত" হবে। সবাই সারাক্ষণ এইদিকে চেয়েই বসে থাকবে হয়ত।"

হেমলতা বললেন "সত্যিই তাই। কাণ্ডজ্ঞান ত বেশী নেই, হয়ত দলবেঁধে বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে যাবে, মেয়েরা, ছোট ছেলেপিলেরা ঘরেই ঢুকে যাবে।"

কনকলতাদের বাড়ী থেকে অনেকেই এসে জুটল। পল্লীগ্রামের মানুষ, সকাল সকাল ওঠাই বেশীরভাগের অভ্যাস। দাশরথী জিজ্ঞাসা করল রামপদকে "এইবার চায়ের জল চড়াই?"

তিনি উত্তর দেবার আগেই কণকলতা বললেন "তা চড়াও, কিন্তু সাড়ে সাতটায় আবার আমার বাড়ী গিয়ে চা খাবে। বৌমারা উঠেছে, সব ঠিক করছে। আর আজ দুপুরের খাওয়া সকলের আমার ওখানে। দাদা তুমিও ওখানে খাবে। তারপর বিকেল থেকে নিজেদের ব্যবস্থা সব নিজেরা করবে।"

হেমলতা বললেন "আচ্ছা বাপু, তাই হবে। তোমাদের বাড়ীর চা যে কি জিনিষ তা আমার জানা আছে। সে খেলে আর বেলা দেড়টা দুটোর আগে ভাত খেতে হবেনা। ও উষা আমার খাবারের বাস্কেট্‌টা খুলে ঐ বিস্কুটের বাক্সটা বার কর ত। মধুকে দাও খানদুই, নইলে এখনই ভ্যাঁ জুড়বে, আর নিজেরাও এক আধখানা মুখে দিয়ে চা খাও, শুধু পেটে চা খেলে গা গুলবে।"

জিনিষপত্র সব ঘরে তোলা হতে লাগল। বাড়ীতে চারখানি ঘর, বেশ বড় বড়ই বলা চলে। একটা রামপদর শোবার ঘর, একটা বসবার ঘর, একটা লাইব্রেরি আর একটা খাবার ঘর। কার্য্যতঃ ঐ শোবার ঘরখানা ছাড়া আর বিশেষ কোনটাই ব্যবহৃত হয়না। রামপদ বসবার ঘর হিসাবে চওড়া বারান্দাগুলোই ব্যবহার করেন। পড়াশুনো বেশীর ভাগ নিজের শোবার ঘরেই করেন, খাওয়া যখন যেখানে খুসি। কিন্তু এবারে নাতনীরা অনেকদিন থাকবে, তাই সব বাড়ীটা ঢেলে সাজা হয়েছে। বসবার ঘরে চেয়ার সোফা প্রভৃতি একপাশে সাজিয়ে তিনটি তক্তাপোষ পাতা হয়েছে। বিছানা, বেডকভার দিয়ে একেবারে তৈরি রাখা। লাইব্রেরি ঘরেও দুজনের শোবার ঐ রকম ব্যবস্থা। কাপড়-চোপড়ের জন্যে আলনা, বসবার জন্য ইজিচেয়ার সব আছে।

হেমলতা বললেন "বাবাঃ, দাদা এত পর্ব্ব কখন করলে? একসঙ্গে তিনরাণী আসছে, তাই দেখি আনন্দে অঢেল খরচ করে বসেছ। এত সব আসবাবপত্র আগে ত তোমার ঘরে ছিলনা?

কণকলতা বললেন, "এই একমাস ধরে বসে বসে এই করেছেন। দিদিমনিদের যেন কোন কষ্ট না হয়। গুছিয়ে দিয়েছে অবিশ্যি বৌমারা। বাসনকোশনও কিনতে চেয়েছিলেন, তা আমি বললাম কিছু কিনতে হবে না সব আমি দিতে পারব। কাঁসার বাসন কিন্তু। কাঁচের জিনিষের এখানে চল নেই। বাউরি বউ তাহলে সব একদিনে ভেঙে শেষ করবে।"

হেমলতা বললেন "ঝি বুঝি এবার একটা রেখেছ?"

কণকলতা বললেন "হ্যাঁ ভাই, এবার আর না রেখে পারলাম না। অনেক লোক হয়ে গেছে, বৌমারা আর পেরে উঠছে না। আমাকে ত বেশী কিছু করতে দেয়না, বলে আপনি কেন চিরকাল করবেন? পারি অবিশ্যি সবই করতে, এমন কিছু বুড়ী হইনি। এরপর শান্তি আর স্বর্ণ আসবে, দুজনেরই বাচ্চাকাচ্চা আছে, জামাইরাও দুচারদিন করে থেকে যাবে। তাই একটা লোক রাখলাম, বাসনকোশন মাজে, গোবর লেপার কাজটাও করে। বৌদের কারো শরীর খারাপ হলে ছেলেপিলের জামা-কাঁথাও কাচে।"

দাশরথী খাবার ঘর থেকে ডেকে বলল "চা দিয়েছি পিসীমা।"

সকলে গিয়ে খাবার ঘরে ঢুকল। এঘর এখন পুরো-পুরি সাজান ডাইনিং রুমে রূপান্তরিত হয়েছে, আগে একটা ছোট টেবল, চেয়ার মাত্র ছিল। এখন খাবার টেবল এসেছে মাঝারি আকারের, চেয়ার খানছয়, আল আলমারি, বাসন রাখার তাক কিছুর অভাব নেই। উমা হাততালি দিয়ে বলল "বারে একটা রিফ্রিজারেটার হলেই ত পুরো শহরের খাবারঘর হয়ে যায়!"

রামপদ হেসে বললেন "ইলেক্‌ট্রিসিটি আসুক আগে গ্রামে, তখন ওটাও কিনে দেব।"

দাশরথী চা গুছিয়ে এনেছিল। হেমপ্রভা বললেন "তোমরা একজন চাটা ঢাল ভাই। মনু আমাকে ছাড়ছে না। বাড়ীতে এত ভোরে ত ওঠেনা, এখানে আবার ঘুম পাচ্ছে বোধহয়।"

উষা চা ঢালতে আরম্ভ করল। কণকলতা এইবার বাড়ী ফিরে চললেন। হেমলতাকে বলে গেলেন "ঠিক সময় যাবি কিন্তু সবাইকে নিয়ে বৌমারা আসতে পারছেনা, গল্প করবার জন্যে সব মুখিয়ে রয়েছে।"

সবাই বিস্কুট এবং চায়ে মনোনিবেশ করল। মনু আগ্রহ করে বিস্কুট খেল, তবে চায়ে একবার চুমুক দিয়েই চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে ঘুমতে আরম্ভ করল। হেমলতা তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এলেন।

উমা বলল "অতঃপর কি করা যায়?"

উষা বলল "মনুর মত আর এক পালা ঘুম দিতে চাও নাকি?"

রীণি বলল "দূর্ একটুও ঘুম পাচ্ছে না! তার চেয়ে চানটা সেরে নেওয়া যাক্, কাপড়চোপড়গুলো তাহলে বদলাতে পারব। গরম জল পাওয়া যাবে?"

দাশরথী বলল "তা যাবেনা কেন এ বেলা ত রান্নাবান্না নেই, যত জল চান গরম করে দিচ্ছি।" বলেই সে জল চড়াতে চলে গেল।

হেমলতা নিজের শোবার ঘরে ঢুকে জিনিষপত্র গোছাতে লাগলেন। বিরাট বেতের বাক্স খুলে সব জিনিষ বার করে দুভাগ করতে লাগলেন। এক ভাগ যাবে কণকলতার বাড়ী, এক ভাগ থাকবে এখানে। নিজের কিছু শাড়ী জামা এবং মনুর ফ্রক প্রভৃতি বার করে আলনায় রাখলেন। নাতনীদের ডেকে বললেন "দিদির বাড়ীর চায়ের সময় হতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক দেরি আছে। এর ভিতর পাঁচ-জনের স্নান হবেনা?"

উষা বলল "আমার দশ পনেরো মিনিটের বেশী লাগে না। আমি নিতান্তই বাঙালী মানুষ।"

উমা বলল "আমাকে কিন্তু আধঘণ্টা সময় দিতে হবে। মাথাটা বোঝাই হয়ে গেছে কয়লার গুঁড়োয়, না ঘষলে আর চলবে না। এই রীণি শ্যাম্পুর বোতলটা কই?"

রীণি বলল, "তোমারই স্যুটকেসের তলায় তোয়ালে জড়িয়ে ঠেশে দিয়েছি। আমার কুড়ি মিনিট আন্দাজ লাগ্‌বে।"

সবাই কাপড়জামা বার করতে লাগল, উষা আর রীণি চুলে খানিকটা তেলও ঘষে নিল। বালতি ভরে গরম জল নিয়ে দাশরথী স্নানের ঘরে রেখে এল। উষা কাপড়-চোপড়, তোয়ালে নিয়ে সেইদিকে যেতে যেতে হেমলতাকে জিজ্ঞাসা করল, "ছাড়া কাপড়গুলো কেচে আন্‌ব ত ছোট ঠাকুমা?"

হেমলতা বললেন "এখন কেচেই আন। দিদি অবশ্য ঝি রেখেছে একটা, সে কাপড়ও কাচে, তাকেই হয়ত তোমাদের কাপড় কাচতে বলবে। তা এত সকালে সে নিশ্চয়ই আসেনি।"

উষা চলে গেল। রীণি বলল "বাবাঃ, শীতকালে কাপড় কাচতে হলেই ত গেছি। আমার তখন জল ছুঁতেই ইচ্ছে করেনা।"

উষা বেরতেই উমা চলল স্নানের ঘরে। উষার হাতে কাচা কাপড় দেখে দাশরথী ত আঁৎকে উঠল "ওকি দিদি-মনি, আপনি কাপড় কেচেছেন কেন? ওসব ত বাউরি

বউ কাচবে, বড় পিসিমা ঠিক করে দিয়েছেন। দিন্ আমার হাতে দিন, আমি উঠনে মেলে দিচ্ছি। কালকে তার খাটান হল উঠনে এই জন্যে।"

হেমলতাও বারান্দায় বসে চুলে তেল দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন "যাক রীণি বেঁচে গেল, জল ঘাঁটাঘাঁটি তার ভাল লাগেনা।"

উমা আধঘণ্টা পার করেই বেরল। রীণি বলল "ছোড়দি ত খুব ভৈরবী জটা পাকিয়ে বেরলি, এখন ওবাড়ী যাবি কি করে? এ চুল ত না শুখলে আঁচড়াতে পারবি না।"

উমা হাতের আঙুল দিয়ে ভিজে চুলের জট ভাঙতে ভাঙতে বলল 'এমনিই যাব। ওরা ভাববে এটা একটা নূতন শহুরে hair-do."

রীণি স্নান করতে গেল। তবে এখানের খোলা হাওয়ায় শীত করাতে কুড়ি মিনিট আগেই বেরিয়ে পড়ল। এরপর হেমলতা মনুকে জাগিয়ে স্নান করাতে নিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা তার একেবারেই মনঃপুত হলনা। সে রীতিমত চ্যাঁ ভ্যাঁ জুড়ে দিল। কিন্তু তার ঠাকুরমা ছাড়বার পাত্রী নন, ভাল করে স্নান করে তবে সে ছাড়া পেল। অতঃপর তাকে নাতনীদের জিম্মায় দিয়ে হেমলতা নিজে স্নান করে এলেন। বললেন "দাদা যা হোক ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। ঘরভরা নাতনী হবে যেন দেখতেই পেয়েছিলেন আগে, তাই খোকার বিয়ের সময়ই স্নানের ঘরটর সব বানিয়ে রেখেছিলেন। নইলে নাতনীরা ত বেঘোরে পড়তই, আমারও একটু অসুবিধা হত। শহরে থেকে থেকে শহুরে হয়ে গেছি ত, শীত পড়লে আর খোলা জায়গায় স্নান করতে ভাল লাগেনা।"

উমা বলল "মার কিন্তু এখনও পুকুরের জন্য মন কেমন করে, বলে কতকাল পুকুরে চান করিনি, আর কোনোদিন করবও না।"

হেমলতা বললেন "বাপের বাড়ীটা রইলনা বলে মন খারাপ আর কি? তোমাদের মামারা যে আর ছায়া মাড়াল না গ্রামের। যতই শহরে থাক, বড় মানুষি কর জন্মস্থান কি ভোলা যায়? দেখনা বুড়ী হতে চললাম, এখনও এখানে আসার নামে মনটা মেচে ওঠে। যদি হাতে কোনোদিন টাকা হয়, তাহলে আমিও একটা ছোট বাড়ী করব এখানে। জমি ত দাদা দিয়েই রেখেছেন।"

একটি শ্যামবর্ণা মোটাসোটা বউ এসে উঠনে দাঁড়াল, বলল "গিন্নিমা ডাকছেন।"

হেমলতা বললেন "এই যাই, চলগো নাতনীরা।" তিনি মনুকে নিয়ে অগ্রসর হলেন। কণকতলার ঘরের সামনের বারান্দায় বেশ মিঠেরোদ এসে পড়েছে। সেইখানে শতরঞ্চি আর মাদুর পেতে চায়ের আসর সাজান হয়েছে। হেমলতা বললেন "দ্যাখ মাটিতে বসতে অসুবিধা হবে, না মোড়া দিতে বলব?

উমা বলল "আহা, কি আমরা মেমসাহেব এসেছি যে মাটিতে বসতে পারব না?" বলেই ধপ্ করে মাদুরের উপর বসে পড়ল।

উমা বলল "বাড়ীতে হরদমই বসছি। বন্ধুদের বাড়ী ত বেশীর ভাগ আসন পেতেই বসতে, খেতে দ্যায়। আর পিক্‌নিকে গেলে ত কথাই নেই। সেখানে কিছুই থাকে না, কাদামাটির মধ্যেই বসে যাই।"

কণকলতার বৌরা খাবার পরিবেশন করতে লাগল। সে এক এলাহি কারখানা। পিঠে, পুলি, মোওয়া, কিছুর অভাব নেই, তার উপর হেমলতার আনা রুটি ও জেলি আছে। কণকলতা বললেন "রুটিগুলো আগে খরচ করে দিচ্ছি, বেশীদিন ত ভাল থাকবে না? জেলি খুব পছন্দ করে শান্তি, তাই বড় বোতলটা রাখছি তার জন্যে।"

পেয়ালা পিরীচের হয়ত অভাব ছিল, দাশরথী ও বাড়ীর সব পেয়ালা দিয়ে গেছে তাই এটাও বেশ নিয়মমাফিক হল। মনুকে ঘুম ভাঙিয়ে স্নান করিয়ে দেওয়াতে তার মেজাজটা কিঞ্চিৎ খিঁচড়ে গিয়েছিল, তবে এত রকম মিষ্টি খাবার দেখে সে সন্তুষ্ট চিত্তে থাবা থাবা করে খেতে লাগল। শুধু কি খাবার? আবার তার নিজের বয়সের কাছাকাছি কয়েকজন বাচ্চাকাচ্চাও দেখা গেল। কাজেই তার মনে কোনো ক্ষোভ রইল না। এতক্ষণ তার চারিদিকে খালি বড় বড় মানুষ দেখে সে কিছুটা হাঁপিয়ে উঠেছিল।

বাউরি বউ তার আর গুটি তিনচার ছেলেমেয়ে উঠোনে বসে সকলের খাওয়া মন দিয়ে দেখতে লাগল। কণকলতা ছেলেমেয়েগুলির হাতে একটুকরো করে রুটি আর জেলি দিলেন। তারা আগে জেলিটা চেটে খেয়ে নিয়ে তারপর রুটিটা খেতে লাগল।

প্রবীরের বউ বলল "কি দেখছিস তোরা এত হাঁ করে।"

বাউরি বউ বলল "এই ত হাতে খাচ্ছেন।"

হেমলতা বললেন "হাতে খাবে না ত কি পায়ে খাবে?"

বাউরি বউ বলল "ঐ যে দাশরথী বলল যে দিদিমনিরা চেয়ারে বসে কাঁটাচামচে খায়।"

উমা বলল "দাশরথী আবার কবে আমাদের খাওয়া দেখতে গেল? বাড়ীতে ত হাতেই খাই?"

রাণি বলল "আমার ডানহাতের বুড়ো আঙুলটা কেটে যাওয়ায় দিনকতক কাঁটা চামচে খেয়েছি বটে।"

কনকলতা বললেন "দাশরথী নিজের দর বাড়াচ্ছে। সে নাকি মহা সাহেবী বাড়ীর চাকর বলে সবাইকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। দাদার ত সাহেবীয়ানার বালাই নেই, তাই দিদি-মনিদের নাম করে বলছে।"

রামপদ এসে একবার ঘুরে গেলেন। কনকলতা তাঁকেও খাবার দিতে যাচ্ছিলেন, তিনি বারণ করলেন। বললেন, "যখন তখন খাওয়ার বয়স আর নেইরে। ওতে অসুখ করে।"

চা খাওয়া শেষ হলে খানিক গল্পগুজব হল। হেমলতা বললেন "এখন বেশী আড্ডা জমিও না বাপু, কাকীদের রান্নার দেরি হয়ে যাবে। এমনিতেই ওদের বেলায় খাওয়া।"

বউরা বলল "না, না, কিছু বেলা হবে না, দেখবেন বারোটার মধ্যে সব শেষ করে দেব। আমরাই ইচ্ছে করে দেরি করি। বাবুরাও বেলা দশটায় খায়, ছেলে পিলেরাও আগেই খায়।"

উষারা তবু উঠেই পড়ল, বলল "আসল আড্ডাটা দুপুরেই হবে এখন। ঘর দোর অগোছাল করে ফেলে এসেছি, একটু গুছিয়ে দিইগে।"

রাণি বলল "দাদু নাকি একরাশ নূতন বই কিনেছেন, সেগুলো নেড়ে চেড়ে দেখতে হচ্ছে।"

উমা বলল "আচ্ছা বড় ঠাকুরমা আমরা ত ছাড়া কাপড় অনেকগুলো স্নানের ঘরে ফেলে এসেছি, সেগুলো তোমার ঝি কাচবে ত?"

কনকলতা বললেন "কাচবেইত। এই চায়ের বাসন-গুলো ধুয়ে নিক্, তারপরই যাচ্ছে। দেখিস্ বাছা পেয়ালা পিরীচ ভাঙিস নে, তাহলে দাশরথী আর রক্ষে রাখবেনা।"

বাউরি বউ বলল "হেই মা, আমি কখনও কিছু ভেঙেছি তুমাদের?"

কনকলতা বললেন "ভাঙিসনি ত। কিন্তু এগুলো কাঁচের জিনিষ কিনা তাই সাবধান করে দিচ্ছি।"

হেমলতাও উষাদের সঙ্গে উঠতে যাচ্ছিলেন। কনকলতা বললেন "তুই বোসনা, একটু গল্পগুজব করি। আমাকে ত বৌমারা রান্নাঘরে ঢুকতেই দেয়না আজকাল। ওদেরও রান্নার হাত ভাল। বেশী লোক খাওয়ান হলেই যা আমার ডাক পড়ে, ওরা আন্দাজটা ঠিক পায়না। নইলে আমি ত বসে শুয়েই কাটাই এখন।"

হেমলতা মোড়া টেনে বসে বললেন, "তা বেশ কর। করবেইত। প্রথম জীবনটা ত গেল ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত খেটে। এখন একটু জিরিয়ে নাও। বউগুলি ভাল বাপু।"

কনকলতা বললেন "তা সত্যি। ঠিক যেমনটি চেয়ে-ছিলাম। গ্রাম দেশের মেয়ে গ্রামে থাকায় কোনো কষ্ট নেই তাদের। কাজকর্ম্ম ভালই জানে। যা জানতনা তাও চটপট শিখে নিয়েছে। আবার এদিকে হাবাগোবা কুচুটেও নয়। শিক্ষা সহবৎ আছে।"

হেমলতা বললেন "আমারও বড় বউটা ভালই হয়েছে। তার উপর সংসার ফেলে বেশ ঘুরে বেড়ান যায়। রাশভারি আছে, হ্যাবলাও নয়। ছোটটা একটু আলসে কুঁড়ে আছে, পাকা শহুরে ত? তা এবার বাচ্চা হবে, তখন আর কাজ না

করে উপায় থাকবেনা। এই মনুটাই আমার হাত জোড়া করে রেখেছে, নইলে আমারও এখন ছুটি। সখ করে একটু আধটু করি।"

২২

উমাদের আসার পর ছয় সাত দিন আড্ডা দিয়ে আর দাদুর সঙ্গে বেড়িয়েই কেটে গেল। তবে পুজো এসে পড়াতে, এবং কনকলতার বাড়ীতে ছেলেমেয়ে সহ শান্তি আর স্বর্ণ এসে পড়াতে, বেড়াতে যাওয়াটায় ছেদ পড়ল খানিকটা।

গ্রামে পুজো হয় গোটা দুই। একজন ধনী ব্যবসায়ীর ঘরে, তিনি নূতন টাকা করেছেন, ঘটা করে পুজো করেন। আর এক পুজো হয় এ অঞ্চলের এক জমিদার বাড়ীতে। তাঁদের আদি বাসস্থান এখানে, তবে বাস করেন কলকাতায় কিন্তু বৃদ্ধ কর্ত্তাবাবুর নিজের বাল্যকালের বাসভূমির উপর মমতাটা সম্পূর্ণ যায়নি। প্রতিবছর পুজোর সময় এখানে আসেন, মাসখানিক থেকে পুজোটা এখানেই সেরে যান। তাঁর বাড়ীটা একেবারে গ্রামের অপর প্রান্তে হওয়ায়,রামপদর বাড়ীর মেয়েরা অষ্টমী পুজোর দিন ছাড়া সেদিকে গিয়ে উঠতে পারেননা। বাকি ক'টা দিন ষ্টেশনের ধারে সেই ধনী ব্যবসায়ীর পুজামণ্ডপেই তাঁদের ঠাকুর দেখাটা হয়।

ষষ্ঠী পুজার দিন ঢাকে কাঠি পড়তেই গ্রামের চেহারা বদলে যায়। ধীর, স্থির নিস্তরঙ্গ জীবনে যেন দোলা লেগে ঢেউ উঠতে থাকে। বিচিত্র উৎসব সাজে সেজেগুজে মেয়ে আর বাচ্চাকাচ্চার দল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। বেশ খানিকটা রাত না হওয়া পর্যন্ত কেউ ঘরে ঢুকেনা।

এ বাড়ীতেও কে কি পরবে তাই নিয়ে তিন বোনে অনেক আলোচনা হল। ভাল শাড়ী তারা অনেক এনেছে কিন্তু কোনটা কবে পরা হবে। দাদুর দেওয়া শাড়ী ত অবশ্যই মহাষ্টমীর দিন পরা হবে। আর বিজয়াতে পরা হবে মা বাবার দেওয়া শাড়ী। অভয়পদ বছরে ঐ একবার মেয়েদের সৌখীন কাপড় কিনবার টাকা দেয়। অপুও তাতে খানিকটা যোগ করে। হাত খরচের টাকা পাওয়ার কল্যাণে আজকাল তার হাতেও কিছু টাকা সর্ব্বদাই থাকে। দুটো মিলে বেশ দামী শাড়ীই হয়। এটা মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছামত কেনে দোকানে গিয়ে। অভয়পদ আর অপুর ঐ বিষয়ে কোনো নির্দ্দেশ নেই।

এবারে বাজারে খুব তসরের শাড়ীর নাম ডাক। বলা বাহুল্য এগুলি আমাদের সনাতনী সাবেকী লাল কস্তা পাড়ের মোটা তসরের শাড়ী নয়। অনেকগুলি প্রায় বাংলা বেনারসীর মত। কিছু অল্প দামেরও আছে সেগুলির জমির রংটায় মাত্র তসরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। পাড়, আঁচল প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। শাড়ীগুলি দেখতে বেশ ভালই।

হেমলতা বললেন "ওগো মেয়েরা ষষ্ঠীর দিন আজ একখানা করে নূতন শাড়ী পর। এনেছ ক'খানা করে?"

উষা বলল "তা গোটা চারেক নিশ্চয় হবে। দাদুর দেওয়া আর মায়ের দেওয়া দুটো বাদ দিলেও আরো নূতন শাড়ী আছে।"

উমা বলল "নূতন বেছে বেছেই ত আনলাম। এখানে বেশ করে ধাম্‌সাব, তারপর কলকাতায় গিয়ে কাচাব।" রানি বলল "এ বছর আমি সব জড়িয়ে পাঁচখানা শাড়ী কিনেছি। ত এত কুঁড়ে আমি যে দুখানার বেশী পরা হয় নি।"

শেষ অবধি উষা নীলাম্বরী শাড়ী, উমা লাল ডগ্‌ডগে শাড়ী আর রানি বেগুনফুলী রং এর শাড়ী পরল। ছোট মনুও আজ শাড়ী পরেছে। তাকে ফ্রক পরাবারই প্রস্তাব হেমলতা প্রথমে করেছিলেন, কিন্তু শান্তির এক মেয়ে আর কনকলতার বড় নাতনী শাড়ী পরেছে শুনে মনু লম্বা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল, সে আর কিছুতেই উঠ্‌বেনা। মহা মুস্কিল, তার জন্যে শাড়ী মাত্র একখানা এনেছেন হেমলতা সেটা সে বিজয়ার দিন পরবে। উমা সমস্যার সমাধান করে দিল। নিজের একখানা শাড়ী তাকে দুপাট করে পরিয়ে দিল। বল্‌ল "স্কুলে আমরা ছোট বাচ্চাগুলোকে এইরকম করেইত শাড়ী পরাই।"

হেমলতা তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন "বাঃ, দেখাচ্ছে ত বেশ বাচ্ছা পরীর মত। কিন্তু গলাখালি কেন? বড় বোঁচা লাগছে যে? মা বুঝি গলায় গহনা দেয়নি কিছু সঙ্গে?"

উষা বলল "মাকে তুমি বলে এসেছিলে হাতে বালা কি চুড়ি পরিয়ে দিতে, তাই দিয়েছে। হারের কথা ত

বলনি, তাই হার দেয়নি। আমিও অতটা খেয়াল করিনি।"

রৌনি বলল "তুমি আবার সাজসজ্জার বিষয় কিছু খেয়াল করবে, তাহলেই হয়েছে। ছোড়দি কিছু আনিস্‌নি? তোর ত ওদিকে খুব টনটনে জ্ঞান।"

উমা বলল "একটা ছোট চেন অ্যাণ্ড পেণ্ডাণ্ট এনেছি আর একটা মুক্তোর মালা। তা মুক্তোটাই তুই নে।"

রৌনি বলল "আর বড়দি?

উষা বলল "আমার কিছু চাই না, আমি ত ঢের জায়গাই গলায় কিছু না পরেই যাই।"

হেমলতা বললেন "সে হবে না বাপু। তুমি এমনি যাবে কেন? এই নাও আমার গলার হার ছড়া আসবার আগে স্যাক্‌রার দোকানে দিয়ে মাজিয়ে এনেছি, খুব ঝক্‌ঝক্‌ করছে, কিছু বেমানান হবে না।"

উমা ব্যস্ত হয়ে বলল, "ওমা, না, তা কিছুতেই হবে ছোট ঠাকুরমা। ঐ হারটায় তোমায় এমন মানায় যে বলব, ওটা খুললে তোমাকে চেনাই যাবে না। মনে তুমি ওটা পরেই জন্মেছিলে, কর্ণের সহজাত কুণ্ডলের ত। তোমার সব গহনাগুলো এমন মানানসই।"

হেমলতা বললে "জহুরী না হলে কি আর মানিক চেনে? তা হলে এক কাজ কর, শান্তি একরাশ গহনা নেছে, এনে দিদির কাছে বকুনি খাচ্ছে। তার কাছ থেকে ছোট মোটো একটা কিছু গলার গহনা নিয়ে এস, সে শ হয়েই দেবে।"

উষার এতে খুব মত ছিল না, কিন্তু উমা ভোঁ করে দৌড় া কিছু বলবার আগেই। মিনিট দশ পরে ফিরে এল টা সোনার নেকলেশ নিয়ে। বাধ্য হয়ে উষাকেই চেয়ে ভারি গহনা পরতে হল গলায়।

কনকলতার বাড়ী থেকেও ছেলেমেয়ে বউ ঝির এক াট দল এসে হাজির হল, সবাই এক সঙ্গে যাবে। রৌনি ল "শান্তি পিসী কি রকম সুন্দরী হচ্ছে দিন দিন দেখছ ই? তোমার বয়স বাড়ছে না কমছে?" শান্তি ঠোঁট ট বলল "হ্যাঁ ঢিপসী হলেই ত খুব রূপ বাড়ে?"

স্বর্ণ বলল "কোথায় আবার মোটা? ওর ঐ এক বাতিক হয়েছে মোটা, মোটা। ছেলেপিলে হয়েছে, একটু গায়ে-গতরে লাগবেনা? সবাই আমার মত কাঁকলাশ হয়ে থাকবে না কি?"

হেমলতা বললেন "কেউ ঢিপসীও নয়, কাঁকলাশও নয়। যার যেমন ধাত। শান্তির চিরকালই দোহারা গড়ন, স্বর্ণ ছিপছিপে রোগা। যেমন আমি আর দিদি। দিদি চিরকালই রোগাটে আমি ছাতে বছরে বেশ বাড়ন্ত ছিলাম। এখনও তেমনিই আছি।"

উমা বলল "তাই থাক তুমি। তোমার বয়সে হয় সবাই ময়দার বস্তার মত মোটা থলথলে হয়ে যায়, নয় শুকিয়ে পাকিয়ে কুঁজো হয়ে অদ্ভুত হয়ে যায়। তোমার মত সুন্দর ফিগার, ক'টা মানুষের থাকে?"

হেমলতা বললেন "সাধে কি আর তোমাকে জহুরী বলি দিদিমনি? তোমার ছোট ঠাকুরদাদাকে বোলো ত এই কথাগুলো?

রৌনি বলল কেন ছোটদাদু বুঝি তোমাকে মোটা বলেন?

হেমলতা বললেন "বলবার ইচ্ছাটা পুরোপুরি আছে, কিন্তু ছেলেমেয়ে বউ সবাই আমার পক্ষে কাজেই সুবিধে হয় না। রঞ্জন ত মায়ের চেহারার কোনো খারাপ সমালোচনা হলে যে বলবে তাকে আস্ত গিলে খেতে চায়।"

উষা বলল ছোট ঠাকুরমাকে কালো বললে "রঞ্জন পিসী কি রকম মারতে যেত ছোটবেলা।"

রামপদ এই সময় কোথাথেকে বেড়িয়ে ফিরলেন। হেমলতা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি ঠাকুর দেখতে যাবে না দাদা?"

রামপদ বললেন "না ভাই, আজ আর যাব না, আমি সপ্তমীর থেকেই যাই, কাল থেকে তোমাদের সঙ্গেই যাব। সুন্দরী দিদিমনিদের পাহারা দিতে হবে ত? বেশী গহনা টহনা পোরোনা যেন, গ্রামেও এখন চোর ছ্যাঁচড়ের প্রাদুর্ভাব হয়েছে।"

হেমলতা বললেন "গহনা আছে কোথায় যে পরবে? ওদের মা কিছু গুছিয়ে দেয়নি, তারও বোধ হয় চোরের ভয়।"

কনকলতা বললেন "যা দিয়েছে তালই করেছে।

শান্তি সব গহনা নিয়ে এসে আমাকে বিপদেই ফেলেছে। বাড়ীতে লোকজন এখন অনেক বটে, তবু সজাগ ঘুম ত বিশেষ কারো নয়। আমিই একরাতে দুচার বার উঠি।"

হেমলতা গলা নীচু করে জিজ্ঞাসা করলেন "কোথায় রাখলে সব? মাটির দেওয়াল ত খুব নিরাপদ নয়। বলত আমার ট্রাঙ্কে রেখে দি, পাকাবাড়ীতে কেউ হানা দিতে পারে না।"

কনকলতা বললেন "রেখেছি ত মায়ের সেই মস্ত কাঠের সিন্দুকে। তার তালাভাঙা সহজ নয়।"

রামপদ বললেন "এতে ভয়ের কিছু নয়। কেই বা অত খবর জানবে? আর এখন দুবাড়ী ভর্ত্তি লোক, এ দিকে চোখ দিতে কেউ ভরসা করবেনা।"

শান্তি বলল "রেখে আসব কোথায়, বাড়ীতে কি কেউ আছে? শাশুড়ী শুদ্ধ বেরিয়েছেন এবার, ভাইয়ের বাড়ী গেছেন। এই গায়ে যা আছে তা ছাড়া আর কিছুই বারই করবোনা! কেই বা জানবে আমার হাঁড়ির খবর?

স্বর্ণ বলল "আমাদের দুই জায়ের সব কিছু সেই কলকাতার ব্যাঙ্কেই থাকে, গ্রামে আনতে দিতেই চায় না।"

দলটি এবার এগিয়ে চলল। রামপদ নিজের হাতের বড় টর্চটা নাতনীদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন "এইটা নিয়ে যাও। এখন এখানে রাস্তায় আলো দেয় বটে, তবে কলকাতার ইলেকট্রিক আলোয় অভ্যস্ত চোখে তাকে আলো বলেই তোমাদের মনে হবে না।"

ঊষা টর্চটা হাতে নিল। উমা ফিস্‌ফিস্ করে বলল "আমরা ত রূপেই আলো করে যাব, অন্য আলোর দরকার কি?

ঊষা তাড়া দিয়ে বলল "সব তাতে ফাজলামি! তোর কি একটু স্থান, কাল, পাত্রেরও বিবেচনা নেই?"

উমা বলল "আমি বাপু খোলাখুলি মানুষ, কথা বলবার আগে অত হাজারবার বিবেচনা করতে পারি না। স্থান কাল ত অনুকূলই আছে মনে হচ্ছে, পাত্রদের মধ্যে বড় কয়েকজন আছেন বটে. তা তাঁরাও ত ঠাকুরদাদা আর ঠাকুরমা? তাঁদের সামনে ফাজলামি করার লাইসেন্স আছে।"

মীণি বলল, "নাও এখন দুই পণ্ডিতে তর্ক বেধে গেল স্থান, কাল, পাত্র নিয়ে। ওসব রেখে এখন এগিয়ে চল ত।"

সবাই এবারে চলতে আরম্ভ করল। রামপদ গিয়ে তাঁর বারান্দায় বসলেন।

পুজোর মণ্ডপ তখন লোক জমে ভরে উঠেছে। ঢাক ঢোলের শব্দে প্রায় কানে তালা লাগার জোগাড়। প্রতিমার দিকে এখন সকলের তত মনোযোগ নেই, সবাই সবাইকে দেখতেই ব্যস্ত। বছরের এই সব উৎসবের দিনগুলোতেই যা মানুষজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, নইলে কেই বা যাচ্ছে কার হাঁড়ির খবর নিতে? সকলেরই কাজ আছে। পল্লীগ্রামের মানুষ সবাই সবাইকে আজন্ম চেনে, তবু নানাকারণে দেখবার আগ্রহ থাকে। প্রথম, কে কেমন আছে সেটা জানা যায়, দ্বিতীয় কারো ঘরে বউ জামাই নূতন কেউ এসেছে কিনা বা সন্তানাদি কারো ঘরে জন্মেছে কি না সেটার খবর পাওয়া যায়। তৃতীয় কে কেমন শাড়ী জামা কিনেছে তাই দেখে তাদের সাংসারিক অবস্থাও খানিক আন্দাজ করা যায়। বিবাহিতা মেয়েরা বাপের বাড়ী আসতে পেরেছে কিনা তার খোঁজও নেওয়া যায়। আসেপাশে খুব ছোট ছোট অসমৃদ্ধ গ্রামও ঢের আছে, সেখান থেকে এখানে অনেকে পুজো দেখতে আসে তারা শহর অবধি যেতে পারে না। তাদের বেশভূষার দৈন্য আর বিচিত্রতাই তাদের ধরা পড়িয়ে দেয়।

ঊষা উমাদের উপর সকলের চোখ পড়ল কারণ তারা নূতন। এর আগে দুচারদিনের জন্য তারা এসে থাকলেও বেশীর ভাগ লোক তাদের দেখেইনি, কারণ কোনো জনসমাগমের মধ্যে তারা যায়নি। সকলে এসে হেমলতা, কনকলতাকে ছেঁকে ধরল "এই বুঝি নাতনীরা?

হেমলতা বললেন, "হ্যাঁ গো, এইটি বড়, এইটি মেজ, আর ঐটি ছোট। আর এই ইনি আমার ঘাড়ে চেপেছেন, ইনি আমার নাতনী।"

একজন বললেন, "বাবা: কি রং নাতনীদের। হাতের সোনার চুড়ির রং যেন গায়ের রং-এ মিশে গেছে। দেখলে মনে হয় মেমসাহেব।"

তাঁর মেয়ে বলল "ওরা শহরে ত মেমসাহেবের মতই

থাকেন, দাশরথী বলেছে। তাই চেহারাও সেই রকম হয়ে গেছে।"

হেমলতা বললেন "ওসব দাশরথীর বানান গল্প। সে কি কোনোদিন কলকাতা গিয়ে দেখে এসেছে কে কেমন করে থাকে? মেম সাহেবের মত করে থাকলেই যদি মেম সাহেবের মত চেহারা হত, তাহলে ত অনেকেরই কষ্টাবার খুব সহজে ঘুচে যেত।"

কথার স্রোত হঠাৎ অন্যদিকে মোড় নিল। এখন প্রশ্ন হল "মেয়েদের এত বয়স অবধি বিয়ে দাওনি কেন গা? টাকা পয়সা ত অঢেল আছে তোমাদের।"

কনকলতা বললেন "আমাদের পরিবারে অত ছোটতে বিয়ে হয়না, দেখলে না শান্তি আর স্বর্ণর কত বড়টি হয়ে তবে বিয়ে হল?

হেমলতা বললেন "ওরা সব কলেজে পড়ছে, পাশ করে বেরলে তবে বিয়ে হবে?"

একজন বিজ্ঞ গৃহিণী বললেন "এ যেন ঠিক বেটা ছেলেদের মত। তা মেয়েরা পাশ করে কি করবে ভাই? তারা কি জজ ম্যাজিষ্টর হবে? না তাদের রোজগার করে সংসার প্রতিপালন করতে হবে?"

হেমলতা বললেন "তা আজকাল অনেকে করছেও তাই। যা খরচের ধাক্কা এখন, সব সময় একজনের উপার্জ্জনে সংসার চলে কি?"

গৃহিণীটি বললেন "সে সব গরীব মানুষদের ঘরে। তোমরা নিজেরা বড়লোক, বড় মানুষের বাড়ীতেই বিয়ে দেবে, তোমাদের মেয়েদের চাকরি করতে হবে কেন? তারা পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ছাপর খাটে থাকবে।"

রীণি গলা নামিয়ে বলল, "একটা টেপ্ রেকর্ডার আনলে ভাল হত। এঁদের কথাবার্ত্তাগুলো বেশ রেকর্ড করে নেওয়া যেত। কলেজে নিয়ে গিয়ে সবাইকে শোনাতাম।"

মণ্ডপে মহিলা আর ছোট ছেলেপিলেরই ভীড় বেশী। সাজ-পোষাকও কত বিচিত্র রকমের। যাঁদের বাড়ীর পুজো তাঁরা অতি মাত্রায় সুসজ্জিত হয়ে প্রতিমার ধারে কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন বা বসে আছেন। আপাদমস্তক গহনা পরেছেন এত যে মানুষগুলোকে প্রায় দেখা যাচ্ছে না। পরিধানে সব আধুনিক নাইলন্ ও জর্জ্জেটের শাড়ী। মুখ বেশীর ভাগেরই এত রঞ্জিত যে কার কি রকম গায়ের রং তা বোঝা যাচ্ছে না। অধিক বয়স্করা কিছু গম্ভীর হয়ে আছেন, বেছে বেছে দু'চারজনের সঙ্গে কথা বলছেন। অল্প বয়সীর দল অবশ্য হাসাহাসি গল্পগাছা করছে।

উমা বলল "দাদু এদের সাজ দেখলে চটে যাবেন, বলবেন পুজোর মণ্ডপে এরকম পোষাক মানায় না।"

হেমলতা বললেন "তা এখন কি হবে বাপু? এখানে যদি গহনাগুলি না পরে তাহলে লোকে জানবে কি করে যে এদের এত আছে? এ ত আর কলকাতা নয় যে সিনেমায় গিয়ে, পার্টিতে গিয়ে দেখিয়ে আসবে? পাড়াগাঁয়ে পুজোর মণ্ডপই হল এক্জিবিশনের জায়গা, এইখানেই সাত গাঁয়ের লোক জড় হয়।"

রীণি বলল "তা অবশ্য ঠিক, কেউ যদি নাই দেখল তা হলে সাজের কি সার্থকতা? তা সাজের মধ্যেও ত একটু বিচার বিবেচনা থাকা দরকার। ঐ ঢেপসী শরীরে কখনও অত পাতলা শাড়ী পরতে আছে? দেখাচ্ছে যেন একটা তাঁবু।"

উষা বলল "বেশী ফ্যাশন্ মানতে গেলে ওসব বিচার বিবেচনা চলে না। অর্দ্ধেক মানুষই অতি অমানান সাজ করে। সাদাসিধে পোষাকে যাকে বেশ মানুষ মনে হয়, উৎকটতম আধুনিক সাজে তাকে যাত্রার দলের সং বলে ভুল হয়।"

উমা বলল "আধুনিক অথচ মানানসই সাজও ত আছে, সেগুলো বেছে নিলেই ত হয়? তবে কিনা তাতে একটু বুদ্ধি থাকা দরকার।"

হেমলতা বললেন "যেমন তোমার আছে। তোমাকে ত কোনোদিন সং মনে হয় না।"

রীণি বলল "ছোট ঠাকুরমা আর ছোড়দি কি চুক্তি করেছ পরস্পরকে compliment দেবে বলে? ছোড়দিকে সর্ব্বদাই ভাল দেখায় কারণ সে দেখতে ভাল। বুদ্ধি বিবেচনা আমাদের চেয়ে বেশী আছে বলে নয়।"

উষা বলল "আর তোমরা দুজন কি চুক্তি করেছ যে একজন যা বলবে আর একজন ঠিক তার উল্টো কথা বলবে?"

এমন সময় একজন ঝি গোছের স্ত্রীলোক এসে কনকলতাকে বলল "গিন্নিমা একটু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।"

কনকলতা বললেন "চল গো একবার গিন্নীর সঙ্গে দেখা করে আসি। তাঁদেরই নেমন্তন্নে আসা যখন।",

সকলে ভীড় ঠেলে ঠেলে গৃহিনী ঠাকুরাণীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহিলার বয়স হেমলতার মতই হবে, তবে সাজ সজ্জায় মেয়ে ও বউদেরই মত। বিপুল শরীরে ও টাকপড়া মাথায় সাজটা মোটেই মানাচ্ছেনা। কনকলতাকে দেখে তিনি কোনোমতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন কেমন আছেন? এবার দুই মেয়েই এসেছে দেখছি, গতবারে এদের দেখিনি ত?"

কনকলতা বললেন "হ্যাঁ, ওরা গত দু বছর আসতে পারেনি। এই আমার ছোট বোন হেমলতা, আর এরা তিনটি দাদার নাতনী ঊষা, উমা আর স্বাতী।"

ভদ্রমহিলা সকলকে একটা সমবেত নমস্কার করে বললেন "এঁদের গল্প অনেক শুনেছি। পুজোটা হয়ে যাক, তারপর একবার আসবেন আমাদের বাড়ী, বউরা মেয়েরা দেখলে ভারি খুশি হবে। কলকাতা ছেড়ে অনেকদিন এসেছে, সেখানকার লোক দেখলে দুটো কথা কয়ে বাঁচে। এখানে কারো সঙ্গে তেমনভাবে মিশতে পারে না।"

কনকলতা বলল "তা যেতে পারে একদিন। ভাইফোঁটা অবধি ত আছেই।"

বউ মেয়েরাও গুটি গুটি এগিয়ে এসে দাঁড়াল। মাই শুধু কলকাতাবাসিনীদের সঙ্গে কথা বলবে কেন? গৃহিনী একটি পনেরো ষোল বছরের মেয়েকে সামনে টেনে এনে বললেন, এইটি আমার ছোট মেয়ে, এখনও বিয়ে হয়নি। পড়ছিল কলকাতায়, তা কর্তা এখানে বাড়ী করলেন, বড় করে ব্যবসা ফেঁদে বসলেন, কাজেই চলে আসতে হল, শহর ছেড়ে। ওর এখানে ভাল লাগে না, পড়াশুনোও তেমন হচ্ছে না।"

মেয়েটি বেছে বেছে রাণির কাছে গিয়ে দাঁড়াল,জিজ্ঞাসা করল, "আজকাল নাকি কলকাতায় অনেক beauty parlour হয়েছে? গিয়েছেন কখনও সেখানে?"

রাণি মেয়েটিকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বলল "গিয়েছি দু'চারবার। আমাদের বাড়ীর কাছেই একটা আছে।"

খোঁপা বাঁধতে গিয়েছিলেন বুঝি? আপনার যা গোলাপ ফুলের মত গায়ের রং,আর কিছু ত আপনার দরকার নেই।"

রাণি বলল "খোঁপা বাঁধতেও গেছি। আবার শুধু শুধু গল্প করতেও গেছি। ভদ্র-মহিলার সঙ্গে আলাপ আছে। make up করা টরার ব্যবস্থাও আছে শুনি, তবে খোঁজ করিনি।"

মেয়েটির নাম গীতিকা, সে বলল "আমার ভারি ইচ্ছে করে একটাতে যেতে। তা বাবা ত এ জায়গা ছেড়ে নড়বেনই না, কি যে ব্যবসার ভুতে পেয়েছে তাঁকে। আমার এই পাড়াগাঁয়ে একেবারে ভাল লাগে না। একটা সিনেমা শুদ্ধ নেই।"

উমা বলল "বর্দ্ধমান ত কাছেই। আপনাদের ত গাড়ী আছে গিয়ে দেখে এলেই পারেন মধ্যে মধ্যে।"

গৃহিনী বললেন "গাড়ী দুখানা আছে কিন্তু ওদের দিচ্ছে কে। একখানা ত কর্ত্তার, সেটার দিকে ত তাকাবার জো নেই, অন্যটাও ছেলেরা সর্ব্বসময় দখল করে থাকে, মেয়েদের কিছুতেই দেবে না। বলে "তোমাদের অত ধিঙ্গিপনা করে শহরে যেতে হবে না, বাবা ওসব পছন্দ করেন না।"

মেয়েটির হঠাৎ অন্যদিকে ডাক পড়াতে সে চলে গেল।

ঊষা বলল 'এত জায়গা থাকতে খোঁজ পড়ল শুধু beauty parlour-এর।"

উমা বলল "তা খুবই প্রয়োজন আছে ওদের।"

হেমলতা বললেন "ভাল কিছুর চর্চ্চা ত নেই, ঐ সাজগোজটুকুই শিখেছে, তাও ঠিক করে করতে জানেনা, সং সাজে।" বলে "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।"

ক্রমশঃ

বাপুকে যেমন দেখেছি

অরুণা দাশগুপ্তা

২রা অক্টোবর ১৯৬৮ সন থেকে মহাত্মা গান্ধী জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে। এই উৎসব একবৎসর ধরে চলবে, হয়ত বেশীসময় অবধিও চলতে পারে। এই একটা বছর ধরে হবে তাঁর জীবনী আলোচনা, তাঁর জীবন দর্শনের ব্যাখ্যা, ও গান্ধী ভাষণ ও গান্ধী সাহিত্য পাঠ। সেসব বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এলেখার অবতারণা নয়। পারিবারিক জীবনে গান্ধীজি ছিলেন আমাদের 'বাপুজী,' তাঁর বিষয়ে দু'একটি খুঁটিনাটি কথা জানাতে চাই, যা জানবার ইচ্ছায় সাধারণ মানুষের হয় অথচ জানবার সবার সুযোগ হয় না।

জানিনা—হয়ত গতজন্মের কোন পুণ্যফলে গান্ধীজীর সঙ্গ পেয়েছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি—এতবার দেখবার সুযোগ পেয়েছি মহাত্মাকে, এই সৌভাগ্য আমার হয়েছে আমার মামার বাড়ীর জন্যে। আমার দাদামশাই শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর নিজের চাকুরী ছেড়ে সর্বস্ব দান করে গান্ধীমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে নিজের জীবন দেশের জন্য উৎসর্গ করেন। সেই সঙ্গে আমার মামার বাড়ী হয়ে যায় আশ্রম এবং পরে এই "খাদিপ্রতিষ্ঠান সোদপুর আশ্রমে" বাপুজী যতবার এসে থেকেছেন সে সময় আশ্রমে বহু দেশনেতার সমাগম হয়েছে। এঁদের সেবা করবার ও দেখাশোনার ভার থাকত আমাদের ওপরে, ও সেইসূত্রে নিজের লোকের মতন নেতাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে। পূজনীয়া কস্তুরবা গান্ধী, মহাদেব দেশাই, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, জহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, খান আব্দুল গফুর খান, প্রভৃতি নামকরা দেশবরেণ্য নেতাদের সঙ্গে পরিবারের যোগসূত্র সম্পর্ক স্থাপন হয় আমার দাদু ও দিদিমার। আমরাও ছেলেবেলা থেকে এঁদের আপনজন, নিকটতম আত্মীয়ের মতনভাবে জেনেছি।

বাপুজীকে প্রথম দেখেছি কবে? ছোটবেলার স্মৃতিতে যেটা সব চেয়ে আগেই স্মরণে আসে, সেটি হচ্ছে যখন আমার বয়স বছর পাঁচেক হবে! দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ীতে ছিল একটি সভা। সভাটি ছিল বিকেল বেলাতে, সম্ভবতঃ ১৯৬৫ সনে—তারিখটা মনে নেই, তবে সেদিন ছিল সোমবার এবং বাপুর মৌনবার। একথাটি মনে আছে এইজন্যই যে সেদিন বাপু কথা বলেননি এবং তাঁর বক্তব্য সবকিছু এবং ভাষণ লিখে জানিয়েছিলেন। তখনই তাই অবাক হয়ে দাদামশাইকে প্রশ্ন করে জেনেছিলাম যে সোমবার বাপু কথা বলেন না। বাপুজীর সামনে ছিল স্লেট ও পেন্সিল, ও কাগজ ও পেন্সিল। যেকথা তিনি উঠিয়ে ফেলতে চাইতেন তা লিখতেন স্লেটে। সেই সভাতে বাপুর পাশে মঞ্চে আমি ছোট্ট মেয়ে সাদা খদ্দরের ফ্রক পরে বসেছিলাম। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আমার দাদামশাই প্রথমে। আমাকে বাপুজী গালে হাত দিয়ে আদর করছিলেন—দাদু বলেছিলেন এটি আমার নাতনী। হঠাৎ আমার কানে বাপুজীর হাত লাগে এবং উনি ব্যথা পান আমার কানের নিমকাঠিতে। সেই সময় দিন দু-এক আগেই গহনা পরবার সখে আমার কান বেঁধান হয়। বাপু তো ব্যথা পেয়ে বিরক্ত হয়ে কান থেকে নিমকাঠি বের করে দিলেন—অন্য কান থেকেও অবশ্য। সে সময় ব্যাথা আমিও পেলাম। মুখে বলতে পাচ্ছিনা। অথচ অভিমানে দুঃখে, চোখে জল এল যে গহনা পরতে দেরি হবে। বাপু তো বুঝলেন কেন এই নিমকাঠি দেওয়া হয়েছে

কানে। তৎক্ষণাৎ কাগজে লিখে দিলেন আমার বাবার কাছে যার অর্থ হচ্ছে—এমন জিনিষ কেন ব্যবহার করবে যাতে যে ব্যবহার করছে সে ব্যথা পাচ্ছে এবং তার কাছে এলে অন্যলোকেও আঘাত পায় এজিনিষ ক্ষতি করে। অতএব গহণা পরতে হবেনা।" তখন তো বক্তৃতা চলছে। আমার দাদামশাই বক্তৃতা শেষে বাপুর কাছে এলেন, বাপু তাঁকে লিখে দিলেন শ্লেটে যে এই চিঠিটা তোমার জামাইকে দেবে। আর নাত্নীর তো দুঃখ হোলো গহনা পরতে পারবেনা—আর আমার যে হাতে লাগ্লো তার জন্যে তো দুঃখ হলোনা। এই ব্যাপারটা নিয়ে পরে আমাদের বাড়ীতে আলোচনা হয়েছিল যে আমি নাকি আর গান্ধীজীর কাছে যেতে চাইবনা। কিন্তু সত্যই তা নয়তো। এতে নিজের মনে তখন থেকেই এ বোধ হয়েছিল যে সত্য জিনিষ জানাতে বাপু কখনও দ্বিধাবোধ করেন না। যেটা মনে করেন সত্য তখনই তা কাজে পরিণত করেন।

তারপর নানাভাবে-নানাস্থানে তাঁকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি। যখনই বাংলাদেশে এসেছেন, যেখানেই থেকেছেন কোলকাতাতে—শ্রীযুক্ত শরৎ বোসের বাড়ীতে অথবা বিড়লাজীর বাড়ীতে, তখনই দিদিমার সঙ্গে গিয়েছি, প্রণাম করেছি, ও কাছাকাছি থেকেছি। অনুভব করেছি এক অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ-শক্তি আছে যাতে উনি টেনেছেন আমাকে তাঁর কাছে। কখনও সক্রিয়-ভাবে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিনি, তবে গান্ধী-সাহিত্য পড়েছি। হরিজনের বস্তিতে গিয়ে সেবা করতে চেষ্টা করেছি। খদ্দর পরেছি, চরকা কেটেছি আর রাম নামকে জপমন্ত্র করেছি। এ সবই তো বাপুর কাছ থেকে আমার শেখা। যখন মামাবাড়ীর সকলেই প্রায় জেলে থেকেছেন তখন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ভেবেছি এ কেমন বিচার? দেশের সেবা করলে কারাবরণ করতে হবে? কিন্তু পরে বাপুজীর অহিংস উপায়ে দেশ স্বাধীন করবার বিচিত্র প্রয়াসে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছি।

বাপুর তো পোষাকে আড়ম্বর ছিলনা—খালিগায়ে সমস্ত ঋতুতে, প্রচণ্ড শীতে এবং বর্ষাতে, থেকেছেন। ছোট্ট একটি ধুতী পরণে আর পায়ে সাধারণ চপ্পল। তবু কিসের টানে ছোটবয়স থেকে তাঁর কাছে গিয়েছি, তাকিয়ে থেকেছি তাঁর দিকে, সে আজ কেমন করে বোঝাই! তাঁর খাদ্য ছিল অতিসাধারণ—যে খাদ্যে অল্পে পেট ভরে, সহজে যে খাদ্য হজম হয়, অথচ যে খাদ্য পুষ্টিকর, এমন খাদ্যই তিনি গ্রহণ করতেন। যে খাদ্য সহজে কম সময়ে প্রস্তুত করা যায়, সে বিষয়েই দৃষ্টি ছিল তাঁর বেশী। সব রকম সব্জি ফল, দুধ, শাক ইত্যাদি ছিল তাঁর আহারের বস্তু। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব। তিনি ছিলেন অহিংস ও সত্যের পূজারী মনে প্রাণে। বাক্যে ও কার্যে অহিংস থাকাই যে সত্যিকার অহিংসের রূপ তা তিনি নিজের জীবনে দিয়ে প্রমাণ করেছেন বারেবারে। তাঁর প্রতি কথায় প্রতিটি কাজে এবং প্রতিটি আচরণে দেশবাসী জেনেছে সত্যিকার অহিংস কাকে বলা হয়।

সময়ের মূল্য ছিল তাঁর কাছে সাধারণের থেকে অনেক বেশী, সেইজন্য একটি ঘড়ি সর্বদাই থাকত তাঁর ট্যাঁকে ঝোলান, যদিও ঘড়িটি ছিল নিকেলের। এই কারণেই ভোর চারটেতে উঠে প্রার্থনা করা, দিনের সব কাজ সুতো কাটা, বড় বড় প্রবন্ধ লেখা বই পড়া, মিটিং যাওয়া, গভীরভাবে চিন্তা করার, সবকিছুরই সময় তিনি পেতেন। এ ছাড়া সময় মতন খাওয়া বিশ্রাম করবার নিয়ম তিনি চিরদিন মেনে চলেছেন।

প্রায় দুশো বছর বৃটিশরা ভারতকে শাসন ও শোষণ করেছে, কিন্তু যখন দেশ স্বাধীন হলো বিভক্ত হয়ে তখন বাপুর প্রাণে লেগেছিলো কত, কারণ এই বিভক্ত স্বাধীন ভারত তো তাঁর কাম্য ছিল না। তবু ভাবি যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি কয়েকটি বছরও বাপু জীবিত থাকতেন তবে ভারতবর্ষে তিনি যে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, হয়ত বা তা করতে পারতেন। নিজের তাঁর ইচ্ছা ছিল ১০০ বছর বাঁচবার, কিন্তু প্রাণ দিতে হল নির্বোধ এক আততায়ীর গুলিতে।

১৯৪৬ সনে নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হল। গান্ধীজী ছুটে এলেন সব কাজ ফেলে রেখে এই দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে, ভয়াবহ মারামারি ও কাটাকাটি বন্ধ করবার জন্য। সেইসময় নোয়াখালি যাওয়ার আগে দশদিন সোদপুর আশ্রমে বাপু অবস্থান করেন, তখন তাঁকে দেখেছি শেষবারের মতন। তখনকার দিনলিপি ও বাপুজীর ভাষণের বাংলা অনুবাদ করে রাখবার ভার ছিল আমার ওপরে—কাজেই সেই ডায়েরী থেকে তুলে দিচ্ছি শেষ দেখার দিনের ঘটনাবলী।

সোদপুর, ৫ই নভেম্বর, ১৯৪৬ সন……

আজ সবার মন বিষণ্ণ বাপু আজ চলে যাবেন। ভোরে আজ প্রার্থনাতে গান হোল "মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান"। এটি বাপুর প্রিয় গান। দুপুরে দুটোর সময় আজ বাপু গেলেন সুরাবর্দি সাহেবের বাড়ী। সন্ধ্যা-প্রার্থনার আগে ফিরলেন, সঙ্গে এলেন শরৎবাবু ও সত্যরঞ্জন বক্সী। বাপু আজ গম্ভীর, চিন্তামগ্ন। খুব গম্ভীরভাবেই প্রার্থনা শেষে ভাষণ দিলেন। রাত্রে সুরাবর্দি আবার এলেন ও ক্ষমা চাইলেন গতকালের ব্যবহারের জন্য। রেডিওতে শুনলাম বলেছে বাপু আমরণ অনশন করবেন যদি গোলমাল না থামে আমরা বলি, 'বাপু' তুমি মুখের কথাতেই পারবে শান্তি আন্‌তে—তোমার প্রাণের বিনিময়ে নয়। রাত্রে এলেন মিস্ মুরিয়েল লিষ্টার। এঁরই কাছে বাপু লণ্ডনে ছিলেন এবং সঙ্গে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী। সোদপুরে এঁদের থাকবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোলো।

৬, ১১, ৪৬, সোদপুর আশ্রম।

আজ ভোরে সবাই ব্যস্ত—আজই বাপু রওনা হলেন নোয়াখালি সকাল সাড়ে দশটাতে স্পেশাল ট্রেণে। সঙ্গে গেলেন বাপুর আশ্রমের ১জন কর্মী ও খাদি প্রতিষ্ঠানের পনেরো জন। আমার দাদামশাই ও দিদিমাও এখানকার কাজ ফেলে রেখে বাপুর সঙ্গে গেলেন। চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সবাই বাপুকে প্রণাম করলাম। কর্মব্যস্ত সোদপুরের প্রাণ আর নেই।

বাপুকে পেয়েছি কাছে ছোটবেলা থেকে, কিন্তু এই দশদিন বাপুকে নিয়ে রইলাম নিজেদের মধ্যে। এমন করে কাছে পেলাম সেজন্য জানাই ঈশ্বরকে প্রণতি। তুলসী রামায়ণ বাপুর প্রিয় গ্রন্থ—বাপুজী জপ করেন রামকে। আমরা দেখেছি বাপুকে জপ করতে। তুলসী রামায়ণে আছে—

> ভগতহেতু ভগবান প্রভুরাম
> ধরেউ তনুভূপ।
> কিয়ে চরিত্ত পাবণ পরম প্রাকৃত
> নব অনুরূপ॥

অর্থাৎ ভক্তের জন্য ভগবান প্রভু রাম রাজার দেহ ধারণ করেন। সাধারণ মানুষের মতন অতি পবিত্র জীবন যাপন করে গেলেন। আমরা জানি বাপু আমাদের সেই রাম।"

আজ ভাবি সেদিনের সেই দেখা যে শেষ দেখা হবে তা তো কল্পনাতীত ছিল। তিনি বলেছেন সোদপুরে প্রার্থনা শেষে ভাষণে ২রা নভেম্বর ১৯৪৬ সনে যে "আমাকে তো কেউ কাটতে পারেন, তাতে গান্ধীর শরীরই নষ্ট হবে, আত্মার বিনাশ হবে না।" এই অমৃতময় বাণী নিজেরা কানে শুনেছি, তাই কেন বলব তিনি নেই! তাঁকে দেখতে পাই এমনি ভাবে—

> "নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে—
> রয়েছ নয়নে নয়নে;
> হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে,
> রয়েছ হৃদয়ে গোপনে॥"

প্রমথ চৌধুরীর 'ছোটগল্প'

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের শিল্প-রূপ নিয়ে যতরকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে তার সমান প্রচেষ্টা অন্য বিভাগে দেখা যায় না। ফলে ছোট গল্পের প্রসার ও সমৃদ্ধি, তার নিত্য নূতন দিগন্ত আবিষ্কার পাঠককে চমকিত করে তুলেছে। 'কল্লোল-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকগণ অবশ্য এর সূচনায় সুনাম দাবী করতে পারেন। তবে অতিশয় বর্ত্তমানের লেখকগণও যে এই সাফল্য ও সার্থকতার প্রধান স্রষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলে বিচারের নিরপেক্ষতা থাকবে না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ছোট গল্পের বৈভবের কথা চিন্তা করার সময় তার অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে যে, সেই, সুদীর্ঘ ফেলে আসার পথের দিশারী হিসাবে কয়েকজন ব্যক্তি পুরুষ প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হাতে মাথা তুলে আজও দাঁড়িয়ে আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার পরেই সকৃতজ্ঞ চিত্তে যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি সর্ব্ব রসিকজন পরিচিত প্রমথ চৌধুরী—বাংলা সাহিত্য সমাজে 'বীরবল' নামে খ্যাত। বঙ্কিম-চন্দ্রের ছোট গল্পের সার্থকতা কতখানি হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পের আবেদন এযুগে অনুভূত হয় কিনা, রবীন্দ্র-নাথের ছোট গল্প তার বক্তব্যের সীমাকে কতখানি লংঘন করে কেবলমাত্র কাব্যধর্মী সাহিত্যরূপ পরিগ্রহ করেছে এই সব বিতর্কমূলক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা যেমন এযুগের একশ্রেণীর সমালোচকের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি প্রমথ চৌধুরীর ছোট গল্প-সাহিত্য কতখানি সাফল্য অর্জ্জন করেছিল এবং একালের পাঠক-মনে তার কতটা রেখাপাত করে সে বিষয়ে কৌতুহল জাগা আশ্চর্য্য নয়। তবে একথাও সত্য যে, বর্ত্তমান যতই সে স্বকীয়তার বা আত্মশ্রেষ্ঠত্বের দাবী করুক না কেন তা আসলে অতীতেরই অনুস্মৃতি এবং অতীতের ঐতিহ্য বহন করেই সে পুষ্ট ও প্রস্ফুটিত হয়েছে। তাই অতীতকে অস্বীকার করলে সে গরিমামূল্য ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেবে মাত্র। সেইজন্য একালের নিরলস পাঠক-মাত্রেরই কর্ত্তব্য বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় সাধন করা এবং কিছুটা বিশ্লেষণধর্মী ও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে তার মূল্যায়ন করা। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তক আখ্যা দিলে যেমন ভুল হয় না, তেমনি প্রথম চৌধুরীকে ছোট গল্পে নব্যরূপ স্রষ্টা বললে অতিশয়োক্তি হবে না। এক সময়ে প্রভাতকুমারের গল্প বাঙালী পাঠকের রসসংবেদনাকে অনেকাংশে তৃপ্ত করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত ক্ষণিক চমৎকারীত্ব বৈচিত্র্যের অভাবে (Want of modulation) গভীরতর চেতনাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সেই সময় জাতির হৃদয়-বেদনাকে শরৎচন্দ্র সহানুভূতিশীল মন ও সহধর্ম্মীর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রত্যক্ষ করে তার দুঃখ ভারাক্রান্ত আকৃতি ও নিগূঢ় উৎকণ্ঠাকে দূর করলেন।

…দরদী শিল্পীর মত অতিশয় বাস্তবনিষ্ঠ ভঙ্গীতে দুঃখের ধ্যান করলেও শরৎচন্দ্র তার নিবৃত্তির কোন উপায় নির্দ্দেশ করেন নি। ফলে জাতির জীবনে পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এবং অতৃপ্তির উৎকণ্ঠা যা সাময়িকভাবে প্রশমিত হয়েছিল তা আবার মনকে পীড়িত করে তুলল। সাহিত্যের অবস্থা যখন এইরকম বাস্তবের পিছনে ছুটে তার নাগাল না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সেই সময় একজন শক্তিমান লেখক গতানুগতিকতা থেকে

আমাদের মনকে ঘুরিয়ে দেবার সংকল্প নিয়ে সামনে এসে দেখা দিলেন। সুদীর্ঘকালের অভ্যাসের ফলে জীবনের যেসমস্ত বৈষম্য ও অসঙ্গতি সম্বন্ধে আমাদের মন অসাড় অচেতন হয়ে পড়েছে, আমাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার মধ্যে সে সমস্ত জীর্ণ সংস্কার এবং ভ্রান্ত ধারণা অখণ্ডনীয় সত্যের মত বদ্ধমূল হয়ে সমগ্র দৃষ্টিশক্তিকে একরকম মোহে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, প্রমথ চৌধুরী তাঁর বুদ্ধির শাণিত তরবারীর একটিমাত্র আঘাতে অথবা ব্যঙ্গ ও শ্লেষের খোঁচায় কিম্বা তির্য্যক হাসির একটি ঝলকে তাকে রূপান্তরিত করে সমগ্র জীবনের বিচারধারাকে পরিবর্ত্তন করে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানচক্ষুকেও উন্মীলিত করলেন।

এই উক্তির দৃষ্টান্ত যেমন তাঁর প্রবন্ধ, আলোচনা ও রসরচনাতে প্রকট তেমনি ছোট গল্পেও তা সুস্পষ্ট। এখন কথা উঠবে যে প্রথম চৌধুরীর ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি যা তাঁর পাঠকচিত্তকে নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট করে। অতি সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হোলে বলতে হবে যে প্রমথ চৌধুরীর ছোট গল্প গতানুগতিক ভাবপ্রবণতা বা রোমাঞ্চধর্মীতাকে পরিহাস করে সৃজনিশক্তির আবেশময়তার সঙ্গে সমালোচনা-শক্তির অভ্রান্ত বিচার বুদ্ধির এক প্রকার হাস্যকর সমাবেশ ঘটিয়েছে। বাংলা স হিত্যে এই প্রচেষ্টা ও অসাধ্য সাধন ইতিপূর্ব্বে আর কেউই প্রদর্শন করতে সাহসী হন নি। তিনি যে পথের পথিকৃৎ সেই পথের তিনিই প্রথম পথিক এবং বোধহয় এ পর্য্যন্ত তিনি একমাত্র পথিক—দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ ঐ পথে পদক্ষেপ করেন নি। যে যুগে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বগ্রাসী প্রতিভা ভাস্বরদীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল সেই কালে তাঁকে অতিক্রম করে পথ চলা যে বিপদসঙ্কুল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী সেই দুঃসাহসিক যাত্রার সূচনা করেছিলেন এবং তাঁর অভিযান সর্ব্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর এই আশ্চর্য্যমূলক সৃজনীশক্তির মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক যুগের মানুষ হয়ে ভিন্নলোকের অধিবাসী ছিলেন। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষার ধারায় লালিত বর্দ্ধিত হলেও তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর জীব। বাংলা সাহিত্যে অষ্টাদশ শতকে ভারতচন্দ্র নামে এক বুদ্ধি জীবি কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর কবিকর্ম্মে নয়-রসের সমাবেশ ঘটালেও হাস্যরস সৃষ্টিতে কিছু আধিক্য প্রদর্শন করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন এই ভারতচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁর হাস্যরসের প্রধানতম সমর্থক। অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের সহজ পরিহাস রসিকতার রং অলক্ষিতে প্রমথ চৌধুরীর সৃষ্টিধর্ম্মী মনকে স্পর্শ করে তাকে অনুরঞ্জিত করেছে। তথাপি একথা মনে করলে ভুল হবে যে প্রমথ চৌধুরী কেবলমাত্র ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করে তাঁর রসরসিকতাকে নিজের করে নিয়েছিলেন। বস্তুতঃ প্রমথ চৌধুরীর সব সৃষ্টিকর্ম্মের মূলে যে বৈশিষ্ট্যটি প্রকট হয়ে উঠেছে তা হোল তাঁর হাস্যপরিহাস, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ হেঁজাত্য রীতির কথন (Pun), শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এই সব আঙ্গিক বা গঠনভঙ্গী ও প্রকরণব্যাপক প্রয়োগের পূর্ব্বে তিনি পরীক্ষা করে নিয়েছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী বললে ভাবের যে বিশিষ্ট রূপকে বোঝায় তা হোল হৃদয়াবেগনির্মুক্ত বুদ্ধির স্বচ্ছ-শুভ্র এক স্ফটিকের মাধ্যমে জীবনকে দর্শন করা। এযুগের বিশিষ্ট লেখকগণের মধ্যে ভল্টেয়ার, মোলিয়ের, সুইফট ও পোপের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। প্রমথ চৌধুরীর ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় সমান অধিকার থাকায় এই দুই সাহিত্যের ক্লাসিক লেখকগণের রচনায় অনুপ্রেরণা লাভ করে তিনি একই সঙ্গে মুগ্ধ ও প্রবুদ্ধ হন এবং এরই ফলে তিনি বাংলাভাষায় ছোট গল্পের এক নূতন পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বাঙালী সমাজ ও সংসারের অধঃপতনের মূলে যে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, আলস্য, হিংসা, ভেদবুদ্ধি সাক্ষাৎভাবে দায়ী তাকে প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করে তার জীর্ণতার প্রতি কেবলমাত্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন নি, তির্য্যক হাস্যরসে ও বক্রোক্তির কুঠারাঘাতে তাকে ছেদন করে দিয়েছেন। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, সব ত্রুটি-

বিচ্যুতি সত্ত্বেও বাঙালী জাতির আত্মিক শক্তিতে তিনি বিশ্বাস হারান নি। তাই তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বিবৃত করতে গিয়ে তাদের অতিরেক প্রদর্শন করেন নি বা কোন ক্ষেত্রেই সত্যের অপলাপ ঘটান নি। এই প্রসঙ্গে একজন খ্যাতনামা সমালোচকের উক্তি স্মরণীয়—"দুর্দশার সব তথ্যই প্রমথবাবু জানেন। বাঙালী-মনের ক্ষুদ্র বিপ্লবাবিত কল্পনাপ্রবণতা এবং বাঙালী-জীবনের বিশ্রী অনশন অপমানের দৈনিক ইতিবৃত্ত জেনেও তিনি বাঙলার প্রাণকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর গল্পে খাঁটি বাংলা মরেনি, নতুন শক্তি গড়েছে পুরোনো ভাষায়, পুরোনো কলেজার আভিজাত্য বজায় রেখে।"

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির কোনটাই সুসংবদ্ধ কাহিনীর আকারে আত্মপ্রকাশ করেনি। এগুলির অধিকাংশ দ্বিতীয় ব্যক্তির মাধ্যমে শ্রুত বা অপর কারও অভিজ্ঞতালব্ধ। লেখক এখানে ঘোষাল, নীললোহিত প্রমুখ ব্যক্তি চরিত্রের আড়ালে ঢেকে রেখেছেন। তাদের বর্ণিত বিবরণ বা কাহিনী কখনও বৈঠক আলোচনার ভেতর দিয়ে অথবা একান্তে শোনা তাদের জীবনের বিচিত্র ঘটনার উদ্ঘাটনে লেখকের মানসলোকে ধরা দিয়েছে এবং তিনি যেন সেগুলি অতিশয় নিখুঁত ও যথাযথভাবে রূপায়িত করেছেন। তাঁর যে কোনও গল্পের প্রতি লক্ষ্য করলে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হবে।

তাঁর ছোট গল্পের মধ্যে 'চারইয়ারী কথা' সবচেয়ে প্রসিদ্ধ। আপাতঃদৃষ্টিতে এই কাহিনী চারটি ভিন্ন গল্পের সমষ্টি হলেও আসলে এটিকে একটি খণ্ডোপন্যাস বলা চলে। এর কাহিনীমূলে আছে চারটি বন্ধুর স্ব স্ব প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা। মেঘমেদুর বর্ষার এক রাত্রে রোমান্টিক আবহাওয়ায় তাদের কল্পনা বল্গাহীন অশ্বের মত ছুটে চলেছে কোন অতীত দিনে। তারা মানসচক্ষে তাদের Eternal feminine বা অনন্ত প্রেয়সীকে প্রত্যক্ষ করছে। 'চারইয়ারী কথা'র প্রথম গল্প সেনের কথায় এমন এক আক্ষেপ দেখা গেছে যার মায়াতে পৃথিবী প্রাণে ভরপুর হয়ে ওঠে, যা মৃত তা জীবন্ত হয় এবং যা মিথ্যা তা সত্যে পরিণত হয়। এই প্রেমানুভূতির বর্ণনা করতে গিয়ে সে বলেছে—'বিশ্বের সূক্ষ্ম শরীর সেদিন এক মুহূর্তের জন্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, এ জড়-জগৎ সেই মুহূর্তে প্রাণময় হয়ে উঠেছিল, আমি সেদিন ইথারের স্পন্দন চর্মচক্ষে দেখেছি।...আমার দেহ মন মিলেমিশে এক হয়ে একটি মূর্তিমতী বাসনার আকার ধারণ করেছিল এবং সে হচ্ছে ভালবাসবার ও ভালবাসা পাবার বাসনা। দ্বিতীয় গল্প 'সতীশের কথায়' জানা যায় যে তার সবল শরীরের মধ্যে একটা কোমল ও দুর্বল মন আছে। তাই সে নারীর দেহ ও মনের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। তবু তার Don Juan হবার আকাঙ্খা কখনও জাগেনি। সে প্রকৃতপক্ষে একজন আত্ম সচেতন পুরুষ এবং সামাজিক অনুশাসনকে লংঘন করার দুঃসাহস তার নেই। তাই তার এই উক্তি-"দুনিয়ার যত সুন্দরী আজও রীতিনীতির কাচের আলমারির ভিতর পোরা রয়েছে অর্থাৎ তাদের দেখা যায়—ছোঁয়া যায় না। আমি যে ইহজীবনে একখানা কাচও ভাঙি নি তার কারণ ও বস্তু ভাঙলে বড় আওয়াজ হয়—তার ঝনঝনানি পাড়া মাথায় করে তোলে। দ্বিতীয়; তাতে হাত-পা কাটবারও ভয় আছে"—ইত্যাদি তার চরিত্রের মহত্তর কালচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তৃতীয় গল্প 'সোমনাথের কথায়' একটি দার্শনিকোচিত ঔদাসীন্য বর্তমান। তার বিশ্বাস স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসার পুরো অর্থ মানুষের দেহের ভিতরও পাওয়া যায় না, মনের ভিতরও পাওয়া যায় না। কেননা ওর মূলে যা আছে সেটি হচ্ছে একটি দুর্ভেদ্য রহস্য। অর্থাৎ ভালোবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke। এই গল্পে জর্জ, রিনী ও সোমনাথের Triangular Drama সত্যই উপভোগ্য।

চতুর্থ গল্প 'আমার কথায়' এমন এক নারী-চরিত্রের দর্শন লাভ হয় যার প্রকৃতি সত্যই মনোমুগ্ধকর। দাসী আনির প্রভুর প্রতি গোপন প্রেমসঞ্চার কাহিনী এই অংশের উপজীব্য। তাই ইহলোকের নানা বিধিনিষেধ তার প্রেমিকের সঙ্গে মিলনের আকাজ্ক্ষা পূর্ণ না করলেও

পরলোকে গমন করে সে যে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে নির্ভয়ে অসঙ্কোচে ভাব-বিনিময় করতে পেরেছে এটাই তার পরম সান্ত্বনা।

প্রকৃতপক্ষে 'চারইয়ারী কথা'য় প্রথম চৌধুরী প্রত্যেক গল্পেই প্রেমের আদর্শ ভাবমূলক আবেশের বিরুদ্ধে হাস্যরসের অভিযান, প্রেমের অমৃতকুণ্ডে বিদ্রূপের অম্লরস নিক্ষেপ করেছেন।

প্রমথবাবুর নীললোহিত পর্যায়ভুক্ত গল্পগুলি যেমন সরসতাপূর্ণ তেমনি স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যে অনবদ্য। এখানে লেখক যে রসচাতুর্য্য প্রদর্শন করেছেন তাতে অতি কথন থাকা সত্বেও কোথাও কৌতুক রসের আবেশ নষ্ট হয় নি। লেখকের সৃষ্ট নীললোহিত একজন আদর্শ গল্পকার। তার সম্বন্ধে লেখক বলেছেন-'সুনিপুণ চিত্রকরের তুলির প্রতি আঁচড় যেমন চিত্রকে রেখার পর রেখায় ফুটিয়ে তোলে, নীললোহিতও কথার পর কথায় তাঁর গল্প তেমনি ফুটিয়ে তুলতেন; এই সকল গল্পের নায়ক সে নিজে। প্রথম গল্প নীললোহিতের স্বদেশী ডাকাতির বৃত্তান্ত, দ্বিতীয় গল্প নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র লীলায় তার সুরাট কংগ্রেসে গমন এবং অদ্ভুত ঘটনাচক্রে পাঞ্জাবী রমণীর বেশে কংগ্রেসের স্ত্রীলোকের গ্যালারী থেকে সভাপতির পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোকের উদ্দেশে নাগরা নিক্ষেপ করলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট পাদুকা স্বয়ং সভাপতির পদতলে গিয়ে আঘাতের কাহিনী সকল পাঠককেই আকৃষ্ট করে।

'ফরমায়েসী গল্প' প্রমথবাবুর মৌলিকত্বের সাক্ষ্য দেয়। এই গল্পে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'কে কেন্দ্র করে তার রোমান্টিক প্রণয়-কাহিনী তথাকথিত বাস্তববাদী ও প্রগতিশীলদের হাতে কেমন কৌতুক কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় তা স্পষ্ট অঙ্গুলিনির্দেশ করে দেখিয়েছেন। উপরোক্ত গল্পগুলির Form বা বাঁধুনিতে অসঙ্গতি থাকলেও অসাহিত্যকর্ম হিসেবে তাদের তুলনা মেলে না। ইংরাজী সাহিত্যে চসার তাঁর বিখ্যাত গল্প 'Canterbury Tales' এর গল্প-গুলি যে-রীতিতে রচনা করেছিলেন বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী সেই রীতির আমদানী করেছেন। 'আহুতি' নামক গ্রন্থের গল্পগুলিতে বাঙালীর মর্য্যাদা ও শক্ত-হাড়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 'বড় বাবুর বড়দিন' গল্পে থিয়েটারে তাঁর লাঞ্ছনা এবং তাঁর অভিমানীনী স্ত্রীর সঙ্গে অকারণ বিরহ বিচ্ছেদ, আত্মীয় স্বজনের কাছে গঞ্জনা এবং পরিশেষে তাঁর সখেদোক্তি—"পৃথিবীতে ভালোলোকেরই যত মন্দ হয়,এই হচ্ছে ভগবানের বিচার" গল্পটিকে একটি সুন্দর প্রহসনে সৃষ্টি করেছে। 'ঘল্প-গল্প' ও 'প্রগতিরহস্য'তে সমাজের মর্মে শ্লেষাত্মক হাল্কা কথার ছুরি বিঁধিয়ে দেয়। কিন্তু এর কোথাও ব্যক্তিগত বা দলগত ঝাঁজ নেই। এটি আসলে উদ্ভোগল্প নয়, বর্তমান প্রগতির আংশিক ইতিহাস। 'যখ' গল্পটি ধন নিয়ে আধুনিক রূপকথা। এতে ছোট ছেলের ঘ্যান-ঘ্যানানি যেমন থামাবে তেমনি বয়স্ক রসিকেরা দেখবেন বিদ্যুতের ইস্পাতী ঝলক। এখানে গল্পের আকারে ধনের প্রতীক নিয়ে মানুষের জটিলতা ধরা দিয়েছে। 'পুতুলের বিবাহ বিভ্রাট' এমন কাহিনী যেখানে পুতুলের বিবাহ ব্যাপারে গিন্নীমার জিদ কেবল মাটি কিম্বা নেকড়ার পুতুলের ধাড়মটকেই কাত্ত হয় না, তা রক্ত-মাংসের পুতুলদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করে তোলে।

প্রমথ চৌধুরীর ছোট গল্পের মধ্যে 'বীনাবাঈ' একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এটিও ঘোষালের কাছে শোনা গল্প। এখানে একজন বাঙালী মেয়ের Tragic Waste-কে লেখক অনবদ্যভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন। বাঙলাদেশ থেকে বহু দূরে বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত রাজ্য সুরপুরের রাজার সঙ্গীতশালায় উপবিষ্টা বীনাবাঈয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি যে অসাধারণ কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং সৌন্দর্য্যের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তা এক-মাত্র প্রমথ চৌধুরীর ন্যায় প্রথম শ্রেণীর স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব। সেই বর্ণনার অংশ বিশেষ এই: 'বীনা সেন স্বয়ং সরস্বতী'। তন্বী, গৌরী, বিগত যৌবনা, শ্বেত বসনা। আর তাঁর কোলে একটি বীণা। এ সরস্বতী পাথরে কোঁদা নয়, রক্ত মাংসে গড়া। আমার মনে হোল এ বাঙালী রমণী। কেননা তাঁর মুখে চোখে

'নিমক' ছিল, সংস্কৃতে যাকে বলে লাবণ্য। কোন বৈষ্ণব কবি এঁর সাক্ষাৎ পেলে বলতেন—"ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়"; যে কথা কোনও হিন্দুস্থানী সুন্দরীর সম্বন্ধে বলা যায় না। পাছে লোকে 'বীণাবাঈ' এর নাম শুনে ভুল করে তার জন্ম লেখক একথাও বলে দিয়েছেন বীণাবাঈজী নয়; যে অর্থে মীরাবাঈ, বাঈ তিনিও সেই অর্থে বাঈ।

বীণা একজন উচ্চ-শিক্ষিতা, সুরুচিসম্পন্না, হৃদয়বতী নারী। অদৃষ্টের অভিশাপ তার ফুলের মত নিষ্পাপ চরিত্রে কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছে; কিন্তু তবু পাপ তাকে পঙ্কে নিমগ্ন করতে পারেনি। তাই অসংকোচে সে এমন কথা বলেছে 'জাতি ধর্মে আমার ভক্তিও নেই, ভয় ও নেই।' আসলে সে রক্তমাংসে গড়া নারী। তাই তার এই স্বীকারোক্তি—'জীবন্ত রক্তমাংসেরও রুচি অরুচি আছে। প্রবৃত্তি যেমন স্বাভাবিক, অপ্রবৃত্তিও তেমনি স্বাভাবিক। প্রবৃত্তি অবশ্য দমন করা যায়, কিন্তু অপ্রবৃত্তি দমন করবার যদি কোন সদুপায় থাকে তা আমার জানা নেই'। তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে বাড়িয়ে দেয়।

প্রমথ চৌধুরী কবি হলেও তাঁর গল্পে কাব্যধর্মকে কখনও প্রাধান্য দেন নি। কিন্তু এই গল্পে তাঁর সেই স্বাভাবিক রীতির একটি ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। বীণার জীবনের ব্যর্থতার কারণ বর্ণনায় একটি করুণ সুর কাব্য-রসমণ্ডিত হয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। সে অভিভূত হয়ে যখন বলেছে, "আমার জীবন বিশৃঙ্খল কেন জান? আমি কারও দাসী হতে পারি নি অর্থাৎ কাউকে ভাল বাসতে পারি নি। দাদাকে অবশ্য প্রাণের চাইতেও ভালবাসি—তাঁর সঙ্গে আমি অভিন্নহৃদয়। কিন্তু এ ভালবাসা নৈসর্গিক ও অশরীরী......আর মাষ্টার মশাই? তাঁর নীরস স্বভাবের ছোঁয়াচ লেগে আমি পাষাণ হয়ে গিয়েছিলুম। তারপর একটি পথচলতি লোকের সুকুমার স্পর্শেই অহল্যা আবার মানবী হয়ে উঠল। আমার শুষ্ক হৃদয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ফুল ফুটল। কেবলমাত্র যুথী, জাঁতি, মল্লিকা, মালতী নয় অর্থাৎ যেসব কুসুম পূজার লাগে তাই নয়, সেই সঙ্গে নব বসন্তের অগ্নিবর্ণ কিংশুক, হৃদয়ের অন্তঃপুরে আযৌবন অবরুদ্ধ নবজীবনের সদ্যমুক্ত কামনার জবাকুসুম।"

বীণাবাঈ চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তার জবানীতে লেখক সঙ্গীতসাধনার কয়েকটি রহস্যের কথার অবতারণা করেছেন। যেমন বীণাবাঈ বলছে; "দেখুন হাত যন্ত্র বাজায় না, বাজায় প্রাণ; গলা গান গায় না, গায় মন, আর প্রাণ উদ্বুদ্ধ করা বা মনকে প্রলুব্ধ করার নামই সাধনা। একের সাধনায় অপরে সিদ্ধ হতে পারে না, প্রত্যেককেই নিজেকে সাধনা করতে হয়।"

বীণা আরও বলেছে: যা গানের প্রাণ তা হচ্ছে অতীন্দ্রিয় সুর। আর এই অতীন্দ্রিয় সুরের সন্ধান যিনি জানেন, তিনি যথার্থ আর্টিষ্ট।......পৃথিবীতে যে বস্তু আনন্দঘন তা স্বপ্রকাশ। ভাষায় এর ব্যাখ্যা চলে না। সঙ্গীতের একমাত্র ভাষা হচ্ছে সুর—কথা নয়। বীণাবাঈ'তে প্রমথ চৌধুরীর স্বভাবসিদ্ধ এপিগ্রাম বা বিদ্রুপাত্মক সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লক্ষণীয়। এই গল্পের এক প্রসঙ্গে লেখক ঘোষালের মুখ দিয়ে বলেছেন—"নীচে অন্ধকার, উপরে আলেয়ার আলো; নীচে রোগীলোক উপরে নাচ গান। এরি নাম সুবিন্যস্ত সমাজ?"

'একটি সাদা গল্পতে' ভাগ্যবিড়ম্বিত শ্যামলালের কন্যা শ্রীমতীর জীবনের পরিণতি দেখান হয়েছে। লেখক এখানে বিবাহে পণ গ্রহণ, মৃতদার ক্ষেত্রপতির প্রৌঢ় বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ ইত্যাদি প্রথার প্রতি কটাক্ষ হেনেছেন এবং এগুলিকে সত্যকার জীবনের অভিনয় বলেছেন।

'ট্রাজেডীর সূত্রপাতে' এ প্রৌঢ় নৃপেন বাবুর অতীত জীবনের এক অনুরাগের স্মৃতি (ছাত্রীর প্রতি প্রেমাকর্ষণ) তাঁকে এমনি চিন্তান্বিত করে রেখেছে যে পাছে তাঁর একমাত্র পুত্রের জীবনে এই অঘটন ঘটে সেই আশঙ্কায় সবচেয়ে গৌরবের দিনে অর্থাৎ যেদিন তিনি শুনলেন যে তাঁর পুত্র পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে সেদিনও তিনি মনে মনে খুশী হতে পারলেন না। বলা বাহুল্য প্রমথ চৌধুরী গল্পের এই কালোমেঘকে একটি মাত্র

পরিহাসের ঝড়ে উড়িয়ে দিয়েছেন যেখানে নৃপেনবাবুর বন্ধু তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন—"যদি কখনও সে অস্থানে প্রেমে পড়ে, তাহলে তুমিও seriously ill হয়ে প'ড়ো। তাহলেই তার ফাঁড়া কেটে যাবে।"

'রামশ্যাম' গল্পে দেশের নেতৃবর্গের মতদ্বৈধতা ও পরস্পরবিরোধী আবরণকে বিদ্রূপ করে বলেছেন, "বাংলার রিফরমের কথাটা চাপা পড়ে গেল, তার পরিবর্তে রাম বড় না শ্যাম বড়-এইটিই হয়ে উঠল আসল মীমাংসার বিষয়।

প্রথম চৌধুরীর ছোট গল্প সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করার আগে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরীর গল্প যাঁরা বিচারকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ করবেন তাঁদের সকলের নিকট না হলেও অধিকাংশের নিকট এর প্রবন্ধাত্মক গঠনরীতি সহজেই অনুভূত হবে। অর্থাৎ এই গল্পগুলির কাহিনীতে বাঁধুনি বা form নেই। ইংরাজী সাহিত্যের বিখ্যাত লেখক জি, কে, চেষ্টারটনের মত প্রমথচৌধুরীর গল্প স্বল্পায়তন কাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করেছে, যার মূল অর্থ কেবল বুদ্ধিগ্রাহ্য হৃদয়ানুভূতি-সাপেক্ষ নয়। একথা হয়তো সত্য যে বুদ্ধিবৃত্তি সম্ভূত হওয়ার দরুন প্রমথবাবুর গল্পগুলি সাধারণ পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয় নি, তবুও একথা ভুললে চলবেনা যে ভাষার প্রসাদগুণে, বিষয়বস্তুর পরিচ্ছন্ন প্রকাশে এবং অনন্যসাধারণ বাক্‌বৈদগ্ধ্যের অভিব্যক্তিতে সেগুলি ভবিষ্যৎ কালেও রসিকজনের মন হরণ করবে। ফরাসী ভাষায় একটি কথা আছে যার ইংরাজী অনুবাদটি বহু উচ্চারিত ও অতি পরিচিত প্রবচন 'style is the man' অর্থাৎ ষ্টাইল বলতে লেখকের রচনা-নৈপুণ্য এবং ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনার সুসমঞ্জস রূপকেই বুঝায়। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি উক্তি স্মরণ-যোগ্য : "সাহিত্যিকের বড় পরিচয় তাঁর সাহিত্যে। এবং এমন সাহিত্যিক অনেক আছেন সেই পরিচয় যাঁদের একমাত্র পরিচয়। তাঁদের অন্য পরিচয়ে মন আকৃষ্ট কি প্রসন্ন হয় না। মনের যে বিশেষ গড়নে, ভাব ও চিন্তার সঙ্কর প্রকাশের আবেগে সাহিত্যের রূপ নেয় সে মনের ছাপ এঁদের জীবনে আর কোথাও গভীর নয়—কথায়-কাজে-চরিত্রে। তাঁদের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির যোগ অতি নিগূঢ়, দৃষ্টির অগোচর, আবার এমন সাহিত্যিক আছেন মনের যে আলোতে তাঁদের সাহিত্যের প্রকাশ তার রঙে তাঁদের চরিত্রের নানাদিক রঙীন। তাঁদের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিত্বের সমস্ত পরিচয় মাত্র চোখে পড়ে। প্রমথচৌধুরী ছিলেন এই শেষের শ্রেণীর সাহিত্যিক।"

পরিশেষে প্রমথ চৌধুরীর ছোট গল্প সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, যে-নৈর্ব্যক্তিক কবিকল্পনা এবং জগৎও জীবনের ভাবগম্ভীর সত্যদর্শন অথবা সর্ব্বাশ্রয়ী রসদৃষ্টি ও ভাবকল্পনা রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্পে বর্ত্তমান অথবা ফরাসী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মোপাসাঁ, মেরিমী, বালজাক্, জোলা প্রভৃতির গল্পে যে সমগ্রদৃষ্টি ও সুডৌল রূপ ও প্রকৃতিপন্থার (Naturalism) নিদর্শন সার্থকরূপে পরিস্ফুট তার প্রমাণ এখানে (প্রমথ চৌধুরীর গল্পে) না থাকলেও ঐ গল্পগুলি বিষয়বস্তুর স্বকীয়তায় এবং প্রাঞ্জলতা, স্বচ্ছতা, বুদ্ধিদীপ্ত-তীক্ষ্ণতা ও ভাবসাম্যের ক্লাসিক গুণাবলীর অম্লান সৌন্দর্য্যে অনাগতযুগের বিজ্ঞ-জনমণ্ডলীর রসচিত্তকে যে পরিতৃপ্ত করবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং আজ লেখকের আবির্ভাবের শতবর্ষ অন্তে সে প্রমাণ দিবালোকের মত উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

গান্ধীজির সত্যাগ্রহ

কানাইলাল দত্ত

গান্ধী মহাজীবনের প্রকৃষ্টতম শিক্ষা কি এক কথায় বল। এই রকম কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমি নির্দ্বিধায় বলিব 'সত্যাগ্রহ' ও 'অহিংসা। অহিংসা-সত্য-অস্তেয়ের বাণী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ হইতে ইতিপূর্ব্বে উত্থিত হইয়া দেশ দেশান্তরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক কালের ভগবান বুদ্ধদেব, স্মরণকালের শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত নামগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু যে সত্যাগ্রহকে আমরা এখন জানি তাহা গান্ধীজির একান্ত নিজস্ব অবদান।

আজকাল একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি গান্ধী-ভাষ্যকার বলিতেছেন সত্যাগ্রহ প্রথম প্রবর্ত্তনের গৌরব গান্ধিজির নহে! প্রখ্যাত গঠনকর্মী ও ভূদান নেতা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী এই কথা শুনিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন একমাত্র জৈন ধর্মগ্রন্থে সত্যাগ্রহ বিষয়ে কিছু আছে। কিন্তু গান্ধীজির পূর্বে পৃথিবীতে আর কেহ সজ্ঞানে সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ইহা প্রয়োগ করেন নাই। তত্ত্ব হিসাবে সত্যাগ্রহ নূতন কিছু নহে একথা ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পিয়ারে লালজির Mahatma Gandhi—the last phase গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। পাতঞ্জলির রচনায় তিনি ইহার সংজ্ঞা পাইয়াছেন। তথাপি তিনি ঐ ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারীর ন্যায় লিখিয়াছেন—গান্ধীজি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য সত্যাগ্রহের প্রয়োগ করেন। যুগের উপযোগী করিয়া প্রয়োগ কৌশল উদ্ভাবন করেন এবং এই পদ্ধতিতে স্বীয় জীবনযাপন করিয়াছেন, সাধারণ মানুষকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তত্ত্ব অপেক্ষা তাহার প্রয়োগ বিচার করিতে হইবে। কারণ বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ ভিন্ন তত্ত্বের কোন মূল্য নাই। হেনরি ডেভিড থোরোর কথাও আলোচনা প্রসঙ্গে উঠিয়াছিল। থোরোর Civil Disobdience প্রবন্ধটি দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিবার পর মহাত্মা গান্ধীর গোচরে আসে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

নারদের নাকি বাহন ছিল ঢেঁকি। চন্দ্রলোক বা গ্রহান্তরে পাড়ি দিবার যান রকেটের যে ছবি আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখি তাহার সহিত ঢেঁকির আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। আকারের সামান্য সাদৃশ্য হেতু যদি আমরা বলি প্রাচীন ভারতবাসীর রকেট নির্মাণের জ্ঞান ছিল এবং বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানী ও যন্ত্রকুশলীদের ইহা আবিষ্কারের গৌরবে ভূষিত করা যায় না—তাহা হইলে যতটুকু সত্য বা মিথ্যা বলা হয় গান্ধীজি সত্যগ্রহের প্রবর্তক নন বলিলে ঠিক ততটুকুই সত্য-মিথ্যা বলা হয়।

সত্যগ্রহের আবির্ভাবের বিষয়ে 'আত্মজীবনী'তে গান্ধীজি লিখিয়াছেন, "সত্যাগ্রহ শব্দের উৎপত্তি হইবার পূর্বেই সত্যগ্রহ রূপ লাভ করিয়াছিল। সত্যাগ্রহের প্রবর্তনের সময় এ জিনিষটা সত্যসত্যই যে কি তাহার পরিচয় আমি পাই নাই।" সাধারণতঃ দেখা যায় কোন একজন মনীষী তত্ত্ব (theory) প্রচার করেন, পরে তাহা হয়তো কার্যে রূপান্তরিত হয়। যেমন মার্কসের তত্ত্ব লেনিনের কার্যে রূপ লাভ করিয়াছে। হিটলারের কর্মধারার মধ্যে নীটশে দেখিতে পাই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এক বিচিত্র ব্যতিক্রম। তাঁহার কাজ এমনই স্বকীয়তা ও বিশিষ্টতামণ্ডিত এবং কল্যাণকর যে তাহা ধীরে ধীরে তত্ত্বের আধারে ধরা হইয়াছে। পৃথিবীতে এমন দ্বিতীয় কোন নজীর আছে বলিয়া জানি না।

২

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রেরিত চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকের শ্রমিক হিসাবে স্বার্থ এবং মানুষ হিসাবে মর্যাদা রক্ষা করিতে

গিয়া গান্ধীজি তথাকার ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত এক অতীব অসম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পড়েন। বিদেশীর সাম্রাজ্য-স্বার্থ ও শেতাঙ্গ-বণিক স্বার্থ সম্মিলিতভাবে ভারত-বাসী ও ভারতের চুক্তিবদ্ধ দরিদ্র শ্রমিকের স্বার্থ পরিপন্থী কর্ম করিতে থাকে। এই ব্যবহারের দুঃসহতা ও রূঢ়তা একদা এমন নগ্ন ও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে ভারতের ইংরেজ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ পর্যন্ত প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গান্ধীজির নিকট এই সংগ্রাম কেবল-মাত্র ভারতীয়দের দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস ও সহজে জীবিকার্জনের অধিকার পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম ছিল না। তাঁহার নিকট ইহা মানুষের পূর্ণ মর্যাদা ফিরিয়া পাইবার সংগ্রামরূপেই প্রতিভাত হইয়াছিল। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্র কেবলমাত্র বর্ণের কৃষ্ণত্বের জন্য যেন সংকুচিত না হয়; এবং নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদা যেন ক্ষুণ্ণ না হয় তাহার জন্যই গান্ধীজি এই দুঃসাহসী ও অভূতপূর্ব সংগ্রামে ব্রতী হন। সত্যকার ক্ষমতাশালী ও হৃদয়বান কোন মানুষের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার তদানীন্তন অবস্থায় নীরব থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাই বস্তুতঃ সমগ্র প্রবাসী ভারতীয়-সমাজ গান্ধীজির পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভারতবাসীগণ যতই সংহত ও সুগঠিত হোন না কেন দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের অকৃত্রিম প্রীতি ছাড়া তাহাদের জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তাবিধান করিবার অন্য কোন প্রশস্ত উপায় ছিল না; মর্যাদার তো নয়ই। ইহা বিবেচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী প্রতিকারের যে কর্মপন্থা প্রবর্তন করেন তাহাই পরবর্তীকালে সত্যাগ্রহ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

উন্নততর অস্ত্রের প্রয়োগের দ্বারা বা অধিকতর বলের প্রভাবে প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করা যাইতে পারে, সাময়িক-ভাবে তাহাকে পরাভূত করাও যায়; কিন্তু এই পথে প্রীতি বা শ্রদ্ধা কিছুতেই অর্জন করা যায় না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরাভূত দেবতা জার্মানী প্রথম সুযোগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই জার্মানীকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া পৃথিবীর ভাগ্যবিধাতারা এখনও শঙ্কায় কালাতিপাত করিতেছেন। জার্মানী যাহাতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে না পারেন তাহার জন্য কত চেষ্টাই না চলিতেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে নামিবার পূর্বেই গান্ধীজি হিংসাশ্রয়ী শক্তির এই অসম্পূর্ণতা বা ব্যর্থতা অনুভব করিতে সমর্থ হন। তাই তিনি ঘোষণা করিলেন: নিজের আচার আচরণ ও ভালবাসার দ্বারা প্রতিপক্ষের হৃদয়ের পরিবর্তন করিয়া সত্য যাহা, ন্যায় অনুমোদিত যাহা, এবং যাহা মানুষের ধর্ম সমর্থন করে তাহাই পালন করিতে হইবে, প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইহা হইল সত্যাগ্রহ।

সত্যাগ্রহ মহাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশ কোন বিচারেই অনুকূল ছিল না। তথাপি ঘটনাচক্রে গান্ধীজিকে জন্মভূমি হইতে দূরে অপরিচিত পরিবেশে অতর্কিতে এই সংগ্রাম সুরু করিতে হয়। শ্রীভগবানের করুণায় তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিপুণতায় তিনি সাফল্যলাভ করেন। সেদিন গান্ধীজির প্রতিপক্ষের প্রধান ছিলেন জেনারেল স্মাটস। ইনি পরে রাজনীতিবিদ ও সমর-নায়ক হিসাবে প্রভূত খ্যাতির অধিকারী হন। এই ব্যক্তি গান্ধীজির সপ্ততিতম জন্মদিনের স্মারকগ্রন্থে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া অকপট শ্রদ্ধার্ঘ্য জ্ঞাপন করেন। প্রতিপক্ষকে অকপটে এমন শ্রদ্ধা ইতিপূর্বে কেহ জানাইয়াছেন বলিয়া জানি না। গান্ধীজির আন্দোলনে কেবলমাত্র জেনারেল স্মাটস্ যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাই নহে। বিস্তর দেশী বিদেশী মানুষ তাঁহার কর্মে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যোগদান করেন, নানাভাবে সাহায্য করেন। অনেক খ্রীষ্টান পাদ্রি গান্ধীজির কর্মের মধ্যে খ্রীষ্টতত্ত্ব জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে মনে করেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। অন্যান্যেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে গান্ধীজির এই নূতনতর অস্ত্রের নিপুণ প্রয়োগ ও তাহার অসামান্য সাফল্য সাগ্রহে প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন। মানুষের হিংস্রতার নিকট, পাশব বলের নিকট আর অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে না এই চৈতন্য ক্রমশ বিস্তারলাভ করিতেছে। হানাহানিমুক্ত সুন্দরতর বিশ্ব বোধ হয়, আনবিক বোমা ও উন্নততর মারণাস্ত্র সত্ত্বেও অসম্ভব কথা নহে।

সত্যাগ্রহ নামটির উৎপত্তির একটি ইতিহাস আছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের প্রারম্ভকালে ইহাকে বলা হইত

Passive Resistance বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে সেখানে যাহা ঘটিতেছিল তাহার পূর্ণ প্রকাশ কথাটির মধ্যে ছিল না। সুতরাং গান্ধীজি তাঁহার Indian Opinion কাগজের পাঠকদের একটি নাম বাছিয়া দিবার আহ্বান জানাইলেন। ঐ আবেদনের উত্তরে গান্ধীজির আত্মীয় মগনলালজি 'সত্যাগ্রহ' নামটি পাঠান। তিনি 'সৎ' ও আগ্রহ শব্দ দুইটির সন্ধি করিয়া 'সত্যাগ্রহ' কথাটি সৃষ্টি করেন। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থটি গান্ধীজির বেশ পছন্দ হইল। আরব্ধ কর্মের মর্মকথাটি যেন ইহার মধ্যে সম্যক মূর্ত দেখিতে পাইলেন। গান্ধীজি লিখিয়াছেন, "এই লড়াইয়ের ইতিহাস আমার দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনের, বিশেষ করিয়া আমার সত্যের প্রয়োগের ইতিহাস বলা যায়।" মগনলালজির প্রেরিত শব্দটির সামান্য অদল বদল করিয়া গান্ধীজি গ্রহণ করিলেন। "সদাগ্রহ শব্দটিকে স্পষ্ট করিবার জন্য আমি মধ্যে 'য' ফলা দিয়া 'সত্যাগ্রহ' এই গুজরাটী শব্দ বানাইলাম।" গুজরাটী "সত্যাগ্রহ" আজ বিশ্বের যাবতীয় ভাষাতেই ব্যবহৃত হইতেছে বলা চলে। ইংরেজি ভাষায় এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য গান্ধীজি প্রথমে Passive Resistance শব্দটি ব্যবহার করিতেন। হেনরি ডেভিড থোরোর প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ Civil Disobedience এর উল্লেখ পূর্বে আমরা পাইয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকার গান্ধীজির ঐতিহাসিক আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর তিনি এই রচনাটি পড়েন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দেও গান্ধীজির জেল হয়। সেখানে অবস্থানকালে কারা-গ্রন্থাগার হইতে থোরোর বইখানা পান এবং পড়েন।

অনেক সমালোচক বলেন গান্ধীবাদের উৎস যেমন টলস্টয় তেমনি সত্যাগ্রহের কল্পনা গান্ধীজি পান থোরোর প্রবন্ধ হইতে। গান্ধীজি ইহার সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন: "আমি সত্যাগ্রহের পরিকল্পনা থোরোর লেখা হইতে লাভ করিয়াছি এমন কথা বলা ভুল। থোরোর প্রবন্ধ দেখিবার পূর্বেই দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন অগ্রগতি লাভ করিয়াছিল। ঐ আন্দোলন তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন নামে পরিচিত ছিল। ...থোরোর বিখ্যাত রচনাটি আমার হাতে আসিবার পর তাহার শিরোনামাটি আমি আমার আন্দোলন ইংরেজি পাঠকদের বুঝাইবার জন্য ব্যবহার করিতাম। কিন্তু Civil Disobedience কথাটিও আমার আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে যখন মনে হইল তখন হইতে আমি Civil Resistance কথাটি ব্যবহার করিতে থাকি।

উদ্ধৃতিটা একটু দীর্ঘ হইল। কিন্তু সত্যাগ্রহ বুঝিতে হইলে এই বাক্য কয়েকটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৩

সত্যাগ্রহের যথার্থ পরিচয় কি? শক্ত প্রশ্ন। ধর্ম যুদ্ধ বা প্রেমময় সংগ্রাম? ঠিক বলা হইল বলিয়া মনে হয় না। গান্ধীজির একটি পারিবারিক ঘটনা উল্লেখ করি। ইহা আমাদের উপলব্ধির সহায়ক হইবে। পত্নী কস্তুরবা অসুস্থ। গান্ধীজি নিজেই চিকিৎসা করেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসা। অনেকদিন হইল অথচ রোগ নিরাময় হইতেছে না দেখিয়া গান্ধীজি নূতন পদ্ধতি প্রয়োগ করিবেন স্থির করিলেন। ইহার জন্য রোগীর ডাল এবং নুন আহার ত্যাগ করিতে হয়। পত্নীকে তিনি তদনুরূপ অনুরোধ করিলেন। কস্তুরবা স্বীকৃত হইলেন না। গান্ধীজি নাছোড়বান্দা লোক। তিনি নানাভাবে তাঁহাকে রাজি করাইতে চেষ্টা করিতে যত্নবান হইলেন। কস্তুরবা এক-সময় বলিয়া ফেলেন "তোমাকে (গান্ধীজিকে) যদি কেহ নুন ও ডাল ত্যাগ করিতে বলে তাহা হইলে তুমিও ছাড়িবে না।" গান্ধীজি যেন এই রকম একটা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে এক বৎসরের জন্য নুন ও ডাল ত্যাগ করিলেন। কস্তুরবার হাজার অনুনয় সত্ত্বেও তিনি সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন নাই। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "ইহাকেই আমি 'সত্যাগ্রহ' বলিয়া পরিচয় দিতে চাই।"

গান্ধীজি বলিয়াছেন, সত্যাগ্রহীরা ঠকিবার জন্যই জন্ম-গ্রহণ করেন। গান্ধীজি কস্তুরবার জন্য নিজের আহার নিয়ন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মাজির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নিগ্রহ বরণের ফলে কস্তুরবার হৃদয়ের অনাগ্রহ নিমেষে বিদূরিত

হইয়া শ্রদ্ধাপ্রীতিমণ্ডিত সাগ্রহের উদয় হইল। সত্যাগ্রহের অমোঘ শক্তি এই প্রেমময় সাধনার মধ্যে নিহিত। প্রেমের সামান্য মাত্র প্রকাশের দ্বারা কস্তুরবার দৃঢ় প্রতিরোধের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। গান্ধীজি তাই বারংবার বলিয়াছেন প্রতিপক্ষকে ঘৃণা করিয়া শত্রু ভাবিয়া সত্যাগ্রহ করা যায় না। প্রতিপক্ষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা না থাকিলে যথার্থ সত্যাগ্রহ করা যাইবে না। গান্ধীজি টলষ্টয়ের লেখা পড়িয়া ব্যক্তিজীবনের মত সমাজজীবনে এবং অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রেমের অমোঘ প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বাসবান হন। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের পথ, প্রেমের পথ; ইহার হাতিয়ারও আত্মনিগ্রহ। প্রতিপক্ষকে আঘাত করা চলিবে না। তাহার অমঙ্গল কামনা করাও না। যা কিছু দুঃখ বেদনা আঘাত সব কিছু সত্যাগ্রহীকেই বরণ করিতে হইবে অসূয়াশূন্য ও অভিমানহীন চিত্তে। অন্যায় ও অন্যায়কারীর মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সে সম্পর্কে সত্যাগ্রহীকে সদা জাগ্রত চৈতন্যের অধিকারী হইতে হইবে।

যাহার জন্য আমরা ত্যাগ স্বীকার করিতে বা দুঃখ বরণ করিতে সানন্দে ও সজ্ঞানে প্রস্তুত নই তাহার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিবার অধিকারও আমাদের নাই। সেই জন্য গান্ধীজি সত্যাগ্রহ ও সত্যাগ্রহী সম্পর্কে কতকগুলি নীতি এবং সর্ত আরোপ করেন। তাহার প্রধান দুইটি হইল: সংযম বা 'Self Discipline; এবং আত্মসম্বরণ বা Self Control। সত্যাহীকে তাহার কর্মের দ্বারা সাধারণ মানুষের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইতে হয়। স্বীকৃত সামাজিক সম্মানের অধিকারী না হইলে কার্যকরী সত্যাগ্রহ করা যায় না।

সত্যাগ্রহী কখনই অন্যায় এবং অন্যায়কারীর মধ্যেকার পার্থক্য ভুলিবেন না। কারণ সত্যাগ্রহী তো অন্যায় দূর করিতে চান, অন্যায় আচরণকারীকে সংশোধন করিয়া তাহাকে সুস্থ মানুষ করিতে চান।' ডাক্তার যেমন রোগের চিকিৎসা করে—এও ঠিক তেমনি। রোগ ঘৃণার এবং ভয়ের। রোগী নহে। সত্যাগ্রহীর তাই অনন্ত বিশ্বাস থাকার দরকার যে পৃথিবীতে এমন পতিত কেহ নাই যাহাকে প্রেমের বারিধারায় ধৌত করিয়া পূত ও পবিত্র করা যায় না। সত্যাগ্রহী কল্যাণ দ্বারা অকল্যাণকে; ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা অসত্যকে সত্য এবং হিংসাকে অহিংসার সাহায্যে অতিক্রম করিবেন। পৃথিবীকে কলুষ মুক্ত করিবার দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। কেমন করিয়া এই রকম মন ও চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায় তাহা ভাবিবার বিষয়। গান্ধীজি বলেন:

"যিনি সত্যাগ্রহী হইতে ইচ্ছুক তাহাকে প্রার্থনাশীল চিত্তে সতত আত্মানুসন্ধান এবং আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা জানিতে হইবে যে ক্রোধ, অসূয়া বা অন্য যে মানবীয় দুর্বলতার বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ (Crusade) করিতে উদ্যত হইয়াছেন সে সকল অপরাধ হইতে তিনি কি মুক্ত না। ঐ বিচার এবং হৃদয়ের নির্মলতার মধ্যেই অর্ধেক বিজয় রহিয়াছে।" গান্ধীজি প্রায়শ্চিত্তের উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেন। Frailty thy name is woman শুধু নয়। মানুষেরও অহরহ পতন ঘটিতেছে। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নহে। কিন্তু পতনের দ্বারা ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম হয় যদি উপলব্ধি মাত্র আমরা স্বেচ্ছায় প্রায়শ্চিত্ত করিতে দ্বিধা না করি। আমরা যাহারা সুন্দর ও আনন্দময় জীবনের প্রত্যাশা রাখি তাহাদেরও জীবনের স্খলন পতন বিষয়ে বিশেষ সচেতন থাকা দরকার। সত্যাগ্রহীর পক্ষে ইহা বিস্মৃত হওয়া চলিবে না।

সত্যাগ্রহী অমিত বীর্যের অধিকারী হইবেন। মানুষ বীর্যবান হইলেই অনন্ত বিশ্বাস তাহার হৃদয়ে সঞ্চার হয়। গান্ধীজি বলিয়াছেন—প্রতিপক্ষ যদি বিশবারও মিথ্যাচার করিয়া থাকে তথাপি সত্যাগ্রহীর তাহাকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। মানব প্রকৃতি বা স্বভাবকে বিশ্বাস করিয়া চলা সত্যাগ্রহের অন্যতম মূল সর্ত। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। দিকে দিকে অবিশ্বাসের ও মিথ্যাচারের বিষবাষ্পের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও একথা কি আমরা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করি না যে, সমাজ সভ্যতা সব কিছু পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর টিকিয়া আছে।

মানুষের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটিয়াছে বলিয়া

বর্তমান বিশ্বে হিংস্র শক্তির প্রসার ঘটিতেছে। মানুষ উন্মাদের ন্যায় আপনার ধ্বংসের আয়োজনে ব্যাপৃত হইয়াছে। পৃথিবীর রাজনীতিবিদদের স্বীকৃত আচরণ হইল দেশের ও জাতির স্বার্থে প্রয়োজন মত দক্ষতার সহিত মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালানো। এই বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিগণ স্বদেশবাসীর সহর্ষ অভিনন্দন পাইয়া থাকেন। অনেক তথাকথিত নীতিবাগীশ ইহাতে কোন অন্যায় দেখেন না! বর্তমান রাশিয়ার নির্মাতা জোসেফ ষ্টালিন বলেন—words are one thing actions another. words are a concealment of bad deeds. কথা এক কাজ আর। মন্দ কাজের আবরণ হইল কথা। এই ভাবে চলিলে আমরা কোন স্বর্গ রাজ্যে পৌছিব? এই পথে কোন কল্যাণ নাই। বিকল্প পথ একমাত্র সত্যাগ্রহের পথ •

গান্ধীজি আদর্শ সত্যাগ্রহী ছিলেন এ কথা শত্রু মিত্র আত্মপর সকলেই স্বীকার করেন। তথাপি একটি উদাহরণ উল্লেখ করিব। ইহার দ্বারা সত্যাগ্রহী গান্ধীর মহত্ব অতি সহজেই প্রকটিত হইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল প্রধানত ভারতবাসীর নাম নথীভুক্ত করানোর আইনগত বাধ্যবাধ্যকতার বিরুদ্ধে। এই সত্যাগ্রহ সাফল্য লাভ করে। কিন্তু জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত আলোচনা করিয়া গান্ধীজি আপোষরফা করেন তাহাতে বহু ভারতীয় ক্ষুব্ধ হন। আলম নামে জনৈক ক্রোধান্ধ ব্যক্তি এই ব্যাপারের জন্য গান্ধীজিকে একদিন বেদম প্রহার করে। গান্ধীজির দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়; তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। জ্ঞান লাভ করিবার পরই তিনি তাহার আঘাতকারীর খোঁজ করেন এবং তাহাকে মুক্তি দিবার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন আলম আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিয়াছেন। তাহার কৃত কর্মের দ্বারা মানুষের মঙ্গল সাধিত হইবে এই বিশ্বাস তিনি আমাকে প্রহার করিয়াছেন। কোন মন্দ উদ্দেশ্য তাহার ছিল না। ইহাই হইল প্রকৃত সত্যাগ্রহীর যথার্থ বিচার।

অনন্যসাধারণ নিষ্ঠা ও একাগ্রতা না থাকিলে সত্যাগ্রহী হওয়া যায় না। গান্ধীজি বলেন দড়ির উপর নৃত্যরত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে সত্যাগ্রহীকে। বিক্ষিপ্ত চিত্তে কাজ করিলে আর যাই হোক না কেন সত্যাগ্রহ করা যায় না।

৪

সত্যাগ্রহী প্রতিপক্ষকে আত্মসংশোধনের পর্যাপ্ত সুযোগ দিবেন। সত্যাগ্রহ গোপন উদ্দেশ্যকে প্রচলিত করিয়া সত্য উদ্ভাবিত করে। ইহাতে গোপনতা বলিয়া কিছু নাই। প্রতিপক্ষের যুক্তি ও বিচারধারাকে সত্যাগ্রহীকে সহৃদয়তার সহিত অনুধাবন করিতে হইবে। প্রতিপক্ষকে তিনি শোধরাইবার সুযোগ দিবেন। যদি তিনি সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অক্ষম হন তবেই তার কৃত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন করা যাইতে পারে। সত্যাগ্রহী হইবেন সৎ ও সত্যাশ্রয়ী। তাহাকে সর্বক্ষেত্রেই ক্রোধহীন চিত্তে শুভ সঙ্কল্পের সারথি হইতে হইবে। সমগ্র:কাজটি তিনি অহিংস পন্থায় প্রকাশ্যে সর্ব্ব সাধারণের বোধগোম্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্যরূপে সম্পাদিত করিবেন যাহাতে সকলেই ইহার অর্থ উদ্দেশ্য শুচিতা ও সত্যময় শুভময় কল্যাণধর্ম বুঝিতে সক্ষম হন। এই স্থানটিতে অন্যান্য আন্দোলন হইতে সত্যাগ্রহের তফাৎটি বিশেষ লক্ষণীয়। রাজনীতি আন্দোলন সংগ্রাম মানেই তো চক্রান্ত ও প্রতিহিংসা। গান্ধীজি বারংবার সাবধান করিয়াছেন—উদ্দেশ্য ও তাহা সাধনের পথ এবং উপায় উভয়ই শুদ্ধ এবং মহৎ হইতে হইবে। নহিলে সব কিছু একটা প্রচণ্ড ধোকাবাজি ও বিষম অকল্যাণে পরিণত হইতে বাধ্য। গান্ধীজির সত্যাগ্রহ অস্ত্র মানুষকে এই অকল্যাণের পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই বোধ হয় উদ্ভাবিত হইয়াছে।

গান্ধীজিও আইন অমান্য আন্দোলন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ভিন্ন পরিবেশে এবং প্রকাশ্যে। স্বাধীনতার পরে অনেকে ইহার প্রয়োজনমত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমতী লীলা রায় লিখিয়াছেন "শ্রেণী সংগ্রাম ও অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন কেবল সমপর্যায়েরই নয় একই বস্তুর দুই নাম। মার্কসবাদে উল্লিখিত শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।" সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন মূলে এক। ইহার সহিত শ্রেণী সংগ্রামকে কি করিয়া জুড়িয়া দেওয়া যায় বুঝি না। সত্যাগ্রহকে আমরা অস্ত্র বলি বটে

কিন্তু আসলে ইহা একটি পথ, বিকাশের পথ। ফুল যেমন আপনি ফুটিয়া ওঠে এবং ফলে পরিণতি লাভ করে সত্যাগ্রহীও তেমনি ধীরে ধীরে নিজের কর্মের মাধ্যমে বিকশিত হন এবং অসত্য অন্যায় মিথ্যা গোপনতা চক্রান্ত প্রভৃতি দুর্বুদ্ধির অবসান ঘটে ও সুবুদ্ধির উদয় হয়। ফুলের আত্মবিলোপের মধ্য দিয়া জয়লাভ করে ফল। ফলই ফুলের একমাত্র স্বাভাবিক ও সার্থক পরিণতি। অতএব ফুলের সঙ্গে ফলের কোন বিরোধ থাকিতে পারে না। তেমনি সত্যাগ্রহেও কোন বিরোধের অবকাশ নাই। তাই ইহা সংগ্রাম নয়, সংশোধন। গান্ধীজি বলিয়াছেন compromise is inherent in Satyagraha—সত্যাগ্রহের অন্যতম সর্ত আপোষরফা। এই আপোষরফার পথেই সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ফুল মধুরতর কল্যাণময় ফলে পরিণতি লাভ করে।

সত্যাগ্রহীরা অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের পথে সংগ্রাম করিতেছেন একথাটা সাধারণ্যে প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। সেইজন্য গান্ধীজি নির্দেশ দিয়াছেন সত্যাগ্রহ আরম্ভের পূর্বে ব্যাপক আন্দোলন দ্বারা জনমত গঠন করিতে হইবে। যে ক্ষতিকর ব্যবস্থা ও কার্য বা নীতির পরিবর্ত্তনের জন্য সত্যাগ্রহী সংগ্রাম করিবেন তাহা যেন সুস্পষ্টরূপে প্রত্যেকের নিকট বোধগম্য হয়। তাহা হইলেই মানবমনের স্বাভাবিক সমর্থন পাওয়া যাইবে। এবং সেই সকল ক্ষতিকর, অসত্য এবং অহিতকর কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিগণ জাগ্রত জনমতের নিকট সহজেই নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবে। এই পথে তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তনও শীঘ্র আসিবে।

আমরা দেখিয়াছি গান্ধীজি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অর্জনের আশায় বারবার অনশন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রচেষ্টা তো অব্যাহত ছিলই। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সুফল তাহার দ্বারা অর্জিত হয় নাই। জিন্নাসাহেবের মনের উপর সত্যাগ্রহী গান্ধী কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। অন্ততঃ বাহিরে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। একমাত্র জিন্নার জিদেই ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমান সকলের স্বার্থের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ ভাগ হইয়াছে একথার দ্বারা জিন্নার ক্ষমতার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত সম্মান দেখানো হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানগণ একটি পৃথক রাজ্যপাট পাইবে এই লোভে বশীভূত হইয়া জিন্নার শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিল। সে যাহাই হোক আপোষরফামূলক সত্যাগ্রহ সাধনার ব্যর্থতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে এটিকে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। গান্ধী রচনার মধ্যে ইহার একটা গ্রহণযোগ্য উত্তর পাওয়া যায়।

গান্ধীজিকে একদা প্রশ্ন করা হয় সত্যাগ্রহের দ্বারা হিটলারকে প্রভাবিত ও পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব কিনা। তিনি যে উত্তর দেন তাহাতে স্পষ্ট হয় যে,সত্যাগ্রহে পরাজয় বলিয়া কোন বস্তু নাই। ইহা কখন ব্যর্থও হয় না। বহু সাধারণ সৈনিকের আনুগত্যের উপর হিটলারের শক্তি নির্ভরশীল। সত্যাগ্রহের দ্বারা তাহাদের হৃদয়ের পরিবর্তন হইতে পারে এবং হিটলারের প্রতি আনুগত্যও কমিতে পারে, ফলে হিটলারের ক্ষমতা হ্রাস পাইবে ও তাহার পরিবর্তন আসিবে। হিটলার ডিক্টেটর হোক আর যাই হোক মানুষ তো বটে। কোন মানুষই সংশোধনের বাহিরে নন। অতএব স্বয়ং হিটলারেরও হৃদয়ের পরিবর্তন সম্ভব। মহারাজ অশোক একদা কম অত্যাচার করেন নাই। একটি মাত্র ঘটনার ফলে তিনি ধর্মাশোক হইলেন। ইতিহাসের পাতা হইতে আরও দুই চারিটি উদাহরণ আহরণ করা যায়। কিন্তু এখানে তাহা অপ্রয়োজনীয়। সময় পাইলে গান্ধীজি জিন্নার হৃদয়ের পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইতেন। ইংরেজ আর দেরি করিলে জিন্নার মতিগতি ও ভারতীয় মুসলমানের মনে দেশ বিভাগের জন্য জিদ কমিয়া যাইবে আশঙ্কা করিয়া স্বাধীনতার দিন নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। সেই নির্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই স্বাধীনতা ঘোষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসের এক ভয়াবহ ভ্রাতৃবিরোধ মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। সেদিনকার মহাশ্মশানে গলিতশব আর শিবাদলের মধ্যে গান্ধীজিকে খুঁজিয়া লইতেও এতটুকুও কষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে আমরা হত্যা করিয়া বাঁচিয়াছি। সত্যাগ্রহ গান্ধীজির নিকট ধর্মযুদ্ধ ছিল। কিন্তু সে ধর্ম—'ধর্ম নহে সম্পদের হেতু, সে নহে সুখের ক্ষুদ্র সেতু।' অন্যে পরে কা কথা, গান্ধীজি ইংরেজের দুর্দশার বিনিময়ে যা তাহাদের

বেকায়দায় ফেলিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও চান নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কথাটি তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার রেলের শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের ধর্মঘট দ্বারা বিব্রত হইলে গান্ধীজি তাঁহার সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখেন। অথচ সরকারের সেই দুর্দিনের সুযোগে দাবি আদায় করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। সত্যাগ্রহে এই প্রকার সুযোগগ্রহণ নিষিদ্ধ। বিরোধীপক্ষকে ভুল বা অন্যায় করা হইতে বিরত রাখিতে হইলে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সমবেদনা থাকা চাই।

চৌরিচৌরায় হিংসাত্মক কার্য ঘটিলে গান্ধীজি বারদৌলি সত্যাগ্রহ বন্ধ করিয়া দিলেন। দেশের অনেকেই তাঁহাকে সে জন্য নিন্দা করিল ও কটুবাক্য বলিল। গান্ধীজি অটল অচল রহিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিংসা বর্জন করিতেই হইবে। ভারতবর্ষের পরবর্তী গণ-আন্দোলনগুলি দেখিয়া আজ অনেকে বলিয়া থাকেন গান্ধীজি সেদিন ঠিক কাজই করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সনের আন্দোলনে পাঞ্চাশ-ষাট হাজার লোক কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সনের আন্দোলনে যোগদানকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৪২ সনে দেখা গেল দেশ যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। অহিংসা ও সত্যাগ্রহে তখন জাতির একটা নির্ভরতা হইয়াছে। সত্যাগ্রহের আন্দোলনে কোন নেতার দরকার গান্ধীজি স্বীকার করিতেন না। ইহাকে তিনি জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়াই মনে করিতেন। প্রতিদিন আমরা সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য কোন নেতার প্রয়োজন অনুভব করি না। সুতরাং সেই জীবনকে মালিন্যমুক্ত ও সুন্দরতর করিবার জন্য কোন নেতার প্রয়োজন হইবে কেন? ১৯৪২ সনের ভারত ছাড় আন্দোলন বস্তুতঃ নেতৃত্বহীন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ছিল। সে আন্দোলনকে সার্থক আন্দোলন বলা চলে। ইহাকে অহিংসা ও সত্যাগ্রহ বলিতে কেহ স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু যখন দেখি মেদিনীপুরে জনতা থানা দখল করিয়া হাতে বন্দুক পাইয়াও তাহা ব্যবহার করে নাই; বন্দুকগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে তখন ইহাকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করা যাইবে? গান্ধীজি হিংসাকে ভয় করিতেন না। ভয় করিতেন অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের হিংস্র আচরণ।

সত্যাগ্রহ অহিংস আন্দোলন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিজয়কেতন উড্ডীন হইবার পর দেখি হিংস্র উপায়ে সোভিয়েট রাশিয়ায় বলশেভিক মতবাদের প্রতিষ্ঠান হইল। গান্ধীজি বলিতেন "হিংসার দ্বারা অর্জিত ধন অহিংসার দ্বারা রক্ষা করা যায় না।" কিন্তু অহিংসার দ্বারা অর্জিত সাফল্য কি হিংসা বা হিংস্রতার দ্বারা ব্যর্থতায় পরিণত করা যায় না? অপরদিকে সর্বোদয়ের সঙ্গে সাম্যবাদের পার্থক্য কতটুকু! সর্বোদয়ের পথে হিংস্রতা অতর্কিতে আসিয়া একদিন ভারতবর্ষে বলশেভিক মতবাদ প্রকট হইতে পারে অনেকে এই আশঙ্কার কথা গান্ধীজির নিকট ব্যক্ত করেন। গান্ধীজি সেই রকম কোন সম্ভাবনার কথা একবারেই স্বীকার করেন না। পরন্তু তিনি বলেন সত্যাগ্রহই ইহাকে যথার্থভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে। বলশেভিক মতবাদ বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার স্বাভাবিক পরিণতি। পশুশক্তি অপেক্ষা স্বাধীনতা এবং ভালবাসা ও বস্তু অপেক্ষা নীতির উৎকর্ষে যদি আমরা আস্থা হারাই তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমাদের এই পুণ্যভূমিতে বলশেভিক মতবাদের প্রসার দেখিতে পাইব। সুতরাং সত্যাগ্রহের মূলে ভগবদ্বিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। অবিশ্বাসী অপ্রেমী মানুষের দ্বারা নীতিনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নহে; সত্যাগ্রহ তো দূরের কথা। ভারতভূমি ধর্মভূমি, তাই এখানে ধর্মবিশ্বাসহীন বলশেভিক মতবাদ শ্রদ্ধার সঙ্গে কোনদিন গৃহীত হইবে না। তা ছাড়া বৈষম্য দূর করার হিংস্র পদ্ধতি অচিরেই নূতনতর এবং কঠিনতর বৈষম্য সৃষ্টি করিবে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

হিংস্র যুদ্ধে ঘৃণা, বিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা, অসততা প্রভৃতি যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তির সহিত একনায়কত্ব মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। 'গান্ধারীর আবেদনের দুর্যোধনের ন্যায় তখন বলিতে হয়।

দীপ্ত জ্বালা অগ্নি ঢালা সুধা
জয়রস, ঈর্ষাসিন্ধুমন্থনসঞ্জাত,
সদ্য করিয়াছি পান,—সুখী নহি তাত,
অদ্য আমি জয়ী।

স্বাভাবিক নিয়মে সব সংগ্রামের একদিন অবসান হয়। মনুষ্যত্বের অপমৃত্যুর সেই শ্মশানভূমিতে বিজয়ী বিজেতা সমান দুঃখী সমান ক্ষতিগ্রস্ত। অপরদিকে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ইতিহাসে পরাজয় বলিয়া কোন কথা নাই। ইহার মূল সূত্র "সংঘ শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই মানুষকে গড়ার কাজে অগ্রসর হইতে হইবে। সেই প্রচেষ্টার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা উত্তরোত্তর সিদ্ধিলাভের পথে অগ্রসর হইবে।...সত্যাগ্রহ সামাজিক রূপান্তর সৃষ্টি করে কিন্তু ঘৃণা সৃষ্টি করে না ...সত্যাগ্রহে তাহার শুভবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া সত্যাগ্রহী স্বীয় প্রাক্তন প্রতিপক্ষের সহযোগিতা লাভ করিয়া নূতন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।"

অস্ত্র মানুষের শক্তি সত্যসত্যই বৃদ্ধি করে এ কথা গান্ধীজি বিশ্বাস করিতেন না। কোন সত্যাগ্রহীই ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন না। গান্ধিজির কথা: When one was deprived of them (arms) generally there was nothing left but surrender. অর্থাৎ অস্ত্রধারীর অস্ত্রখানা চলিয়া গেলে তাহার আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু সত্যাগ্রহী? তাহার তো কোন কিছু হারাইবার ভয় নাই। সত্যাগ্রহী তো আত্মপর সকলের হিতসাধনে একনিষ্ঠ যত্নশীল। আনন্দমাত্র তাহার পুরস্কার। সুতরাং তাহার হৃদয়ের ঐশ্বর্য তাহার অমোঘ বীর্য হইতে কে তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে? কিন্তু সকলেই কি এই মহা আয়ুধের অধিকার লাভ করিবার যোগ্য? মানুষ চেষ্টা করিলে নানা বিদ্যা ও বিবিধ কার্যে দক্ষতা অর্জন করিতে সমর্থ হয়। সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রেও তাহা সত্য। কোন পথে ইহা লভ্য? জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের পথে চলিয়া ইহা পাইতে হয়। ঈশ্বরে অনন্ত বিশ্বাস ছাড়া আত্মপর সর্ব মানবকে সমানভাবে ভালবাসা যায় না; অহিংসার সাধনা ভিন্ন প্রতিপক্ষের অত্যাচারের শিকার হইয়া তাহার হৃদয়ের পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভবপর নহে। এবং সরল সেবাময় ও প্রার্থনাশীল জীবনযাপন ভিন্ন এই কাজের উপযোগী হওয়া যায় না। অতএব উপযুক্ত প্রস্তুতি ভিন্ন সকলের সত্যাগ্রহী হইবার অধিকার নাই। পতিতা ভগ্নিদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদানের আবেদনের উত্তরে গান্ধীজির বক্তব্য এই প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। "সকলেই সত্যাগ্রহের সামিল হোক ইহা আমি কামনা করি। কিন্তু আমি সর্বক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অননুতপ্ত কোন পেশাদার খুনীকে সত্যাগ্রহ সনদে স্বাক্ষর দিতে বাধা দিব।

৬

আজ বিশ্বব্যাপী মানুষনিধন-যজ্ঞের উন্মত্ত আয়োজন চলিতেছে। নিমেষে লক্ষ লক্ষ লোক হত্যা করিবার অভূতপূর্ব উদ্যোগ দেখিয়া মানুষকে স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে হইতেছে ইহার পরিণতি কোথায়? চোখের বদলে চোখ চাই ইহাই যদি সকল মানুষের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে একদিন পৃথিবীতে চক্ষুষ্মান মানুষ নাও থাকিতে পারেন। অতএব এই পথ কল্যাণ-পথ নহে। ততঃ কিম্? মানুষের বস্তুগত সঞ্চয়ের মাত্রাহীন স্ফীতি তাহাকে আজ পদে পদে বিড়ম্বিত করিতেছে। এই বিড়ম্বনার পথ ধরিয়া নানা বিরোধ আমাদের পীড়িত করিতেছে। দেশে দেশে বিরোধ, আদর্শে আদর্শে বিরোধ, শ্রমিক মালিকে বিরোধ লোভ লালসা হিংস্রতার বহুবিধ বিচিত্র রূপপথে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িতেছে। নানা মতবাদের ভক্তরা ইহার নিরাকরণের দাওয়াই লইয়া বিশ্বের হাটে হাটে ফিরি করিতেছেন। গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যতন্ত্র কত কি তার নাম। এক তন্ত্র অপর তন্ত্রকে আঘাত করিতেছে। ইহাও এক নূতনতর শ্রেণী-সংগ্রাম বোধ হয়! সকলেই বলিতেছেন আমারটাই শ্রেষ্ঠ, আর সব ঝুটা।

সত্য যাহা তাহা চিরকল্যাণময়। সে কাহাকেও আঘাত করে না। নিরাময় করাই তাহার কর্ম, তাহার ধর্ম। সংঘাতের মধ্যে তাই সত্য নাই। আছে কিছু ক্ষমতা শুধু লোভাতুর মানুষের অপকৌশল। সেই সামান্য সংখ্যক ভ্রান্ত মানুষের কর্মকৃতির জন্য সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অসহায়ভাবে মার খাইতেছে। কোথায়ও দুটি ক্ষুধার অন্নের জন্য হৃদয়বৃত্তির নির্বাসন, বর্ণের কৃষ্ণত্বের জন্য অমর্যাদা অসম্মান, আবার কোনখানে ক্লিষ্ট পীড়িত মানুষের মাথার উপর ডেমোক্রিসের হুড়োর মত

তথাকথিত মিত্র অ-মিত্র উভয়ের আণব বোমা উদ্যত হইয়া আছে। মানব সভ্যতার এই শোচনীয় দুর্গতির মধ্যে পরমাশ্রয় ও একমাত্র ভয়ত্রাতা মহামানব মহাত্মা গান্ধীর অভয়বাণী।

"বগ্না যখন আসে তেড়ে
উঁচিয়ে ঘুষি ডাণ্ডা নেড়ে
আমরা হেসে বলি জোয়ানটাকে
ঐ যে তোমার চোখ-রাঙানো
খোকাবাবুর ঘুম-ভাঙানো,
ভয় না পেলে ভয় দেখাবে কাকে।"

এই ভয়-না-পাবার সাধনা হইল সত্যাগ্রহের সাধনা। দিকে দিকে আজ মানুষের মনে ভয়হীনতা প্রকটিত হইতেছে। গান্ধীজি মানুষের ভয় দূর করিয়া দিয়াছেন। নূতন পথের সন্ধান দিয়াছেন। সে পথ হইল সত্যাগ্রহের সোজা সড়ক। সেই পথ দিয়া বিশ্বমানবের মুক্তি সমাসন্ন। মানবসভ্যতার পশ্চাৎ গতি নাই। সভ্যতার আদিকাল হইতে দিনে দিনে ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। ইতিহাসের ইহাই নিয়ম। সুতরাং আনবিক বোমার বিকট অট্টহাস্য বা তাহার হিংস্র পূজারীদের তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে ভয় পাইবার কোন প্রকৃত কারণ নাই। ইতিহাসে অনিবার্যতায় আমাদের সামনে নূতন প্রভাতের সূর্য উদিত হইবেই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে মহামানব মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ মহামন্ত্র ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে সেই পুণ্য প্রভাতের প্রসন্ন বালার্ক। ভারতবর্ষের সার্বভৌম কবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথও জীবন সায়াহ্নে এমনি আশা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। সেই ঋষিবাক্য, সত্যবাক্য স্মরণ করিয়া আজকের সত্যাগ্রহ কীর্তনের সমাপ্তি করিতেছি।

"আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর—একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে।"

মূলে ভুল

(উপন্যাস)

পুষ্প দেবী

প্রভা খোসামোদ করলেন কর্ণাটায় নিয়ে যেতে অনুকে। গদাই বললো তাঁদের ওপর ভরসা করে অনুকে নাকি ছাড়তে পারবে না। প্রভা কপাল চাপড়ালেন। কৃপণের আদি মানুষ গদাই, পুরীতে কার ভাঙ্গা বাড়ী পেয়ে সেখানে অনুকে নিয়ে বেড়াতে গেল। অনু চিঠি লিখলো "মাগো কি বাড়ীতেই এসেছি কোন দরজা জানলায় ছিটকিনি নেই। ভয়ে সারারাত বসে কাটাই। পোড়ো ভাঙা বাড়ী দেখে বাসুদেব সন্ধ্যে হলেই কাঁদতে আরম্ভ করে। হ্যারিকেনের আলো তার ভালো লাগে না। সব দেয়াল নোনা-ধরা, ছেলেপুলের অসুখ না হলে বাঁচি।"

যাক ফিরে এলো সব ভালোয় ভালোয়। অনুমার খাটুনীর অন্ত নেই। অনুমা হেসে বলতো, ডাক্তার আমায় হাঁটতে বলেছে। পায়ে যদি মা মাইল মিটার লাগানো থাকতো তাহলে দেখতো দিনে কশো মাইল হাঁটছি। একটা ঠিকে ঝি নিয়ে দিনরাত তার খাটুনীর সীমা ছিল না। মাঝে মাঝে একটি খোঁড়া ঝি কম মাইনেয় রেখেছিল, গদাই তাকে বলতো খোঁড়া হাঁস। কখনো বা একটা বাচ্চা ছেলে।

পাশের বাড়ীর পুটুন্ মার কাছে প্রভা শুনেছে গদায়ের নাকি কথার মাত্রা ছিল—অনুকে বলতো "তুমিত টিকিট কিনে বসে আছ।" এই রকম কথা ডাক্তার হয়ে নিজের স্বামী যদি বলে, মানুষের ত ভয়েই পরমায়ু কমে যায়। যাকে বলে আঁৎকিয়ে মেরে ফেলা। প্রভা অনুকে হারানর পর কেঁদে কেঁদে ভাবে হায় ভগবান গদায়ের কুবুদ্ধির কি শেষ ছিল না? আজকালকার ডাক্তাররা সাইকোলজি নিয়ে কত না মাথা ঘামাচ্ছে। গদাই কি এটুকু ডাক্তারীও জানতো না—। বুঝতে পারলেও মন মানতে চায়না যে রুগ্ন বলে মায়ের বোঝা ভেবে গদাই ইচ্ছে করে তাকে সরিয়ে ফেললো। প্রভা ভাবে, আমি সরল মাষ্টারের হাতে পড়েছিলুম সে শুইয়ে শুইয়ে তার সাধ্যাতীত টাকা খরচ করে আমায় সারিয়ে তুললো চতুর গদাই যেই অনুকে বোঝা মনে হল ঝেড়ে ফেলে দিলো। কিন্তু তার পক্ষে অনু অপ্রয়োজনীয় হতে পারে কিন্তু খোকা খুকু বাসুদেব?

খোকা অবুঝ হতে পারে, গোঁ ধরা হতে পারে কিন্তু মা অন্ত প্রাণ ছিল তার। অমন মাতৃগত প্রাণ সন্তান জগতে কমই দেখা যায়। অনুর হাতে হাতে যাকিছু কাজে খোকা ছিল মার নিত্য সঙ্গী। লেখাপড়া কৃতিত্বের সঙ্গে করেও রান্না থেকে ঠাকুরঘরের কাজ, সেলাই বোনা গান সবজিনিষে তার সমান দক্ষতা ছিল। তাই খোকন মার ও প্রভার বড় অহঙ্কারের বস্তু ছিল। তার দরাজ দরদী গলায় রামপ্রসাদী গান 'আমার দেহ হবে রাঙাজবা হৃদি বিল্বদল' শুনে শুনে প্রভার আশ আর মিটতো না। গদাই

খোকন সম্বন্ধে শিশুকালে শুধু উদাসীন বিরক্তই ছিলনা, বেশ কিছুটা নিষ্ঠুরও ছিল কিন্তু ছেলে যখন আপন কৃতিত্বে বড় চাকরি পেল, চতুর গদাই তখন ভোল পাল্টালো। হঠাৎ খোকন বিশেষ সমাদর পেল গদায়ের কাছে। ছেলের বন্ধুদের অগাধ প্রশ্রয় তার কাছে নিজে হাতে ছেলের কোট ঠিক করে দেয়, নিজে হাতে পাউডার লাগিয়ে দেয় মুখে অফিস যাওয়ার আগে। সরল খোকা এই অপ্রত্যাশিত সমাদর পেয়ে আনন্দ বিহ্বলতায় বাপের কোলে লুটিয়ে পড়লো।

এই সময় এবাড়ীতে একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছলনাময়ী যুবতীর আবির্ভাব ঘটলো।

শোনা গেল মেয়েটি গদায়ের বোনের সতীনের সঙ্গে দার্জ্জিলিং এ পরিচিতা। সেই বোনের সতীনের মেয়ের বিয়ের পরিচয় ধরে শনি ছিদ্র দিয়ে এবাড়ীতে প্রবেশ করলো। বয়সে মেয়েটি অনুর চেয়ে সামান্যই ছোট। অনুর শিশু বয়সে বিয়ে ও সন্তানরা হওয়ায় তার ছেলে মেয়েরা আজ বড় হয়েছে। কিন্তু তটিনীর কুড়ি বছর বয়সে বিয়ে হয়েও সঙ্গে এগারো বারো বছর বয়সের মেয়ে। মেয়ে দিপু কিন্তু তার মায়ের কাছে থাকতে পায় না। মেয়ে পাশে থাকলে তার বয়স বেশী লাগবে এই আশঙ্কায় সে তার দিদিমার কাছে থাকে। এই দিদিমাও কল্পনাপ্রসূতা। কারণ বছরের পর বছর তটিনী স্বামী সন্তান ছেড়ে গদায়ের সংসারে একান্নভুক্তা হয়ে থাকা সত্ত্বেও সেই দিদিমাকে কেউ কোনদিন চক্ষে দেখেনি। অনুর মৃত্যুশয্যাতেও তিনি অনুকে দেখতে আসেননি। শুধু তটিনীর মুখে তার মায়ের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের বিশেষ বিশেষ গড়নের উচ্ছসিত বর্ণনা শুনে খোকা ও গদায়ের সামনে প্রভা কুণ্ঠিত হয়েছেন। মেয়েটির নাম তটিনী না হয়ে রঙ্গিনী হলে সার্থকনামা হত। সবচেয়ে অদ্ভুত কথা সন্তান যা কিনা মায়ের গর্ব্বের জিনিষ, সেই সন্তানকে নিজেকে বুড়ো মনে হবে বলে যে মা দূরে রাখে, তার অন্তরের পরিচয় পেয়ে প্রভা আশঙ্কিত হন।

এই মেয়েটি এসে অনুপমার বাড়ীর সব ভোল পাল্টে দিলো। যে খোকন মায়ের হাতে হাতে কাজ করত সেই খোকনকে সে বোঝাল পুরুষ মানুষের কাজ করা বাপু আমি দেখতে পারি না। তাকে বলা ত যায় না তুমিত পর ঘরবাসী তোমার স্বামীর কাজ ত তিনি নিজেই করেন। তটিনীর চেয়ে আট বছরের কি দশ বছরের ছোট খোকনকে তটিনী ছোটদা বলে ডাকতে সুরু করলো।

খুকুকে হাত করলো বিলাসদ্রব্যের আমদানী করে। খুকু রূপের ডালি মেয়ে। গুণেরও তার কমতি ছিল না। তেমনি মধু ঢালা মিষ্টি গলা তার। তটিনী বুড়ো বয়সে গানের ইস্কুলে ভরতি হবার ছলে তার বরানগরের বাড়ী ছেড়ে অনুর বাড়ী আড্ডা গাড়লো। মেয়ে রইল বালিতে তার দিদিমার কাছে। স্বামী দশুেশ্বর পটলডাঙ্গার মেসে রইল। খুকুর সম্বন্ধে অনুর একটি বিশেষ দুর্ব্বলতা ছিল। নিজের বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতায় সে জানতো বিয়ের পর মেয়েমানুষের খোয়ারের শেষ থাকে না। সে কারণ খুকুর বিয়ে দিতে তার মনে ভয়ের অন্ত ছিল না, তার ওপর খুকুকে সে নড়ে বসতে দিতো না। খুকুর মেঘের মত এক ঢাল কালো কোঁকড়ান চুল ছিলো, সেই চুল নিজে হাতে না বেঁধে দিলে তার মনে শান্তি ছিল না। মৃত্যুর দুদিন আগেও সে হাঁপাতে হাঁপাতে খুকুর চুল বেঁধে দিয়ে গেছে। প্রভা বারণ করায় বলেছে, মাগো, আমি চুল বেঁধে না দিলে ওর মাথা ধরে মা। প্রভা অসন্তুষ্ট হয়ে বলেছেন, তা বলে হাঁপাতে হাঁপাতে চুল বাঁধতে হবে। তোরা কি আমার অনাদরের ছিলি? কিন্তু আমার ত মনেই পড়ে না কবে তোদের চুল বেঁধে দিয়েছি। সংসারের কাজ করে বাড়ীতে রোগীর সেবা করে সময়ই বা কোথায়? তোদের বাপের ত বারমাস রোগ, তোমরাও কম ভোগাওনি। এসব তোর শুদ্ধুরে আদর অনেক মা আছে না যারা মেয়ের ছেলে হলে নিজে নাতিনাতনীকে চান করিয়ে দেয়। তারপর মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে বলে, ওমা আমি ত স্নান করাতে জানিনা

আমার মা ত সেখানে স্নান করিয়ে দিতো। মার জয় জয়কার উঠতো সত্যি কিন্তু সেখানে নির্ভরযোগ্য লোক না থাকলে মেয়ে ছেলের চান নিয়ে হাবুডুবু খেতো। এসব শুধু আদিখ্যেতা। ছেলেপুলেকে স্বাবলম্বি হতে শেখাতে হয় এইটেই মায়ের কাজ। ম্লান হেসে অনু বলে, তবে মা তুমি যে পায়খানা গেলে আমায় নবছর অবধি পরিস্কার করে দিয়েছ তার বেলা? কে আবার ন বছর অবধি মেয়েকে ধুয়ে দেয়। প্রভার মুখে অতীতের কথা স্মরণ করে যেন স্নেহমেদুর ছায়া পড়ে। বলেন সে ত অনেক করেছি রে নিরেনব্বই জ্বর হলে তোদের বেডপ্যান দিয়েছি। উঠে বাথরুম যেতে দিইনি। কিন্তু বেমু হবার পর থেকে কি আর তোকে চান করাতে ধোয়াতে ছুটি পেয়েছি। এই শেষ শক্তি নিংড়ে কাজ করা আমি ভালোবাসিনা। মনে মনে প্রভা ভাবে, তুই ত আজ নিঃশেষ হতে বসেছিস কিন্তু তোর কথা আজ কে ভাবছে?

ঐ খুকু প্রভারও নয়নমনি। একদিন খুকুর মুখ ভার দেখলে প্রভার মনে শান্তি ছিল না। কঠিন সয়গুণ ছিল। খুকুর একবার মদনমোহন তলায় এক চাকর তার মাথায় উপর পিড়ি ফেলে দিয়েছিল। গদাই তখন বিলেতে। অনু বলে তোমায় কি বলবো মাগ্রিকোয়ারা দিয়ে রক্ত ছুটছে— মেয়ের মুখে একটু শব্দ নেই। বলতে বলতে অনু কেঁদে ফেলে। আর একদিনের কথা মনে পড়ে প্রভার। তখনও গদাই বিলেতে। খুকুর কানের পিঠে ফোড়া হয়েছিল মদনমোহন তলায়—কোটিপতি না হলেও বিশ লাখ টাকার মালিক খুকুর জ্যাঠা তাকে হাসপাতালের আউটডোরে নিয়ে গিয়ে বিনা পয়সায় কাটিয়ে নিয়ে আসে। প্রভা অনুর মুখে কথাটা শুনে বলেন, সে কি রে? প্রভার কাছে অনু বার বার করে কেঁদে বলে, জানো মা যখন খুকু বাড়ী এলো তখনও খুকুর ঠোঁট থর থর করে কাঁপছে। নীল হয়ে গেছে মুখখানা। কানটাতে হাত চাপা দিয়ে বলছে নান্না নান্না। খুকু যখন স্কুল কলেজে গেছে তার সাড়ী থেকে ব্লাউজ থেকে রুমাল পর্য্যন্ত সেট মিলিয়ে অনু বের করে দিয়েছে। সমস্ত জামা কাপড় নিজে সাবানে কেচে মাড় দিয়ে ইস্ত্রি করে সাজিয়েছে মেয়েকে।

আজ প্রভা কেঁদে কেঁদে ভাবেন অমন মা কি কেউ পায়? তাই কি অনুর ছেলেমেয়েরা এই শিশু বয়সে মাকে হারালো? অনুর ছেলেমেয়েরা মার মূল্য প্রচুর বুঝতো। মা তাদের অত্যন্ত গর্ব্বের বস্তু ছিল। কিন্তু চিড় ধরালো তটিনী এসে। খুকুকে বিলাসিতার মধ্যে চুবিয়ে দিলো সে। গান জলসায় খোকনের মনে নেশা ধরালো। মায়ের সঙ্গে কাজ করার ফুরসুৎ আর তাদের রইল না। মৃত্যুর দিনও প্রভা যখন বলেছেন অনু আমার রত্নগর্ভা। অনুর নিষ্প্রভ মুখখানি আনন্দে ভরে উঠেছে। মনে হয় আর্থিক অসাচ্ছল্যতার জন্য অনুর শৈশব জীবনে যে আনন্দের অভাব ছিল অনু তা খুকুর জীবনে পরিপূর্ণ করে দিলো। কিন্তু গদাই সংসারে টানাটানি কম করত না, কষ্টের সীমা পরিসীমা রইল না অনুর। অনু মাকে বলতো দেখোদেখি মা, পরের মেয়ে বাড়ীতে থাকলে সকলের খাওয়ার ষ্টাণ্ডার্ডই বেড়ে যায়। তার উপর তটিনী ভাত খেতো ভীমের আহার। তার তথাকথিত স্বামী বলতো বাড়তি আছে ভাবনা কি, তটিনীকে দিয়ে দিন। তটিনী ভরা পেটের ওপর অনায়াসে একজনের ভাত খেতো। বলতো জানো এটা আমার পৈত্রিক জিনিষ। এটার আমার লজ্জা নেই। এটা আমি গর্ব্বের কথা মনে করি। প্রভা ভাবেন লজ্জা কথাটা যে তোমার অভিধানে লিখতে ভুলে গেছেন সৃষ্টিকর্ত্তা, নইলে পরের বাড়ী এ ভাবে কোন ভদ্রঘরের মেয়ে থাকে? সেলাই করার নাম করে অনুর দামী দামী খুকুর জন্য কেনা জামার কাপড় সে নিয়ে যায়। দর্জ্জির পয়সা বাঁচবে এই লোভে গদাই তটিনীকে দিতে বলে আর ফেরে না। অনু লজ্জার তাগাদা দিতে পারে না। এর মধ্যে প্রভার মার্কেট থেকে কেনা একটা সোনালী লেপের কথা প্রভার মনে আছে। গদাইদের সেই বাড়ী, যারা মেয়েদের বোরকা পরিয়ে ভালো রাখে—কাজেই সাজার উপায় ছিল না বুবুর। সাজে পোষাকে তাকে দেখলে

প্রভার চেয়ে বৃদ্ধা মনে হত। সাজ ছিল অর্দ্ধ বিধবার সাজ। কিন্তু খুকুর বেলা সে আইন মানতে রাজি ছিল না অনু। অনু খুকুকে সাজাতো কিন্তু সে সাজ ছিল ভদ্র-রুচির সাজ কিন্তু তটিনী এলো সেই পেট পিঠ কাটা জামা পরে মাথায় মোহন চুড়া করা আর রং পাউডার আই-লাশ মেকাপ লোশান ক্রীমএতে ডুবে রইল। অবাক হয়ে প্রভা ভাবে, আজ কিন্তু এসব খারাপ মনে হল না গদায়ের। এমন কি মেয়েকে সেই ভাবে সাজতে বললো গদাই। প্রভা অত্যন্ত উদার আবহাওয়ার মানুষ। তবুও আজ মনে হয় পাড়ার গিন্নিরা যে বলছে যে সাংঘাতিক মেয়েমানুষ তটিনী ও বশীকরণ জানে তা কি সত্যি?

এরপর তটিনী খোকা খুকুর কাছে বলে বলে রটালো আমি এলে বাবা মাকে হাতের তেলোয় রাখি। মাকে বাবা আমি খাটতে দোব না। অথচ আবার এও শোনা যেত অনুর হাতের মাছের চপ, অনুর হাতের আলুর দম এমন তারিয়ে তারিয়ে তটিনী খায় যে অনুর নাকি না রেঁধে উপায় নেই।

গদাই হল স্বভাবে কাপুড়ে বাবু। যাকে সাদা বাংলায় বলে বাইরে কোঁচার পত্তন ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন। সংসারে সবদিকে টানাটানির অন্ত নেই। অথচ তখন খোকন চাকরী করে মোটা টাকা আনছে। গদায়েরও নেই নেই করে কিছু প্রাকটিস তো আছেই। তাছাড়া পৈত্রিক বাড়ীর ভাড়াতেও তো মোটা টাকা আসছে। তবু রান্নার লোক রাখা অনুর অদৃষ্টে জুটলো না। রান্নার আবার বিশেষ পদ্ধতি আছে। কিছুটা রান্না কাঠকয়লার কুকারে সস্তায় সব এক সঙ্গে সেদ্ধ হবে। সেই কুকারের ওপরের বাটিতে কিছুটা ডুমুর বা শাক শুধু জলে সেদ্ধ হত অনুর জন্যে। বাকি সব আলুর তরকারি। অনুর জন্য পৃথক রান্না হলে খরচ তো? তার চেয়ে উপোস ঢের ভালো।

এই সময় অনুর দুবার কার্ব্বংকল হল। ভয় পেলো প্রভা। অনু কেঁদে বললো লক্ষ্মিটি মা তুমি কিছু বোল না। জানোত মা কি অবুঝ মানুষ নিয়ে আমায় ঘর করতে হয়। এই সময় সদাশিববাবুর ডায়বেটিস বাড়ায় ডায়বেটিস স্পেশালিষ্ট কে বি ঘোষকে দেখান হল। তাঁর অদ্ভুত ডায়েট কন্ট্রোলের দরুন এক মাসে দশসের ওজন তাঁর কমে গেলো। প্রভা ডায়েট কন্ট্রোল করতে দিলেন না সদাশিববাবুকে। কিন্তু গদাই এ সুবর্ণ সুযোগ হারালো না। নিজে ডাক্তার, কাজেই বিনা ফীতে তক্ষুণি কে বি ঘোষকে দেখিয়ে অনুর অর্দ্ধাহার সিকি-আহারে সীমিত করলো। প্রভা হায় হায় করে উঠলেন। শুনলেন না অনুর কথা। গদাইকে গিয়ে বললেন, দেখলে তো তোমার শ্বশুরের অবস্থা? ও খুনে ডাক্তারের হাতে অনুকে দিও না। গদাই বললো, দেখুন ডাক্তারিটা অন্ততঃ আমি আপনার চেয়ে বেশী জানি। খোকন ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে দিদিমার দিকে চাইল অর্থাৎ আমাদের মার ভালো-মন্দ বাবাই সব চাইতে বোঝে। গদাইএর বাড়ীতে অর্ডার জারি হল। যত সোনার সামগ্রীই আমার বাড়ী আসুক না অনু যেন না খায়। আর রাজা যত বলে পরিষদ দলে বলে তার শতগুণ। তটিনী সর্ব্বদা বলে বেড়াতে লাগলো, না ভাই, মা বরং না খেয়ে থাকুক তবু মাকে বাঁচাতে হবে। কিছুতেই মাকে খাইয়ে মেরে ফেলতে দোব না দিদিমাকে। সতর্ক দৃষ্টি রাখা হল প্রভার দিকে। নিদারুণ অভিমানে প্রভা মুখ ফেরালেন।

তবুও পারেন না—হয়ত একটু স্যাকারিন দিয়ে ক্ষীর করে পাঠালেন অনুর জন্যে। মনে আশা স্যাকারিন দেওয়া ত। নিশ্চয় কেউ খাবে না। কিন্তু গিয়ে দেখেন তটিনী চেটে চেটে সেই ক্ষীর খাচ্ছে। বলছে রাগ করছ না ত মা? তোমার মার পাঠানো ক্ষীর খেলুম বলে? জানো ত মামাবাবু দেখলে অনর্থ করবে। দিদিমা ত অবুঝ মানুষ বোঝে না মার ভালোর জন্যই মাকে এসব খেতে দেওয়া যায় না। অনুর ভালো মন্দ অনুর মার চেয়ে তটিনী বেশী বোঝে এমন কথাও শুনতে হল প্রভাকে।

প্রভার মনে পড়ে, অনুর বিয়ের সময় নিরুর প্যানক্রিয়াস আলসার মত সন্দেহ করেছিল ডাক্তাররা। অনুর বিয়ের রাতেও নিরু শুধু দুধ ভাত খেয়েছে, আর কিছু খায়নি। খেতে দেননি প্রভা।

দিনে দিনে প্রভার চোখের সামনে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো অনু। নিরুপায় প্রভা মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এই সময় বাড়ীতে খোকন-খুকুর কলেজের বন্ধুদের প্রচুর সমাগম সুরু হল। মজলিশ বসালো ওটিন'—আর আহার জোগালো অনু তার শেষ শক্তি নিঃশেষ করে। যে গাঙ্গুলীদের বাড়ী গিয়ে চিরদিন সদাশিববাবু আর প্রভা বাজারের খাবার খেয়ে এসেছে, সেই গঙ্গাদের বাড়ীতে কিন্তু দোকানের খাবার আনা হল না। হঠাৎ ওটিনা বা খুকু খোকনের বন্ধু এলে তক্ষুণি ময়দার থালা হাতে করে অনুকে রান্নাঘরে ছুটতে হবে। আর রাতের মাছ যা ডায়েবেটিস রুগীর একমাত্র পথ্য তা ওদের মধ্যে বণ্টন করে রাতে ব্যাসনের ফুলুরী দিয়ে আহার সারতে হবে। প্রভার পক্ষে আর সহ্যের বাইরে চলে গেল। পারতপক্ষে প্রভা নিচে নামেন না।

বিশেষ করে একদিনের কথা মনে পড়ে প্রভার। নিরু খুব অসুস্থ। নিরুর মেয়ে প্রসব হতে এসেছে প্রভার কাছে। তার ঘন ঘন বেদনা উঠছে। প্রভা অনুকে ডেকে পাঠালেন—কিন্তু অনু আসতে পারলো না। নিরুর নাতি হবার পর কুণ্ঠাবিজড়িত মুখে অনু বললো কি করি বলো মা, সকাল থেকে চেষ্টা করছি, এক মিনিট ছুটি পাচ্ছি না। হঠাৎ দলবল শুদ্ধ ছেলের মেয়ের বন্ধুরা এলো—বসতে হল ময়দা নিয়ে। প্রভার মুখের ডগায় এলো, একদিনও কি তাদের দোকানের মিষ্টি দেওয়া যায় না? কিন্তু রাশ টানলেন মনে মনে। অনুর পরাধীনতা স্মরণ করে দুঃখ পেলেন।

এই সময় একটি মেয়ে দিদিমা বলে ডেকে প্রভার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। মেয়েটি খুকুর বন্ধু। শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তাই ছিল তাদের বাড়ীর প্রতিটি মানুষের আচার আচরণে ব্যবহারে। সেই মেয়েটি খুব সুন্দর লিখতো তার ডায়রীতে। সে অনুর বিষয় একটু লিখেছিল প্রভার বড় ভালো লেগেছিল, যেন সহজ ছবি অনুর=

সুস্মিতার ডায়রী

আজ সকালে উঠে মনে হল আমার স্মরণ তিথির ডায়রী খুলে বসি। আগের দিনের লেখাটা চোখ পড়লো আর সেই সঙ্গে একজনের মুখ মনে পড়তে মনটা খুশীতে ভরে উঠলো। আমার মনে পড়লো মাসীমাকে।

যিনি শিপ্রার মা হয়ে এসে আমাদের সকলের মা হয়ে গেলেন। মায়ের কোন বিশেষ মূর্তি আছে কি? যদি থাকে তবে সে কি রকম জানিনে। কিন্তু মাসীমাকে দেখা মাত্রই আমার মনে হয়েছে ইনি চিরন্তন বিশ্বজননী মা। এমন শান্ত স্নিগ্ধ পবিত্র সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি আমি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শুধু আমিই নই যত জন তাঁর কাছে এসেছে, বলেছে মায়ের মত মা। মাঝে মাঝে আমার এ কথাই মনে হয় পূর্ব্বজন্মে হয়ত আমার কিছু সুকৃতি ছিল তাই এমন মানুষের দেখা পেলেম জীবনে। আমার সমস্ত দৈন্য যেন এঁদের প্রভাবে ঐশ্বর্য্যময় হয়ে ওঠে। অস্বীকার করিনে, আমি স্নেহের কাঙাল। কিন্তু মাসীমার স্নেহের কাঙাল সকলেই। যে একবার এই স্নেহ পেয়েছে সে ধরে নিয়েছে এ তার প্রাপ্য। এ দাবী সে ছাড়তে চায় না। আমিও চাইনে। ওঁর আদর আমায় বোধহয় মাথায় তুলে দিয়েছে। কিছুতে নামতে রাজী নই আমি। কিন্তু মুস্কিল বেধেছে অন্যত্র। সকলেরই সমধিক দাবি। সকলেই তার পাওনা চায় পূর্ণ মাত্রায়! একতিল ছাড়তে রাজী নয় কেউ। আমিও বা ছাড়বো কেন? আমার ন্যায্য অধিকার আছে যে। সব সময় দাবি জানাতে পেরে উঠিনে। কিন্তু জানি বড় কাছে আছি তাই মাঝে মাঝে টান পড়ে স্নেহের সুতোয়। যদি থাকতেম বহু দূরে টান পড়তো

না ভাতে। মাঝে মাঝে ভয়ে উঠতো প্রাণ। আমার চিঠির আশায় থাকতেন মাসীমা। চিঠি পাওয়া মাত্র ওঁর হাজার কাজের মধ্যে তাকে পড়তেন সর্ব্বাগ্রে। চিঠি দিতেন তাড়াতাড়ি। দেখা হলে দিশাহারা হয়ে উঠতেন, কী করবেন ভেবে পেতেন না। দূরের মেয়ের জন্য মার মন থাকতো ব্যাকুল হয়ে। কি জানি সে কেমন আছে? কতদিন দেখিনি তাকে মনে হত বারবার। আমার ক্ষেত্রে তা হবার জো নেই। নিত্য দেখা মেলে। কেমন আছি ভাববার সুযোগ না দিয়েই কাছে গিয়ে হাজির হই। দিশেহারা হবার আগেই বিব্রত করে তুলি। আদরের এক কণা ঘাটতি হলে আমার অভিযোগের অন্ত থাকে না। আমি জোর করে কেড়ে নিই আমার প্রাপ্য যক্ষপুরীর রাজার মত। হৃদয়ের ধনকে শক্তির মুঠোয় পেতে চাই। কিন্তু পাই কি? এই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি আজো। কিন্তু এ ভাবনা আমায় যন্ত্রণা দেয়।

মাসীমাকে মায়ের রূপেই সব সময় দেখি আমরা। কিন্তু এই রূপের অন্তরালে তাঁর যে আরো দুটি সত্তা আছে তাকে কি আমরা কখন দেখবার চেষ্টা করি? তাঁর যে আমাদের কাছে কিছু পাওনা আছে তা কি আমরা দিই? আমরা মায়ের ওপর দাবী করি স্নেহের। তার এক কণা ঘাটতি হলে নিমগ্ন হই অভিমানের অতল সাগরে। কিন্তু মায়ের অন্তরে যে শিল্পী আর কবি বাস করে তার দিকে চাইনা আমরা। মাঝে মাঝে অবশ্য ভারি বিস্ময় জাগে আমার। এমন নীরব শিল্পী আমি দেখিনি। নিজের প্রতিভাকে বিকাশ করার দিকে কোন চেষ্টা নেই ওঁর। কবিতার খাতা যায় হারিয়ে। হিসেব লেখার ডায়রীতে পেনসিলে ছন্দতরঙ্গ খেলা করে কিছুক্ষণ। তারপর তার তরঙ্গ যায় মিলিয়ে। কিন্তু আবার নীরবে তরঙ্গ ওঠে। আমরা কখনো দেখতে চাইনি। তাই আমরা কাব্য-বিহারীকে কখন আত্মবিহ্বল হয়ে ভোরের পাখীর মতন সাহিত্যাকাশে ডেকে উঠেছিলেম তাই নিয়ে ঐশ্বর্য্যের বীজ ছড়িয়ে দি। অথচ এমন পরিবেশে এমন নীরবে হিসেবের খাতায় যে কাব্য সৃষ্ট হচ্ছে তার সন্ধান রাখি না। অথচ উনি জাত কবি। তাই এমন পরিবেশেও কাব্য সৃষ্ট হয়। আমরা কতটুকু শ্রদ্ধা ওঁকে দিয়েছি? কবেই বা স্বীকার করেছি। কিন্তু প্রয়োজন নেই ওঁর শ্রদ্ধার আর স্বীকৃতির উনি একান্তই মজ্জায় কবি। নিজের খেয়ালে নিজের আত্মার আনন্দে হিসেবের খাতায় কিংবা ক্যালেণ্ডারের পাতায় ফের কাব্য রচনা করবেন।

আর শিল্পী আছে সে মাসীমার অন্তরলোকে অহরহ জেগে। যে প্রতি মুহূর্ত্ত স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের ছায়া ফেলছে। সেই মাতৃরূপে তাকে কি আমরা দেখেছি। সেই শিল্পীও নীরব। নীরবে নির্জ্জনে ছবি এঁকে চলেছে সে, সে শিল্পী সৌন্দর্য্যের পূজারী শিল্পীর কাজ সুন্দরের আরাধনা আর সুন্দরের উপাসনা করতে গিয়ে সে কি পায়? সে পায় এক অদ্ভুত তৃপ্তি আর আনন্দের দীপ্তি। আমার মাসীমা প্রকৃত শিল্পী। কোনও শিক্ষালাভ করতে হয়নি ওঁকে। কোনও কলা প্রদর্শনীতে যাবার যোগ্যতা পাননি উনি, বহু-মূল্য ওঁর ছবি বিকোবে না কোনও দিন। কিন্তু বিশ্ব-স্রষ্টা এক সত্যিকারের শিল্পী সৃষ্টি করে রেখেছেন ওঁকে। মাঝে মাঝে একথা ভাবলে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে আমি অবনত হই। কিন্তু না আমরা মাসীমাকে মা ভেবেই পেতে চাই। দাবী নিয়েই কাড়াকাড়ি করতে চাই। সর্ব্বক্ষণ ওঁর স্নেহ অঞ্চলের তলায় থাকবো—প্রতিদিনের প্রত্যাশা সেই স্নিগ্ধ হাসি আর উদার আহ্বানের॥

সুমিতা

এ রকম বন্ধুও খুকুর ছিল কিন্তু তটিনী এসে সে সব বন্ধু দূর হটিয়ে দিলো। এককালে যারা খুকুর অন্তরঙ্গ ছিল তারা আজ এই রঙ্গিণীর প্রভাব দেখে অভিমানে ভারাক্রান্ত হল। অপু ছুটে এল তার প্রাণভরা স্নেহ দিয়ে খুকুর ত্রুটি ঢাকা দেবার জন্যে। অত্যধিক আদরে খুকু একটু খেয়ালী হয়ে গিয়েছিলো। এমনও দিন হয়েছে সুমিতা বহু কষ্টে সময় করে এসেছে খুকুর জন্য। কিন্তু খুকু তাকে বসিয়ে রেখে তটিনীকে নিয়ে পার্কে বেড়াতে

গেছে। অনু এ ঘটনায় দুঃখিত হত। কিন্তু খুকু অবুঝ, সে বুঝবে না। এইভাবে তাকে বোঝানর বৃথা চেষ্টা না করে যতটা পারে নিজেই তার ক্ষুধা ঠাণ্ডা করতো। উপাদান ছিল তার মনের শান্ত স্নিগ্ধ মাতৃত্ব। আর নিজে হাতে করে জোগাড় করা কিছু উৎকৃষ্ট আহার্য্য। এই আহার্য্য যে সব সময় দুষ্প্রাপ্য বা মূল্যবান হত তা নয়। কিন্তু মায়ের ব্যাকুল আগ্রহ আহার্যটিকে সন্তানের চক্ষে মূল্যবান ও লোভনীয় করে তুলত।

এইবার অনুর হাতেপায়ে একটা ঝিন ঝিন ধরা কষ্ট হল—পরে ডাক্তাররা প্রভাকে বলেন ওর নার্ভ শুকিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু প্রভা নিরুপায়। প্রভার একটা কথাও গদাই শুনবে না। একটা প্রবাদ আছে না অহঙ্কারই পতনের মূল। সেই গদাইএর অহঙ্কারই অনুর অকালে মৃত্যুর কারণ হল। কর্মাটাড়ে প্রভাদের বাড়ী। কিন্তু প্রভা বড় জামাই মেয়ে নিয়ে সেখানে গেলেও অনুর সেখানে যাবার উপায় রইল না। আবার কোন ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কার বাড়ী সংগ্রহ করে গদাই ছেলেমেয়ে আর অনুকে নিয়ে চেঞ্জে গেল কিন্তু অনু সেখানে গিয়ে আরো অসুস্থ হয়ে ফিরলো।

এর মধ্যে তটিনী কি গদাই কে জানে কে একটা নতুন ফন্দী বের করলো। একই ফোন ওপরে ও নিচে ছিল। সেই ফোন ধরে ধরে নিত্যি নতুন কথার সৃষ্টি করে প্রভা ও সদাশিবের বিরুদ্ধে নানা ঘটনা বলে অনু ও ছেলে-মেয়েকে তাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ করার প্রাণপণ চেষ্টা চললো। ফন্দিটি খাটলো না অনুরাণীর কাছে আর খাটলো না, বাসুদেবের কাছে—সম্পূর্ণভাবে। কিন্তু প্রভার বুকে ক'রে মানুষ করা খোকন খুকু ধীরে ধীরে প্রভার কাছ থেকে দূরে সরে গেলো। একা গদায়ের পক্ষে এবাজ করা কঠিন ছিল। তাই সে অস্ত্রস্বরূপ তটিনীকে চালনা করল। সরল অবোধ খোকন খুকু সম্পূর্ণ সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল কারণ তারা মামার বাড়ীতে মানুষ এবং সর্ব্বদা গদায়ের ঘরজামাই সংক্রান্ত ফলে সে অকারণ অসম্মান বোধ করে, আস্ফালনের ফলে প্রভা ও সদাশিববাবু এত সন্ত্রস্ত থাকতেন যে সাধারণ একটা অন্যায় বা ভুল করলে অনুর ছেলে পুলেকে ত বলার সাহস তাঁদের ছিলনা। যা অনায়াসে নিরুর ছেলেমেয়ে বা বেণুর ছেলেমেয়েকে তাঁরা বলতে পারতেন।

গদায়ের বোঝানর দক্ষতা অসাধারণ ছিল। বাসুদেবের মত বুদ্ধিমান ছেলেকে তার বাগ্মীতার গুণে বুঝিয়েছিল যে গদায়ের সতীর্থ মতি যে আজ এত উন্নতি করলো সে শুধু তার লোক-দেখানির ফলে। একই সঙ্গে গদাই ও মতি ট্রপিকাল স্কুলে কাজ করত। গদাই শুধু তার দুটো রক্ত পরীক্ষা শেষ করেই ল্যাবরেটারী থেকে পালিয়ে এসে ঘুমতো। আর শয়তান মতি সব ডাক্তারদের সঙ্গে সারা হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে রুগী দেখে দেখে বেড়িয়ে তারপর সব ডাক্তাররা চলে যাবার পর রাত আটটা অবধি ল্যাবরেটারীতে কাজ করত। তীক্ষ্ণ মেধাবী বাসুদেবও এই সহজ কথাটা বুঝতে পারতো না যে, যে ডাক্তার বড় ডাক্তারদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অসুখ দেখে বেড়ায় তার কতটা অভিজ্ঞতা হয়? তারই ফলে সে উন্নতি করেছে। ফাঁকি দিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে বাড়ীতে ঘুমলে সে নিজেই ফাঁকে পড়ে। বাসুদেব শত হোক শিশু, সে গ্রামোফোন রেকর্ডের মত বাবার সেই কথাই পুনরুক্ত করে বেড়াত। শুনে শুনে প্রভা ভাবতো গদায়ের বুঝানোর কেরামতি আছে বটে।

কত কথাই আজ মনে পড়ে, বিপদহারিণীর সঙ্গেই যখন সম্পর্ক তুলে দিলো গদাই, প্রভা দুঃখ পেয়েছিলেন। কিন্তু গদাই বলেছিল, ওর ছেলেগুলো মামলার সময় খেটেছে তাই ওকে সয়েছি। এখন কাজ ফুরিয়েছে লাথি মেরে তাড়িয়ে দোব। কথাটা শুনে আহত হয়েছিলেন সদাশিব বাবু। অনুর ব্যবহার স্বতন্ত্র ছিল। গদায়ের আইন ছিল তার ভাই বা বোনের ছেলেরা এলে এককাপ চাও দেওয়া হবে না। অনু কাঁদ কাঁদ মুখে বলতো, দেখো দেখি মা ছেলেপুলেদের খেতে দিচ্ছে এমন সময় ওবাড়ীর ঝণ্টু মণ্টু এলো কি করে ওদের না দিয়ে পারি বলো ত? পরে গদাই বেরিয়ে গেলে

তাদের খাবার দিত। তারাও সময় বুঝে আসতো। যখন গদাই থাকতো না তখন ছিল তাদের সব চাওয়া নেওয়া। অনু তার মায়ের শিক্ষায় নিজের মমতা কোন হৃদয়ের উদার দাক্ষিণ্যে ভাবতো। পরে ওরা খারাপ ব্যবহার করেছিল সত্যি কিন্তু আগে আমাদের ভালোওবাসত তাও ঠিক।

এইবার বাড়ীতে বেরিবেরি হল। হল দুজনের। কর্ত্তা সদাশিব বাবুর ও অনুর। এরই আগে উপোসে উপোসে উপোসে অনু জীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, পরে প্রভা নিরুর কাছে শুনেছে নিরু নাকি অনুকে বলেছিল বাবা কি করে তুই রুটি খেয়ে বারমাস থাকিস? অনু বলেছিল রুটি খেতে কষ্ট হয়না রে কষ্ট হয় খিদের।" আজকে প্রভা কেঁদে কেঁদে ভাবেন অদৃষ্টে কতই ছিল। ডায়বেটিস সিরোসিস হার্ট ডায়লেটেশান এতগুলো ভয়াবহ রোগ নিয়ে যদি আজ সদাশিব বাবু আটষট্টি বছর বয়স অবধি কাটাতে পারেন তো অনু কেন ছত্রিশ বছর বয়সে চলে গেল? কেন সে পেট ভরে খেতে পেল না? ভাত আলু দেওয়া যায় না সত্যি কিন্তু প্রোটিন খাবারে তো তার কোন বারণ ছিল না।

যখনই খাবার দিতে গেছেন সদাশিব বাবুকে শুনেছেন এখনও তাঁর খিদে হয়নি। প্রভা বলতো সে কিগো সেই কোন সকালে তিনখানা শুকনো রুটি খেয়েছ? আমার মতন পোড়াকপাল কার আছে বলো মুটে মজুরের স্ত্রীরাও তার স্বামীকে থালাভরে ভাত দেয়, আমার এমনি অদৃষ্ট—তাও দেবার উপায় নেই।

সদাশিব বাবু হেসে বলতেন কিন্তু তার সঙ্গে আঁশের দুধ একপো মাছ ভুলে গেলে চলবে কেন? আমি ত সেরা মাল খাই তোমরা ত ভুষি মাল খাচ্ছ। "কই তুমি একবাটি দুধ খাও ত দেখি বিকেলে খিদের নাম গন্ধ থাকবেনা।" প্রভা বলতেন তোমার সঙ্গে কথা বলা ঝকমারি, সব কথা উল্টে দেবে। ডাক্তাররা যাই বলুক না কেন, অসুখ হলে দেখেছি ত যত আদুর বেদানাই খাইনা কেন, একমুঠো ভাত খেলে তবে মাথা ঘোরা সারবে। সদাশিব বাবু বলতেন জানো ত ভাত থেকে হাড় হয় ওটা মাধ্যন্দ্রব্যের গুণ। প্রভা বিরক্ত হয়ে বলতেন অত শত জানিনা বাবা যত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা আছে তোমার কথার ঝোলাতে।

শুধু কি তাই, কি অসুখ হয়নি সদাশিববাবুর? দু দুবার ম্যালিগ নেন্ট ম্যালেরিয়া। সে কী কষ্ট, আজো মনে আছে প্রভার। ভাগ্যে পোষ্টাপিসের মাসীমা ছিলেন তাই সেবার মিহিজামে রক্ষা পেয়েছিলেন।

অমন মানুষ প্রভা জীবনে দেখেননি। তাঁর নাম ছিল স্বর্ণলতা। সত্যি সত্যি কাঁচাসোনার রং ছিল তাঁর। কিন্তু প্রভার মনে হয়, তাঁর নাম সেবারতা হলেই যেন ঠিক হত। অমন সেবা-কোমল হাত আর দেখেনি প্রভা। নিজের সন্তান তাঁর হয়নি কিন্তু অপরের সন্তানকে অমন ভালোবাসতে যে মানুষ পারে তা প্রভার জানা ছিল না। মর্ত্তের মধ্যে যেন মূর্ত্তিমতী দেবী। দুরন্ত ক্যানসার রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর সময় প্রভা উপস্থিত ছিলেন না বটে কিন্তু মৃত্যুর আগের দিনও তাঁর যে ধীর স্থির অবিচল মূর্ত্তি প্রভা দেখেছেন তা আশ্চর্য্য বলে মনে হয়। তাঁকে হারিয়ে প্রভা সত্যি সত্যি মৃত্যু-শোক পেয়েছিলেন। সদাশিববাবুর আর একবার ম্যালেরিয়া হয় চাঁইপায় চন্দ্রনাথদার বাড়ীতে। চন্দ্রনাথ দা সেখানকার সিভিল সার্জ্জন। তাঁর অবিরাম চেষ্টায় সেবার জীবন রক্ষা হয়। বরফ পাওয়া যেতনা ওখানে, চন্দ্রনাথ দা মটোরে করে অনেকদূর থেকে বরফ আনিয়ে দিতেন। প্রভার জীবনে মাতৃবৎ স্নেহ প্রচুর এসেছে কিন্তু এমনি অদৃষ্টের পরিহাস যাঁদের ভালোবাসা তাঁর একান্তই প্রাপ্য ছিল তাঁদের কাছেই বঞ্চিত হলেন প্রভা। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস।

এরপর পর পর দুবার টাইফয়েড কাউকে এ্যাজমা বেনাস কলিক হয় নি কি? আজীবনই ত প্রভা দুর্জ্জয় মনের শক্তিতে নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত সেবা ও ডাক্তার বদ্যি পথ্যে তাঁকে সুস্থ করে তুলেছেন। আজ প্রভা কাঁদেন আর ভাবেন তাঁর সবচেয়ে সুস্থ সন্তান অনুরাণী

তিনি বেঁচে থাকতে এই ভাবে অনাহারে অচিকিৎসায় প্রাণ হারালো, এর চেয়ে বড় শাস্তি আর মায়ের কি হতে পারে? অনুই ছিল তার তিন সন্তানের মধ্যে সুস্থ, সেই অনুও নেই। হায় ভগবান! চাঁদ উঠছে সূর্য্য উঠছে জগৎ তেমনি চলছে কিন্তু প্রভার জীবন সেই সেদিন রাত আটটায় জন্মের মত থেমে গেছে। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তিনি দেখছেন সবাই সবই করে যাচ্ছে হাসছে কথা কইছে কাজ করছে—একান্ত প্রিয়জনেরা প্রভার অবস্থা দেখে মাঝে মাঝে অভিভূত বিচলিতও হচ্ছে তবু চলছে জগৎ ঠিক আগের মত। প্রভা বিড় বিড় করে সেই একই কথা বলে চলেছে অনুর কী কষ্ট. ঠোঁট দুটো নীল হয়ে গেছে একবার মুখ তুলে চাইতে পারলো না। বাবাগো কী কষ্ট! বিব্রত হন সদাশিব বাবু। বলেন আর ত তার কষ্ট নেই এখনও সে কথা ভাবছো কেন? ব্রহ্মচারী বলেন, মা! মা! তোমার ইষ্টনাম জপ করো, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। ঘুমুতে চেষ্টা করো মা। ডাক্তাররা ঘুমের ওষুধের মাত্রা বাড়াল।

হাঁ বেরিবেরি চল, সদাশিব বাবুকে নিয়ে প্রভা রওয়ানা হলেন হার্টের স্পেশালিষ্টের কাছে। তাঁর কথামত ওষুধ পথ্যে এক সপ্তাহের মধ্যে সদাশিব বাবু সুস্থ হলেন। অনুমা বলতো বাবার যদি অসুখ হয়, পৃথিবীশুদ্ধ লোককে পাগল করে দেবে মা তারপর দুতিন দিনের মধ্যে বাবা সেরে উঠবে। সদাশিব বাবুর অসুখ হলে প্রভার কাছে সব চেয়ে বেশী বকুনি খেতো প্রভার মেয়েরা। প্রভা বলতেন তোরা কি রে? বাপের অসুখ তোদের ভাবনা নেই? মেয়েরা কিন্তু বাপের সম্বন্ধে মোটেই অচেতন ছিলোনা। তবু সদাশিব বাবুর সম্বন্ধে অকারণ তাদের অযথা আশঙ্কায় প্রভা ব্যস্ত হতেন। বলতেন যা করার এখন কর শেষে শুধু ছবিতে মালা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকবেনা। এখন প্রভা কেঁদে ভাবেন, তিনি কি জানতেন আজ তার অনুরাণীর ছবিতে তিনিই মালা দিয়ে সাজাচ্ছেন। আর কিছু তার জন্য করবার নেই—এমন কি তার সন্তানদেরও জন্য তাঁর করবার কিছু নেই। ভাগ্য এমনি বিরূপ তাঁর প্রতি। প্রভার জগতে একধারে সারা পৃথিবী আর একধারে ছিল তাঁর বাবা। সে কারণ পিতৃভক্তির ঔদাসীন্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পতিভক্তিও তাঁর কম ছিল না কিন্তু নত হয়ে সমীহ করে কথা কইতে তিনি জানতেন না। তার সীমাহীন ভালোবাসা সেকারণ অনেক সময়ই নিদারুণ ব্যর্থতায় ফিরে এসেছে। কিন্তু মাঝে দুষ্ট চক্রী কেউ না থাকলে তাঁর ভালোবাসা পরের কাছেও কোনদিন ব্যর্থ হয়নি। কারণ জিনিষটা ছিল খাঁটি। তবে মানুষ ভালোবাসে স্বাধীনতা, জোর করে অপরের ভালো করার মত বিড়ম্বনা পৃথিবীতে আর নেই। মানুষ নিজের বুদ্ধিতে ঠকতেও ভালোবাসে কিন্তু পরের বুদ্ধিতে জিততেও সে রাজী নয়। এমনি অহং এ মর্ত্ত্য এ পৃথিবী। বারে বারে আঘাত পেয়েছেন প্রভা তবু তাঁর আজো জ্ঞান হয়নি।

সদাশিববাবু সেরে উঠলেন কিন্তু অনুমা সারলো না। কে বি ঘোষের ডায়েটিং এ অর্দ্ধেক জীবনী শক্তি তার নিঃশেষ হয়েছিল বাকি শেষ হতে চলছিল বারোমাসে তের পার্ব্বণ পূজার। মাসের মধ্যে অন্ততঃ দশদিন তার উপবাস। বাকি কুড়ি দিন সকাল দশটার পর জল খাওয়া। দুপুরে তিনটেয় গদাই ফিরলে তবে অনু খাবে। প্রভা ভাবেন গদায়ের কথা ছেড়ে দিই। ছেলে-মেয়েরা কেন ভাবেনা যে মানুষ রাতে একখানা রুটি খেয়ে থাকবে সে কি করে বেলা দশটা অবধি জল না খেয়ে থাকবে। এই উপবাসের ফলে অনুর এ্যাসিটোন বাড়তে লাগলো। যা ডায়বেটিস-রুগীর পক্ষে মারাত্মক। মনে মনে প্রভা খোকন খুকুর উপরে অভিমানে আত্মহারা হলেন। অমন মায়ের প্রতি উদাসীন তারা। অনু আদর দিয়ে দিয়ে ছেলে মেয়েদের দেবভাব আনিয়ে দিয়েছে, তারা শুধু নিতেই জানে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের দোষ ছিল না। গদায়ের ছলনায় ভুলেছিল তারা। যে সব ছেলেমেয়েরা ভালো তারা সচরাচর পিতৃভক্ত হয়ই। তাছাড়া বরং রাগী গদায়ের সম্বন্ধে

ছেলেমেয়েদের সাবধান করতে অনু বলতো "দেখো তোমরা জীবনে কখনো বাবার অমতে চলো না। যদি মনে করো তিনি ভুল বুঝছেন তবুও প্রতিবাদ কোর না। দেখো তাতে তোমাদের মঙ্গলই হবে।" এইত আমাদের ধর্মের শেষ কথা। ভগবানে সমস্ত অর্পণ করো, তিনি দুঃখ দিন বেদনা দিন ভ্রান্তি দিন তবুও সম্পূর্ণভাবে তাঁকে আত্মসমর্পণ করে তাঁর দেওয়া জীবন নিনা প্রতিবাদে সহজভাবে মেনে চলতে হবে। শুধু মার কাছে অনু বলতো, জানো মা, তোমার জামাই ত জানে ঘ্যাক্ করে চেঁচালেই আমি ভয় পাই—সে অস্ত্রই ও চালাচ্ছে।

অনুমা ক্ষিধের জ্বালায় চা খাওয়া বাড়ালো। ফলে খালি পেটের চা বার বার খাওয়ায় সে গ্যাসট্রিক আলসারে আক্রান্ত হল। তবুও না হল চৈতন্য গদায়ের, না হল তার ছেলেমেয়ের। অনুমা চা ছেড়ে পান ধরলো। প্রভা বললো হঠাৎ পান ধরলি যে? অনু কথাটা চাপা দেয়। বলে জানো মা পান খেলে বেশী ক্ষিধে পায় না। প্রভা আর পারেন না। বলেন কেন যে অত কম খাস তুই? অত ডাক্তারদের কথা মানতে হবে না। দেখনা তোর বাবাকে সব ডাক্তার মাখনের মাঠা তোলা দুধ খেতে বলেছে, আমি এক সের পাঁচপো দুধ তো ওকে দিই-ই। বাড়ীর সমস্ত দুধের সরটা চিরকাল ও খায়। কি ক্ষতি হয়েছে তাতে? অনু নত ভাবে বলে জানোমা কি রকম গোঁয়ার মানুষ নিয়ে আমায় চালাতে হয়? কখন কি ওষুধ খাচ্ছে তার নামও আমি জানিনা। আমি যতটা খাব তার সঙ্গে মেপে আমায় খেতে হবে। লুকিয়ে খাবার আমার উপায় নেই মা। নইলে নিজের ক্ষিধের জন্য নয় শুধু তোমায় শান্তি দেবার জন্যও আমি খেতুম। প্রভা আড়ালে চোখের জল মোছেন। একি সখাত সলিল হল তাঁর?

তবুও প্রভা হাল ছাড়েন না। হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাঃ রায়ের প্রেসক্রিপশান নিয়ে তিনি গেলেন গদাই-এর কাছে। গিয়ে বলেন এই ওষুধ খেয়ে ত তোমার শ্বশুর সেরে গেলেন। অনুকে খাওয়ালে হয় না? এবার গদাই মোক্ষম অস্ত্র ছাড়লো, বললো আমারও ত পা ফুলেছে এটা অন্য পা ফোলা আপনি বুঝবেন না। গদায়ের মজা হল অন্যের সর্দি হলে তা পুঁয় সর্দি নয়। বাড়ীতে কারুর জ্বর হলে ও ফুঁপ সে প্রচার করবে তারও ভীষণ জ্বর কিন্তু তার ত শোবার উপায় নেই কাজেই সে জ্বর গায়েই কাজ করে বেড়াচ্ছে। এমন কি থার্মোমিটার দেওয়ারও সময় নেই। কাজেই যার জ্বর হয়েছে সে লজ্জায় নিজের জ্বরের কথা আর বলতে কুণ্ঠা পাবে।

এবারও এই অস্ত্রে সে বাজিমাৎ করলো। তবুও আঁকড়ে প্রভা ছাড়েন না। বলেন আমার সই বলছিল যে পা ফোলায় পুনর্নবার রস ভালো। তোমরা খাওনা সবাই। বিদ্রূপভরে গদাই বললো, আমাদের বাড়ীশুদ্ধ বেরিবেরি হয়েছিল। কোবরেজ মশাই পুনর্নবার রস দিয়েছিলেন, ওতে ঘেঁচু হয়। প্রভা বলতে পারেন না যে ঘেঁচু আর কই হয়েছে? হলে ত বাঁচতুম। এই গোঁয়ারের হাতে মেয়ে দিয়ে আমার প্রাণান্ত হত না। বেশ জলজ্যান্ত বেঁচে তড়পাচ্ছো তো? এই বেরিবেরির কথায় আরো মনে পড়ে, অনুর জা তারার যখন বেরিবেরি হয় মাণিকচাঁদ গদায়ের হাতে তাকে ফেলে না রেখে ডাঃ চৌধুরীকে আনিয়েছিলেন। তাতেই তারা সেরে উঠলো ও আজো বহাল তবিয়তে আছে। কিন্তু পরাজয়ের লজ্জায় গদাই ক্ষেপে উঠলো তখন কোরামিনের যুগ। ডাঃ চৌধুরীর কথামত কোরামিন তারা খাওয়ায় গদাই বললো বৌদি আর বেশীদিন নয় এসব ডাক্তারদের খুন করে মারতে হয়। প্রভার বাবার অসুখে ডাঃ ঘুমের জন্য গাড়িনাল দিতে বলেছিল, সর্বনাশ গাড়িনাল খেলে আর রক্ষে নেই। কতদিন কতপ্রয়োজনেও আর গার্ডিনাল দিতে পারেন নি প্রভা। কিন্তু প্রত্যেকবার রক্ষে করেছে অন্য ডাক্তার এসে কিন্তু অনুকে আজ কে রক্ষা করে। অদৃষ্টের পরিহাস এই সময় নিরু অসুস্থ হল কঠিন অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে নার্সিং-হোমে রাখা হল। প্রভা বিব্রত হয়ে পড়লেন তাকে নিয়ে।

দীপকের বাড়ীতে প্রভার সম্মান ছিল। সদাশিববাবু

ও প্রভার কথামত চিকিৎসা হত নিরুপমা'র। কাজেই নার্সিং-হোমে প্রভা অপরিহার্য্য হয়ে উঠলেন। প্রথমত অনুর দুঃখ নিবারণে প্রভার কোন হাত নেই, তার ওপর সত্যি সত্যি যে গদাই চিকিৎসা কিছুই জানে না ইচ্ছে করে অনুপমাকে অবহেলা করবে এ বিষয় আজকের মত প্রভা নিঃসংশয় ছিলেন না। পর পর পাঁচবার অপারেশন করতে হল নিরুপমাকে—গ্রহের ফের। সংসার স্বামী সবের ভার বেণু'কে আনিয়ে তার হাতে তুলে দিয়ে প্রভা নার্সিং-হোমবাসী হলেন। দিনরাত সেখানেই থাকেন, বাড়ী থেকে তার খাবার যায়। একবার এমন অপারেশন হল যে টেবিলেই বুঝি প্রাণ যায়। ডাঃ ঘোষ বললেন, "জানি না কি হয়েছে ওর যতই কাটি ততই পচা টিসু! আমি ক্যান্সার ভেবে অপারেশন করেছি। বায়োপ্সি করতে পাঠান দেখা যায় কি হয়। মেয়ের টেবিলেই পালস্ চলে গিয়েছিলো, আমি এ্যানাসথিসিস বন্ধ করে জ্ঞানে অপারেশন করেছি।" নাকে অক্সিজেন হাতে ব্লাড, ওধারে স্যালাইন দেওয়া অবস্থায় নিরুপমাকে এনে টেবিলে ফেললো। প্রভার অবস্থা তখন সঙ্গীন। সেদিনও স্বাধীন অনুপমার সাধ্য ছিল না যে মার কাছে গিয়ে একবার দাঁড়ায়। বেণু'র কাছে নাকি অনু কেঁদে বলেছিল দেখ না কি সংসারের জালেই জড়িয়ে পড়েছি—ভাবতে কেমন লাগে যে দিদির গায়ে ছুরি চালাচ্ছে আর আমি বসে বসে নারকেল কুড়চ্ছি।

একুশদিন বাদে বায়োপ্সির খবর আসবে। সদাশিববাবু আর প্রভার দিন আর কাটেনা। তার ওপর তখনও প্রভা সুস্থ হননি। হার্টের কষ্ট অবস্থায় বাইরে থাকা সহজ সাধ্য নয় তবুও প্রভা নিরুপমাকে ছেড়ে আসতে পারেন না। তাতেও গদাই-এর গাত্রদাহ! প্রভাকে বলে, দরকার কি এত কষ্ট করে আপনার এখানে থাকার? নার্সের হাতে দিয়ে চলে যান? আবার বেণু'র কাছে বলে বাবা মা যেন দিদির কেনা ঝি, অমন কষ্ট করে আমরা হলে থাকতে পারতুম না। প্রভা মনে মনে আঘাত পান। এবারে অনুর জ্ঞান আসতেই তাঁকে দেখতে তার শ্বশুরবাড়ীর সবাই আসতে লাগলো। মামার বাড়ী, বেণু ও বেণু'র বর, বোনের বাড়ীর বন্ধুবান্ধব কেউ আর বাকী রইল না। শুধু এলোনা অনু আর অনুর ছেলে মেয়েরা। নিরুপমা অবুঝের মত তাদের দেখার জন্য ঝোঁক ধরলো। কিন্তু চির স্বাধীন অনু একদিন বাসুদেবকে শুধু পাঠাতে পারলো। খোকা খুকু একদিনও আসেনি বা পারেনি আসতে। বাসুদেব ভাই বোনেদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলো। তার ঐটুকু শিশুর পক্ষে যতটা থাকা সম্ভব ততটা নিজস্ব মত ছিল। সকালে দাদু দিদমার কাছে ওপরে এসে সে আটকে যেত। এই নিয়ে অনুর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। কিন্তু খোকন হঠাৎ তেড়ে এসে বলতো কি এত গল্প হচ্ছে? কিছু না পারো নিচে থাকলে দরজাটা খুলেও ত উপকার করতে পারো। বলা চলে না সকাল আটটা অবধি যদি খুকু তটিনীর গলা জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে। সারা সন্ধে যদি পরম প্রয়োজনীয় তটিনীর সঙ্গে তোমাদের গানের চর্চা চলতে পারে। তখন যদি ঐ বিনি মাইনের চাকরী অনু বেচারা একা কাজ চালাতে পারে, এখনই বা কেন পারবে না। আসলে ওপরের সঙ্গে মেলামেশাটা গদায়ের অপছন্দকর। সেইটেই সংক্রামিত হয়েছে খোকনের মধ্যে। বাসুদেব তার বন্ধু বান্ধবদের বাড়ীতে আনা বেশী পছন্দ করত না। মনে হয় দাদা দিদির বন্ধুর দল নিয়ে মাকে কষ্ট পেতে দেখে সে মনে কষ্ট পেত। বলত রক্ষে করো বাবা, বাড়ীতে বন্ধুর দল দেখে দেখে আমার অরুচি হয়ে গেছে। আমি বন্ধু এলে ফটকের বাইরে গল্প করে ফুটপাথ থেকে বিদেয় করে দিই। বেশীক্ষণ গল্প করতে চায় তো পার্কে বসি। বাড়ীতে তাদের দিনরাত আড্ডা আমার ভালো লাগে না। এই বাসুদেবের প্রতি প্রভার আস্থা ছিল। অসাধারণ মেধাবী ছেলে। খোকাও পরীক্ষায় ভালো করত। কিন্তু সে পেটে পিটে। এ যেন তরতরিয়ে চলেছে। সহজ জলের স্রোতের মত। তাছাড়া খোকার পরীক্ষার ফল বরাবর ভালো হলেও সে ছিল একটু ভীতু ধরণের ছেলে। তাই তার পরীক্ষার সময়

অসুর খাটুনীর অন্ত ছিল না। ভালো পরীক্ষা দিয়ে এসেও সে স্বস্তি পেত না। কিন্তু বলতো ঠিক ফেল করব।

বাসুদেব ছিল ঠিক তার উল্টে। পরীক্ষার দিন সামনে। ছেলে বসে বসে ক্রিকেটের ওপর প্রবন্ধ লিখছে অসু ব্যস্ত হত বলতো এ কিরে একটু পড়্? বাসুদেবের শেষ পরীক্ষার কথা মনে পড়ে প্রভার। অসু সচরাচর বাইরে বেরুত না আর যদিও যেত গদাই বা খোকনের সঙ্গে। সেবার বাসুদেবের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সিট কাছাকাছি পড়েছিল। কেন জানিনা খোকা বা গদাই কেউ সময় পায়নি বলে অসুকে যেতে হয়েছিল বাসুদেবকে টিফিন খাওয়াতে। অসু এসে সদাশিববাবুকে জিগেস করলো—বাবা রাস্তাটা আমায় বুঝিয়ে দাও না এটা কোনখান দিয়ে যাবো? প্রভা বলেন সে কি তুই একা যাবি কিরে? চল আমি তোর সঙ্গে যাই। সদাশিববাবু অসুস্থ ছিলেন তাই তিনি যেতে পারবেন না। অসু বলে পাগল নাকি? এই চোত মাসের ভরা দুপুরে তুমি যাবে কি? এইটুকু পথ রিক্‌শা করে যাবো। প্রভা তবুও জেদ করেন। অসু ছোট মেয়ের মত মাকে বোঝায়, দেখো বাবার অসুখ বাবা একা থাকবে। আমি যাবো আর আসবো। ফিরে আসে অসু যেন আনন্দে ভ'রে। বলে জানো মা, তোমার বাসুদেবের সবই আলাদা। ছেলে যেন পরীক্ষার ঘর থেকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলো। মনে ওর ভয় ডর নেই মা? বলে পুরোপুরি নম্বর পাবো জানো মা? সব কোশ্চেন রাইট। এই ত খোকা খুকুর কতদিন টিফিন খাওয়াতে গেছি ওরা ভয়েই জড়ো সড়ো, যেন কাঁদো কাঁদো ভাব। তুমি যে বলো মা তোর বাসুদেব একেবারে আমার বাবার মত, সত্যিই তাই। এটা চোত মাসের কথা। এই পরীক্ষার ফল অসু দেখে যায় নি। বাসুদেব রেকর্ড মার্ক পেয়ে ফার্স্ট হল। কাগজের পাতায় পাতায় তার ছবি। সব কাগজের প্রথম পাতায়।

সেদিন অসু মারা যায়। সবাই শ্মশানে চলে গেছে। এই একটি দিন বিচলিত হতে দেখেছিল বাসুদেবকে প্রভা। কাটা ছাগলের মত আর্তনাদ করে উঠলো বাসুদেব। বললো আর কিছু কি করবার নেই দাদু? আর কিছু কি করা যায় না? এতক্ষণ তার ধৈর্য্য আর স্থৈর্য্য দেখে প্রভা অবাক হয়ে গেছলেন। কিছু পরে শান্ত হয়ে গেলো বাসুদেব। মনে পড়ে তটিনীর কোলের কাছে খুকু তাকে জড়িয়ে শুয়ে আছে।

অসুর শূন্য ঘরে প্রভা নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন, নিরুপমা দোতলায় বাপের কাছে ছিল: সদাশিববাবু বলেছিলেন এ ঘরে আর আসবো না মনে করব অসু মা এখানেই আছে। প্রভার মন বাসুদেবের কথায় ভরা ছিল। মনে হল বাবা যখন যান যদুর কথা ভাবতে কি কষ্টই না হয়েছিল। প্রভা ভেবেছিলেন আমার আজ আটত্রিশ বছর বয়স হল আর কটাই বা দিন বাঁচবো কিন্তু যদু? ঐ দুধের ছেলে ওর কি যাবার বয়েস হয়েছে?

আর আজ? আজ বাসুদেবের কথা ভাবলে যে জ্ঞান থাকে না। অসুকে হারিয়ে বাসুদেব স্তব্ধ হয়ে গেলো। অতবড় আলোড়ন বুকের মধ্যে চেপে সে সইতে পারলো না—দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগলো।

না সেই রাত্রের কথা বলছিলুম। প্রভা গিয়ে বাসুদেবের কাছে বসলো। বাসুদেব হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল, প্রভাকে দেখে কথা বললো। জানো দিদিমা মা বলেছিল আমায় অনেক বড় হতে হবে। এবার পরীক্ষা খুব ভালো দিয়েছিলুম। কি ফল হবে ভগবান জানেন? প্রতিবারই ত ফার্স্ট হতুম। মার যেন তাতেও মন ভরতো না। কেউ কি জানে, মা আমাদের কতবড় এ্যাসেট ছিল। সারারাত ধরে শুধু মার কথা বললো বাসুদেব। আর অশ্রুহীন নেত্রে প্রভা সব শুনে গেলেন। না শুনে গেলেন না মনের মধ্যে গেঁথে ফেললেন। মনে পড়লো প্রভার শিশু বাসুদেবের কথা। চিরকালই বাসুদেবের উচ্চাকাঙ্খা দিগন্তপ্রসারী। ছোট্ট বাসুদেব আঁকাবাঁকা হাতের লেখায় তার ছোট্ট খাতায় লিখেছিল, আমায় নোবেল প্রাইজ পেতে হবে। অসু মা হাসতে

হাসতে সেই লেখাটা প্রভাকে দেখিয়েছিল। অনু জানতো বাসুদেবকে নিয়ে প্রভার গর্ব্বের শেষ নেই। লেখাপড়াকে সবচেয়ে মর্য্যাদা দেন প্রভা। তাই অনুর সব ছেলে মেয়ের প্রাইজের দিনে প্রভার যাওয়া চাই-ই। অনুমার মৃত্যুর পরও প্রভা গেছেন খোকার মেডেল পাওয়া দেখতে। বাসুদেবের ফার্ষ্ট হওয়ার কবিতা লিখলেন—

"প্রতিকূল পরিবেশে অনুকূল বায়ু এনে দিলে
মৃত্যুরে অমৃত চিনে বীর তুমি অমৃতেরে নিলে
শোকদগ্ধ প্রিয়জনে সান্ত্বনার করিলে শিকল
রুদ্ধশ্বাস তারি মাঝে দক্ষিণের সুরভি পবন
দীপ্ত সূর্য্য সম হয়ে আলোকিলে মধ্যাহ্ন আকাশ
মাতাকে অমর করি সন্তানের অপূর্ব্ব প্রকাশ ॥

সেই বাসুদেব তাকে প্রভার বুক থেকে কেড়ে নিয়ে গদাই চলে গেছে। বুকের পাঁজর ভেঙ্গেচুরে শেষ হয়ে গেলো যে। ব্রহ্মচারী বলেন মা রাত যে শেষ হয়ে এলো একটু শোবে চলো। তোমার কিসের অভাব? অমন গুরু তোমার, ইষ্টমন্ত্র জপ করো মা।

স্থির কণ্ঠে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করেন ব্রহ্মচারী—

শান্ত হয়ে যান প্রভা, শুধু একবার বলেন তুমি যে ব্রহ্মচারী তুমি কি করে বুঝবে মায়ের কী জ্বালা। সমস্ত সংসার চলছে, চলবে। তার সন্তানরাও হয়ত একদিন সংসার স্ত্রী পুত্র সম্পদ পেয়ে মাকে ভুলে যাবে। শুধু আমি একা আমি সেই মুখখানি হারিয়ে সব—সব হারিয়ে ফেলেছি। আমার মত ক্ষতি অনুকে হারিয়ে কারুর হয়নি আস্তে আস্তে গান গাইতে চেষ্টা করেন।

অশ্রু লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায় ব্রহ্মচারি বলেন কিছু ত হারায় না মা কিছু হারায় নি। তুমি জপ করো মা আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি প্রভা বলেন, না গীতা পাঠ করো।

ব্রহ্মচারী গীতার শ্লোক বলেন। প্রভা সেই ছোট্ট বেলায় বাবার কাছে যেমন গীতা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, মুহূর্ত্তে ঘুমিয়ে পড়েন। সদাশিব বাবু বলেন ব্রহ্মচারিকে এবার আপনি একটু শোন্। একবছর তো বেশ শান্ত হয়েছিল। ভেতরটা যে এত জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে কাউকে বুঝতে দেয়নি। এমন কি আমি যে পাশে ছিলুম আমিও বুঝিনি। বাবাকে খুব ভালোবাসতো। বাবার গীতা পাঠ ওর কাছে সবচেয়ে বড় পুজো ছিল। গীতা শুনলেই ও যেন বাবাকে কাছে পায়। অথচ বলে আমি ত গীতাপাঠ শুনতে যাই না, আমি যাই আমার ছেলেকে দেখতে। ছেলের ওবে এত আকাঙ্খা ওর মনে ছিলো তাও ত জানি না কোনদিন। সেদিন আমায় বললো ব্রহ্মচারি এত দেরীতে এলো কেন? ও কেন আমার পেটে এলো না? আমি বললুম তাহলে কি এত ভালো ছেলে হত?

ওদের কথাবার্ত্তায় প্রভা নড়ে চড়ে যেন বলেন কার ছেলে? ব্রহ্মচারি বলেন তোমার ছেলে মা? তোমার ছেলে। "গোপাল! গোপাল! আমার গোপাল!" বলে প্রভা আদর করেন যেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়েন।

যাক, গল্প থেকে অনেক দূরে এসে পড়েছি আমরা। নিরুপমা ফিরে আসে নার্সিং-হোম থেকে। তাকে শ্বশুর-বাড়ী যেতে দেননা প্রভা। ওপরে রাজ সমারোহে নিরুপমাকে রাখা হয়। নিরুপমার জন্যে ডান-লোপিলোর গদী আসে। হায়রে প্রভা, তিনি কি তখন স্বপ্নেও ভেবেছেন যে তাঁর প্রাণের অনুমার দিন গোণার মধ্যে চলে এসেছে। অনুমা তখন হাঁপাতে হাঁপাতে খেটে যাচ্ছে জান কবুল করে। সত্যিই প্রভার সংসার টানাটানির সংসার ছিল। প্রভা সন্তানদের অকারণ আরাম করতে শেখান নি। নিজে পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। অনু বেনুও সেই ভাবে গঠিত হয়েছিল। প্রতি বছর পুরানো ধুতি দিয়ে সব লেপের ওয়ার সেলাই করতেন তিনি। নিজের খাটুনিকে খাটুনিই মনে করতেন না। অনুও ঠিক মার মত টেনে সংসার

চালাতো। শুধু প্রভা ছিলেন রূঢ় ভাষিণী, অনু ছিল মধুরভাষিনী। কিন্তু মনে প্রাণে দুজনেই অভিমানী ছিলেন। প্রভার সেই অভিমানের মর্য্যাদা তার সন্তানরা দিয়েছিলেন। অনু পায়নি। মনে পড়ে প্রভার একদিনের কথা। তিনি ছাদে দাঁড়িয়ে। খোকন অফিস থেকে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরছে। হঠাৎ মৃদুভাষিণী মার উচ্চকণ্ঠে চমকিত হয়ে খোকন বলে, কি হলো? সারাদিন খেটেখুটে বাড়ী এসে এতো চেঁচামেচি ভালো লাগেনা? অনু উত্তর দিল তোমাদের আর কি, হোম হোম সুইট হোম। কিন্তু আমি একা হাতে সব পারি কি করে? সেই যে কোথায় গেছে লক্ষ্মীরমা এখনো দেখা নেই। দুহাতে দুটো ভারি কাঠের পিঁড়ি নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে আসে অনু। গেট খুলে পেতে দেয় ফুটপাথের ওপর। গদায়ের গাড়ীর হর্ণ শোনা গেছে। অনু ছুটে এসেছে উনুন থেকে কড়া নামিয়ে ফুটপাতে চৌকি পাততে। এই চৌকির জন্মকাহিনীও বিস্ময়কর। সচরাচর দশটা টাকা কর্পোরেশানে দিলেই গাড়ী নামাবার জন্যে ফুটপাথের পাথর সরাতে দেয়। কিন্তু ব্যবসাবুদ্ধিধারি গদাই তা করেনি। বাড়ী থেকে একবস্ত্রে চলে এসেছিল বটে। কিন্তু পরে যখন বাড়ী মেরামত করতে প্রভা সদাশিব বাবুকে নিয়ে যায়, তখন এই কাঠের পিঁড়ি দুটো শূন্য গারেজ থেকে আনিয়েছিল গদাই। নাইবা থাকলো ঘোড়া, চাবুক ত আছে? মটোর বাপের পায়নি বটে কিন্তু গাড়ি ফুটপাথে নামাবার পিঁড়ি দুটো পেয়েছিল গদাই। পিঁড়ি দুটো গায়ে গতরে প্রচুর। বোঝাই যায়, কারণ গাড়ীর ভার সয়। এই পিঁড়ি দুটো গদায়ের প্রাণ, গাড়ীর হর্ণ পেলেই পেতে দিতে হবে। আবার গাড়ী গেটে ঢুকলেই তুলে রাখতে হবে। যদি চুরি যায়? প্রভাই অকারণ হয়রাণি দেখে মনে কষ্ট পেতেন। মুখে বলতেন গরম গরম পিঁড়ি পাততে হবে ত? পেতে রাখা যাবে না। অমূল্যনিধি কে কখন চুরি করে। হায়রে প্রভার কপাল, এতো চুরির ভয় তার কিন্তু অনুর মত স্ত্রীর প্রতি সে সতর্ক হলোনা কেন? কাঠের পিঁড়ির প্রতি তার যে মমতা ছিল তাও কি অনুর ভাগ্যে ছিলো না? কেঁদে কেঁদে প্রভা লিখেছে সন্তানহারা কবিতা।

শ্রাবণের ধারা অঝোর ধারায়
ঝরিছে ভুবন ভরে!
তারি সাথে সাথে সন্তানহারা
জননীর আঁখি ঝরে।

সেই মুখখানি হারায়ে গিয়েছে
মহাবিশ্বের মাঝে,
সেই মুখখানি সবারে আড়াল
করিয়া বুকেতে রাজে।

মনে পড়ে যায় কতদিনকার
ছোটখাট কত কথা,
শিশু বালিকার কিশোরী
মায়ের আনন্দ আকুলতা।

তিল তিল করে বাড়িয়া উঠেছে
বুক আনন্দে ভরে,
সুখ দুখ ভরা কত কী যে স্মৃতি
বুক আলোড়ন করে।

মুখে হাসি আর হাতে তার কাজ
দেখেছি শেষের দিকে,
শেষ মুখখানি বক্ষেতে আঁকা
চাহি যে নির্নিমিখে।

স্বর্ণাভরণ খুলে নিলো মাগো
কে সে নির্ম্মম হাতে?

যত ভাবি মাগো হৃদয়ে বিদরে
আঁকা ও হৃদয় পাতে।

শুধু হাতে মাগো মার দেয়া সেই
শঙ্খ ও রুলি রয়,
পরায়েছি মাগো কত সাধ করে
আর পরাবার নয়।

জননীর তব হীরকের ফুল
কর্ণেতে পরা ছিলো,
কে সে নিরদয় নিঠুর হস্তে
তাহাও খুলিয়া নিলো
মুখে এলো বলি জনকের দেওয়া
ওর সাথে কিছু দাও
শেষে ভাবিলাম সবি যদি নিলে
তুচ্ছ সোনাও নাও।
কত সহিয়াছ আজ বুঝি মাগো
রুধিয়া বক্ষ দ্বার
বুঝেছিলে শুধু শ্রীহরি ভরসা
চাহিলে না ফিরে আর।
শেষ রাতটির কথা মনে পড়ে
বসে তব পাশটিতে
কেহ জানিল না প্রলয়ের ঝড়
বহে যে মায়ের চিতে
পাগলের মত কত কী যে ভাবি
মনে হলে হাসি পায়
বিদ্রোহ ভরে ব্যাকুল এ হিয়া
কেড়ে নিতে তারে চায়
শিশুকালে কত কঠিন অসুখে
পিতামাতা দুইজন
সেবা শুশ্রূষা কত কিযে দিয়ে
করিয়াছি প্রাণপণ
আজো সেই মেয়ে কেমন করিয়া
হল মোর কেহ নয়
কোন কথা আজ বলিবার মোর
অধিকার নাহি রয়
না বলিতে ঐ মুখখানি দেখে
অকথিত কথা যার
বোঝে সবচেয়ে চিরদিন
আজ পরাজয় হল মার।
দাসীর মতন দাঁড়াইয়া শুধু
যন্ত্রণা দেখে চোখে

তাই চোখ তার অশ্রুবিহীন
পাবে জল কোথা থেকে
অবাক হইয়া ভাবি আর ভাবি
স্তব্ধ হইয়া যাই
জীবন তোমার শুধু আরাধনা
তাতে কিছু ভুল নাই
শিশুকাল হতে বিলাস ব্যসনে
ছিল না আকিঞ্চন
মায়ের কাছেও চাহনি কখনো
কিছু বলি প্রয়োজন
হাসিয়া বলিতে চাহিবার আগে
চিরদিন তুমি দাও
আজ বলি মাগো মোর প্রাণভরা
ক্ষণেক এদিকে চাও
মায়ের মনের কী সাধ মিটাতে
দোল পূর্ণিমা দিনে
হাসিয়া বলিলে সবে দিলে টাকা
শুধুই আমায় বিনে?

জানিনা ত মাগো কিযে চেয়েছিলে
বুঝিনি তোমার ভাষা
বিশ্বাস মাগো হয়না আমায়
ব্যথা দিতে তোর আশা।

চিরদিন মাগো হারালে কিছু যে
বলিতে খুঁজিলে পাবে
আজকে আমার ওই হারানিধি
কে বলো খুঁজিয়া দেবে
সারাটি জীবন পেলে কত দুখ
বলেনি মা কেহ আহা
নিরুপায় দুই জনক জননী
দেখিল কেবল তাহা
কৃশ তনুখানি নাই বিশ্রাম
নাইক আহার তার

সারাদিন কার অজস্র কাজ
গতি ভরা ছুটি পায়
ভাঙ্গিল চুরিল শেষ হয়ে গেল
মালিক অহঙ্কারে
ছুঁড়ে ফেলে দিলো নিঃশেষ করে
ছুঁড়ে অবহেলে তারে
অতিদীন মাগো ভিখারিণী সাজে
আমের পাতার তোড়া
দিলে কোন প্রাণে? তার মাঝে মাগো
মুখ সেই আলো করা
তাও সহিলাম সহিলাম মাগো
অসহ তোমার ক্লেশ
নিরুপায় হয়ে দেখিলাম চেয়ে
রহি যে নির্নিমেষ
বুকে বহে ঝড় বুক তোলপাড়
কত দুঃখের মেয়ে
হয়ে যায় শেষ ওগো পরমেশ
আমি শুধু রই চেয়ে
কাছে যাইবার নিষেধ আমার
নিষেধ শতেকতম
তবু আজো বলি নিঠুর সেজনে
ভগবান তুমি ক্ষম
অহঙ্কারেতে অন্ধ হইয়া
ভাবে না কারুরই কথা
তেমন বাপ মা ছিলনা তাহার
বোঝেনা সে আকুলতা
রুগ্ন বাপ সে সারাদিন খেটে
সারাদিন ঘুরে হায়
বিরাট চাহিদা মিটাইয়া
মেয়ে সঁপে দিলো তার পায়
আজ দলি যায় দৃপ্ত সেজন
বুক ভেঙ্গে চুর করে

অবুঝ শিশুরা চুপ করে থাকে
শুধু আঁখিবারি ঝরে।
আমার চোখেতে জলও আজ নাই
শুধু জ্বালা দুঃসহ
ওগো ভারবাহী জানি মম ভার
হরি তুমি নিজে বহ ॥

আবার কাহিনী তার নিজের জায়গা থেকে সরে এসেছে। নিরুপমাকে এনে তার শরীর সারানর চেষ্টায় প্রভা উঠে পড়ে লাগলেন। অনুর মৃত্যুর পর এক দাসীর কাছে প্রভা শোনেন, অনু নাকি তাকে বলেছিল এই যে মা দিদিকে এনেছে নড়ে বসতে দেবেনা। হাতের তেলোয় করে রাখবে। আমার মার হাতের যত্ন যে পায়নি সে বুঝতেও পারবে না। প্রভা এখন কাঁদে আর ভাবে এই যত্ন কি অনুরও পাবার কথা ছিল না। নিরুর অসুখের জন্য মাকে অসুস্থ শরীরে বিব্রত দেখে অনু নিজের কষ্টের কথা লুকিয়ে যেতো। সদাশিববাবুর কথা ত ওঠেই না। প্রভা তাঁকে ছেড়ে নিরুর জন্যে পাগল। যে মানুষকে চশমা খুঁজে দিতে হয় খাবার কথা মনে করিয়ে দিতে হয়, স্নান করতে যে ভুলে যায়, সে আজ স্বাধীনতা পেয়ে বিব্রত বোধ করে। তাছাড়া নিরুর জন্যে মনে উদ্বেগও কম নেই। এরি মধ্যে এক-দিন অনু এসে বললো, মা তুমি যদি পুরী যাওনা আমি তোমার সঙ্গে যাবো। প্রভা মনে মনে হাসলেন। বিনি মাইনের দাসীকে এক মিনিট চোখছাড়া করেনা গদাই। মুখে বলে ওর শরীর তো ভালো নয় কারুর সঙ্গে ওকে ছাড়তে পারি না। প্রভা ভাবেন কই খাটানোর বেলা ত এ কথাটা মনে থাকে না। আগে অনুর হাতে হাতে সাহায্য করতো খোকন। কিন্তু তটিনী পুরুষ মানুষের কাজ করা সইতে পারে না বলায় খোকনের সে কাজ বন্ধ হল। খুকু খুব কাজের নয়, চিরদিনই রোগা মেয়ে।

তবু দায়িত্ব নিয়ে কাজ যে সে কত নিপুণভাবে করতে পারে, তার প্রমাণ দিয়েছে অনুর অন্তিম দিনের তিনটি দিনেতে। গদাই যখন বুলু বাঁচবেনা কথাটা জারী করে দিলো, সে সময় খুকু অসাধারণ ধৈর্য্য ও স্থৈর্য্যে সংসারের হাল ধরেছিলো। তার সঙ্গে মায়ের সেবা, কিছুতে তার বিন্দুমাত্র ত্রুটী ছিলনা। ইনজেকসনের জোগাড় থেকে প্রতিটি কাজে তার সেবাভরা দুটি হাতের যেন অবসর ছিল না। মা মারা যাবার পর কেঁদে সে বলেছিল, বুঝিনি মা এভাবে চলে যাবে। কাজই করে গেছি পাগলের মত, একটু মার কাছে বসিও নি।

খোকনও করেছে শেষের তিনদিন। কিন্তু অনেক সময় কেঁদে ভেঙ্গে পড়েছে। খুকু বলেছে আমিও কি কাঁদিনি, দিদিমা তবে বাইরে চেপে থেকেছি। ছেলেমেয়ে তিনজন মাকে প্রাণের অধিক ভালোবাসত।

কিন্তু বাপকেও তারা নির্ভর করতো দারুন নিষ্ঠাভরে বি॰দ ঘটলো সেইখানে। বাপের অজ্ঞতা তারা বুঝতে পারলো না। তাই অনুর সম্বন্ধে তারা উদাসীন না হয়েও ভুল করলো।

ক্রমশঃ

মস্কো আকাডেমিক আর্ট থিয়েটারের সত্তর বছর পূর্তি উৎসব

অশোক সেন

মস্কো আর্ট থিয়েটারের বয়স হল সত্তর বছর। সারা দুনিয়া আজ জানে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান নাট্য-শিল্পের কেন্দ্র বলতে এই রঙ্গমঞ্চটিকেই বোঝায়।

সম্প্রতি এই থিয়েটারের একটি দল জাপান সফর করে এলেন—এঁরা আগেও অর্থাৎ ১৯৫৮ সালেও আরেকবার জাপান ঘুরে এসেছিলেন। এইবার জাপানের থিয়েটার-অনুরাগীদের চারটি নাটক এঁরা দেখিয়েছেন: গোর্কীর 'লোয়ার ডেপথ্‌স', চেখভের 'থ্রি সিষ্টারস', গোগোলের 'দি ইন্সপেক্টর' এবং পোগোডিনের 'দি ক্রেমলিন চাইমস্‌'। এই নাটকগুলো দেখে জাপানের দর্শকেরা মস্কো আর্ট থিয়েটারের নাট্যশিল্পের মান এবং অভিনয়-ভঙ্গীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ ধারণা করে নেবার সুযোগ পেয়েছেন। উপরিউক্ত নাটকগুলো সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। প্রত্যেকটি নাটকেরই প্রয়োগ ব্যাপারে নাট্যশিল্প সম্বন্ধে বিশেষ সৃজনশীল জ্ঞান থাকা দরকার—পরিচালক এবং নটনটীদের তরফে।

বিগত ১৯৬৮ সালে আমি যখন বার্লিনার আনসেম্বলের নিমন্ত্রণে ব্রেশট্‌-ডায়লগে অংশগ্রহণ করতে যাই, বার্লিনে উন্টার ডেন লিণ্ডেন হোটেলে একদিন ওখানকার নভোস্তি প্রেস এজেন্সি থেকে আমাকে টেলিফোনে জানানো হোল যে তাঁরা আমাকে সোভিয়েট রাশিয়া দেখতে যাবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। বার্লিন থেকে দেশে ফেরবার পথে আমি কয়েকদিনের জন্য রাশিয়া সফরের জন্য ব্রেক জার্নি করেছিলাম। প্রতি সন্ধ্যায় মস্কো এবং যখন লেনিনগ্রাডে ছিলাম তখন সেখানে, হয় নাটক, নয় ওপেরা অথবা ব্যালে দেখতে যাবার আমন্ত্রণ থাকতো আমার। আর সবথেকে ভাল লাগতো একটা ব্যাপার—প্রত্যেক শো'তেই পরিচালকের সঙ্গে আমার আলাপ-আলোচনা করবার ব্যবস্থা করা থাকতো। এই আলোচনার মাধ্যমে রাশিয়ান শো'গুলো সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য আমি জানতে পেরেছি। জার্মানীর বিভিন্ন জায়গাতেও ঠিক এই ধরনেরই সুযোগসুবিধা আমি পেয়েছি। আজকালকার সবসেরা জার্মান নাট্যকার পিটার ভাইসের কোন নাটক সে সময় জার্মানীতে প্রদর্শিত হচ্ছিল না। অথচ আমার খুব ইচ্ছা তাঁর নাটক দেখবার। রষ্টকের বিখ্যাত পরিচালক অর্থাৎ Generalintendant Professor H. A. Perten সেকথা জানতে পেরে Volkstheater Rostock-এ পিটার ভাইসের ভিয়েৎনাম সম্বন্ধে যে নাটকটি তিনি মহড়া দিচ্ছিলেন, তাই দেখতে আমাকে ইন্‌ভাইট করেন। সেই রিহার্সালে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং মহড়ার শেষে অধ্যাপক পার্টেনের সঙ্গে আমার কিছুক্ষণ আলোচনাও হয়েছিল। আমার এই সফরের সময় একথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছি যে পূর্ব্ব জার্মানী এবং সোভিয়েট রাশিয়ার মত অতিথিবৎসল জাতি সচরাচর দেখা যায় না।

মস্কোতে আর্ট থিয়েটারের 'লোয়ার ডেপথ্‌স' আমি দেখেছিলাম—লেনিনগ্র্যাডের আর্ট থিয়েটারে 'থ্রি. সিসটার্স' দেখবার সুযোগও আমার হয়েছিল। এইসব অনবদ্য প্রডাকসন দেখে একদিকে যেমন চমৎকৃত হয়েছিলাম তেমনি আমার বারবার আমাদের দেশের শিশিরযুগের অভিনয় এবং রঙ্গমঞ্চের কথা মনে হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ হচ্ছিল আজকের দিনের আমাদের প্রচারসর্ব্বস্ব দলগুলোর কথা মনে হয়ে। এইজাতীয় একটি দলের এক নাট্যাচার্য শিশির-কুমার, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতির সম্পর্কে বহু বিষোদ্গার

করে একবার একটি বই লিখেছিলেন, কিছুকাল আগেবামপন্থী হয়ে একবার তিনি রাশিয়া যান এবং ফিরে এসে রাশিয়ান থিয়েটার সম্পর্কেও কতকগুলো আজেবাজে কথা বলতে ভদ্রলোকের মুখে বাধেনি। তখন বুঝতে পেরেছিলাম লোকটির আসলে ভাল থিয়েটার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। কিন্তু কথায় বলে জহুরি জহরৎ চেনে। তাই চেরকাশভ এবং পুডোভকিন যখন কলকাতায় এসেছিলেন নাট্যাচার্যের অভিনয় দেখে তাঁরা মুগ্ধ হয়ে নিজেদের মনের প্রতিক্রিয়া লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এবিষয়ে এবারও মস্কোতে শ্রীননী ভৌমিকের মুখে শুনলাম। শ্রীযুক্ত ভৌমিক সেরাত্রে চেরকাশভ এবং পুডোভকিনের পাশে বসেই "ষোড়শী" নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন।

মস্কো আর্ট থিয়েটারের পক্ষে বিদেশে সফরে যাওয়াটা একটা ট্র্যাডিশনের মত হয়ে গেছে। বিগত দশ বছরে এঁরা পৃথিবীর এগারটি দেশে পরিক্রমা করেছেন · কয়েকটি দেশে একাধিকবারও গেছেন। এদিক দিয়েও মস্কো থিয়েটার তাঁদের সুবিখ্যাত প্রডিউসার স্তানিসলাভস্কির উপদেশেরই অনুসরণ করে চলেছেন। কারণ স্তানিশলাভস্কি একবার লিখেছিলেন—"থিয়েটারের মত প্রকৃষ্ট মাধ্যমের ভেতর দিয়েই নানাদেশের লোক নিজেদের ভেতর যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং পরস্পরের ভেতরকার সুন্দর মনোভাব এবং অনুভূতিসমূহের প্রকাশ এবং আদানপ্রদান চালাতে পারেন। নিজেদের অন্তরের ভেতরকার পবিত্র চিন্তাধারা· গুলিকে বিভিন্ন দেশবাসীরা যদি আরও বেশী করে চালু করতে পারতেন, তাহলে তাঁরা বুঝতেন যে নিজেদের ভেতর ঘৃণা বা শত্রুতার কারণগুলো গজিয়ে ওঠে অস্বাভাবিকভাবেই এবং স্বার্থপরতার উপর ভিত্তি করে—এইসব কারণগুলোকে অপসারিত করতে পারলেই বিভিন্ন দেশের ভেতর একটা সম্প্রীতি এবং সদ্ভাবের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।"

১৮৯৮ সালে কে. স্তানিসলাভস্কি এবং ভি. নেমিরোভিচ্ ডানশেঙ্কো মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প-দিনেই এটা রাশিয়ার প্রগতিশীল লোকেদের কাছ থেকে স্বীকৃতি এবং ভালবাসা অর্জ্জন করে। এঁরা প্রথম অন্যদেশে সফর করতে যান ১৯০৬ সালে। সেই থেকেই এঁরা পৃথিবী-ব্যাপী খ্যাতি এবং যশ অর্জ্জন করতে শুরু করেন।

মস্কো আর্ট থিয়েটার তার প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক এবং রাজনীতিক সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে এসেছেন রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে। স্তানিসলাভস্কি বলেছিলেন—আমরাই প্রথম যুক্তিযুক্ত, নীতিপূর্ণ এবং সর্ব্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য জীবনপণ করে চেষ্টা করছি আমাদের এই মহৎ সাধনা সাফল্যলাভ করবে এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

সমাজের নাগরিক জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের দ্বারাই মস্কো আর্ট থিয়েটার নিজস্ব সৃজনশীল শিল্পকর্মের পরিচয় দিয়ে এসেছেন। অভিনয়-শিল্পের সাহায্যে সমাজে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটানোর ব্যাপারে মস্কো আর্ট থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ "বাস্তবতার" উপর সমধিক প্রাধান্য আরোপ করেছিলেন। এই কারণেই মঞ্চসজ্জা, অভিনয় প্রভৃতি সব ব্যাপারেই তাঁরা রিয়ালিষ্টিক করে তোলার পক্ষপাতী, সেই প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই। নাটকের পাত্রপাত্রীর জীবন এবং অন্যান্য যেসব লোকেদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ থাকে, সেই যোগসূত্রের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্যেই মস্কো আর্ট থিয়েটার তুলে ধরতে চেষ্টা করেন মানুষের উপর তার সামাজিক পরিবেশের প্রভাবের দিকটা।

প্রথমাবধিই মস্কো আর্ট থিয়েটার রাশিয়ার সেরা কথা শিল্পীদের জীবনাদর্শের প্রচার এবং প্রসারের কাজে ব্রতী হয়েছেন। আন্তন চেখভ, লিও টলষ্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কী এই তিনজনই এঁদের লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। চেখভের সি গাল'কে মস্কো আর্ট নিজেদের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বার্লিনার আসেম্বল যেমন পিকাসোর শান্তি-পারাবতকে নিজেদের সিম্বলরূপে গ্রহণ করেছেন।

স্তানিসলাভস্কি একবার বলেছিলেন—গোর্কীই হচ্ছেন মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা—এই থিয়েটারের সামাজিক এবং রাজনীতিক কার্যধারারও তিনিই ছিলেন প্রধান নির্দ্দেশক। শুভ উদ্বোধনের দিন থেকেই মস্কো আর্ট থিয়েটারের প্রচেষ্টা ছিল জনগণের রঙ্গমঞ্চ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার। মস্কো ফ্যাক্টরী এবং প্লান্টসের শ্রমিকদের

জন্ম অল্পদামের টিকিটে এঁরা বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতেন। ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে গোর্কীর 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌সের সমস্ত টিকেট বিক্রীর টাকা ধর্মঘটী শ্রমিকদের পরিবারদের বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল। এই থিয়েটার সব সময়েই মেহনতী জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবার চেষ্টা করে এসেছেন।

১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর এই থিয়েটার অবশেষে সমর্থ হন সাধারণ জনতার জন্ম এদের রঙ্গগৃহের দুয়ার সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দিতে। খেটে খাওয়া লোকেরা—অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি, এবং বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীরা দলে দলে এখন থেকে এই থিয়েটারে অভিনয় দেখতে আসতে লাগলো। এ ব্যাপারটা যে এই থিয়েটারের পক্ষে কতোটা গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমান করা যায়।

সত্তর বছরের অস্তিত্বে মস্কো আর্টথিয়েটার জনতার সামনে দুশোর বেশী নাটকের অভিনয় করেছেন। এসবের ভেতর ছিল সেরা সেরা রুশ সাহিত্যের বই। নামডাকওলা জগৎ-সাহিত্যের ক্ল্যাসিকাল ড্রামা এবং আধুনিক লেখকদের বিখ্যাত সব রচনা। প্রডিউসাররা বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন ক্ল্যাসিক্‌সের মঞ্চরূপায়ণ এমনভাবে করতে, যাতে দর্শক অতি সহজেই নাটকের গভীরত্বের দিকটা অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারেন। এজন্ম দৃশ্যসজ্জার ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো সযত্নে পরিহার করা হয়েছে এবং নাট্যকারের আসল এবং মূল বক্তব্য পরিচ্ছন্নভাবে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা করেছেন প্রযোজক। আর এইজন্মই প্রতিটি নাটক এত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং সুদীর্ঘকাল ধরে একটানাভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। 'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স' নাটকটির মঞ্চরূপায়ণ চলেছে ছেষট্টি বছরের ওপর। বেশ কয়েক দশক ধরে চেখভের 'দি থি সিষ্টার্স' এবং টলষ্টয়ের 'আনা কারেনিনা' এই থিয়েটারের রেপারটরীতে স্থান পেয়ে আসছে। রাশিয়ান বিপ্লবের মহানায়ক লেনিন সম্পর্কে লেখা কয়েকটি নাটক সবসময়েই মস্কো আর্টের রেপারটয়ারে বিশেষভাবে স্থান পায়। অন্যান্য অনেক অনেক নাটকেও রাশিয়ার সিভিল ওয়ারের ঘটনাবলীর প্রতিবিম্ব দেখা যায়। প্রাক্‌ দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধকালীন সোভিয়েট সমাজজীবনের আলেখ্য নিয়ে রচিত অনেক নাটক মস্কো আর্টে মঞ্চস্থ হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে রাশিয়ানরা প্রাণপণ করে লড়াই করছিলেন। সে সময় এই থিয়েটারে প্রত্যেক নাটকেই সোভিয়েট জনসাধারণের দেশাত্মবোধ এবং বীরত্বের দিকটা দর্শকদের কাছে তুলে ধরা হোত।

মস্কো আর্ট থিয়েটারের রেপারটয়ারে আধুনিক নাট্যকারদের সমসাময়িক জীবন বা টপিক্যাল সাবজেক্ট্‌সের উপর রচিত নাটকের একটা বিশেষ স্থান আছে। বিগত দশ বছরে এই রঙ্গমঞ্চ পঞ্চাশটিরও বেশী নব-নাট্য মঞ্চস্থ করেছেন। ১৯৬৭ সালে সমগ্র জনগণের সাহচর্যে এই থিয়েটার গ্রেট্‌ অক্টোবর সোশ্যালিষ্ট রেভোলিউশনের অর্দ্ধশত বার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করেছেন। এই সময় সোভিয়েট লেখকদের রচিত পাঁচটি নতুন নাটক অভিনীত হয়েছিল —এইসব নাটকে সোভিয়েট শক্তির সংগঠনের ইতিহাস দেশের লোককে দেখানো হয়েছিল।

১৯৬৮ সালে মস্কো আর্ট থিয়েটার গোর্কীর জন্মের শতবার্ষিকী উৎসব পালন করেছেন। এই উপলক্ষেই এঁরা একছর গোর্কীর চারটি নাটক মঞ্চস্থ করেন—'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্' 'দি ফিলিসটাইনস,' 'ইয়েগর বুলিশভ এণ্ড আদার্স' এবং 'দি এনিমিজ।' সোভিয়েট রাশিয়া পরিক্রমার সময় 'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্' দেখবার আমার সুযোগ হয়েছিল সেকথা আগেই বলেছি।

লেনিনের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের দিন প্রায় সমাগত—এটি একটি বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনার মত ব্যাপার। এই আনন্দোৎসবে যোগ দেবার জন্ম মস্কোআর্ট থিয়েটারে প্রস্তুতি পর্ব চলেছে। সোভিয়েট নাট্যকারেরাও এই স্মরণীয় দিনটির উপলক্ষে নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

এই ডিসেম্বর মাসেই মস্কো আর্ট থিয়েটার তাঁদের সত্তর বছর পূর্ত্তির উৎসব করবেন—এই উৎসবে তাঁরা বেশ কয়েকটি রাশিয়ান ক্ল্যাসিক নাটকের অভিনয় দেখাবেন মঞ্চানুরাগী জনসাধারণকে।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সময় হয়েছে নিকট ?

কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার মতে বর্ত্তমান অবস্থায় এ-দেশে কম্যুদমন হইয়াছে অত্যাবশ্যক, সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলিরও। এ-বিষয় প্রয়োজনমত আইন পাশ করাতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে! কংগ্রেসপতির সহিত আমরা একমত হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার কি করিবেন বলা শক্ত। দেশে বিষম হৈ-হল্লা, নাশকতামূলক কার্য্যাদি, বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলগুলির দেশদ্রোহিতার ক্রিয়াকর্ম্ম, রাজনৈতিক মতবিরোধ কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সঙ্গে খুনখারাবির ঘটনা ঘটিতেছে কম নহে, সর্ব্বক্ষেত্রেই কিন্তু কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা 'সব কিছু অতি দৃঢ় হস্তে কঠোরভাবে দমন' করিবার ঘোষণা দৃপ্ত ভাবেই করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, কর্ত্তাদের কথার সহিত কাজের মিল খুঁজিয়া পাই না। ফলে, দেশে অনাচার, অসামাজিক এবং দেশদ্রোহিতামূলক ক্রিয়াকর্ম্ম, তথা রাজনৈতিক দলগুলিরও সাহস ক্রমে দুঃসাহসে পরিণত হইতেছে। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস কেন্দ্রীয় কর্ত্তারা বাক্যবীর ছাড়া আর কিছুই নহেন!

এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে বর্ত্তমান ভারতে অনেক কম্যুনিষ্ট দলভুক্ত ব্যক্তিরা তাহাদের নেতৃত্বের গোপন এবং প্রকাশ্যউস্কানীতে ডাকাতি, লুঠতরাজ, খুনজখম—তথা সর্ব্বপ্রকার বেআইনি এবং অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতৎপর হইয়াছে। কম্যুর দল মনে করে দেশের সাধারণলোক, বিশেষ করিয়া 'সর্ব্বহারার' দল (কম্যু মতে) তাহাদের দলে এবং তাহাদের সর্ব্ববিনাশী সমাজবিধ্বংসী মতবাদে বিশ্বাস করে, যদিও ভারতীয় 'কম্যুনিষ্ট' মতবাদ কি তাহা, কম্যু-চ্যাঙড়াদের কথা বাদ দিলাম, কম্যুপ্রধানরাও জানেন কিনা সন্দেহ এবং সমাজে ও জনগণ মধ্যে সেই অজানা মতবাদের প্রচার-প্রয়োগের বিধিবিধান কি—সে বিষয়ে কয়জন কতটুকু জানেন সে-বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। এ-দেশে কম্যুনেতা এবং কম্যুপদাতিক সকলের মুখেই 'বিদ্রোহের' কথা শুনা যায়, সকলেই পথেঘাটে সর্ব্বত্র বিদ্রোহ করিতে, দেশের চলতি রাজ এবং সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সকলকেই (সকলের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ করিবার 'আহ্বান' (এখানেও সেই আহ্বান!) জানাইতেছে। ইহাদের কথায় মনে হয় বিদ্রোহ যেন একটা নেহাত ছেলেখেলা এবং যখন যাহার ইচ্ছা, সে-ই তাহার খেয়ালখুসীমত নিজেকে মহা বিদ্রোহীরূপে জাহির করিতে পারে! বিগত কালের সাচ্চা বিদ্রোহীদের জীবনী পাঠ করিয়া (অবশ্য পাঠ করিবার মত বিদ্যা এবং পাঠের পর তাহা হইতে নিজ জীবনে শিক্ষা গ্রহণ, কেবল চুনোপুঁটিরাই নহে, তথাকথিত নববিদ্রোহী নেতাদের মধ্যে কার কতটুকু আছে কিংবা আদৌ আছে কি না, বলা শক্ত।)

যে সব এবং যে প্রকার সংবাদ প্রকাশিত হয়, তাহাতে ভারতীয় কম্যুদলগুলিকে, বিশেষত উগ্র এবং তীব্র লালীদের দেশদ্রোহীতার অপরাধে অভিযুক্ত করা অবশ্যই যায়। চীন এবং পাকিস্তানের সহিত বিগত যুদ্ধের সময় কম্যুরা প্রকাশ্যভাবে চীন এবং পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করে, গোপন সহায়তা দানের সঙ্গে শত্রুর

চরহিসাবেও কাজ করে অনেক কম্যুদেশদ্রোহী। এই সকল ঘটনাতেও আমাদের অতি চতুর এবং দেশভক্ত কেন্দ্রীয় (তথা কংগ্রেসী) নেতাদের চেতনা হয় নাই এবং কম্যুদমনে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তাঁহাদের সামান্য সাহসও হয় নাই। কম্যুদের ভারতকে যে বিষম কামড়ুদিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে, তাহাকে সামান্য পিপীলিকার কামড় বলিয়া অগ্রাহ্য অবহেলা কেন্দ্রীয় সরকারের মহা অপরাধ এবং বিষম অবহেলার মাশুল দেশের মানুষকে বুকের রক্ত দিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। বিধাতা না করুন, বিপদ যদি আসে নেতারা দেশ এবং জাতিকে রক্ষার জন্য জনগণকে আহ্বান জানাইয়াই তাঁহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া দিল্লী মহাকরণের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় বসিয়া দেশ রক্ষার নূতন প্ল্যান ভাবিতে থাকিবেন এক দিকে এবং অন্য দিকে 'ভাঁড়ার' রক্ষায় ব্যস্ত থাকিবেন। বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় মণ্ডলে এমন একজন সদস্যও নাই, যাঁহাকে সর্ব্ব ভারতীয় নেতা কিংবা সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় এবং মান্যব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এমন তৃতীয়.কিংবা নো-শ্রেণী অ্যাট্-অল ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত মন্ত্রীমণ্ডলীর, দেখা যাইতেছে প্রধান কর্ত্তব্য এবং মহাকার্য-নিয়মিত মাসিক বেতন গ্রহণ এবং খেয়ালমত অর্থহীন বাণীপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে আরো আত্মত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধনের উদাত্ত "আহ্বান" জানান।

কম্যুদের একটি ক্যাকৃড়া দল ত প্রকাশ্যেই দেশদ্রোহীতা প্রচার করিতেছে এবং সেই সঙ্গে রক্তাক্ত বিপ্লবের দ্বারা দেশে মাও-চাও ব্র্যাণ্ড গণতন্ত্র—যাহার প্রকৃত অর্থ—এক প্রভুবাদ প্রবর্ত্তন করিতে। এই প্রকার ঘোষণাও যদি দেশ-দ্রোহীতা না হয়, ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া মস্কাও-পিকিংএর অনুগত্য প্রচার করিলেও যদি অপরাধ না হয়, তবে দেশদ্রোহীতা কি তাহা জানা নাই। দেশ শাসন, এবং দেশদ্রোহীদের দমনের ক্ষমতা যদি না থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তব্য শাসনক্ষমতা পরিত্যাগ করা, ইহাই হইবে ভদ্রজনোচিত।

কলিকাতা পৌরসভার নব কীর্ত্তি—

অকাজের কাজ করিয়া যে প্রতিষ্ঠান ভারতের তথা বিশ্বে অতুল কীর্ত্তির অধিকারী, সেই কলিকাতা কর্পোরেশনের বেকার নবাবী মেজাজী পৌরনেতারা আর একজন কর্ম্মোঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং ভদ্র কমিশানারকে অপমানিত করিয়া কর্পোরেশন-ভাগাড় হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। ভদ্রলোকের অপরাধ তিনি কার্পোরেশনের শূন্য ভাণ্ড হইতে কাউন্সিলারদের ধরা বরাদ্দ প্যাশ করেন নাই। এক একজন কাউন্সিলার—সকলেই অকর্ম্মার ঢেঁকি—'বরা' কল্যাণের জন্য যে অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা কাহার কল্যাণে যায় সে বিষয় কিছু না বলাই ভাল। আগামী মার্চ মাসে পৌরসভার নির্ব্বাচন, কাজেই আমাদের পৌরপিতাদের মাছের তেলে মাছ ভাজিবার তৈলের ব্যবস্থা কর্পোরেশনরূপী বোয়াল মাছকেই করিতে হইবে—পরের গাঁট কাটাই যাহাদের ব্যবসা এবং অভ্যাসে দাঁড়াইয়াছে,তাহাদের নিজের গাঁট কাটিয়া নির্ব্বাচনের সময় একান্ত প্রয়োজন তৈলের সংস্থান করিতে বলা, মহা অপরাধ ছাড়া আর কি হইতে পারে? (অপ) পিতাগিরী যাহাদের পেশা এবং যে পেশাতে তাঁহাদের নবাবীর সর্ব্বপ্রকার সংস্থান হয়, সেই হইতে তাহাদের বঞ্চিত করা পাপ এবং অতিশয় কঠোর ব্যক্তি ছাড়া আর কেহই, এ-কল্পনা করিতে পারে না। পাপ করিলে তাহার ফলভোগ করিতে হইবেই, কমিশনার সেনগুপ্ত পাপ করিলেন, ফলভোগ করিতে, বিলম্ব হইল না। কমিশনারকে দণ্ডদানের ব্যাপারে পৌরসভার কংগ্রেসী সদস্যরাও—অন্য সকল সদস্যের সহিত হাত মিলাইতে লজ্জা বা দ্বিধাবোধ করিলেন না, কারণ, নির্ব্বাচনের পুর্ব্বে নগদ কিছু অবশ্যই প্রয়োজন—ধারার কল্যাণ সাধনে! দেখা যাইতেছে প্রাপ্তির ব্যাপারে কর্পেরেশনের কাউন্সিলার—সকলেই মাস্‌তুতো ভাই-এর পর্যায়ভুক্ত!

রাজনীতিতে সৎ নীতির ধারক, বাহক এবং অহরহ প্রচারক আজ নীরব কেন? মধ্যবর্ত্তীকালীন নির্ব্বাচন নাকের ডগায় বলিয়া কি তিনি দিতে পরিতেছে না।

এই যদি হয় তাঁহার উচিত ছিল কর্পোরেশনের সর্ব্বাধিনায়কত্ব ত্যাগ করিয়া অন্য কোন নির্ব্বাচন এবং কঠোর নীতিপরায়ণ সাব নেতার হস্তে পৌরসভার 'ম্যানেজমেণ্ট' ছাড়িয়া দেওয়া। —কিন্তু এখানেও বিপদের সম্ভাবনা আছে—···বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া যাইবে!

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও কর্পোরেশনীয় বেদায়বী কেন সহ্য করিতেছেন বুঝা কঠিন! শক্ত তারের ঝাঁটা দিয়া যাহাদের ধাপার নিক্ষেপ করা একান্ত বর্ত্তব্য, সেই কলিকাতা নগরীর সর্ব্বনাশকারী পৌর অপ-পিতাদের রাজ্যপালও কি অপদেবতা ভাবিয়া ভীত হইয়াছেন? রাজ্যপালের নির্দ্দেশে কর্পোরেশনকে দুদিনেই বাতিল করা যায় এবং সম্ভব। যাহা একান্ত কর্ত্তব্য এবং প্রয়োজন, তাহা হইতে বিরত থাকা রাজ্যপালের পক্ষে অশোভনীয় অন্যায়। এই লইয়া পর পর চারিজন কর্ত্তব্যপরায়ণ কমিশনার বিদায় লইলেন এইবার কাহার পালা দেখা যাক—। তবে একথা বলা যায় যে অন্তকার অপদার্থ অপচারী পৌবপিতাদের তাড়াইতে না পারিলে কর্পোরেশনের নারকীয় আব-হাওয়ার, বদল হইবে না, কর্ত্তব্যপরায়ণ কোন কমিশনারও এখানে টিকিতে পারিবেন না।

দেশের সংহতি-সংহারে নব-উদ্যম—

দেশ যখন শত ভাবে হাজারো রকম সমস্যায় জর্জরিত, ঠিক সেই সময় দিল্লী দরবার হইতে হিন্দী সম্পর্কে বিচিত্র এক নির্দ্দেশ জারি করা হইল। সকালে ইংরেজী সংবাদ প্রচার (আকাশ বাণী হইতে) হিন্দীর পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া হইল। বহুকাল যাবত ইংরেজী সংবাদ প্রচারিত হইত সকাল আটটায়, হিন্দী হইত আটটা পনরো মিনিটে। ইহাতে নাকি হিন্দীর মানহানি হইতেছিল! বেতারমন্ত্রী কাহার সহিত কি পরামর্শক্রমে সংবাদ প্রচারের সময় পরিবর্ত্তন করিলেন, আমাদের জানিবার কোন অধিকার নাই। কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় একজন মাননীয় মন্ত্রী, নিজ নিজ দপ্তরের 'স্বাধীন নৃপতি'! যখন যাঁহার যেমন ইচ্ছা বা খেয়াল তিনি সেইমত কার্য্য এবং আদেশজারী করিতে পারেন। তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছার তথা খামখেয়ালীতে অন্য কোন মন্ত্রী বাধা দিতে পারেন না। লোকসভাতে প্রশ্ন উঠিলেও তাহা প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই অগ্রাহ্য করা হয়। সংশ্লিষ্ট মহামন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলের একান্ত ন্যায্য দাবীও স্থির হইবার বহু পূর্ব্ব হইতেই কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দীভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ মহাশয় মন্ত্রীগণ হিন্দীকেই রাজতক্তে বসাইয়া occupation is ninety percent of law নীতি অনুসারে দেশে হিন্দীরাজ কায়েম করিবার অপপ্রয়াস চালাইয়া যাইতেছেন, দেশের শতকরা অন্তত সত্তর ভাগ জনমত অগ্রাহ্য করিয়া।

আকাশবাণীর প্রচারিত সংবাদ অবশ্য আমারা শ্রবণ করা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছি, কারণ ইহা সংবাদের নামে প্রধান এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তিগত গভীর গবেষনাপ্রসূত পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অথচ কাহারো কোনো কাজে লাগে না এমন সব অবাস্তব, সময় সময় হাস্যকর, বাণী বা 'আহ্বান' প্রচার ছাড়া আর কিছুই নহে। গত কিছুকাল হইতে স্বর্গত পিতার মত সেই ষ্টাইলে বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীও তাঁহার বিচিত্র এবং বিদ্‌ঘুটে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মতবাদ আকাশবাণীর নিউজ বুলেটিন মারফত অহরহ প্রচার করিতেছেন! পনরো মিনিটের সংবাদ প্রচারের সময়কালের মধ্যে প্রায়ই ১১ মিঃ ৩১ সেঃ প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ার 'বাণীতে' পূর্ণ থাকে।

সংবাদ প্রচারকদের দোষ দিব না। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা সংবাদ প্রচারকদের কণ্ঠ পরিবর্ত্তন করা কি যায় না? ক্লাসে পড়া-বলার মত করিয়া 'সংবাদ-পাঠ', অতি কষ্ট-শ্রবণ হইয়া পড়ে। সংবাদ প্রচার ক্রিয়াকর্ম্ম লোক্যাল ষ্টেশনের অধিকার ভুক্ত করিলে, (৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যবস্থাই ছিল) কার্য অনেক সুষ্ঠু ভাবে চলিতে পারে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এক্তিয়ার ভুক্ত না রাখিয়া। এ-বিষয় রাজ্যসরকারগুলিরও

দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লীর আকাশবাণীকে হিন্দী সর্ব্বাধিনায়কত্বথর্ব্ব না করিলে অহিন্দী ভাষী শ্রোতাদের হিন্দীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করা অসম্ভব

অন্য রাজ্যের কথা জানি না, কিন্তু কলিকাতা আকাশবাণী হইতে ক্রমশঃ বাঙ্গলার প্রচারের সময়ও কমিয়া যাইতেছে এবং এই কর্ত্তিত সময় দখল করিতেছে হিন্দী অশ্রাব্য প্রচারের অদ্ভুত বিষয়বস্তু, তাহার মধ্যে প্রধান এবং নিকৃষ্টতম হইতেছে হিন্দী 'বিবিধ' ভারতীর বিচিত্র 'কা র্য্যক্রম' প্রত্যহ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা। হিন্দী ফিল্মী সঙ্গীতের অতি মাত্রাধিক্য—অথচ সেই তুলনায় বাঙ্গলার স্থান কি? বাঙ্গলা দেশে হিন্দী সঙ্গীত 'কারিয়াক্রম'-কে এত প্রাধান্য দিবার উদ্দেশ্য কি, কোন মতলবে এবং কেনই বা তাহাকে স্থানীয় আকাশবাণী হইতে রিলে ক'রতে বাধ্য করা? রাজ্যগুলির যে সামান্য অটোনমি আছে, তাহার মধ্যে স্থানীয় রেডিও-ষ্টেশনগুলিকে আনিতে না পারা পর্য্যন্ত আমাদের হিন্দী-পীড়ন হইতে কেহই বাঁচাইতে পারিবে না। রাজ্য-সরকার কি এ বিষয়ে তৎপর হইতে পারেন না?

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজী-সংবাদ প্রচারের সময় হিন্দীর পরে করার জন্য বিক্ষোভ প্রকাশ করা হইল, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে ইহার বিরুদ্ধে কেহ একটু সামান্য প্রতিবাদও জানাইলেন না কেন? বাঙ্গলা শ্রোতা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা নেতাদের এ-বিষয়ে কি কোন কর্ত্তব্যই নাই? বাঙ্গালা শ্রোতাদের নিকট কি হালকা এবং বহুক্ষেত্রে অশ্রাব্য হিন্দী গানই হইল অমৃত সমান? শ্রোতাদের যদি এই মনোভাব হয় এবং এত অবনতিই যদি হইয়া থাকে বাঙ্গালী শ্রোতাদের মহলে, তাহা হইলে কলিকাতা আকাশবাণী বন্ধ করিয়া দিলে দোষ কি বিশেষ কয়েকটি অনুষ্ঠান বাদ দিলে কলিকাতা আকাশবাণীর মান অতীব নিম্নমুখী হইয়াছে। তাহা যদি না হইত তবে 'কৃষিকথার' আসরের ভাঁড়ামো, এই আসরের তথাকথিত মোড়ল পরিচালিত 'ধেড়ো খোকাদের' এক ঘেঁয়ে গুকারজনক আসর', (মন্ত্রীস্থানীয় এবং অন্যান্য বড় কর্ত্তাদের রসহীন সম্বলহীন 'আহ্বান' প্রভৃতি প্রচার লোকশিক্ষার নামে, কেমন করিয়া চলিতে পারে? বলা বাহুল্য শ্রোতাদের নিকট এইপ্রকার প্রচার মূল্যহীন এবং বিরক্তিকর হইয়াছে যে, আমাদের মনে হয় শতকরা ৯০ জন শ্রোতা এইসব বিচিত্র অতি মূল্যবান প্রচার শোনা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছে বাধ্য হইয়াই।

অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও যদি প্রজাপালক সরকার বাহাদুর এবং বিশ্বাভারে টৈটম্বুর মহামন্ত্রীদের প্রচার-বাহনরূপে ব্যবহার এবং নিয়োগ করাই সরকারী নীতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে গরীব রেডিও গায়ক এবং ধারকদের বাৎসরিক ১৫টি মূল্যবান মুদ্রার গাঁটগচ্চা হইতে রেহাই দেওয়ার দাবী কেন গ্রাহ্য করা হইবে না? আর রেহাই দেওয়া না-দেওয়ার সর্ব্বময় কর্ত্তা ত আমাদের একজন 'স্বাধীন নৃপতি' বেতার মন্ত্রী মহারাজ!

শিশু শিক্ষা—আনন্দের মধ্য দিয়া—।।

কিছুদিন পূর্ব্বে ঝড়গ্রামের নিকট গড়শালবনি গ্রামে এক শিশু উৎসবে রাজ্যপাল ধর্ম্মবীর বলেন যে—"শিশুদের মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি জাগ্রত করিতে হইবে, শিশুশিক্ষার ইহাই হইল যে গোড়ার কথা, সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা। মনে রাখিতে হইবে শিশুরাই দেশের এবং জাতির ভবিষ্যত।"— রাজ্যপাল আরো বলেন যে, মুক্ত আকাশ ও মুক্ত পরিবেশের মধ্যে শিশুদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। শিশু বয়স হইতেই যাহাতে ছোটরা দেশের মাটির স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা চাই—উক্তিগুলির মধ্যে কাহারো আপত্তি করিবার মত কিছু নাই, এবং ইহা সর্ব্বজন সমর্থন-যোগ্যও বটে।

কিন্তু আমাদের এ-রাজ্যে শিশুদের ভবিষ্যত চিন্তা করিবার পূর্ব্বে তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিদান করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

একথা সকলেই জানেন যে, দেশের শতকরা আশী-পঁচাশী জন সাধারণ মানুষ সর্ব্ববিধ দুঃখ কষ্ট এবং অভাব অনটনের মধ্যে দিনযাপন করিতেছে। এখন লক্ষ লক্ষ পরিবার আছে, যাঁহারা দিনান্তে একবারও পেট ভরিয়া

খাইতে পায় না। বলাবাহুল্য, এই সকল পরিবারের ছেলেমেয়েরাও অন্নাভাবে অপুষ্টির কারণে ক্রমশ জীর্ণ হইতেছে দেহে মনে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিষাদ-মলিন মুখের দিকে যদি চোখ মেলিয়া কেহ একবার চাহিয়া দেখেন, তাহা হইলে আমাদের কথার সত্যতা কত গভীর এবং ভয়ঙ্কর তাহা হয়ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যাহাদের পেটে নাই অন্ন, পরনে শতছিন্ন মলিন বসন শিশু বয়সেই যাহাদের প্রায় বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তি হইতেছে, তাহাদের জন্য 'আনন্দের মধ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা' করার কথা পরিহাস মাত্র। প্রকৃত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আজ যদি শিশুদের ভবিষ্যত চিন্তা করিতে হয়, তাহাদের মনে যদি বিন্দুমাত্র আনন্দ উৎসাহের সঞ্চার করিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, শিশুদের জন্য আজ সর্ব্বপ্রথম অন্নের সংস্থান করিয়া অর্থাৎ তাহাদের অন্ন বস্ত্রের নিম্নতম দাবী মিটান। অন্ন বস্ত্রহীনদের কাছে আনন্দের কথা বলা, তাহা যতই সত্য হউক না কেন, নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়া গৃহীত হইবে।

যাহারা এই মাটির পৃথিবীতে প্রথম চোখ মেলিয়া মাটিকেই দেখে, এবং এই মাটির ধুলাতেই যাহাদের সর্ব্বভাবে বঞ্চিত জীবন যাপন করিয়া শেষে এই পৃথিবীর মাটিতেই সমাজ অবহেলিত জীবন পরিত্যাগ করিতে হয়, 'মাটির' স্বাদ তাহাদের যেমন বিষমভাবে গ্রহণ করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে আবার নূতন করিয়া মাটির স্বাদের কোন প্রয়োজন আছে কি না জানি না। এই বঞ্চিতের অবহেলিতের নিকট মাটির 'বিস্বাদ'—একদিনেই কখনো সুস্বাদু হইতে পারিবে কি?

"ছোটবেলা থেকেই যাহাতে তারা (শিশুরা) দেশের মাটির স্বাদ গ্রহণ করিতে পারে তাহার জন্য যথাযথ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন" রাজ্যপালের এই বাক্যকে সার্থক করিতে হইলে, আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য দেশের সকল শিশু যাহাতে বাঁচিবার পক্ষে অন্তত নিম্নতম অধিকার অবকাশ লাভ করে তাহা দেখিতে হইবে। আমাদের সাধারণ ঘরের শিশুরা সামান্য জ্ঞান বুদ্ধি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখিতেছে বড় ঘরের, বিশেষ করিয়া বিত্তবান ঘরের শিশুদের বাঁচিবার শিক্ষালাভ করিবার, জীবনে আনন্দ লাভ করিবার আয়োজন-বাহুল্য, তাহাদের বসন-ব্যসনে, জীবনের সকল সুখ এবং আনন্দ উপভোগের জন্য কত প্রকার আয়োজন এবং চোখ ঝলসানো বৈচিত্র—যাহা গরীব ঘরের শিশুদের ভাগ্যে কখনো জুটিবে না। কপাল-গুণে হয়ত লাখে এক-আধজন গরীব শিশুর ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়া সুখ সৌভাগ্যের কিছু ছিটেফোটা পড়িয়া যায়। ইহা দুর্লভ ব্যতিক্রম মাত্র, সাধারণ নিয়মের বাহিরে। শিশুদের প্রতি কর্ত্তব্যের নীতি কথা এবং কি হওয়া প্রয়োজন, তাহা বারবার উপর মহল হইতে প্রচার না করিয়া, বাস্তব অবস্থার প্রতিকারে যদি সরকারী বেসরকারী ভাবে কিছু করা হয়, তাহা হইবে সত্যকার কাজ এবং অবহেলিত শিশুদের প্রতি মমতা প্রকাশ।

সত্যভাষণ—

ঝাড়গ্রামে: উপরি উক্ত শিশু-উৎসবের প্রধান অতিথির ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন বলেন:

"...ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা আছে ঠিকই।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেন:—

"বড়রা কি উচ্ছৃঙ্খলতা মুক্ত? সুতরাং ছোটদের মধ্যে শৃঙ্খলা আসে আমাদের নিজেদের দোষ ত্রুটিগুলির যাতে তাদের (ছোটদের) সামনে প্রকাশ না পায় তারজন্য সংযত হতে হবে।" —ডঃ সেন যাহা বলিয়াছেন তাহার একটি কথাও অগ্রাহ্য করার মত নহে। বর্ত্তমানে অহরহ দেখা যাইতেছে—বড়রা, যাহাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক স্কুল টিচার (নারী এবং পুরুষ) সামান্য কারণে এবং দাবী আদায়ের জন্য নিজেদের রাজপথে নামাইতে দ্বিধাবোধ করেন না। দৃশ্যটা খুব প্রীতিকর নহে। যাহারা নিজেদেরকে দেশের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান ব্রতে নিয়োজিত করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন ছোটদের, ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে নিজেদেরকে আদর্শ চরিত্র হিসাবে দাঁড় করানো। শিক্ষক শিক্ষিকারা যদি নিজেদেরকে কলকারখানার অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সামান্য কর্ম্মচারীর মত ব্যবহার এবং আচারে অভ্যস্ত করেন তবে তাঁহাদের

পক্ষে শিক্ষকতা বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তরে, গমন করাই সকলের পক্ষে শুভকর হইবে। ডঃ সেন খুব সম্ভব শিক্ষাব্রতীদের কথা স্মরণ করিয়াই উপরি-উক্ত কথাগুলি দুঃখের সঙ্গে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি কিছুসংখ্যক শিক্ষাব্রতী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্ত্তৃক কি লাঞ্ছিত অপমানিত নিগৃহীত হয়েন, তাহার কথা সহজে ভুলিবার নহে। এ রাজ্যে গত কিছুকাল হইতে দেখা যাইতেছে ভদ্র, নিয়ম এবং আচার-নিষ্ঠ ব্যক্তিরাই হইয়াছে সাধারণের উপহাস, আক্রমণের পাত্র এবং এই পরম শুভকর্ম্মের প্রধান প্ররোচক—প্রধানত আমাদের দেশ-হিতব্রত দুইটি বিশেষ এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক দল, দেশের সর্ব্বস্তরের সকল মানুষের মধ্যে একটা অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করাই যাহাদের একমাত্র দেশ এবং জনহিতকর কার্য্য। এই দুইটি দল এবং তাহাদের সমধর্ম্মীরা দেশের মানুষকে সকল সময় অস্থির রাখিয়া দেশে স্থিরতা আনিতে চায় নৈরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া।

কেবলমাত্র অধ্যাপক, শিক্ষকদের নিন্দা করিয়া লাভ নাই—ইহাদের সঙ্গে বিধান সভার মাননীয় সদস্যদের (যাঁহারা দেশের নিয়ামক এবং ভাগ্যবিধাতা বলিয়া দাবী করিয়া থাকেন) এবং কলিকাতা পৌরসভার অতি মাননীয় পৌরপিতাদের আচার, ব্যবহার তথা ভদ্র ও অতি সংযত কার্য্যকলাপের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা চলে। আমাদের বিধানসভায় প্রায়ই এমন প্রকার কাণ্ডকারখানা এবং অসভ্যজনোচিত হামলা হইতে দেখা যায়, যাহাতে, আমরা যাহাদের বস্তিবাসী বলিয়া ঘৃণা করি তাহারাও লজ্জা পায়। কলিকাতা পৌরসভার তথাকথিত পৌর অপপিতা-দের কথা না বলাই ভাল। পৌরসভার অধিবেশনে এই পরম জ্ঞানী, অতি-পণ্ডিত, কলিকাতার জন্য আত্মত্যাগী পৌরপিতারা যে প্রকার নিকৃষ্ট শ্রেণীর অমানুষ গুণ্ডামীর দৃশ্য দেখাইয়া থাকেন, তাহাতে কলিকাতায় সর্ব্বপ্রকার অসামাজিক নষ্টামীর প্ররোচক, প্রবর্ত্তক এবং পরিবর্দ্ধক মনুষ্যরূপধারী গুণ্ডারাও লজ্জায় অধোবদন হয়! সমাজের উপরতলার আমাদের পথপ্রদর্শক, সংস্কারক এবং নীতি-নির্দ্ধারক নিয়ামকদের দ্বারা যে বিষম দৃষ্টান্ত অহরহ রচিত হইতেছে, তাহাতে সমাজের নিম্নস্তরের মানুষদের নিকট হইতে বেশী কিছু আশা করা যাইতে পারে কি! ডঃ সেন এবং তাঁহার মত নীতিবান, শিষ্ট ব্যক্তিরা যতই দুঃখ করুন দেশের বিষম অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, উপরতলার দুর্নীতিদুষ্ট স্বার্থপর এবং সর্ব্ববিধ পাপ কর্ম্ম এবং পাপ-চক্রের উদ্যোক্তা, উদ্বোধকদের যতদিন মাটির গভীর কবরস্থ না করা যায়, ততদিন আমাদের সমাজ-জীবনে কোন-প্রকার শুভবুদ্ধির উদয়ের আশা আমরা করি না। অজ্ঞান-পাপীদের হয়ত পাপ মুক্ত করা যায়, কিন্তু জ্ঞান-পাপীদের উদ্ধার করার আশা দুরাশা মাত্র।

মুক্ত আকাশ ও মুক্ত পরিবেশের মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা ইহাই রাজ্যপালের বাসনা এবং সঙ্গত ইচ্ছা। আজ দেশ শিক্ষা বিশেষ করিয়া ভারতের ভবিষ্যত আশা শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কে পণ্ডিতের দল নানা বিচিত্র আলোচনা করিতে-ছেন, জনে জনে নবনব বিধানও দিতেছেন, কিন্তু আকাশের নিচে খোলা হাওয়ায় শিশুদের শিক্ষার কথা বিশেষ কেহ আজ পর্যন্ত বলেন নাই। শিক্ষাবিদ বলিয়াই হয়ত তাঁহাদের মাথায় সামান্য গাছতলার কথা মনে হয় নাই, হইতেও পারে না কারণ তাঁহারা বড় বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা ছাড়া অন্য কোথাও স্কুল কলেজের কথা চিন্তা করিতে পারেন না। রাজ্যপাল শিক্ষাবিদ্ বলিয়া পরিচিত নহেন, কাজেই তাঁহার নিকট শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রকৃতির কোলের কথাই মনে হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনে, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা কোথায় কেমন ভাবে হয় তাহা বলা চলে। এখানে প্রথম হইতেই ছাত্ররা খোলা আকাশের নিচে গাছতলায় বসিয়া গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিতেছে। এই ব্যবস্থায় কেহ কখনও আপত্তি জানায় নাই। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথই এই ব্যবস্থা প্রচলন করেন। তিনিও বোধহয় 'শিক্ষাবিদ' ছিলেন না এবং তাঁহার বি-এড্ বা এম এড্ ডিগ্রীও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাবিদ না হইলেও, মানুষের তথা শিশুদের কল্যাণকর শিক্ষা কি যে হইতে পারে, সে বিষয়ে সামান্য "চিন্তাবিদ্" হয়ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাব্যবস্থা সমগ্র বিশ্বের জ্ঞানী এবং গুরুজন কর্ত্তৃক

প্রশংসিত হয়। কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশেও এই নূতন (তৎকালে) শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রবর্ত্তন করা হয়, কিন্তু আমাদের এই গণতন্ত্রী গরীব দেশে নব্য শিক্ষাবিদ এবং পণ্ডিতদের নিকট হয়ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। কেবলমাত্র ওড়িষ্যার সাক্ষীগোপাল নামে গ্রামে পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস তাঁহার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আলোচ্য পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিদ্বারে গুরুকুল আশ্রমেও খোলা আকাশের নীচে বৃক্ষতলেই ছাত্রদের শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালিত হইত এক সময়, এখনকার কথা ঠিক জানা নাই। বর্ত্তমান কালের তথাকথিত শিক্ষাবিদ্‌দের নিকট পুরাণ কথা বলিয়া লাভ নাই, কারণ তাঁহারা সকল বিষয়েই পরিবর্ত্তন এবং 'নূতন কিছু' করার পক্ষপাতী। কিভাবে যথার্থ শিক্ষাদান প্রকৃষ্টভাবে করা যায়—সে-দিকে কাহারো দৃষ্টি নাই। সকল বিষয়ে সকল কর্ম্মে আমরা নিজ এবং নিজদলীও স্বার্থ চিন্তা করিয়া কাজ করি। শিশুদের জন্য শিক্ষাব্যবস্থা অন্তকার শিক্ষাবিদ্‌গণ যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন দেন, তাহার মধ্যে অবহেলিত সমাজের শিশুদের জন্য এক ব্যবস্থা, কিন্তু কর্ত্তাব্যক্তিদের সন্তানদের জন্য কার্য্যত হয় অন্য ব্যবস্থা, অর্থাৎ বিত্তবানঘরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার জন্য যে-সুযোগ সুবিধা পায়, দরিদ্রঘরের সন্তান সে-সুযোগ গ্রহণের অবকাশ লাভে বঞ্চিত থাকে অর্থাভাবের জন্য।

আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে পারিব না, কারণ শিশুশিক্ষার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত, এ-বিষয় সাধারণভাবে সামান্য আলোচনার সূত্রপাত মাত্র করিলাম। একমাত্র অনুরোধ কথায় কথায় সকল বিষয়ে সকল সময় কেবল 'কমিশন,' 'কমিটি' গঠন করিয়া তাহার উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করা, কর্ত্তব্য এড়াইয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। আর একটি কথা: শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধাবলী পাঠ করিলে বর্ত্তমান শিক্ষাবিদ্‌গণ হয়ত নূতন জ্ঞান লাভ করিবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা তাহাদের হইবে কি? বর্ত্তমান শিক্ষাবিদগণ মনে করেন, তাঁহাদের শিক্ষা এবং শিক্ষাদান বিষয়ে পৃথিবীতে কেহ তাঁহাদের নূতন জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে না। ইহারা সকল বিদ্যার ওপারে গিয়াছেন।

———
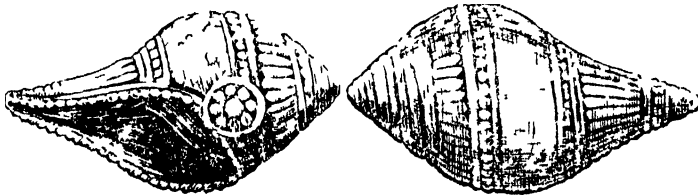
রাত্রির বাগানে

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভোর হলেও মৃতের চক্ষুতে,
অন্ধের দৃষ্টিতে আর ঘুমন্তের চোখে অন্ধকার।
ভোর হলেও চোখ বুজে স্বকৃত অন্ধকারে থাকি।

এখন এখানটায় অন্ধকার রাত্রির বাগান,—
লাল, নীল, সাদাফুল পাতাবাহারেরা
সব কালো, একাকার কালো ;
সূর্য্য উঠলে এ বাগান নানারঙে তরঙ্গ হবে ;
তাদের বিচিত্র গন্ধ অন্ধকারেও আমি পাই
এবং সূর্যের জন্য প্রতীক্ষায় থাকি।

হেথা নয়, অন্য কোথাও
রাতারাতি তাড়াতাড়ি পালাবার আতঙ্ক আমার
বিন্দুমাত্র নেই,
কেননা যা-কিছু চাই এখানেই আবৃত আছে ;
হাৎরে হাৎরে ঠাউরে নেব তাদেরকে এই অন্ধকারে।

স্বপ্ন !

বিভা সরকার

শুচিশুভ্র তুষারের
　　বিন্দু বিন্দু করি কি সঞ্চয়
রচনা হয়েছে তাজ
　　তাই কি সে বিশ্বের বিস্ময় ?
আলোড়ি সাগর বক্ষ
　　কুড়ায়ে প্রবাল মুক্তা আনি
দেশান্তর হতে লয়ে
　　মরকত হীরা পান্না চুনি—
রাজৈশ্বর্য ঢেলে দিয়ে
　　তৃপ্ত নহে বিরহী সম্রাট ;
মর্ম্মরে জীবন দিতে
　　খুলে দিল হৃদি রাজ্যপাট !
পৃথ্বীর ললাটে জাগে
　　সাধনার চির জয়টিকা
যুগে যুগে লিখে যায়
　　মানস ধ্যানের জ্যোতির্লিখা।

শ্রেয় প্রেয় চিরন্তন
　　হৃদয়ের চির শুভশুচি
মুগ্ধ নিষ্ঠ প্রেমিকের
　　একটি মহান অভিরুচি।
এ শিল্প দেউলে তাই
　　দিশাহারা দর্শকের দল,
আত্মহারা আনচান
　　স্তব্ধবাক বিহ্বল চঞ্চল !
কালজয়ী এ মীনারে
　　শুধু মমতাজ নহে, নহে সাজাহান
শিল্পীদল শ্রান্তিহীন
　　বক্ষে এর ঢেলেছিলো প্রাণ।
বিশ্বের বিরহ নিয়ে
　　বহুর স্বপ্নের সাধ জাগে
মানব অমর কীর্ত্তি
　　যুগে যুগে নব অনুরাগে।
মর্ম্মরের স্তরে স্তরে
　　শিল্প সাধ নাহি মানে দিশা—
শিল্পীর জাগ্রত স্বপ্ন
　　ভাস্কর্য্যের মূর্ত্ত মোনালিসা !

বাগানিয়া

নীরদবরণ

বাগানের 'পরে করেছ বাগান, রাশি রাশি সেথা ফোটাও ফুল,
বাগানিয়া সখা মোর,
কি দেখিতে পাও ফুলের গহনে, কোন গুণে তারে করো আকুল,
ওগো ফুল-চিত-চোর !
দেখিতে কি পাও স্বর্গসুষমা, শোন কি অতল মর্ম্মবাণী,
বাগানিয়া সখা মোর ?
তাহারি অর্ঘে জীবনবেদাতে সাজাও শুভ্র কুসুমদানি,
দিবস যামিনী ভোর !
উষা সময়ে উদ্যান জাগে আবেক ঘুমের কুয়াশা ছাড়ি—
শুনি তব আগমনী,
তোমারি পরশে আঁখি মেলে চায় বিচিত্র শোভা পুষ্পঝারি,
ওঠে অস্ফুট ধ্বনি ;
তব সম্ভাষে তাদের মানসে গুঞ্জরে কত স্বপন-কথা !
বর্ণ-হৃদয় খুলি
দেয় উপহার গন্ধ-বাহার, রাতের পূর্ণ সঞ্চয়তা
তোমারি হস্তে তুলি !
সারাদিনমান কাটে তব কাল এফুল ওফুল সাথীর পাশে
বাগানিয়া সখা মোর !
প্রতি প্রসূনের বেদনায় রাঙা ছায়া ফেলে তব হৃদয়াকাশে,
ঝরায় অশ্রু লোর ;
তাদের প্রাণের মঞ্জরীমূলে তব অচিন্ত্য উৎস খোলে,
তাহারি পুলক-গীতি

গুঞ্জরে যায় শিশিরসিক্ত কণক রজত মুকুতা দলে
বিমোহিয়া সারা বীথি।
ভুলে যাও সব বিশ্বভুবন সে ফুল-ভুবনে মগ্ন রহি,
সেথা বাঁধো খেলা ঘর ;
পূবের সূর্য পশ্চিমে ঢলে, আসে সন্ধ্যার মমতাময়ী
দীপ জ্বালি মন্থর ;
তবু স্নেহসুধা ঢালো ফুলে ফুলে, মানোনা ক্লান্তি, মানোনা বাধা ;
প্রতিটি সুপ্ত বীজ
ফুটাও যতনে, তারি ফুলদলে তোমার প্রেমের সরণী পাতা,
ওগো ফুল-মনসিজ !
চিরবসন্ত হাসি তব মুখে, তাহারি মলয় ছন্দ পায়,
বাগানিয়া সখা মোর,
যে যাদুতে খুলি কলির পরাণ ফোটাও সূর্যচন্দ্রমায়,
রাঙো ধূলি অম্বর,
সে যাদু চাবিতে খোল মোর দ্বার, ছোঁয়াও তোমার সোনার কাঠি,
যাহার পরশ রাগে
এই রূপরস গন্ধবিহীন চিরনিদ্রিত মর্ত্যমাটি
ফুল নন্দনে জাগে !
বাগানের 'পরে করেছ বাগান, রাশি রাশি সেথা ফোটাও ফুল,
বাগানিয়া সখা মোর !
কি দেখিতে পাও ফুলের গহনে, কোন গুণে তারে করো আকুল
ওগো ফুল-চিত-চোর !
দেখিতে কি পাও স্বর্গসুষমা, শোন কি অতল মর্ম্মবাণী,
বাগানিয়া সখা মোর ?
তাহারি অর্ঘে সাজাও তোমার জীবন-বেদীর কুসুমদানি,
দিবসযামিনী ভোর !

---

৪৮৮ পাতার পর

কারণে ট্রেড ইউনিয়নের নেতাগণ মন্ত্রী হইলে তাঁহারা স্বভাবতই পক্ষপাতিত্ব করিতে পারেন। অপরাপর মন্ত্রী-গণও নিরপেক্ষভাব রক্ষা করিয়া না চলিতেও পারেন। মন্ত্রীত্ব দান করিবার পূর্ব্বে এই সকল সম্ভাবনা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া লইতে হয়। মন্ত্রীগণ যাহাতে নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন সেইরূপ ব্যবস্থাই অতি আবশ্যক। শাসন কার্য্যে নিরপেক্ষতা না থাকিলে সে শাসন পদ্ধতি কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। ইহা শুধু শ্রমিক মালিক, শিক্ষক-ছাত্র, রাজস্ব আদায়কারী ও রাজস্বদাতা প্রভৃতির সম্বন্ধ বিচারের ক্ষেত্রের কথা নহে। যাঁহারা সকল দেশ-বাসীর লাভ লোকসান ন্যায়তঃ বিচার করিয়া শাসন চালাইবেন তাঁহারা শ্রেণী সংঘাত ও দলাদলিতে অধিক আস্থাবান হইলে সুশাসনকার্য্যে যোগ্যতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবেন। সুতরাং নিরপেক্ষভাবে ন্যায়ত ও নিয়ম অনুযায়ী পদ্ধতিতে শাসনকার্য্য চালাইতে হইলে গোষ্ঠী অথবা গণ্ডির মতবাদ ভুলিয়া সকল শ্রেণীর মঙ্গল ও দেনা-পাওনার কথা সমান আগ্রহে বিচার করিয়া চলা আবশ্যক হইবে। ইহা না করিতে পারিলে মুসলমান সাম্রাজ্য যে পক্ষপাতিত্ব দোষে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল সেই দোষে যে কোন প্রভুত্বই ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। রাজকার্য্যে নিরপেক্ষতা মহত্তম গুণ।

সত্যেন্দ্রনাথ রায়

সম্প্রতি ভারতীয় সিভিল সারভিসের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সতেন্দ্রনাথ রায়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পূর্ব্বে প্রায় দশ বৎসরকাল বাংলা দেশের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন ও অবসর গ্রহণের পরে স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ কর্ম্মজীবনে সত্যেন্দ্রনাথ রায় সকল সময়েই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সুনীতি অনুসরণে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার আগ্রহের জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাংলা দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল এবং তাঁহার পরলোক গমনে বাংলার শাসনকর্ত্তাদিগের সৎপরামর্শলাভের একটা বিরাট উৎস লুপ্ত হইল। সত্যেন্দ্রনাথ সুগায়ক, সুবক্তা এবং বন্ধু মহলে রসিক বলিয়া বিশেষ আদৃত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শিকার বিষয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন ও অনেকগুলি নরখাদক ব্যাঘ্র হনন করিয়া গ্রামবাসীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। মৃত্যুর দুইতিনমাস পূর্ব্বেও তিনি একটি ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই সত্যেন্দ্রনাথ শিক্ষা অনুরাগী ছিলেন ও সকল পরীক্ষাতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া সুনাম লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২১ খৃঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কিংস.কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করেন এবং পদার্থ বিজ্ঞান ও অর্থ-নীতিতে ট্রাইপস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। কেমব্রীজ হইতেই তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় সক্ষম হইয়া ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হ'ন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি শ্রীমতী রেণুকা মুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্তির পরে তখন দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীমতী রেণুকা রায় বিবাহের পরে রাজনৈতিক কার্য্যে যোগদান করেন ও বাংলার কংগ্রেস মন্ত্রীসভায় মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। কর্ম্ম-জীবনের শেষের দিকে সত্যেন্দ্রনাথ রায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দক্ষিণ হস্তের মতই ছিলেন এবং সেই যুগের সুশাসনের খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির অনেকটাই তাঁহার কর্ম্ম-ক্ষমতাপ্রসূত বলিলে ভুল হইবে না।

ভাবপ্রবণ জাতির ভাবান্তর

যে সকল জাতি ভাবপ্রবণ তাহাদিগের মধ্যে নূতন নূতন আবেগের আবির্ভাব সহজেই হয়। ভাবান্তরের একটা রূপ চিত্তবিকার; অর্থাৎ পূর্ব্বের ভাবধারায় গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া বিপরীত পথে চলিবার প্রবল ভাবাবেশ।

ফরাসী জাতি খুবই ভাবপ্রবণ। তাহাদিগের মধ্যে সহজেই বিপ্লব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়; আবার তৎপরেই রক্ষণশীলতা প্রবলভাবে জাতির অঙ্গে অঙ্গে ব্যক্ত হইতে থাকে। ইতালীয়ান জাতীও সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়-প্রীতিতে জগৎ বিখ্যাত। ঐ দেশেও দেখা যায় আজ সকলে ফ্যাশিষ্ট ও কাল ফ্যাশিজম্‌কে উদ্দাম আবেগে দূরে নিক্ষেপ করিয়া ও ফ্যাশিষ্ট নেতাগণকে মাটিতে লুটাইয়া দিয়া সোসিয়ালিজম্‌ অথবা কম্যুনিজমের তাণ্ডব নৃত্য। ভারতের কোন কোন জাতি বিশেষরূপে ভাবাক্রান্ত ও সেই সকল জাতির মানুষ প্রায়ই পুরাতন প্রেরণাকে ত্যাগ করিয়া নূতনের সন্ধানে ধাবমান হয়। কথনও বিদেশী-দিগের প্রতি প্রবল বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিয়া সকলে স্বদেশ প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়ে; আবার কখনও বা বিদেশীর পদলেহনে ঐ সকল জাতির লোকেরা কোন লজ্জা অনুভব করিতে ভুলিয়া যায়। কখনও অহিংসা ধর্ম বিশ্বাসের মতই সকলের মনকে অভিভূত করিয়া রাখে; কখনও বা সশস্ত্র আক্রমণে মতবিরোধ নাশ করিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। সুতরাং ভাবপ্রবণ জাতির মানসিক অবস্থা একই প্রকার থাকিবে এই বিশ্বাস আশ্রয় করিয়া কাহার পক্ষে চলা বুদ্ধির কার্য্য হয় না।

জাতির নিজের পক্ষেও এই প্রকার বিক্ষিপ্তচিত্ত ভাবে চলা গঠনশীলতা সহায়ক নহে। কারণ যে ক্ষেত্রে কোন আদর্শই অধিককাল অনুসৃত হয় না এবং জাতির রাষ্ট্রীয় অর্থ নৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি থাকিবে কি না তাহাও পরিষ্কার বোধগম্য হয় না সেক্ষেত্রে মানুষের কর্ম্মে উৎসাহ কোন প্রসার বা গভীরতা লাভ করে না। লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত না হইয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে শেষ অবধি জাতির পক্ষে তাহাই মঙ্গলসূচক হয় দেখা যায়। ব্যক্তির পক্ষে চিত্তচাঞ্চল্য যেরূপ ক্ষতিকর জাতির পক্ষেও তাহাই হইয়া থাকে।
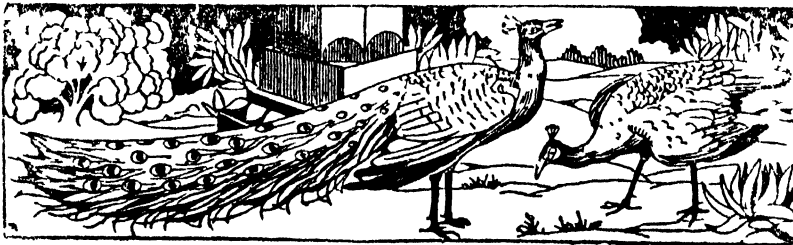
নিপীড়নের নাগপাশ

কালীচরণ ঘোষ

এতদিন ভস্মাচ্ছাদিত যেটা ধূমায়িত ছিল, বঙ্গভঙ্গের পর সেটি বহ্নিমান হয়ে উঠ্‌লো। চারিদিকে প্রচণ্ড আন্দোলন মাথা তুলে উঠেছে। তার ভঙ্গিমাও নানা আকারে প্রকাশ পেয়েছে। পুলিশের সঙ্গে ছাত্র যুবকদের সঙ্গে খটাখটি, বিদেশী মাল চলাচল বা বিক্রী করার চেষ্টা, নতুন স্বদেশী বাজার সৃষ্টি করা, বিদেশীদের প্রতি বিদ্রূপ পরিহাস, 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিদ্বারা উত্যক্ত করা প্রভৃতি বিদেশীর বিরুদ্ধে মনোভাবের এগুলি মাত্র কয়েকটি অভিব্যক্তি।

গভর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। চণ্ডনীতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল জনসাধারণের ওপরে। তাদের আশা ছিল বালির বাঁধ সাহায্যে বন্যা রোধ করবে। অন্দোলনের ভঙ্গীর সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের শাসাশাসানি বিভিন্নরূপ নিয়েছে। তার মধ্যে বেশী আক্রোশটা পড়ে ছাত্রদের ওপর। সহানুভূতিসম্পন্ন অভিভাবকরা পরিত্রাণ পাননি। অপরাপর যে সকল পন্থা অবলম্বিত হয়েছিল, তার রূপের পরিচয় এই সঙ্গেই দেওয়া হচ্ছে।

"বন্দে মাতরম্"

"বন্দে মাতরম্" শব্দ দুটি যে শাসনকর্ত্তাদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় ছিল সে কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে। নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গে এর বিরুদ্ধে সরকারী অভিযান চলেছে।

সব ঘটনা বিবৃত করা সম্ভব নয়; সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ছেলেরা চীৎকার করে উধাও, আর পুলিশ এসে লোকের বাড়ী ঢুকে এলোপাতাড়ি লাঠি চালিয়ে লোক জখম করে চলে গেছে। পথচারী যারা সেই উদ্দাম আক্রমণের সামনে পড়েছে, তাদের দুর্দশার আর সীমা পরিসীমা ছিল না।

ইংরেজি প্রবচনে বলে লাল ন্যাকড়া দেখলে মহিষ ক্ষেপে যায়। কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, কথাটার সত্যতা কিছু কম। এখন লাল ন্যাকড়ার ছড়াছড়ি কিন্তু "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের কানে প্রবেশ করে সকল শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারীকে বিব্রত করে তুলেছিল।

ঢালাও এক হুকুম পূর্ব্ববঙ্গ চিফ্ সেক্রেটারীর অফিস থেকে ৮-ই নভেম্বর (১৯০৫) প্রচারিত হলো। তার মূল বক্তব্য; প্রকাশ্য সভা চলবে না, আর "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ-স্বরূপ বলা হলো যে এই ধ্বনিতে শান্তি ভঙ্গ হবার সম্ভাবনাঃ ব্রিটিশ ভারতে এ হেন অশুভ ঘটনা ঘটতে দেওয়া যায় না। সদররাস্তায় মিছিল চলবে না; বাদ্যধ্বনি, সঙ্গীত নিষেধ।

ব্যক্তি হিসাবে এই শাসনযন্ত্র কেমন প্রযুক্ত হয়েছিল তার কিছুটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে। ১৯০৫ নভেম্বর মাসে এক (অশুভ) দিনে ফরিদপুর জেলা স্কুলের ছাত্ররা "বন্দে মাতরম্" বলে বেড়িয়েছে। জেলা শাসকের কাছে সংবাদ গেলে তিনি স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের ওপর হুকুম জারি করলেন যাতে অপরাধী ছাত্রদের যথোপযুক্ত শাস্তিবিধান করা হয়।

অমৃতবাজার পত্রিকার ২৪-এ জানুয়ারী (১৯০৬) সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হইতে জানা যায় বরিশালে বিধুভূষণ নামে এক ভদ্রলোক তাঁর নিজের বাড়ীর মধ্যে "বন্দে মাতরম্" বলেছিলেন। যখন এই ধ্বনি নিষিদ্ধ করা হয়েছে তখন তিনি নিশ্চয়ই অপরাধ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামে মামলা রুজু করা হলো। সেদিনে এ গুরু অপরাধে কারও মুক্তি পাবার কথা শোনা যায় না। হয়

জেল, নয় জরিমানা, কখনও কখনও উভয় শাস্তি এক সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে।

"বন্দে মাতরম্" অনেক নির্য্যাতন কাটিয়ে উঠেছিল, স্বাধীন ভারতের নায়কদের হাতে তার অপমৃত্যু ঘটবে বলে। জলপাইগুড়িতে সরস্বতী পূজা হলো; প্রতিমা নিরঞ্জন ভক্তদের আনন্দের এক অঙ্গ। তদুপলক্ষ্যে মিছিল হতে পারে এবং আনন্দের আতিশয্যে ছেলেরা "বন্দে মাতরম্" বলতে পারে বলে পুলিশ মিছিল বন্ধ করার আদেশ জারি করে দিলে। উপায়হীন অবস্থায় দেবী ভক্তগৃহে সে বছর বাস করলেন। ছাত্র-নিপীড়নের যত ফন্দী সরকারী মস্তিষ্কে গজিয়ে উঠেছিল, তার খানিকটা যদি সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত হতো তা হলে বাঙ্গলার বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠতে আরো কিছু সময় লাগতো। ঢাকা বিভাগের অস্থায়ী স্কুল পরিদর্শক (Inspector of Schools) ষ্টেপলটন (H-E-Stapleton) কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঢাকা থেকে এক পত্রাঘাত করেন। ২৯-এ মে (১৯০৬)। তাতে বলা হয়েছিল যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে 'পাঁচশ' বার লিখতে হবে "বন্দে মাতরম্" বলে অযথা সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় বা অবিবেচনার কাজ।"

To copy out five hundred times "It is foolish and rude to waste my time in shouting Bande Mataram."

এতে গায়ের ঝাল মেটেনি। ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ের ফাঁকি দিতে পারে। সুতরাং বলা হলো যে লেখা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হবে এবং প্রত্যেক ছাত্র যে অপরের বিনা সাহায্যে নিজে লিখেছে সেই একরার (সার্টিফিকেট) সহ তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। সতর্কবাণী উচ্চারণ করে পত্র সমাপ্ত করা হয়েছে, অর্থাৎ এই জাতীয় সমস্ত কার্য্যকলাপ বন্ধ করতে না পারলে স্কুলের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে।

মাধবপাশা (বাখরগঞ্জ)র এক জন সেটেলমেণ্ট বিভাগের কর্ম্মচারীর সামনে বিলাসচন্দ্র কুঞ্জবিলাসা (?) "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করায় দুমাস কারাদণ্ড ভোগ করেছেন।

ঐ জেলারই হরিবপুরে বিপিনচন্দ্র গুহ, ললিতমোহন গুহ ও ইন্দ্রচন্দ্র গুহ "বন্দে মাতরম্" বলে চীৎকার করায় সঙ্গে একজনের কাছ থেকে কিছু বিদেশী নুন ফেলে দেয়। বিচারে প্রত্যেকের একমাস করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

টাঙ্গাইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক দুই ছোকরা জগদীশচন্দ্র গুপ্ত বক্সী আর জিতেন্দ্রকান্ত বসু উৎসাহভরে "বন্দে মাতরম্" বলেছিল। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৭ ধারা মতে (মন্দস্বভাব ও দুর্বৃত্ত প্রকৃতি) তাদের সচ্চরিত্রতার অঙ্গীকারে জামীন মুচলেখা দিতে হয়েছিল।

রংপুরে জিলা স্কুলের তিন ছাত্র "বন্দে মাতরম্" বলায় প্রত্যেকের ১০-ই নভেম্বর (১৯০৫) তিন টাকা হিসাবে দণ্ড ধার্য্য করা হয়।

বনকাঠিতে যথাক্রমে সাত ও আট বছরের দুই কিশোরকে "বন্দে মাতরম্" বলার অপরাধে পুলিশ টান্‌তে টান্‌তে তাদের থানায় নিয়ে গিয়ে হাজির করে। মামলা দায়ের করা হয় নি বটে, পুনরায় এরূপ "গুরু" অপরাধ করলে দুর্দশা কি হতে পারে সেটা বেশ করে বুঝিয়ে তাদের তখনকার মত মুক্তি দেওয়া হয়।

ফক্‌নার (Faulkner) হলেন পুলিশের এ্যাসিস্টাণ্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। ছোট ছোট ছেলেদের হাত পায়ের গাঁটের ওপর লাঠি মারবার এক বিশেষ হুকুম তাঁর জারি করা ছিল। অবস্থা এতদূর গড়ায় যে এক ভদ্রলোক সাহেবের নামে নালিশ করলে আসামীর পাঁচ টাকা জরিমানা হয়। আপীলে অবশ্য সে সাজা মকুব করা হয়েছিল।

"বোঝার ওপর শাকের আঁটি"র মত একটি ছোট্ট ঘটনা। বরিশালে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাড়ীর মধ্যে থেকে "বন্দে মাতরম্" বলাতে গুর্খারা ভিতরে ঢুকে বেদম প্রহার করে প্রস্থান করে।

স্বদেশী পণ্য ব্যবহার

স্বদেশী পণ্যের প্রসার রোধ করার নানা পন্থা

গৃহীত হয়েছিল পূর্ব্ববঙ্গে। তার কিছু নমুনা এখানে দেওয়া হচ্ছে।

ঢাকার চিফ্‌সেক্রেটারী লায়ন (P. C. Lyon) ৪-ঠা নভেম্বর ১৯০৫ দেশী বিদেশী দ্রব্য ক্রয়বিক্রয়-বিধি নিয়ে এক ইস্তাহার জারি করেন। তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, জনসাধারণ যেন দেশী দ্রব্য ক্রয় করে এইটা সরকার বাহাদুরের ইচ্ছা। "এ সংবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। যার যেমন খুশি দেশী-বিদেশী নির্ব্বিশেষে পণ্য ক্রয় করতে পারবে। যদি কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশী মাল কিনতে বাধ্য করা হয় তা হলে সেটা অপরাধ বলে গণ্য হবে। যদিও এ অপরাধ সদ্য পুলিশগ্রাহ্য (Cognisable) নয়, তথাপি শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভাবনা বর্ত্তমান থাকায় পুলিশ এ কাজে বাধা দেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের সংশ্লিষ্ট মহলের গোচরীভূত করবে।"

বাখরগঞ্জে কয়েকজন নেতা ১৯০৫ নভেম্বর (২১-এ কার্ত্তিক ১৩১২) দেশী দ্রব্য কেনবার জন্য এক আবেদন প্রচার করেন। সরকার পক্ষ থেকে হুকুম জারি হলো যে এ আবেদন প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারী মতে কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট কোনো এক বিশেষ শ্রেণীর পণ্য কেনবার নির্দ্দেশ দিতে পারে, অপর কারও এ বিষয়ে কোনো এক্তিয়ার নেই। আদেশের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি চলবে না; যা বলা হয়েছে তাই পালন করতেই হবে।

মেহেরপুর (নদীয়া)-এ এক ছাত্র একজন বিদেশী বস্ত্র-ক্রেতাকে অনুরোধ করে যেন সে ঐ কাপড় দোকানে ফেরত দিয়ে দেশী কাপড় নিয়ে আসে। সরকারী মতে এটা অপরাধ বলে পরিগণিত হয় এবং মামলায় তার শাস্তির ব্যবস্থা হয়।

মাদারিপুরের মহকুমা হাকিম (Briscoe S. D. O) ব্রিস্কো ইস্তাহার জারি করলেন যে পিকেটিং একটা গুরুতর অপরাধ। যদি সরকারী কর্ম্মচারী কাকেও বিলাতী মাল ক্রয় করতে বাধ্য করে, সেটা কিন্তু অপরাধ নয়। ব্রিস্কো-শাসিত এলাকায় দেখা গেল শ্বেতাঙ্গরা বাজারে বাজারে ঘুরে লোককে বিলাতী কাপড়, নুন, চিনি কিনতে বাধ্য করছে। সঙ্গে পুলিশ ঘুরছে এবং এ কাজে খুব উৎসাহ প্রকাশ করছে।

ভোলা (বরিশাল)-র দুই উকিল মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ও নবীনচন্দ্র দাশগুপ্ত বিলাতী লবণ বিক্রয়ে বাধা দেন। ১৮-ই ডিসেম্বর মামলা রুজু হয় তাঁদের বিরুদ্ধে। ৯-ই জানুয়ারী (১৯০৬) বিচারের রায়ে প্রথমজনের এক হাজার ও দ্বিতীয়র চারশ' টাকা অর্থদণ্ড হয়।

বিলাতী লবণের ক্রয় বিক্রয় নিয়ে দেশের ছেলেদের খুব তীক্ষ্ণ নজর পড়ে। ৭-ই জুলাই (১৯০৬) বরিশালের খবর যে সেখানে পিয়ারীমোহন বসু নামে এক যুবককে বিলাতী নুন ফেলে দেওয়ার অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

সুনামগঞ্জে ক্রেতা বিলাতী কাপড় কেনবার জন্যে প্রস্তুত। এমন সময় দুর্গাচরণ চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র গুহ আর প্রসন্নকুমার বসু তাতে বাদী হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ২৪-এ সেপ্টেম্বর (১৯০৬) তাঁদের নামে মামলা রুজু হয়েছিল।

ঈশানচন্দ্র ঘোষ কুড়িগ্রাম (রংপুর) বাজার থেকে ৮-ই জুলাই ১৯০৬ বিলাতী কাপড় কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। পথে জীবনকৃষ্ণ দত্ত (মোক্তার), পরেশনাথ রায় ও তাঁর ওড়িয়া পাচক ঈশানের সম্মতিক্রমে কাপড়খানি নিয়ে পুড়িয়ে দেন। সরকারী শাসন এ অনাচার সহ্য করতে পারে না। বিচার আরম্ভ হলো, কৃষ্ণর দু সপ্তাহ সশ্রম কারাবাস, পরেশের পঞ্চাশ এবং পাচকের ত্রিশটাকা জরিমানা হয়।

মাত্র ষোলোবছরের ছেলে রাজেন্দ্রলাল সাহা বল্লা (ময়মনসিংহ)তে এক দোকানে বিলাতী কাপড় বিক্রয়ে আপত্তি করে। সেখানে দোকানের মালিক ও অপর কয়েকজন রাজেন্দ্রকে ভীষণ প্রহার করে এবং তার বিরুদ্ধে নালিশ করে। বিচারে (৩০-এ অক্টোবর ১৯০৬) অপরাধীর দু সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আপীলে নিম্ন আদালতের আদেশ বহাল থাকে।

রাজবাড়ী (ফরিদপুর)তে মোহর মোল্লা তাঁর বাজারে বিলাতী লবণ বিক্রয় বন্ধ করায় পঞ্চাশ টাকা দণ্ড দিতে বাধ্য হয়।

নরসিংদি (ঢাকা)তে লালু বাস্তকর ও রাজকুমার চক্রবর্ত্তী তাঁদের ইজারা নেওয়া বাজারে বিলাতী লবণ বিক্রয়ে বাধা দেওয়ার প্রত্যেকে পঁচিশ টাকা হিসাবে দণ্ড দিতে বাধ্য হয়।

নলচিটি (বাখরগঞ্জ)-তে মস্তাজ আলি ও ইয়াকুব আলি বাজারে বিলাতী লবণ বিক্রয়ে আপত্তি করায় প্রত্যেকে এক মাস হিসাবে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

বিদ্যালয় ও জনসাধারণ

ছাত্রদলন কার্য্যের পরিচয় দেবার আগে স্কুল, ছাত্র অভিভাবক, জনসাধারণের ওপর কি পরিমাণ অত্যাচার করা হয়েছে এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসী কিভাবে তা গ্রহণ করেছে আজ সে কথা মনে হলে গর্ব্বে প্রাণ ভরে ওঠে। কিছু নমুনা "প্রবাসী"র পৃষ্ঠায় গ্রথিত হয়ে থাক। অসতর্ক মুহূর্ত্তে কেউ যদি পুরাতন "প্রবাসী"র পাতা উল্টে ফেলেন, তখন তাঁদের কাছে কথাটা একবারের জন্ম মনে উঠতে পারে, এই আশা।

মাদারিপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত (সভাপতি) এবং পালঙ, তুলাসার, চিকন্দি, লোনসিঙ, কান্তিকপুর, পণ্ডিতসর, গোপালপুর, খাসিয়া, বাজিৎপুর, বিঘারি, এবং মাদারিপুর, প্রত্যেক স্কুলের নির্ব্বাচিত এক একজন শিক্ষক প্রতিনিধি ৫ই নভেম্বর ১৯০৫ সভায় মিলিত হয়ে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাতে বলা হয় যে-হেতু আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে কোনো অশালীন আচরণ করে নি এবং যে-হেতু আমরা সর্ব্বসময়ে তাদের বে-আইনী কার্য্যকলাপ বা উচ্ছৃঙ্খলতা শাস্তি দ্বারা রোধ করতে প্রস্তুত, সে কারণে আমরা ১০-ই অক্টোবর ১৯০৫ তারিখের ১৬৭৯ নং পি. ডি, (ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান ও শান্তিব্যবস্থা) আদেশ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি এবং আমাদের বিবেকানুযায়ী তা পালন করতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম।"

দ্বিতীয় এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, শিক্ষকদের স্বার্থ (সম্মান ইত্যাদি) সংরক্ষণের জন্ম একটি শিক্ষক-সমিতি গঠিত হউক।

গৃহীত সিদ্ধান্তের বয়ান হতে ১৬৭৯ নং পি ডি আদেশ শিক্ষকদের যে পুলিশী কাজ করবার নির্দ্দেশ দিচ্ছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। তখনকার দিনে শিক্ষকদিগের এ মনোভাব যে কত বড় সাহসের পরিচয়, সে বিষয় আজ হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে না।

ময়মনসিংহের এক স্কুলের ওপর ছাত্রদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের সরকারী আদেশ জারি করা হয়। সেক্রেটারী অনাথবন্ধু গুহ ১৭-ই নভেম্বর (১৯০৫) লিখিতভাবে জানালেন যে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দেবার স্বাধীনতা প্রত্যেক ছাত্রেরই আছে। তাতে বাধা দেওয়ার কোনো কারণ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি।

রংপুরে লাট বাহাদুর আসবেন খবর হলো আর সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারী আর রাজভক্তমহলে সোরগোল পড়ে গেল—রাজপ্রতিনিধিকে মানপত্র দানে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। মিউনিসিপ্যালিটি হ'লো এ কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র। আবহাওয়া আলোচনা করে বোঝা গেল, ব্যাপারটা খুব সহজ হবে না।

রংপুরের থেকে ১৬ই নভেম্বর ১৯০৫ কলকাতায় খবর আসে যে তথাকার জেলা-শাসক এমার্শন (Emerson) ক্ষেপে গেছেন কারণ মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ছোট লাটকে যে মানপত্র দেবার কথা হচ্ছিল তাতে কোনো কোনো লোক আপত্তি করেছে। তাঁরা ত বটেই, যাঁরা তাঁদের সহকর্ম্মী ও "স্বদেশী" ভাবধারার সমর্থক নানা বয়সের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত এই রকম পঁচিশজনকে স্পেশ্যাল কনষ্টেবল্ করে দেওয়া হয়েছে।

এঁদের কার্য্যতালিকার মধ্যে কোমরে পুলিশ বেল্ট (belt) এঁটে খাটোলাঠি হাতে নিয়ে দীর্ঘ প্যারেড করা, পুলিশ-কর্ত্তাদের হুকুমে যেখানে সেখানে হাজিরা দেওয়া, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা, পুলিশের অনভিপ্রেত কাজ রোধ করা (তার মধ্যে বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী পক্ষে বলা) হ'লো তাঁদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এমার্শন এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, তাঁদের কার্য্যকলাপ সর্ব্বরকমেই অশোভন ("their

conduct was unseemly") এঁদের মধ্যে কারো কারো বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় (সম্ভবতঃ 'স্বদেশ') তাঁর কানের পীড়া উৎপাদন করেছে। যাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মানপত্র প্রদানের বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন তাঁদের "অপরাধ" বুঝতে কষ্ট হয় না। রাজদ্রোহ বলে আদালতে টেনে নিয়ে গেলেও চলে যেত।

প্রবীণ ও প্রখ্যাত উকিল, রাজাভিষেকের তকমা (coronation certificate) ধারী মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান উমেশচন্দ্র গুপ্ত, কমিশনার ও উকিল রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় এবং সতীশচন্দ্র রায়, ভাইসচেয়ারম্যান ও উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সম্পত্তির ম্যানেজার, ধর্ম্মশালার সভাপতি ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার বরদা প্রসাদ বাগচি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনার রাধারমন মজুমদার, উকিল মাহোমেডান এ্যাসোসিয়েশনের (Mohomedan Association) যুগ্ম সম্পাদক মৌলভী আসফ্ খাঁ মিলে সকলেই মানপত্র প্রদানের বিরোধিতা করেছিলেন।

এঁদের সঙ্গে "দণ্ড" ভোগে বাধ্য হন, ব্যারিষ্টার ও রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্ম্মাধ্যক্ষ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, উকিল ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, "রংপুর বার্ত্তাবহ" -সম্পাদক জয়চন্দ্র সরকার, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন, উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, "দেশী দোকান" পরিচালক ও উকিল উমাকান্ত দাস, মোক্তার বার এ্যাসোশিয়েসন (Muktear Bar Association)-এর সভাপতি হরিশচন্দ্র রায়, লোন অফিসের সেক্রেটারী ও লোন অফিসের কোষাধ্যক্ষ রাজীবলোচন সোম, ইঞ্জিনীয়ার অফিসের ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান হরিনাথ অধিকারী, উকিল কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়, ব্যবসায়ী শরৎচন্দ্র মজুমদার ও বেশরাজ চোপরা, তাজহাট স্কুলের প্রধান শিক্ষক গোপালচন্দ্র ঘোষ, জমিদার মন্মথনাথ দাস, রাজা আশুতোষ নাথ এষ্টেটের ম্যানেজার, মাহিগঞ্জের 'স্বদেশী ভাণ্ডার"-এর সেক্রেটারী সতীশচন্দ্র শিরোমণি এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোককে একই শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

এঁদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশের কোমরবন্ধ (belt) ও খাটোলাঠি (baton) ব্যবহার করতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করায় ১৬-ই নভেম্বর তাঁদের বিরুদ্ধে হাকিম সাহেবের আদেশ অমান্য করার জন্য নালিশ রুজু করা হয়। যাঁরা "পাহারাওয়ালা" নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা ২০শে নভেম্বর (১৯০৫) সেই আদেশের কবল হতে মুক্তি পান। যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলছিল তাঁরা হুকুমটা হাকিমের এক্তিয়ার বহির্ভূত মনে করে হাইকোর্টের মতামতের জন্য আবেদন করেন। ২-রা ফেব্রুয়ারী (১৯০৬) হাইকোর্ট আবেদন-কারীদের আপত্তিতে পূর্ণ সমর্থন জানান। যাঁদের কপাল নিতান্ত মন্দ তাঁরা পুলিশ বেশে পথে পথে চৌকিদারী করে বেরিয়েছেন এমার্শনের বে-আইনী আদেশ বলে।

রাজসাহী শহরে একটি জনসাধারণের সভা আয়োজন চেষ্টায় রাজসাহীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল ও জমিদার কিশোরী মোহন চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ১৮-ই ডিসেম্বর (১৯০৫) জেলা পুলিশসুপারের বাংলোয় দেখা করতে যান। দুচার কথার পর পুলিশ সাহেব চটে উঠলেন "চোপ্ রও" ইংরেজি "Hold your tongue" যদি কোনো সভা অনুষ্ঠিত হয় গুর্খারা সে সভা ছত্রভঙ্গ করবে।" বলা বাহুল্য সে সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে নি।

প্রকাশ্য স্থানে "স্বদেশী" সভা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ৯ই ডিসেম্বর (১৯০৫) রাজসাহীতে একটু বড় রকমের ঘরোয়া বৈঠক চলছে। পুলিশ সন্ধান পেয়ে সেখানে উপস্থিত। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিয়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে পুলিশ সেখান হতে প্রস্থান করে।

যথেচ্ছভাবে নিদারুণ প্রহার করা তখনকার পুলিশের কাজ হয়েছিল পূর্ব্ববঙ্গের সমস্ত জেলাতেই। সাধারণ লোক বা সম্মানিত ব্যক্তি, কিশোর যুবকরা প্রাপ্তবয়স্ক এমন কি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত এ নির্য্যাতনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। গুর্খা আর আর আসাম থেকে আমদানি করা সশস্ত্র পুলিশ দিয়ে সায়েস্তা করার চেষ্টা হয়েছে।

চাঁদপুরে সজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও চিকিৎসক (এল এম্ এস্) ডাঃ শশধর নিয়োগী, বেলকুঠির বসন্ত বণিক প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত লোক আসাম পুলিশের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। বরিশালে পিকেটিং করার অপরাধে কুলচন্দ্র দে এবং সাব্ ইন্সপেক্টরকে গালি দেওয়ায় আদালতে অভিযুক্ত হয়েছে।

বরিশালের শ্যামাচরণ দত্ত জানুয়ারী ১৯০৬-তে গুর্খা কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হবার পর তাদের বিরুদ্ধে এক নালিশ করেন। মামলার ব্যাপার মাথায় উঠে গেল, নালিশ করার এক সপ্তাহ মধ্যে সদর রাস্তায় গুর্খারা শ্যামাচরণকে বেদম প্রহার করে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রেখে চলে যায়। ঐসব ব্যাপারে কোনো প্রতিকার ছিল না।

১৯০৫ নভেম্বর নাগাদ বরিশাল বানরীপাড়া অঞ্চল দেখে মনে হ'লো এলাকাটি যেন শত্রুসৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে আছে। কতগুলি ছেলে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। উপরন্তু স্থানীয় লোকের উপর চার শত টাকা পাইকারী জরিমানা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট কাছারির সামনে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিকারী ছেলেদের বেত মারবার জন্যে "তে-কাঠা" "(whipping triangle)" খাটিয়ে দেওয়া হয়। নির্ম্মমতা ও ভয়প্রদর্শনতা কত দূর যেতে পারে এটা তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

রংপুর ও বরিশালের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ণমাত্রায় তাঁদের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বে-আইনী ভাবেও তাঁরা ভীতিপ্রদর্শন, শাস্তিদান নিজেদের ইচ্ছামত করে যাচ্ছিলেন। বরিশালের জেলা-হাকিম জ্যাক্ (Jack) স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে যোগ আছে এই সন্দেহে (১৯০৫) নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তলব করলেন উকীল রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীচরণ সেন, মোক্তার ও (মিউনিসিপ্যাল কমিশনার) কৈলাসচন্দ্র সেন, ব্রাহ্ম নেতা মনোমোহন চক্রবর্ত্তী আর "বিকাশ" সম্পাদক দীননাথ গুহকে।

সকলে হাজির হলেন। সাহেব একজনকে বললেন যে, তাঁর অপরাধ তিনি উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দিয়ে থাকেন। তাঁর নাম ধাম গুর্খাদের কাছে দেওয়া হয়ে গেছে। অতএব অন্ততঃ পক্ষকালের জন্য যেন তিনি সহর পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। কারণ, গুর্খারা তাদের খুশিমত হামলা করতে পারে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার গুর্খাদের সেই আচরণ উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে সকলেরই বিরক্তিকর লাগবে এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তার জন্যে দায়ী হবেন না, বা তা বন্ধ করতে চেষ্টা করবেন না। অন্য সকলকেও অনুরূপ সুপরামর্শ দান করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন, প্রায় সওয়া শ' গুর্খা বরিশাল সহরে তখন এসে উপস্থিত হয়েছে। দশ-বারজন করে এক একদলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। "বন্দে মাতরম্" বা অন্য কোনো আপত্তিকর লেখা কাগজ যেখানে সেখানে ছিঁড়ে ফেলছে।

ক্রমশঃ বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে সরকার বাহাদুর হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করে। কোনো মিছিল চলবে না, এই হলো সাধারণ নিষেধাজ্ঞা। বিবাহের বর বরযাত্রী দল বেঁধে যায়, অতএব এটা "প্রোসেশন্" বা মিছিল। ঢাকায় একটি সম্পন্ন ঘরে বিবাহ। একদলে কতক লোক যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। অনুমতি চাইতে গেলে, পুলিশ-সুপার এক ছাড়পত্র দিলেন ১১ই ডিসেম্বর ১৯০৫ বিবাহের দল যেতে পারে বটে তবে পরিষ্কার ক'রে বলে দেওয়া হলো ঐ মিছিল চলবার সময় "স্বদেশী" সংক্রান্ত কোনো কথা বা কাজ করা চলবে না ("No acts or words having connection with the Swadeshi agitation will be employed while the procession is in progress.")

ময়মনসিংহের জেলা-হাকিম ক্লার্ক (L-O-Clark) প্রায় ক্ষিপ্ত। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্যামাচরণ রায়ের কাছে ১লা ডিসেম্বর (১৯০৫) কৈফিয়ৎ তলব করা হ'লো লালবাজার রোড থেকে কেন তিনি কতকগুলি

দোকান সরিয়ে নেবার আদেশ জারী করেছেন। জেলা-হাকিমের উৎসাহ দেখে মনে করা যেতে পারে যে দোকানগুলি বিলাতী কাপড়, নুন, চিনি বিক্রয়ের জন্য পুলিশ খাড়া করেছিল। শ্যামাচরণ তেড়ে উত্তর দিলেন যে, সদর সড়কের উপর নতুন দোকান স্থাপিত হওয়ায় মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতাপ্রয়োগে সেগুলি অপসারিত করা হয়েছে। তাঁর এ ক্ষমতা আছে এবং কমিশনাররা এ কাজ সমর্থন করেছে। বক্তব্য বোধ হয় ছিল এই জেলা-শাসকের আরও অনেক কাজ আছে, এ ব্যাপারে তাঁর মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই।

ঐ ক্লার্ক সাহেবই ১লা ডিসেম্বর অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট তারানাথ বলকে জানাতে চাইলেন যে ২৪শে নভেম্বর ময়মনসিংহে বরিশাল, মাদারিপুর ও রংপুরে সরকার-বিদ্বেষী কাজে সমর্থন জানিয়ে যে সভা হয় তাতে তারানাথ বক্তৃতা করেছেন কি না। উত্তর দিতে হবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। উত্তর না পাওয়ায় অস্থায়ীভাবে তারানাথের হাকিমী ক্ষমতা অপহরণ করা হয়েছে। ৪ঠা ডিসেম্বর তারানাথ দৃপ্ত ভাষায় জানালেন যে ওটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার ক্ষমতা জেলা-হাকিমের নেই।

স্মৃতিচারণ ঃ আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ভাগবতদাস বরাট

সহরের উপকণ্ঠ। বাঁকুড়া শহর হতে প্রায় এক মাইল দূরে নূতন চটি পল্লী। আমার জন্মভূমি, যোগেশচন্দ্রের বার্দ্ধক্যের শান্তি নীড়। কয়েক ঘর মুচি, বাউরি, কোটার আর গেনে নিয়ে গ্রামের গ্রামিকত্ব তা ছাড়া কয়েকঘর কুলু, ময়রা ও বামুনেরও বসবাস।

গ্রামের পূর্ব্ব সীমান্তে কয়েকটি বিদেশাগতদের পাকা বাড়ী। কলেজের প্রফেসার, উকিল স্কুল মাষ্টার প্রভৃতির আবস্থান। এই সবার মাঝে গুরু ট্রেনিং স্কুলের সন্নিকটে আচার্য যোগেশচন্দ্রের বাসভবন "স্বস্তিক"। বিদ্যানিধি সেখানে বাস করতেন।

যে সময়ের কথা বলছি, নূতন চটির রূপ ঠিক এইরূপই ছিল। কিন্তু এখন তার রূপ পাল্টেছে, এবং সেইসঙ্গে অনেক অদল বদল। পূর্ব্ববঙ্গের জনস্রোতের একটা ঢেউ ছিটকে এসে পল্লীর আসেপাশে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যাক্ সে কথা। এখন যা বলতে চাইছি তাই বলি।

ইংরাজী ১৯২০ খৃষ্টাব্দে যোগেশচন্দ্র তাঁর কর্ম্মজীবনের সমাপ্তিতে নূতনচটির পূর্ব্বপ্রান্তে স্বস্তিকভবন নির্ম্মাণ করে বসবাস সুরু করেন। তখন আমার জন্ম হয় নি।

জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই যোগেশচন্দ্রকে দেখেছি! তবে তখন তাঁর প্রসিদ্ধির কথা জানতাম না। এমনি পথেঘাটে দেখা আর পাঁচজন লোকের মত তাঁকে চিনতাম। আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যে পাকা অহল্যাবাঈ রোড সোজা পশ্চিমমুখো চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে তিনি সকালসন্ধ্যা আনাগোনা করতেন। পিছনে থাকতো একজন নেপালি যুবক।

বাড়ীর সামনে রাজপথের অপরপ্রান্তে পাঠশালা। সেখানেই আমার হাতে খড়ি। আমার অ আ ক খ শেখা সেখানেই হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে মাতৃভাষার সঙ্গে একটু পরিচয় হলে আমাকে পড়তে হয়েছে বাঁকুড়ার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত।" এই বই-এ যোগেশচন্দ্রের নাম দেখি। পরীক্ষার সময় কিছু না বুঝেও মুখস্থ করেছি,—বাঁকুড়ার প্রখ্যাত মনীষীদের মধ্যে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তখনও জীবিত। কিন্তু সেই সময় এই দু'জন স্মরণীয় প্রাজ্ঞজনের প্রখ্যাতি সম্বন্ধে কারো কাছে কোন প্রশ্ন করিনি এবং বিশেষ কিছু জানবার আগ্রহও জাগেনি। পরে যখন আমার জ্ঞান হল তখন জানলাম যোগেশচন্দ্র জ্ঞানী পণ্ডিত। অতলান্ত জ্ঞানরাশির তিনি অগাধ পাথার। শৈশবে ভাবতাম, হয়ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতই তাঁর অসীম পাণ্ডিত্য। এরপর আমার বয়স যখন দশ বৎসর তখন বিদ্যানিধি মশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেল। শুধু পরিচয় নয়, তিনি হলেন আমার শৈশব সাথী। তাঁর সংসর্গে আসতে কোন চেষ্টা যত্নের প্রয়োজন হয় নি, এমনি আপনা আপনি আমার তৎকালীন প্রাত্যহিক জীবনে তিনি এসে গেলেন। যেমন পথ চলতে গিয়ে ধুলো উড়তে দেখে, সেই ধুলোকে এড়াতে গিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে পালাতে গেলেও ধুলো উড়ে এসে গায়ে লাগে; তেমনি যোগেশচন্দ্রকে এড়াতে গিয়েও এড়াতে পারিনি।

সেই সময়ে যোগেশচন্দ্রের একমাত্র কাজ ছিল, ছেলে ধরা। সকাল সন্ধ্যা তিনি শুধু ছেলে ধরে বেড়াতেন। যাকে হাতের নাগালে পেতেন, তাকে নানা প্রশ্নে ঘায়েল করতেন। সেইজন্যে আমরা সকলে তাঁকে এড়িয়ে চলতাম।

শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত আনন। চোখে বেশী পাওয়ারের চশমা। বাঁহাতে একখানা কালো ছড়ি। আর ডানহাতে একখানা খোলা সাদা ছাতা। বুক পকেটের নীচে চোরা পকেটে লুকানো থাকতো একখানা ছোট টাইমপিস ঘড়ি। মৎস্য-শিকারী যেমন ছিপ ফেলে পুকুরঘাটে মাছ পাবার

উদ্‌গ্রীবতার বসে থাকে, যোগেশচন্দ্রও সেইরূপ লাঠি হাতে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতেন ছেলেদের প্রতীক্ষায়।

বেলা দশটা। ছেলেরদল স্কুলে যেতে সুরু করেছে। একটু দূর থেকে দেখা গেল সাদা ছাতা মাথায় দিয়ে বিদ্যানিধি-মশায় একটির পর একটি ছেলেকে আটক করছেন। নানা-রকম প্রশ্নে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছেন। কারো কারো বা পড়ার বইটা হাতে নিয়ে বই খুলে প্রশ্ন করছেন। আর ছেলেটি তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে ধরা পড়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপছে। যে একবার তাঁর নাগালে ধরা পড়বে সে আর ভুলেও কোনদিন তাঁর আওতায় আসবে না। আমি দূর থেকে এই সবই দেখতাম, কৌতুক বোধ করতাম আর কাছে না এসে দূর থেকেই পাড়ি দিতাম।...কি জানি বাবা, আমাকে যদি ধরেন।

তিন চার মাইল দূর থেকে একবার এক একটি ছেলে ইস্কুলে আসছে। পাড়াগাঁয়ে ঘর। স্কুলের অভাবে তাকে এতটা পথ হাঁটাহাঁটি করে পড়াশুনা করতে হয়। শ্বেত-বস্ত্রে বিভূষিত জ্ঞান-তাপস যোগেশচন্দ্র একদিন ছেলেটিকে আটকে করলেন। প্রথমে তাকে প্রশ্ন করা হল,—"তোমার বাড়ী কোথায়? কদ্দূর পথ হেঁটে আসছ?" প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি জানায়—"তিন মাইল।" বিদ্যানিধি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। ঘাড় নেড়ে চোখ তুলে বলেন,"—তি—ন মাইল! কিন্তু আমি তো পারব না।" যেন তিনি না পারলেও তাঁকে অতটা পথ হাঁটতে হবে। বুঝলাম যার পিপাসা পায় নি, তার পক্ষে জলপান করা কষ্টকর। কিন্তু যোগেশচন্দ্র তা ভাবেন নি, স্বীয় বার্দ্ধক্যে তিনি থুঁথবু বলেই তিন মাইল পথ হাঁটা অসম্ভব মনে হয়েছিল।

যদি কোন ছেলে বলত,—আজ দেরি হয়ে গেছে, ছেড়ে দিন স্কুলে পৌঁছতে আরো দেরি হয়ে যাবে। রায়-মশায় তখন তাঁর টাইমপিস্ ঘড়িটি তুলে দেখতেন ছেলেটির কথা সত্য না মিথ্যা। ঘড়ি দেখতে দেখতে আড় চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,—"ক'টার স্কুল বসে?" ছেলেটি বলে,—"সাড়ে দশটায়।" বিদ্যানিধি বললেন,—"ও এখনো তো দশ মিনিট দেরি আছে। আচ্ছা, এখন বলতো তোমাদের গ্রামের নাম নানাবাধ কেন হল? এ সম্বন্ধে যদি কিছু জানতো বলে যাও।" ছেলেটি কি উত্তর দিবে ভেবে পায় না। অসীম পাথারে কূলহারা নাবিকের মত অসহায় বোধ করে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিদ্যানিধি বললেন,—"ছিঃ ছিঃ এ ভীষণ লজ্জার কথা। তুমি যে গ্রামে বাস কর সেই গ্রামের নামকরণের ইতিহাস জান না, অথচ প্রতিদিনই শিক্ষালাভের আশায় ছুটে আসছ এতটা রাস্তা। শিক্ষা তোমার মোটেই হচ্ছে না।" ছেলেটিও নিশ্চুপ। হয়ত সে এইক্ষণে জানতে পারল বইএর বাইরেও শিক্ষণীয় বিষয় আছে। জ্ঞানরাশির পরিধি তার চোখের সামনে না ভেসে উঠলেও সে মনে মনে ভাবে এতদিন সে কিছুই শেখে নি।

কোন ছেলে যদি বিদ্যানিধির কবলে পড়ে দেরিতে স্কুলে পৌঁছত তা হলে সে তার ক্লাস-মাষ্টারকে সে কথা জানালে তার লেট-ফাইনও মকুব হত।

এরপর আমিও একদিন বিদ্যানিধি মশায়ের কবলে পড়ে গেলাম। বাঁকুড়া জিলা স্কুলের আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। অপরিপক্ক জ্ঞান ও বুদ্ধির আমি তখন অধিকারী। চোখের সামনে যা ঘটছে তাকেই বিশ্বাস করতাম, কেন যে ঘটছে তার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়াসী ছিলাম না। সমুদ্রের নীচে প্রবালের স্তর জমে যেমন তা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে প্রশস্ত প্রবাল দ্বীপের সৃষ্টি করে, আমার মনে সেইরূপ জ্ঞান বুদ্ধির স্তর জমছে কিনা তার হিসাবনিকাশও করিনি তখন। পাহাড়ের আড়ালে তখন চলাফেরা করতাম। আজ কিন্তু সেদিন অস্তমিত।

ইংরাজী ১৯৩৪ সালের ঘটনা। স্কুলে যাবার সময় নয়। বিকালে খেলাধূলা করতে যাচ্ছি। এমন সময় বিদ্যানিধি পাকড়াও করলেন,—"ওহে খোকা শোন।" বিদ্যানিধি আমায় ডাকলেন। তাঁর ডাক শুনেই গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কাছে গেলাম। অতি সন্নিকটে। তিনি প্রশ্ন করলেন,—"তোমার নাম কি?" আমার নাম শুনেই আবার প্রশ্ন,—"তোমার নামের অর্থ কি?" বলেছিলাম,—"জানি না।" বেশ মনে আছে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছিলেন,—"সে কি, নিজের নামের মানে জান না? তা হলে তুমি যে ইস্কুলে পড়

সেই স্কুলের ইতিহাস জান না নাকি। স্কুল কখন স্থাপিত হল, কে বা কারা স্থাপনা করলেন, তখন কে হেডমাষ্টার ছিলেন,—এ সব জানতে তোমার মনে কোনরূপ আগ্রহ জাগে না? যখন যা কিছু দেখবে কি শুনবে, যা যা কিছু জানবে তখন সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি সব কিছুই তো জানা দরকার।"

সেই সময় তাঁর এই নীতিবাণী আমার কাছে কুইনাইন গেলার সামিল হয়েছিল, কিন্তু আরো পরে বুঝেছি যে ঐরূপ অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তিনি বড় হতে পেরেছিলেন। তাই তিনি মনীষী।

তাঁর মুখেই শুনেছি, তিনি যখন কটকের কলেজের প্রফেসার, তখন গান্ধীজির বিদেশী জিনিষের বর্জ্জন রীতির ঢেউ উঠেনি। গান্ধীজির অসহযোগ-আন্দোলনের পূর্ব্বে যোগেশচন্দ্র চরকায় সূতা কাটার কথা চিন্তা করেছিলেন। এবং সেই সময় তিনি চরকায় সূতা কাটারও ব্যবস্থা করেছিলেন কটকে। শুধু তাই নয়। সেকালে তিনি স্বদেশী জিনিষপত্র বিক্রয়ের একটি দোকানও খুলেছিলেন। চরকা তৈরীর জন্য তিনি একজন লোককে মাইনা দিয়ে নিযুক্তও করেছিলেন। কিন্তু সেই লোকটি কিছুদিন কাজ করার পর যখন বেশী টাকার দাবী করে তখন যোগেশচন্দ্র তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে নিজেই চরকা তৈরী করতে আরম্ভ করেন। এবং বিভিন্ন ধরণের নানাবিধ চরকা প্রস্তুত করেন। স্বীয় অধ্যবসায় ও স্বীয় অনিসন্ধিৎসু মনই তাঁকে সেই সময় জয়যুক্ত করেছিল। সেই সময় তিনি তৎকালীন প্রবাসীতে দেশীয় চরকা ও তার উন্নতিবিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখে-ছিলেন। আর সেই সময় কাপড় রঞ্জিত করার মানসে তিনি বিভিন্ন রঙেরও প্রবর্ত্তন করেন আপন অধ্যবসায় ও গবেষণায়। অজানাকে জানার আগ্রহ তাঁর মনে বলবতী ছিল বলেই তাঁর গবেষণাও সফলকাম হয়েছিল। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার আয়ত্তে জ্ঞান লাভ হয় না, অজানাকে জানার মানসে তৎপর হলেই মানুষ হবে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান সভ্যতার প্রধান উপাদান।

বেশ মনে আছে আমি সেদিন তাঁকে বলেছিলাম, "পরে জেনে নেব। এখন আমাকে ছেড়ে দিন, খেলতে যাব।" কিন্তু তিনি ছাড়লেন না। সঙ্গে করে বেড়াতে নিয়ে গেলেন। সেদিন আমার কাছ হতে আমার বাবার নাম থেকে আমার আগাগোড়া ইতিহাস জেনে নিলেন। তারপর থেকে তিনি প্রায়ই বিকালে আমার সঙ্গী হতেন। রাস্তার ধারে আমাদের বাড়ীটাও চিনে ফেলেছিলেন। সুতরাং রাস্তায় দেখা না পেলে বাড়ীতে এসে খোঁজ করতেন।

সে এক মহা জ্বালা। নীরস জ্ঞানের চর্চা ভাল লাগত না। শুধু কি তাই, সব সময়ে প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা। একদিন তিনি প্রশ্ন করলেন "তাহার কথাটা ঠিক না তাঁহার কথাটা ঠিক।" বলেছিলাম, আমরা তো তাঁহার বলি। উনি বলেছিলেন, "তাঁহার হবে না তাহার হবে। তেমনি তোমায় না হয়ে তুমার হবে। গরু না হয়ে হবে গোরু।" কেন যে হবে তারও যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব কথা বোঝার সামর্থ তখন হয় নি। এখন বুঝেছি, উলু বনে মুক্তা ছড়িয়ে ছিলেন তিনি সেই সময়।

সন্ধ্যামণি ফুল সন্ধ্যাকালে ফুটে বলে ঐফুলগুলোর নাম সন্ধ্যামণি। এতদঞ্চলে সকলেই ঐফুলকে সন্ধ্যামণি বলেই জানে। আর সকলের কাছে ঐ ফুলগুলো সন্ধ্যামণি নামে পরিচিত। কিন্তু উঁহার মতে ঐ ফুলের নাম টগর ফুল। অথচ টগর ফুল নামে যে ফুলগুলো সকলের পরিচিত তার সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। আকৃতি, প্রকৃতি ও আঘ্রাণে আকাশ পাতাল তফাৎ। বিদ্যানিধির সাহচর্য্যে এইরূপ নানা নূতন নূতন বিষয় জানতাম। সবই যেন নূতন মনে হত।

সেটা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের কথা। বাংলা হরপে আমার নামটা আমাদের ইস্কুলের ম্যাগাজিনে সেই প্রথম ছাপা হল। ছাপা অক্ষরে আমার নামের সেই প্রথম প্রকাশ। মনে তাই কেমন যেন এক নূতন ধরনের আনন্দ। বারবার পত্রিকা খুলে নিজের নামটাই দেখছি। দেখে যেমন তৃপ্তি তেমনি না দেখেও তৃপ্তি। সমস্ত দিনটাই যেন মনে হচ্ছে আনন্দে ভরা। যেন দিকবিজয় করে বাড়ী ফিরেছি। মনের এই অত্যুজ্জ্বল উচ্ছ্বাস বিদ্যানিধির কাছেও গোপন রইল না। তিনি আমার নামের প্রারম্ভে শ্রীমানের যোগ দেখে তখুনি

প্রশ্ন করলেন, "তোমার নামের পূর্ব্বে শ্রীমান লেখা কেন ?" বলেছিলাম, "আমি যে এখন ছোট আছি, তাই নামের পূর্ব্বে স্কুলের মাষ্টারমশায় শ্রীমান কথাটা জুড়ে দিয়েছেন হয়ত।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যোগেশচন্দ্র আমার মুখের দিকে ক্ষণিক তাকিয়ে রইলেন। হাতের লাঠিগাছটি তখন বগলে আবদ্ধ। আমিও বিস্মিত তাঁর বিস্ময়ের কারণ আজও বুঝি নি। কিছুক্ষণ এইভাবে স্থির থেকে জানালেন, "তা হলে তুমি যখন বড় হবে তখন কি নামের মুখের শ্রীমান কথাটা উঠিয়ে দেবে ?" বলেছিলাম, "তা কেন ? আমার নামের পূর্ব্বে তখন শ্রী বসবে।" আবার প্রশ্ন, "কে বললে নামের পূর্ব্বে শ্রী বা শ্রীমান লাগাতে হয় ?" উত্তরে জানিয়ে ছিলাম, "কে আবার বলবে, এতো জানা কথা যারা জীবিত তাদের নামের আগে শ্রী বা শ্রীমান লিখতে হয়। যারা ছোট ছেলে বা অপর কারো স্নেহাস্পদ তাদের নামের আগে শ্রীমান বসে।"

বিদ্যানিধি আমার কথাগুলি বেশ মন দিয়েই শুনলেন। কিছু বললেন না, একটু হাসলেন মাত্র। সে হাসির যে কি অর্থ তা আমি তখুনিই বুঝেছি। কিন্তু আজও বুঝি নি তাঁর মতে নামের আগে শ্রী বা শ্রীমান লেখার দোষ কতখানি প্রচ্ছন্ন হাসির নিগূঢ় অর্থ আজও আমার কাছে প্রচ্ছন্ন রয়ে গেছে। এখন মনে হচ্ছে বেগবতী স্রোতস্বিনীর পাশে ছোট খাটো একটা খানা ডোবার মতই আমি ওঁর সান্নিধ্যে ঘোরাফেরা করতাম।

যোগেশচন্দ্রের বাড়ী হতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে নূতন চটির সীমান্তে কাঠজুড়িয়ার ডাঙ্গা নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী। সেখানে তিনি একদা একটি বাগান করেছিলেন। সেটা খুব সম্ভব ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের কথা। একদিন সকালে বিদ্যানিধি বেড়াতে বেড়াতে তাঁর সেই বাগানে হাজির হলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম। বাগানে যেসব গাছ ছিল সেগুলো দেখিয়ে আমার কাছে সেই সব গাছের নাম জানতে চাইলেন। গাছগুলো অবশ্য আমার পরিচিত ছিল। সুতরাং যথাযথ নাম বললাম। কিন্তু তাঁর মতে আমার সব নাম বলা ঠিক হল না। কতকগুলো হলেও বাকীগুলো নয়। বিদ্যানিধির কাছে গাছ গাছালির নামও বিভিন্ন। সবই যেন উল্টো মনে হত। সেইদিনই তিনি আমায় জানিয়েছিলেন যে এই কাঠজুড়ি ডাঙ্গা অঞ্চলে আগে ছুতোর মিস্ত্রীর প্রাধান্য ছিল। তারা কাঠে কাঠে জোড়া লাগিয়ে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বহুবিধ আসবাবপত্র তৈরী করত। তাই এই অঞ্চলের নাম কাঠজুড়িয়ার ডাঙ্গা। তাঁর বাসভূমির নাম নূতনচটি কেন হল, এই কথা জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন, গাঁয়ের মধ্যে ঢুকতে গেলেই কতকগুলো মুচিঘর দেখতে পাচ্ছ। এদের পূর্ব্বপুরুষেরা চটি জুতো তৈরী করত। এবং প্রত্যহ নূতন নূতন চটি জুতোর যোগান দিত। সে যুগের মানুষের মধ্যে চটি জুতোরই প্রচলন ছিল বেশী। মুচিরা চটি জুতো তৈরী করত। ফলে দিন দিন নূতন নূতন চটি জুতো এখানে পাওয়া যেত বলে এই অঞ্চলের নাম নূতন চটি।

কিন্তু পরে আমার দিদিমা শ্রীমত্যা কামিনী নাগের মুখে শুনেছি যে নূতন চটিতে পুরাকালে চটি অর্থাৎ হাট বসত। সে যুগে যানবাহনের এত প্রচলন ছিল না। স্থান থেকে স্থানান্তরে গমনাগমন করতে হলে পায়ে হেঁটে কিম্বা উটের গাড়ীতে যাতায়াত করতে হত। সুতরাং প্রয়োজনীয় দ্রব্য সস্তায় আমদানী ও রপ্তানীর ব্যাপারে মানুষকে উটের গাড়ীর সাহায্য নিতে হত। সেকালে যেসব ব্যবসাদার মালমশলা আমদানী করত তাদের বলা হত বেপারী। এই সব ব্যবসায়ী বেপারীরা দলবদ্ধভাবে উটের গাড়ীতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় মালমশলা আমদানী করত এবং তারা বাঁকুড়ার বেপারী হাটে সমবেত হয়ে এই সব দ্রব্য সস্তায় বিক্রী করত। সেইজন্য এখন বাঁকুড়া সহরের উক্ত অঞ্চলের নাম বেপারী হাট। পরে তাদের স্থান বেপারী হাটে সঙ্কুলান না হওয়ায় নূতন চটি অঞ্চলে কেনাবেচার সুবিধার্থে আর একটা নূতন হাট অর্থাৎ চটি খুলে দেওয়া হয়। দিদিমা ৺কামিনী নাগ তাঁর শৈশবাবস্থায় নূতন চটিতে বেপারীদের হাট দেখেছিলেন।

বাঁকুড়া নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন,আমি এসম্বন্ধে বেশী চিন্তা করি নি। তবে জানি এখন যেখানে নূতন গঞ্জ, সেখানে পূর্ব্বে বাঁকুড়া মৌজা

(এরপর ৫৮৯ পাতায়)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন

প্রফুল্লকুমার দাস

[ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অবদান ইতিহাস-স্বীকৃত। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পূর্বে আত্মীয় সভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এবং আরও বহুতর সংস্থার মাধ্যমে ভারতের শিক্ষিত জনগণ রাজনৈতিক অবস্থা-উন্নয়নের জন্য ব্যাপৃত ছিল। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম আন্দোলন জনগণের সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াসই শুধু করিয়াছিল, তাহা নহে, পরন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্যও প্রচেষ্টা করিয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় জনগণের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের চেতনা সঞ্চার করেন। "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ সংখ্যায় মহর্ষির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। উহা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে দেওয়া হইল।]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা ও অধ্যাত্মবাদের কথা সর্বজনবিদিত। রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের কথা বিস্তারিত আলোচনা সর্বদা হয় না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময় (২৯ অক্টোবর ১৮৫১ থেকে ১৩ জানুয়ারী ১৮৫৪) মহর্ষির জীবনে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের কর্মমুখর এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সম্পাদকরূপে তাঁর কার্যাবলীর মধ্যেই মাতৃভাষার প্রতি তাঁর প্রবল অনুরাগ, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা, সর্বোপরি দারিদ্র্য-নিপীড়িত স্বদেশবাসীর প্রতি অন্তহীন ভালবাসা ও বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে। ভারতবাসীর দুঃখমোচনের জন্য এবং ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি ও নিপীড়ন-মূলক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি আপোষহীন সংগ্রাম করে গেছেন। সংসার-সমরাঙ্গণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে পলাতক বালকের মতো তিনি কেবল সারাদিন বাঁশী বাজিয়ে আত্মার জয় ঘোষণা করেন নি। বাস্তব জীবনের কর্মময় কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করে তিনি জীবনের রথকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন।

১৮৫১ সাল থেকে দেবেন্দ্রনাথকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটির পুনরুজ্জীবনের আশায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে National Association নামে এক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৮৫১র ৩১ ডিসেম্বর Friend of India জানাচ্ছেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কির্কপাট্রিক যথাক্রমে উক্ত এসোসিয়েসনের সম্পাদক ও সভাপতি হন। ন্যাশনাল এসোসিয়েসনের উদ্দেশ্যগুলি ১৮৫১র ২৬ ডিসেম্বর Bengal Harkaraতে প্রকাশিত হয়েছে। এই সংগঠন পরিপূর্ণ রাজনৈতিক রূপ নেয় British Indian Associationএ। ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি একত্র হয়ে ১৮৫১র ২৯ অক্টোবর ৩নং কাসিটোলা নামক স্থানে এক সভায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সূচনা হয়। মুখ্যতঃ দুটি বিশেষ কারণে এই সভা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

প্রথমত: কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপনের পর মফস্বলবাসী ইংরেজদের জেলা আদালতের আওতা থেকে মুক্ত করে' সুপ্রিম কোর্টের অধীনে আনা হয়। এর ফলে মফস্বলবাসী নীলকর সাহেবদের অত্যাচার চরমে ওঠে। এই অব্যবস্থা ও অত্যাচার দূর করবার জন্য ভারত সরকারের আইন-সচীব ড্রিঙ্ক্‌ওয়াটার বেথুন ১৮৪৯ সালে চারখানি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ঐ আইনগুলিকে Black Acts আখ্যা দিয়ে ইংরেজগণ এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। এদেশের পক্ষে রামগোপাল ঘোষ A few Remarks on Certain Draft Acts, commonly called Black Acts নামক পুস্তিকায় ঐ আইনগুলিকে সমর্থন জানান। অবশেষে ইংরেজদেরই জয় হয়। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে ব্যবস্থাপক সভা ঐ আইনগুলি বাতিল করেন। কিন্তু এই ঘটনায় শিক্ষিত দেশবাসী সংঘবদ্ধ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "একতা ও আন্দোলনের দ্বারা কি হয় তাহা তাঁহারা চক্ষের উপর দেখিলেন।......শিক্ষিত দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্য সম্মিলিত হইবার বাসনা প্রবল হইল। তাঁহারা বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক।"

দ্বিতীয়ত: ১৮৫৩ সালে কোম্পানীর নতুন করে সনদ লাভ করার সময়। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ ভাবে ভারতবাসীর পক্ষ থেকে অভাব অভিযোগ জানানর এই একমাত্র উপযুক্ত সময় ও সুযোগ। এই জন্যই তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এক সর্বভারতীয় সংগঠন উপযোগিতা উপলব্ধি করেন।

এই সভার নিয়মাবলী, লক্ষ্য ও আদর্শ, সভ্যনির্বাচন-পদ্ধতি এবং সভ্য ও দাতাগণের সুযোগ সুবিধা, অফিস, সভার অধিবেশন, সমিতি, উপ-সমিতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রস্তাবগুলি পূর্ণাকারে ১৮৫১র ১৯ নভেম্বর The Englishman পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই সভা তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করে' বলে :

"The great aim and object of this Association shall be to promote the improvement and efficiency of the British Indian Government by every legitimate means in its power, and thereby to advance the common interest of Great Britain and India, and ameliorate the condition of native inhabitants of the subject country.

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভার প্রতিষ্ঠাকালীন সময় অর্থাৎ ২৯ অক্টোবর ১৮৫১ থেকে ১৩ জানুয়ারী ১৮৫৪ পর্যন্ত অবৈতনিক সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সভা প্রতিষ্ঠার অল্প কয়েকদিন পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রাধাকান্ত দেবকে কয়েকটি পত্র লেখেন। তার তিনখানির উত্তর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় Calcutta Municipal Gazette, ১৯৪২, ১১ই জুলাই সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের ঐ তিনখানি পত্রেও এসোসিয়েসনের উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা জানতে পারি। ১৮৫১র ১১ ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একটি শাখা প্রতিষ্ঠার জন্য মাদ্রাজের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কাছে এক পত্র লেখেন। C. F. Andrews এবং Girija Mukherjee তাঁদের The Rise and Growth of the Congress পুস্তকে ঐ পত্রটি অংশত প্রকাশ করেছেন। সেই পত্র থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে দেবেন্দ্রনাথ এই এসোসিয়েশনের নিখিল ভারতীয় রূপ দেবার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়েছেন। অনতিকাল পরেই দেখা যায় মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামমোহনের অনুরাগী দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় অযোধ্যাতে ১৮৫২র ২৩ মার্চ এসোসিয়েশনের একটি শাখা স্থাপিত হন।

ভারতবাসীর দুঃখ মোচনের জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে দেবেন্দ্রনাথ স্বাক্ষরিত ১৫টি আবেদন পত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধের মধ্যে ঐ সমস্ত আবেদন পত্রের আলোচনা সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে মাত্র তিনটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। গভর্ণর জেনারেলকে প্রদত্ত প্রথম আবেদনে দেবেন্দ্রনাথ ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধমূলক

কার্যের প্রতিবিধানের সরকারী-খসড়া আইনের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, পুলিশী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও উন্নত করবার জন্ম সরকার করের মারফৎ যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেন, তার অল্পই ব্যয় করেন। সরকারী উদাসীনতার ফলেই দেশে পুলিশী ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং জন-জীবনে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিয়েছে। সরকার এই আবেদনটিতে সচেতন হয়েছিলেন এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে তৎপর হয়েছিলেন। Friend of India ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ সংখ্যায় জানাচ্ছেন :'······the Government has anticipated the advice of the Memorial, and resolved to take the most effectual steps towards the accomplishment of this object."

দ্বিতীয়টি বাংলার পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডব্লু ড্যামপিয়াবকে লিখিত একটি প্রতিবাদ পত্র। হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেট এক পরওয়ানার দ্বারা জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে যে কোন ব্যক্তিকে অস্ত্রবহন করার নির্দেশ দিলে, দেবেন্দ্রনাথ তার প্রতিবাদ করেন। চৌকিদারী প্রথা ও পুলিশী ব্যবস্থা যেখানে চালু রয়েছে, সেখানে অযাচিত বে-আইনি অস্ত্রবহনে নানা বিপদ ও বিঘ্নের সৃষ্টি হতে পারে, পত্রে তার উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে লিখিত তৃতীয় আবেদনটি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের ইতিহাসে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ। ভবিষ্যৎ ভারত-শাসন সম্পর্কে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। গভর্ণরের ব্যবস্থাপক সভা, শাসন ও বিচার বিভাগ আইন-সভা ও পুলিশী ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করা হয়েছে ঐ আবেদনপত্রে। এ ছাড়া, শাসনবিভাগের সর্বক্ষেত্রে ইউরোপীয়ের সম মর্যাদায় ও বেতনে ভারতীয় নিয়োগ, মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আবেদনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই আবেদনটির কথা উল্লেখ করে Friend of India ১৮৫২র ২৬ আগষ্ট সংখ্যায় লিখছেন : "The petition is highly creditable to the industry and patriotism of those who have got it up.... The measures which the petitioners propound would introduce a radical and organic change into the whole system of government."

দু'বছর দেড়মাস কাল সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৮৫৫র ১৩ জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথ পদত্যাগ করেন। এই গুরু দায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। তাঁর কার্যাবলীর দ্বারা ভারতবাসী সচেতন হয়েছে এবং আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়েছে। ৩১ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেস তাঁরই আদর্শ ও কার্যসূচী গ্রহণ করে ভারতের রাষ্ট্রিক সংগ্রামের বৃহত্তর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মার্কসীয় জড়বাদ ও ভারতীয় সংস্কৃতি

[মার্কসীয় দর্শন ও রাষ্ট্রিক আচরণবিধিকে অন্যান্য বহুবিধ দর্শন ও রাষ্ট্রবোধের অন্যতর বিকাশ মাত্র বলিয়া মনে করা ভুল। প্রচলিত যাবতীয় দর্শন সংস্কার ও সামাজিক প্রত্যয়ের প্রতিবাদ রূপেই মার্কসীয় চিন্তাধারাকে বিচার করা ভালো। দীর্ঘ দশ হাজার বছর ধরিয়া মানব-সভ্যতা যে মনন-ভিত্তির উপর গড়িয়া উঠিয়াছে, মার্কসীয় আদর্শ উহাকে নির্মূল করিয়া এক নূতন কাঠামোর পত্তন করিতে বদ্ধ পরিকর। শুধু রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতিতে নহে, শিক্ষা সমাজবোধ, আধ্যাত্মিক রীতি নীতি, এক কথায় জীবনধারণের সর্বক্ষেত্রেই মার্কসীয় চিন্তার দ্যোতনায় জনগণকে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাইবার উদ্দেশ্যে সকল দেশের মার্কসীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসীরা প্রয়াস করিতেছেন।

"প্রবর্তক" পত্রিকা মার্কসীয় চিন্তাকে ভারতীয় জনগণের কল্যাণের পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন ; ঐ পত্রিকার একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উহা বিবৃত হইয়াছে। শ্রীরবি কর নামক জনৈক মার্কসীয় চিন্তায় বিশ্বাসী পাঠক সম্পাদকের ঐ

ঐ মনোভাবের প্রতিবাদ করিয়া সম্পাদককে একটি চিঠি লেখেন। "প্রবর্ত্তক" পত্রিকার মাঘ ১৩৭৫ সংখ্যায় ঐ প্রতিবাদ এবং সম্পাদকের প্রত্যুত্তর ছাপা হইয়াছে। উহা সংক্ষিপ্তকারে পুনঃপ্রকাশিত হইল।]

প্রতিবাদ

বিগত কয়েকমাস যাবৎ আপনার সম্পাদকীয় রচনাগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ে আসছি। পুরনো বিশ্বাস, আদর্শ, ঐতিহ্য ইত্যাদি আজ সমাজজীবনে দ্রুত ভাঙ্গনের দিকে চলেছে, চতুর্দ্দিকে অরাজতা, শৃঙ্খলাহীনতা এবং নৈরাশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আপনার মতে—

"আত্মধর্ম্ম ভুলিয়া অন্ধপরানুকরণের বিষময় ফলই" ইহার কারণ।

'মার্কসীয় জড়বাদী নিরীশ্বর সমাজতন্ত্র—যাহা নিছক পশু জীবনেরই প্রবৃত্তি প্রেরণা"—তা কখনই এর প্রতিকারের পথ নয়।

"খাঁটি অমিশ্র ভারতীয় মত ও পথে পুনশ্চ প্রত্যাবর্ত্তনই ইহার একমাত্র পথ।"

আপনার এ বিশ্লেষণ কোন যুক্তিবাদী মনে সাড়া জাগাতে পারে না। কারণ আজকের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ণ প্রয়োজন, যা আপনার রচনায় একেবারেই অনুপস্থিত। তা ছাড়া "লক্ষ্যে—অর্থাৎ আত্মধর্ম্মে পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত 'এই পরম ব্রত' হইতে ভারতবর্ষ তথা 'প্রবর্ত্তক' বিরত হইবে না"—এ সংকল্প সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশ করা হইয়াছে! কিন্তু পথ কি?—যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা না Miracle? উপরন্ত কমিউনিজমের বিকৃত ব্যাখ্যা ও উগ্র জাতীয়তাবাদ আপনার লেখায় শোভেনিষ্টিক (Chouvenistic) পর্য্যায়ে পৌঁছেছে।

ভারতীয় মত ও পথ কি? এ বিষয়ে কোন Concrete theory আছে বলে আমার জানা নেই। তবে সাধারণভাবে যদি মানবিকতা বোধকেই ধরে নিই তা হলে, "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই"—এ শাশ্বত পথই ভারতের মর্ম্মকথা। এ কথা আপনার লেখায়ও স্বীকৃত হয়েছে। তবে কমিউনিজম-এর সঙ্গে এর বিরোধ কোথায়? নিপীড়িত জনগণের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাই হচ্ছে কমিউনিজম। অতএব কমিউনিজম ভারতীয় তথা কোন জাতীয় ভাবধারারই পরিপন্থী নয় বরং পরিপুরক। বিশ্বের প্রতিটি দেশে যেখানেই ধনতন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে মানবাত্মা পরিত্রাণের প্রয়াস পাবে সেখানেই কমিউনিজমের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। শাসকের রক্তচক্ষু, বন্দুকের গুলী অথবা আধ্যাত্মিক কলমের খোচায় এর উদ্ভব বিলম্বিত করা যেতে পারে—কিন্তু স্তব্ধ করা যাবে না।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে তারই পরিণতি আজকের বিশ্বব্যাপী সংকট। জীবনাচরণের আদর্শ ও মূল্যবোধ সামগ্রিক ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থই এই সমাজব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি এবং বিত্তবানেরাই এই অর্থের অধিকর্তা। এই বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থেই দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জগত ব্যবহৃত হচ্ছে। এই শ্রেণী শুধু রাজনৈতিক শাসনের মধ্য দিয়েই জনসাধারণকে শোষণ করতে চায় না, সাধারণের সামাজিক জগত ও সাংস্কৃতিক বিকাশকে অসুস্থ, পঙ্গু এবং বিকারের অন্ধ গলিতে স্তব্ধ করে দিতে চায়। দেশের জন-মানস, যুবচেতনা, সমস্ত আদর্শবোধ, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়বোধকে বিসর্জ্জন দিয়ে মেরুদণ্ডহীন ক্লীববিশেষে পরিণত হোক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলুক—এটাই চায় এই শোষক শ্রেণী। তা হলেই এদের শোষণ অব্যাহত থাকবে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা অটুট থাকবে ও শক্তিশালী হবে।

এই শোষকশ্রেণীর গোড়া ধরে উপড়ে না ফেললে যে এই শোষণ ব্যবস্থার অবসান হবে না—মার্কস ও এঙ্গেলস্ ইতিহাসের বস্তুবাদী বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে তাই দেখিয়ে দিয়েছেন। শ্রেণীবৈষম্যের ওপর গড়ে ওঠা এই সমাজব্যবস্থাকে ধ্বংস ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে এক

নতুন সমাজ ব্যবস্থা যেখানে থাকবে না শ্রেণী, থাকবে না সম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত অধিকার। কাজেই জীবনের মূল্যবোধগুলি—প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, সততা, শ্রদ্ধা, রুচি, সৌন্দর্য্যবোধ ইত্যাদি—যেগুলো এই সমাজব্যবস্থার অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ হারিয়ে ফেলছি সেগুলো ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে মুক্ত করতে হবে পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষণের হাত থেকে।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত: আজকাল কিছু তথা-কথিত প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞব্যক্তিরা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির নামে যুক্তিবিজ্ঞানবিরোধী Theory of belief-এর ওপর ভিত্তি করে অতি-প্রাকৃতবাদ, ঈশ্বরবাদ, গুরুবাদ ইত্যাদির মহিমা প্রচারে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। এমন কি এই সংকীর্ণ জাত্যাভিমান, গুরুবাদী চিন্তা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নাসিকতাকে বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে রচিত অবাস্তব দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে মিশিয়ে বুদ্ধিজীবিদের কাছেও গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করছেন।

এঁরাই নাকি ভারতীয় জাতীয় ভাবধারার ধারক ও বাহক। এঁরা শুধু হতভাগ্য ভারতবাসীকেই মুক্তির সন্ধান দেন না, ভাগ্যবান বিদেশীদিগকেও জ্ঞান বিতরণ করে ধন্য হন। সম্প্রতি মহাঋষি মহেশ যোগী পবিত্র হৃষীকেশে এক আন্তর্জ্জাতিক ধুরন্ধরদের সমাবেশ করেছেন—সেখানে হতভাগ্য ভারতবাসীর স্থান নেই। অতএব এঁরা কার স্বার্থে প্রগতিশীল বাস্তব বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারাকে নির্ম্মূল করতে প্রয়াস পাচ্ছেন—তা বলার অবকাশ রাখে না।

প্রত্যুত্তর

মার্কসবাদ সম্বন্ধে পত্রলেখকের যে একরোখা প্রশংসা ও সর্ব্ব সমস্যার সমাধানমূলক ধারণা তার হেতু হইতেছে তাঁর তথা মার্কসবাদী প্রায় সকলেরই ভারতের মর্ম্ম ও মিশন সম্বন্ধে অজ্ঞতা। বস্তুত: কার্ল মার্কস-এর মানব-দরদী স্বপ্ন ও প্রকল্প সত্ত্বেও ইহার কোন গভীর তত্ত্ব ও দার্শনিক ভিত্তি নাই—অত্যন্ত উপরিচর দেহসর্ব্বস্ব গুণধর্ম্মী অর্থনীতিক মতবাদের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। জীবন ও সমাজকে সমগ্রভাবেই দেখা হয় নি মার্কসবাদে।

মার্কসবাদে জগৎসৃষ্টির মূলে আত্মিক চৈতন্য অস্বীকৃত। অপর পক্ষে অধ্যাত্মচেতনার জাগরণের মধ্যেই মানব সভ্যতার পূর্ণাঙ্গ চরিতার্থ আনিতে চায় ভারতবর্ষ। শ্রীঅরবিন্দের কথায় "The work we have to do for humanity is a work which no other Nation can accomplish—the spiritualisation of the human race." মানবতাকে এই আত্মিক চেতনায় উত্তরণ করিয়া তোলাই ভারতবর্ষের মহৎ ব্রত। গভীর শ্রদ্ধাবুদ্ধি ও মর্ম্ম পরিচয় না থাকিলে ভারত-সভ্যতার এই অন্ত:শায়ী নিগূঢ় অভিসন্ধিটি ধরা পড়িবে না। পত্রলেখক শ্রীকরের বক্তব্য হইতে বেশ বুঝা যায়, তাঁর ভাব ও ভাবনা সবই নোঙরচ্যুত, পরপ্রভাবদুষ্ট। এই হেতুই শ্রীকর মন্তব্য করিতে ভরসা করিয়াছেন যে, যারা এই ভারতধর্ম্মী তাঁরা 'ভাববাদী'—'বস্তুবাদী' নহে। তাঁদের চিন্তা যুক্তি বিজ্ঞানবিরোধী—ইহাদের মত পথ 'theory of belief'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত—প্রগতিশীল বাস্তব বিজ্ঞানভিত্তিক নহে।

একজন প্রগতিশীল পাশ্চাত্য বিদ্বান মনীষীর (Max Muller) কথা: A people that can feel no pride in the past, in its history and literature, loses the main stay of its natural character.,'

এ কথা নি:সন্দেহে বলা চলে যে, আজকের ভারতীয় মার্কসবাদী যাঁরা তাঁদের জীবন, চিন্তা, ভাবাদর্শ জাতীয় জীবন, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য। সুপ্রাচীন ভারতবর্ষকে যাহা স্মরণাতীত কাল হইতে ধারণ করিয়া আছে সেই প্রধান অবলম্বন হইতে মার্কসবাদীরা ভ্রষ্ট। ভারতের এই প্রধান অবলম্বনটী হইতেছে রাজনীতি বা অর্থনীতি নহে, পরন্তু ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বলিতে বিশ্বকবি ঋষি রবীন্দ্রনাথের কথায় "যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে। সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু তাহাই ধর্ম্ম। ......সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে সমাজ মনুষ্যত্ব ও সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।"

সুতরাং এই ধর্ম্ম তথা সত্য ও সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট যে অনাত্মিক অধার্ম্মিক মার্কসবাদী সমাজতন্ত্র তাহা কোনদিন ভারতীয় চেতনায় শ্রদ্ধেয় ও স্বীকৃত হইবে, এ প্রত্যয় আমরা করি না এবং ভারতের মূল রসবাহী নাড়ির সঙ্গে যাদের যোগ আছে তারাও করিবে না।

আমরা জানি যারা মার্কসের অর্থনীতিক জীবনধারায় বিশ্বাসী, যারা প্রলিতারীয়—ভারতীয় ভাষায় শূদ্রের ডিক্টেটরশিপ বা রাষ্ট্রযন্ত্রে শ্রমিকশ্রেণীর প্রাধান্যকামী, তাঁদের মোহাচ্ছন্ন বোধে ভারতীয় ঋষি মনীষীর প্রজ্ঞালোকিত দিগ্‌দর্শন গ্রাহ্য হইবে না। মার্কসের মানবতামূলক সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে দরদী মনের পরিচয় মিলে তাহা সশ্রদ্ধায় স্বীকার করিয়াও, আমরা বলিব, মার্কসের মনুষ্যত্ব ধারণা জড়ভিত্তিক বলিয়াই খণ্ড পরিচ্ছিন্ন- সর্ব্বগ্রাসী নহে, শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীসর্ব্বস্ব। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে :"মনুষ্যত্ব জিনিষ একটা অখণ্ড সত্য, সেটা সকল মানুষকে লইয়াই বিরাজ করিতেছে।"

আত্মিক অনুভব ভিন্ন এমন অখণ্ড মানবতার ধারণা সম্ভব নহে। এই দৃশ্যমান বহু বিচিত্র জগৎ ব্যাপারের পশ্চাৎপটে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছিল এক অখণ্ড বিশ্বব্যাপী চৈতন্য যাহা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আধেয় হইয়া নিত্য বর্তমান—যাহা না ধরিয়া রাখিলে এই বিশ্ব সৃষ্টি থাকে না, অথচ জগৎ সংসার না থাকিলেও যাহা বিদ্যমান থাকে। এই যে ধৃতি-ধর্ম্ম ও সৃজন-প্রক্রিয়া যাহা অব্যক্ত হইতে ব্যক্তে, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে তথা দেবত্বে উত্তরণের শক্তি—যাহা এক ও বহু সব কিছুকে ধরিয়া রাখা এবং বাঁচা-বাড়ার শক্তি তাহাই ধর্ম্ম। তাইতো ভারতীয় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদভিত্তিক অধ্যাত্ম সমাজতান্ত্রিক স্বামী বিবেকানন্দের কথা : "মনুষ্য সমাজ থেকে ধর্ম্মকে সরিয়ে নিলে কি থাকবে? একপাল বন্যজন্তু ছাড়া আর কিছু নয়। ইন্দ্রিয়সুখ মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য নয়, জ্ঞানই জীবনের লক্ষ্য।"

এইজন্যই আমরা মার্কস-মার্কা ধর্ম্মহীন দেহাত্মবোধ-সর্ব্বস্ব সমাজতন্ত্রকে পশুধর্ম্মী বলিয়াছিলাম—যে সম্বন্ধে শ্রীকর তাঁর পত্রে আপত্তি তুলিয়াছেন। ভারতের পূর্ব্বগামী ঋষি মনীষী আলোকদিশারীর মানব-অভ্যুদয়ের প্রজ্ঞাবাণী গ্রাহ্য না করিয়া ভারতবাসী যারা মার্কস-এঙ্গেল্‌-লেনিন মাও-এর কথায় লম্ফঝম্প করেন তাঁদের বিপথগামী বলিয়াই আমরা মনে করি।

মুসলমানের একাধিক বিবাহ

সৈয়দ আনিসুল আলম

[সমগ্র ভারতে এক সমাজবিধি প্রচলিত করিবার জন্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির অব্যবহিত কাল পরে হইতেই আন্দোলন হইতে থাকে। অ-মুসলমান অন্যান্য সম্পাদকগুলির নেতারা মত দিয়াছিলেন, কিন্তু আপত্তি উঠিয়াছিল মুসলমানদের মধ্যে। 'ধর্ম্ম নিরপেক্ষ' ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ ভীত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিলেন। অ-মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এক স্ত্রী বর্তমানে পুনরায় দারপরিগ্রহে নিষেধ আরোপিত হইয়াছে; কিন্তু মুসলমানের বেলায় ঐ নিষেধ নাই। পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারেও দেখা যাইতেছে মুসলমান সমাজে এবং উহার নেতাদের মধ্যেও বিশেষ কোনও আগ্রহ নাই। ধর্মান্ধ অশিক্ষিত অনগ্রসর সম্প্রদায়, বিশেষতঃ যেখানে সেই সম্প্রদায় রাষ্ট্রের মধ্যে সংখ্যায় দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায়, সেখানে রাষ্ট্রের উন্নয়ন প্রয়াস ব্যর্থ হইতে বাধ্য; হইতেছেও তাই। তথাপি রাষ্ট্রনায়করা মুস্‌লিম ধর্মান্ধতার সংস্কার সাধনে অগ্রসর হইতেছেন না। কয়েকমাস আগেও স্বাস্থ্য দপ্তরের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ চন্দ্রশেখর লোকসভায় জানান (৮ এপ্রিল ১৯৬৮) যে, 'নানাপ্রকার জটিলতার জন্য সরকার সকল সম্প্রদায়ের জন্য একই রকম বিবাহবিধি বলবৎ করা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না।' তিনি আরও জানান যে 'সরকার মনে করেন বিবাহবিধি পরিবর্তনের ইচ্ছা মুসলমানদের নিকট হইতেই

আসা সরকার।' মুসলমান ধর্মবিধি শরিয়তে হস্তক্ষেপ করা হইবে, এবং উহার রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সামলাইবার মতো সাহস ও ক্ষমতা বর্তমান রাষ্ট্রশাসকদের নাই, এই জন্যই অদ্যাবধি কিছু করা হইতেছে না। জানিয়া শুনিয়াই রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের অহিত সাধিত হইতে দিতেছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই নিম্নোধৃত প্রবন্ধটি দৈনিক বসুমতী' পত্রিকার ১৭ জানুয়ারী ১৯৬৯ সংখ্যা হইতে সংকলিত করা হইল। লেখক মুসলমান, এবং মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে একাধিক বিবাহ আবশ্যিক বলিয়া নির্ধারিত হয় নাই, ইহা প্রনিধানযোগ্য।]

বর্তমান যুগে একজন পুরুষের পক্ষে একটি সংসার ভালভাবে পরিচালন করা প্রায় কঠিন হয়ে পড়েছে বলা যায়। সুতরাং একাধিক বিবাহ করে নতুন সংসার স্থাপন করা অসম্ভব। এখন আর পূর্বের মত চারবিবি রাখা মুসলিম সমাজে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তখনকার আরব দেশে প্রায়ই যুদ্ধে বহু পুরুষ নিহত হতো; সেজন্য তখনকার দিনে নারীদের সমস্যা সমাধান, সমাজের মধ্যে শৃংখলা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য বহু বিবাহের প্রয়োজনও ছিল। কোরআন শরীফের কোনও স্থানে—চার বিবাহ করা অথবা চারটি স্ত্রী রাখতে হবে এরূপ কোন নির্দেশ নাই; বরং স্ত্রী ভরণ-পোষণে অক্ষম হলে বিবাহ করতেই নিষেধ করা হয়েছে। আল্ কোয়আন, সুরা নূর, ৩৩ নম্বর আয়াত (শ্লোক) যথা—

"যাদের বিবাহের উপযুক্ত অবস্থা (ভরণ-পোষণ ইত্যাদি) না থাকে তবে তাদের মধ্যে যতদিন না সেরূপ সামর্থ্য আসে ততদিন তারা সংযত জীবনযাপন করুক...।"

হজরত মোহম্মদের যুগেও দাসপ্রথা বর্তমান ছিল। কোরআনে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীদের সম্বন্ধে আয়াত (শ্লোক) রয়েছে, কিন্তু বর্তমান সভ্যযুগে সেই প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে, তাই আজকের নানা সমস্যাময় যুগে ...দের মঙ্গলের জন্য ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ সাধনের মত যদি কোন সামাজিক ক্রিয়া-কাণ্ডের মধ্যে কিছু রদবদল করতে হয় তবে সেটা অধর্ম হতে পারে না তা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

সিরিয়া, লেবানন, মিশর প্রভৃতি স্বাধীন মুসলিম দেশে তাই এখন আইনের মাধ্যমে একাধিক বিবাহ করা পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাকিস্তানেও সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ।

মানবতার দিক থেকেও একটি সহধর্মিণী বর্তমান থাকতে অন্য আর একজনকে পত্নীরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত কি?

রমণী হৃদয় যেমন কোমল তেমনি ছন্দময়—রূপে, ছন্দে ও সুরের মাধুর্যে একখানি বীণার সাথে তুলনা করলেও চলে। প্রেম এমন কোন বিষয়বস্তু নয়, যা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা যায় অথবা জোরপূর্বক লাভ করা সম্ভব হয়। যে পুরুষের বিবাহিত একটি পত্নী বর্তমান, সেই অবস্থায় তিনি যদি অন্য নারী বিবাহ করেন তবে তাঁর পূর্ব পত্নীর অন্তরের প্রেমবীণার তার ছিন্ন হবে।

এক স্বামী এক স্ত্রী থাকলে তাদের প্রেম হয় সুগভীর, এক কেন্দ্রাভিমুখী। পৃথিবীর ইতিকথায় প্রেমিক-প্রেমিকার উপাখ্যানে পাই একটিমাত্র বিবাহ অথবা একটিমাত্র প্রেম।

আজকের প্রগতিশীল স্বাধীন নতুন যুগে নর-নারী নির্বিশেষে বহু বিবাহ সমাজ থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর হতে হবে। পূর্ব যুগে হিন্দু কুলীনদের মধ্যেও বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; কিন্তু সমাজ সংস্কারকগণ বহু লাঞ্ছনা সহ্য করে সমাজের সেই সব ক্ষতিকর বিষয়গুলি বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মতো আমাদের দেশেও উপযুক্ত আন্দোলনের মাধ্যমে এই বহু বিবাহ প্রথা নিরসন করতে হবে।

সমগ্র নারীজাতির মঙ্গল সাধন করতে হবে, কারণ ভারতীয় মুসলিম নারীগণ অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের মত স্বাধীনভাবে সকল সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ এবং তাঁদের স্বাধিকার লাভে বঞ্চিতা হবেন কেন?

কংগ্রেসের ভূমি-নীতি

ডাঃ কমলকুমার ঘোষ

['কৃষি বিপ্লব' শব্দটির ব্যাপক প্রচার হইতেছে। দেশের ৮৫ শতাংশের বেশি লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, অথচ দেশের অধিকাংশ জমির মালিকানাই অল্পসংখ্যক মালিকের কুক্ষিগত। চাষী ও ভূমিহীন ক্ষেত মজুরের মধ্যে অসন্তোষ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অত্যুগ্র কম্যুনিস্টরা চাষী মজুরের অসন্তোষকে সর্বাত্মক বিপ্লব-প্রয়াসে নিয়োজিত করিতে চায়। ১৯৬৮ সালে পাটনা অধিবেশনে দক্ষিণপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল যে তাহারা গভর্ণমেণ্টে প্রবেশ করিলে 'ভূমি রাজস্ব ও ব্যক্তিগত মালিকানায় জমির পরিমাণ হ্রাসকরণ, কৃষি-শ্রমিক এবং ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বাড়তি ও অনাবাদী জমি বিতরণ করা, ভাগচাষীদের নিরাপত্তা, খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় সমেত জাতীয় খাদ্যনীতি নির্ধারণ' বিষয়ক প্রোগ্রাম অনুসরণ করিবে। আবার, এইরূপ মতও কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে চাষের জোত বড় না হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ হইতে পারে না। ভূমিহীনকে জমি দেওয়া ও বর্গাদারকে উত্তরাধিকার দেওয়া মানেই জমিগুলিকে খণ্ডিত করা; তাহাতে ফসল উৎপাদন কমিবে। এই জন্য এই শেষোক্ত মতবাদীরা মনে করেন যে আমেরিকার মতো service co-operative হইলে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না, চাষের ফসলও অধিক ও উৎকৃষ্ট হইবে।

ভুবনেশ্বর অধিবেশনে কংগ্রেস পার্টি শ্রীডেবরকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করে। ভূমি-সংস্কার নিয়োজিত এই কমিটির রিপোর্টে লেখা হইয়াছে, 'আগামী দুই বৎসরের মধ্যে দেশে যাহাতে ভূমিসংস্কার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়, এবং কৃষির প্রসারের পক্ষে যে সমস্ত অন্তরায় আছে তাহা যাহাতে দূরীভূত হয় তাহা করিতে হইবে।'

স্বাধীনতার পর হইতেই কংগ্রেস পার্টি দেশের শাসন-কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত। ভূমি সংক্রান্ত প্রকৃত সংস্কার সাধন কংগ্রেস পার্টির পক্ষে সম্ভবপর কিনা, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে হয়; প্রকৃত সংস্কার সাধিত না হইলে কম্যুনিস্টদের ঘোষিত কৃষি বিপ্লবের প্রতিরোধ দুঃসাধ্য হইবে।

"যুগবাণী" পত্রিকার ২৫ জানুয়ারী ও ১ ফেব্রুয়ারীর দুই সংখ্যায় কংগ্রেসের ভূমিনীতির আলোচনা করা হইয়াছে। লেখক নিজে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; তিনি মনে করেন, ভূমি বিষয়ে প্রকৃত সংস্কার-সাধন কংগ্রেস করিবে না। প্রবন্ধটি সংকলিত হইল।]

১৯৩১ সালে করাচী অধিবেশনের আগে কংগ্রেসদল কখনও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। করাচীর পর ১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌ এবং ১৯৩৬ সালের ফৈজপুর অধিবেশনে ভূমি সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বাধ্য হয়েই এসকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তখন কংগ্রেসের মধ্যে ভূমি এবং কিষাণ সম্পর্কে দুটি বিপরীতমুখী মত দানা বেঁধে উঠেছে। একদল গান্ধীজীর নেতৃত্বে দেশের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম প্রসারে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর, অপরদল কংগ্রেস সোশালিষ্টদের নেতৃত্বে কিষাণদের জন্য যথাযথ দাবী আদায়ে অনড়।

আমরা জানি যে জমিদার এবং সাধারণ কিষাণ সকলেই কংগ্রেসদলের সদস্য হতে পারত এবং এখনও পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কংগ্রেসের নীতি নির্দ্ধারণের ব্যাপারে ধনী জমিদারের না সাধারণ কিষাণের মত অধিকতরভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা যখন বার্ষিক দশ হাজার টাকা কংগ্রেস তহবিলে দান করেন তখন কংগ্রেসে তাঁর প্রাধান্য থাকবে, না সাধারণ

সদস্য একজন বিরোধী কিষাণের সুযোগ সুবিধা আদায় করতে গিয়ে কংগ্রেস এইসব ধনী সদস্যের শত্রু করে তুলবে। প্রথম আমলের কংগ্রেস নেতারা ব্যাপারটা ভালভাবেই বুঝেছিলেন। অ-জমিদার রমেশ দত্ত যখন প্রজাদের খাজনার পরিমাণ স্থায়ীভাবে স্থিরীকরণের দাবী করলেন তখন অধিকাংশ কংগ্রেস সদস্য এই দাবীতে সাড়া দেননি। বরং দেখা যায় পিটার পল পিল্লাই, বৈকুণ্ঠ নাথ সেন, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা, এঁদের প্ররোচনায় কংগ্রেস জমিদারদের জন্য সুযোগ সুবিধা আদায়ে ব্যস্ত। প্রসঙ্গতঃ The Punjab Land Alienation Bill of 1900-এর উল্লেখ করা যায়। এই সময়ে চাষের জমি চাষীর হাত থেকে অ-চাষীর হাতে অতি দ্রুত চলে যাচ্ছিল। ১৮৯০ থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৩৩৮,০০০ একর জমি ঋণের দায়ে অকৃষকদের কাছে বিক্রীত হয়। সরকার এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার জন্য উপরোক্ত আইন পাশ করতে চান। এই সময়ে পাঞ্জাব কংগ্রেসের নেতারা ছিলেন বাণিয়া অথবা অকৃষক শ্রেণীভুক্ত। Land Alienation Bill পাশ হলে এই সকল কংগ্রেসী নেতাদের শ্রেণীস্বার্থ ক্ষুন্ন হবে বুঝতে পেরে তারা এর বিরোধিতা করেন। বাণিয়া-শ্রেণী জমি বন্ধক রেখে প্রচুর অর্থ কৃষকদের ঋণ দিয়েছে। এখন কৃষকশ্রেণীর বাইরের লোকদের কাছে জমি ক্রয়-বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হলে বাণিয়াশ্রেণীর সমূহ ক্ষতি হবে। ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেস এই বিলের বিরোধিতা করে প্রস্তাব পাশ করে। ভূমি এবং কিষাণ সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি মোটামোটিভাবে অপরিবর্তিত থেকে যায়। ১৯১৭ সালে গান্ধীজী চম্পারণে অহিংস আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের বিরোধীপক্ষ কিন্তু চম্পারণের জমিদার শ্রেণী নয়—বৃটীশ নীলকর। সর্দার প্যাটেলের ১৯২৮ সালের বরদলৈই আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে। গ্রামাঞ্চলে কৃষক শোষণের প্রথম এবং প্রধান নেতা জমিদার-তালুকদার শ্রেণী। এদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কখন আন্দোলন করেনি। ১৯২২ সালের খাজনা বন্ধ আন্দোলন আহ্বান করার পর চৌরিচৌরায় হত্যাকাণ্ড ঘটে। গান্ধীজী আশংকিত হয়ে আন্দোলন বন্ধ করে দেন। যুক্তি হিসাবে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে আন্দোলন সহিংসরূপ গ্রহণ করায় তিনি বাধ্য হয়ে এই আন্দোলন বন্ধ করেছেন। কংগ্রেস কৃষকদের এই কাজকে নীতিবিরুদ্ধ বলে মনে করে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কখন জমিদার তালুকদারদের শত্রুতে পরিণত করতে চায়নি। উত্তর প্রদেশের কৃষক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২১ সালের ১৮ই মে গান্ধীজী ইয়ং ইণ্ডিয়াতে লিখেছিলেন ঃ

"While we will not hesitate to advise the kisans when the movement comes to suspend payment of taxes to the Government, it is not contemplated that at any stage of non-cooperation we would seek to deprive the Zamindars of their rent. The kisans be confined to the impovement of the status of the betterment of the relation between the Zamindars and them."

গান্ধীজীর এই নীতির প্রতিধ্বনি তুলে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯২২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবের ৬নং ধারায় বলা হল "ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস কর্মী ও সংস্থাগুলিকে পরামর্শ দিচ্ছে যে তারা প্রজাদের জানিয়ে দেয় যে জমিদারদের খাজনা বন্ধ করা কংগ্রেসী প্রস্তাব এবং দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ।"

৭নং ধারায় বলা হল "ওয়ার্কিং কমিটি জমিদারদের আশ্বাস দিচ্ছে যে তাঁদের আইনানুগ অধিকার কোনপ্রকারে খর্ব করা কংগ্রেসী আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয় এবং কমিটি চায় যে প্রজাদের সত্যিকারের দুঃখদুর্দশা পারস্পরিক আলোচনা ও সালিশীর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।"

চৌরিচৌরা আন্দোলন বন্ধ করে দেবার কারণ খুঁজতে গিয়ে Brailsforth তাঁর Subject India বইয়ে মন্তব্য করেছেন যে জমিদারদের খাজনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যই গান্ধীজী এই আন্দোলন ত্যাগ করেন। তিনি আরও বলেছেন যে জমিদারদের আইনানুগ স্বার্থরক্ষা করার জন্য কংগ্রেস এবং গান্ধীজী উভয়েই জমিদারদের নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ছিলেন। অর্থাৎ খাজনা আদায় জমিদারদের আইনানুগ অধিকার, তা ক্ষুণ্ণ হলে কংগ্রেস বাধা দেবে।

পণ্ডিত নেহেরু এ ব্যাপারে গান্ধীজী থেকে খুব বেশী দূরে ছিলেন না। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস কমিটিতে নেহেরু একটি প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন। প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ: জনগণের আর্থিক দুর্গতি শুধুমাত্র বিদেশী শোষণের ফলে নয়; দেশের আর্থিক কাঠামো এবং সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসও এর জন্য দায়ী। জনগণের দুর্দশা দূর করতে হলে সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের আশু প্রয়োজন। নেহেরু নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন যে কংগ্রেস কমিটি যথাযথভাবে অনুধাবন না করেই এমত প্রস্তাব পাশ করেছিল। অর্থাৎ প্রজাস্বার্থ রক্ষা করতে নেহেরু কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরাগভাজন হতে চাননি।

কৃষকদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাবের পরিচয় ১৯৩৬ সালে আরও প্রকটভাবে প্রকাশ পায়। এই সময়ে প্রগতিশীল কংগ্রেস নেতারা কৃষকদের জন্য একটি আলাদা কিষাণ সংস্থা গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁদের অভিমত শ্রমিক সংস্থার ন্যায় কৃষকদেরও শ্রেণীসংস্থা থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাবে নির্দেশ দেওয়া হয় যে একটি সাব-কমিটি বিষয়টির যৌক্তিকতা বিচার করে তাঁদের মতামত ওয়ার্কিং কমিটিকে জানাবেন। সাব-কমিটি ১৯৩৬ সালের মে মাসে সকল প্রাদেশিক সাব কমিটির নিকট কতকগুলি প্রশ্নসম্বলিত একটি লিপি (Questionaire) পাঠান।

প্রাদেশিক উত্তরসমূহ আলোচনা করে সাব কমিটি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে কৃষকদের পৃথক শ্রেণীসংস্থার কোন প্রয়োজন নেই; কংগ্রেসই কৃষকদের সংস্থা। প্রকৃত ঘটনা এই সিদ্ধান্তের বিপরীত। কংগ্রেস কখনও কৃষকদের সংস্থা নয়। কৃষকদের আশা আকাঙ্খা কখনও কংগ্রেসের মাধ্যমে পূর্ণ হয়নি; কংগ্রেস আসলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কুক্ষিগত— তাদের স্বার্থ রক্ষা করাই এর প্রধান কাজ। লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তাঁর সভাপতির ভাষণে নেহেরু সত্য কথা ফাঁস করেছিলেন। তাঁর উক্তি—কংগ্রেসের আসল শক্তি যদিও দেশের কৃষককুল কিন্তু দলের নেতৃত্ব রয়েছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাতে। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। দোষত্রুটি সত্ত্বেও মধ্যবিত্তশ্রেণী কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিয়ে যাবে; অবশ্য কৃষকশ্রেণী তাদের প্রেরণা যোগাবে। পূর্বে কৃষকরা আপন শ্রেণী স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ ছিল না; এখন তারা এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সুতরাং সংস্কার না আনলে কংগ্রেস আর কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে পারবে না।

কংগ্রেস তখন ১৯৩৫ সালের ভারত আইন অনুসারে নির্বাচনে অংশ গ্রহণে প্রস্তুত। ইস্তাহারে ঘোষণা করা হল যে কংগ্রেস সদস্যগণ আইনসভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কার্যকরী করতে সচেষ্ট থাকবে:

১। খাজনা এবং ভূমিরাজস্ব প্রভূত পরিমাণে হ্রাস করা হবে;

২। জমির দখলী-সত্ব স্থায়ী করা হবে;

৩।. পূর্বনির্দিষ্ট নিম্নতম কৃষি আয়ের উপর প্রগতিশীল হারে কৃষি আয়কর বসান হবে; এবং

৪। ঋণ, বকেয়া কর ও খাজনা হতে গ্রামবাসীদের মুক্তি দিতে হবে।

কৃষকদের দীর্ঘস্থায়ী মঙ্গলসাধনের জন্য কোন সুষ্ঠু নীতি পরিষ্কারভাবে ইস্তাহারে ঘোষিত হয়নি। কংগ্রেসী ঘোষণায় বিশ্বাস করে দলে দলে লোক কংগ্রেস পক্ষে ভোট দেয়। প্রায় ২৮ মিলিয়ন নূতন ভোটার এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে এবং অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেসকে জয়যুক্ত করে।

ফৈজপুর অধিবেশনে ভূমিসংস্কারের নীতি ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই বিহার কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায়। নির্বাচনী সভা-সমিতিতে কৃষকদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে কংগ্রেস শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেই ভূমিসংস্কার এবং কৃষি সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ে আইন পাশ করা হবে। সুতরাং শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই কিষাণরা ভূমিসংস্কার আইন প্রণয়নের জন্য চাপ দিতে থাকে। বাধ্য হয়ে কংগ্রেসী সরকার ভূমিসংস্কার বিল আইনসভায় উপস্থিত করেন। কিন্তু বিহারে জমিদারশ্রেণীর প্রতাপ দোর্দণ্ড। কংগ্রেস এই সকল শক্তিশালী জমিদার শ্রেণীর বিরাগভাজন হতে চায় না। সুতরাং রাজেন্দ্রপ্রসাদ জমিদারদের সংগে চুক্তি করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—জমিদারগণ ধনী এবং প্রভাবশালী; তাঁরা নিজেদের সংগঠিত করতে পারে। সুতরাং জমিদারদের অনুমতি ব্যতীত কোন আইন পাশ করা হলে তারা সে-আইনকে কার্যকরী করতে নানাভাবে বাধা দেবে।

কিষাণদরদী কংগ্রেসকর্মীরা এই চুক্তিমত আইন পাশে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং নেতাদের সমালোচনা করে। কিন্তু দলীয় নেতারা কিষাণদরদী কংগ্রেসকর্মীদের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করেন; বিশেষতঃ কিষাণ সভার সংগে যোগাযোগ রাখা কর্মীদের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৮ সালের কংগ্রেসী ভূমিসংস্কার আইন সম্পর্কে জমিদারদের অভিমত উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। বিহার আইনসভার জমিদারদের জনৈক নেতা, কে, বি. ইসমাইল জানালেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জমিদাররা কোন অধিকার হারায়নি, বরং এতে তাদের লাভই হয়েছে। সুতরাং এই প্রকার কংগ্রেসী সরকারকে তাঁরা প্রশংসা করবেন। বিরোধী নেতা সি. পি. এন. সিংহ ১৯৩৯ সালে মন্তব্য করলেন যে বিহার সরকার অত্যন্ত ভাল (very reasonable) এবং এই সরকার ব্যতীত অন্য কোন সরকার জমিদারদের সুযোগ সুবিধা দিত না (Some concessions were secured by Zamindars in Bihar which no other Government would have allowed")।

ঘোষণা এবং কার্যের মধ্যে কংগ্রেস চিরদিনই ফারাক রেখে দিয়েছে। কৃষকদের মঙ্গলের জন্য আইন পাশ করা হয়েছে বলে তারা সরলমনা গ্রামবাসীদের বোঝাতে থাকে। কিন্তু এমনই আইন পাশ হ'ল যে কৃষকরা নয়, প্রতিপক্ষ শ্রেণী উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কংগ্রেসী এই দ্বৈতভাষণ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে আবার আত্মপ্রকাশ করল।

ভূমিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও কংগ্রেসের ধারণা মধ্যস্বত্ব লোপ করলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এবং সমবায় কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপিত হলেই ভারতে উন্নত কৃষি ব্যবস্থা প্রচলিত হবে। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে কংগ্রেস আইন দ্বারা মধ্যস্বত্ব লোপ করেছে। কিন্তু তার ফল কি বিষময় হয়েছে তা কৃষকরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। আইনতঃ জমি জমিদার এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছ থেকে নিয়ে নিলেও কার্যতঃ বেনামীতে তাদের হাতেই রয়ে গেছে। সমবায় কৃষি-ক্ষেত এখন কথায় কথায় দাঁড়িয়েছে। বরং ইদানীং সরকারী নীতি হচ্ছে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কৃষিতে মূলধন নিয়োগ করা। ফলে ব্যাঙ্ক মালিকরা কৃষিব্যবস্থায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করবার সুযোগ পাবে। কংগ্রেসী বড় বড় বুলি আজ বইয়ের পাতায় আছে—কার্যক্ষেত্রে নয়।

অপশাসনের একুশ বছর

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "সপ্তাহ" নিম্নোক্ত সংবাদ দিয়াছে :—

> কংগ্রেসী রামরাজ্যে ৬ কোটি মানুষকে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় দৈনিক ৩২ পয়সা বা তার চেয়েও কম আয়ে। ৪ কোটি মানুষ জীবনধারণ করে দৈনিক ২৫ পয়সা বা তার চেয়েও কম। জনসমষ্টির ৬০ শতাংশের মাথাপিছু ব্যয় ২০ টাকারও কম।
>
> এটা কোন মন গড়া তথ্য নয়। এ তথ্য নেওয়া হয়েছে সরকারি ন্যাশনাল স্যাম্পল্ সার্ভে থেকে।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ অ্যাপ্লায়েড্ ইকনমিক রিসার্চের এক সমীক্ষা অনুসারে গ্রামাঞ্চলের সবচেয়ে নিচেকার ৫ শতাংশ গৃহস্থের কোনই বিত্ত নেই, তার পরবর্তী ৫০ শতাংশ প্রাচীন সম্পদের মাত্র ৭ শতাংশ ভোগ করে থাকে। গ্রামের মানুষের দৈনিক গড়পড়তা আয় :

সর্বনিম্ন ১ কোটি মানুষ মাথা পিছু দৈনিক ২৭ পয়সা
পরবর্তী ৫ কোটি „ „ „ „ ৩২ „
পরবর্তী ৫ কোটি „ „ „ „ ৪২ „

ভারতে গ্রামের সংখ্যা ৫.৬৭ লক্ষ। পরিকল্পনা কমিশনের প্রোগ্রাম ইভ্যালুয়েশন অর্গানাইজেশনের এক সমীক্ষা অনুসারে এর অধিকাংশ গ্রামেই এখনও না আছে কোন পোস্ট অফিস, না কোন বাজার, না ডাক্তার।

পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৮৭.২ টি গ্রামে কোন ডাকঘর নেই, শতকরা ৯৩.৯ টি গ্রামে কোন বাজার নেই, শতকরা ৮০.৪ টি গ্রামে একজন ডাক্তার পর্যন্ত নেই। এই রাজ্যে ৩৯টি কর্মসংস্থান কেন্দ্রে বিগত তিন বছর মোট ১৩,৯৬,৬৪৪ জন কর্মপ্রার্থীর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। তার মধ্যে কাজ পেয়েছেন মাত্র ১৩১০৯২ জন। অর্থাৎ শতকরা ৯০ জনেরও বেশি

কোন কাজ পান নি। গ্রাম এবং শহরের আংশিক ও পুরো বেকার মিলিয়ে এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি পর্যন্ত দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যখন উন্নয়ন হয়েছে সবচেয়ে বেশি তখনও মাথাপিছু বাৎসরিক আয়ের মাত্রা এই রাজ্যেই বেড়েছিল সব চাইতে কম। এই বৃদ্ধির মাত্রা মহারাষ্ট্রে ছিল ৩.৭ শতাংশ, মধ্যপ্রদেশে ২.৯ শতাংশ, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ১.৬ শতাংশ।

উৎপাদনে নিয়োজিত মোট মূলধনের পরিমাণ মহারাষ্ট্রে ৬৪৯ কোটি টাকা, পশ্চিমবঙ্গে ৭৫৬ কোটি টাকা এবং এবং বিহারে ২৯০ কোটি টাকা। কিন্তু রেজিষ্টার্ড কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা মহারাষ্ট্রে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার, পশ্চিম ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার এবং বিহারে ২ লক্ষ ৩ হাজার।

মনোপলি কমিশনের রিপোর্ট দেখা যায় ৭৫টি শিল্পপতি গোষ্ঠির হাতে রয়েছে ১৫৩৮টি শিল্প যার মূলধনের পরিমাণ ৬১০ কোটি টাকা এবং তাদের "ঘোষিত" সম্পত্তির পরিমাণ ২০৬৫,৯৫ কোটি টাকা। দেশের সমস্ত উৎপাদনশীল মূলধনের প্রায় ৪৬.৯ শতাংশই তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। এদের মধ্যে তিনটি গোষ্ঠি—টাটা, বিড়লা ও মার্টিন বার্ণ-২২৫টি কোম্পানী নিয়ন্ত্রণ করে যার সম্পত্তির পরিমাণ ৮৯০ কোটি টাকা। বিড়লারা তিন বছরের মধ্যে তাদের সম্পত্তি বাড়িয়েছে ২৯৩ কোটি টাকা থেকে ৪৩৭.৫ কোটি টাকা।

স্বরূপ-বাণী

যদি দেশেরই কাজ করিতে চাও, সে কাজ হইবে আগুন জ্বালিবার শক্তিতে নয়, প্রজ্বলিত অগ্নিপিণ্ডকে অক্লেশে করতলে ধারণ করিবার ক্ষমতায়। কর্মী যাঁহারা, তাঁহারা ধীর স্থির, চিন্তাশীল ও সহিষ্ণু।

আমাদের জীবন ইতিহাসের জীবন হউক,
আমাদের ইতিহাস জীবনেরই ইতিহাস হউক।

পরের দুঃখে শুধু অশ্রুপাত করিলেই চলিবে না, কর্মের দ্বারা সেই অশ্রুর সম্মান অব্যাহত রাখিতে হইবে।

সাধুগিরির মেকী মুদ্রা বাজারে চালাইতে গিয়াই যে আমরা যথার্থ ছদ্মবেশে সজ্জিত হইতে চাহিয়াই যে আমরা যথার্থ সন্ন্যাসকে ছোট করিয়া দিয়াছি, বৈরাগ্যের কৃত্রিম পতাকা উড়াইতে গিয়াই যে আমরা যথার্থ ত্যাগীকেও তাঁহার আসনে অনধিকারী করিয়া রাখিয়াছি, লোক ভুলাইবার জন্যই আলখাল্লা পরিয়া বাউল সাজিয়াছি, উদরের তাড়নায় ফকিরীর ফিকির ধরিয়াছি, এবং এই ভাবেই যে আমরা সর্বস্ব-সমর্পণকারীর আপ্রাণ উৎসর্গের মূল্য কমাইয়া দিয়াছি, হে তরুণ ভারত, দেশের জন্য দশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে আসিয়া আজ একথা ভুলিয়া যাইও না। মঠ বা আশ্রম বা রাজপ্রাসাদই তোমার গৃহ নহে, তোমার গৃহ ঐ দীনদরিদ্রের নিরন্ন অন্নশালায়, তোমার গৃহ ঐ লজ্জানিবারণে অক্ষম বস্ত্রহীনের আত্মগোপনের অন্ধকারে, তোমার গৃহ ঐ ভ্রাতৃবিরোধী আত্মবিদ্বেষী নিত্যকলহরত সহোদরের রক্তাক্ত অঙ্গনতলে, এবং সর্বোপরি তোমার গৃহ তাহাদের নিত্য সাহচর্যে, যাহারা অজ্ঞতায় আত্মমর্যাদা ভুলিয়াছে, অপশিক্ষায় মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে।

(৫৭৬ পাতার পর)

ছিল। সেখানে নাকি একটি কুণ্ড অর্থাৎ পুকুর আছে। সেই পুকুরটা হয়ত জলজ ফুলে ভর্তি থাকত। সাঁওতালী বাহ শব্দের অর্থ ফুল। বোধ হয় সাঁওতালেরা ঐ মৌজার নাম বাহকুণ্ডা অর্থাৎ ফুলের পুকুর গ্রাম রেখেছিল।

এরপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি যেন ক্রমশঃ যোগেশচন্দ্রের কাছ থেকে দূরে সরে গেলাম। তারপর একদিন আমি আমার জন্মভূমির মায়া কাটিয়ে [illegible] চটির [illegible] তুলে দিয়ে বাঁকুড়া শহর ছেড়ে চলে [illegible] এলাম। [illegible] এই প্রবীণ মনীষীকে [illegible] দেখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলাম। জলধারার গতিপথ হঠাৎ পাল্টে গেলে যেমন সে আর আগের পথে এগোয় না, আমারও তেমনি [illegible] পথ পাল্টে গেল। [illegible] মনে [illegible] ট্রেনযাত্রী হয়ে আমি একটা স্টেশন পেরিয়ে আর এক স্টেশনে এসে পৌঁছেছি।

সে অনেক [illegible] আগের কথা [illegible] তাঁর [illegible] আমি [illegible] বিদায় [illegible] কাছ থেকে [illegible] তিনি বলেছিলেন —"আমার লেখা তোমার [illegible] হয়ত তোমার আমাকেই [illegible]।" কথা [illegible] তাঁকে দাম্ভিক বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন [illegible] পরিচালনায় জানতে পেরেছি [illegible] ঠিক কথাই বলেছিলেন। সাধারণ পাঠক যা চায়, তাদের মনের খোরাক [illegible] তে আচার্য যোগেশচন্দ্রের জ্ঞানগর্ভ লেখা কম সাহায্য [illegible]। তাঁর লেখা বোঝার ক্ষমতা অনেকেরই ছিল না। [illegible] পাঠকসাধারণ চাইতেন হালকা ধরণের কিম্বা হাসির [illegible]।

সালের কথা মনে নেই। তা আর খোঁজাখুঁজি করে জানবার চেষ্টাও করলাম না। তারিখটা হচ্ছে ১৪ই শ্রাবণ। হঠাৎ নজরে পড়ল, গাছ থেকে একটি পাকা ফল [illegible] পড়ে গেছে।

দোতালার পড়ার ঘরে আমি তখন লেখাপড়ার চর্চা করছি। এমন সময় জানতে পারলাম রাজপথে মৃতদেহের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে। কে আবার মারা গেল! উদ্গ্রীবতায় চঞ্চল হয়ে বাইরে বেরিয়ে জানলাম প্রবীণ মনীষী আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মারা গেছেন। এ তাঁরই শবযাত্রা। মনে হল দারুণ শীতে কে যেন আমার গায়ে এক বালতি জল ঢেলে দিল। বিষাদে বিহ্বল মনে আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলাম। অনেকে ছুটে গেল রামপুরের শ্মশানঘাটে। [illegible] দ্বারকেশ্বরী নদী তীরে, যেখানে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ আচার্যের চিতা জ্বলে উঠবে। যে দেহ নিয়ে তিনি বাণীর অর্চনায় নানা বিষয়ের গবেষণা ও আলোচনা করে গেছেন সেই দেহ ভস্মীভূত হবে। আমায় সঙ্গে নিতে অনেকেই চাইলেন, কিন্তু আমি গেলাম না। যে দেহ দেশবাসীর পরম আদরের, শ্রদ্ধেয় ও নমস্য, প্রিয় হতেও প্রিয়তর ছিল, [illegible] সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহ পুড়ে যে ছাই হবে তা দেখতে পারব না। মন তখন এই প্রশ্নের উত্তর চাইল,— মানুষ মারা গেলে কোথায় যায়? [illegible] পড়ার ঘরে আমি [illegible] অন্তরালে আচার্য যোগেশচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করলাম। এ যেন গঙ্গাজলে গঙ্গার পূজা। তারপর সেই লেখা সাপ্তাহিক [illegible] পত্রিকায় প্রকাশ করে দেশের পাঠক ও জনসাধারণের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানে কাছে টানলাম। জানি না সেই শ্রদ্ধাঞ্জলির বাণী ইথারে ধ্বনিত হয়ে তাঁর স্বর্গগত অমর আত্মার পদস্পর্শ করেছে কি না।

যোগেশচন্দ্রের বিভিন্নমুখী প্রতিভার পরিচয় প্রদান এবং সে সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করতে গেলে সেই আলোচনার শেষ হবে না। আমি শুধু এই কথাই বলব,— জীবনের শেষপ্রান্তে, কাজ হতে অবসর নিয়ে, বয়সের অবসাদকে অগ্রাহ্য করে তিনি যে পুণ্যোদ্যমে বাণীর অর্চনা করে গেছেন, সেই উৎসাহ উদ্যমের কথা স্মরণ করে যদি কেউ তাঁর পদাঙ্কানুসরণে কিছুটা সমর্থ হন, তা হলেই বুঝব তিনিই তাঁর কিছুটা মূল্য দিতে পারলেন। তখন তিনি যেমন দেশকে গৌরবান্বিত করবেন, তেমনি নিজেও ধন্য হবেন।

———

সাময়িকী

আন্দামান অভিযাত্রা

পিনাকী চট্টোপাধ্যায় এবং জর্জ্ অ্যালবার্ট ডিউক নামে দুইটি তরুণ একটি ছোট নৌকায় কলিকাতা হইতে আন্দামান যাত্রা করিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে দূরভাষী রেডিও, রাডার বা অন্য কোনও যন্ত্রপাতি নাই, যাহার সাহায্যে তাহাদের নৌকাটি নিরাপদ হইতে পারে। হাতে অবিরত দাঁড় বাহিয়া ইহারা বঙ্গ সাগর পাড়ি দিবে। গঙ্গার তীর হইতে সমুদ্রের মোহনা পর্য্যন্ত ইহারা নদীপথে যাইবার সময়ে অসংখ্য নরনারী নদীতীরে দাঁড়াইয়া হর্ষধ্বনি করিয়াছে, নিরাপদে ইহারা আন্দামান পৌছান, এই কামনা করিয়াছে।

বিস্তর দুর্ভাগ্য এবং চরিত্র-অবনতি বর্তমান বাঙালী তরুণ সম্প্রদায়কে লোকচক্ষে নিন্দার্হ করিয়াছে। ঘরে ও বাহিরে এই ধারণাই প্রচারিত হইতেছে যে বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমরা তাহা বিশ্বাস করি না; আমরা মনে করি বাঙালীজাতির মৃত্যু নাই। আন্দামান-অভিযাত্রা তাহার অন্যতম প্রমাণ। দুঃখ সহিবার তপস্যায় বাঙালী তরুণ যে মৃত্যুসীমা অতিক্রম করিবার সাহসেও বলীয়ান্, তাহার প্রমাণ যুগে যুগেই পাওয়া গিয়াছে।

বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা

সংবাদে প্রকাশ—

> কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় টার্ণার মরিসন কোম্পানীর একটি মামলায় রায় দিতে গিয়া গত কয়েক বৎসর ধরিয়া আয়কর বিভাগ মুন্দ্রার নিকট প্রাপ্য তিনকোটি টাকা বকেয়া কর আদায় সম্পর্কে কোন চেষ্টা না করায় এবং সুপ্রীম-কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মিঃ বি. পি. সিন্হা টার্ণার মরিসন কোম্পানীতে যোগ দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

খ্যাতনামা হরিদাস মুন্দ্রা এককালে টার্ণার মরিসন কোম্পানীর প্রভূত পরিমাণ শেয়ার খরিদ করিয়া উহার পরিচালনার ভার নিজের হাতে লইয়াছিলেন। ঐ কোম্পানী পূর্ব্বভারতে কার্য্যনিরত একাধিক বৃহৎ মূলধন বিশিষ্ট কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট্স্ বা পরিচালক। টার্ণার মরিসন কোম্পানীর কর্তৃত্ব অধিকার করিবার ফলে হরিদাস মুন্দ্রা ঐ সব পরিচালিত কোম্পানীরও মালিকানা করায়ত্ত করিয়াছিলেন। আয়কর বিভাগ তাহাদের প্রাপ্য কর আদায়ের নিমিত্ত মামলা করিয়া জয়ী হয় এবং ডিক্রী পায়। কোম্পানীর উপর ক্রোক-পরওয়ানা জারী করিয়া টাকা আদায় করা যাইত, কিন্তু আয়কর বিভাগের ঔদাসীন্য বা গাফিলতীর জন্য ক্রোক-পরওয়ানা জারী করা হয় নাই। মামলায় জিতিবার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া এই ঔদাসীন্য বা গাফিলতী চলিতেছিল, ডিক্রীর মেয়াদ তামাদি হইবার প্রাক্কালে ক্রোক জারী করিবার জন্য দরখাস্ত করা হয়।

বিচারপতির রায়ে প্রকাশ

> কর আদায়কারী বিভাগের পাওনা তিনকোটি টাকার উপরে হইবে। ট্যাক্স আদায়কারী অফিসার স্বীকার করিয়াছেন যে ক্রোক জারি করিবার জন্য কর্তারা কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। ১৯৬৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী ক্রোক করিবার আদেশ বাহির হইবার পর ১৯৬৮ সাল শেষ হওয়া পর্যন্ত হরিদাস মুন্দ্রার নিকট হইতে টাকা আদায়ের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই।

সাক্ষীদের জেরার মাধ্যমে সুপ্রীমকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মিঃ বি. পি. সিন্‌হার সম্বন্ধে ট্যাক্স আদায়ের প্রতিবন্ধকতা করিবার যে সকল অভিযোগ উঠিয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার জন্য বিচারপতি প্রশান্ত-বিহারী মুখোপাধ্যায় মিঃ সিন্‌হাকে আদালতে উপস্থিত হইতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেই আদেশ বা অনুরোধ মিঃ সিন্‌হা রাখেন নাই।

মিঃ সিন্‌হা সুপ্রীমকোর্ট হইতে অবসর নিয়াছিলেন এবং টার্ণার মরিসন কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডে চেয়ার-ম্যানের আসন গ্রহণ করেন। বিচারপতি মুখোপাধ্যায় তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন

> কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ভুবনেশ্বরপ্রসাদ সিন্‌হা অভিযোগ অস্বীকার করিতে আদালতে উপস্থিত হন নাই। আমি একমাত্র এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারি যে উহা অস্বীকার করিবার উপায় তাঁহার ছিলনা এবং ঐ অভিযোগগুলি সত্য।

হাইকোর্ট এবং সুপ্রীমকোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষম থাকিলে বিচারপতিগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়ী যে কোনও বৃত্তিতে প্রবেশ করিতে পারেন; অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির পক্ষে নূতন কার্য গ্রহণ কোনও ক্রমেই আপত্তিকর হইতে পারে না। তাঁহাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা লোককল্যাণে নিয়োজিত হইবে, এতদপেক্ষা বাঞ্ছনীয় আর কি হইতে পারে! কিন্তু এক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে তাহা অন্য ব্যাপার। মিঃ সিন্‌হা সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি থাকা কালে হরিদাস মুন্দ্রার বিরুদ্ধে তঞ্চকতা জালিয়াতী পরস্বাপহরণ প্রভৃতি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইয়াছিল, এবং ঐ সব মামলার অনেকটিতে অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছিল; আপীল করিয়াও হরিদাস মুন্দ্রা রেহাই পায় নাই, তাহার একাধিক শাস্তির আদেশ হয়। মিঃ সিন্‌হা উহা বিচারপতি থাকা কালেই জানিতেন; তথাপি, অবসর লইবার পর কুখ্যাত মুন্দ্রার কোম্পানীতে যোগ দেন এবং রাষ্ট্রের প্রাপ্য আদায়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। মিঃ সিন্‌হার ব্যবহার শুধু নিন্দনীয় নয়, গর্হিতও বটে।

সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারাদের অবসর গ্রহণের পর কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানসমূহে যোগ দেওয়ার প্রবণতা অত্যধিক হইয়াছে। প্রশাসনিক বিষয়ে তাঁহাদের দীর্ঘকালের লব্ধ অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো অপেক্ষা সরকারী অফিস সমূহে প্রভাব বিস্তার করার উদ্দেশ্যই এই সব পুনর্নিয়োগের মূলে কাজ করে। ফলে অনেক অর্থকরী সুবিধাও অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের নূতন কর্তারা পাইয়া থাকে। লাইসেন্স্ পারমিট কন্ট্রাক্ট্ প্রাপ্তি তো আছেই, রাষ্ট্রের প্রাপ্য আদায়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং অনেক দণ্ডযোগ্য অপকর্ম সাধনও এই সব পুনর্নিয়োগ করিবার ফলে সহজ এবং নির্ঝঞ্ঝাটে হইতে পারে।

অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের তো বটেই, কোনও কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া শুধু নিষিদ্ধ করা নহে, গর্হিত এবং দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য করা যায় কি না তদ্বিষয়ে চিন্তা করা আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে। বিশেষতঃ যে সব কমার্শিয়াল প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স পারমিট ট্যাক্সফাঁকী এবং বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত বিষয়ে দোষী বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যদি কোনও অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বা সরকারী কর্ম্মচারী জড়িত থাকে, তবে তাহারও দণ্ড হইবে, এইরূপ আইন হওয়া দরকার।

বিচার বিভাগ হইতে এবং সরকারী অন্যান্য বিভাগ হইতে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তৎ তৎ বিভাগে প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ পায়। এই প্রভাব বিস্তার সর্ব্বথা সদুদ্দেশ্যে নাও হইতে পারে, এবং এইরূপ হইলে বিচার বিভাগের ও সরকারী প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ব্যাহত হয়। ঐ নিরপেক্ষতা গণতন্ত্রের শুধু মর্যাদাই বাড়ায় না, উহার স্থায়িত্বেরও নিদর্শন।

ট্রামের ও বাস্-এর ভাড়া বৃদ্ধি

কলিকাতার ট্রাম ও সরকারী বাস্-এর ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ ভাবেই বার্ষিক প্রায় চার কোটি টাকা লোকসান হইতেছে।

লোকসান মিটাইবার জন্য ট্রামের ভাড়া ইতিমধ্যেই বাড়িয়াছে, বাস্-এর ভাড়া বৃদ্ধির জন্যও জোর চেষ্টা চলিতেছে। ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে আয় দেড়গুণ অপেক্ষাও বেশি হইবে, এবং যাত্রীদের সুখ সুবিধা আরামও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনের কর্তারা মনে করেন। ভাড়া বৃদ্ধির ফলে ইতিমধ্যেই ট্রামে যাত্রীর সংখ্যা কমিয়াছে, এবং বাস্-এর ভাড়া না বাড়িলে ট্রাম-পরিচালকদের আকাঙ্ক্ষিত বেশি রোজগার হইতে পারিবে না। এই জন্যও বাস্-এর ভাড়া বাড়াইবার জন্য প্রস্তাবও পাশ হইয়া গিয়াছে। নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে উহা কার্যকরী করিবার চেষ্টা হইবে।

যুক্তফ্রন্ট্-এর আহ্বায়ক বিবৃতি দিয়াছেন যে তাঁহার দল মন্ত্রীত্ব পাইলে ট্রামের ভাড়া-বৃদ্ধি কমাইবেন। এই উক্তি সাধারণের বিভ্রান্তি হইতে পারে। কারণ, যুক্তফ্রন্ট্ গবর্মেণ্ট্ যখন ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন, এবং আয়-ব্যয়ের ঘাটতি মিটাইবার জন্য ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব কেহ কেহ বলিয়াছিলেন; অন্ততঃ 'জনতার সরকারের' বিরুদ্ধে যাইতে পারে বলিয়া ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব তখন আলোচিত হয় নাই। বর্তমানে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে ট্রামের যাবতীয় শ্রমিক ইউনিয়নের কোনটাই কোন আপত্তি করিয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। যুক্তফ্রন্ট্ পুনরায় গবর্মেণ্ট্ পাইলে ট্রামের লোকসান কিভাবে মিটাইবেন তাহা তখন দেখা যাইবে। রাজনৈতিক বিবৃতি ও অর্থনৈতিক সমাধানে বিস্তর ফারাক, ইহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে।

সরকারী বাস্-এ যে লোকসান হয়, তাহা মিটাইবার উপায় ভাড়া বৃদ্ধি নহে। ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্টের লাভ লোকসানের খতিয়ান তলাইয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে অযোগ্য মাথাভারী ওভারহেড্ এবং চুরী,—এই দুই রন্ধ্রে আয়ের টাকা নষ্ট হইয়া থাকে। অবক্ষয় খাতে যে টাকা দেখানো হয় তাহা প্রতিটি বাস্-পিছু কষিয়া সেই অঙ্কের দ্বিগুণ হারে যদি বাস্গুলি লীজ্ দেওয়া হয়, তবে ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্টে লোকসান হইবে না। ধরা যাক একটি দোতলা-বাসে অবক্ষয় হয় বার্ষিক বিশহাজার টাকা; নিলাম ডাকিয়া একবছরের জন্য উহা চল্লিশহাজার টাকায় লীজ নেওয়ার লোকের অভাব হইতে পারে না। প্রাইভেট বাস্ও চলিতে দিলে, ভাড়া না বাড়িতে দিয়ে প্রতিযোগিতা করিয়াও উহা চালাইয়া দৈনিক বাস্-পিছু একশো টাকা লাভ থাকা অসম্ভব নয়।

ছাত্রদিগকে কন্সেসন্-এ বা শস্তায় যাতায়াত করিবার সুবিধারূপ ঘুষ দিয়া তাহাদিগকে ট্রাম-বাস্ দাহ করা হইতে নিবৃত্ত রাখিলেই সরকারী পরিচালনায় ট্রাম বাস লাভজনক ব্যবসায় হয় না। সোসালিষ্টদের সাইন্-বোর্ড টাঙাইলেও ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা আসলে ক্যাপিটালিষ্ট—ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যবসায়ের মালিকানা যেখানে সংবিধান সম্মত। ক্যাপিটালিষ্টিক গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতা হইতেছে অর্থ-নৈতিক বিকাশের মূলভিত্তি। বাস্-এর মালিকানা প্রাইভেট লোকদের হাতে দিয়া এবং ভাড়ার হার ও অন্যান্য বিষয়ে কণ্ট্রোল কঠোরতর করিলে সরকারের লাভ বই লোকসান হইবে না, সরকারী ব্যবসায়ে লোকসান বহনকারী ট্যাক্সদাতারা এবং যাত্রীরা নিরুদ্বেগে শ্বাস লইতে এবং নিশ্বাস ছাড়িতে পারিবে।

যদি উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে কর্তাদের কোনও মানসিক বাধা থাকে এবং তাঁহারা বাস্ পরিচালনা নিজেরাই করিতে চান, তবে এই নিয়মটা করিতে পারেন যে, ষ্টেট ট্রান্সপোর্টের কর্তারা প্রত্যেকে অন্ততঃ ছয়মাস কাল বাস্-এ চড়িয়াই কর্ম্মস্থলে যাতায়াত করিবেন, পৃথক কোনও গাড়ীতে নহে।

একটি মামলার রায়

'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড' ইংরাজী দৈনিক পত্রিকার ২৩ ডিসেম্বর ১৯৫৮ সংখ্যায় একটি মামলার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহা এইরূপ :—

বোম্বাই-এ আশা নাদ্কার্নী নামে একটি পঁচিশ বৎসর বয়স্কা সিনেমা-অভিনেত্রী তাহার মা ও ভাই-এর সঙ্গে বাস করে। একদিন জনৈক বাবুভাই তাহাকে ফোন করিয়া বলে যে কলিকাতা হইতে এক মিঃ মুখার্জী বোম্বাই আসিয়াছেন, তিনি বোম্বাই-এর বিড়লা হল্-এ আশা নাদ্কার্নীর নাচের

ব্যবস্থা করিতে চান। সেইদিন সন্ধ্যায় পুলিশের সাব-ইন্‌স্পেক্টর মিঃ খোট আসিয়া নিজেকে মিঃ মুখার্জী বলিয়া পরিচয় দেয় এবং নাচের বায়না স্বরূপ তিন হাজার টাকা দেয়। এই টাকার রসিদ লিখিবার সময় পুলিশের ভিজিল্যান্স্‌ বিভাগের লোকরা আসিয়া নাদ্‌কার্নীর ফ্ল্যাটে তল্লাসী চালায় এবং নাদ্‌কার্নী ও তাহার মাকে ধরিয়া থানার হাজতে পুরিয়া দেয়; অভিযোগ এই যে আশা অসদুপায়ে জীবিকা অর্জন করে এবং তাহার মা উহাতে সহায়তা করে। হাজতে সারারাত্রি তাহাদিগকে অনাহারে এবং শয্যাহীন থাকিতে হয়। পরের দিন সকালে বাবা সাহেব মোরের একজন লোক আসিয়া তাহাদের জামীনের ব্যবস্থা করে। সাব্‌ ইন্‌স্পেক্টর মেহতা তাহাদিগকে বাবা সাহেব মোরের কথা অনেকবার বলে। বোম্বাই-এর "ভীতি" (terror)এবং "বাঘ" (tiger), এই দুই উপাধিতে খ্যাতিমান (!) সাব ইন্‌স্পেক্টর মেহতা আশা নাদ্‌কার্নীকে বাবাসাহেবের প্রীতি উদ্রেক করিবার অনেক পরামর্শ দেয়!

পুলিশের ভিজিলান্স শাখার অভিযোগকে অগ্রাহ্য করিয়া বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট আশা নাদ্‌কার্নী ও তাহার মাতাকে মুক্তি দিয়াছেন এবং ঐ শাখার এবং পুলিশের কার্যকলাপের কঠোর নিন্দা করিয়াছেন। কিসের অভিযোগ, সংবাদদাতার নাম, ভিজিলান্স্‌ বিভাগের রিপোর্টে কিছুই উল্লেখ নাই; ইহা না থাকিলে পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার জুলুমের পর্যায়ে পড়ে। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ পুলিশী জুলুমের সমর্থন করেন নাই।

বাবাসাহেব মোরে হইতেছেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চৌহানের জামাতা। তাহারই যোগসাজসে ও বন্দোবস্তে আশা নাদ্‌কার্নীকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাবাসাহেবের নেক্‌ নজর যুবতীটি অনেকদিনই উপেক্ষা করিয়াছিল; প্রতিপত্তিশালী শ্বশুরের জামাতা ঐ উপেক্ষার প্রতিশোধ লইয়াছে। শ্বশুর মহাশয় যে জামাতাবাবাজীর "মুভমেণ্ট" সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ তাহা বিশ্বাস করা কঠিন এও জ্ঞাত হইতে পারে যে শহরে শহরে 'টেরর' ও 'টাইগার' মার্কা পুলিশের দারোগা পুষিয়া জামাতাবাবাজীদের বেপরোয়া লালসা পরিতৃপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। মানুষের প্রথম ও ষষ্ঠ রিপুর চরিতার্থতার জন্য সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের ব্যবহারের উদাহরণ তৎকালীন ফরাসীদেশে বিরল ছিল না; বিখ্যাত সাহিত্যিক আনাতোল্‌ ফ্রাঁস্‌ তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের আড়ালে থাকিয়া অন্যবিধ প্রতিষ্ঠার জন্য যে এ দেশেও চেষ্টা হইয়া থাকে, বোম্বাই-এর মামলায় তাহার নিদর্শন পাওয়া গেল। নাচ নেওয়ালী বলিয়াই হয়তো মামলাটা আদালতে উঠিয়াছে; ঘরওয়ালীদেরও উপর যে নেক্‌নজর পড়ে না, তাহা কে বলিতে পারে!

দেওয়ালের লিখন

রাশিয়ার উট্রেক্ট্‌ শহরের পৌরসভা বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন যে শহরের যত্র তত্র পোষ্টার মারা চলিবে না। কয়েকটি কাঠের বোর্ড তাঁহারা বসাইয়াছেন, যাহার যাহা পোষ্টার বা বিজ্ঞপ্তিপত্র উহাতে সাঁটিয়া দেওয়া যাইবে। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন যে প্রতি পোষ্টারে এবং বিজ্ঞপ্তিপত্রে বিজ্ঞাপকদের নাম এবং ঠিকানা প্রকাশ করিতে হইবে।

কলিকাতার বাড়ি ঘরের দেওয়াল, স্কুল কলেজ এবং হাসপাতালও বাদ যায় না,—নানাবিধ পোষ্টার ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে নোংরা করিয়া রাখা হয়। এইরূপে শহরকে কুৎসিত করিবার মূলে মানসিক কুশ্রীতাই কাজ করিয়া থাকে। আপত্তিকর সিনেমা প্ল্যাকার্ড তো আছেই, তদুপরি বাড়ীর দেওয়ালে অবিরত পোষ্টার সাঁটিয়া যে নোংরামি করা হয়, তাহা শুধু আপত্তিকর নহে, আইনতঃ দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। কলিকাতা কর্পোরেশন বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি ও আইন সভার সদস্যরা উপরোক্ত দুষ্কর্মের অবসান ঘটাইতে চেষ্টা করেন না কেন?

'ভোট বর্জন করো'

একদল বালখিল্য স্লোগান দিয়াছে, "ভোট বর্জন করো" অপর একদল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিরা ঐ স্লোগান সংবিধান-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করা যায় কিনা তদ্বিষয়ে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ভোটদান সম্পর্কে কিছু জানিবার

জন্য খুঁজিপুঁথি ঘাঁটিবার দরকার নাই। কারণ, ভারতে অনুষ্ঠিত প্রত্যেকটি নির্বাচনেই, দেখা গিয়াছে; প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ভোটার ভোটদান হইতে বিরত থাকে। দলীয় অনুরাগী, অনুগৃহীত, ভুয়া ও মৃত ব্যক্তিদের প্রদত্ত ভোটেই যিনি জিতিবার, জিতিয়া থাকেন; ভোট-স্বার্থহীন এবং দলানুবর্তী নহেন এরূপ ভোটারদের ভোটপত্র যাহা ব্যালট বাক্সে পড়ে, তাহাদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: এক শ্রেণী হইতেছেন তাঁহারা যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত দলের লোক যাহাতে না জিতিতে পারে সেই জন্য বিপক্ষকে ভোট দেন; অপর শ্রেণীর ভোটাররা মনে করেন 'অজানা শয়তান অপেক্ষা জানা শয়তানই ভালো' এবং সেই মনোভাব লইয়া ক্ষমতায় আসীন পার্টির প্রার্থীকেই ভোটপত্র দিয়া থাকেন।

একুশ বৎসরের স্বাধীনতার অভিজ্ঞতায় নির্দলীয় ভোটাররা উপলব্ধি করিয়াছেন যে শয়তানী ক্রিয়াকর্মে, জানা ও অজানা উভয় প্রকার শয়তানরাই সম্পূর্ণ স্বাধীন! শয়তানের স্বাধীনতার আগুনে আর ভোটের ভূজিপত্র নিক্ষেপ করিবার ব্যক্তি স্বাধীনতা তাঁহারা যদি অপকর্ম বলিয়া মনে করিতে থাকেন, তবে দোষ কিসের?

ভোটারমাত্রকেই যদি ভোটদান করিতে আইনতঃ বাধ্য করা হয়, তবে ভোটপ্রার্থীকেও কয়েকটা গুণের ন্যূনতম অধিকারী হইতে হইবে। যেমন, কোনও প্রার্থীর যেন ঘুষ খাইয়াছে এরূপ অপবাদ না থাকে, যেন সে অন্ততঃ স্কুলের শেষ ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছে, যেন সে অতীতে বেকার পরান্নভোজী বা কোনও পরগাছাবৃত্তির আচরণ না করিয়া থাকে, যেন সে কোনও দিন প্রশাসনিক কর্তৃবর্গের নিকট কাহারও জন্য পারমিট্ লাইসেন্সের জন্য বা অভিযোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য দ্বারস্থ না হইয়া থাকে, যেন সে বৎসরের একটি বা দুইটি দিনই শুধু চরখায় সুতা না কাটে, কারখানা বা মিলের শ্রমিক না হইলে যেন শ্রমিকদের প্রদত্ত ভোটে তাহার অধিকার না হয় ইত্যাদি। বার্নার্ড শ' লিখিয়াছিলেন, "Politics is the last resort of scoundrels";—এই কথাটি মনে পড়িতেছে।

গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই কিছু করিবার এবং না করিবার উভয়বিধ স্বাধীনতাই দেওয়া হইয়াছে; নির্বাচিত প্রার্থীর যেমন শয়তানী করিবার অবাধ স্বাধীনতা আছে, নির্বাচকেরও তেমন অধিকার আছে শয়তান মাত্রকেই ভোট দেওয়া হইতে বিরত থাকিবার।

ভোট দেওয়া যেমন, ভোট না দেওয়াও তেমনই গণতন্ত্রে নাগরিক মাত্রেরই মৌল অধিকার। ভোট না দেওয়ার মৌল অধিকারের ব্যাপক প্রয়োগ হইলে বর্তমানের তথাকথিত গণতন্ত্র অন্যান্য দেশের নিকট উপহাসের বিষয় হইয়া উঠিবে, এবং তখনই ভোটার ভোটপ্রার্থীর গণতান্ত্রিক আত্মমর্যাদাবোধের পুনর্বাসন হইবে।

সমবায় সূতাকল

দৈনিক "যুগান্তর" পত্রিকার ১৫ পৌষ ১৩৭৫ সংখ্যায় নিম্নপ্রকার সংবাদ ছাপা হইয়াছে:—

> ১৯৬৪ সালে রাজ্য সরকার কোঅপারেটিভ পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গে একটি সূতাকল স্থাপন করার কাজে হাত দিয়েছিলেন। এই কলটির নাম দেওয়া হয়েছিল, ওয়েষ্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ স্পিনিং মিলস্ লিমিটেড। শ্রীরামপুরে মিলের বাড়ী তৈরী হয়েছে। মিলটি কোনদিনই চালু হয়নি। আরও কৌতুককর ঘটনা হচ্ছে, গত ২৮শে আগষ্ট রাজ্যপাল ধর্ম্মবীরকে দিয়ে শ্রীরামপুরে এই মিলটির উদ্বোধন করা হয়েছিল। কিন্তু সবটাই ধোঁকাবাজি। রাজ্যপাল যদি খবর নেন তবে জানতে পারবেন, উদ্বোধনের পরে একদিনও মিল চলেনি। উদ্বোধনের আগেও চালু ছিল না। অথচ এই কোম্পানীতে রাজ্য সরকার এ পর্যন্ত চৌত্রিশ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনেছেন।

যুগান্তর পত্রিকার মন্তব্যে বলা হইয়াছে —

> রাজ্য সরকারের একটি ভালো পরিকল্পনার এই ব্যর্থতার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসের মধ্যে রাজ্যের রাজনীতিও আছে।

সমবায় আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি কিরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহা বলিবার পূর্ব্বে যুগান্তর পত্রিকা যাহা লিখিয়াছে তাহা জানা দরকার:—

'৬৪ সালের আগষ্ট মাসে রাজ্য সরকার সমবায় ভিত্তিতে এই সূতাকল স্থাপনের কোম্পানী গঠনের জন্যে একটি ম্যানেজিং কমিটি গঠন করেন। কমিটির চেয়ারম্যান হন শ্যামাদাস ব্যানার্জি। স্থির হয়, সরকার কোম্পানীর মোট শেয়ারের শতকরা একান্নভাগ পর্যন্ত কিনতে পারবেন। বাকী শেয়ার বিভিন্ন সমবায় সমিতি এবং সাধারণ নাগরিকরা কিনতে পারবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, সমবায় সমিতি বা ব্যক্তিগত পর্যায়ে মাত্র এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকার মধ্যে আবার এক লাখ টাকার শেয়ার কিনেছে রাজ্যের হ্যাণ্ডলুম উইভারস কোঅপারেটিভ সোসাইটি। অর্থাৎ মাত্র পঁয়ষট্টি হাজার টাকার শেয়ার বেসরকারী তরফ থেকে কেনা হয়েছে। অন্যদিকে রাজ্য সরকার ক্রমে ক্রমে চৌত্রিশ লক্ষ টাকার শেয়ার কিনলেন। শুধু তাই নয়, কোম্পানীর পরিচালনা খরচের জন্যে সরকার থেকে আরও ৮৮ হাজার টাকা সাহায্য দেওয়া হোলো। সরকারের নিশ্চয়ই আশা ছিল, মিলটি একদিন চালু হবে।

কিন্তু দেখা গেল, ম্যানেজিং কমিটি শ্রীরামপুরে জমি কিনলেন, বিভিন্ন কোম্পানীকে মালপত্র সরবরাহের অর্ডার দিলেন। প্রায় পাঁচ লাখ টাকা অগ্রিম দেওয়া হোলো। অর্ডার দেবার সময় প্রতিযোগিতামূলক টেণ্ডার বা কোটেশন আহ্বান করার ব্যাপারে মনযোগ দেওয়া হোলো না। বেসরকারী চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট কোম্পানীর অডিট রিপোর্টেই (১৯৬৬-৬৭) এই প্রসংগ উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যান্য কোম্পানী থেকে কোটেশন নেওয়া হয়নি। আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন না নিয়েই কয়েকটি কোম্পানীকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং সেজন্যে অগ্রিম টাকাও (এ্যাডভ্যান্স) দেওয়া হয়েছে।" এইভাবে অর্ডার দেবার ঘটনা ঘটতে থাকলো। কিন্তু মিল চালু হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। যাই হোক, জমি কেনা হোলো। প্রায় সাত লাখ টাকা দিয়ে কারখানা-বাড়ী তৈরি করানো হোলো। আর প্রায় কুড়ি লাখ টাকার যন্ত্রপাতি কারখানায় পৌঁছে গেল। কিন্তু এই সব কিনতে কিনতে রাজ্য সরকারের শেয়ার কেনার টাকা তখন ফুরিয়ে এসেছে।

শ্রীরামপুর ঠিকানায় অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত এই ওয়েষ্ট বেঙ্গল কে-অপারেটিভ্ স্পিনিং মিল্‌স্ লিমিটেডের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্যামাদাস ব্যানার্জী সম্পর্কে দৈনিক "কালান্তর" পত্রিকায় ২০ মার্চ ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে এই সংবাদটি ছাপা হয় :—

"পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকারের উদ্যোগে ১৯৫৯।১৯৬১ সালে সমবায় ভিত্তিতে বিভিন্ন জেলায় ১০০টি পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরী চালু হয়। এই সমবায় গুলিকে সাহায্য করার জন্য ১৯৬৫ সালে "ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট্ পাওয়ারলুম এপেক্স সোসাইটি" চালু করা হয়। কিন্তু ইহার পরিচালক হলেন এমন খ্যাতনামা কংগ্রেসী ভদ্রলোকগণ যাহাদের অধিকাংশের সহিত সমবায় পাওয়ারলুমগুলির কোন সংশ্রব নাই। যথা, শ্রীশ্যামাদাস ব্যানার্জী (অতুল্যবাবুর নিজের লোক এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের রাজনৈতিক একান্ত সচিব)" এই এপেক্স সোসাইটির গলদপূর্ণ কাজ কারবারের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার ১৯৬৬ ডিসেম্বর মাসে একটি তদন্তের আদেশ দিয়াছিলেন ; শেষ পর্যন্ত তদন্ত হয় নাই।

এই এপেক্স্ সোসাইটিই শ্রীরামপুরের মিলের মোট বিক্রীত ১লাখ ৬৫ হাজার টাকার শেয়ারের মধ্যে ১লাখ টাকার শেয়ার কিনিয়াছেন।

এই শ্যামাদাস ব্যানার্জী সম্পর্কে "শয়তানের সমবায়" পুস্তকে লেখা হইয়াছে :

"পশ্চিমবঙ্গের সমবায় আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ যাহারা করায়ত্ত করিয়া রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শ্যামাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সদা স্মরণীয়। অতীতে তিনি হুগলী কুটির শিল্পী সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন,

তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় উহা গণেশ উল্টাইয়া লিকুইডেশনে গিয়াছে। তিনি শ্রীরামপুর মাল্টি পারপাস্ সমিতিরও চেয়ারম্যান ছিলেন। ওটিরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।"

"এই ব্যক্তির পরিচালিত অন্যতম প্রতিষ্ঠানের নাম পশ্চিমবঙ্গ তাঁতি সমবায় সমিতি। সমিতির উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশের সমস্ত তাঁতিকে সুতা রং কেমিকেল প্রভৃতি ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ এবং উৎপন্ন বস্ত্র তাঁতিরা যাহাতে ন্যায্য লাভে বিক্রয় করিতে পারে তার বন্দোবস্ত করা।"

"বৈদেশিক মুদ্রার ভয়ানক অনটনের মধ্যেও ইংলণ্ড এবং পশ্চিম জার্মানী হইতে রং এবং কেমিকেল আমদানীর জন্য সমিতি দেড় লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পাইয়াছিল। মাল যখন আসিয়া পৌঁছিল তখন শ্যামাদাস তার মুরুব্বীকে দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইলেন যে তাঁতিরা ঐ সমস্ত রং ও কেমিকেল নিতে চাহিতেছে না, ঐগুলি বাজারে বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হউক। আমদানী লাইসেন্স্ প্রার্থনার সময় কিন্তু সুষ্ঠুভাষায় লিখিত একরারনামা দেওয়া হইয়াছিল যে কেবলমাত্র তাঁতিদের ব্যবহারের জন্য ঐগুলি আনা হইবে এবং কোনমতেই উহা বাজারে বিক্রয় করা হইবে না। সমিতির বার্ষিক ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা এবং উহারা সরকারী গ্রাণ্ট ও বিনাসুদে ঋণও পাইয়াছে। তবু উহাদের অপূর্ব্ব কর্ম্মদক্ষতায় ৩০ জুন ১৯৬২ পর্যন্ত তিন লক্ষ টাকা লোকসান হইল। উহার আদায়ের অযোগ্য পাওনার (bad debt) পরিমাণই দাঁড়াইল আড়াই লক্ষ টাকা।"

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পাওয়ারলুম সমবায় সমিতিগুলির অবস্থা ও উন্নয়নের অনুসন্ধান ও পন্থা নির্দ্দেশের জন্য মিঃ এন্, সি, রায়কে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটি ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে উহার রিপোর্ট দেয়। ঐ রিপোর্ট রাজ্যপাল অদ্যাবধি (২৫ মাঘ) প্রকাশ করেন নাই। ঐ কমিটির নিকট যে

সকল সাক্ষ্য প্রমাণও বিবৃতি দেওয়া হয়, তাহা কমিটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে উক্ত কমিটির নিকট যেসব তথ্য পেশ করা হয় তন্মধ্যে শ্যামাদাস ব্যানার্জ্জী কতখানি জড়িত। আমরা নির্ভর-যোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে জানিয়াছি যে ঐ তথ্যগুলি শ্যামাদাসবাবুর শ্রুতিসুখকর হইবে না।

"শয়তানের সমবায়" পুস্তকের এক কপি লেখক রাজ্য-পালকে দিয়াছিলেন। শ্যামাদাসবাবুকে অভিযুক্ত করিয়া শ্রীরামপুর ঠিকানার উপরোক্ত কো-অপারেটিভ্ স্পিনিং মিল সম্পর্কে একটি চিঠি ঐ পুস্তকের লেখক পাঠাইয়াছিলেন, রাজ্যপালের সেক্রেটারীর নিকট হইতে প্রাপ্তিসংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। এন, সি, রায় কমিটির নিকট প্রদত্ত সাক্ষ্য ও বিবৃতিও রাজ্যপাল নিশ্চয়ই পাঠ করিয়াছেন।

তাহার পরও রাজ্যপাল শ্রীরামপুরস্থ মিলের 'দ্বারোদ্-ঘাটন' করিতে গিয়াছিলেন!

পরোপকার

ভারত গভর্ণমেন্ট্ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর হইতেই বিশ্ব-শুদ্ধ সকলের পরোপকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের নবতম পরোপকার প্রস্তাব হইতেছে পারস্য (বা ইরাণ) দেশের নির্মিয়মান ইস্পাত শিল্পে দক্ষ কারিগর সাহায্য দিয়া উহার উন্নয়ন। এগার শ' কোটি টাকা মূলধন খাটাইয়া ভারত সরকারের পরিচালিত হিন্দুস্থান ষ্টীল প্রতিষ্ঠান ইস্পাত উৎপাদন করিয়া দেড় শ' কোটি টাকা লোকসান দিয়াছে। পৃথিবীর সর্বদেশেই, এবং ভারতে অবস্থিত প্রাইভেট কোম্পানীগুলিও ইস্পাত উৎপাদন করিয়া লাভ করিয়া থাকে, শুধু হিন্দুস্থান ষ্টীলে হয় লোকসান।

ভারত সরকারের প্রশিক্ষণে ইরানী ইস্পাত শিল্প-ভবিষ্যতে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে তাহা অনুমান করিতেও চিন্তিত হইতে হয়।

ইরাণ ও ভারত

ইরাণের শাহ জামসেদপুরে গিয়াছিলেন। টাটা কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা তাঁহাকে বিপুল সমারোহে সম্মানিত করেন; শাহও টাটাদের কীর্তি অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হন। ভারতের সঙ্গে ইরাণের আবহমান কালব্যাপী সখ্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য বিষয়ক রুচিসুখকর বক্তৃতাও বিস্তর হইয়াছে।

নাদীর শাহ একদা ইরাণ হইতে সানুচর আসিয়া দিল্লীতে ভারত-ইরাণ সখ্য করিয়া গিয়াছিলেন; সে কথা না হয় ইতিহাসের অজ্ঞতার জন্য স্মরণ না হইতে পারে। কিন্তু টাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা জামসেদজির পূর্বপুরুষ অষ্টম খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে বর্তমান শাহর পূর্বপুরুষের রাজত্বকালে জান মান বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে পৈতৃক বাসভূমি পারস্য ত্যাগ করিয়া ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন; তারপর তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া পারস্য হইতে পারশি উদ্বাস্তরা পশ্চিম ভারতে পুনর্বাসন পাইতে থাকে, এই ঘটনা তো টাটা কোম্পানীর কর্তাদের অজানা থাকিবার কথা নয়! পারস্যের সঙ্গে আবহমানকাল হইতেই ভারতের সখ্য ও ঐক্য বজায় আছে, শুধু উপোরক্ত দুইটি ঐতিহাসিক ব্যাপার ছাড়া,— এই কথাটা বলিলেই রাজকীয় অভ্যর্থনা ও বাগাড়ম্বর নিখুঁত হইত বলিয়া মনে করি।

১৯শে সেপ্টেম্বর ধর্মঘট

কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস সমূহে বেতনবৃদ্ধি ও অন্যান্য দাবীর ভিত্তিতে গত বৎসর ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে ধর্মঘট হয়, উহা রাষ্ট্রপতির অর্ডিনান্স অনুযায়ী ধর্মঘটের দুই দিন আগেই 'বে-আইনী' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যশোবন্তরাও চৌহান তখন একটি বিবৃতিতে ঐ বলিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন যে যাহারা ধর্মঘটে যোগ দিবে কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না; তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। ধর্মঘট হইয়াছিল এবং সরকারী অফিসগুলিতে ঐ দিন কোন কাজ কর্মই হয় নাই। বহুসংখ্যক কর্মচারীকে কার্যে অননু-মোদিত অনুপস্থিতির জন্য সাস্‌পেণ্ড করা হয়। এই বাধ্যতামূলক কর্মচ্যুতির বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় এই বিষয় লইয়া একাধিকবার আলাপ আলোচনাও হয়, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ আমেরিকার সফর শেষ করিয়া

ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে বিষয়টি বিবেচনা করিতে দেওয়া হয়। তিনি সাস্‌পেন্‌শন্‌-এর আদেশ প্রত্যাহারের পক্ষে তাঁহার সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিয়াছেন। ফলে যাঁহাদের সাময়িক কর্ম্মচ্যুতি হইয়াছিল তাঁহারা পুনরায় চাকুরী ফিরিয়া পাইলেন। 'যাহারা ধর্ম্মঘটে যোগ দিবে তাহাদের দেখিয়া লইব' বলিয়া যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হুম্‌কি দিয়াছিলেন, তিনি এখন নীরব।

দেখা যাইতেছে যে কেন্দ্রীয় সরকার পরোক্ষে স্বীকার করিয়া লইলেন যে ১৯ সেপ্টেম্বরের ধর্ম্মঘট 'বে-আইনী' বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকিলেও উহাতে যাহারা যোগ দিয়াছিল তাহারা ক্ষমার্হ। ইহার পর যদি আবার কোনও ধর্ম্মঘট হয়,—হইতে কোনও কারণের অভাব হইবে না,—তাহাতে যাহারা যোগ দিবে, তাহারা ক্ষমাশীল কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীদের বাৎসল্যের কথা স্মরণ করিয়া আরও অধিক সক্রিয়ভাবে ধর্ম্মঘট করিতে পারিবে।

ক্ষমা মানুষের আধ্যাত্মিক মনোভাবের একটি প্রকাশ; রাজনীতি ও প্রশাসন ব্যাপারে উহার প্রয়োগ অত্যন্ত সংযমের সহকারে করিতে হয়। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারীরা কতকগুলি দাবী লইয়া আবেদন নিবেদন করিতেছিল; ঐ দাবীগুলি অযৌক্তিক

একথা সরকার কখনও বলেন নাই। পরন্তু 'আজ নয়, কাল' বলিয়া কালহরণ করিতেছিলেন। এই মনোভাব অসংযমের পরিচায়ক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার শীর্ষস্থানীয়দের ভিতর পারস্পরিক রেষারেষির সংবাদ সুবিদিত। স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী চৌহানকে অপদস্থ ও লোকসমাজে হাস্যাস্পদ করিবার সুযোগও হয়ত কেহ কেহ লইয়া থাকিবেন। ইহার কোনটাই সুস্থ রাজনৈতিক কাজ নহে।

ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার 'অপরাধে' যাহাদের উপর সাস্‌পেন্‌শন আদেশ হয়, তাহারা ১৯ সেপ্টেম্বর হইতে তাহাদের বেতন পাইবে। এই বকেয়া টাকার পরিমানও কম নহে। কাজ না করিয়াই তাহারা টাকাটা পাইবে। কাজ না করিলেও কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়া থাকে, এইরূপ কথাও লোকে বলিতে পারিবে।

ধানের দাম কম দেওয়া

বাঁকুড়া বীরভূম ও বর্ধমান জেলাগুলি হইতে সংবাদ পাইতেছি যে চাষীরা ফুড্‌ কর্পোরেশন এবং চালকল মালিক-দের নিকট ধান বিক্রয় করিয়া সরকারী নির্ধারিত মূল্য পাইতেছে না। ধানে ঘাস বা ধুলা আছে এই অজুহাতে চাষীকে শুধু কম দামই দেওয়া হইতেছে না, কুইন্টাল পিছু তিন বা চার কিলোগ্রাম করিয়া ওজন বাদ দেওয়া হইতেছে। চাষীরাও, স্বল্পবিত্ত বলিয়া এবং অনন্যগতি হইয়া, মূল্যে এবং ওজনে এই বঞ্চনা স্বীকার করিয়া লইতেছে।

এবার সাড়ে চারলক্ষ টন ধান সংগ্রহ করিবেন বলিয়া সরকার স্থির করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই, ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত সময়ে ৮৫ হাজার টন সংগৃহীত হইয়াছে। আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত সংগ্রহ চলিবে, দুই মাসেই এতোটা পরিমাণ গুদামে তুলিতে পারিয়া সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষ ইহাতে উল্লসিত হইয়াছেন; এবার ফসল ভালো হইয়াছে, অভীপ্সিত পরিমাণ সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হইবে না বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন।

চাষীদের মধ্যে অধিক পরিমাণ ফসল যাহারা উৎপাদন করে, তাহাদের কথা আলাদা; অল্পবিত্ত চাষী ও ক্ষেত-মজুরের পক্ষে চাষের পর বিক্রয়লব্ধ টাকার সম্বৎসরের খরচা বহন করা সম্ভবপর নহে, এই সত্য স্বীকার করিয়া তাহাদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। বক্তৃতা পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা প্রকাশ ছাড়া কাজের কিছুই এই দিক দিয়া করা হইতেছে না। চিরকাল অনটনের মধ্যে থাকিতে দিলে মানুষ অমানুষে পরিবর্তিত হয়। শতকরা ৮০ জন লোক যেখানে চাষের উপর নির্ভরশীল সে দেশে কোনও 'উন্নয়ন মূলক' ব্যবস্থাই সফল হইতে পারে না।

চাষীকে তাহার ন্যায্য-প্রাপ্য দিতেই হইবে। অল্প-মূল্যে ধান খরিদ করিয়া ফুড কর্পোরেশন বা চালকলের মালিকরা কম দামে চাল বিক্রয় করিবেন, এরূপ কোনও ঘোষণার সংবাদ আমরা পাই নাই। সুতরাং বাড়তি মুনাফা উঁহারাই পকেটস্থ করিবে। ফুড কর্পোরেশনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিলে বা চালকল মালিকের সম্পত্তি বৃদ্ধি হইলে জাতীয় ঐশ্বর্য বাড়িবে না। ধানের দাম কম দিলেই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যায় না, নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিও রোধ করিতে হয়। ভেজাল তেল, জালী কাপড়, রকমারী সাইজের ফুলস্কাপ কাগজ, কাপড় কাচা ভেজাল সাবান প্রভৃতির মূল্য কমানোর দিকে তো কাহারও নজর দেখি না!

ধান্যক্রয়ে সরকারী সাহায্য

অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে (২৬ জানুয়ারী) চাষীদের নিকট হইতে ধান্যক্রয় করিয়া গুদাম জাত করিবার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের ধানকল-ওয়ালারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে কর্জ পাইতে পারিবে। খাদ্যশস্য ক্রয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত কয়েক বৎসর যাবৎ কড়াকড়ি নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, ফলে খাদ্যশস্য সস্তার বাজারে ক্রয় করিয়া পরে কালোবাজারে এবং বেশী মুনাফায় বিক্রয় করিতে অসাধু ব্যবসায়ীদের অসুবিধা হইতেছিল; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দাদননীতি শিথিল হইবার ফলে সেই অসুবিধা দূর হইল। এবার প্রচুর ফলন হওয়ায় যাহারা চাল অতঃপর

দরে পাইবার আশা করিয়াছিলেন তাহারা নিরাশ হইবেন।

ফুড কর্পোরেশনই ধান কিনিবার একাধিপত্য পাইলে উপরোক্ত কালোবাজারী ও মুনাফালুটের সম্ভাবনা থাকিত না।

খনিজদ্রব্যের রপ্তানী

ভারত হইতে প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণ খনিজদ্রব্য রপ্তানী হইয়া থাকে। ম্যাঙ্গানিজ্, ক্যায়ানাইট্, অভ্র প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যপ্রধানত: আকরধাতুরূপেই রপ্তানী হয়। অভ্র উৎপাদনে ও রপ্তানীতে ভারত পৃথিবীতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু কেব্ রিকেটেড্ ও ফিনিশ্ড্ অভ্রের পরিমাণ অভ্রের মোট রপ্তানীর পরিমাণে ৭.৫ শতাংশ মাত্র। অথচ অভ্রের ফিনিশ্ড্ মাল এদেশে তৈরী করিবার অন্তরায় বিরাট কিছু নয়। মাইকানাইট্ শীট্, মাইকা পাউডার, কন্‌ডেন্সার প্লেট প্রভৃতি এদেশেই তৈরী হইতে পারে; এই দ্রব্যগুলির আন্তর্জাতিক চাহিদা প্রচুর।

এদেশে সেপারেটিং ও স্মেল্টিং প্ল্যান্ট্ ও অন্যবিধ প্রসেসিং কারখানা স্থাপিত করিয়া খনিজ পদার্থগুলিকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত-করণ হইলে উহা রপ্তানী করিয়া ঢের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হইতে পারে। ক্যায়ানাইট্ তো প্রায় বিরল খনিজদ্রব্য। উহার নিষ্কাশনের প্ল্যান্ট্ হয় না কেন?

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৮-শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৭৫

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার নূতন শাসন ব্যবস্থা

যুক্তফ্রন্ট নির্ব্বাচন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া নূতন মন্ত্রী-সভা গঠন করিয়া রাজ্য শাসন কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। শাসনভার ফিরিয়া পাইলে যুক্তফ্রন্ট যাহা যাহা করিবে তাহার তালিকাটি দীর্ঘ এবং কোন কোনটি বিশেষ কঠিন কার্য্য। যথা রাজ্যশাসনকার্য্যে ন্যায়, সুবিচার, সুনীতি ও সুশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা। ইহা বলিতে ও শুনিতে সহজ হইলেও বিশেষ কষ্টসাধ্য। কারণ দুর্নীতি, অন্যায় ও অবিচারের মূল অনুসন্ধান করিলে আমাদিগকে মুসলমান নবাবী আমলে ফিরিয়া যাইতে হয় ও ঐ সকল সমাজ-বিরুদ্ধতা কে, কোথায়, কি ভাবে ও কতটা করে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে মুসলমান হইতে বৃটিশ ও তৎপরে কংগ্রেস রাজত্বে আসিতে হয়। খাদ্যে ভেজাল, দুধে জল মিশান, উৎকোচ গ্রহণ ও দান, অন্যায়ভাবে উপযুক্ত পাত্রকে প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া অনুপযুক্তকে তাহা দেওয়া, সকল কার্য্যে পক্ষপাত; শিক্ষা, চিকিৎসা আদালতে বিচার ও রাজস্ব নির্দ্ধারণ বিষয়ে অবিচার বিলম্ব ও যথেচ্ছাচার; পথেঘাটে অসভ্যতা, সর্ব্বত্র চুরি ডাকাতি, রাহাজানি; ক্রয় বিক্রয় ও অপরাপর ক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা, মাপে ও মূল্যে মিথ্যার প্রচলন, অসম্ভব উচ্চ-হারে সুদ লওয়া; বিক্রেতা ও শ্রমিককে যথাযথ মূল্য বা মজুরী না দেওয়া; অন্যায় ভাবে লাভ করিবার চেষ্টা; টাকা লইয়া কাজ না করা. হাল্লা হাঙ্গামা করিয়া প্রাপ্যের অতিরিক্ত আদায় চেষ্টা—এ সকল সামাজিক স্বাস্থ্যহীনতার বহুমুখী ও বহুধাবিভক্ত অভি-ব্যক্তির অপসারণ শীঘ্র ও সহজে হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। যে সকল দুষ্কার্য্যে দেশের মানুষ দুই চারিশত

বৎসর জড়িত আছে, তাহাদিগকে এ সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া নূতনভাবে সত্যের ও ন্যায়ের পথে চলিতে শিখান অতি দুরূহ হইবে বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং বড় বড় কথার প্রতিশ্রুতি ছড়াইলে লাভ অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনাই অধিক। কংগ্রেসী শাসনকালে যাহারা অন্যায় করিয়াছে সকলকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থাও করা হইবে বলা সহজ কিন্তু কার্য্যকরী নহে; কারণ অসংখ্য লোকের অসংখ্য দুষ্কর্ম প্রমাণ ও সাক্ষীসুদ্ধ দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের শাস্তির আয়োজন সাধারণ কার্য্য নহে। এবং যাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করে তাহারা সচরাচর কোন প্রমাণ না রাখিয়াই চলে। এই কারণে উপযুক্তভাবে অনুসন্ধান করিয়া অন্যায়-কারীগণকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে সেই কার্য্যের জন্য একাধিক বিশেষ কর্ম্মক্ষম ও বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির প্রয়োজন হইবে। সেইরূপ লোকবল আছে কি না তাহা আমরা জানি না। যতটা মনে হয় অনুসন্ধান করিবার লোক পাওয়া কঠিন হইবে। প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া উপযুক্তভাবে অভিযোগের বিষয় সাজাইয়া আদালতে উপস্থিত করাও সহজ হইবে না। অভিযোগ করিয়া আদালতে প্রমাণ করিতে না পারা অত্যন্তই ক্ষতিকর হইবে এবং সেই কারণে সহজে আদালতে যাওয়া চলিবে না। কি হইবে তাহা অবশ্য আমরা জানি না; কিন্তু বহু ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিয়া সাজা দেওয়া সহজ হইবে না তাহা আমরা ঠিকই বুঝিতে পারি। সমাজের সকল লোকের নিকট অপরাধীদিগকে সাজা দেওয়া হইবে কথাটা আশার কথা; কিন্তু সাজা দিতে সক্ষম না হইলে তাহার ফল বিশেষভাবে অভিযোক্তাদিগের যশহানীকর হইবে।

যে সকল অন্যায়, অবিচার, সমাজবিরুদ্ধতামূলক ও জন-অহিতকর কার্য্য রাজত্ব পরিচালনার নামে অহরহ সর্ব্বত্র হইতেছে সেই সকল কার্য যাহাতে না করা হয় তাহার চেষ্টা আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে না এবং করা হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। পুলিশ, আদালত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাট যানবাহন সংরক্ষণ, উপযুক্ত মূল্যে যথেষ্ট খাদ্য সরবরাহ, অবাস গৃহাদির ব্যবস্থা করা, সকলের উপার্জ্জন করিবার সুবিধার সৃষ্টি প্রভৃতি বহু কার্য্য না করিলে রাষ্ট্র ঠিকভাবে চলিবে না। এই সকল কার্য্য করিতে হইলে মহা আয়োজন, কর্ম্মতৎপরতা, ও সততার আবশ্যক। তাহা যদি থাকে বা তাহার ব্যবস্থা করা যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে সেই চেষ্টা অন্ততঃ আংশিক ভাবেও সফল হইতে পারে। ক্রমে ক্রমে বুঝা যাইবে যে ঐ প্রকার কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে কিনা। কারণ শুধু সৎ ইচ্ছা থাকিলেই সৎকার্য্য সম্পন্ন হয় না। উপযুক্ত অর্থ, কর্ম্মী, জনগণের সহায়তা প্রভৃতি বহুকিছু না থাকিলে ঐ রূপ সংস্কৃতি প্রচেষ্টা সম্ভব হয় না। নূতন রাষ্ট্রীয় দলগুলি জয়যুক্ত হইয়াছে বলিয়াই জাতির স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলা চলে না। ধর্ম্ম ও নীতি-বোধ হঠাৎ বিশেষভাবে বাড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। এবং সেই কারণেই মনে হয় অকস্মাৎ দেশের কর্ম্মপ্রচেষ্টা নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিবে না। সরকারী সকল কার্য্যে যে প্রকার ইচ্ছাকৃত বিলম্ব, মানুষকে বিপর্যস্ত করা, ঘুষ আদায়, অন্যায়ভাবে চাপ দেওয়া, পক্ষপাত প্রভৃতি নানাপ্রকার সুশাসন বিরোধী ধরণধারণ আজ বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার কোন পরিবর্ত্তন হঠাৎ হইবে কি? জন-সাধারণের দিক হইতে যে সকল অন্যায় হইয়া থাকে তাহারও কি অবসান আশা করা যাইতে পারে? অর্থাৎ বিনা টিকিটে ট্রামে-বাসে-ট্রেনে যাতায়াত, কালো বাজারে মাল বিক্রয়, দুধে জল মিশান কিম্বা পরীক্ষা-স্থলে বই দেখিয়া বা অপরকে জিজ্ঞাসাতে উত্তর লেখা ইত্যাদি কি আর কেহ করিবে না? অল্পবয়স্কদিগের মধ্যে যে সকল অপরাধপ্রবণতা দেখা যায় তাহা কি ক্রমশঃ ন্যায়ের আবহাওয়া বহিতে শুরু করিয়া নিবৃত্তির পথে চলিতে আরম্ভ করিবে? একটা নূতন ন্যায় ও সত্যের যুগের কি এইবার আরম্ভ হইবে? কিম্বা হাঙ্গা হাঙ্গামা, লুটপাট, মারপিট ও সকল প্রকার আইন লঙ্ঘন ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া "বিশ্বব্যাপী মহা বিপ্লবকে" বাংলার আরও নিকটে আনিয়া ফেলিবে? কোন কোন

রাষ্ট্রনেতা ঐ রক্তস্নাত বিপ্লবের কথা প্রায়ই আওড়াইয়া নিজ নিজ আদর্শবাদ সতেজ রাখিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সাধারণ ছাপোষা জনসাধারণ সমাজের রক্তাক্ততা বৃদ্ধির জন্য ভোট দিতে যান না। ভাল খাদ্য বস্ত্র আবাসগৃহ শিক্ষা চিকিৎসা সস্তায় পাওয়া ও উপার্জ্জন বৃদ্ধিই ভোটদাতাদিগের লক্ষ্য। কোন রক্তসিঞ্চিত অবস্থা তাহাদিগের লক্ষ্য নহে। সামাজিক সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রয়োজন ভোগ্যবস্তু উৎপাদন কার্য্য সবল ও ব্যাপক করিয়া তোলা। সামাজিক শ্রমশক্তির পূর্ণ ব্যবহার এবং সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও সুনীতির প্রতিষ্ঠা। নূতন মন্ত্রীসভা তাহার চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কারণ বর্ত্তমান যুগে যে রক্তাল্পতা সকল মানুষের শরীরেই দেখা যাইতেছে তাহার প্রতিকার বিপ্লবের দ্বারা হইতে পারে না। ভোগ্যবস্তু উৎপাদন যদি যথেষ্ট না হয় এবং সেই উৎপাদনের অভাব বা অল্পতা যদি তথাকথিত শ্রেণী-সংগ্রামের ফলেই হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ করা না যায়, তাহা হইলে সমষ্টিবাদ অবলম্বন করিলেই খাদ্য বস্ত্রের অভাব দূর হইবে বলিয়া আশা করা যাইবে না। হয়ত দেখা যাইবে যে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে রক্তাক্ত অথবা জলীয়, কোন প্রকার বিপ্লবেরই প্রয়োজন হইবে না; বিপ্লববর্জ্জিত, শান্তিপূর্ণ, ব্যক্তিগত ও সামাজিক প্রচেষ্টার মিলিত ব্যবহারেই ঐ সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে। এবং তাহা জাতির ভিতরের জনশক্তি ব্যবহারেই হইতে পারিবে। তাহার জন্য বাহিরের কোন বিদেশীর সাহায্য গ্রহণ করার আবশ্যক হইবে না অথবা জাতির মধ্যেও পরস্পর বিরোধকে প্রবলতর করিয়া তুলিতে হইবে না। প্রয়োজন হইবে অন্যায়ভাবে কেহ কাহাকেও যাহাতে শোষণ করিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করার ও কোন কার্য্য না করিয়া কার্য্যাতিরিক্ত ভোগ নিবারণ ব্যবস্থার। ইহার জন্য সাধারণ রাষ্ট্রীয়শক্তির সাধারণ ব্যবহারই যথেষ্ট। যুদ্ধবিগ্রহ বিপ্লব ও মাথা কাটাকাটির প্রয়োজন না হওয়াই স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। সুতরাং যাঁহারা বাম অথবা দক্ষিণ পন্থা অনুসরণের নামে এক জাতির মধ্যে বহু দলের সৃষ্টি করিয়া নিজেদের প্রভুত্ব অপর সকল ব্যক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের পক্ষে উচিত হইবে জাতির মধ্যে দলাদলি যাহাতে ক্রমশঃ কমিয়া যায় ও মিলিত চেষ্টা ক্রমবর্দ্ধনশীল হয় তাহারই চেষ্টা করা। দলাদলি করিয়া আজ বাঙ্গালী তাহার কর্ম্মশক্তি নষ্ট করিয়া সর্ব্বক্ষেত্রেই ক্রমে ক্রমে অবনতির শেষ সীমায় পৌঁছাইতে বসিয়াছে। এই দলাদলির জন্য সর্ব্ববিধ আদর্শের অবতারণা করা হইয়া থাকে। প্রায় বেশীর ভাগ আদর্শই যতটা মনে হয়, জাতীয়ভাবে বিশেষ কার্য্যকরী নহে। চুলচেরা বিচার করিলে কোন দুই ব্যক্তির মতই এক হইতে পারে না; আবার মূল বিশ্বাস কি তাহা দেখিলে বহু পার্থক্যই ঐক্য লাভ করে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন অনেকটা মানুষের পার্থক্য বা ঐক্য সৃষ্টির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইহার ভিতরে অবশ্য লাভ লোকসানের কথা কখন কখন থাকে। লাভের উৎস কোথায় তাহা সহজজ্ঞাত নহে। দল বদল অথবা নব নব মিলিত মহাদলের সৃষ্টি হইতেই মনে হয় লাভের কথা আছে। রাষ্ট্রীয়শক্তি হস্তগত করিলে সকল মানুষই যে ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টা করেন এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। কোন কোন মানুষ আছেন যিনি নিজের ক্ষতি করিয়াও জনহিত চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু সেইরূপ মানুষ বহু সংখ্যায় আছে বলিয়া মনে হয় না। অধিকাংশ মানুষই লাভের আশায় রাষ্ট্রক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং শক্তি লাভ করিতে পারিলে লাভের চেষ্টাও করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্রক্ষেত্রের দলাদলি এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রের প্রতিযোগীতার কোথাও কোথাও বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। একটি সাদৃশ্য এই যে ব্যবসাদার যতই সাধারণের সেবা ও অল্পমূল্যে মহা উৎকৃষ্ট বস্তু সরবরাহের কথা বলুন না কেন, তাহার ভিতরের আবেগ সর্ব্বদাই আত্মসেবা ও নিজের লাভেই নিবিষ্ট থাকে; এবং সেইমতই রাষ্ট্রক্ষেত্রের নায়কগণ সর্ব্বদাই জনহিতের বিষয় জোর

গলায় বলিলেও তাঁহাদের নিজেদের হিতই শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে। এই কারণে বুদ্ধিমান লোকে কখনই রাষ্ট্রনেতা অথবা ব্যবসাদারদিগকে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কিছুটা অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, রাষ্ট্রনেতাগণ কতভাবে নিজ নিজ লাভের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বাড়ী, গাড়ী, ভ্রমণ আতিথ্যগ্রহণ, ইত্যাদির কথাত আছেই। ইহার উপরে আছে নিজ নিজ সেবায়েতদিগের জন্য চাকুরী, কন্‌ট্রাক্ট লাইসেন্স প্রভৃতি সংগ্রহ করা ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে নিজের লোকের জন্য ট্যাক্সি, বাস প্রভৃতি জোগাড় করিয়া দেওয়া। বৃহৎ বৃহৎ কর্ম্মে বিদেশী-দিগের সহিত সংযোগ ঘটিলে কোন কোন ব্যক্তির বিদেশেও তহবিল গঠিত হইয়া উঠে। যতটা রটে ততটা হয়ত ঘটে না, কিন্তু কিছু কিছু যে ঘটে একথা যাঁহারা রাষ্ট্রনেতাদিগের মহাভক্ত তাঁহারাও স্বীকার করিয়া থাকেন। কোন আদর্শবাদ মানিয়া চলিলে চরিত্রের উন্নতি হয় একথা গ্রাহ্য হইলেও আদর্শ আওড়াইলেই তাহা মানা হয় না। অর্থাৎ যাঁহারা মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ মহাপাপ বলিয়া প্রচার করেন তাঁহারাও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে শোষণ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া ফেলিতে পারেন। কেহ কেহ করেন বলিয়াও দেখা যায়। অবশ্য বাড়াবাড়ি না করিলেই জনসাধারণ খুসী থাকিতে পারে। ইহার কারণ তাহারা কোন সময়েই, বিশ্বাস করে না যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত কোন মানুষই পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও নির্লোভ হইতে পারে।

পাকিস্থানে পরিস্থিতি

কিছুকাল পূর্ব্বে পাকিস্থানের একাধিপতি আয়ুব খানের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই বিষয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানে ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বে সমালোচনা, বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনমত গঠন ও তৎসঙ্গে দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদির সূচনা হয়। পাকিস্থানের ভূতপূর্ব্ব আন্ত-র্জাতিক সম্বন্ধরক্ষক জুলফিকার আলি ভুট্টো সম্ভবত অতঃ-পর ঐ দেশের রাষ্ট্রপতি হইবার আশায় নিজ গুরু আয়ুব খানকে বলি দিবার ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ সঙ্গে পাকিস্থানের বিমান সেনাপতি আসগর খানও আয়ুব নিপাত কার্য্যে লাগিয়া পড়েন। পূর্ব্ব পাকিস্থানের কয়েকজন আয়ুব-বিরোধি নেতা বহু পূর্ব্ব হইতেই রাষ্ট্রপতি আয়ুবখানের রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য প্রাণপাত করিতেছিলেন। আসগর খান ব্যতীত অপর সকল বিরুদ্ধাচারীকে আয়ুবখান কারাগার বন্ধ করেন ও বিক্ষোভ-প্রদর্শকদিগের উপর লাঠি, কাঁদুনে বাষ্প ও গুলি চালাইবারও ব্যাপকভাবে হুকুম দেন। কিন্তু হাঙ্গা হাঙ্গামা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিতে থাকে এবং ইসলামাবাদ হইতে ঢাকা অবধি কোথাওই শান্তির চিহ্নমাত্র থাকে না। এই অবস্থায় পৃথিবীর সকল লোকেই এ-কথা বুঝিতে আরম্ভ করে যে পাকিস্থানে একটা রাষ্ট্রপতি পরিবর্ত্তন না হইয়া যায় না। আয়ুব ভিতরে ভিতরে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে একটা কথা অনেকেই ভাবেন যে আয়ুব নিজে সরিয়া দাঁড়াইলেও আয়ুব সমর্থক উলেমাগণ ও জমিদার-বৃন্দ নূতন কোন এমন শক্তিকে বাড়িতে দিবে না যাহাতে তাহাদিগের প্রভুত্বও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। আসগর খান উলেমা ও জমিদারদিগের সমর্থিত কিনা তাহা জানা যায় নাই। ভুট্টোকে কে চাহে তাহা সম্ভবত ভুট্টোও জানে না, কিন্তু মনে হয় ভুট্টো বর্ত্তমানে কম্যুনিষ্ট সাজিয়া ছাত্রদিগকে ও পূর্ব্ব পাকিস্থানীদিগকে দলে টানিবার চেষ্টা করিতেছে। পাকিস্থানের পুরাতন চীনা-প্রীতি ও নবলব্ধ রুশের প্রতি ভালবাসা এখন কি ভাবে একা-ধারে জাগ্রত থাকিতে পারিবে তাহাও একটা সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র একটা কথাই পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তাহা হইল আয়ুবের যুগাবসান।

আয়ুব এই কথা বুঝিয়া কিছুদিন আগে জনসনের কায়দায় বিশ্ববাসীকে জানাইয়া দিয়াছেন যে তিনি আর পাকিস্থানের রাষ্ট্রপতি থাকিতে ইচ্ছুক নহেন ও নূতন নির্ব্বাচনে তিনি ঐ পদপ্রার্থী হইবেন না। তিনি আরও তাঁহার বিরুদ্ধবাদী সকল ব্যক্তিকেই কারাগার হইতে

নিস্কৃতি দিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের সহিত মেলা-মেশা আরম্ভ করিয়াছেন। অর্থাৎ এখন আয়ুব-বিরোধীদিগের মধ্যে কিছু কিছু লড়ালড়ি চলিবে, কে রাষ্ট্রপতি হইবে তাহা লইয়া। এই গোলমালে হয়ত আয়ুবের সমর্থিত কোন ব্যক্তিই রাষ্ট্রপতিত্ব প্রাপ্ত হইবেন এবং পাকিস্থানে সাধারণতন্ত্র আরো বর্দ্ধিত সংখ্যক নির্ব্বাচকের দ্বারা চালিত হইলেও আয়ুবশাহির শেষ হইবে না। কম্যুনিষ্ট-আদর্শেও রাষ্ট্রীয় দলের নেতাগণের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। উহা সাধারণতন্ত্র নহে। ভুট্টো অথবা পূর্ব্ব পাকিস্থানের কোন নেতার ইচ্ছায় পাকিস্থান শাসিত হইলে এবং তাহাতে কম্যুনিজম মিশ্রিত থাকিলে পাকিস্থানের বাসিন্দাগণ স্বাধীনভাবে নিজদেশের উন্নতি-সাধন করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। চীন ও রুশিয়া একমত হইয়া পাকিস্থানকে সাহার্য্য করিবে ইহাও ঘটিবে না। আমেরিকা টাকা দিতে থাকিবে, নহিলে পাকিস্থানের অবস্থা সঙ্গীন হইবে। কি সর্ত্তে টাকা আসিবে তাহা জানা কঠিন। সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া ইহাই মনে হয় যে, পাকিস্থান যেরূপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানা সহায়কের সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজ সুবিধা সাধন করিত, এখনও তাহাই করিতে থাকিবে। ভিতরের নেতৃত্বের কোন বিশেষ মূল্য থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। আয়ুব থাকিলেও অবস্থাটা ঐ প্রকারই ছিল। কারণ যদিও আমরা ভাবিতে পারি যে, আয়ুব পাকিস্থানের একক মালিক তাহা হইলেও একথা ভুলিলে চলিবে না যে আয়ুব আমেরিকা, রুশিয়া, বৃটেন ও চীনের হুকুমে চলিতেছিলেন ও এখনও চলিতেছেন। কি ভাবে এই অপরূপ ও বিচিত্র প্রভুত্ব চালিত আছে তাহা সহজ-বোধ্য নহে। কারণ এই সকল প্রভুরাও কতটা পরস্পর বিরোধে নিমগ্ন ও কতটা গুপ্ত চক্রান্তে জড়িত তাহা কেহ জানে না। জানিতে পারেও না।

আয়ুব শাহির স্বরূপ

ভারতবিভাগ যখন হয় নাই তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ ভারতের উপর নিজেদের প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিবার জন্য হিন্দু মুসলমান বিভেদ প্রকটতর করিয়া তুলিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিত। সেই চেষ্টার ফলে এই দুই ধর্ম্মের অনুসরণকারী লোকেরা কলহ-বিবাদ করিতে আরম্ভ করে ও পরে তাহারই ফলে বৃটিশদিগের ভারতবিভাগ করা সহজ হয়। বিভাগ করার উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ কোন সময় পুনর্ব্বার বৃটিশকর্ত্তৃক ভারত দখল করার আয়োজন ঠিক রাখা। কিন্তু পরে বৃটিশজাতি সাম্রাজ্যবাদ ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুদ্রতর বৃটেনের পরিকল্পনাকেই মানিয়া লইয়াছে ও এখন ভারত দখল করিবার আশা তাহারা আর পোষণ করে না। আমেরিকার সাম্রাজ্য-বাদ ছদ্মবেশী ও তাহা নানাদেশে নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া থাকে। ভারতে ও পাকিস্থানে তাহা যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন ও তাহার ফলে আমাদিগকে এখন বহুকালাবধি আমাদিগের জাতীয় উপার্জ্জনের একটা অংশ আমেরিকাকে দিতে থাকিতে হইবে। পাকিস্থান কি ভাবে কি দিবে তাহা আমরা জানি না। হইতে পারে কোন গুপ্তচুক্তি আছে যাহা স্বাধীনতা হ্রাসকর। চীন বা রুশিয়া অর্থ দেয় নাই অস্ত্রও বিশেষ দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং পাকিস্থানের চীন ও রুশিয়ার সহিত গভীর ঘনিষ্ঠতা একটা অভিনয় মাত্র হইতে পারে। তাহা পাকিস্থান নিজ বুদ্ধিতে করিয়াছে অথবা আমেরিকা ও বৃটেনের প্ররোচনায়; একথারও নিশ্চয় উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। আয়ুবখানের রাজত্বকালে সকলপ্রকার মিথ্যা অভিনয় সহজ হইয়াছে। কারণ যাহাই করা হইয়াছে তাহা লিখিত ও প্রকাশ্য-ভাবে করা হয় নাই। গুপ্তচুক্তি ও অপ্রকাশিত সর্ত্ত অনুসারে টাকাকড়ির লেনদেন একাধিপতির রাজ্যেই যথাযথভাবে চলিতে পারে। স্বাধীন মতামত প্রকাশ প্রশ্নের ও অনুসন্ধানের অধিকার, বহুসংখ্যায় নির্ব্বাচক-দিগের প্রতিনিধিচয়ন ও তাহাদিগের দ্বারা রাজ্যশাসন ইত্যাদি থাকিলে কোন কথাই গোপন থাকে না। এই অবস্থার বাহ্যিক পরিবর্ত্তন প্রচারিত হইলেও সত্যই কোন পরিবর্ত্তন হইবে কি?

প্রদেশের শাসনক্ষমতা

আজকাল প্রায়ই শুনা যায় যে, প্রদেশগুলির রাষ্ট্রীয় কার্য্য ক্ষমতা যথেষ্ট না থাকায় প্রদেশের শাসকগণ জনহিত যতটা করিতে পারিতেন তাহা করিতে পারেন না। অর্থাৎ যদি আরও নানাপ্রকার কার্য্যক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে প্রদেশ-শাসকগণ ভারতের অশেষ উন্নতি করিতে পারিতেন। সকল প্রদেশের সকল শাসকগণই প্রায় একই চরিত্রের লোক। ব্যক্তি ব্যক্তিতে পার্থক্য থাকিলেও সকলকে একত্র করিয়া বিচার করিলে চরিত্রগত পার্থক্য অল্পই লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ কেহ কংগ্রেস কেহ কম্যুনিষ্ট বা আর কিছু হইলেও মোটামুটি কর্ম্মশক্তি, নীতি জ্ঞান, কথা ও কার্য্য সমান সমান হওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়া সকলের স্বভাব অনেকটা একই রকমের বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ক্ষমতা না থাকার জন্য সৎকার্য্য করিতে না পারার কথাটা ততটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। কারণ যে সকল ক্ষমতা আছে তাহাই যদি ঠিকভাবে ব্যবহৃত না হয় অথবা সর্ব্বক্ষেত্রেই যদি গাফিলি, পক্ষপাত, সুবিধাবাদ ও ব্যক্তিগত লাভের চেষ্টা দেখা যায়, তাহা হইলে ক্ষমতাবৃদ্ধি এ সকল দোষ দূর করিবে বলিয়া আশা করিবার কোন হেতু থাকিতে পারে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার ব্যবস্থা, পাঠ্য পুস্তক, পরীক্ষার পন্থা, শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করা, ছাত্রদিগের চরিত্র, কৃষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নততর করা প্রভৃতি সকল কার্য্যের ক্ষমতাই প্রদেশের হস্তে আছে। কাজগুলি হওয়াতে বাধা কোথায়? হাসপাতাল, চিকিৎসক, ঔষধ, সেবা ও পথ্য সকল কিছুই ঠিকমত পরিচালিত হইলে রোগীদিগের বহু সুবিধা হয়। ঠিক ব্যবস্থায় কোন কিছু চলেনা কেন? ক্ষমতার অভাব আছে বলিয়া কি? রাস্তা-ঘাট হয় নাই নয়ত থাকিলে ভাঙ্গিয়াচুরিয়া নষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে। কেহ কিছু করে না। কেন ক্ষমতার অভাবের জন্য কি? জাল, ভেজাল, দুধে জল মিশান বন্ধ করিতে কোন ক্ষমতা আবশ্যক? বন্ধকরা হয় না কেন? পুলিশের কার্য্য ঠিকমত চলে না কেন? চুরি, ডাকাতি, পকেটমার, প্রবঞ্চক এই সকল অনায়াসে চলিতেছে কেন? এই সকল ক্ষেত্রে দমন ও সংস্কার হইতে বাধা কি? অতিরিক্ত ক্ষমতা পাইলে কি হইবে? যাহারা চার আনার ক্ষমতা হাতে পাইলে ছয় আনা পরিমাণ তাহার অপব্যবহার করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ক্ষমতা দিলে কি হইবে? হয়ত শুনিব আমরা আগের লোকেদের মত নহি; আমরা নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত ইত্যাদি। কিন্তু আমরা ভাবি একই জাত, একই ধাত একই চরিত্র, একই ধরণের উচ্চ আদর্শ—তফাৎ হইবে কি করিয়া? গান্ধীবাদ কি অপরাপর আদর্শ হইতে কিছু নিম্নস্তরের আদর্শ? গান্ধীবাদীগণ যদি সুনীতির পথ ছাড়িয়া উল্টা পথে চলেন তাহা হইলে অন্যান্য মহাপুরুষদিগের অনুসরণকারীগণকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? এই কারণে ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা মহোৎসাহে মানিয়া লইতে ভয় হয়। বৃদ্ধি সম্ভবত রাজস্ব বৃদ্ধির সহিত গভীর বন্ধনে আবদ্ধ। টাকা অধিক থাকিলেই কাজ ভাল হইবে একথা কেহ বলিতে পারে না। অনেক সময়েই উল্টা হয়। ধন ঐশ্বর্য্য সর্ব্বদাই দুর্নীতি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। দারিদ্র্যই ধর্ম্মকে মানুষের নিকটে আনিয়া দেয়। অর্থ ব্যতীত অপর ক্ষেত্রের ক্ষমতা কোন প্রদেশ পাইতে পারে না। যথা দেশরক্ষা, আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ প্রভৃতি। এইগুলি বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাপার। তাহার কারণ এই বিষয়গুলি আঞ্চলিকভাবে বিচার করিলে মহা ক্ষতি হইতে পারে। কংগ্রেস শাসনে ভারতবর্ষ এক দেশ না থাকিয়া বহু পরস্পর বিরুদ্ধ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া জাতীয় ঐক্য অনেকাংশে হারাইয়াছে। ইহার মূল কারণ শাসকদিগের ক্ষমতার ও অন্য প্রকার লোভ। ক্রমাগতই শুনা গিয়াছে এই প্রদেশ চাহেন নিজ ভাষাকে উচ্চে উঠাইতে অথবা ঐ প্রদেশ চাহেন অপর কোন প্রদেশের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া অনেকটা ভূমি ও তৎসঙ্গে ব্যবসা কারখানা ইত্যাদি। কোন কোন প্রদেশ আরম্ভ হইতেই পরগাছার মত অপরের দেহে শিকড় প্রবিষ্ট করিয়া নিজ পুষ্টি সাধন করিয়া আসিয়াছে। এক কথায় আমাদের সম্মুখে যে বিরাট রাষ্ট্রসমস্যা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে তাহার মূল

কথা হইল এক ভারতবর্ষ থাকিবে না খণ্ড খণ্ড হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন ক্ষুদ্রকায় দেশসমষ্টিতে পরিণত হইবে? বলকানাইজেশন বলিয়া যে কথাটি আছে তাহার অর্থ হইল এক মহাদেশকে ভাঙিয়া টুকরা টুকরা করিয়া বহু খণ্ডদেশ গঠন। ভারতের যে প্রাদেশিক ক্ষমতা বৃদ্ধির আগ্রহ তাহা ব্যক্তিগত অথবা ব্যক্তিসমষ্টিগত আত্ম-প্রতিষ্ঠার দুরাকাঙ্খাজাত এবং তাহা বাড়িতে দিলে ভারত কখনও থাকিবে না। যে দোষে প্রাচীন কালে ভারত ক্ষুদ্রতর আফঘান, ইরাণী বা আরবি শক্তির নিকট পরাজিত হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল ও পরে দুইশত বৎসর ইংরেজের পদতলে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, আজ সেই পাপ আবার মাথা উঁচাইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই চাই আমরা তাই চাই, আমাদের এই দাবি, আমাদের তাই দাবি ইত্যাদি বাক্য প্রবল ধারায় সর্বত্র বর্ষিত হইতেছে। ইহার মূল কথা হইল স্বেচ্ছাচারের আগ্রহ। সংযম ও সংহতি দূর করিয়া কেহ কোন একটা মতলব হাসিল করিবার তাড়নায় গতিশীল; কেহবা অপর কোন অভিসন্ধি সাধন ইচ্ছায় উত্তেজিত। কোথাও কোথাও আবার বিদেশীর প্ররোচনা বর্তমান। যথা কাশ্মীরের পিছনে রহিয়াছে পাকিস্থান ও পাকিস্থানের পিছনে আছে আমেরিকা, বৃটেন, রুশ চীন। এই সকল জাতিগুলি ভারতকে শক্তিশালী হইয়া উঠিতে দিতে চাহে না। কারণ ভারত যদি এক হইয়া এক আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে পারে তাহা হইলে এশিয়াতে বিদেশীর অথবা এশিয়ার অন্তর্গত কোন জাতির একাধিপত্য স্থাপিত হওয়া কঠিন হইবে। সুতরাং ভারতকে খণ্ড খণ্ড করিবার আরম্ভের প্রেরণা বিদেশ হইতে আমদানি করা। এই কারণেই যাহারা ভিতরে ভিতরে অন্যদেশের গুপ্তচরের কাজ করে তাহারা নিজ দেশের ভিতরের মিল রাখিতে পারে না (চাহে না), কিন্তু বিশ্বমানবের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে তাহারা সহজেই পারে। ভিতরে পরস্পর বিরোধ ও বাহির হইতে খাল কাটিয়া কুমীর ডাকিয়া আনা যেখানে চলিয়া থাকে সেখানে দেশবাসীর উচিত বিরোধ-বাদী রাষ্ট্রীয় গণ্ডিগুলিকে কোনরূপেই শক্তি আহরণ করিতে না দেওয়া।

বর্তমানে যাহার যেটুকু ক্ষমতা আছে তাহাকে অগ্রে দেখাইতে হইবে যে, সে ঐটুকু ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিতে জানে ও করিতেছে। যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রক্ষণাবেক্ষন কার্য্য, পথঘাট মেরামত, জল সরবরাহ ও জলনিকাশ, চাষের উন্নতি, গোপালন, মৎস্যপালন, হাঁসমুরগী ফলমূল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া প্রথমে শাসকগণ দেখান তাঁহাদের কর্মশক্তি কতটা আছে। বড় বড় কথা পরে উঠাইলেই উত্তম। সামাজিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সমূলে উৎপাটিত করিয়া নূতন কিছু করিতে চাওয়াটা স্বেচ্ছাচারের আকাঙ্খাজাত। আমরা কাহারও স্বেচ্ছাচারের আকাঙ্খার দাস হইতে চাহিনা। বিশেষ করিয়া যদি মনে হয় যে, সে আকাঙ্খার উৎস অপর দেশের ও তাহা পরাধীনতার পূর্বাভাস মাত্র।

কত লোক দাঁড়াইলে কত জায়গা লাগে?

আমরা প্রায়ই শুনি যে রাস্তা দিয়া দশলক্ষ বা পাঁচ-লক্ষ লোক দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে অথবা কোন বড় ময়দানে এককোটি অথবা একলক্ষ লোক একত্র হইয়া সভা সমিতি করিয়াছে। এই সকল কথার মধ্যে সত্য যাহা তাহা পাওয়া যায় জনতার আকারে ও সংখ্যার মধ্যে। পঞ্চাশ হাজার এমন কি দশ হাজার লোক একত্র হইলেও তাহাকে বিরাট জনতা বলিতে হয়। কিন্তু পঞ্চাশ হাজারকে পাঁচলক্ষ বলিলে কথাটা অতিরঞ্জন-দোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। বস্তুত এই সকল আলোচনা শুনিয়া মনে হয় ঠিক কত লোক দাঁড়াইলে কতটা স্থান জুড়িয়া লোকে লোকারণ্য হয় এই কথার প্রকৃষ্ট উত্তর কি? একজন লোক যদি বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার চার হইতে দশ বর্গফুট জায়গা লাগে। হাঁটিয়া চলিলে আরও অধিক স্থান প্রয়োজন হয়। ধরা যাউক কাতারে কাতারে লোক চলিয়াছে কোন এক রাজপথ ধরিয়া। এই প্রকার মিছিলে পাশা-

পাশি চারজন অথবা ততোধিক লোক হাঁটিয়া চলে। একসারি লোক অপর সারির দুই তিনফুট তফাতে থাকে অর্থাৎ দশফুট জায়গায় হয়ত দুইসারি লোক থাকে। মানে সারি পিছু পাঁচফুট জায়গা লাগে। ইহাতে এক মাইল দীর্ঘ মিছিল হইলে তাহাতে ১০০০ সারি লোক চলে। চারজন পাশাপাশি চলিলে এক মাইলে চার হাজার লোক চলে। অধিক সংখ্যার সারি হইলে মোট সংখ্যা তদনুপাতে বাড়ে। তাহা হইলে যদি ধর্ম্মতলা ও চৌরঙ্গীর মোড় হইতে ওয়েলিংটনের মোড় ঘুরিয়া বহুবাজার অথবা হ্যারিসন রোড পর্য্যন্ত মিছিল চলে তাহাতে দুইতিন মাইলের দৈর্ঘ হয় ও জনসংখ্যা হয় আট হাজার, বার হাজার অথবা তাহার দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ হয়। হ্যারিসন রোডের মোড় হইতে চৌরঙ্গীর মোড় অবধি সারিসারি ছয়জন করিয়া হাঁটিলে প্রায় কুড়ি হাজার লোক হয়। কিন্তু অত দীর্ঘ মিছিল কখন হয় কি? পাশাপাশি চলেও সচরাচর চারজনের অনধিক সংখ্যক লোক। যাহাই হউক যদি শ্যামবাজারের মোড় হইতে চৌরঙ্গী অবধি লোক চলে তাহাতেও একলক্ষ লোক হয় কি? যাঁহারা গণনাবিশারদ তাঁহারা এ কথার সত্যতা বিচার করিতে পারেন।

বসিয়া থাকিলে মানুষের যা স্থানের প্রয়োজন হয় তাহাতে একটা বড় ফুটবলের মাঠে ঠাসাঠাসি বসিলে ৩০,০০০ লোক ধরে কিনা সন্দেহ। দুই তিনটা ফুটবলের মাঠ একত্র করিলেও এক লক্ষ লোক জমা হইতে পারে না। হইলে দম বন্ধ হইয়া বহু লোকের প্রাণহানি হওয়া সম্ভব। সচরাচর যেরূপ বিরাট জনসভা আমরা দেখি তাহাতে মনে হয় ২৫,০০০ হইতে পঞ্চাশ হাজার লোক কখনও একত্র হয় না। সুতরাং দশ বা বিশলক্ষের কল্পনা মানসক্ষেত্রেরই চিত্র, বাস্তবক্ষেত্রে তাহা কখনও দেখা যায় না। বাংলাদেশে যদি ৩৪ কোটি লোকের বাস ধরা যায় তাহা হইলে তাহা লক্ষ হিসাবে ৩০০।৪০০ লক্ষ বলা যায়। পঞ্চাশ হাজার মানুষ তাহা হইলে বাংলার জনসংখ্যার শতকরা হিসাবে ৬০০ বা ৮০০ শত মানুষের মধ্যে একজন মাত্র হয়। ইহাতে মনে হয় যে যদি ৫০,০০০ মানুষও একত্র হইয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া কিছু বলে তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, সেই জনমত সারা বাংলার জনমত।

নিক্‌সন্ ও অন্যান্যদিগের কথা

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিক্‌সন্ সফরে বাহির হইয়া বহুদেশ ঘুরিয়া নিজের নূতন রাষ্ট্রনীতি মূর্ত্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহার নূতন রাষ্ট্রীয় আদর্শ নূতন হওয়ার পথে বহু বিঘ্ন আছে। ইহার কারণ তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন তাহার প্রায় সব কিছুই পুরাতনের সহিত গভীরভাবে জড়িত আছে। যথা প্রথমতঃ ইয়োরোপে আমেরিকানদিগকে কেহই চায় না। কিন্তু আমেরিকান অর্থ পাইলে সকলেই লইতে চাহেন। ডি গ্যল মাঝে বৃটিশের সহায়তায় আমেরিকানদিগকে অপসৃত করিবার একটা চেষ্টা করেন, যদিও সে চেষ্টা সফল হয় নাই। বৃটিষগণ আমেরিকার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রে হাত দিতে রাজি না হওয়ায় বিষয়টা বিপরীতরূপ ধারণ করে। দ্বিতীয় সমস্যা রুশিয়া। রুশিয়া সাক্ষাৎভাবে কোন ঝগড়ায় না থাকিলেও তাহার পরোক্ষ দায়িত্ব অতি মারাত্মক; কারণ দীর্ঘকাল কম্যুনিষ্ট হইয়া থাকার ফলে পূর্ব্ব জার্ম্মানী গুরু অপেক্ষা অধিক কম্যুনিষ্ট আদর্শমগ্ন হইয়া পড়িয়া পশ্চিম জার্ম্মানীর সহিত সর্ব্ববিষয়েই মতে পার্থক্য দেখিতেছেন। বার্লিনে পশ্চিম জার্ম্মানী নির্ব্বাচন কার্য্য করিতে অধিকারী কিনা; কোন পথ দিয়া তাহারা বার্লিনে যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। রুশিয়া কিভাবে এই সকল দ্বন্দ্বের নিবৃত্তি চেষ্টা করিবে তাহার উপরেই ইয়োরোপের শান্তি নির্ভর করিবে। ইহার পর রহিয়াছে এশিয়ার পূর্ব্বের দেশগুলির ঝগড়া। আরব দেশগুলি রুশিয়ার আশ্রয়ে ও ইজরায়েল আমেরিকার সাহায্যে বসবাস করে। ইহাদিগের ঝগড়া যে কোন সময় একটা

এরপর ৭০৪ পাতায়

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

ঋষভচাঁদ

দুই সতীনের দুর্নিবার কলহের মত প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব চলে আসছে যুগ-যুগান্তর ধ'রে। প্রবৃত্তির পথে চলতে হবে, না নিবৃত্তির পথে? না প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমবায়ের পথে? মুখ্যতঃ এই তিনটা প্রশ্নই চিন্তাশীল মানুষের সামনে উপস্থিত হয় এবং একটা না একটা সমাধান তাকে খুঁজতে হয়।

অবশ্য অধিকাংশ মানুষ এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা এই দ্বন্দ্বের বিষয়ে তেমন সজাগ নয়। তারা চলে তাদের প্রবৃত্তির তাড়নায় (অবশং প্রকৃতের্বশাৎ—গীতা)। তারা অপরা প্রকৃতির কামনা-বাসনাকে নিজেদের কামনা-বাসনা মনে ক'রে তাদের তৃপ্তি-সাধনে রত থাকে। জন্মজন্মান্তর তারা এইভাবে অজ্ঞানময়ী ত্রিগুণা অকা প্রকৃতির অসহায় ক্রীড়নক হয়ে চলে। তারা বুঝতে পারে না যে তাদের কর্মপ্রবৃত্তি প্রকৃতির প্রবৃত্তি তাদের নয়। এ প্রবৃত্তি অন্ধ, উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল; তাদের চেতনাকে আঁধার ক'রে ক্ষণিক সুখ-দুঃখের চক্রাবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে তাদের বিনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে—বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি—গীতা।

আশার কথা এই যে এ অবস্থা চিরকাল থাকে না। পরিণামশীল জীবনমাত্রেই একদিন না একদিন এই সর্বনাশা গোলামির বিষয়ে সচেতন হয়। তার বুদ্ধির আঁধার কাটতে আরম্ভ করে এবং সে অনুভব করে কী নিদারুণ এই প্রকৃতির বশ্যতা! তার আত্ম-জাগৃতির উপক্রম হয়, তার চেতনা স্বচ্ছ হতে থাকে এবং সে কে, তার স্বরূপ কি, তার জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি, কোন্ পথে তার অভ্যুদয় ও মুক্তি, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল ও মর্মসত্য কি, এই সব প্রশ্ন তার মনে উঠতে আরম্ভ করে।

এই সব প্রশ্ন ওঠার আগেও তার প্রবৃত্তির দুর্ধর্ষ প্রবেগের কিয়দংশ প্রশমিত করতে বাধ্য হয়। এই সংযমন তার উপর আরোপ করে সমাজ ও তার নিজের অন্তর্নিহিত নীতিবোধ। সামাজিক জীব বলে সে সমাজের শাসন একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না। অস্বস্তিকর হ'লেও প্রবৃত্তির পথে এ একটা শুভঙ্কর প্রতিবন্ধক। তা ছাড়া সে যত হীনই হোক্ না কেন তার মধ্যে একটা ক্ষীণ ধর্মাধর্মবোধ না থেকেই পারে না। ভাল-মন্দের এই অস্ফুট বিবেককে সে নিষ্পেষিত করতে চেষ্টা করে, কিন্তু সহজে তা পারে না, তার বৃশ্চিক-দংশন মাঝে মাঝে তাকে অতিষ্ঠ করে তোলে। প্রাকৃত জীবন এইভাবে আলো-আঁধারের মধ্য দিয়ে, হর্ষ-অমর্ষ, জয়-পরাজয়, মান-অপমান, লাভ-ক্ষতির অবিরাম দোল খেয়ে অগণন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে করতে অতি মন্থর গতিতে তার বিকাশমার্গে অগ্রসর হয় পরমেশ্বরের অলঙ্ঘ্য বিধানে। মোহনিদ্রায় যতদিন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, বিনিদ্র পরমেশ্বর তার কামনারাশি নির্মাণ ক'রে[১] তার জাগরণ ও বিকাশের পথে অলক্ষ্যভাবে সহায়তা করেন, কিন্তু যতদিন সে নিজকে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি ব'লে মনে করে, যতদিন তার অহংবোধ স্পর্ধিত ও দুরাগ্রহী থাকে, ততদিন তার অজ্ঞান মন এই দিব্য বিধান ও প্রেরণা দেখতে পায় না। তার নিম্ন প্রকৃতির প্রেরণাবশেই সে চলে, অথচ মনে করে সে-ই কর্তা (অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে—গীতা)।

১। য এষ সুপ্তেষু জাগর্তি কামং কামং পুরুষো
নির্মিমাণঃ—কঠোপনিষদ

মুষ্টিমেয় কয়েকজন, যাদের সাত্ত্বিক বৃত্তির উন্মেষ হয়েছে, যাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত পরিমার্জিত হয়েছে তারা তাদের প্রকৃতির প্রবৃত্তি-বেগ প্রশমিত করতে সচেষ্ট হয়, প্রবৃত্তির প্রারম্ভে তার ঔচিত্য-অনৌচিত্য ও ফলাফল বিষয়ে বিচার করে, এবং যে সব প্রবৃত্তি আবিল অপকৃষ্ট, অশুভ ও অনিষ্টকর তা' পরিহার করে। এই পরিহারের নাম নিবৃত্তি। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির যথার্থ দ্বন্দ্বের এবার সূত্রপাত হয় তাদের মধ্যে। তাদের বহির্মুখী চেতনা মোড় নেয় অন্তরের দিকে। প্রবৃত্তি-মাত্রকেই অকুণ্ঠ প্রশ্রয় না দিয়ে যা শ্রেয় মনে হয় তার অনুমোদন করে আর যা শ্রেয় নয় শুধু প্রেয় তাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই প্রকারে সংযম অভ্যাস ক'রে সে তার চেতনার বিকাশের পথে এগিয়ে যায়। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির এক কাজ-চলা সামঞ্জস্য তাকে করতে হয়, কিন্তু অহংকেন্দ্রিত সমস্ত প্রবৃত্তির নিরাকরণ এতে হয় না, সাত্ত্বিকতার সীমিত পরিধির মধ্যে যতদূর সম্ভব ততদূর মাত্র হয়। সাত্ত্বিক অহমিকাও প্রকৃতির শৃঙ্খল, যদিও তা স্বর্ণ-শৃঙ্খল। ত্রিগুণের পারে না গেলে মুক্তি হয় না।

মুক্তি বা নির্বাণকামী সন্ন্যাসী কিন্তু প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বোঝা-পড়ায় সন্তুষ্ট হ'তে পারেন না। তাঁর মুক্তি বা কৈবল্যের অর্থই যখন প্রকৃতি-বর্জন, তখন নিছক নিবৃত্তিই তাঁর ঐকান্তিক লক্ষ্য। শরীর-যাত্রা মানব-হিতের জন্য অপরিহার্য যে কর্মপ্রবৃত্তি, তাছাড়া আর সমস্ত প্রবৃত্তি-ত্যাগে তিনি বদ্ধপরিকর হন। তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনের প্রারম্ভ নিবৃত্তিতে এবং পরিসমাপ্তি নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠায়। প্রবৃত্তি বাসনা ও অহন্তাকে পুষ্ট করে, চেতনাকে বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ করে এবং আসক্তিকে দৃঢ়মূল করে, অতএব সমস্ত প্রবৃত্তিই সর্বথা বর্জনীয়— তাঁদের মতে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত এ ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। প্রবৃত্তি ভিন্ন কর্ম অসম্ভব, এবং কর্ম-মাত্রই যদি বন্ধনের কারণ হয়, তবে কর্মসন্ন্যাসই মুক্তির শ্রেষ্ঠ পন্থা, স্বীকার করতে হবে। তাঁরা ঘোষণা করেন যে জ্ঞান ও কর্মের নিত্য-বিরোধ এবং কর্ম মাত্রই জ্ঞান-লাভের অন্তরায়—(জ্ঞানকর্মণোর্বিরোধং পর্বতবদকম্প্যং যথোক্তং ন স্মরসি কিং?—শঙ্করাচার্য)। উপনিষদ ও গীতার শিক্ষা কিন্তু এর বিপরীত। ঈশোপনিষদ অধ্যাত্মজীবনে কর্মের অপরিহার্যতা প্রতিপাদন করছে। মুণ্ডকে বলা হয়েছে: ব্রহ্মবিদদিগের মধ্যে যিনি বরিষ্ঠ তিনি আত্মক্রীড়, আত্মরতি ও ক্রিয়াবান। কেনোপনিষদের উক্তি: তপ, দম এবং কর্ম ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত-পুরুষের কর্ম, যুক্ত-পুরুষের কর্মের কথা ব'লে বলছেন তিনি স্বয়ং অতন্দ্রিত থেকে যদি বিশ্বকর্মে নিরন্তর প্রবৃত্ত না থাকেন তবে এই লোক সকল ধ্বংসমুখে পতিত হবে। সংসার-বিতৃষ্ণ সন্ন্যাসী কিন্তু কর্মের পথে কোনো কল্যাণ দেখেন না, কর্মত্যাগই তাঁর চোখে মুক্তির একমাত্র পথ। তিনি জীবনের সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে বহির্মুখ প্রবৃত্তির নিরোধ এবং অন্তরাবৃত্ত প্রবৃত্তির অনুশীলন করেন। পরে জ্ঞানের উপচীয়মান আলোকে চেতনাকে ডুবিয়ে রেখে ধ্যান-ধারণা সমাধির মধ্য দিয়ে আত্মসত্তায় বা ব্রহ্মসত্তায় বা আত্মপ্রত্যয়সার সংস্বরূপে অবগাহনের প্রয়াসী হ'ন। যতদিন দেহ আছে সমাধিই তাঁর প্রধান সাধন, দেহপাত হ'লে নিঃশ্রেয়স-প্রাপ্তি হ'বে, তিনি আশা করেন।

এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে যতদিন তাঁর দেহ আছে ততদিন সন্ন্যাসী প্রবৃত্তির নিঃশেষ পরিহার করতে পারেন না। পরাক্-বৃত্ত প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত হ'য়ে প্রত্যক্-বৃত্ত বা অন্তর্মুখী প্রবৃত্তির উজান-স্রোতে তাঁকে ভাসতেই হয়, কারণ জীবনের ধর্মই প্রবৃত্তি—সব প্রকার প্রবৃত্তির নিরোধে জীবন স্তব্ধ হ'য়ে যায়। কেবল সমাধির নির্বিকল্প অবস্থায় আর বিদেহ মুক্তিতে আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব। আমরা যাকে বলি নিবৃত্তি তা প্রবৃত্তির আন্তর ক্রিয়ামাত্র। নিবৃত্তি-মূলক আন্তর প্রবৃত্তির অনুশীলনে সাধকের অন্তশ্চেতনা জাগ্রত হয়। সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়, আভ্যন্তর বৃত্তিসমূহ উজ্জীবিত হয় এবং পরমার্থের অভিসারের সূচনা হয়। মুক্তিকামী সন্ন্যাসীর পক্ষে এ পথ সর্বতোভাবে প্রশস্ত

এই এক পরিণাম ব্যতীত ঐকান্তিক নিবৃত্তির অন্য কোনো পরিণাম আছে কি না, দেখা যাক। প্রথম

পরিণাম এই যে ঐকান্তিক নিবৃত্তির ফলস্বরূপ সন্ন্যাসীর অন্তর্জীবন যেমন আধ্যাত্মিক সম্পদে ভ'রে ওঠে, বহির্জীবন তেমনি রিক্ত ও নিঃস্ব হয়ে পড়ে। অবশ্য তিনি এ রিক্ততা স্বেচ্ছায় বরণ করেন। সুখের কথা, কর্মনিষ্ঠ বর্তমান যুগে ঐকান্তিক নিবৃত্তি-পরায়ণ সন্ন্যাসীর সংখ্যা অল্প। জ্ঞান-ভক্তি-কর্মের একটা সংমিশ্রণের তারতম্যই দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের বৈদান্তিক দীক্ষা-গুরু প্রাচীন-পন্থী তোতাপুরীর কথা এ প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে। সে যাই হোক্ মায়াবাদী বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের বৈষম্য মানুষের সাম্য বা সঙ্গতিবোধকে পীড়া দেয়। অখণ্ড জীবনের আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক পরিপূর্ণতা ও ঋদ্ধি—যা ছিল বৈদিক সাধনার লক্ষ্য—তিনি উপলব্ধি করতে পারেন না। তাঁর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন এক অপার্থিব সামঞ্জস্যে জারিত হয় না। ব্রহ্মজ্যোতি, ব্রহ্মবর্চস ও ব্রহ্মানন্দ তাঁর সমগ্র জীবনকে আপ্লুত ক'রে মানব-সমাজে পরিব্যাপ্ত হয় না। বরং তাঁর প্রভাবে সমাজে সংসার-বিমুখ সন্ন্যাসের আকর্ষণই প্রসারিত হয়।

দ্বিতীয় পরিণাম এইযে অক্ষর, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় পরতত্ত্বকে পাবার অদম্য আকুতিতে তিনি বিশ্বগত পুরুষের সঙ্গে তাদাত্ম্য, তাঁর বিশ্বলীলায় আনন্দময় সাহচর্য ও সক্রিয় ঐক্যের প্রতি বিমুখ হ'ন। তাঁর জগৎ-বৈরাগ্য জগন্নিবাস জগদীশ্বরের প্রতি বৈরাগ্যের কারণ হয়। যে পরম-পুরুষের দ্বারা এই নিখিল চরাচর পূর্ণ, (তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্বম্—শ্বেতাশ্বতর), যিনি সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ বিশ্বমূর্তি, তাঁর সঙ্গে সাযুজ্য ও সাধর্ম্য থেকে তিনি নিজকে বঞ্চিত করেন। ব্রহ্মের তুরীয় পাদে লীন হ'বার ঐকান্তিক আগ্রহে ব্রহ্মেরই অন্য তিন পাদ মায়া বা মিথ্যা বলে অগ্রাহ্য করেন। এই একদেশদর্শিতার ফলে চতুষ্পাদ পূর্ণব্রহ্মের সঙ্গে তাঁর তাদাত্ম্য হয় না। তিনি যদি পরকে পান, পরাবরকে হারান; নির্গুণকে পান, "গুণভোক্তৃ"কে হারান, অরূপকে পান তো অনন্তরূপকে হারান।

তৃতীয় পরিণাম এই যে, যে সমাজের উপর ঐকান্তিক নিবৃত্তির বা কর্মত্যাগের প্রভাব পড়ে সে সমাজের প্রাণশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'তে থাকে এবং রাজসিক ভাবের নিগ্রহে সত্ত্বগুণ হৃতবীর্য হ'য়ে তামসিকতার বৃদ্ধি হয়। শূন্যবাদ বা মায়াবাদের করাল ছায়াপাতে জীবন-প্রত্যয় ও জীবন-প্রচেষ্টা শিথিল ও নিরুদ্যম হয়। কয়েকজন প্রবুদ্ধচেতা সন্ন্যাসী মুক্তির পথে এগিয়ে যান, বহুসংখ্যক সন্ন্যাসের অনধিকারী সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করে নিষ্কর্মার দলপুষ্টি করে আর অবশিষ্ট জনসমুদয়ের অধিকাংশ এগিয়ে যায় জীবন-মৃত্যুর দিকে। গীতা যাকে বলে বুদ্ধিভেদ ও ধর্মসংকর তাই মানব-সমাজে মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়ে। নিস্তেজ জীবনী-শক্তি মূঢ় রক্ষণশীলতা, সহজ গতানুগতিকতা, কৌপীন-সম্বল পাণ্ডুর দারিদ্র্য, অবসন্ন শ্রমবিমুখতা, জ্ঞানৈষণার স্থানে তর্কবুদ্ধির উৎকট কচাল এবং দৈন্যের আনুষঙ্গিক অপ-গুণগুলির উপচয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে দেশ বা জাতি পরাধীনতা-পাশে আবদ্ধ হয়। স্বাধীনতার অভাবে সামাজিক জীবন যেমন শুকিয়ে যায়, আধ্যাত্মিক আস্পৃহাও তেমনি ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আসে। ফলে অধ্যাত্মপিপাসুর সংখ্যা কমতে থাকে এবং গৈরিক পতাকার নীচে তামসিক বৈরাগ্যের প্রকোপ হয়। প্রবৃত্তির নিরোধে অপ্রবৃত্তির বৃদ্ধি হয়। প্রাণশক্তির ক্রমিক হ্রাসের পরিণাম কী শোচনীয় তার জলন্ত সাক্ষ্য দিচ্ছে বিগত কয়েক শতাব্দির ভারতের ইতিহাস।

তাহ'লে আমরা দেখলাম যে প্রবৃত্তি ভিন্ন জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। আবার নিবৃত্তির অভাবে প্রবৃত্তি অন্ধ ও উন্মার্গগামী। অন্তর্মুখী হোক্ বা বহির্মুখী হোক প্রবৃত্তিই প্রগতির পথ। ব্যক্তির, সমাজের, রাষ্ট্রের, দেশের, জাতির বহির্জীবনের যদি কোনো সার্থকতা না থাকে বা অন্তর্জীবনের উদ্বোধনের জন্য বহির্জীবন যদি এক সাময়িক প্রস্তুতিমাত্র হয় এবং সংসারত্যাগের দ্বারা মুক্তি বা কৈবল্যই যদি মানব-জীবনের পরম উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐকান্তিক নিবৃত্তির বিরুদ্ধে বলবার কিছুই থাকে না। কিন্তু আমরা দেখেছি কী মারাত্মক পরিণাম ঐকান্তিক নিবৃত্তির জনসমুদয়ের উপর। অসংযত প্রবৃত্তি

যেমন প্রলয়ঙ্করি ঐকান্তিক নিবৃত্তিও তেমনি প্রলয়ঙ্করি। তবে কোন্ পথে চললে ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে আসবে আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সৌষম্য ও আত্মসম্পূর্তি?

প্রবৃত্তির উৎসমূলে যদি যাই তবে দেখি পরমাত্মা থেকেই এর উদ্ভব। পরম পুরুষের আত্মশক্তি অর্থাৎ পরা-প্রকৃতি থেকেই অনাদিকাল ধরে প্রবাহিত হচ্ছে প্রবৃত্তির পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী (যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী—গীতা)। পরমেশ্বরের সৃজনানন্দই এর উদ্গমনির্ঝর। নিষ্কাম ও নিঃস্পৃহ এর গতি, অমোঘ এর অমিতবীর্য। তরঙ্গিত আনন্দের রূপকৃৎ উল্লাস ও উচ্ছলন এই প্রবৃত্তি। গীতার মতে কর্মের উদ্ভব ব্রহ্ম থেকে (কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং)। প্রশ্নোপনিষদ বলছে রূপমাত্রই আনন্দের রূপ—(মূর্তিরেব রয়িঃ) এই রূপসৃষ্টিই প্রবৃত্তির কৃতি। পরাপ্রকৃতির এই শুদ্ধা প্রবৃত্তি সঞ্চারিত হয় জীবের স্ব-ভাবে, তার আত্ম-প্রকৃতিতে। স্ব-ভাবনিয়ত প্রবৃত্তিই জীবের স্ব-ধর্মের সহজ অভিব্যক্তি। নিত্য-নিবৃত্তির বুকে এ যেন নিত্য-প্রবৃত্তির অক্লান্ত নৃত্য। স্বতঃস্ফূর্ত এই প্রবৃত্তি নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার মানবাধারে পরম-পুরুষের ইচ্ছার স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। এতে বন্ধনের ভয় নাই (ন কর্ম লিপ্যতে নরে—ঈশোপনিষদ), ভাল-মন্দের দ্বন্দ্ব নাই, সুখ-দুঃখের আবর্তিত বিক্ষোভ নাই। সক্রিয় তাদাত্ম্যের ফলে ভগবানের ইচ্ছার সঙ্গে মুক্ত পুরুষের ইচ্ছার যে ঐক্য হয়, সেই ঐক্য-প্রসূত অগ্নিগর্ভ শক্তিধারাই প্রবৃত্তিরূপে তার রূপান্তরিত জীবনে চরিতার্থ হয়। এই পুরাণী প্রবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ খর্ব বা পঙ্কিল করার কোনো সম্ভাবনা সেখানে থাকে না।

যতদিন বাসনা আছে, অহংবোধ আছে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সাম্যই অনিবার্য সাধন। বাসনা ও অহং নির্মূল হ'লে মুক্ত পুরুষের কর্ম (মুক্তস্য কর্ম) স্বভাব-নিয়ত, স্বতন্ত্র ও সাবলীল হয়; কিন্তু এ অবস্থাতেও দিব্য প্রবৃত্তির নির্দোষ প্রকাশ সম্ভব হয় না। তারজন্য প্রয়োজন সমস্ত প্রকৃতির আমূল রূপান্তর। দেহের, প্রাণের ও মনের দিব্য রূপান্তর হ'লে ভাগবত প্রবৃত্তির প্রকাশ হয় অনবদ্য ও অব্যর্থ—দিব্য ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত ও পরিচালিত। ভগবান স্বয়ং তার মধ্য দিয়ে কর্ম করেন। এই ভাগবত প্রবৃত্তিই সমাজের, রাষ্ট্রের ও মানব-জাতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ, সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষের একমাত্র সাধন। কর্মসু চামৃতম্—মুণ্ডকোপনিষদ—কর্মে অমৃতত্ব।

বৈদিক সাধক কেমন ক'রে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বের সমাধান করেছিলেন, এবার তা' দেখা যাক। বলা বাহুল্য, নিম্ন-প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলির নিরসনের জন্য তাঁদেরও প্রথমে নিবৃত্তি-মার্গ নিতে হয়েছিল, কিন্তু ঐকান্তিক নিবৃত্তির পথে তাঁরা যান নি, কারণ ব্রহ্মনির্বাণ বা বিদেহমুক্তি তাঁদের লক্ষ্য ছিল না, সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্র-সাধন তাঁদের সাধনার অঙ্গ ছিল না। প্রাথমিক নিবৃত্তির অনুশীলনেও তাঁরা নিরোধ বা নিগ্রহের পথে না গিয়ে দিব্যশক্তির কাছে প্রণতি বা প্রপত্তির দ্বারাই সহজে সফল হ'তেন।

বৈদিক সাধনার লক্ষ্য ছিল সত্য, জ্যোতি ও অমৃতত্ব—সত্যং ঋতং বৃহতের অক্ষয় আনন্দ। মানব-জীবনকে বৈদিক সাধক মনে করতেন একটা সুদীর্ঘ যাত্রা, চেতনার ঊর্ধ্বায়ণের নিরবচ্ছিন্ন যজ্ঞ—"যজ্ঞ-মধ্বরং"—যা চলে কত লোক-লোকান্তর, কত সমুদ্র, কত নদ-নদী, কত গিরি-কান্তার পার হ'য়ে; সত্যের ঋজু পথে, তপোদ্দীপ্ত আস্পৃহা নিয়ে, প্রজ্বলিত সংকল্প-শক্তির প্রবল প্রবেগে, আত্ম-নিবেদনের বর্ধিষ্ণু উল্লাস ও উৎসাহ ভ'রে সেই একের অভিসারে যিনি পরম-ব্যোমে তাঁর সহস্রসূর্যদীপ্তিতে চিরভাস্বর।

যজ্ঞ বা আত্মাহুতিই ছিল তাঁদের একমাত্র সাধন। যজ্ঞের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ—জ্ঞান ও কর্ম—ছিল এক অগ্নিগর্ভ আকূতি-সূত্রে গ্রথিত। অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন—জীবনকে তাঁরা এই দু'ভাগে বিভক্ত করেন নি। তাঁদের সমস্ত জীবনই ছিল যজ্ঞ, সমস্ত জীবনেই তাঁরা চাইতেন আলোর বিস্ফোরণ, আনন্দের প্লাবন। মনঃ বা মতির

দ্বারাই তাঁরা এগিয়ে যেতেন পরমার্থের দিকে, আত্ম-নিবেদন দ্বারাই তাঁরা অমৃতত্বের অধিকারী হ'তেন।

"নম ইদুগ্রং নম আ বিবাসে নমো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাম্।
নমো দেবেভ্যো নম ঈশ এষাং কৃতং চিদেনো নমসা বিবাসে॥" ঋগ্বেদ—৬,৫১,৮

অর্থাৎ "শুধু প্রণতিই শক্তিমান, আমি প্রণতির আশ্রয় গ্রহণ করি, প্রণতিই পৃথিবী ও দ্যৌকে ধারণ ক'রে আছে। আমি দেবতাদের প্রণাম করি, তাঁরা প্রণতির বশীভূত; পাপ যদি ক'রে থাকি, প্রণতিরই আশ্রয় গ্রহণ করি।"

ঋষি অগ্নির উদ্দেশে বলছেন:

"উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তর্ধিয়া বয়ম্। নমো ভরন্ত এমসি॥" ঋ, ১,১,১

"তোমার নিকট প্রতিদিন, হে অগ্নি, রাত্রে ও আলোতে আমরা বুদ্ধির দ্বারা আমাদের নমঃ বা প্রণতি নিয়ে আসছি।" ঈশোপনিষদ ও কঠোপনিষদে অগ্নির উদ্দেশে এই একই প্রকার প্রণতি আছে।

বৈদিক-সাধক যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতেন অগ্নি, ইন্দ্র,বৃহস্পতি বরুণ, মিত্র, সূর্য, সোম, উষা প্রভৃতি দেব-দেবীর উদ্দেশে। এই দেব-দেবীকে তাঁরা পৃথক পৃথক সত্তা বলে জানতেন। তাঁরা জানতেন পরম-দেবেরই বিভূতি এঁরা, পরম-দেবেরই অন্তর ইচ্ছায়, তাঁরই "কবিক্রতু"র ছন্দে বিশ্বব্যাপার নিয়মন ও পরিচালন করেন। যখনই তাঁরা কোনো এক দেব বা দেবীকে আবাহন করতেন তখন পরম-দেবেরই এক বিশিষ্ট বিভাবের, এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও অভি-ব্যক্তির আবাহন করতেন ও তদনুযায়ী ফল পেতেন। প্রত্যেক দেব-দেবীর মধ্যে একমাত্র পরমেশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করতেন।

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" ঋ. ১. ১৬৪. ৪৬.

"সৎ একই, জ্ঞানীরা তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন অভিহিত করেন; তাঁরা বলেন অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন্।"

আবার এই দেব-দেবীরা পরস্পরের সঙ্গে অভিন্ন তাও তাঁরা জানতেন। অগ্নির উদ্দেশে ঋষির উক্তি:

"ত্বমগ্নে বরুণো জায়সে যত্বং মিত্রো ভবসি যৎ সমিদ্ধঃ।
ত্বে বিশ্বে সহস্পুত্র দেবাস্ত্বমিন্দ্রো দাশুষে মর্ত্যায়॥" ঋ, ৫,৩,১

"হে অগ্নি, যখন তুমি জন্মগ্রহণ কর তখন তুমি বরুণ হও, যখন পূর্ণরূপে প্রদীপ্ত হও তখন তুমি মিত্র; হে শক্তির পুত্র তোমার মধ্যেই সব দেবেরা বর্তমান, হবিদাতা মর্ত্যের জন্য তুমি হও ইন্দ্র।"

দেব-দেবীকে পৃথক পৃথক সত্তা ভেবে নিজেদের তুচ্ছ পার্থিব কামনা-বাসনার তৃপ্তির জন্য বৈদিক-সাধক তাঁদের আহ্বান করতেন না। তাঁদের স্তব-স্তুতি-প্রশস্তি অনির্বাণ অগ্নিশিখার মত উঠে যেত সেই পরম একের দিকে, সেই মহান্ পুরুষের অভিমুখে—পুরুষং মহান্তম্। তাঁরা জানতেন সেই এককে, ডাকতেন সেই এককে, এবং সেই একেরই শক্তিতে, একেরই প্রসাদে উত্তরণেই প্রয়াস করতেন সেই একেরই মধ্যে। তাঁদের এক কিন্তু সর্বনিরসনকারী নেতি নেতির এক ন'ন। বিশ্বের অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, বিশ্বজীবনকে অলীক ক'রে তিনি শুধু তাঁর অব্যক্ত, অব্যবহার্য, নিরঞ্জন সৎ-স্বরূপের নিস্তরঙ্গ পরমা শান্তিতেই অধিষ্ঠিত ন'ন। তিনি এক অথচ অনেক, তিনি অরূপ অথচ বিশ্বরূপ, তিনি অবর্ণ অথচ তাঁরই অফুরন্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যে নিখিল চরাচর অনুরঞ্জিত। তিনিশুধু সৎ নন, শুধু সৎ-চিৎ নন, তিনি অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দ। তিনি "বাজপতিঃ" অসীম ঐশ্বর্যের অধিপতি, "উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ—দেবতারা যাঁর শাসনাধীন, তস্মাৎ বিরাড়জায়ত—তাঁহা হ'তেই এই বিরাটের জন্ম। এই সর্বগত, সর্বরূপ, সর্বব্যাপী ও সর্বাতিগ পরম-পুরুষই বৈদিক সাধকের একমাত্র লক্ষ্য—"সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।"

যজ্ঞ—বাহযজ্ঞ ও আন্তরযজ্ঞ—পরম পুরুষের বিভূতি এবং সাধকের মধ্যে আদান-প্রদানের স্বর্ণসেতু ছিল।

সাধকের আত্মনিবেদনের ডাকে উষার প্রকাশ হ'ত, তাঁর চেতনায় আঁধার ভেদ ক'রে জ্ঞানসূর্যের উদয় হ'ত, ইন্দ্র তাঁর দিব্য-মানস-জ্যোতি ঢেলে দিতেন বৃষ্টির ধারা-প্রবাহে, সোম তাঁর দ্যুতিমান আনন্দ-মদিরা নিয়ে আসতেন, আর অগ্নি—পুরোধা ও ঋত্বিক—সাধকের আধারের সমস্ত পাপ-তাপ, কুটিলতা-ক্লিষ্টতা বিদূরিত ক'রে এসে দিতেন তাঁর চেতনায় বরুণের বিশালতা ও মিত্রের প্রেমমঞ্জুল সৌষম্য। মর্ত-চেতনা প্রতিষ্ঠিত হ'ত অমৃতত্বে, মর্ত-জীবন হ'য়ে উঠত অমৃতময়—"মর্তাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ"—মর্ত্য তাঁরা অমৃতত্বের অধিকারী হ'লেন। অবর পার্থিব চেতনা থেকে উঠে বৈদিক-সাধক কেমন ক'রে আনন্ত্যের অমরজ্যোতিতে পৌঁছতেন তাঁর কথাতেই তা প্রকাশ পায় :

"পৃথিব্যা অহমুদন্তরিক্ষমারুহমন্তরিক্ষাদ্দিবমারুহম্।
দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ স্বর্জ্যোতিরগামহম্"

যজুর্বেদ—১৭.৬৭

"পৃথিবী থেকে উঠে আমি অন্তরীক্ষে আরোহণ করলাম, অন্তরীক্ষ থেকে উঠলাম দ্যুলোকে, দ্যুলোকের পৃষ্ঠ থেকে গেলাম স্বর্লোকে—জ্যোতিতে।"

আবার "ঋত্বা দেবানামজনিষ্ট চক্ষুরাবিরকর্ভুবনং বিশ্বমুষাঃ"—"যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের চোখ খুলেছে, উষা সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত করেছে।" ঋ, ৭.৭৬.১

এই উর্ধ্বারোহণ পরম-পুরুষে লীন হবার জন্ম নয়, এর উদ্দেশ্য ছিল পরম-পুরুষের জ্যোতি, শান্তি, শক্তি, আনন্দ প্রভৃতি দিব্য সম্পদ দিয়ে তাঁদের পার্থিব জীবন সমৃদ্ধ ও সমুদ্ভাসিত করা। তাঁরা পৃথিবীর রহস্য অবগত ছিলেন—পৃথিবী যে পরম-পুরুষের পাদভূমি! পৃথিবীর বুকে গুহাহিত আছে যে অন্তহীন বৈভব তারই উদ্ধারের জন্ম তাঁরা ডাকতেন দেববৃন্দকে। পৃথিবী রত্নগর্ভা বসুন্ধরা, কিন্তু এ রত্ন স্থূল জড়বস্তু নয়, এ রত্ন হচ্ছে জ্যোতি, শান্তি, আনন্দ, অমৃত। এই সমস্ত অধ্যাত্ম-সম্পদ আবদ্ধ করে, লুকিয়ে রেখেছে আঁধারের শক্তিরাজি—বৃত্র, পণি, বল, দস্যু প্রভৃতি। দিব্যানন্দকে ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখে ধ'রে রেখেছে। অমৃতকে মৃত্যু-কবলিত করেছে, জ্যোতিকে তমিস্রার গর্ভে ডুবিয়ে রেখেছে, সত্যকে মিথ্যা বা অনৃতে পর্যবসিত করেছে। বৃত্র প্রচণ্ড, দুর্দান্ত অসুর—সে তার কুণ্ডলীকৃত আঁধার দিয়ে ব্যাহত করছে পৃথিবীতে দিব্যজীবন ও দিব্যকর্মের প্রতিষ্ঠা; অথচ দিব্যজীবন ও দিব্যকর্মের প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণের জন্যই পৃথিবীর সৃষ্টি। মানুষের জড় দেহায়তনে বদ্ধ ও রুদ্ধ রয়েছে যে ঐশী বিভূতি তার মুক্তি ও অভিব্যক্তিই মানুষের জীবন-ব্রত। মানুষের দেহে, প্রাণে ও মনে যে সব দেবতারা সুপ্ত আছেন তাঁদের পূর্ণ জাগৃতি ও আত্ম-প্রকাশ, মানব-জীবনের দেবজীবনে রূপান্তর এবং তার রূপান্তরিত জীবনে রূপান্তরিত প্রকৃতিতে পরম-পুরুষের অব্যাহত প্রকাশই মানুষের পার্থিব পরিণামের চরম উৎকর্ষ। তাই অসুরদের ও দস্যুদের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম ও দেব-শক্তির সহায়ে তাদের পরাভব ও বিনাশ আর্যজীবনের মুখ্য কর্ম। আর্য সে যে চেতনার উদয়নের জন্ম অক্লান্ত শ্রম করে, সংগ্রাম করে। "আর্যা জ্যোতিরগ্রাঃ"—জ্যোতি বা জ্ঞানালোককে সম্মুখে রেখে যে অগ্রসর হয় সেই আর্য। এই দেবাসুর সংগ্রামের কথা, আলোর শক্তি আর আঁধারের শক্তির, ঋতের শক্তির আর অনৃতের শক্তির সুদীর্ঘ ও তুমুল সংঘর্ষের কথা বেদে প্রচুর রয়েছে। ঋষি বামদেব বৃহস্পতির জয়গানে বলছেন,

"অশ্মন্ময়ানি নহনা ব্যস্তন্। বৃহস্পতিরভিকনিক্রদদ্গা..."

ঋ, ১০,৬৭,৩

"বৃহস্পতি পাথরের অবরোধ বিধ্বস্ত ক'রে জ্যোতির্ময় গোযূথকে আহ্বান করলেন"।

ইন্দ্রকে ডাকা হ'ত তাঁর বজ্র দিয়ে বৃত্রকে হনন করার জন্ম। গো আর অশ্ব অর্থাৎ জ্ঞানদীপ্তি এবং প্রোজ্জল প্রাণশক্তি দেবার জন্ম, যাতে সাধক সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে মর্ত্য চেতনা হ'তে অমরত্বে, ভূমানন্দে উঠে যেতে পারেন। অগ্নিকে আবাহন ক'রে ঋষি বলছেন :

"হে তপঃশক্তি, উর্ধ্বগামী হও, বিদীর্ণ কর যত আবরণ,

ফুটিয়ে তোলো আমাদের মধ্যে পরম-দেবের বিভূতিরাজি"
—"ঊর্ধ্বো ভব প্রতি বিধ্যাধ্যস্মদাবিষ্কৃণুষ্ব দৈব্যাগ্নয়ে।"

ঋ, ৪,৪,৫

তা হ'লে আমরা দেখলাম যে বৈদিক-সাধক কর্মী ছিলেন, পৃথিবীতে দিব্যকর্ম সম্পাদনই তাঁদের জীবনের ব্রত ছিল। পৃথিবীতে দেব-জাতির সৃষ্টি তাঁদের আদর্শ ছিল। মানবদেহে অধ্যাত্মদীপ্ত, সুস্থ, সবল আনন্দময় সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ জীবন যাপন করাই তাঁদের সাধনার কাম্য ছিল। "ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্ প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্বাণি"—"আমার অঙ্গসকল বাক প্রাণ চোখ কান বল ও ইন্দ্রিয়গুলি পুষ্টিলাভ করুক, পূর্ণতা প্রাপ্ত হোক"। (সামবেদ) বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনকে একই দিব্যছন্দে গাঁথতেন বলেই তাঁরা তাঁদের সমস্ত জীবনকে রসান্বিত করতে পারতেন অনন্তের অমৃত দিয়ে। তাঁদের সাধনায় যজ্ঞ ছিল প্রতীকাত্মক ও রূপকাত্মক, কিন্তু জনসাধারণ সশ্রদ্ধ বাহ্য ক্রিয়াকর্মের সহায়ে তাদের ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে যেত। জ্ঞান ও কর্ম অনন্যোনির্ভর হ'য়ে সাধকের জীবনে এনে দিত এক সুসমঞ্জস সার্থকতা।

বৈদিক-সাধক সেই অবস্থায় পৌঁছতে চাইতেন যেখানে তাঁদের বিশাল চেতনার স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে দিব্য-প্রবৃত্তি অবাধে নিজকে চরিতার্থ করতে পারে পার্থিব জীবনে। উষার কাছে তাই তাঁদের প্রার্থনা :
"উত নো গোমতীরিষ আ বহা দুহিতর্দিবঃ" —ঋ. ৫. ৭৯.৮
"হে দেবলোকের দুহিতা, নিয়ে এসো আমাদের মধ্যে জ্যোতির্ময়ী প্রবৃত্তির শক্তি।" ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা :

"বিদ্যামেষং বৃজনং জীরদানুম"—ঋ.১. ১১১. ৬.

"আমরা সেই প্রবল প্রবৃত্তিকে প্রাপ্ত হই যা সবেগে বাধা-বিঘ্ন ভেদ ক'রে যেতে পারে।" নিরহঙ্কার, অনাসক্ত, মুক্ত চেতনায় শুধু জ্যোতির্ময়ী প্রবৃত্তির খেলা চলে, তাকে বিকৃত বা খণ্ডিত করার কিছু থাকে না;—নিবৃত্তি যেন কোন্ অলক্ষ্য পটভূমিতে সমাহিত থাকে।

দিব্য-জীবনের পূর্ণজীবনের এই মহান আদর্শ বৈদিক যুগের পর ম্লান হ'তে লাগল। জ্ঞান ও কর্মে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হ'ল। জ্ঞান কর্মকে প্রত্যাখান ক'রে, জীবনকে পরিহার ক'রে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল ব্রহ্মলয় বা বিদেহ-মুক্তির দিকে এবং উগ্রতপা সন্ন্যাসের আবির্ভাব হ'ল মানব-জীবনের সাম-মুখরিত রঙ্গমঞ্চে। রত্নগর্ভা ধরিত্রীর অমূল্য রত্ন-সম্ভার উপেক্ষিত হ'ল, মর্ত্যধামে অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা কোন্ অনাগত কালের কুক্ষিতে স্থগিত রইল।

প্রতিবন্ধ

(গল্প)
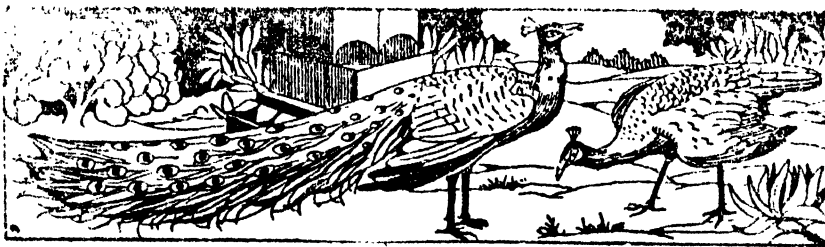
সন্তোষকুমার ঘোষ

রাত দশটাই হবে বোধ হয়। এইমাত্র ফিরে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসেছে হরিদাস। রোজকার মত পাঠশালার ছুটির পর আজ আর বৈকালে বাড়ীতে আসতে পারেনি। বিশেষ কাজে দূরে কোথায় যেতে হয়েছিল। খিদের নাড়ী তাই চুঁই-চুঁই করছিল এতক্ষণ। রুটির প্রথম গ্রাসটি মুখে পুরে সবে চিবতে শুরু করেছে। কথাটা পাড়বার জন্যে অন্নদা যেন ওৎপেতেই ছিল। আর তর সইল না। ফস্ করে বললে—আজ দুপুরে শিবু এসেছিল গো। নেমন্তন্ন করে গেল।

শিবু! নেমন্তন্ন! —হরিদাসের ঠোঁটের ফাঁক থেকে আলগোছে দুটিমাত্র শব্দ ঝাঁপিয়ে পড়ল। কণ্ঠস্বরেও কেমন যেন একটু বিস্ময়ের ভাব।

আহা, আকাশ থেকে পড়ছো না কি? আমার ভাই শিবু গো। পরশু আমার সেজ বোনের বিয়ে। আমাদের সবাইকে যাবার জন্যে বাবা অনেক করে বলে দিয়েছে। পথ-খরচার দরুণ দশটা টাকাও পাঠিয়ে দিয়েছে। কিছুতেই নোব না—শিবু জোর করে দিয়ে গেল। —এক নিঃশ্বাসে অন্নদা কথা ক'টা বলে ফেললে। বেশ আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বর।

কথা নেই আর কারও মুখে। হরিদাসের চোয়ালের হাড়গুলো শুধু নড়ছে একটানা। মুখ নয়—চর্বনরত যন্ত্র যেন একটা। রুটি-তরকারির স্বাদ এখন ওর অনুভূতির সীমায় পৌঁচচ্ছে কি না—ও-ই জানে। তবে একরাশ চিন্তা যে হরিদাসের মনটাকে হঠাৎ ছেঁকে ধরেছে—তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ ধ'রে নিস্তব্ধতা শুধু। কেমন যেন অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা। স্তব্ধতার বুকে অন্নদাই আবার তরঙ্গ তুললে। আগ্রহব্যাকুল কণ্ঠে বললে—দুটো দিনের জন্যে বইতো নয়। আমি যাব ঠিক করেছি। তুমি যাবে না জানি। ভোঁদার মাকে তাই বলে রেখেছি। আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বলেছে। কাল সকালের গাড়ীতেই যাব আমরা। তুমি এবার আর 'না করো না'—লক্ষ্মীটী। বাপের বাড়ীতে কতকাল যাইনি বলতো? —বলতে বলতে অন্নদার কণ্ঠস্বরে যেন একটু অভিমান ঘনিয়ে এল। চোখ দুটোও যেন ছলছল করে উঠলো।

অন্নদার এই বাপের-বাড়ী যাওয়ার কথা উঠলেই হরিদাস বিচলিত হয়ে ওঠে। শুধু বিচলিত হয় না—বেশ খানিকটা অস্বাভাবিকও হয়ে ওঠে। অমন সদাশিব মানুষটা কথা কাটাকাটি করতে করতে একেবারে দুর্বাসার মেজাজ ধরে।

মানুষটাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ক'টা—কারুরই তোলা জামাকাপড় কি ফ্রক-প্যাণ্ট কিছুই নাই। কুটুম্বস্থল বলে কথা। আট-পৌরে ছেঁড়াখোঁড়া জিনিষ পরিয়ে তো আর পাঠান যায় না। নতুন কিনে দিতে হয় তা হলে সবাইকে। সে

সামর্থ্যই বা কই তার। যাতায়াতের দরুণ পথ খরচাও লাগে দশটাকার কাছাকাছি। তা ছাড়া, বাড়ীর বড় মেয়ে অন্নদা। ভাই-বোনেরা রয়েছে। কেউই মায়ের পেটের ভাইবোন নয় অবশ্য। বৈমাত্রের ভাইবোন সব। তা হ'ক। রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তো বটে। খালি হাতে পাঠান চলে না। কিছু মিষ্টি খাবারও সঙ্গে দেওয়া দরকার বই কি। এতসব খরচের কথা ভেবেই সম্ভবতঃ হরিদাস বিচলিত হয়—ক্ষেপে ওঠে। কেন কে জানে—আজ আর চটে উঠলো না হরিদাস। বরং কণ্ঠ-স্বরে বেশ খানিকটা সহানুভূতির সুর মিশিয়ে বললে—কিন্তু, তোমার তোলা কাপড় নেই একখানিও—জামাও নেই। মায়া, মিতা, দীপু, দীপা, খোকন—ওদের কারুরই কিছু নেই। ভাবছি তাই।

সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাস দিয়ে অন্নদা বললে—সে জন্তে ভাবতে হবে না তোমায়। আমি চেয়েচিন্তে সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। হ্যাঁ দ্যাখো—রাঁধতে হবে না তোমায়। দুটো দিন খুড়ীর কাছে খাবে। আমি বলে-কয়ে রেখেছি।

এখনই—এই রাত্তেই যেন যাচ্ছে অন্নদা। হরিদাস বেশ বুঝলে, যাওয়ার জন্তে অন্নদা অতিমাত্রায় উৎসুক হয়ে উঠেছে। অস্বাভাবিক নয় মোটেই। বাপের বাড়ীতে কতদিন যেতে পায় নি বেচারী। সেই কবে ওর সেজ ভাইয়ের পৈতের সময় গিয়েছিল। সে প্রায় সাত-আট বছর আগেকার কথা। কিন্তু সবদিকের সব কথা কি ভেবে দেখেছে অন্নদা! কে জানে!

সামনের জরাজীর্ণ জানলাটার পাল্লা ক' খানা অনেকদিন আগেই খসে পড়েছে। অগ্রহায়ণের শেষ সপ্তাহ চলছে। শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে এরই মধ্যে। ঠাণ্ডা আটকাবার জন্তে জানলার মুখটায় একটুকরো চটের যবনিকা ফেলা আছে। তার একদিকের বাঁধনটা কখন খুলে গেছে কে জানে। খানিকটা হিমেল হাওয়া এসে হরিদাসের সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে দিলে। স্ত্রীর দিকে মুখ তুলে চাইলে হরিদাস। বললে—উঃ, এর মধ্যেই কি ঠাণ্ডা পড়েছে গো এবার! হাড় কাঁপাচ্ছে যেন।

হাঁ-না কোন উত্তরই দিলে না অন্নদা। গরম জামা নেই ছেলেমেয়েদের। এখনই হয়ত ঠাণ্ডার ওজর তুলবে মানুষটা। তোলে তুলুক। কোন কথাই শুনবে না। যেমন অজুহাতই দেখাক। অগ্নিমূর্তি ধরে ধরুক। কোন কিছুই গ্রাহ্য করবে না। কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হবে না আজ। যেমন করে হ'ক যাবেই ও কাল। বাপের বাড়ী বলে কথা। তায় বিয়ে বাড়ী। পাঁচ জায়গার আত্মীয়-কুটুম্ব একঠাঁইয়ে এসে জড় হবে। কতদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি সকলের সঙ্গে। যাবার জন্যে অন্নদার মনটা তাই অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছে। উদ্দীপনাও বেড়েছে।

যা ভেবেছে—ঠিক তাই। হরিদাস বিড় বিড় করে বলতে লাগল—পাড়াগাঁয়ের শীত—এখানকার দেড়া প্রায়। গরমজামা নেই কারও। বিয়ে বাড়ী—রাতের বেলায় ছেলেমেয়েগুলো ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরবে হয়ত। কেঁপে কেঁপে মরবে সব। ঠাণ্ডা লেগে কিছু না হয় আবার ওদের।

চকিতের মধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠল অন্নদা। আপন-মনে গজগজ করে ঠাণ্ডার কথা বলা। ও অন্য কিছু নয়। যেতে না দেওয়ারই অজুহাত খুঁজছে মানুষটা। বেশ উত্তেজিত কণ্ঠেই অন্নদা বললে—সাত জন্মেও যদি ওদের জামাকাপড় না জোটে—তা বলে বোনের বিয়েতেও বাপের বাড়ী যেতে পাব না বুঝি? সাধ-আহ্লাদ বলে কিছু থাকতে নেই যেন আমার জীবনে। ঠাণ্ডায় কেঁপে মরে--মরবে। যা হয় হবে ওদের।

যা হয় হবে, ঠিকই। কিন্তু এরপর ভুগবে কে? এমনি ধরণের কথা দুটোকে ঠোঁটের প্রান্ত থেকে মুক্তি দিতে গিয়েও হঠাৎ সামলে নিলে হরিদাস। রুটি চিবতে চিবতে একফাঁকে উৎকণ্ঠামিশ্রিত কণ্ঠে বললে, বিয়ে উপলক্ষ্যে যাচ্ছ। যেমন হক একখানা শাড়ী আর কিছু মিষ্টি খাবারও তো সঙ্গে নিতে হবে গো। সেও তো অনেকগুলো টাকার ফের।

নিতে হবেই তো। তোমার যদি এখন চিরকালই অভাব থাকে। তা বলে বিয়ের ব্যাপারে লৌকিকতা

করতে হবে না বুঝি? সব কুটুমবাড়ী থেকে কাপড় মিষ্টি আসবে---আর আমি বড় বোন—শুধু হাতে যাব! ভারি মান বাড়বে আমার তাতে—না? অন্নদার কণ্ঠস্বর বেশ খানিকটা উত্তেজনায় ভরা।

আর কথা কইলে না হরিদাস। খাদ্যপেষণ যন্ত্রটা একটানা নড়ে চলেছে কোন রকমে। চোয়ালের হাড়গুলো অস্বাভাবিকভাবে ঠেলে ঠেলে উঠছে। চোখ দুটিও অনেকখানি কোটরগত হয়েছে। শ্রী-ছাঁদ বলতে যা বোঝায়—সে সবের আর কোন রকম অস্তিত্ব নেই হরিদাসের মুখে চোখে। সংসার সবকিছু নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। নিচ্ছেও প্রতিদিন। চেয়ে চেয়ে দেখে অন্নদা। কেন কে জানে—লোকটার জন্যে ওর মনের কোনে কিন্তু বিন্দুমাত্র মায়াদয়ার ভাব জাগে না আজ। বরং মনে হয়—তার এমন দুর্ভাগ্যের জন্যে—অন্য কেউ নয়—শুধু ওই মানুষটাই দায়ী। ভাল উপায় করবার সামর্থ্য নেই। অপদার্থ পুরুষ। কত লোক কত কি করে দিব্যি সংসার চালাচ্ছে। অনেকে দুদিনে বড়-লোকও হয়ে উঠছে। এর শুধু ওই মাষ্টারি আর মাষ্টারি। কুলী-মজুরদের বউ-ঝিরাও তার চেয়ে সুখে আছে। তাদেরও সাধ-আহ্লাদ মেটে। ভাবতে ভাবতে এক ফাঁকে তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠেই আবার অন্নদা বললে, হ্যাঁ, ছাখো, আমি বড় বোন। বর-কনেকে আশীর্বাদ করতে হবে—জানতো? গোটা চারেক বাড়তি টাকা চাই আমার—বুঝলে?

যা মাইনে পায়—আর টুইশানি করে যা উপায় করে হরিদাস—সবই এনে অন্নদার হাতে তুলে দেয়। অন্নদাই টেনেটুনে সব কিছু চালায়। তিনমাস হ'ল পাঠশালায় মাইনে পায় নি। কী ভাবে যে সংসার চলছে সবই জানে ও। সব জেনে শুনেও—সব বুঝেসুঝেও অন্নদা টাকার কথা কইছে দেখে হরিদাস আর চুপ করে থাকতে পারলে না। নিতান্ত অসহায় মুখখানা তুলে বললে — ধার যে চাইব কারও কাছ থেকে—তাও শুধু-হাতে দিতে চায় না কেউ—জানই তো?

শুধু হাতে দিতে চায় না, তার আমি কি করব শুনি? ঝুড়ি ঝুড়ি কত সোনাদানা দিয়ে রেখেছ আমায় যে বার ক'রে দেবো এখন তোমাকে! বিয়ের সময় দু'দশভরি যা দিয়েছিল—তোমাদের পালগুষ্টির গর্ভ ভরাতে গিয়েই তো যথাসর্বস্ব ঘুচেছে। না হ'লে—

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে থাকে অন্নদা। কথাটা মিথ্যে নয় অবশ্য। ঘরে তখন শাশুড়ী আর ননদ ছিল। তার উপর নিজের তিনটি ছেলে-মেয়েও তখন অন্নদার। পাল্টে পাল্টে রোগে পড়ল সেবার হরিদাস। দু'তিনমাস ধরে টাইফয়েডে ভুগলো। যায় যায় অবস্থা হয়েছিল। ডাক্তার, ওষুধ, পথ্যি--তার উপর পাঁচটি প্রাণীর মুখের অন্ন—কচিটার দুধ। অন্নদা গা থেকে একে একে সব ক'খানা গয়নাই খুলে দিয়েছে। নিজের অদৃষ্টের জন্যে আক্ষেপ করেনি কোনোদিন। আজ হঠাৎ অন্নদার এমন অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর—এমন অভাবনীয় উক্তি শুনে হরিদাস কেমন যেন অবাক হয়ে গেল। কথার প্রতিবাদে কিছু বলতেও পারলে না সে।

কিছুক্ষণ ধ'রে আবার একটানা নিস্তব্ধতা। তলে তলে আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠল অন্নদা। হরিদাসের অমন নীরবতা অসহ্য ঠেকছে এখন ওর। নিদারুণ উত্তেজনা-ভরে বললে—টাকা ধার করে পাবে কি চুরি করে আনবে—সে দেখবার দরকার নেই আমার! যাবই আমি কাল। শালীর বিয়েতে একখানা কাপড় দেবার মুরোদ নেই যার—তার মান খোয়া যায় তো বড় বয়েই গেছে আমার। কাপড়, মিষ্টি এনে দিতে পার ভালই— না হ'লে শুধু হাতেই যাব আমি। বাপের বাড়ীর সবাই জানুক—ঢি-ঢি হ'ক আত্মীয়মহলে—কেমন মানুষের হাতে পড়েছি আমি—কী সুখে রেখেছে আমায়।

অন্নদা নয়—অন্য কেউ কথা বলছে যেন। উত্তেজনার বশে নিতান্তই অনাত্মীয়ের মতই কথা বলছে অন্নদা। খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে হরিদাসের। রুটি এখন বিস্বাদ ঠেকছে মুখে। শেষপাতে রোজই একছিটে চিনি চেয়ে নেয় হরিদাস। আজ কিন্তু তা চাইতে

ভুলে গেল সে। স্বামী কি চায়—না-চায়—সেদিকে অন্নদারও মন নেই এখন। ক্ষোভ-জ্বালা—উত্তেজনা-রাগ অভাবনীয় রূপ নিয়েছে এখন ওর সারা অন্তরজুড়ে।

নিজেকে শুনিয়েই যেন বললে হরিদাস—হারানবাবুকে বলে দেখব কাল সকালে—আগাম যদি কিছু দেন। কিন্তু যা হাতভারী লোক! দেখি কি হয়।

হারানবাবুর ছেলেমেয়ে তিনটিকে পড়ায় হরিদাস। কথাটা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল অন্নদা। হাতভারী হবেই তো সবাই। তাদের দোষ কি শুনি? তুমি চিরকাল হাত পাতবে—আর সবাই তোমায় চিরকাল দয়া দেখাবে—না?

কথা ক'টা বলার পরই একান্ত উত্তেজনাভরে হরিদাসের বড় ব্যথার জায়গাটাতেই নির্মমভাবে আঘাত দিয়ে ফেললে—কতদিন বলেছি—চুলোবছাই—ওই ছেলেঠেঙান ছেড়ে—অন্য যা হ'ক কিছু করো। কাছে-পিঠে কত কল-কারখানা হয়েছে। কত জায়গায় কত লোক কত কি ক'রে খাচ্ছে। দিব্যি সংসার চালাচ্ছে। তুমি ওই এক হতচ্ছাড়া মাষ্টারি করতে শিখেছ শুধু। উঃ, বাবা যদি এর চেয়ে গলায় পাথর বেঁধে জলে ফেলে দিত তখন আমায়—সেও শতগুণে ভাল ছিল। আমার মাথা খেতে—এমন মানুষের বিয়ে করার সখ জেগেছিল কেন—তাও বুঝি না!

কথাশুনে শুধু অবাক হয় না হরিদাস—হতবাক হয়ে যায় যেন। আঘাত খেয়েও ফোঁস করবে যে—সে সামর্থটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছে আজ হরিদাস। বউ আর ছেলেমেয়েদের সাধ-আহ্লাদ মেটান চুলোয় যাক—মুখের দুটি অন্ন আর পরণের কাপড়জামাও যোগাতে পারে না সে। অন্নদার কথাগুলো সত্যি হ'ক বা মিথ্যেই হ'ক—প্রতিবাদই বা করবে সে কিসের জোরে! তবু আসন ছেড়ে উঠে পড়বার সময় হরিদাস আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বেশ চড়া মেজাজেই বলে ফেললে—বিয়ে আমি সখ করে করিনি—করবার ইচ্ছেও ছিল না। বিয়ের জন্যে তোমার বাপখুড়োরাই আমার আর মামার হাতে ধ'রে সাধাসাধি করেছিল—সে কথা ভুলে যেও না।

বারুদে আগুনের ছোঁয়াচ লাগল যেন সঙ্গে সঙ্গে। রাগ আগুন। রাগ চণ্ডাল। কথার ঘা খেয়ে ক্ষ্যাপা চণ্ডাল বারুদের মতই ফস করে জ্বলে উঠল। অগ্ন্যুদ্গার করতে গিয়ে কিন্তু হঠাৎ বিষোদ্গার করে বসল অন্নদা। দাঁতে দাঁত ঘসে বিকৃতকণ্ঠে বললে—মাষ্টারি করতে যায় না—গুষ্টির পিণ্ডি চটকাতে যায়। মরেও না তো! মলে বুঝতুম—মাথার উপর কেউ নেই—তাই কষ্ট পাচ্ছি—এমন হেনেস্থা হচ্ছে ছেলেমেয়েগুলোর। অমন মানুষের বেঁচে থেকে লাভ কি?

এমন মর্মান্তিক উক্তি এ সংসারে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। অভাবনীয়ও বটে। তাছাড়া দেহেমনে আগুন ধরিয়ে দেবার মত কথা। 'হ্যাঁ, ম'লে তোমরা দশহাত বার করে গিলতে-কুটতে পাও—না? এমনি ধরণের একটা উক্তি সেই মুহূর্তেই হরিদাসের বুকের দিক থেকে ঠেলে উঠে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। আবহাওয়া হয়ত আরও বিষিয়ে উঠত তা হ'লে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই নন্দীমশাই সদর-দরজার কাছে হাঁক দিলেন—হরিদাস—ও হরিদাস। সন্ধ্যারদিকে বাড়ী-বাঁধার সুদের দরুন তাগাদা দিতে এসেছিলেন নন্দীমশাই। দেখা পান নি তখন। দোকান থেকে ফেরবার পথে তাই একবার হাঁক দিয়ে দেখছেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি আঁচাবার জন্যে বাইরে চলে গেল হরিদাস।

রাগে—ক্ষোভে—বিতৃষ্ণায়—উত্তেজনায়—মুখদিয়ে অতর্কিতে অমন সব কথা বেরিয়ে পড়েছে। নিজের বিকৃতকণ্ঠস্বর শুনে সঙ্গে সঙ্গে নিজেই চমকে উঠেছিল অন্নদা। মাথার রক্ত চড়েছে। সারামুখ আগুন হয়ে উঠেছে যেন। দেহের মধ্যে অস্বাভাবিক একটা কাঁপন জেগেছে। বুকটাও ধড়ফড় করতে শুরু করেছে। ছেলেমেয়েরা সব খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছে অনেক আগে। অন্যদিন স্বামীর এঁটোপাতেই খেতে বসে

অন্নদা। হরিদাস পাশের ঘরে শোয়। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল। অন্ধকারে চোখে জল এসে পড়ল অন্নদার। জল গড়িয়ে পড়ল চোখের কিনারা বেয়ে। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জলে শুধু বালিশই ভিজল না—রাগ, ক্ষোভ, উত্তেজনা, অভিমান—ভিজে ভিজে সব কিছুই গলতে শুরু করল আস্তে আস্তে। ভাবলে—অদৃষ্ট—হ্যাঁ, নিজের অদৃষ্টই সব কিছুর জন্যে দায়ী। মানুষটার আর দোষ কি? না হ'লে—পাঠশালায় মাষ্টারি করাটা কি আর অপরাধ? ওটা কি আর কাজ নয়? তবে কুলীমজুরদেরও অধম দশা কেন মানুষটার? তিনমাস হ'ল মাইনে পায় নি লোকটা। একটানা শুধু মুখের রক্ত তুলে খেটে আসছে। এ কী সরকারী ব্যবস্থা! ধারধোর করে—যা ক'রে সংসার চালাচ্ছে মানুষটা—তা শুধু ভগবানই জানেন। রাগের মাথায় বিষের ফলার মত অমন সব কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বলে চরম অনুশোচনায় ছটফট করতে লাগল অন্নদা! মিথ্যে দোষ দেওয়া লোকটাকে। সখ ক'রে বিয়ে করেনি তাকে হরিদাস। মোটেই না। কথাটা নিতান্ত মিথ্যে। চকিতের মধ্যে সতের-আঠারো বছর আগেকার এমনি এক হেমন্তরাতের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে।

রাঙা চেলীপরা, কনে-চন্দনপরান একটি মেয়ে ঘরের মধ্যে আলপনা-আঁকা পিঁড়ির উপর বসে থরথর করে কাঁপছে। বাইরে উঠানে তখন সে কী তুমুল তর্ক আর অস্বাভাবিক চীৎকার! একসঙ্গে ঝড়-ঝঞ্ঝা আর বজ্রপাত চলছে যেন। সে কী উত্তেজনার মুহূর্তগুলো! দেখতে দেখতে একেবারে তার মাথার উপরই যেন বজ্রপাত হল। বরপক্ষ বাজের মতই ফেটে পড়ল না শুধু—বরাসন থেকে বরকে উঠিয়ে নিয়ে চলেও গেল সঙ্গে সঙ্গে। একে কালো মেয়ে। তায় একটা চোখের তারা পুরোপুরি ঘোলাটে। কানা বললেই হয়। দয়া করে অমন মেয়েকে এ জন্মের মত যারা উদ্ধার করতে এসেছিল—তারা শুধু মোটা পাওনার লোভেই রাজী হয়েছিল। এমনিতে দয়া দেখাবার মত মহানুভব নয় তারা মোটেই। সামান্ত দেনা-পাওনার কথা নিয়ে বচসা শুরু হয়। তাই থেকেই ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি। শেষটায় আকস্মিক বজ্রপাত। চকিতের মধ্যে উৎসব-আনন্দের সব আলোই নিভে গিয়েছিল সারা বাড়ীতে। কনের নিজের মা বেঁচে ছিল না তাই। পিসীমা কিন্তু কান্না চাপতে পারে নি। সে কান্না শুনে কনেও কেঁপে-ঘেমে কেমন যেন হতচেতনের মত হয়ে গিয়েছিল। সে কনে অন্য কেউ নয়—অন্নদা নিজে। অন্নদাদের গ্রামেই হরিদাসের মামারবাড়ী। পরম ভাগ্য তার—সে সময়ে মামারবাড়ীতেই ছিল হরিদাস। বাবা, মেজকাকা, সেজকাকা, পাশের বাড়ীর হালদার জ্যাঠা-মশাই—তখনই গিয়ে হরিদাসের মামার হাতেপায়ে ধরেছিল। মামাই ছিলেন ধরতে গেলে অভিভাবক। হরিদাস এককথায় বর সেজে পিঁড়িতে এসে বসেছিল সেদিন। একটা আদর্শের ঝোঁকেই সম্ভবত এমন রোগা ময়লা আধকানা মেয়েকে বিয়ে করতে একটুও দ্বিধা করেনি। বাবা পরে যা হ'ক একটা ব্যবসা করে দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবে বলে সকলের সামনে কথাও দিয়েছিল। কিন্তু কথা রাখে নি বাবা। নিজের মা বেঁচে থাকলে আজ হয়ত এ সংসারে অন্য রকমের হাওয়া বইতো। সবই অদৃষ্ট তার।

ভাবতে ভাবতে সাতআট বছর আগেকার বাপের-বাড়ীর আর এক ছবিও চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাত্র দু'টি দিনের দৃশ্যপট। কিন্তু কী মর্মান্তিক তা! সে আর মন থেকে মোছবার নয়। এ জীবনে ভোলবারও নয়। সেজভাইয়ের পৈতে উপলক্ষ্যে গিয়েছিল অন্নদা। মায়া, মিতা, দীপু—একটু বড়সড় হয়ে উঠেছে তখন। দীপা কোলে। কাজের বাড়ীতে পাঁচজন আসছে—যাচ্ছে। কত-কি কথা হচ্ছে। সরলাপিসীর বরাবরই খুঁটিনাটি সব কিছুর খোঁজ নেওয়া স্বভাব। রোয়াকে বসে এ-কথা সেকথা কইতে কইতে এক ফাঁকে সংখাকে

উদ্দেশ করে বললে—পৈতের শৈলকে কে কী দিলে লা বড়-বউ ?

মাসীরা, মামারা, পিসীমা, মেজবোন—অনেকে অনেক কিছুই দিয়েছিল। সোনার আঙটিই পেয়েছিল শৈল—পাঁচ ছ'টা। সব শুনেও ক্ষান্ত হয়নি গয়লাপিসী। অন্নদার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেছিল—তুই ভাইকে কী দিলি রে অন্ন ?

কিছুই দিতে পারেনি অন্নদা। লজ্জায় নিতান্ত সঙ্কুচিত হয়ে তাড়াতাড়ি রোয়াক ছেড়ে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিল অন্নদা। সৎমা সঙ্গে সঙ্গে ফিসফিস করে বলেছিল—পোড়া কপাল ! নিজেদের খেতেই জোটে না, তা ভাইকে দেবে কি ! ছেলেমেয়েগুলোর চেহারার হাল দেখে বুঝছ না ঠাকুর্ঝি—কী দশা !

কথাগুলো স্পষ্টই কানে এসেছিল। একবাড়ী কুটুম্ব। মেয়েরা সবাই রোয়াকে বসেছিল তখন। দারিদ্র্য যে এমন নিদারুণ লজ্জা বহে আনে—তা আগে জানতো না অন্নদা। মেজবোন অমনি কস্‌ করে বলেছিল—এত জাড়ে এসেছে তো পিসীমা—তা ছেলেমেয়ে কটার গায়ে দেবার গরমজামা আনেনি একটাও।

সৎমা সঙ্গে সঙ্গে রসান দিয়ে বলেছিল—হ্যাঁ, থাকলে তো আনবে। মাঘের জাড় বলে কথা ঠাকুর্ঝি। কথায় বলে—মোষের শিঙ নড়ে। ও মা ! একটা গরম জামা নেই গা—কারও গায়ে ! হি-হি করে কেঁপে মরছে সব। চোখে দেখে তো আর থাকতে পারি নে ঠাকুর্ঝি। কালী আর দুর্গার পুরনো দুটো জামা তোলা ছিল। বার করে দিলুম কাল। মেয়ে দুটো পরে বেঁচেছে।

দিয়েছিলই সত্যি। কিন্তু স্নেহের দান নয়। বুঝি বা—দয়ার দানও নয়। সৎমার কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন কাঁটার মত খোঁচা ছিল। শুনে—চোখে সেদিন জল এসে গিয়েছিল অন্নদার। পরের দিন সকালে সেও আর এক কাণ্ড। ছেলেমেয়েগুলো তখন কম হ্যাংলা ছিল না। বিশেষ ক'রে—দীপুটা 'খাই খাই' করতো সর্বক্ষণ। মিষ্টি খাবার দেখলে যেন দৃষ্টি দিয়ে লেহন করতো। লোভ সামলাতে পারেনি বেচারী। মেজবোনের ছেলের হাত থেকে আধখানা সন্দেশ কেড়ে নিয়ে নিজের গালে পুরে দিয়েছিল। সে কি কথার ছিরি—বোনের আর সৎমার। রান্নাঘর থেকে সব কথাই স্পষ্ট শুনেছিল অন্নদা। সৎমার সেই চাপা বিকৃত কণ্ঠস্বর মর্মে সেদিন অগ্নিশলাকার মতই বিঁধেছিল। সাত জন্মে যেন গিলতে পায় নি। হ্যাঁংলা কুকুরের মত হাঁই-হাঁই করছে সর্বক্ষণ। তোকে তো বলেই রেখেছি প'রু—ওদের সামনে তোর ছেলে মেয়েদের খাবার-দাবার দিস নে। খাবার জিনিষ দেখলে—কি রকম-ভাবে চেয়ে থাকে—দেখিস না ওরা। তারপর নজর লেগে তোর বাছাদের কিছু হ'ক !

ওরা—মানে, অন্নদার ছেলে মেয়েরা। কথাশুনে লজ্জায় ক্ষোভে দুঃখে রাগে একেবারে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সেদিন অন্নদা। তখনই ছুটে গিয়ে একবাড়ী কুটুম্বদের সামনেই ছেলেটাকে মেরে মেরে প্রায় আধমরা করে দিয়েছিল। মার খেয়ে দীপুটা যেন একেবারে নির্জীবের মত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। রাতে ঘুমন্ত ছেলের গায়ে হাত বুলতে বুলতে কত কান্নাই কেঁদেছিল সেদিন অন্নদা।

বোনেদের সঙ্গে স্নান করতে গিয়েও কম বিড়ম্বনা হয় নি সেবার অন্নদার। ঘাটে সই 'গঙ্গাজলের' সঙ্গে দেখা। বেশ বড়লোকের বাড়ীতে পড়েছে গঙ্গাজল। ভারিভারি এক গা গহনা গায়ে। নানান কথা কইতে কইতে অন্নদার নিরাভরণ দেহটার দিকে বারবার যেন কেমন এক ধরণের দৃষ্টি বুলিয়ে বুলিয়ে দেখছিল। বড় লজ্জা লাগছিল অন্নদার। একফাঁকে কস করে বলেছিল—হ্যাঁ রে, তোর সব গয়নাগাটি কি হল রে ? কাজের বাড়ীতে এসেছিস—তা অমন ন্যাড়া গা কেন ?

উত্তর দিতে কেমন যেন বাধোবাধো ঠেকেছিল অন্নদার। বঠঠাকুমাও ঘাটে ছিলেন। বুড়ী দুজনকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনিও সেই মুহূর্তেই কস করে বলেছিলেন—কেন, বাপ তো গা-সাজান

সবরকম গয়নাই দিয়েছিল বিয়ের সময়। হ্যাঁ লা—নাতজামাই সব ঘুচিয়েছে বুঝি?

ছলছল ক'রে চোখে জল এসে পড়েছিল অন্নদার। টপ-টপ করে গোটাকতক ডুব দিয়ে ফেলে সে-যাত্রায় কোনরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছিল অন্নদা।

সেবারে মেজকাকীমাকে নমস্কার করতে গিয়েও কম লজ্জা পায় নি অন্নদা! মেজকাকীমার কথাগুলো এখনো যেন কানে বাজছে। বেশ বেশ—থাক থাক। তা অত রোগা হয়ে গেছিস কেন মা? ছেলেমেয়েগুলোরও অমন কাঠিকাঠি চেহারা হয়েছে কেন বলতো? হ্যাঁরে, জামাই এখন অন্য কিছু করছে—না, আগের মতই সেই ছেলে পড়াচ্ছে?

অন্নদা ঘাড় নাড়তেই মেজকাকীমা সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল না, না—অন্য কিছু করতে বলিস বাপু। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে—পেট বাড়ছে দিনদিন। এ বাজারে পাঠশালে পড়িয়ে কি আর সংসার চলে মা?

মেজকাকীমার কণ্ঠস্বরে সত্যিই বড় সহানুভূতি মাখান ছিল। তবু—কেন কে জানে—অমন কথাও অন্নদার চোখেমুখে সেদিন যেন ঘনঘন লজ্জারই প্রলেপ দিয়েছিল। লজ্জা, কুণ্ঠা ক্ষোভ, দুঃখ আর নিদারুণ অস্বস্তি—স্মৃতি মন্থন করে এসব ছাড়া এখন আর কিছুই হাতড়ে পাচ্ছে না অন্নদা। নিজের বাপের বাড়ী হলে কি হবে! সেবারে গিয়ে স্নেহ-মমতা কি প্রীতি-অনুরাগের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়নি সে একটুও। নিতান্ত অবজ্ঞা—নয়ত করুণার দৃষ্টি দিয়েই দেখেছিল সবাই।

একে একে নানান ভাবনা এখন ভর করছে ওর মনে। ছেলেমেয়েগুলো এখনো তেমন হ্যাংলা আছে। ছোট ক'টার হ্যাংলামি যেন আরও বেড়েছে। প্যাঁকাটি-প্যাঁকাটি চেহারা হয়েছে সব ক'টারই। ভাল জামাকাপড় কি ফ্রক-প্যান্ট নেই কারও। এবারও বোনের বিয়েতে ভালগোছের একখানা কাপড়ও হয়ত দিতে পারবে না। বাপের বাড়ী গেলে সেবারের মত একই ধরণের সব ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে হয়ত। পদে পদে লজ্জায় মুষড়ে পড়তে হবে অপদস্থ হতে হবে। নিজের সেই অবশ্যম্ভাবী অবস্থাটা কল্পনা করে শিউরে উঠল অন্নদা। বাপেরবাড়ী যাবে—কি যাবে না—এ চিন্তা হঠাৎ তখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের দোলায় ফেলল অন্নদাকে। 'না—না' করে প্রবল একটা আপত্তিও মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। শুধু মাথা চাড়া দিলে না, বিন্ধ্যের মত বাধা হয়ে দাঁড়াল যেন। যাওয়ার সব সংকল্পই এলিয়ে পড়ল আস্তে আস্তে। সব উদ্দীপনাও সঙ্কুচিত হ'য়ে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। আবার স্বাভাবিকতায় ফিরে এল অন্নদা। মাঝ রাত্ত পেরিয়ে গেছে কখন। ঘুম যেন ওৎপেতেই ছিল। শান্তভাবটুকু ফিরে আসতেই এবফাঁকে অন্নদার চোখ জুড়ে এল। ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সে।

* * * *

পরদিন খুব সকালেই বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল হরিদাস। বেলা আটটা নাগাদ হনহন করে বাড়ী ফিরল। হাতে একঠোঙা মিষ্টিখাবার—আর কাগজে মোড়া লালপেড়ে রঙীন শাড়ী একখানা। সারামুখে সকালবেলার মেঘমুক্ত আকাশের মত প্রসন্ন-সুন্দর হাসি। ঘরে ঢুকেই বললে—কি গো—শুয়ে রয়েছো যে এখনো? যাবে কখন তা হ'লে? এই নাও কাপড় আর খাবার রইলো। টাকা ক'টা কুলুঙ্গীতে রাখছি—সঙ্গে নিও বুঝলে? কণ্ঠস্বর পরম তৃপ্তিতে ভরা। হাসতে হাসতে আবার বললে—কার মুখ দেখে উঠেছিলুম কে জানে। গিয়ে বলতেই হারানবাবু এক কথায় কুড়িটা টাকা বার করে দিলেন।

নিতান্ত নিরুত্তাপ-কণ্ঠে অন্নদা সঙ্গে সঙ্গে বললে—দিক গে। যাওয়া হবে না আমাদের। যাব না আমি। শরীর খারাপ।

বিস্মিত কণ্ঠে হরিদাস বললে—সে কি গো! রাতের মধ্যে কি এমন হল তোমার! কাপড়, মিষ্টি সব খরচা করে কিনে নিয়ে এলুম। আর—

অন্নদা সঙ্গে সঙ্গে বললে – ভালই করেছ। শাড়ীখানা মায়া পরবেখন। ফ্রক আর ওকে মানায় না মোটেই। খাবারও ফেলা যাবে না – ভয় নেই। সাতজন্মে তো মিষ্টি খাবার খেতে পায় না ছেলেমেয়েগুলো – খেয়ে বাঁচবে।

রাগের কথা নিশ্চয়ই। তেমনি বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে হরিদাস আবার বললে – শিবু যাতায়াতের দরুণ দশটা টাকা দিয়ে গেছে বললে। তা –

কথার মাঝেই অন্নদা বাধা দিয়ে বললে – দিয়ে গেছে তা কি হবে। দীপুর ইস্কুলের মাইনে পড়ে আছে ক'মাসের। নন্দীমশাইও বাড়ীর সুদের জন্যে রোজ এসে তাগাদা দিচ্ছে। ও টাকায় যাহ'ক করা যাবে।

মাঝরাত্তির থেকে সকালের মধ্যে কী যে হয়েছে অন্নদার তা ভেবে পেলো না হরিদাস। রাগ, অভিমান – না সত্যিই শরীর খারাপ হল আবার! মাস দুই হ'ল – মাঝে মাঝে ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে অন্নদার। দিন দিন কেমন যেন কাহিল হয়ে পড়ছে বেচারী। অতিমাত্রায় অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠল হরিদাসের মনটা। তাড়াতাড়ি বিছানার খুব কাছটিতে এগিয়ে গিয়ে বললে – দেখি তোমার গাটা। জ্বর হ'ল না কি গো আবার?

কথাটা বলতে বলতে গায়ের উত্তাপ অনুভব করবার জন্যে হাতটা বাড়ালে হরিদাস।

যাও, কচি খুকী নাকি আমি? গায়ে হাত দিয়ে আবার দেখবে কি শুনি? সরো, ছেলেমেয়েরা ঘুরঘুর করছে – দেখুক কেউ। ব'লে ভ্রূভঙ্গী করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল অন্নদা।

ক্ষোভ, দুঃখ, রাগ, অভিমান, উত্তেজনা, উদ্দীপনা কোন কিছুরই চিহ্ন নেই অন্নদার মুখে। চোখে শুধু অপরিসীম অনুরাগভরা দৃষ্টি। চেয়ে চেয়ে আরও বিস্মিত হয়ে উঠল হরিদাস। না যাওয়ার কারণ কি – তা ভেবে পেলে না।
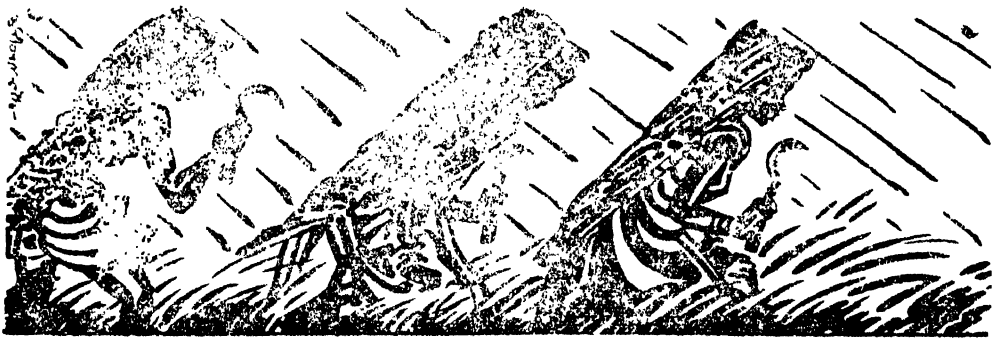
অহিংসা

কানাইলাল দত্ত

অহিংসার ইতিবাচক সংজ্ঞা পাই নাই। যাহা হিংসা নয় তাহাকেই আমরা অহিংসা বলি। মারামারি কাটাকাটি প্রভৃতি বহিরঙ্গের হিংসা এবং অসূয়া মাৎসর্য— মানসিক হিংসার ফসল। এই উভয়বিধ হিংসার মধ্যে মানসিক হিংসা অধিকতর ক্ষতিকর। মনে যাহার হিংসা প্রবৃত্তি নাই তিনি যদি কখন কাহাকেও আঘাত করেন তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত কম হিংসা হয়। মাছ খাওয়া অপেক্ষা খাদ্যে ভেজাল দেওয়াকে গান্ধীজি অধিকতর হিংসা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাছ যাহার খাদ্য বলিয়া স্বীকৃত তাহার নিকট মৎস্যাহার হিংসা নয়। গান্ধীজি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যুগে যুগে হিংসা অহিংসার ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মহাভারতের অর্জ্জুন যাহাকে হিংসা বা অহিংসা মনে করিতেন আমরা তাহা করি না।

হিংসা পরিহার করা কথাটিও নেতিবাচক কথা। মহাত্মাজি কখনও নেতিবাচক আন্দোলনের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যান নাই। প্রতিটি আন্দোলনেই তিনি যেখানে কিছু পরিহারের কথা বলিয়াছেন সেখানেই সৃজনশীল রচনাত্মক কর্মের দ্বারা শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। যেমন, বিলিতি কাপড় বর্জ্জনের আহ্বানের সঙ্গে সঙ্গে খাদি উৎপাদানের পরামর্শ। বিলিতি বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া জনসাধারণ পরিধান করিবেন কি? দেশীয় কলের উৎপাদন প্রয়োজনের এক অতিশয় ক্ষুদ্র অংশ মাত্র মিটাইতে তখন সমর্থ ছিল। সুতরাং বিলিতি বর্জ্জন করিয়া মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্য গান্ধীজি খাদি উৎপাদন ও ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিলেন। একদিকে বর্জ্জন, আর একদিকে গ্রহণ। ইহাকেই আমরা বলি সৃষ্টির দ্বারা বিলোপ। অন্যেরা শুধু ধ্বংস ও বর্জ্জনের হোতা।

অহিংসার ক্ষেত্রেও একই জিনিস লক্ষ্য করি। অহিংস সাধনায় মানুষকে অস্ত্রত্যাগ করিতে হয় এবং শারীরিক বলপ্রয়োগ হইতে বিরত থাকিতে হয়। সেই অবস্থায় হিংসাশ্রয়ীদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্যও গান্ধীজি পথ নির্দেশ করিয়াছেন। নোয়াখালির শ্মশানভূমিতে পৌঁছাইলে জনৈক যুবক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন সেখানকার সেই হিংস্র পৈশাচিকতার মধ্যে তাহারা কি করিয়া আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে পারেন। উত্তরে গান্ধীজি বলেন: By learning to die bravely— বীরের মত মরিতে শিখিয়া। জনৈকা নারী বিপ্লব-কর্মীকে এই সময় গান্ধীজি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাকেও এই পথ-নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সেই মহিলাকে তিনি বলিয়াছিলেন—বিভ্রান্ত ও ত্রস্ত নারীদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত না করিয়া তাহাদের স্ব স্ব গৃহে অবস্থান করিতে নির্দেশ দিন। আপনারা তাহাদের সহিত বাস করুন, এবং তাহাদের বলুন—আমাদের সকলকে হত্যা না করিয়া কেহই আপনাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। ইহা করিলে সকল বঙ্গনারীই বীর রমণী হইয়া উঠিবেন।

ব্রিটিশ সৈন্য ও পুলিশ হিংস্র এবং নির্মম নৃশংস অত্যাচার দ্বারা বিয়াল্লিশের আগষ্ট আন্দোলন দমিত করিয়াছিল। ইহার ফলে নেতৃত্বহীন জনতা ভয়ানক

ভীত হইয়া পড়ে। মুক্তির পর গান্ধীজি এই জনসাধারণের মনে অহিংস শক্তি ও সাহস সঞ্চারের জন্ম গঠনকর্মের প্রবর্তন করেন। একই পদ্ধতিতে তিনি নোয়াখালিতে কাজ আরম্ভ করেন এবং হিন্দু মুসলমান সকলের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। নোয়াখালিতে গান্ধীজি যে মুসলীম বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হন তাহা জনসাধারণের সক্রিয় সমর্থনহীন রাজনৈতিক নেতাদের সৃষ্ট বিরুদ্ধতা।

অহিংসা সৃষ্টিধর্মী হইলেও মানুষের পক্ষে পূর্ণ অহিংস হওয়া সম্ভব নয়। অনেকে বলেন একের বিলোপের উপর কোন না কোন আকারে অপরের বিকাশ নির্ভরশীল। সাদা চোখে ইহাই দেখি এবং সাধারণ বুদ্ধিতে তাহাই বুঝি। গরু-মহিষ-মানুষ হত্যা বন্ধ করিলে বাঘকে অনাহারে মরিতে হয়। মানুষের খাদ্য-তালিকায় প্রাণীর সংখ্যা কম নয়। যাহারা নিরামিষ-ভোজী তাহারাও জড়জীবন ভোজন করেন। আমাদের চলা ফেরা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের সময়ও অজ্ঞাতে আমরা জীব হত্যা করিতেছি। সুতরাং পূর্ণ অহিংসা বোধহয় সম্ভবপর নহে। তথাপি গান্ধীজির কর্মজীবন অহিংসা সাধনার মাধুর্য্যে প্রসারিত ও শাশ্বতের ভূমিতে দীপ্যমান এই সাধনার পথিকৃতের গৌরব বুদ্ধদেবের। "বুদ্ধের বাণী" প্রবন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধ-পূর্বযুগের মানব-চরিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন তাহারা "ঈশ্বরের জন্ম নিজের জীবন বলি দিতে পারে, আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ঈশ্বরের নামে নরহত্যা করিতে পারে।" মানুষের এই আচরণ ভ্রান্ত বিশ্বাস সঞ্জাত। মানুষের এই বিশ্বাস যেমন অপরকে আঘাত করিত, তেমনি নিজেকেও। প্রসঙ্গক্রমে বিবেকানন্দ সন্তান বিসর্জ্জনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সন্তান বিসর্জ্জন বা নরবলির মধ্যে যাহারা কল্যাণ দেখিতেন তাঁহারা যে ভ্রান্ত সে কথা আজ সকলেই স্বীকার করেন। বুদ্ধদেবের সাধনার সুফল পাইতে আমাদের বহু শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধের সেই সাধনার পথ ধরিয়া মহাত্মা গান্ধী ব্যক্তি জীবনের অহিংসাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামূহিক কর্মে প্রসারিত করিয়া মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এক নূতন দিগন্তের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহারও সুফল পাইতে মানব-সমাজকে হয়তো আরও কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করিতে হইবে। অনাগত ভবিষ্যতের সেই সুপ্রভাতকে ত্বরান্বিত করিবে গান্ধী মহাজীবন ও কর্মের স্মরণ মনন ও অনুসরণ। এই সাধনার পথেই বর্তমানের দেশ ও কালের গণ্ডীদ্বারা খণ্ডিত মানব-অনুভূতি বিশ্বব্যাপ্ত হইবে।

আজ আমি একজন বঙ্গসন্তান নিহত হইলে যতটা বেদনাহত হই একজন ইংরেজ বা আমেরিকানের জন্ম ততটা শোকাতুর হই না। ইহাও ভ্রান্ত আচরণ। বিবেকানন্দ পূর্বোক্ত প্রবন্ধেই লিখিয়াছেন, বিশ্বের যে কোন অংশের মানুষের উপর আঘাত যেন আমরা নিজের আঘাত বলিয়া মনে করিতে পারি। গান্ধীজির অহিংসাব্রতের মূল লক্ষ্য ইহাই। তিনি বলিলেন, ভ্রমবশতঃই মানুষ হিংসা করে। হিংসা ঘৃণা, অহিংসা ভালবাসা। হিংসা পশুর ধর্ম অহিংসা মানুষের ধর্ম। যিশুখ্রীষ্টও অনুরূপ কথা বলিয়াছেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়াও তিনি তরবারি ব্যবহারকারী জনৈক শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছেন—all that take the sword shall perish with the sword. হিংসা শুধু ধ্বংসই আনে। হাতিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষটিরও বিলোপ ঘটে।

অহিংসার প্রকৃত তাৎপর্য এবং ইহার দূরপ্রসারী কল্যাণশক্তি সম্পর্কে গান্ধীজির বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। অহিংসা সাধনায় তাঁহার গভীর নিষ্ঠার ও ঐকান্তিকতা বিশ্ববাসী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। অহিংসার পথে তিনি পূর্ণতা লাভের দাবী করেন নাই। তাঁহার সাধনাকে তিনি টুটা ফুটা বা ভাঙ্গাচোরা অহিংসা বলিয়াছেন। মহা প্রয়াণের অব্যবহিত পূর্বে দিল্লীর প্রার্থনা সভায় তিনি বার বার বলিয়াছেন আমি ও আমার

সঙ্ঘের অন্যান্য লোকেরা যাহাকে অহিংসা বলিয়াছি তাহা খাঁটি অহিংসা নয়, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নামে অহিংসার ক্ষীণ অনুকরণ মাত্র। কল্যাণময় যাহা তাহার স্বল্পও মহৎ ভয় দূর করে। অন্য প্রসঙ্গে হইলেও গীতা বলেন— স্বল্পমস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়া।

গান্ধীজিও অনুরূপ কথাই বলিতেন। ফজলুল হক সাহেব একদা গান্ধীজির নিকট মুসলিম লীগের গুণ্ডাবাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। গান্ধীজি উাঁহাকে অহিংস অসহযোগের পথে প্রতিকারে ব্রতী হইতে উপদেশ দেন। এই পথে যে গুণ্ডাবাজি বন্ধ হয় তাহাতে মহাত্মাজির পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। পরন্তু তিনি হক সাহেবকে বলেন, অহিংসা অসহযোগের ব্যবহারে ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও ব্রিটিশ শক্তির সশস্ত্র বাধার মোকাবিলা করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে আনিয়া দিয়াছে।

গান্ধী-প্রবর্তিত ও আচরিত অহিংসা কেবল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করিয়াই নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। এশিয়া আফ্রিকার বহু পরাধীন দেশ যে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ করিয়া মানব-ইতিহাসে একটি নবীন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে তাহার মূলেও গান্ধীজির এই অহিংসা সাধন লক্ষ্য করি।

সর্ব মানবের পক্ষে নূতনতর এই বৈপ্লবিক নীতিকে যথার্থ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দান করা এখনও সম্ভবপর হয় নাই। উকিলি বুদ্ধি দিয়া ইহার অনেক ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু তাহার দ্বারা সত্য ম্লান হয় না।

ত্রিশ বৎসরকাল সক্রিয় অহিংসা সাধনার পর স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে হিংসার দাবানল স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংসার অবদানকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। মানব চিত্তে সংশয়ের সঞ্চার হইয়াছে। ভারতবর্ষের সেই ইতিহাস এক মহা দুঃস্বপ্নের কলঙ্কময় অধ্যায়। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষপুটে মুসলিম লীগের প্রতিক্রিয়াশীলতা ধীরে ধীরে তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ তাহাকে নিজের বশে রাখিতে যখনই অসুবিধা বোধ করিয়াছে তখনই হিন্দুর উপর লেলাইয়া দিয়াছে। প্রভুভক্ত শিকারী কুকুরের ন্যায় তাহারা হিন্দুদের ক্ষতবিক্ষত করিতেছে এই দৃশ্য শাসক ইংরেজের চিত্তে খুসির ঝড় ও আনন্দের তুফান তুলিত।

কলিকাতার কুখ্যাত ডাইরেকট অ্যাকশান পর্যন্ত ইহা শহরের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষের সাতলক্ষ গ্রামের কোটি কোটি মানুষের শান্তি ও সম্প্রীতি শুভেচ্ছা ও নির্ভরতা ইহার দ্বারা কোন দিন বিঘ্নিত হয় নাই। কিন্তু ১৯৪৬ এ কলিকাতা মহানগরীর বুকে সরকারী হিসাবে ৫ হাজার মানুষ হত্যা ও পনের হাজার জখম করিয়াও সাম্প্রদায়িকতার ফ্রাঙ্কষ্টাইনের পৈশাচিক প্রবৃত্তি সংযত হইল না। ভারতবর্ষের গ্রামের পর্ণ কুটির প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার বছরের শান্তি ও সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক বিশ্বাসের সমাধি রচনায় ঘাতকেরা হাত লাগাইল, এই আগুন ও মানুষের সেই পৈশাচিকতা নোয়াখালির গ্রামে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। ক্রমে বিহার পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতবর্ষের দিকে দিকে প্রসারলাভ করিল। ইংরেজ ধরা পড়িয়া গেল। তাহার আত্মরক্ষার আর কোন উপায় রহিল না। অপসৃত হইবার পূর্বে সে ভারতবর্ষ হইতে পলায়ন করিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিল। ইংরেজ পাকিস্তান সৃষ্টি করিয়া তাহার অপকর্মের তিক্ত বহিরঙ্গে মিষ্ট প্রলেপ দিল। ভারত-পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষ গত একুশ বৎসর যাবৎ সেই হিংস্রতা ও শঠতার খেসারৎ দিতেছে। হিংসা বিদ্বেষের ফল যে কাহারো পক্ষেই ভাল হয় না ভারত পাকিস্তানের বর্তমান দুঃখকর বেদনাময় অবস্থা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কয়েকজন ক্ষমতালোভী মানুষ ছাড়া ভারত-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কেহই আজ সুখী নন। আমাদের এ আহত বিবেকের প্রথম বিকৃত ও অভিশপ্ত প্রকা' গান্ধী-হত্যা। গান্ধীজিকে হত্যা করিয়া অহিংসার গা' স্তব্ধ করা যায় নি।

এত হিংস্রতা সত্ত্বেও বিনোবাজি বলিয়াছেন, অহিংসা জয়যুক্ত হইতেছে। ভুদানযজ্ঞ পত্রিকায় তাঁহার কথা

মৃতের যে অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে পাই: "অহিংসার কাছে ইহা (হিংসার প্রসার) কোন বড় সমস্যা নয়।...সাদার উপর দাগ শীঘ্র নজরে পড়ে। মানুষ স্বভাবত: অহিংস। তাই সামান্য মাত্র বিরোধী কিছু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকের নজরে পড়ে। অল্প হইলেও অধিক মনে হয়...। হিংসার প্রাদুর্ভাব দেখা গেলেও অহিংসার প্রভাব ঠিকই আছে।......ভাল কাজ হঠাৎ নজরে পড়ে না" বিনোবাজি এই প্রসঙ্গে আরও যাহা বলিয়াছেন তাহা আমি এইরূপ বুঝিয়াছি: কোটি কোটিতে একটি মা সন্তানকে হত্যা করেন। কোটি কোটি মায়ের সন্তান-স্নেহ আমাদের চিত্তকে তেমন উদ্রিক্ত করে না যেমন করে একটি মায়ের সন্তান-দ্রোহ। অহিংসা স্বাভাবিক বলিয়া তাহা নীরবে নিঃশব্দে তাহার কাজ করিয়া যাইতেছে এবং অহিংসা অস্বাভাবিক বলিয়া তাহার প্রকাশমাত্র আমরা বিচলিত হই। হিংসা মানুষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়াই এই রকম হয়। তথাপি আমাদের শান্তচিত্তে ভাবিয়া দেখা দরকার মানুষ যে সুন্দর ও শান্তিময় বিশ্বের স্বপ্ন দেখে তাহা হিংসা বা অহিংসা কোন পথে আমরা লাভ পাইব এবং পাইলে সুরক্ষিত রাখিতে পারিব। কলিকাতা—নোয়াখালি—বিহারের ঘটনা যত নিদারুণ শোকাবহই হোক না কেন তাহা মানব-ইতিহাসের সামান্য একটা দুর্ঘটনা মাত্র। বিনোবাজিও এই কথা বলিয়াছেন। দুঃস্বপ্নের এই অন্ধকার মুহূর্তগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করা মানবধর্মানুগ আচরণ হইতে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর উন্নততর বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞানের সমৃদ্ধি সত্ত্বেও বহুবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিকট আমরা এখনও একান্ত অসহায়। এই তো সেদিন, কত সন্তর্পণে ও শ্রমে গড়া জলপাইগুড়ি চোখেরপলকে এক-প্রকার ভাসিয়া গেল। জলপাইগুড়ির এই বানভাসি সত্য, কিন্তু তাহার পরেও আর এক পরম সত্য আছে। তাহা হইল: মানুষ এই বন্যাকে, এই ধ্বংসকে শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না; বহুযুগের চেষ্টা ব্যর্থ হইল বলিয়া সে গড়ার কাজ ছাড়িয়া জঙ্গলের বন্য-জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তন করিবে না। কালরাত্রির মধ্যেই মানুষ ধ্বংসের শ্মশানেই নূতন সৃষ্টির মহাযজ্ঞ সুরু করে। হিংসা অহিংসার ব্যাপারেও এই কথা সত্য। সুতরাং কোথায়ও হিংসার বীভৎস প্রকাশ দেখিয়াই অহিংসা সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা ও কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। পরন্তু বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও অহিংসার মার্গে স্থিতিশীল থাকিবার সাধনা সর্বপ্রযত্নে অব্যাহত রাখিতে হইবে। ইহার পশ্চাদ্গতি সম্ভব নহে। তাই তীব্রতম দুঃখ এবং তীক্ষ্ণতম আঘাত পাইলেও মানুষ আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, সামনে চলে।

ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত মহাত্মা গান্ধী শতবার্ষিকী গ্রন্থে সীমান্ত গান্ধী (খান আবদুল গফুর খান) Recollections শীর্ষক একটি চমৎকার লেখায় গান্ধীজির অহিংসা প্রসঙ্গটির মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের পাঠানগণ অতিশয় দুর্ধর্ষ। পান হইতে চুন খসিলেই তাহারা মারামারি কাটাকাটি করিতে প্রবৃত্ত হইতে অভ্যস্ত ছিলেন। বল-প্রয়োগে পরাভূত করা ভিন্ন বিরোধ মীমাংসার দ্বিতীয় কোন পন্থা তাঁহারা স্বীকার করিতেন না। ইঁহাদের মোকাবিলা করিতে ইংরেজরা একই পদ্ধতি অনুসরণ করে। সামান্য কারণেই ইংরেজরা অমানুষিক নৃশংস অত্যাচার করিত। সে অত্যাচার এতই নির্মম ও তীব্র ছিল যে, বহু বীর পাঠান তাহার আঘাতে ভীরু হইয়া পড়েন। পাঠানেরা জেল ও ইংরেজ সেপাইয়ের অত্যাচারে এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত হন যে, তাঁহারা সেপাই-দের সঙ্গে কথা বলিতেও সাহসী হইতেন না, অনেক সময় পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেন। পরে সীমান্ত গান্ধীর নেতৃত্বে এই জাতি অহিংসা সাধনা সুরু করেন। তখন দেখা গেল ভীরুতা উঠিয়া গিয়াছে। যাঁহারা স্বভাবভীরু তাঁহারাও যেন এই অহিংসার মন্ত্রে

বীরে পরিণত হইলেন। এখন আর লুকোচুরি নয়, সকলেই হাসিমুখে জেলে যাইতেছেন, ভয় করেন না কাউকে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে হিংসার প্রাবল্য ঘটে। কিন্তু উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এই পাপ স্পর্শ করে নাই। অথচ সাধারণবুদ্ধিগ্রাহ্য বিচারে সেই এলাকাটা ঐ সময়ে হিংসার প্রকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল স্থান ছিল। সীমান্ত গান্ধী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া উক্ত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—অহিংসা সাধনা বীরের সাধনা (ইহা গান্ধীজিও বারবার বলিয়াছেন) ভীরু মানুষের নয়। পাঠানেরা প্রকৃতই বীর বলিয়া তাঁহারা অহিংস থাকিতে সক্ষম হন, সেখানে কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই।

দূর অতীতের অন্ধকারময় দিনে দুজন অপরিচিত মানুষে সাক্ষাৎ ঘটিলে জন্তুজানোয়ারের মত লড়াই শুরু হইয়া যাইত না কি? অন্ধকার গুহাবাসী মানুষের সেই কলঙ্ককাহিনী আজিকার সুসভ্য মানবসন্তানেরা বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিবেন। কিন্তু মানব-চরিত্রের মূলে লক্ষ্য করিলে আমরা বোধ হয় ভিন্নতর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। অনেক সমাজবিজ্ঞানী অবশ্য বলেন, আদিম মানুষ অপেক্ষা বর্তমান মানুষ হিংস্রতর। আর একদল বলেন: হিংসা হইল মানুষের সহজ প্রবৃত্তি। আঘাত করিলেই প্রত্যাঘাত করিবার বাসনা হৃদয়ে জাগ্রত হয়।

আদিম যুগের নরনারীরা আত্মরক্ষার জন্য একমাত্র তাহার দেহশক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। দেহবলে মানুষ পশুরাজ্যে হীনবল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তাহাকে প্রস্তরখণ্ড তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে শিখাইল। যে মুহূর্তে তাহার এই বিদ্যা বা কৌশল আয়ত্ত হইল তখন হইতে মানুষ দেহবলের ন্যূনতা সত্ত্বেও পশুরাজ্যের উপর প্রভুত্বের অধিকারী হইল। এই অধিকার ক্রমে ক্রমে প্রসারিত হইয়া পশুরাজ্য অতিক্রম করিয়া মানবসমাজে প্রবেশ করিয়াছে।

আঘাত প্রত্যাঘাত আনিয়া দিবেই। ক্রম প্রসারমান মানব-অধিকার মানুষকে যে বস্তুগত সঞ্চয়ের অধিকার দিল সেখানেই সব চাওয়া এবং সকল পাওয়ার শেষ হইল না। জৈব প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে যে জীবন যাহাকে প্রাজ্ঞ পুরুষেরা বলিয়াছেন 'মননেন জীবিত' মানুষের পক্ষে সেই জীবনের আহ্বান বেশিদিন উপেক্ষা করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। শতশত অভাব এবং অসুবিধার মধ্যেও মানুষ ফলের প্রয়োজন ভুলিয়া ফুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া রহিল, ভালবাসিয়া জয় করিতে চাহিল, নিজে স্বেচ্ছায় কষ্ট ভোগ করিয়া অপরকে শোধরাইবার চেষ্টা করিল। সভ্যতার সেই উষাকালেই অহিংসার পথে মানুষের প্রথম সচেতন পদসঞ্চার ঠিক যে কবে তা বোধ হয় জানা যাইবে না। তৎসত্ত্বেও এ কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, দূর অতীতের সেই যাত্রালগ্ন হইতেই হিংসা মানব-জীবন-বৃত্ত হইতে ক্রমাগত দূর স্তরে অপসারিত হইতেছে।

আত্মপর স্বজন পরিজন সকলের সাহিত মিলিয়া মিশিয়া আমরা বাস করিতেছি। একে অন্যের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে সকলেই আগাইয়া আসি। মানুষ স্বভাবতই অহিংস বলিয়া ইহা সম্ভবপর হয়। কিন্তু লোভ ও লালসা এই স্বাভাবিক আচরণের মধ্যে কখন কখন বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। তাই মানবকল্যাণকামী হিতব্রতী মানুষ মধ্যে মধ্যে মানব-সমাজকে হিংস্রতা পরিহার করিয়া অহিংসার সার্বিক সাধনার কথা শুনাইয়া থাকেন। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বর্তমান যুগের এই অহিংস সাধক মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

অহিংসা সাধনা ও সত্যাগ্রহ প্রবর্তনের মধ্যেই গান্ধীজির শ্রেষ্ঠত্ব—একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। গান্ধী-অনুরাগীজনেরা যুক্তিযুক্ত ভাবেই বিশ্বাস করেন এই পৃথিবীতে মানুষকে পূর্ণ অহিংসাব্রতী হইতে হইবেই। অথবা নিশ্চিহ্ন হইবার ঝুঁকি লইতে হইবে। গান্ধীজি যখন অহিংসা ব্রত লইয়া আবির্ভূত হন তখন

আমরা ভয়াবহ আনবিক বোমার কথা কিছু মাত্র জানি না। গ্যাসচেম্বার, বীজাণু বোমা, আগুনে বোমাও তেমন জ্ঞাত ছিল না। গোটা পৃথিবীটা সমূলে ধ্বংস করিতে যে পরিমাণ আনবিক বোমার প্রয়োজন অপেক্ষা বহু বেশি বোমা বিভিন্ন শক্তিশিবিরে এখনই মজুদ আছে। প্রয়োজন কেহ অনুভব, করিয়াছেন বলিয়াই এগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। ঐগুলি যাঁহারা ব্যবহার করিতে চান তাঁহারা পৃথিবীর ধ্বংস হইবে জানিয়াই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। হিংসার ইহাই একমাত্র পরিণতি। সে নিজে মরে এবং সকলকেই মারে। কিন্তু আসলে ইহারা নিজেরা মরিতে চান না। বাঁচিবার জন্য ইহাদের এই অসম্ভব মারাত্মক উদ্যোগ। কিন্তু ঐ পথে যে বাঁচা যায় না সে বুদ্ধিটুকু তাহাদের নাই। কথাটা শুনিতে অবাক লাগে। বুদ্ধিহীন বলিলে সুবিচার হইল না। ইহারা সকলেই বুদ্ধিমান, কিন্তু ভীরু বিশ্বাসহীন লোভী। দীর্ঘদিনের আচরিত অভ্যাসের শৃঙ্খল হইতে ইহারা নিজেদের মুক্ত করিতে পারিতেছে না। একটু শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখুন তো রাশিয়া বা আমেরিকা যদি আনবিক বোমা ছোড়াছুড়ি আরম্ভ করে তবে কি অবস্থা হয়! এখন কে আগে বোমাটা মারিবে এবং কতখানি ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সঙ্গে মারিতে পারিবে তাহার কিছু সুবিধা হইবে—অতএব নিশিদিন নিদ্রাহীন শঙ্কিত সতর্কতার মধ্যে কালকাটানো ভিন্ন কোন উপায় নাই। এই পথ বাঁচার পথ নয়, পাগল হইবার পথ, মৃত্যুর পথ। বর্ত্তমান সময়ের মত দুঃসময় ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে কখন দেখা দেয় নাই। আজ হয় অহিংসা নহিলে সমূলে সবংশে বিনাশ—ইহার কোন বিকল্প নাই।

অধিকাংশ মানুষ (নেতা ও সাধারণ) স্বীকার করেন অহিংসা ভাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথা বলেন ইহা অবাস্তব এবং বর্ত্তমানের সমস্যা সমাধানের অনুপযোগী। অনেকে ইহাও বলেন—আমার অহিংসা বিলাসের সুযোগ লইয়া অপরে আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। গান্ধীজির জীবদ্দশায় এ সকল প্রশ্ন উঠিয়াছিল। তিনি ইহার বিস্তারিত ও অপূর্ব সুন্দর আলোচনা করিয়াছেন। সে সকলের পুনরাবৃত্তি করিব না। এই মাত্র এখানে বলিলে চলিবে যে, আমাদের ভীরুতা আমাদিগকে অস্ত্রের উপর নির্ভর করিতে শিখাইয়াছে।

দাঙ্গার সময় মানুষ পশুর অপেক্ষা অধম ও পিশাচ হয়। তথাপি দেখা যায় তাহার মধ্যে মানুষকে রক্ষা করিতে মানুষ আপন প্রাণ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দুঃখীজনের দুঃখ দূর করা, শরণাগতকে রক্ষা করা আমরা মানবিক কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। ইহা হিতবাদী মানুষের কথা। হিতবাদী মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন না করিয়া যতটুকু সম্ভব ততটুকু করেন। আর বেশি পারেন না। কিন্তু অহিংস-সাধক নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়াও অন্যের মঙ্গল সাধন করেন। ভগবৎ বিশ্বাসের ফলে অহিংসাব্রতীর এই প্রত্যয় জন্মে এবং প্রার্থনার দ্বারা তাহাতে বিশ্বাস দৃঢ় হয়। দু চারিজন ভগবদ-বিশ্বাসীর আত্মাহুতির পর বহু স্থানে দাঙ্গা বন্ধ হইতে দেখা গিয়াছে। আত্মদানকারী সকলেই নিশ্চয় অহিংসায় বিশ্বাসবান ছিলেন না। গান্ধীজি বলিয়াছেন—অহিংসা এই পথে কাজ করে। ঐ পথে শুভ শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়া অশুভ শক্তিকে একান্তে ঠেলিয়া দেয়। ফলে, সমগ্র সমাজের শুভ শক্তি জাগ্রত হইয়া নিপীড়িত জনতাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

অহিংসা আলোচনার শেষ হয় না। ইচ্ছা করিলেই সপক্ষে ও বিপক্ষে বিস্তর যুক্তিতর্ক উত্থাপন করা যায়। কিন্তু বুদ্ধির বিচারকে যদি আমরা হৃদয়ের বিচারের নিম্নে স্থান দেই তাহা হইলে সকলেই সহজেই বুঝিব—অহিংসা ভিন্ন পথ নাই। মানুষ কি ইচ্ছা করিলেই অহিংসাব্রতী হইতে পারে? সর্ব ক্ষেত্রের মত এখানেও প্রস্তুতির প্রয়োজন রহিয়াছে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হইয়াছে। এই কর্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন সংযমের। ব্রহ্মচর্যের কথাটা ইচ্ছা করিয়াই

বলিলাম না। ইহাকে চরিত্র-গঠনের আবশ্যিক অঙ্গ বলিয়া গান্ধীজি নির্দ্দেশ করিতেন। গান্ধীজি বলিয়াছেন, নিম্নতম মানুষের যাহা নাই তাহা যদি কেহ পাইবার প্রত্যাশা করেন, তবে তিনি আর অহিংসা সাধনা করিতে পারিবেন না। এখানেও গান্ধীবাদ সাম্যবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অহিংসা সাধকের একদিকে সত্য এবং অপরদিকে অহিংসা যদি থাকে তাহা হইলে ভ্রম প্রমাদ ঘটিবেই না। ইহা গান্ধীজির আশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি এই আশ্বাসের মধ্যে পৃথিবীর মানুষের জীবন-কাঠি রহিয়াছে। আমাদের তাহা খুঁজিয়া পাইতেই হইবে। গান্ধীজি যেমন কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া তাঁহার সান্নিধ্যে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের লইয়াই ছোট বড় সর্ব্বপ্রকার কাজের সূত্রপাত করিতেন, তেমনি আসুন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্যে ক্ষুদ্রতর গণ্ডীর মধ্যে ক্রিয়াশীল হই। এই পথে একদিন অহিংস ও সত্যাশ্রয়ী বিশ্বলোকের উদয় হইবে। ভারতবর্ষে গান্ধীজির আবির্ভাব পৃথিবীর মানব ইতিহাসে-অক্ষয় হইয়া থাকিবে। টুণ্ডেলকারের গান্ধীজীবনী গ্রন্থমালা 'মহাত্মা'-র ভূমিকা পণ্ডিত জহরলাল লিখিয়াছেন—

His (Gandhiji's) voice may not be heard by many in the tumult and shouting of today, but it will have to be heard and understood some time or other, if this world is to survive in any civilized form.

সত্য পৃথিবীর সংরক্ষণের জন্য গান্ধীজি অপরিহার্য। আজ হোক কাল হোক গান্ধীজির শরণ লইতেই হইবে। কিন্তু কেন? জীবনের সর্ব্বক্ষেত্রে সত্য ও অহিংসা প্রয়োগের যে এই সুদুর্লভ সন্ধান তাহা একদিন স্বীকৃতি লাভ করিবেই। গান্ধী শতাব্দীতে সেই অবশ্য প্রয়োজনীয় স্মরণ মনন শুরু হোক এই প্রার্থনা করি।

তিন কন্যে

(উপন্যাস)

সীতা দেবী

(২৩)

সপ্তমীর দিন সকালে কনকলতার দুই জামাই এসে উপস্থিত হওয়াতে বাড়ীতে খুবই হৈ হৈ লেগে গেল। এঁরা ইতিপূর্ব্বে গ্রামের বাড়ীতে বেশী আসেন নি। ক্রিয়াকর্ম্মে, পারিবারিক উৎসবে এসেছেন দুচার দিনের জন্যে। এবারে এক সপ্তাহ থাকবেন। বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাই যে শুধু তাঁদের ছেঁকে ধরল তাই না, প্রতি-বেশীদের বাড়ীরও বউঝি অনেকে জুটে গেল। পল্লী-গ্রামে এসব ব্যাপারে বড় কেউ নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখেনা।

কনকলতার মানুষকে খাওয়ানর বড় আগ্রহ। অমনি কাকাদের বাড়ীতে যাঁরা ছিলেন ও রামপদর বাড়ীর সকলের নিমন্ত্রণ হয়ে গেল। হেমলতা বললেন "দিদি পারেও বাপু, অষ্টপ্রহর বাড়ীতে যজ্ঞি লাগিয়ে রাখতে।"

উষা বলল "তুমি বুঝি বেশী লোকজন ডাকা পছন্দ করনা ছোট ঠাকুরমা?"

হেমলতা বললেন "কখন সখনও ভাল লাগে তাই বলে এত বেশী না। এতে খাওয়াদাওয়া সব কিছুর বড় অনিয়ম হয়। আমি আবার অনিয়ম বেশী সহ্য করতে পারিনা, অসুখ করে যায়।"

উষা বলল "তুমিও দেখি দাদুর মত, তাঁর ত পান থেকে চুন খসবার জো নেই। এখানেই দেখছি নেমন্তন্ন করলে খেতে যান, কলকাতাতে ত কোথাও যেতেই চাইতেন না।"

হেমলতা বললেন "দিদির ধাতটাই আলাদা রকমের। যখন হোক্ খেলেই হল, যখন হোক শুলেই হল। চারদিকে সবাই হৈ রৈ করছে এই ও ভালবাসে। অল্পবয়সে কিছু ত করতে পারেনি, বড় টানাটানির সংসার ছিল। এখন ছেলেরা কাজকর্ম্ম করছে বউরা সংসার মাথায় করে আছে, খুব সুবিধা হয়েছে এখন।"

রাণি বলল, "আজ তাহলে বিকেলে আর বেরনো হবে না। শান্তি পিসীরা একবার গল্প সুরু করলে বিকেল অবধি গড়াবে, আর চা খাওয়াটাও ঐখানেই হয়ে যাবে।"

হেমলতা বললেন "তা ঠাকুর দেখতে না হয় একটু সন্ধ্যে করেই যাব। আজ ত চারপাশের গাঁ ঝেঁটিয়ে সব এখানে আসবে। এটাই তাদের কাছে শহর। এত ছোট সব গ্রাম আছে, যে সেখানে পুজোই হয়না। তারা সব এখানেই চলে আসে। সারাদিনই ঘোরে এখানে। দোকান থেকে কিনে খায়, কেউবা চিঁড়ে-মুড়ি বেঁধে আনে।

রাণি বলল "তাদের প্রসাদ দেওয়া হয়না?"

হেমলতা বললেন "তা হয়, কিন্তু ওদের রাক্ষুসে পেট ত? একখুরি প্রসাদে কি হবে? তাই নিজের ব্যবস্থা নিজেরাই করে। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি জমিদারবাড়ীর পুজোতে যে আসত তাকেই পেটপুরে খাইয়ে দিত! তখন শস্তাগণ্ডার দিন ছিল, আর ওঁরা তখন এখানেই বাস করতেন। এখনকার দিনে আর পারেনা। যাদের চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করে তাদেরই

বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে খাওয়ায়, আর অন্তদের ঐ খুরি করে প্রসাদ দেয়।

রীণি জিজ্ঞাসা করল "আমরা কোন দলে? খুরির দলে না পাতার দলে?"

হেমলতা বললেন "আমরা চিরকালই পাতার দলে। তিন পুরুষে সম্বন্ধ আমাদের সঙ্গে, এই বুড়ো কর্তার বাবার সময় থেকে। শুধু পুজো কেন, সব রকম পালা পার্ব্বণে ওঁদের বাড়ী গিয়েছি, খেয়েছি।"

উষা বলল "ওঁরা মোটের উপর সব সাবেকী চালই বজায় রেখেছেন না?"

"হ্যাঁ সেই জন্মেই ত দাদার ওঁদের উপর অত টান? আর যাদের নেমন্তন্নই অগ্রাহ্য করুন না, ওদের বাড়ী ঠিকই যাবেন।"

রীণি বলল "দাদু আর যেদিকেই পুরাতন পন্থী হোন, স্ত্রী শিক্ষা, স্ত্রী স্বাধীনতার দিকে খুবই আধুনিক। দেখনা বড়দির বয়স ত কুড়ি পার হয়ে গেছে, বি, এ, পরীক্ষাও দিয়েছে, তবু এখনও তার বিয়ের কথা মুখে আনেন না।"

হেমলতা বললেন "মুখে না আনুন, মনে তবু আনছেন আজকাল। তোমার বাবা যে ভয়ানক ব্যস্ত হয়েছে, কত জায়গায় ছেলে দেখছে আর দাদাকে লিখছে। এবার এখান থেকে ফিরে গিয়ে দেখবে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলেছে।"

উমা বলল "বাবার ত কেবল পণের টাকা বাঁচানর ভাবনা। যে পণ না চাইবে, সেই ভাল পাত্র। পণ না চাইতে ত যে কোনো ক্যাবলা পারে, তাই বলেই কি তাকে বিয়ে করতে হবে?"

উষা নিজের বিয়ের কথা ওঠাতে গম্ভীর ভাবে চুপ করে রইল। এ সব বিষয়ে অত খোলাখুলি আলোচনা করতে তার ভাল লাগেনা। দাদুর সঙ্গে একদিন কথা বলবে ঠিক করে রেখেছে। রীণি বলল, "এসব দিকে মায়ের মতটা কিন্তু উদার নৈতিক, সে ভাল ছেলে চায়, পণ দিতে হোক বা নাই হোক্।"

উমা বলল "কিন্তু মায়ের কথা ত বাবা কানেই নিতে চাননা। মা ইংরিজী জানেনা, পাড়াগাঁয়ে মানুষ, তাই তার কথার কোনো মূল্যই নেই বাবার কাছে।"

হেমলতা বললেন "মায়ের কথার মূল্য দিন বা না দিন, নিজের বাবার কথার মূল্য তোমার বাবাকে দিতেই হবে। আশা করে বসে আছে যে ঠাকুরদাদাই নাতনীর বিয়ের সব খরচ দিয়ে দেবে।"

উষা বলল "বাবাকে নিয়ে এই বড় মুস্কিল। এত ঢাক পিটচ্ছেন এখন থেকে। কোথায় কি তারই ঠিক নেই, এরই মধ্যে কতনা রটছে চারদিকে, আমার একেবারে এ সব ভাল লাগেনা।"

রীণি বলল "দাদুকে বলে বাবাকে একটু বকুনি দেওয়াও। আর কারো কথা ত গ্রাহ্য করেনা।"

আর কেউ কিছু বলবার আগে শান্তি এসে বলল, ওগো মেয়েরা, তোমরা একটু সকাল সকাল স্নান করে নেবে। তোমার দুই পিসেই তোমাদের স্নানের ঘরে স্নান করবার জন্তে খোট ধরেছেন। তাঁরা সব শহুরে হয়ে গেছেন এখন, তাঁদের পুকুরে যেতে ভাল লাগছে না, শীত করছে।"

হেমলতা বললেন "আচ্ছা বাপু, কাজ সেরে নিচ্ছি আমরা। তুমি গিয়ে বাউরি বউকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও, ছাড়া কাপড়গুলো চট্ করে কেচে দিয়ে যাবে।" শান্তি চলে গেল।

সেদিন স্নান খাওয়া সারতেই বেলা পড়ে এল। চায়ের পর্ব্বও ওখানে সারা হল। সেটাও কনকলতা সংক্ষেপে সারতে দিলেন না। দুই জামাই একসঙ্গে এসেছে, যেমন তেমন করে কি সারা যায়? বড় ছেলেকে বর্দ্ধমানে পাঠিয়ে প্রচুর মিহিদানা আর সীতা-ভোগ আনালেন, খুব হৈ হল্লোড় করে চা, জলখাবার খাওয়া হল। হেমলতা বললেন "দিদির একটা রাজ্যের রাণী হওয়া উচিত ছিল। প্রতিদিন সব প্রজাদের খাইয়ে খুশি করে দিত।"

কনকলতা বললেন "তেমন কপাল করে কি আর এসেছি? নিজে কষ্টে না পড়লে পরের কষ্ট ভাল করে

বোঝা যায় না। তোদের তাই অবাক লাগে যে আমি কেন এত খাওয়ানো দাওয়ান ভালবাসি। এমন দিনও ও গেছে আমার যখন সকালে খেয়ে বিকেলে খেতে পাব কিনা তার ঠিক থাকে নি।"

হেমলতা বললেন "অবাক হই আর নাই হই, এটা তোমার আরো যেন বাড়ে এই কামনাই করি, আর আমরাও ভালটা মন্দটা খেয়ে বাঁচি। তুমি থাকাতে না আমাদের মা বাবার সংসার ভেঙে যাওয়ার দুঃখও বুঝতে হয়নি।"

স্বর্ণ বলল "আজ বুঝি কেউ তোমরা আর পূজো দেখতে যাবেনা, খালি খাওয়ার গল্পই করবে?"

শান্তি বলল "তোর মত নিখাকী ত সবাই না, তুই নিজে খাসনা বলে পরের খাওয়াও দেখতে পারিস না। আমাদের খেতেও ভাল লাগে, খাওয়ার গল্প করতেও ভাল লাগে।"

স্বর্ণ বলল "তবে তাই কর বাপু তোমরা, আমি এখন উঠি। আমার অনেককালের সই বহুদিন পরে বাপের বাড়ী এসেছে। এই পাশের গ্রামেই ত? তারা আজ সব এখানে আসছে পূজো দেখতে। অতি অবিশ্যি করে বলে দিয়েছে আমাকে যেতে।" বলেই সে উঠে পড়ল।

একজন উঠে যেতেই অন্যগুলিরও যেন টনক নড়ে গেল। সবাই উঠে পড়ল এবং যারা বেরবে তারা তাড়াতাড়ি করে তৈরি হতে লাগল। মেয়েদের তৈরি হওয়া ত? খুব চট্‌করে হলনা। চুল বাঁধা, শাড়ী জামা বদলানর ফাঁকে ফাঁকে গল্প, সমালোচনা, তর্কাতর্কি সবই চলতে লাগল। রামপদ আজ যাবেন এদের সঙ্গে। তিনি পাশের ঘর থেকে ডেকে বললেন "তোমরা বেরচ্ছ কখন? একেবারে সন্ধ্যে করে ফেলনা।"

নাতনীরা তাড়াতাড়ি সাজ শেষ করে বেরল। ও বাড়ীর মেয়ে দুজন শান্তি আর স্বর্ণ চলল ছেলে পিলে নিয়ে। জামাইরা গুরুভোজনের অছিলায় বাড়ী থেকে গেল। বৌদেরও রান্নাঘরের অনেক কাজ বাকি, গল্পের চোটে সময়মত কাজে লাগতে পারেনি বলে কাজ অসমাপ্ত থেকে গেছে। তারা বলল খানিক পরে বেরবে। কনকলতা কয়েকটি নাতি-নাতনী নিয়ে বেরলেন।

আজ মণ্ডপে বিষম ভীড়। গ্রামের লোক সবাই ষষ্ঠীর দিন আসেনি, আজ স্ত্রীপুরুষ সবাই ঝেঁটিয়ে এসেছে। আশেপাশের গ্রামের লোক এসেছে বিস্তর। তারাই যেন মণ্ডপটা দখল করে নিয়েছে নিজেদের বিচিত্র পোষাক আর প্রাণখোলা কথাবার্ত্তা নিয়ে। এত গোলমাল হচ্ছে যে কান পাতা যায়না।

উমা বলল "এই হল এখানকার loud speaker, কলকাতায় যেগুলো বাজে সেগুলো বন্ধ হয় মাঝে মাঝে খরচ কমাবার জন্যে। এদেরত সে বালাই নেই, প্রাণের মায়া ছেড়ে চেঁচাচ্ছে।"

উষা বলল "কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে সেটাই আশ্চর্য্য।"

রামপদ বললেন, "এই হল আসল বাংলার ছবি, ভাল করে দেখে নাও তোমরা। কলকাতায় যা দেখ তা ঠিক বাংলা দেশের চিত্র নয়, পাঁচ মিশালী ভূতের কারখানা। এখানের সব কিছুই সুদৃশ্য বা সুশ্রাব্য নয়, কিন্তু একেবারে খাঁটি। কোনো দেশ থেকে ধার করা নয়।"

স্বর্ণ নিজের সইকে পেয়ে মহা আনন্দে গল্পে মজে গেল। বাড়ীর গৃহিণী মেয়ে বউদের নিয়ে আজ আরো বেশী গহনা পরে জাঁকিয়ে বসেছেন। তবে আজ তাঁদের ঘিরে ধরেছে এমন এক ভীড়, যা ভেদ করে বেশী এদিক ওদিক তাঁরা যেতে পারছেন না। যারা চারিদিক দিয়ে তাঁদের আগ্‌লাচ্ছে, সেগুলি বেশীর ভাগই অন্যান্য গ্রামের বাসিন্দা। ধনীলোক দেখা তাদের তেমন অভ্যাস নেই, প্রতিমা দেখার সঙ্গে সঙ্গে এঁদেরও তারা বিস্মিত মুখে দেখছে। এঁরা সকলেই সুসজ্জিতা, তার উপর বেশীর ভাগই এত বিপুলাকৃতি যে তাঁরা যে সাধারণ মানুষ নয় তা অতি সহজেই বোঝা যায়।

বাবুরাও আজ অনেকেই বেরিয়েছেন। কর্ত্তাবাবু একখানা বড় চেয়ারে ঠিক মণ্ডপের মাঝখানে বসে

আছেন। তাঁর পিছনে দুজন দরোয়ান দাঁড়িয়ে আছে, যদিই কর্ত্তার কোনো দরকার হয়। রামপদ ভীড় ঠেলে তাঁর কাছে অগ্রসর হয়ে বললেন "কেমন আছেন দাস মশায়? খবর সব ভাল ত?"

কর্ত্তা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্ব্বাদে খবর সব ভালই। কাল মেয়েদের কাছে শুনছিলাম এবারে আপনার বাড়ী একেবারে ভরপুর, নাতনীরা সব এসেছেন।"

রামপদ বললেন "হ্যাঁ, তিনজনই এসেছে। আজ ওদের নিয়েই এসেছি এখানে। ভীড়ের মধ্যে কোথায় ডুব মেরেছে, দেখতে পেলে ডেকে এনে আলাপ করিয়ে দেব।"

উষা উমারা বেশী দূরে ছিলনা, একটুক্ষণের মধ্যেই রামপদ তাদের দেখতে পেলেন। তাদের কাছে গিয়ে বললেন, "চল এ বাড়ীর কর্ত্তাকে তোমাদের দেখিয়ে আনি। বুড়ো মানুষ, কিন্তু তাঁকে প্রণাম করতে যেও না যেন। ব্রাহ্মণ কন্যাদের প্রণাম তাঁরা নিতে পারেন না, পাপ হয়। নমস্কার করলেই চলবে।"

রীণির ভয়ানক হাসি পেল। বলল "ওমা সে আবার কি? পাপ কেন হবে?"

রামপদ বললেন "যেখানকার যা নিয়ম। আগে তোমার মাকে ছোটোবেলায় দেখেছে ত, তাই তোমরা এসেছ শুনে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছে।"

স্ত্রীলোক দুটি গালে হাত দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে উষা উমাদের দেখতে লাগল। একজন বলল "এ বাবা, বড় সুন্দর যে। অপু এমনটি ছিল নাই।"

কনকলতা বললেন, "মা বাবা আর ছেলেমেয়ে কি আর সব সময় একরকমই হয়? ওদের ঠাকুরমা যে বড় সুন্দরী ছিলেন, নাতনীরা অনেকটা তাঁর মতনই হয়েছে।"

রীণি বলল, "বোলো ত দাদুর সামনে, একেবারে, হাঁ হাঁ করে উঠবেন। একদিন তাঁকে বলতে শুনেছিলাম যে ঠাকুরমার মত সুন্দরী বাংলা দেশে দেখাই যায়না।"

কনকলতা বললেন "তা বাপু মিথ্যে বলেননি। আমি অন্ততঃ তার মত সুন্দর মানুষ কোথাও দেখিনি। তাহলেও উমা অনেকটাই তাঁর মত দেখতে হয়েছে।"

সেদিন ফিরতেও একটু দেরি হল। গল্প করবার লোক পেয়ে শান্তি আর স্বর্ণ এমনি মজে গেল যে তাদের শেষ অবধি টেনেই আনতে হল। কনকলতা বললেন, "আর রাত করোনা। কাল ত আবার সব সকালবেলার পর্ব্ব। রাতে একটু ঘুমিয়ে না নিলে চলবে কেন?"

মহাষ্টমীর দিন ছেলে বুড়ো মেয়ে সবাই সকাল সকাল উঠে পড়ল। স্নান সাজগোজও তাড়াতাড়ি করতে লাগল সকলে। যারা অঞ্জলি দেবে তারা চা খেলনা। ছোটরা বেশীর ভাগই ভাল করে চা খেয়ে নিল, পূজো শেষ করে তবে ত খাওয়া, বেশ বেলা হয়ে যাবে। জমিদারবাবুদের বাড়ী একেবারে গ্রামের অন্য প্রান্তে, হেঁটে গিয়ে পৌঁছতেও সময় লাগবে খানিকটা।

পূজোর জন্যে কেনা ভাল শাড়ী আজ সকলে পরল। আজ সবাই যাবে, এমন কি ঝি, চাকর রাখালরা পর্য্যন্ত। বাড়ীতে থাকবেন শুধু কনকলতার স্বামী। তিনি ভীড়ের ভিতর আজকাল আর একেবারেই যান না। স্ত্রীকে বললেন দেখ গো যার যা গহনা আছে সব পরেটরে যাও। মেয়েরা সব এসেছে, কাজেই চোরদেরও নজর পড়েছে এ বাড়ীর দিকে। আমি কিছু আগলাতে পারবনা। দুপুর বেলাটা ত ঘুমিয়েই পড়ি।"

শান্তি বলল "ওমা, অতগুলো গয়না এক সঙ্গে পরব কি করে?"

কনকলতা বললেন "ভাগ করে দাও উষা উমাদের মধ্যে। ওরা বিশেষ কিছু আনেনি।"

তাই হল। উষারা তিন বোন বেশ কয়েকখানা করে গহনা পরে চলল। হেমলতা বললেন "দ্যাখ দেখি, গহনা পরবার মত রূপ থাকলে গহণা এসে জোটেই। নাতনীদের যা দেখাচ্ছে, আজ জমিদার বাড়ী ভীড় জমে যাবে এদের দেখতে।"

আরো অদ্ভুত ছিল। ঐ মধুর মত খুকীগুলোও যদি ব্রাহ্মণের ঘরের হত, তাহলে তাদেরও ব্রাহ্মণেতর জাতির বুড়ো বুড়ীরা ঢিপ্ ঢিপ্ করে প্রণাম করত।"

উমা বলল "আমাদের দেশের সবই কি অদ্ভুত!"

রামপদ বললেন "অদ্ভুত নিয়ম সকল দেশেই কিছু কিছু আছে। তবে শিক্ষা দীক্ষার সঙ্গে এগুলো কমে যাচ্ছে।"

রামপদ নাতনীদের নিয়ে আবার দাস মশায়ের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বললেন "এই যে আমার তিন নাতনী। এইটি বড় উমা, এ গত মে মাসে বি, এ, পরীক্ষা দিয়েছে। এইটি মেজ মেয়ে উমা, এ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে; আর এইটি ছোট স্বাতী, এবারে হাইয়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছে।"

মেয়েরা নমস্কার করতে কর্তামশায় তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে প্রতি নমস্কার করে বললেন "বাঃ, কি চমৎকার! এরকমই ত হওয়া উচিত আপনার নাতনীদের। রূপে, গুণে, বিদ্যা বুদ্ধিতে অনুপম একেবারে। একদিন সকলকে নিয়ে আসবেন আমাদের বাড়ীতে, পুজোর হাঙ্গামটা চুকে গেলে।"

রামপদ বললেন "হ্যাঁ একদিন নিয়ে যাব, ওরা এখনও কিছুদিন আছে।"

উমার আর রীণির ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। দূর থেকে কনকলতার ডাক শুনে তারা বেঁচে গেল, নইলে বুড়ো কর্তার সামনেই হি হি করে হেসে উঠত। কনকলতা ডেকে বলছেন, ওগো নাতনীরা এদিকে একটু এস। তোমাদের মামাবাড়ীর গ্রামের কয়েকজন তোমাদের দেখতে চাইছে।"

রামপদও ডাকটা শুনতে পেয়ে বললেন "আচ্ছা যাও শুনে এস তারা কি বলে। ওরা আসুক তাহলে এখন।"

দাসমশায় সম্মতি দেবামাত্রই তিন বোন বেশ দ্রুতপদেই প্রস্থান করল। উমা বলল "কি কাণ্ড! বুড়ো মানুষের এত উচ্ছাস!"

উমা বলল "বাড়ীর মেয়েগুলির যা চেহারা, দেখে দেখে বুড়োর মন খারাপ হয়ে গেছে।"

রীণি বলল "শুধু মেয়েদের কেন, পুরুষদেরই বা এমন কি সুন্দর চেহারা?"

উমা বলল "পুরুষরা সুন্দর হবে এটা কেউ আশা করে না যে?"

কনকলতা দুটি প্রৌঢ়া গোছের স্ত্রীলোককে নিয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন "এই দেখ গো, তোমাদের অপুর মেয়েরা।" নাতনীদের বললেন "এরা সব তোমাদের মামার বাড়ীর গ্রাম থেকে পুজো দেখতে এসেছে। বেশী চড়া রোদ হবার আগেই রামপদ তাঁর বিশাল বাহিনীকে নিয়ে জমিদারবাবুদের পুজার মণ্ডপে গেলেন। সেখানে বাজনা শুরু হয়েছে, ঢাক ঢোল, কাঁশর, লোকজনও জড় হচ্ছে আস্তে আস্তে। বৃদ্ধ কর্তা প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে সব অতিথিদের অভ্যর্থনা করছেন। বাড়ীর গৃহিণী আর সব বউ মেয়েদের নিয়ে মহিলা অতিথিদের নিয়ে বসাচ্ছেন। পরনে সবাইকারই প্রায় তসর, গরদ, বালুচরি, বেনারসী। বিবাহিতারা সবাই ঘোমটা দিয়েছে মাথায়, আলতা পরা খালি পা, ছোট মেয়েগুলি অনেকেই নূপুর আর মল পরেছে। এরই মধ্যে বাতাসে খিচুড়ির সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

উমা বলল "ত্যাখ এই রকম পুজো কলকাতায় একটাও দেখবে না।"

রীণি বলল "ঠিক একশ বছর আগের ছবি দেখছি মনে হচ্ছে। এই জন্যে দাদুর এত পছন্দ এদের। আধুনিকতা ত দেখতে পারেন না।"

উমা বলল "কি যে বাজে বকিস্। এই যে পড়াশুনো করছিস, এত বয়স অবধি ধিঙ্গির মত লাফিয়ে বেড়াচ্ছিস্, এ হতে পারত যদি দাদু সব কিছু আধুনিক জিনিষই অপছন্দ করতেন?"

রীনি বলল "তা হয়ত হতে পারত না। তবে সেকালের সব জিনিষের উপরেই ওঁর অসম্ভব টান।

হেমলতা বললেন "তা আছে বটে। ওঁকে যদি কেউ বর দিয়ে ওর ছেলাবেলাতে পাঠিয়ে দেয় ত উনি হাসতে হাসতে চলে যান। মা, বাবা কবে চলে গেছেন কিন্তু তার দুঃখ তিনি এখনও ভোলেননি। আমরা যে মেয়ে আমাদের চেয়েও ওঁর মন নরম এসব বিষয়ে।"

ঢালা ফরাস পেতে সব বসবার জায়গা হয়েছে।

মেয়েরা গিয়ে একপাশে বসল। কলকাতাবাসিনীদের আগমনে খানিকটা সাড়া পড়ে গিয়েছে মনে হল। অনেকে অনেকে ডেকে ডেকে উষা, উমাদের দেখাচ্ছে, বেশ বোঝাই গেল। বাবুদের দিকেও একটু চঞ্চলতা দেখা গেল। উমা বলল "আমরা দেখি মহা দ্রষ্টব্য হয়ে দাঁড়ালাম।"

রাণি বলল "তুই বিশেষ করে। যখন ঢুকছি তখন একজন অনেক আংটি পরা মোটা ভদ্রলোক এদের কর্ত্তা বাবুকে জিজ্ঞাসা করল "ঐময়ূরকণ্ঠী রং এর শাড়ীপরা মেয়েটি কে?"

উমা বলল "এই রে! আমি বাবু এখানে কারো ফাঁদে ধরা দিচ্ছি না। আমি একেবারে মনে প্রাণে শহুরে। এইবার যখন বেরব তখন কপালে একটা লেবেল্ লাগিয়ে রাখব "not for sale."

উষা বলল "অমন কর্ম্মও কোরোনো বাছা। যেদিন লেবেল লাগাবে, সেইদিনই দেখবে তোমার এক 'Prince Charming' হাজির হয়েছে এবং তোমার কপালে লেবেল দেখে ভির্মি গেছে।

উমা বল্ল "সে ভয়টা আছে বটে।"

রাণি বল্ল "আমার কাছে চালান করে দিস্ ভাই, যদি খুব বড়লোক হয়। তোর মত নুরজাহান নাই হই, আমিও ত দেখতে ভালই? আমি খুব বড়লোক বিয়ে করতে চাই, বেশ হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকব, কোনো কাজ করতে হবে না। আমি কাজ করা মোটেই দেখতে পারি না।"

পূজো দেখার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর গল্প চলল। কনকলতা হেমলতা নাতনীদের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে। রামপদও তাদের দেখিয়ে আনলেন কর্ত্তামশায়কে। দু জায়গাই প্রচুর সমাদর হল তাদের। জমিদার গৃহিণী বললেন "সুন্দরী ঠাকুরমার নাম রাখবে এরা।"

খাওয়াদাওয়া শেষ হতে প্রায় বেলা পড়ে আসার জোগাড়। রামপদ শেষে তাড়া দিয়ে সবাইকে জড় করলো এক জায়গায়, এবং সকলকে নিয়ে বাড়ী ফিরে চললেন। সন্ধ্যেবেলা আর কেউ বেরতে চাইল না।

এদিকে অপু, অভয়পদর ত আর দিন কাটেনা। বাড়ীটা এমন অস্বাভাবিক চুপচাপ হয়ে গেছে. মেয়েরা থাকতে ত কান পাতা যেত না। তাদের নিজেদের কলকাকলি যদি বা থামল ত হয় গ্রামোফোন বাজতে লাগল, নয়ত রেডিও সরব হয়ে উঠল। তাদের বন্ধু-বান্ধবও ছিল অগুন্তি। অপু তবু দিনে একবার অন্ততঃ আদুরীকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরত, অভয়পদর সব দিন তাও ভাল লাগত না। অপু কিছু বললে বলত "আমার ত তোমার মত শাড়ী দেখানোর কি শাড়ী দেখার উৎসাহ নেই, আমি রোজরোজ গিয়ে কি করব?" মেয়েদের চিঠি রোজই আসত, কিন্তু তাতেও বেশী কিছু সান্ত্বনা ছিল না।

শেষে বিজয়ার পর দিন অভয়পদ বলল "এবার ওদের আসতে লিখে দিই। ঢের ত পুজো দেখা হল।"

অপু বলল, "কালীপুজো, ভাইফোঁটা সব সেরে আসবে বলে গেছে, এখন লিখলে কি আর আসবে?

অভয়পদ বলল, "খালি ফুর্ত্তি করলেই ত আর চলে না। ওদিকে ওরা উষাকে দেখতে আসবার দিন ঠিক করছে। ক্রমাগত তাগাদা দিচ্ছে। শেষে চটে যাবে।"

অপু বলল, "বাবাকে লেখ তাহলে। তিনি যদি বলেন ত মেয়েরা কথা শুনবে। আর তাঁর নিজেরও ত দেখা দরকার। তিনি মত না করলে ত হবে না?"

অভয়পদ বলল "সেটা ত দরকার বটেই, তবে ভয়ও যে আবার ওখানেই। তিনি আবার কি মত করবেন কে জানে? আমার ত সম্বন্ধটা ভালই মনে হচ্ছে, টাকার খাঁইও নেই তেমন। কিন্তু বাবার দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা।"

"লিখে ত দেখ। তিনি অনেক দেখেছেন, পণ্ডিত মানুষ, ভাল ছেলে মন্দ ছেলে কি আর চিনবেন না? তবে উষাকে তিনি যে রকম ভাল বাসেন, সহজে কাউকে তার যোগ্য তিনি ভাববেন না।"

অভয়পদ বলল "ঐ ত মুস্কিল। মেয়ে আমার, দায়ও

আমার কিন্তু ক্ষমতাও আমার তেমন নয়। 'সাগর সেঁচা মাণিকের' আবদার ধরলে আমি আনব কোথা থেকে ?

অপু বলল "বাবা নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।"

"তা করবেন অবশ্য তাঁর মনের মত পাত্র হলে। যদি অমতে দিতে যাই, তাহলে হয়ত যোগই দেবেন না। এমনিতে চুপ করে থাকেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে গোঁ যে অসম্ভব। যা কথা, সেই কাজ। দেখলে না কেমন হট্ করে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে গেলেন ?

অপু চুপ করে রইল। রামপদর কলকাতার থেকে চলে যাওয়ার কথা উঠলে সে চুপ করেই থাকে। নিজেকে এখনও সে দোষীই মনে করে।

অভয়পদ বলল "যাক, আগে মেয়ে দেখান ত হোক্। পছন্দ ত ওরা একরকম করেই আছে। ছেলেরই যখন দেখা হয়ে গেছে, তখন তার বাবা মা কিছু না বলবে না। আমার ছেলে নাই তারা জানে, আজ হোক, কাল হোক মেয়েরাই সব পাবে তাও জানে। বাবার দেশে বাড়ী আছে, টাকাকড়িও আছে, সেটাও জানিয়ে দেব। অমত করবার কোনো কারণ দেখিনা।"

অপু বলল "ও কিন্তু এম্ এ পড়তে চেয়েছিল।"

অভয়পদ অসহিষ্ণুভাবে বলল "বিয়ের পরে পড়ে যেন। মেয়েরা যা আবদার ধরবে তাই রাখতে হবে নাকি ? আমি একটু তাড়াতাড়ি ওদের বিয়ের ব্যাপার-গুলো সেরে ফেলতে চাই, বাবা থাকতে থাকতে। মেয়ে বুড়ী করে বাড়ীতে বসিয়ে রাখতে আমি চাই না। আজ-কালকার যে আবহাওয়া কখন কার মাথায় কি খেয়াল চাপবে কে জানে ?"

অপু বলল "রোসো একজনেরই আগে বিয়ে হোক্। এক সঙ্গে তিনটিকেই বিদায় করতে চাও নাকি ? তার-পর কি দুই বুড়ো বুড়ী বসে বসে খালি কড়ি কাঠ গুনব ?"

অভয়পদ বলল, "তুমি একটা গুরুটুরু পাকড়ে নিও। সারাদিন মালা জপ কোরো আর পূজা কোরো। মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করতে যেও তোমার আদুরীকে নিয়ে।"

অপু ভুরু কুঁচকে বলল "ওসব আমার ভাল লাগেনা বাপু। আমি ঘর সংসার নিয়ে থাকতেই ভালবাসি। যাক্‌গে সে সব কথা। তুমি বাবাকে আজ চিঠি ত লেখ।"

চিঠি চলে গেল। রামপদ চিঠি পড়ে বললেন "এই শোন কি লিখেছে তোমার বাবা", বলে চিঠিখানা পড়ে নাতনীদের আর হেমলতাকে শুনিয়ে দিলেন।

উমা বলল "আমরা কিছুতেই যাবনা এখন। কতরকম প্ল্যান করে রেখেছি আমরা। নিতান্ত যেতে হয়ত দিদি যাক্। বিয়ে ত হবে তার, তা আমাদের সকলকে টেনে নিয়ে গিয়ে কি হবে ?"

রীনি বলল "ত্থাখনা কাণ্ড! আমরা বলে ভাইফোঁটার দিন রাত্রে একটা গানের জলসা করব ঠিক করে রেখেছি। বাবার সব তাতে বাগ্‌ড়া দেওয়া। আসলে নিজেদের একলা থাকতে ভাল লাগছে না, তাই আমাদের টেনে নিয়ে যেতে চাইছে।"

রামপদ বললেন "উষা কি বল ?"

"উষার তখন চোখ ছলছল করছিল। সে বলল "তুমি বাবাকে একটু বুঝিয়ে বলনা দাদু। একটু দেরিতে কিছু এসে যাবে না।"

রামপদ বললেন "তুমি কি বল হেম ?"

হেমলতা বললেন "খোকার সব তাতে বাড়াবাড়ি। বেচারীরা থাকনা আর কটা দিন ? কোথাও ত যেতে পায় না ? আর একবার বিয়ের বেড়ী পায়ে পরলে চিরজন্মের মত বন্দী হবে ত ?"

রামপদ বললেন "পাত্রপক্ষ রাগ করতে পারে বলে খোকার ভয় হয়েছে।

হেমলতা বললেন "রাগ না হাতী। ওরা অত সহজে ছাড়ছে আর কি ? কি এমন রাজা বাদশা ? ছেলে সবে প্রফেসরের কাজে ঢুকেছে, বাড়ীর অবস্থা খুবই মাঝারি, ভাইও আছে দুতিনজন। উষাকে পেলে বর্তে যাবে। দুচারদিন দেরি করতে বললে ঠিক করবে তারা। তুমি লিখে দাও ভাইফোঁটার পরের দিন ওরা যাবে, তুমি নিজে নিয়ে যাবে, ঐ অবধি তোমার কাজ আছে। তুমিও যেতে পারবে না।"

রামপদ বললেন "তুমি ঠিকই ধরেছ হেম, সত্যিই আমার কাজ আছে। এখানে আমিই জোগাড় যাগাড় করে একটা লাইব্রেরী করছি। ঐ সময়েই ঠিক ওটার উদ্বোধন করা হবে। আমি কর্মকর্তা, আমি চলে গেলে সব মাটি হবে। আমার এতদিনের পরিশ্রম মাটি হবে এটা আমি একেবারে চাইনা। আর নাতনীরা তার দাদুর লাইব্রেরী খোলা দেখবে না, এও আমার ভাল লাগবে না। ঊষা উমারা গান গাইবে প্রথমে এও আমি ঠিক করে রেখেছি।" উমা ত লাফিয়ে উঠল। গান বাজনার সখ তার অত্যন্ত বেশী, গলার জোরও সব চেয়ে বেশী। সে বলল "বাঃ, সে ত খুব ভাল হবে। আজ থেকেই আমরা রিহার্সাল দেব, না রে রীনি?"

রীনি বলল "গানের জলসার জন্যে ত কথাই ছিল রিহার্সাল দেবার, তার সঙ্গে এটাও জুড়ে দেব। ক'টা গান হবে দাদু?"

রামপদ বললেন "এটা ত প্রধানতঃ গানের ব্যাপার নয়? দুটো গান হলেই হবে। তোমরা প্রথমটা গাইবে, আর জমিদার বাড়ীর সৌরীন্দ্র গাইবে শেষেরটা। তোমাদের গানও আমি ঠিক করে রেখেছি, "এসো হে গৃহ দেবতা" গাইবে তোমরা।" হেমলতা হেসে বললেন, "খোকাকে চিঠিখানা আজই লিখে দাও দাদা। এত কথার উপর সে আর কথা বলবে না। নিজেরাও এসে হাজির হবে হয়ত, লাইব্রেরী খোলা দেখতে।"

ঊষা জিজ্ঞাসা করল লাইব্রেরীর বাড়ীর কিছু নাম হবে নাকি দাদু?"

রামপদ বললেন "মায়ের নামেই নাম দিচ্ছি "বিন্ধ্য-বাসিনী গ্রন্থাগার।" মাই বোধহয় এ গ্রামের প্রথম লেখাপড়া জানা বউ।"

হেমলতা বললেন "কাকীমাদেরও মায়ের কাছেই অক্ষর-পরিচয় হয়েছিল।"

পুজোর হিড়িক চুকে গিয়ে এখন গানের হিড়িক সুরু হয়ে গেল এ বাড়ীতে। উমাই হয়ে দাঁড়াল দলপতি। তার প্রশংসায় বাড়ীর সবাই ত পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। রামপদ বললেন "এত দেখি মস্ত গাইয়ে হয়ে উঠবে। ভাল করে শেখান দরকার।"

উমা বলল "বাবা শিখতে দিলে ত? তিনি খালি বিয়ে বিয়ে করতে জানেন।"

রামপদ বললেন "গান শেখা এবং বিয়ে করা দুটোই চলতে পারে ত? আচ্ছা আমি ত যাচ্ছি কলকাতায় ক'দিন পরে, তখন এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে।"

লক্ষ্মীপুজোটা ঘরোয়া ভাবেই কেটে গেল। তবে বাড়ীর সকলের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করতে ভুললেন না কনকলতা। কালীপুজো গ্রামে ঘটা করেই হয়। দাস মশায় করেন, জমিদার বাড়ীতেও হয়। গ্রামে আর একবার দুর্গাপূজার মত ধূম বাধে, তবে এক দিনের জন্যেই। দেওয়ালিতে আলো দেয় সবাই, মাটির প্রদীপ দিয়ে ঘর আঙিনা সাজায়, ভারি কোমল অথচ উজ্জল একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বাজিও পোড়ে কিছু কিছু, তবে শহরের মত কান ফেটে যায় না কারো।

ভাই ফোঁটার বিপুল আয়োজন হচ্ছিল এ বাড়ীতে। ঠাকুমারা দুজন আছেন, তাঁরা দাদুকে ফোঁটা দেবেন। আত্মীয়গুষ্ঠির মধ্যেও দুচার জন বোন আছে গ্রামে, তাঁরাও যোগ দেবেন। তারপর শান্তি আর স্বর্ণ ফোঁটা দেবে নিজের ভাইদের আর রামপদর কাকার বাড়ীর ভাইদের। সব শেষে ফোঁটা দেবে ঊষা, উমা, রীনি মনু প্রভৃতিরা, গুটি কয়েক বাচ্চা ভাইকে। খাবার লোক জমবে প্রচুর, বাড়ীর সব লোকগুলি কনকলতাদের কাকার বাড়ীর যারা আছে এবং গ্রাম সম্পর্কে, জ্ঞাতি সম্পর্কে যারা এসে জুটবে, তারা সকলেই। কনকলতা আর হেমলতা দুপুরের খাওয়ানোর ভার নিলেন। শান্তি, স্বর্ণ বউরা এবং ঊষা উমারা মিলে বিকালে খুব ঘটা করে চা খাওয়ান ও গানের জলসা করবে বলে সবাইকে নিমন্ত্রণ করে রাখল।

হেমলতা বললেন "এ যেন একটা বিয়ের যজ্ঞ বসে গেল বাড়ীতে

কনকলতা বললেন "আমাদের ছেলেমেয়েদের ত সব বিয়ে হয়ে গেছে, নাতী-নাতনীদের বিয়ের বয়স হতে

রের দেরি। তা আমরা কি আর এত বছর শুধু ডাল ভাত খাব? যা হোক ছুতো করে একটু আমোদ আহ্লাদ করব না?"

রীনি বলল "বা: আমরা বুঝি নেই?"

কনকলতা বললেন "আছ বৈ কি? কিন্তু তোমরা ত আমাদের গ্রামে এসে নহবৎ বাজাবেনা, তোমাদের সবই হবে কলকাতায়। আমি এখানকার বাড়ীর কথা বলছি আর কি?"

গ্রামে বসে বড় উৎসব করতে গেলে ক'দিন আগে থাকতে খুব খাটতে হয়, এ বাড়ীতেও তা হল। গৃহিণীরা বড় মেয়ে ও বউদের নিয়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। ছেলেরাও হাজার রকম জিনিসের জোগাড় দেবার জন্যে প্রায় দিনরাত হাটে বাজারে, দোকানে ছোটাছুটি করতে লাগল। উপহার দেবার মত ধুতি শাড়ীর সন্ধানে বদ্ধমান শুদ্ধ যেতে হল দু একজনকে। ঊষা উমারাও বাচ্চা ভাইদের জন্য তাদের উপযুক্ত উপহারের জিনিষ জোগাড় করল। বাচ্চা বোনরা পাছে কান্নাকাটি করে সেজন্য তাদেরও consolation prize-এর ব্যবস্থা হল। বৈকালিক চা পার্টির জায়গা কি রকম সাজানো হবে, এবং গান কি রকম হবে, কতক্ষণ হবে তারই আয়োজন করতে লাগল ওরা।

এরি মধ্যে কালীপূজা এসে গেল। সেটা দেখতেও সকলে ছুটল। কনকলতার বাড়ী রামপদর বাড়ী প্রদীপ দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হল। ঠাকুর দেখে এসে উমারা গ্রামের অন্যান্য বাড়ীও একটু ঘুরে এল। তারপর দিনটা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার আয়োজনেই কেটে গেল। এখন একটু একটু শীত পড়েছে, তাই দ্বিতীয়ার দিন অত সকালে স্নান করতে ছোটদের অনেকেই কান্নাকাটি লাগাল। কিন্তু ফোঁটা নেওয়ার লোভটা ছাড়তে পারল না। মা'রা তাদের কাকস্নান করিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে তৈরী করে দিল।

বেশ সকাল সকালই ফোঁটা দেওয়ার পর্ব্ব শেষ হল। চা খেয়ে নিয়ে রান্নাঘরের কাজে লেগে গেলেন যাঁরা রান্নার ভার নিয়েছিলেন। বাইরের নিমন্ত্রিতারাও অনেকেই এগোলেন তাঁদের সাহায্য করতে। অপেক্ষাকৃত ছোটরা হুল্লোড় করে বেড়াতে লাগল, একটু একটু কাজ মাঝে মাঝে করতে লাগল, নইলে বিকেলের চায়ের পর্ব্ব ঠিকমত জমান যাবে না।

অনেক চেষ্টা করে দুপুরের খাওয়াটা একটু সকাল সকাল সারা হল। দুপুরে বিশ্রাম করাটা হলনা। তার বদলে ঊষা উমারা নিজেদের বাড়ীর চওড়া বারান্দায় আলপনা দিয়ে ফুল পাতা দিয়ে সাজিয়ে উৎসবের আসর সাজিয়ে দিল। খাবার দাবার, চায়ের জোগাড় সব কাজ প্রায় নিজেরাই করল অবশ্য দাশরথী ও বাউরি বউ অনেক সাহায্য করল। দাস মশায়দের বাড়ী থেকে একটা টেবল হার্মোনিয়ম ধার করে আনা হল তা নইলে গান জমে না। নিমন্ত্রিতের দল সময়ের আগেই এসে আসর জুড়ে বসে গেল। পদ্মপাতা মুড়ে কাঠি দিয়ে আটকিয়ে সুন্দর ঠোঙা তৈরী হয়েছিল, তাইতে করে জলখাবার দেওয়া হল; অতগুলি লোককে চা দেবার জন্য কিছু পেয়ালা পীরিচও ধার করতে হল। কনকলতার মেয়ে বউরা সব কাজে সমানে যোগ দিয়ে সব তাল সামলে নিল, ঊষা উমাদের অনভ্যস্ত হাতে কাজে কোথাও বাধা পড়ল না। কনকলতা বললেন "ভাগ্যে পাকা দালানে জায়গা করেছিল, নইলে আমার দাওয়ায় হলে এতক্ষণে জল কাদায় একশা হত।"

হেমলতা বললেন "এখানে বারান্দার উপরে ছাদ আছে তাই রক্ষে। নইলে খোলা আকাশের তলায় বসলে এতক্ষণে হিম লেগে সব হাঁচতে সুরু করত। নে বাপু তোদের গান এইবার আরম্ভ কর দেখি।"

গান আরম্ভ হল। বাচ্চাগুলো প্রথম একটু গোলমাল আরম্ভ করল, তবে মা বাবারা দু-চারটে চড় চাপড় মেরে তাদের শীগ্‌গিরই চুপ করিয়ে বসিয়ে দিল। এ রকম গান গ্রামে হয়না ত কখনও, মাঝে মাঝে যাত্রাগান, কীর্ত্তনগান হয় বটে। এটা একেবারে নূতন জিনিষ তাদের কাছে। আর উমার মত গলাই বা এখানে কার

আছে? জমিদারবাবু নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, তিনি বললেন "এযে দেখি একেবারে কংগ্রেসে গাইবার মত গলা!"

গানের প্রোগ্রাম আধঘণ্টা কি ৪৫ মিনিট বড় জোর চলল! সারাদিনের হুড়োহুড়িতে ছোটগুলো সব ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, সব শতরঞ্চির উপর শুয়ে পড়তে লাগল। যা যা গান হবে বলে ঠিক ছিল তা বড়দের আগ্রহে হয়েই গেল। তারপর মা বাবারা নিজেদের ঘুমন্ত ছেলে মেয়ে কুড়িয়ে নিয়ে যে যার ঘরে চলল। এরপর আসর গুটিয়ে ফেলা গেল।

জমিদার কর্ত্তাবাবু যাবার সময় বললেন "এর গান আবার কাল শুনছি ত?"

রামপদ বললেন "আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল ওরাই প্রথম গানটা গাইবে।"

কর্ত্তাবাবু বললেন "বেশ বেশ, এরা ত আমাদেরই ঘরের মেয়ে। গ্রামের লোক সব শুনুক। আমরা ধার করা গাইয়ে আনিনি। একে সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা যা তাই দেবেন, দেশে নাম রেখে যাবে।"

তিনি চলে যেতেই হেমলতা সকলকে তাড়াতাড়ি শুইয়ে দিলেন। রাত্রে খাবার জন্যে আর কেউ বসল না। পরদিনই লাইব্রেরী খোলা হবে, সেও অনেকক্ষণের ব্যাপার। শরীরটাকে খুব বেশী ক্লান্ত করে ফেললে চলবে না।

সকাল হতেই ছেলের দল চলল লাইব্রেরীর ঘর সাজাতে। রৌনি জিজ্ঞাসা করল, "লাইব্রেরীর ঘর কি তুমিই তৈরী করিয়ে দিয়েছ দাদু?"

রামপদ বললেন "প্রায় তাই, অন্ততঃ আধাআধিত বটেই। ঐখানে জমিদারবাবুদের একটা কাছারি ঘর ছিল। তা ওঁরা যখন এখানকার বাস উঠিয়ে চলে গেলেন, তখন ঘরটা খালিই পড়ে রইল। ভেঙ্গে চুরে নষ্টই হয়ে গিয়েছিল অনেকটা। লাইব্রেরীর জন্য চাওয়াতে তিনি খুশি হয়েই দিয়ে দিলেন। অবশ্য সারিয়ে সুরিয়ে নিতে আমার হাজার দুই টাকা গেছে। এখন দিব্যি নূতনের মত দেখতে হয়েছে।"

বিকেলে গ্রামের সব ভদ্রলোক ত সেখানে হাজির হলেন, মেয়েরাও অনেকে এলেন। গ্রামের চাষীভুষীর দলও সব এসে জুটল, কি হচ্ছে দেখতে। শামিয়ানায় জায়গা যখন আর কুলাল না, তখন খোলা আকাশের তলায়ই অনেকে দাঁড়িয়ে রইল। দাস মশায় প্রধান অতিথি হলেন এবং জমিদারবাবু হলেন সভাপতি। রামপদ সম্পাদকরূপে সর্ব্বময় কর্ত্তা। গায়িকারা যথাকালে এসে পৌঁছল সঙ্গে পরিবারের সবগুলি মানুষ।

মেয়েদের গান আরম্ভ হতেই অতগুলি মানুষ একেবারে চুপ হয়ে গেল। এরকম গান সত্যিই তারা কখনও শোনে নি। বাবুদের বাড়ীর মেয়েরা গান বাজনা করে এটা তারা জানে বটে, কিন্তু এবার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হল।

এরপর রিপোর্ট পড়া, বক্তৃতা, দ্বার উদ্‌ঘাটন সবই একে একে হয়ে গেল। সর্ব্বশেষে গান করলেন কর্ত্তাবাবুর এক নাতি, সৌরীন্দ্রনাথ। ভাল গলা, শিক্ষাও পেয়েছেন ভাল। উমা চুপিচুপি বলল "বেশ গুণীমানুষ ভাই।"

রৌনি বলল "চেহারাটাও ভাল।"

উষা একটু মুচকি হেসে বলল "বিয়ে হয়েছে কিনা খবর নেব?"

উমা বলল "বেশ ত নাওনা? আমি কিন্তু কলেজ অফ্ মিউজিকে পড়তে যাব আগে, তারপর অন্য কথা।"

সভা ভেঙে যেতে সবাই বাড়ী যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। উষা বলে উঠল "আরে বাবা কখন এসে ভীড়ের ভিতর বসে আছে দেখ।"

রৌনি বলল "মা বেচারীর শুধু দেখা হল না।"

রামপদ ছেলেকে দেখে একটু অবাক হয়ে বললেন "খোকা কখন এলে? কই আগে ত কিছু লেখনি?"

অভয়পদ বলল "আগে ঠিক করিনি কিছু হঠাৎ

খেয়াল চাপল চলে এলাম। কাল ভোরের ট্রেণেই ফিরে যাবো। তোমরা যাচ্ছ কবে ?"

রামপদ বললেন "চল ঘরে গিয়ে আলোচনা হবে। সবাই বাড়ী এসে পৌঁছল। দাশরথীকে ডেকে আর একজনের জন্যে চাল চড়াতে বলতে যেতেই কনকলতা বললেন, "আমার বাড়ী দুবেলায় তিরিশখানা পাতা পড়ছে, একজনের জন্যে আবার আলাদা রান্না করতে হবে কেন ? ও আমার বাড়ীই খাবে।

হেমলতা নিজের শোবার ঘরে আর একখানা তক্তপোষ পেতে অভয়পদর শোবার জায়গা করে দিলেন।

অভয়পদ বাবার সঙ্গে ঘরে এসে বসল। রামপদ জিজ্ঞাসা করলেন, "উষাকে দেখাবার দিনটিন কিছু ঠিক করেছ নাকি ?"

অভয়পদ বলল "উপস্থিত স্থির আছে যে সামনের রবিবার তারা আসবে। তবে আমি বলে রেখেছি যে তুমি যদি এর মধ্যে না যেতে পার, তাহলে আরো দেরি হতে পারে।"

রামপদ বললেন "আমি না গেলেও মেয়ে দেখাতে কোনো বাধা নেই।"

অভয়পদ বলল "সে হয়না বাবা। আমার বয়স যথেষ্ট হয়েছে সংসারও করছি অনেকদিন, তবু সাংসারিক অভিজ্ঞতা আমার বিশেষ কিছুই নেই। আমি আপনার ভরসাতেই এগোচ্ছি। আপনি ছেলে দেখুন, তার সম্বন্ধে সব খোঁজ খবর নিন। নিয়ে যদি বলেন যে এ পাত্রে মেয়ে দেওয়া যেতে পারে, তবেই পাকা কথা দেব। মেয়ে নিজেও মেয়ের মাও, আপনার মতকেই সবার উপরে স্থান দেয়, সুতরাং গোড়ার থেকেই আপনাকেই সব কিছুর নির্দ্দেশ দিতে হবে।"

রামপদ একটু চিন্তা করে বললেন, "দেখি শনিবারের মধ্যে গিয়ে পড়তে পারব বোধ হয়। সম্প্রতি কয়েকটা দিন অবকাশ আছে। তবে বিয়ে ঠিক হলেও অগ্র-হায়ণের আগে ত দেওয়া যাবে না ? জোগাড় করতে সময় ত লাগবে খানিকটা ? আচ্ছা তুমি বিশ্রাম কর এখন। কলকাতায় গিয়ে সব বিষয় ভাল করে আলোচনা করা যাবে।"

ক্রমশঃ

ধর্মে সাহিত্যে, রাষ্ট্রনীতিতে দল চাই, কিন্তু দলের বাহিরের সঙ্গেও সম্পর্ক থাকা চাই, শুভ্রতা চাই। ঘরের মধ্যে রাঁধিয়া খাই, ঘুমাই, কাজ করি বলিয়া আমরা চিরজীবন কেহ দুয়ার জানালা বন্ধ করিয়া ঘরের মধ্যে থাকি না। যে কখন ঘরের বাহির হয় না, সে নিশ্চয়ই দুর্বল ও অসুস্থ।

প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৩

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিদ্যাসাগর

সন্তোষকুমার অধিকারী

রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা প্রায় বিলুপ্তির পথে চলেছিল। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখের নেতৃত্বে ডিরোজিও শিষ্য নব্য বঙ্গের দল একদিকে যেমন ইংরেজিয়ানার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, অন্যদিকে তেমনি মিশনারি পাদরিদের প্রভাবে এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোকের প্রেরণায় খৃষ্টধর্মের দিকে সাধারণ মানুষ আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের ভাঙা হাল তুলে ধ'রে আপন নেতৃত্বে তাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিলেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করলেন তখনও তিনি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত হন নি। তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল "সমুদয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই সেদিন এই সভার সভ্য হ'য়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

১৮৪৩-এর আগষ্ট মাস থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ। এই পত্রিকার সম্পাদনা ভার দেওয়া হয় অক্ষয়কুমার দত্তকে। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তর চিন্তাধারায় দেবেন্দ্রনাথের পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না। পত্রিকার প্রবন্ধাদি নির্বাচন ও সংশোধনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ একটি Paper Committee বা গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা গঠিত করেন। এই কমিটিতে ছিলেন শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা।

বিদ্যাসাগর কিভাবে এই Paper Committee-তে এলেন, তার বিবরণ শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন আনন্দকৃষ্ণ বসু। আনন্দকৃষ্ণ বসু ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে বসে আনন্দকৃষ্ণর অনুরোধে বিদ্যাসাগর অক্ষয়কুমারের একটি প্রবন্ধর সংশোধন ক'রে দেন। সংশোধিত অংশ অক্ষয়কুমারের ভাল লাগায় তিনি আনন্দকৃষ্ণর কাছে এসে হাজির হন ও জানতে পারেন বিদ্যাসাগরকে। অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর, দুজনের বয়সই তখন (১৮৪৩ খৃঃ) তেইশ।

পেপার কমিটির হাতেই ছিল পুরো ক্ষমতা। অর্থাৎ প্রকাশযোগ্য প্রত্যেকটি রচনা, এমন কি সম্পাদকের রচনাও কমিটির অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। কমিটির অন্যতম সদস্য হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্রও অক্ষয়কুমারের রচনাগুলি দেখে দিতেন। এ' প্রসঙ্গে শ্রীরাজনারায়ণ বসু তাঁর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় বলেছেন—"অনেকে অবগত নহেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।"

এই ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্রের জীবনী গ্রন্থ থেকেই। নিচে যে পত্রাংশগুলি উদ্ধৃত করা হ'য়েছে তার থেকেই বোঝা যাবে প্রবন্ধ নির্বাচন ও সম্পাদনার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর কতখানি প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। ১৭৭০ শকে অর্থাৎ পত্রিকা প্রকাশের দ্বিতীয় কল্পের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্তর

একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল ; 'কবীর পন্থীদের ইতিহাস'। এই প্রবন্ধটি প্রকাশের পূর্বে বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়েছিল অনুমোদনের জন্য।

"I beg to send herewith a copy of an article on the "History of the Kabirponthis" Please do the needful."

Sd. Akshay Kumar Dutta
Paper-Editor

"I am glad to read the copy sent by you. It has been nicely got up and written in easy, chaste language. I therefore, gladly approve of its publication in the Patrika.

Sd. Isvar Chandra Sarma.

"The corrections and alterations made by Iswar Chandra Vidyasagar here and there have been very nice."

Sd. Shyama Charan Mukhopadhya.

এ'র দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যিক প্রাধান্য তখনই স্বীকৃত হ'য়েছিল। এবং অক্ষয়কুমার তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই মেনে নিয়েছিলেন।

সে যুগের সাময়িকপত্রের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার নাম উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। "একেবারে সূচনা-কাল থেকেই সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান পুরাতত্ত্ব জীবনী সমাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে সুসমৃদ্ধ হয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই অসাধ্যসাধনের মুখ্য কর্ণধার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত।" তবুও দেবেন্দ্রনাথ খুসী হ'তে পারেন নি। কারণ তিনি তখন বেদ-বেদান্ত মন্থন করে' তত্ত্বান্বেষণে রত। আধ্যাত্মিকতা তাঁর ধর্ম। ভক্তিবাদ তাঁর মনে স্থায়ী আসন নিচ্ছে। তিনি বলেন বেদ ও বেদান্ত অভ্রান্ত এবং প্রার্থনার দ্বারা মানুষের কল্যাণ-ধর্ম সাধিত হবে। অন্যদিকে অক্ষয়কুমার পুরো যুক্তিবাদী। তিনি প্রার্থনায় অবিশ্বাসী। আর ঈশ্বরচন্দ্র? ব্রহ্ম বা ঈশ্বর নিয়ে তাঁর চিন্তা নয়, তাঁর চিন্তা মানুষ নিয়ে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীতে এই মতবিরোধের উল্লেখ আছে। [পৃষ্ঠা—৪৫৬]

"বাংলা গদ্যসাহিত্যে যে দুইজন প্রতিভাবান পুরুষ এক নবযুগ আনিতে চাহিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত,—তাঁহারা দুজনেই আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতাকেই বড় বলিয়া জানিতেন।"

দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শুধুমাত্র ব্রাহ্মধর্মমত প্রচারের মাধ্যম হবে ; সত্যধর্ম প্রচারের জন্য হবে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়ার পর "দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই সভা (তত্ত্ববোধিনী) ব্রাহ্মসমাজের কার্যের একটি যন্ত্র-মাত্র ছিল।...পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন প্রভৃতি লইয়া তদন্তর্গত গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার সহিত সময়ে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ হইতে লাগিল।" [পৃঃ ৩৫৭-আত্মচরিত]

বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রবল হ'য়ে উঠেছিল কারণ তিনি ধর্মমত প্রচারের ব্যাপারে নিস্পৃহ ছিলেন অথচ সংস্কারমূলক রচনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল। তিনি ভেবেছিলেন ধর্মের চেয়ে নীতিপ্রচারের প্রয়োজন বেশী। এই কাজে তিনি পত্রিকার সহায়তা চেয়েছিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর দু'জনেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে সরে যান।

যদিও দেবেন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে এই প্রচ্ছন্ন মতবিরোধ তাঁদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করে' ছিল, তা সত্বেও তাঁরা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতেন যথেষ্ট। বিদ্যাসাগরের দুর্দমনীয় বিপ্লবী সত্তাকে তত্ত্ববোধিনী সভা অভিনন্দন জানিয়েছে। সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁকে সমর্থন জানিয়ে এসেছে। যখন 'বঙ্গদর্শন' বা 'সংবাদ-প্রভাকর' বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করে সমালোচনা করেছে, তখন তত্ত্ববোধিনী পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা প্রবন্ধ লিখেছে বিদ্যাসাগরের সমর্থনে। পত্রিকার ৪র্থকল্পে (অগ্রহায়ণ ১৭৭৭ শক) ১০৪। ৫ পৃষ্ঠায় 'বিধবাবিবাহ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয় দ্বিতীয়-

পুস্তকের অকুণ্ঠ প্রশংসা করে ওই পুস্তকের 'উপক্রম ও উপসংহার' অংশগুলি উদ্ধৃত করা হয়। বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর প্রথম বিবাহের সংবাদ পরিবেশন করে' তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লেখে [পৌষ ১৭৭৮ শক, পৃঃ ১২৯]

"আমরা পরমাহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদিগের চিরবাঞ্ছিত বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। গত ২৩শে অগ্রহায়ণ রবিবাসরে দেশবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রামধন তর্কবাগীশ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের সহিত পলাশডাঙা গ্রাম নিবাসী ভদ্রবংশোদ্ভব ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। ইত্যাদি।

এই সংবাদের উপসংহারে তত্ত্ববোধিনী লেখে : 'এই মহৎ ব্যাপার যে কয়েকটি ব্যক্তি অসামান্য ধীসম্পন্ন প্রসন্নমতি মহাত্মাদিগের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু তন্মধ্যে মহামান্য ও সর্ব্বাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণ আমরা জীবন সত্ত্বেও ভুলিতে পারিব না। তাঁহার অদ্বিতীয় নাম এই অসাধারণ কীর্তির সহিত মহীতলে চিরকাল জীবিত থাকিবে।..."

বহুবিবাহরোধে বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত সংগ্রামকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে তত্ত্ববোধিনী। ৪র্থ কল্প প্রথমভাগের চৈত্র(১৬৯পৃঃ) সংখ্যায় ও দ্বিতীয়ভাগে—ভাদ্র (১৭৭৮শক-পৃঃ৬৬-৭২) সংখ্যায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা হ'য়েছে বহুবিবাহ প্রথার নিন্দা করে' এবং বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।'

সম্পাদক অক্ষয়কুমার দত্ত'র অনুরোধে একদা (১৮৪৮খৃঃ) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই মহাভারতের বাংলা অনুবাদ আরম্ভ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আদিপর্ব্ব [illegible]পা হওয়ার পর কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগরের কাছে এসে জানালেন যে, তিনিও মহাভারতের অনুবাদ করছেন। তিনি বলেন, বিদ্যাসাগরও যদি মহাভারতের অনুবাদ করেন তবে কালীপ্রসন্নের বিরাট পরিশ্রম ব্যর্থ হবে। কারণ বিদ্যাসাগর ছেড়ে কেউ কালীপ্রসন্ন পড়বে না। বিদ্যাসাগর তখনই তাঁর অনুবাদের কাজ ছেড়ে দিলেন। উপরন্তু কালীপ্রসন্নকে তাঁর কাজে অনেক সাহায্য করেছিলেন। এ' ঘটনা কালীপ্রসন্ন নিজেই স্বীকার করে' গেছেন।

'তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য বিদ্যাসাগরকে ব্রাহ্মমতদ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছিলেন ব'লে বলা হয়। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হননি। "১৮৩৯ সালে যখন উপনিষদবেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার প্রবল আগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করে, তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যুক্ত হন নাই। এই কারণে তিনি নিজ অভিপ্রায়ের উপযোগী নূতন একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। তাহাই তত্ত্ববোধিনী সভা।" [মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী পৃঃ৩৪৭]

বস্তুতঃ ধর্ম্মাধ্যক্ষসভায় (paper committee) যে দু'একজনের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত আপন বৈশিষ্ট রক্ষা করে চলেছিল, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে (বিদ্যাসাগরকে) পরোক্ষে নাস্তিক বলেছেন ; কিন্তু এ' কথাও ভুল। বিদ্যাসাগরের ধর্ম্মমত উদার ছিল। তবে বেদান্ত ও অদ্বৈতচিন্তাধারার প্রভাব তাঁর ওপর ছিল, এ' ধারণা অমূলক নাও হ'তে পারে। 'বোধোদয়' গ্রন্থে ঈশ্বর সম্বন্ধে সামান্য যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, তার থেকে তাঁর মনোভাব অনুমান করা যেতে পারে। "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না ; কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান।"

সেদিনের বৈজুদা

শশাঙ্কশেখর সান্যাল

চলতি শতকের প্রথম দশক

মুর্শিদাবাদ জেলার সদর বহরমপুরে ঘোড়দৌড়ের উল্লেখযোগ্য সমারোহ। সিপাহিবিদ্রোহ দমনকারী গোরা-পল্টনের উত্তরাধিকার তখনও সঙ্কুচিত ছাউনি একেবারে ছেড়ে যায় নি। উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ অসামরিক কর্ম্মচারী ও কুঠিয়ালত' আছেই। অশ্ব ও অশ্বারোহীর সমাবেশে বিস্তৃত গড়ের মাঠ উৎসব-আলোড়িত। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত ও বাহির থেকে নানা শ্রেণীর লোক সমাগম—ক্ষুদ্র বৃহৎ হরেকরকম দোকান পসারের ছড়াছড়ি। সব মিলিয়ে উত্তেজনা ও আনন্দের মহামেলা। কিশোর বৈজু—পুরো নাম বৈদ্যনাথ সাহা—শৈশব থেকেই এই পুলকের মধ্যে অন্য অনুভূতির ছোঁয়াচ পেয়েছিল। ঘোড়-দৌড় অতীত পর্ব্ব হওয়ার পরেও দুপুরে একা বেড়াতে বেড়াতে খোলা মাঠের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেত—তার স্বপ্নালু মন হাঁকড়ে উঠত। পরিত্যক্ত প্রান্তরের পিছনের টান যুবক বৈজুর অন্তঃকরণে মাঝে মাঝে ঘা দিয়ে যেত।

নাবালক বৈদ্যনাথ সাহা সহরে একাধিক ভাড়া-আদায়ী, পাকা বসতবাড়ী ও নাম করা আড়তদারির মালিক—শরীর ও সম্পত্তি জন্য নিয়োজিত কোর্ট গার্জেনের তত্ত্বাবধানে। সাবালক হওয়ার পর হিসাব অন্তে দেখা গেল নগদ ও বিষয়ে লাখ দুই টাকার সম্পত্তি—তদুপরি ব্যবসার আয় বেশ ভাল। সদালাপী সামাজিক যুবক। প্রতিবেশী দরদি ও পরদুঃখে কাতর। কোন বদ খেয়াল নাই—গড়ের মাঠে সকালে বিকালে ঘুড়ি উড়ান ছাড়া। আমরা কয়জন অনুরক্ত বালক তাঁর এই বিলাসিতার একান্ত ছড়িদার। স্নানাহার ছেড়ে যখন ঘুড়ি বানাতেন ও সুতোতে মাঞ্জা চড়াতেন আমরা টুকিটাকি কাজে তাঁকে সাহায্য করে ধন্য হ'তাম। তিনি মাঠের দিকে রওনা হলে আমরাও তাঁর পিছনে। শান্তস্বভাবা স্ত্রী—আমাদের ভৌজি—সময়ে তিতবিরক্ত হ'য়ে বলতেন ঐ গড়ের মাঠই তোমার দাদার কাল"

ঘুড়ি-প্রতিযোগিতা এখন ঘোড়া-প্রতিযোগিতার স্থলাভিষিক্ত। এর আয়োজন, প্রয়োজন—রূপায়ণ যাবতীয় দায় দায়িত্বের ভার বৈজুদার। মাঠেই থাকেন—সেখানেই এক ফাঁকে খাওয়া। দূরপাল্লা থেকে যেসব প্রতিযোগী তাঁর আমন্ত্রণে যোগদান করেন তাঁদের অভ্যর্থনা অবস্থানের তদ্বির-তদারক তাঁকেই করতে হয়—একাই সব। বাড়ী আসেন অর্থসংগ্রহে। কখনও দোকানের মূলধনে হাত পড়ছে, কখনও স্ত্রীর গহনা। স্থাবর অস্থাবর বিক্রয় বন্দক—সেত' আছেই। বিশ পঞ্চাশ একশ ঘুড়ি উড়ছে, গোঁত্তা খাচ্ছে উঠছে। বৈজুদার সমস্ত সত্তা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আকাশে বিচরণ করছে—যেন প্রতিটি ঘুড়িকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তার পর প্যাঁচ। কি সে উন্মাদনা। পনের মিনিট, আধ ঘণ্টা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সুতোতে সুতোতে জড়াজড়ি, লাটাইয়ের উপর মাপা মাপা থাক—এই নোজর, এই লাট, কোন্ সময়ে অলক্ষ্যে ঘুড়ি কেটে গেল। চারি দিক থেকে চীৎকার—ভো-কা-ট্টা। সব ধ্বনিকে ডুবিয়ে বৈজুদার বীর্যবান কণ্ঠে করুন অভিব্যক্তি ভো-কা-টা—যেন কাটা ঘুড়ির ও ছিঁড়ে যাওয়া সুতোর সঙ্গে সমবেদনায় কথা কইছেন। আমরা একবার আকাশের দিকে

জীবন্ত, মুমূর্ষু মৃত ঘুড়ির পানে আবার আবাহন বিসর্জ্জনের পুরোহিত বৈজুদার দিশেহারা মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

ঘোড়দৌড়ের মত ঘুড়ি-দৌড়ও এখন যবনিকার অন্তরালে। বৈজুদা নিঃস্ব। একমাত্র পুত্র বার-বৎসর বয়সে হাঁসপাতালের বারান্দাতে মারা গেল। তখন তিনি ভাড়াটে খাপরা ঘরের কোণে নূতন রকমের মাঞ্জা তৈরীতে ব্যস্ত। তাঁর দুঃখ যে ছেলেটা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই সুতোটা ঠিক প্যাঁচ দুরস্ত হ'ত—এও হল না, ওটাও গেল। কিছু দিন মধ্যে সংসারের অবশিষ্ট সূত্রও ছিন্ন হ'ল—ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী পত্নী পতিগৃহে কান্না ফেলে ছেলের খোঁজে নিরুদ্দেশ।

বাজারে এক মাঝারি আড়তে বৈজুদা থাকা খাওয়া ও সামান্য বেতন চাকুরী করেন। সেখানে লাটাই, ঘুড়ি, সুতো ও বোতলচুরও বিক্রী হয়। তাঁর হাতে এসে এগুলোর কাটতি বেড়েছে। কখনও কখনও দাঁড়িও ধরতে হয়। তাঁর বাল্যবন্ধু—আমার সম্বন্ধে দাদা—এখন বিদেশে ভাল চাকুরিয়া। ছুটিতে এসে বৈজুদার খোঁজ করলে আমি তাঁকে নিয়ে আড়তে গেলাম। বৈজুদার একহাতে বাঁধা পুরিয়া, অন্য হাতে ভঙ্গিমা করে অনেক খরিদ্দারকে ঘুড়ি লাটাই মাঞ্জা সম্বন্ধে পাঠ দিচ্ছেন আর ফেলে-আসার প্রতিযোগিতার দিনের এক একটি উন্মাদ মুহূর্ত এঁকে চলেছেন। ঘুড়ির মাঠের পুরাতন বন্ধুকে পেয়ে আরও উৎসাহে সেই সব কথা। কথা কইতে কইতে ভিতরে গেলেন ঘুড়ি আনতে। দোকানিকে দাদা চুপ ক'রে শুধালেন "ওর বাড়ীতে এখন কে আছে?" গদিয়ান উত্তর দিবার সময় বা সুযোগ পাওয়ার আগেই বৈজুদা কতকটা নির্লিপ্তভাবে ক্রেতা বা শ্রোতা বা নিজেকেই বলতে বেরিয়ে এলেন, "শুধু লাটাই প'ড়ে আছে—ঘুড়িও নাই, সুতোও নাই"। ক্ষণেকে জীবনের মানচিত্র থেকে পঁচিশ বছর মুছে গেল। গড়ের মাঠে ফিরে এসেছি। শত সহস্র কণ্ঠের উপর বৈজুদার অপরাজেয় মমতাদৃপ্ত আওয়াজ ভা-কা-ট্টা

জীবজগতে কেঁচো বা অমনি কোন জীবকে পিষিয়া ফেলিলেও তাহারা প্রতি-আঘাত করে না। ইহা সাত্ত্বিকতা নহে। ইহা জড়তা। আবার অনেক প্রাণী আছে পিঁপড়া মৌমাছি বোলতা সাপ কুকুর ষাঁড় ইত্যাদি তাহারা আঘাত পাইলে আঘাত করে। মানুষের ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বভাব আছে। সে আঘাত করিলে বলে, আমি তোমার অধীন হইব না কিন্তু আঘাতের বদলে আঘাতও করিব না।·· আমি তোমার পশুভাব নষ্ট করিব।··· তুমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরকে অধীন করিয়া রাখিতে চাও, সেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে মারিয়া ফেলিব। নষ্ট করিব।

প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৭

সংখ্যাগণনার এক নূতন পদ্ধতি ও তার আলোচনা

সন্তোষকুমার দাশগুপ্ত

শিক্ষাদান সমাজে অপরিহার্য্য। সমাজকে বাঁচাতে গেলে সুষ্ঠু সমাজ তৈরী করতে গেলে, সঠিক ও উপযুক্ত শিক্ষাদান একান্তই দরকার। একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সমাজ গঠনের মূল লক্ষ্যস্থল শিশু। সেই শিশু শিক্ষা পেলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ভবিষ্যৎ সমাজের সৃষ্টি ও সংগঠনের কাজে 'নিয়ন্ত্রক' রূপে কাজ করে। কিন্তু সেই শিশুদের নিয়ে আমরা পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণা-বেক্ষণের কাজ যে ভাবে করি সেই বিষয়ে আমাদের একটু চিন্তিত ও সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ, শৈশব অবস্থায় সে যা৷া গ্রহণ করে তাহাই ভবিষ্যতে তার পাথেয় হিসাবে কাজ করে। কাজেই প্রাথমিক স্তরে শিশুদের শিক্ষাদান এ একটি বিরাট সমস্যা।

শিশুদের শিক্ষাদানের জন্যে ছোট বড় নানাস্তরের শিক্ষায়তন আজকাল গড়ে উঠেছে। কে, জি, (কিন্ডার-গারটেন) বা নার্সারী বিদ্যায়তনগুলি প্রধানত শিশুশিক্ষার বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্দেশ্য শিশুদের খুসীমত গল্প ও খেলাধুলার মাধ্যমে কিম্বা ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া। এই বিদ্যায়তনগুলির শিক্ষাদানপদ্ধতি বিজ্ঞান-মুখী করা। শিশুরা অতি সহজে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী কোন রকম মানসিক নিপীড়নের কবলে না পড়ে সহজভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

সব শিশুদের মন ও গ্রহণ-ক্ষমতা এক রকম নয়। কিছু-সংখ্যক পাওয়া যায় গ্রহণ বা আয়ত্ত করার ক্ষমতা বেশী। এদের সংখ্যা স্বভাবতই কম। আবার কিছুসংখ্যক শিশু এমন যাদের গ্রহণ ক্ষমতা আশানুরূপ নয়। এদের সংখ্যাও গুণে বলা যায়। তাহলে সমস্যাটা স্বভাবতই সাধারণ শিশুদের নিয়েই। এদের সংখ্যাই বেশী। কাজেই শিক্ষাদান সমাজের এই বৃহত্তর অংশ শিশুদের জন্য।

শিশুরা বিশেষ প্রবণতা নিয়ে জন্মে। তারা সবাই কমবেশী খেলাধূলার প্রতি অনুরাগী, আদর ভালবাসা চায়। তারা বিভিন্ন প্রশ্নবাণে বাবা, মা ইত্যাদি ও শিক্ষকদের জর্জরিত করে। অনেক প্রশ্নের উত্তর তাদের মেলে, অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না। তাই শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর এই আচরণের দিকগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির নির্দ্দেশ রয়েছে। স্বভাবতই শিশুর আচরণে এ ধরণের বৈষম্য থাকার জন্যই শিক্ষাদানে অপরিসীম ধৈর্য্য শ্রমের ব্যয় হয় একথা বলা বাহুল্য। শিক্ষাবিদরা যে এবিষয় ভাবছেন না তা নয়। কিন্তু এমন কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থায় এখনও আসা যায়নি যে পরীক্ষার ফলে বলা যায় আমাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান পুরোপুরি সার্থক। তাই পরীক্ষা ও নিরীক্ষা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই।

এ শিশু-শিক্ষার জন্যে যে দরদী, ধৈর্য্যশীল ও ত্যাগী শিক্ষক প্রয়োজন তা আমাদের দেশে বিরল। কাজেই একদিকে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার যেমন প্রয়োজন, অন্যদিকে ঠিক অনুরাগী শিক্ষকের প্রয়োজনও খুব বেশী। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষক এই দু'এর সমন্বয় না হলে শিশুশিক্ষাই নামেই থাকবে।

আজকাল বিভিন্ন স্থানে কে,জি, বা নার্সারী নামাঙ্কিত শিক্ষায়তনগুলিতে শিশুশিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু শিশুদের গুণাগুণ বিচার করলে অনেক পার্থক্য ধরা যায়। এর

কারণ একটা শিক্ষায়তনগুলিতে স্থান, আবহাওয়া ও সর্বোপরি উপযুক্ত পরিবেশের অভাব। তাই উপযুক্ত ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ না থাকিলে শিশুশিক্ষাদানে সাম্যবস্থার রাখায় যথেষ্ট অসুবিধা আছে। (আজকাল কিন্তু হয়েছে তাই। ব্যাঙের 'ছাতার মত গজিয়ে ওঠা নার্সারী বা কে, জি, স্কুল। যেটা স্বভাবতই অস্বাস্থ্যকর।) যদি ধরে নেওয়া যায় উপযুক্ত পরিবেশ আছে তাহলে কোন পদ্ধতি মেনে নিলে সেই শিক্ষায়তনগুলির শিক্ষাদান ও মান এক রকম হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যত: হয় না। তার কারণ বোধকরি শিক্ষকের যোগ্যতার অভাব।

শিশুর প্রতিভা বিকাশের জন্যে যা' প্রয়োজন তা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সময় (২) তার সংশোধনেরও প্রয়োজন। যদিও সেই সব সংশোধন গবেষণা সাপেক্ষ।

সবাই জানেন শিশুদের সংখ্যা গণনা কি করে শেখান হয়? একবার স্কুল প্রাঙ্গণ ও পাঠশালার দ্বারদেশে গেলেই শুনতে পাবেন। শিক্ষকের সুরে সুর মিলিয়ে শিশুদের মর্মভেদী চীৎকার একের পিঠে দুই, বারো, একের পিঠে তিন তেরো ইত্যাদি। কিন্তু একবার যদি সংখ্যাগুলির দিকে নজর দেওয়া যায় পঠনপদ্ধতির সঙ্গে অনেক স্থানে সংখ্যাগুলির কোন সম্পর্ক নেই। অনেকাংশেই নিরর্থক। শিশুর অপ্রাপ্ত বয়সে তার গ্রহণ-ক্ষমতার (receptive mind) এর সুযোগ নিয়ে একটা যেন আবহমানকাল সংখ্যা গণণার রীতি অনুসরণ করে চলেছি। কার্য্যত এ শিক্ষাদান ও শিশুর গ্রহণ যান্ত্রিক (mechanical) ছাড়া কিছুই বেশী হচ্ছে না।

আলোচ্যবিষয় এখানে শিশু-শিক্ষার প্রচলিত সংখ্যাগণনা সম্পর্কে কতকগুলি অসুবিধা ও তার প্রতিকারের সম্ভাব্য পথ।

সংখ্যা গণনায় ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে ইংরেজী ও বাংলায় যা প্রচলিত সে বিষয়ে আলোচনা নিশ্চয়ই এখানে প্রাসঙ্গিক।

পর্য্যবেক্ষকগণ এটা লক্ষ্য করে থাকবেন, ইংরেজী সংখ্যা গণনার যে প্রচলিত রীতি বর্ত্তমানে আছে তাতে আমাদের দেশের শিশুরা ইংরেজী সংখ্যা পড়তে বা গ্রহণ করতে যত সহজে পারে, বাংলা সংখ্যা গণনায় প্রচলিত পদ্ধতির অনুসরণ করে তা'রা সেরকম সহজে আয়ত্ত করতে পারে না। ইংরেজী সংখ্যা গণনার প্রচলিত পদ্ধতিতে এমনকি গুণ আছে যার জন্যে শিশুরা সহজে পড়তে পারে? এই বিষয় ভেবে দেখা দরকার। শুনতে হয়ত খারাপ লাগবে। যদি বলা যায় ইংরেজী প্রচলিত শিক্ষায় সংখ্যা গণণার পদ্ধতি অনেক সহজ, পরিমিত ও বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু আমাদের বাংলায় সংখ্যা গণনাপদ্ধতি কেন এমন সহজ হয়ে উঠতে পারেনি? এ ব্যাপারে আমাদের মন ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোন কারণ নেই। ইংরেজী ভাষায় শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন চর্চ্চা হয়েছে তেমন তার উৎকর্ষতাও বেড়েছে। পশ্চিমী দেশগুলি রীতিমত এ ব্যাপারে প্রচুর শ্রম, সময় ও অর্থবিনিয়োগ করেছে, আমরা তা কিছুই করতে পারিনি। দু'একটি বাংলা ভাষা প্রসারসমিতি প্রতিষ্ঠা করলে কিছু হবে না। এরজন্য চাই প্রাথমিক স্তরে শিশুর মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা যা শিশুমনের উপর অতি সহজে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এদিক থেকে বলা যায় ইংরেজী ভাষায় সংখ্যা গণনার পদ্ধতি এই শিশু-মনের দিকে নজর দিয়েই তৈরী হয়েছে। কিন্তু আমাদের মাতৃভাষার সেদিকে নজর দেওয়া হয়নি বলেই সম্ভবত এত অসুবিধা। নিম্নের আলোচনা মারফৎ আমাদের বক্তব্য পরিষ্কার হবে।

ইংরেজী প্রচলিত সংখ্যা গণনার কথাই প্রথমে শুরু করা যাক্। ইংরেজী সংখ্যাগুলি যথাক্রমে লিখে পঠনের ভাষা পাশাপাশি রেখে বিচার করা যাক।

1—One 2—Two 3—Three 4—Four 5—Five 6—Six 7—Seven 8—Eight 9—Nine 10—Ten 11—Eleven 12—Twelve 13—Thirteen 14—Fourteen 15—Fifteen 16—Sixteen 17—Seventeen 18—Eighteen 19—Nineteen 20—Twenty 21—Twenty one 22—Twenty-two 23—Twenty three......ইত্যাদি 29—Twenty

nine 30—Thirty 31—Thirty one 32—Thirty two……ইত্যাদি 39—Thirty nine 40—Forty 41—Forty one 42—Forty two……ইত্যাদি 49—Forty nine 50—Fifty 51—Fifty one 52—Fifty two 53—Fifty three………ইত্যাদি 59—Fifty nine 60—Sixty 61—Sixty one 62—Sixty two 63—Sixty three……ইত্যাদি 69—Sixty nine 70—Seventy 71—Seventy one 72—Seventy two 73—Seventy three ইত্যাদি 79—Seventy nine 80—Eighty 81—Eighty one 82—Eighty two 83—Eighty three……ইত্যাদি 89—Eighty nine 90—Ninety 91—Ninety one 92—Ninety two……ইত্যাদি 99—Ninety nine.

উপরিউক্ত ইংরেজী সংখ্যাগুলি (যেমন 1 হইতে 100 পর্য্যন্ত) ও তার প্রচলিত পঠনপদ্ধতির ভাষা পাশাপাশি রেখে দেখান হয়েছে। এবার বাংলা ভাষায় সংখ্যাগুলি ও তার প্রচলিত পঠন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা যাক্। বাংলায় পঠনরীতির প্রথম দিক হল ১-এক ২-দুই, ৩-তিন, ৪-চার, ৫-পাঁচ, ৬-ছয়, ৭-সাত, ৮-আট, ৯-নয়, ১০-দশ। মোটামুটি ইংরেজী ও বাংলাতে এই সংখ্যাগুলির ভাষা ধরে নেওয়া গেল। কিন্তু এর পরই বিপর্যয় সুরু হল। ইংরেজিতে কিছুটা, বাংলায় বেশী রকম। ইংরেজীতে ব্যতিক্রম হল 11 এ যার পঠনের ভাষা eleven 12-এর পঠনের ভাষা 'twelve 13 থেকে 19 পর্যন্ত প্রতিটি শব্দ পঠনের সুর একরকম, 13-Thriteen 14-fourteen 15-fifteen'…19-nineteen, পঠনের মধ্যে দিয়ে একটা সুন্দর সুরের রেশ লক্ষ্য করা যায়। পঠনের মধ্যে এই শব্দগতমিল (Phonetically) এবং সুর (harmony) বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ধরণের সুর বা মিল থাকলে শিশুমনকে সহজেই চিত্তের মধ্যে আনা যায় ও শিশুও নিজে উৎসাহ বোধ করে। কাজেই সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে এই সুর নিশ্চয়ই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইংরেজী প্রচলিত সংখ্যা গণনার এই সুর '20' এর পরেই লুপ্ত। অবশ্য তাতে ইংরেজী সংখ্যায় গ্রহণ করার ক্ষমতায় ব্যাঘাত ঘটায়নি। এ একটা ক্রটি হলেও অর্থাৎ সংখ্যা গণনার সহজ ভাষা বর্ত্তমান থাকায় পদ্ধতির প্রভাব ইংরেজী শিশুমনের উপর বেশী।

বাংলায় পঠনের ভাষাটি একটু বিবেচনা করা যাক্। যেমন ১১-এগারো, ১২-বারো, ১৩-তেরো, ১৪-চৌদ্দ, ১৫-পনেরো, ১৬-ষোল, ১৭-সতেরো, ১৮-আঠার, ১৯-উনিশ ২০-বিশ।

পঠনের ভাষা আকৃতির দিক থেকে সহজ হলেও সংখ্যা-গুলির মাঝে পঠনের ভাষায় দূরত্ব অনেক।

তাই শিশুমনের উপর প্রভাব বা ছাপ বেশী পড়েনা। সংখ্যাগুলির সঙ্গে পঠনের ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত দিকও রক্ষা হয়নি। আর একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় যে (১০) দশ এর সঙ্গে (১) এক যুক্ত হয়ে এগারো হয়। এ কতখানি অর্থবাহী হল। কিন্তু সেইদিক থেকে সংস্কৃত সংখ্যা গণনার পদ্ধতি লক্ষ্য করলে একটা সম্পর্ক ধরা পড়ে।

যেমন ১১-একাদশ, ১২-দ্বাদশ, ১৩-ত্রয়োদশ, ১৪-চতুর্দ্দশ, ১৫-পঞ্চদশ, ১৬-ষোড়শ, ১৭-সপ্তদশ, ১৮-অষ্টাদশ, ১৯-উন-বিংশতি? ২০-বিংশতি, ২১-এক বিংশতি, ২২-দ্বাবিংশতি ইত্যাদি, ইত্যাদি, দেখা যাচ্ছে সংস্কৃত সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত দিক ও 'harmony' উভয় গুণ লক্ষ্য করার মত। এদিক থেকে ইংরেজী সংখ্যা গণনার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যই আছে। কিন্তু সংস্কৃতের ভাষাগত দৈর্ঘ্য (length) ও অসুন্দর শিশুমনের প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাই বেশী। সেইজন্য বোধকরি সহজ উচ্চারণ ও ভাষার দৈর্ঘ্য কমিয়ে শোধিত সংখ্যা গণনার পদ্ধতি বাংলায় দাঁড়িয়েছে এগারো, বারো, ইত্যাদি। কিন্তু ক্রটিমুক্ত কোন রকমেই হয়নি। তাই শিশুর মনে এর শব্দগত ও ভাষাগত আবেদন থাকলেও, অর্থবোধক একেবারেই হয়নি, যার সম্ভাবনা (scope) যথেষ্ট আছে। কোন বিষয় গ্রহণ করার মুহূর্তে ভাবতে হবে, শিশুর কোমল-মন নিয়ে খেলা হচ্ছে, তার উপর মানসিক

উৎপীড়ন যত কম হয় সেই রকম একটি সম্ভাব্য পথ খুঁজে বার করা দরকার, হয়ত কঠিনও নয়। তারপর শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাথে যেন সহজে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। কাজেই সংখ্যা গণনায় ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত একটা সম্ভাব্য-রীতি গ্রহণ করা যায়।

যেমন ১০-দশ, ১১-একদশ ১২-দুইদশ,১৩-তিনদশ,১৪-চারদশ, ১৫-পাঁচদশ, ১৬-ছয়দশ, ১৭ সাতদশ, ১৮-আটদশ, ১৯-নয়-দশ, ২০-বিশ, এ ইংরেজী থেকে কি খুব দুর্বোধ্য হল?

এই সংখ্যা পঠনের ভাষা বা রীতি সহজেই সম্পর্ক স্থাপনে সাহায্য করে। যেমন ১০+১ একদশ, ১০+২ দুইদশ ১০+৩, তিনদশ ইত্যাদি। এতে সংখ্যা গণনায় ভাষা সহজ ও বিজ্ঞানসম্মত হল। এই পঠনের রীতি ২০ বিশ থেকে ১০০ একশ পর্যন্ত সর্বস্তরের সংখ্যা গণনায় প্রয়োগ করা যায়। সম্ভাব্যসংখ্যা গণনা রীতিতে ২০তে এলে হয় 'বিশ' তারপর ২১-এক বিশ, ২২ দুইবিশ ২৩-তিন বিশ, ২৪-চারবিশ, ২৫-পাঁচবিশ, ২৬ ছয়বিশ, ২৭-সাতবিশ ২৮-আটবিশ, ২৯-নয়বিশ।

প্রচলিত পঠনরীতি অনুযায়ী উপরিউক্ত সংখ্যাগুলি পড়া হয়, একুশ, বাইশ, তেইশ, চব্বিশ (চারবিশ এর নিকটবর্তী) পঁচিশ (পাঁচবিশ এর নিকটবর্তী) ছাব্বিশ সাতাশ, আটাশ উনত্রিশ।

ইংরেজীতে সংখ্যা গণনায় বিজ্ঞানসম্মত ও সহজবোধ্য রূপ কিন্তু 20 টুয়েন্টি থেকেই লক্ষ্য করা যায়।

যেমন 21-টুয়েন্টি ওয়ান, 22-টুয়েন্টি টু, 23-টুয়েন্টি থ্রি, 24-টুয়েন্টিফোর, 25 টুয়েন্টিফাইভ, 26টুয়েন্টিসিক্স ইত্যাদি 29 টুয়েন্টিনাইন Twentynine, এরপর 30 থারটি 31-থারটি ওয়ান, 32-থারটি টু, 33-থারটি থ্রি ইত্যাদি। যথারীতি এই ভাবে 39-নাইনটি নাইন পর্যন্ত কোন রকম দুর্বোধ্যতা নেই।

আর বিশদভাবে ইংরেজী পঠনরীতির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় 20 এর সঙ্গে 1, 2, 3 ইত্যাদি যথাক্রমে টুয়েন্টিওয়ান টুয়েন্টি টু……টুয়েন্টীনাইন। টুয়েন্টী বললেই 20 এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দেয় তার সঙ্গে 1, 2, 3, যোগ করে উপরি-উক্ত পঠনরীতির ভাষার খুঁজে পাওয়া যায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, পড়তে অসুবিধা হয় না। এই ধরনের বিজ্ঞানসম্মত ও সহজ-আশ্রয়ী পঠন-রীতি স্বভাবতই শিশু মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু বাংলা সংখ্যাগণনার রীতির মধ্যে এই 'সহজ বোধ্যতার অভাব প্রায় প্রতিস্তরেই আছে অর্থাৎ means of Communication এর দিক থেকে বাংলা-পদ্ধতি এখনও অনগ্রসর। আজ শিশুশিক্ষায় পঠনরীতি মোটামুটি একটি যান্ত্রিক mechanistic দুর্বলতায় আচ্ছন্ন। যান্ত্রিক' এই রূপ যত তাড়াতাড়ি দূরীভূত হয় ততই মঙ্গল। শিশুরা যাতে সংখ্যাগুলি সহজে উচ্চারণ করতে পারে ও ভাষার মাধ্যমে সংখ্যাগুলির সম্পর্ক বা নামীকরণ এর মধ্যে সংখ্যাগুলির সান্নিধ্য, উপলব্ধি করে, সেটাই কাম্য। তাই সেদিক থেকে ইংরেজী ভাষার পঠনরীতির মতই বাংলা সংখ্যা গণনায় সম্ভাব্য রীতির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। একটু লক্ষ্য করলে কতকগুলি চমকপ্রদ ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যেমন ২৪ কে চারবিশ বলা হয়েছে। কারও কারও ৪২০ চারশবিশ এর কথা স্মরণ হতে পারে আবার ৪ গুণিতক বিশ বা কুড়ির কথাও মনে হতে পারে।

গ্রামের অশিক্ষিত লোকের কাছে বয়সের হিসাব চাইলে তারা বলে চার কুড়ি যায় অর্থ চার গুণিতক কুড়ি অর্থাৎ ৮০ আশী। সত্যি কথা বলতে সংখ্যা গণনার শিক্ষা এদের নেই। আর 'চারবিশ'কে বিকৃত করে চারশবি মনে করার কারণও অবাস্তব।

বিস্তৃত আলোচনার পর বাংলায় সংখ্যা গণনের রীতি ও প্রচলিত রীতি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ বোধ করি এখন করা চলে।

৩০ ত্রিশ এর উর্ধে সম্ভাব্য রীতি অনুযায়ী সুব কর যাক ৩১-একত্রিশ, ৩২-দুইত্রিশ, ৩৩-তিনত্রিশ, ৩৪-চারত্রি ৩৫-পাঁচত্রিশ, ৩৬-ছয়ত্রিশ, ৩৭ সাতত্রিশ, ৩৮-আটত্রি ৩৯-নয়ত্রিশ।

প্রচলিত পঠনপদ্ধতি, একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ, চৌত্রি পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, সাতত্রিশ, আটত্রিশ, উনচল্লিশ।

৪০ চল্লিশ এর পর:

৪১-একচল্লিশ, ৪২-দুইচল্লিশ, ৪২-তিনচল্লিশ ৪৪ চা

চল্লিশ, ৪৫-পাঁচ চল্লিশ, ৪৬-ছয় চল্লিশ, ৪৭-সাতচল্লিশ, ৪৮-আটচল্লিশ, ৪৯-নয় চল্লিশ।

প্রচলিত পঠন পদ্ধতি: একচল্লিশ, বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ চৌচাল্লিশ, পয়তাল্লিশ, ছিচল্লিশ, সাতচল্লিশ, আটচল্লিশ, উনপঞ্চাশ?

৫০ পঞ্চাশ এর ঘর:—

৫১-এক পঞ্চাশ, ৫২-দুই পঞ্চাশ, ৫৩-তিন পঞ্চাশ, ৫৪ চার পঞ্চাশ, ৫৫-পাঁচপঞ্চাশ, ৫৬-ছয়পঞ্চাশ, ৫৭-সাত-পঞ্চাশ, ৫৮-আটপঞ্চাশ, ৫৯-নয় পঞ্চাশ।

প্রচলিতপদ্ধতি: একান্ন, বাহান্ন, তিপান্ন, চুয়ান্ন, পঞ্চান্ন, ছিয়ান্ন. সাতান্ন, আটান্ন, উনষাট।

৬০ ষাট এর ঘর:—

৬১-একষাট, ৬২-দুইষাট, ৬৩ তিনষাট, ৬৪-চারষাট ৬৫ পাঁচষাট, ৬৬-ছয়ষাট, ৬৭-সাতষাট, ৬৮-আটষাট, ৬৯ নয়ষাট।

প্রচলিত পদ্ধতি: একষট্টি, বাষট্টি, তেষট্টি, চৌষট্টি পয়ষট্টি, ছিষট্টি, সাতষট্টি, আটষট্টি, উনসত্তর?

৭০ সত্তর এর ঘর:—

৭১-এক সত্তর, ৭২-দুই সত্তর, ৭৩-তিন সত্তর, ৭৪-চার সত্তর, ৭৫ পাঁচ সত্তর, ৭৬-ছয় সত্তর, ৭৭-সাত সত্তর, ৭৮ আট সত্তর, ৭৯-নয় সত্তর।

প্রচলিত পদ্ধতিতে: একাত্তর, বাহাত্তর, তিয়াত্তর, ছিয়াত্তর, সাতাত্তর, আটাত্তর, উনআশী?

৮০ আশী এর ঘর:—

৮১-এক আশি, ৮২ দুই আশি ৮৩-তিন আশি, ৮৪ চার আশি, ৮৫-পাঁচ আশি, ৮৬-ছয় আশি, ৮৭-সাত আশি ৮৮ আট আশি, ৮৯-নয় আশি।

প্রচলিত পদ্ধতি: একাশি, বিরাশি, তিরাশি, চুরাশি পঁচাশি, ছিয়াশি, সাতাশি, আটাশি, উননব্বই?

৯০ নব্বই এর ঘর:—

৯১-এক নব্বই, ৯২-দুই নব্বই, ৯৩-তিন নব্বই, ৯৪-চার নব্বই, পাঁচ নব্বই, ৯৬-ছয় নব্বই, ৯৭-সাত নব্বই, ৯৮-আট নব্বই, ৯৯-নয় নব্বই।

প্রচলিত পদ্ধতি: একানব্বই, বিরানব্বই, তিরানব্বই, চুরানব্বই, পচানব্বই, ছিয়ানব্বই, সাতানব্বই, আটানব্বই, নিরানব্বই:

সংখ্যা গণনার ব্যাপারে (১ থেকে ৯৯ পর্যন্ত) প্রচলিত রীতি ও সম্ভাব্য পদ্ধতির একটা কাঠামো স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির পঠনে বেশ সংশয়ের সৃষ্টি করে। যেমন:—১৯ (উনিশ) ২৯ উনত্রিশ ৩৯ উনচল্লিশ, ৪৯ উনপঞ্চাশ, ৫৯ উনষাট, ৬৯ উনসত্তর, ৭৯ উনআশি, ৮৯ উননব্বই, ৯৯ নিরানব্বই। শিশুদের নিয়ে পরীক্ষা করা দূরের কথা। বয়স্কদের নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায়, উপরিউক্ত সংখ্যাগুলির লিখনের ভাষাও সরাসরি উপলব্ধিতে বেশ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

শিশুদের কথা ছেড়ে দিয়ে বয়স্কদের কথাই ধরা যাক্। ২৯ লিখতে বললে লিখে বসে ৩৯, ৩৯ উনচল্লিশ লিখতে গিয়ে লিখে বসে ৪৯ ইত্যাদি। শিশুদের ক্ষেত্রে এ ভুল প্রায়ই হয়। তার কারণ সম্ভবত এই 'উন' কথাটির প্রয়োগ নিয়ে, এর যত ব্যাখ্যাই দেওয়া যাক্ না কেন, শিশুকে উনত্রিশ ২৯ লিখতে বললে এই মানসিক ক্রিয়া হওয়া খুবই সম্ভব, যেন ত্রিশের সঙ্গে ন' যুক্ত হয়ে গেল, ত্রিশের এর ঘরে এসে গেছি। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে উন' এর অর্থ একটা করে দেওয়া যায়, উন'ত্রিশ ত্রিশের ঠিক অনুবর্তী কিন্তু শিশুদের মনে এর রেখাপাত না হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই শিশুশিক্ষায় ২এর পিঠে ৯, ২৯ উনত্রিশ, ৩এর পিঠে ৯, ৩৯ উনচল্লিশ এই ধরণের যান্ত্রিক-পদ্ধতি যত কম অনুসরণ করা হয় ততই মঙ্গল। এ কথা গ্রহণযোগ্য শিশুরা যা পড়ে তা বুঝে শেখেনা অর্থাৎ কিছুটা যান্ত্রিকউপায়েই শেখে। কিন্তু যে রীতি প্রয়োগ করা হয় তা যেন সহজ হয় এবং উৎসাহ নিয়ে শিখতে চায় এবং একটু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে একটা সম্পর্ক খুঁজে পায়। তাই ফলপ্রাপ্তির ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ই গ্রহণযোগ্য। প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজীতে এই সংখ্যাগুলি আর একবার স্মরণ করা যায় যেমন 29 Twentynine. 39-Thirtynine,

49-Fortynine, 59-Fiftynine ইত্যাদি। বাংলা সংখ্যা-গণনায় এই সংখ্যাগুলি গ্রহণ না করতে পারলেও ইংরেজীর এই সংখ্যা পঠনে ও লিখনে শিশুদের কিন্তু এতে অত অসুবিধা নেই। কারণ আর কিছু শব্দগত (Phonetically) সংখ্যাগুলি শিশুমনের উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। কাজেই যে বিরোধ বাংলা ও ইংরাজী সংখ্যা গণনায় বিদ্যমান, তাকে কিছুটা নিরসন করা যায় সম্ভাব্যরীতি অনুসরণ করে, যেমন ২৯ নয়বিশ, ৩৯ নয়ত্রিশ, ৪৯ নয়চল্লিশ; ৫৯ নয় পঞ্চাশ, ৬৯ নয় ষাট...ইত্যাদি ইত্যাদি। ইংরেজী ও বাংলার সংখ্যা গণনার বিরোধ কেবলমাত্র উপরিউক্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধ নয়। যে কোন সংখ্যার সাহায্য নিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। আমাদের পদ্ধতি অনুযায়ী সংখ্যা পঠনে ৭৪'কে চুয়াত্তর বা চারসত্তর সম্ভাব্য রীতি অনুযায়ী, সেখানে ইংরেজী প্রচলিত ধারায় 74'কে Seventyfour পড়ান হয়। দেখা যাক্ কোনটি যুক্তিযুক্ত। প্রসঙ্গক্রমে মনে রাখা দরকার ইংরেজী বা বাংলায় মূল সংখ্যা '70' বা '৭০' তারপর 1, 2, 3, 4 ইত্যাদি কিম্বা ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি যুক্ত করেই পরবর্তী সংখ্যাগুলির উৎপত্তি। তাহলে ইংরেজী প্রচলিত ধারায় 70এর সাথে, 1, 2, 3, ইত্যাদি যথাক্রমে 71 Seventyone, 72 Seventytwo, 73 Seventythree ইত্যাদি দাড়ায়, যেখানে বাংলা প্রচলিত ধারায় একাত্তর, বাহাত্তর, তিয়াত্তর, ইত্যাদি পড়ান হয়। কিন্তু সত্তর, যেখানে মূল বা প্রাথমিক সেখানে 'এক' 'দুই' ইত্যাদি কি করে আগে আসে? অবশ্য এক সত্তরের একটা অর্থ এইভাবে করা যায় এক যুক্ত সত্তর, কিন্তু ত্রুটি মুক্তি করা যায় না। বরং সত্তর এক, ৭১, সত্তর দুই ৭২, সত্তর তিন ৭৩ ইত্যাদি হলে ভাল হত।

একথা স্বীকার্য্য বাংলা সংখ্যা পঠনের প্রচলিত পদ্ধতির একটি ভাল দিক আছে যেটা ইংরেজী সংখ্যা গণনায় একরকম উহ্যই বলা যায়। সেটা হল পঠনের মধ্য দিয়ে কবিতাসুলভ একটি সুরের আবেদন। যেমন একত্রিশ, বত্রিশ (দুই ত্রিশ), তেত্রিশ তিন ত্রিশ, ইত্যাদি। শিশু-মনের কাছে এর যে একটা আবেদন নেই এ কথা মনে করলে ভুল হবে। তবে সুরের আবেদন থাকলেও পঠন ও তার উপলব্ধির মাঝে একটা ফাঁক থেকেই যায়। তাই বাংলা সংখ্যা গণনার রীতি ইংরেজী প্রচলিত রীতির মত বিজ্ঞান-আশ্রয়ী হলে পঠন রীতি ও উপলব্ধির ব্যবধানটুকু ঘটে যায়। সেইদিক থেকে সংখ্যাগুলির পঠনরীতি ৭০এর ঘরে হবে: সত্তর এক ৭১, সত্তর দুই ৭২, সত্তর তিন ৭৩ ইত্যাদি। এই ভাবে পড়তে হয়। প্রসঙ্গক্রমে মনে হয় ইংরেজী সংখ্যাগণনার ক্ষেত্রে 10 থেকে 19 এদের পঠনের ভাষায়ও ত্রুটি রয়ে গেছে। যদি ২০ থেকে এদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় কিন্তু 10 19 পর্য্যন্ত কিন্তু কোন রকমেই দেওয়া যায় না। সেদিক থেকে মনে হয় ইংরেজীতে সংখ্যাগণনায় প্রচলিত ভাষার কিন্তু রদবদল করা দরকার। তাহলেই অনেকাংশে দোষমুক্ত হয়। যেমন 10-Ten, 11-Ten one, 12-Ten two, 13-Ten three, 14-Ten four, 15-Ten five, ইত্যাদি।

তবে প্রচলিত ইংরেজী সংখ্যা গণনায় একমাত্র 11 এবং 12 ছাড়া, 13 থেকে 19 পর্য্যন্ত পড়তে ভালই লাগে। একটা সুরের আবেদন আছে যেটা শিশুদের মনে সহজেই আকৃষ্ট হয়। এ বিষয় অবশ্য আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইংরেজী ও বাংলা সংখ্যা পঠনের রীতি 'একমুখি' হলো, ব্যাপারে রক্ষণশীল তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠবেন, সর্বনাশ ইংরেজী পদ্ধতি নকল করতে কেন যাব? বস্তুত, এতদিনকার পুরোন অভ্যাস কি করে ছেড়ে দিই? তাই মনে হয় অতি শোধনবাদী না হয়ে সম্ভাব্যরীতি প্রাথমিক-ভাবে চালু হলেই আমাদের মঙ্গল।

এ ছাড়াও বাংলা প্রচলিত সংখ্যায় পঠনে যে সংখ্যা-গুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তারমধ্যে ১২ বারো ২২ বাইশ, ৩২ বত্রিশ, ৪২ বিয়াল্লিশ, ৫২ বাহান্ন, ৬২ বাষট্টি, ৭২ বাহাত্তর, ৮২ বিরাশি, ৯২ বিরানব্বই উল্লেখযোগ্য।

এটুকু বলতে পারা যায় ১০এর সঙ্গে ২ যোগ করে দুই দশ যতখানি '১২'এর স্বরূপ প্রকাশ করে, 'বারো'

এই কথাটি সেই স্বরূপ প্রকাশে সমর্থ হয় না। ২০ বিশএর সঙ্গে '২' যুক্ত হলে 'দুই বিশ' যে অর্থ বহন করে 'বাইশ' সেখানে সে অর্থ প্রকাশ করে না। এই প্রভেদগুলি অন্যান্য সংখ্যার ক্ষেত্রে বিদ্যমান। ইংরেজী প্রচলিত ধারার পঠন লক্ষ্য করার মত। একমাত্র 12 Twelve ছাড়া অন্যান্য সংখ্যাগুলির Sequence লক্ষ্য করার মত। 22-Twentytwo, 32-Thirtytwo, 42-Fortytwo, 52-Fiftytwo, 62-Sixtytwo, 72-Seventytwo, 82-Eightytwo, 92-Ninetytwo কাজেই ইংরেজী প্রচলিত পঠনরীতি সহজ, দ্রুত অর্থবাহী, ও বিজ্ঞান-সম্মত। তবে এখানে বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার যে আমাদের সংখ্যাগণনার ভাষা পেয়েছি সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকেই। বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যার কয়েকটি বড় বড় কথা যতই এখানে শোনান হোকনা কেন। কিন্তু একথা সোচ্চারে আবার বলতে চাই সংখ্যাগণনার ভাষা সংস্কৃতে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ভাষাবিদরা সেই সাম্য শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করতে পারেন নি। সংশোধনের ব্যাপারে তারা এমন কাট্‌ছাট্‌ করেছেন যে শিশুমনস্তত্ত্বের দিক সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। তাই যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যাই দিইনা কেন, আমাদের সম্ভাব্য রীতির ভাষা সেই সংস্কৃত ভাষারই অনুযায়ী।

প্রসঙ্গক্রমে একথা আবার জোর দিয়ে বলা প্রয়োজন যে, এই নিয়মে পঠন ও পাঠনে শিশুরা শিখবে অতি সহজে ও স্বাভাবিকভাবে। অকারণে কালক্ষেপের কবলে পড়তে হবে না। এ বিশ্বাসও রাখা যায় সম্ভাব্য রীতিতে ইংরেজীর মত বাংলায়ও সংখ্যা গণনায় শিশুদের পঠনের মাধ্যমে সংখ্যাগুলি আয়ত্ত করার ক্ষমতা (Learning Capacity) অল্প সময়ের মধ্যেই বেড়ে যাবে।

প্রাথমিক স্তরে শিশুশিক্ষা যাহা সমাজ বা জাতি-সংগঠনের অত্যন্ত জরুরী' তাকে অকারণ অনাবশ্যক সময়ের যাঁতাকলে বেঁধে রাখলে সে শিক্ষা-ব্যবস্থায় গলদ থাকবেই। শিশুশিক্ষায় মনস্তত্ত্বের প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সমগ্র পশ্চিমী-দেশগুলি সেই পন্থাই অবলম্বন করে চলেছে। বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার বা পদ্ধতির অনুবর্ত্তী বলে তারা উত্তর জীবনে অতি সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও দেশের মর্য্যাদা বাড়ায়।
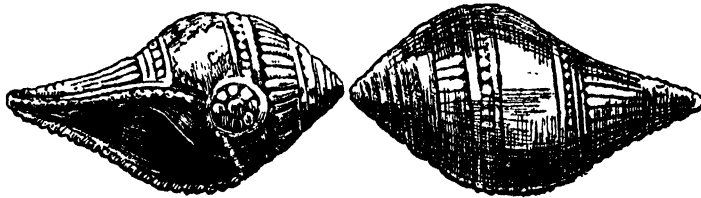
পত্রধারা

পরিমল গোস্বামী

৩

চিঠি ব্যক্তিগত হলেও তার মধ্যে এমন অনেক অংশ থাকে যা সবার জন্য। এমনি সব অংশ বেছে নিয়ে বিদেশ থেকে আমাকে লেখা এই পত্রাংশগুলি এখানে সঙ্কলিত হল। পত্রলেখক বা লেখিকাদের পরিচয় পত্রের মধ্যেই যেটুকু তার বেশি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধ করেছি।

La Fayettle, Indiana
15-3-63

...নিউওয়েষ্টের পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন প্রথম এসেছিলাম, তখন সব চেয়ে যে জিনিস আমার মন হরণ করেছিল তা হল এখানকার সুদৃশ্য ক্যাম্পাস।

আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রকম যদি একটি ক্যাম্পাস থাকত, তাহলে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালাভ আরো সহজ ও সর্বাঙ্গীন হতে পারত। আরো পরিষ্কার করে বলছি—একটি ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শুধু একটি ক্লাস বা ল্যাবরেটরির মধ্যে সম্পূর্ণ হতে পারে—এ ধারণা খুবই ভুল। একটি ছাত্রের শিক্ষাজগৎ কখনই একটি ক্লাস-ঘরের মধ্যে বা একটি ল্যাবের টেবিলের সীমায় সঙ্কুচিত করা যায় না। তার শিক্ষার অনুশীলন, সেই সঙ্গে নিজস্ব চিন্তাধারার বিকাশ ও চরিত্রের সুস্থ সবল পরিণতির জন্য একটি উন্নততর ও বৃহত্তর পরিবেশ অবশ্যই দরকার। একটি আদর্শ ক্যাম্পাস সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। এখানকার ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নগুলিও শিক্ষার এই ব্যাপক রূপায়ণের যথেষ্ট সহায়তা করে থাকে।

এরা এখানকার অন্যতম গর্বের বস্তু। ইউনিয়নগুলিতে কি না আছে? সুবিশাল লাইব্রেরি, থিয়েটার হল, সিনেমা হল, সুসজ্জিত লাউঞ্জ, বলরুম, সুইমিং পুল, এ ছাড়া হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর দুবেলা আহারের জন্য সুসজ্জিত ডাইনিং হল। এখানে ছাত্রছাত্রীদের পরিচালিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত নানারকম ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানের অফিস আছে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি দৈনিক পত্রিকাও আছে। ছাত্ররা যারা পড়ার খরচ নিজেরা উপার্জন করে নিতে চায়, তাদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। ইউনিয়নের বহু পার্টটাইম কাজ এরা পেতে পারে। এখানকার আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ কেন্দ্রই হচ্ছে এই সব ইউনিয়ন। এখানে অধ্যাপকেরাও আসেন এবং সকল বিষয়ে অংশ গ্রহণ করেন।...

এখানকার পার্সোনেল (personnel) অফিসগুলির কাজ হল যেসব ছাত্র পড়াশুনার সঙ্গে রোজগার করতে চান, তাদের কাজ খুঁজে দেওয়া। এবং পড়া শেষ হলে যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চান, অথবা আরও বেশি পড়তে চান, তাঁদের জন্যও এই সব অফিস সুযোগ খুঁজে দিতে চেষ্টা করে।...

তারকমোহন দাস

6 Hamilton Way
London N 3
30th March 1967

…Engagement এর অন্ত-অবধি নাই। দেখা যাওয়া করা ইত্যাদি ত আছেই। এবারে আসিয়া উচ্চস্তরের ইংরেজের সামাজিক জীবন দেখিবার যে সুযোগ ঘটিতেছে তাহা অল্পসংখ্যক ভারতীয়েরই ঘটে। কয়েকদিনের মধ্যেই অ্যাস্‌কুইথের কন্যা লেডি অ্যাস্‌কুইথ (Lady Violet Bonham Carter)-এর সঙ্গে ও দেখা হইবে। তিনি সম্প্রতি চার্চিল সম্বন্ধে অতি সুন্দর একটি বই লিখিয়াছেন। সেটি দিল্লীতে পড়ি। তিনি আমার পুরস্কারের [Duff Cooper] দিনেও উপস্থিত ছিলেন। ফিল্ড মার্শাল অকিনলেক প্রাইজ দেন, তিনি নিজেও আমাকে বলেন যে, বইটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছে।

এখানকার জীবনযাত্রার বাহ্যিক ঐশ্বর্য সীমাহীন। সৌন্দর্যেরও সীমা নাই, কিন্তু ইহার পিছনে একটা নিরাশার কথা আছে। ইংরেজ জাতের ও ইংরেজী সভ্যতার ভবিষ্যৎ আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। সামাজিক জীবনের এক স্তরে একটা বর্বরতা দেখিতেছি, অন্যস্তরে বৈদগ্ধ্য অবশ্য অপরিমিত, কিন্তু এই সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে আমি লিখিয়াছি "I am seeing the golden sunset of the English civilization I have loved."…

…বি বি সি তে ইতিমধ্যেই তিনটি ইনটারভিউ হইয়াছে, আরও একটি 'টক' (3rd Programme) হইবে। মোটের উপর কাজের চাপ আছে।

আমার 'দেশ' পত্রিকার লেখা এই চিঠি পাইবার আগেই শেষ হইয়াছে। কথা সাহিত্যে "হিন্দু মেয়ের ভালবাসা" বলিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে। অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন। "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপ-ব্যবহার" পড়িলেন কি?…১৮ তারিখে রওনা হইতেছি, আপনার চিঠির প্রত্যাশা করিব।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

সংযোজন (১) নিকলসন রোড দিল্লী-৭ থেকে ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ তারিখে নীরদবাবু আমাকে লিখছেন—

…আপনি যাঁহার পরিচয় [উপরের পত্রে উল্লেখিত লেডি অ্যাসকুইথ সম্পর্কে] জানিতে চাহিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে এইবার দেখা হইয়াছে, গতবারে তিনি অসুস্থ ছিলেন, সে জন্য দেখা হয় নাই। গেল বারেও লেডি ডায়ানা ডাফ কুপারের বাড়ীতে দেখা হইবার কথা ছিল, এবার সেইখানেই দেখা হইয়াছে। ইনি রাজনৈতিক নেতা অ্যালফ্রেড ডাফ কুপারের পত্নী, ডিউক অভ রাট্‌ল্যাণ্ডের কন্যা, ও বর্তমান লর্ড নরউইচের মাতা। ইঁহার সঙ্গে ইঁহার বাড়ীতে দেখা হইয়াছে। তিনি বিখ্যাত প্রধান মন্ত্রী অ্যাস্‌কুইথের কন্যা। নাম বিভিন্ন আশ্রয়ে এইরূপ—

কুমারী—Violet Asquith

বিবাহিতা—Violet Bonham Carter.

বর্তমানে—Lady Asquith (Peeress in her own right,)

সংযোজন (২) গত ২৩-২ ৬৯ তারিখের হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে "কমেন্‌টারি" তে নীরদবাবু একস্থানে লিখছেন …"the news…I read this morning? (21-2-69) of the death of……Asquith's daughter Lady Bonham Carter, and Lady Asquith in her own right, whom I met in London and found to be a most vivacious old lady…"

Stavropol U-S-S-R
22-7-64

রাশিয়ান মাসিক পত্র 'ইউনস্ত' (যৌবন)-এর পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। জুলাই সংখ্যায় এই মাসিকপত্রে একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণত এই কাগজে সুপ্রতিষ্ঠিত নবীন লেখকদের লেখা বার হয়, যেমন ইয়েভতুশেংকো, আখ মেদ্যালিন ইত্যাদি। কিন্তু এই সংখ্যায় এবারে সব লেখক লেখিকা নতুন। প্রথম শ্রেণীর এই কাগজে অধিকাংশ লেখকের বয়স ২০-২৫ বছর। প্রতি লেখকের সম্পর্কে ছোট বর্ণনা আছে। বেশ চিত্তাকর্ষক। একজন কেমিক্যাল এনজিনিয়ার লিখেছে ছোটগল্প "আমরা"। ১৯ বছরের

একটা মেয়ে ক্রেন-চালক লিখেছে "টেলিফোনে," আর "বসন্ত"—এই দুটি কবিতা। উয়ালমাশ কারখানার ষ্টীল-মেল্টার লিখেছে 'আরণ্যক' নামক কবিতা। আরো অনেকে। প্রত্যেকেরই প্রথম লেখা। আমাদের কোনও প্রথম শ্রেণীর কাগজ বোধ হয় সবকটা অচেনা লেখকের লেখা ছাপত না। এদের এই "ইউনস্ত" আর "নভই মীর" (নতুন পৃথিবী) কাগজের লেখা নিয়ে অন্যান্য রক্ষণশীল কাগজে খুব চেঁচামিচি হয়।

অভিজিৎ আচার্য

Abbot Hall
710 North Lake Shore Drive
Chicago 11, Illinois
20 10-66

কলকাতা থেকে শিকাগো আসা, এমন আর কি। ৩২ ঘণ্টা প্লেনে আর ট্র্যানজিট লাউঞ্জে—চেয়ার, সোফা, যাত্রী আর মালপত্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় নি। এমন কি অ্যাটলান্টিক সমুদ্রও, মেঘের তলায় আর BOAC র চা কফি আর লাঞ্চের তলায় প্রায় দেখাই যায় নি।

শিকাগোর যে অংশে আছি সেটা কলকাতার পার্ক ষ্ট্রীটের দক্ষিণ বলা যায়। কিছু দূরেই অফিস পাড়া, কাজেই শহরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বোঝার জায়গা এটা নয়। উঁচু বাড়ি, বহুগাড়ি, রাস্তা-ঘাট চৌরঙ্গীর মতোই পরিষ্কার (অথবা নোংরা)। দোকান পাট খুব বিরাট চকচকে। শুনেছি পুরানো শহরে ছোট রাস্তা, নিচু বাড়ি, ছোট ছোট দোকান আছে। এখনো দেখতে যাইনি। পড়াশোনার চাপ বেশি। অ্যামেরিকান ছাত্ররা, টাইম পত্রিকা যাই বলুক, খুব পড়াশোনা করে, করতে বাধ্য হয়।

...সকালে মিশিগান হ্রদ কুয়াশায় ঢাকা। ইউনিভার্সিটির গায়ের আইভি পাতা ঝরে যাচ্ছে।

অভিজিৎ আচার্য

শিকাগো

ফেব্রুয়ারি ২৮, ১৯৬৭

...চিঠি না লেখার রেকর্ড সৃষ্টি করছিলাম। অ্যামেরিকায়, ভারতবর্ষে, ভিয়েটনামে, অনেক কিছু ঘটে কিন্তু নর্থ ওয়েষ্টার্ণ ইউনিভার্সিটির segregated (de facto) আপার মিডল ক্লাস ছাত্র-সমাজে তার কোনো ছায়া পড়ে না।

আমার দিন শুরু হয় সকাল আটটায়, ক্লাস, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে। শনি রবিবারেও অনেক সময় যেতে হয়। সন্ধ্যাবেলা reading assignment, প্রায় স্কুলের হোম-ওয়ার্ক করার মতো।

শিকাগো অ্যামেরিকান Jazz-এর অন্যতম কেন্দ্র। মাঝে মাঝে jazz শুনতে যাই। বেশীর ভাগই নিগ্রো বাদক। নিউ অরলিয়নসের নিগ্রো বস্তীতে প্রথম শুরু হয়ে জাজ্ সমস্ত অ্যামেরিকায় আর ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু এখনও এ জিনিস অ্যাফ্রো-আমেরিকানদের নিজস্ব, ব্যক্তিগত, জাতিগত সঙ্গীত।

জুনমাসে ক্যানাডায় এক্সপো ৬৭ দেখতে যাব।

অভিজিৎ আচার্য

শিকাগো

১৫-১-৬৮

...এখানকার পঠন পদ্ধতি আমাদের অর্থাৎ ব্রিটিশ ধরনের পদ্ধতির চেয়ে আলাদা। সবটা বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল। প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে পাঠ-ক্রমের নমনীয়তা। পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েটের (এখানকার ভাষায় গ্র্যাজুয়েট) ছাত্র একটা বড় কাঠামোর মধ্যে থেকেও নিজের ইচ্ছামতো পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করতে পারে। ডিগ্রীর জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার ক্রেডিট দরকার—যথা এম, এসসি ডিগ্রীর জন্যে আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬টি ক্রেডিট ঘণ্টা দরকার। প্রতি পাঠ্য বিষয়ের নির্দিষ্ট সংখ্যক credit hours আছে—বছরে চার কোয়ার্টার, প্রতি কোয়ার্টারে, ধরো, দশটা বিষয় পড়ানো হয়, প্রতি বিষয়ে (পাস করলে) তিন অথবা চার ক্রেডিট আছে। ছাত্র এই বিষয়গুলির মধ্যে এমন ভাবে নিজের পাঠক্রম নির্বাচন করবে যে, কোয়ার্টার প্রতি ১২ ক্রেডিটের বেশী না হয়। অর্থাৎ ঐ দশটা বিষয়ের মধ্যে সে যে কোন চারটে অথবা

তিনটে বিষয় নিতে পারবে। বিষয় নির্বাচনে ছাত্রের Faculty adviser সাহায্য করেন, তবে সাধারণত ডিকটেট করেন না। এই ভাবে তিন অথবা চার কোয়ার্টারে যখন ৩৬টি ক্রেডিট আওয়ার পূর্ণ হয় তখন প্রয়োজনীয় পাঠ শেষ হয়েছে ধরা হয়। তখন একটা থীসিস লিখতে হয়। আমার থীসিসের কাজ অবশ্য গত বছর ধরেই চলছিল। আমার লেখার কাজ আমি গত সেপটেম্বার (১৯৬৬) থেকেই আরম্ভ করেছিলাম। এখন course work হয়ে যাবার পর থীসিস লিখছি সমস্ত 'ডেটাম্' একত্র করে। আমার বিষয় Correlation of micro-structures and corrosion behaviour of Au-Fe alloys, অর্থাৎ মাইক্রোসকোপে ধাতুর গঠন দেখে তার ক্ষয়-প্রতিরোধ ক্ষমতা কি রকম হবে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা এবং পরে এক্স-পেরিমেণ্ট করে সে ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতা প্রমাণ করা।

এ বিষয়ের উপর আমি দুটো পেপার পড়েছি অ্যামেরিকান সোসাইটি অভ মেটাল্‌স্ এর সভায়। ফেব্রুয়ারিতে নিউ ইয়র্কে এ ধরনের আর একটা পেপার পড়তে যাব।

অভিজিৎ আচার্য

Hotel Arges
Pitesti
20-8-67

…মস্কোয় এক রাত্রি থেকে বুখারেষ্টে এসে পৌঁছেছি। ভিসা না থাকায় মস্কো বিমানবন্দর থেকে বাইরে যেতে পারিনি। ওর ভেতরেই একটা বনে পদচারণা করে রাশিয়ার মাটির স্পর্শ লাভ করলুম।

বুখারেষ্টে…রাজাদের হাল এখন খুব খারাপ। বুখা-রেষ্ট থেকে বেরিয়ে এক পাহাড়ী শহরে এসে দুদিন ছিলাম। জায়গাটার নাম আগে ছিল ব্রাশোভ—পরে হয় স্তালিন নগর। তারপরে আবার এখন ব্রাশোভে পরিণত হয়েছে।

এখন অন্য পথে বুখারেষ্টে ফিরছি, রাত্রিবাস করছি আধাশহর একটা জায়গায়—যেন নব-আলিপুর। তা বলে মনে করবেন না আমাদের গ্রামের সঙ্গে নব-আলিপুরের যতখানি তফাৎ, এখানকার সঙ্গে বুখারেষ্টের তফাৎও তত-খানি। আধাশহর অর্থে রাস্তায় গাড়ি একটু কম চলে, এবং লোকজনের জামাকাপড় চুলকাটার ষ্টাইলটা একটু সেকেলে।

যাই হোক, কাল সন্ধ্যায় বুখারেষ্টে ফিরছি। রবীন্দ্রনাথ যে হোটেলে ছিলেন এবং তারপর অনেক ভদ্রলোক, চোর-জোচ্চোর ও স্মাগলারও যে হোটেলে থেকেছে ও থাকছে, সেখানে ফিরছি। ২৩শে অগষ্ট রুমানিয়ার গণতন্ত্র দিবস। সেদিন রাজধানীতে থেকে উৎসব দেখব। তারপর সমুদ্র-তীরে [কৃষ্ণসাগর] ভ্রমণ করে আবার বুখারেষ্টে ফিরব ২৮শে। তারপর মস্কোর পথে দেশের দিকে।

আবার চাল নেই, চিনি নেই, ময়দা নেই, মাছ নেই শুনতে কলকাতায় ফিরব ২রা/৩রা সেপটেম্বার। এ কদিন বেশ আরামে আছি। অতিথি বলে নয়, সাধারণ লোকেরও মুখে নেই নেই শুনি না। রাস্তায় সবাই হাসি-মুখে চলেফিরে বেড়াচ্ছে এমন দৃশ্য কতদিন দেখিনি। চায়ের সঙ্গে চিনির কিউব দেয়—সবটা না খেলে ফেলে দেয়, দেখলেও কষ্ট হয়। কলকাতায় এতটুকু চিনির জন্যে মাথা খুঁড়তে হয়।…

যে-কোনো রেস্তোরাঁয় খেতে গেলে এত খাবার দেয় যে, খেতে পারা যায় না। দুপুরে দুপদ খাবার খেলে রাত্রে আর খাবার প্রশ্ন ওঠে না। একপদ খেলে কোন রকমে হয়ত রাত্রে একটুকরো পাঁউরুটি খাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য শস্তা নয় অবশ্য—এক কে-জি কালো রুটির দাম দুই লেই—প্রায় দুটাকার সমান। কিন্তু সবচেয়ে কম মাইনে পায় ঝাড়ুদার—মাসে ৭০০ লেই।

এক কে জি রুটিতে সারা পরিবারের খাওয়া হয়ে যায়। রুটির নিজস্ব দোকান আছে। সেখানে তাকের ওপর জানলার ধারে স্তরে স্তরে সাজানো নানা ধরনের নানা বর্ণের রুটি। পথ চলতে দেখি আর ভাবি—হে মোর দুর্ভাগা দেশ!…

দেশটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য খুবই বৈচিত্র্যময়। পাহাড়পর্বতে গাড়ি করে অনেক ঘুরলাম। অনেক মিউ-

জীগ্রাম, প্রাচীনকালের দুর্গ দেখলাম। কিন্তু যে যাদুমন্ত্রে অন্নবস্ত্র সুরক্ষিত করছে এরা, সেটা দেখেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। না, প্রচার নয়। ওসব ষ্টালিনী ষ্টাইল আজকাল বরবাদ হয়ে গেছে। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাব কিছু কিছু পাচ্ছি। আর চোখে দেখছি। আর বারবার মনে পড়ছে আমাদের গ্রামগুলোর কথা।

কাল একটা যৌথখামারে গিয়েছিলাম। শুনলাম আজকাল নাকি চাষীরা মোটরগাড়ি করে শহরের বাজারে শাক মাছ নিয়ে যায়। গ্রামে নাকি ঘরে ঘরে টেলিভিশন রেফ্রিজারেটর। দেখা হয় নি, জানি না। কিন্তু গ্রামের পথ অ্যাসফাল্‌ট বাঁধানো, দোকানে কাঁচের জানালা। বাড়িঘর বাইরে থেকে দেখে মফঃসল শহরের শৌখিন লোকের বাড়ি বলে মনে হয়। জানলায় যে লেসের পর্দা ঝোলে তা কলকাতায় আমার কেনবার সামর্থ্য নেই।

আরও একটা আশ্চর্য বস্তু দেখলাম, যা আমাদের দেশে হয়ত কখনোই সম্ভব হবে না। লেখকদের এখানে অসাধারণ সম্মান। লেখক সমিতির সভাপতি জাহারিয়া স্তানকু একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ওঁর একটা উপন্যাস আমি অনুবাদ করেছি, সেই সূত্রে ওঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তারপর দিন উনি আমাকে দুপুরে খেতে নিমন্ত্রণ করলেন, বুখারেষ্ট থেকে একটু দূরে বনের মধ্যে একটা রেস্তোরাঁয়। সেখানে একজন রুশ সাহিত্যিক ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন। শিক্ষা সংস্কৃতি দপ্তরের সহ-মন্ত্রীও ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয় লেখকদের কাছে সম্মানে শ্রদ্ধায় প্রায় অবনত হয়ে ছিলেন। স্তানকুর স্ত্রী মাতৃসুলভ স্নেহে মন্ত্রীমহোদয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, এসো বাবা বসো। কতদিন দেখিনি। বাড়িতে ছেলেপুলে ভাল তো? দেখেশুনে চোখকান জুড়িয়ে গেল। আমাদের লেখকেরা যে কবে পুরস্কারের লোভে পাত্রমিত্রদের খোশামোদ করা ছাড়বেন!

এতক্ষণ রুমানিয়ার প্রশংসা করার পরে একটু আত্মপ্রশংসা করা যাক। স্তানকু প্রমুখ সবাই যখন আমার রুমানিয়ান ভাষা জ্ঞানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছিলেন, তখন সহমন্ত্রী বললেন, "উনি যখন বুখারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছেন, সেই সময় আমি ডীন ছিলাম, সেজন্য গর্ববোধ করছি।" তারপর ফিরে এসে মাথাঘোরার ওষুধ খেলাম।

অমিতা রায়

ভিলা নারচিসা
এফোরিয়ে
রুমানিয়া
২৪-৮-১৯৬৭

দুদিন বুখারেষ্টে বাস করে আবার পালিয়ে এসেছি। সেবার ছিলুম পাহাড়ে এবার এসেছি সমুদ্রে। পাহাড়ে যাবার রাস্তাটা ভারি সুন্দর ছিল, এবারকার রাস্তা সমতল মাঠের মধ্যে দিয়ে। বৈচিত্র্য কম। কিন্তু গাড়ি-করে ড্যানিয়ুব নদী—এরা যে নদীকে মিষ্টিসুরে বলে দুনারেয়া—পেরোবার জন্যে ফেরী নৌকায় ওঠার আগে একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল। নৌকাঘাটের পাশে একটা ছোট্ট রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে একটা মাত্র খাবার পাওয়া যায়। কি জানেন? মাছ! টাটকা ভাজা মিঠে জলের মাছ! খেয়ে মনে হল এমন জিনিষ ছোটবেলায় খেয়েছি বটে। আপনার সেই গল্প [যাদুঘর] অনুযায়ী যখন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে যাদুঘরে মাছের মডেল বানাবার জন্য গবেষণা চালান হবে তখন যদি গবেষকেরা একবার রুমানিয়া ঘুরে যান! এখানে মোটাসোটা কয়েকটি বেরালকেও ঘুরতে দেখলাম, ঠিক যেন বিস্মৃত বাংলাদেশ। যাকগে, এসব শুনে আবার আপনার মন খারাপ হবে, অতএব অন্য প্রসঙ্গে যাওয়া যাক।

যে বাড়ীটায় এখন আছি, এর নাম নারচিসা (অর্থাৎ নার্সিসাস, যে নাম আমাদের পরিচিত)। এঁরা আমার জন্য একটি পুরো অ্যাপার্টমেণ্ট রেখেছেন। আমার সঙ্গিনী শ্রীমতী প্রেশা আছেন অন্য একটা বাড়িতে। শোবার ঘর, রান্নাঘর, বসবার ঘর, স্নানের ঘর. সব আছে। সব সাজানো-গোছানো—রেডিও রেফ্রিজারেটর সুদ্ধ আছে।

টেবিলের উপর টাটকা গোলাপফুল পর্যন্ত। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ঘরে সুটকেসটা দিয়ে যেতে এসেছিল, বললে, "বাঃ! এখানকার রেডিওটা খুব ভাল তো! আমার বাড়ীতেও ঠিক এই রেডিও আছে।"

৯ ভালভের বিরাট রেডিও সাধারণ ড্রাইভারের বাড়িতে, কি আর বলব! এখানে কিন্তু দরজায় একটা মাত্রই গা-চাবি। শোবার ঘরের পাশে বারান্দার রেলিং ডিঙিয়ে যে-কোন লোক উঠতে পারে। অথচ তার মধ্যে একটামাত্র কাঁচের দরজা, সেখানেও শুধু ঐ গা-চাবি। এ বাড়িতে এমনি চারটে অ্যাপার্টমেন্ট আছে। কিন্তু এই যে রাত্রে শার্সির দরজার উপর থেকে মোটা ভেলভেটের পর্দা সরিয়ে দিয়ে বসে বসে চিঠি লিখছি, একটুও ভয় করছে না। চোরেরও না, ভূতেরও না। এত দামী দামী জিনিসই যখন চুরি যায় না, তখন আমার আর ভয় কি?

এখানে আসবাবপত্রের ভীষণ দাম। ছোট্ট লেসের টেবল-ক্লথটারই দাম হবে টাকা পঞ্চাশ। এ সব দেশ থেকে—এরা ভূত মানে না বলে—বছরে কত হাজার মৃতের আত্মা হয় চালান হয়ে যাচ্ছে, আর না হয় শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। কিংবা এদের পুনর্জন্ম হচ্ছে ভূতমানা দেশে।

আমার ঘরটা একতলায়। সমুদ্রের জলো হাওয়ার হাত থেকে বাড়িটা বাঁচাবার জন্য সামনে একসারি ঘন-পাতার গাছ লাগানো আছে, তাই সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি না ঘর থেকে। সমুদ্র অবশ্য অনেক নিচে। এ জন্য মাঝে-মাঝে সিঁড়ি-দেওয়া তিনতলা ব্যালকনি আছে বীচের উপরে।

এদেশের বেশির ভাগ লোক কিন্তু সমুদ্রের চেয়ে পাহাড় বেশি ভালবাসে। পাহাড়ও এখানে বড় সুন্দর। সুইজারল্যাণ্ডের আল্‌প পর্বতমালা শীতের তুষারে অপূর্ব সুন্দর, কিন্তু গ্রীষ্মে রুক্ষ। রুমানিয়ার আল্‌প গ্রীষ্মেও মখমলের মতন সবুজ।

আগে জানিয়েছিলাম, পাহাড়ের উপর দিয়ে দড়িপথে বেড়িয়েছি। কি ভাল যে লাগল! প্লেনে ওঠার চেয়েও সুন্দর। প্লেনে বন্ধ খাঁচার অনুভূতি, আর দড়িপথে মনে হয় আকাশে রিকশায় চলছি।

পাহাড়ী শহর ব্রাশোভ অদ্ভুত সুন্দর। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই শহরের পত্তন। ভারী মজার জায়গা। একটা চোদ্দতলা হোটেল, আবার তার পাশেই একটা নিচু বাড়ি, তার পাশেই এক প্রাচীন গির্জা, আবার কোথাও প্রাচীন দুর্গের একটা আস্ত দেয়ালের উপর দিয়ে গাঁথা হয়েছে নতুন কোন শিক্ষায়তনের বাড়ি। অথচ সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। আমরা যে হোটেলে ছিলুম সেটা রাজধানী বুখারেস্টের যে-কোনো হোটেলের চেয়ে সুন্দর। উঠোনে একটা বড় পুকুরের মধ্যে থেকে সরু লম্বা একটা ফোয়ারার ধারা অনেক দূরে উঠে নিচে ঝরে পড়ছে। এই জলধারায় নানা রং প্রতিফলিত হচ্ছে—জলের মধ্যে দীপাবলীর আলোর খেলা।

ঐ আধুনিক হোটেলের থেকে একটু দূরে একটা প্রাচীন গ্রীক গির্জার পিছনে একটা মধ্যযুগীয় দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। সেখানে সরু পায়ে চলা পথের দুপাশে বনলতার জড়াজড়ি। অনেক অচেনা ফুলের ভিড়। মাঝে মাঝে পাখীর ডাক।…এ যেন সত্যিই মধ্যযুগ। এই দুর্গের উপরে এখনো প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের হাত পড়েনি। এর অমার্জিত ভাব সেই জন্যই। ব্রাশোভ শহরের বিখ্যাত কালো গির্জা এর কাছেই। গথিক গড়ন, তৈরি করতে নাকি একশ বছর লেগেছিল। তারপর সপ্তদশ শতকের শেষদিকে পুড়ে কালো হয়ে গেছে। আমরা যেদিন গিয়েছিলাম, সেদিন রবিবার। অনেকে প্রার্থনা করছিলেন। দেব-স্থানে এত সুন্দর গাম্ভীর্যময় ভক্তির পরিবেশ এমন ডিসিপলিন একমাত্র সভ্য দেশগুলিতেই সম্ভব। কিন্তু এখানকার গাছের পাতার মতো আমার চিঠির পাতা আর বাড়ানো ঠিক নয়।

অমিতা রায়

আথেনি পালাস হোটেল
বুখারেস্ট
২৯ অগস্ট, ১৯৬৭

মিউজীয়াম। বুখারেষ্টের কাছেই এই বাড়িটা। ডকটর মিনোভিচ নামক ইনজিনিয়ার লোকশিল্পের নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেছিলেন। বাড়ির এক একটি দেয়ালে সীলিঙে এক এক শতাব্দীর স্টাইলে কারুকার্য করিয়ে ছোট্ট একটি গির্জার বেদীর মডেল করিয়েছিলেন, তারপর বাড়িটাকে মিউজীয়াম করে তুলে মৃত্যুর আগে এটিকে আকাদেমীকে দান করে যান। এখন এটি জাতীয় সম্পত্তি। মিনোভিচের একজন ভাগনে অথবা ভাইপো অথবা নাতি (রুমানিয়ান ভাষায় nepot বলতে এ সবই বোঝায়, ভাষাতাত্ত্বিকেরা নেপোটিজম অথবা নেভিউটিজম্-এর কথা ভাববেন) এর তদারক করেন। আমাদের দেখিয়ে শুনিয়ে তিনি বললেন, মাতৃভাষায় কিছু লিখে দিয়ে যান ভিজিটর্স বুকে। এ পর্যন্ত এদেশের যত জায়গায় গেছি, সুযোগ পেলেই বাংলা এবং রুমানিয়ান - দুই ভাষাতেই লিখে এসেছি। পাতা উলটে নিয়েছি অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার বা বর্ণের ছাপ নেই সেখানে। তখন মনে হয়েছে আট বছর আগে যে, এই বুখারেষ্টে বসে এত পরিশ্রম করে রুমানিয়ান শিখেছিলাম তার সার্থকতা এতদিনে মিলল। নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে এসে অন্তত কয়েকটা বাংলা অক্ষরও তো এই খাতাগুলোয় পৌঁছে দিতে পারলাম। এবং আর কোনো ভারতীয় ভাষার আগেই !

হস্টেলে থেকে এখানে পড়বার সময় আমাদের এম্‌ব্যাসির নিরামিষভোজী লোকদের স্ত্রীরা বলতেন, তোমার আর কি, খাওয়াদাওয়ার তো বাছবিচার নেই, যেখানে খুশী থাকতে পার। 'বঙ্গাল মুলুকমে এইসাই হোতা হ্যায়।' ভাগ্যিস বাংলা দেশে খাওয়াদাওয়া ছোঁয়াছুঁয়ির হাঙ্গামা নেই, তাই বিদেশ বাস বাঙালীর পক্ষে সহজ। আমিই এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালী ছাত্রী ছিলাম।……

মিউজীয়ামের কথা বলছিলাম। ছোটখাট এই মিনোভিচ মিউজীয়াম যেমন একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ, সিবিউ-এর একটি বিরাট মিউজীয়াম তেমনি অষ্টাদশ শতকের ব্যারন ব্রুকেনথানের ব্যক্তিগত সংগ্রহ। রাজপ্রাসাদের মতন ঐ বাড়িটিও তাঁরই নিজের বাড়ি ছিল। এর ছয়টি শাখা—প্রকৃতি বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, লোকশিল্প, সামন্ত যুগের শিল্প আর গ্রন্থাগার। এক সপ্তাহ ধরে দেখলেও সময়ে কুলোয় না। আমার দুটি শাখায় কোনো রকম চোখ বুলিয়ে যাওয়াতেই সারা দিন লেগেছিল। শোনা গেল গ্রন্থাগারে দুলক্ষ চল্লিশ হাজার বই আর পাণ্ডুলিপি আছে। এবং তার সবই জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল্যবান বই।

বুখারেস্টে আর একটি মিউজীয়াম আছে, গ্রিগোরে আন্তিপার ব্যক্তিগত সংগ্রহ, নেচার হিষ্টরি মিউজীয়াম। এর সংগ্রহের সংখ্যা আর উৎকর্ষ না কি ভিয়েনার মিউজীয়ামের পরেই। অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বিতীয়। আন্তিপা সারা পৃথিবীর বন্ধু বান্ধবদের কাছে চেয়েচিন্তে জিনিসপত্র জোগাড় করে এই মিউজীয়াম করেছিলেন।

আমাদের দেশের ধনীদের টাকা এদের চেয়ে অনেক বেশি ছাড়া কম ছিল না। তারা এত টাকা কি করত বলুন তো? বাঁদরের শ্রাদ্ধ আর বেরালের বিয়ে? কিছু সৎকাজও করেছেন, কিন্তু তা কনভেনশনাল। এবং পুণ্য লাভের নিশ্চিত আশায়।

আর একটি আশ্চর্য মিউজীয়াম দেখলাম—গ্রাম মিউজীয়াম। একটা পার্কের মধ্যে সতেরো একর জমিতে সতেরোটি প্রদেশের গাছপালা, ঘরবাড়ি, কুয়ো, যাঁতাকল সব। মডেল বা মিনিয়েচার নয়—আসল। সত্যিকার ঘরবাড়ি গ্রাম থেকে তুলে এনে বসানো হয়েছে। ভিতরে বাইরে সবই যেমন ছিল তেমনি। বেশ ভাল লাগল। এবারে আসবার পর আর এখানকার গ্রাম দেখিনি। এরা যাকে গ্রাম বলে সেখানে পিচের রাস্তা, নিয়ন আলো, ছেলেমেয়েরা হাতে হাতঘড়ি বেঁধে গাড়ি চালায়। কোন কোন জায়গায় ক্ষেত-খামারের কাছে পথ কিছু ভাঙা—কলকাতার কলেজষ্ট্রীটের মতন। কলকাতার গ্রাম মিউজীয়ম তো সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে। ছেঁড়া চটের ৩ হাত × ৪ হাত 'বাড়ির' এক একটা কলোনি।……

অমিতা রায়

আকাশ পথে

১-৯-১৯৬৭

……আমি এখন কোথায় জানি না। মস্কো ছেড়েছি

বিকেলে। ইংরেজী মতে কাল সকালে দিল্লী পৌঁছাব। মাঝামাঝি কোন জায়গায় আকাশে আছি। চিঠি দিল্লী থেকে ডাকে দেব। বিমান-মাঝি আকাশ সমুদ্র পার করে দেবে। কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের দেশকে পার করবে কে? এ চিন্তা মন অধিকার করে আছে। রুমানিয়ায় সতেরো দিন থেকে একেবারে বোকা বনে গেলাম। দ্বিতীয় যুদ্ধে রুমানিয়া গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। তার আগেও এমন কিছু নাম করা দেশ ছিল না। থাকার মধ্যে ছিল মাটির নিচে খানিকটা পেট্রল আর মাটির উপরে লক্ষ্মীছাড়া মানুষের পাল। তাদের পেটে ভাতও ছিল না বিদ্যাও ছিল না। অথচ এই বিশ বাইশ বছরে এরা কি করেছে! এমনকি ১৯৬১-তে যে রুমানিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলাম, ১৯৬৭র রুমানিয়া তাকেও কতদূরে ফেলে চলে এসেছে! এত সমৃদ্ধি এত সৌন্দর্য এরা কোথায় পেল!

রাশিয়া এদের প্রথম দিকে খুব সাহায্য করেছে, সে কথা সত্যি। কিন্তু আমরা? আমরাও তো সাহায্য পেয়েছি। আমাদের মতন এমন মাটির সম্পদ কটা দেশের আছে? এত বিদেশী সাহায্য কোন্ দেশ পেয়েছে? তারপর আমরা তো এক আবহমানকালের ঐতিহ্য পেয়েছি—পেয়েছি ইংরেজের শিক্ষার আলোক। সে সব আমাদের কোন্ কাজে লাগল?

এরা তো দেশ গড়তে মানুষও কত কম পেয়েছে। তবে যে কজন পেয়েছে তারা ওদের ম্যান-পাওয়ার, আর আমরা কেবলই পপুলেশন। এই পপুলেশন আমাদের বিশেষ কোনো কাজে কেউ লাগল না। আমরা খুব অহঙ্কার করে গান গেয়েছি 'চল্লিশ কোটি মোরা'—এখন দেখছি সংখ্যাটা কমানো যায় কি করে। এবং গানটা কাব্যেই ভাল, যদিও এত ভিখিরী নিয়ে গর্ব করা গানেও উৎসাহ হয় না।

এদেশের একজন নেত্রীস্থানীয়া মহিলার সঙ্গে ২৬শে অগস্ট দেখা করেছিলাম। এঁর নাম মারিয়া গ্রোজা—নারী কাউন্‌সিলের সেক্রেটারি ছিলেন আগে। তখন আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এখন ঐ কাউন্‌সিলের প্রেসিডেন্ট উনি। কাউনসিলের সাপ্তাহিক পত্রিকারও সম্পাদিকা, আবার ওদিকে পার্লামেন্টের চার জন ভাইস-প্রেসিডেন্টের একজন। আমি ওঁর সঙ্গে কাউনসিলেই দেখা করেছিলাম। আমি মিনিট পাঁচেক আগে পৌঁছেছিলাম।...তিনি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সময় হলে ফাইলের কাজ চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন।......ঘরে গিয়ে দু একটি কথার পর বললেন, তুমি তো ১৯৬১ তে দেশে ফিরলে? তারপর থেকে কি হয়েছে সেটাই বলি তা হলে।

তারপর তিনি, আমার দিদিমার কাছে বসলে যেমন ঘরোয়া কথা সব গড়গড় করে বলে যান, তেমনি করে এই ক বছরে দেশের মেয়েরা কতটা এগিয়েছে, মেয়েদের জন্য কি কি করা হয়েছে, শিশু কল্যাণের কাজ কি কি করা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত সব শিক্ষায় কি কি পরিবর্তন এসেছে, সব গল্পের মতন বলে গেলেন—ষ্ট্যাটিসটিক্সসমেত।...একবার রেফারেন্স বই দেখলেন না।...আমি সংখ্যার তোড়ে ভেসে গেলাম। খাতা পেনসিল নিয়ে বসেছিলাম, বন্ধ করে রেখে দিলাম।...

শ্রীমতী গ্রোজার বাবা ছিলেন রুমানিয়ার প্রথম প্রধান মন্ত্রী। নাম পেত্রু গ্রোজা। তাঁর নেতৃত্বেই রুমানিয়া জারমান শাসন থেকে মুক্তি পায়। তিনি যখন দেশের ভার নিয়েছিলেন, তখন দেশে একেবারে লক্ষ্মীছাড়ার অবস্থা। তখন বরফের উপর খালি পায়ে হেঁটেছে লোক—এমনই দারিদ্র্য ছিল তখন। সে ঐ দ্বিতীয় যুদ্ধের ঠিক পরের অবস্থা। এখনকার লোকেরা সে সব দিন দেখেনি। তখনকার লোকদের কাছে শুনেছি গ্রোজা একটা মোটা ওভারকোট পরে টুপি মাথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন আর পথের লোকদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন তাদের কিসের অভাব, কি দুঃখ। এখনকার প্রেসিডেন্টও নিজে পথে বেরিয়ে সব দেখে বেড়ান। বাজারে ঢুকে খারাপ খাদ্যবস্তু কিছু দেখলে নিজহাতে টেনে পথে ফেলে দেন।—কিন্তু এসব রূপকথার গল্প ভেবে আর লাভ কি?

অমিতা রায়

Post Box 497
Kathmandu
21.2.68

......ক্যামেরায় ফোকাস করতে করতে ঝাপসা ছবিটা যেমন

ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমার সামনের পাহাড়গুলো তেমনি যত বেলা বাড়ে ততই মেঘ কাটিয়ে পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয়। চেয়ে থাকতে থাকতে দেখি এক একটা নতুন শিখর, নতুন খাঁজ, সারাদিন আকাশ যেন তার ক্যামেরা ফোকাস করছে, এইতে তার বেশ সময় কেটে যায়। রোজ নতুন অংশ আবিষ্কার করি।

সকালে উঠে জানলা দিয়ে দেখি নগাধিরাজ, সারা দিন ছাতে বসে দেখি নগাধিরাজ—কোথায় পাহাড়ের শেষ, আকাশের শুরু সব গোলমাল হয়ে যায়। কোন্‌টা তুষারমৌলি চূড়া আর কোন্‌টা মেঘ বুঝতে ধাঁধা লাগে অনেক সময়।

আমি আছি বাঘমতী নদীর এপারে, জায়গাটার নাম ললিতপুর, কাঠমণ্ডুর শ্যামবাজার। ওপারে নতুন নতুন বাড়ি, চওড়া রাস্তা, রাজপ্রাসাদ, সিংদরজা, অর্থাৎ সেক্রেটারিয়েট, আসল কাঠমণ্ডু। ওখানেই আছে একখানা গাছের কাঠ থেকে তৈরি মন্দির, যার নাম কাষ্ঠ মণ্ডপ, তার থেকেই কাঠমণ্ডু নামের উৎপত্তি।

এর মধ্যে এক দিন দামন গিয়েছিলাম, সেখান থেকে সব পর্বত শিখর দেখা যায়, এভারেষ্ট, গৌরীশঙ্কর, অন্নপূর্ণা—সব। এভারেস্টের অবশ্য নেপালী ভাষায় অন্য নাম আছে।

এদের ভাষা-প্রীতি অসাধারণ—সর্বত্র নেপালী ভাষায় পোষ্টার লেখা। পৃথিবীর তাবৎ দেশের কাছে এরা সাহায্য নিচ্ছে, এমন কি ভারত পাকিস্তান ইজরায়েলের কাছেও। কিন্তু যেখানে যত সহযোগিতার পোষ্টার পড়ছে, আগে নেপালী ভাষা, তারপর ইংরেজী। ইংরেজী এদের দ্বিতীয় ভাষা। শিক্ষিত লোকেরা সবাই ইংরেজী বলে।

পরশু এদের প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসবে রাজ দর্শন করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু অনেক দূরে দাঁড়ানোর জন্য দেখা যায় নি, শুধু প্রজাদের দেখা হল।

আর একটা জিনিস দেখছি, বিদেশী জিনিসে বাজার ভরতি। জাপানী মাল অনেক আসে, ইয়াশিকা ইলেকট্রো-৩৫ ক্যামেরা কিন্তু নেই। আসবার সময় সহযাত্রী এক ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছে ইয়াশিকা মিনিম্যাক্স ক্যামেরা দেখলাম, ৩৫ মিলিমিটার, ভেতরে লাইট মীটার বসানো, আপনা থেকে এক্সপোজার সেট হয়ে যায়, জাপানে কেনা ৭ পাউণ্ডের মত দাম। ভদ্রলোক প্লেনের জানালার ভেতর দিয়ে দূরের এভারেষ্টের ছবি তুললেন। আমার খুব ঈর্ষা হচ্ছিল। আর এক অ্যামেরিকান মহিলার কাছে দেখলাম টেলিফোটো লেন্স বসানো আধুনিক মডেলের রোলিফ্লেক্স ক্যামেরা। হংকং-এ কেনা।

ক্যামেরার কথা লিখতে লিখতে সামনের একটা শিখরের বরফ মেঘকে ধাক্কা দিয়ে উঁকি মারছে। এমন অসামান্য সৌন্দর্যের কোলে মানুষের শ্রীহীন জীবন বিসদৃশ লাগে।

এখানকার হিপিদের কথা অমৃতবাজারে পড়েছেন বোধ হয়। বেশ কিছু হিপি পথে ঘাটে দেখছি। শুনেছিলাম ওরা ফুল ভালবাসে, কিন্তু এদের হাতে ফুল দেখিনা, দেখি ক্যামেরা ……

…এখানকার দোকানে কিছু কিছু বাংলা বই পাওয়া যায়। আপনার স্মৃতিচিত্রণ দোকানে আছে। নেপাল সম্বন্ধে কিছু কিছু বই কিনছি, ছবিও তুলছি, কিন্তু…

অমিতা রায়

(ক্রমশঃ)

আবোল-তাবোল ও সুকুমার রায়

বিনায়ক সেনগুপ্ত

সুকুমার রায়কে আমরা ছড়াকার বলেই জানি, জানি তিনি শিশুদের জন্য কয়েকখানি অনবদ্য ছড়া লিখে রেখে গেছেন। ছোটদের জন্য অজ্ঞাত অখ্যাত ছড়াকারের অনেক চিরকালীন ছড়াই বাঙলা দেশে আছে, সে সব ছড়া নানা লোক ও নানা প্রকাশক বাঙলার মানুষদের সামনে অনেক ক'রে দিয়েছেন, কাজেই তা আর আজ বাঙলার পাঠকদের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু সুকুমারের ছড়া সে রকম নয়, এ একেবারে ভিন্ন রীতির, তার ধারা ভিন্ন, প্রকাশ ভিন্ন, বিষয় ভিন্ন—সে একেবারেই আলাদা, সে অনন্য, সে শুধুই সুকুমার।

তারা ছোটদের জন্যই লেখা, প্রথম প্রকাশ লাভ করেছিল এক-কালীন বাঙলার বহুখ্যাত ছোটদের মাসিক পত্র সন্দেশে, পরে তাদের পুস্তকাকারে আবোল-তাবোলে সংগৃহীত করা হয়। আবোল তাবোল বাঙলার বহু-পঠিত পুস্তক, বাঙলা দেশে আবোল-তাবোল পড়েনি এমন ছেলে-মেয়ে অতি বিরল। কিন্তু এ সব ছড়া কি কেবলই ছোটদের, বয়স্কদের পড়বার কি এর ভিতরে কিছুই নেই? ব্যক্তিগত-ভাবে আমার নিজেরতো মনে হয়, এ সব ছড়া বেশী ক'রে বড়দের জন্যই, কারণ তার ভিতরে রয়েছে এমনই যে বিষয়, ভাষা, ছন্দ—ছন্দের, ভাষার, বিষয়ের মার-প্যাঁচ যা ছোটদের চাইতে বড়দেরই আবেদন করে বেশী, কারণ তা সত্যিকারের বোঝবার আর সঠিক অনুধাবন করবার জন্য প্রয়োজন হয় বেশ একটু পরিণত মস্তিষ্কের। শিশু বা ছোটরা সে আনন্দ-রস থেকে বঞ্চিত হয় শুধু তাদের এই পরিণত মস্তিষ্কের অভাবে। সুকুমার যে মহতী প্রতিভা, মনে হয় বাঙলা দেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকের দরবারে তা আজও সেরকম ভাবে আলোচিত হয়নি। সুকুমারের তা দুর্ভাগ্য, আর তার চাইতেও বড় দুর্ভাগ্য বাঙালী জাতির, যে, সে এই বিরাট সম্পদ হাতে পেয়েও তার সঠিক মর্য্যাদা আজও সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না।

বৎসর কয়েক পূর্ব্বে আবোল-তাবোলের এক বিজ্ঞাপনে প্রকাশকরা লিখেছিলেন—'বাঙলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বলা যায় যে এমনটি আর দেখিনি।' অত্যন্ত সত্যিকথা। কিন্তু এও বলতে পারি যে কেবল বাঙলা সাহিত্যে কেন, বিশ্ব-সাহিত্যেই এমনটি আর আছে কি? বলা যায় বিশ্ব সাহিত্যের কতটুকুই বা আমরা জানি। তবু যেটুকু জানি তাতে সহজেই এ কথা অনুমান করা যায় যে এমনটি আর নেই, নিশ্চয়ই নেই। সকল দেশে সকল সাহিত্যেই ছড়া আছে, তারা লোক-গাথা। ইংরেজীর মাধ্যমে আমরা যেটুকু জেনেছি। তাতে আমরা অনেক ছড়াই জানি—জানি তাদের অনেকই ভালও বটে, কিন্তু তারা বিশেষ ক'রেই ছোটদের জন্য, মাত্র ছোটদের। কিন্তু 'সুকুমার' তা নয়। সে সবার। সে একক, সে একে-বারেই সুকুমার।

সুকুমার তাঁর আবোল-তাবোলে গ্রন্থকারের ভূমিকায় অর্থাৎ কৈফিয়তে লিখেছিলেন, "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল-রসের বই, সুতরাং সে রস যাহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাহাদের জন্য নহে।" কোন পুস্তকের এমন চমৎকার ভূমিকাও বোধ করি আর হয় না। কয়েকটি মাত্র কথায় সবই বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু এই যে অদ্ভুত ভূমিকাটি একি কেবল শিশুদের বা ছোটদের জন্য মনে হয় কি?

স্বীকার করি আবোল-তাবোলের অনেকই আজগুবি, এবং অসম্ভব, এবং উদ্ভট যাদের নিয়েই তার আসল কারবার কিন্তু অনেকই আবার তা নয়। তাদের ভিতরে ভিতরে রয়েছে সুদূরপ্রসারী অর্থ সুগভীর ব্যঙ্গ, ভাবার এমনি অনবদ্য কারিগুরি যে দেখে একেবারে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। মনে হয় যে এত বিচিত্র ভাবধারা একই মস্তিষ্কে স্থান পেয়েছিল কি করে'? কিন্তু প্রতিভা তো তাই, সেই জন্যইতো তা হচ্ছে প্রতিভা, তার বিচিত্র ভাববার ক্ষমতা, নব নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি, প্রতিভার তো তাই হচ্ছে সংজ্ঞা।

সুকুমারের ভাষা ছিল অনবদ্য, প্রকাশক্ষমতা অসীম, ছন্দজ্ঞান নিখুঁত, মিল তুলনাহীন। উপরন্তু তাঁর ছড়ার ছবিকারও ছিলেন তিনি নিজেই। এখানে ছিল তাঁর বিশেষ সুবিধা। তিনি যে শুধু ছন্দই মেলাতে পারতেন তা নয়, ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে এমনই ছবি আঁকতে পারতেন যে কোন ভাড়াটে ছবিকার দিয়ে তা সম্ভব ছিলনা। যে জিনিষ ছিল তাঁর কল্পনায়, ভাড়াটে ছবিকারকে সে জিনিষ বোঝানই যেত না। দু'একটা উদাহরণ ধরা যাক—যেমন, ভয় পেয়োনা। গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে এমন একটি জীব যা পৃথিবীতে নেই। ঐ একটি শরীর, একটি মাথা যার ভিতরে একটি মুখ, একটি নাক আর ড্যাব-ডোবে দু'টি চোখ ছাড়া আর কিছুই নেই। কিন্তু ছবিখানা দেখুন এ জীবটি সামনে এসে দাঁড়ালে, যত অভয়ই দেওয়া যাক না কেন আর সেখানে কেউ দাঁড়াতে পারেন কি? আশ্চর্য্য নয় যে অমন প্রাণপণে ছুটেছে লোকটা। 'মাথায় আমার শিং দেখে ভাই ভয় পেয়েছো কতই না।' সেখানে মাথায় আবার তিনটি শিং। এ কল্পনা সুকুমার ছাড়া আর কারু মাথায় আসা সম্ভব ছিলনা।

এর পর ধরা যাক "ট্যাঁশ গরু"। ট্যাঁশ শব্দটির অর্থ অত্যন্ত প্রকট, সেটি কি বস্তু তা আমরা সবাই জানি। ট্যাঁশ গরু গরুও নয়, পাখীও নয়—সে এ দুটির মাঝামাঝি।

বর্ণিতে রূপগুণ সাধ্য কি কবিতার
চেহারার কি বাহার ঐ দেখ ছবি তার।

ছবিতে সে খানিকটা গরু খানিকটা পাখী। সামনের পা দু'টি ডানা হয়ে গেছে তা একেবারেই পাখা নয়। পায়ের ভাবটি আছে তার ভিতরে চার-পা ওয়ালা গরুর যা হওয়া উচিত। আবার পিছনের পা দুটি দেখুন একেবারে পাখীর পা। সুকুমারকে খুঁটিয়ে দেখলে আরও অনেক মজাই বার করা যায়, যা বেশ প্রচ্ছন্ন, নজর এড়িয়ে যেতে পারে সহজেই। ট্যাঁশ গরুর পাশে দেখুন আছে একটি পাত্র আর একটি প্লেটে দু'টি মোম বাতি। কেন না, এটা তার আহার। "সাবানের স্যুপ আর মোমবাতি খায় সে"। বহুলোকেই এটা লক্ষ্য করেছেন মানি। এ সন্দেহও বোধ-হয় করতে পারি যে তা আবার বহু লোকেরই লক্ষ্য এড়িয়েও গেছে। আজ আমি বলে দিলুম বলেই এর পর আপনার নজরে আসবে তা ঠিকমত।

'কুমড়ো পটাশ'কে দেখুন, এও এক কাল্পনিক জীব। কিন্তু ঐ ছবিটি দেখলে তাকে কুমড়ো পটাশ ছাড়া আর কিছু মনে হয় কি? কি তার মুখ, কি নাক, কি চোখ, আবার একটু খানিক জিভ্ বার করা। নাচছে কুমড়ো পটাশ, যা সে কখনো কখনো করে থাকে আর ছেলেটি চার-পা তুলে ঝুলছে হটুমুলার গাছে। 'হটুমুলা'টি কি জিনিষ? অবশ্য গাছে কিছু সাধারণ মূলা দেখা যাচ্ছে খুব স্পষ্টই।

'ফসকে গেল'তে আবার দেখুন ধনুকটি ধরা হয়েছে উলটো করে। আর তাতেই তার মর্য্যাদা যেন আরও বেড়েছে। এ চিন্তাও সম্ভবপর ছিল শুধু সুকুমারেই।

'হুঁকো মুখো হ্যাংলা'কে দেখুন, 'রাম গরুড়ের ছানা'কে দেখুন—এরা কোন মানুষ নয়। কিন্তু এরা কোন জন্তুও নয়, এরা এক একটি বিশেষ জীব যাদের ভিতরে রয়েছে বেশ একটা মানবিক সত্তা, রীতিমত ব্যক্তিত্ব। সুকুমার তাদের কল্পনা করেছিলেন ছড়ায়, তারপর নিজেই তার রূপ দিয়েছেন ছবিতে। ছড়া তৈরীতে যদি ছিল তাঁর প্রতিভা, ছবি তৈরীতেও তা এতটুকুও কম ছিলনা। ছবিকার হিসেবেও তিনি ছিলেন সমানই বৃহৎ, যে দিকটা প্রায় ঢেকে গেছে ছড়ার ছায়ায়।

আবোল-তাবোলের প্রায় প্রত্যেকটা ছড়াই বুঝিয়ে দেওয়া আছে ছবির আঁচড়ে। ছড়াটা নিশ্চয়ই তার প্রধান অংশ কিন্তু ছবিটিও কিছু অপ্রধান নয়। কতক ছড়া আছে যাতে ছবি না হলেও চলতো। আবার কতক এমনি ছড়া আছে যাতে ছবিটি না হলে চলতইনা, বোঝাই যেতো না যে ছড়াকার কি বলতে চাচ্ছেন। আবার ধরা যাক 'ভয় পেয়োনা' একটি সুন্দর ছড়া কেউ কাউকে ডাকছে আর অভয় দিচ্ছে কাছে আসতে। অত্যন্ত সহজ কথা, কিন্তু ঐ ছবিটি ছাড়া এর অন্তর্নিহিত অর্থটি ধরা পড়তো কি ?

'চোর ধরা'। 'খাড়া আছি সারা দিন হুঁসিয়ার পাহারা।' আজকে আর নিষ্কৃতি নেই, রোজ রোজ যারা খাবার খেয়ে যায় আজ তাদের ধরতে পারলে একেবারে ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে কেটে দেওয়া হবে তরোয়াল দিয়ে। এ ছড়াটিও ঐ ছবিটি না হলে অপ্রকাশ থেকে যেতো কি হচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষায় ফুটস্কোপটি ধরা হয়েছে উলটো করে। এওতো একেবারেই সুকুমার। তবে প্রথম কথাই হচ্ছে ফুটস্কোপটা কি জিনিষ ? তার আবার উলটো সোজা কি ?

সুকুমারের ছড়া, প্রধানতঃ হচ্ছে ছড়া, পদ্যে গাঁথা কতগুলি 'আইডিয়া'। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায় তার অধিকাংশই হচ্ছে এক একটি গল্প বিশেষ। কাঠবুড়ো, গোঁফচুরি, গানের গুঁতো, খুড়োর কল, লড়াই ক্ষ্যাপা, কাতুকুতু বুড়ো, কিম্ভুত, চোরধরা, বোম্বাগড়ের রাজা, নেড়া বেলতলায় যায় কবার, হুঁকো মুখো হ্যাঙলা, একুশে আইন, ভুতুড়ে খেলা, রাম গরুড়ের ছানা, হাত গণনা, গন্ধ-বিচার, কাঁদুনে, পালোয়ান এরা সবই এক একটা গল্প। আর তার কি প্রকাশ-ভঙ্গী। যেটি লক্ষ্য করবার বিষয় তা হচ্ছে সুকুমারের অসীম প্রকাশ করবার ক্ষমতা। তার ছন্দ মধুর, শব্দ-বিন্যাস মধুর-মিল-মাত্রা-যতি মধুর। আমরা পাঠকরা এই সবেতেই এমনভাবে মেতে যাই, তলিয়ে দেখিনা যে কি অসম্ভব কল্পনা করবার শক্তি ছিল সুকুমারের। দুটো একটা ছড়া নমুনা হিসাবে ধরা যাক— গানের গুঁতো।

গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা,
আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা দিল্লী থেকে বর্মা।

এই যে ভয়ানক গান, এতে কি হওয়া সম্ভব ? সুকুমার এ ছড়া রচনা করেছিলেন, তখনো মাইক্রোফোন আর লাউড্-স্পীকার উদ্ভাবিত হয়নি, তা হলেও না হয় বলতে পারতুম যে ধারণাটা হয়তো ওখান থেকেই পেয়েছিলেন তিনি। কি হওয়া সম্ভবপর তার কিছুটা আমরা তবু আঁচ করতে পারি যখন বাড়ীর পাশের মাঠ থেকে পুজো-মণ্ডপের গানের কলের গান আমাদের কর্ণ-পটাহ বিদীর্ণ করতে থাকে। আকাশ কাঁপছে, দালান ফাটছে, গাছের বংশ হচ্ছে ধ্বংশ। মরছে কত অথম হয়ে, করছে কত ছটফট। মনে রাখবেন এ সবই হচ্ছে গানের ঠ্যালায়। তারপর ধরুন 'কাঁদুনে'।

নন্দ ঘোষের পাশের বাড়ী
বুথ সাহেবের বাচ্চাটার,
কান্নাখানা শুনলে বলি
কান্না বটে সাচ্চা তার।

'আকাশ ফাটান জোর গলা', 'ভুত ভাগানো শব্দে লোকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে' এই যে বর্ণনা, এমন সহজ সরল, পরিষ্কার আর এমনি জোরালো বর্ণনার ক্ষমতা খুব কম সাহিত্য কর্মেই দেখতে পাওয়া যায়, তাও আবার পদ্যে। এমনি বর্ণনাময় আর একটি ছড়া ধরা যাক, 'পালোয়ান'।

খেলার ছলে ষষ্ঠি চরণ হাতী লোফেন যখন তখন,
দেহের ওজন উনিশটি মণ শক্ত যেন লোহার গঠন।
রাত্রে সে তার হাত-পা টেপায় দশটি চেলা মজুত থাকে,
দুম-দুমা-দুম সবাই মিলে মুগুর দিয়ে পেটায় তাকে।
—এমন বর্ণনার তুলনা কোথায় ?

ছন্দের দিক থেকে সুকুমার তো তুলনাবিহীন। আবোল তাবোলে সব সুদ্ধ আছে ছয়-চল্লিশটি ছড়া। এর চব্বিশ-টিই হচ্ছে বিভিন্ন ছন্দে। আরগুলো সবই দশ, চোদ্দ, ষোল, আঠারো, -কুড়ি অক্ষরের পঙক্তির। কিন্তু তার ভিতরে ভিতরে রয়েছে অত্যন্ত মধুর শব্দ-বিন্যাস। আর

মজা। এই যে সুকুমারের এতগুলি ছড়ায় সামান্য দু'একটি ছাড়া মিল-মাত্রা-যতির এতটুকুও বিচ্যুতি কোথাও ঘটেনি। তা এমনি সহজ, এমনি সরল, এমনি সাবলীল। আবোল-তাবোলের প্রথম ছড়াই হচ্ছে 'আবোল-তাবোল।'

আয়রে ভোলা। খেয়াল খোলা।
স্বপন দোলা। নাচিয়ে আয়॥
আয়রে পাগল। আবোল-তাবোল।
মত্ত মাদল। বাজিয়ে আয়॥

এর মিল-মাত্রা-যতির আর বলে দেবার কিছু নেই। তার পর ধরা যাক, 'নেড়া বেলতলায় যায় কবার' সারা আবোল-তাবোলের সব চাইতে ছন্দময় ছড়া, প্রত্যেক দু' পঙক্তিতে তার একটি করে সম্পূর্ণ পঙক্তি আর তাতে আছে তিনটি করে যতি আর যতিতে যতিতে মিল—

রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা। তার উপরে বসল রাজা।
ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা। খাচ্ছে কিন্তু গিলছেনা।
গায়ে আঁটা গরম জামা। পুড়ে পিঠ হচ্ছে ঝামা।
রাজা বলে বৃষ্টি নামা। নইলে কিচ্ছু মিলছে না।

এখানেও বর্ণনার ক্ষমতাটি লক্ষ্য করুন।

'হুঁকো মুখো হ্যাংলা' আর 'রাম গরুড়ের ছানা'ও দুটি সুন্দর ছন্দের ছড়া। আর একটি সুন্দর ছন্দের ছড়া হলো 'ফসকে গেল'। এর দু' পঙক্তিতে এক একটি সম্পূর্ণ পঙক্তি, প্রতি সম্পূর্ণ পঙক্তিতে চারটি করে যতি, যতিতে যতিতে মিল আর তার পরে একটি দু' অক্ষরের হসন্তাত্মক শব্দ যার সঙ্গে আবার দু' পঙক্তি বাদে মিল।

গুড় গুড় গুড় গুড়িয়ে হামা।
খাপ পেতেছেন গোষ্ঠ মামা।
এগিয়ে আছেন বাগিয়ে ধামা।
এইবারে বাগ চিড়ি-নামা চট্।
ঐযা গেল ফস্‌কে যে সে।
হেঁই মামা তুই ক্ষেপ্‌লি শেষে।
ঘ্যাঁচ্ করে তোর পাঁজর ঘেঁষে।
লাগল কি বাণ চট্‌কে এসে—ফট্।

অন্যান্য যে কোন ছড়াই ধরা যাক না কেন, ছন্দ হিসেবে তার অক্ষর, তার মাত্রা, তার মিল, একেবারে মাপা। এরা সব দশ, চোদ্দ, ষোল, আঠারো, কুড়ি অক্ষরের পঙক্তির ছড়া। যে কোন একটি ধরা যাক—ভূতুড়ে খেলা।

পরশু রাতে। পষ্ট চোখে। দেখনু বিনা। চশমাতে।
পান্তু ভূতের। জ্যান্ত ছানা। করছে খেলা। জোছনাতে।

লক্ষ্য করুন এর মাত্রা ও তাল।

আর একটি ধরা যাক—'কাঁদুনে'।

ছিচ্ কাঁদুনে। মিচ্‌কে যারা। শস্তা কেঁদে। নাম কেনে।
ঘ্যাঙায় শুধু। ঘ্যানর ঘ্যানর। ঘ্যান ঘ্যানে আর।
প্যান প্যানে।

—একেবারে মাপা মাত্রা।

আবোল-তাবোলে দুটি ছড়া আছে, একটি হ'লো 'বুড়ীর বাড়ী' আর একটি 'হুলোর গান'। আবোল-তাবোলের আর সব ছড়ার ছন্দের, ভাবের, ভাষার, বর্ণনার, প্রকাশ-ভঙ্গীর তলে আমরা এমনিই তলিয়ে যাই যে, এ দুটি ছড়ার ছন্দটিকে আমরা তলিয়ে দেখিনে। অথচ ছন্দই হচ্ছে এদের প্রধান সম্পদ। এই দুটি ছড়ারই ছন্দ এক এবং তাতে রয়েছে একটি বিশেষ বিশেষত্ব। আর তা এমনি সুন্দর আর এমনি মধুর যে ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের মনে হয় সমগ্র বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও ও জিনিষ আর আছে কি না। এরা দুটিই আঠারো অক্ষরের পঙক্তির ছড়া, প্রত্যেকটি শব্দই হয় দু'অক্ষরের, না হয় চার অক্ষরের। মাত্রা প্রতিটি চার অক্ষরে আর শেষ শব্দটি হলো দু'অক্ষরের। পঙক্তিতে পঙক্তিতে মিলতো রয়েইছে আর প্রত্যেকটি পঙক্তির প্রথম এবং পঞ্চম শব্দে আছে মিল।

বুড়ীর বাড়ী—

(গাল) ভরা। হাসিমুখে। (চাল) ভাজা। মুড়ি॥
(ঝুর) ঝুরে। প'ড়ো ঘরে। (থুড়) থুড়ে। বুড়ী॥
(কাঁথা) ভরা। ঝুলকালি। (মাথা) ভরা। ধুলো॥
(মিট) মিটে। ঘোলা চোখ। (পিঠ)খানা। কুলো॥
(ডাকে) যদি। ফিরিওয়ালা। (হাঁকে) যদি। গাড়ী॥
(খসে) পড়ে। কড়িকাঠ। (ধসে) পড়ে। বাড়ী॥

(ছাদ)গুলো। ঝুলে পড়ে। (বাদ)লায়। ভিজে॥
(একা)বুড়ী। কাঠি গুঁজে। (ঠেকা) দেয়। নিজে॥

এমনি মধুর মিল। ষোল পঙক্তির ছড়া, আগাগোড়া সমস্ত ছড়াটির প্রতিটি পঙক্তিরই এই ধরন।

এবার ধরা যাক 'হুলোর গান'। এটির ছন্দও বুড়ীর বাড়ীর অনুরূপ। এর পঙক্তি হচ্ছে বাইশ। এই বাইশ পঙক্তির চারটি পঙক্তিতে মাত্র রয়েছে চারটি যুক্তাক্ষর। কিন্তু সেই যুক্তাক্ষরে রয়েছে দু'অক্ষরের মাত্রা তাই কোথাও ছন্দপতন ঘটেনি এতটুকুও। এরও পঙক্তির প্রথম শব্দে ও পঞ্চম শব্দে রয়েছে মিল, তবে বুড়ীর বাড়ীর মত অত সুন্দর নয়। মাঝে মাঝে মিলটি ব্যাহত হ'য়েছে কিন্তু ছন্দটি নয়। আচ্ছা ছড়াটি দেখা যাক—

হুলোর গান—
(বিদ্)ঘুটে। রাত্তিরে। (ঘুট্)ঘুটে। ফাঁকা॥
(গাছ)পালা। মিশ্ মিশে। (পথ)ঘাটে। ঢাকা॥
(চুপ)চাপ। চারদিকে। (ঝোপ)ঝাড়। গুলো॥
(আয়) ভাই। গান গাই। (আয়) ভাই। হুলো॥
(চট্) ক'রে। মনে পড়ে। (মট্)কার। কাছে॥
(মাল)পোয়া। আধখানা। (কাল) থেকে। আছে॥
(দুড়্) দুড়্। ছুটে যাই। (দূর) থেকে। দেখি॥
(প্রাণ)পণে। ঠোঁট চাটে (কান)কাটা। নেকি॥
(গাল)ফোলা। মুখে তার। (মাল)পোয়া। ঠাসা॥
(ধুক্) করে। নিভে গেল। (বুক)ভরা। আশা॥

এইটিই হচ্ছে এর ছন্দ। এই ছন্দ-জ্ঞানের কোন তুলনা নেই।

এতো গেল সাধারণভাবে ছন্দের কথা। সুকুমারের সব ছড়ায়ই আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে তা হচ্ছে পঙক্তির ভিতরে ভিতরে মিল দেওয়া শব্দ-বিন্যাস। যেমন—'আওয়াজখানা দিচ্ছে হানা' 'জলের প্রাণী অবাক মানি' 'নোঙ্‌রা ছাঁটা খ্যাঙ্‌রা ঝাঁটা' 'বুদ্ধি জোরে এ সংসারে' 'গোড়ায় তবে দেখতে হবে' 'ঠাণ্ডারাতে সর্দ্দি-বাতে' 'শুনছ না যে গানের মাঝে' 'দেখ না কিরে প্যাখনা ধরে' 'কোথায় বা কি ভূতের ফাঁকি' 'নৌকা ফানুষ পিঁপড়ে মানুষ' 'ছিল হাজির বৃদ্ধ নাজির' 'কায়াতরে উলটে পড়ে' 'ফুঁয়ের জোরে পথের মোড়ে' এমনি-ধারা শব্দ ব্যঞ্জনায় ছড়াছড়ি। অঢেল, আবোল-তাবোল ভর্ত্তি প্রায় প্রত্যেক ছড়ায়। এরা পঙক্তি নয়, পঙ্‌ক্তাংশ। এইটি একটি বিশেষ সুকুমারী কায়দা।

সুকুমার তার বইয়ের ভূমিকায় বলেছেন, যা আজগুবি, যা উদ্ভট, যা অসম্ভব তাদের নিয়েই তাঁর বইয়ের কারবার। আবোল-তাবোলে সে আজগুবিত্ব, সে ঔদ্ভট্য, সে আসম্ভব্য যে কত আছে তা ধারণা করা যায় না। আর ছড়ার সঙ্গে তা এমনি আশ্চর্য্যভাবে মিশে আছে যে অনেক সময়েই তা দৃষ্টি এড়িয়েও যায়। প্রথমেই ধরা যাক 'কাঠবুড়ো'। এখানে তিনি কাঠের যে গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন তা উদ্ভট্ নয় কি? তারপর 'গোঁফচুরি' 'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা'। ছায়াবাজীতে প্রথমেই ব্যবসাটাইতো হ'লো ছায়াধরার। তারপর আছে চাঁদের ছায়া রোদের ছায়া, মৌয়াগাছের মিষ্টি ছায়া, তেতুলতলার তপ্ত ছায়া। হালকা ছায়া, পান্‌সে ছায়া।

কিম্ভূত একটি অদ্ভুত জীব, একটা সে সব হলে মেটে তার প্যাখনা। একুশে আইনে সবই আজগুবি, বোম্বা-গড়ের রাজার সবই আজগুবি। হুঁকোমুখো হ্যাঙলার দুটো ল্যাজ যা পৃথিবীতে কোন জীবেরই নেই। সাবধানে আছে—

বিপিনের খুড়ো হায় বুড়ো সেই হলরায়,
মাছি খেয়ে পাঁচ মাস ভুগেছিল কলেরায়।

এত সহজ সরল ছন্দে মেলানো পঙক্তি যে পাঁচমাস যে কলেরায় ভোগা যায় না এটা ক'জনের খেয়ালে আসে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার অবকাশ আছে।

'নেড়া বেলতলায় যায় কবার' এ আছে—ঠোঙা ভরা বাদাম ভাজা খাচ্ছে কিন্তু গিলছে না। ভুতুড়ে খেলায়তো প্রথমে ভূতটা দেখা গেল একেবারে বিনা চশমায়ই। যেন চশমার দেখা সম্বন্ধে একটু বিশেষ গুণ আছে। এরপর আছে 'শুনতে পেলুম ভূতের মায়ের মুচ্‌কি হাসি কট্‌কটে'। মুচ্‌কি হাসিটা যে শুধু দেখবার জিনিষ শোনবার নয় ছন্দের তালে এ কথাটাও এড়িয়ে যাওয়া

সম্ভব। 'ভয় পেওনা' তে আগেই বলা হয়েছে ওর আত্মপ্রকাশ হচ্ছে ঐ ছবিটিতে, ছড়াতে নয়। ট্যাঁশ গরুর কথাতো নিশ্চয়ই কাউকে বলে' দিতে হবেনা।

'বিজ্ঞান শিক্ষা'য়, 'ঘোল খাওয়া ছাতাপড়া মাথা কাটা মত মনে হয় যেন'। এ যেন ঘটি-বাটি। আবোল-তাবোলের শেষ ছড়াটি হচ্ছে আবার 'আবোল-তাবোল' আর তাতেও আছে অনেকই আবোল-তাবোল। তবে তার তিনটি হচ্ছে—

সুরের নেশার ঝরণা ছোটে
আকাশকুসুম আপনি ফোটে।

আকাশকুসুমটা ফোটে কি ?

আলোয় ঢাকা অন্ধকার,
ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।

এখানে লক্ষ্য করবার দু'টি জিনিষ, অন্ধকারটি আলোতে ঢাকা আর ঘণ্টাটি বেজে চলেছে গন্ধেতেই। সুকুমার ছাড়া এ বস্তু আসবে আর কার মাথায় ?

জোনাথান সুইফ্‌ট গালিভার্‌স্‌ ট্রাভেল্‌স্‌ লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিলিপুট, তাতে ব্রব্‌ড্‌ঙ্‌নঙ, ট্রাল্‌ড্রাগ্‌ ইহু ইত্যাদি কতগুলো শব্দ ব্যবহার করেছিলেন কতগুলো মানুষ বোঝাতে। এরা সব কল্পনার মানুষ তবু তারা এক একটি অর্থ-ধারণ করেছে এবং তাদের চিরস্থায়ী আসন দখল করেছে ইংরেজী অভিধানে। সুকুমারেরও কুমড়ো পটাশ, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, রামগরুড়ের ছানা, ট্যাঁশগরু এরা সবাই অর্থগ্রহণ করেছে। খুব মোটা লোককে 'কুমড়োপটাশ', খিটখিটে হাসিহীন লোককে 'রামগরুড়ের ছানা', অতিমাত্রায় গম্ভীর লোককে 'হুকোমুখো হ্যাংলা' বেশী বেশী সাহেবীয়ানার লোককে 'ট্যাঁশগরু' এখন অভিধায়তো আমরা সর্বদাই অভিহিত করি। এ সব শব্দও কালে বাঙলার অভিধানভুক্ত হবে বলেই মনে হয়।

প্রকাশকরা আবোল-তাবোলের বিজ্ঞাপনে বলেছিলেন, "বাংলাসাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে ধরা যায় যে এমনটি আর দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ নিজে তার চাইতেও একটু বেশী গিয়েছিলেন। তিনি নিজে বলেছিলেন,—আমি সাহিত্যের সব হতে পারি, পারি না শুধু সুকুমার হ'তে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে তিনি সাহিত্যের সব বিভাগের সব কিছুই লিখতে পারেন, পারেন না কেবল সুকুমারের মত আবোল-তাবোল লিখতে। সুকুমার সেদিক থেকে একা, একাই একটি প্রতিষ্ঠান।

বাঙলা দেশের অনেক সাহিত্যের অধ্যাপক এবং অন্যান্য আরও অনেক বিদ্বান জ্ঞানীগুণী মানুষ বাঙলা সাহিত্যের অনেক লোক এবং তাদের সাহিত্যের এবং অন্যান্য আরও অনেক দিক নিয়েই অনেক আলোচনা করেছেন, অনেক অনুসন্ধান অনেক গবেষণা করেছেন কিন্তু মনে হয় সুকুমারকে নিয়ে আজও তেমন কোন অনুসন্ধান বা গবেষণা বা এতটুকুও জোরদার আলোচনাও কেউ কখনো করেন নি।

এটা হওয়া উচিত এবং অতি সত্বর হওয়া উচিত। যদিও আবোল-তাবোলের পর সুকুমারের আর একখানি ছড়া-সংগ্রহ প্রকাশ লাভ করেছে, তবু সে-কালীন সন্দেশে সুকুমারের লেখা এবং আঁকা আরও অনেক কিছুই ছিল যা আজও সংগৃহীত হয়নি। আমি নিজে তা জানি। এবং সন্দেশে কি কি বস্তু ছিল সে সংবাদ দেবার কিছু মানুষ বাঙলা দেশে এখনও বেঁচে আছেন, যাঁরা আর কিছুদিনের মধ্যেই আর থাকবেন না। সে সব সন্দেশও এখন আর পাওয়া হয়তো খুবই কঠিন তবু তা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হয়না। চেষ্টা করলে অনেক বাঙালীর বাসায়ই বা কোন কোন পাঠাগারে তার অবশিষ্ট কিছু হয়তো এখনও মিলতে পারে।

সুকুমার বাঙলা ভাষায় এম, এ, পরীক্ষার একটি বিভাগ হবার যোগ্যতা ও দাবী রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়কেও এ বিষয়ে অবহিত ও উদ্যত হবার পক্ষে সময় অতি উচ্চতর হয়ে উঠেছে বলেই এ লেখকের বিশ্বাস।

ভগবানকে কি জানা যায় ?

ভোলানাথ সাহা

ভগবানকে অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তাকে না যায় কিনা এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে ভগবান ছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। কেন না গবান যদি না থাকেন তবে তাঁহাকে জানা যায় কিনা এ শ্ন আদৌ উত্থিত হয় না। সুতরাং ভগবান আছেন কিনা মে এই বিষয়েই আমরা আলোচনা করিব।

ভগবানের অস্তিত্বের প্রশ্ন সুবিশাল বিশ্বের উৎপত্তির শ্নের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, ক্ষত্রসমন্বিত এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের উৎপত্তির কারণ চিন্তা রিতে করিতে ভারতের মনীষিবৃন্দ ক্রমশঃ উন্নতিশীল বহু তবাদ স্থাপন করিয়া সর্ব্বশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত য়াছেন যে, ভগবান স্বয়ং এই বিচিত্র বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-য়কর্ত্তা। তাঁহাদের চিন্তাধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে ত্ত হইল।

প্রাচীন আর্য্যগণ দেখিতেন, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে র্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্ত সংঘটিত হয়। দিবালোকের পর -অন্ধকার আবির্ভূত হয়; প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে র হ্রাস বৃদ্ধি সাধিত হয় এবং প্রতিবৎসরে নিয়মিতভাবে ঋতুতে দুঃসহ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপের, বর্ষা ঋতুতে ঘন চ্ছন্ন আকাশ হইতে প্রবল বারিবর্ষণের ও নদীর চ্ছ্বাসজনিত জলপ্লাবনের, শীত ঋতুতে ক্লেশকর কনে শীতের এবং বসন্ত ঋতুতে আরামদায়ক মলয়সমীর-হের অনিবার্য্য প্রাদুর্ভাব হয়। এই সকল প্রাকৃতিক া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া য়াছেন যে, প্রকৃতির প্রতিটি কার্য্যের মূলে কর্ত্তারূপে জন দেবতা আছেন। ঋগ্বেদের ঋক্ বা মন্ত্রগুলি এই ল বৈদিক দেবতার স্তবস্তুতিতে পূর্ণ। দেবতাগণ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, পবন ইত্যাদি নামে অভিহিত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের চিন্তাধারার ক্রমোন্নতির ফলে আর্য্যগণ নানা দেবতার স্থলে সুবিশাল বিশ্বের নিয়ন্তারূপে এক দেবতা আছেন এবং পূর্ব্বোক্ত নানা দেবতা সেই এক দেবতারই বিভিন্ন নাম ব্যতীত আর কিছুই নহে—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। সনাতন ধর্ম্মের প্রথম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদে আর্য্যগণের উন্নত চিন্তাধারার ফল স্বরূপ নিম্নলিখিত উক্তি আমরা দেখিতে পাই—

"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমম্ মাতরিশ্বানম্ আহু।"

তিনি এক ও সত্য, বিপ্রগণ তাঁহাকেই বিভিন্ন নাম দিয়া থাকেন—অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা তাঁহাকেই বলা হয়।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে জগতের কারণ সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যগণের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ বহু দেবতা এই জগৎ সৃষ্টির মূলে আছেন) বর্ত্তমানে আমাদিগের নিকট হাস্যজনক হইতে পারে কিন্তু সেই অতি প্রাচীন যুগে এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তির কারণানুসন্ধানে আর্য্যগণের উৎসাহপূর্ণ আন্তরিক প্রচেষ্টা যে প্রশংসার্হ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। যে সময়ে প্রাচীন আর্য্যগণ জগতের কারণ নির্ণয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সে সময়ে জগতের অন্যান্য বংশের অধিবাসীগণ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিলেন। তাহার বহু শতাব্দীপর গ্রীস দেশের মনীষিগণ জগতের কারণ নির্ণয়ে সচেষ্ট হন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ শতাব্দীতে গ্রীক-দার্শনিকপণ্ডিত Thales সর্ব্বাগ্রে ঘোষণা করিলেন যে, জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। তাঁহার শিষ্য Anaximander বলিলেন যে, জগতের উৎপত্তির কারণ জল নহে, ব্যোম। তাঁহার শিষ্য Anaximenes বলিলেন যে,

জগতের কারণ জলও নহে, ব্যোমও নহে ইহা হইতেছে বায়ু। ভারতের আর্য্যগণ গ্রীসের দার্শনিক পণ্ডিতগণের ন্যায় কোন ভৌতিক পদার্থকে জগতের কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন মানব অপেক্ষা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন দেবতাগণ এই জগতের সৃষ্টিকর্তা। প্রাচীন আর্য্যগণের চিন্তাধারা যে পরবর্ত্তীকালের গ্রীক-পণ্ডিতগণের চিন্তা-ধারা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাহা অনস্বীকার্য্য।

বহু দেবতার স্থলে এক দেবতা আছেন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর প্রাচীন আর্যগণের চিন্তাধারা আরও উন্নত হওয়ায় তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সেই এক দেবতা (তদেকম্) জগতে যাহা কিছু আছে সব সৃষ্টি করিয়াছেন; তিনি বিশ্বকর্ম্মা। তারপর আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা যে সকল কার্য্য বিশ্বকর্ম্মার কৃত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের চিন্তাধারার অধিকতর উন্নতির ফলে তাঁহারা সেই সকল কার্য্য ব্রহ্মের কৃত বলিয়া স্থির করিলেন এবং এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে তাঁহারা বলিলেন তিনি এক, অদ্বিতীয়, অসীম ও সর্ব্বকারণের কারণ। এই সিদ্ধান্ত ঋষিগণের অন্তর্দৃষ্টি প্রসূত।

উপনিষদে এই ব্রহ্মতত্ত্বই নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মের দুইটী ভাবের বর্ণনা আছে—একটী নির্ব্বিশেষভাব এবং অপরটী সবিশেষভাব। নির্ব্বিশেষ ভাবকে নির্গুণ ব্রহ্ম এবং সবিশেষ ভাবকে সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান বলা হয়। নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতি বলেন—

ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিকপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥—কঠোপনিষৎ

ইঁহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না। কেহ ইহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। হৃদয় সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন। সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতি বলেন—

যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥

যে দেবতা অগ্নিতে ও জলে আছেন, যিনি সমস্ত বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন যিনি ওষধি ও বৃক্ষে আছেন সেই দেবতাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

মহর্ষি ব্যাস তাঁহার রচিত সমস্ত উপনিষদের সারমর্ম্ম-প্রকাশক ব্রহ্মসূত্রে সগুণ ব্রহ্মের সংজ্ঞা দিয়াছেন—জন্মাদ্যস্য যতঃ। যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় হয় তিনিই ব্রহ্ম। ইনিই সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা ভগবান।

হিন্দুশাস্ত্র বলেন—ঈশ্বর সর্ব্বাত্মা, সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। ইহা শুধু শাস্ত্রের কথা নয় ইহা ঋষিগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতি। আর্য্য ঋষি তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—

বেদাহং এতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। আমি এই অজর, পুরাণ, সকলের আত্মভূত, সর্ব্বগত সর্ব্বব্যাপী বস্তুটি জানি। সুতরাং ভগবান আছেন, এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

এখানে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব পরিদৃশ্যমান জগতকে যেভাবে জানা যায় ভগবানকে সেই ভাবে জানা যায় কি না। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানলাভের উপায় প্রধানতঃ তিনটি—(১) প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূতি; (২) অনুমান এবং (৩) শব্দ অর্থাৎ ঈশ্বর প্রকটিত বাক্য বা আপ্তবাক্য।

বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ভগবান আমাদের দেহে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা এবং ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়াছেন। আমরা চক্ষু দিয়া রূপ দেখি, কর্ণ দিয়া শব্দ শুনি, নাসিকা দিয়া গন্ধ অনুভব করি, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদন করি এবং ত্বক দ্বারা স্পর্শ অনুভব করি। জগতের যাবতীয় পদার্থ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ এবং গন্ধ—এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়। যে জন্মান্ধ সে উদীয়মান সূর্য্যের অনুপম সৌন্দর্য্য, নীলাকাশে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মনোহর শোভা, শিশুর হাসিমাখা আনন্দদায়ক মধুর মুখখানি, বিবিধ বৃক্ষশোভিত বিহগকূজিত সুন্দর উপবন, নানাবিধ

সুশোভিত মনোহর পুষ্পোদ্যান, তটিনীর সলিল প্রবাহ, তুচ্চ শৃঙ্গসমন্বিত পর্ব্বতশ্রেণী, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, নানা-র্ণের এবং নানা আকারের পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ—এ কলের কিছুই দেখিতে পায় না এবং সেইজন্য এই সকল য়ের জ্ঞানও তাহার হয় না। যে জন্ম হইতে বধির সে তিপ্রদ বজ্র নির্ঘোষ, শ্রুতিমধুর বিহগকাকুলি, চিত্তাকর্ষক র সঙ্গীতধ্বনি—এ সকলের কিছুই শুনিতে পায় না এবং ই জন্য এ সকলের জ্ঞানও তাহার হয় না। এইরূপে াসিকা জিহ্বা এবং ত্বক বিকল হইলে, নাসিকা দ্বারা সুগন্ধ । দুর্গন্ধের অনুভব, জিহ্বা দ্বারা অম্ল, মিষ্ট, তিক্ত প্রভৃতি াস্বাদের অনুভব এবং ত্বকের দ্বারা শীত, উষ্ণ প্রভৃতি শর্শানুভব সম্ভব হয় না এবং সেই জন্য এ সকলের জ্ঞান-াভও হয় না। সুতরাং জগতে যাহাকিছু আছে তাহা ামরা উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে জানিতে পারি বং তদ্দ্বারা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। ন্তু বাহ্যজগতের ন্যায় ভগবান আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। তরাং জ্ঞানলাভের বিজ্ঞানসম্মত প্রথম উপায় প্রত্যক্ষদ্বারা ামরা ভগবান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না র্থাৎ ভগবানকে জানিতে পারি না।

দ্বিতীয় উপায় অনুমান দ্বারা ভগবানকে জানা যায় কিনা াহাই আমরা এখন আলোচনা করিব। কোন স্থান হইতে ম নির্গত হইতে দেখিয়া আমরা সেখানে অগ্নির অস্তিত্ব নুমান করি, কেননা ধূমের সহিত অগ্নির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যথানে ধূম সেখানেই অগ্নি; অগ্নি ছাড়া ধূমের অস্তিত্ব চন্তা করা যায় না। কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান জগতে এমন ক আছে যাহার সহিত ভগবানের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান এবং যাহা দেখিয়া ভগবানের অস্তিত্ব জানা যাইতে পারে? ভগবানের সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধবিশিষ্ট কোন পদার্থ জগতে াই। সুতরাং অনুমানের সাহায্যে ধূম দেখিয়া অগ্নিকে জানার ন্যায় ভগবানকে আমরা জানিতে পারি না।

কিন্তু জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই ইহা নানা জাতির পদার্থ লইয়া সংগঠিত হইলেও এই সকল নানা জাতীয় পদার্থ বিবিধ অপরিবর্তনীয় বিধি অনুসারে পরস্পরের সহিত ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ারূপ কার্য্য দ্বারা সুসম্বদ্ধ। সুতরাং ইহা প্রণালীবদ্ধ বিভিন্ন অংশের একটি সুব্যবস্থিত সমবায়। মানব দেহে যেমন ইহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত সুসম্বদ্ধ এখানেও সেইরূপ ইহার বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত সুসম্বদ্ধ। ইহাদের মধ্যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া অবিরত চলিতেছে। বাহ্য পদার্থ সমূহ মানব মনের উপর সতত ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে এবং মানব মনও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছে। তারপর এজগৎ যে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলিতেছে সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সৌরজগতের কথা চিন্তা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবী নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং চন্দ্র নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। এই দুইটি নির্দ্দিষ্ট পথ পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী ও চন্দ্রের ঘূর্ণন এমন সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রিত যে কোন সময়েই পৃথিবী এবং চন্দ্র একই সময়ে দুই পথের সংযোগস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয় না এবং সেজন্য ইহাদের সংঘর্ষণও হয় না। দ্বিতীয়তঃ একই নিয়মে পূর্ণচন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি সংঘটিত হইতেছে, ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং এই সুনিয়ন্ত্রিত জগতের যে একজন নিয়ন্তা আছেন, মানব মন স্বীয় বিচারশক্তি দ্বারা সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য। যিনি এই সুনিয়ন্ত্রিত জগতের নিয়ন্তা তিনিই যে এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এই বিরাট বিশ্বের নিয়ন্তা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তিনি প্রজ্ঞাবান এবং অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন; এবং এই নিয়ন্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তার কোন কারণ নাই বলিয়া তিনি অনাদি। ইনিই ভগবান। সুতরাং জগৎকে জানিয়া আমরা আমাদের মনের বিচার-শক্তি দ্বারা ভগবানকে জানিতে পারি।

তৃতীয় উপায় শব্দ। শব্দ বলিতে বুঝায় ঈশ্বর প্রকটিত বাক্য অর্থাৎ বেদশাস্ত্র। বেদ অপৌরুষেয়। ঈশ্বর প্রকটিত বাক্য বলিয়া বেদ অভ্রান্ত এবং সত্য। বেদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে আমরা ভগবান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

এখানে ভগবানকে জানা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতগণের কি মত তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিব।

ভগবানকে জানা যায় কিনা অর্থাৎ ভগবান জ্ঞানগম্য কিনা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে পাশ্চাত্য মনীষীগণ, মানবমন কি উপায়ে জ্ঞানলাভ করিতে পারে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। Immanuel Kant বলিয়াছেন—আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ প্রাকৃতিক বল দ্বারা ভাবান্তরিত হইয়া অনুভূতিরূপ উপকরণ প্রদান করে এবং আমাদের বিচারশক্তি স্বীয় দেশ ও কালের ধারণার সাহায্যে সেই সকল উপকরণের মধ্যে যেগুলি সদৃশ সেগুলিকে একত্র করিয়া এবং যেগুলি বিসদৃশ তাহাদের মধ্যে ভেদ অনুধাবন করিয়া বাহ্য পদার্থের জ্ঞান জন্মায়। কিন্তু এ জ্ঞান বাহ্য পদার্থ যেরূপ দেখায় অর্থাৎ মানব মনে যে সকল অনুভূতির সৃষ্টি করে, তাহারই জ্ঞান, বাহ্য পদার্থের সত্তার জ্ঞান নহে। ভগবান দেশ ও কালের অতীত নন সেইজন্য তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন বলিয়া তিনি মানব মনের জ্ঞানগম্য নহেন।

Hobbes বলেন—যাহা সর্ব্বদা সমরূপ, যাহাতে কোন পরিবর্ত্তন নাই, মানব মন তাহা জানিতে পারে না। যে বায়ু আমরা নিঃশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করি তাহা যতক্ষণ সমরূপ থাকে ততক্ষণ আমাদের জ্ঞানগম্য হয় না; সহসা সেই বায়ুতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে তখন তাহার জ্ঞান আমরা লাভ করিতে পারি। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি তাহা কামানের গোলার গতিবেগের পনর গুণ বেগে ধাবিত হইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তথাপি সমরূপ বলিয়া পৃথিবীর এই গতি আমরা অনুভব করি না। প্রতি মিনিটে ত্রিশ মাইল বেগে আমরা পৃথিবীর মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘূর্ণিত হইতেছি, তথাপি সমরূপ বলিয়া এই ঘূর্ণনে আমাদের মস্তক ঘূর্ণন হয় না। যে সকল প্রাণী চিরকাল অন্ধকারে বাস করে, অন্ধকার সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান হয় না। আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ পাকস্থলী কিংবা যকৃৎ যতদিন সমানভাবে কাজ করিতে থাকে ততদিন আমরা জানিতে পারি না যে আমাদের পাকস্থলী কিংবা যকৃৎ আছে। ভগবান নির্বিকার, সর্ব্বদাই একরূপ সেই জন্য মানব মন ভগবানকে জানিতে পারে না।

পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণের মতে কোন পদার্থের জ্ঞানলাভ আপেক্ষিকতারূপ নিয়মের অধীন। যাহা আপেক্ষিক অর্থাৎ অন্যের অপেক্ষা রাখে, তাহাই মানব মন জানিতে পারে। নিরবচ্ছিন্ন সুখের বা দুঃখের কোন জ্ঞান হয় না। সুখকে সুখ বলিয়া জানা যায় যখন দুঃখ উপস্থিত হয় এবং দুঃখকে দুঃখ বলিয়া জানা যায় যখন সুখ উপস্থিত হয়। সেইরূপ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার বা আলোকের কোন জ্ঞান হয় না। আলোক দেখা দিলে অন্ধকারের জ্ঞান হয় এবং অন্ধকার দেখা দিলে আলোকের জ্ঞান হয়। সুতরাং সুখ দুঃখের অপেক্ষা করে, সেইরূপ দুঃখও সুখের অপেক্ষা করে; অন্ধকার আলোকের অপেক্ষা করে সেইরূপ আলোকও অন্ধকারের অপেক্ষা করে। কিন্তু যাহা আপেক্ষিক তাহা সীমাবদ্ধ। সুতরাং সীমাবদ্ধ পদার্থেরই জ্ঞানলাভ সম্ভব। যাহার সীমা নাই সুতরাং আপেক্ষিকতা নাই তাহা মনের মানব অজ্ঞেয়। ভগবান অসীম, তাঁহার আপেক্ষিকতা নাই, সেইজন্য মানব মন ভগবানকে জানিতে পারে না।

কিন্তু Sir William Hamilton এবং Mr Mansel বলেন যে পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন শব্দদ্বয় যেমন পূর্ণ এবং অংশ সমান এবং অসমান, এক এবং বহু সসীম এবং অসীম পরস্পরের সহিত এরূপভাবে সম্বদ্ধ যে একের জ্ঞান ছাড়া অন্যের জ্ঞান সম্ভব নয়। পূর্ণের জ্ঞান ছাড়া অংশের কোন ধারণা হয় না, অসমানের জ্ঞান ছাড়া সমানের কোন জ্ঞান হয় না। বহুর জ্ঞান ছাড়া একের কোন ধারণা হয় না এবং অসীমের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়া সসীমের কোন জ্ঞান হয় না। সেইরূপ ইহা অনস্বীকার্য যে যাহা অপেক্ষা রহিত (non relative or Absolute) তাহার সহিত সম্বন্ধ ছাড়া আপেক্ষিক (relative) কোন পদার্থ জ্ঞানগম্য নয়; যেহেতু আপেক্ষিক পদার্থেরই জ্ঞান আমাদের হয়, তদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে আপেক্ষারহিত পদার্থের ও অনুভূতি আমাদের হয়, যদিও ইহা সুস্পষ্ট নয়। অপিচ

পরস্পরবিরুদ্ধ দুটি শব্দের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহার জ্ঞান শব্দদ্বয়ের জ্ঞান সূচনা করে। সুতরাং অপেক্ষারহিত (Absolute) পদার্থ অবস্তু নয়; তবে ইহার জ্ঞান বা অনুভূতি অস্পষ্ট। ইঁহারা জানিতে চান যে অপেক্ষারহিত ভগবানের অনুভূতি আমাদের হয়, তবে তাহা সুস্পষ্ট নয়। Hegel এর মতে Absolute অর্থাৎ অপেক্ষারহিত ভগবান (God) বিশ্বানুগ এবং মানব মনের জ্ঞেয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে দর্শনশাস্ত্রে শুধু যুক্তি তর্কের অবতারণা। যুক্তিতর্কের আবর্তে পড়িয়া মানব মন দিশেহারা হইয়া যায়। প্রকৃত প্রভাবে ভগবানকে জানা বা ভগবদ্দর্শন সাধনাসাপেক্ষ। ভগবানের দর্শন পাইতে হইলে, ভগবানকে জানিতে হইলে উপলব্ধি করিতে হইলে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমূল্য উপদেশ অবশ্য আমাদের প্রতিপাল্য; তিনি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগতবাসীকে বলিতেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥

তুমি আমাতে তোমার মন রাখ, আমাকে ভক্তি কর, আমাকে পূজা কর, আমাকে নমস্কার কর; আমি সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি তুমি আমাকেই পাইবে।

ভগবান যে সকল কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন সবই সাধনার অঙ্গ। সাধনা করিতে করিতে যখন সত্ত্বগুণ রাজোগুণ ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া প্রবল হয় এবং আরও উচ্চস্তরে শুদ্ধ সত্ত্ব প্রাকৃত সত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া চিত্তকে অলঙ্কৃত করে তখন সঠিক ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করে, ভগবানকে তখন সে জানিতে পারে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস কোন এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন "ভগবানকে শুধু দেখা যাবে কেন, তাঁহার কথাও শুনা যায়; আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা বলছি ভগবান ঠিক এইরূপ কথা বলেন।" ভক্তের সম্মুখে ভগবান তাহার বাঞ্ছিত রূপ ধারণ করিয়া দেখা দেন। ভগবানকে জানিবার বা পাইবার একমাত্র উপায় ভক্তি। ভক্তি বলিতে বুঝায় ঈশ্বরে বা ভগবানে পরমাণুরক্তি। সুতরাং ভগবানে অনুরাগ জন্মিলে তাঁহাকে জানা যায় এবং পাওয়াও যায়।

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥—চৈতন্য চরিতামৃত।

নিবেদন

আগামী বৈশাখ সংখ্যায় প্রবাসী সত্তর বৎসরে পদার্পণ করিবে। গ্রাহকগণ ও এজেণ্টগণ তাঁহাদের অর্ডার যথাসত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—প্রবাসী

রাধাকৃষ্ণলীলায় হোলীখেলা

স্নেহেন্দু মাইতি

রাধাকৃষ্ণের অসংখ্য লীলার মধ্যে হোলীখেলাও একটা লীলাবিশেষ। রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্যে নিগূঢ় তাত্ত্বিকতার সন্ধান মেলে। দ্বাদশ শতকের পূর্বে আমরা রাধাকৃষ্ণের লীলার বিশেষ ব্যাপকতা দেখি না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে রাধাকৃষ্ণের অনেক লীলা আছে বটে কিন্তু অনেকে এগুলি প্রামাণিক বলে স্বীকার করেন না। প্রকৃতপক্ষে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'ই লীলার প্রথম প্রাধান্য স্বীকৃত। প্রাক্ চৈতন্য যুগে লীলার মধ্যে কোন গভীর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা না থাকলেও সেখানে ভক্তের লীলা আস্বাদন, লীলা দর্শন ও লীলার জয়গানই আসল কথা। চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর যুগে আমরা রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা ও পরকীয়া প্রেমতত্ত্বের সন্ধান পাই। এখন থেকেই রাধাকৃষ্ণ লীলা গভীর তাত্ত্বিকতামণ্ডিত। বৈষ্ণব কবিগণ বহু সাধারণ উৎসবকে রাধাকৃষ্ণের লীলার পর্যায়ে স্থাপন করে আধ্যাত্মিক মূল্য দিলেন। হরিভক্তি বিলাসে রয়েছে, জীবগণের অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মের মধ্যে গীতই সর্বশ্রেষ্ঠ (৮।১০)। বৈষ্ণব কবিগণ 'কানু' ছাড়া গীত গাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। কানুকে অবলম্বন করে গীত গাইতেই বিভিন্ন লৌকিক উৎসবকেও তাঁরা লীলার পর্যায়ে স্থাপন করলেন। আমাদের এরূপ সিদ্ধান্তের প্রধান কারণ হচ্ছে, হোলীখেলা সংক্রান্ত বিভিন্ন পদ চৈতন্যোত্তর যুগেই রচিত।

হোলীখেলা যে লৌকিক উৎসব সে সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ। বহু বৈষ্ণব কবি-দার্শনিক রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তনের মধ্যে হোলীখেলাকে স্থাপন করে এক অপূর্বত্ব দিয়েছেন। হোলীখেলার মধ্যে যে একটি দার্শনিক বোধ আছে অস্বীকার করবার উপায় নেই। হোলীখেলায় বৈষ্ণব কবির চোখে সমস্ত কিছুই লাল। যেমন,—

শারদ বসন্তে আজি শ্রীকান্ত খেলিছে হোরী।
লালে লাল নিধুবনে বঁধু সনে লাল প্যারী॥
লাল কুঞ্জ, লতাফুল, লালে লাল অলিকুল।
শাখীপরে সোহাগ ভরে গায় লাল সুখশারী॥
লাল ফাগু মাখি গায়, মলয় সমীর ধায়।
লালে লাল গগন কায় লাল যমুনার তরী॥
লাল বৃন্দাবন রেণু, লালে লাল গোঠে ধেনু।
লাল গোপী উন্মাদিনী শ্যাম দেয় পিচ্‌কারী॥

লালের অর্থ সহজভাবে একটা রং। লালের অর্থ হতে পারে সুন্দর বা প্রিয়। বসন্তে সমস্ত কিছুই মধুর। প্রকৃতি নববেশে সজ্জিতা। অলিকুলের মধুর গুঞ্জন ও কোকিলের কর্ণতৃপ্তিকর ডাকে দশদিক পরিপূর্ণ। মনের আনন্দ এ সময়েই তো মূর্ত হয়ে উঠে। আর আনন্দানুসন্ধানই মানব জীবনের চরম কাম্য। কেন না, উপনিষদে রয়েছে, অনন্ত আনন্দপ্রবাহ থেকেই বিশ্বজগৎ ও তার বিভিন্ন উপাদানের সৃষ্টি হয়েছে। বসন্তের বিচিত্র কুসুমগন্ধে পরিপূর্ণ মলয় সকলে পরম আদরে হৃদয়ে গ্রহণ করে। চোখের সামনে সকলই সুন্দর। মনের আনন্দকে এ সময়ে সবার মধ্যে বিকীর্ণ করে দেওয়াই প্রয়োজন। হোলীখেলার মাধ্যমেই প্রাণের সাথে প্রাণের সংযোগ হয়। দর্শনের ভাষায় বলতে গেলে, প্রতিটি পুরুষের মধ্যে নারীভাব ও প্রতিটি নারীর মধ্যে পুরুষভাব বর্তমান। উভয়ে যখন পরস্পরের নিকটাবস্থায় আসে তখন উভয়ের মধ্যেই বিরুদ্ধভাবের সঞ্চার হয়। তখনই এক প্রাণের সাথে অপর প্রাণের সূক্ষ্ম সম্পর্ক নির্ণীত হয়। রামদাসের একটি পদে দেখি,

রাধামাধব ভেট ভঙ্গী।

রাধা মাধব মাধব রাধা কীট-ভৃঙ্গ গতি হোই জো গঙ্গ॥

অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের মিলনের ফলে, রাধা মাধব, মাধব রাধা হল। কীট ভৃঙ্গ গতির মতই তাদের অবস্থা। হোলীখেলার মাধ্যমে সেই বিচিত্র আনন্দ রং অপরের মধ্যে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আর এরই ফলে প্রাণের সাথে অপর প্রাণের বন্ধন হয়। রাধার মুখে আমরা শুনতে পাই,—

চললো বৃন্দে শ্রীগোবিন্দে আজি মৃগমদে সাজাব লো।
আজি সাজায়ে যতনে সে নীল রতনে
অনিমেখে দিঠে হেরিব লো॥
আজি মনোসাধ সব মিটাব বলে আজি
প্রাণে প্রাণ বঁধু বাঁধিব লো।
আয় লো ললিতা, আয় লো চম্পকা
ডাকে প্রাণসখা আয় লো বিশাখা।
আয় সুখশারী সব পরিহরি বঁধু সনে,
হোলী খেলিব লো॥

সুতরাং হোলীখেলার মধ্যে প্রাণের আদানপ্রদানই মুখ্য কথা। বৈষ্ণব কবিরা এটাকেই রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্যে ব্যক্ত করেছেন।

নারী ও পুরুষের মধ্যে পরম 'একে'র দুটি প্রবাহ নিত্য প্রবাহিত হচ্ছে (রাধিকা-রস-কারিকা: সেই রূপেতে করে কুঞ্জেতে বিহার। সেই কৃষ্ণ এই রাধা একই আকার। রাধা হতেই নিরাকার রসের স্বরূপ। অতএব দুই রূপ হয় এক রূপ)। প্রাকৃত গুণ সংস্পর্শে নরনারী অত্যন্ত হীন হয়ে পড়ে। নারী ও পুরুষ যদি তাদের মনের আদান-প্রদানে প্রাকৃতগুণের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে পারে (সাধনার দ্বারা) এবং রাধাকৃষ্ণের লীলাকে শুদ্ধভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করতে পারে তবে এই লীলা অপ্রাকৃত ব্রজের লীলা হয়ে উঠে। এরূপ লীলার মধ্যে অফুরন্ত রসোৎসার ঘটে। মাধব ঘোষের একটি বিখ্যাত পদে রাধাকৃষ্ণের হোলীখেলার সুন্দর বর্ণনা আছে।—

মধুবনে মাধব খেলত রংগে।
ব্রজবনিতা ফাগু দেয় শ্যাম অংগে॥
কানু ফাগু দেওল সুন্দরী অংগে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভংগে॥

প্রসংগত উল্লেখ্য হোলীখেলায় আমরা প্রচুর আবীরের ব্যবহার দেখি। আবীরকে আমরা বিশেষ রং রূপেই জেনে থাকি। আবীরের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দাঁড়ায়,আ—বি—ঈর্ +ঘঞ্। ঈর্ ধাতুর অর্থ হল ক্ষেপণ বা প্রেরণ। সুতরাং আবীর শব্দের অর্থ করা যেতে পারে, বিশেষরূপে প্রেরিত হয় 'এমন কিছু'। আমাদের ধারণা এই 'এমন কিছু' হল প্রাণের রং বা আনন্দ-আবেশ। আবীর যখন অপরের দেহে দেওয়া হয়, যিনি আবীর দেন তাঁর মনের রং অপরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। আবীরের প্রচুর ব্যবহার আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে লক্ষ্য করি। অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধাম আনন্দে মুখরিত। আবীর কুমকুম ও বিচিত্র রং-এর প্লাবনে বৃন্দাবনভূমি ভেসে যাচ্ছে। বৈষ্ণবভক্ত রাধাকৃষ্ণের লীলা দেখে মোহিত।

বৃন্দাবনে নবলীলা আজি হোলী খেলে বনমালী।
আকাশ-পাতাল হর্ষে মাতাল নরনারী কুতুহলী॥
গাছে গাছে পাখী গাহিছে গান
কাঁপিয়া উঠিছে নবীন পরাণ।
আবীর কুমকুম ছড়াছড়ি যায়
ধন্যং শ্রীধাম বৃন্দাবন॥

হোলীসংক্রান্ত বৈষ্ণবপদাবলীতে প্রায় একইরূপ বর্ণনা দেখি। রাধাকৃষ্ণের এই লীলা যে কালক্রমে লৌকিক উৎসব থেকে লীলাতে পরিণত হয়েছে, আমরা এরূপ মত পোষণ করছি। বৈষ্ণবকবিগণ নিছক লীলার মধ্যেই এই উৎসবকে স্থান দিয়েই তাঁদের দায়িত্ব সারেন নি। এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম দার্শনিকবোধ আরোপ করে হোলীখেলাকে লৌকিকতার লঘুত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পূজার চাঁদা আদায়ে অত্যাচার—

সংবাদে প্রকাশ অন্যান্য বৎসরের মত এবারেও পূজার চাঁদা আদায়ে দেবীভক্ত যুবকদের একাংশ বিভিন্নস্থানে অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিয়াছে। পূর্ব্বেও এইরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে, বিশেষ করিয়া সরস্বতী পূজার ব্যাপারে। পূর্ব্বকালে আমরা দেখিয়াছি—সরস্বতী পূজায় যাহারা বিশ্বাস করে, তাহারা নিজ নিজ সাধ্যমত চাঁদা আনন্দের সহিত দান করিত। প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে চাঁদা-দাতার ছিল এ-বিষয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর চাঁদা-দাতা হারাইয়াছে এই স্বাধীনতা, এখন তাহাকে চাঁদা-আদায়কারীর দাবীমত চাঁদা-রূপী চৌথ দিতে হইতেছে। চাঁদা অর্থাৎ চৌথের পরিমাণ কি হইবে, তাহা নির্ভর করে আদায়কারী দলের উপর। "দিতে পারিব না' বলা চলিবে না—দাবীমত অবশ্যই চৌথ দিতে হইবে। না দিলে তাহার ফলাফল কি হইবে আদায়কারী দলের সদস্যরা তাহাও চাঁদায়কারীকে বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে কসুর করে না। কথাটা সাধারণভাবে বলা হইল, ইহার ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহাও শতকরা দশ-পনেরোর বেশী হইবে না। নেহাৎ ছোট যাহারা, তাহাদের আবদার প্রায় সকলেই রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। হুমকী দিয়া যাহারা চাঁদা আদায় করিতে দলে দলে বাহির হয়, দলই তাহাদের বল এবং সেই কারণে একক চাঁদা-দাতা এই দলের কাছে হুমকীতে 'সায়েস্তার' অর্থাৎ আত্ম-এবং সাধ্যের অতীত অর্থসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। একটি বা দুইটি 'দল' হইলেও কথা ছিল, কিন্তু দলের পর দল যদি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একমাত্র রোজগারী কর্ত্তার উপর ক্রমাগত চাঁদাক্রমণ চালায়, সেই হতভাগ্য আক্রান্তব্যক্তির অবস্থা কি হয়? এই প্রশ্নের জবাব সকলেরই জানা আছে। প্রতিকার কিছু নাই। সকলেই যদি প্রাণভয়ে এই অত্যাচার মানিয়া লইতে থাকে, তাহা হইলে এ-অত্যাচার দিনের পর দিন বৃদ্ধিমুখেই চলিবে।

"চাঁদা-দাতারা সঙ্ঘবদ্ধ হও" এই রকম একটা কিছু শ্লোগান প্রচার করিয়া আক্রান্ত এবং সম্ভাব্য-আক্রান্তের দল যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া চৌথ আদায়কারী দলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি গঠন করেন, তবে হয়ত কিছু শুভফল ফলিতে পারে। কিন্তু আমরা বৃথাই এ-আশা করিতেছি।

যতদূর দেখা যায়, তাহাতে আমাদের বাঙ্গালী ছাত্র-সমাজ এবং যুবকদের বিদ্যাদেবীর পূজায়, বিদ্যার সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না প্রায় ক্ষেত্রেই। সরস্বতী পূজার সময় তিন চারদিন বহু বহু স্থানে গলাভাঙ্গা মাইক এবং রদ্দিমার্কা হিন্দীগানের ফাটা রেকর্ড তারস্বরে বাজানোই দেবীপূজার প্রধান অঙ্গ হইয়াছে। পাড়া-প্রতিবাসীকে সর্ব্বভাবে জ্বালানো এবং তাহাদের দিনরাত্রির বিশ্রাম-নিদ্রার ব্যাঘাত সৃষ্টি করাই যেন দেবী ভক্তদের একটা প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া কেহ আপত্তি জানাইবেন তাঁহাকে হামলার ঝুঁকি লইয়াই তাহা করিতে হইবে। বিগত পূজার সময় এই প্রকার ন্যায্য প্রতিবাদের ফলে অনেককে দেবী-সেনাদের হাতে দৈহিক

নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে, এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। সব কিছু দেখিয়া ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, স্বাধীনতার পর একশ্রেণীর অবিভক্ত দেবী-সেনার দেবীর প্রতি ভক্তির লাভা-প্রবাহ প্রচণ্ডভাবে প্রবাহিত হইতেছে এবং সেই লাভা-প্রবাহে শান্তিপ্রিয়, ভদ্র, নিরীহ নাগরিক-দের দেহমন দগ্ধ হইতেছে। মাইক্-লাউড্-স্পীকার ব্যবহার সম্পর্কে এই মাত্র বলা যায় যে, পুলিশের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

বেলা ৬ হইতে ১০টা এবং
সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা

পর্য্যন্ত লাউড্স্পীকার মৃদুস্বরে বাজানো চলিবে। কিন্তু কার্য্যত দেখা যায়, ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত একটানা, লাউড্স্পীকারের কর্ণবিদারী সঙ্গীতাদি বাজানো হয়। পুলিশথানার সামনেও ইহা ঘটে, কিন্তু শান্তিরক্ষক পুলিশ এ বিষয় হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পায়। এই যদি অবস্থা তবে পুলিশের নোটিস্ পরিহাস মাত্র। নোটিস না দেওয়াই শ্রেয়। আসলকথা অন্যকার পুলিশও, আমাদের মত হামলাকারী দেবীভক্তদের ভয় পায় এবং পুলিশী ইস্তাহার বাহির করিয়াই দায়িত্ব শেষ হইল বলিয়া মনে করে।

কলিকাতার দৈনিক পত্রিকাগুলিও দেখা যাইতেছে—কোন পূজার ব্যাপারে ভক্তদের হাজারো রকম হৈ হল্লা এবং চাঁদা আদায় প্রভৃতি সকল অনাচারকে "ভাবগম্ভীর আবহাওয়া" বলিয়া উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করে। গত কিছুকাল হইতে আমাদের দৈনিক পত্রিকাগুলি 'কোদালকে কোদাল' বলিতে ভয় পায়। ব্যতিক্রম মাত্র একটি ইংরেজী দৈনিক পত্র—নাম করিবার প্রয়োজন নাই। জনমত গঠন-কারী, মানুষের স্বাধীনতা রক্ষক এবং প্রহরী 'ফোর্থ ষ্টেটের' আজ একি অবস্থা?

শুভ সংবাদ—

জানিতে পারিলাম সরকার হইতে স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ী আটলক্ষে ক্রয় করিয়া একটি সংগ্রহশালা হইবে যাহা মৃতের স্মৃতিরক্ষার কারণে এবং অন্যভাবেও ব্যবহৃত হইবে। সংবাদটা ভাল এবং জনহিতকর হইলেও হইতে পারে। ইহাতে কিছু আপত্তি করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে না কিন্তু এই প্রসঙ্গে

আমহার্ট ষ্ট্রীটে রামমোহন রায়ের এবং
বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীটে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাড়ী

সরকার হইতে ক্রয় করিয়া বাড়ী দুইটির যথাযথ ব্যবহার করা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইল বা হইবে জানিতে ইচ্ছা হয়।

বহুকাল পূর্ব্বে একবার শুনিয়াছিলাম যে রামমোহন রায়ের বাড়ীটি বর্ত্তমান অবাঙ্গালী মালিক-সিণ্ডিকেটের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া রামমোহনের স্মৃতিসৌধ এবং রামমোহন মিউজিয়াম হিসাবে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হইবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বাস্তবে কিছুই দেখা গেল না। এই বিরাট বাড়ী এবং সংলগ্ন উদ্যান আজ ভূতের আস্তানা এবং প্রায় জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে।

স্বর্গত বহু সুসন্তানের বাস্তুভিটা সরকার কিংবা কোন সাধারণ সংস্থা হইতে ইতিপূর্ব্বে দখল লইয়া, ঐগুলিকে মৃতের স্মৃতিরক্ষার জন্য নানাভাবে রূপান্তরিত করিয়া সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই কলিকাতা শহরের বুকে অবস্থিত, বর্ত্তমান যুগের ভারত তথা বিশ্বের একজন মহত্তম পুরুষের স্মৃতি-রক্ষার জন্য সরকারীভাবে কি করা হইয়াছে জানা নাই। যে-মহাপুরুষ ভারতবর্ষের সেইকালে দেশের পরম অন্ধকারের মধ্যে জ্ঞানের আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দেশের মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রচার এবং ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া স্বাধীনতার প্রথম বীজ বপন করেন, তাঁহার নামও আমরা স্মরণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। সমাজসংস্কারক হিসাবে রাম-মোহন ছিলেন অদ্বিতীয় এবং একক ভাবে বাঙলা দেশের নারীজাতিকে—সতীদাহ নামক পরম নিষ্ঠুর প্রথা হইতে রক্ষা করেন নিজে জীবন বিপন্ন করিয়া। আজকের বাঙলা দেশে ভারতপথিক রামমোহনের নাম কয়জন জানে ও মনে করে?

আর বিদ্যাসাগর? বাঙলা দেশে তথা ভারতবর্ষে এখন

দ্বিতীয় আর কোন নাম পাওয়া যাইবে কি না জানি না। সারা জীবন ধরিয়া যে মহাপ্রাণ নিজের সর্ব্বশক্তি এবং সকল সম্পদ দেশের এবং সমাজের অকল্যাণ দূর করিতে, নানা-বিধ কুসংস্কার মুক্ত করিতে ব্যয় করেন, তাঁহার কথাও আজ আর কোন বাঙ্গালী বৎসরে একবারও মনে করে কি না বলিতে পারি না।

দুষ্ট-রাজনীতি এবং সেই সঙ্গে চলচ্চিত্র এবং থিয়েটার আজ বাঙ্গালা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার দৃষ্টিশক্তিকে মানুষের কল্যাণকর সব কিছুর আড়াল করিয়াছে। আমাদের দৃষ্টিশক্তি আজ মানবজীবনের উন্মুক্ত আকাশ পর্য্যন্ত যায় না। তথাকথিত রাজনীতির এবং সিনেমা থিয়েটারই বর্ত্তমানে বাঙ্গালী সাধারণজন এবং যুবসমাজের কর্ম্ম এবং ধর্ম্মক্ষেত্র। জানি না কবে কোন শুভদিনে আমাদের চোখের সামনে ঘন কুয়াসা কাটিয়া গিয়া বাঙ্গালী তাহার মনের এবং দৃষ্টির অবলুপ্ত স্বাস্থ্য এবং স্বচ্ছতা আবার ফিরিয়া পাইবে। চারিদিকের ঘন নিরাশার মধ্যেও আমরা এখনো আশাহীন হই নাই। রাত্রির গভীরতম অন্ধকারের পরেই আলোর আভাস পূর্ব্বদিগন্তে দেখা দিবে—এ-বিশ্বাস যদি হারাই আমরা বাঁচিব আর কিসের আশায়? কিসের জন্য?

ধর্ম্মপ্রাণ জাতি প্রাণ-ধর্ম্মী ভক্ত—

কিছুকাল পূর্ব্বে এই কলিকাতা শহরে হঠাৎ এক অতিসামান্য কারণে, এমন কি অকারণেও হইতে পারে, ধর্ম্মে কিংবা মর্ম্মে আঘাত লাগার কারণে—সংখ্যালঘু শ্রেণীর (অর্থাৎ মুসলমান) এক দল চ্যাংড়া একটা বিরাট হৈ-হাল্লার সৃষ্টি করিয়া আর একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইবার চেষ্টা করে। কারণ আর কিছুই নহে—বিখ্যাত ঐতিহাসিক মিঃ আর্নল্ড জোসেফ টয়েনবি রচিত একটি প্রবন্ধ—"Relevance of Gandhian Creed in the Atomic Age কলিকাতার ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকার বিগত ২৬-১-৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বলা প্রয়োজন এই প্রবন্ধ গান্ধী শতবার্ষিকি স্মারক সমিতির অনুরোধে লিখিত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে বিতরণ করা হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধটি কমপক্ষে তিনবার অতি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া কোন প্রকার আপত্তিকর কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। লেখকের অপরাধ তিনি নিজের বিচার-বুদ্ধি মত পয়গম্বরের সহিত মহাত্মা গান্ধীর তুলনামূলক কিছু মতামত প্রকাশ করিয়াছেন। এই তুলনামূলক বিচারে মুসলমানধর্ম্ম কিংবা এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক পয়গম্বর মহম্মদের প্রতি কোন প্রকার অসৌজন্য, অপমানজনক এবং কোন প্রকার হেয় মন্তব্য করা হয় নাই। লেখক ঐতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিয়া তাঁহার প্রবন্ধে কিছু সাধারণ মন্তব্য মাত্র করিয়াছেন এবং ইহাতে 'প্রাণধর্ম্মী' কিন্তু সর্ববিষয়ে অশিক্ষিত হল্লাবাজদের ক্ষেপিবার কারণ কি বুঝা গেল না। প্রসঙ্গক্রমে বলা প্রয়োজন, যাহারা সংশ্লিষ্ট দৈনিক পত্রিকার কার্য্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তাহাদের শতকরা ৯৫ জনই কলিকাতার এক বিশেষ এলাকার বস্তিবাসী এবং ইহাদের মধ্যে একজনও আলোচ্য প্রবন্ধ পাঠ করে নাই, কারণ ইংরেজি পাঠ এবং তাহা বুঝিবার মত বিদ্যাবুদ্ধি এই সকল ব্যক্তির নাই। পিছন হইতে কেহ বা কাহারা এই সব সরলবুদ্ধি লোকেদের মনে ধর্ম্মের গরল বুদ্ধির ইন্জেকসন দিয়া হাঙ্গামার সৃষ্টি করিতে প্ররোচনা দেয়।

ঘটনাটির দ্বিতীয় এবং শেষ দিনে নিকটস্থ কোন স্থান হইতে প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া দেখবার সুবর্ণ সুযোগ হয়। একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া কিছু আনন্দবোধ করিলাম—এবং তাহা এই যে, পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালী মুসলমান—বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজের কাহাকেও এই অযথা বিক্ষোভে যোগ দিতে দেখিলাম না। এই অসঙ্গত এবং অযথা বিক্ষোভে যোগদানকারীদের মধ্যে শতকরা শতজনই বোধ হয়—পশ্চিম বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী একটি রাজ্যের বাসিন্দা।

এই প্রায়-দাঙ্গা বিক্ষোভ-হাল্লা কলিকাতার পুলিশ এক ঘণ্টাতেই দমন করিতে পারিত, কিন্তু রাজনৈতিক দল-

গুলির ভয়ে হয়ত তাহা করিতে সাহস পায় নাই। নির্বাচনের পূর্ব্বে মুসলীম ভোট প্রাপ্তির আশায় সব কয়টি দলই নিজ নিজ পার্টির স্বার্থ বজায় রাখিতে সর্ব্বভাবে ঘৃণ্য লজ্জাকর-জনক ধরণে সংখ্যালঘু মুসলীম-তোষণে আত্মনিয়োগ করে! তাহাদের সব কিছু অনাচার, এমন কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্য্যকেও রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কাজে লাগাইতে দ্বিধাবোধ করে নাই—ভবিষ্যতেও করিবে না। ব্যতিক্রম কিছু অবশ্যই আছে, কিন্তু তাহার পরিমাণ খুবই কম।

—•—

আবদারের কি কোন সীমা নাই?

পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে দেখা যাইতেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই আসলে সংখ্যাগুরু! তাহারা গাছেরও খাইতেছে, তলারও কুড়াইতেছে। আমরা ভারতীয় হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টানের মধ্যে কোন তফাৎ দেখি না, মনে করি—ভারতীয় মায়েরই সম অধিকার এবং ভারতীয় সংবিধানসম্মত আইন কানুনও সকলের উপর সমানভাবে প্রযুক্ত হইবে। কিন্তু আমাদের মহাশয় শাসকবর্গ তাহা করিতেছেন কি? সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহার যথাযোগ্য শাস্তি বিধানে কর্ত্তারা কোন গাফিলতী করেন না, কিন্তু তথা-কথিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অপরাধীর বেলায় প্রায়ই একটা অহেতুক কোমলতার ভাব পরিলক্ষিত হয়। কর্ত্তারা সদা সর্ব্বদা পাকিস্তানের 'প্রতিক্রিয়ার' সবিশেষ মর্য্যাদা দিয়া থাকেন—এবং সেই বুঝিয়া গুরুতর অপরাধে অপরাধীর শাস্তি বিধানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অপরাধীর দণ্ডবিধান করা হয়।

অপরাধীকে আদালতে প্রেরণ করিলে তাহার যথাযথ বিচারের অবকাশ হয়, কিন্তু অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন অপরাধীর বিরুদ্ধে যদি মামলা দায়ের করা না হয়, তাহা হইলে বিচারক কি করিবেন বা করিতে পারেন?

আলোচ্য বিক্ষোভের সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বস্তিবাসী গুণ্ডার দল ধর্ম্মতলা অঞ্চলে বহু দোকানীর ক্ষতি করে, লুটপাটও হয়—কিন্তু বিশেষ কতকগুলি দোকানের (ফল প্রভৃতি) মালপত্র মুসলমান দোকান-মালিকেরা নিজেরাই অতি তৎপরতার সহিত সরাইয়া ফেলে এবং তাহার পর নিজেদের দোকানেই অগ্নিসংযোগ করে। ফলে কয়েকটি দোকান পুড়িয়া যায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মালিক দোকানীদের জন্য জমিয়ত উলেমা হিন্দু খেসারত দাবী করায়—সরকার তাহা অতি তৎপরতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন! "আমরাই হাঙ্গামা করিব। আগুন লাগাইব, লুটপাট করিয়া কিছু ফালতু মুনাফাও লুটিব এবং এবং সর্ব্বশেষে ক্ষতিপূরণের দাবীও পেশ করিব।" দাবীও গ্রাহ্য হইবে এবং গরীব-করদাতাদের অর্থেই তাহা মিটান হইবে। ইহা কাজীর বিচারকেও কেবল হার মানাইতেছে না, লজ্জাও দিতেছে!!

'সংখ্যা গুরুত্বের' পাপের জন্য আমরা কি এইভাবে চিরকাল গুরুদণ্ডই ভোগ করিব? আজ স্পষ্টভাবে বুঝিবার এবং সেই মত কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, অবাঙ্গালী মুসলমানদের আবদার দাবী যতই মিটাইতে থাকি না কেন, এই শ্রেণীর লোকেদের পোষ মানাইয়া ভদ্র এবং শান্ত 'ভারতীয়' নাগরিকে পরিণত করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমাদের কর্ত্তারা এই অসম্ভবকেই আজ হউক, কাল হউক কিংবা পাঁচশত বছর পরেই হউক—সহজ সম্ভব করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আগুনের আঁচ তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করে না, কাজেই তাঁহারা প্রসন্নচিত্তে বহাল তবীয়তে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সর্ব্ববিধ অসম্ভব এবং অসম্ভব চিন্তাসুখে নিমগ্ন থাকিতে পারেন। আমরা কেবলমাত্র ক্রন্দন করিয়া এই গানই গাহিতে থাকিব—

যার ব্যথা সেই জানে!
কি জানে (উ) পরে!!

—•—

হামলাবাজদের কৃত ক্ষয় ক্ষতির খেসারত কে দিবে ?

আলোচ্য হাঙ্গামার সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মুসলমান অর্ব্বাচীনের দল যে সব বাস্, প্রাইভেট গাড়ী, মিলিটারী ভ্যান্ ধ্বংস করে, সেই সব ধ্বংসপ্রাপ্ত সামগ্রীর খেসারত কেন তাহাদের নিকট হইতেই আদায় করা হইল না ? হামলাবাজ কাহারা, কোন্ কোন্ বিশেষ অঞ্চলের বস্তি হইতে তাহারা ধর্ম্মের মান রাখিতে এবং প্রাণ-ধর্ম্মের জ্বালা জুড়াইতে বিজয়-অভিযানে বাহির হয় তাহার সব কিছুই শান্তিরক্ষক পুলিশের জানা আছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও কেন, কোন গুরু এবং গোপন কারণে সেই সব বস্তির উপর পিটুনী কর বসাইয়া খেসারতের টাকা আদায় করা হইল না এবং কোন্ অপরাধে সংখ্যা-গুরু সম্প্রদায়ের উপর ক্ষতিপূরণের নামে পরোক্ষ পিটুনী কর—আমাদের প্রদত্ত কর হইতে হামলাবাজদের 'উপরি' হিসাবে দেওয়া হইল ? ইহাকে যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্ররোচনা দায়ক বলা যায়, তাহা কি অন্যায়, হইবে ?

—•—

নির্ব্বাচনের পর—

এককালে মহান, সর্ব্বজন সমর্থিত কংগ্রেসের রাজত্ব পশ্চিমবঙ্গে এবং হয়ত অন্য কয়েকটি রাজ্যেও পরম শান্তি লাভ করিল। এবার শাসকদের 'বংশ' বদলের পালা। সাধারণ করদাতারা আশা করিতেছে—পশ্চিমবঙ্গে অবশেষে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং নূতন শাসক-বর্গ দেশশাসনের ব্যাপারে আমদানীকরা রাজনীতির খেলা দেখান এবং লোককে ঠেলা দেওয়া পরিত্যাগ করিয়া, দেশে সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিবেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসাব্যাপারে একটা বিধিসম্মত ধারার সূচনা করিবেন। নূতন শাসকের দল আর যাহাই হউন—তাঁহারা কেবলমাত্র আত্মসুখ এবং স্বজনপালনেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেন না। সমষ্টিভুক্ত বিভিন্ন দলগুলি—যে-আদর্শে বিশ্বাস এবং আস্থা রাখেন, তাহা ভুল বা ঠিক যাহাই হউক, সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে প্রয়াস পায়েন, গুরুর নাম-কীর্ত্তনই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য নহে। আমরা অর্থাৎ সাধারণ মানুষ আশা করিব, নূতন শাসকের দল দেশের সকল শ্রেণীর সকল মানুষকে সমভাবে দেখিবেন এবং সর্ব্বভাবে সকলের প্রতি সুবিচার করিবেন। নূতন শাসকদলের সার্থকতা কামনা করি।

এইসঙ্গে—যাঁহারা বিদায় লইলেন, সেই একদা গরীয়ান দলকে আমাদের অতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। নির্ব্বাচনের কঠোর বিচার এবং শিক্ষাকে বিদায়ী দল যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইবেন, এই আশা করি। পশ্চিমবঙ্গে সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত আবার তাঁহারা নিজেদের ত্যাগে, স্বার্থশূন্য দেশসেবায় এবং বুদ্ধিমত্তায়, দেশের মানুষের চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। এ-আশা সুদূরপরাহত হইলেও, নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই।

রিক্শয়ালা

শ্রীমমতা ঘোষ

ও ভাই মানুষ যন্ত্র যুগের লোহার মানুষ বুঝি
সকাল থেকে রাত অবধি বেড়াও যাত্রী খুঁজি।
জমাট আঁধার পাতলা হতেই পাখিরা গান গায়
আলোর আভাস জাগে যখন, বহে শীতল বায়,—
নূতন প্রভাতটিরে
প্রণাম সেরে রিক্শয়ালা রিক্শ নিয়ে ফিরে।
গ্রীষ্মকালের দুপুর বেলা সবাই যখন ঘরে
গাছতলাতে শোও যে তখন ফুট্‌পাথেরই 'পরে।
দিন-দেবতা রুদ্র রোষে বিশ্ব ভুবন দহে,
দুখের উপর দুখ বাড়িয়ে তপ্ত বাতাস বহে
এম্‌নি সময়ে হায়
ছাতা মাথায় যাত্রী এসে কোথায় যেতে চায়?
হায়রে তুমি মানুষ কি নও, কেউ করে না মায়া,
রক্ত মাংস নেই শরীরে, বুঝি লোহার কায়া।
পিচগালা পথ পায়ের তলায় বিঁধছে সূচী যেন,
মাথার 'পরে রোদ ঠিকরে আগুনকণা হেন;—
নাইরে উপায় নাই,
মানুষ বহে রিক্শয়ালা চলল ছুটে তাই।
বাদল দিনে কানে আসে মেঘেরি গর্জ্জন,
তালে তালে রিক্শয়ালার শুনি রে ঠন্ ঠন।

ট্রাম বাসেরই দিন গিয়েছে, চক্র নাহি চলে,
ট্যাক্সিবিরল পথ যে কাঁদে, দাঁড়িয়ে যাত্রী জলে।
রিক্শওয়ালা ভাই
দুর্দ্দিনেরই বন্ধু, তোমায় খোঁজে পথিক তাই।
কুহেলিময় আকাশ মাটি শিশির মাসের ভোরে
যাত্রী নিয়ে রিক্শওয়ালা চলছে ছুটে জোরে।
শীতের বসন নাইক' দেহে, ঋতুরই দাস,
এম্‌নি ক'রে লোহার মানুষ ছুটছে বারো মাস
হিম ঝরানো রাতে
রিক্শওয়ালার চরণ দুটি চলার ছন্দে মাতে।
ঋতুর পরে ঋতুর চাকা চলছে ফিরে ফিরে,
রিক্শওয়ালার নাই যে বিরাম, চালায় রিক্শটিরে।
যাত্রী কত নামে ওঠে, ক্রমে বাড়ে বোঝা,
লোহার মানুষ শ্রম জানে না, ছুটছে কেবল সোজা।
বন্ধু সবার ও যে,—
তাইত' বুঝি ধনী গরীব সবাই ওরে খোঁজে।
জানি না ওর কবে কখন মিলবে অবসর,
ভাববে বসে মা মাটিরে, পড়বে মনে ঘর।
গাছপালাতে ঘেরা কুটির, পুকুর বহে যায়,
বুঝি ঘুমের ঘোরে
স্মরণপথে আপন জনে আসবে রে ভিড় ক'রে।
না, না, এখন থামাও মায়া, কাজ কি ভাবনায়,
হাত পড়েছে রিক্শতে ওর দিন যে বহে যায়।
অস্তাচলে নাম্‌বে যখন যৌবনেরই রবি,
তখন সময় মিলবে রে ওর, দেখবে সুখের ছবি।
তখন রিক্শটিরে
আর কারে ও সঁপে যাবে আপন ঘরে ফিরে।
ওর জীবনে তপন যে আজ মাঝ গগনে তাই
একই সুরে চলছে ছুটে রিক্শওয়ালা ভাই।
মানুষকে ও ভালবাসে, দাবি তাদের মানে,
দুঃখ জ্বালা সহে সবই চলে প্রাণের টানে।
সবার বোঝা বয়,—
সুখের দিনে দুখের রাতে সহায় ও যে হয়।

মাতৃ-স্নেহ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বন্য পাখীও ধন্য সোহাগে মা'র ;
হেরেছি তা'দেরও অনিন্দ্য ব্যবহার।
পথে যেতে যেতে কতবার আনমনে
নয়নে প'ড়েছে নিরালা নিভৃত খনে
মা-পাখী সোহাগ-মধুর চঞ্চু-পুটে
খাদ্য এনেছে বন-বনান্ত লুটে ;
দিয়েছে ছানার ক্ষুধিত চঞ্চু ভরি'
কত না যতনে—কত না আদর করি'।
এমন স্নেহের দৃশ্য দেখিলে পরে
কা'র না দু'চোখে আনন্দ-বারি ঝরে !
বাল্যের স্মৃতি মনে না জাগিবে কা'র !
কা'র মনে জেগে উঠিবে না মুখ মা'র !
সকল মায়েরই একরূপ ব্যবহার ;—
বন্য পাখীও ধন্য সোহাগে মা'র।

পৃথিবীও কথা কয়

ডাঃ নন্দলাল পাল

পৃথিবীও কথা কয় মাঝে মাঝে
নিজের ভাষায়।
কখনও বুঝি সে ভাষা,
কভু শুধু থাকি কান পেতে
মাটির বুকের মাঝে।
হৃদয়ের ছন্দিত কম্পনে
যৌবন, জড়তা, মৃত্যু—এই নিয়ে জীবনের সাধ !
কখনও ফুলের জন্ম, কখনও বা ফলের পিয়াসী।
শীতের স্খলিত পত্র বসন্তের পূর্ণ অভিলাষে
ভরে কভু কানায় কানায়।
পৃথিবীও কথা কয়, পৃথিবীও হেসে কেঁদে বাঁচে।
নিশায় নিশুতি
কিংবা দুপুরের প্রচণ্ড দহনে,
অথবা বিষণ্ণ সন্ধ্যা, সোনালী উষায়
আমার মনের বীণা কভু যদি ঝঙ্কারিয়া উঠে—
পৃথিবী মুখর হয় নিজের ভাষায়।

মূলে ভুল

(উপন্যাস)

পুষ্প দেবী

আরো ভ্রান্তির কারণ ঘটালো তটিনী। সাধারণ দালালের বৌ সে। হঠাৎ এ্যারিষ্টোক্রেসী-সমাজে ওঠার আশার এদের কাঁধে ভর করেছে। তার বাক্‌চাতুরীতে সে প্রমাণ করলো অনুকে সে হাতের তেলোয় রাখে। অথচ প্রকৃত পক্ষে তার জন্যে অনুর খাটুনি সাতগুণ বাড়লো। কষ্ট হলে প্রভাকে বলা অনুর স্বভাব নয়। কিন্তু রুগ্ন শরীরে খাটতে খাটতে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে সে মাকে বললো, "বাইরের একটি লোক থাকলে বাড়ীর সকলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড বেড়ে যায়। এই চালের বাজারে কত যে ব্ল্যাকে চাল কিনছি মা কি বলবো?" তটিনীর তথাকথিত স্বামী কিন্তু লোকটা ভালো। তার আশা ধিঙ্গি বৌ যদি অনুর দেখে ঘরসংসার চেনে কিন্তু ঘটনা ঘটলো বিপরীত। খারাপটা মানুষ চট্ করে নেয়, তটিনী ঘরসংসার চিনলোনা, খোকা-খুকু গানের নেশায় মেতে উঠলো। আজ জলসা, কাল গানের আসর, তাদের আর অবসর রইল না মার দিকে তাকাবার। পরিবর্ত্তন হল না শুধু শিশু বাসুদেবের। এর মধ্যে দু-দুবার কর্ম্মাটাড়ে সদাশিববাবুর বাড়ীতে বেড়াতে গেল তটিনী, সঙ্গে গেলো অনু। সেই অনু, যে অনুকে অন্যের সঙ্গে চোখের আড়াল করে না গদাই, সেই অনু। প্রভা মনে মনে হাসলেন "কত রঙ্গ জানো যাদু কত রঙ্গ জানো" প্রভা হল পরস্ত পর। সে অনুকে যত্ন করতে পারবেনা, পারবে তটিনী। কথায় বলে না "মার চেয়ে যার দরদ বেশি তাকে বলে ডান।"

তখন প্রভা বোঝেন নি যে রুগ্ন অনুমার দাম গদায়ের কাছে নিঃশেষে হয়ে গেছে। তাই যেদিন আবার অনুমা এসে বললো, জানো মা তুমি যদি কর্ম্মাটাড়ে যাও আমি তোমার সঙ্গে যাবো। প্রভা সে কথাও কানে তোলেন নি। মনে করেছিলেন কত যে গদাই যেতে দেবে সে জানা আছে। আজ প্রভা হায় হায় করেন! কী ভুল করেছেন তিনি, কেন তিনি গদাইকে ভয় করে অনুকে অচিকিৎসায় ফেলে রাখলেন, কেন অনুকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখালেন না। এত বড় ভুলের আজ কি মাশুল দেবেন। যত ভাবেন ততই মাথার ভেতর হু হু করে জ্বলে ওঠে। ব্রহ্মচারী গীতা পড়েন

ক্লৈব্যংমাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ

প্রভা বলেন আর একবার বলো গোপাল? হ্যাঁ হ্যাঁ ঐ ক্লীবতার দোষই তাঁকে স্পর্শ করেছিল। কার ওপর অভিমান করলেন তিনি? সে কী মানুষ? হ্যাঁ অভিমান, এই অভিমানই তাঁর কাল হল। প্রতি মাসে মাসে ব্লাড সুগার দেখার জন্য সদাশিববাবুর জন্য যে ডাক্তার আসতো, প্রভা বারে বারে অনুরোধ করেছে অনুমাকে, হ্যাঁরে তোর এত খাওয়া বন্ধ করেছে ব্লাড সুগারটা একবার দেখা না? কিন্তু গদায়ের একান্ত জেদ। সদাশিববাবুর ডাক্তারকে ব্লাডসুগার দেখান হবে না অনুর। প্রভা বুঝে পান না কারণটা কি?

এখন বোঝেন প্রভা যে অমুর শরীরের অবস্থা প্রভাকে জানাতে রাজী ছিল না গদাই। মৃত্যুর দিন ইনস্যুলিন দেওয়া সত্ত্বেও তার ব্লাডসুগার আড়াইশো দেখা গেল। অথচ তার আগের দিনও বুকে তার কষ্ট, হাই-পোগ্লাই-সিমিয়া বলে গদাই উপেক্ষা করেছে।

যাদের বহুমূত্র অসুখ থাকে, তাদের ইনস্যুলিন বা ঐ জাতীয় ওষুধ দিয়ে রক্তে চিনি কমিয়ে রাখা হয়। কিন্তু রক্তে চিনি বেশী কমে গেলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হয়। মাথা ঘোরে বুক ধড় ফড় করে, অনেক সময় অজ্ঞানও হয়ে যায় রুগী। সেকারণ চিনি সঙ্গে রাখতে হয় খেলেই রুগী সুস্থ হয়। গদাই মহাপণ্ডিত সে রক্তও নিয়মিত পরীক্ষা করাবে না। আবার বুকে কষ্ট হলে হাইপোগ্লাইসিমিয়া বলে অগ্রাহ্যও করবে। সবচেয়ে দুঃখ-জনক ঘটনা ঘটলো অমুর মৃত্যুর দিনে। সেদিন প্রভা সদাশিববাবুর ডাক্তারকে দিয়েই অমুর রক্ত পরীক্ষা করালেন। সবাই জানে যে ব্লাডসুগার দেখলে তার সাতদিনের মধ্যে প্রস্রাবে সুগার পরীক্ষা করতে হয় না। কিন্তু গদাই সারাদিনই অমুর প্রস্রাব পরীক্ষাতেই কাটিয়ে দিলো। ছেলেমেয়েরা বাপের চিকিৎসার নিষ্ঠা-বিহ্বল কিন্তু মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন প্রভা ও সদাশিববাবু। বংশের অসুখ, এ অসুখের নাড়ী নক্ষত্র তাঁদের জানা। তবুও সরল সদাশিব-বাবু একবার বলতে গেলেন আর এ পরীক্ষা কেন? এধারে ব্লাড প্রেসার হু হু করে নেমে যাচ্ছে সেদিকে গদায়ের ভ্রুক্ষেপ নেই। বাড়ীতে একটা ব্লাড প্রেসারের যন্ত্র নেই। অক্সিজেন দেওয়া রুগী অথচ কোরামিন নেই ডাক্তারের বাড়ীতে। যখন প্রেসক্রপশান লিখলো গদাই ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো বেনুর বর আর প্রভার ভাই তখন অমুমা সবশেষ করে চলে গিয়েছে। ওষুধটা পড়ে প্রভা দেখেন পেথেড্রিন আর কোরামিন—হায়রে প্রভার কপাল এ দুটো ওষুধই প্রভার ঘরের ড্রয়ারে আছে—থাকে সর্ব্বদা।

আর একদিনের কথা মনে পড়ে, কী একটা পূজা ছিল সেদিন। প্রভা বলেন, দেখলি অমুর কাণ্ড খোকা আফিসে গেছে বলে আমার ঠাকুরকে অমু তালের বড়া দিতে ভুলে গেলো। বেণু বলে না মা তা নয়। তোমার কেবল খোকন আর খোকন। ছোটদি ভুলবে কেন? ছোটদি ত চিরকালই চাপা। ছোটদিই ত বলছিল দেখনা খেটে সবই করলুম, মার ঠাকুরকে দিতে পারলুম না। সিঁড়ি উঠলেই কেমন হাঁপ ধরে মার কাছে ধরা পড়ে যাবো। তাই প্রভা আজ মনে করেন কেন তিনি চুপ করে ছিলেন? কেন ভেবেছিলেন যে অমুর চিকিৎসা ত গদাই করাতে দেবেই না মাঝ থেকে অমুর প্রাণান্ত হবে গদায়ের রাগে। আজ তাই শুধু ভাবেন প্রভা একি করলেন? হায় হায় একি করলেন তিনি? মাথার ভেতর যেন জোট পাকিয়ে যায় তাঁর। ধ্রুব নারায়ণের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে থাকেন।

হ্যাঁ নিরুর অসুখ কিছুটা সামলালো। সে গেলো নিজের বাড়ী, যথারীতি প্রভা বিছানা নিলেন। অসুস্থ শরীরে নার্সিং হোমে নিরুকে নিয়ে থাকতে শরীরে কম ধকল যায় নি। মনের জোরে খেটেছিলেন। আজ আবার বিশ্রামের দিন আসতেই পুরাতন বন্ধু তার সাঙ্গো-পাঙ্গ নিয়ে এসে দেখা দিলো। সেই বুকের কষ্ট সেই মাথা ঘোরা—মাসখানেক বিছানায় কাটলো। এর মধ্যে হঠাৎ শুনলেন। অমুমা নাকি তটিনীর বাসায় যাচ্ছে চেঞ্জে। অবাক কাণ্ড! পুরী নয়, ওয়েলটেয়ার নয় রাঁচী নয়, যাচ্ছে ধাপধাড়া গোবিন্দপুর—জয়নগর মজিলপুরে। এমন কথা জন্মে শোনেনি প্রভা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে প্রভা নিচে নামলেন। তখন সব গোছান-গাছানো শেষ। সামনে জীপগাড়ী দাঁড়িয়ে। ক্লান্ত বিষণ্ণমুখে অমু গাড়ীতে উঠছে। মাকে দেখে বললো, এই তোমার কাছে যাবো ভাবছিলুম হঠাৎ এরা ঠিক করলো, কিনা? বলচে তুমি দিনকতক তটিনীর কাছে যাও বিশ্রাম হবে। আর পারলেন না প্রভা। বললেন তা তোমার সংসার থেকে ছুটিই যদি মিলেছে আমার কাছে রইলেনা কেন? আমি কি তোকে দিয়ে বাসন মাজাতুম? অমুর বোধ হয় কথা কইতে কষ্ট হচ্ছিল—মার দিকে চেয়ে শুধু একটু ম্লান হাসি হাসলো অমু। তটিনী প্রভার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, আমি বাবা নিয়ে যেতে চাইনি,

মামাবাবু জোর করে পাঠাচ্ছেন। অনু বললো, তাতো পাটাচ্ছেন কিন্তু টা টা বাই বাই করতেও তো এলেন না। প্রভার চোখের সামনে দিকে জীপগাড়ীটা অনেক ধুলো উড়িয়ে চলে গেলো। সেই ছবিটা আজো প্রভার চোখের সামনে ভাসে। পরে অনুর ঝির কাছে প্রভা শুনেছে, অনু নাকি জয়নগর যেতে চায়নি। খোঁড়া ঝি কেঁদে কেঁদে প্রভাকে বলেছে যেতে চায়নি বেচারী, বললো তটিনীর বাড়ীতে বড় কষ্ট ওপরে একটা ঘর নিচে একটা ঘর চানের ঘর নিচে। আমার সিঁড়ি উঠতে বড্ড কষ্ট হয় আর যা উঁচু উঁচু ধাপ ওদের সিঁড়ি। আজো প্রভা ভেবে পান না কেন অনুকে জয়নগর পাঠানো হল। পাছে প্রভা অসুখ ধরে ফেলে চিকিৎসা করান এই আশঙ্কায় কি? পরে শোনেন তখন অনুর জ্বর চলছিল, টেরামাইসিন দিতে দিতে কেউ কি হার্টের রুগীকে জীপ গাড়ী করে জয়নগর পাঠিয়ে দেয়? এমন সর্বনেশে কথা কেউ কি কখনো শুনেছে? গদায়ের সব ব্যবস্থাই চমৎকার। কানের কাছে রোগের ঘ্যান ঘ্যানানির জ্বালায় তাকে দেশান্তরী করে যে শান্তি পাবে তার উপায় নেই। তিন পয়সায় কাডিওগ্রাম তোলার আশায় যে বন্ধু কাডিওলজিষ্টকে আসতে বলেছিল সে এসে হাজির, এধারে রুগী পলাতক। ডাক্তারের চোখ ছানাবড়া—কাডিওগ্রাম তুলতে এসে রুগী জীপগাড়ী করে জয়নগর গেছে এমন কথা সে জীবনে শোনে নি। যদিও তার মার মৃত্যুর দিনে নাকি গদাই সারারাত সেখানে ছিল। তার পরিবর্তে এটুকু গদাই চেয়েছিল। তবুও সে বলে আচ্ছা বৌ-পাগলা তুই। সে জীপগাড়ী করে বাজী মাৎ করে বেড়াচ্ছে আর তুই বলছিস তার কাডিওগ্রাম তুলতে।

এরপর প্রভা অনুমার একটা চিঠি পেলো জানো মা, আমি এখানে সাতবুড়ীর একবুড়ী হয়ে চুপ চাপ বারান্দায় বসে থাকি সময় আর কাটে না। বাসুদেবটার বড় কাসি কেমন আছে কে জানে? ওরাত চিঠিপত্তরও দেয় না। তুমি চিঠি দিও। এখানে এক জাগ্রত কালী আছেন। রোজ আমার তটিনী সেখানে নিয়ে যায়। তটিনীর মেয়ে আমায় ভাবে সত্যিই বুড়ো আমার হাত ধরে রিকসা থেকে নামায়। এখানের কালীকে ছুঁতে দেয় আমি রোজ গিয়ে পুজো করি। আমি জানি তোমার সময় নেই তবুও চিঠি দিও মা। তুমি কি আমার ওপর রাগ করে আছ?

তুমি আর বাবা কেমন আছ আমার প্রণাম নিও। কবে ফিরবো কে জানে? চিঠি দিতে ভুলো না। কিন্তু বড্ড ভালো লাগে তোমার চিঠি পেলে।

তোমার—অনু

এর ক'দিন পরে অনু ফিরলো। খবর পেয়ে প্রভা নিচে গেলেন। গিয়ে দেখেন চেয়ারে কপাল টিপে অনু বসে আছে। অনুর এ চেহারার সঙ্গে প্রভা পরিচিতা নন। যখনই প্রভা নিচে যেতেন দেখতেন অনু ছুটোছুটি করে কাজ করছে। আজ বাইরে থেকে ফিরে সে কি বসে থাকার মেয়ে? জিগেস করলেন, মাথা টিপে আছিস কেনো রে? কি হয়েছে? অনু বললো এই জ্বরটা চলছে ত? চান করে মাথার কষ্টটা কেমন বেড়ে গেল। প্রভা বললেন কতদিন জ্বর হয়েছে? অনু বললো ওতো চলছেই। প্রভা বললেন তবে সাত সকালে চান করতে গেলি কেন? বললো ওদের ভারি ঐ সময় জল দেয়, ভাবলুম একেবারে মাথায় দুঘটি ঢেলে নিই। প্রভা বললেন জ্বর গায়ে ঐ গণ্ডগ্রামে গেছলি তুই আর ঐ হাঁপাতে হাঁপাতে জীপ গাড়ী করে ফিরলি?

এবার অনু প্রসঙ্গান্তরে যায়, বলে দেখ না মা খুকুটার বিয়ের জন্যে একবার যেতে বলেছিলুম তাও বোধ হয় যায় নি। এ কী আমার বাবা যে যেখানে ভালো পাত্তর আছে শুনবে পালকিতে বেঁধে ছুটবে? কত কি বললো পাত্তর দেখে এসে তোমায় ফোন করব কত কি? এক কলম চিঠি লেখেনি।" প্রভা বিস্মিত হন, এভাবে গদায়ের বিরুদ্ধে কিছু বলা অনুর স্বভাব নয়। স্বভাবে অনু মিতভাষী। তারপরে চিরকালই প্রভাও গদায়ের বিরুদ্ধবাদী স্বভাবের জন্য অনুর স্বভাবই দুজনের কাছে দুজনের গুণগুলিই প্রস্ফুট করে তোলা। হঠাৎ তার মুখে একথা শুনে প্রভা চমকে গেলেন। অনুর মৃত্যুর দিন গদাই

একজনকে বলেছিল, জানিস আমি হাতে করে দিলে ও বিষও খেতে পারে।' মনে মনে ভাবেন, তাই তুমি হাতে করে বিষই দিলে সাবাস্ সাবাস। সদাশিববাবু বলেন, জানো প্রভা, বেশী ভালো ভালো নয় বলে একটা প্রবাদ আছে। অনুমার কথা ভাবলে সেইকথাই মনে হয়। এরপর সাত আটটা দিন কাটলো। রোজই প্রভা নামেন অনুকে দেখতে। যখন গদাই থাকে না। দেখেন অনু হাঁপাচ্ছে। অনুকে বলেন, নাই বা হল হার্টের দোষ তুই একটা লোক রাখ উঠতে গেলে হাঁপিয়ে যাচ্ছিস তুই।

অনু বলে ব'লে দেখবো। খুকু কি বোঝে কে জানে? বলে লোক রেখে কোন সুবিধে হবে না। প্রভা বলে তোদের আর কি? তোরাও কলেজে কেউ ডাকলে দরজাও তো খুলে দিতে পারে? এই সময় তটিনী আসে। তটিনীর কাছে প্রভা শোনেন জয়নগরে গিয়ে প্রথম দিনরাতেই খুব কষ্ট হয় অনুর। তটিনী বললো, আমি ভাবলুম বুঝি বুকচাপা। হার্টের অসুখে রামবাবু মারা যান। এ বুকচাপাকে প্রভা চেনেন, তাঁর বুক কেঁপে ওঠে। তটিনী বলেই চলে, তারপর দিন রাতে বলে দেখি মা কি হাঁপাচ্ছে? সে যেন ঢেঁকির পাড় দিচ্ছে বুকে। আমি বললুম মা অমন করছ কেন? মা বললো বাথরুমে গেছলুম। আমাদের বাথরুম তো নিচে। ঐটুকু সিঁড়ি উঠে কি কাণ্ড। যাক বাবা ভাগ্যে সেখানে অসুখ বাড়েনি। এর পরদিন পালং বলে একটা বাচ্চা ছেলেকে প্রভা নিয়ে যান। বলেন এ বসে থাক তোর কাছে। কেউ এলে দরজা খুলে দেবে। কি তুই কারুকে ডাকতে বললে ডেকে দেবে। অনু ম্লানমুখে বলে দরকার নেই মা। তোমার জামাই রাগ করবে। তবু প্রভার এ সাহস নেই যে বলবে, তুই ওপরে চল থাকার আমি নার্স রেখে দোব—গদাইকে এত ভয় তাঁর। ভয়ই হল মৃত্যু আর অভয় হল অমৃত সেই মৃত্যুই হয়েছিল তাঁর তাই এতবড় ভুল তিনি করলেন। সত্যিই গদাই বাড়ী এসেই পালংকে ফেরৎ দিলো। পালং বললো জামাইবাবু বললেন যা পালা। নিরুপায় হয়ে প্রভা গুরুর কাছে যান মনে মনে প্রার্থনা করেন গদায়ের সুবুদ্ধি দিন ভগবান। ফিরে দেখেন অনুকে নিয়ে গদাই বেরুচ্ছে। পরে গদাই বলেছিল আপনি যখন হাওয়া খেতে বেরুচ্ছিলেন আমি তখন অনুকে ই সি জি করতে নিয়ে যাচ্ছি জানেন সেকথা? দুঃখে ক্ষোভে প্রভা আর বলতে পারেন না যে আমি যে হাওয়া খেতে যাচ্ছিলুম এই পরম রোমাঞ্চকর সংবাদটি তোমায় দিলো কে? পরদিন সকালে যথারীতি সদাশিব-বাবু অনুর কাছে যান প্রাত্যহিক প্রাতঃভ্রমণের তাঁর এ একটা অঙ্গ। তবে গদাই থাকলে তিনি যান না। গদাইকে সবাই এড়িয়ে চলে। তার মুখে চোখে যে উপেক্ষার ভঙ্গী থাকে তা যে কোন আত্মসম্মানজ্ঞানযুক্ত মানুষের পক্ষেই অসহনীয়। কড়া নাড়তে অনু এসে দরজা খুলে দেয় সদাশিববাবু বলেন একী রুগী স্বয়ং।

অনু বলে জানো বাবা কার্ডিওগ্রাফে কোন দোষ পায়নি। সদাশিববাবু বললেন সেতো ভালই, তাবলে তুই তরকারি কুটতে বসে গেলি। অনু ম্লান হেসে বলে তোমার জামাই বলেছে আমি যত কাজ করব তত ভালো। এইটুকু কথা বলার পরিশ্রমে অনুমার কপালে ঘাম ফুটে ওঠে। সদাশিববাবুর ভালো লাগে না জিনিষটা। বিকেলে দীপক আসে অনুকে দেখতে। পরে প্রভার কাছে এসে দীপক বলে "আচ্ছা গদায়ের বাতিক —এলুম রোগী দেখতে ওমা সে ঠাকুরঘর মুছছে। আমায় বললে জানেন দাদা আজকাল এত সহজে হাঁপিয়ে উঠি যে এইটুকু ঘর মুছতে ঘেমে গেলুম। অনু ত সহজে কষ্ট স্বীকার করে না, তাই মনে হল ওর খুব কষ্ট হচ্ছে। সেদিন চৈত্র সংক্রান্তি কলসী উচ্ছুগ্গুর আয়োজন। এর ঠিক সাতদিন বাদে অনু মারা যায় গায়ে জ্বর বুকে হাঁপ, পা ফোলা বুক ধড়ফড়। এত লক্ষণ দেখেও একজন হার্ট-স্পেশালিষ্ট আনানো গদাই প্রয়োজনবোধ করেনি। অনু বারে বার বলছে জানো গো,আমার কেমন মনে হচ্ছে যেমন আমার পায়ে জল হয়েছে না? তেমনি যেন বুকেও জল হয়েছে। এর চেয়ে ভালো করে কেউ অবস্থা বলেছে বলে প্রভা মানেন না। তবুও হার্ট-স্পেশালিষ্ট আসে না। এলো চোখের ডাক্তার, এলো শিশু-চিকিৎসক। আর একজন নাক কান গলার ডাক্তার, এর সঙ্গে পরামর্শ করে গদাই সদর্পে চিকিৎসা আরম্ভ করল। চিকিৎসা হল

মানসিক রোগের। সেদিন সন্ধ্যায় গদাই চেম্বারে বেরিয়ে যেতে প্রভা নিচে গেলেন। বিকেলে ছাদ থেকে দেখেছিলেন গদাই অনু আর বাসুদেবকে নিয়ে বেরুচ্ছে। প্রভা অনুকে জিগেস করলেন কোথা যাচ্ছিস। অনু ইসারায় বললে বেড়াতে। প্রভা নিচে যেতে অনু বললে জানো মা, ঐটুকু ঘরে এসে এত ক্লান্ত হলুম না? বাগান থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে ওর রুগী দেখার টেবিলে শুয়ে পড়লুম। ওকে আজ বলেছি মা বলছে নাইবা হল হাটের রোগ তোর কষ্ট যখন হচ্ছে একটা লোক রাখ। ও উত্তর দিলো না। আজ আমায় বলছে হিন্দুমিশনে যাবে ঠাকুর দেখতে? ঐ হিন্দুমিশন প্রভার প্রিয় কাজেই অনু যতবার যেতে চেয়েছে গদাই বাধা দিতো। আজ গদাই আগ্রহ করে সেখানে নিয়ে যেতে চায়। অসুখটা মানসিক কি না তার পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। সদাশিববাবু প্রভাকে বলেন গদায়ের অহঙ্কারই বড় হল। মানুষ পরামর্শ নেয় বড়র কাছে। গদাই যায় ছোটর কাছে। যারা বলবে আপনিই বেশী জানেন। ডাক্তাররা নিজের বাড়ীর চিকিৎসা নিজেরা করে না। অনু প্রভাকে বললে; আমি বললুম এ কাঠামোয় আর হবে না। প্রভা চমকে ওঠেন, অনু ক্লান্ত হয়ে শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে চোখ খুলে বলে আবার বাথরুমে যেতে হবে। খুকু যেতে দেয় না নিজেই বাটি দেয়। দু একবার প্রভাও দেন। প্রভা বলেন এত হাঁপাচ্ছিস আমি তোকে খাইয়ে দিয়ে যাই। কিইবা আহার। একগাল খেয়েছে কি না খেয়েছে এমন সময় গদাই এসে হাজির। বললে কী ব্যাপার, শুয়ে খাচ্ছ কেন? পালস ধরে বলে ঠিক আছে কিচ্ছু হয়নি, উঠে এসো—গদায়ের আদেশমত উঠে যায় অনু। যেন যন্ত্রচালিত পুতুলের মত। মাকে ইসারা করে ওপরে যাও। প্রভা আস্তে আস্তে ওপরে আসেন। এর পরদিন প্রভা আর স্থির থাকতে পারেন না আবার নিচে গিয়ে অনুরোধ জানান, একটা লোক রাখ অনু। এতো হাঁপাচ্ছিস কি করে সইবি? খুকু আজো প্রবল আপত্তি জানায় কিন্তু ভাগ্যগুণে গদায়ের এক ভাইঝি এসেছিল সে খুকুকে ধমক দিয়ে বলে, চুপ কর মায়ের প্রাণের কি কষ্ট তুই কি বুঝবি রে? আপনি ভাববেন না দিদিমা, আমি কাকাকে রাজী করাবো। এই মেয়েটি পিতৃমাতৃহীন স্বভাবগুণে গদায়ের মত মানুষও তাকে ভালোবাসতো। যাই হোক তার কথামত একটা সেবিকা যাকে আয়া বলে তাই ঠিক হল। কিন্তু আয়া যখন এলো তখন অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে—। বেস্পতিবার সন্ধ্যেয় খুব কষ্ট চলছে, প্রভা নিচে গিয়ে দেখে খোকন খুকু বাসুদেব মার কাছে বসে—। এত দুর্ব্বল অনু যেন ভীষণ শ্রান্ত। বললে কি খাই বলতো মা, খিদে পাচ্ছে। প্রভার একবার মনে হল ওপরে ছানা কাটানো আছে নিয়ে আসেন, আবার দেখলেন সামনে জ্বালে দেওয়া দুধে মোটা সর পড়েছে। ভাবে কবিরাজরা ত এই সব দিয়ে মকরধ্বজ খাওয়ায়। সরটা দিই অনুকে। সরটা খেয়েই অনু বলে গা বমি বমি করছে মা? কেন জানি না, কিছু দিন যাবৎ খোকন যেন আড়বোঝা হয়েই ছিল সে ভীষণ চটে ওঠে দিদিমার উপর। কেন মাকে সর খাওয়ালে? প্রভা বলতে পারেন না,কেন খাওয়ালেন। নিজেও ভয় পেয়ে যান, খানিক বাদে অনু সামলে গেল। অনর্গল কত গল্প শিশুবেলার করলো অবাক হয়ে যান প্রভা। অনু বলে সর খাওয়ার কথা তোমার জামাইকে বলে কাজ নেই মা, আমি ত সামলে গেছি। খোকনকে বলে বলিসনি রে জানিস ত রগচটা মানুষ। প্রভা বলে, নারে ওকে বলাই দরকার।

সব দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে দেয় বাসুদেব সে গেটের কাছে ছিল। গদায়ের গাড়ী ঢুকতেই সে বললো জানো বাবা, মা বমি করছিল। গদাই যখন ঘরে এলো অনু বেশ প্রফুল্ল খুব গল্প করছে সবাই। বেণু ওপর থেকে একটু মাংসভাত নিয়ে গেলো। খুব খুসী খুসী মুখে অনু খেলো। বেণুকে আদর করে বললো, তুই আবার রেঁধে এনেছিস। রাত্রে ওপরে এলেন প্রভা। কেন জানিনা সিঁড়িতে উঠতে উঠতে প্রভার মনে হল ইতিমধ্যে এতো ভালো অনুকে কোনদিন দেখিনি, একি নেব্বার আগে প্রদীপ জ্বলে উঠল নাতো? মার মন তখুনি নারায়ণ স্মরণ করেন প্রভা। পরদিন সকালে সদাশিববাবু যখন বেরুচ্ছেন প্রভা বললেন, দেখো আমার সময়

নিরুকে বলে এসো অনু ভালো আছে। পূজো করে উঠে প্রভা বাসুদেবের দুধ টেবিলে পড়ে আছে প্রভা ছাদ থেকে বাসুদেবকে ডাকেন হ্যাঁরে এখন অসিসনি কেন? মা কেমন আছে? বাসুদেব বলে ভালো নেই। তার মুখের কথা শেষ হবার আগে প্রভা নেমে যান। গিয়ে দেখেন অনুকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে গদাই সিঁড়িতে বসে কাঁদছে। একজন বৃদ্ধ ডাক্তার বেরিয়ে যাচ্ছেন গেট দিয়ে। আগেই বলেছি বিপদের দিনে চিরকালই প্রভা স্থির থাকেন। আস্তো বললেন গদাইকে কাঁদছো কেন? গদাই বললো আর ওকে বাঁচাতে পারলুম না। প্রভা বললেন কখন থেকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে? গদাই বলে রাত দুটো। প্রভা একবার শুধু বলেন আমাদের জানাওনি এক বাড়ীতে থেকে আশ্চর্য্য!

প্রভা শুশুর ঘরে ঢুকে শান্ত অনুকে দেখেন বলেন এখন আর এতে ভয় পাইনা। নিরুর কতবার এরূপ দেখলুম। অনু মাকে ইসারায় বোঝায় কষ্ট কিছু হচ্ছে না, কষ্ট কমবে বলে অক্সিজেন দিচ্ছে! প্রভা ত্বরিত চরণে বাইরে যায় পালংকে বলে তুই গেটে বোস্ বাবু এলে ওপরে যেতে দিবি না, বলবি মেজদি অসুস্থ। নিজে গদায়ের কাছে গিয়ে বলে বিপদের দিনে কি অধৈর্য্য হয়, ডাঃ ঘোষকে একবার ডাকো না তোমার মাষ্টার মশাই ত? গদাই বলে তিনি আর কি করবেন ইনি বললেন, আর একদিনও কাটবে না। তবুও প্রভা ছাড়েনা নাছোড়বান্দা যাকে বলে। তখন গদাই বলে উঁকে আজ ডাকলে আসবেন পনেরদিন বাদে। প্রভা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, না আমার বাবার বন্ধুর ছেলে উনি, পনের মিনিটের মধ্যে আসবেন। কেন জানি না গদাই রাজী হয়। প্রভা ফোন করে ডাঃ ঘোষকে ডাকেন। ভাগ্যগুণে তখুনি পেয়েও যান। ডেকে বলেন, দাদা আমার মেয়েকে অক্সিজেন দিচ্ছে শীগগির আসুন জামায়ের হাতে ফোন দিচ্ছি। গদাই বলে আমায় আবার কেন? কিন্তু প্রভা ছাড়েন না ওধারের কথা শুনতে পান না প্রভা, এধারে গদাই বলে স্যাম্পল ছিল স্যার তাই দিয়েছি, না না ওটা দেওয়া হয়নি। প্রভা আবার ভাবে হায়রে আমার কপাল! প্রভার মেয়ে স্যাম্পেলের ওষুধ ছাড়া ওষুধ খাবার ভাগ্য করেনি। আবার শোনে গদাই বলছে হ্যাঁ স্যার তাই আসুন। ততক্ষণে সদাশিববাবু এসে গেছেন। রেণুর কাছে আর নিরুর কাছে খবর পাঠিয়ে প্রভা অনুর কাছে এসে বসেন। অনু শান্ত হয়ে শুয়ে আছে এতক্ষণে সেবিকা এসে পৌঁছুল সে ত অক্সিজেন দেওয়া রুগী দেখে ভয়েই অস্থির।

ডাঃ ঘোষ এলেন। অনুর মুখে কি আনন্দের হাসিই ফুটে উঠলো। বাঁচবার আশায় কি মার কথামত গদাই ডাক্তার আনায় কেঙ্গানে। ডাক্তার রুগী দেখে পাশের ঘরে এসে বলেন ও কার্ডিওগ্রাফ ঠিক হয়নি। এইভাবে তুলতে বলো দোষ ধরা পড়বে। প্রভাকে সরিয়ে দেন। বলেন মেয়ের কাছে যাও। যেতে যেতে প্রভা শোনে হার্ট ফেলিওর চলছে। ডাক্তার চলে যেতে গদাই বলে কই ডাক্তারকে ফী দিলেন না? প্রভা বলেন উনি ফী নেন না। পরে যাহোক দোব। এই সময় সেই শিশু-চিকিৎসক আসে লাফাতে লাফাতে। গদায়ের চেম্বারে বসে সে। বলে বাঃ চমৎকার পালস চলছে। আর যত সব মহারথীরা বলে গেলেন বড় বড় কথা যত সব রদ্দিমাল। প্রভার ইচ্ছে করে ঠাস করে এক চড় মারে তার গালে। বহু কষ্টে সংযত করে নিজেকে। ইতিমধ্যে তটিনী ষ্টাফ নার্স হয়ে উঠেছে ষ্টিকিন প্লাষ্টার কাটছে আর যত্র তত্র লাগিয়ে অক্সিজেনের নল বসিয়ে দিচ্ছে। অনেক অক্সিজেন দেওয়া প্রভা দেখেছে। প্রভার ঠাকুর-দাকে আট দিন ধরে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছিল। বাড়ীর লোকেরা ক্রমান্বয়ে ধরে থেকেছেন এযেন হাসপাতালের ব্যাপার। দুপুরে আবার সেই কার্ডিওলজিষ্ট আসে। তাকে ডাঃ ঘোষের কথামত ছবি তুলতে বলতে দোষ ধরা পড়ে। সেই ছবি নিয়ে প্রভা সদাশিববাবু রেণুর স্বামীর সঙ্গে যান ডাঃ ঘোষের কাছে। ডাঃ ঘোষ বলেন দাঁড়াও গদায়ের সঙ্গে কথা বলি—এধারের কথা শোনা যায়, সেকি ওষুধ এখনও পড়েনি? কেন আমি এগারোটায় গেছি এখন চারটে বাজে ওষুধ দাওনি কেন? এখন প্রতিটি মিনিট মূল্যবান আর পরীক্ষাগুলো

আজ করিয়ে নিও দেরী কোর না রাতে বিপদ আসলে আমরা কারুর সাহায্য পাবোনা। প্রভা জিগেস করে আমার মেয়ে বাঁচবে ত? ডাঃ ঘোষ বলে না বাঁচার কথা ত নয়। প্রভা বলেন, ওটা কি বেরিবেরি? ঘোষ বলেন তা বেরিবেরির চিকিৎসাইবা আমরা কি করেছি? শান্ত মানুষএর চেয়ে বেশী বলা তাঁর স্বভাব নয়। প্রভা আশ্বস্ত হয়ে ফিরে আসেন। ডাঃ ঘোষ লিকুইড ডায়েট দেন কিন্তু কার্ডিওলজিষ্ট বলেন, আপনি ত বেশ ভালো আছেন, রুটি টোষ্ট খান সেই রুটি খেতে গিয়ে কষ্ট খুব বেড়ে যায়। সেই বৃদ্ধ ডাক্তার আবার আসেন। কার্ডিওলজিষ্টের ওষুধের প্রতিবাদ করেন বলেন, অত পেসার লো—এ্যাসিড্রেক্স দিও না বেহুঁশ হয়ে যাবে। কিন্তু হায়রে গদায়ের অহঙ্কার! সে না শুনলো ঐ বৃদ্ধের পরামর্শ, না শুনলো ডাঃ ঘোষের কথা। শিশু-চিকিৎসক আর কার্ডিওলজিষ্টের চিকিৎসাই হচ্ছে আর তিনি অভয় দিয়েছেন। রাত্রে প্রভা অনুর ঘরে রইল। গদায়ের তাতে ঘোর আপত্তি। অনু ইসারা করে বলছে নেয়ারের খাটি পেতে মার বিছানা করে দাও। গদাই বললো, না এঘরে বিছানা করা চলবে না। অনু বললো মা আমার পাশে শুক। গদাই বললো, না আমি শোব। বিব্রত হয়ে বলেন কিছু করতে হবেনারে, আমি তোর পায়ের কাছে বসে থাকবো।

সেই রাত্রের কথা আজো ভাবলে প্রভা পাগল হয়ে যান—বিছানায় শুতে গেলেই সেই দৃশ্য মনে পড়ে। অনু বসে বসে হাঁপাচ্ছে গদাই উপুড় হয়ে পড়ে ঘুমুচ্ছে। অনুর পায়ের কাছে বসে প্রভা—অর্দ্ধেক রাত প্রভা আর অর্দ্ধেক রাত অনুর বাপ-মা-মরা ভাসুরঝি। সে যে কি অবর্ণনীয় কষ্ট যে না দেখেছে সে বুঝবেনা। বহু মৃত্যু প্রভা দেখেছে, এমন কষ্টকর মৃত্যু কখন প্রভা দেখেনি, অথচ আশ্চর্য্য, একবার গদাইকে সে ডাকলো না, বললো না ওগো আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। মৃত্যুর জন্য এমন শান্ত প্রতিক্ষা জীবনে দেখেনি। আশ্চর্য্য হয়ে প্রভা দেখলো নিশ্চিন্ত হয়ে গদাই ঘুমুচ্ছে। অনুর পা হাঁটু অবধি বরফের ভয়পেয়ে প্রভা গদাইকে ডাকে। অনুকে অবিশ্যি বলে খাল ধরা মানে জানিস না, খাল ধরবে কেন? কিন্তু ঘুম ভেঙ্গে গদাই রেগে যায়, বলে ঠাণ্ডা বলবেন না তাহলে এ ঘরে আপনাকে থাকতে দিতে পারব না। ভয়ে প্রভা কথা বলেন না। গদাই বলে সরে বসুন, আপনি গায়ে হাত-টাত বোলাবেন না।

প্রভা যেন জড় পদার্থ। অনু বলছে কি করি বলোত মা? প্রভা না দিলেন একটু হরলিক করে না দিলেন পায়ে একটু গরম জলের সেক। না দিলেন একফোঁটা ইপিকাক। শুধু ভয় পাছে ঘর থেকে বের করে দেয়। এখন প্রভা ভাবেন আর ভাবেন, কি ক্ষতি হত যদি ঘরে না থাকতেন? কি লাভ হল থেকে? শুধু এই চির জীবন সেই রাতের সঙ্গী সেই রাত্রের মরণাধিক যন্ত্রণার দৃশ্য মানসপটে আঁকা ছাড়া? সব কষ্টেরই শেষ আছে—।

সকাল হল, প্রভার মনে আশা—গদাই বলেছিল রাত কাটবে না, অনু যেন একটু শান্ত। বললে আমি একটু চা খাবো। আনন্দে প্রভা বললেন আমি ওর জন্যে চা করে আনছি। চায়ের জল চড়িয়েছেন অমনি ফোন এলো অনুর খবর নিচ্ছেন একজন। সদাশিববাবু চা করলেন। অনু বাবার হাতের চা খুব ভালোবাসতো সেই চা বসে বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলো। প্রভা উৎফুল্ল হয়ে গদায়ের কাছে গিয়ে বললো রাততো কেটে গেল, আরতো ভয় নেই। গদাই প্রশান্ত স্বরে বললো আজ আর কাটবে না দিন। আপনি ওপরে গেছলেন চোখটা কেমন হয়ে গিছলো না তটিনী? তটিনী বললে হ্যাঁ আমি ত তাই ভাবছি মামাবাবু না থাকলে এমন রোগের চিকিচ্ছে কে করত?

প্রভা ব্যাকুল হয়ে বলে তবে একবার ডাঃ ঘোষকে ডাকলে কি হয়? গদাই বলে ডেকে লাভ নেই তাঁর ওষুধ আমি দিইনি। প্রভা আকাশ থেকে পড়েন ওপরে এসে ঠাকুরঘরে লুটিয়ে পড়েন। বলেন ঠাকুর ধৈর্য্য আমায় তুমি প্রচুর দিয়েছ, আজ শুধু তোমার কাছে চাইছি

শান্ত পায়ে প্রভা অনুর ঘরে যান। ওমা অন্ধকার ঘর একা অনু শুয়ে। ছেলেমেয়েরা ঘরথেকে চলে এসেছে। প্রভা ঘরে যেতে যায় তটিনী বারণ করে, মা ঘুমুচ্ছে দিদিমা যেওনা। প্রভা বারণ না শুনে যান। আসে নিরু, অপুর নিরুর মেয়ে। অত কষ্টর মধ্যেও অনুর রসিকতার সীমা নেই। বলে নাতিকে জানলি না হৃদয়ের ব্যাপার। মাকে বলে ভাগ্যে অসুখ করেছিস কত আদর পেলুম মার! এবার কষ্ট দ্রুত বাড়ে। শেষ মার সঙ্গে কথা বলে। প্রভা মাথায় হাত বুলুচ্ছেন আর বলছেন নারায়ণ "বলে এই ত ঠিক কথা মৃত্যু" বলেই সদাশিব-বাবুর দিকে চেয়ে থেমে যায়। বাসুদেবকে বলে তোর বাবাকে ডাক্। বল আমার ভেতর থেকে কেমন কাঁপুনি আসছে। প্রভা আবার যান বলেন গদাই একবার চলো। গিয়ে দেখেন গদাই শুয়ে নিজের কপালে অমৃতাঞ্জন ঘসছে। প্রভা বলেন গদাই তোমায় অনু ডাকছে। গদাই বলে ও দৃশ্য আমি দেখতে পারব না। প্রভার ঠোঁটের গোড়ায় আসে আমি পারছি ওর বাপ পারছে ওর সন্তানরা পারছে শুধু তুমি পারবে না। কিন্তু সংযত হয়ে বলেন, এখন আমাদের কথা ভাবার সময় নয় গদাই, এখন শুধু অনুর কথা ভাবো। অগত্যা ঘরথেকে বেরোয় গদাই। গেটের কাছে মিঃ ধর বলে কি খবর মিসেসের? প্রশান্ত হাস্যে গদাই বলে বাঁচানো গেল না। ধর চমকে ওঠে। বলে সেকি মশাই, আজকালকার যুগে সারবে না একি কথা। প্রভা আর পারেন না গদায়ের হাত ধরে বলেন ডাঃ ঘোষের ওষুধ না হয় নাই দিলে, তুমি যে বুড়ো ডাক্তারকে এনেছিলে তাঁকেই আনো। গদাই বলে আজকে ও ঐ কার্ডিওলজিষ্টকে পাওয়া যাচ্ছে, কাল বুড়োকে আনবো। রাগে দুঃখে ক্ষোভে প্রভার কান্না পায়। লোকে এ সময় একটা ছেড়ে পাঁচটা ডাক্তার আনে। আর এ কি না বলে আজকে থাক? অথচ নিজেই বলছে আজকের দিন কাটবে না। তবু তুতিয়ে বাতিয়ে গদাইকে অনুর কছে নিয়ে যান। জানি না হয়ত কিছু বলার আছে স্বামীকে। জীবনের কোন সাধইত মিটলো না মেয়েটার। গদাইকে অনুর সামনে দিয়ে প্রভা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। আবার পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে নিরুর কাছে দাঁড়ান অনুর পিঠের দিকে। শোনেন গদাই বলছে কেন তোমার ত কোন কষ্ট নেই। অনু চোখ দুটো বড় বড় করে বললো "জানো না আজ ছাব্বিশ দিন আমার কি কষ্ট? তুমি জানোনা সে কষ্ট বলে বোঝান যায় না—" গদাই থিয়েটারি ঢংএ অনুর হাতটা তুলে তাতে একটা চুমো খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দেয়। অনু বলে ডাক্তারকে বলবে ত? পাছে আমি শুনি তাই দরজা ভেজিয়ে দিলো। ও হরি হরি বসার ঘরে বসে সাদাশিববাবু শোনেন, গদাই ফোন করছে। ডাক্তারকে বলছে, বলছে ত কষ্ট কতদূর কষ্ট কতদূর সাইকোলজিকাল কে জানে? একথা শুনলে কোন ডাক্তারই বা আসে, তায় বিনা ফী এর ডাক্তার! ডাক্তার এলো না। আজো প্রভা ভাবে, গদাই নাহয় অবুঝ। নিজের অহঙ্কারই ওর বড় হল কিন্তু খোকা খুকু কেন একবার বললোনা, বাবা তুমি ত বলছো মা বাঁচবেই না। লোকে এখন সাপের বিসও দেয়। ডাক্তার ঘোষ যখন বলছে নিশ্চয় সারবে তার ওষুধ একবার দিয়ে দেখো না। অদ্ভুত পিতৃভক্তি তাদের, পরশুরামকেও হার মানায় যেন। আর তটিনী মাসীবাবুর অদ্ভুত চিকিৎসার মূর্তিমতী বিজ্ঞাপন হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। প্রভা আবার ওপরে গেলেন। হার্টের যন্ত্রণার একটি হোমিওপ্যাথিক টনিক তার জানা ছিল সেটি আনতে। ডাঃ ঘোষ আর সেই বৃদ্ধ ডাক্তার চিকিৎসার বিষয়ে একমত—। যে হার্টেও জল জমেছে, এ সময় কবিরাজী মতেও জল বন্ধ করা উচিত। প্রভার বাবা রামবাবু হার্টের অসুখে মারা যান। তাঁকে যখন কবিরাজ জল বন্ধ করেছিল জ্যৈষ্ঠমাসে সে কি কষ্ট। আজ অনুমা মরণের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দুজন বিজ্ঞ ডাক্তারই বলে গেলেন জল দেবেন না নয়, যেটুকু না দিলে নয় দেবেন। কিন্তু একবার কার্ডিও-লজিষ্টকে ডেকে গদাই পরিবারকে জীপগাড়ী করে জয়-নগরে পাঠিয়েছিল। কার্ডিওলজিষ্ট রসিকতা করে বলেছিল বৌ হিল্লি দিল্লী করছে আর তুই কি না বৌ-এর জন্য পাগল। চতুর গদাই ঐ বৌ-পাগল নামটি প্রচার করার আশায় কার্ডিওলজিষ্টের হাতেই অনুকে রাখলো। কারণ যাতে ডাক্তারমহলে তার স্ত্রী যে অবহেলায়

অচিকিৎসায় মারা গেছে একথা না জানা যায়। প্রভা ওষুধ নিয়ে নেমে দেখেন অনু হাঁসফাঁস করছে। তাকে নাকি জোর করে এক গেলাস ডাবের জল খাওয়ান হয়েছে। প্রভা ওষুধটি খাওয়াতে যেতেই খোকন তার হাত ঠেলে দিলো বললো এখন দিওনা—অনু চোখ চেয়ে মার হাত থেকে সেই ওষুধ নিজে হাতে করে খেলো। বোধহয় মাকে তৃপ্তি দেবার চেষ্টায়। আবার এলো সেই কার্ডিওলজিষ্ট আর শিশু-চিকিৎসক যাদের মতে অনু দিব্যি আছে। প্রভা বৃহৎ পরিবারের কন্যা ও বধূই শুধু নন, চিরদিনই মানুষের বিপদের দিনে বুক দিয়ে পড়া তাঁর অভ্যাস। মৃত্যু তিনি কম দেখেন নি। কিন্তু এমন কষ্টকর মৃত্যু আর এমন গদায়ের মত গদাইলস্করি চালে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা তিনি কখনও দেখেন নি। লোকে কথায় বলে যমে-মানুষে টানাটানি। কিন্তু এযেন আগে-ভাগে তার জন্ত নৈবেদ্য সাজিয়ে বসে আছে। কার্ডিও-লজিষ্ট ডাক্তার ওষুধ দিলেন না। ছেলেকে বললেন মুখে জল দাও—মার। সে জলও অনুমা নিজে হাতে ধরে খেলো, খোকার হাত কাঁপছে। আজ প্রভা ভাবেন ডাক্তার যে শেষ পর্য্যন্ত ওষুধই দেবে কত মৃত্যুমুখে পতিত রুগীর প্রভা দেখেছেন ওষুধ মুখে দিলো কস বেয়ে পড়ে গেল। এ কি ডাক্তার? আগে থেকে হাল ছেড়ে বসে আছে? এরপর অনুমার মুখখানি বেঁকেচুরে কিরকম হয়ে যেতে লাগলো। ছেলেমেয়ে হাহাকার করে উঠলো। প্রভা নিস্তব্ধ অপলক দৃষ্টে সেই মুখখানির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে তখন সমুদ্রের তোলপাড়! ঝড় উঠেছে। এই দিনের কথা প্রভার ডায়রীতে লেখা হল বহুদিন পরে—

এই আসে এই যায় তাই যদি জগতের রীতি?
তবে কেন মার বুকে দিয়েছিলে এত স্নেহ প্রীতি?
হৃদয় কমল সম বক্ষে ধরি কত দীর্ঘ দিন!
কাটায়েছি কত দুখে কত রাত্রি হল নিদ্রাহীন।
সেই মুখ চেয়ে চেয়ে কেটে গেছে ভয়ে ভাবনায়,
মুহূর্ত্তে টুটিল বৃন্ত উঠে রব নাই নাই হায়।
অসহায় নিরুপায় পিতা মাতা ভূমে লুটে পড়ে,
জানিনা নিয়তি তোমা আঁখি হতে বারি কি না ঝরে?
ব্যর্থ হল জীবনের যত কিছু দীর্ঘ আয়োজন,
ব্যর্থ হল প্রাণভরা সংগ্রহের যত প্রয়োজন।
শ্মশানভূমিতে দোঁহে বসি আজ চাহি দোঁহা পানে,
কি ভাষায় কবে কথা? দুজনেই মনে টেনে আনে!
শুধু একখানি মুখ শিশু হতে ধীরে বড় হয়!
তারি কথা তারি কথা আর জানি কোন কথা নয়!
ভুলে যায় ইষ্ট মন্ত্র ভুলে যায় মধু হরি নাম,
ভুলে যায় সব কিছু শুধু সেই প্রাণের আরাম!
ছত্রিশ বছর ধরি তিলে তিলে যারে বড় করি
সে যে নাই এই কথা ক্ষণতরে কেমনে বিস্মরি?
সংকল্প বিকল্প হল কিছু আর নাহি করিবার
হেরি দীর্ঘ যাত্রাপথ শিহরিয়া উঠে বার বার
সাধ ছিল নেহারিয়া শুধু ওই মুখ কয়খানি
শেষ আঁখি নিমীলিত হবে মনে এই আশা বাণী
ডুবিল উদিত সূর্য্য মুছে গেল ধরণীর সব
স্তব্ধ হল তুচ্ছ যত চারিধারে কল কলোরব।
পিতামাতা দুই জনে ব্যর্থ মানে আপন জনম
কী যে লজ্জা বাঁচিবার কী যে দুঃখ অসহ সরম
মাতৃহারা সন্তানেরা আকুল নয়ন মেলি চায়
বলিবার নাহি ভাষা সে ক্ষতির পরিমাণ হায়
অসহায় মাতৃশক্তি রক্ষিবার শক্তি নাহি যার
নিরুপায় পিতৃত্বের বুকভরা শুধু হাহাকার
জ্বলিছে দারুণ চিতা মেলি তার সহস্রেক দল
শুধালো করুণাসিন্ধু চোখ বলো কোথা পাবে জল।
প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জননীর ব্যাকুল প্রার্থনা,
সকলি বিফল হল জীবনের যত আরাধনা।
আপন নামেরে মাগো সার্থক করিলে যোগাসনে!
অপূর্ব্ব সে ব্রত তব ধৈর্য্যমনে বিস্ময় যে আনে।
মৃত্যু কষ্ট বিসরিয়া ভাবিলে মা সকলের কথা,
অটুট তোমার ধৈর্য্য ক্ষণতরে নাই অধীরতা।
তপস্যা ও যোগবলে ঋষিগণ তেয়াগিত দেহ,
মনে হয় তুমি মাগো সেই গোত্রে তাহাদেরি কেহ।

যন্ত্রণায় নীল হল সর্ব্বদেহ তবু শান্ত হয়ে,
পিতামাতা দোঁহে স্মরি সে যন্ত্রণা বহিলে মা সয়ে।
পরিণাম হেরি মাগো খুঁজি মনে ত্রুটি শত শত,
মনে হয় বারে বারে করিবার আরো ছিল কত;
যন্ত্রণার নিবারণে নিরুপায় দর্শকের স্থানে
মা হইয়া বাঁধা হাত রহিলাম কি কঠিন প্রাণে।
আজ নিশি বিভীষিকা ভাসে চোখে সে যাতনা
স্মৃতি
এই যায় এই আসে তাই নাকি ধরণীর রীতি।

এই মুহূর্ত্তেও প্রভা তাঁর চিরদিনের কর্ত্তব্য ভুলে যান নি—শান্ত হয়ে যেমন হরিনাম শোনালেন অনুমাকে, তেমনি তার মৃত্যুর পর গদাইকে বললেন, আমার তিনটি সন্তানের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ সেইটি তোমায় দিয়েছিলুম—শেষ বললেন না তুমি রাখতে পারলে না।

একবার শুধু অনুমার দেহখানি জড়িয়ে বললেন "আমায় সঙ্গে নে মা নিয়ে চল" তারপর সদাশিববাবুকে দেখে স্থির হয়ে গেলেন। মেয়ের মাথায় হাত রেখে আশীর্ব্বাদ করলেন তিনি, যিনি মেয়েকে না দেখে থাকতে পারবেন না বলে বিদেশে ভালো ভালো পাত্র পেয়েও বিয়ে দিতে পারেন নি। তিনি আজ মেয়েকে বিদায় দিচ্ছেন চিরদিনের মত। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রভা বিচলিত হলেন, বললেন, তুমি আবার এখানে কেন? চিরকালই সংসারের দুঃখ কষ্ট থেকে সদাশিববাবুকে সরিয়ে রাখাই ছিল প্রভার ব্রত। আজ এ অবস্থায় তাঁকে দেখে কি যে করবেন ভেবে পান না। নিরুকে বলেন নিয়ে যা—এই প্রথম—বোধহয় প্রথমই সদাশিববাবুর প্রভা কথা শোনেন না। নিরুর হাত ছাড়িয়ে বাসুদেবের কাছে গিয়ে বসেন। গদাই দ্রুত হাতে শেষ আয়োজন করতে লাগলো যেন প্রস্তুতই ছিল। এবার প্রভা গদাইকে বললো, গদাই একটা কথা আমার রাখো। আজকের রাতটা অনুকে আমার কাছে থাকতে দাও। গদাই এক কথায় জবাব দিলো সে হয়না। কেন হয়না তা প্রভা বোঝেন না। বাসি মড়া ভেবে যদি আপত্তি হয়, না হয় শেষরাতে নিয়ে গেলেও হয়।

তাছাড়া যে মানুষ ছেলের পৈতের বছরে বিদেশে নিয়ে গিয়ে তাকে মুর্গি খাওয়ায় সে আজ এত হিন্দুয়ানীর আমদানি করলো কেন?

ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে মৃতদেহ খানিকক্ষণ রাখতেই হয়। যদি আবার প্রাণ ফিরে আসে। মিরাক্‌ল্‌ও ত হয় অনেক সময় কিন্তু গদাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কি মন্ত্রে সে খোকনকে বশ করলো জানি না। নিজে হাতে করে অনুর সব চুড়ি খুলে গুণে গুণে খোকনের হাতে দিলে—নিপুণ হাতে কানের হীরের ফুল খুলে নিলো। খোকা খুকুর জীবনে মৃত্যুর দৃশ্য হয়ত এই প্রথম কিন্তু বাকি সবাই অবাক হয়ে গেল গদায়ের এই আসল রূপটি দেখে—সচরাচর মৃত স্ত্রীর অলঙ্কার খোলাতে বাধা দেয় স্বামীরাই—ঐদিনে প্রভার এক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন তিনি কাশীবাসিনী, তিনি বলেন অমিত মনি-কর্নিকার কাছেই থাকি ভাই, এসব অনেক দেখেছি, তবু তোমার জামাই গদাই যা দেখালো তা কখনো দেখিনি। কিন্তু তখনও দেখার অনেক বাকি ছিল। প্রভার মনে পড়ে তার সইএর মেয়ে চুড়ি পরতে চেয়েছিল কিশোরী বালিকা হাতে রুলিই ছিল।

হঠাৎ ডিপথিরিয়া হয়ে সেই মেয়ের মৃত্যু হয়। সইএর স্বামী পাগলের মত দোকান থেকে সোনারচুড়ি কিনে এনে পরিয়ে দেন। প্রভার ভাইকে হীরের বোতাম হীরের আংটি পরিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিল প্রভার কাকীমা। শেষে হাতের রূপোর নোয়াটি যখন খোলে, প্রভা বাধা দিলেন। বেণুব্রত করে দিয়েছিল বলে বড় আদরের জিনিষ ছিল অনুমার কিন্তু গদাই শুনলো না। সবচেয়ে আশ্চর্য্য যে স্মৃতি বলে নিলো না তাহলে লোহার নোয়াগুলোও নিতো। হাতে রইল লোহার নোয়া আর প্রভার বড় আদর করে পরানো শাঁখা ও রুলি লাল কড়ের। এরপর শেষ সাজানোর জন্য প্রভা তাঁর লালপাড় বেনারসী নিয়ে গেলেন। গদাই বললো থাক্ এখন চিতায় দিয়ে লাভ কি, তার চেয়ে খুকুর বিয়েতে দিলে কাজে লাগবে। প্রভার ইচ্ছে ছিল নিজের হাতের চুড়ি খুলে পরিয়ে দেবেন অনুমাকে কিন্তু পাছে আবার খুকুর বিয়ের জন্য থাকে ভেবে নিরস্ত হলেন।

বাঁশের খাটিয়ায় তোষক দেওয়া বৃথা সেকারণ অনুর গায়ে জড়ানো চাদরখানা খুলে গদাই পেতে দিলো। মায়ের বসার ঘরে খাটের ওপর একখানা লাল রং-এর মুগার বাক্স করা কটকী বেডকভার ছিল, প্রভাই পুরী থেকে এনে দিয়েছিল। খোকনের এক বন্ধু সেটা তুলে খাটিয়ায় পাততে গেলো, হাত থেকে কেড়ে নিলো গদাই।

প্রভার মনে পড়ে রামবাবুর মৃত্যুর দিনের কথা, ডাঃ মল্লিক রামবাবুর বন্ধু ডাঃ বক্সীকে জড়িয়ে শুয়েছিলেন। দুজনের বেদনা এক সেই দৃশ্য চিরদিনের মত প্রভার মনে আঁকা। সত্যিই ডাঃ বক্সী এরপর মারা যান। এ আঘাত সইতে পারেন নি। আজ কিন্তু গদায়ের দেটোয়ার দলের মধ্যে এমন একজন মানুষও ছিল না যারা প্রভা বা সদাশিববাবুর এই নিদারুণ আঘাতে একটু ব্যথিত হলো না।

প্রভা বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। হঠাৎ কানে গেল গদাই বলছে, শুধু কমলালেবু আর ছানা ওতে পেট ভরবে কেন? ঐ কমলালেবু নিরু এনেছিল' অনুর জন্যে আর ছানা প্রভা নিজে হাতে কাটিয়েছে অনু খাবে বলে। আবার গদায়ের কথা কানে যায় কলাটলা নেই? আচ্ছা রসগোল্লা আনাও। কে যেন একহাড়ি রসগোল্লা আনলো। এবার শববাহীর আগমন হচ্ছে। এলো নিরুর জামাই, এলো প্রভার ভাইরা— সবাই সবে অফিস থেকে ফিরেছিল অফিসের পোষাকেই এসেছে—এসেছে বেণুর বরও তাদের কারুকে না ডেকে গদাই একমনে খেতে লাগলো—প্রভা ভাবলো না ডেকে ভালোই করেছে। এ অবস্থায় এমন খাওয়া গদাই ছাড়া কেউ খেতে পারবে না।

এর পর আধঘণ্টার মধ্যে ওরা চলে গেলো অনুমাকে নিয়ে—এমন সময় ফোন আসে। সেই বুড়ো ডাক্তার ফোন করছেন, বৌমা কেমন আছে গদাই ত খবর দিলো না। যাবার আগে প্রভা নিজে হাতে অনুমাকে আলতা পরিয়ে দিলো শেষবারের মত। ভালো করে অনুর কাপড়চোপড় ঝেড়ে গদাই দেখে নিলো কিছু নিয়ে পালাচ্ছে কিনা অনু। ঘৃণায় শিহরিত হলেন প্রভা। মনে হয় কোন চোর ঝি চাকরকে তাড়ানোর সময়ও মানুষ অতটা নির্লজ্জ হতে পারে না। লজ্জিত হলেন প্রভা নিজের আত্মীয় পরিজনের সামনে। পরে শ্মশানের কথার মধ্যে তিনি শুনলেন এক শববাহীর কাছে যে বন্ধুর গাড়ীতে গদাই আর খোকন গিয়েছিল। খোকন সেখানে পাগলের মত কান্নাকাটি করেছিল কিন্তু গদাই চিতার তাপ বাঁচিয়ে দূরে বসে বন্ধুর সঙ্গে রসালাপে মগ্ন ছিল। যে প্রভাকে কথাগুলি বলে সে নবীন যুবক তার মনে ঘটনাটি বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল।

এধারে তটিনী দ্রুতপদে রঙ্গালয়ে আবির্ভাব করলো। তিনটি সদ্য মাতৃহারা জ্ঞানহীন ছেলেমেয়েকে তার বাক চতুরীতে বুঝিয়ে দিলো। প্রভা ও সদাশিব যে কান্নাকাটি করছেন না এটা একান্তই নিষ্ঠুর হৃদয়হীনের ঘটনা। কিন্তু গদাই যে শান্ত হয়ে খাওয়াদাওয়া করছে এটা তার বিজ্ঞ ও সন্তানদের প্রতি কর্তব্যের পরিচয়। তটিনীর উদ্দেশ্য খুব সহজ। যাকে সাদা কথায় বলে আলুথালু করে দে মা লুটেপুটে খাই। অনুর চাবির গোছা কোমরে ঝুলিয়ে সে গৃহকর্ত্রী হয়ে বসলো। বিস্মিত প্রভা দেখলেন যে সতর্ক গদাই অনুর কাপড়চোপড় ঝেড়ে নিয়ে তবে ছেড়ে ছিল শ্মশানে পাঠানোর আগে। সেই গদাই কিন্তু তটিনীর চাবি নেওয়ায় কিছু আপত্তি জানালো না। এর আগেই ঝি-মহলে গুজব উঠেছিল "কে জানে মেয়েটা গুণতুক জানে কি না? অমন জলজ্যান্ত মানুষটাকে নিজে বাড়ী নিয়ে গিয়ে কর্পূরের মত উবিয়ে দিলো বাপু? আবার রোজ নাকি কালিপূজো করাত? জামাইবাবুর মত রাগী বদমেজাজী মানুষ ওর কথায় ওঠে বসে। ছুঁচ হয়ে এসে এ যে ফাল হয়ে বেরুল" কথাগুলো প্রভার কানে যায়। মনে মনে বারণ করেন তিনি এসব কথা বোল না—তবুও কথাগুলো তার মনের মধ্যে কাজ করে। প্রভার পিসীমা বলেন "তুই বাছা সব মানিনা বলে উড়িয়ে দিলে কি হবে, ওসব বশীকরণ গুণতুক আছে

বৈকি।” প্রভা বলেন থাকুক আমার শোনার দরকার নেই। তবুও প্রভা নিস্তার পান না পাড়ার লোকের কাছে। জনে জনে উত্তর দিতে হয় হার্টের রুগী একরাত্ত রাখা হল না কি উত্তর দেবেন প্রভা, কেমন করে বলবেন মেয়ে তিনি বিক্রী করেছিলেন তার এটুকু কথাও গদাই রাখেনি। আজ আবার মনে পড়ে গদায়ের বাবা প্রসন্নবাবুর কথা কখনো ভুলো না গদাই অনুমার বাবা তোমার দুর্দ্দিনের আশ্রয়দাতাই শুধু নন, অন্নদাতাও। ভাবেন প্রভা তিনি কি আজ সব দেখতে পাচ্ছেন।

আগের রাত্রে প্রভা ছিলেন অনুমার কাছে। এরাতে রইলেন বাসুদেবের কাছে। তাঁর অনুমার চোখের মণি অঞ্জননিধি বাসুদেব—আজ বাসুদেব মাতৃহারা। আজ কি প্রভার নিজের কথা ভাবার অবসর আছে? সারারাত্তি দুজনে অনুর কথা কইলেন। সকালে ওদের ফিরে আসার আগে নিরু নেমে এলো ওপর থেকে। বললো আর নয় মা, এবার ওপরে চলো। বাসুদেবের হাত ধরে প্রভা ওপরে এলেন। একগ্লাস দুধ ঢেলে বাসুদেবকে খাওয়ালেন। তারপর আর কি যেন দিতে গেলেন। বাসুদেব বললো আজ বোধহয় আমার ওসব খেতে নেই দিদিমা—বুকের ভেতর যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠলো। বসে পড়লেন চেয়ারে। বাসুদেব নেমে গেল নিচে দিদির কাছে।

আবার উঠলেন প্রভা। খোকন—তাঁর খোকন যে আজ কি খাবে ভেবে পান না। সামনে দুধের হাঁড়িতে সব ছানার জলটা ঢেলে দেন। খোকন ছানা খাবে। ছানায় তো দোষ নেই। নিরু এসে মার হাত ধরলো। বললো বুকে অত হাত বুলুচ্ছো কেন, কষ্ট হচ্ছে? প্রভা বললেন, না ও কিছু নয় হাত ছাড়। নিরু ব্যস্ত হয়ে হট-ওয়াটার ব্যাগ খুঁজলো। কে যেন বললো নিচে দেওয়া হয়েছিল। নিচেয় নিরু যেতে খোকন ছুটে এলো ওপরে। দিদিমাকে ধরে বললো তোমার আবার কি হল? তখন ছানা ছাঁকছেন প্রভা। বললেন কি আবার হবে আমার? ছানাটা খোকনের হাতে দিয়ে তার মনে পড়ে যেদিন কাকা মারা যান তার শিশুপুত্র বলে প্রভা যাকে বুকে করে কেঁদেছিলেন সেই অমৃত কুড়ি বছরের ছেলে। আজ বাসুদেব তার শিশু বাসুদেবকে এই সাজে সাজতে হবে? হায় অদৃষ্ট, এও বাকি ছিল? প্রভার এই বিচলিত ভাব সদাশিববাবুকে ব্যাকুল করে। তাঁর হাতে একটি মাত্র অস্ত্র ছিল চা। কি বলবেন প্রভাকে কি বোঝাবার আছে যার সন্তান অচিকিৎসায় অনাহারে আজ শেষ হয়ে গেল? ঐ মেয়েদের অসুখে কখন পান থেকে চুন খসার উপায় ছিল না যেখান থেকে পারো নিয়ে এসো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ডাক্তার, নিয়ে এসো সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ। আজ সেই মা সন্তানহারা বাচ্চাচাকর পালংকে বলেন মাকে চা দে দিখি। চাকর যথারীতি রুটি টোষ্ট চা এনে প্রভার সামনে ধরে দেয়। প্রভা নীরবে চায়ের কাপ তুলে নেন অনাদৃত রুটি প্লেটে পড়ে থাকে। নেশার জিনিষ। ঐ একটি মাত্র নেশা শেষ জীবনে ধরেছিলেন প্রভা, সে চা। পান জর্দ্দা এসব খাওয়ার সখ ছিল না। সময়ই বা কই। চা দিনে পাঁচ-বার হয় সদাশিববাবুর জন্য। শেষবয়েসে ক্লান্তি-নিবারণের পন্থা হিসেবে চাকে গ্রহণ করেছিলেন প্রভা। সেই চাও আজ মুখে বিস্বাদ লাগলো। তবু সদাশিববাবুকে তৃপ্তি দেবার আশায় সেই চা গলাঃধকরণ করলেন প্রভা। এমন সময় এসে দাঁড়ালো তটিনী। বললো কম্বলের আসন আছে দিদিমা? কম্বলের আসন। কম্বলের আসন শ্মশান থেকে ফিরে এসেছে যারা তারা জল খাবে সেই আসন খুঁজে দিতে হবে প্রভাকে। উঃ উঠে পড়েন। প্রভা তটিনী বলে না না আপনি আরাম করে চা খাচ্ছিলেন উঠলেন কেন আমি খুঁজে নিচ্ছি। প্রভার কানে আরাম কথাটা যেন ব্যঙ্গ মনে হয়। বলেন না খাওয়া হয়ে গেছে। তটিনী বলে সেকী রুটি মাখন খাবেন না? মনে হল তটিনীর ঠোঁটের কোনে যেন বিদ্রূপের হাসি।

আবার সংঘাত এলো বালিশটাকে সুত্র করে। অনুমার শেষ দুদিন অনেক বালিশ লেগেছিল ঠেস দিয়ে

দুটি ভেলভেটের বালিশ প্রভা করিয়েছিলেন তাতে রেশমের ওয়াড় এমব্রয়ডারী করা। ফুল লতাপাতা এঁকে দিয়েছিল অমুমাই। সেলাই করেছিল প্রভার ভাজ। বালিশ দুটি প্রভা করিয়েছিলেন যদি কোনদিন তাঁর গুরু এসে কীর্ত্তন করেন এই আশায়। সেই নরম বালিশ দুটি অমুমার আরামের আশায় প্রভা নিচে নিয়ে যায়। যখন করান কে জানতো সেই বালিশ মাথায় দিয়েই অমু চলে যাবে জন্মের মত প্রভাকে ছেড়ে।

তটিনী চলে যেতে প্রভা বিছানায় শুয়ে পড়েন। বোকা ভৃত্য গৃহিণীকে খুসী করার আশায় বালিশ খুঁজতে নিচে যায়। তার কাজটি নিশ্চয় সময়োচিত হয়নি। কিন্তু এ সুবর্ণসুযোগ হারাতে তটিনী রাজী নয়। ওপরে এসে বলে এখনও ছোটদা জল খায়নি এখন কি আপনাদের বালিশ খোঁজার সময়? বালিশ ঠিক পাবেন আপনারা ভয় নেই। ঘটনাটায় শুধু প্রভাই আহত হন না নিরু বেণুও আশ্চর্য্য হয় তটিনীর ভঙ্গী দেখে।

খোকনকে তটিনী বুঝিয়েছিল পুরুষমানুষের কাজ করা সে পছন্দ করেনা। তাছাড়া অমুকে সাহায্য করবার খোকনের কি দরকার? সে ত অমুকে হাতের তেলোয় করে রাখে। সত্যি হাতের তেলোয় যে সে রাখতে জানে তা সে দেখিয়ে দিলো গদাইকে হাতের তেলোয় রেখে।

জিতে গেল তটিনী। পরাজিত হলেন প্রভা। এমনি করে যুগে যুগে প্রভার দল হেরে গেছেন তটিনীদের রঙ্গ ভঙ্গি-ময়ী মোহ আবরিত করেছে নির্মল স্নেহের স্রোতস্বিনীতে।

দিনে দিনে পরিবর্ত্তন ঘটলো সংসারে। আর সকালে চায়ের টেবিলে বাসুদেব দুধের গেলাস হাতে বসে না। খুকু মুখ বেঁকিয়ে চলে যায় যেন এড়িয়ে যেতে চায় দিদিমাকে, খোকনের চোখে বিরক্তি পরিস্ফুট।

অমুকে হারিয়ে সবাই বিভ্রান্ত, সবাই বিচলিত, গদাই এর মাঝে নিপুণ হাতে তার অস্ত্র নিক্ষেপ করলো তটিনীকে দিয়ে। শরাহত প্রভা নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। চিরদিনের শিশু প্রকৃতি সদাশিববাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রভাকে নিয়ে চললেন তীর্থ পর্য্যটনে। সঙ্গী হলেন ব্রহ্মচারি, বললেন আমায় যেতেই হবে নইলে একদিনও মাকে সামলাতে পারবেন না আপনি। বন্ধনমুক্ত স্বাধীন বিহঙ্গ নিজের হাতে লোহার শেকল পায়ে পরলেন। বৃন্দাবন কাশী গয়া মথুরা দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান প্রভা কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। নিরু বেণু বারে বারে মাকে চিঠি লেখে, মাগো ফিরে এসো আমাদের কথা কি একবারও মনে পড়ে না? বাবুল টুনি কত তোমার কথা বলে। তাদেরও কি দেখতে ইচ্ছে করে না তোমার?

প্রভা চিঠি পড়ে বলেন আবার ওই আগুনে হাত দোব আমি? আবার নাতি-নাতনী—উঃ জলে গেলুম আমি কই গোপাল কই? ব্রহ্মচারি বলেন বলো মা? গোবিন্দ জয় জয়। প্রভা বলেন পাপ হয়েছিল আমার পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছিল আমার স্নেহ। নিরুর ছেলেমেয়ে বেণুর ছেলেমেয়ে কেউ আমার সে স্নেহ পায়নি যা পেয়েছিল খোকন খুকু বাসুদেব।

ব্রহ্মচারী গীতার শ্লোক বলেন

অব্যক্তাদীনি ভুতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত

অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা

আগেও ছিল না পরেও থাকবে না মধ্যে কিছু দিন ছিল এইই ত জগতের নিয়ম মা। রাস্তার বাউল গান গাইছে—

স্নেহ মোহ দুয়ের তফাৎ ও মূঢ় মন চিনলি নারে।

সমাপ্ত

তাম্রলিপ্ত

বিধুভূষণ জানা

প্রাচীন "তাম্রলিপ্ত" সম্পর্কে একাধিক ইতিহাস প্রকাশ হইয়াছে, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যও হইয়াছে। বস্তুতঃ অবলুপ্ত তাম্রলিপ্ত সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন প্রধান—(১) প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্য, (২) তাম্রলিপ্তের রাজধানী, (৩) তাম্রলিপ্ত নগর ও বন্দর প্রভৃতির অবলুপ্ত অবস্থান ও তাহার সীমানা?

বর্ত্তমানকালের তমলুক সহরকে উহার একটি অংশ ধরিয়া গবেষণা আরম্ভ করিলেও চৈনিক পরিব্রাজক আইসিং, হিউয়েন সাং, ফা-হিয়ান প্রভৃতির ভৌগোলিক নির্দ্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন; কিন্তু এই সকল কষ্টসাধ্য গবেষণায় এখনও পর্য্যন্ত কোন ঐতিহাসিক মনোনিবেশ করিতেছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সম্প্রতি মালিবুড়োর (যুধিষ্ঠির জানার) প্রয়াস এদিক দিয়া প্রশংসনীয়, অনন্তঃ তিনি এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি তাঁহার উদ্দেশ্যকে আরও আলোকপাত করিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

অধিকাংশ স্থলে কিংবদন্তি এবং বিস্ময়কর দৃশ্য ইতিহাস-লেখার ও আবিষ্কার প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করে, কিন্তু অনেক সময় ইহা বিভ্রান্তিকরও হয়। কোন বিধ্বস্ত ও জঙ্গলাকীর্ণ একদা মনুষ্য-পরিত্যক্ত জনহীন অঞ্চলে, আবার দূরদেশাগত জনগণ নূতন নূতন বসতি নির্ম্মাণের সঙ্গে যে সকল প্রাচীন ধ্বংশাবশেষকে দেখিয়া থাকে, তাহাকে তাঁহারা নিজ নিজ ধারণামত অধিকাংশস্থলে সর্ব্বলোকপ্রিয় মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে মিলাইয়া এক একটা নামকরণ করিয়া থাকে, তাহাই এক একস্থলে "কিংবদন্তি" নামে খ্যাত হয়, যেমন—মেদিনীপুর সহরের পশ্চিমাংশের বিরাট রাজার "গো-গৃহ", বাহিরীতে কাঁথি বিরাট রাজার "গো-গৃহ", আবার বালেশ্বরের অন্তর্গত রাইমনি কেল্লাও "বিরাট রাজার বাড়ী" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু তমলুকের কিংবদন্তির সঙ্গে ইতিহাসের সামঞ্জস্য আছে, কারণ এই স্থানে অনেক প্রাচীন বংশ বংশানুক্রমে আছেন। তমলুক সহর প্রাচীন তাম্রলিপ্তের অন্তর্ভুক্ত এবং তমলুকের বর্ত্তমান রাজবাড়ীটি একটি প্রাচীন কেল্লা অথবা প্রাসাদের ধ্বংশস্তূপের সংলগ্ন (রাজ্যময়দান হইতে দরবার বাড়ীর তলদেশ পর্য্যন্ত স্থানের মধ্যে অবলুপ্ত হইয়াছে) এ বিষয়ে ভ্রান্তির কিছু নাই।

ইতিহাস রচনার বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় আরও অনেক ক্ষেত্রে, যেমন—নারায়ণ, শিব, রামচন্দ্র, অর্জ্জুন, কর্ণ ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তির একটা সৌ-সাদৃশ্য থাকায়, যে অবস্থার এবং যে স্তরে যে কোন সমসাদৃশ্য মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হউক না কেন, তাহাকে অধিকাংশ লেখক বলিতেছেন উহা "বুদ্ধ মূর্ত্তি"। কিন্তু এই প্রাচীনতম ভারতবর্ষে অনেকবার ধর্ম্মবিপ্লব ঘটিয়াছে, অনেক শিল্পী ও জনপ্রিয় রাজা, প্রসিদ্ধ সংস্কারক ও বলশালীদের জন্ম হইয়াছে, ইঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি বিভিন্ন রুচির ভক্ত ও শিল্পবিলাসীদের দ্বারা সংরক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রশ্নটিও স্বাভাবিক। প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার এবং মূর্ত্তিমাত্রই পদ্ধতির, মন্দিরমাত্রই "বুদ্ধের"—ইহাকে যথার্থ প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বলিয়া স্বীকৃতি দিতে দ্বিধা হয়।

যে স্থানকে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—সেই স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি, চিত্র অথবা কোন প্রসিদ্ধমূর্ত্তি "ফলক" মাত্র আবিষ্কার হইলেই ঐ স্থান তাহার পিঠস্থান—

এরূপ অনুমান অত্যন্ত যুক্তিহীন। তথাকথিত এই বন্দর সীমানার মধ্যে আরও বিভিন্ন দেশীয় অনেক দ্রব্য-সামগ্রী এবং বিভিন্ন কালের শাসকদের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে—এগুলি কাহারও স্থায়ী আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠাকে স্বীকৃতি দেওয়া অপেক্ষা বাণিজ্যিক আদান-প্রদান, আমদানী-রপ্তানীর এবং পর্য্যটক ও যাত্রীদের দ্বারা নাতি-পরিত্যক্ত এবং ব্যক্তিবিশেষের রুচি অনুযায়ী সংরক্ষিত হইয়াছিল এইরূপ ধারণাই অধিক বলিষ্ঠ।

চীন-জাপানে, সিংহলে, যাভায় বৌদ্ধধর্ম যেরূপ আপামর জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মমতের বাধার জন্য সেরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই—কিংবা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, সুতরাং সমস্তই "বৌদ্ধময়" একথা অবিশ্বাস্য। এই অবিশ্বাস্য মতবাদকে কেন্দ্র করিতে গিয়া যেকোন গবেষণার মূলে সত্য আবিষ্কারকে আরও জটিল ও কষ্টদায়ক করা হইয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিতে গিয়া শুধু বৌদ্ধযুগকে প্রাধান্য দিলেই তাহা সুসম্পন্ন হইবে না। গৌতম নিজেই এই প্রাচীন দেশে ও তাহার প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই তাম্রলিপ্ত গৌতমের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী দেশ। বিধ্বস্ত তাম্রলিপ্তের কোন অংশে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের কোন ব্যর্থ স্মৃতি আবিষ্কারের চেষ্টায় কিংবা সমালোচনায় বৃহত্তর তাম্রলিপ্ত আবিষ্কারের গতি প্রতিহত ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে এই ভূভাগের উড্র ও বঙ্গ নাম বিলুপ্ত হইয়া সুহ্ম রাজ্য নামে পরিচিত হইয়াছিল। তাহার পরে এই সুহ্ম রাজ্য অঙ্গ রাজ্যের কতকাংশ লইয়া গঙ্গার আদিম প্রবাহী পূর্ব্ব শাখা হইতে নর্ম্মদা নদীর উত্তর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভূভাগ "তাম্রলিপ্ত রাজ্য" নামে খ্যাত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তীকালে অশোকের পূর্ব্বে প্রাচীন উড্র প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আরও দক্ষিণে বিস্তৃত সমুদ্র উপকূল ভাগ লইয়া কলিঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অশোকের সময় কলিঙ্গ ও প্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্য দুইটি একপ্রাণ ও এক জাতিতে ও এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। এই প্রাচীন রাজ্যটির স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অশোকের ঐতিহাসিক যুদ্ধের পর পরাজিত ও গোঁড়া বৈদিক ধর্মাবিশ্বাসী রাজ্যের অধিবাসীরা বিজিত অশোকের নেতৃত্বে এই বৌদ্ধধর্ম্মকে অন্তরের সহিত সমর্থন করে নাই, কিংবা এই ধর্ম্মকে তাহারা এই রাজ্যে স্থায়ী হইতে দেয় নাই—এই দুই অবস্থাকেই পরোক্ষে স্বীকৃতি দেয় সমস্ত ইতিহাস এবং দৃশ্যমান পরিবেশ ও দৃষ্টান্তবহুল প্রাচীনতম হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলি পদ্ধতি।

একটি দেবালয়কে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা ক্রমান্বয়ে রূপান্তর করিয়া ব্যবহার করিয়াছে, একই শিল্পী ও কারিগর তাহার শিল্পধারা ও রুচি অনুযায়ী মন্দির, বিহার, গীর্জ্জা ও মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে, একটি গড়কে বা কেল্লাকে বিভিন্ন বিজয়ী রাজা অথবা শাসকেরা ব্যবহার করিয়াছে, সংস্কার করিয়াছে এবং নিজ নিজ নামে পরিচিতি দিয়াছে। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আবার হিন্দুর আরাধ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি পূজা পীঠস্থানের সংলগ্ন অতিথি-অভ্যাগত, ভিক্ষু-সন্ন্যাসী ও ভক্তদের আশ্রয় এবং বেদ-বেদান্ত-দর্শন-শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের স্থান কিংবা ছাত্রাবাস ছিল না—কেবল ধর্ম্মাবলম্বীরাই তাহাদের মঠে ও বিহারে এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এরূপ অলস কল্পনা ও বর্ণনা দ্বারা হিন্দুদের ধারাবাহিক ও প্রাচীনতম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে ক্ষুব্ধ ও ম্লান করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বৌদ্ধলিপি ও গ্রন্থগুলিতে উপরোক্ত প্রদেশগুলির ধারাবাহিক ও ঐতিহাসিক গৌরবকে ক্ষুণ্ণ ও বঞ্চিত করিয়াছে। একথা আজ অনেকেই দৃঢ়তার সহিত স্বীকার করিবে যে, বৌদ্ধযুগেই ভারতের শৌর্য্য-বীর্য্য, উন্নত শিল্প-বাণিজ্য ও কারুকার্য্য সমস্তই প্রায়—"মহানির্ব্বাণ" লাভ করিবার উপক্রম করিয়াছিল বা হইয়াছিল। কোন কোন বৌদ্ধ-সাহিত্যে বিকৃতিও প্রকাশ পাইয়াছে, যেমন—গৌড়ের পালবংশ "জাতিতে বৌদ্ধ ছিল, পুরির জগন্নাথমন্দির একদা বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং তমলুকের বর্গভীমার মন্দিরও একদা বৌদ্ধ বিহার ছিল; কিন্তু যথার্থভাবে এতদ্‌প্রদেশগুলির মধ্যে তাম্রলিপ্ত এলাকার মধ্যে কোথায় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা য

...না স্থাপন করিয়াছিলেন—তাহার কষ্টসাধ্য গবেষণা ...র হয় নাই।

বালেশ্বর জেলার রাইমনি কেল্লা (রাইমুনি) সম্পর্কেও ... কোন ঐতিহাসিক এই প্রকার সূত্রহীন মন্তব্য ...য়াছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ও ভোগোলিক সূত্রে ঐ কেল্লা ...পরাক্রমশালী কৌলিঙ্গ রাজের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সিদ্ধান্ত ...রাই অধিক যুক্তিযুক্ত। যদিও কৌলিঙ্গ রাজের শক্তির ...র ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়াছে, কিন্তু তাহার রাজধানী ও ...র অবস্থান সম্বন্ধে বলিষ্ঠ নজির নাই। কেহ তাহা ...করিলেও উহা যে ঐ শ্রেণীর একজন দিকপালের কেল্লা ...হা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কালক্রমে ...কৌশলক্রমে কলিঙ্গের স্বজাতীয় রণকুশলী চোড়গঙ্গ ...বর্ম্মা) ঐ কেল্লা জয় করিয়া কলিঙ্গ রাজ্য-"উড়িষ্যা ...লিঙ্গ রাজ্যের অবলুপ্তির পর ঐ রাজ্য উড়িষ্যা নামে ...র হইয়াছে) বিজয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং ...বর্তীকালে অনঙ্গভীমদেব ঐ কেল্লাকে উড়িষ্যারাজ্যের ...ান সৈন্যশিবির ও সেনাধ্যক্ষের (সামন্ত রাজার) ...ধীনে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বশেষে ওই কেল্লার ...ম রাইমনিকেল্লা নামে পরিচিত হইয়াছিল—তাহার ...িষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার পরবর্তীকালে ঐ কেল্লা ...ছুকাল পাঠানদের সেনানিবাস এবং তার পরে কিছুকাল ...রাঠাদের দুর্গে পরিণত হইয়াছিল। তাই বলিয়া উহাদের ...াহারও নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া দাবী করিবার উপায় ...ই—কেবলই হস্তান্তর মাত্র—যেমন দিল্লীর "লালকেল্লা।" ...ইমনিকেল্লা সম্পর্কে কেবলমাত্র প্রশ্ন এই যে, কোন্ ...সে কে তাহার যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা? বিদ্বেষপূর্ণ ও ...ক্ষপাতপূর্ণ উক্তি ইতিহাসে স্থায়ীভাবে স্বীকৃতি লাভ ...রিবেনা। কিন্তু কোন্ সময়ে ঐ বিশাল ও বিরাট ...রক্ষিত কেল্লার প্রতিষ্ঠাতা কে? যাহার বিশালতা শুধু ...ড়িষ্যায় নয় সমগ্র ভারতবর্ষেও বিরল। ইহা একটি বড় ...শ, পুরুষ পুরুষানুক্রমে যাহারা যে স্থানে বসবাস করে—...হাদের কিংবদন্তির সূত্রে ইতিহাসের সূত্র পাওয়া যায়; ...ন্তু বাংলা-উড়িষ্যার সমুদ্রউপকূলের অধিবাসীরা সমুদ্র-...বনে ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কারণে পুরুষানুক্রমে প্রাচীন না হওয়ায় কিংবদন্তির সূত্রটিও ভিত্তিহীন। ইহার যথার্থ তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য কলিঙ্গ রাজ্যের বৃত্তান্ত প্রয়োজন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বুদ্ধজন্মের বহু অতীতের প্রতিষ্ঠান এবং নিজেও এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু কালস্রোতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকলেই বৌদ্ধধর্মকে সমর্থন করিয়াছিল এজন্যই ইহাকে "বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠান" বলা আদৌ সঙ্গত নয়। ঐ নালন্দা ধ্বংস না হইলে আবার হয়ত সকলে পূর্ব্বধর্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। সুপ্রাচীন জগন্নাথমন্দিরের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে এবং বর্ত্তমান মন্দির যে বৈদিক ধর্ম্মে বিশ্বাসী মহাপরাক্রমী ক্ষত্রিয় অনঙ্গভীমদেবের দ্বারা নির্ম্মিত, ইহার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও উহা "বৌদ্ধ-বিহার" একথা বলায় ইতিহাসের সার্থকতা কি? কোন সময়ে যদি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা তাহা দখল করিয়া থাকে তাহার নির্দ্দিষ্ট সময়ের গবেষণা করিলে সার্থক হইত। যদি তাহার কোন প্রমাণ নাই থাকে তবে এই অনর্থক উক্তি কেন?

মেদিনীপুরের শিবাজীকেল্লা নামে খ্যাত ইংরেজদের পুরাতন জেলাটির পূর্ব্ব যথার্থ ইতিহাস আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। উহার দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণের প্রাচীর সংলগ্ন একটি সুড়ঙ্গ মেদিনীপুর সহরের নিম্নদেশ দিয়া মেদিনীপুর সহরের পশ্চিমে গোপ নামক সুউচ্চ দালানের তলদেশে কাঁসাই নদীর উপকূল সংলগ্ন হইয়াছে—ঠিক যেন মহাভারতের যতুগৃহ হইতে নদীতে অবস্থিত যন্ত্রচালিত জলযানে কুন্তিদেবীসহ পাণ্ডবদের জীবনরক্ষা ও অন্তর্ধান হইবার ব্যবস্থা। ইহা কাহার কীর্ত্তি? কিবা তাহার উদ্দেশ্য? কোথায় তাহার বলিষ্ঠ প্রমাণ? কে এইসকল কীর্ত্তি ও কাহিনীর গবেষণায় নিযুক্ত আছেন জানিনা। শুধু এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, ঐ ক্ষুদ্র কেল্লাটি মারাঠাদের দুর্গ ছিল। পরবর্তীকালে পাঠান এবং পাঠানদের পর ইংরেজ, তাহার পর এখন ভারতরাষ্ট্র ব্যবহার করিতেছে। বস্তুতঃ উহা মেদিনীপুরের প্রাচীনতম কীর্ত্তির অন্যতম। ইহার প্রাচীনত্ব হিসাবে মারাঠাগণ ইহার প্রতিষ্ঠাতা নয়—

মারাঠারা ইহা ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম মারাঠা দুর্গ বলিয়া বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে খ্যাত হইয়াছে—এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব সমধিক। ১৯১৬ সালেও সুড়ঙ্গের দুই প্রান্তদ্বার দেখিয়াছি, এই প্রকার শুধু পাথর নির্ম্মিত মেদিনীপুর জেলার লালগড়, কর্ণগড়, কাঁসাই নদীর তীরে কেদারেশ্বরের মন্দির, দাঁতনের শিবমন্দির, কুলটিকরীর মন্দির ও গড় এগ্রার শিবমন্দির প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে—এগুলিতে পোড়া মাটির একক নিদর্শন কিছু নাই; কোন কোনটী একমাত্র পাথর কাটিয়া যাহা কিছু শিল্পসম্ভাবে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে প্রাচীনকালে হিন্দুদের দেব-দেবীর মন্দিরে এবং মন্দিরসংলগ্ন আবাসিক স্থানে এবং ঋষি পুরোহিতের আশ্রমেই দেশবাসীর প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। নিছক বিদ্যাপীঠগুলির একাংশেও দেব-দেবীর অর্চ্চনা হইত। নালন্দা, বলভী ও তক্ষশীলাতেও বৌদ্ধপূর্ব্বকালে হিন্দুর আরাধ্য দেবতার মন্দির ও প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। সমবেত স্বরে নিত্য স্তব, স্তুতি প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হইত। যাহার অনুকরণ আজও অনুষ্ঠিত হয়—রামকৃষ্ণমঠে, বিদ্যালয়ে ও ছাত্রাবাসে এবং অন্যান্য ধর্ম্মীয় মঠে, মন্দিরে ও টোলে। তবে "পতিত পাবন সীতারাম" নয়, কিংবা মহানির্ব্বাণের কোন সূত্র নয়, অনেকে উচ্চমার্গের বৈদিকস্তোত্র ও বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রার্থনা অপূর্ব্ব সুরে মানুষের পূর্ণ মনুষ্যত্বকে লক্ষ্য করিয়া সকলের প্রাণ মন আকর্ষণ করিয়া গীত হইত। আশ্রম, মঠ ও দেবালয়মাত্রই পরিব্রাজক, আগন্তুক ও নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ছিল। ইহা হিন্দুধর্ম্মের ও জাতির একটি প্রাচীনতম সংস্কৃতি ও রীতি। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনেক সাহিত্যিকের অন্ধপ্রীতি ও সহজ গবেষণা ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের এই ইতিহাসকে ও গৌরবকে ম্লান করিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবিলম্বী চীন দেশীয় পরিব্রাজকেরা সাধারণতঃই বৌদ্ধধর্ম্মের অতিথি ছিলেন এবং অন্যধর্ম্মাবলম্বীদের মঠ-মন্দিরে ধর্ম্মবিরোধ বশতঃ তাঁহাদের গতিবিধি প্রীতিজনক না হওয়াই স্বাভাবিক এবং সেজন্য তাহার বৃত্তান্ত রচনায় তৃপ্তি না থাকা অথবা বিকৃত করাও স্বাভাবিক।" তাই বলিয়া প্রাচীনতম হিন্দুজাতির দেবালয়ে, আশ্রমে প্রাচীনতম "বৈদিকরীতি-পদ্ধতিকে (সমবেত বেদগীতি, ও ছাত্রাবাস) অস্বীকার করিয়া মন্দিরসংলগ্ন আবাসিক ব্যবস্থা ও পরিবেশ থাকিলেই তাহাকে বৌদ্ধ-বিহার বলিতে হইবে এমন কিছু অবধারিত "সিদ্ধান্ত" আমাদের থাকা উচিত নয়—বস্তুতঃ ইহা যথেষ্ট প্রমাণসাপেক্ষ। সঠিক প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বার বার শুধু কাল্পনিক নজিরে একটা ঐতিহ্যকে ম্লান করিবার চেষ্টা না করাই সকলের কর্ত্তব্য। অন্যথায় মানুষ ধর্ম্মের চিরন্তন আশ্রয় হইতে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মহারা হইয়া পড়িতেছে। একটা ধর্ম ও উচ্চ আদর্শ ব্যতীত মানুষের নৈতিক চরিত্র বলিষ্ঠ হইতে পারে না। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এই একই সমস্যা। বর্ত্তমান 'কলিকাতা নগর ও বন্দর" বলিতে একজন বিদেশীর প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ডায়মণ্ডহারবার হইতে পলতা, ব্যারাকপুর ও দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এককালে ময়ূরধ্বজ ও তাম্রধ্বজের রাজ্য বলিতে পূর্ব্ব-দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও সুবর্ণরেখা নদী, উত্তর ও পশ্চিমে নর্ম্মদা নদী প্রান্ত হইতে গঙ্গার উপকূলে পাটলীপুত্র বা পাটনা এবং গঙ্গার নিম্নগামী প্রবাহের সীমানা বুঝাইত। ভারতের একমাত্র তাম্রলিপ্ত "বন্দর" বলিতে সাগর উপকূলের দীঘা, সমুদ্রপুর, দারিয়াপুর, বাহিরী, হিজলী, বায়েন্দা, নন্দীগ্রাম, বর্ত্তমান তমলুক, চন্দ্রকোনা, সপ্তগ্রাম, ঘাটাল, হুগলী, হাওড়া,, ২৪ পরগণার বেড়াচাঁপা, বেহালা, মথুরাপুর, রায়দিঘী এবং আরও সুদূর ২৪ পরগণার অবলুপ্ত দক্ষিণ-অঞ্চল (সুন্দর বন) বুঝাইত। উপকূলবর্ত্তী দ্বীপগুলি এক একটি ঘাঁটি ছিল। এই সকল এলাকা লইয়া সমগ্ররূপে ব্যয়সাধ্য ও কষ্টসাধ্য গবেষণা আরম্ভ হওয়া উচিত। তমলুকের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে যে সকল প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, অনুরূপ প্রাচীন তথ্য উপরোক্ত প্রাচীন ঘাঁটি ও নগরগুলিতে পাওয়া যাইতেছে। এই বৃহত্তর তাম্রলিপ্ত বন্দরের কোন্ ঘাটে আইসিং প্রভৃতি বৌদ্ধপরিব্রাজকেরা উঠিয়াছিলেন এবং কোন্ ঘাটে হান্টার সাহেব উঠিয়াছিলেন—"প্রাচীন বন্দর এলাকা" আবিষ্কারের সঙ্গে স্বতন্ত্র এই "ঘাট"গুলির আবিষ্কারের প্রয়োজন। আমার অনুমান বৌদ্ধ "তা-রা-হা"

বিহারের স্থান কাঁথির বাহিরে কিংবা অন্য কোন ঘাটে অবস্থিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান তমলুকের বিভক্ত বৈদিকধর্ম্মী রাজবাড়ীর অন্তর্ভুক্ত কোন বৌদ্ধ-বিহারের অস্তিত্ব থাকার যে কল্পনা তাহার কোন সঙ্গতি নাই। "দরিয়াপুর" অঞ্চলে প্রাচীন বন্দরের আর একটি ধ্বংসাবশেষ। বাহিরীতে প্রাচীনতম নৌ ঘাঁটি পোত সংস্কার ক্ষেত্রের (ডক) স্থান এখনও সুস্পষ্ট আছে এবং হিন্দুদের বিশেষ দেবদেবীর প্রাচীন প্রতিষ্ঠান ব্যতীত ভিন্নমঠ-মন্দিরের অস্তিত্ব আছে এবং ঐ সকল ধ্বংসাবশেষের রূপান্তরও স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ ক্ষেত্রটিকে কেন্দ্র করিয়া একাধিকবার নূতন নূতন রাজ্য সৃষ্ট হইয়াছে এবং বার বার তাহা পরিবর্তন হইয়াছে (হিজলীরাজ্য)। বর্ত্তমান এই বাহিরী হইতে সমুদ্র উপকূল এখন প্রায় দশমাইল। বায়েন্দাতে আর একটি নৌঘাঁটি ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়- যাহা এখন বাংলাগড়ের পুষ্করিণী নামে খ্যাত। বিখ্যাত পাঁশকুড়ার সার্গেন্ট- ইংলিশার দীঘি দাঁতনের "শবশঙ্কাও" এই শ্রেণীর। ঐগুলি ক্রমিতে সেচের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

মহাভারতীয় কালে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব লইয়া অর্জ্জুন আদি—শ্রেষ্ঠ রণকুশলীদের সঙ্গে তাম্রধ্বজের যুদ্ধ এবং তাম্রধ্বজ কর্তৃক অশ্ববিজয়ের গৌরবলাভ ঘটিয়াছিল—নর্ম্মদানদীর পূর্ব্বপ্রান্তে রত্নাবতীপুরের দুর্গ এলাকার মধ্যে (অনেকের মতে মহাভারতোক্ত রত্নাবতীপুর ও বর্ত্তমান তমলুক একই স্থান। মতান্তরে ময়ূরভঞ্জের বাড়িপাদা, মেদিনীপুরের শহর, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, হুগলী অথবা বর্দ্ধমান হইতেও পারে) এই সময় ময়ূরধ্বজ তৎকালে রত্নাবতীপুরের দুর্গে সপরিবারে অবস্থিত ছিলেন। একদা তাঁহারই স্বজাত ও শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়বীর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রামায়ণের যুগে এই নর্ম্মদা নদীর উপকণ্ঠে অন্যতম মাহিষ্মতী নগরের বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাঁহার নিকট রাবণ পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিল। বাংলার জাতীয় গণনায় মাহিষ্য সম্প্রদায় এই রাজ্যকে তাঁহাদের আদি রাজ্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন। কোন সময়ে পরশুরামের আক্রমণে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন অঙ্গহীন হইয়া হীনবল হওয়ায় এবং পরশুরামের দ্বারা ক্রমাগত উৎপীড়িত হইয়া লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয় উক্ত রাজ্য হইতে বঙ্গ-কলিঙ্গের সাগরউপকূলে পলাইয়া আসিয়া "আত্মগোপন" করিয়াছিল। তাঁহারাই পরবর্ত্তীকালে ঐ রাজ্যের নামে "মাহিষ্য" আখ্যায় পরিচিত হইয়া ময়ূরধ্বজের সঙ্গে মিলিত হইয়া এতদ্দেশে ময়ূরধ্বজকে তাহাদের আদি রাজার সমতুল্য সম্মানে ও গৌরবে অভিষেক করিয়া নূতন করিয়া তাম্রলিপ্ত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন—এই ধারণা পুরাণ ও ইতিহাসের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। বহু অশ্বসংক্রান্ত যুদ্ধে পরাজিত পাণ্ডবদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ নিরুপায় দেখিয়া কৌশলে সন্ধি করিবার পর ময়ূরধ্বজের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ায় ময়ূরধ্বজ সৈন্যসামন্তসহ সপারিষদ তথাকথিত "তমলুকে" আসিয়া আর একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্ররাজ্য ও রাজধানী স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন—এধারণাও সঙ্গতিপূর্ণ। এই নূতন রাজধানীতে তিনি রাণীর সহিত জলাশয়ের মধ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সময় উভয়ে জলমগ্ন (সর্ব্বগ্রাসী সামুদ্রিক প্লাবন) হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই কিংবদন্তি নিছক কিংবদন্তি নয়, এবং তাহার পরবর্ত্তী বংশধরেরা ময়ূরধ্বজ ও তাম্রধ্বজের কীর্ত্তি-গৌরবের সঙ্গে পুরুষানুক্রমে সর্ব্বোচ্চ রাজসম্মানে এই তাম্রলিপ্তে বসবাস করিতেছেন। একদা এই তাম্রলিপ্তকে কেন্দ্র করিয়া গৌড় হইতে উড়িষ্যার শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত এই রাজবংশধারারও জাতিগোষ্ঠির একটি মহাপরাক্রমশালী স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সকল কথা ও কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

মহাভারতীয় কালের পূর্ব্বে এবং তাম্রধ্বজের জন্মের পূর্ব্বে "তাম্রলিপ্ত" নামে কোন রাজ্যের নাম পাওয়া যায় না। মহাভারতীয় কালে নর্ম্মদা নদীর তীরে রত্নাবতীপুর নগরে ময়ূরধ্বজ ও তৎপুত্র অপরাজেয় তাম্রধ্বজের নাম পাওয়া গিয়াছে এবং তার পরবর্ত্তীকালের পুরাণে গঙ্গার শাখা রূপনারায়ণের তীরে তাম্রলিপ্ত নামক রাজধানীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, হাণ্টারসাহেব তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। এই "তাম্রলিপ্ত" নামের উৎপত্তি লইয়া যে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা উপরোক্ত ধারণার সূত্রে অনেক সহজ ও সরল হইয়া যায়। কিন্তু ইহা স্বীকৃত

না হইলে—এই তমলুক একদা রত্নাবতীপুর ছিল এবং নদীর নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃতি দিতে হয়।

চন্দ্রকোণা নগরের প্রতিষ্ঠাতা "কলিঙ্গ" (সম্ভবতঃ কলিঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রী বলিয়া নিজের রাজ্যে কলিঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছিলেন)। তাঁহার পালিত পুত্র চন্দ্রহংস-দেবের নামানুযায়ী তিনি ঐ নগরের নাম চন্দ্রকোনা নামকরণ করিয়াছিলেন (কিংবদন্তি)। মহাভারতের সার কথা—চন্দ্রহংস কৌণ্ডিল্য নগরের (কলিঙ্গ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) রাজা দধিমুখের একমাত্র পুত্র। কৌণ্ডিল্য নগর কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রউপকূলে অবস্থিত ছিল। চন্দ্রহংস শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ায় জনৈক মন্ত্রীর রাজ্যলোভের কারণে তাহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। অন্যতম মন্ত্রী পূর্ব্বোক্ত "কলিঙ্গ" আসন্নমৃত্যুর হাত হইতে শিশুচন্দ্রহংসকে উদ্ধার করিয়া নিজ রাজ্যে (চন্দ্রকোণা) ছদ্মনামে লালনপালন করিয়া যথাসময়ে অপূর্ব্ব কৌশলে চন্দ্রহংসকে তাহার পিতৃরাজ্যে আনিয়া (চাণক্যতুল্য রাজনীতিবিদ) এই "কলিঙ্গ" রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দ্রহংস যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ অশ্বকে তাঁহার গড়ের মধ্যে আটক রাখিয়াছিল। পরমবিষ্ণুভক্ত এই চন্দ্রহংসকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়া এবং তাঁহার প্রাসাদে দুইদিন অর্জ্জুনাদি সকলে অবস্থান করিয়া মিত্রতার সূত্রে যজ্ঞ-অশ্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন (পূর্ব্বোক্ত রাইমনী কেল্লাতে প্রাচীন বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বংশাবশেষ এখনও বিদ্যমান)। এই স্থান হইতে যজ্ঞঅশ্ব উত্তর দিকে সমুদ্রে (সুবর্ণ রেখা নদীর মোহনা) সাঁতার দিয়া নিকটবর্ত্তী একটি "ক্ষুদ্রদ্বীপে" গিয়াছিল এবং প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বরাবর উত্তর দিকে সিন্ধুপুরের জয়দ্রথের রাজ্যের মধ্যদিয়া বিনাবাধায় হস্তিনা-পুরে উপস্থিত হইয়াছিল (মহাভারত)।

মহাভারতোক্ত উপরোক্ত ক্ষুদ্রদ্বীপটি (বাল্গালুভা মুনির নির্জ্জন আস্তানা) সম্ভবতঃ বর্ত্তমান কালের "চন্দনেশ্বর" অঞ্চল। ইহা এখন স্থলভাগের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই প্রকারে আরও অনেক দ্বীপ স্থলভাগের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে, আবার কোনটি হয়ত সমুদ্রগর্ভে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়াছে—কোথাও কোন ভূভাগ নদীর দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে (সুন্দরবন) ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান।

অশ্বমেধ যজ্ঞের পর তাম্রধ্বজ যেমন বর্ত্তমান তমলুকে আসিয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, অনুরূপভাবে মহাভারতীয় কালের পর এই কলিঙ্গ রাজ্য আবার স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও অমিতপরাক্রমশালী রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল—ইতিহাসে তাহার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। মহাভারতীয়কালে ভারতের দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চলে কেবলমাত্র রত্নাবতীপুরের তাম্রধ্বজ ও কলিঙ্গ রাজ্যের রাজা চন্দ্রহংসের পুত্র মোকরাক্ষ ও পদমাক্ষ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরিতে সাহসী হইয়াছিল। মনিপুরে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন ব্যতীত আর কোন দিকপাল এতদ্দেশে তখন ছিলনা ইহাই প্রমাণ হইতেছে। এই বিবরণের সঙ্গে ধারাবাহিক ইতিহাস অন্বেষণ করিলে আরও প্রমাণ হয় যে, গৌড় হইতে উড্র (পরে উড়িষ্যা) দেশের দক্ষিণ-প্রান্ত অতিক্রম করিয়া একসময় একটি পরাক্রমশালী জাতির রাজ্য গঠিত হইয়াছিল এবং তাহারা গোষ্ঠী-পরম্পরায় রাজ্য ও রাজধানীর ক্ষেত্র একাধিকবার পরিবর্ত্তন করিয়াছে (যেমন উপরোক্ত কলিঙ্গ বা কৌণ্ডিল্য নগর-কটক-পুরী এবং রত্নাবতীপুর-তমলুক, আবার পৌণ্ড্র-পাটলীপুত্র) এবং শক্তিবৃদ্ধির জন্য বহু স্বজাতীয় সামন্ত রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, সুতরাং গুপ্ত ও শূর বংশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই রাজ্যগুলির মধ্যে আর কোন প্রভাবকে প্রক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করিলে নিতান্তই ঐতিহাসিক মূঢ়তা বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাম্রলিপ্ত ও কলিঙ্গ রাজ্যের অন্ধকারাচ্ছন্ন যে ইতিহাস—ইহা তাহার একটি সঙ্গতিসম্পন্ন ও অন্যতম সূত্র মাত্র।

বর্ত্তমান "তমলুক সহর" নামে যে এলাকাটি পরিচিত, তাহাই একদা তাম্রধ্বজ ও তাহার পরবর্ত্তী বংশধরদের তৎকালের উপযোগী নিজস্ব গড়বাড়ী (বাস্তু)। উত্তরে ও দক্ষিণে-পূর্ব্ব-পশ্চিমাভিমুখে শঙ্কর আড়া ও পায়রাচালী নামে দুইটি স্রোতস্বিনী কংসাবতীর শাখা। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণাভিমুখী দুইটি পরিখা পূর্ব্বোক্ত দুইটি শাখা-নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। অতীতকালে আর একটি

পরিখা গড়ের উত্তরাংশ দিয়া পূর্ব্বোক্ত পশ্চিম পরিখার সহিত সংযুক্ত ছিল। এই গড়বাড়ীর উত্তর পশ্চিমাংশের একটি পদ্মাসনে ঐতিহাসিক খাট পুকুর ও অবলুপ্ত উদ্দান-আদিসহ তাম্রধ্বজের নিজস্ব প্রাসাদ (মতান্তরে বর্ত্তমান দেওয়ানী-ফৌজদারী-জেলখানার এলাকায়) ছিল। এই প্রাসাদের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে (অথবা দক্ষিণে) আর একটি বৃহত্তম পদ্মাসনের উপর বর্ত্তমানের সহর এলাকা (অতীত-কালের রাজ-উদ্যান, সেনানিবাস, কাছারীবাড়ী, ধর্ম্মশালা, পুষ্করিণী, অতিথি-অভ্যাগতদের আবাসবাড়ী, দেবালয় ও উৎসবক্ষেত্র এবং কতকাংশে ব্রাহ্মণ, নাপিত, মালি, ধোপা, পাইকবরকন্দাজ, শিল্পী, রাজকর্ম্মচারী, মন্ত্রী ও পাত্র-মিত্র-স্বজন-পোষ্যবর্গের স্থায়ী বাসস্থান ছিল। বর্ত্তমান সময়ের মেছুয়াবাজার—২০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও রাজার গোলাবাড়ী ছিল। বিগত ২০ বৎসর পর্য্যন্ত—বর্ত্তমান সময় সার্ব্বজনীন পূজার নামে যে উন্মুক্ত মেলার প্রচলন হইয়াছে তাহা নিষিদ্ধ ছিল। এই গড়বাড়ীর মধ্যে কেবলমাত্র রাজ-প্রতিষ্ঠিত ও নির্দ্ধারিত দেব-দেবীর পূজা অর্চ্চনা ব্যতীত আর কোন মূর্ত্তির পূজা-আরাধনা হইত না। কালক্রমে পৌরাণিক কালের "নেতা ধোপাণীর পাটটি" বিধ্বস্ত নদী-সৈকত হইতে আসিয়া খাট পুকুরের নিকট সংরক্ষিত হইয়াছে এবং পরম বিষ্ণুভক্ত রাজপরিবারের সৌজন্যে শ্রীগৌরাঙ্গের মঠটি মাত্র বাংলা সনের অন্তর্ভুক্তকালে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল।

প্রধান বাণিজ্যিক বন্দর ও নগর ছিল সম্ভবতঃ ঐ বেষ্টনীর বহির্ভাগে—আর পূর্ব্বাংশে; যাহা রূপনারায়ণের করালগ্রাসে আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু বৃহত্তম তাম্রলিপ্তের অন্যান্য অবলুপ্ত ঘাঁটিগুলির অস্তিত্ব এখান হইতে প্রাচীন নদী-সমুদ্র উপকূল বরাবর ৪০-৫০ মাইলের মধ্যে এখনও বিদ্যমান। এই গড়বাড়ীর অভ্যন্তরে রাজদণ্ড, শাসন, দখল ও পূর্ণপ্রতাপ বিদ্যমানে বৈদিকরীতি-নীতির বিরুদ্ধ বৌদ্ধবিহার ও অশোকস্তম্ভের অস্তিত্ব থাকার কল্পনা যাঁহারা করিয়া থাকেন—তাঁহাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীকে ঐতিহাসিক বলিয়া স্বীকৃতি দিতে আমরা দ্বিধাবোধ করি। কথিত বৌদ্ধবিহার ও অশোকস্তম্ভের যথার্থস্থান নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে অনুসন্ধান করা উচিত।

৬০৮ পাতার পর

তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করিতে পারে। আমেরিকা ও রুশিয়া ইহা হইতে কিভাবে বাঁচিবে সেই চিন্তাতেই আকুল। সর্ব্বশেষে আছে চীন ও রুশিয়াও তাহাদের কলহের আবর্ত্তে পতনোন্মুখ পৃথিবীর অপর জাতিগুলি। এখানেও আমেরিকার গভীরভাবে জড়িত হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে।

অর্থাৎ আমেরিকা ও রুশিয়ার মাথায় অপরের শিরঃ-পীড়ায় প্রতিফলিত আবেগের আবির্ভাবই প্রবলতম রূপ ধারণ করে ও তাহার জন্যই ঐ দুই দেশের বড় ছোটাছুটির প্রয়োজন।

প্রদেশপালের স্বেচ্ছাচার

বাংলার গভর্ণর শ্রীধর্ম্মবীর সেদিন বাংলার বাৎসরিক আয়ব্যয় ঘটিত আলোচনার পূর্ব্বে তাঁহাকে যে মন্ত্রীসভা লিখিত ভাষণ পাঠ করিয়া দিতে হয় সেই ভাষণ পাঠ করিবার সময় কোন কোন অংশ পাঠ করেন নাই। এইভাবে মন্ত্রীসভার লিখিত ভাষণ বাদ রাখিয়া পাঠ করার কোন রীতি নাই। অর্থাৎ মন্ত্রীগণ যাহা লিখেন রাজ্যের প্রধান ব্যক্তির তাহাই পড়িয়া দেওয়াই রীতি। এই ক্ষেত্রে গভর্ণর বাদ রাখিয়া ভাষণ পাঠ করিলেন কেন তাহার কথায় তিনি বলেন যে, মন্ত্রীগণ ভাষণে এমন কথা লিখিয়াছিলেন যাহার সহিত আয়ব্যয়ের আলোচনার কোনও সম্বন্ধ নাই। মন্ত্রীরা নাকি ঐ ভাষণে ১৯৬৭ খৃঃ অব্দে ইহার পূর্ব্বের ইউ এফ মন্ত্রীসভাকে কি প্রকার অন্যায়ভাবে বিতাড়িত করিয়াছিলেন তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই বিষয়টি সেই সময় হাইকোর্টে নাকি উত্থাপিত হয় ও হাইকোর্ট তাহা আইনতঃ ঠিক হইয়াছে বলিয়া রায় দেন। সুতরাং মন্ত্রীসভার লিখিত ব্যাখ্যা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধ বলিয়াও তাহা পাঠ করা গভর্ণর উচিত মনে করেন নাই। এই সকল কথার আলোচনায় ইহাই মনে হয় যে গভর্ণরের কার্য্য রীতি অনুযায়ী হয় নাই এবং মন্ত্রীদিগের আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত কথা ভাষণে ঢোকানও রীতিবহির্ভূত ছিল। মতদ্বৈধ থাকিলে তাহা বিধানসভার গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে ব্যক্ত করাটা ঠিক উচিত কার্য্য মনে হয় না। রাষ্ট্রীয় সকল বিশেষ বিশেষ আলোচনার একটা নিজস্ব গাম্ভীর্য্য আছে যাহা নষ্ট করা কখন উচিত নহে। ইহাতে কলহে জড়িত দুই পক্ষেরই সম্মানের হানি হয়। বাহিরের লোকে হাসে।

মানবজীবনের উচ্চ আদর্শে বিশ্বাস এবং সেই আদর্শকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা, ধর্ম্মের এই দুটি প্রধান অঙ্গ। রাজনৈতিক পরাধীনতা এই বিশ্বাস ম্লান করে, বা জন্মিতে দেয় না।

প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৩

গান্ধীবাদ ও গান্ধীবাদী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

শ্রীযুক্ত কানাইলাল দত্ত মহাশয়ের লেখাটি পড়লাম (প্রবাসী অগ্রহায়ণ '৭৫) "গান্ধীজি—গঠন—অস্পৃশ্যতা-বর্জন"।

গান্ধীজীর উপর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও কয়েকটী কথা বলা দরকার মনে হয়।

(১) গান্ধীবাদ যে প্রায় সর্বত্র ব্যর্থ হয়েছে সেটা চোখ খুলে দেখা এবং বলার সময় এসেছে। তার কারণ গুলি গান্ধীবাদ গান্ধীবাদী নিজেরা অনুসরণ করেন না। গান্ধীবাদের কোন আদর্শ মানেন না। কিন্তু অনুসরণ করতে বলেন জনসাধারণকে। (ক) কৃচ্ছ্রসাধন তারা করুক, তারাই—নেতারা নয়! (খ) অস্পৃশ্যতাবর্জন করা হোক শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্নভাবের জীবিকার ব্যবস্থায় নয়;—তাকে "হরিজন জন্মে" রেখেই মন্দির প্রবেশ বক্তৃতা সভাতেই কার্য্যক্রম ও সমাপ্তি! (গ) মাদকবর্জ্জন। (ঘ) সাম্প্রদায়িকতা নিবারণ।

দত্ত মহাশয় যে আঠার দফার তালিকা দেখিয়েছেন তাতে সব সংকল্পের বিধানই আছে, নেই আসল জিনিষটী। মানুষের শিক্ষার আমূল ব্যবস্থা। যা অনুসরণ করলে ঐ আঠারো দফার—(১)(২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) এবং (১৪) (১৫) (১৬) (১৮)—সবগুলিই আপনি এসে পড়ত। শিক্ষা সম্বন্ধে গান্ধীজীর উক্তি "এডুকেশন ক্যান ওয়েট" (শিক্ষা স্থগিত থাকুক—থাকতে পারে।)" স্মরণীয়!

(ক) কৃচ্ছ্রসাধন কিভাবে নেহরু আমল থেকে সাধারণকে করানো হচ্ছে, সেটা জনসাধারণের 'হাড়ে মাংসে' উপলব্ধি হয়েছে। কিন্তু নেতারা বক্তারা নেহরুরা তিনমূর্ত্তি ও অন্য প্রাসাদবাসীরা "আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখায়" নীতি অনুসরণ করেছেন কি? কোন কৃচ্ছ্রসাধন তাঁরা করেছেন? (ব্রিটিশ আমলে যা কিছু করেছেন তার পুরস্কার রাজত্ব মন্ত্রীত্ব! হাতে হাতে পুরস্কার!)

(খ) অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন। অস্পৃশ্যজনগুলিকে হরিজন নামের মানুষগুলিকে আজ অবধি কতজনকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার এবং পরিচ্ছন্নতার—স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়—নবনব জীবিকার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয়েছে কি? না। শিক্ষাও দেওয়া হয়নি। সকল জীবিকায় প্রবেশের সুযোগ তাতে হত যে বেচারীদের!

আমি এই প্রসঙ্গে বাল্মীকি ভবনের হরিজন উপনিবেশের কাহিনীর অভিজ্ঞতা একটু জানাই। আরেক-বারো বলেছিলাম বহুদিন আগে। ৺প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের লেখা পড়ে।

১৯৫৩।৫৪ সাল। আমি দিল্লীতে আমায় খুল্লতাত ডাক্তার ৺রাম কাকুর (অপ্রকাশচন্দ্র সেন) কাছে গিয়ে কিছুদিন ছিলাম। আমার এক বোন ৺করুণা সেন সেখানে তখন ছিলেন! দিল্লীতে বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রে কাজ করতেন।

আমারও ভারি কৌতূহল ও আগ্রহ হল ওখানে কাজ করা ও দেখতে যাওয়ায়।

হিন্দী কিছু শিখেছিলাম বাল্যকালে। ওখানে তার সঙ্গিনী অবৈতনিক ও সখের শিক্ষিকা হয়ে কিছুদিন গেলাম। যদি বিদ্যানুযায়ী হিন্দী প্রথমভাগ দ্বিতীয়ভাগ পড়াতে পারি ভেবে।

এখন দিল্লীতে বয়স্ক-শিক্ষার কেন্দ্র ৮।১০টা। আমার বোনের কর্মক্ষেত্র তখন ছিল সেলিমগড়ে।

একদিন শুনলাম তাকে বাল্মীকি কলোনীতে হরিজনদের কয়েকদিন পড়াতে যেতে হবে।

আমিও গেলাম। চমৎকার দোতলা কয়েকটা পাকা বাড়ী। আড়াইশো ঘর, পরিবারমানুষের থাকার মত সব ব্যবস্থা এবং আড়াইশো ঘর অর্থে ঘরপিছু ৪টী সন্তান ধরে নিয়েছি আমার মনে মনে। এরই বয়স্ক দুতিন জন—পিতামাতা পিতামহী জ্যেঠা কাকা যাই হোক। সব সমেত ৭।৮ জন প্রতি পরিবারে হওয়াই সম্ভব।

যাওয়া হল স্কুলে। একদিন সকালে এবং একদিন সন্ধ্যায়।

একটী বাঁকানো বড় দালান। একটী দুটী জীর্ণ চেটাই তাল বা খেজুর পাতার। বোনই শিক্ষিকা। আমরাই দুজন গিয়েছি।

সেদিন গিয়েছি সন্ধ্যাবেলা। বয়স্ক-শিক্ষা সন্ধ্যায় হয়। সকালে বালকবালিকাদের পড়াশোনা।

আর একটু কথা বলে নিই। তাহলে জিনিষটা স্পষ্ট হবে। পাশেই একটী আরো "তাঁত চরকা শিক্ষাগার" আছে। 'শিক্ষাগার' না বলে সেটীকে "প্রদর্শনী" বলব আমি। সেটী হচ্ছে একটী ৯।১০ হাত লম্বা ৮।৯ হাত চওড়া ঘর। তাতে দুটী তাঁত আছে। ৪।৫টী চরকা আছে। দু' একটী আলমারী আছে। তাতে চটের তৈরী এবং তাঁতের তৈরী কয়েকটী চটের আসন ছোট জাজিম, সুতীঝাড়ন রুমাল ইত্যাদি সাজানো আছে। ("বিক্রীর জন্য নহে")। কর্মও নেই জিনিষও নেই বিক্রীর। "প্রদর্শনী" মাত্র।)

সেখানের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি হচ্ছেন একটী মাদ্রাজী মহিলা। বেতনও পান ৩০০৲ মুদ্রা। জিজ্ঞাসা করলাম কখন সেখানকার ক্লাস বসে তাঁত চরকা শিক্ষণের? হরিজনরা জানেন না। কারা শেখেন? তাও তাঁরা কেউ জানেন না। এক কথায় সেটা শিক্ষালয়ের 'ভান'। একটী সাজানো ব্যাপার! মনে হল আমাদের সেদিনের ঘটনায় আমরা ক্লাসে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র একটী মুলতুবী বচসা-কলহের গুঞ্জন ভেসে উঠল।

মোট বয়স্ক ছাত্র ছিল ৮।৯, ছাত্রী ৩।৪ জন। ঐ ছাত্র-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সেই তাঁতঘরের মাদ্রাজী মহিলার সঙ্গে বচসা করছে রূঢ় ভাষায় ডেকে কথা বলার জন্য। ঐ মহিলাটি 'তুম' অবজ্ঞাসূচক ভাষায় কি কথা বলেছেন। কয়েকদিন আগে থেকে এই ব্যাপার চলছে।

আমাদের ঐ বয়স্ক ছাত্রছাত্রীগুলি সবই হরিজন ৩০।৪০ ৫০ বছর বয়সের। তারা ঐ রূঢ়-অভদ্র ভাষায় কথা বলায় অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছে। তারা ঐ মহিলাটীকে ওখান থেকে ওই কাজ থেকে তাড়িয়ে সরিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর…। তুম বললে তারা রাগ করে, "মন্ত্রী জগজীবনরাম আমাদের স্বজাতি…আমাদের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার—আমরা সহ্য করব না।" ঐ বাগ্‌বিতণ্ডাতে আমরা বেশ হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। অনেক কষ্টে আমার বোন তাদের শান্ত ও আশ্বস্ত করলেন। তারা খুব ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ এবং অপমানিতবোধ করেছে নিজেদের। ওপরে চিঠি লেখা হবে এবং প্রতিকার করায় ব্যবস্থা হবে বলা হল।

ক্লাশ হল না। আমরা বাড়ী থেকে গিয়েছিলাম, কাজেই কাকার গাড়ী পেয়েছিলাম। 'বাসে যেতে হয়নি। সেই মহিলাটী আমাদের সঙ্গে অন্য জায়গায় যেতে চাইলেন সেখানে সেদিন একলা থাকার ভরসা করতে পারলেন না।

আমরা ইতিমধ্যে বাল্মীকি ভবনের গান্ধীজীর ঘরে এলাম। একটু ভিতরের ব্যাপার সেখানে জানতে পারা গেল।

সেখানে ছিলেন শ্রীযুক্ত প্যারেলালজীর সহধর্ম্মিণী। তিনি নোয়াখালির বাঙালী মেয়ে। দুজন বাঙালী মেয়ে আমাদের দেখে তিনি বিশেষ খুসী হলেন। আমরা বয়সে অনেক বড় তাঁর চেয়ে যদিও। তবু খানিকটা বসে আলাপ পরিচয় করা হল। কিছু বাংলা বই তিনি পড়তে চাইলেন। ভিতরের গণ্ডগোলের ব্যাপারটাও তিনি বললেন। এবং কিছু আরো জানলাম আভাসে।

ভিতরে ও বাইরে—"হরিজন শিক্ষায় কাজ" "হরিজন ফাণ্ডের আড়াইকোটী টাকা," "সে টাকার অছি কারা"- "খরচ করে কারা" "হরিজন ভাগে তার কতটা ব্যয় হয়"···সামান্যই তিনি যা বললেন এবং যা না বললেন সব থেকেই সবটা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌ল। তিনটী বাঙালিনীর কাছে।

প্রসঙ্গত বলা উচিত গান্ধীজী ১৯২১।২২এ করেন—নন কো অপারেশন অসহযোগ আন্দোলন এবং চরকা শিক্ষায় অসহযোগ আন্দোলনে তখনকার বাঙালী অনেক ছাত্র 'বলি' হয়েছে। আন্দোলনের ক্ষেত্রও দক্ষিণ আফ্রিকাতেই। গান্ধীজী বুঝে নিয়েছিলেন বাংলা দেশই ঠিক ক্ষেত্র। এবং (স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনা দেখে) বাংলাদেশই সাড়া দেয় বিশেষভাবে। "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জ্জনে" "শিক্ষা বয়কটে" আশুতোষের সমর্থন ছিলনা। "চরকাই সবার্থ সাধক" এতে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না।

মনে হয় ১৯২৬এ হরিজন আন্দোলন করা হয়। কলকাতাতেই সভা হতে লাগল। পর্দানশীন মেয়েরা (আমরাও) সেই সব সভায় যোগ দিয়েছি। অন্য প্রদেশিনীরা কে কত গহনা ও অর্থ দিয়েছিলেন আমি জানি না। বাঙালী সাধারণ মেয়েরা অনেকেই বালা চুড়ী হার আংটী টাকা দিয়েছেন। তবে অর্থদান দেশের সবাই করেছে। টাকা তো সব সময়েই গৌরী সেনদের টাকা!

আমার বক্তব্য হল, হরিজন অর্থ সংগ্রহের অর্থ—তার ব্যয় তাদের জন্য—কতটা হয়েছে, এবং সেই ব্যয়ে এই দীর্ঘ ৪০,৪৫ বছরে তাদের কোনো একটীও সন্তান-সন্ততি নিম্ন মধ্য উচ্চ শিক্ষার পথের সুযোগে কতটা শিক্ষিত সম্মানিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের সমাজের শিক্ষিত উচ্চবর্ণের পাশে এবং স্তরে এসে দাঁড়াতে পেরেছেন কিনা। তাঁরা কেউ অধ্যাপক ডাক্তার উকিল হয়েছেন কিনা? বিদেশে গিয়ে শিক্ষিত হবার সুযোগ পেয়েছেন কিনা? ছোটবড় ব্যবসায়ী হয়ে ফার্ম তৈরী করতে পেরেছেন কিনা? যোলটী প্রদেশের ছোটবড় ব্যবসায়ীদের—বাঙালী পার্শি গুজরাটী ভাটিয়া মাড়োয়ারী শেঠ বণিকদের গদীতে ভালো কোনো পদ পাওয়ার যোগ্যতা দেখিয়েছেন বা সেই অনুসারে পেয়েছেন কিনা? কিংবা তারা "ভাঙী" ও "ধাঙড়" নাম বদলে "হরিজন" সংজ্ঞাতেই খুসী হয়ে গেছে! আর একদিন মন্দিরে প্রবেশে!! আমি "শোবর" (জিন্না সাহেবের উক্তি) মন্ত্রীদের কথা বলছি না। 'হরিজন মন্ত্রী' আছেন জানি।

এখন আগের কথায় আসি। তারপরও দুদিন আমরা ওই হরিজন কলোনীতে সকালের পাঠশালায় গেলাম। এ দুদিনে আর একটু অভিজ্ঞতা হল। তাদের বয়স্ক এবং শিশু বালকবালিকাদের শিক্ষার নমুনা পেলাম।

ঐ কলোনীর একদিকে অনেকগুলি চালাঘরও ছিল। তার কাছেই শিক্ষাগার দালানটী।

সেই চালাঘরগুলি ভারতবর্ষের সমগ্র দেশের 'দরিদ্র-শালার'মতই খড়ের ও মাটির তৈরী।

তাদের হাতের সামনে ছোট ছোট দড়ির অত্যন্ত দড়িতে-বোনা খাটিয়া। তাতে ছিন্ন-মলিন-জীর্ণ অতি অপরিচ্ছন্ন তুলো বেরিয়ে যাওয়া তুলো জমে যাওয়া শীত এবং বর্ষা "গ্রীষ্ম দরিদ্র নারায়ণের" সম কালীনঅনন্ত শয্যা পাতা।

সেই বিছানাতে কয়েকজন স্থবির অশক্ত-দেহ বুড়ো-বুড়ীর দল শুয়ে। পাশে তাদের ঘরের শিশু ও বালক-বালিকার দল। তাদের জামাকাপড় কেমন আমার না বললেও চলবে।

কেনা জানেন। হাত পা ধুলোমাখা নাকচোখ, মুখ খুবই অপরিষ্কার। সকালে জল ছুঁয়েছে মনে হয় না।

আমাদের ইস্কুলের জন্য আসতে দেখে তাদের মধ্যে যারা বড় তারা কয়েকজনমাত্র অপরিষ্কার ছোট ছোট ক্ষুদ্র শিশুগুলিকে নিয়ে বই শ্লেট হাতে এলো। চটচটে হাতমুখ, সেই হাতে খাত। কোলে ভাইবোন। ভাইবোন-গুলির হাতে 'হাত'রুটি গুড় পাঁউরুটি বিস্কুট কলা খইমুড়ির মোয়া দিয়ে ভুলানো হয়েছে। তাছাড়া অনেকেই এলো না।

শোনা গেল রাত্রি সাড়ে তিন-চারটে থেকে সহর পরিষ্কার করতে হয়। খুব ছোটরা যেতে পারে না। তাই তারা রয়েছে। তাছাড়া শিশু ভাইবোন বুড়ো-বুড়ীদের কে দেখবে? ১৫।১৬।১৩।১২ বছরের বয়স্করা যায় কাজ করতে। 'রোজ' ও 'রুজী' 'রোটী' না হলে মারা যায়? খাবে কি। 'লিখনা 'পঢ়না' সে পেট কাঁহা ভরত? নাহি হোত কুছ। তাদের ঠাকুমা দিদিমারা খাটে শুয়ে বললে। তাব যারা রাস্তায় কাজে যায় নি তারা গুরুজনদের জন্যে 'রোটী' বানাচ্ছে। নিচু ঘরে কাঠের জ্বালের উনুনের পাশে আর 'তসলা' (থালা) ভরা আটা ঠেসছে বালকবালিকারা।

দোতলার ঘরের মধ্যে ঢুকি নি। সেখানেও শয্যা ও শিশু সবই একই রকম মলিন।

বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছিল। রৌদ্রে ঝলমল করা বাড়ীগুলো। দেখতে পরিষ্কারও।

অনেকে কেন দোতলাবাসী আর অন্যরা কেন (ঝোপড়া) কুটীরবাসী তার হদিস আমরা পাই নি। এই বসবাসে ভাড়া অথবা 'অনুগ্রহ' 'প্রসাদে'র মহিমা আছে যা নয়াদিল্লী-পুরোনো-দিল্লীব 'হরিজন' হিসাবের ব্যাপার কিনা তাও বুঝতে পারিনি।

৯টা থেকে ১১টার মধ্যেই 'পহেলি' আর 'দুসরী' কিতাব'' আর নামতা পড়ানো শেষ হল। সকালের ক্লাস মোট ছাত্রছাত্রী শিশু বিভাগে (ঐ আড়াইশো—ঘরের অনুপাতে কত হওয়া উচিত?)

মাত্র ২৫ থেকে ৩০টী আমরা পেয়েছি দুদিন। আর বয়স্কদের সন্ধ্যার ক্লাসে ২০,২৫ জনের বেশী পাইনি। তাতে মেয়ে মাত্র ৪টী। কেননা বাকি মেয়েরা রান্নাঘরে ও শিশুশালায়। বাকি কজন পুরুষ। তারাও অধিবাসী অনুপাতে ঘরপিছু একজনও নয়। কারণ আছে।—সারাদিন হাড়ভাঙা রাস্তা বস্তি পরিষ্কারের কাজ। স্বাধীনতার পর আধুনিক দিল্লী নতুন এবং পুরোনোতে বিভক্ত। (বিভাগ আমাদের নেতাদের পেশা এবং নেশা।)

লালকেল্লাটী পুরোনো এলাকায়। সেটা বছরে দুদিন সম্মানিত হয়। (প্রসঙ্গত শুনুন জাতীয়তার বাণী রাষ্ট্র-ভাষার এত প্রচার ও আস্ফালন সত্ত্বেও ঐ মহা উৎসব দুটী হল (সেক্যুলার?)

বিদেশী তারিখেই চিহ্নিত। ২৬শে জানুয়ারী! (দেশী তারিখটী? মাঘ ১৩।১৪?) এবং ১৫ই আগষ্ট! (শ্রাবণ সংক্রান্তি?)। এই পুরোনো দিল্লীকে পরিষ্কার রাখা মানে সেকেলে ধরণের পাঁক ময়লা ভরা খোলা নর্দ্দমা শৌচাগার ইত্যাদি হাতে খেটে মাথায় করে নিয়ে হাতে ঠেলাগাড়ী করে পরিষ্কার করা। একেবারে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের কার্জ্জনী আমলের দিল্লী এখনো বহু জায়গায়।

আমি সে দিল্লীতেও বাল্যকালে ছিলাম। (২) নয়া-দিল্লীতে সাহেবী দিল্লী। দর্শক সাহেবরা। আধিবাসী কংগ্রেসী খদ্দরী সাহেবরা। নেহরুজীর "তিন মূর্ত্তি" ও নানা প্রাসাদে সজ্জিত বিদেশী ভ্রমণকারীদের হোটেল। দূতাবাসবাসীদের 'নেত্রগাত্র' সুখউৎপাদক নয়াদিল্লী পরিষ্কার রাখা তাদের কাজ।

তারা শরীরে মনে বিপর্য্যস্ত হয়ে বাড়ীতে বা ঝোপড়ীতে ফিরে আর শিশুবা বয়স্করা জ্ঞানবর্দ্ধক লেখাপড়া শিখতে পারে না। কথা কয়ে দেখেছি মেয়েগুলির সলজ্জ ইচ্ছা স্বামীকে পত্র লিখ্‌বে। কম বয়সের পুরুষদেরও তাই। কিন্তু বেশী বয়স্কদের স্থবির স্ত্রী তো লেখাপড়া জানে না।

আর 'খত্‌' লেখার প্রয়োজনই কার কতটুকু। সুতরাং সেই অবসরটুকু তারা কাটায়—"রামাহো রামা' গানে,-তুলসীদাসী রামায়ণ শুনে,-অনেকেই কিঞ্চিৎ দেশী-মাদক সেবা করে।

এখন একটী "হরিজন উদ্ধারণ'' কাহিনী শোনাই। ১৯৩৭এ ছিলাম অমৃতসরে পাঞ্জাবে। আমার বাড়ীর কাজের জন্য একটী লোক খুঁজছি। ঝি দরকার। এক-জন শিখ-বান্ধবী বললেন, তাঁর দাসীকে পাঠিয়ে দেবেন। বসে আছি। কেউ এল না।

দুদিন বাদে সেই বান্ধবী (তিনি জ্ঞানী গুরুমুখ সিং মুসাফির মহাশয়ের পত্নী) এসে বললেন, যে মেয়েটীকে তিনি পাঠাবেন বলেন, সে মেয়েটীকে বলেছে "সে আগে 'ভাঙ্গী' ছিল। শিখধর্মে নীতি বিচার নেই। তাই মিশেগেছে। কিন্তু এই বাঙালী মাতাজী কি তার কাজ নেবেন জিগ্যেস কোরো"...তার ভাই একটি স্কুলের মাষ্টার।

কথা বাড়ানোর দরকার নেই। "হরিজন উন্নয়ন" সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম। শিখ ও বৈষ্ণবধর্ম্ম স্মরণীয়। সাধারণের প্রথম প্রশ্ন এখন (১) হরিজন ফাণ্ডের আড়াই কোটী টাকা সুদে আসলে এখন কত?

(২) সেটাকায় শুধু দিল্লীর বা বম্বের অথবা বিহার মাদ্রাজের কি অন্য কোথাও কিংবা শুধু দিল্লীরই কজন 'হরিজন' উপযুক্ত শিষ্য পেয়েছে? নিজের সমাজের সুখ-দুঃখ উন্নতির কথা ভাবতে শিখেছেন কিনা?

শিক্ষার আসল উদ্দেশ্যই তাই। ভাবতে বুঝতে শিখে কাজ করতে পারা। চাকরী বা অনুগৃহীত মন্ত্রীত্বের উচ্চপদ পাওয়া নয়।

(৩) এবং ঐ টাকায় কটী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল হয়েছে। ওই সব স্কুলে বা অন্য স্কুলে পাঠশালায় ছেলেরা 'হরিজন' থেকেই পড়তে বাধ্য হয়, না, সব বর্ণের শ্রেণীতে মিশে যেতে পারে?

তারা যদি লেখা পড়া শিখে সমাজের গায়ে মিশে-যেতে না পারে নিশ্চয়ই তাহলে 'নিগ্রোদের' মত তারা একটী উপেক্ষিত পতিত জাত হয়েই থাকবে? "হরিজন-স্থান" চাওয়াও আশ্চর্য্য নয়। আসিবে সেদিন আসিবে হয়ত। এবং অভিধানে 'হরিজন' মানে ঝাড়ুদার হবে।

(৪) ঐ 'হরিজন' ফাণ্ডের টাকার আয় ব্যয় খরচ, হরিজনদের তাতে ভালো করা টাকা জমা করার দায়-দায়িত্বের অধিকার কাদের হাতে? সেকি আমাদের উচ্চবর্ণের লোকের হাতে? যাঁরা চিরকাল আগে নিজের ভাগে বিশেষ "ভালো" করে, কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট "ভালো" করেন অন্যের। (৫) 'হরিজন' সভ্য কজন আছেন ঐ 'অছি'তে? মোটেই আছে কি?

আঠারো দফার (১) "সাম্প্রদায়িকতাতে" বলার কথা মাত্র একটী আছে।

'সাম্প্রদায়িকতা' দিয়েই 'সাম্প্রদায়িকতা' উচ্ছেদ করা যেতে পারে। "কলসীর কানার মার খেয়ে প্রেমের বাণী"তে নয়। যদি প্রেমের বাণীতেই সব হ'ত তাহলে দেশবিভাগের ঐ "বিষম সাম্প্রদায়িকতা" মেনে নেওয়া হ'ল কোন্ নীতিতে। আর কিছুদিন মারামারি শক্তি-পরীক্ষা করে 'মার' খেলেন না কেন দুইপক্ষ? গান্ধীজীর প্রেমের পথ তো খোলাই ছিল। দেশ ভাগ হল কেন? সেটা কি 'সাম্প্রদায়িক প্রেমের' ফল? সত্যাগ্রহ বলতে 'সত্য' বোঝায় অথবা 'গান্ধীবাণী' মাত্র?

'গান্ধীবাদ'কে গান্ধীজী স্বয়ং নানা পথে ব্যর্থ করে গেছেন। দলের প্রীত্যর্থে। বহু কাজই 'সুভাষ অপসরণ-আদিও ঐ জন্যই করা হয়েছে।

একটা দৃষ্টান্ত, ১৯৩৭এর প্রাদেশিক মন্ত্রীত্ব নেওয়া হয় ৫০০৲ বেতনে।

যাই বলা হোক্ জিন্নাসাহেব কিন্তু সোজা লোক। ওসব 'মনে মুখে' দুরকম 'ধাপ্পাবাজী' করতেন না। তাই তাঁর দলেরা চুটিয়ে মন্ত্রীত্ব করলেন!

অতঃপর ১৯৪৭এর মন্ত্রীত্ব এলো। এবারে গান্ধীজীর অনুমোদনেই রাজ্যপাল ও মন্ত্রীত্বের 'মহান্ মর্য্যাদা' রাখার জন্য কত কত (বহু) হাজারী ব্যবস্থা হল? জানিনে। শোনা যায় নেহেরু ভবনেরই দৈনিক ব্যয় ছিল ২৫০০০৲। সেটা সরকারী খাতার হিসাব।

দ্বিতীয়টী শেঠজীদের দেওয়া "নজর খেলাত" ও গান্ধীজীর সময় থেকেই চলছে। সেও "নল্ রাজার অঙ্গুষ্ঠি ছিদ্র" পথ। সেটী এখন 'ভোটার্থ' সংগ্রহ পথে। শুচিতা বর্জিত 'পারমিট' কেনাবেচা প্রথার। ঐ সব ছিদ্রপথেই 'গান্ধীবাদের' বাকি কাজগুলি গান্ধীবাদীরা 'গান্ধীবাদের' দোহাই দিয়ে বাণী দিয়ে আর্থিক প্রশাসনিক ক্ষমতা দিয়ে রেখে দিয়েছেন। যে কোনো সময়ে "আসা

যাওয়ার দুইদিকেই খোলা আছে যার। প্রয়োজন শুধু 'ভাইয়োঁ' বলে বাণী বর্ষণ। গান্ধীবাদে "শুদ্ধশুচি গান্ধীবাদী" কজন আছেন বলা শক্ত।

বিবেকানন্দের একটী কথা উদ্ধৃত করি। সমাজ যে কোনো সংস্কারের কথায় তিনি বলেন "স্ত্রীজাতি আর শূদ্রদের শিক্ষা দাও। নিজের ব্যবস্থা তারা নিজে করবে"…। কোনো দফা নয়। প্রতিষ্ঠার মোহও তাঁর ছিলনা, মাদক সম্পর্কে। এক সময়ে আমাদের বাল্য-কালে "সুরাপান বা বিষপান" বলে একখানি বই আল-মারীতে দেখি কেশবসেনের প্রচারিত। উচ্চবর্ণের ঐ অভ্যাসবিষ বর্জ্জনের প্রচার পুস্তক। দেখা যাবে কিন্তু মাদক আসব সুরা মদিরা মদির পানীয়গুলি এখনো উচ্চপদস্থদের ভোজশালায় ভোজসভায় সম্মানিত ও প্রয়োজনায় বিভাগে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের আমোদ-প্রমোদ ভোগ্য ভোগবিলাসবস্তু রূপে। যদিও (১) তাঁদের অন্নের অভাব নেই। (২) অচ্ছাদনের অভাব নেই। (৩) আশ্রয়ের অভাব নেই। (৪) প্রমোদ-বিলাসভবনেরও অনটন নেই।

কিন্তু মাদক মদিরা ছাড়া তাঁদের চলে না কেন?

'হরিজন' বা 'দুঃখীজন'রা যদি তাঁদেরই আদর্শ নেয়, ছোট বা দরিদ্র উপায় বা উপাদানে কি বলার আছে!

(১) তারা পেটভরে খেতে পায় না (২) গায়ের কাপড় কিনতে পারে না (আমাদের সস্তাদামে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জিত হচ্ছে বিদেশে বস্ত্র চালান করে এখানে চড়াদামে বিক্রী করে)। (৩) তাদের খড়ের 'খাপরার' ঘরে শীতবর্ষার সুখ সকলেরই জানা।

(৪) তাদের খাদ্য মাত্র অর্দ্ধাশন অন্ন (চিনিতেও আমরা বৈদেশিক অর্থ অর্জ্জন করছি) আচ্ছাদন আশ্রয়ে দুঃখ অপরিমেয়। একমাত্র 'মন ভোলানো প্রমোদ আর ক্ষুধা ভোলানোর শীত দুঃখ নিবারণের উপায় ঐ রংগোলা স্পিরিট বা সস্তা মাদক। তাদের জীবনে অন্য উন্নত নেশা-'মাদক বিষয়' সৃষ্টি না করা আধি-শিক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞান ধর্ম্ম—তারা ঐ উপায়ে নিজেদের ভোলাবেই। তবু যে ভোলায় না সবাই এইটেই ভাগ্য মনে হয়। গড় হিসাবে তবু তারা এত সৎ এইটেই আশ্চর্য্য।

সঙ্কশাস্য

[১৯৫২ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব বঙ্গ বাংলা ভাষাকে যথোচিত মর্যাদার দাবীতে একটি গণ-উত্থান হয়। পাকিস্তানী শাসকবর্গ বাংলাভাষার পরিবর্ত্তে উর্দ্দু ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে চালু করিবার চেষ্টা করে; হিন্দু সংস্কৃতি ঘেঁষা ও মুসলমান-সম্প্রদায়ের বিরোধী বলিয়া বাংলাভাষা হইতে অনেক শব্দ খারিজ করিবার কথা ওঠে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত রেডিওতে নিষিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত গণ-উত্থান পাকিস্তান সরকারের ঐ সব কার্য-কলাপ ও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে করা হয়। ক্রমশঃ ভাষা-আন্দোলন আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বহু সংখ্যক মানুষের হত্যা ও নির্ম্মম পীড়ন করিয়াও শাসকদল ঐ আন্দোলনকে দমন করিতে পারেন নাই। আন্তর্জ্জাতিক সীমারেখার দুই পারেই পূর্ব্ববঙ্গে বাংলাভাষা রক্ষার আন্দোলন ও তাহার সমর্থন জোরদার হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে পুস্তক পত্রিকাদির চলাচল নিষিদ্ধ করিয়াও ঐ আন্দোলনকে প্রতিহত করা যায় নাই। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী পূর্ব্ববঙ্গে ভাষা আন্দোলনে প্রথম গুলী চলে; প্রতিবৎসর পূর্ব্ববঙ্গে এবং ভারতেও তাহার বার্ষিক স্মৃতি অনুষ্ঠান হইতেছে।

দৈনিক "কালান্তর" পত্রিকার ২৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে জনৈক পাক নাগরিকের লেখা একটি প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। লেখকের নাম অপ্রকাশিত। বাংলাদেশের উত্তর অংশে বাঙ্গালীর চিন্তা ও সাযুজ্য একই পারস্পরিক কল্যাণ-উদ্দেশ্যে সন্নিবদ্ধ হউক, প্রবন্ধ-লেখকের বক্তব্য ইহাই। আমরা উহা সংক্ষিপ্তাকারে পুনঃমুদ্রিত করিলাম।]

একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতি দিবস। "একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা চলবে না, অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" —এই দাবিতে ১৯৫২ সালে ঢাকা নগরীতে যাঁরা পুলিশের গুলিতে নিহত হন, এবার পূর্ব্ব পাকিস্তানের সর্ব্বত্র অন্যান্যবারের চেয়েও অনেক ব্যাপকভাবে তাঁদের স্মৃতি দিবস উদযাপিত হয়েছে।

দুই বাংলার জনগণের মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইহা শুধু যে দুই বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন তাই নয়, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুমূলত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসাবেও ইহা কাজ করতে পারে।

১৯৪৭ সালে যখন ভারত বিভাগ হলো তখন পূর্ব্ব বাঙলার হিন্দুরা বাঙালী বলতে শুধু নিজেদের বুঝতো,

মুসলমান বাঙালীরা তাদের বাঙালীর হিসাবের মধ্যেই পড়তো না।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক মানুষ পশ্চিম বাঙলার মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ হইতে চায়, তাদের জানতে বুঝতে চায়, তাদের শ্রদ্ধা করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব কামনা করে এবং এজন্যই তাদের আকাঙ্খা হল এখন সব কাজে পশ্চিম বাঙলাকে অনুসরণ করা বা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করা—যাতে দুই বাঙলার মানুষ পরস্পরকে আত্মীয় হিসাবে ভালবাসতে পারে। পশ্চিম বাঙলা এই ব্যাপারে যতটা সাড়া দিবে ততই পূর্ব্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাহায্য অনুভব করবে।

১৯৬৪ সালের দাঙ্গার সময় ঢাকাতে যে কোন শিক্ষিত মুসলমান বাঙালী তরুণ হিন্দুদের রক্ষা করা তাব পবিত্র দায়িত্ব বলে গ্রহণ করেছিল এবং এজন্য তারা তাদের জীবন বিপন্ন করতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সরকারও অবাঙ্গালী মালিকগোষ্ঠী এই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছে বলে তারা প্রকাশ্য অভিযোগ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে শাসানি দেয়।

হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা

যে দুদেশের কায়েমী স্বার্থবাদীদের সহায়ক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বড় শত্রু, অভিজ্ঞতা হতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের নতুন গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি তা উপলব্ধি করছে এবং এর বিরুদ্ধে তারা সংগ্রাম করছে, আরও তীব্র সংগ্রাম করতে চায়। পশ্চিম বাঙলায় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যত কঠিন সংগ্রাম হবে ততই পূর্ব্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক অন্দোলন জোর পাবে।

বাঙলার ইতিহাস ও বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐক্য, পূর্ব্ব বাঙলার সাহিত্য, প্রভৃতি বিষয়ে আকাশবাণীতে যে সকল আলোচনা থাকে পূর্ব্ব বাঙলার শিক্ষিত মানুষ খুব আগ্রহের সাথে তা শুনে। তাই এইগুলি যাতে ইতিহাস-নিষ্ঠ হয় এবং এগুলির মধ্যে যাতে সাম্প্রদায়িকতা. উগ্র জাত্যাভিমান, অভিভাবক ও বড়ভাই সুলভ উপদেশ দান, সঙ্কীর্ণতা ও আঘাত দেওয়ার মনোভাব প্রকাশ না পায় সেদিকে গণতান্ত্রিক মহলের দৃষ্টি থাকা উচিত'।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরা দুইটি জাতি—মিঃ জিন্নার এইরূপ ধর্ম্মভিত্তিক দ্বিজাতি তত্ত্ব অনুসারে ভারত বিভাগ হয়। সুতরাং কেবলমাত্র পাকিস্তানেব শাসকবর্গই নয়, সেখানকার প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ও কর্ম্মীরা ইহা ধরেই নিয়েছিল যে একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে "কায়েদে আজম" জিন্না ঢাকাব এক বিশাল জনসমাবেশে ঐরূপ ঘোষণা করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক দল ছাত্র যখন সাথে সাথেই প্রতিবাদ করল তখন সারা পূর্ব্ব বাঙলায় একটা চমক লেগে গেল। শহরে-বন্দরে-গ্রামে সর্ব্বত্র এক আলোচনার হিড়িক পড়ে গেল। এক নতুন গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটল। পূর্ব্ব বাঙলার মুসলমানরা নিজেদের বাঙালী বলে দাবী করলে, তারা এজন্য গর্ব প্রকাশ করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারা জীবন দান করে প্রমাণ করল যে তারা বাঙালী, বাঙলা ভাষার মর্যাদাকে তারা ভূলুণ্ঠিত হতে দিবে না। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার অন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানের মানুষ যেভাবে সংগ্রাম করেছে তাব নজীব সম্ভবতঃ দুনিয়ার ইতিহাসে খুব বেশী নাই। এর কারণ রয়েছে। ভাষার লড়াই ছিল আসলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাঙালী জাতির জাতি-সত্তা রক্ষার লড়াই। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী "মুসলমানরা এক জাতি" এই ধ্বনি তুলে সেই রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগুলির অস্তিত্ব বিলোপ করে তাদের উপর অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতনকে চিরস্থায়ী করার যে ষড়যন্ত্র এঁটেছিল, ভাষা আন্দোলন ছিল তারই বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ। এই আন্দোলনই ক্রমে ক্রমে এখন পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পরিণত হয়েছে।

শুধু মৌখিক সমর্থন জানানই নয়, পূর্ব্ব বাংলার

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি পশ্চিম বাংলার গণতান্ত্রিক মানুষের দায়িত্ব অপরিসীম।

পূর্ব্ব বাঙলার বাঙালী মুসলমানরা এখন তাদের বাঙালীর জাতীয় সত্তার জন্ম সংগ্রাম করছে, এর অর্থ এই নয় যে তারা তাদের পাকিস্তানী সত্তা ত্যাগ করেছে।

পূর্ব্ব বাংলার মুসলমানরা বাঙালী। কিন্তু তারা পাকিস্তানী বাঙালী। এটা অদ্ভুত কিছু নয়। পশ্চিম-বাংলার মানুষেরা বাঙালী, কিন্তু এটাই তাদের পরিচয় নয়, তারা ভারতীয় ও পাকিস্তানী বাঙালী—এই দু'য়ের মধ্যে দু'টা রাষ্ট্রীয় সত্তার বিভিন্নতাই প্রকাশ পায় না, দু'টা জাতীয় সত্তার মধ্যেও বিভিন্নতা রয়েছে।

পূর্ব্ব-বাঙলার মানুষ পশ্চিম বাঙলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিকট হয়তো একটু অতিরিক্ত আশা করে। এদের সম্বন্ধে তাদের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা কম এবং কল্পনা অনেক কিছু। কলকাতাকে তারা বাঙালীদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তীর্থক্ষেত্র জ্ঞান করে এবং এদেশে দেখার জন্ম তাদের আকুল আগ্রহ। পশ্চিম বাঙলার গণতান্ত্রিক মানুষ যখনই কোন শক্তির পরিচয় দেয় তখন পূর্ব্ব বাংলার মানুষ, বিশেষতঃ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের [illegible]রোধা শিক্ষিত তরুণরা বিপুল উৎসাহ বোধ করে, গর্ব [illegible]রে। পশ্চিম বাঙলায় গণতান্ত্রিক শক্তির কোন [illegible]র্ব্বলতা ও ব্যর্থতা তাদের দুঃখ দেয়, দুর্বল করে, [illegible]দের কাজ কঠিন করে তোলে। তারা পশ্চিম [illegible]ঙলার বইপত্র পড়তে চায়, গান শুনতে চায়, সিনেমা-[illegible]বি দেখতে চায়, ছাত্র-শিক্ষক-সংস্কৃতিসেবীদের সাথে [illegible]লতে চায়। দুই বাঙলার মানুষই আজ এই সকল [illegible]ধিকার হতে বঞ্চিত, দুই দেশের সরকার একে অন্যকে [illegible]ন্য দোষারোপ করে। মনে হয় দুই দেশের [illegible]তান্ত্রিক মহল যেন তাতেই তৃপ্ত। আমাদের বিশ্বাস [illegible]চম বাঙলার ঐতিহ্য সম্পন্ন ও অগ্রসর গণতান্ত্রিক [illegible]ন্দোলনের দায়িত্ব এক্ষেত্রে অনেক বেশী।

পাকিস্তান শহীদ স্মৃতি সমিতি যদি আজকের মত [illegible]ন্ন অনুষ্ঠান এবং বিভিন্নমুখী কাজের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার গণতান্ত্রিক কর্মী ও জনগণের সামনে তাদের যথার্থ দায়িত্বগুলি স্পষ্ট করে তুলে ধরেন তাহলে তাদের এই জীয়ন কাঠির স্পর্শে সবাই সজাগ হয়ে উঠবে এটা দৃঢ়ভাবেই বিশ্বাস করি।

বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস

[পশ্চিমবঙ্গের সহ স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ রমেশ-চন্দ্র আচার্য কুষ্ঠ ব্যাধি দূরীকরণের জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা আহ্বান করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। কুষ্ঠ রোগ মাত্রই যে সংক্রামক নয়, কুষ্ঠ রোগ যে সম্পুর্ণ নিরাময় হইতে পারে, ডাঃ আচার্য তাহা বলিয়াছেন। প্রবন্ধটি আমরা মুদ্রিত করিলাম এবং আশা করি এতৎ সম্বন্ধে জনমত জাগ্রত হইবে।]

কুষ্ঠরুগীরা আজও আমাদের সমাজে ঘৃণার পাত্র। মহাত্মা গান্ধীজি এই সব কুষ্ঠরুগীদের আরোগ্য লাভের পর সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্ম আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। সমাজে জন্মগ্রহণ করেও যাঁরা সমাজে পরিত্যক্ত, জীবনের রূপ-রস উপভোগে বঞ্চিত···সেই অগণিত হতভাগ্যদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর সহানুভূতি। তাই তাঁর তিরোধান দিবসটিকে গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিশ্বের জনগণ "বিশ্ব কুষ্ঠ দিবস" রূপে পালন করে আসছেন।

বিশ্বে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক এই রোগে ভুগছেন। আমাদের ভারতবর্ষেই এই রোগী সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে এই রোগে ভুগছেন প্রায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজার লোক। আমাদের অজ্ঞতা, গোপনতা, কুসংস্কার এবং প্রথম অবস্থায় চিকিৎসার অবহেলা এই রোগ বিস্তারের কারণ। কয়েক শত বর্ষ কাল পূর্ব্বে ইউরোপে এই মহাব্যাধি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত চেষ্টায় সমাজের মধ্যে থেকে সব অবস্থায় কুষ্ঠরোগীদের সন্ধান করে বার

করে নিয়মিত এবং উপযুক্ত চিকিৎসা করার দরুণ আজ আর সেখানে এই রোগ একরকম দেখা যায় না।

অনেকেই মনে করেন কুষ্ঠরোগ ভগবানের অভিসম্পাত দুরারোগ্য এবং বংশানুক্রমিক। কিন্তু বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে ইহার কোনটিই সত্য নয়। কুষ্ঠরোগ দুই প্রকার···সংক্রামক ও অসংক্রামক। যত কুষ্ঠ রোগী আছে তার প্রায় এক চতুর্থাংশ সংক্রামক। সংক্রামক কুষ্ঠ রোগীদের নাক, গলা এবং চামড়ার নিঃসৃত রসে এই রোগের জীবাণু থাকে। এই রোগ পূর্ব্ব--পুরুষ হইতে উত্তরাধিকারী হিসাবে জন্মায় না। কেবল সংস্পর্শ দ্বারাই রুগ্ন দেহ হইতে সুস্থ দেহে গমনাগমন করে। বহুকালের ঘনিষ্ঠতা যেমন একই বিছানায় শয়ন, রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্র পরিধান, একত্রে বেড়ান, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি দ্বারাই জীবাণু সুস্থ শরীরে আক্রমিত হয়।

বহুদিন কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে থাকার ফলে এই রোগের আক্রমণ ঘটতে পারে। বড়দের চেয়ে শিশুরাই সহজে এই রোগে আক্রান্ত হয়। তবে রোগ জীবাণু সংক্রমনের সঙ্গে সঙ্গেই রোগ প্রকাশ পায় না। রোগ প্রকাশ পেতে সাধারণতঃ ১ মাস থেকে ৭ বৎসর সময় লাগে।

প্রথমে শরীরের চামড়ার স্বাভাবিক রং বিবর্ণ হয়। শরীরের যে কোন অংশে আধ ইঞ্চিরও কম পরিমিত চমড়াও ওপর দাগ (patch) দেখা যায় এবং তাতে অনুভূতি থাকে না।

সংক্রামক জাতীয় কুষ্ঠের বিশেষ লক্ষণ এই যে রোগীর কানের ও মুখের চামড়া ফুলে ওঠে ও রং রক্তাভ বা তামাটে হয় এবং মসৃণ ও চকচকে দেখায়। চোখের ওপর ভ্রূগুলি ফুলে ওঠে ও শূন্য হয় এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই কানে, মুখের ও শরীরের অন্যান্য অংশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে ফুলে ওঠে। কোন কোন ক্ষেত্রে নাকের বিকৃতি ঘটে। চোখ আক্রান্ত হলে অন্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে। সংক্রামক জাতীয় কুষ্ঠ রুগীর সংস্পর্শ অত্যন্ত বিপদজনক।

অসংক্রামক জাতীয় কুষ্ঠে কখন কখন হাতের এবং পায়ের আঙ্গুলগুলি প্রথমে অসাড় হয়, তারপর ক্ষত হয়। এই অবস্থায় চিকিৎসা না করলে হাতের বা পায়ের আঙ্গুলগুলি পচে দেহ থেকে খসে পড়ে। এই সমস্ত আক্রামক রুগী কিন্তু কুষ্ঠের জীবাণু ছড়ায় না। সুতরাং এই জাতীয় কুষ্ঠরুগীর সংস্পর্শ মোটেই বিপদজনক নয়।

প্রথম অবস্থায় ছুলি, দাদ বা কোন চর্ম্মরোগ মনে করে সময় নষ্ট না করে যদি কুষ্ঠ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট পরীক্ষা করান হয় তবে অতি সহজেই সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করা যায় অনেক রুগী সমাজ থেকে পরিত্যক্তের ভয়ে ও কুসংস্কার বশতঃ প্রথমে রোগ গোপন করেন। ফলে শুধু রোগ সারানাই যে কঠিন হয় তাই নয়, সংক্রামক জাতীয় হলে রোগ ততদিনে বহুলোকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরে যখন রোগ ভালভাবে প্রকাশ পায় তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ জটিল হয়ে পড়ে, চিকিৎসাতে অনেক সময় লাগে, আবার অনেক সময় অঙ্গ বিকৃতিও রোধ করা যায় না। এই রোগ প্রথম অবস্থা থেকে পূর্ণ অবস্থায় পৌছুতে প্রায় ৫।৭ বৎসর সময় লাগে। পূর্ণত্ব কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসা করতে বহু সময়ের দরকার হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার যুগে উপযুক্ত এবং সময়মত চিকিৎসা করলে কুষ্ঠব্যাধিও অন্যান্য রোগের মত সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। সংক্রামক ও অসংক্রামক উভয়প্রকার কুষ্ঠ রোগীরই চিকিৎসার প্রয়োজন। অসংক্রামক রুগী স্বাভাবিক জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই উপযুক্তরূপে চিকিৎসা করাতে পারেন। কিন্তু সংক্রামক রুগীকে চিকিৎসার দ্বারা অসংক্রামক না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে হবে। রোগ সম্পূর্ণ না সারা পর্য্যন্ত অবশ্য চিকিৎসা করাতে হবে।

একদিন ছিল যখন মানুষ অজ্ঞানতা বশতঃ কুষ্ঠরুগীকে মনে করতো সমাজের জঞ্জাল। এ রোগ যে সারতে পারে তা কেউ ধারণা করতে পারেনি। কিন্তু উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে এবং ব্যাপক রোগ নিরোগ

প্রচেষ্টার কাছে এই রোগকেও আজ পরাজয় মানতে হয়েছে। কিন্তু রোগ সেরে গেলেও রোগীর প্রতি আগেকার মত সামাজিক অবিচার এখনও রয়েছে। সমস্যা দাঁড়িয়েছে সেইখানে। এতে রুগী রোগ গোপন করছেন…তাতে একদিকে রোগ সারার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠছে, অন্যদিকে তাঁদের দ্বারাই রোগ বেশী ছড়িয়ে পড়ছে।

তাতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। আবার সংক্রামক রুগীকে প্রথমে পৃথক করে রেখে উপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা অসংক্রামক হয়ে যাওয়ার পর সমাজে সাধারণ মানুষের মতই বাস করে চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন। তাতে কারো কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই। এই উভয় প্রকার রুগীদের আমরা সময়মত আমাদের মধ্যে স্থান দিতে পারি। এতে রুগী রোগ গোপন করবে না। রোগ তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে, উপযুক্ত এবং সময়মত চিকিৎসায় তাড়াতাড়ি সেরে যাবে এবং রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা অনেক কমে যাবে। সরকারের এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের "কুষ্ঠরোগ নিরোধের" এই ব্যাপক অভিযান সফল করতে হলে সর্বাগ্রে চাই জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ ও সংযুক্ত সহানুভূতি একাগ্রতা ও চেষ্টা।

আহারাদি কি রকম কর্‌ব ?

"হিতাহার, মিতাহার, মেধ্যাহার। যে আহার্য গ্রহণে শরীরের হিত হয়, অহিত হয় না। যে আহারের পরিমাণ প্রয়োজনমাফিক, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নয়। যে আহার্য গ্রহণে মেধা বর্ধিত হয়, সদ্বিষয়ের স্মৃতি জাগরূক রাখ্‌তে সহায়তা হয়।

"মহম্মদ মাংসকে শ্রেষ্ঠ আহার মনে করতেন, আর্য ঋষিরা ঘৃতকে শ্রেষ্ঠ আহার মনে করতেন। কিছুদিন মাংস খেয়ে আর কিছুদিন ঘৃত খেয়ে তারপরে তোমাকে নিশ্চয় স্বীকার করতে হবে যে দধি দুগ্ধ আর মাখন মাংসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, ঘৃতের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। শরীর যা সহজে গ্রহণ করতে পারে, যে খাদ্য খেয়ে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয় অল্প, যে খাদ্যে কোষ্ঠকাঠিন্য বাড়ে না, বা অতিমাত্রায় কোষ্ঠতারল্য ঘটে না, যে খাদ্য যকৃতের ক্রিয়া-পরিচালনে সাহায্য করে, যা' স্বল্পায়াসে জীর্ণ হয় এবং এত সব গুণের সঙ্গে যে খাদ্যের সুলভতা গুণ রয়েছে, তাই হিতাহার।

"কিন্তু খাদ্যরূপে আমিষ বা নিরামিষ যাই গ্রহণ কর, লোভকে বাদ দিয়ে আহার কার্যটি সারতে হবে। যে খাদ্যে যখন লোভ দেখবে, সে সম্পর্কে তখন সঙ্কোচ-বিধি অবলম্বন করবে। অর্থাৎ সেই খাদ্যের পরিমাণ এবং বার কমিয়ে দেবে।"

—স্বরূপ-বাণী

সাময়িকী

কংগ্রেসের নূতন সংসদীয় নেতা

পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দল বিধানসভায় কাজ চালাইবার জন্য সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে নেতা নির্বাচিত করিয়াছেন। সিদ্ধার্থশঙ্কর বিধান রায়ের জীবিতকালে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হইতে ইস্তফা দিয়া দলত্যাগ করেন। ষ্টেট্‌সম্যান পত্রিকা তাঁহাকে তখন Angry young man বা 'ক্রুদ্ধ নব যুবক' এই আখ্যা দেয়। সিদ্ধার্থশঙ্কর তাহার পর কম্যুনিষ্ট ও প্রায়-কম্যুনিষ্ট দলগুলির সমর্থন পাইয়া বিধানসভার উপনির্বাচনে জয়লাভ করেন, এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাকে বহুবার বিব্রত করিয়াছেন। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন, এবং কেন ঐরূপ করিলেন তাহা বর্তমান নিবন্ধ-লেখকের নিকট বর্ণনা করেন। তাঁহাকে তখন এইরূপ বলা হইয়াছিল যে শখের বা 'পার্টটাইম' রাজনীতি করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে, হাইকোর্ট এবং অ্যাসেম্‌ব্লির মধ্যেকার দূরত্বকে ভৌগলিক বিচার হইতে সরাইয়া নিতে হইবে। সর্বস্ব পণ করিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণে যদি তিনি আত্মোৎসর্গ করিতে না পারেন, তবে যেন তিনি সক্রিয় রাজনীতির বাহিরে থাকেন। মনে হইতেছে তিনি সম্পূর্ণভাবে রাজনীতির আসরে নামিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে উপদলীয় কোন্দলে যদি তিনি আত্মনিয়োগ করেন, তবে তিনি বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে যাইতে পারিবেন না ; একথা তিনি যেন মনে রাখেন।

এবারের নির্বাচনে ২৮০টি আসনে প্রার্থী দিয়া কংগ্রেস দল মোট ভোটার-সংখ্যার ২৮.৮% এবং প্রদত্ত ভোটের ৩৯% পাইয়াছে। অপরপক্ষে যুক্তফ্রণ্টের প্রার্থীরা যথাক্রমে ৩২% ও ৪৪% পাইয়াছে। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ হইতেই কংগ্রেসের পক্ষে প্রদত্ত ভোটসংখ্যা কমিয়া আসিতেছে ; ১৯৬২-তে কংগ্রেস প্রদত্ত ভোটের ৪৭,৩% এবং ১৯৬২-তে ৪১,৩% পাইয়াছিল, এবার উহা কমিয়া ৩৯% হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে ৪১,৩% ভোট পাইয়া যেখানে ১২৭টি আসন পাওয়া গিয়াছিল, ৩৯% পাইয়া প্রাপ্ত আসনের সংখ্যা অর্ধেকেরও কম হইয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার দিকে তাকাইলেই চলিবে না, কংগ্রেস-প্রার্থীর ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও অন্যান্য গুণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তুলনায় বেশি থাকিলে হইবে, নতুবা ভবিষ্যতে কংগ্রেস দলে নির্বাচিতের সংখ্যা আরও কমিবে।

অর্ধশতাব্দী ধরিয়া দেশের মানুষের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খার চরিতার্থতার জন্য কংগ্রেসের দিকে লোকে তাকাইত। জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ, এই দুইটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া প্রায় শতাব্দীকাল ভারতীয় জনগণ জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সংগ্রাম করিয়াছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তিরপর সমাজতন্ত্র বা সমসমাজের আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃই দেখা যাইতে লাগিল যে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ কথায় এবং কাজে পার্থক্য সৃষ্টি করিতেছেন। ফলে, জনগণের মনে হতাশা আসিল, ক্রমে হতাশা বিদ্বেষে পরিণত হইল। যাহারা নূতন ভোটাধিকার পাইল, তাহারা কংগ্রেসের বিপক্ষে দলবদ্ধ হইতে লাগিল।

এই যে নূতন মানুষরা ভোটাধিকার পাইতেছে, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-নেতৃত্ব যদি তাহাদের সমস্তা আশা আকাঙ্খা সম্বন্ধে দরদ বোধ না করেন, তাহার সুচারু সমাধান করিতে প্রয়াস না করেন, তবে শুধু যে

কংগ্রেসের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইবে, তাহা নহে; পরন্তু দেশের সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক বিন্যাসও ধ্বংস হইবে।

দলীয় কোন্দলের উর্ধে উঠিয়া যদি সেদিনের "ক্রুদ্ধ নব যুবক" সিদ্ধার্থশঙ্কর কায়মনোবাক্যে সংসদীয় কংগ্রেস পার্টির এবং সমগ্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলের পুনর্বাসন ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার জীবন সফল হইবে। এবং এই পুনর্বাসনের মন্ত্র হইবে শোষণহীন সমাজের ও জাতীয়তাবাদের অভীপ্সা হইতে উদ্গীত।

পশ্চিমবঙ্গে অকংগ্রেসী সরকার

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চম সাধারণ (অন্তর্বর্তী কালীন) নির্বাচনে বিধানসভার মোট ২৮০টি আসনের মাত্র ৫৫টি অধিকার করিয়া কংগ্রেস পার্টি মন্ত্রিসভা গঠনে অপারগ হইয়াছে। কংগ্রেসবিরোধী দ্বাদশ পার্টি মার্কসিষ্ট কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করিয়া ২১৪টি আসনে জয়লাভ করে, পরে আরও ৬টি নির্বাচিত সদস্য ঐ দলে যোগ দিয়াছেন, শোনা যাইতেছে কংগ্রেস দল হইতেও কয়েকটি সদস্য দলত্যাগ করিয়া যুক্তফ্রন্টে অভ্যাগত হইবেন। পশ্চিমবঙ্গে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে, এই প্রথমবার অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠ সদস্যসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত হইল। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের 'যুক্তফ্রন্টে' যাহারা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রফুল্ল ঘোষ, হুমায়ুন কবীর, জাহাঙ্গীর কবীর, এবং তাঁদের দলগুলি, প্রজা সোসালিষ্ট পার্টি, এবং আগের বারের একাধিক মন্ত্রিসভা পতনে যাঁহার নাম বিশেষভাবে শোনা গিয়াছিল, সেই আশুঘোষ এবং তাঁহার দলের প্রায় সব কয়টি প্রার্থীই নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী না হইয়াও এবং শ্রেণী সংগ্রাম ও সশস্ত্র বিপ্লবপন্থায় বিশ্বাসী হইয়াও কম্যুনিস্ট দুই দল বিধানসভায় ও মন্ত্রিত্বে অংশগ্রহণ করিয়াছেন। বাহিরে পার্টি-সংগঠন ও শ্রেণী সংগ্রামের যাবতীয় ক্রিয়াকার্যে লিপ্ত থাকিয়া এবং সংসদের ভিতরে হইতে প্রশাসন যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ও সংবিধানগত সংকট সৃষ্টি করিয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করা সম্ভব, যাহার ফলে জনগণের কল্যাণের জন্য একমাত্র সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতিরেকে অন্য পথ নাই, এইরূপ ধারণা প্রচারিত হইতে পারিবে। ভিতরে ও বাহির হইতে যুগপৎ চাপ সৃষ্টি করিয়া ঐরূপ অবস্থা ত্বরান্বিত করা যাইতে পারিবে। নবগঠিত মন্ত্রিমণ্ডল ও যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাধিক রাজনৈতিক সম্প্রদায়গুলির কোনও কোনওটি অথবা একাধিক গোষ্ঠীর কর্মনীতি যদি এইরূপ হয়, তবে বিস্ময়ের কারণ হইবে না।

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যেও যদি আকাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টি না হয়, অর্থাৎ গণবিপ্লব না ঘটে, তবে পুনরায় নির্বাচনে প্রার্থী দিয়া জয়লাভ করিতে হইবে; যুক্তফ্রন্টের সংগ্রামী মনোভাব যে সব দলগুলির আছে, তাহাদিগকে কয়েকটি জনকল্যাণের প্রোগ্রাম সফল করিতেই হইবে। চটকদার বুলি নিঃসৃত করিলেই চলিবে না।

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কল্যাণ-সাধনই প্রথম কর্তব্য বলিয়া নিশ্চয় বিবেচনা করিবেন, এবং তৎসাধনে ব্রতী হইবেন। কম্যুনিস্ট পার্টি সমূহের একটি অপবাদ আছে যে তাঁহারা সর্বভারতীয় পার্টির রাজ্যশাখা বলিয়া এবং বহুতর অবাঙালী শ্রমিকের ভোট পাইয়া থাকেন বলিয়া সর্বতোভাবে বাঙালী জাতির ও বাংলাদেশের স্বার্থরক্ষায় তৎপর হইতে পারেন না। কৃষিকার্যে ও মিলকারখানায় অধিকতর সংখ্যায় বাঙালী শ্রমিক নিয়োগ ব্যাপারে কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট, উভয় মতাবলম্বী দলই অকর্মণ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এবার-কার নির্বাচনের ফলে তাঁহারা অধিকতর সক্রিয় ভাবে বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির স্বার্থ ও আত্মরক্ষায় তৎপর হইবার নীতি গ্রহণে প্রবুদ্ধ হইতে পারিবেন। অনাকরেক ধনী বাঙালী ভিন্ন চা ও পাটের উৎপাদনে ও শিল্পে বাঙালী শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের কোনও স্বার্থ নাই; সুতরাং খাদ্যশস্য উৎপাদনে চাষের জমির পরিমাণ বাড়াইতে তাঁহাদের আপত্তি করিবার কারণ নাই।

আহার্য, আশ্রয়, পরিধেয়, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপার্জন ও নিরাপত্তা,—জীবনধারণের এই মৌল বিষয়গুলির প্রাপ্তি সম্বন্ধে যে গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়তা দিতে পারে না, তাহার দেশশাসনের অধিকার নাই। এই মৌল বিষয়গুলির প্রাপ্তি-বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ কতোটা স্বয়ংভর হইতে পারে, যুক্তফ্রণ্টের বিভিন্ন দলগুলিকে তদ্বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। নিছক রাজনৈতিক ভাবাবেশে অভিভূত হইলে চলিবে না. বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। যতোটা সম্ভবপর, স্বয়ংভরতা অর্জনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে।

প্রশাসনিক ব্যপারে আমূল সংস্কার সাধন হওয়া দরকার। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে ধারা ও রীতি অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে. তাহা সর্বজনের হিতকারী হয় নাই। শুধু কয়েকটি অবসর-গ্রহণ ও বদলীর আদেশ বা দলীয় মতানুরাগীর নিয়োগেই যেন উহার দায়িত্ব শেষ না হয়।

অর্থনৈতিক তথা শিল্পোন্নয়ন ব্যাপারে সর্বদেশেই মোটামুটি কয়েকটি উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। অতি বৃহৎ ও ভারী শিল্প, যেমন—ইস্পাত ও সিমেণ্ট, জাহাজ রেলগাড়ী ও ইঞ্জিন, এরোপ্লেন, সার প্রভৃতি শিল্পে মূলধনের জোগান ও পরিচালন রাষ্ট্রীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারপর আছে অজস্র ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদনের বৃহত্তর বড় বড় মিলকারখানা, যেমন—মোটরগাড়ী, ষ্টিমলঞ্চ, ইলেকট্রনিক্স, অজস্র প্রকারের যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও ঢালাই-এর কারখানা, ঔষধ ও কাগজ, প্রভৃতি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প। এইগুলি প্রাইভেট্ সেক্টরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। যতদিন না দেশে সোসালিজম্ প্রয়োগ করা হইতেছে, ততদিন মূলধন সংগ্রহে এবং লগ্নী ও নিয়োজনে উৎসাহ দেওয়া গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্টের অন্যতম দায়িত্ব।

উপরোক্ত দুই প্রকার শিল্পধারার পরও জনগণের উপার্জনের জন্য ক্ষুদ্রায়ত মালিকানা বা অংশীদারী এবং প্রাইভেট্ লিমিটেড কোম্পানীর মধ্যে শ্রম ও মূলধন নিয়োগের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার করণীয় কার্য করিতে হয়।

মূলধন যাদের নাই, অথচ উৎসাহ বা প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা আছে, অথবা শুধু উৎসাহ আছে, সেই সব মানুষের উপার্জনের সুবিধা করিয়া দিতে কল্যাণ-রাষ্ট্র বাধ্য। কি উপায়ে তাহা হইতে পারে ? সর্বাপেক্ষা ধনীর দেশ যুক্তরাষ্ট্রেও সেই চিন্তা হইয়াছে, ইংলণ্ডে ও পশ্চিম ইয়োরোপেও হইয়াছে। ক্ষুদ্রায়ত শিল্পের জন্য পশ্চিম জার্মানীতে গোয়েরিং প্ল্যান দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী কালে তথাকার জনগণের প্রচুর উপকার করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সমবায় আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশেও সমবায় প্রথার প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এ যাবৎ প্রায় সাত শ' কোটি টাকা মূলধন এবং ঋণ বাবদ দিয়াছে; আরও দিবে সন্দেহ নাই। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিমণ্ডলী যদি ব্যাপক ভাবে সমবায় আন্দোলনে অগ্রনী হ'ন এবং অদ্যাবধি কৃত দুষ্কর্মের পুনরাবির্ভাব অসম্ভব করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে বাংলাদেশে তাঁদের আসন চির-স্থায়ী হইয়া থাকিবে।

খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল নিরোধের জন্য, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিরোধে, শিক্ষায়তনে আফিসে আদালতে শৃঙ্খলার পুনঃস্থাপনে, তাঁহাদের প্রয়াস নিবদ্ধ হউক।

যুক্তফ্রণ্ট এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছেন। আগেরবারের মতো মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য অহরহ তাঁহাদিগকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে না। তাহাদের বিঘোষিত প্রোগ্রামে গণতান্ত্রিক কর্মধারারই সঙ্কেত দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানের সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাঁহারা কেন্দ্রের সঙ্গে বিরোধ করিতে পারেন, কিন্তু কোন রকমেই উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতে পারেন না।

সেই গভর্ণমেণ্টই প্রকৃত গণতান্ত্রিক, যাহার মূলনীতি ও দৈনন্দিন কার্যক্রম "বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ" হইবে। অরাজকতা, বৈষম্যমূলক আচার অনুষ্ঠান, মুষ্টিমেয়র হাতে ধন ও সমৃদ্ধি কেন্দ্রীভূত হওয়া রাজনৈতিক মত নির্বিশেষে গোষ্ঠীস্বার্থ সাধন,—সমস্তাবেই তাঁহারা প্রতিহত করিবেন। তাহা না করিতে পারিলে তার

কোটি বাঙালীর নিকট তাঁহারা অপদার্থ বলিয়া পরিচিতি পাইবেন।

নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের কারণ

মাঘ সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গ অংশে বাংলায় কংগ্রেসের পতন সম্বন্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া আমাদের একজন পাঠক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

"বিবিধ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পতনের যে সব কারণ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা ঠিকই। কথায় অহিংসনীতির প্রচার এবং কাজে হিংসার ব্যবহার, অত্যুগ্র হিন্দী-অনুরাগ, বেকার সমস্যার সমাধানে অপারগতা, মিলকারখানা হইতে বাঙ্গালী চাকুরিয়ার সংখ্যায় ক্রমশঃ হ্রাস পাওয়া, ইত্যাদি যেসব বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যথার্থ হইয়াছে। আমার বিবেচনায়, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের জনসমর্থন কমিয়া যাইবার আরও কয়েকটি কারণ আছে, সেইগুলি হইতেছে—

১) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র পরিচালনের কথা বলিয়া ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই চালু রাখা—বিদেশ হইতে ঋণ ও সাহায্য যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সুপরিকল্পিতরূপে বৃহৎ বণিকগোষ্ঠীরই হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং ঋণ ও সাহায্য পাইয়া বৃহৎ উৎপাদকগোষ্ঠী মুনাফা লুঠের কারবার ফলাও করিয়া তুলিয়াছে। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে হইতে অদ্যাবধি বিদেশী ঋণ ও খয়রাতীর পরিমাণ চৌদ্দ হাজার কোটি টাকার কম হইবে না। এই বিপুল টাকার বিনিময়ে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বলা চলে না। বিশেষতঃ 'কো-লেবরেশন' নামক এক অপূর্ব্ব সহযোগিতার উদ্ভাবন করিয়া যে মজ্জা-শোষণকারী অর্থনৈতিক দাস-যুগের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, তাহার প্রতি বিরাগ প্রায় বৈরিতার স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

২) ট্যাক্স-ফাঁকী-দেওয়া যেসব ধনীগোষ্ঠীর নাম কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিজেই পার্লামেন্টে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং যেসব ধনী বণিকদের নাম ইন্‌ভয়েসের কারচুপি ব্যাপারে প্রকাশিত হইয়াছে, বৈদেশিক মুদ্রার বে-আইনী—লেন দেন করিয়া যাহারা অভিযুক্ত হইয়াছে, কংগ্রেস গবর্মেণ্ট্ তাহাদিগকে শাস্তিদানের ব্যবস্থা করেন নাই। পক্ষান্তরে, কংগ্রেসী বড়োকর্তাদের সঙ্গে তাহাদের 'দহরম মহরম' চলিয়া থাকে।

৩) বিগত একপুরুষ কাল ধরিয়া সিনেমা ও রেডিও, এবং আমদানীকৃত তরল চিন্তাদ্যোতক বই ও ছবির মাধ্যমে কুৎসিত মনোভাব জাগ্রত করা, নটী ও অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে কংগ্রেসী শীর্ষস্থানীয় অনেকেরই অশোভন উৎসাহ, এক কথায়: দেশের সর্ব্বশ্রেণীর তরুণ তরুণীকে বিপথগামী হইতে সহায়তা করিবার জন্য কংগ্রেস তথা গবর্ণমেণ্ট্ পরিচালক পার্টিকে দিনের পর দিন অধিকতর অপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। এবারের নির্ব্বাচনে দুই-লক্ষেরও বেশি সংখ্যক নূতন ভোটার (যাহাদের বয়স সবেমাত্র একুশ বৎসর হইয়াছে) একযোগে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া প্রমাণ করিয়াছে যে তাহারা উন্মার্গ-গামী 'হিপি' নয়, তাহারা সুস্থ জীবনাদর্শই চায়।

৪) কংগ্রেসী কর্তারা এতকাল মুখে গরীবের জন্য দরদ প্রকাশ করিলেও আসলে ধনীদেরই পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছেন এবং করিয়াছেন। যুক্তফ্রন্টের নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় বারে বারেই এই কথা বলা হইয়াছে যে কংগ্রেসীদের সমর্থিত রাজ্যপাল অন্যায়ভাবে 'গরীবদের প্রতিনিধি' যুক্তফ্রন্ট্ মন্ত্রিসভাকে খারিজ করিয়াছেন। যুক্তফ্রন্টের অন্তর্বিরোধের সুযোগ লইয়া রাজ্যপাল অশোভন ব্যগ্রতায় তৎকালীন ম'ন্ত্র অজয় মুখোপাধ্যায়কে অসময়ে (রাত্রি আটটায় বণিকদের আহূত সভায় উপ[illegible] থাকাকালে) পদচ্যুতির পত্র জারী করেন। এই ঘটনা গর্হিত পর্যায়ের অপমান বলিয়া জনসাধারণ [illegible] করিয়াছিল। কংগ্রেস পার্টির তরফ হইতে কোনো [illegible] প্রতিবাদ তাহাদের নির্ব্বাচনী বক্তৃতায় শোনা যায় না।

৫) যুক্তফ্রন্ট্ মন্ত্রিসভা (১৯৬৭) ভাঙিতে হুমা[য়ুন] কবীর এবং প্রফুল্ল ঘোষ সবিশেষ অগ্রণী ছিলেন। প্র[ফুল্ল] ঘোষকে কংগ্রেস দীর্ঘকাল পরে পার্টিতে ফিরাইয়া নে[য়]। হুমায়ুন কবীর মহাশয়ের অতীত কার্যকলাপ বাঙ্গা[লী] জাতি দেশের পক্ষে অহিতকর বলিয়া মনে করে। হুমা[য়ুন] কবীর আহত অবস্থায় হাসপাতালে থাকা কা[লে] মোরারজি দেশাই তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, ইন্দি[রা] গান্ধী ট্রাঙ্ক টেলিফোন-যোগে তাঁহার খবরাখ[বর] নিয়াছিলেন, কংগ্রেস-অনুগত দৈনিক পত্রিকাগু[লি] উহার ফলাও বিবরণ প্রকাশ করে। এই ঘটনাগু[লি] কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাসের সহায়ক হয়।

৬) ১৯৬৭ সালের নির্ব্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পা[র্টি] ১২৭টি আসন পাইয়াও প্রায়-অনুরূপ দলগুলির স[ঙ্গে] 'কোয়ালিসন' করিয়া গভর্ণমেণ্ট গঠন করে নাই। নীতি[র] দোহাই দিয়াই মন্ত্রিত্বের বৈরাগ্য ঘোষণা করা হয় অথচ কয়েকমাস পরেই নীতির বালাই অতিক্রম করিয়া, তাহারা দলত্যাগীগের দ্বারা গঠিত 'বাচ্চা-ই-সাক্কো' সরকারকে 'ঠেকনা' দিতে আগাইয়া আসে। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভোটারদের এক বিপুল অংশ কংগ্রেসের এই নীতিহীন রীতির ফলে বিরুদ্ধে গিয়াছে।"

আমরা পত্রলেখকের সঙ্গে মতান্তরের কারণ দেখি না।

সম্পাদক—শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক মুদ্রাকর—শ্রীকল্যাণ দাশগুপ্ত, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৭৭।২।১ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩